সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র

১৮৪০—১৯০৫

পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ

চতুর্থ খণ্ড

'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার রচনা-সংকলন

বিনয় ঘোষ

সম্পাদিত ও সংকলিত

পাঠভবন

১২/১ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট। কলিকাতা-১২

ভারত সরকারের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষা উন্নয়নোদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আনুকূল্যে প্রাপ্ত আর্থিক সাহায্যে এই গ্রন্থের বর্তমান মূল্য সম্ভব হয়েছে।

পাঠভবন। কলিকাতা ১২ হইতে
শ্রীমতী বীণা ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত

প্রথম প্রকাশ: জুলাই ১৯৬০

প্রচ্ছদশিল্পী: শ্রীবিমলেন্দু সেন

প্রচ্ছদ ও প্রতিলিপি মুদ্রণ:
ভারত ফটোটাইপ স্টুডিও
কলিকাতা ৯

মুদ্রক: শ্রীসুকুমার ভাণ্ডারী
রামকৃষ্ণ প্রেস
৬ শিবু বিশ্বাস লেন। কলিকাতা ৬

উ ৎ স র্গ

বিংশ শতকে নতুন বাঙালী সমাজ
যাঁরা গড়ে তুলবেন তাঁদের

"প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী
শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

—'সোমপ্রকাশ' এর কণ্ঠে মুদ্রিত শ্লোক।

"এই পত্র প্রতি সোমবার চাঁপাতলা এমহর্ষ্টে স্ট্রীট সিদ্ধেশ্বর চন্দ্রের লেন ১নং বাটী বাঙ্গলা যন্ত্রে শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়।"

—'সোমপ্রকাশ' প্রথমে কলিকাতা থেকে যখন
প্রকাশিত হত, তখন প্রতি সংখ্যার শেষে লেখা থাকত।

"এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ-পূর্ব মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাংড়িপোতা গ্রামে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতে প্রকাশিত হয়।"

—১৮৬২ এপ্রিল থেকে 'সোমপ্রকাশ' চাংড়িপোতা গ্রাম
থেকে প্রকাশিত হয়। বর্তমান 'চাংড়িপোতা' গ্রামের
নাম বদলে সুভাষগ্রাম করা হয়েছে। দক্ষিণ ২৪-পরগণায়
সোনারপুরের পরের স্টেশন সুভাষগ্রাম।

"The *Shome Prokash* was first projected by Pundit Eswar Chunder Vidyasaghur, and we believe the first number was written by him."

—*The Hindoo Patriot*, 9 January 1865.

বিষয়সূচী

সোমপ্রকাশ

'সোমপ্রকাশ' ও সেকালের বাঙালী সমাজ

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, সিপাহী বিদ্রোহের পর, বাংলার সামাজিক জীবনে 'সোমপ্রকাশ' ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। কোম্পানির আমলের অবসানের পর বাংলার সামাজিক জীবনে পরিবর্তনের ধারা বিচিত্রগামী হয়ে ওঠে। সমাজসংস্কার আন্দোলনের পুরোভাগে এসে দাঁড়ান প্রথমে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং পরে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ-কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে পরিচালিত পুনরুজ্জীবিত ব্রাহ্মসমাজ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর শিক্ষাক্ষেত্রে যে নতুন যুগ প্রবর্তিত হয়, তার বিচিত্র ফলাফল সমাজের সর্বক্ষেত্রে দেখা দিতে থাকে। শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্তশ্রেণীর স্তর ক্রমে প্রসারিত হতে থাকে এবং তার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ নতুন রাজনৈতিক কর্মজীবনের সূচনা হয়। অর্থনীতিক্ষেত্রে একদিকে যেমন নানাবিধ ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসার হয়, অন্যদিকে তেমনি রেলপথের বিস্তার, যানবাহন ও চলাচলের উন্নতি, আধুনিক কারখানাশিল্পের প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির ফলে পারিবারিক ও সামাজিক জীবন পরিবর্তনের তরঙ্গাঘাতে ভাঙতে-গড়তে থাকে। এইভাবে নানাদিক থেকে সামাজিক জীবনে নতুন নতুন তরঙ্গের সঞ্চার হয় এবং এইসব নতুন জীবনতরঙ্গের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি শোনা যায় সমকালের সাময়িকপত্রে। এই সমস্ত সাময়িকপত্রের মধ্যে 'সোমপ্রকাশ' নিঃসন্দেহে সর্বপ্রধান, অন্তত উনিশ শতকের ষষ্ঠ ও সপ্তম দশকে তার নিকট-প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য কোন পত্রিকা ছিল বলে মনে হয় না।

'সোমপ্রকাশ' ও দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ

১৫ নভেম্বর ১৮৫৮ · ১ অগ্রহায়ণ ১২৬৫) কলকাতার চাঁপাতলা অঞ্চল থেকে 'সোমপ্রকাশ' প্রথম প্রকাশিত হয়। ৯ জানুয়ারি ১৮৫৮ 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকায় লেখা হয় যে বিদ্যাসাগর মহাশয় এই পত্রিকার উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং প্রথম সংখ্যার কতকগুলি রচনা তাঁর নিজের লেখা। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে লিখেছেন: "শুনিয়াছি সোমপ্রকাশ প্রকাশের প্রস্তাব প্রথমে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বিদ্যাভূষণের নিকট উপস্থিত করেন। সারদাপ্রসাদ নামে তাঁহাদের প্রিয় একজন বধির পণ্ডিতকে কাজ যোগান, তাঁহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। ১৮৫৮ সালে সোমপ্রকাশ প্রথম প্রকাশিত হইল। দ্বারকানাথ সম্পাদকতা ভার ও তাঁহার যন্ত্র মুদ্রাঙ্কণের ব্যয়ভার গ্রহণ করিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতি কতিপয় বন্ধু লেখক-শ্রেণীগণ্য হইলেন। কার্যকালে সারদাপ্রসাদ আসিলেন না, অপরাপর লেখকগণও অদর্শন হইলেন; সোমপ্রকাশ সম্পূর্ণ রূপে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের উপরেই পড়িয়া গেল। তিনি

অধ্যাপকতা বাদে যে কিছু অবসর কাল পাইতেন, তাহা সমুদয় সোমপ্রকাশ সম্পাদনে নিয়োগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ন্যায় কর্তব্য-পরায়ণ মানুষ আমরা অল্পই দেখিয়াছি। তিনি যখন সংস্কৃত কলেজের পুস্তকালয়ে পাঠে নিমগ্ন থাকিতেন, তখন দেখিলে বোধ হইত না যে অধ্যাপকতা কার্য সুচারুরূপে নিষ্পন্ন করা ভিন্ন তাঁহার পৃথিবীতে আর কোনও কাজ আছে। আবার যখন গৃহে সোমপ্রকাশের জন্য রাশীকৃত দেশী ও বিলাতী সংবাদ-পত্র, গবর্ণমেণ্টের রিপোর্ট ও গ্রন্থাদি পাঠে মগ্ন থাকিতেন, তখন কোথা দিয়া ঘণ্টাব পর ঘণ্টা যাইত তাঁহাব জ্ঞান থাকিত না। রাত্রি ১১টার সময় শয়ন করিতে যাইবার পূর্বে দেখিয়াছি তিনি কার্যে মগ্ন আছেন, রাত্রি ৪টার সময়ে উঠিয়া দেখিয়াছি তিনি কার্যে মগ্ন আছেন। আমার বয়সের মধ্যে প্রত্যুষে উঠিয়া তাঁহাকে কখনও ঘুমাইতে দেখিয়াছি এরূপ মনে হয় না।" (পৃষ্ঠা ২৮৬-৮৭)

'সোমপ্রকাশে'র কণ্ঠে এই শ্লোকটি মুদ্রিত হত : "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।" দ্বারকানাথের সম্পাদনায় 'সোমপ্রকাশ' খুব অল্পদিনেব মধ্যেই শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্তের কাছে খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ১৮৬৫ সনের ২ জানুয়ারি থেকে দ্বারকানাথ কিছুদিনেব জন্য সম্পাদকীয় আসন থেকে অবসর গ্রহণ করেন। মোহনলাল বিদ্যাবাগীশ পত্রিকাব সম্পাদনার ভাব গ্রহণ করেন। ১৮৭৪ সনে স্বাস্থ্যলাভের উদ্দেশ্যে দ্বারকানাথ যখন কিছুদিনের জন্য কাশী যাত্রা করেন তখন তাঁর ভাগ্নে শিবনাথ শাস্ত্রী কয়েক মাস 'সোমপ্রকাশ' সম্পাদনার ভার নেন। ১৮৭৮ সনের মার্চ মাসে 'ভারনাকিউলার প্রেস অ্যাক্ট' জারি হয় এবং ১৮৭৯ সনের মার্চ মাসে 'লাহোরস্থ সংবাদ-দাতা'র একটি পত্র প্রকাশের জন্য 'সোমপ্রকাশ' বাজবোষে পডেন এবং গবর্ণমেণ্ট এক হাজার টাকা জমানৎ ও মুচলেকা চেয়ে পাঠান। দ্বাবকানাথ নিজেই প্রেস আইনের প্রতিবাদে পত্রিকা বন্ধ করে দেন। এই সময় বাংলার ছোটলাট স্যাব বিচার্ড টেম্পল তাঁকে রাজভবনে ডেকে এনে পত্রিকা বন্ধ না করার জন্যে নাকি বিশেষ অনুরোধ করেছিলেন। পরে আইন (Vernacular Press Act) উঠে যাবার পর পুনরায় সোমপ্রকাশ প্রকাশিত হয়, কিন্তু তাব পূর্ব প্রভাব আর থাকল না। পবে বিদ্যাভূষণ মহাশয় 'কল্পদ্রুম' নামে এক মাসিকপত্র কিছুদিন প্রকাশ করেন। তাও ক্রমে হস্তান্তবিত হয়ে গেল। প্রায় এক বছর বন্ধ থাকার পর ১৮৮০ সনের এপ্রিল থেকে আবার নব-কলেবরে 'সোমপ্রকাশ' প্রকাশিত হতে থাকে। ১৮৮৬ সনের ২৩ আগস্ট দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ পরলোক গমন করেন। তাঁর মৃত্যুর পরে আরও কিছুদিন 'সোমপ্রকাশ' প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাই বিদ্যাভূষণের জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি বললে অত্যুক্তি হয় না।

'সোমপ্রকাশ'-এব বৈশিষ্ট্য

'সোমপ্রকাশ'-এর আগে বাংলা সাময়িকপত্রে সামাজিক জীবনের ব্যাপক ও বিস্তারিত আলোচনা বিশেষ হত না। তার প্রধান কারণ, আলোচনা ও সমালোচনার

মূলে যে রাজনৈতিক চেতনা থাকা প্রয়োজন, সেই চেতনা বাঙালী মধ্যবিত্তের মধ্যে তেমন সঞ্চারিত হয়নি। সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকে এই চেতনার দ্রুত সঞ্চার হতে থাকে এবং তার উত্থান-পতনের সঙ্গে 'সোমপ্রকাশ'ও তরঙ্গায়িত হতে থাকে। সমাজ অর্থনীতি রাজনীতি শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি, প্রত্যেকটি বিষয়ে 'সোমপ্রকাশ' যে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়, তার সুর ও ভাষা পূর্বেকার ধারা থেকে একেবারে স্বতন্ত্র। রাজনৈতিক মতামত সেকালের তুলনায় অনেকটা নির্ভীক এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মতামত নিঃসন্দেহে উদার। এই কারণে 'সোমপ্রকাশ' উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে শিক্ষিত উদারপন্থী বাঙালী মধ্যবিত্তের অন্যতম মুখপত্র হয়ে উঠেছিল। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন: "দেখিতে দেখিতে সোমপ্রকাশের প্রভাব চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। প্রভাকর ও ভাস্কর প্রভৃতি বঙ্গসমাজের নৈতিক বায়ুকে দূষিত করিয়া দিয়াছিল, সোমপ্রকাশের প্রভাবে তাহা দিন দিন বিশুদ্ধ হইতে লাগিল। সোমবার আসিলেই লোকে সোমপ্রকাশ দেখিবার জন্য উৎসুক থাকিত। যেমন ভাষার বিশুদ্ধতা ও লালিত্য, তেমন মতের উদারতা ও যুক্তিযুক্ততা, তেমন নীতির উৎকর্ষ। চিত্তের একাগ্রতাটাই সোমপ্রকাশের প্রভাবের মূলে ছিল। তত্ত্ববোধিনী সম্পাদন বিষয়ে অক্ষয়বাবুর চিত্তে অদ্ভুত একাগ্রতার অনেক গল্প শুনিয়াছি; আর সোমপ্রকাশ সম্পাদন বিষয়ে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের চিত্তের একাগ্রতা দেখিয়াছি; তাহার অনুরূপ সমগ্র হৃদয়মনের একীভাব আর কখনও দেখি নাই। তিনি সোমপ্রকাশে যাহা লিখিতেন তাহার এক পংক্তি কাহারও তুষ্টি সাধনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া লিখিতেন না। লোকসমাজে আদৃত হইবার লোভে লোকের রুচি বা সংস্কারের অনুরূপ করিয়া কিছু বলিতেন না" (পূর্বোক্ত গ্রন্থ: পৃষ্ঠা ২৮৭)।

শাস্ত্রী মহাশয় যে সোমপ্রকাশের ভাষায় বিশুদ্ধতা ও লালিত্যের কথা বলেছেন তা অতিরঞ্জিত নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হবার পর 'সোমপ্রকাশে' তার ভাব ও ভাষার কঠোর সমালোচনা করা হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের গোষ্ঠীকে 'সোমপ্রকাশ' 'শবপোড়া মড়াদাহের দল' বলে বিদ্রূপ করতেন। বিদ্রূপটি পরিষ্কার। সাধারণত আমরা শবদাহ ও মড়াপোড়া বলে থাকি, কিন্তু সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলার মিশ্রণ 'সোমপ্রকাশ'-এর কাছে অসহ্য মনে হত বলে তাঁরা বঙ্কিম-গোষ্ঠীকে ঐ ভাষায় বিদ্রূপ করতেন। অবশ্য তার প্রতিবিদ্রূপও 'সোমপ্রকাশ'কে সহ্য করতে হত। এই ব্যঙ্গবিদ্রূপ সত্ত্বেও বলা যায় যে 'সোমপ্রকাশ'-এর ভাষা পূর্বগামীদের জড়তা কাটিয়ে উঠতে অনেকখানি সক্ষম হয়েছিল এবং কতকটা পরিমাণে প্রাঞ্জল ও সরলরূপ ধারণ করেছিল।

'মতের উদারতা ও যুক্তিযুক্ততা' 'সোমপ্রকাশ'-এর জনপ্রিয়তার একটি বড় কারণ বলে শাস্ত্রী মহাশয় উল্লেখ করেছেন। তাঁর কথা অনেকটা সত্য। ১৮৫৭ সনের জাতীয় বিদ্রোহের পর দেশের এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে ১৮৫৮ সনে 'সোমপ্রকাশ' প্রকাশিত হয় এবং প্রায় উনিশ শতকের অষ্টম দশক পর্যন্ত জাতীয় জীবনের বিচিত্র পরিবর্তনের ভিতর

দিয়ে জনমত গঠনের কঠোর কর্তব্য পালনে ব্রতী থাকে। এই সময়ের মধ্যে সামাজিক অর্থনীতিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলীর ঘাতপ্রতিঘাতে যে নতুন পরিবেশ সৃষ্টি হয়, 'সোমপ্রকাশ' তার দৃষ্টির উদারতাগুণে সেই পরিবেশের সঙ্গে একটি বিশিষ্ট সামঞ্জস্য স্থাপনে সক্ষম হয়। কোম্পানির আমল শেষ হবার পর ব্রিটিশরাজের শাসনকাল এইসময় থেকে আরম্ভ হয়। ক্যানিং, এলগিন, লরেন্স, মেও, নর্থব্রুক, লিটন, রিপন, ডাফরিন ও ল্যান্স-ডাউন—এই সময় ব্রিটিশরাজের পক্ষে ভারত শাসন করেন। যে সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনা এই সময় জাতীয় জীবনকে গভীরভাবে আলোড়িত করে, তাদের মধ্যে প্রধান হল এইগুলি :

> লাইসেন্স ট্যাক্স, বেঙ্গল রেণ্ট অ্যাক্ট, ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলস অ্যাক্ট, রয়েল টাইটেলস অ্যাক্ট, আফগান যুদ্ধ, ভার্নাকিউলার প্রেস অ্যাক্ট, শিক্ষাবিষয়ে হাণ্টার কমিশন, স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন আইন, ইলবার্ট বিল আন্দোলন, বেঙ্গল টেনেন্সি অ্যাক্ট, জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা।

ক্যানিং-এর শাসনকালে রেণ্ট অ্যাক্ট ও কাউন্সিলস অ্যাক্ট পাস হয়। কৃষকদের ইচ্ছামতো ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করাব অধিকার জমিদারদের কাছ থেকে কিছুটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করা হয় রেণ্ট অ্যাক্ট পাস করে। অ্যাক্টে বলা হয় যে যদি কোন কৃষক ১২ বছর দখলীস্বত্ব ভোগ করে, তাহলে সেই স্বত্ব থেকে তাকে সহজে উচ্ছেদ করা সম্ভব হবে না। শোনা যায় নাকি ইংলণ্ডের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী গ্ল্যাডস্টোন বাংলাদেশের এই রেণ্ট অ্যাক্টকে তাঁর প্রথম আইরিশ ল্যাণ্ড অ্যাক্টের মডেল হিসেবে ব্যবহার করেন। ১৮৬১ সনের ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলস অ্যাক্টকে ভারতের রাজনৈতিক জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে উল্লেখ করা হয়। এই অ্যাক্ট দ্বারা বডলাটের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলকে কতকটা ক্যাবিনেটের মতো করে গড়া হয় এবং আইন (Law), স্বরাষ্ট্র (Home), অর্থ (Finance) ও রাজস্ব (Revenue),—এই চারটি বিভাগের ভার দেওয়া হয় এক একজন সদস্যের উপর, এবং বড়লাট নিজে পররাষ্ট্র (Foreign Affairs) ও পাবলিক ওয়ার্কস বিভাগের দায়িত্ব নেন। হাণ্টারের ভাষায় বলা যায় : "All matters of imperial policy were debated behind closed doors". এই সংকীর্ণ অলিগার্কিতে আরও প্রায় ৫০ বছরের আগে, ১৯০৯ সনের আগে পর্যন্ত, কোন একজনও ভারতীয়ের স্থান হয়নি। তা না হলেও এই অ্যাক্টের ফলে পুরনো 'paternal' গবর্নমেণ্টের বদলে নতুন 'rule of law' খানিকটা প্রবর্তিত হয়। গ্ল্যাডস্টোনের লিবারেল গবর্নমেণ্টের পর ১৮৭৪ সনে ডিজরেইলির রক্ষণশীল গবর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। লর্ড নর্থ ব্রুকের পরে ডিজরেইলি লিটনকে ভারতের বড়লাট করে পাঠান। এই সময় মহারাণী ভিক্টোরিয়া কাইজার-ই-হিন্দ বা ভারত-সম্রাজ্ঞী উপাধিতে ভূষিত হন। এই উপলক্ষে ১৮৭৭ সনের ১ জানুয়ারী দিল্লীতে লিটনের আমলে জমকাল দরবার হয় এবং রয়েল টাইটেলস অ্যাক্ট পাস করে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করা হয় যে "the Crown of England should henceforth be

identified with the hopes, the sympathies and the interests of the Native Aristocracy" (Rawlinson). ১৮৮০ সনে লিটনের পদত্যাগের পর রিপন ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেন। রিপনের শাসননীতিতে সমসাময়িক ইংলণ্ডের গ্ল্যাডস্টোনিয়ান উদারভাব প্রভাব যথেষ্ট ছিল। তাঁর শাসনকালে ভার্নাকিউলার প্রেস অ্যাক্ট বাতিল করা হয়, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও প্রজাসংক্রান্ত বিল খসড়া করা হয়, ঐতিহাসিক ইলবার্ট বিল প্রণয়নের চেষ্টা হয়। ডাফরিনের শাসনকালে ১৮৮৫ সনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন:

"Would it have been possible even in the days of Akbar for a meeting like this to assemble, composed of all classes and communities, all speaking one language? It is under the civilising rule of the Queen and the people of England that we meet here together, hindered by none, freely allowed to speak our minds without the least fear of contradiction. Such a thing is possible under British rule, and British rule only."

প্রধানত 'সোমপ্রকাশের সাংবাদিকতার এই হল ঐতিহাসিক পশ্চাদ্‌ভূমি। সাংবাদিকতার কোন বলিষ্ঠ আদর্শ যখন এদেশে গড়ে ওঠেনি, তখন এই দ্রুত-পরিবর্তনশীল ঘটনাবর্তের মধ্যে 'সোমপ্রকাশ' যথাসম্ভব একটি আদর্শের হাল ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন। সেই আদর্শ হল—উদারতা ও স্বাদেশিকতার আদর্শ। আদর্শের একটি ধারাই যে একনিষ্ঠার সঙ্গে সর্বত্র অনুসৃত হয়েছে তা নয়। রাজনীতি ও অর্থনীতি বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে মধ্যে মধ্যে আদর্শের অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু এটুকু ত্রুটী তখনকার দিনে মার্জনীয়। মোটামুটি বলা যায়, 'সোমপ্রকাশ'-এর দৃষ্টিভঙ্গিতে বলিষ্ঠতা আছে, উদারতা আছে, স্বাদেশিকতাবোধ আছে এবং তার মধ্যে মধ্যবিত্তসুলভ দ্বিধাসংস্কারও আছে।

অর্থনৈতিক দৃষ্টি

অর্থনৈতিক বিষয়ের বিচার-বিশ্লেষণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'সোমপ্রকাশে'র আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রত্যেকটি আর্থিক সমস্যা 'সোমপ্রকাশ' বাস্তব সামাজিক দৃষ্টি দিয়ে বিচার করার চেষ্টা করেছেন। দেশের আর্থিক দুর্দশার কারণ বিশ্লেষণ করে 'সোমপ্রকাশ' লিখেছেন (পৃঃ ১২০-২২) যে দেশের বাণিজ্য বৃদ্ধির ফলে দ্রব্যাদি আগের তুলনায় অনেক দুর্মূল্য হয়েছে এবং সংসার নির্বাহ সেই কারণে অনেক বেশি ব্যয়সাপেক্ষ হয়েছে। যুগের পরিবর্তনের ফলে আমাদের ইচ্ছা, অভ্যাস ও সংস্কারের পরিবর্তন হয়েছে। আগেকার দিনে যে সমস্ত বস্তু আমাদের কাম্য ও ভোগ্য ছিল না, এখন তা কাম্য ও ভোগ্য হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ যাকে 'standard of living' ও

'consumption-pattern' বলা হয়, জীবন সম্বন্ধে দেশের লোকের (অন্তত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর) দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের ফলে তারও পরিবর্তন হচ্ছে বলে 'সোমপ্রকাশ' ইঙ্গিত করেছেন। লোকের আয় বেড়েছে, অর্থাগমের উপায় বেড়েছে, কিন্তু তাতেও অর্থাভাব মিটছে না। কথাটা মধ্যবিত্তদের লক্ষ্য করেই যে বলা হয়েছে তা বোঝা যায়। সমাজের লোকের ভোগের বাসনা বেড়েছে, জীবনধারণের স্ট্যাণ্ডার্ড বদলেছে, এবং তার সঙ্গে আমাদের হিন্দুসমাজের প্রাচীন প্রথাগুলিও বেশ দৃঢ়মূল হয়ে রয়েছে। নতুন ইচ্ছা ও পুরাতন প্রথা উভয়েই ব্যয়বহুল। পুরাতন ব্যয়বহুল প্রথার মধ্যে 'সোমপ্রকাশ' এই কয়টি উল্লেখ করেছেন: একান্নবর্তিতা, বাল্যবিবাহ, পিতা-মাতার শ্রাদ্ধ ও চিরবৈধব্য। প্রত্যেকটি প্রথার সঙ্গে আর্থিক অপব্যয়ের সম্পর্ক আছে।

বাঙালীর ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাকরিপ্রিয়তা প্রসঙ্গে 'সোমপ্রকাশ' যে মতামত প্রকাশ করেছেন তা আজকের দিনেও অত্যন্ত রূঢ় সত্য বলে মনে হয়।' 'সোমপ্রকাশ' লিখেছেন যে বাণিজ্য দু'রকমের—বহির্বাণিজ্য ও অন্তর্বাণিজ্য। প্রাচীন ভারতে বহির্বাণিজ্যের উন্নতি হয়েছিল, তার কারণ তখন সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ ছিল না। কিন্তু পরে হিন্দুসমাজে এমন একটি কুসংস্কার ঢুকল যাতে সমুদ্রযাত্রা করলে সমাজচ্যুত হতে হত। এই অবস্থায় বহির্বাণিজ্যের অবনতি না হয়ে পারে না। যেটুকু বহির্বাণিজ্য এদেশে আছে তাতে বোম্বাই-ওয়ালাদেরই আধিপত্য বেশি। বাঙালীরা এত বেশি মাত্রায় চাকরিপ্রিয় যে স্বাধীন বাণিজ্যের দিকে তাঁদের বিশেষ নজর নেই। দু'একজন যদিও বা বাণিজ্যে উদ্‌যোগী হন, তাঁরা একবার কোন কারণে ব্যর্থ বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে আর সেদিকে পা বাড়াতে চান না। বোম্বাইওয়ালারা তা করেন না, তারা ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করেও বার'বার চেষ্টার ফলে কৃতকার্য হন। বাণিজ্যের জন্য যে মূলধন প্রয়োজন, তা বাঙালী জমিদার ও ধনিকরা স্বচ্ছন্দে যোগাতে পারেন, এবং শতকরা তিনচার টাকা মাত্র গবর্নমেণ্টের সুদে টাকা না খাটিয়ে, কয়েকজন মিলে মূলধন সংগ্রহ করে বাণিজ্যের উদ্‌যোগ করতে পারেন। মধ্য-বিত্তরাও ইচ্ছা করলে কোঅপারেটিভের বা সমবায় সংস্থা গঠন করে বাণিজ্যের চেষ্টা করতে পারেন।

বাণিজ্যবিষয়ে এই রচনাটি ১৮৭৮ সনে লিখিত (পৃঃ ১২৪ ২৮)। ১৮৮০ সনে লিখিত একটি প্রবন্ধে (পৃঃ ১৩০-৩৪) বাংলাদেশের চটকলের আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রমশিল্পের প্রতি বাঙালীর অনুৎসাহের কথা 'সোমপ্রকাশ' উল্লেখ করেছেন। বাংলার কৃষকরা পাট চাষ করে হয়ত কিছু লাভবান হয়েছে, কিছু বাঙালী শ্রমিক হয়ত চটকলে কাজও করছে। কিন্তু নতুন চটকলে যত শ্রমিক নিযুক্ত হয়েছে তারচেয়ে অনেক বেশি গ্রামের চটশিল্পজীবী উৎখাত হয়েছে। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা হল যে চটকলের প্রায় সমস্ত টাকাই ইংরেজদের, কাজেই লাভের অংশও সবই প্রায় তাঁরাই পাচ্ছেন। এদিকে পুরাতন গ্রাম্য শিল্পজীবী যারা হাতে চট বুনে জীবনধারণ করত, চটকলের জন্য তাদের দুর্গতি বেড়েছে

এবং ভবিষ্যতে আরও বাড়বে। চটকলের মুনাফা ইংরেজরা ভোগ করছেন, তার আঘাত সহ্য করছে গ্রাম্য শিল্পীরা, বাংলাদেশের ও বাঙালীর কোন উপকার হচ্ছে না। এই যুক্তি দিয়ে 'সোমপ্রকাশ' অবশেষে ধনিক বাঙালীদের কাছে এই বলে আবেদন করেছেন যে তাঁরা যেন যথেষ্ট পরিমাণে চটকলের শেয়ার কিনে মুনাফার কিছুটা অংশ অন্তত দেশের মধ্যে রাখতে চেষ্টা করেন। বাণিজ্যের স্বাধীনতা প্রসঙ্গেও (পৃঃ ১৩৭-৩৮) এ বিষয় চমৎকার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে 'বাণিজ্যের স্বাধীনতা' নীতি হিসেবে ভাল, এবং সকলে এই নীতি পালন করলে কারও আর্থিক ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু বিশেষ কোন দেশের স্বার্থে যদি এই স্বাধীনতার বুলি আওড়ানো হয়, তাহলে তা অন্যান্য দেশের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে। আমাদের দেশে সাধারণত ইংলণ্ডের স্বার্থেই বাণিজ্যের স্বাধীনতার কথা বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ ইংলণ্ডের কলকারখানায় উৎপন্ন পণ্যদ্রব্য এদেশে করমুক্ত অবস্থায় স্বাধীনভাবে আমদানি হবে, কিন্তু এদেশে পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের অথবা বাণিজ্যের কোন স্বাধীনতা থাকবে না। স্বাধীনতার নীতি আমাদের দেশে ভারতবর্ষের পক্ষে অনিষ্টকর।

শ্রমশিল্পের বিস্তার ছাড়া যে দেশে প্রকৃত আর্থিক উন্নতি সম্ভব নয়, একথা সোমপ্রকাশ অর্থনৈতিক বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বহুবার উল্লেখ করেছেন (১৫৫-৫৫, ১৬৮-৭০, ১৮০-৮৯ পৃষ্ঠা)। শিল্পবাণিজ্যে এদেশী মূলধন নিয়োগের পক্ষে সোমপ্রকাশ সুযুক্তিপূর্ণ মত প্রকাশ করেছেন। যেমন লৌহশিল্প সম্বন্ধে বলেছেন যে এই শিল্পে মূলধন খুব বেশি দরকার এবং এদেশের ধনিকরা ইচ্ছা করলেই তা যোগাতে পারেন। বিদেশী ইংরেজরা যদি এদেশে মূলধন নিয়োগ করেন, তাহলে তাতে তাঁরাই লাভবান হবেন, এদেশের লোকের বিশেষ কিছু লাভ হবে না। শিল্পবিস্তার যে ভারতবর্ষের ধন বৃদ্ধির প্রধান উপায় তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ইউরোপীয় বাণিজ্যের সংঘর্ষে এদেশের শিল্পের চরম অবনতির বিশ্লেষণ সোমপ্রকাশ নিখুঁতভাবে করেছেন। বাংলাদেশে বিভিন্ন জেলায় ও অঞ্চলে যে সমস্ত দেশীয় শিল্পের বিশেষ উন্নতি হয়েছিল, বিদেশী পণ্যের প্রতিযোগিতায় কিভাবে তাদের অবনতি ও উচ্ছেদ হয়েছে তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে (১৬৮-৭০ পৃষ্ঠা)। দেশীয় শিল্পীরা নিজেদের বংশগত বৃত্তি পর্যন্ত ভুলে গিয়েছেন। আগের মতো ঢাকায় আর মসলিন প্রস্তুত হয় না, ঢাকার তাঁতিরা আর সেরকম সুতো তৈরি করতে পারেন না, তাঁরা সম্পূর্ণ ম্যাঞ্চেস্টারের অধীন হয়ে পড়েছেন। এখন বিলেত থেকে সুতোর আমদানি হয় এবং তাঁতিরা তাই ব্যবহার করেন। বর্ধমান জেলায় কালনার লালবাগান অঞ্চলে এক সময় উৎকৃষ্ট ধুতিশাড়ী তৈরি হত, এখন বিলেতি বস্ত্রের আমদানিতে তার অনেক অবনতি হয়েছে। বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলায় বহু লাক্ষার কারখানা আছে। বর্ধমান হুগলি ও মেদিনীপুর অঞ্চলে ধাতু-পাত্র তৈরি হয় এবং তা বিদেশে রপ্তানি হয়ে থাকে। ১৮৮২-৮৩ সালে বর্ধমান জেলা থেকে ৮ লক্ষ ৪৭

হাজার টাকার কাঁসা বিলেতে রপ্তানি হয়েছিল। সেই বছরেই হুগলি থেকে ৬ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকার পিতল বিলেতে রপ্তানি হয়। বর্ধমানের কাঞ্চননগরে অতি উত্তম ছুরি কাঁচি ও অস্ত্র তৈরি হত। এই সমস্ত শিল্পের দ্রুত অবনতি হয়েছে ও হচ্ছে। নদীয়ার শান্তিপুর অঞ্চল কাপড়ের জন্য বিখ্যাত ছিল এবং মুর্শিদাবাদের খ্যাতি ছিল রেশমের জন্য। কিন্তু বিলেত থেকে সার্টিন ও অন্যান্য বস্ত্রের আমদানির জন্য এই সব অঞ্চলের শিল্প প্রায় লোপ পেতে বসেছে। রাজসাহী ও রংপুরের পিতলের বাসনের একদা যে খ্যাতি ছিল, এখন আর তা নেই। মেদিনীপুর দিনাজপুর বগুড়া জলপাইগুড়ি পাবনা প্রভৃতি অঞ্চলে একসময় খুব উন্নত মাদুরের ব্যবসা ছিল, এখন তার অবনতি হয়েছে। এরকম বহুবিধ শিল্পকর্মের অবনতি ঘটেছে বাংলাদেশে এবং তার প্রধান কারণ হল বিদেশী দ্রব্যের প্রতি লোকের আকর্ষণ ও রুচির পরিবর্তন এবং সেকালের গ্রাম্যসমাজের সংহতির দ্রুত ভাঙন। চট, সিমেন্ট, কাগজ, কাপড় ইত্যাদি আধুনিক কলকারখানা কিছু-কিছু দেশের মধ্যে গড়ে উঠছে বটে, এবং তাতে এদেশের লোকজন কাজকর্মেও নিযুক্ত হচ্ছে, কিন্তু যে অনুপাতে নানাবিধ শিল্পকর্ম থেকে দেশের লোক উৎখাত হচ্ছে, সেই অনুপাতে নতুন কাজ পাওয়া যাচ্ছে না। তার ফলে দেশের আর্থিক অবস্থা ক্রমেই খারাপ হচ্ছে।

বাঙালীর দারিদ্র্যের কারণ বিশ্লেষণ

বাঙালীর দারিদ্র্যের কারণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে 'সোমপ্রকাশ-এর' একটি রচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। রচনাটি আজও বাঙালী মাত্রেরই পাঠ্য, এবং একাধিকবার পাঠ্য। রচনাটির নাম 'বাঙ্গালীর দারিদ্র্য' (১৮০০-৮৯), বেশ দীর্ঘ রচনা। রচনাটির বিশ্লেষণ পদ্ধতির মধ্যে 'সোমপ্রকাশ'-এর যে বাস্তব সমাজমুখী দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে, তা তৎকালের সাময়িকপত্রের মধ্যে খুবই বিরল বললে বেশি বলা হয় না। এরকম যুক্তিধর্মী রচনা একালের সাময়িকপত্রেও বেশি চোখে পড়ে না।

দারিদ্র্যের কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে প্রথমে 'সোমপ্রকাশ' বাঙালীর বিভিন্ন উপজীবিকার কথা আলোচনা করেছেন। তারপর দেখিয়েছেন যে ইংরেজ আমলে সমাজের বাস্তব অবস্থার পরিবর্তনের জন্য কিভাবে এই সমস্ত উপজীবিকার ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়েছে। উপজীবিকাকে সাতটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে: (১) সামান্য ব্যবসাবাণিজ্য (২) ভূসম্পত্তির উপস্বত্ব ভোগ (৩) দৈহিক ও মানসিক শ্রম বিক্রয় অথবা চাকরি (৪) জাতীয় বৃত্তি (৫) তোষামোদ, ভিক্ষা, উঞ্ছবৃত্তি (৬) আত্মবিক্রয় বা ধর্মবিক্রয় (৭) প্রতিভাবিক্রয়। প্রথম শ্রেণীর সামান্য ব্যবসাবাণিজ্যের মধ্যে আড়তদার গোলাদার দোকানদার মুদি ফেরিওয়ালা প্রভৃতি খুদেব্যবসায়ী যারা সামান্য মূলধন নিয়ে ব্যবসা করে তাদের ধরা হয়েছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর ভূমির উপস্বত্বভোগীদের মধ্যে জমিদার পত্তনিদার তালুকদার জোতদার বৃত্তিব্রহ্মোত্তরভোগীদের উল্লেখ করা হয়েছে। তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে হাইকোর্টের জজ,

ডাক্তার উকিল মোক্তার থেকে আরম্ভ করে কুলিমজুর পর্যন্ত সকলেই গণ্য হতে পারে। চতুর্থ শ্রেণীর মধ্যে যারা গণ্য হবার যোগ্য তারা হল পুরুত ধোপা নাপিত কামার ছুতোর প্রভৃতি। এরা বংশানুক্রমে নিজেদের কুলবৃত্তি অনুযায়ী জীবিকা অর্জন করে আসছে। পঞ্চম শ্রেণীর সংখ্যাও সমাজে কম নয়। অপরের গললগ্ন হয়ে থাকা এবং ভিক্ষা চুরি বা তোষামোদ করে কোন রকমে জীবনযাপন করা সমাজে একশ্রেণীর লোকের স্বভাব হয়ে দাঁড়ায়। যারা আত্মবিক্রয় বা ধর্মবিক্রয় করে তাদের ষষ্ঠ শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। বিবাহে পণ গ্রহণ, শিষ্যের কাছে গুরুর অর্থ গ্রহণ, বেশ্যাবৃত্তি—এ সমস্ত প্রাচীনকালে সমাজে নিন্দনীয় কর্ম বলে গণ্য হত, এবং সেই নিন্দার একটা সামাজিক ভয়ও তখন ছিল। কিন্তু ক্রমে এ নিন্দাভয় সমাজে আর থাকছে না।

বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বসতি, একথা ঠিক, বিশেষ করে বৈদেশিক বাণিজ্যে। কিন্তু এরকম বাণিজ্যের বিস্তার আমাদের দেশে বিশেষ হয়নি। এখন বিদেশী বণিকরা বৈদেশিক বাণিজ্য তাঁদের কুক্ষিগত করে ফেলেছেন। তাঁরা এদেশের দ্রব্য বাইরে রপ্তানি করে এবং বিদেশের দ্রব্য এদেশে আমদানি করে প্রভূত লাভ করছেন। এদেশের লোকের হাতে যে সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য আছে তাতে লাভের অংশ সামান্য। আজকাল আবার তাতেও প্রতিযোগিতা খুব বেড়েছে, অর্থাৎ ছোট ব্যবসায়ীর সংখ্যা আগের তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে। তাতে সামান্য কিছু লোকের উন্নতি হয়েছে বটে, কিন্তু সেটা নিতান্তই ব্যক্তিগত উন্নতি, তাকে জাতীয় উন্নতি বলা যায় না। বৈদেশিক বাণিজ্যের আমদানি-রপ্তানির হরণ-পূরণ হয়ে যে পরিমাণ দ্রব্য বেশি রপ্তানি হয়, সেই পরিমাণ জাতীয় ধনের ক্ষয় হয় এবং দেশের লোকও দরিদ্র হয়। কাজেই বৈদেশিক বাণিজ্যে যদি নিজেদের উদ্বৃত্ত না থাকে তাহলে তাতে দেশের আর্থিক ক্ষতিই হয়ে থাকে।

জমিদার তালুকদার পত্তনিদার প্রভৃতি ভূমির উপস্বত্বভোগীদের খানিকটা সুবিধা হয়েছে, কিন্তু তাঁদের সুবিধা কতকটা অন্তত কৃষকদের সচ্ছল অবস্থার উপর নির্ভর করে। কিন্তু দেশের কৃষকদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। প্রায়ই অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টির জন্য দেশে অজন্মা হয় এবং ভারতের নানা স্থানে খাদ্যাভাব ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তাছাড়া এদেশের কৃষকরা জমি চাষ করে যা উৎপাদন করে তাতে তাদের পারিবারিক প্রয়োজন মেটে না। সর্বদাই তাদের আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হয় এবং তার ফলে মহাজন ও জমিদারদের কাছে দেনার দায়ে জড়িয়ে পড়ে। 'সোমপ্রকাশ' লিখেছেন: "এদেশের পক্ষে কৃষকই যথার্থ ধন-উৎপাদক। সে শ্রেণীর এরূপ দুর্দশা হইলে দেশেরও দুর্দশা, উপস্থিত জমিদার, তালুকদারেরও দুর্দশা। ইহার উপরে আবার গবর্নমেণ্টের আইনকানুনের উপসর্গে এই দারিদ্র্যরোগ আরও বর্দ্ধিত হয়।" একথা বলেও 'সোমপ্রকাশ' আধুনিক শিল্পায়ন ও কলকারখানার উপযোগিতার কথা উল্লেখ করতে ভোলেননি। এই প্রসঙ্গে লিখেছেন: "বৈজ্ঞানিক শিল্পপ্রধান দেশে এরূপ দুর্দশা ঘটে না। কারণ বৈজ্ঞানিক ও

কলকারখানার কার্যের উপর প্রাকৃতিক বা দৈব ঘটনার আধিপত্য নাই। অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি হউক, তাহাতে মেসিনারির বল ও কার্য্য সমানভাবেই হইতে থাকে; সেইজন্য শিল্পপ্রধান দেশ ধনী এবং কৃষকপ্রধান দেশ দরিদ্র।"

যারা শ্রমবিক্রয় বা চাকরি করে, অথবা মুটে মজুরীতে জীবিকা অর্জন করে, তাদের অবস্থাও খুব ভাল নয়। বিশেষ করে চাকরির জন্যে বাংলাদেশে এত বেশি লোক লালায়িত যে চাহিদার চেয়ে প্রার্থীর সংখ্যা অনেক বেশি হয়ে গেছে, এবং তার ফলে চাকরির বাজারও সস্তা হয়েছে। ভাল চাকরি যা কিছু তা সবই প্রায় বিদেশী রাজপুরুষদের একচেটে। অথচ দেশের যে টাকা দিয়ে এসব বিদেশী চাকুরের শ্রম ও মর্যাদা কিনতে হয়, তার চেয়ে অনেক অল্প মুল্যে এদেশেব শ্রম ও যোগ্যতা কিনতে পাওয়া যেতে পারে। বিদেশী চাকুরের সঞ্চিত ধন ও পেনসন বিদেশে যায় এবং সেখানেই খরচ হয়। তাতেও দেশের যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতি হয়। 'সোমপ্রকাশ' লিখেছেন:

"শ্রমবিক্রয় অর্থাৎ চাকুরি কিম্বা মুটে-মজুরিতে অনেকে অনেকটা সুবিধা বিবেচনা করেন কিন্তু ঐ কার্য্যে এত লোকের প্রবৃত্তি হইয়াছে, চাকুরিব জন্য এত লোক লালায়িত যে, প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রার্থী হইয়াছে সুতরাং চাকুরির বাজার সস্তা হইয়াছে। শ্রমবিক্রয়ে এক্ষণে যে অর্থ মিলে তাহাতে দারিদ্র্য কিছুমাত্র অন্তর্হিত হয় না। আবার শ্রমবিক্রয়ের উৎকৃষ্টাংশ রাজপুরুষ বা রাজানুগৃহীতের একচেটে। তাঁহাদের যোগ্যতা বা শ্রম যে মুল্যে দেশীয় ধন দ্বারা ক্রীত হয়, তদপেক্ষা অল্পমুল্যে দেশীয় যোগত্যা ও শ্রম পাওয়া যাইতে পারে। আবার তাঁহাদের সঞ্চিত ধনের ও পেন্সনের অধিকাংশই বিদেশে চলিয়া যায় ও তথায় ব্যয়িত হয়, দেশীয়ের সঞ্চিত ধন পেন্সন দেশেই থাকে।"

এদেশের জাতীয় ব্যবসায়ী ও শিল্পীদের অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়েছে। জাতিগত শিল্পকর্মে বংশপরম্পরায় যারা নিযুক্ত ছিল এবং সেকালের গ্রাম্যসমাজের পরিবেশে যাদের আর্থিক প্রয়োজন মোটমুটি মিটে যেত, তারা নতুন সামাজিক পরিবেশে প্রায় উচ্ছেদ হবার উপক্রম হয়েছে। বিদেশী শিল্পদ্রব্যের প্রাচুর্য ও প্রতিযোগিতায় এদেশের কুটিরশিল্প ও লোকশিল্প ক্রমেই ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। যে সমস্ত জিনিস বিলেত থেকে আমদানি হয় না, কিছুটা পরিমাণে সেই সমস্ত জিনিস এখন এদেশে তৈরি হয় এবং বাজারে বিক্রি হয়। কলকারখানা না হলে, আধুনিক শ্রমশিল্পের বিস্তার না হলে, এদেশের দারিদ্র্য দূর হবে বলে মনে হয় না। এই প্রসঙ্গে 'সোমপ্রকাশ' লিখেছেন:

"জাতীয় ব্যবসায়ী অথবা শিল্পী, এই বিভাগের অনেক শ্রেণীরই অন্ন মারা গিয়াছে। আমাদের দেশে কোনরূপ শিল্পকার্য্যের উন্নতি কোন কালে ছিল না বা এখনও নাই। কল কৌশলে শিল্পকার্য্য হইলে সুন্দর অথচ সুলভ দ্রব্য প্রস্তুত হয়। এদেশে সেরূপ কল-বল কোন কালে ছিল না, এখনও নাই। ইউরোপীয় কল কৌশল নিষ্পন্ন দ্রব্যাদির সংঘর্ষণে, এদেশের জাতীয় ব্যবসায় অথবা শিল্পী-শ্রেণী একেবারে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। যে সকল দ্রব্য

বিলাত হইতে আমদানি হয় না, সামান্যাকারে সেই সকল দ্রব্য প্রস্তুত ও বাজারে বিক্রয় হয়। ইহাতে দেশের দারিদ্র্য ভঞ্জনের কোন কারণ নাই। বরং বিদেশীয়ের হস্তে শিল্প কার্য্য ন্যস্ত থাকায়, তদুৎপন্ন প্রচুর লাভ তাহারা বিদেশে বসিয়া উপভোগ করে।"

চোর জুয়াচোর চাটুকার ভিক্ষুক যারা, তাদেরও দুর্গতির শেষ নেই। কারণ দরিদ্র দেশে ভিক্ষুকের ভিক্ষা, চোর জুয়াচোরের কর্মক্ষেত্র, চাটুকারের পুরস্কার দুর্লভ। দরিদ্রের নিকট ভিক্ষুকেরও প্রত্যাশা নাই, চাটুকারেরও আদর নাই, উঞ্ছবৃত্তিরও উপায় নাই।"

আত্মবিক্রয় বা ধর্মবিক্রয় করে যাঁরা জীবিকা অর্জন করেন, সমাজে তাঁরা চিরদিনই নিন্দনীয়। বর্তমানে এঁদের অবস্থাও শোচনীয়। তাছাডা বর্তমানে এই ঘৃণ্য বৃত্তিরও প্রসার হয়েছে। শিষ্যের কাছে গুরুর অর্থগ্রহণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী পাত্রদের জন্য পাত্রীর অভিভাবকদের কাছ থেকে যথেষ্ট পণ গ্রহণ প্রভৃতি আধুনিককালে আত্মবিক্রয়ের বড দৃষ্টান্ত।

সপ্তম শ্রেণীর উপজীবিদের 'প্রতিভা-বিক্রেতা' বলা হয়েছে। এই শ্রেণীর সংজ্ঞা নির্দেশ করা হয়েছে এইভাবে: "এই বিভাগে প্রতিভাসম্ভূত কাব্য নাটক নভেল বিক্রয়, বিজ্ঞান রসায়নশাস্ত্র ধর্মশাস্ত্র অথবা উপদেশপূর্ণ কোনরূপ সাময়িক পত্রাদি দ্বারা আবিষ্কর্তা, প্রণেতা রচয়িতা যে স্বত্ব ভোগ করেন, সেই স্বত্বাধিকারিগণকে প্রতিভাবিক্রেতা বলা যায়।" অতীতে আমাদের সমাজে এই জীবিকা প্রচলিত ছিল না, অর্থাৎ ব্যবসায়ীর মনোবৃত্তি নিয়ে কেউ বিদ্যাবুদ্ধি সংশ্লিষ্ট এই সমস্ত কাজ করতেন না। আধুনিক যুগে বিদ্যাবুদ্ধি বাণিজ্যপণ্য হয়ে উঠেছে, প্রতিভার একটা বাজারমূল্য আছে। সেইজন্য সাহিত্যচর্চা সাংবাদিকতা শিক্ষকতা অধ্যাপনা প্রভৃতি পেশা স্বাধীন ব্যবসায়ের মতো বিনিময়-প্রধান হয়ে উঠেছে। সোমপ্রকাশ লিখছেন: "এইরূপ বৃত্তি অবলম্বনে কোন দোষ দেখা যায় না বরং প্রার্থনীয় বলা যাইতে পারে।" সোমপ্রকাশের মতামত নিছক মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর মতামত—প্রতিভা-বিক্রয় যুগধর্ম, কাজেই অশাস্ত্রীয় হলেও তাতে দোষ নেই। তবে এই বৃত্তির লোকসংখ্যা এত অল্প যে তাদের পৃথক সামাজিক শ্রেণীভুক্ত করা যায় না।

এইভাবে বিভিন্ন উপজীবিকার শ্রেণীভেদ করে বর্তমান সমাজব্যবস্থায় প্রত্যেকটির আর্থিক উন্নতি অবনতির সম্ভাবনা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। কি উপায়ে বিভিন্ন উপজীবিকার আর্থিক উন্নতির পথে ব্যাঘাত ঘটেছে তাও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ ছাড়াও বাঙালীর আর্থিক অবনতির আরও কয়েকটি সামাজিক ও চারিত্রিক কারণ আছে যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই কারণগুলি সোমপ্রকাশ এইভাবে নির্দেশ করেছেন:

(ক) বাংলাদেশে লোকসংখ্যা আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে এবং ক্রমেই বাড়ছে। কিন্তু বাংলাদেশে যে পরিমাণ ধনোৎপাদন হয় তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে লোকসংখ্যা

বাড়ছে না। ধনোৎপাদনের তুলনায় লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার অনেক বেশি। তার ফলে লোকের দারিদ্র্য ক্রমে বাড়ছে। তাছাড়া সামান্য যা ধনোৎপাদন হয় তার অনেকটা অংশ বিদেশী রাজপুরুষদের ভরণপোষণে ব্যয় হয়ে যায়। দেশের লোকের জন্য যা অবশিষ্ট থাকে তাতে সকলের পক্ষে দুবেলা দুমুঠো অন্ন সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। তার উপর বাঙালীদের ঘরকুণো স্বভাব আর্থিক উন্নতির পরিপন্থী। বাঙালীরা ঘর ছেড়ে অথবা দেশ ছেড়ে বাইরে যেতে চান না। "বাঙ্গালী ঘরে পড়িয়া অনাহারে মরিবে, তথাপি বাহিরে যাইয়া আহারান্বেষণ করিবে না। সুতরাং বাঙ্গালীর উল্লিখিত প্রবৃত্তিদ্বয় দারিদ্র্য ব্যাধির ঘোর উপসর্গ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

(খ) কতকগুলি সামাজিক রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহার বাঙালীর আর্থিক উন্নতির প্রবল অন্তরায় হযে রয়েছে। তার মধ্যে বিবাহপ্রিয়তা ও বিবাহবাধ্যতা অন্যতম। এই বিবাহপ্রিয়তা ও বাধ্যতার জন্য বাঙালীসমাজে বাল্যবিবাহ বহুবিবাহ প্রভৃতি মারাত্মক দোষ দেখা দিয়েছে। এই কারণে দেশের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি তো হচ্ছেই, অর্থের অপচয়ও যথেষ্ট হচ্ছে। এই অপচয়ের ফলে বাঙালীর পারিবারিক জীবন ক্রমে চরম আর্থিক দুর্গতির সম্মুখীন হচ্ছে। বাল্যবিবাহ বহুবিবাহ প্রভৃতি সামাজিক কুরীতির অবসান না হলে এই আর্থিক দুর্গতি থেকে মুক্তির কোন আশা নেই।

(গ) বাঙালীর আর্থিক দুর্গতির তৃতীয় অন্তরায় হল আর একটি সামাজিক কদাচার, তার নাম কৌলীন্যপ্রথা। এই প্রথা থেকে বিবাহকালে পুত্রকন্যার পণ গ্রহণের রীতি প্রচলিত হয়েছে এবং এই রীতি ব্রাহ্মণেতর বিভিন্ন জাতির মধ্যেও সংক্রমিত হয়েছে। কৌলীন্যপ্রথা বাঙালীর আর্থিক অবনতির একটি বড় কারণ।

(ঘ) চতুর্থ কারণ হল—একান্নবর্তিতা। "বহু পরিবারের এক অন্নে থাকা, বঙ্গীয় সমাজের চিরপ্রচলিত এই প্রথাও দারিদ্র্য আনয়ন করে। ভাবুন, একটা পরিবারে একজন উপায়ক্ষম আছেন। সে উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলে চতুর্দ্দিক হইতে দূর সম্বন্ধীয় জ্ঞাতি কুটুম্ব আসিয়া তাহার গলগ্রহ হইল। তাহারা নিষ্কর্ম্মা হইয়া একজনের উপার্জ্জিত অর্থে উদর পোষণ করিতে লাগিল। সুতরাং উপার্জ্জনকারীর কিছুমাত্র সংস্থান হইল না, অথচ আলস্য পরবশ জ্ঞাতি কুটুম্বগণও সমাজের অকর্ম্মণ্য জীব হইয়া কেবল ধনক্ষয় করিতে লাগিল…"। এ ছাড়া বাল্যবিবাহ বহুবিবাহ, চিরবৈধব্য প্রভৃতি নানাবিধ সামাজিক কুরীতির জন্য বাঙালী পরিবার ক্রমে একটি রাবণের পরিবারের মতো আকার ধারণ করে। সুতরাং একান্নবর্তিতা যে বাঙালীর আর্থিক দুর্গতির একটি বড় কারণ তাতে সন্দেহ নেই।

(ঙ) বাঙালী সমাজে ধর্মাচারের প্রভাবও অত্যন্ত প্রবল। পিতা-মাতার শ্রাদ্ধ, ঠাকুরসেবা, উৎসব পার্বণ এবং এই জাতীয় অন্যান্য আরও অনেক ধর্মাচার ও লোকাচার পালনের জন্য বাঙালী অবস্থাপন্ন গৃহস্থদের বহু অর্থ ব্যয় করতে হয়। সোমপ্রকাশ লিখেছেন:

"বিবেচনা করুন এক স্থানে পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয়ে একটী বারইয়ারি পূজা হইল, যাত্রা, মহোৎসব, নাচ, তামাসা, সাজ সরঞ্জাম, ঠাকুর গঠন প্রভৃতিতে সেই ৫০ হাজার টাকা ব্যয়িত হইল, অর্থাৎ ধনীর হস্ত হইতে সে টাকাটী দশ জনের হস্তে পড়িল। বারইয়ারির পরদিবসে সে অর্থ ব্যয়ের চিহ্নও থাকিল না। কিন্তু ভাবুন দেখি, এই বঙ্গদেশে শুধু বারইয়ারির উপলক্ষ্যে এক বৎসরে যে টাকাটী ব্যয় হয়, সেই অর্থ দ্বারা যদি পাঁচটী উচ্চদরের কারখানা খোলা যায় তবে তাহাতে কত লোক কত দিনের জন্য প্রতিপালিত হইতে পারে।" আমাদের দেশের লোক ধর্ম-কর্মে যাগযজ্ঞে, অতিথিশালা ও অন্নসত্র স্থাপনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে মনে করেন যে এমন পুণ্যকর্ম করছেন যাতে পরলোকে স্বর্গের সিংহদ্বার তাঁদের জন্য বিনা পাহারায় খোলা থাকছে। তাঁরা এও মনে করেন যে এই সব পুণ্যকর্মের দ্বারা তাঁরা লোকের ও সমাজের উপকার করছেন। সোমপ্রকাশের অভিমত হল: "কিন্তু ইহাতে সাধারণকে আলস্যপরবশ করে। অতিথিশালা স্থাপন করিলেন বা অন্নসত্র দিলেন, কতকগুলি লোক তথায় পরপিণ্ডে পেটপুরিয়া আলস্য ও পাপের আশ্রয় দিতে লাগিল ও অকর্মণ্য হইয়া সমাজের অব্যবহার্য্য জীব হইতে চলিল। ধনীর ধন বিতরণের এরূপ পন্থা প্রশস্ত নহে। ইহাতে দারিদ্র্য আনয়ন করে।"

(চ) বংশগত মর্যাদার অভিমান এবং শাস্ত্রোক্ত নিষেধ পালন বাঙালীর আর্থিক অনুন্নতির আর একটি বড় কারণ। বংশগত অভিমানের এই দৃষ্টান্ত সোমপ্রকাশ উল্লেখ করেছেন। কোন জমিদার-সন্তানের প্রপিতামহ একদা সুপ্রসিদ্ধ মান্যগণ্য জমিদার ছিলেন। হয়ত তখন তাঁর বার্ষিক আয় ছিল ৫০ হাজার টাকা। দেশহিতকর কাজে অর্থব্যয় করার জন্য গবর্নমেণ্ট তাঁকে রাজোপাধিতে সম্মানিত করেছিলেন। এই মান্যগণ্য জমিদার পাঁচ পুত্র ও তিন কন্যা রেখে পরলোক গমন করেন। তাঁর সঞ্চিত ধনসম্পত্তি পুত্রকন্যাদের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। অতঃপর পুত্রকন্যাদেরও স্বাভাবিক নিয়মে বংশবৃদ্ধি হতে থাকে। তার ফলে চার পুরুষের মধ্যে ঐ সম্পত্তি কড়ায়-গণ্ডায় ভাগ হয়ে যায়। বর্তমান জমিদার বা রাজসন্তান নয় গণ্ডা তিন কড়ার সম্পত্তির মালিক এবং সেই সম্পত্তির আয় থেকে তাঁর সংসার চলে না। সাধারণত জমিদার-সন্তানদের যে রকম বিদ্যাবুদ্ধি তাতে পরের অধীনে চাকরি করলে তিনি খুব বেশি হলে মাসে একশত টাকার মতো রোজগার করতে পারেন। কিন্তু পরের চাকরি করলে জমিদারবংশের মর্যাদার হানি হয়, কাজেই তিনি চাকরি করতে পারেন না। কেউ সেরকম প্রস্তাব করলে তিনি বলেন যে তাঁর প্রপিতামহ রাজা ছিলেন, তিনি পরের চাকর হতে পারেন না। "এই অভিমানে ফাটিয়া ঘরে পড়িয়া উপবাস করিতে লাগিলেন। ক্রমে বৃথা অভিমানে, চিন্তায়, দরিদ্রতায় অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন এবং তাঁহা হইতেও দরিদ্র কতকগুলি অপগণ্ড শিশুসন্তান, বিধবা স্ত্রী, ভগ্নী প্রভৃতি সাত আটজনকে দুস্তর সংসার সাগরে নিরবলম্বনে ভাসাইয়া গেলেন। ইহাকে বলে বংশগত অভিমানের অত্যাচার।" এই বংশগত অভিমানে অন্ধ হয়ে বাংলাদেশের অনেক

বিত্তশালী সম্ভ্রান্ত পরিবার চরম আর্থিক দুর্গতির মধ্যে পড়ে একেবারে উচ্ছন্নে গিয়েছে। প্রপিতামহদের দিন বহুকাল আগে গত হলেও তাঁরা সেই অতীতের স্বপ্নে আত্মবিস্মৃত হয়ে বর্তমান বাস্তবকে উপেক্ষা করেছেন।

শাস্ত্রোক্ত নিষেধের বাধাও অনেক আছে। তার মধ্যে জাতিবর্ণভিত্তিক কর্মভেদ আমাদের দেশের আর্থিক উন্নতির পথে প্রবল অন্তরায়। সুখের বিষয় আধুনিক যুগে জাতিগত বৃত্তিভেদের বন্ধন অনেকেই মানেন না, কিন্তু এখনও এই বন্ধন যেটুকু আছে তাতেও সমাজের আর্থিক ক্ষতি যথেষ্ট হচ্ছে। জাতিভেদ ও কর্মভেদ আমাদের জাতীয় অবনতির অন্যতম কারণ।

শিক্ষাবিভ্রাট বাঙালীর আর্থিক অবনতিব অন্যতম কারণ। যে শিক্ষার প্রচলন আছে তাতে শিক্ষিতদের বিভিন্ন প্রকারে কর্মদক্ষতা কিছুই বাড়ছে না। "নানা প্রকার শিল্প কৌশল, বিজ্ঞান প্রভৃতি অর্থকরী ও কার্য্যকরী শিক্ষা, এদেশে নাই বলিলেই অত্যুক্তি হয় না। যে ভাবের শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাতে কেবল শূন্যে কেল্লা নির্ম্মাণের বৃদ্ধি হয়, বচনে খৈ ফুটাইবার ক্ষমতা হয়, শিমুল ফুলের মত অল্প বাতাসে ফাটিয়া চটিয়া দেশময় হওয়ার সুবিধা হয়, এরূপ নিষ্ফল শিক্ষায় দারিদ্র্য ও দুঃখেব স্রোত প্রবলবেগে বহিবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।"

উপযুক্ত কার্যক্ষেত্রের অভাব দেশের লোকের দারিদ্র্যের আর একটি কারণ। দেশের লোকসংখ্যা বাড়ছে, শিক্ষার প্রসার হচ্ছে, কিন্তু কর্মক্ষেত্রের সংকীর্ণতা দূর হচ্ছে না। রেলওয়ে, ট্রামওয়ে, চাবাগান ও সদাগরী আফিসে অনেক লোক কাজকর্ম করে প্রতিপালিত হচ্ছে। বিদেশী বণিকদের অধীনে কাজ করে বিস্তর লোক জীবিকা নির্বাহ করছে। কিন্তু দেশের ধনী লোকদের এদিকে আদৌ দৃষ্টি নেই। দেশের উন্নতির জন্য তাঁরা একটুও মাথা ঘামান না। বিদেশীরা যদি তাঁদের কাজ-কারবার তুলে চলে যান তাহলে দেশের লোকের যে কি শোচনীয় অবস্থা হবে তা ভাবতেও ভয় হয়। "সেই জন্য এই বলি, কেবল বিদেশীয়ের ভাগ্যোপজীবি হইলে দেশের দারিদ্র্যতা কখনও ঘুচে না।"

গবর্ণমেন্টের "বিদেশপ্রিয়তা, বিজাতীয়তা ও ধর্ম্মান্ধতা" এই তিনটি গুণের জন্য এদেশের দারিদ্র্য ক্রমেই বাড়ছে। রাজার "বিদেশীয়তা ও বিজাতীয়তা হেতু" প্রজাদের উপর তাঁর কোন সহানুভূতি নেই। তাঁরা কেবল নিজেদের প্রাপ্য রাজস্ব ও অর্থ বা মুনাফা আদায় করার জন্য ব্যস্ত এবং তাতে দেশের ক্ষতি হলেও তাঁরা সে সম্পর্কে উদাসীন। এরকম বিদেশী রাজার অধীনে কোন দেশের স্থায়ী কল্যাণ হতে পারে না।

বাঙালীর আর্থিক দুর্গতি ও অবনতির এই বিস্তারিত বিশ্লেষণের মধ্যে সোমপ্রকাশের বৈজ্ঞানিক সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি সুপরিস্ফুট। বর্তমান কালেও বাঙালীর অর্থনীতিক জীবনের অনেক বিপর্যয় ও ব্যর্থতার মধ্যে সোমপ্রকাশ কথিত অধিকাংশ সামাজিক কারণ সত্য বলে মনে হয়।

সোমপ্রকাশের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি

সোমপ্রকাশের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি সাধারণভাবে উদার ও প্রগতিশীল বললে অত্যুক্তি হয় না। স্ত্রী-স্বাধীনতা, বিধবা-বিবাহ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সমস্যা, গ্রাম্যসমাজ ও নাগরিক সমাজের পরিবর্তনের ধারা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা সোমপ্রকাশ করেছেন। প্রত্যেকটি বিষয়ে যে সোমপ্রকাশ প্রগতিশীল বা উন্নতিশীল দলের মতামত অন্ধের মতো সমর্থন করেছেন তা নয়। কিন্তু তা না করলেও কোথাও অন্ধের মতো প্রাচীনপন্থীদের গোঁড়া মনোভাবও সোমপ্রকাশ সমর্থন করেননি। বিচারশীল উন্মুক্ত মন নিয়ে সোমপ্রকাশ প্রত্যেকটি সামাজিক সমস্যা বিশ্লেষণ করেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে সমস্যা বিশ্লেষণের মধ্যে সোমপ্রকাশ আশ্চর্য সমাজবিজ্ঞানসম্মত বিচারভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। হিন্দুসমাজের গোঁড়ামিকে সোমপ্রকাশ যেমন সমর্থন করেননি, তেমনি প্রগতি বা উন্নতির নামে স্বেচ্ছাচারিতাকেও অনুমোদন করেননি।

গ্রাম ও নগর

গ্রাম্যসমাজের পরিবর্তনের ধারা লক্ষ্য করে সোমপ্রকাশ লিখেছেন (১৮৬৭-৬৮ সালে) যে দশ বছর আগেও যে কোন পল্লীগ্রামে প্রবেশ করলে মনে হত বাঙালীরা যেন কেবল আমোদ-আহ্লাদ করে আলস্যে দিন যাপন করার জন্য সৃষ্টি হয়েছেন। গ্রামের বালক থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলেই ক্রীড়াসক্ত। বালকদের লেখাপড়ার নামগন্ধ নেই, যুবকদের বিষয়চিন্তা নেই, বৃদ্ধদের কোন কাজকর্ম নেই, কেবল দলাদলি, লোকের নিন্দা, বৃথা গল্প ও খেলা নিয়ে সকলে মত্ত হয়ে আছেন। "এখন সেই সেই গ্রামে প্রবেশ করিলে গ্রামের আর সেভাব দেখিতে পাওয়া যায় না। বালকেরা লেখাপড়ায় অভিনির্বিষ্ট হইয়াছে; যুবক ও প্রৌঢ়েরা বিষয়কর্মে ব্যস্ত হইয়া বেড়াইতেছে; বৃদ্ধদিগেরও দেখিয়া শুনিয়া পুর্ব্বভাবের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে" (পৃষ্ঠা ২১২)। আলস্যের জন্য আগে লোকের আর্থিক স্বচ্ছলতা আদৌ ছিল না, কারণ কর্মবিমুখ লোক অর্থের দিক থেকে কখনও লাভবান হতে পারেন না। এখন গ্রামের আর সে অবস্থা নেই। গ্রামের আর্থিক অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। "এখন কি কৃষক, কি শ্রমজীবী মজুর কেহই প্রায় অন্নের নিমিত্ত হাহাকার করেন না। গ্রামের ...যে দুই চারিজন জাত্যাভিমানাদি নিবন্ধন শ্রমবিমুখ হইয়া আলস্যে কালাতিপাত করে, তাহাদিগেরই যে কিছু কষ্ট আছে এইমাত্র। সাধারণ্যে বলিতে গেলে এই কথা বলিতে হয়, পল্লীগ্রামগুলি পূর্বাপেক্ষা বহুগুণে সৌভাগ্যসম্পন্ন হইয়াছে।" এখানে বাংলার গ্রাম্যসমাজের সাধারণ পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে। সেকালের গ্রামের অর্থনীতিক ব্যবস্থার ভাঙন ও অবনতি যে গ্রাম্যসমাজের পরিবর্তনের মূল কারণ, সেকথাও ইঙ্গিত করা হয়েছে। পরিবর্তনের কারণ প্রসঙ্গে সোমপ্রকাশ

বলেছেন: "বিদ্যাদান কার্য্যের প্রাচুর্য্য, বাণিজ্যের উন্নতি ও রেলওয়ের সৃষ্টি এই তিনটিই পল্লীগ্রামের অবস্থা পরিবর্তের প্রধান কারণ।"

গ্রামের উপর নগরের প্রভাব

সোমপ্রকাশ লিখেছেন, "এখনকার সভ্যসমাজে দুইটি নূতন পদার্থ জন্মগ্রহণ করিয়াছে যাহার নিকটে বাস করিলে ভদ্রস্থতা নাই এবং যতদূরে বাস করা যায় ততই শান্তিলাভ করা যায়" (পৃষ্ঠা ২৯৭)। এই দুটি পদার্থের মধ্যে প্রথমটি হল 'আদালত', দ্বিতীয়টি হল 'কলকাতা শহর'। ইংরেজের 'আদালত' গ্রাম্যসমাজে প্রবেশ করাতে নানারকমের নতুন উপদ্রব বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্বে বিবাদ-বিসম্বাদ ঘটলে দেশের দশজনকে ডেকে লোকে মীমাংসা করে নিত। এখন আদালত হওয়াতে সামান্য আধ হাত জমির মালিকানা নিয়ে লোকে চোদ্দবার আদালতে ছুটোছুটি করতে আরম্ভ করেছে। আদালতের কৃপায় প্রত্যেক গ্রামে নতুন একশ্রেণীর লোক দেখা দিয়েছে। তাদের কাজ হল লোকের বিবাদে উস্কানি দেওয়া এবং সেই সুযোগে নিজেরা কিছু অর্থ রোজগার করা। তীর্থের কাকের মতো এরা আদালতের পাশে ঘুরে বেড়ায় এবং গ্রাম্য লোক দেখলে মামলার পরামর্শ দেয়। মিথ্যা সাক্ষী দিতে, জাল মোকদ্দমা প্রস্তুত করতে, উকিল-মোক্তারের ব্যবস্থা করতে এই শ্রেণীর লোক অত্যন্ত পটু। গ্রাম্য জীবনে সর্বপ্রকারের অশান্তির অগ্রদূত এরা। নিজেদের হীন স্বার্থসিদ্ধির জন্য গ্রামে গ্রামে এরা অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে রাখতে চায়। গ্রামের লোকের পরস্পরের মধ্যে একদা যে প্রীতির সম্পর্ক ছিল, এখন আদালতের এই অর্থলোভী দালালদের জন্য তা প্রায় নির্মূল হয়ে যেতে বসেছে।

ইংরেজ আমলে কলকাতা শহরের বিকাশ ও উন্নতি যত দ্রুত হয়েছে, তত দ্রুত কলকাতার কাছাকাছি গ্রামের অবনতি হয়েছে। এখন অর্থ থাকলেও গ্রামে ভাল খাদ্য পাওয়া যায় না। ক্ষেতে বা পুকুরে যা কিছু খাদ্য উৎপন্ন হয়, তার অধিকাংশই ভোর হতে না হতে শহরের বাজারে চলে যায়। উদ্বৃত্ত যে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য গ্রামের জন্য থাকে তা সুখাদ্য নয় এবং তার মূল্যও অনেক বেশি। এইভাবে কলকাতার মতো মহানগর পাশাপাশি গ্রামগুলিকে শোষণ করে নিঃস্ব করে ফেলছে।

শহরের কাছের গ্রামগুলিতে নানরকমের সামাজিক বিপ্লব চুপিসাড়ে ঘটে যাচ্ছে। গ্রাম্যসমাজের প্রাচীন শৃঙ্খলা ভেঙ্গে যাচ্ছে। পূর্বে গ্রামের মধ্যে দু' চারজন ধনী ও ক্ষমতাশালী লোক থাকতেন, যাঁদের গ্রামের অন্যান্য লোক সম্ভ্রম করত এবং শাসন মেনে চলত। গ্রামের ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকেরা সেকালে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করতেন বলে সকলে তাঁদের কথা মেনে চলত। এখন গ্রামের লোক সকলেই স্বাধীন, কেউ কারও অধীন নয়। জীবিকা অর্জনের স্বাধীনতা আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। "এই কারণে সমাজের অনেক লোক রীতিনীতি সম্বন্ধে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছে। ধর্ম্মশাস্ত্রের

যে শাসন ছিল তাহাও ইংরাজী শিক্ষার গুণে ও সহরের বাতাসে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, এখন শাস্ত্র এবং সমাজবিরুদ্ধ পাপ সকল সমাজমধ্যে অবারিত হইতেছে। নিবারণের উপযুক্ত শাসনশক্তি কাহারও নাই। সহরে যাঁহারা থাকেন সহরের দোষ ভাগের সঙ্গে সঙ্গে সহরের গুণ ভাগের অংশী হইয়া থাকেন। সেখানকার শিক্ষা ও আত্মোন্নতির উৎকৃষ্ট উপায় সকলও তাঁহারা লাভ করেন, কিন্তু আমাদিগের ন্যায় সহরের নিকটে যাঁহাদের বাস তাঁহারা সহরের গুণ ভাগ না পাইয়া দোষ ভাগই অধিক ভোগ করিয়া থাকেন" (২৯৮ পৃষ্ঠা)।

আধুনিক শহর ও শহরতলির সামাজিক পরিবেশের পার্থক্যের যে ইঙ্গিত এখানে করা হয়েছে তা যে অনেকাংশে সত্য একথা একালের সমাজবিজ্ঞানীরাও স্বীকার করেন। শহরে সমাজে যেমন কতকগুলি দোষ আছে, তেমনি কতকগুলি গুণও আছে। শহরতলির সমাজে শহরের গুণগুলির বদলে দোষগুলিই ভেসে আসে বেশি। কতকটা শহরের আবর্জনার নালানর্দমার মতো শহরতলির সমাজ গজিয়ে ওঠে।

গ্রামের উপর শহরের প্রভাব সম্বন্ধে সোমপ্রকাশ আরও যে কয়েকটি কথা বলেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। শহর থেকে দূরে যে সমস্ত গ্রাম অবস্থিত সেখানকার শিক্ষিত লোকেরা, যাঁরা শহরে থাকেন ও কাজকর্ম করেন, ছ' মাসে ন' মাসে গ্রামে যান বলে গ্রামের প্রতি তাঁদের দৃষ্টি থাকে, দরদ থাকে। গ্রামের উন্নতির কথা তাঁরা চিন্তা করেন এবং তার জন্য চেষ্টাও করেন। কিন্তু শহরের কাছাকাছি গ্রামের লোক যাঁরা শহরে বাস করেন, শহরটাই তাঁদের প্রধান বাসস্থান হয়ে ওঠে এবং গ্রাম হয়ে ওঠে সপ্তাহান্তে বিরাম ও আরামের স্থান। কাজেই গ্রামের উন্নতির জন্য তাঁদের ইচ্ছা বা চেষ্টা কিছুই থাকে না। এই কারণে শহরের কাছাকাছি গ্রামের যত দ্রুত অবনতি হয়, দূরের গ্রামের তা হয় না।

শহরের ভোগবিলাস জীবনযাত্রার পরিবর্তনশীল ফ্যাসান, আচার-বিচার ইত্যাদি কাছাকাছি গ্রামের উপর যতদূর প্রভাব বিস্তার করতে পারে, দূরবর্তী গ্রামের উপর তা পারে না। নিত্যনতুন বিলাসিত পোষাক-পরিচ্ছদ ও আহার-বিহারের রুচি কাছাকাছি গ্রামের লোকজনদের প্রলুব্ধ করে এবং সেই শহুরে জীবন অনুকরণের চেষ্টায় গ্রামের লোক নিজেদের আর্থিক সর্বনাশ ডেকে আনে। এই সর্বনাশের হাত থেকে শহরের কাছাকাছি গ্রামের মুক্তি আছে বলে মনে হয় না।

বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও বিধবাবিবাহ

সোমপ্রকাশ বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের ঘোরতর বিরোধী। বিধবাবিবাহের অন্ধ সমর্থক না হলেও উদারতা ও যুক্তিবাদের দিক দিয়ে তার সামাজিক ফলাফল বিচারের পক্ষপাতী। বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের বিরুদ্ধে সোমপ্রকাশ তীব্র ভাষায় বহু সমালোচনা করেছেন। সোমপ্রকাশ লিখেছেন :

"বাল্যবিবাহের উন্মূল একটি মহোপকারক বিষয়। সে পরিবর্ত্তে অল্প লোকের

অভিরুচি দেখিতে পাওয়া যায়। সোমপ্রকাশের দুইজন পত্রপ্রেরক দুইটি বালকের বিবাহ হইতে দেখিয়া আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন। "বাল্যবিবাহ বহুদোষের আকর। আমরা যে এত হীনবীর্য্য ও হীনবল, দেশের জলবায়ু প্রভৃতির দোষই তাহার একমাত্র কারণ নয়, বাল্যবিবাহ বহুল পরিমাণে উহার সহায়তা করিয়া থাকে। কাহার বৃক্ষ রোপণে ইচ্ছা জন্মিলে সে কখনও চারাগাছের অপুষ্ট বীজ লইয়া সে ইচ্ছা চরিতার্থ করে না; কিন্তু বঙ্গদেশীয়েরা অনায়াসে অপুষ্ট বীজে সন্তান উৎপন্ন করিতেছেন। সে সন্তানে বলিষ্ঠ দীর্ঘজীবী হইবার সম্ভাবনা কি? এদেশের লোকে অধিক বয়স পর্যন্ত অধ্যবসায় সহকারে যে কোন কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন না, বাল্যবিবাহ তাহার অন্যতর প্রধান কারণ।" (পৃষ্ঠা ২১৩)

বাঙালী হিন্দুসমাজে 'কোণের বউ' যাঁদের বলা হয় তাঁরা সকলেই বালিকা-বধূ। এই কোণের বউয়ের বিবরণ দিয়ে সোমপ্রকাশে এক পত্রলেখক লিখেছেন:

"কোণের বউ হওয়া যে কি ভয়ানক দায়, তাহা যাঁহারা কোণের বউ তাঁহারাই জানেন, যাঁহারা সরলচিত্তে তাহা অনুভব করিয়া থাকেন তাঁহারাই বুঝিতে পারেন। কোণের বউ প্রতিপদেই অপরাধী, প্রতি কার্য্যেই দোষী। গমনে, ভোজনে, রন্ধনে, বাক্য কথনে, অঙ্গ চালনে সকলেতেই কোণের বউ দোষী।... শাশুড়ী মুক্তকণ্ঠ, ননদ খড়্গহস্ত, কোণের বউয়ের কাঁদিবারও যো নাই। কাঁদিলে আরও ভৎর্সনা, আরও গঞ্জনা।" (পৃষ্ঠা ২০৮-৮৯)

সোমপ্রকাশ-সম্পাদক পত্রলেখক সতীপ্রসাদ সেন মহাশয়ের বক্তব্য বিষয়ের আলোচনা করে বলেছেন:

"কালচক্র কুম্ভকার চক্রের ন্যায় খরতর ভ্রমণ করিতেছে, সেই ভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে সকল বিষয়েরই পরিবর্ত্তন হইয়া যাইতেছে। আমাদের দেশীয় লোকেরা সেই পরিবর্ত্তস্রোতে গা ঢালিয়া দেন না, উজান যাইবার চেষ্টা পান। সুতরাং বিপরীত স্রোতোগামীর যে দারুণ কষ্ট, তাহা ভোগ করিয়া থাকে। বাল্যবিবাহ এখনকার সময়ের উপযোগী নয়। বাল্যবিবাহের পরিবর্ত্তন এখন একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে কিন্তু আমাদের দেশের লোকেরা এমনি অনাগ্রব (একগুঁয়ে), কালেব গতির এমনি বিরোধী, প্রাচীন প্রথার এমনি ভক্ত, যে বাল্য-বিবাহ নিবন্ধন দেশের বিষম দুর্দশা ঘটিতেছে, দেশ বলবীর্য্যহীন হইতেছে, অপ্রতিবিধেয় রোগ শোকের অবসর হইতেছে, অকাল মৃত্যুর ক্রীড়ার স্থান হইতেছে, তাঁহারা ইহা দেখিয়াও দেখেন না। তথাপি তাঁহাদের চৈতন্য হয় না, তথাপি তাঁহাদের বাল্যবিবাহ পরিবর্ত্তন চেষ্টা জন্মে না। সতীপ্রসাদবাবু যে বিষয়ের প্রসঙ্গ করিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন বাল্যবিবাহের পরিবর্ত্তন ও সুশিক্ষার বহুল প্রচার ব্যতিরেকে কি তাহার সংশোধনের সম্ভাবনা আছে?" (পৃষ্ঠা ২৯২)

বোম্বাইয়ের পার্সী সমাজসংস্কারক বাইরামজী মালাবারী ১৮৮৫ সনের দিকে যখন বাল্যবিবাহ ও বালবৈধব্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করেন তখন উত্তর থেকে দক্ষিণ ভারত

পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেক প্রদেশে তার তরঙ্গধ্বনি শোনা যায়। বাংলাদেশেও স্বভাবতঃই তার প্রতিক্রিয়া আরও অনেক বেশি পরিমাণে হয়। এই বিষয়ে সোমপ্রকাশ লেখেন: "মালাবারি স্বয়ং হিন্দু বা মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত নহেন। তিনি পারসী, পারসীদিগের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত নাই। সুতরাং মালাবারির স্বয়ং বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা নাই। এইজন্য একদিকে তাঁহার বর্ত্তমান চেষ্টা অতিশয় প্রশংসার্হ সন্দেহ নাই। অপরদিকে তিনি হিন্দুদিগের মতামত ভাবস্বভাব বেশী জানেন না বলিয়াই, তাঁহার প্রস্তাবিত উপায় সম্বন্ধে এত মতভেদ হইতেছে। আমাদের আর একটি দুঃখ হয় যে হিন্দুদিগের দুর্গতি দেখিয়া ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত, ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী মালাবারি মহাশয় ব্যথিতপ্রাণ হইয়া তাহা দূর করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। সেই হিন্দুগণ আমরা আপনাদিগের সামাজিক মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি এত উদাসীন এ দুঃখ রাখিবার স্থান কোথায়? মালাবারির মত সুবিজ্ঞ এবং পদস্থ কোন হিন্দু সন্তান উৎসাহ সহকারে এ বিষয়ের সংস্কারসাধনে যত্নবান হইলে অতি সহজে যে এই ভীষণ কুপ্রথা সমাজ হইতে দূরীভূত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে আমাদিগের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।"

"কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ পর্য্যন্ত হিন্দুসমাজ মধ্যে বাল্যবিবাহ নিবারণের জন্য উপযুক্ত চেষ্টা করা হয় নাই। ব্রাহ্মগণ এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ চেষ্টা করিয়াছেন সত্য, পুস্তিকা প্রচার, বক্তৃতা ও অন্য অন্য উপায়ে আন্দোলন করিয়া তাঁহারা এই কুপ্রথার প্রতি হিন্দুসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা সমাজের লোক নন বলিয়া তাঁহাদের সমুদয় যত্ন ও চেষ্টা বিফল হইয়া গিয়াছে, সমাজ তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপও করেন নাই। তাঁহাদের যত্নে কেবল ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের মধ্যেই যাহা কিছু বাল্যবিবাহের নিবারণ করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু আমাদিগের স্থির ধারণা এত যে মালাবারি মহাশয় আজ যেরূপ যত্ন করিতেছেন, এবং কিছুকাল পূর্ব্বে বাঙ্গালার ব্রাহ্মসম্প্রদায় যতটুকু চেষ্টা করিয়াছেন, হিন্দুসমাজভুক্ত কোনও পদস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যদি ততটুকু যত্ন করিতেন এতদিনে এই কুপ্রথা বহুল পরিমাণে নিবারিত হইয়া যাইত।" (পৃষ্ঠা ৩২৫-২৬)

সোমপ্রকাশ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ প্রচলনের জন্য "বহু শ্রম চেষ্টা ও অর্থব্যয়' করার কথা উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন যে "বিধবাবিবাহ প্রচলিত করা যত কঠিন বাল্যবিবাহ নিবারণ করা তত কঠিন নহে। উপযুক্ত বয়সে বালিকার বিবাহ দিলে আজকাল কাহাকেও সমাজচ্যুত হইতে হয় না। সুতরাং বিদ্যাসাগরের মত পদস্থ এবং সুবিজ্ঞ কোন হিন্দুসন্তান যদি বাল্যবিবাহ নিবারণের জন্য চেষ্টা করিতেন, আজ সমাজ হইতে তাহা বহুল পরিমাণে দূরীকৃত হইত। তাহাতে চিরবৈধব্যের কষ্টও বহুল পরিমাণে হ্রাস হইত। বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিবার চেষ্টা বাল্যবিধবাদিগের কষ্ট নিবারণই প্রধান উদ্দেশ্য। বয়স্থা হইয়া যাঁহারা বিধবা হইয়াছেন তাঁহাদিগের পুনর্বিবাহ হইল বা না হইল সমাজ তদ্জন্য বিশেষ চিন্তিত হন না।"

উনিশ শতকের অষ্টম দশকে দেখা যায় যে বাংলাদেশে দশ বছর বয়সের কম

বালবিধবার সংখ্যা ছিল ৩৬,৩৯৪ এবং দশ থেকে চোদ্দ বছর বয়সের বালবিধবার সংখ্যা ছিল ৭০,৩০৬। পনের বছর বয়সের বালবিধবার সংখ্যা ছিল লক্ষাধিক। বৈধব্যের এই ভয়াবহ অবস্থার সঙ্গে বাল্যবিবাহের সম্পর্ক যে কত প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ তা পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়। দশ বছরের কম বয়সের প্রায় নয় লক্ষ বিবাহিতা বালিকা ছিল ১৮৮৪-৮৫ সনে। এর মধ্যে কত জন বালিকা যে বিধবা হবে তার ঠিক নেই। বিশেষ করে কৌলীন্যপ্রথা ও বহুবিবাহের ফলে বালিকাদের বৈধব্যের সম্ভাবনা বেশি থাকে।

বাঙালীসমাজে একদা বহুবিবাহ ভয়াবহ আকারে দেখা দিয়েছিল এবং কৌলীন্যপ্রথা ছিল তার অন্যতম কারণ। সোমপ্রকাশ এরকম বহুবিবাহের সমর্থক ছিলেন না। ১২৭৮ সালে "বহুবিবাহ হওয়া উচিত কি না?" প্রসঙ্গে (পৃষ্ঠা ২৪১-৪৩) সোমপ্রকাশ যে মতামত প্রকাশ করেছেন তাতে এই ধরনের সামাজিক প্রথায় গবর্নমেণ্টের হস্তক্ষেপের বিরোধিতা প্রকাশ পেলেও, বহুবিবাহের আনুকূল্য প্রকাশ পায়নি। আলোচনা প্রসঙ্গে সোমপ্রকাশ বলেছেন যে সমাজসংস্কারের কথা উঠলেই দেখা যায় সে সমাজ দুইদলে ভাগ হয়ে গেছে এবং এদেশে প্রাচীন ঋষিদের মতামতের শ্রাদ্ধ করা হচ্ছে। তাতে ফল যত না হোক, আড়ম্বরের সীমা থাকে না। উভয় পক্ষ শাস্ত্রবিচার আরম্ভ করেন, কিন্তু আসলে সেটা হয় ঋষিহত্যার অনুষ্ঠান। মনে হয় ঋষিরা যেন দুই দলেরই সমর্থনে নানাবিধ বচন রচনা করে গেছেন। কিন্তু কি করে যে তা সম্ভব সাধারণ বুদ্ধিতে তা বোঝা যায় না। একি মামলাবাজদের কালীঘাটের স্বস্ত্যয়ন? যে ন্যায়পক্ষে সেও স্বস্ত্যয়ন করছে, যে অন্যায়পক্ষে সেও স্বস্ত্যয়ন করছে। এই অবস্থায় মা কালী কার মনরক্ষা করবেন, সেইটাই সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। সমাজসংস্কারকরা দু'টি পরস্পরবিরোধীদলে বিভক্ত হয়ে যখন শাস্ত্রকারদের বচন উদ্ধৃত করে নিজপক্ষ সমর্থনে ব্যস্ত হন, তখন সমাজের সাধারণ লোকের অবস্থা হয় অনেকটা মা কালীর মতো, কোন্ পক্ষকে তাঁরা সমর্থন করবেন বুঝতে পারেন না। অথচ বহুবিবাহের মতো সামাজিক কুপ্রথা বন্ধ করার জন্য কথায় কথায় শাস্ত্রকারদের স্মরণ করা উচিত নয়, অথবা গবর্নমেণ্টের শরণাপন্ন হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। "যদি গবর্নমেণ্টের সাহায্য লইয়া আমাদিগের সমাজসংস্কার আবশ্যক হয়, অসংখ্যবার তাঁহাদিগের শরণ লইতে হইবে। প্রতি পদক্ষেপে দাদাকে ডাকা সুখের নয়। তাহা হইলে গবর্নমেণ্ট দ্বারা সমুদায় আচার ও ধর্ম্মেরও সংস্কার করা আবশ্যক হইয়া উঠে। অত উতলা হইলে চলে না।" (পৃষ্ঠা ২৪২)

সোমপ্রকাশ মন্তব্য করেছেন যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বহুবিবাহ' সম্বন্ধে লিখিত প্রস্তাব থেকে জানা যায় যে কলকাতা ও তার কাছাকাছি অঞ্চলে, যেখানে আধুনিক ইংরেজিশিক্ষার প্রসার হয়েছে, সেখানে সমাজসংস্কারের উৎসাহ এদেশের শিক্ষিত লোকের মনে বিলক্ষণ সঞ্চারিত হয়েছে। কাজেই বুঝতে পারা যায় যে আধুনিক শিক্ষার প্রসার হলে সমাজসংস্কারের জন্য আমাদের বিদেশী সরকারের মুখাপেক্ষী হবার প্রয়োজন হবে না। এছাড়া সোমপ্রকাশ আরও একটি অভিনব প্রস্তাব পেশ করেছেন। প্রস্তাবটি এই: যাঁরা

বিনা কারণে একাধিক বিবাহ করবেন, তাঁদের প্রত্যেক বিবাহে পাঁচশত টাকা করে ট্যাক্স দিতে হবে। এই প্রস্তাব করে মন্তব্য করা হয়েছে যে অর্থদণ্ড সবচেয়ে গুরুদণ্ড এবং এই দণ্ডে দণ্ডিত হলে "নিঃস্ব অপদার্থ কুলীন" কুমারদের "বিবাহ-ব্যবসায়" বন্ধ হয়ে যাবে। সামাজিক কুপ্রথা দমনের জন্য সোমপ্রকাশের এই অর্থদণ্ডের প্রস্তাব একেবারে অগ্রাহ্য করার মতো নয়। তৎকালের সমাজে এ প্রস্তাব যে অনেকটা কার্যকর হত তাতে সন্দেহ নেই। তার 'কারণ' অবশ্য সোমপ্রকাশ নিজেই ইঙ্গিত করেছেন। কুলীন কুমারেরা যাঁরা বিবাহকে ব্যবসা মনে করেন, তাঁদের সোমপ্রকাশ "নিঃস্ব অপদার্থ" বলেছেন। সোমপ্রকাশের উক্তি অতিরঞ্জিত নয়।

জাতীয় সংহতি ও স্বাজাত্যবোধ

সোমপ্রকাশের রাজনৈতিক চেতনা অত্যন্ত প্রখর ছিল। ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের কর্মনীতির কঠোর সমালোচনা পত্রিকার প্রায় প্রত্যেক সংখ্যাতে দেখা যায়। এরকম নির্ভীক সমালোচনা তখনকার কালে বাস্তবিক বিরল ছিল। আলোচনার ভঙ্গির মধ্যেও গাম্ভীর্য ও আত্মমর্যাদাবোধের কোন অভাব নেই। "ব্রিটিশ শাসনপ্রণালীর মহাদোষ" শীর্ষক একটি রচনা এই ভঙ্গির নিদর্শনরূপে উল্লেখ করা যায়:

"ইংরাজদিগের রাজ্যের শাসনপ্রণালী দর্শন করিলেই হঠাৎ বোধ হইবে ইহাতে স্বেচ্ছাচারিতার নামগন্ধ নাই। কেহ যে ইচ্ছামত কোন অন্যায় বা অত্যাচারের কার্য্য করিবে সে সম্ভাবনা নাই। তাহার কারণ ব্রিটিশ শাসনপ্রণালীর গ্রন্থন ও স্বরূপ দর্শন করিলে কোনরূপে এরূপ বোধ হয় না যে ইহাতে স্বেচ্ছাচারিতার নামগন্ধ আছে—দেখ, প্রথমে রাজ্ঞী তারপর মন্ত্রীসভা, তাহার পর লর্ডদিগের সভা, তাহার পর সাধারণের সভা। উপর হইতে দেখিলে সৌরজগতের ন্যায় পরস্পরকে এমনি শৃঙ্খলাবদ্ধ বলিয়া বোধ হয় যেন কেহ কাহাকে অতিক্রম করিয়া ‍ ‍ান কাজ করেন না। ভারতবর্ষ প্রভৃতি অধীন প্রদেশগুলি এই অদ্ভুত শাসনপ্রণালীর পরাধীন। সে সে স্থানেও যেন কিছুমাত্র স্বেচ্ছাচারিতা নাই অথবা হইবার যো নাই। অথচ ফল ইহার বৈপরীত্যের পরিচায়ক। গত মন্ত্রীসভা ও বর্ত্তমান মন্ত্রীসভা ও অধীনস্থ প্রদেশ সকলের গত শাসনকর্ত্তা ও বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তাদিগের কার্য্য ও ব্যবহার দেখিয়া বোধ হয় ব্রিটিশ শাসনপ্রণালী মধ্যে স্বেচ্ছাচারিতা মূর্ত্তিমতি হইয়া যেন বিরাজ করিতেছে। কার্য্য দেখিলে বোধ হয় মুসলমান রাজাদিগের এরূপ স্বেচ্ছাচারিতা ছিল কিনা সন্দেহ।" (পৃষ্ঠা ৩৯৬)

সোমপ্রকাশের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল সাম্প্রদায়িক উদারতা এবং জাতীয় সংহতি-চেতনা। বাংলাদেশে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যখন আধুনিক জাতীয়তাবোধের উন্মেষ হয়, তখন ঐতিহাসিক কারণবশতঃই তার মধ্যে হিন্দুয়ানিভাব প্রকট হয়ে ওঠে। আধুনিক ইংরেজীশিক্ষিতদের মধ্যে বাঙালী হিন্দুরাই ছিলেন প্রধান

গোষ্ঠী এবং তাঁরাই ছিলেন এদেশে জাতীয়তাবোধের উদ্বোধক। স্বভাবতঃই তাই আমাদের দেশে জাতীয়তাবোধের উদ্‌যোগপর্বে হিন্দুত্বের কিছুটা উগ্রতা লক্ষ্য করা যায়। এই সময় প্রধানত শিক্ষিত হিন্দুদের পরিচালিত বিভিন্ন পত্রিকায় জাতীয়তা প্রায় হিন্দু-জাতীয়তার সুরে ধ্বনিত হতে থাকে। সোমপ্রকাশ এই সুরের সঙ্গে সর্বত্র সুর মেলাতে চেষ্টা করেননি, বরং অনেক ক্ষেত্রে ভিন্ন সুরে জাতীয়তার মন্ত্র আবৃত্তি করেছেন। সেই সুর জাতীয় সংহতি ও ঐক্যের সুর, যে সুরের সাধনা আজকের স্বাধীন ভারতবর্ষেরও বোধ করি সবচেয়ে বড় সাধনা। হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক কলহ-দাঙ্গায় ব্যথিত হয়ে সোমপ্রকাশ লিখেছেন :

"........মধ্যে মধ্যে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে দাক্ষিণাত্যে পাঞ্জাবে হিন্দু মুসলমান জাতির পরস্পর দারুণ বিবাদ ঘটিতেছে। এই উভয় জাতিই বহুকাল অবধি ভারতবর্ষে বাস করিতেছে, তাহারা বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বটে, কিন্তু একরাজার প্রজা ও একদেশনিবাসী। অতএব তাহাদের এতাদৃশ বৈরভাবের উদয় হওয়া যার পর নাই আক্ষেপের বিষয়। দিন দিন কোথায় সকলে সভ্য হইবেন, একদেশবাসী, একদেশবাসী বলিয়া পরস্পরের প্রতি স্নেহ জন্মিবে, ধর্ম্মান্ধতা ত্যাগ করিয়া সকলেই পবিত্রভাবে পরস্পরের দুঃখ মোচন করিবেন, পরস্পরের সাহায্য করিবেন, একপ্রাণ এক আত্মা হইয়া স্বদেশের উন্নতি করিবেন—না ক্রমশই বৈরভাব বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এই এক ভারতবর্ষে ধর্ম্মপথের সংখ্যা করিয়া শেষ করা যায় না। কেবল হিন্দু ও মুসলমান বলিলেই ভারতবর্ষের সকল ধর্ম্মাবলম্বীর নাম করা হইল না। হিন্দুগণও অসংখ্য সম্প্রদায়ে বিভক্ত। তন্মধ্যে একপ্রকার সম্প্রদায়ের মত অন্য সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ বিপরীত। শাক্তের সঙ্গে বৈষ্ণবের মতের সামঞ্জস্য হয় না, বৌদ্ধের সঙ্গে সাধারণ হিন্দুসমাজের মতের মিল নাই। ব্রহ্মজ্ঞানীরা আবার আর এক সম্প্রদায়ের লোক। ইহারা সকলেই যদি বিবাদ বিসম্বাদে প্রবৃত্ত হন, তবে ভারত উৎসন্ন যাইতে ত একদিনও লাগে না। ধর্ম্ম কর্ম্মে সকলে আপন আপন বিশ্বাস মত কাজ করুন, কিন্তু সামাজিক কাজে একতা চাই। নতুবা নিজ নিজ উন্নতিও হইবে না। স্বদেশেরও উন্নতি হইবে না।" (পৃষ্ঠা ৪০৩-৪)

এটি ১৮৮১ সালের রচনা। তখনও জাতীয় কংগ্রেসের উৎপত্তি হয়নি। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ইংরেজদের দুরভিসন্ধি ও বিভেদনীতির ফলে মধ্যে মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সামাজিক পরিবেশ বিষিয়ে তুলত। মুলতানে এই ধরনের একটি দাঙ্গা প্রসঙ্গে সোমপ্রকাশ এই মন্তব্য করেছিলেন। প্রসঙ্গত বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে সোমপ্রকাশ লেখেন : "বঙ্গদেশে মুসলমানে ও হিন্দুতে যথেষ্ট প্রণয় আছে। তাঁহাদের ধর্মমত এবং বিশ্বাস যেরূপ হউক, কিন্তু সকলেই একবাক্য হইয়া সৎকর্মের অনুষ্ঠান করেন। এক ভারতবাসী বলিয়া পরস্পর পরস্পরের সহানুভূতি করিতে হয়, তাহা সকলেই শিক্ষা করিতেছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে এখনও সে

বিশুদ্ধভাব প্রবর্তিত হয় নাই। মুসলমানেরা রো সাহেবের অনুমতি পাইয়া আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। হাটে বাজারে হিন্দুদের সম্মুখে চীৎকার করিয়া গোমাংস বিক্রয় করিতে লাগিল। তাহাতে হিন্দুদের সঙ্গে ঘোর দাঙ্গা উপস্থিত হয়। হিন্দুগণ মুসলমানদের গৃহাদি ও মসজিদ নষ্ট ও দগ্ধ করিয়া দেয় এবং মুসলমানেরাও দোকান দেবালয় এবং গৃহাদি দগ্ধ করে। উভয়পক্ষের অনেক লোক আহতও হইয়াছিলেন।····· দেশের অনিষ্টে আমাদের অনিষ্ট, তাই আমাদের প্রার্থনা হিন্দু ও মুসলমানে ভবিষ্যতে আর যেন বিবাদ না ঘটে·····।"

সোমপ্রকাশ আগাগোড়া সাম্প্রদায়িকতা বর্ণবিদ্বেষ ইত্যাদি সামাজিক বিকৃতির বিরোধিতা করেছেন। মুসলমানদের নানাবিধ সামাজিক কুসংস্কার, আধুনিক ইংরেজি-শিক্ষার প্রতি ঔদাসীন্য এবং এরকম আরও সমস্যা সম্পর্কে সোমপ্রকাশ আলোচনা করেছেন, বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন, কিন্তু কখনও কোনও আলোচনার মধ্যে মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রকাশ পায়নি। এইটাই সোমপ্রকাশের বড় বৈশিষ্ট্য।

বাঙালীচরিত্রের সমালোচনা

'সোমপ্রকাশ' বহু রচনার মধ্যে মধ্যবিত্ত বাঙালীচরিত্রের সমালোচনা করেছেন। এগুলিকে 'আত্মসমালোচনা' বলা যায়। বাঙালীর চারিত্রিক গুণের কথা সর্বজনবিদিত। কিন্তু চারিত্রিক দোষ সম্বন্ধে বাঙালীরা কতকটা যেন চোখ বুজে থাকাই পছন্দ করেন। বাঙালীর শোচনীয় অবস্থার কথা পর্যালোচনা করে ১২৭৯ সালে 'সোমপ্রকাশ' লিখেছেন :

"আমরা বাঙ্গলা দেশের এই যে শোচনীয় অবস্থার উল্লেখ করিলাম, কয়েকটি কারণে উহা ঘটিয়াছে। প্রথম, অর্দ্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিতের ভাগ অধিক। উহারা ইউরোপীয়দিগের গুণ গ্রহণের সমর্থ হয় নাই, দোষগুলি জয় করিয়া লইয়াছে। দ্বিতীয়, পূর্ব্বে শাস্ত্রে দৃঢ়তর শ্রদ্ধা ছিল, শাস্ত্রকৃত নিয়ম লঙ্ঘন করিলে পাপ জন্মিবে এই আশঙ্কা ছিল, এখন আর নাই। এখন সুরাপানাদি করিলে ধর্ম্মে [illegible]তিত অশ্রদ্ধেয় ও অপাঙক্তেয় হইয়া থাকিতে হয় না। তৃতীয়, সামান্য চাকরীর বাহুল্য ও বাণিজ্য প্রভাবে অধিকাংশ লোকের সচ্ছল হইয়াছে। অর্থসঙ্গতি না থাকিলে ব্যসন বাসনা চরিতার্থ করিবার যে ব্যাঘাত জন্মে এখন সে ব্যাঘাত নাই। চতুর্থ, বাঙ্গালিদিগের বাণিজ্যে প্রবৃত্তি নাই, সংগ্রামে গতি নাই, আয়াসকর কার্য্যে মতি নাই, ভোজ্য ও শয়ন অতি কোমল, সুতরাং বিলাসেই গাঢ়তর অনুরাগ জন্মিয়াছে। এটি বাস্তবিক শোচনীয় অবস্থা সন্দেহ নাই। বঙ্গদেশের এই স্ত্রৈণভাব দূরীভূত হইয়া যে কবে পুরুষভাব হইবে আমরা ভাবিয়া আকুল হইতেছি।"

আমরাও আজ প্রায় একশত বছর পরে ভেবে আকুল হই, বাঙালীর স্ত্রৈণভাব কবে দূর হয়ে পুরুষভাবের উদয় হবে। বাঙালীর বলবীর্য, বাঙালীর পৌরুষ যে নেই তা নয়, কিন্তু বাঙালীত্বের অন্যতম বিশেষত্ব যা অতীতের খণ্ড খণ্ড কাহিনীর ভিতর দিয়ে ফুটে ওঠে, তা হল এই 'স্ত্রৈণভাব'। তা ছাড়া সোমপ্রকাশ যে বলেছেন, বাঙালীর বাণিজ্যে

প্রবৃত্তি নেই, সংগ্রামে গতি নেই, আয়াসকর কর্মে মতি নেই, ভোজ্য ও শয়ন অতি কোমল, এ কথার মধ্যেও অতিরঞ্জন বা মিথ্যা নেই। আজও এ কথা সত্য। বাঙালীত্বের আর একটি বিশেষত্ব সম্বন্ধে 'সোমপ্রকাশ' লিখেছেন :

"মোগল শাসনাধীনে থাকিয়া বাঙ্গালী এক্ষণেও বিলাসী, আবার ইংরাজ অনুকরণে বঙ্গবাসী বচনবাজি ও গলাবাজিতে সুনিপুণ ও কার্য্যকলাপে বাহ্যাড়ম্বর পূর্ণ।"

বাঙালীচরিত্রে (অবশ্যই মধ্যবিত্ত বাঙালী) মোগল আমলের দান বিলাসিতা, ব্রিটিশ আমলের দান বচনবাজি ও গলাবাজি, এবং তার সঙ্গে বাহ্য আড়ম্বরপূর্ণ কার্যকলাপ। তাই সোমপ্রকাশ দুঃখ করে বলেছেন : "মোগলদিগের ভোগবিলাস ও ইংরাজগণের বাহ্যাডম্বর বঙ্গসমাজের আভ্যন্তরীণ উন্নতি-পথের কণ্টকস্বরূপ।" এখন আর মোগল আমল নেই, ব্রিটিশ আমলও নেই, তবু বাঙালীত্বের মধ্যে ভোগবিলাস ও বাহ্যাড়ম্বরের প্রবণতা মনে হয় ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়েছে ও পাচ্ছে।

বাঙালীচরিত্রের আর একটি বিশেষত্ব ব্রিটিশ আমলে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এই চরিত্রের বাঙালীদের 'সোমপ্রকাশ' বলেছেন "সামাজিক লোফার" (social loafer)। নামকরণটি ভালই হয়েছে। 'সামাজিক লোফার' আর সেকালের নতুন 'নাগরিক লোফার' এক রকমের জীব ছিল না। নাগরিক লোফার নৈষ্কর্মের প্রতিমূর্তি, গুণ্ডামি দাঙ্গাবাজি এবং বর্তমানে রকবাজি, তরুণী-নিগ্রহ (eve-teasing), ছিন্তাই-ধোল্তাই ইত্যাদি এদের প্রধান কর্ম। সামাজিক লোফার ঠিক তা নয়। সে আরও উচ্চমার্গের জীব। তার গুণাগুণ বর্ণনা করে 'সোমপ্রকাশ' লিখেছেন :

"এই মহাপুরুষদিগের কিঞ্চিন্মাত্র লেখাপড়া জ্ঞান আছে, কিন্তু বাহিরে এরূপ ভাব প্রকাশ করা হয় যে, এমন প্রগাঢ় পণ্ডিত আর নাই। কোন পণ্ডিতের কথা হইতেছে, সামাজিক লোফার অমনি বলিয়া উঠেন 'সে কি জানে ? আমি অমুক সময়ে তাহার সহিত কথা কহিয়াছিলাম, সামান্য ঐতিহাসিক ঘটনাগুলিও সে বলিতে পারে না।' কিন্তু সামাজিক লোফারের বাটী অনুসন্ধান করিলে একখানি পুস্তক পাওয়া যায় না।... সামাজিক লোফার পরিশ্রম করে না। মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র কাহারও নিমিত্ত ইহারা চিন্তা করে না। আপনার তৃপ্তি হইলেই হইল। ইহাদিগের এমন চমৎকার ক্ষমতা এই, তোমার টাকা লইবে, কিন্তু দেখাইবে যেন তোমার টাকা লইয়া তোমারই মহা উপকার করিল। বলিতে থাকে, 'তোমাকে ভালবাসি বলিয়াই সাহায্য লইতেছি। অমুক আমার পিতৃব্য, আমি চাহিলে তিনি পাঁচ সহস্র টাকা দিতে পারেন, কিন্তু তাহা আমি লই না, কেন তাঁহার নিকটে লঘুতা স্বীকার করিব।' লোফার এরূপ ভাব দেখায় যেন দেশে এমন বড় লোক নাই যাঁহার সঙ্গে তাহার বন্ধুত্ব না আছে। অল্পবুদ্ধি ও আত্মাভিমানী লোক ইহাতে মোহিত হইয়া ভাবে 'দ্বারে হস্তি বাঁধিয়াছি।' নাগরিক লোফারের উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ ও আহারের দিকে তত দৃষ্টি নাই। কিন্তু সামাজিক লোফার উত্তম বস্ত্র না পাইলে পরিধান

করিতে পারে না। সাদা ভাত ইহাদের মতে শূকরের আহার। অম্বুরি তামাক যে না খায় সে ছোট লোক। যাঁহারা লোফারের কুহকে পড়েন, তাঁহারা পাছে লোফার মহাশয় ইতর ভাবেন বলিয়া নিজে উত্তম বস্ত্র পরিধান ও উত্তম আহার করেন, সেই সঙ্গে প্রিয় সহচরকেও সেই প্রকার, কখন কখন তদপেক্ষা উৎকৃষ্টও দিতে হয়। লোফার এক-একজনকে পাইয়া বসিলে তাহার ভিটায় ঘুঘু না চরাইয়া ছাড়ে না।"

সামাজিক লোফারের এই বর্ণনা পড়ে মনে হয় ১২৭৯ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে নয়, ১৩৭৩ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসেও বাংলাদেশের শহর নগর গ্রামে সর্বত্র তাদের ঘুরে বেড়াতে দেখছি। তবে তাদের সংখ্যা এখন বিপুল আকার ধারণ করেছে। যান্ত্রিক জীবনযাত্রার উন্নতির ফলে আগেকার গ্রাম নগরের পরিবেশের ব্যবধান যত কমে যাচ্ছে, তত যেন লোফারবৃত্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। সাম্প্রতিক কালের সামাজিক লোফারদের এক বিচিত্র ধরনের 'status seekers' বলা যায়। দৈবাৎ কোন কাজকর্মে, অসাধু ব্যবসাবাণিজ্যে বা উচ্চ বেতনের চাকরিতে রাতারাতি যখন কোন অজ্ঞাতকুলশীলের সামাজিক স্টেটাস উলটে-পালটে যায়, তখন সেই স্টেটাস বজায় রাখতে যাবতীয় লোফারবৃত্তি অবলম্বন করতে সে একটুও দ্বিধা করে না। "অম্বুরি তামাক যে না খায় সে ছোট লোক।" তেমনি যে সপ্তাহান্তে একবার সিনেমায় না যায়, শপিং না করে, বাইরে চেঞ্জে না যায়, পার্ক স্ট্রীট চৌরঙ্গীতে কফি না খায়, রবীন্দ্র সঙ্গীত না শোনে, আর্ট নিয়ে কথা না বলতে পারে, পার্টিতে না যায় সে 'ছোট লোক'। উনিশ শতকের একটি বাংলা পত্রিকার সম্পাদক একদা বাংলাদেশে 'সামাজিক লোফারে'-এর যে পদসঞ্চার দেখে শঙ্কিত হয়েছিলেন, বিশ শতকে তার ভয়াবহ নবরূপ ধারণ দেখলে অবশ্যই তিনি আতঙ্কিত হতেন। তিনি দেখতে পেতেন, কিভাবে আজকের বাঙালী সমাজে নিম্নমধ্যবিত্তের বিস্তৃত ভিতটি পর্যন্ত নড়ে উঠেছে এই নতুন সামাজিক লোফার স্টেটাস-সন্ধানীদের আকর্ষণে।

'সোমপ্রকাশ' লিখেছেন: 'বাঙ্গালী সাধারণতঃ দুর্বল বলিয়া জগতে কেবলমাত্র পরিচিত নহে, বিশেষরূপ ঘৃণিত।" বাংলাদেশ থেকে দিল্লী পাঞ্জাব পর্যন্ত ট্রেনে যাতায়াত করলেই আজও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বাঙালীর যত লম্ফ ও দম্ভ সবই স্বগৃহের সীমানায় আবদ্ধ এবং স্বজন ও স্বজাতি কেন্দ্রাভিমুখী। বাঙালীর এই বিচিত্র দুর্বলতা প্রসঙ্গে সোমপ্রকাশ লিখেছেন:

"যাহাদের মনের স্থিরতা, দৃঢ়তা বা বন্ধন নাই, যাহাদের মন অন্তঃসারশূন্য কিংশুক ফলের ন্যায়, সামান্য কারণরূপ উত্তাপে ফট্ করিয়া কেবল কতকগুলি তুলাসম লঘুকায্য করিয়া চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হইয়া সমাজের পবিত্র দেহকে মলিন করিয়া থাকে, তাহাদের হৃদয়ে ধর্ম্মের ভাব কিরূপ স্থায়ী ও প্রবল, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। সেই হৃদয়ে ধর্ম্ম বিশাল তরঙ্গান্দোলিত অনন্ত সমুদ্রে অর্ণবযানের তুল্য। এই আছে, এই নাই। একবারে ডুবিয়া ডুবিয়া চলিতেছে! সেই জন্য আমাদের সমাজও ডুবিয়া ডুবিয়া

চলিতেছে।”...বাঙালীর মনের স্থিরতা নেই, দৃঢ়তা নেই, বন্ধন নেই। যাদের অন্তঃসারশূন্য মন কিংশুক ফলের মতো সামান্য কারণের উত্তাপে ফেটে গিয়ে তুলোর মতো লঘুকাজ চারিদিকে বিকীর্ণ করতে পারে, তাদের হৃদয় ধর্মভাবে বা সত্যাশ্রয়ে দৃঢ় হতে পারে না। রামমোহনের মতো বিদ্যাসাগরের মতো দু-একজনের মনের বন্ধন ও দৃঢ়তা দেখে সকলের সম্বন্ধে কোন ধারণা করা যায় না। বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে ভাবতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে কাকের বাসায়, অর্থাৎ বাংলাদেশে বাঙালীর ঘরে, কোকিলের ডিম থেকে বিদ্যাসাগরের মতো ‘বাচ্চা’ জন্মাল কি করে, ভাবলে অবাক হতে হয়। নৈসর্গিক বিস্ময়ের মতো এও এক বিস্ময় এবং এই বিস্ময়ের রঙিন কাচ দিয়ে সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালীর চরিত্র বিচার করা যায় না।

ব্রিটিশ আমলে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালী বাংলার বাইরে চাকরি (সোমপ্রকাশের ভাষায় ‘চাকুরী, অথবা কুকুরী’) করতে বেরিয়েছিলেন এবং তাঁদের প্রধান মূলধন ছিল ইংরেজিবিদ্যা। বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, সুদূর উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, সর্বত্রই বাঙালী চাকুরিজীবীর প্রতিপত্তি তখন থেকেই অক্ষুণ্ণ ছিল। এই বিদ্যাভিমানী বাঙালীদের চরিত্র সম্বন্ধে ‘সোমপ্রকাশ’ ৮৫ বছর আগে লিখেছিলেন যে যাঁরা বিদ্যাভিমানী হয়ে বিদেশে থেকে সামান্য বিশ-পঁচিশ টাকা বেতনের রেলওয়ে খালাসী, ডাকঘরের পিওন ও অসহায় পথিকদের ‘বনগ্রামের জম্বুক রাজার মত’ বিলক্ষণ দৌরাত্ম্য করেন, অনবরত ঘণ্টা নেড়ে আত্মশ্লাঘা প্রদর্শন করে থাকেন, তাঁদের মন ও চরিত্র যে কি রকম উন্নত তা ব্যাখ্যা করে বলার দরকার হয় না। এই সেদিন পর্যন্ত প্রবাসে বাঙালীরা বনগ্রামের জম্বুক রাজার মতো ব্যবহার করেছেন। কিন্তু কোন বনগ্রামই আজ আর বনগ্রাম নেই। সেখানেও বিদ্যাভিমানী মধ্যবিত্তের বিকাশ হয়েছে এবং ইংরেজ আমলের জম্বুক রাজারা আজ বাংলার বাইরে তাই ‘বাঙালী তাড়াও’ আন্দোলনের সম্মুখীন হয়েছেন। ইতিহাসেও অন্যায়ের দণ্ড পেতে হয়, ভুলের খেসারত দিতে হয়। আজ বাঙালীরা সেই ভুলের ও মিথ্যা অভিমানের খেসারত দিচ্ছেন এবং অত্যন্ত চড়ামূল্যে।

অর্থনীতি সমাজ সংস্কৃতি রাজনীতি নানাবিধ বিষয় নিয়ে সোমপ্রকাশ যে আলোচনা করেছেন, তার মধ্যে একটি বলিষ্ঠ যুক্তিবাদী উদার মনের পরিচয় পাওয়া যায়। এরকম মন ও দৃষ্টিভঙ্গি সোমপ্রকাশের সমকালীন পত্রিকার ক্ষেত্রে খুবই দুর্লভ ছিল বলা চলে। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো মুক্তচিত্ত উদারহৃদয় যুগপুরুষ যে সোমপ্রকাশ পত্রিকার আদি-পরিকল্পক ও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, সোমপ্রকাশের পরিচালক ও সম্পাদকরা তার মর্যাদা অনেকটা বজায় রেখেছিলেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালীর সার্থক মুখপত্র হয়ে উঠেছিল সোমপ্রকাশ।

বিনয় ঘোষ

সোমপ্রকাশ

"প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

৩ ভাগ।
৩৩ সংখ্যা

সন ১২৬৮। ৪ আষাঢ়। ইং ১৮৬১। ১৭ জুন

মাসিক মূল্য ১ টাকা
বার্ষিক অগ্রিম ১০ টাকা।

সোমপ্রকাশ।

৪ আষাঢ়।

ইংরাজ জাতির মহানুভাবতা।

ইউরোপখণ্ডে কোন ঘটনা হইলে ইংলণ্ডের লোকেরা তদ্বিষয় লইয়া যেরূপ অনুরাগ সহকারে তাহার আন্দোলন করেন, তদ্বৃত্তান্ত শ্রবণে যেরূপ ঔৎসুক্য প্রদর্শন করেন, ভারতবর্ষসংক্রান্ত বৃত্তান্ত শ্রবণে তাহার শতাংশের একাংশ অনুরাগ ও ঔৎসুক্য দৃষ্ট হয় না। তাঁহারা ভারতবর্ষের বিষয়ে প্রায় উপেক্ষাই করিয়া থাকেন। ইহাতে আমরা মনে ভাবিয়াছিলাম বাঙ্গলা দেশীয় লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর নীলকরদিগের অত্যাচার নিবারণার্থ এত যে কাণ্ড করিলেন, হয়ত ইংলণ্ডের লোকের অননুমোদিত হইয়া নিশ্চয় বিফল হইবে। আমাদিগের এবম্বিধ আশঙ্কার আরো একটি বিশেষ কারণ ছিল। নীলকরেরা মফস্বলের নির্জ্জন প্রদেশে বসিয়া যার পর নাই নৃশংস ও অনৈসর্গিক ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা স্বজাতির নিকটে অন্য চিত্র স্থাপন করিয়া তাঁহাদিগকে বিমোহিত করিয়া রাখিবার চেষ্টার ত্রুটি করেন না। ইংলণ্ডেও তাঁহাদিগের যোগাড় কম নাই। এতদিন তাঁহারা ষড়যন্ত্র করিয়া তত্রত্য লোকদিগকে বিমোহিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। যাহা হউক, ইংরাজ জাতির মহানুভাবতাগুণপ্রভাবে আমাদিগের সেই আশঙ্কা নির্ম্মূল হইয়াছে। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন লণ্ডনের কি সাধারণ লোক, কি রাজকর্ম্মচারী কি পার্লিয়ামেণ্টের সভা সকলেই গ্রাণ্ট সাহেবের অনুসৃত নীতির অনুমোদন করিয়াছেন।

সকল জাতিরই স্বজাতির প্রতি পক্ষপাত আছে সেই পক্ষপাত প্রভাবে স্বজাতীয় কৃত অবৈধ কার্য্যের দোষ তজ্জাতীয় অপর ব্যক্তিরা হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হয় না, মনুষ্যের এইরূপ দৃষ্টি দোষ হইয়া থাকে। প্রাচীন কালের লোকদিগের ব্যবস্থা পদ্ধতি দর্শন ও ব্যবহার বৃত্তান্ত পাঠ করিলে ইহার ভূরি প্রমাণ উপলব্ধ হয়। স্পার্টা নগরীয় ব্যবস্থাপকেরা স্বজাতির প্রতি পক্ষপাত বশতঃ হেলটদিগের প্রতিকূল ব্যবস্থা প্রণয়নে পরাঙ্মুখ ছিলেন না। স্পার্টানগরীয়েরা হেলটদিগের প্রতি নিতান্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিত, কিন্তু কি ব্যবস্থাপকগণ কি রাজপুরুষ, কেহই সেই অত্যাচারকে অত্যাচার বলিয়া বোধ করিতেন না। ইদানীন্তন কালেও এবম্বিধ ব্যবহারের অনন্ত দৃষ্টান্ত দৃষ্টিগোচর হয়। আজিও মার্কিণ দেশের লোকেরা দাসদিগের প্রতি সাতিশয় নৃশংস ব্যবহার করিয়া থাকে। তত্রত্য রাজবিধি ও রাজপুরুষেরা তদ্বিষয়ে অনুরাগী রহেন। পক্ষপাতপ্রসূত চিরন্তন কুসংস্কারই ইহার মূল। রুশিয়ার জমিদারেরাও এতদিন পক্ষপাতমূলক ঈদৃশ কুসংস্কারে অন্ধ হইয়া তত্রত্য কৃষকগণের প্রতি যার পর নাই নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছিলেন। যাঁহারা পক্ষপাতের এবম্বিধ দুর্নিবার প্রভাব দমনে সমর্থ হইয়া নিরপেক্ষরূপে কার্য্যানুষ্ঠান করিতে পারেন, তাঁহারাই যথার্থ মহানুভাব লোক। ইংলণ্ডীয়েরা পক্ষপাতে অন্ধ না হইয়া স্বজাতীয় ও স্বদেশীয় নীলকরদিগের অবিনয় নিরপেক্ষরূপে দর্শন করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদিগের সামান্য মহানুভাবতার কার্য্য নহে। কেবল এই বিষয়ে কেন, অনেক বিষয়েই ইংরাজ জাতির মহানুভাবতা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

এস্থলে অনেকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যে জাতি এরূপ মহানুভাব, তজ্জাতীয় ভারতবর্ষবাসী কতকগুলি লোকের নীলকর পক্ষপাতী নিন্দিত ব্যবহার দৃষ্ট হয় কেন? ইহার উত্তরার্থ স্থলে আমাদিগের বক্তব্য এই, ইংরাজদিগের জাতিসাধারণ কার্য্য দর্শন করিলে তাঁহাদিগের অনেক অলোকসামান্য মহানুভাবতা নয়নপথে আবির্ভূত হয়। এতাদৃশ মহানুভব জাতি

সোমপ্রকাশ

অর্থনীতি

রচনা-সংকলন

অর্থনীতি

যাবতীয় ব্যবসায়ে করনিরূপণ প্রস্তাব। ৭ ভাদ্র ১২৬৬। ৪১ সংখ্যা

সম্পাদকীয়

এতদিনের পর রাজপুরুষেরা প্রজাগণের যে দৃঢ়তর অনুরাগভাজন হইবেন তাহার পন্থা উদ্ভাবন করিয়াছেন। মানুষ ক্রমেই বিজ্ঞতম হয়। রাজপুরুষেরা দেখিলেন, ইউরোপীয় দ্রব্যসামগ্রীর উপরে কর নিরূপণ করিয়া ইংরাজদিগের দ্বারে বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠালাভ হইল, তখন আর তাঁহারা কিরূপে এতদ্দেশীয় লোকের নিকটে প্রতিষ্ঠালাভের চেষ্টায় পরাঙ্মুখ থাকিতে পারেন? গত ১৩ই অগষ্ট হারিঙটন সাহেব ব্যবস্থাপক সভায় প্রস্তাব করিয়াছেন, যিনি যে ব্যবসায় করিবেন, তাঁহাকে তাহাতে লাইসেন্স (অনুমতি পত্র) লইতে হইবে। এই প্রস্তাব বিধিবদ্ধ হইলে কেহই আর রাজকরগ্রহ হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন না। সকলকেই ইহার ফলভাগী হইতে হইবে। ফল লাভ হইলে কোন ব্যক্তি রাজপুরুষদিগের প্রতি অনুরক্ত না হইবে।

হারিঙটন সাহেব স্বয়ং উল্লেখ করিয়াছেন, বাণিজ্য কার্য্যে কর নিরূপিত হইলে অনেকে এই বলিয়া আপত্তি করিবেন যে বাণিজ্য কার্য্যের বিঘ্ন হইবে। কিন্তু বাণিজ্যের ব্যাঘাত করা তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য নহে। অর্থের অসঙ্গতি নিবন্ধন কেবল তাঁহারা এতাদৃশ বিষয়ে কর নিরূপণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বাণিজ্য দ্রব্যে কর নিরূপিত হইলেই বাণিজ্য কার্য্যের ব্যাঘাত হয়, ইহা সিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে আমরা সম্মত নহি। বিঘ্ন না ঘটিবার অনেক সম্ভাবনা আছে। রাজপুরুষেরা বণিকগণের নিকট হইতে যে কর গ্রহণের নিয়ম করিবেন, বণিকেরা নিজ হইতে অথবা লাভ ক্ষতি করিয়া তাহা দিবে না, তাহারা ক্রেতৃগণের স্কন্ধেই সে ভার নিক্ষেপ করিবে। ফলতঃ বাণিজ্য দ্রব্যে কর নিরূপণ করাতে যাবতীয় প্রজার উপরে কর নিরূপণ অর্থতঃ সিদ্ধ হইতেছে।

কিছুদিন পুর্ব্বে রাজপুরুষেরা সমুদ্র পথে যে সকল দ্রব্য আমদানী ও রপ্তানি হয় তাহাতে কর গ্রহণের যে নিয়ম করিবেন, তদ্দারা ইউরোপীয়দিগকেই বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। এতদ্দেশীয়দিগের সকলে ন। হউন, অনেকে সে উৎপাত হইতে মুক্ত ছিলেন। তন্নিবন্ধন ইউরোপীয়দিগের অনেকে ঈর্ষ্যান্বিত হইয়াছিলেন। এখন তাঁহারা মনকে প্রবোধ দিন, এখন সকলের এক দশা হইল।

যখন যে কার্য্যের অনুষ্ঠানে যাঁহার ঐকান্তিক প্রবৃত্তি জন্মে, তৎকালে তাঁহার স্বমত প্রতিপোষিণী যুক্তিও আসিয়া জুটিয়া থাকে। হারিঙটন সাহেব প্রস্তাবিত বিষয় ন্যায়মূলক বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত এই যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন যে পুর্ব্বে এদেশে বাণিজ্য

দ্রব্যে কর গ্রহণের নিয়ম ছিল। অদ্যাপি মাদ্রাজে মস্তফি বলিয়া এক প্রকার কর গৃহীত হইয়া থাকে এবং ইংলণ্ডবাসীদিগের নিকট হইতে সম্পত্তিকর গ্রহণ করা হয়। এ দেশে এই ব্যবহার প্রচলিত ছিল এবং অন্য দেশে অদ্যাপি প্রচলিত আছে বলিয়া হারিঙটন সাহেব যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সাধীয়সী বলিয়া বোধ হইতেছে না। অনেক দেশে ন্যায়বিরুদ্ধ অনেক ব্যবহার প্রচলিত আছে। অন্য দেশে প্রচলিত আছে বলিয়া কি সেই অন্যায় ব্যবহার সৎ ও যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া পরিগৃহীত হইবে, যাহাতে প্রজার বহুতর কষ্ট হয়, সে বিষয় ন্যায়ানুগত ও নির্দ্দোষ বলিয়া আদৃত হইতে পারে না। পূর্ব্বে যখন ঘাট মাস্থল দিবার নিয়ম ছিল, তৎকালে লোকের কষ্টের পরিসীমা ছিল না। কষ্টদায়ক বলিয়াই ঐ নিয়ম উঠিয়া যায়। বিশেষতঃ ইংলণ্ডের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া এদেশের লোকের উপরে করদানভার অর্পণ করা কোনক্রমেই বিধেয় হইতেছে না। এদেশের লোকে ও ইংলণ্ডের লোকে অনেক ইতর বিশেষ আছে। ইংলণ্ডের সমুদায় লোকই প্রায় শ্রমশীল ও উপার্জ্জনক্ষম। অতএব তাহাদিগকে কোন বিষয়ে অধিক ব্যয় করিতে হইলে অত্যন্ত কাতর হয় না। আমাদিগের দেশের অধিকাংশ লোক অলস ও অকর্ম্মণ্য। সুতরাং কোন বিষয়ে কিঞ্চিৎ অধিক ব্যয় করিতে হইলে ইহাদিগের প্রাণান্ত বোধ হয়। এখন যেরূপ দ্রব্যসামগ্রী মহার্ঘ হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে সেই অকর্ম্মণ্য দলের অনেকের দিনপাত করা ভার হইয়া উঠিয়াছে। তাহাতে আবার বাণিজ্য দ্রব্যে কর হইয়া যদি দ্রব্যসামগ্রী উত্তরোত্তর আরো মহার্ঘ হয় তাহা হইলে তাহাদিগের সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হওয়া নিতান্ত দুরূহ হইবে সন্দেহ নাই।

আমরা কেবল অলস দলের কষ্ট হইবে বলিয়া একথা কহিতেছি না। ইংলণ্ডের লোকের উপার্জ্জনের যত পন্থা আছে, এ দেশের লোকের তত নাই। অন্যদেশ বিলক্ষণ আচার ব্যবহার, জাত্যভিমান, সমাজবন্ধনের রীতি প্রভৃতি নানা কারণে এদেশের লোকের উপার্জ্জনের উপায় সকল রুদ্ধ হইয়া আছে। যাহাদিগের পরিশ্রমের ক্ষমতা আছে, উপায় বিরহে তাহারাও উপার্জ্জনে শক্ত হয় না, এ অবস্থায় রাজপুরুষেরা এদেশের লোকের নিকট হইতে অর্থগ্রহণের যত চেষ্টা করিবেন, ততই ইহাদিগের অসন্তোষের বৃদ্ধি হইবে।

প্রতি ব্যক্তির আয় নিরূপণ করিয়া কর নির্দ্ধারণ দুষ্কর বিবেচনা করিয়া হারিঙটন সাহেব ব্যবসায়িদের দশটি শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন। সে শ্রেণীবিভাগ এই—

শ্রেণী	বার্ষিক আয়
১	২০০০ টাকা
২	১০০০ „
৩	৫০০ „
৪	২৫০ „
৫	১০০ „

শ্রেণী	বার্ষিক আয়
৬	৫০ টাকা
৭	২৫ „
৮	১০ „
৯	৫ „
১০	২ „

কালেক্টরদিগের উপরে শ্রেণীবিভাগ করিবার ভার সমর্পিত হইবে। তাঁহারা পঞ্চায়েতের সাহায্য লইয়া শ্রেণীবিভাগ করিবেন। প্রথমত শ্রেণীবিভাগ কালেই বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইয়া প্রজার যথেষ্ট কষ্ট হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। এরূপ অনেক ব্যবসায় আছে, সকল বৎসরে সকলের তাহাতে সমান লাভ হয় না। লাভগত এত বৈষম্য হয় যে, গড় ধরিয়া শ্রেণী বিভাগ করা সহজ নহে। তৎসমব্যবসায়ী অপর ব্যক্তির লাভ্যাংশের গড় ধরিয়া শ্রেণী বিভাগ করিতে গেলে বড় বৈলক্ষণ্য ঘটিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে।

যাঁহারা লোকব্যবহর্য্য দ্রব্যসামগ্রীর ক্রয় বিক্রয় কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন, তাঁহারাই যে কেবল উল্লিখিত কর ভারাক্রান্ত হইবেন এরূপ নহে, উকীল, কৌন্সেলি, চিকিৎসক প্রভৃতিকেও ঐ উৎপাতগ্রস্ত হইতে হইবে। হারিংটন সাহেব উকীল প্রভৃতির আয় গণনা করিয়া কি প্রকারে তুল্যরূপে শ্রেণীবিভাগ করিবেন বলিতে পারা যায় না। আর কিছু নয়, কতকগুলি বৈদ্য ও অধ্যাপক মহাশয়েরই বিষম বিভ্রাট দেখিতেছি! তাঁহাদিগের নিমিত্তই আমাদিগের বড় ভাবনা হইয়াছে। বোধ হয় এইবারেই তাঁহাদিগকে ঔষধের পুঁটলি ও টোল ফেলিয়া সহর পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গা পার হইতে হইল। এক দেশের লোকে তাঁহাদিগকে সমুচিত সমাদর করেন না সুতরাং লাভ ভাব অল্প, যাহা পান তাহাতে দিনপাত হওয়াই ভার, আবার রাজপুরুষেরা বাদে লাগিলেন। তাঁহারা যা উপার্জ্জন করিবেন, সে সমুদায়গুলি যদি রাজপুরুষদিগকে দিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহারা কি লইয়া সহরে তিষ্টিয়া থাকিবেন। তাঁহারা সহর পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন এই কথা মনে হইয়া আমাদিগের চক্ষে জল আসিতেছে। আমরা আর প্রাতঃকালে উঠিয়া সে ঔষধের থলি, সে তসর কাপড, সে দীর্ঘচ্ছন্দের ফোঁটা দেখিতে পাই না। আমরা তাঁহাদিগকে একটি সৎপরামর্শ বলি, তাহারা এই বেলা হারিংটন সাহেবের নিকটে এই দরখাস্ত করুন, ঐ সাহেব যেমন প্রস্তাবিত আইনের এক ধারায় রাজকর্ম্মচারীদিগকে মুক্ত রাখিয়াছেন, আর একটি ধারা যোগ করিয়া তেমনি তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দেন।

প্রস্তাবিত আইনের ২০ ধারায় লিখিত আছে, যাহারা অন্যের নিকট চাকরি করিবে, তাহাদিগের সেই চাকরি ব্যবসায় মধ্যে পরিগণিত হইয়া তাহাদিগের নিকট হইতেও কর গৃহীত হইবে। কিন্তু ২১ ধারায় লিখিত হইয়াছে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মকর-

দিগকে পরিত্যাগ করিয়া যে আইন হইয়াছে তাহা যুক্তিসিদ্ধই হইয়াছে সন্দেহ নাই। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মকরদিগের নিকট হইতে করগ্রহণের নিয়ম করা হইলে নিয়মকর্ত্তারাও অব্যাহতি পাইতেন না। আপনারা নিয়মকর্ত্তা হইয়া আপনাদিগের আপদ আপনারা ঘটান, সেটা উচিত হয় না। অন্যের নিকটে যাহারা কর্ম্ম করে, তাহাদিগের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিলে রাজপুরুষদিগের তাহাতে ক্ষতি কি? সে ক্ষতি প্রজাগণের হইবে। কৃষকগণের প্রতি হারিঙটনের সমধিক অনুগ্রহ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। তিনি কৃষিকার্য্য প্রবৃত্ত লোকদিগের নিকট হইতে করগ্রহণের নিয়ম করেন নাই! তাঁহার এই অসামান্য অনুগ্রহ কেন হইল বলিতে পাবা যায় না। বোধ হয়, প্রজাগণের কষ্ট হইবে, এই ভয়ে ক্ষান্ত হইয়াছেন।

এতদিন প্রসঙ্গসঙ্গতিক্রমে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কথা উঠিলে আমরা দম্ভ করিয়া কহিতাম, ভারতবর্ষে ইংরাজদিগেব অধিকাব হওয়াতে প্রজাগণ বহু অংশে সুখী হইয়াছে। দস্যু তস্করাদির তাদৃশ উপদ্রব নাই, প্রবলেরা আর পূর্ব্বেব ন্যায় দুর্ব্বলদিগকে পীড়ন করিতে সমর্থ হয় না, বিদ্যারও সমধিক অনুশীলন আরম্ভ হইয়াছে, রাজপুরুষেরা কৃষি-বাণিজ্যাদি বিষয়ে সমধিক উৎসাহ প্রদান কবিয়া থাকেন, বাণিজ্য দ্রব্যে রাজপুরুষ-দিগের করগ্রহণ করা নাই, কৃষিকার্য্যোপযোগী ভূমির যে কর গ্রহণ হইয়া থাকে, তাহা আত্যন্তিক মারাত্মক নহে। কিন্তু এক্ষণে বাজপুরুষেরা যে প্রকরণ করিতেছেন, তাহা দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হইতেছে, অবিলম্বে আমাদিগের সেই দম্ভ করিবার পথ রুদ্ধ হইবে। অতঃপর গবর্ণমেণ্টকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রণামী না দিয়া আমারদিগের পথে পা বাড়াইবার যো থাকিবে না। অসন, বসন, শয়ন, আসন প্রভৃতিব উপযোগী যে কোন দ্রব্য ক্রয় করিতে যাইবে, তাহাতেই কিছু কিছু রাজভাণ্ডারে দিতে হইবে।

হারিঙটন সাহেব প্রজাগণের প্রবোধার্থ এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন যে তাঁহারা নূতন বিষয়ে কর গ্রহণ করিতে হইলে প্রজাগণকে এইরূপেই প্রবোধ দিয়া থাকেন। প্রথম যখন কলিকাতার বাটীর টাক্স হয়, তখনও রাজপুরুষেরা প্রজাগণকে ঐরূপ প্রবোধ দিয়াছিলেন, প্রথম প্রথম তাঁহাদিগের কথা রক্ষাও হইয়াছিল, অল্প অল্প কর গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু শেষে আর রাজপুরুষেরা সে কথা রক্ষা করিতে পারিলেন না। ক্রমেই টাক্স বাড়াইতে আরম্ভ করিয়াছেন।

হারিঙটন সাহেব কৃত শ্রেণী বিভাগ দর্শন করিয়া স্পষ্ট বোধ হইতেছে, বাণিজ্য দ্রব্যে কর নিরূপণ করা প্রস্তাবিত আইনের উদ্দেশ্য নহে। আয়ের উপরে কর নিরূপণ করাই উহার মুখ্য উদ্দেশ্য। যাহা হউক, রাজপুরুষেরা যেরূপে সেই উদ্দেশ্য সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন কি না সন্দেহ স্থল। বণিকগণ যদি এক বাক্য হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের চেষ্টা বিফল হইবে সন্দেহ নাই।

রাজপুরুষেরা নিত্য নিত্য কর গ্রহণের নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়া ভারত-

বর্ষীয়দিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবেন এই বলিয়াই কি ইহারা স্বাধীনতা বিনিময় করিয়া ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে ? লোকে সুরাজলাভের প্রার্থনা করে কেন ? রাজা দস্যু তস্করাদির উপদ্রবের ন্যায় অসঙ্গত কর গ্রহণ হইতে মুক্ত করিবেন, এই আশা করিয়াই লোক ভাল রাজার প্রার্থনা করে এইরূপ কিম্বদন্তী প্রসিদ্ধ আছে, অযোধ্যার অধিপতি সূর্য্য বংশীয় রাজা রামচন্দ্র পশ্চিমদ্বারি গৃহের কর লইতেন না। এই নিমিত্ত তাঁহার অতিশয় সুখ্যাতি শুনিতে পাওয়া যায়। যে রাজ্য বাস করিয়া প্রজাগণ কিঞ্চিন্মাত্র কষ্ট অনুভব না করে, সেই রাজ্যই রামরাজ্য বলিয়া উল্লিখিত হয়।

হারিঙটন সাহেব মনে মনে বিলক্ষণ জানেন যে লোকের আয়ের উপরে কর নিরূপণ করিতে গেলেই বিরাগ ভাজন হইতে হইবে। এই হেতু তিনি আত্মদোষ ক্ষালনের অভিপ্রায়ে উল্লিখিত আইন প্রস্তাব করিবার এই কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন যে, অর্থের অতিশয় অসঙ্গতি বলিয়া তাঁহারা ঈদৃশ চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই কারণ প্রদর্শন অসঙ্গত বলিয়া অগ্রাহ্য হইতেও পারে না। যে কারণে হউক, তাহার বিবেচনায় প্রয়োজন নাই, রাজা ঋণগ্রস্ত হইয়াছেন এসময়ে সাহায্য করা প্রজামাত্রেরই কর্ত্তব্য। রাজপুরুষেরা কর নাম পরিবর্ত্ত করিয়া অন্য নামে অর্থ গ্রহণ করুন এবং কাল নিয়ম করিয়া দিন, নিঃসংশয় তাহাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে। কর এই নাম শুনিলেই প্রজাগণ ভীত হয়।

নীলকরদিগের আবেদন। ২১ ভাদ্র ১২৬৬। ৪৩ সংখ্যা

ইউরোপীয়েরা এ দেশের লোকের উপরে অত্যাচার করিলে এতদ্দেশীয় বিচারকর্ত্তার নিকটে তাহার বিচার হয় না। এই হেতু মফঃসলবাসী ইউরোপীয়েরা অত্রত্য লোকের উপরে অত্যাচার করিয়া অনায়াসে অব্যাহতি পায়। ইউরোপীয়দিগকে এতদ্দেশীয় বিচারকর্ত্তার বিচারাধীন করিবার চেষ্টা বহুদিন অবধি হইতেছে কিন্তু ফলোদয় হইতেছে না। সম্প্রতি ব্যবস্থাপক সভায় এই প্রস্তাব হয় যে ইউরোপীয়েরা এদেশের লোকের উপরে অত্যাচার করিলে এতদ্দেশীয় বিচারকর্ত্তারা দোষের অনুসন্ধান পূর্ব্বক তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া সুপ্রিম কোর্টে বিচারার্থ সমর্পণ করিতে পারিবেন। আমরা ৩১এ শ্রাবণের সোমপ্রকাশে সংক্ষেপে এ বিষয়ের প্রসঙ্গ করিয়াছিলাম। এখন শুনা যাইতেছে নীলকরেরা এই প্রস্তাবের বিপক্ষ হইয়া ব্যবস্থাপক সভায় এক আবেদন করিয়াছেন।

নীলকরেরা বিপক্ষ হইবেন, আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তাঁহারা এতদ্দেশীয়দিগের উপরে অত্যাচার করেন। এ দেশের লোকে তাঁহাদিগের কৃত যাবতীয় অত্যাচার বৃত্তান্ত অবগত আছেন। সুতরাং এতদ্দেশীয় বিচারকর্ত্তার উপরে তাঁহাদিগের অব্যাহতি পাওয়া দুরূহ হইবে। ইউরোপীয় বিচারকর্ত্তার নিকটে তাঁহারা সাধু হন। ইউরোপীয়

বিচারকর্ত্তা তাঁহাদিগের মায়া বুঝিতে পারেন না। এদেশের লোক তাহাদিগের নামে কোন বিষয়ের নালিশ করিলে বিচারকর্ত্তা মনে করেন, কুঠিয়াল সাহেবের দোষ নাই, অভিযোগকর্ত্তারই যত দোষ। মোকদ্দমার নিষ্পত্তিও তদনুসারিণী হইয়া থাকে। কিন্তু এদেশের লোকের উপরে বিচার ভার হইলে তাঁহারা মায়াজাল বিস্তার করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না নিশ্চয় বুঝিয়াছেন। তাহাতেই তাঁহারা শঙ্কিত হইয়া তাড়াতাড়ি ব্যবস্থাপক সভায় আবেদন করিয়াছেন। যে ব্যক্তি অধিক দোষী হয়, তাহার ভয়ও অধিক হয়।

তাঁহারা যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তদ্দ্বারাও স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে তাঁহারা শঙ্কিত হইয়াছেন। তাঁহারা আবেদনমধ্যে অন্য যুক্তি প্রদর্শন করিতে পারেন নাই, এতাবন্মাত্র যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন যে ইউরোপীয়দিগের সহিত এদেশের লোকের একটি প্রবল জাতিবৈর আছে, যদি এদেশের লোকের উপরে ইউরোপীয়দিগের অপরাধের বিচার ভার সমর্পিত হয়, তাহা হইলে সেই বৈর নিবন্ধন যথভূত বিচার হইবে না। আমাদিগের বক্তব্য এই বিচারকর্ত্তা বিচারকালে রাগদ্বেষাদির বশীভূত হইবেন এরূপ আশঙ্কা করাই অবিধেয়। রাজপুরুষেরা তাদৃশ অবশেন্দ্রিয় ব্যক্তিকে বিচারপতির আসন প্রদান করিবেন কেন? নীলকরদিগের ঐ আশঙ্কা অমূলক সন্দেহ নাই। ঐ আশঙ্কা যদি সমূলক হয়, তাহা হইলে এদেশের লোকেও বলিতে পারেন, ইউরোপীয় বিচারকর্ত্তারা এ দেশের লোকের যত মোকদ্দমার বিচার করেন, তাহার একটিও যথার্থ হয় না। এদেশের লোকের প্রতি ইউরোপীয়দিগের আত্যন্তিক বিদ্বেষ বুদ্ধি আছে, তাহা বিদ্রোহ ঘটনা হওয়াতেই প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে।

নীলকর কুঠীয়াল সাহেবেরা যে সকল গর্হিত কর্ম্ম করেন, তাহা আমাদিগের এতদ্দেশীয় পাঠকগণের কাহারও অবিদিত নাই। অতএব তাঁহাদিগের নিকটে নীলকরদিগের অত্যাচার বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া উদাহরণ প্রদর্শন করা পুনরুক্ত সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদিগের যে সকল ইউরোপীয় গ্রাহক আছেন, তাঁহারা সকলে নীলকরদিগের ব্যবহার বৃত্তান্ত জানেন না। তাহাদিগের নিমিত্ত আমরা গুটি দুই উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছি। কিন্তু বিশেষ কারণ বশতঃ আমরা স্থান ও ব্যক্তির নাম নির্দ্দেশ করিতে পারিলাম না।

নীলের এক কুঠীর সন্নিহিত আমাদিগের এক আত্মীয়ের কিঞ্চিৎ ভূমি আছে। একদা কোন কারণ বশতঃ কুঠীয়াল সাহেবের সেই ভূমিতে লোভ দৃষ্টি পতিত হইল। কুঠীয়াল সাহেবদিগের রীতি আছে, কোন বিষয়ে গ্রহণেচ্ছা জন্মিলে লাঠীয়ালদিগকে আদেশ করা হয়, তাহারা তৎক্ষণাৎ অধিকার করিয়া দেয়। উল্লিখিত কুঠীয়াল সাহেব লাঠীয়ালদিগকে আদেশ করিলেন, তাহারা তৎক্ষণাৎ আমাদিগের সেই আত্মীয়ের ভূমি অধিকার করিয়া লইল। আমাদিগের আত্মীয় এই অন্যায় দেখিয়া মুনসেফে-নালিশ করিলেন। আদালতেই যাও আর অন্যের কাছেই যাও, প্রবলের সহিত বিরোধ করিয়া পারিয়া উঠা

ভার। আমাদিগের আত্মীয় মোকদ্দমায় জয়ী হইতে পারিলেন না। তখন কি করেন, বিবেচনা করিয়া দেখিলেন বিষয় যায়, শেষ কুঠীয়াল সাহেবের কাছে রফা করিতে গেলেন। কুঠীয়াল সাহেব রফা করিতে সম্মত হইলেন কিন্তু ভূমি ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইলেন না। মূল্য দিয়া ভূমি ক্রয় করিয়া লইতে চাহিলেন। কিন্তু আমাদিগের আত্মীয় তাহা স্বীকার না করাতে শেষ জমি পাটা করিয়া হইলেন। আমাদিগের আত্মীয় রফার কথাবার্ত্তা স্থির হইবার সময়ে কথায় কথায় কহিয়াছিলেন, সাহেব যদি একান্তই জমি ছাড়িয়া না দেন তাহা হইলে তিনি ২।৪।৫ বৎসরের নিমিত্ত জমি খাজনায় দিতে পারেন। এই বাক্যের তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলে ২।৪।৫ বৎসরের নিমিত্ত বলিলে অল্প দিনের নিমিত্ত বুঝায়। কিন্তু স্বার্থহানি সম্ভাবনা দেখিয়া সাহেব সে অর্থ বুঝিলেন না। তিনি ২।৪।৫ ইহা ঠিক দিয়া এগার বৎসর গণনা করিয়া সেই এগার বৎসরের পাটা করিয়া লইলেন। অপর উদাহরণ এই :

এদেশের পল্লীগ্রামের এই রীতি আছে, যে সকল গৃহস্থের দাসদাসী রাখিবার সঙ্গতি না থাকে তাহাদিগের বাটীর স্ত্রীলোকেরা স্বয়ং গিয়া নিকটবর্ত্তী নদী অথবা সরোবর হইতে জল আনয়ন করে। নীলের এক কুঠীয়াল সাহেবের প্রতিবেশী এক কায়স্থের এক ভ্রাতৃবধূ ও এক কন্যা প্রতিদিন কুঠীর সমুখ দিয়া জল আনিতে যায়। কায়স্থের কন্যাটী কিছু সুশ্রী। তাহাকে দেখিয়া কুঠীয়াল সাহেবের লোভ জন্মিল, সাহেব অতিশয় ধৈর্য্যশালী। তিনি তৎক্ষণাৎ রাস্তা হইতে সেই কন্যাটীকে ধরিয়া আনাইলেন না। আপিয়স ক্লডিয়সের ন্যায় প্রতারণারও আশ্রয় লইলেন না। কুঠীয়াল সাহেব প্রবঞ্চনা ভালবাসেন না। উল্লিখিত সাহেব কন্যার পিতা কবে বাড়ী না থাকে তাহার তত্ত্বে রহিলেন।...যাহার যেমন ভাবনা কার্যসিদ্ধিও তদনুরূপ হয়।

সাহেবের ভাগ্য প্রসন্ন হওয়াতে কন্যার পিতার বাড়ী না থাকাই ঘটিয়া উঠিল। কন্যার পিতা বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ একদিন গ্রামান্তরে গমন করিলেন। সাহেব সেই দিন রাত্রিতে ১০।১২ লাঠীয়াল পাঠাইয়া সেই কন্যা ও তাহার পিতৃব্যপত্নী উভয়কেই আনাইলেন। কন্যাটির খুড়িকে আনাইবার কারণ শুনিলে আমাদিগের পাঠকগণ কুঠিয়াল সাহেবকে সহস্র সাধুবাদ দিবেন সন্দেহ নাই। পাঠকগণ এরূপ মনে করিবেন না যে সাহেব উভয় স্ত্রীকেই স্বয়ং রাখিবার মানস করিয়া তাহাদিগকে আনাইয়াছিলেন। একদা দুই স্ত্রী রাখিতে নাই, শাস্ত্রে নিষেধ আছে। সাহেব তাহা জানেন। তিনি জ্ঞানবান হইয়া তেমন অবৈধ কর্ম্ম করিবেন কেন? যে সকল লোক সেই কন্যাটিকে আনিয়া দিয়া তাঁহার মহোপকার করিয়াছিল, তিনি যদি তাহাদিগকে শ্রমানুরূপ পুরস্কার না দেন, তাহা হইলে অকৃতজ্ঞ হইতে হয়। তিনি কেবল সেই অকৃতজ্ঞতা দোষের পরিহার করিবার নিমিত্ত সেই কন্যাটির খুড়িকে আনান এবং পুরস্কার স্বরূপ কর্ম্মকর্ত্তাদিগের হস্তে তাহাকে সমর্পণ করেন। সাহেবের এই উদার ব্যবহার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কে না প্রশংসা করিবেন।

এদিকে ত কুঠীয়াল সাহেব কন্যাটীকে আনাইয়া ভয় ভঞ্জন ও সান্ত্বনা করিতে

লাগিলেন, ওদিকে তাহার স্বামী ঐ সমাচার প্রাপ্ত হইয়া আদালতে নালিশ করিলেন। নালিশ হইয়া তদারক হইতে হইতে ২।৩ মাস অতীত হইয়া গেল। ততদিনে সাহেব সেই সেই বন্দীকৃত স্ত্রীর প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। অনন্তর যখন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে সেই স্ত্রীর জবানবন্দী লওয়া হইল সে বলিল, স্বেচ্ছাপুর্ব্বক সাহেবের নিকটে গিয়াছে, সাহেবকেও মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে ঐ কথা বলিতে হইয়াছিল সন্দেহ নাই। সাহেবেরা সত্যবাদী লোক ; মাজিষ্ট্রেট সাহেব কুঠীয়াল সাহেবের কথায় অবিশ্বাস করিবেন কেন।

আমাদিগের পাঠকগণ কি বোধ করেন? সেই স্ত্রী কি সাহেবের রূপে মোহিত ও ইচ্ছাবতী হইয়া স্বয়ং গিয়া সাহেবের গলদেশে বাহুদ্বয় নিক্ষেপ করিয়াছিল? আমাদিগের দেশের স্ত্রীলোকেরা সাহেব দেখিলেই ভয় পায়। দীর্ঘ সহবাস না হইলেও প্রণয় প্রসক্তি হয় না। প্রণয় সঞ্চারের পুর্ব্বে কিরূপে সাহেবের সহিত সেই স্ত্রীলোকের সহবাস সংঘটন হইল। তবে সেই স্ত্রীলোক যে মাজিষ্ট্রেটের নিকটে বলে সে ইচ্ছাপুর্ব্বক সাহেবকে বরণ করিয়াছে, তাহার অনেক কারণ আছে। সে বেশ জানিত ভদ্রলোকের স্ত্রীকে কেহ বাহির করিয়া লইয়া গেলে তাহার স্বামী আর তাহাকে ঘরে লয় না। বিশেষতঃ সাহেবে বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছে। তাহার স্বামী যে তাহাকে ঘরে লইবে তাহা কোনক্রমেই সম্ভাবিত নহে। তাহার স্বামী বৈরনির্য্যাতনার্থী হইয়া কেবল আদালতে নালিশ করিয়াছে। অতএব সে যদি তখন সাহেবকে পরিত্যাগ করিয়া আইসে তাহার তাঁতিকুল বৈষ্ণবকুল সকলি যায়। সুতরাং তাহাকে সাহেবের সপক্ষতা করিতে হইল।

যে সকল রাজপুরুষ ব্লাক আক্‌টের বিপক্ষ, আমরা এক্ষণে তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা নীলকরদিগের ঈদৃশ ব্যবহার বৃত্তান্ত অবগত হইয়াও কি বিপক্ষতাচরণ হইতে বিরত হইবেন না? তাঁহারা কি নীলকরদিগকে মফঃসল আদালতের বিচারাধীন করিতে চাহেন না। তাঁহারা যদি এই সকল জানিয়া শুনিয়াও ব্লাক আক্‌ট চলিত না করেন, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই বুঝিব, তাঁহাদিগের স্বজাতির প্রতি পক্ষপাতই প্রবল, প্রজার মঙ্গল চেষ্টা প্রবল নহে। রাজপুরুষেরা মনোযোগ দিয়া যদি শ্রবণ করেন, আমরা নীলকরদিগের অত্যাচারের পরঃশত প্রামাণিক বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে পারি।

গত সোমবারের সভা। ৪ আশ্বিন ১২৬৬। ৪৫ সংখ্যা

সম্পাদকীয়

হারিঙটন সাহেব ব্যবস্থাপক সভায় যাবতীয় ব্যবসায়ে করনিরূপণের যে প্রস্তাব করেন তাহার দোষ গুণ বিবেচনা ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ নিমিত্ত গত সোমবারে টৌনহালে ইউরোপীয়েরা এক সভা করিয়াছিলেন। বেলা ৩টার সময়ে সভাগৃহ লোকে পরিপূর্ণ হয়। দুই হাজারেরও অধিক লোক সভাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সভার কার্য্য আরম্ভ হইলে

ছয়টী প্রস্তাব হয়। তাহার সকলগুলি অনুবাদ করিয়া উদ্ধৃত করা অনাবশ্যক বিবেচনা করিয়া আমরা কেবল প্রথম প্রস্তাবটি অনুবাদ করিয়া দিলাম।

"যাবতীয় ব্যবসায়ে করনিরূপণবিষয়ক আইনের যে পাণ্ডুলেখ্য করা হইয়াছে, তাহা বিশুদ্ধ হয় নাই, তাহার যুক্তি ও অবয়ব উভয়েতেই দোষ দৃষ্ট হইতেছে। অতএব এই সভা এই আপত্তি করিতেছেন, সেই আইন প্রচলিত না হয়, এবং যে কর সকল লোকের সম্পত্তির ও সকল লোকের আয়ের উপরে নির্দ্ধারিত করা না হইবে, তাদৃশ করবিষয়ক নিয়ম প্রচলিত না হয়। সভার মত এই, সকল লোকের আয়ের ও সম্পত্তির উপরে ন্যায়ানুগত করনিরূপণ করা হয়, ঐ নিয়মই এতদ্দেশের উপযোগী"।

পঞ্চম প্রস্তাবে পার্লিয়ামেণ্টে আবেদন এবং ষষ্ঠ প্রস্তাবে ব্যবস্থাপক সভায় আবেদন করিবার কথা উল্লিখিত দৃষ্ট হইল, তদ্ভিন্ন প্রস্তাব সকলে বর্ত্তমান ব্যবস্থাপক সভা ব্যবস্থা-প্রণয়নে যোগ্য নহেন, গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য আয়ব্যয়াদিবৃত্তান্ত সকলের গোচর করেন ইত্যাদি পুরান কথাই মহাডম্বর করিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব তদনুবাদপ্রয়াস পরিত্যক্ত হইল।

ইংলিসমান সম্পাদক এই সভাকে কলিকাতাবাসীদিগের সভা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা এ সভাব সে নাম দিতে সম্মত নহি। ইউরোপীয় বণিক-সম্প্রদায়ই যত্নবান হইয়া এই সভা করেন, আমরা শুনিযাছি এতদ্দেশীয় গণনীয় লোকেরা সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না। ২।১ নামার্থী ব্যক্তি যদি উপস্থিত হইয়া থাকেন সে ধর্ত্তব্য নহে। তবে যে ইংলিসমান সম্পাদক বাঙ্গালিরাও উপস্থিত ছিলেন বলিয়া লিখিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য আছে। বাঙ্গালিদিগের মধ্যে দোকানী পসারী প্রভৃতি অনেকে তামাসা দেখিতে গিয়াছিলেন। ইংলিসমানের সম্বাদদাতা তাহাদিগকেই দেখিয়া মনে করিয়াছিলেন সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালিরা এ সভায় অনুমোদন করিতে আসিয়াছেন। সম্ভ্রান্ত, বুদ্ধিমান ও বিবেচক বাঙ্গালিরা এ সভার অনুমোদন করেন এ সেরূপ সভা নহে। যে উদ্দেশ্যে এ সভা হয়, তাহা বিশুদ্ধ নয়। বিশেষতঃ ইহা এতদ্দেশীয়দিগেব পক্ষেই সবিশেষ অনিষ্টকর। এ সভাকে কলিকাতাবাসী বণিগ্ব্যবসায়ী ইউরোপীয়দিগের সভা বলিয়া উল্লেখ করাই ইংলিসমান সম্পাদকের উচিত ছিল। এই সভায় উপস্থিত হইবার নিমিত্ত ইউরোপীয় বণিকগণেরই সমধিক অনুরাগ দৃষ্ট হয়। এক ঘণ্টা দোকান বন্ধ থাকিলেও যাঁহারা মর্ম্মান্তিক বেদনা পান, তাঁহারাও দোকান বন্ধ করিয়া গত সোমবারে টৌনহালে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

আমরা উক্ত সভাকে ইউরোপীয় বণিকব্যবসায়ীদিগের সভা বলিয়া যে নির্দ্দেশ করিতেছি, তাহার আরো অনেক কারণ আছে। ডি. মেকিনলে সাহেব কলিকাতাবাসী ইউরোপীয় বণিক সম্প্রদায়ের যজ্ঞেশ্বর। সভারূপ যজ্ঞ উপস্থিত হইলেই তিনি অধিষ্ঠান হইয়া থাকেন। তিনি এ সভাকেও পদার্পণরূপ অনুগহ দ্বারা পবিত্র করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। তিনি সভায় উপস্থিত হইয়া এক দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তিনি কিরূপ বক্তৃতা করিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য অবগত হইবার নিমিত্ত আমাদিগের পাঠকগণের অনেকে উৎসুক

হইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদিগের এই ক্ষুদ্রকায় পত্রিকায় সেই দীর্ঘ বক্তৃতার আনুপুর্ব্বিক তাৎপর্য্যের অনুবাদ দর্শন করিবার সম্ভাবনা নাই। আমরা তাঁহার সদৃশ নয়, তৎকৃত সেই বক্তৃতা তাঁহাদিগের হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছে এরূপ বোধ হইতেছে না।

আমাদিগের রাজপরুষেরা অনীতিজ্ঞতা ও অতি লোভ দোষে দুর্ব্বহ ঋণভারগ্রস্ত হইয়াছেন। তাঁহারা সেই ভার প্রজাগণের স্কন্ধে নিক্ষেপ করিবার চেষ্টায় আছেন। প্রজাগণের কর্ত্তব্য সকলে ঐকমত্য অবলম্বন করিয়া তাঁহাদিগকে অগ্রে আত্মদুঃখ নিবেদন করেন, নিয়মগতই হউক, আর অন্য বিষয়গতই হউক, রাজপুরুষদিগের যে যে ভ্রান্তি আছে, তাহা দেখাইয়া তাহার সংশোধনের চেষ্টা করেন এবং যে উপায় অবলম্বন করিলে রাজপুরুষেরা ঋণদায় হইতে মুক্ত হইতে পারেন তাহা বলিয়া দেন। এই এই উদ্দেশ্যে প্রজাগণ যদি কোন সভা করেন, তাহা সকলের আদরণীয় হয়। রাজপুরুষেরাও তৎকৃত আপত্তি অযৌক্তিক অথবা অকিঞ্চিৎকর বলিয়া অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। মেকিনলে সাহেবের সভা করিবার এ সকল উদ্দেশ্য নয়। গবর্ণমেণ্টের ঋণ পরিশোধ করিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়া দেওয়া তাঁহার চেষ্টা নয়। এতদ্দেশীয় জমিদারদিগের উপরে ঈর্ষ্যা প্রকাশ করা এবং রাজপুরুষদিগকে অন্যায় কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টাই তাঁহার সভা করিবার মুখ্য উদ্দেশ্য।

হারিংটন সাহেব ব্যবস্থাপক সভায় যাবতীয় ব্যবসায়ে কর নিরূপণের যে প্রস্তাব করেন, উল্লিখিত সভা তাহার অযৌক্তিকতা ও সদোষতা প্রমাণ করিয়া দিবার নিমিত্ত এই যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, হারিংটন সাহেব কর গ্রহণের যে নূতন আইন করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাহাতে তিনি জমিদারদিগকে মুক্ত রাখিয়াছেন, এ কেবল শ্রমশীল ব্যক্তিদিগকে কষ্ট দিবার নিমিত্তই করা হইতেছে; কতকগুলি লোকের স্কন্ধে করভার নিক্ষেপ করা আর কতকগুলিকে তাহা হইতে মুক্ত রাখা বিষম পক্ষপাতের কর্ম্ম, বিশেষতঃ জমিদারেরা ধনী, তাঁহারা অনায়াসে গবর্ণমেণ্টের এ বিপদকালে সাহায্য করিতে পারেন, তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করা অবিধেয় হইয়াছে। সাধারণের আয়ের ও সম্পত্তির উপরে কর নিরূপণ করাই কর্ত্তব্য। মেকিনলে সভার (আমরা উল্লিখিত সভাকে মেকিনলে-সভা বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম) প্রদর্শিত যুক্তি আমরা সাধীয়সী বলিয়া গ্রাহ্য করিতে পারি না। জমিদারদিগকে সঙ্কল্পিত করগ্রহ হইতে মুক্ত রাখা আপাততঃ অন্যায্যবদাভাসমান হইতেছে বটে, কিন্তু করগ্রহণ প্রস্তাবকর্ত্তা যে যুক্তিতে তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন তাহার বিষয় চিন্তা করিলে কোনরূপেই নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। ১৭৯৩ খৃঃ অব্দে লার্ড করন্‌ওয়ালিস জমিদারদিগের সহিত যে বন্দোবস্ত করেন, তাহা ডিরেক্টরসভার অনুমোদিত ও পরিগৃহীত হইলে ডিরেক্টরসভা এই অঙ্গীকার করেন, জমিদারদিগের সহিত যে বন্দোবস্ত হইল তাহা চির অব্যাহত ও অপরিবর্ত্তিত থাকিবে। তদানীন্তন বন্দোবস্ত অপরিবর্ত্তিত রাখিবার তাৎপর্য্য এই জমিদারেরা এদেশের ভূস্বামী,

তাহাদিগের অধিকৃত ভূমির কর যদি পরিবর্ত্তশীল না করা হয়, তাহা হইলে তাঁহারা কৃষিকার্য্যোপযোগী ভূমির উর্ব্বতাসম্পাদনে যত্নবান হইবেন এবং গবর্ণমেণ্টের প্রতির চির অনুরক্ত থাকিবেন।

ভূমির খাজনা ও উপস্বত্ব ব্যতিরিক্ত জমিদারদিগের অন্যবিধ আয় নির্দ্দিষ্ট নাই। তাঁহাদিগের আয়ের উপরে করনিরূপণ করিতে গেলে কি সেই ভূমির কর বৃদ্ধি করা হয় না? এখন ভূমির কর বৃদ্ধি করিলে কি সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা হইবে না? অঙ্গীকৃত প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইলে কে আর ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের কথায় বিশ্বাস করিবে? প্রজার অবিশ্বাস ও তন্নিবন্ধন বিরাগভাজন হইয়া রাজত্ব করা করা বিড়ম্বনা নয়? প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহার ভঙ্গ করা যদি সভ্য গবর্ণমেণ্টের সহজ কর্ম্ম হয় তাহা হইলে সভ্য ও অসভ্য গবর্ণমেণ্টে ইতর বিশেষ কি? তবে বাঙ্গালিরা সভ্য সভ্য বলিয়া ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের এত গোঁড়ামি করেন কেন?

মেকিনলে সাহেব আত্মবাক্য সমর্থন কবিবার নিমিত্ত সর বার্ণেস পিককের বক্তৃতার কিয়দংশের তাৎপর্য্য উদ্ধার করিয়াছেন। বার্ণেস পিকক বলেন, জমিদারদিগের নিকট হইতে প্রস্তাবিত কর গ্রহণ করিলে, তাঁহাদিগের সহিত যে চির বন্দোবস্ত আছে তাহার ব্যাঘাত করা হইবে না। তাহার তিনি এই কারণ প্রদর্শন করেন, তাঁহাদিগের জমির যে খাজনা নির্দ্ধারিত আছে, তাহারও বৃদ্ধি হইবে না, তবে সে বন্দোবস্তের ব্যাঘাত সম্ভাবনা কি! পিকক সাহেব এই যে হেতুবাদ করিয়াছেন, ইহার তাৎপর্য্য বোধে আমরা অসমর্থ হইলাম। তিনি বড লোক, তাঁহার সদৃশ বড লোক না হইলে তৎকৃত হেতুবাদের বলাবল চিন্তা অন্যের সাধ্য নহে। জমির উপস্বত্বই যাঁহাদিগের আয়, সেই আয়ের অনুসারে যাঁহারা যাবতীয় সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহের নিয়ম করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট হইতে দিবেন, এ কথা পিকক সাহেবের একবারে বিবেচনা করা উচিত ছিল। দুরবগাহ বিষয়ের এক অংশ ধরিয়া মীমাংসা ক লে অপরিণামদর্শিতা প্রকাশ পায়।

কেহ কেহ বলেন গবর্ণমেণ্ট ধন প্রাণ রক্ষা করিয়া জমিদার তাহাদিগের মহোপকার সাধন করিতেছেন, জমিদারেরা তাহার কি প্রত্যুপকার করিতেছেন? একথার উত্তর দান স্থলে এইমাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইতে পারে, জমিদারেরা গবর্ণমেণ্টের প্রজা, দস্যু তস্করাদির উপদ্রব হইতে প্রজাগণকে রক্ষা করা কি রাজার ধর্ম নয়? গবর্ণমেণ্ট জমিদার-দিগের নিকট হইতে ভূমির কর গ্রহণ করিয়া কি রক্ষার বেতন গ্রহণ করিতেছেন না? এতদ্ভিন্ন রাজপুরুষদিগের কোন বিপদ উপস্থিত হইলে জমিদারকে কি সাহায্য করিতে হয় না? জমিদারেরা সসৈন্য হইয়া রণস্থলে যান না বটে, কিন্তু তাঁহাদিগকে যুদ্ধের সমুদায় হাঙ্গাম ভোগ করিতে হয়। যখন রাজ্য মধ্যে যুদ্ধের প্রসঙ্গ না থাকে, তখনও জমিদারদিগকে রাজ্যের অনেক কাজ করিতে হয়। পল্লীগ্রামে চৌকিদার নিযুক্ত করিতে হইবে, জমিদার আছেন; রাজপুরুষেরা তাঁহার নিকটে পরয়ানা পাঠাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হন; তাঁহাকে

সমুদায় ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হয়। গ্রামের বদমাহেস ধরিয়া দিতে হইবে, জমিদার আছেন, তাঁহার উপরে পরয়ানা গেল, যেরূপে পারেন অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া দিতে হইবে। এক জন জমিদারের অধিকার মধ্যে কত রকমের কত লোক থাকে সকল জমিদার কিছু সকল জানিতে পারেন না। যদি কোন জমিদারের অধিকারস্থ কোন প্রজা চৌর্য্য ক্রিয়া দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, এরূপ প্রমাণ হয়, রাজপুরুষেরা তৎক্ষণাৎ জমিদারের দণ্ড করিয়া নিষ্কৃত নাই, মাজিষ্ট্রেট সাহেব মফঃসলে গেলে জমিদারদিগকে সতত তটস্থ থাকিতে হয়, খোদাবন্দ কখন কি হুকুম করেন। জমিদারেরা ধনী বলিয়া সাহেবেরা ঈর্ষ্যা করেন। কিন্তু তাঁহাদিগের সেই ঈর্ষ্যার সম্পূর্ণ কারণ নাই। জমিদারদিগের অনেকেই নিঃস্ব, ঋণদায়ে অনেকের শয়নগৃহ পর্য্যন্ত বিক্রয় হইয়া আছে। তবে সাহেবেরা যে তাঁহাদিগের ধুমধাম দেখিতে পান, সে কেবল তাঁহাদিগের অভিমান প্রযুক্ত সম্ভ্রম রক্ষা মাত্র।

গত সোমবারের টৌনহালের সভা কেবল এতদ্দেশের লোকের অপকারের নিমিত্ত নয়, গবর্ণমেণ্টেরও মহা অনিষ্টের নিমিত্ত হইয়াছিল। ১৭৫৭ খৃঃ অব্দ অবধি গবর্ণমেণ্টকে ভারতবর্ষে অধিক সংখ্য ইউরোপীয় সৈন্য রাখিতে হইয়াছে। তাহাদিগের নিমিত্তই গবর্ণমেণ্টের অধিক ব্যয় হইতেছে। তাহাদিগের নিমিত্তই গবর্ণমেণ্ট দিন দিন ঋণজালে জড়িত হইতেছেন। তাহাদিগের নিমিত্তই গবর্ণমেণ্টের আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হইয়া পড়িয়াছে। এখন কোন রূপে সেই সৈন্য কম করা দরকার। কিন্তু উল্লিখিত সভা সকল লোকের সম্পত্তির উপরে করনিরূপণের যে পরামর্শ দিয়াছেন রাজপুরুষেরা যদি তাহার অনুসরণ করেন তাহা হইলে তাঁহাদিগকে অধিকতর ইউরোপীয় সৈন্য এদেশে আনয়ন করিতে হইবে। সম্পত্তির উপরে কর নিরূপণ করিলেই এদেশের লোকেরা বিদ্রোহানুরাগ প্রদর্শনে বিমুখ হইবেন না।

উল্লিখিত সভা পার্লিয়ামেণ্টে আবেদন করিবার সংকল্প করিয়াছেন। কিন্তু আমরা ভবিষ্যৎ বাণীর ন্যায় নির্দ্দেশ করিতেছি, তাঁহারা আবেদন করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। মেকিনলে সাহেব সেখানকার কর্ত্তা নহেন, পিকক সাহেবও নহেন। তত্রত্য কর্ত্তৃপক্ষ জমিদারদিগের আয়ের উপরে কর নিরূপণ করিয়া পুর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞার ভঙ্গ করিবেন কোন রূপেই এরূপ বোধ হইতেছে না।। তাঁহারা ইংরাজ জাতির সম্মান রক্ষণে যত্নশীল হইবেন সন্দেহ নাই। তাঁহারা সম্পত্তির উপরে কর নির্দ্ধারণ করিয়া ভারতবর্ষীয়দিগকে পুনরায় বিদ্রোহে প্রবর্ত্তিত করিতে সাহসী হইবেন এরূপও বোধ হইতেছে না।

সুসভ্য ইংরাজবংশাবতসং নীলকর শ্রীযুক্ত মরে হইতে প্রজাদিগের নির্ব্বাসন ভ্রূণহত্যা, স্ত্রীহত্যা, বালহত্যা, বলাৎকার, জালকারিতা প্রভৃতি। ২ বৈশাখ ১২৬৯

পবিদর্শক হইতে উদ্ধৃত

পাঠক মহাশয়গণ! সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়! রিফর্ম্মার সম্পাদক মহাশয়!

আপনারা অনেকানেক নীলকরের অত্যাচারের বিষয় শ্রবণ করিয়াছেন, কিন্তু এক মোকদ্দমায় এক ব্যক্তিকে কখন এতগুলি গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইতে দেখিয়াছেন? আমরা এই ঘটনাটির আনুপুর্ব্বিক বর্ণনা করিব কি, বিষাদে হস্ত অবসন্ন হইয়া আসিতেছে, দুঃখে হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, অন্তঃকরণ এক একবার সাহসকে সহায় করিয়া দ্বিগুণতর বল বৃদ্ধি করিতেছে। ঈদৃশ বিষম অবস্থায় অন্তঃকরণ স্থির রাখিয়া একপক্ষাশ্রয়িতা দোষ পরিহার করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে, তথাপি পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে অপক্ষপাতী হইয়া যতদূর জ্ঞাত আছি প্রকাশ করিতেছি।

৩।৪ দিন হইল নীলকর লার্ম্মুর সাহেবের নূতন অত্যাচারের বিষয় বর্ণন করিয়াছিলাম। অদ্য যে ঘটনার উল্লেখ করিতেছি ইহার নিকট তাদৃশ অত্যাচার অতি সামান্য। ইংরাজ জাতির মধ্যে যে এতদূর দুরাত্মা, এতদূর নির্দ্দয়, এতদূর নিষ্ঠুর আছে, তাহা আমরা পুর্ব্বে জ্ঞাত ছিলাম না। মরে সাহেব অধুনা যাদৃশ দুষ্কর্ম্ম করিতেছেন তাহাতে বোধ হয়, কি অসভ্য বাঙ্গালি, কি প্রসিদ্ধ নিষ্ঠুর মুসলমান কেহ কখন এতদ্দেশে তাদৃশ ঘৃণিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হন নাই। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়, জগৎসেট, মিরজাফরআলী প্রভৃতি এতদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোকেরা চক্রান্ত করিয়া যে অপরাধে নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া ইংরাজকে শাসনকর্ত্তা করিয়াছিলেন, এক্ষণে এই সকল নীলকর মহাপুরুষ হইতে কি তাহা অপেক্ষা দশগুণ অত্যাচার ঘটিতেছে না? কি আশ্চর্য্য! অধিকাংশ ইংরাজই কি সিংহ চর্ম্মাবৃত গর্দ্দভ, ইহারা মুখে বিশ্বহিতৈষীর ন্যায় ভাণ করেন, কার্য্যকালে বিশ্বসংহর্ত্তার ন্যায় কার্য্য করিয়াও স্বোদর পুর্ত্তি করিতে কসুর করেন না। অপক্ষপাতী ইংলিসম্যান, হরকরা ইহাদের প্রধান সহায়, আর ইহাদিগের কে কি করিতে পারে? অশিক্ষিত অসভ্য নেটিবদের কথায় কি হইবে? কেই বা তাহাদের কথায় বিশ্বাস করিবে? যাহা হউক এ বিষয়ে অধিক কিছু না বলিয়া প্রকৃত ঘটনাটী বর্ণন করিব।

অনেকেই জ্ঞাত থাকিতে পারেন মরে সাহেবের নীলকুঠি ও সুন্দরবনে আবাদ আছে। মরেলগঞ্জের কুঠিতে তাঁহার একজন ইংরেজ কর্ম্মকর্ত্তা আছেন। এই কর্ম্মকর্ত্তার নাম হিলি সাহেব, মরে সাহেবের আদেশানুসারে ২১ একুশ জন প্রজাকে সপরিবারে ধরিয়া আনিয়া কুঠির মধ্যে কয়েদ করিয়া রাখিয়াছিলেন। খুলিনীয়ার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট এই বিষয়ের এত্তেলা পাইয়া অনুসন্ধান করেন, কিন্তু হিলি প্রজাদিগকে কোথায় রাখিয়াছেন সন্ধান পাইলেন না। ফলতঃ তৎকালে প্রজাগণ কুঠিতেই অবরুদ্ধ ছিল। পরে কর্ম্মকর্ত্তা হিলি সেই সকল অসহায় প্রজাকে সুন্দরবনে লইয়া যান। এই সময় একটী গর্ভবতী রমণীর গর্ভে গুলি করিয়া প্রাণ সংহার করিলেন এবং সেই সমুদায় প্রজাকে দুই ভাগ করিয়া একভাগ অন্যদিকে পাঠাইলেন, একভাগ স্বয়ং সমভিব্যাহারে লইয়া মাতলার অভিমুখে আগমন করেন। এই সময় গরীব প্রজাগণকে যেরূপ কষ্ট দিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে পাষাণও দ্রবীভূত হয়, হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, নয়ন হইতে অনবরত অশ্রুধারা

নিপতিত হইতে থাকে। এই অবকাশে দুইটি পতিপ্রাণা রূপবতী যুবতীকে বলাৎকার করা হইয়াছিল। সেই দুইটী রমণীর একটীর কোলে একটী শিশুকন্যা ছিল। টানাটানি করিবার সময় সেই কন্যাটির প্রাণ বিয়োগ হইল। হায়! কি নির্দ্দয়তা, কি নিষ্ঠুরতা, কি অরাজকতা! ইহা কি ইউরোপীয় সভ্যজাতির রাজত্ব? মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরী কি রাজ্যশাসন করিতেছেন? হায়! এখন যদি ঈদৃশ দুরাচার ও দুষ্কর্ম্মের কথা শুনিতে পাইব, তাহা হইলে কেন সিরাজদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাহার প্রাণ সংহার করা হইল? গবর্ণমেণ্ট ইংরাজ অপরাধীকে অব্যাহতি বা লঘুদণ্ড দেওয়াতেই তাহাদিগের অত্যাচার এতদুর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া উঠিয়াছে। পুর্ব্বে সার মাউণ্ট ওয়েল্‌সের এরূপ বিশ্বাস ছিল যে ইংরাজেরা সকলেই বিশুদ্ধ-চরিত ও বাঙ্গালিরা সমুদায় দুষ্কর্ম্মের আধার। এক্ষণে তাঁহার সে সংস্কার গিয়াছে। অধুনা তিনি বুঝিয়াছেন যে বাঙ্গালির ন্যায় ইংরাজেরাও দুষ্কর্ম্মান্বিত হইয়া থাকেন। গত সোমবার সেশন খুলিলে তিনি উপস্থিত মোকদ্দমা দেখিয়া বলিয়াছেন যে ইংরাজদিগকে এতদুর দুষ্কর্ম্মে লিপ্ত দেখিয়া আমি অতিশয় দুঃখিত হইলাম। যাহা হউক সে সকল অপ্রাসঙ্গিক কথায় প্রয়োজন নাই। প্রকৃত প্রস্তাবেরই অনুসরণ করা যাউক। অনন্তর নীলকুঠীর কর্ম্মকর্ত্তা হিলি, অসহায় প্রজাগণকে মাতলার বাঁওড়ে রাখিয়া মরের নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে আসিলেন, পরে পুনর্ব্বার মাতলায় গিয়া ঐ হতভাগ্য প্রজাগণকে লইয়া বে আব বেঙ্গল দিয়া পুর্ব্বাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং বাহির সুন্দরবনে উপস্থিত হইয়া একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন। গরীব প্রজারা সেই স্থলে হিংস্র জন্তু সমাকুল অরণ্য ভ্রমণ করিতে করিতে কিয়দ্দূরে কয়েকজন মৎস্যব্যবসায়ীর কুটীর দেখিতে পাইল, এবং তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া তাহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিল। এদিকে পরম দয়ালু হিলি সাহেব জানিতে পারিলেন যে অবরুদ্ধ প্রজারা মৎস্যজীবীর আশ্রয়ে অবস্থিতি করিতেছে। তিনি অবিলম্বে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া মৎস্যজীবীদিগের জরীমানা করিয়া প্রজাগণকে পুনর্ব্বার সমভিব্যাহারে লইয়া গমন করিতে লাগিলেন। এই সময় একজনের শিরশ্ছেদন করিয়া জলে ভাসাইয়া দেন। ইতিপুর্ব্বে বলিয়াছি যে হিলি প্রজাদিগকে দুই ভাগ করিয়া আর এক ভাগ অন্যদিকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। যে সকল প্রজা অন্যদিকে প্রেরিত হইয়াছিল তাহারাও এইরূপ অশেষ যন্ত্রণাভোগ করিয়া একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে অবস্থিতি করিতেছিল। পরে দৈবগত্যাই হোক আর জ্ঞাত থাকিয়াই হউক হিলি সাহেব স্বয়ং আনীত প্রজাগণকেও সেই দ্বীপে ছাড়িয়া দিলেন। তখন দুই দল একত্র হইল। এক্ষণে বাকরগঞ্জের কয়েকজন বরকন্দাজ অনেক অনুসন্ধান করিয়া এই হতভাগ্য প্রজাদিগকে বাহির করিয়াছে। হিলি সাহেব পলায়ন করিয়াছেন। খুলিনীয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের নিকট এই মোকদ্দমা আছে। গবর্ণমেণ্টে এই বিষয়ে আনুপুর্ব্বিক রিপোর্ট হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট অনুমতি করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি হিলি সাহেব প্রভৃতি তিনজন প্রধান অত্যাচারীকে ধরিয়া বা অনুসন্ধান করিয়া

দিতে পারিবেন তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে ধরাতে দুই হাজার টাকার হিসাবে ৬,০০০ ছয় সহস্র টাকা পারিতোষিক প্রাপ্ত হইবেন। যৎকালে গবর্ণমেণ্টের এই অনুমতি প্রকাশ হয় তৎকালে হিল্লি সাহেব চিতপুরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। সম্প্রতি তিনি নাম ভাঁড়াইয়া আমেরিকার জাহাজে আরোহণপূর্ব্বক আমেরিকায় পলায়ন করিয়াছেন।

এদিকে মরে সাহেব দেখেন যে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে, প্রায় সকল কর্ম্মই প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। এখন কি করেন, কিরূপে শুদ্ধ হইয়া বসেন এইরূপ অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে জাল করিয়া হিলি সাহেবের নামে ৫০,০০০ টাকা তহবীল তছরুপাতের নালিস করিলেন। হিলি সাহেব ঘরের পঞ্চাশ হাজার টাকা তহবীল ভাঙ্গিয়া পলায়ন করিয়াছে, শুনিলেই গবর্ণমেণ্ট বিশ্বাস করিবেন যে ইনি পরম ধার্ম্মিক, এ সকল অত্যাচারের বিষয় কিছুই জানেন না। যাহা হউক এই মোকদ্দমায় যেইরূপ দণ্ডবিধান হয় পরে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

আমরা বিবেচনা করি, সাহেব হইলে কি হয়, এই গুরুতর মোকদ্দমায় কেহ অমনি নিষ্কৃতি পাইতে পারিবেন না, যেরূপ দু একটী দেখিয়াছি তাহাতে বোধ হয় প্রত্যেক ইংরাজের দশ টাকা, বড় বেশী হয় পাঁচ টাকা করিয়া জরিমানা হইবেক। এত গুরুদণ্ডে কি নীলকর সাহেবেরা শাসিত হইবে না? অবশ্যই হইবে। অযথা এখনই এত ব্যস্ত হইবার আবশ্যক কি? "ফলেন পরিচীয়তে"

এই প্রস্তাব লেখা সমাপ্তি হইলে আমরা সবিশেষ অবগত হইলাম যশোহরের মাজিষ্ট্রেট সাহেব মরে সাহেবের নিকট উক্ত সমুদায় অত্যাচারের বিষয় কৈফিয়ত তলব করিয়াছিলেন। মরে সাহেব তখন তাহা বড় একটা গ্রাহ্য করেন নাই। এখন তিনি নিতান্ত চাপাচাপী ও গোলযোগ দেখিয়া উক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত গোপনীয় পত্র লিখিয়াছেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেব উত্তর দিয়াছেন যে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বে আমি তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব না। ইহার মধ্যে তুমি আমার আবাসে আসিও না। মাজিষ্ট্রেট সাহেব এরূপ প্রত্যুত্তর দেওয়াতে আমরা তাঁহার উপর সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। এরূপ উপরোধ অনুরোধের বশবর্ত্তি ও স্বজাতি পক্ষপাতী না হওয়াতে তিনি অবশ্যই যশোভাজন হইবেন।

পরিশেষে ইংলিসম্যান সম্পাদককে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিয়া লেখনীকে বিশ্রাম দিই। তিনি প্রায় সমুদায় সংবাদই সর্ব্বাগ্রে প্রকাশ করেন। কি স্বদেশ কি বিদেশ, কি লোকালয়ে কি অরণ্যে, কি জলে কি স্থলে সর্ব্বত্রই তাঁহার সংবাদদাতা আছেন। আমরা যে দিন মনে করি যে অদ্য এই বিশেষ সংবাদটি আমরা সর্ব্বাগ্রে প্রকাশ করিলাম, সেইদিন প্রায় সেই সংবাদটী ইংলিসম্যান পত্রেও দেখিতে পাই। কলিকাতার মধ্যে অগ্রে সংবাদ সংগ্রহ বিষয়ে কেহই ইংলিসম্যানকে পরাজয় করিতে পারেন না, পরন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তিনি এই সকল সংবাদ শুনিতে পান না ইহার কারণ কি? তাঁহার সংবাদদাতারা

কি এই সকল অত্যাচার বিষয়ক সংবাদ লিখিতে জানেন না? অথবা তাঁহার কি এক চক্ষু অন্ধ, তিনি সকল দিক সমান দেখিতে পান না। কোন বাঙ্গালি যদ্যপি কোন ইংরাজের প্রতি ইহার শতাংশের একাংশও অত্যাচার করিত তাহা হইলে যে তিনি "মিউটিনি মিউটিনি" করিয়া পাগল হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার সুদীর্ঘ বক্তৃতার ছটায় স্বদেশীয় লোক বিমোহিত হইত, তাহা যে তাঁহার ৫।৭ দিনের কাগজে বাঙ্গালিদিগের উপর গালিবৃষ্টি করিয়া বড় বড় এডিটোরিয়ল প্রকাশ হইতে থাকিত। এসময় লেখনীর প্রতিভা ও সংবাদদাতাগণের সংবাদ সংগ্রহ নিপুণতা নাই কেন? কোন কবি বলিয়াছেন "সহজান্ধদৃশঃ স্বদুর্ণয়ে পরদোষেক্ষণ দিব্য চক্ষুষঃ স্বগুণোচ্চগিরে মুনিব্রজঃ পরবর্ণ গ্রহণেষ্যসাধ্বঃ।" যাঁহারা অসাধু তাঁহারা আপনাদের দুর্নীতি দর্শন করিবার সময় অন্ধ ও পরদোষ দর্শনের সময় দিব্যচক্ষু হন এবং আপনাদের গুণ বর্ণনার সময় তাঁহাদের দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা প্রকাশ হইতে থাকে। যখন তাঁহাদের পরের প্রশংসা করিবার সময় উপস্থিত হয় তখন তাঁহারা মৌনব্রত অবলম্বন করেন। ইংলিসম্যান পত্র পাঠ করিয়া নিশ্চয় প্রতীতি জন্মিতেছে যে ইংলিসম্যান সম্পাদক এই শ্লোকের অনুযায়ী কর্ম্ম করেন। যাহা হউক সম্পাদকের এরূপ না হইয়া সর্ব্বত্র সমদর্শী হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

অত্যাচার বিষয়ে এদেশীয় জমিদারেরাও বড় কম নন। ২০ শ্রাবণ ১২৬৯

সম্পাদকীয়

" বলবন্তং চিকিৎসয়েৎ।"

যে রোগ প্রবল হইয়া ওঠে অগ্রে তাহার চিকিৎসা করাইবেক।

সম্প্রতি এ দেশে ইউরোপীয়দিগের অত্যাচার অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, ইহার প্রতীকার চেষ্টাতেই সকলে ব্যস্তসমস্ত আছেন। সুতরাং আমাদিগের দেশের জমিদারদিগের পাপক্রিয়া ও অত্যাচারের প্রতি কেহ বড় দৃষ্টিপাত করিতেছেন না। উহা এক্ষণে একপ্রকার আচ্ছন্ন হইয়া আছে। মহাপ্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হইলে ক্ষুদ্র প্রদীপ তাহার নিকটে দীপ্তি পায় না। অত্রত্য অসৎ ইয়োরোপীয়দিগের অত্যাচার ক্রমে ক্রমে আর সকল অত্যাচারকে ঢাকিয়া ফেলিতেছে। কিন্তু পাঠকগণ! এরূপ অনুমান করিবেন না যে, এ দেশের পুরান পাপিরা (জমিদারেরা) সকলেই সাধুশীল হইয়াছেন।

এক ব্যক্তি বর্দ্ধমানের এক জমিদারের অত্যাচার বৃত্তান্ত লিখিয়া আমাদের নিকট পাঠাইয়াছেন। আমরা উহা যথাস্থানে প্রকাশ করিলাম। পাঠকগণ আপনারা কি মনে করিতেছেন, সমুদায় বর্দ্ধমান জিলার মধ্য হইতে এই একটীমাত্র গুণপুরুষ আবিষ্কৃত হইয়াছেন? তাহা নয়। এই রূপ অনেক গুণপুরুষ গুপ্তভাবে আছেন। দুর্ব্বল সম্বন্ধে প্রবল ব্যক্তির অত্যাচার একমুখ নয়। মধ্যে মধ্যে নানাবিধ অত্যাচার সম্বাদ আমাদিগের শ্রবণ

গোচর হইয়া থাকে। ১০ আইনে আছে, জমিদারেরা প্রজাগণকে আপন গৃহে ধরিয়া আনিয়া খাজনা আদায় করিতে পারিবেন না। কিন্তু এরূপ অনেক জমিদার আছেন, তাঁহারা এই আইনের মস্তকে পদাঘাত করিয়া প্রজাগণকে স্বগৃহে ধরিয়া আনিয়া যারপর নাই পীড়ন করিয়া থাকেন। তবে বিশেষের মধ্যে এই হইয়াছে, পূর্ব্বে জমিদারেরা সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ্যরূপেই প্রজাগণকে প্রহারাদি করিতেন, এখন আর সেটা বড করেন না।

জমিদারদিগের মধ্যে আর একটী দল হইয়াছে, তাঁহারা বড় পাকা লোক! তাঁহারা কুকার্য্য পরিপাক করিবার উদ্দেশ্যে বাহিরে বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থাপন করিয়া থাকেন। আমাদিগের প্রাচীন দলের একটী সম্প্রদায় হইতে তাঁহাদিগের এই শিক্ষাটী হইয়াছে। ঐ সম্প্রদায় গোপনে না করেন এমন কুকর্ম্ম নাই, পরদারগমন উৎকোচগ্রহণ ও কৃতঘ্নতা করিয়া পরের সর্ব্বস্ব হরণ প্রভৃতি কিছুতেই পরাঙ্মুখ নহেন। তাঁহাদিগের এই সকল কুক্রিয়া জীর্ণ করিবার মহৌষধ আছে। সে ঔষধ এই, গঙ্গাস্নান ও নামাবলী গ্রহণ।

জমিদারেরা কি চিরকাল অবিরোধিত রূপে এই রূপ অত্যাচার করিবেন? ইহার কি নিবারণের উপায় নাই? উপায় আছে। সে উপায় এই, অধ্যবসায় সহকারে রাজপুরুষদিগের অনুসন্ধান করিয়া কুক্রিয়া বাহির করিবার চেষ্টা এবং এ দেশের মধ্যম ও তৃতীয় শ্রেণীর ঐক্য। মধ্যম ও তৃতীয় শ্রেণীকে একবাক্য হইয়া জমিদারদিগের যাবতীয় দোষের বিষয় রাজপুরুষদিগের গোচর করিতে হইবে। তাঁহাদিগের সহায়তা ব্যতিরেকে রাজপুরুষেরা কখন কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। তাঁহারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া লাগিলে কৃতকার্য্যতা লাভে সমর্থ হইবেন সন্দেহ নাই। রোমীয় পেট্রিসীয়দিগের গর্ব্ব কিরূপে চূর্ণ হইয়াছিল? ফরাসী জমিদারেরা কৃষকাদির নিকটে পরাস্ত হইয়াছিলেন কেন? কৃষকাদির অধ্যবসায় ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞাই কি তাহার কারণ নহে? ইংলণ্ডের কমন্স কি গুণে লার্ডদিগের তুল্য পক্ষ হইয়াছেন? ঐ সকল দেশের তৃতীয় ও মধ্যম শ্রেণী যদি আপনাদিগের উন্নতিসাধনে সমর্থ হইলেন, এদেশের ইহারা না হইবেন কেন? এক অংশে ইহাঁদিগকে পরম সৌভাগ্যশালী বলিতে হইবে। আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট ইহাঁদিগেব সবিশেষ সহায়তা করিবেন সন্দেহ নাই।

বৃহৎ সহায়ঃ কার্য্যান্তং ক্ষোদীয়ানপি গচ্ছতি।
সম্ভূয়াম্ভোধি মভ্যেতি মহানদ্যা নগাপগা॥

প্রবল ব্যক্তি যদি ক্ষুদ্র লোকের সহায় হয়, সেই ক্ষুদ্র ব্যক্তি কার্য্যের পার পাইতে পারেন। পর্ব্বতের ক্ষুদ্র নদী মহানদী গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়া সমুদ্র গমনে সমর্থ হয়।

আমারদিগের মধ্যম ও তৃতীয় শ্রেণী এক অংশে যেমন সৌভাগ্যশালী, তেমন অপর অংশে তাঁহাদিগের কিঞ্চিৎ কাঠিন্য আছে। তাঁহাদিগকে জমিদারদিগের ন্যায় অত্যাচারকারী ইউরোপীয়দিগেরও গর্ব্ব চূর্ণ করিবার চেষ্টা পাইতে হইবে।

অদ্যাপিও এরূপ কোন নিয়ম করা হয় নাই। স্বার্থ সম্বন্ধ থাকিয়া প্রবল ও দুর্ব্বল সম্বন্ধ হইলে সচরাচর যেরূপ ঘটনা হইয়া থাকে, আসাম প্রভৃতি স্থানে মজুরদিগের সেই ঘটনা হইয়াছে। চা-করেরা তাহাদিগের উপরে যারপরনাই অত্যাচার করিতেছেন। এদেশীয় সম্বাদপত্র সকল, ঐ বিষয় কর্ত্তৃপক্ষের গোচর করেন। কর্ত্তৃপক্ষও দীর্ঘকাল বধিরবৎ ব্যবহার করেন নাই। আমাদিগের বর্ত্তমান লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বীডন সাহেব অনুসন্ধান দ্বারা সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত ও তন্নিবারণ বিষয়ে যত্নবান হইয়াছেন। বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সভ্য ইডেন সাহেবের প্রস্তাব ক্রমে গত ৮ই অগ্রহায়ণ শনিবারের সভায় আসাম, কাছাড় ও শ্রীহট্টে কুলি প্রেরণ বিষয়ক বিল প্রথমবার পঠিত হইয়া সিলেক্ট কমিটির হস্তে অর্পিত হইয়াছে। নিম্নে বিলের স্থূল মর্ম্ম সঙ্কলিত হইল।

যে চা-কর স্বয়ং মজুর লইয়া যাইবেন, তাঁহাকে নিজে অনুমতিপত্র লইতে হইবে। অনুমতিপত্র দিবার নিমিত্ত একজন তত্ত্বাবধায়ক নিয়োজিত থাকিবেন। চা-কর যদি কোন কণ্ট্রাক্টদারের নিকট হইতে কুলি লন, তাহা হইলে ঐ কণ্ট্রাক্টদারকে অনুমতিপত্র লইতে হইবে। এই অনুমতিপত্র বিনা ব্যয়ে লব্ধ হইবে না। ৫ টাকা অবধি ১৬ টাকা পর্য্যন্ত ফি দিবার নিয়ম হইয়াছে। যাঁহারা কুলি সংগ্রহ করিবেন, তাঁহাদিগকে কুলি রাখিবার একটী স্বতন্ত্র আড্ডা করিতে হইবে। ঐ আড্ডা স্বাস্থ্যকর স্থানে করিতে হইবে এবং যাহাতে কুলিদিগের শয়ন ভোজনাদির কোন কষ্ট না হয়, তদ্বিষয়ে তত্ত্বাবধায়কের সবিশেষ দৃষ্টি থাকিবে। কুলিদিগকে জাহাজে তুলিবার পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে একজন চিকিৎসক তাহাদিগের অবস্থা দর্শন করিবেন। যদি তিনি কাহাকে অসুস্থ অথবা গন্তব্য স্থানের জলবায়ু সহনে অসমর্থ বোধ করেন, তাহা হইলে তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলিবেন। গৃহে যাইতে তাহার যে ব্যয় লাগিবে কণ্ট্রাক্টদারকে তাহা দিতে হইবে। তিনি তখনই যদি সে ব্যয় দিতে না পারেন, ·চিকিৎসক নিজে টাকা দিয়া পরে তাহা আদায় করিয়া লইবেন। বিলের ৮ম ধারাতে এই প্রস্তাব হইয়াছে, অনুমতি প্রাপ্ত কণ্ট্রাক্টদার যাবতীয় জেলায় কুলি সংগ্রহ করিতে পারিবেন, কিন্তু প্রত্যেক জেলার মাজিষ্ট্রেটের নিকটে অগ্রে অনুমতি লইতে হইবে। তাঁহাদিগকে এক এক চাপরাস রাখিতে হইবে, তাহাতে তাঁহাদিগের চাপরাস ধারণের উদ্দেশ্য লিখিত থাকিবে। যদি কোন কণ্ট্রাক্টদার আপনাকে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী বলিয়া পরিচয় দেন, তাহা হইলে তাহার দণ্ড হইবে। কুলি সংগৃহীত হইলে একবার মাজিষ্ট্রেটের নিকট তাহাদিগকে লইয়া যাইতে হইবে এবং তথায় তাহাদিগের গন্তব্যস্থান, কার্য্য, বেতন প্রভৃতির বিষয় স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে। ঐ সকল শুনিয়া যাহারা অসম্মত হইবে তাহাদিগকে লইয়া যাওয়া হইবে না। তাহার পরে মাজিষ্ট্রেট কুলিদিগের রেজিষ্টর করিয়া তাহার এক নকল নিজে রাখিবেন, আর একখানি কণ্ট্রাক্টদারকে দিবেন।

পরে যাহাতে কুলিদিগের কোন কষ্ট না হয়, তাহার উপায় স্থির করা হইয়াছে।

মাজিষ্ট্রেট সংগ্রহকারীর সহিত নিজের একজন বিশ্বস্ত লোক দিবেন। আড্ডায় পৌহছিলে পর তত্বাবধায়ক প্রত্যেক কুলিকে ডাকিয়া এই কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিবেন। পথে সে কোন কষ্ট পাইয়াছে কিনা? সে নিজের গন্তব্য স্থান ও কর্ত্তব্য কার্য্য প্রভৃতির বিষয় ভালরূপে অবগত হইয়াছে কি না? তখনও যদি কেহ অসম্মত হয়, তাহাকে কণ্ট্রাক্টদারের ব্যয়ে নিজ বাটিতে পাঠাইয়া দিতে হইবে। তাহার পর চিকিৎসক সকলের অবস্থাদির পরীক্ষা করিবেন। পরীক্ষা করা হইলে প্রতিজ্ঞাপত্র প্রস্তুত করা হইবে। পাঁচ বৎসরেব অধিককালের প্রতিজ্ঞাপত্র করা হইবে না। প্রতিজ্ঞাপত্রের তাৎপর্য্য ও অর্থ কুলিদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া হইলে তাহারা এবং তত্বাবধায়ক তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন। যে নৌকা বা বাষ্পীয় জাহাজ দ্বারা কুলি প্রেরিত হইবে, তাহার মাজি ও কাপ্তেনকেও অনুমতিপত্র লইতে হইবে। কুলিরা জাহাজে উঠিবার পূর্ব্বে এক এক অনুমতিপত্র (পাস) পাইবে। তাহাদিগকে উত্তম স্থান ও উত্তম খাদ্যদ্রব্যের সংযোগ করিয়া দিতে হইবে। কুলিরা কর্ম্মস্থানে পঁহুছিবামাত্র তত্রত্য মাজিষ্ট্রেট চা-করকে সংবাদ দিবেন। চা-কর অবিলম্বে কুলিদিগকে যথাযোগ্য স্বাস্থ্যকর বাসস্থান দিবেন। যদি তিনি বিলম্ব করেন, মাজিষ্ট্রেট নিজ ব্যয়ে তাহাদিগকে বাসা দিয়া পরে চা-করের নিকটে আদায় করিয়া লইবেন।

এই বিলটী অনেক অংশে প্রশংসনীয় হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা একটী মস্তকহীন সুন্দর দেহের ন্যায় হইয়াছে। কুলিরা আসাম প্রভৃতি গন্তব্যস্থানে পদার্পণ করিবামাত্র উক্ত বিলের সহিত তাহাদিগের সম্বন্ধের শেষ হইল। কিন্তু তথায় তাহাদিগের প্রতি যে অত্যাচার ও অন্যায় ব্যবহার করা হইবে, উক্ত বিলে তন্নিবারণের কোন উপায় করা হয় নাই। এবিষয়ের নিমিত্ত একটি স্বতন্ত্র ধাবা কর্ত্তব্য। যদি মাজিষ্ট্রেট কুলিগণের আবেদন অথবা অন্য কোন উপায় দ্বারা জানিতে পারেন তাহাদিগকে নিষ্ঠুর প্রহার ও অসঙ্গত পরিশ্রম করাইয়া লওয়া হইতেছে, তাহা হইলে তিনি প্রথমে চা-করকে সতর্ক করিয়া দিবেন। তাহাতে যদি ফল না হয় তিনি কুলিদি'কে চা-করের ব্যয়ে তাহাদিগের নিজ নিজ স্থানে প্রেরণ করিবেন। এরূপ একটী নিয়ম না হইলে ইডেন সাহেবের বিল বৃথা হইবে। পথের কষ্ট ত দুইমাস মাত্র, যে স্থলে ৫ বৎসর থাকিতে হইবে, তথায় কোন কষ্ট না হয়, ব্যবস্থাপক-দিগের তদ্বিষয়ে সবিশেষ যত্নশীল হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

আর একটি বিষয় বিশুদ্ধ যুক্তি ও বার্ত্তা শাস্ত্রের নিতান্ত বিপরীত দৃষ্ট হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট বলেন, তাঁহারা স্বাধীন বাণিজ্য ও স্বাধীন পরিশ্রমের বিষয়ে হস্তার্পণ করিয়া তাহার ব্যাঘাত চেষ্টা করিবেন না, কিন্তু এক ব্যক্তিকে এক প্রকার বেতনে পাঁচ বৎসর কাল এক বিষয়ে রুদ্ধ করিয়া রাখা কি সেই স্বাধীন বাণিজ্য ও স্বাধীন পরিশ্রমের বিঘ্নকারী অসঙ্গত হস্তার্পণ নহে? নীল উৎসন্ন হইল কেন? হিল্স সাহেব প্রতি বাণ্ডিলে আট আনা দিতে চাহিয়াও কৃতকার্য্য হইলেন না কেন? পরিশ্রমের একরূপ বেতন ও বিক্রেয় দ্রব্যের এক প্রকার মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া রাখাই অন্যায়। এক্ষণে প্রতি বৎসর উত্তরোত্তর

শ্রমের মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে। দুই বৎসর পূর্ব্বে যে মজুরকে প্রত্যহ ছয় পয়সায় খাটান হইয়াছে, সে এক্ষণে প্রতিদিন চারি আনা উপার্জ্জন করিতেছে। এরূপ স্থলে মূর্খ ও নির্ব্বোধ ব্যতিরিক্ত কোন্ ব্যক্তি পাঁচ বৎসরের জন্য একবিধ বেতনে বদ্ধ থাকিতে অভিলাষী হইবে? শেষে নীলকরদিগের ন্যায় ঘটনা হইবে সন্দেহ নাই। ক্রমশঃ নিম্নশ্রেণীর লোকেরা আইন ও আদালত ও যুক্তাযুক্ত কার্য্য বুঝিতে পারিতেছে। কুলিরা যতদিন নিতান্ত মূঢ় থাকিবে, ততদিনই চা-করদিগের লাভ, কিন্তু তাহাদিগের দীর্ঘকাল বিমূঢ়তা দর্শন সম্ভাবিত নহে। সম্ভাবিত হইলেও তাহাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করা কি গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য? একজন বুদ্ধিমান মজুর দুইজন অজ্ঞ মজুরের কাজ করিতে পারে। বেতনের নিয়ম একবিধ থাকিলে আসাম প্রভৃতি স্থানে বুদ্ধিমান মজুরের গমন সম্ভাবনা কি? আমাদিগের মতে কর্ম্মস্থানে অবস্থানের কাল নিয়ম করা বিধেয় নহে এবং যে বৎসর যেরূপ বাজার হইবে, তদনুসারে মজুরদিগের বেতন নির্ণয় করা কর্ত্তব্য। এই নিয়মগুলি না হইলে উল্লিখিত প্রস্তাবিত বিলের সোত্তমাঙ্গ ও সাঙ্গ হইবার সম্ভাবনা নাই।

গাড়ি ও পালকির ভাড়া নির্ণয় প্রস্তাব

মুটিয়াদিগের ভাড়া নির্ণয় প্রস্তাব করা না হইল কেন? ৮ পৌষ ১২৬৯

যখন যে রীতি ও চলন হয়, অথবা যে বিষয়ে অধিকাংশ লোকের কার্যকারিতা ও স্বার্থসম্বন্ধ হয়, তাহা নিতান্ত অদ্ভুত অনাবশ্যক অনৈসর্গিক ও যুক্তিবিরুদ্ধ হইলেও আদৃত ও পরিগৃহীত হইয়া থাকে, তাহার দোষগুণ বিচারে প্রায়ই কাহাকে উন্মুখ দেখিতে পাওয়া যায় না। দিন কত কাল ইতস্ততঃ চতুর্দ্দিক দৃষ্ট হইতে লাগিল, ইউরোপীয়েরা টুপিতে এক গড়া জড়াইয়া বহির্গত হইতেছেন। এখন এ চলনটী অন্তর্হিত হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে শ্মশ্রু ধারণ রীতিটি দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইয়া থাকে। আমাদিগের দেশে অনুকরণপ্রবৃত্তি তাদৃশ বলবতী নয়, তথাপি এখানে অনেক নূতন রীতি প্রবেশ করিয়াছে। এখন পেণ্টুলানধারী আর উপহাসিত ও ভর্ৎসিত হয় না, পূর্ব্বে মুণ্ডিত-মুণ্ডেরা কুঞ্চিত কেশকে দেখিলে উপহাস করিতেন, কিন্তু এখন মুণ্ডিত মুণ্ডেরাই উপহসিত হইতেছেন। কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তি স্থানের ভাড়াটিয়া গাড়ি ও পাল্‌কি ভাড়া প্রস্তাবটীও এইরূপ হইয়া উঠিয়াছে। ইংলণ্ডে, আমেরিকায় ও রেঙ্গুনে গাড়ি ও পালকি ভাড়ার নিয়ম আছে বলিয়া উল্লিখিত প্রস্তাবটী কলিকাতাবাসিদিগের আপত্তিযোগ্য ও যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হইতেছে না। আমরা উহার প্রতিবাদ করিয়াছিলাম বলিয়া অনেকে আমাদিগের বিরোধী হইয়াছেন।

বাণিজ্য বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া তাহার প্রতিবন্ধকতা করা গবর্ণমেণ্টের উচিত নয় বলিয়া আমরা যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলাম, বিরোধিদিগের কেহ কেহ তাহার অখণ্ডনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা ইংলণ্ডাদি প্রদেশের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া উল্লিখিত প্রস্তাবের

আবশ্যকতা প্রতিপাদনে পরাঙ্মুখ হন নাই। ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানে যে কোন রীতি ও প্রথাদি প্রচলিত আছে, সে সমুদায়ই যে বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত এ কথা আমরা স্বীকার করি না। বিশেষতঃ একবিধ প্রথাদি সর্ব্বদেশের ও সর্ব্বকালের সমুচিত হয় না। ইংলণ্ডীয়দিগের শিক্ষা সংস্কার ও অভ্যাস স্বতন্ত্র। তত্রত্য সামান্য ব্যক্তিরাও এমনি শিক্ষিত যে তাহারা প্রায় নিয়ম ভঙ্গে প্রবৃত্ত হয় না। পক্ষান্তরে, অত্রত্য ব্যক্তিদিগের অশিক্ষা নিবন্ধন পদে পদে নিয়মভঙ্গ প্রবৃত্তি দৃষ্টিগোচর হয়। ইংলণ্ডে-কেহ কোন ব্যক্তিকে চাকর রাখিলে তাহার সহিত যে যে কাজ করিবার কথা থাকে, সে তাহার অতিরিক্ত কাজ করে না, প্রভুও তাহাকে অতিরিক্ত কাজ করিতে কহে না। কিন্তু এখানে সচরাচর ইহার বিপরীত ঘটনাই হইয়া থাকে। প্রভু ভৃত্যকে প্রায় নিয়মাতিরিক্ত কার্য্য করাইতে ছাড়ে না। সুতরাং যে ভৃত্য কিঞ্চিৎ প্রগলভ ও ন্যায়পর (তাহাকে উক্ত প্রভুরা অসৎ বলেন) হয়, তাহার সহিত বিবাদ উপস্থিত হয়। প্রক্রান্ত বিষয়েরও একটী উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

বোধকর এক ব্যক্তি কলিকাতার বহুবাজার হইতে শ্যামবাজারে যাইবেন। তিনি বহুবাজারে যখন গাড়ি ভাড়া করেন, "শ্যামবাজার যাইব" এইমাত্র বলিলেন। শকটবাহ বুঝিল, বাবু শ্যামবাজারের মোড়ে নামিবেন, কিন্তু বাবুর মনে-মনে আছে, শ্যামবাজারের অপর প্রান্তে যাইবেন। এরূপ স্থলে যদি গাড়য়ান শ্যামবাজারের প্রবেশ মুখে উপস্থিত হইয়া গাড়ি থামায়, তাহা হইলেই বাবুর সহিত লাঠালাঠি উপস্থিত। এতদিন কেবল হুড় ঝগড়া করিয়া গাড়য়ানেরা নিষ্কৃতি পাইত, কিন্তু এক্ষণে নিয়ম হইতেছে, এখন গরীব বেচারাদিগকে এই অপরাধে দণ্ড দিতে হইবে। যখন শকটবাহ ও আরোহির এইরূপ দশা হইল তখন উল্লিখিত প্রস্তাব বিধিবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে প্রস্তাবকারিদিগের কর্ত্তব্য এই যে তাঁহারা কলিকাতার সর্ব্বস্থানে মাইল চিহ্ন স্থাপন করেন এবং আরোহী ও শকটবাহকদিগকে কিছুদিন নিয়ম পালনের শিক্ষা দেন।

যাঁহারা আমাদিগের মতবিরোধী হইয়া প্রক্রান্ত বিষয়ে লেখনী গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদিগের কোন কোন ব্যক্তির একটী চমৎকার দেখিলাম, উক্ত প্রস্তাব বিধিবদ্ধ হইলে আমরা যে অত্যাচার ঘটনার আশঙ্কা করিয়াছিলাম, বিরোধিরা প্রথম ক্ষণে তাহা সমূলক বলিয়া স্বীকার করেন নাই, কিন্তু উল্লিখিত প্রস্তাবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া পরক্ষণেই আপনারা সেই সেই অত্যাচারের আশঙ্কা করিয়াছেন। যাহা হউক এস্থলে আমরা বিরোধিদিগের নিকটে একটী প্রশ্ন করিতেছি, তাঁহারা উত্তর দান করিয়া কৃতার্থ করিবেন। বোধকর, শ্রাবণ মাসের একদিন বারিধর অবিচ্ছিন্ন ধারায় ঘোরতর বর্ষণ করিতেছে, পূর্ব্বদিগের বায়ু প্রবল বেগে বহিতেছে, তুমি ভিজিবার ভয়ে স্থূলতর বস্ত্রদ্বারা গাত্র আচ্ছাদিত করিয়া কথঞ্চিৎ এক শকটবাহের আড্ডায় উপস্থিত হইয়া কহিলে "আমি সমস্ত দিনের ভাড়া ৩ টাকা দিব, তোমাকে গাড়ি লইয়া অমুক অমুক স্থানে যাইতে হইবে"। ঘোড়ার আচ্ছাদন বস্ত্র দূরে থাকুক, গাড়য়ানের নিজের একমাত্র ছিন্ন সূক্ষ্মবসন সম্বল। সে আপনি মারা

পড়িবার ও ঘোড়া মরিয়া যাইবার ভয়ে যাইতে অস্বীকার করিল, তুমি তাহার পঞ্চাশ টাকা জরিমানা করাইলে। এটী কি অত্যাচার নয়? বর্জ্জনবিধি দ্বারাও ইহার নিবারণ সম্ভাবিত নহে। কত বর্জ্জন বিধি করিবে? যত বিধি বাহুল্য হইবে ততই কষ্ট বৃদ্ধি হইবে, ইহা সিদ্ধান্ত-বাক্য। পরিশেষে আর একটী প্রশ্ন করিয়া এ প্রস্তাবের উপসংহার করা যাইতেছে। কতকগুলি লোকের সুবিধার জন্য গাড়ি ও পাল্‌কির ভাড়া নির্ণয় করা যদি যুক্তিসিদ্ধ হইল, মুটিয়াদিগের ভাড়া নির্ণয় করা না হইতেছে কেন? গাড়ি ও পাল্‌কিবাহদিগের অপেক্ষা মুটিয়াদিগের সহিত অধিকসংখ্য লোকের সম্পর্ক হয়। উহাদিগের ভাড়া নির্ণিত হইলে অধিক লোকের সুবিধা হইবে। ফলত যুক্তি উভয় পক্ষেই সমান রহিতেছে। গাড়য়ান ও বেহারাদিগের অপেক্ষা মুটিয়ারা অধিক ভদ্রও নহে। এই প্রস্তাব লিখন সাঙ্গ ও সীসময় অক্ষর পংক্তিতে বিন্যাসিত হইলে পর বাইষত ফ্রেণ্ড পত্র আমাদিগের হস্তগত হইল। আমরা গাড়ি ও পালকিভাড়া সংক্রান্ত প্রস্তাবের শিরোভাগ দেখিয়া উৎসুক চিত্তে অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিতে আরম্ভ করিলাম, দেখিয়া হৃষ্ট হইলাম সম্পাদক সাধারণ ভ্রমে পতিত হন নাই, তিনি আমাদিগের ন্যায় উল্লিখিত প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়াছেন।

সম্ভূয়-সমুত্থান। ২২ পৌষ ১২৬৯

সম্পাদকীয়

সম্ভূয় সমুত্থান যে উন্নতির একটী প্রধান সাধন, গতবারে তাহা এক প্রকার প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। পাঠকগণ যদি ইহার মূল যুক্তির অনুসরণ করিয়া অনুধাবন করিয়া দেখেন, ইহার উপযোগিতা সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে সন্দেহ নাই। সমাজের যত শ্রীবৃদ্ধি হয়, ততই মানুষের অভিলষিত বিষয়ের অসঙ্গতির অনুভব এবং অপ্রাপ্ত বিষয়ের লাভ চেষ্টা ও প্রয়োজন বৃদ্ধি হইতে থাকে। পাঁচজনে একত্র হইয়া বিশাল মূলধন সংগ্রহ পূর্ব্বক যদি রেলওয়ের কার্য্যে প্রবৃত্ত না হইতেন, আমরা কি ইউরোপ, আমেরিকা ও ভারতবর্ষকে রেলওয়ের দ্বারা আচ্ছন্ন দেখিতে পাইতাম? সর্ব্বত্র রেলওয়ে হওয়াতে পৃথিবী যেন রূপান্তর সাধন করিয়াছেন, সর্ব্বত্র সজীবতা লক্ষিত হইতেছে, সর্ব্বত্র সভ্যতা বৃদ্ধি হইতেছে, সর্ব্বত্র লোক শ্রমশীল ও কার্য্যদক্ষ হইয়া উপার্জ্জনপটু হইতেছে, সর্ব্বত্র বাণিজ্য কার্য্যের উন্নতি ও তন্মূলক কৃষ্যাদি কার্য্যের সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। এ সকল কি সংগৃহীত বিশাল মূলধন ও সমবায়িক চেষ্টার ফল নহে? ইংলণ্ডীয়েরা বৃহৎ মূলধন বিনিয়োগ করিয়া ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থানে রেলওয়ে নির্ম্মাণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, বহু পরিমাণে তৎকার্য্য সম্পন্ন হইয়াও আসিয়াছে। আমাদিগের দেশের লোকের এবিষয়ে অল্পমাত্র সম্পর্ক আছে। অল্পমাত্র লোকে তত্তৎ রেলওয়ের অংশ ক্রয় করিয়াছেন। ইহাঁদিগের কি এখন এ সম্পর্কে যাইবার আর উপায় নাই? ইহাঁরা এক এক সম্প্রদায় করিয়া মূলধন সংগ্রহ পূর্ব্বক শাখা

রেলওয়ের নির্ম্মাণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন। শাখা রেলওয়ের অনেক আবশ্যকতা আছে। বিদেশীয় লোকেরা যে তৎসমুদায় সম্পন্ন করিয়া তুলিবেন, তাহার সম্ভাবনা নাই। রেলওয়ে কি লাভকর বাণিজ্য নহে? গবর্ণমেণ্ট কাগজের সুদের মুখ চাহিয়া থাকা অপেক্ষা এতদ্বিষয়ে প্রবৃত্তি বিধান সহস্রগুণে শ্রেয়স্কর সন্দেহ নাই। অপেক্ষাকৃত অধিক অর্থলাভ হইবে এইমাত্র কেবল ইহার ফল এরূপ নয়, রেলওয়ে দ্বারা যে যে উপকার লাভের সম্ভাবনা আছে, যে যে গ্রামের নিকট দিয়া সেই শাখা যাইবে, নিঃসংশয় সেই সেই গ্রামের সেই সেই উপকার লাভ হইবে। আমাদিগের দেশের লোকেরা এবম্বিধ মহোপকারক বিষয়ে প্রবৃত্তি না করিয়া আজিও উদাসীন রহিয়াছেন কেন? সম্ভূয় সমুত্থান বার্ত্তাশাস্ত্রের একটী প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। এতদ্দ্বারা জগতের অশেষবিধ কল্যাণ লাভ হইয়া থাকে।

আমাদিগের দেশের লোকেরা যে আজিও এবম্বিধ মহোপকারক বিষয়ে উদাসীন ও অননুরক্ত রহিয়াছেন অনেকে ইহার কারণানুসন্ধানে কৌতুকাবিষ্ট হইবেন সন্দেহ নাই। কেহ কেহ এই কারণ নির্দ্দেশ করেন যে ইঁহাদিগের ধর্ম্মনীতি বিষয়ে দৃঢ়তা নাই, চরিত্রগত দোষ থাকাতে কেহ কাহাকে বিশ্বাস করেন না, বিশ্বস্ত লোক পাওয়াও দুরূহ। কিন্তু এ কারণ আমাদিগের অনুমোদিত নহে। যদি কেহ কাহাকে বিশ্বাস না করিতেন, এতদিন ভারতবর্ষে কখন ব্যবসায় চলিত না! এদেশে একটী প্রসিদ্ধ কথাই আছে, ক্ষুদ্র ব্যবসায়িদিগের যিনি যা প্রতারণা করুন, মহাজনেরা কখন পয়সার চতুর্থাংশও প্রবঞ্চনা করিয়া লন না। বিশেষতঃ ইদানীন্তন কৃতবিদ্যদলের মধ্যে অনেক বিশ্বস্ত লোক পাওয়া যায়।

আমাদিগের অনুমোদিত কারণ এই, এদেশীয়েরা সাধারণ হিতকর কার্য্যের ন্যায় সম্ভূয় সমুত্থানের মর্ম্মজ্ঞ নহেন। তন্মর্ম্মজ্ঞ না হওয়াতেই তাঁহারা তৎকার্য্যে ভীরু ও অবিশ্বস্তের ন্যায় দৃষ্ট হন। ইহার গুণ যদি তাঁহাদিগের হৃদয়ঙ্গম হইত, তাঁহারা কখন পরাঙ্মুখ হইতেন না।

নীলপ্রধান প্রদেশ। ৯ চৈত্র ১২৭০। ১৯ সংখ্যা

এই প্রদেশে পুনরায় বিরোধ বহ্নি প্রজ্জলিত হইয়াছে। শুনিতে পাই যেরূপ প্রতিকুল বায়ু বহিতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে যে ইহা শীঘ্র নির্ব্বাণ হয় এরূপ বোধ হয় না, প্রত্যুত ইহার ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা. আমাদিগের যে এক পত্রপ্রেরক এতৎসংক্রান্ত একখানি পত্র প্রেরণ করিয়াছেন তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল। বুঝি ১৮৫৯ অব্দ আবার উপস্থিত হয়! পত্র এই :

মহাশয়! পুনর্ব্বার নদীয়া জেলায় স্থানে স্থানে প্রজায় ও নীলকরে গোলযোগ উঠিয়াছে। বলপুর্ব্বক প্রজাদিগকে নীলবপন করিয়া লওয়াই এই দ্বন্দ্বের কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। এই উপলক্ষে রামনগর, কুমরি প্রভৃতি স্থানে একটী সামান্যরূপ দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে।

কুঠির কর্ম্মচারীরা রামনগরের কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির যৎপরোনাস্তি অপমান ও তত্রত্য সমুদায় প্রজাকে জোর করিয়া নীল বুনাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া ঐ নিদারুণ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। তাহাতে কুঠির আমীন হত ও দেওয়ান আহত হইয়াছে। প্রজাদিগের পক্ষেও ঐরূপ কার্য্য হইতে ত্রুটি হয় নাই। আমীন যেরূপ প্রাণ হারাইয়াছেন, তাহা শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। নীল বপনের কথা লইয়া প্রজাদিগের সহিত তাঁহার বাককলহ হয়, পরে ঐ বিবাদ ক্রমে বর্দ্ধিত হইলে নীলদর্পণ নাটকের অভিনয়ের রীত্যনুসারে তিনি তাহা-দিগকে প্রহার করিতে আরম্ভ করেন। তাহারাও তৎক্ষণাৎ তাহার উত্তর দিয়াছিল। তিনি উত্তর উপস্থিত দেখিয়া পলায়ন পূর্ব্বক আত্মরক্ষা করি ভাবিয়া পলাইতে আরম্ভ করিলেন এবং কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই তাহাদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলেন, কিন্তু পথিমধ্যে তাঁহার এরূপ পিপাসা হইয়াছিল যে, স্বয়ং ব্রাহ্মণ হইয়াও এক মুসলমান বাটীতে জল প্রার্থনা করিতে হইল। কিন্তু মুসলমানের জলপান দ্বারা তাহার জাতিভ্রংশ হইবে ভাবিয়া তত্রস্থ নিকটবর্ত্তী কর্ম্মকা.রর বাটী হইতে তাহাকে জল অনাইয়া দিল, জল খাইবা মাত্র তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। যে যে প্রজা এই দাঙ্গায় লিপ্ত ছিল, তাহারা পুলিষ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া বিচারার্থ প্রেরিত হইয়াছে। আমি বলিতে পারি, বিচারে নীলকরেরাই জয়ী হইবে। যাহার অর্থ তাহার জয়। ভজনঘাটের নীলকুঠির দেওয়ান্‌জি মহাশয়ও ৩০ জন সড়কীওয়ালা চাহিয়া বসিয়াছেন। ভয় প্রদর্শন করিয়া অথবা বলপুর্ব্বক নীলবপন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়। এই সময়ে গবর্ণমেণ্ট ইহার প্রতিবিধানের চেষ্টা করুন। নতুবা ইহার দ্বারা পরিণামে বিষম অনর্থ উৎপন্ন হইবে।”

যে ক্ষতের পুয ও ক্লেদ নির্গত না করিয়া ঔষধ দ্বারা কেবল উপরিভাগ শুষ্ক করা হয় তাহা দীর্ঘকাল অবিকৃত অবস্থায় থাকে না। উহা অন্তরে পচিয়া ক্রমে অতিশয় অপকারকারক হইয়া উঠে। প্রজার সহিত নীলকরদিগের বিবাদের অবস্থাও তদনুরূপ হইয়াছে। বিবাদের প্রকৃত কারণের উন্মূলন করা হয় নাই। প্রজার সহিত নীলকর-দিগের মিলন করিয়া দেওয়াও হয় নাই। অতএব ঐ বিবাদ যে পুনরুত্থিত হইবে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ইদানীন্তন রাজপুরুষদিগের এই বিবাদ শান্তির চেষ্টা নাই। প্রত্যুত কোন কোন রাজপুরুষের নীলকর পক্ষপাতিতা প্রবহমান বায়ুর ন্যায় ঐ বিবাদ বহ্নিকে উদ্দীপিত করিয়া তুলিতেছে, কণ্ট্রাক্টবিল প্রভৃতি অনিষ্টকর কয়েকটি বিষয় পুনঃ পুনঃ বিধিবদ্ধ করিবার চেষ্টা দ্বারাই সেই পক্ষপাতিতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। জনরব যদি বিশ্বাসযোগ্য হয়, অপক্ষপাতী বিচারকর্ত্তারা নীলপ্রধান প্রদেশে তিষ্টিতে পারিতেছেন না। তাঁহাদিগকে স্থানান্তরে বদলী করা হইতেছে, আর নীলকর পক্ষপাতী বিচারকর্ত্তারা নীলপ্রধান প্রদেশে আনীত হইতেছেন। অনেক ছোট আদালতের বিচারকর্ত্তার বিচার দেখিয়া অনেকে অনুমান করেন মফস্বলে ছোট আদালতের সৃষ্টি প্রজার অনিষ্ট ও নীল-করের ইষ্টের নিমিত্তই হইয়াছে। যাহা হউক, বীডন সাহেব এই সময়ে সসজ্জ হউন,

চতুর ও কার্য্যদক্ষ বলিয়া তিনি যে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন দেখিবেন যেন নীলপ্রধান প্রদেশের বিবাদ মহাপঙ্কে তাহা নিমগ্ন না হয়।

নীলপ্রধান প্রদেশ। ১৬ চৈত্র ১২৭০। ২০ সংখ্যা

আমরা গতবারে এতৎ প্রদেশ সংক্রান্ত একখানি প্রেরিত পত্র প্রকাশ করিয়াছিলাম, এবারেও আবার আর একখানি হস্তগত হইয়াছে। আমরা ইহাও এই স্থলেই গ্রহণ করিলাম।

সম্পাদক মহাশয়। এক্ষণে নীলসংক্রান্ত কোন সম্বাদ সোমপ্রকাশে প্রায় উদিত দেখা যায় না। আর উদয় হইয়াই বা কি হইবে? চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী। গ্রাণ্ট মহাশয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহার জ্যোতিঃ সাত সমুদ্র পারে গিয়াছে। এক্ষণে বিলক্ষণ চতুরতা চলিয়াছে। গৌর ভজাই এক্ষণকার উদ্দেশ্য। যিনি চতুরতা করিতেছেন, তিনি ভাবেন তাঁহার কৌশল কেহ বুঝিতে পারে না, সে তাঁহার ভ্রান্তি। বাঙ্গালিরা দুর্ব্বল এবং ভীরু স্বভাব বটে, কিন্তু বুদ্ধিতে বড় দুর্ব্বল এবং অপ্রবেশও নহে। তবে তাঁহার সুকৌশল বুঝিতাম, যদি তাঁহার ধূর্ত্ততা লোকে বুঝিতে না পারিত। ঝিনিদহ, মাগুরা, কুমারখালি, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া হেডকোয়াটরে ব্যূহরচনা হইয়াছে। প্রদেশ মধ্যে সামাল সামাল পড়িয়াছে, কে কোথায় যাইবে ভাবিয়া অস্থির, কমাণ্ডরইন্‌চিফের ভয়ে পাদরিরা আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি করেন না। কলিকাতার বাবুরা আর ও কথায় কথা কহেন না। আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, নীলবুনান করিতে ও নীলের দাদন হইতে প্রজারা অস্বীকার, এই অপরাধে কালস্বরূপ ছোট আদালত সৃষ্টি হইয়া চুক্তিভঙ্গের দশ গুণ বিশ গুণ ডিক্রি দিয়া প্রজার সর্ব্বস্ব নীলকরকে দেওয়ান হইল। উচিত বিচার হইলে প্রজারা বিপদে পতিত হইত না। বাঙ্গালী জজদিগের উচিত বিচারের চেষ্টা ছিল, কিন্তু বাবু কাশীশ্বর মিত্র ও বাবু নবীন কৃষ্ণ পালিত উচিত বিচারের প্রতিফল ভোগ করাতে কর্ত্তার ভয়ে ধর্ম্মভয় কাজেই ত্যাগ করিতে হইয়াছে।

সাহেব মাজিষ্ট্রেটদিগের করালগ্রাসে পতিত প্রজাগণের জাতি, মান, প্রাণ, ধন, সকলই গেল, নদীয়া জেলা সদ্বিচারের অহঙ্কারের প্রধান স্থল ছিল, হরশেলষ্টারের বংশ দ্বীপান্তরে উদিত হওয়াতে অসদ্বিচারের অগ্রস্থল হইয়াছে। তদ্বিস্তারিত বৃত্তান্ত লিখিয়া এক চাষা এক কারাবাসিকে যে পত্র পাঠাইয়াছিল, জাহাজে উঠিবার সময় প্রিন্সিপ ঘাটে তাহা পড়িয়া গিয়াছিল, প্রাতঃস্নায়ী হরিদাস তাহা পাইয়া আনিয়া দিয়াছে, তাহার অবিকল প্রতিলিপি নিম্নে প্রকটিত হইল।

"আল্লা! আমরা গেলাম! নীলঅওলারা আবার তেমনি হলো! মেজেষ্টরেরা একেবারে আগুন হয়েছে! গাঁয়ের ৩৯ জনকে ফাটকে হাজতে দিয়াছে, বলে খাতা কর,

খালাষ পাবি, তাই হয়েছে। লস্করেরা খাতা করে খালাষ পেয়েছে, টাকা কড়ি দেয় নি। এ মেজেষ্টরের আগে যে মেজেষ্টর ছিল, সে দেশ ডুবিয়ে গিয়েছে। এ মেজেষ্টর পথম পথম বেশ ছিল, তিন দিন ভাল ছিল, তারপর ৪ দিনের দিন নীলঅওলারা কুঠিতে নিয়ে কি খাওয়ালে আর কি কল্লে ৫ দিনের দিন সেই নয়, এজলাসে বসিয়া দে ফাটক দে ফাটক বই কথা নেই। বাড়ী শুদ্ধই ফাটক! গাঁয়ে মানুষ নেই! রাখাল কিরশান যে আছে ধরিয়া ধরিয়া লইয়া খাতা করাচ্ছে, গেরোস্তের বাড়ীর মধ্যে আমিনতাগিদদার ও লাঠিয়াল পড়িয়া জানানা লোকদের ঘিরিয়া নেঙটো হয়ে কবি গাচ্ছে। গাঁর পুরুষ মানুষ সব ফাটকে, জানানা অবলা লোকের বদহাল করিতেছে। হোরমত বিশ্বাস একজন মাতব্বর লোক, দিনির বেলা তার বাটী লুটিয়া টাকাকড়ি মালামাল তেজারতের খত খাতা সব লুটে নিয়েছে। সে ফাটকে; তার ১২।১৩ বছরের নাবালক ভাইকে ধরে নিয়ে গিয়ে খাতা দিয়াছে। হারাণ বিশ্বাসের মাতাকে লাঠির বাড়ি মেরেছে, চন্দ্র মণ্ডলকে এসে ফাটকে দেয়, সে আজ আট দশ দিন ফাটকে মরেছে। এই মেজেষ্টব তার ভাই ও ছেলেকে সেদিন ফাটকে দিয়াছে। তার বাটীর মদ্দ আমীন খালাসী ও লাঠিওয়ালা পড়িয়া কবি গাইয়া মণ্ডলের বিবিকে বলে খাতা কর গিয়া! সে এমনি মানি মানুষ ছিল, তার বাড়ির তেসীমানায় পাকী উড়ে যেতে পারত না, হা খোদা! তোব মনে এই ছিল! এই রকম কত করছে। থানার দারোগা ১০০ টাকা ফুরণ করিয়া নিয়েছে সকল গাঁর নীল বুনিয়ে দেবে, মেজেষ্টরের নিকট দরখাস্ত করিলে লা মঞ্জুব সারা বছর না খেয়ে মজুরি করে জমিগুলি চাষ করিয়া রাখিয়াছি আশমান পানি দিলিই ধান বুনবো তাবে বালবাচ্চা সমেত খেয়ে জান বাঁচাবো। তাই নীলবুনে নেবে, চুক্তি ভঙ্গ বলে সকল বেচে কিনে নিল, জমায় তিন চার গুণ বেশী করলো, খোদারবান্দা ফাটকে মলো। আরো কত মরে তার ঠেকনা কি? আয়েন্দা ভাত পানির দফা যায়। আল্লা এমন করে মারিস ক্যান? তুই তো সকলই পারিস। একদিন কেন সব রাইয়ত গুষ্টি সমেত মেরে ফেলে সাহেবগারে সব দে না। আর তো বরদাস্ত হয় না। দোহাই আল্লা। এই দরখাস্ত করছি তুই আমাগারে মেরে ফেল।"

আবদুল মতলেব মণ্ডল।

নীলপ্রধান প্রদেশ । ১৪ বৈশাখ ১২৭১ । ২৪ সংখ্যা

সম্পাদকীয়

এই প্রদেশের নামটি আমাদিগের শ্রবণপথে প্রবিষ্ট হইলে অন্তঃকরণে যুগপৎ শোক, ক্ষোভ, বিস্ময় ও ঘৃণার উদয় হয়। শোক জন্মিবার কারণ এই যে সকল প্রজা দয়ার পাত্র, নীলকরেরা সভ্যজাতীয় ও সভ্যাভিমানী হইয়াও তাঁহাদিগের প্রতি পীড়ন

করিতেছেন। আমরা সর্ব্বদাই কৃষকদিগের অবস্থা দর্শন করিতেছি, তাহাদিগের স্বভাব ও কার্য্য দেখিতেছি, তাহারা অপরাধী হইলেও তাহাদিগের প্রতি কোনক্রমে পীড়ন প্রবৃত্তি জন্মে না। উপস্থাপিত স্থলে তাহাদিগের এই নীলচাষে লাভ হয় না বলিয়া তাহারা দাদন লইতে চায় না, কিন্তু নীলকরেরা নৃশংস হইয়া তাহাদিগের প্রতি পীড়ন করিতেছে, ইহাই আমাদিগের বিস্ময় ও ঘৃণার কারণ। ক্ষোভের বিষয় এই, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট অলোক-সামান্য প্রতাপবলে এই বৃহৎ সাম্রাজ্যকে হস্তামলকের ন্যায় মুষ্টিমধ্যে রাখিয়াছেন, সেই গবর্ণমেণ্ট একটী সামান্য প্রদেশকে সুস্থির করিয়া রাখিতে পারিতেছেন না।

নীলপ্রধান প্রদেশে পুনরায় যে গোলযোগ আরম্ভ হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। সোমপ্রকাশে কয়েকবারের প্রকাশিত পত্রই তাহা সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। নীল কমিসন বহুতর অর্থব্যয় ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া নীলব্যবসায়ে প্রণালীগত দোষ প্রদর্শন ও অত্যাচার নিবারণের যে উপায় করিয়া দেন এবং যে উপায় অবলম্বন করিয়া সর জন গ্রাণ্ট সাহেব প্রজাদিগের কষ্ট নিবারণে সমর্থ হন, এখন সে সমুদয় বিফল হইয়া যাইতেছে। নীলকরগণ চারিদিক হইতে পূর্ব্ববৎ অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছেন। পুনরায় বলপূর্ব্বক চষা ভূমিতে নীল বুনানি দাদন গছাইয়া দেওয়া ও খতে স্বাক্ষর করাইয়া লওয়া হইতেছে, নীল কুঠীর খালাসী ও আমীন প্রভৃতি পুনরায় বাটী লুঠ ও স্ত্রীলোকদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে। ফলতঃ নীলপ্রধান প্রদেশে বিষম বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে।

আমরা বিশ্বস্ত লোকমুখে শুনিলাম নীলপ্রধান প্রদেশের প্রজাগণের নিগূঢ় প্রতিজ্ঞা এই তাহাদিগের যত কেন বিপৎপাত হউক না, নীলকরেরা যত কেন অরাজক কাণ্ড করুক না, তথাপি তাহারা নীল বপন করিবে না। কিন্তু কার্য্যকালে তাহাদিগের এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইতেছে না। নীলকরদিগের কৌশলের নিকটে তাহাদিগের প্রতিজ্ঞা পরাভূত হইতেছে। সম্প্রতি আমরা পাবনা হইতে যে একখানি পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা এই স্থানে প্রকাশ করা গেল, পাঠকগণ তৎপাঠে অবশিষ্ট বিষয় জানিতে পারিবেন। পত্র এই :

"পাবনা জেলায় ২৭টী নীলকুঠী আছে। তন্মধ্যে দুইটী বন্ধ রহিয়াছে, অবশিষ্ট ২৫টীর কার্য্য চলিতেছে! কৃষিকার্য্য দ্বারা প্রজা ও মহাজন উভয়েরই লাভ হইবার সম্ভাবনা আছে বটে, কিন্তু নীলকরদিগের অনেকের ন্যায়পরতার অভাবে ও অনবধানতা দোষে নীলচাষ এককালে বিপরীত মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। অনেক প্রজার হাল, গরু, গৃহ, পরিবার, অবশেষে প্রাণ লইয়া টানাটানি পড়িয়াছে। কোন কোন নীলকর স্ব স্ব উদ্ভাবনী শক্তি প্রভাবে অদ্ভুত কৌশলজাল বিস্তার করিয়া গ্রামের প্রধান ও ধনবান প্রজাদিগকে কুঠীর কাজকর্ম্ম দিয়া বশীভূত করাতে তাহারা দুর্ব্বল প্রজাদিগকে আনিয়া নীল যজ্ঞে উৎসর্গ করিয়া দিতেছে। যে স্থানের মণ্ডলেরা ঐ রূপ প্রলোভনে ভুলিতেছেন,

সেই স্থানেই দাঙ্গা ও তদানুষঙ্গিক অত্যাচার ঘটনা হইতেছে। এতন্নিবন্ধনই খাদমপুর ও অন্য অন্য গ্রামের অনেক প্রজা দেশত্যাগ করিয়া গিয়াছে।

নিজ পাবনাতে নীলসংক্রান্ত মকদ্দমা অধিক নাই বটে, কিন্তু জেলার অন্তর্গত সিরাজগঞ্জ ও কুমারখালীতে রীতিমত নম্বর জারির ক্রটি হইতেছে না, জারডিনস্কিনার, বেরি ও উ. পি. বিল্সন, ইঁহারা এ জেলার প্রধান নীলকর বলিয়া বিখ্যাত। এই স্থানে একটি কথার উল্লেখ করা আবশ্যক। নীলকরেরা প্রায় অশিক্ষিত ও অভদ্র লোকদিগকে গোমস্তা ও আমীন প্রভৃতির পদে নিযুক্ত করেন। ঐ সকল কর্ম্মচারী স্বার্থসাধনার্থ প্রজার প্রতি অধিকতর অত্যাচার করিয়া থাকে। এরূপ স্থলে নীলকরের নিজের তত দূর অত্যাচার করিবার ইচ্ছা না থাকিলেও কাজে কাজেই উহা দাঁড়াইয়া যায়।

উপরে যে কারণ প্রদর্শিত হইল, এই কারণে অনেকের এই এক সংস্কার জন্মিয়া গিয়াছে, নীলকরেরা ভদ্র ও নিরীহ, এদেশীয় কর্ম্মচারিরাই কেবল অভদ্র ও অত্যাচারী। সাধারণ্যে এ সংস্কার অবশ্যই ভ্রমাত্মক বলিতে হইবে। কর্ত্তার যদি ন্যায়পরতা বলবতী থাকে ও অত্যাচার করিবার ইচ্ছা না হয়, অধীনস্থ কর্ম্মচারিরা প্রভুর অসম্মতি ও অনিচ্ছাতে কতদিন দৌরাত্ম্য করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারে? প্রজাদিগের সকলে লালমুখের নিকটে গমন করিতে সাহসী না হউক, অপেক্ষাকৃত সাহসী ব্যক্তিরা তাঁহাদিগকে পীড়নবৃত্তান্ত জানাইতে পারে সন্দেহ নাই। কর্ত্তা যদি ভদ্র হন, তিনি কি প্রজার ক্রন্দনে কর্ণপাত করেন না? যাহা হউক, আমি বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা জানিলাম, অত্যাচার না করিলে কোনক্রমে নীলচাষ হইবার সম্ভাবনা নাই। জোড়াসাঁকো নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরই ইহার একটী প্রধান প্রমাণ। বিনা অত্যাচারে নীল হয় না বলিয়া তিনি কুঠী পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মুখে শুনিলাম, তিনি কর্ম্মচারিগণকে বিশেষরূপে সাবধান করিয়াও অত্যাচারের নিবারণে সমর্থ হন নাই। সুতরাং কুঠী বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। ভদ্র নীলকরেরা এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবেন সন্দেহ নাই। আমি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, বিচারকর্ত্তাদিগের নীলকর-পক্ষপাতিতার বিষয় সর্ব্বদা সমাচারপত্রে প্রকাশিত হওয়াতে অনেক ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের বিচার অপক্ষপাতের দিকেই ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। বিচারপতিগণ কর্ত্তব্য পালন করেন, ইহা সকলেরই প্রার্থনীয়। তাঁহারা এতদিন এতদ্বিষয়ে যেরূপ উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া বিপরীত আচরণ করিয়াছেন, তাহা কেবল তাঁহাদিগের বিচারকার্য্যের কলঙ্ক নয়, তাঁহারা যখন লোকের অত্যাচারের শাস্তি করিতে পারিলেন না, তখন তাঁহাদিগকে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে সন্দেহ নাই।

পরিশেষে পরশুরামের নিঃক্ষত্রিয় করিবার প্রতিজ্ঞার ন্যায় একটী নীলকরী প্রতিজ্ঞা পাঠকগণের গোচর করা যাইতেছে। একজন বিখ্যাত নীলকর সাহেব প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তিনি যেরূপে পারেন প্রজাদিগকে উৎসন্ন না দিয়া ক্ষ্যান্ত হইবেন না!

নীলপ্রধান প্রদেশ। ২১ বৈশাখ ১২৭১। ২৫ সংখ্যা

সম্পাদকীয়

নীল চাষ লইয়া কৃষ্ণনগরের অন্তঃপাতী বাঘাডাঙ্গায় যে দাঙ্গা হয়, তৎসমাচার পাঠকগণ পূর্ব্বেই শুনিয়াছেন. নদীয়ার মাজিষ্ট্রেট ই. গ্রে সাহেব তাহার অনুসন্ধান করিয়া যে রিপোর্ট করিয়াছেন, অদ্য তাহা পাঠকগণের গোচর করা যাইতেছে। নীলপ্রধান প্রদেশে বিবাদবহ্নি জলনোন্মুখ হইবামাত্র আমাদিগের পত্র প্রেরকেরা তদবধি যে যে কথা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, এই রিপোর্ট মধ্যে তাহার অনেকগুলি উল্লিখিত হইয়াছে, এতদ্দ্বারা তাঁহাদিগের বাক্য সমধিক সমর্থিত হইল সন্দেহ নাই। সে রিপোর্ট এই ঃ—

মাজিষ্ট্রেট লিখিয়াছেন 'আমি বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে বাঘাডাঙ্গার কুঠীর দাঙ্গার বিষয়ের অনুসন্ধানার্থ মফঃস্বলে গমন করিয়াছিলাম। কুঠীর কুলী মদনকে পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া যে জনরব উঠিয়াছে, আমি প্রথমেই তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। সে ব্যক্তি যে জীবিত আছে, আমি তাহার প্রমাণ পাইযাছি, বিস্তারিত বিবরণ পশ্চাৎ লিখিয়া পাঠাইব।

নীলকুঠীর প্রতি প্রজাদিগের নূতন অভক্তি জন্মিল কেন, আমি ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, যে কারণে নীল কমিশন বসিয়াছিল, যে কারণে নীলের মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছিল, পুনরায় সেই কারণের আবির্ভাব হইয়াছে। নীলকরদিগের অনেকে টাকায় ছয় বাণ্ডিল নীল লইবার চেষ্টা পাইতেছেন, কিন্তু কমিসনেরা ৪ বাণ্ডিল ধার্য্য করিয়া দিয়াছিলেন।

বাঙ্গালা দেশের ভূতপূর্ব্ব লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর এতৎসংক্রান্ত যে এক মিনিট লিখেন, তাহাতে আছে, "প্রজারা যদি টাকায় ছয় বাণ্ডিল নীল দেয়, তাহা হইলে প্রতি বিঘায় গড়ে সাত টাকা করিয়া ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।" এরূপ অবস্থায়ও এক্ষণে যখন ঐ নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইতে চলিল, তখন বলপ্রকাশ ব্যতিরেকে নীলচাষ হইবার সম্ভাবনা কি? সেই বল-প্রকাশের উপায়ও ১৮৫৯ অব্দের ১০ আইনের ১৩ ধারায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ছয় খাতা গ্রহণ কর না হয় ঐ আইনের ঐ ধারা অনুসারে নোটিস জারি করিয়া খাজনা বৃদ্ধি করা যাইবে। মূলনাথের কুঠীর প্রায় বার আনা প্রজা নূতন নিয়ম অনুসারে টাকায় ছয় বাণ্ডিল করিয়া দিবে বলিয়া দশ বৎসরের নিমিত্ত এগ্রিমেণ্ট লিখিয়া দিয়াছে। তাহারা এই বিবেচনা করিয়া ইহাতে প্রবৃত্ত হইয়াছে যে, একবার কর বৃদ্ধি করিলে চিরকাল উহা বহন করিতে হইবে, এবং চিরকালই নীলকরদিগের ইচ্ছা অনুসারে বৃদ্ধি হইতে পারিবে। দ্বিতীয়, কর বৃদ্ধির মকদ্দমা উপস্থিত হইলে বৃথা ব্যয় হইবে, অথচ কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা অল্প। আমি মূলনাথ ও কাটগড়ায় অবস্থা দর্শন করিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, কোন প্রজাই প্রায় সন্তুষ্টচিত্তে নীল চাষ করিতে সম্মত নহে। অনেক প্রজা কুঠীয়ালদিগের অত্যাচারে পীড়িত

হইয়া বিচারালয়ে অভিযোগ করিয়াছে। এক্ষণে বাঘাডাঙ্গার কুঠী এবং রামনগর ও কুমারী গ্রামের দাঙ্গার বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে।

২৫ শে ফেব্রুয়ারি কুঠীর দেওয়ান, আমীন কয়েক জন কুলী এবং কুঠীর লাঠিয়াল ভৃত্য সমভিব্যাহারে নদীর পশ্চিম তীরস্থ ভূমি চষাইতে আরম্ভ করিয়া যখন কুমারীর ভূমি চষিতে যান, তখন অত্রত্য লোকেরা কুলীদিগকে প্রহার করে। দেওয়ান ও অন্য অন্য ব্যক্তিও প্রহারলাভে বঞ্চিত হন নাই। আমীন রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্লীহাবৃদ্ধিরূপ পীড়া থাকাতে ঐ প্রহারেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। রামনগরের প্রজারা আজিও তাহাদিগের গ্রামে নীল চাষ করিবার প্রতিবন্ধকতা করিতেছে।

কুঠীর দেওয়ানকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন "আমি স্বয়ং আমীন, খালাসী কুলী ও দুইজন পেয়াদা, সর্ব্বশুদ্ধ ২০।২৫ জন লোক লইয়া নিজাবাদের ভূমি চষাইতে গিয়াছিলাম। ঐ ভূমি এই সময়ে না বুনিলে জলে ডুবিয়া যায়।" দেওয়ান নিজে কি নিমিত্ত তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, ইহা স্পষ্ট বুঝা গেল না। ইহাতেই প্রজারা সন্দেহ করে, কেবল নির্ব্বিরোধী নিজাবাদের ভূমি চষিবার নিমিত্ত আড়ম্বর হয় নাই, আর কিছু নিগূঢ় অভিসন্ধি আছে। বাস্তবিক এ সন্দেহ অমূলক নয়, আমি অনুসন্ধান দ্বারা জানিলাম, যে স্থানে বিবাদ উপস্থিত হয়, কুলী ও পেয়াদারা সেই স্থানেই গমন করিয়াছিল। গ্রামের লোকেরা "কাহার জমিতে হাল চষিতেছিস্?" বলিয়া তথায় উপস্থিত হয় এবং কুলীদিগকে প্রহাব আরম্ভ করে। অবশেষে তাহারা তিন জন কুলীকে ধরিয়া পুলিসে লইয়া যায়! দেওয়ানজী প্রভৃতি সে বাটীতে বসিয়াছিলেন সেই বাটীর সম্মুখ দিয়াই পুলিসে যাইবার পথ। ঐ স্থানে কুঠীয়াল প্রজা একত্রিত হওয়াতে প্রকৃত দাঙ্গা উপস্থিত হয় এই স্থানেই আমীনের মৃত্যু হইয়াছে। রাইয়তেরা দেওয়ানের উপর বৈরনির্য্যাতনার্থ তদন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া ঐ স্থানে গিয়াছিল, কি বারবার পুলিসে যাইবার নিমিত্তই যাইতেছিল, তাহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে বুঝা গেল না।

কুঠীয়ালেরা বলিল, তাহারা সে স্থানে কুলী ভেজাইয়াছিল, ঐখানে প্রতিবৎসরই নীল হয়। আমি ঐ স্থানের কিয়দংশ ভূমি পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, নীলগাছের গোড়া দেখিতে পাওয়া গেল, কিন্তু তাহার অব্যবহিত দক্ষিণাংশে আর কোন চিহ্ন লক্ষিত হইল না। প্রজারা বলিল, যে স্থানে নীলের গোড়া দেখা গিয়াছে, ঐ স্থানে কুমারী গ্রামের অন্তর্গত, রামনগর নহে। ঐ ভূমি নীলকুঠীর আমীন মৃত রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধিকৃত। রামমোহন ও তাহার ভ্রাতা বিষ্ণু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমি ব্যতিরেকে এ গ্রামের আর কোন স্থানে তিন বৎসর নীলচাষ হয় নাই। বন্দ্যোপাধ্যায়-দিগের ভূমিতে গত বৎসরমাত্র চাষ হয়। যাহা হউক, কুঠীর লোকেরা তাহাদিগের সীমা অতিক্রম করিয়া সে প্রজার ভূমি চষিয়াছে, তাহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে। কুঠীর গত বৎসরের জরিপী কাগজ দেখা গেল, তাহাতেও সকল ভূমির সীমা নির্দ্ধারণ করা নাই।

সত্য বটে, অপরাধিরা ধৃত হইয়া বিচারাধীনে রহিয়াছে, কিন্তু তাহারা দাঙ্গায় বিষয় সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিয়া বলে, ভূমি সম্বন্ধে কোন বিবাদই উপস্থিত হয় নাই। রামনগরের প্রজারা প্রথমে কোন কথা প্রকাশ করে নাই। তাহারা এই উপস্থিত ঘটনার অব্যবহিত পরেই আমাকে তদারকে যাইতে দেখিয়া এই আশঙ্কা করিয়াছিল, তাহারা যদি বিবাদের কথা কিছু মাত্র ব্যক্ত করে তাহাদিগকে নরহত্যা অপরাধে দণ্ডনীয় হইতে হইবে। বিশেষতঃ রামনগর ও কুমারীর প্রজারা অপরাধিদিগের আত্মীয় ও কুটুম্ব তাহাদিগের বাক্যে বিশ্বাস হওয়া ভার। আমি অনেক পরিশ্রম ও চেষ্টা করিয়াও তাহাদিগকে প্রকৃত কথা ব্যক্ত করাইতে পারি নাই। অবশেষে রামনগর, কুমারী ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামে সকলে দুই বার গমন করিয়া সবিশেষ, বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি। কুঠীর অধ্যক্ষ সাহেব স্বয়ং আমাকে কহিলেন। তিনি রামনগর ও কুমারীর প্রজাদিগকে নীল চাষ করাইবার নিমিত্ত ব্যতিব্যস্ত আছেন। ইহাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। এতদ্দ্বারা বোধ হইতেছে, কুঠীর কর্ম্মচারিরা এরূপ অনুমন্দশীল নয়, তাহারা কর্ত্তার এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রতি ঔদাসীন্য করিবে।

আমি বিশেষরূপে জানিলাম, মূলনাথের কারখানাতেই অধিকতর অত্যাচার হইতেছে। এই স্থান হইতেই ১৮৫৯ অব্দের ১০ আইনের ১৩ ধারা ফলবতী হইতে আরম্ভ হইয়াছে। অন্য অন্য কুঠীর কর্ত্তারাও ক্রমে ক্রমে এই কুঠীর অনুসরণ করিতেছে।

নীলকরদিগের নামে চারিদিক হইতে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অত্যাচারের নালিশ উপস্থিত হইতেছে। ঐ সকল মকদ্দমার সমুদায়ই যে মিথ্যা; ইহা কখনই বলা যাইতে পারে না। আমি ঐ সকলের সত্যাসত্য জানিবার নিমিত্ত বনগ্রাম সবডিবিজনের বিচারপতি মকদ্দমার নথী তলব করিলাম। অবশেষে প্রজাদিগকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, "যখন, তাহারা কোন প্রকারে প্রপীড়িত হইবে তখনই যেন তাহারা বিচারালয়ের আশ্রয় গ্রহণ করে। বিচারালয়ের দ্বার সর্ব্বদাই উদ্ঘাটিত আছে।"

সে ক্ষণে নীল প্রধান প্রদেশে বিবাদবহ্নি পুনরায় প্রধূমিত হইতে আরম্ভ হয়, সেই অবধি আমরা বিডন সাহেবকে সতর্ক করিতে আরম্ভ করি, তিনি তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া দারজিলিঙের শীতল সমীরণ সেবন করিতে গেলেন। কিন্তু এখানে যেরূপ প্রবল জ্বালা সহকারে বহ্নি জ্বলিয়া উঠিতেছে, ইহার শিখা উড্ডীন হইয়া স্বল্পকাল মধ্যে সেই বায়ুকে উত্তপ্ত করিয়া তুলিবে। এখন কি তাঁহার সুস্থির হইয়া দারজিলিঙে বাস করিবার সময়? সেকালের হিন্দু রাজাদিগের এই সংস্কার ছিল, প্রজার অকাল মৃত্যু হইলে তাঁহারা মনে করিতেন, রাজার অপরাধ ব্যতিরেকে কখন প্রজার অকাল মৃত্যু হয় না। এ সংস্কার উপধর্ম্ম দূষিত বটে, কিন্তু ইহা নিরর্থক নহে। রাজার দোষ ব্যতিরেকে কি প্রজার মানুষী আপদ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে? ১৮৫৭ অব্দের বিদ্রোহ ঘটিবার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত কর্ত্তৃপক্ষ সুস্থিরচিত্ত ছিলেন।

প্রজারা নীল বপন করিতে চাহিতেছে না, নীলকরেরা জোর করিয়া তাহাদিগকে সেই কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিবেন। ইহাকে কি অত্যাচার কহে না? যে গবর্ণমেণ্ট শাসিত প্রদেশ মধ্যে এই অত্যাচারের নিবারণে সমর্থ হইতেছেন না, সেই গবর্ণমেণ্ট কোন্ মুখে অত্যাচার নিবারণ ছল করিয়া অন্যের রাজ্য গ্রহণ করিতে যান? আর কোন্ মুখেই বা জয়কীর্ত্তনকারী সমাচার পত্র সম্পাদকেরা তদ্বিষয়ে উৎসাহ দান করেন? হয় নীলকর, না হয় প্রজা অত্যাচারের উন্মূলন না হইলে নীলপ্রদেশ সুস্থির হইবার সম্ভাবনা নাই। বরাবর যে রীতিতে নীলবপন করা নীলকরদিগের অভ্যাস হইয়া আসিয়াছে, যতদিন সে রীতি পরিত্যক্ত না হইতেছে, ততদিন বিবাদের শান্তি হইবার সম্ভাবনা অল্প। নীলকরেরাই বা কেন এইরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন এবং প্রজাদিগকে উৎসন্ন দিতেছেন? তাঁহারা নীল বিক্রয়ের মূল্য বৃদ্ধি করুন এবং প্রজাদিগকে পীড়ন না করিয়া তাহাদিগকে স্বাধীনতা ও এই অনুমতি প্রদান করুন যে, তাহারা আপন আপন ইচ্ছামত আপন আপন ক্ষেত্রে নীল উৎপাদন করুক, নীলকরেরা অধিক মূল্য দিয়া তাহা ক্রয় করিবেন। লাভ হইলে প্রজারা আপনা হইতেই তাহাতে প্রবৃত্ত হইবে। লাভের তুল্য উৎসাহদাতা ও কর্ম্মে প্রবর্ত্তনকারী আর নাই।

ল্যাণ্ডহোলডার্স সভা ও বিডন সাহেব। ১ আষাঢ় ১২৭১। ৩১ সংখ্যা

এতদিনের পর বীডন সাহেব নীলপ্রধান প্রদেশ সম্বন্ধে নয়ন উন্মীলন করিয়াছেন, সম্প্রতি বাঘাডাঙ্গার দাঙ্গা ঘটিত কয়েকখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সভাকে এই অনুরোধ করিয়াছেন যে সভা যত্নবতী হইয়া নীল-ঘটিত বিবাদের শান্তি করিয়া দেন। বীডন সাহেব ইহার পূর্ব্বে নদীয়ার কমিসনরকেও এক পত্র লিখিয়া তিনটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন প্রথম প্রশ্ন, নীলকরেরা যে সে ব্যক্তিকে কর বৃদ্ধির সংবাদ দিতেছেন, ইহা সঙ্গত কিনা? দ্বিতীয়, তাঁহাদিগের নীল ও ভূমির কর সংক্রান্ত হিসাব পৃথক না রাখাতে যে অনিষ্ট ঘটিতেছে তন্নিবারণের উপায় কি? তৃতীয়, কৃষকদিগের প্রদত্ত করের যুক্তিসঙ্গত হিসাব করিয়া সেই কর চিরস্থায়ী করা উচিত কিনা? কমিসনর রেবেনিউ বোর্ডের দ্বারা এবিষয়ের রিপোর্ট পাঠাইবেন। বীডন সাহেব বলেন বাঘাডাঙ্গার প্রজারা নীলকুঠির দেওয়ান ও মজুরদিগকে আক্রমণ করিয়া অতি গর্হিত কার্য্য করিয়াছে। কিন্তু তিনি পক্ষান্তরে স্বীকার করিয়াছেন নীলকরেরা কয়েক বৎসর টাকায় চারি বাণ্ডিল নীল লইতেন, হিল সাহেব কিছু দিন দুই বাণ্ডিল লন এক্ষণে সামান্যতঃ ছয় বাণ্ডিল লওয়া ভাল হইতেছে না। তিনি আরো বলেন, কর বৃদ্ধি হইলে প্রজাদিগকে আপাততঃ ঘর হইতে টাকা দিতে হয়, নীল বপনে তাহা করিতে হয় না, এবং তাহাদিগের এই আশা থাকে যে ভবিষ্যতে কোনরূপে ইহা

হইতে উদ্ধার হইতে পারিবে। কিন্তু তাহাদিগের মনে এই একটী সংস্কার থাকে যে তাহাদিগকে অল্পতর মূল্যে ভয় প্রযুক্ত নীলবপন করিতে হইতেছে। এই অনিষ্টকর সংস্কার বদ্ধমূল হইলে তাহারা কখন নীলবপন ও নীলকরদিগকে সস্নেহ দৃষ্টিতে দর্শন করিবে না। অপর স্থলে এই বলা হইয়াছে ভূম্যধিকারী ও তাঁহার ভৃত্যগণের প্রজাদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করা অতি কর্ত্তব্য। তাঁহারা দয়া, সহিষ্ণুতা ও ভৃত্যগণের চরিত্রের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া কৃষকদিগের সুখ বর্দ্ধন…(?)

এ স্থলে আমাদের বক্তব্য এই, সভা ঐ ১৭৯৩ অব্দের ১ আইনের ৮ ধারাটী খুলিয়া দেখিবেন, তাহাতে কি লর্ড করণওয়ালিস স্পষ্টাভিধানে বলেন নাই যে যখন তখন গবর্ণমেণ্ট কৃষকদিগের রক্ষার্থ আইন পরিবর্ত্ত ও নূতন আইন করিতে পারিবেন? ১০ আইন কি সেই ক্ষমতার ফল নহে? ব্যবস্থাপক সভা যদি এখন প্রজাদিগের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেন, তাহা হইলে কি সেই জমিদারেরা এক্ষণে যে প্রকার ব্যবহার করিতেছেন, তাঁহারা বিনা ব্যয়ে বিনা পরিশ্রমে অধিকতর কর পাইতেছেন। মধ্যে মধ্যে আরো তাহার বৃদ্ধি চেষ্টা করিতেছেন, অত্রত্য প্রজাদিগের এককালে নির্দ্দিষ্টরীতিতে কর ধার্য্য করা কোন্ ব্যক্তি অন্যায় বলিবেন? আমরা বারম্বার বলিয়া আসিতেছি প্রজাদিগের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না হইলে কখন সফল হইবে না। পরিশেষে বীডন সাহেবের প্রতি আমাদিগের অনুরোধ এই, তিনি শ্রীবৃদ্ধিকারিদলের অলীক প্রশংসালাভ লোভ পরিত্যাগ করিয়া আত্মকৃত প্রস্তাবাদানুরূপ কার্য্য করিয়া স্বকর্ত্তব্য সাধনে তৎপর হউন। তাহা হইলে কেবল যে তাঁহার পদোচিত গৌরব রক্ষা হইবে এরূপ নহে, বঙ্গদেশের যথার্থ উপকার করা হইবে। কৃষকেরাই বঙ্গদেশের জীবনভূত। এতদিন তাঁহার ঔদাসীন্য দোষে তাহারা অনর্থক কষ্ট পাইয়াছে।

এ প্রস্তাবের উপসংহারকালে আমরা লাণ্ডহোলডার্স সভার অভদ্রতা ও ধৃষ্টতার উল্লেখ না করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিলাম না। তাহাদিগের পত্র পাঠ করিলে বোধহয় তাহারা যেন গর্ব্বিত বাক্যে গবর্ণমেণ্টকে সকল বিষয়ে আজ্ঞা দিতেছেন। ভারতবর্ষীয় অভিপ্রায় জানিবার চেষ্টা করাতে শ্রীবৃদ্ধিকারিদল খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাদিগের আজ্ঞা বাক্যও দূষিত নহে, কারণ ইহারা যে এদেশের শ্রীবৃদ্ধিকারী!! সভা গবর্ণমেণ্টকে এই আজ্ঞা করিয়াছেন "গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিদিগকে বলা হইক, তাঁহারা জমিদারদিগের সহায়তা করিয়া তাঁহাদিগের স্বত্ব রক্ষা করুন্। তাঁহারা যে কোনরূপে প্রজাদিগকে সাহস ও আশা না দেন ইত্যাদি।" সভা কি মনে করিয়াছেন, বল ও ভয় প্রদর্শন দ্বারা কার্য্য সাধন করিয়া লইবেন? যদি এরূপ মনে করিয়া থাকেন, নিতান্ত ভ্রমে পড়িয়াছেন। বল প্রকাশের কাল অতীত হইয়াছে।

বঙ্গদেশীয় প্রজাগণের এত দুরবস্থা কেন? ১৪ ভাদ্র ১২৭০। ৪২ সংখ্যা

১৮৪১ সালের ১২ আইন, ১৮৪৫ সালের ১ আইন ও ১৮৫৯ সালের ১১ আইন

এই দুরবস্থার অন্যতর প্রধান কারণ। এ প্রকার অসঙ্গত বিধি বিধান করিয়া কৃষকদিগের বল হ্রাস করা কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত কার্য্য হয় নাই। প্রত্যুত এতদ্দ্বারা নিতান্ত অদূরদর্শিতা ও স্বার্থপরতার পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে। কারণ পূর্ব্বতন জমিদারগণের কৃত নিয়ম অন্যথা না হইলে পাছে নীলামের সময় মূল্য অল্প হইয়া গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য রাজস্বের বিঘ্ন হয়, এই উদ্দেশ্যেই এই আইনগুলি করা হইয়াছে। ন্যায়পথগামী হইয়া স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই আশঙ্কা অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীয়মান হইবে সন্দেহ নাই। সে সকল প্রদেশে লার্ড কর্ণওয়ালিসের কৃত দশসালা বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তথায় এরূপ ভয়ের কোন কারণ দেখা যায় না বিশেষতঃ শেষোক্ত আইনের বিধানানুসারে পত্তনির পাট্টা প্রভৃতি রেজিষ্টারি করা হইলে নীলামের দ্বারা তাহার অন্যথা হইবার সম্ভাবনা নাই, তবে দবিদ্র জোতদারদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাট্টা (যাহা স্থির থাকিলে রাজস্বের কিছুই ক্ষতি বৃদ্ধি সম্ভবে না) বাতিল হয় কেন ? ইহা কি রাজার অদূবদর্শিতা, স্বার্থপরতা ও রাজনিয়মের অনভিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিতেছে না ? ইহাকেই পিটরেব অপহরণ কবিয়া পালকে দেওয়া বলে। যদি বল, পত্তনিদার প্রভৃতি পণ দিয়া পত্তনি লইয়াছে, তাহাদিগের পাট্টা বাতিল কবিতে হইলে অন্যায় হয়, এ স্থলে সহজেই এই প্রশ্ন উত্থিত হয়, প্রজারা মকরাবি বা মেয়াদী পাট্টা গ্রহণ করিবার সময় জমিদারকে নজর ও সেলামী বলিয়া কি প্রচুর অর্থ দেয় না ? একথা কে না মুক্তকণ্ঠে স্বীকাব করিবেন যে, সহায়হীন, নিরক্ষর, অনভিজ্ঞ, নিবীহ, কৃষিজীবী প্রজা এক বিঘা পরিমিত ভূমির পাট্টা লইবার ব্যয়েব সহিত গড করিলে প্রজার দত্ত অর্থ কি অধিক বলিয়া পরিগণিত হয় না ? যদি তাহা হয়, তবে রাজনিয়ম তাহাদিগের সাহায্য দানে কৃপণতা করেন কেন ? অপর জমিদারেরা নিজ পাট্টায় স্বাক্ষর করেন না। এই একটী অনর্থকারিণী রীতি প্রচলিত থাকাতে প্রজাগণের অনল্প ক্ষতি হইতেছে। কায্যকালে সচরাচর তাঁহারা বলিয়া থাকেন, নায়েব বা গোমস্তাকে পাট্টা দিবার ক্ষমতা দেন নাই। এরূপ স্থলে তাহা প্রমাণ করা প্রজার পক্ষে অতিশয় কঠিন হইয়া পড়ে। আত্মাকে বিপদ হইতে রক্ষা করা সম্পত্তি অর্জ্জনের ফল, কিন্তু কৃষকদিগের মকরারি বা মেয়াদি পাট্টা হস্তান্তর করণের নিয়ম না থাকাতে তাহাদিগের সম্বন্ধে সম্পত্তি অর্জ্জনেব মুখ্য উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে না। রাজনিয়ম দ্বারাও ইহা স্থিরীকৃত হইয়া রহিযাছে প্রজার প্রাপ্ত পাট্টা কি তাহার স্বত্ব সূচক দলীল নহে ? সে যদি সেই পাট্টা বন্ধক রাখিয়া অথবা হস্তান্তর করিয়া বিপদকালে উদ্ধার হইতে না পারিল এবং রাজ নিয়ম যদি তদ্বিষয়ে সহকারী না হইল, তাহাদিগের ইষ্ট পথ কি একপ্রকারে রুদ্ধ করা হইল না ?

এইরূপই এক শতাব্দী গত হইলে পর কর্ত্তৃপক্ষ নয়ন উন্মীলন করিয়া কৃষকদিগের উপরে কিঞ্চিৎ কৃপা দৃষ্টি করিলেন, তাহাতেই ১৮৫৯ সালের ১০ আইন বিধিবদ্ধ হইল। ঐ আইনের ৪।১৫।১৫ এবং ১৬ ধারায় অপেক্ষাকৃত জোতস্বত্ব রক্ষার উপায় করা হইল।

কিন্তু বিচার প্রণালীর দোষে প্রজার পর্য্যন্ত জোতদারিনিবন্ধন কিছু উপকারলাভ হইয়াছে, এরূপ বোধ হইতেছে না কারণ জোতস্বত্বের প্রমাণার্থ জমিদারের প্রদত্ত দাখিলা ভিন্ন প্রজাদিগের অন্য কোন দলীল নাই। ঐ দলীলে জমির চৌহদ্দী পরিমাণে অথবা প্রকার ভেদ লিখিত না থাকাতে প্রমাণ স্থলে আদালত তাহা মূল বলিয়া গ্রাহ্য করা দূরে থাকুক অন্তর্গত দলীল বলিয়াও গণ্য করেন না। পক্ষান্তরে, জমিদার অনায়াসে এই বলিয়া জোত ছাড়াইয়া লইতে পারেন। প্রজা যে দাখিলা দাখিল করিয়াছে, উহা বিরোধী ভূমির নহে। অতএব ১০ আইনের ঐ সকল ধারায় জোতস্বত্বের যেরূপ উপায় করা হইয়াছে। সেইরূপ জমাজমি ও বৎসরের সীমা স্বরূপ ও মিয়াদ নিরূপণ করিয়া দাখলা দিবার রীতি প্রবর্ত্তিত করিয়া দিলে যথার্থ উপকার দর্শিত। ফলতঃ নীলপ্রধান প্রদেশে এই জোতস্বত্ব লইয়া যেরূপ বিবাদের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, তাহা দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হইতেছে, জোতস্বত্ব রক্ষার যেরূপ উপায় করা আবশ্যক, ঐ আইনে সে উৎকৃষ্ট উপায় করা হয় নাই। নিয়োগ প্রণালীরও বিলক্ষণ দোষ আছে। জমিদারীর হস্তান্তর হইবার রীতি প্রজার সর্ব্বনাশের আর একটী প্রধান কারণ। ইহার মধ্যে যে কত অত্যাচার, প্রজাপীড়ন গুপ্তভাবে আছে, তাহা বর্ণন করা দুঃসাধ্য। প্রথমতঃ জ্যেষ্ঠাধিকারের রীতি এদেশে প্রচলিত না থাকাতে বৃহদায়তন জমিদারী অচিরকাল-মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া যায়, তন্মূলক প্রজার সুখ দুঃখ সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। বোধ কবি, কোন ন্যায় পথাবলম্বী ধার্ম্মিক জমিদারের অধীনে জোতদারগণ জোতদারী কবিয়া সুখে কালযাপন করিতেছে, এমন কোন দুর্ব্বৃত্ত অত্যাচারী উত্তরাধিকারী হইল, সে অনায়াসে এককালে প্রজাগণের সুখ সচ্ছন্দ বিলুপ্ত করিয়া দিতে পারে। তৃতীয়তঃ ১৮১৯ সালের ৮ আইনের বিধান মতে পত্তনি দিবার যেরূপ বন্দোবস্ত আছে, তাহা প্রজাগণের অধিকতর অনিষ্টের কারণ। সুচতুর জমিদারগণ স্বীয় অধিকারস্থ জমিদারী জরীপ ও নিরিখ ধার্য্য করিয়া পত্তনি দিবার ঘোষণা করিয়া দেন, নালামের ডাকের ন্যায় উহার ডাক বাড়িতে থাকে যে ব্যক্তি অধিক পণও জমা দিতে সম্মত হয়, তাহার সহিত পত্তনি বন্দোবস্ত হইয়া থাকে। পত্তনিদার মহলে উপস্থিত হইয়া খাজনা আদায় করিবার পূর্ব্বে এই কথা প্রচার করিয়া দেয় যে যে প্রজা টাকার সিকি বৃদ্ধি স্বীকার না করিবে তাহার সহিত বন্দোবস্ত হইবে না। এই নিমিত্তই প্রজার ভূমিতে জমিদারের জরীপের রজ্জুপাতকে হৃদয়শলা জ্ঞান করে। তাহাও রাজনিয়মের দোষ। এক শতাব্দীকাল মধ্যে রাজপুরুষেরা নূতন নূতন আইনের এত সৃষ্টি করিয়াছেন যে, তাহার সংখ্যা করা দুরূহ, কিন্তু এ পর্য্যন্ত ভূমি জরীপের সাধারণ একটী নিয়ম বিধিবদ্ধ হইল না! ভূম্যধিকারিগণের যদৃচ্ছা ক্রমে ঐ গুরুতর কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছে। কোন স্থানে বা শিকলের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ভূমি মাপিবার রসি স্থির না থাকাতে সচরাচর, দেখিতে পাওয়া যায়, পত্তনিদারের লোকেরা ১৮ কোঠায় বিঘা হয়; এমত রসি লইয়া মাপ আরম্ভ করে, এবং ১০ বিঘার বন্দকে জরীপ মুখে ১২ বিঘা করিয়া

তুলে, তখন প্রজারা মাঞ্চেষ্টরের মজুরদিগের ন্যায় নিতান্ত নিরুপায় হইয়া পত্তনিদারের দুরাকাঙ্খা পূর্ণ করিতে বাধ্য হয়। এই প্রকার দর পত্তনিদার, ছেপত্তনিদার, ইজারদার, ছেইজারদারের হস্তে নিত্য নূতন যন্ত্রণাভোগ করিতে হয় ইহাতে কি প্রজাদিগের সুখ সৌভাগ্যের প্রত্যাশা আছে ?

বঙ্গদেশীয় প্রজাগণের এত দুরবস্থা কেন ? ৪ আশ্বিন ১২৭১। ৪৫ সংখ্যা

যে দেশে ইংরাজজাতি এত দীর্ঘকাল একাধিপত্য করিতেছেন, তথায় ভূমিব প্রকৃত কর এ পর্য্যন্ত ধার্য্য হইল না। ইহা কি কৃষিজীবি প্রজাগণের সামান্য আক্ষেপের বিষয়। রেবিনিউ ইতিবৃত্ত নাই বলিয়া কর্তৃপক্ষ ব্যস্ত হইয়া রাশি রাশি অর্থব্যয় পূর্ব্বক সরবিয়ারি কার্য্য সমাধা করাইলেন। তৎকালে সুযোগ সত্ত্বেও প্রকৃত নিরিখের নির্ণয় করা হইল না। শীঘ্র হইবে এরূপ কোন লক্ষণও লক্ষিত হইতেছে না। সম্প্রতি ঈশ্বর ঘোষ ও হিল সজ্ঘটিত নিরিখের যে মকদ্দমার হাইকোর্টে নিষ্পত্তি হইয়াছে, তাহা কি রাজনিয়মের সদোষতা সপ্রমাণ করিতেছে না ? তদ্দ্বারা কি জোতদার প্রজাগণকে দৈনিক মজুরের স্থলভিষিক্ত করা হয় নাই ? যখন ভূমির প্রকৃত অধিকারী জোতদারকে রাজনিয়মে মজুর করিয়া তুলিল, তখন তাহাদিগকে হতভাগা ভিন্ন আব কি বলা যাইতে পাবে ? ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ১৭ ধারার বিধান হইয়াছে, প্রজাব পরিশ্রম ও সাহায্য ব্যতিরেকে যে ভূমির মুল্য বৃদ্ধি হইবে, তাহার কর বৃদ্ধি হইতে পারিবেক, কিন্তু প্রজার সহায্য ও ব্যয়ব্যতীত জমিদারের সাহায্য ও ব্যয়ে ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি বর্দ্ধিত হইতেছে, বঙ্গদেশে এরূপ ভূমির বা জমিদার নাই বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। ১৮১২ সালের ৫ আইনের পবগণার প্রচলিত নিরিখ অনুসারে ভূমির কর ধার্য্য হইবার ব্যবস্থা ছিল তদ্দ্বারা যে কত প্রজা এককালে উৎসন্ন হইয়াছিল, তাহা গণনা করিয়া শেষ করা যায় না। গ্রামসমষ্টির নাম এক পরগণা, ঐ পরগণার মধ্যে উত্তম মধ্যম অধম এই ত্রিবিধ ভূমি আছে। তদনুসারে নিরিখ স্থির করিতে গেলে, ভিন্ন ভিন্ন প্রকার নিরিখ হওয়াই সঙ্গত হয়। কিন্তু তাহা না হইয়া এক পরগণার অন্তঃপাতী ভূমি বলিয়া একবিধ নিরিখ অনুসারে একাল পর্য্যন্ত করধার্য্য হইয়া আসিতেছে। ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ১৭ ধারা দ্বারা উহার প্রতীকার করা হইয়াছে, বটে, কিন্তু ব্যবস্থাপকদিগের কিঞ্চিৎ বিবেচনায় ক্রটিতে উহা সম্যক ফলোপধায়ী হয় নাই। ঐ ধারায় আছে, পার্শ্বস্থ ভূমির নিরিখ অনুসারে নিরিখ ধার্য্য হইবে, কিন্তু অনুধাবন করিয়া দেখিলে এ ব্যবস্থাটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। পাশাপাশি ভূমিরও স্বরূপ গত বৈলক্ষণ্য অনেক স্থলে দৃষ্ট হয়। অতএব সেই সেই ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বিবেচনা করিয়া নিরিখ ধার্য্য করিবার ব্যবস্থা করাই উচিত ছিল, তাহা হইলে প্রজার মঙ্গল হইত। ভূমির প্রকৃত কর ধার্য্য করিয়া দেওয়া রাজার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তাহা না

হওয়াতেই কৃষিকার্য্যের হ্রাস, শস্য উৎপাদনের ব্যাঘাত এবং প্রজার কষ্ট দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে।

১৮৫৯ সালের ১০ আইনের দ্বারা প্রজারা যে পরিমাণে উপকৃত হয়, ৬২ সালের ৬ আইন দ্বারা তদধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে শেষোক্ত আইনে ব্যবস্থা হইয়াছে প্রজার দেয় রাজস্ব যথাকালে আদায় না হইলে শতকরা পঁচিশ টাকা সুদ দিতে হইবেক। শতকরা ২৫ টাকা সুদ দিবার নিয়ম যে কোন রাজার অধিকারে কখন ছিল এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। যবনাধিকারকালে এদেশের প্রজাদিগকে অনেক প্রকার ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহাদিগের উপরে অনেক প্রকার অত্যাচার হইয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু সেই যবনেরাও নিঃস্ব দরিদ্র কৃষিজীবি প্রজাগণের নিকট হইতে অসঙ্গত সুদ গ্রহণ করেন নাই। যদি বল, জমিদারগণ গবর্ণমেণ্টে দেয় রাজস্ব প্রজার নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া দেন, তাহা নিয়মিত সময়ে না পাইলে জমিদারগণকে ঋণ করিয়া দিতে হয়, না দিলে তখন আর প্রজার অনুরোধে তাঁহাদিগের জমিদারী নীলামে চড়িতে বাকী থাকে না, সুতরাং মহাজনের সুদ দিবার জন্য তাঁহাদিগকে প্রজার নিকট সুদ লইতে হয়, জমিদারদিগকে সুদ দিয়া কর্জ্জ করিতে হয় যথার্থ বটে, কিন্তু তাঁহারা শতকরা ২৫ টাকা সুদে কর্জ্জ করেন না, অথচ এত অধিক সুদ গ্রহণ করেন কেন? ফলতঃ সুদের নিয়ম উর্দ্ধসংখ্য দশ টাকা অবধারিত হইলেই পর্য্যাপ্ত হইত। শতকরা ২৫ টাকা অবধারিত করিয়া দেওয়াতে দরিদ্র প্রজাগণ সুদের দায়ে বিষম বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে।

প্রজাদিগের এইমাত্র বিপদ নয় এতদ্ভিন্ন মহাজনের অত্যাচাররূপ আর একটী মহাবিপদ আছে। মহাজন এই শব্দটী শুনিতে মধুর বটে, কিন্তু হতভাগ্য বঙ্গবাসী প্রজার অদৃষ্টে ইহা বিষময় ফল প্রসব করে। কোথায় সহায় ও সম্বলহীন প্রজারা মহাজনের আশ্রয় গ্রহণপুর্ব্বক সমুদায় দায় হইতে রক্ষা পাইবে, তাহা না হইয়া মহাজনই তাহাদিগের সর্ব্বনাশের কারণ হইয়া উঠিয়াছেন একথা কে না মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন যে, সামান্য এক জন গ্রাম্য মহাজন অতি অল্প অর্থ লইয়া অচিরকাল মধ্যে প্রজার সর্ব্বনাশ করিয়া অতুল ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া উঠেন। প্রজা পীড়নকল্পে ইহারা নীলকরের সহোদর। প্রজাদিগের অনেকেই নিরীহ ও সরল স্বভাব। তাহারা যে ক্রমে মহাজনরূপ বিষম বিকারে আচ্ছন্ন হইতেছে তাহা বুঝিয়াও বুঝিতে পারে না ক্রমে নীলের দাদনের ন্যায় মহাজনের সুদ বৃদ্ধি পাইয়া এত অধিক হইয়া উঠে যে ঐ হতভাগ্যদল কখনই ঐ ঋণদায় হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না। মহাজনেরা তাহাদের শ্রমোপার্জ্জিত শস্য স্বেচ্ছাক্রমে বিক্রয় করিয়া লয়, তাহারা দ্বিরুক্তি করিতে শক্ত হয় না। মহাজনেরা সুদ, সুদের সুদ, ধরতা, বাঁটা, হিসাবানী, পার্ব্বণী প্রভৃতি বাবদে অল্প দিনের মধ্যে ঋণজালে প্রজাকে এমনি বদ্ধ করিয়া ফেলে যে, তাহার আর উদ্ধারের উপায় থাকে না, অর্থপিশাচ মহাজনেরা কেবল যে অর্থ ব্যবহার দ্বারা অর্জ্জনস্পৃহার চরিতার্থতা সম্পাদন করে এরূপ নয়, তাহাদের ধান্যাদির বাড়ী

দিবার একটী ভয়ানক ব্যবসায় আছে। এই বাড়ী দুই প্রকার, দেড়া ও দুনা। নিবন্ন প্রজারা উদরান্নের জন্য মহাজনের নিকট যে ধান্যাদি লয়, বর্ষের মধ্যে তাহা পরিশোধ করিলে এক মণে দেড় মণ এবং বীজের জন্য যে কোন শস্য গ্রহণ করে, তাহা এক মণে দুই মণ দিতে হয়। ইহার মধ্যে আদান প্রদান কালে মাপেরও ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। কয়ালি, মুটিদারি, চৌকিদারী, এবং গোলা শুক্তি প্রভৃতি অনেকগুলি বাবও ইহার অন্তর্বর্ত্তী আছে। বোধ কর, আষাঢ় মাসে একজন প্রজা বীজ ধানের জন্য বিংশতি মণ ধান্য বাড়ী লইল। সেই সময়ে টাকায় দুই মণ ধান্য বিক্রয় হইতে ছিল, তাহার পর নয় মাস কাল গত না হইতেই পৌষ মাসে (এ মাসে প্রায় টাকায় এক মণ ধান্য বিক্রয় হইয়া থাকে) প্রজা বিশ মনের স্থানে চল্লিশ মণ এবং বাব সাতেরও আর দশ মণ ধান্য না দিয়া নিস্তার পায় না। ইহাকে কি শতকরা শতকরায় অধিক সুদ বলা যায় না ? অধিকতর দুঃখের বিষয় এই যে রাজনিয়ম দ্বারা এই কুৎসিৎ রীতি অনুমোদিত হইয়াছে। ১৭৯৩ সালের ১৫ আইনের ৬ ধারায় শতকরা এক টাকা হারে সুদ গ্রহণের নিয়ম হয়, পশ্চাৎ ১৮৫৫ সালের ১০ আইন এবং ১৮৭১ সালের ২৩ আইনের ১০ ধারায় তাহার অন্যথা হইয়া এই নিয়ম হয় যে, উত্তমর্ণ আপনার ইচ্ছামত সুদ লইতে পারিবেন। তাহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা প্রজার কষ্ট শতগুণে বৃদ্ধি হইয়াছে। সত্য বটে, মহাজন না থাকিলে সহায় সম্বলহীন কৃষিজীবি প্রজার যথাকালে কৃষি কর্ম্ম সম্পাদন করা কঠিন হইত, তাহা বলিয়া কি এত অত্যাচার ন্যায়সঙ্গত হয় ? সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, জমিদার বাকী খাজনার নিমিত্ত দরিদ্র প্রজার ফলোন্মুখ শস্য নীলাম করাইয়া লইতে উদ্যত হইয়াছেন, এমত সময় মহাজন টাকা দিয়া তাহার রক্ষা করে। কিন্তু পরিণামে তাহা ব্যাঘ্র মুখ হইতে ছাগল রক্ষা করিয়া নিজে ভক্ষণ করিবার ন্যায় হইয়া পড়ে। প্রস্তাবের উপসংহারকালে কর্ত্তৃপক্ষকে আমাদিগের অনুরোধ এই তাঁহারা উভয় দলের লাভালাভ ও উপকার অপকারের প্রতি দৃষ্টি করিয়া উভয়ের রক্ষার্থ উৎকৃষ্ট নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন।

লাণ্ডহোলডার্স সভার প্রশ্ন ও তাহার উত্তর। ১৮ অগ্রহায়ণ ১২৭১। ৪ সংখ্যা

* * * * * *

গত জুলাই মাসে লাণ্ডহোলডার্স সভা যাবতীয় নীলকরের নিকটে এক সরকুলর পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা করেন "পর্য্যায়ক্রমজাত শস্যের মত নীলবপন করিলে ভূমির অনিষ্ট হয় কিনা ? কয়েকজন নীলকর তদুত্তরে বলিয়াছেন দুই বৎসর ধান্য দিয়া তাহার পর বৎসর অন্য শস্য উৎপাদন করিয়া প্রজারা চতুর্থ বর্ষে ভূমি ফেলিয়া রাখে, কিন্তু ফেলিয়া না রাখিয়া যদি নীল করা হয়, ভূমির কোন অনিষ্ট হয় না। লাণ্ডহোলডার্স সভা এইরূপে উত্তর সংগ্রহ করিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছেন, নীলে ভূমির উর্ব্বরতা শক্তির হ্রাস হয় না। তাঁহাদিগের কৃত

এই সিদ্ধান্তটি "খায় ভাত উগারে পিঠে" বলিয়া যে একটী মহার্থ সামান্ত প্রসিদ্ধ কথা আছে, তাহার স্বরূপ হইয়াছে। এক বিষয়ে বিবাদ চলিয়াছে, অন্ত বিষয়ের সিদ্ধান্ত হইতেছে। নীলবপন করিয়া প্রজাদিগের শ্রমানুরূপ পুরস্কার লাভ হয় না। এই নিমিত্ত তাহারা নীলের কৃষিকার্য্যে বিমুখ। ইহারই কোন উপায় বিধান ও মীমাংসা আবশ্যক। কিন্তু ল্যাণ্ড-হোলডার্স সভা সেদিক দিয়া যাইতেছেন না। একবিধ প্রশ্নের অপরবিধ উত্তর অত্যন্ত বিড়ম্বনার বিষয় সন্দেহ নাই। কোন কোন নীলকর নীলের প্রতি প্রজারা অনুরক্ত ইহা জানাইবার নিমিত্ত বলেন "নীলবপন ও করবৃদ্ধি এ উভয়ের মধ্যে প্রজারা নীলবপনই মনোনীত করে।"

নীলকরেরা যেরূপ মনে করেন, ইহার তাৎপর্য্য সেরূপ নহে। ইহার তাৎপর্য্য এই, নীলবপন ও করবৃদ্ধি উভয়ই প্রজার অনভিমত ও বিদ্বিষ্ট, তাহার মধ্যে করবৃদ্ধি অধিকতর বিদ্বেষের বিষয়, তাহারা বরং নীলবপন ঘটিত অনিষ্ট স্বীকার করিতে পারে তথাপি করবৃদ্ধি স্বীকার করিতে পারে না। জেমস হিল সাহেব গর্ব্বপূর্ব্বক বলিয়াছেন "আমার প্রজারা পাঁচ বৎসরকাল যে অবস্থায় ছিল এক্ষণে তদপেক্ষা অনেক দরিদ্র হইয়াছে, তাহারা ও তাহাদিগের পরিবারগণ তাহার এই কারণ নির্দ্দেশ করে। পূর্ব্বে নীলকুঠি হইতে তাহারা যে টাকা পাইত, তাহা আর পায় না, তাহাতেই এই দুরবস্থা ঘটিয়াছে।" পাঁচ বৎসরকাল তাহারা যে মকদ্দমায় মকদ্দমায় উৎসন্ন হইয়াছে, পরিশেষে নব নাগের দিকাকের আজ্ঞানুসারে হিল সাহেব পাঁচ আনা খাজনা স্থলে এক টাকা কর লইতেছেন, তন্মূলক প্রজার যে কষ্ট হিল সাহেবের প্রিয় প্রজারা ও হিল সাহেব স্বয়ং তাহার নির্দ্দেশ করিতে বিস্মৃত হইয়াছেন। নীলের দাদন পৈতৃক রোগের ন্যায় সে পুত্র পৌত্রাদিকে আক্রমণ করে, বোধ হয় একথাটীও প্রজাদিগের সহিত হিল সাহেবের মনে হয় নাই।

এক্ষণে আমাদিগের জিজ্ঞাস্য এই, বুনা বাহ্যক্ষেত্রে যে বলপূর্ব্বক নীলবপন করা হয়, তাহা নীলকরেরা অস্বীকার করেন কি না? কেবল একজন নীলকর বাক্যে আমরা সন্তোষ লাভ করিলাম। বড়বারি কুটির টি. ই. ওমান সাহেব বলিয়াছেন নীলকরেরা পূর্ব্বে যে টাকায় ছয় বাণ্ডিল নীল লইতেন, তাহা লইলে কোনক্রমে নীলের কৃষিকার্য্য চলিবে না। যাঁহারা চারি বাণ্ডিল লইয়া সন্তুষ্ট হইতে না পারেন তাঁহাদিগের নীলবপন বন্ধ করিয়া প্রজাকে কনট্রাক্ট হইতে মুক্ত করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। ওমান সাহেব স্বীকার করিয়াছেন, যাবতীয় ব্যয় বাদে ইক্ষুক্ষেত্রের প্রতি বিঘায় ২৫ অবধি ৫০ টাকা পর্য্যন্ত লাভ থাকে। আমাদিগের জিজ্ঞাস্য এই, নীলে তাহা কখন হয় কি না? নীলে যদি তাহা না হয়, প্রজারা লাভের অঙ্ক পরিত্যাগ করিয়া অলাভ বাণিজ্যে যাইবে কেন? ওমান সাহেব আর যে কয়টি ন্যায়োপেত কথা কহিয়াছেন, তাহারও এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক। তিনি বলেন "নীলকর হউক আর প্রজা হউক যাহারা আইন বিরুদ্ধ কাজ করিবে, গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের দণ্ড করুন এবং এদেশীয় সমাচারপত্র সম্পাদকদিগকে সাবধান করিয়া দিন, তাহারা অবচ্ছেদা-

বচ্ছেদে যাবতীয় নীলকরের প্রতি দোষারোপ না করেন।" গবর্ণমেণ্ট অপরাধির অনুসন্ধান করিয়া দণ্ড করেন, আমরাও সর্ব্বদা এই অনুরোধ করিয়া থাকি। তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের তাদৃশ যত্ন নাই বলিয়া আমরা সর্ব্বদা ক্ষোভও প্রকাশ করিয়া থাকি। এদেশীয় সমাচারপত্র সম্পাদকদিগের বিষয়ে তিনি যে কথা বলিযাছেন, তদ্বিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য এই, সমাচার সম্পাদকদিগের এরূপ অভিপ্রেত নয় যে তাঁহারা ভদ্র নীলকরদিগেরও দুর্নাম করেন। তবে যে তাঁহারা সাধারণ্যে কোন কোন দোষের উল্লেখ করেন, তাহার তাৎপর্য্য এই, নীলকরদিগের অধিকাংশ সেই দোষে দূষিত, ইহা প্রমাণ করিয়া দেওয়াই তাঁহাদিগের অভিপ্রেত। তাঁহারা বলেন করবৃদ্ধি না করিয়া কয়েক বিঘা নীল করাইয়া লইলে প্রজাদিগের ইষ্ট বিনা অনিষ্ট নাই। কিন্তু তাহাতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রজার লাভ সম্ভাবনা কি? গুরুতর অনিষ্টের ভয়ে সামান্য অনিষ্ট স্বীকার কর্ত্তব্য বলিয়া যে নীতি আছে, ইহা তাহার উদাহরণস্থল নহে। নীলকরেরা প্রজার শোণিত পান করিয়া হৃষ্টপুষ্ট হইবেন ইহা কি কখন সঙ্গত হইতে পারে? সমুদায় দ্রব্যের মূ- বৃদ্ধি হইয়াছে, কিন্তু নীলের ··। ইহা কি স্বাধীন বাণিজ্যের বিরুদ্ধ নহে? নীলকরেরা চারি বাণ্ডিল স্থলে ছয় বাণ্ডিল লইতেছেন, ইহা কি অত্যাচার নহে? তবে তাহারা এক করবৃদ্ধির কথা বলেন। সে বিষয়ে আমাদিগের জিজ্ঞাস্য এই তাঁহারা ধর্ম্মতঃ বলুন দেখি, প্রজারা কি বার্ণেন পিককের অনিষ্ট মূল আজ্ঞানুসারী করদানে সমর্থ কি না? লাভ না হইলে প্রজারা কেন নীলবপন করিবে? পূর্ব্বে যাহা হউক কিঞ্চিৎ দাদন দেওয়া হইত, এক্ষণে নীলকরেরা বিনামূল্যে নীল লইবার চেষ্টায় আছেন। লাণ্ড হোলডার্স সভা যেরূপ বলুন তাহাদিগের যে এই চেষ্টা তাহা এক প্রকার সিদ্ধান্ত হইয়াছে। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর সংবাদ পত্রের উত্তর স্বরূপ যথার্থ বলিয়াছেন নীল-পর্য্যায় শস্য কিনা সে কথা হইতেছে না। প্রজারা যে মূল্য পায়, তাহা পর্য্যাপ্ত কিনা তাহাই বিবেচ্য হইতেছে। তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন নীলকরেরা করবৃদ্ধির ভয় প্রদর্শন করিয়া অদ্যাপি নীলবপন করাইবার ইচ্ছা পরিত্যাগ করিলেন না, এই উপায় কখন বাণিজ্য সম্বন্ধে লাভকর হইতে পারে না। সেক্রেটারি ইডন সাহেব বলেন "৪ঠা জনে আমি যে প্রত্যুত্তর দি তাহাতে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর যদিও স্বীকার করেন, পর্য্যায়জ শস্য লাভকর বটে কিন্তু নীলকরের সহিত কৃষকদিগের যে বিবাদ আছে, নীলের পর্য্যাপ্তোৎপাদন দ্বারা তন্নিবারণ সম্ভাবনা নাই।" তিনি বলিয়াছিলেন বঙ্গদেশীয় কৃষকদিগের কিসে লাভ ও ক্ষতি হয় তাহারা তাহা বুঝিতে পারে। গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ অনিষ্ট ও অত্যাচারের মূল হইবে।" লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর তৎপরে বলিয়াছেন নীল যদি লাভকর হয়, এবং প্রজা ও নীলকর উভয়ে তাহা জানেন তবে নীলকরেরা সহজে নীল হইতে পাবে না কেন? যদি তাহাতে লাভ হইত তাহা হইলে অর্থোপার্জ্জন স্পৃহাপরতন্ত্র হইয়া প্রজারা অবশ্য নীলবপন করিত। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর পরিশেষে বলেন "এক্ষণে করবৃদ্ধির স্বত্ব এক প্রকার স্থির হইয়াছে এবং নূতন রেজিষ্টরি আইনে জাল বন্ধ হইতেছে। অতএব এরূপ আশা করা যাইতে পারে, নীলকরেরা

আদালতের আশ্রয় না লইয়া প্রজাদিগের নিকট হইতে যথার্থ ও ন্যায়সিদ্ধ কর লইবেন, তাহা হইলে নীল ও করের স্বতন্ত্র হিসাব ও প্রভেদ থাকা যে উচিত তাহা হইবে।" লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বৃথা আশা করিয়াছেন। পূর্ব্বতন মুসলমানেরা যেরূপ পরাজিত জাতিকে এক হস্তে কোরাণ আর অপর হস্তে তরবারি গ্রহণ করিয়া বলিত, নীলকরেরাও সেইরূপ প্রজাদিগকে বলিতে থাকিবেন "বিনামূল্যে নীলবপন কর, নচেৎ সর বর্ণেস পিককের লাঠি পড়িবে।" এত কাণ্ড হইল, তথাপি তাঁহারা নীল ও ভূমির করের হিসাব পৃথক করিলেন না। তাঁহারা এখনও ভয় প্রদর্শন করিয়া নীলবপন করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর কখন ভাবিবেন না যে নীলকরেরা বিনামূল্যে নীলবপন ত্যাগ করিবেন। উল্লিখিত পত্রগুলি দ্বারা তাঁহারা গবর্ণমেণ্টকে কেবল স্বীকার করাইয়া লইলেন যে তাঁহারা প্রজাদিগের পক্ষ। এই সুবিধাটী তাঁহাদিগের পক্ষে ঘটিয়া রহিয়াছে।

উপসংহারকালে আমরা স্পষ্টাক্ষরে কহিতেছি সে সমস্ত প্রজা এক্ষণে কর বৃদ্ধির ভয়ে নীলবপন করিতেছে তাহারা সকলেই অসন্তুষ্ট, সকলেই বলিতেছে প্রধানতম বিচারালয় তাহাদিগের প্রতি অন্যায় করিয়াছেন। অতএব সুযোগ পাইলেই তাহারা নীলবপন ত্যাগ করিবে। বলপুর্ব্বক কাজ কিছু দিন চলিতে পারে। বীডন সাহেবের রাজত্বকালে কোন গোল না হইতে পারে। কিন্তু যখন অত্যাচার স্পষ্ট রহিল, তখন বিবাদের বিলক্ষণ সম্ভাবনা রহিল। নিপীড়িত কৃষকেরা সুযোগ পাইলে পুনর্ব্বার মস্তকোত্তলন করিবে সন্দেহ নাই। স্বার্থান্ধ নীলকরেরা সেই অনিষ্ট দূরবর্ত্তী ভাবিয়া আপাততঃ সুস্থচিত্ত হইতে পাবেন, কিন্তু যে গবর্নমেণ্ট দীর্ঘকাল স্থায়িতার আশা করেন, তাঁহারা ইহা তুচ্ছ করিতে পারেন না। এই বিবাদের মূলোৎপাটন করা অতি আবশ্যক। আমরা সহস্রবার ইহা বলিয়াছি, এবং পুনরুক্তির ভয় না করিয়া আবার বলিতেছি কৃষকদিগের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করাই একমাত্র উপায়।

বিনা মূলধনে ব্যবসায় বড় ভয়ঙ্কর। ৪ মাঘ ১২৭১। ৯ সংখ্যা

ভারতবর্ষের বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হয় ইহা সকলের প্রার্থনীয়। বাণিজ্য ধনোপার্জ্জন ও দেশের সৌভাগ্য এবং ক্ষমতা বৃদ্ধির এক অসাধারণ কারণ। কিন্তু এতদ্বিষয়ে সাধু-ব্যবহার অতি অনাবশ্যক।·· কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, আজিকালি ভারতবর্ষে কতকগুলি নিরন্ন লোক রিক্ত হস্তে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হওয়াতে প্রতারণার বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। এদলে ইউরোপীয় ও এদেশীয় উভয়েই আছেন। তন্মধ্যে ইউরোপীয়ের সংখ্যা অধিক। আমরা প্রায়ই শুনিতে পাই, অমুক ইউরোপীয় অমুক ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। অমুক বাবু (১) মুচ্ছুদ্দি হইলেন। দিন কয় পরে শুনিতে পাই, তিনি ফেইল হইয়াছেন।

পাদটীকা:

(১) ধনী বাবুদিগের অনেকে স্বয়ং ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া বড় কষ্ট স্বীকারে অগ্রসর হন না, বসিয়া যা কিছু লাভ করিতে পারেন সেই চেষ্টায় যান, শেষে লাভের মূলে জল দিয়া নিশ্চিন্ত হন।

বাবু টাকার নিমিত্ত ছটফট করিয়া বেড়াইতেছেন। বাজারের লোকেরা বাবুকে ধরিয়া পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিয়াছে। ওদিকে সেই ইউরোপীয় নাম ফিরাইয়া আর এক দোকান খুলিয়া বসিয়াছে। নীলপ্রধান প্রদেশে যে এত অত্যাচার হয়, অধিকসংখ্য মুলধনশূন্য ব্যক্তির নীল ব্যবসায়ে প্রবৃত্তিই তাহার প্রধান কারণ। যাহারা এইরূপে নীল ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদিগের মুলধন থাকে না। সুতরাং প্রজার শোণিত আকর্ষণ পুর্ব্বক অবয়ব পুষ্ট করিতে হয়। আমরা জানি অনেকে এই প্রকারে যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছে। ইহাদিগের নিজেব এক পয়সাও ছিল না। ঋণ ইহাদিগের ব্যবসায়ের মুল, দেউলিয়া আদালত ইহাদিগের পলাইবার পথ।...অধিকাংশ দালাল...কেবল ঋণের উপরে নিভর করিয়া কাজ করিয়া থাকেন। বাজার নরম হইবামাত্র ইহাদিগকে নিরন্ন হইতে হয়। আপনার টাকা না থাকিলে ব্যবসায় করা অতিশয় অন্যায়। এ প্রকার লোক সমাজের ধনের মারীভয় স্বরূপ। ইহারা কেবল আপনারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, অনেক অল্পবুদ্ধি লোকে তাহাদিগকে বিশ্বাস করিয়া কর্জ দেয়, শেষে তাহাদিগকেও সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। এই অনিষ্ট নিবারণ করা কি উচিত নহে? আমরা জানি সম্ভ্রান্ত বণিক মাত্রেই এই সকল নিরন্ন ব্যবসায়ির প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেন। কিন্তু কেবল ঘৃণা প্রকাশে কাজ হইতেছে না। ইহাদিগের অসৎ দৃষ্টান্তে সমাজের বিশেষ অনিষ্ট ঘটিতেছে। আমরা তন্নিমিত্ত প্রস্তাব করিতেছি,·দেউলিয়াদিগকে ফৌজদারিতে মেয়াদ দেওয়া কর্ত্তব্য। এজন্য দেউলিয়া আইন সংশোধন করা অতি আবশ্যক হইয়াছে

রেসম। ৪ মাঘ ১২৭১। ৯ সংখ্যা

নীলের ব্যবসায়ের ন্যায় রেসমের বাণিজ্য বিস্তৃত নহে, মুরশিদাবাদ, রাজশাহী, মালদহ, পাবনা, কুমারখালি, ঘাটাল এবং মেদিনীপুর প্রদেশেই ইহার আকরস্থান। এই স্বল্পস্থানের অধিবাসী শ্রমজীবিরা ইহাতে লিপ্ত থাকাতে নীলের ন্যায় না হয় ইহাতে যে আংশিক প্রজার কষ্ট আছে, তাহা অনেকেই অবগত নহেন। পক্ষান্তরে ইহা মুল্যবান বিক্রেয় দ্রব্য বলিয়া কখন কখন প্রজারা এতদ্দ্বারা অপেক্ষাকৃত লাভবান হইয়া থাকে। এই হেতু ইহা নীলের সহচররূপে পরিগণিত হয় না। কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে প্রতীয়মান হইবে, ঐ ব্যবসায়ী ধনাঢ্য বণিকেরা ঐ মুল্যবান পণ্যের লভ্যাংশ হইতে প্রজাদিগকে বঞ্চিত রাখিয়া আপনারা লাভবান হইতেছেন। একের ভোজ্য অপরে গ্রাস করিলে তাহাকে অত্যাচার বলা যায়। হতভাগ্য প্রজারা ভূমি কর্ষণ পুর্ব্বক তুতের মুল রোপণ ও বর্দ্ধনশীল করণার্থ জলসেচনাদি করিয়া রেসম কীটের খাদ্য প্রস্তুত করে এবং নানা স্থান অনুসন্ধান করিয়া রেসম কীটের বীজ (সাঞ্চা) আহরণ পুর্ব্বক যে প্রকার পরিশ্রম সহকারে ঐ কীট সকলকে রেসম উদ্গীরণযোগ্য করে, তাহা বর্ণনা করা দুসাধ্য। ফলতঃ

যখন রেসমকীট সকল তুতপাতা খাইতে আরম্ভ করে তৎকালে কৃষকের এক প্রকার আহার নিদ্রা রহিত হইয়া যায়। এত করিয়াও ঐ প্রজা তাহার সম্যক ফলভাগী হইতে পারে না, নিকটস্থ রেসম কুঠীর লোক আসিয়া ঐ বহুমূল্য পণ্য অল্পমূল্যে (কাহন দরে) ক্রয় করিয়া লইয়া যায়। পড়তামত তাহাদের কোয়া আড়াই বা তিন টাকা সের পড়ে, কিন্তু কুঠিয়ালেরা অত্যল্প ব্যয়ে রেসম প্রস্তুত করিয়া ন্যূনকল্পে ১৫ টাকা সের বিক্রয় করিয়া থাকেন। যদি এরূপ বলা যায় যে কৃষকেরা কোয়া বিক্রয় না করিলেই হয়, কিন্তু সেটী তাহাদিগের সাধ্যায়ত্ত নহে। নিকটস্থ কুঠিয়ালেরা নানাপ্রকার কৌশল অথবা শাসন বলে তাহা করিতে দেয় না। কুঠিয়ালেরা এই অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত শতের স্থানে সহস্র ব্যয় করিতেও কাতর হয় না। সুতরাং দুর্ব্বল কৃষিজীবী প্রজার আর সাধ্য কি যে, কুঠির বিরুদ্ধে মস্তকোত্তোলন করে। এই কারণে ঐ সকল প্রদেশে যে সকল ভয়ানক কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে বোধ হয় তাহা উক্ত প্রদেশের অনেকেই অবগত আছেন। প্রজারা মেটে ঘাইয়ের দ্বারা রেসম সূত্র বাহির করিবার এক সহজ প্রণালী জানে। যদি কোন প্রজা অধিক লাভের আশায় তাহা করে কুঠিয়ালেরা আপন আপন ব্যবসায়ের অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া যে প্রকারে হয় তাহা তৎক্ষণাৎ বন্ধ করিয়া দেয়। সুতরাং তাহারা নিরুপায় হইয়া কোয়া বিক্রয় দ্বারা যথা কথঞ্চিৎ লাভে তুষ্ট হইয়া থাকে।

পাট প্রভৃতির রপ্তানীর মাসুল গ্রহণ প্রতিবাদ। ২৯ চৈত্র ১৭৭১। ২১ সংখ্যা

সর চারলস ট্রিবিলিয়ান ১৮৬৫।৬৬ অব্দের যে আয় গণনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে ইংলণ্ডে ১২০০৩০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ ও পাট প্রভৃতির রপ্তানীর ৩৩০০০০ টাকা মাসুল গ্রহণের প্রস্তাব করিয়াছেন। ঋণ গ্রহণ দ্বারা লোকের বিবাগ উৎপাদন করা অপেক্ষা ঋণ গ্রহণ দ্বারা তৎকার্য্য নির্ব্বাহ করা যুক্তি বিরুদ্ধ নয়। ঋণের সুদে যেমন ক্ষতির সম্ভাবনা, তত্তৎকার্য্যের লাভ দ্বারা তেমনি তৎপূরণ সম্ভাবনা আছে। অত্রত্য বণিকগণ পাট প্রভৃতি রপ্তানী দ্রব্যের মাসুল গ্রহণ প্রস্তাব হওয়াতে তৎপ্রতিবাদ চেষ্টায় আছেন। ৫ই এপ্রেল কমর্শ চেম্বর সভা স্থির করিয়াছেন, প্রথমে গবর্ণর জেনরলের নিকটে রপ্তানী দ্রব্যের মাসুল রহিত করিবার আবেদন করিবেন, তাহাতে যদি কৃতকার্য্য হইতে না পারেন, সর চারলস উডের নিকটেও আবেদন করিতে পরাঙমুখ হইবেন না।

বণিকসভা আশঙ্কা করিতেছেন; রপ্তানীদ্রব্যে মাসুল গ্রহণের নিয়ম হইলে শস্যোৎপাদন ও বাণিজ্যের উন্নতির ব্যাঘাত হইবে। কিন্তু যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, এ আশঙ্কা অমূলক। যে যে দ্রব্যে কিঞ্চিদধিক মাসুল গ্রহণের প্রস্তাব হইয়াছে, তাহার গ্রাহক অধিক আছে, বিদেশে ঐ সকল দ্রব্যের যেরূপ আদরে রপ্তানী হইয়া থাকে, যৎকিঞ্চিৎ মাসুল বৃদ্ধিতে তাহার হানি সম্ভাবনা নাই। বাণিজ্য দ্রব্যের মাসুল

গ্রহণ বার্ত্তাশাস্ত্রের নিয়মবিরুদ্ধ আমদানী ও রপ্তানী উভয়বিধ মাস্থলেই ঐ নিয়মের তুল্য কার্য্যকারিতা আছে। প্রয়োজনানুরোধে যদি আমদানী মাস্থল গ্রহণ অনুমোদিত হয়, রপ্তানীর মাস্থল সেই প্রয়োজনানুরোধে অনুমোদিত না হইবার কোন কারণ দেখা যায় না। আমদানী হউক আর রপ্তানী হউক মাস্থল গ্রহণ নিয়ম থাকিলেই উহা এক প্রদেশের উৎপাদক ও অপর প্রদেশের গ্রাহকের সম্বন্ধে পতিত হয় সন্দেহ নাই। সর চারলস্ ট্রিবিলিয়ান যে যে দ্রব্যে মাস্থল গ্রহণের প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা এই—

পাট, লোম চা ও কাফি এই চারি দ্রব্যে শতকরা ৩ টাকা রপ্তানি মাস্থল গ্রহণের প্রস্তাব করা হইয়াছে। তাহাতে বার্ষিক ১৩০০০০০ লক্ষ টাকা আয়ের সম্ভাবনা আছে। চামড়া চিনী রেসম ইহাতে শতকরা ২ টাকা গৃহীত হইবে। তাহাতে বর্ষে বর্ষে ৬০০০০০ লক্ষ টাকা আয় হইবে। চাউল ও অন্য অন্য শস্যে মণকরা দুই আনা ছিল এক্ষণে মণকরা তিন আনা প্রস্তাব হইয়াছে। ১৪০০০০০ লক্ষ টাকা বার্ষিক আয়ের সম্ভাবনা আছে। এ অংশে সমুদায়ে ৩৩০০০০০ টাকা আয় অনুমান করা হইয়াছে।

বণিকসভা প্রতিবাদ করিতেছেন বটে কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন, আমাদিগের এরূপ বোধ হয় না।

পল্লীগ্রামে অত্যাচার। ১৩ বৈশাখ ১২৭২। ২৩ সংখ্যা

চিঠি

পল্লীগ্রামে যে আজিও কত প্রকার অত্যাচার হয়, প্রধান পুরুষেরা তাহা জানিতে পারেন না। তাঁহারা পুলিষ করিয়া দিয়াছেন, জজ মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিয়াছেন, মধ্যে মধ্যে পুলিষের কার্য্য প্রণালীও সংশোধন করিতেছেন, তাহাতেই মনে করিতেছেন, পল্লীগ্রাম অত্যাচার শূন্য হইয়াছে। পল্লীগ্রামবাসীরা সুখে কাল হরণ করিতেছেন বাস্তবিক তাহা নহে পুলিষই করুন আর ঘন ঘন বিচারপতি নিয়োজিত করুন যাবৎ সরিষার ভিতর হইতে ভূত ছাড়ান না হইবে, তাবৎ মঙ্গল নাই। নিম্ন লিখিত পত্রখানি আমাদিগের এই বাক্যের তাৎপর্য্য পাঠকগণের সহিত প্রধান পুরুষদিগের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবে।

ভয়ঙ্কর অত্যাচার

সম্পাদক মহাশয়! কি অশুভক্ষণেই আমাদের গবর্ণমেণ্ট মাদক দ্রব্যের ও লবণের বাণিজ্যে হাত দিয়াছেন। এই দুই বাণিজ্য নিরবচ্ছিন্ন রাজহস্তগত হওয়াতে প্রজাগণের যে কত অনিষ্ট ঘটিতেছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আবগারীর শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া বোধ হইতেছে প্রায় দেশ শুদ্ধ লোকেই ক্রমে ক্রমে মাতাল হইয়া উঠিবেক। বড় বড় বিদ্বান বুদ্ধিমান ও সৎবংশোদ্ভব ব্যক্তিরাও লাল জলে মগ্ন হইয়া অসার

অপদার্থ হইয়া যাইতেছেন, স্থানে স্থানে সুরাপান নিবারণী সভা স্থাপিত হওয়াতেও বিশেষ ফল দর্শিতেছে না। এ দিনে লবণের বাণিজ্যেও রাজ সাহায্য বিলক্ষণ বিক্রমশালী হইয়া অনিবার্য্যরূপে লোক পীড়ন আরম্ভ করিয়াছে। লবণ সংক্রান্ত তেজস্বী আইনগুলি উহার প্রখর প্রহরণ, সল্ট পুলিষের কর্ম্মচারিগণ উহার ভীষণ সেনানী ও সেনা, গোয়েন্দাগণ উহার সুনিপুণচর নূতন পুলিষের ক্ষমতা উহার ভয়ঙ্কর সহায় এবং দরিদ্র প্রজা ও জমিদারগণ উহার অবশ্যভেদ্যলক্ষ্য। যে সকল নিমক চৌকির দারোগা, জমাদার ও চাপরাসী কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পথে ঘাটে প্রজাদিগকে ধরিয়া লবণ চাপাইয়া দিয়া চালন করিত, যাহাদিগের গুণে হিজলী অঞ্চলে কয়েকটা নরহত্যা পর্য্যন্ত হইয়াছে, সেই সকল লোকেরাই এখন পুলিষের ক্ষমতা পাইয়া সল্ট পুলিষনামে বিখ্যাত হইয়াছে এবং তাহাদিগেরই নাম এখন ইনস্পেক্টর সবইনস্পেক্টর ইত্যাদি হওয়াতে তাহারা নূতন নাম ও নূতন ক্ষমতার সহিত নূতন প্রকার অত্যাচারকারিতাও লাভ করিয়াছে। পূর্ব্বে কাহারও ঘরে লবণ ফেলিতে হইলে পুলিষের সহায়তা লইতে হইত এখন আর সে অপেক্ষা নাই, এখন তাহারা আপনারাই সর্ব্বে সর্ব্বা।

চোরা পোক্তাব গ্রেপ্তার বিষয়ে সল্ট পুলিষ ও বেঙ্গাল পুলিষ উভয়েরই সমান ক্ষমতা আছে, উভয়েই আগ্রহাতিশয় সহকাবে লোকপীডনে ব্যস্ত সমস্ত। আজি যদি বেঙ্গাল পুলিষ একগ্রামে চারি ঘব মারিল কালি সল্ট পুলিষ অনায়াসে অন্যগ্রামে আট ঘর উৎসন্ন করিয়া ফেলিল। উৎসন্ন কিরূপে করে? এ প্রশ্নের উত্তর স্থলে বক্তব্য এই যে, ইনস্পেক্টর বা সবইনস্পেক্টর ও কনষ্টাবলগণ ২।৪ জন অসচ্চরিত্র গোয়েন্দাকে সঙ্গে লইয়া ২০।৩০ জন মনুষ্য একত্রিত হইয়া কিঞ্চিৎ রাত্রি থাকিতে থাকিতে কোন গৃহস্থের দ্বারে বসিয়া থাকে, নতন লবণ কিঞ্চিৎ ও লবণ তৈয়ারির ২।৪টা হাঁড়িও, তাহাদিগের সমভিব্যাহারে থাকে। স্ত্রীলোকেরা প্রাতঃকৃত্য করণার্থে অতি প্রত্যূষে যেমন বহির্গত হয়, অমনি যমসোদর গোয়েন্দা ও কনেষ্টবলগণ গৃহ প্রবিষ্ট হইয়া পুরবাসী-দিগকে প্রহার করে এবং আনীত লব· ও লবণের হাঁড়ি ঐ সময়ে গৃহ মধ্যে রাখিয়া আইসে। দীন হীন ভীরুস্বভাব গৃহস্থ এই আকস্মিক বিপদ দেখিয়া হতমান হয এবং আর্ত্তনাদ করিতে থাকে। প্রতিবেশীরাও ভয়ে ও বিস্ময়ে জড়জড় হয় যে দুই এক জন সাহস করিয়া নিকটে আইসে তাহাদের সাক্ষাতে দুষ্টেরা পুর্ব্বে প্রবেশিত লবণ ও হাঁড়ি বাহির করিয়া গৃহস্থকে বেআইনী পোক্তানকারী বলিয়া গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যায়। এমনকি এক ঘরের দুই তিন জনকে ধরিয়া লইতেও ত্রুটি করে না! এইরূপ প্রজা-পীড়ন কার্য্যে তাহাদের কেবল যে অর্থ লাভ হয় এরূপ নয়, রাজদ্বারেও বিলক্ষণ বাহাদুরী প্রকাশ হয়।

উল্লিখিত দুষ্ট দুরাচার নরাধমদিগের কৌশলের কথা কি কহিব। কোন গ্রামের ২।৩ জন আসামীকে চালান করিবার আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলেও গ্রেপ্তার করণকালে ৬ বা

৮ জন লোককে ধরিয়া লইয়া যায়, এবং এই বেশী লোকদিগের নিকটে অর্থলালসাচরিতার্থ করিয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেয়। যে গ্রামে এইরূপ অত্যাচার সংঘটিত হয়, তথাকার জমিদারকেও অত্যাচারী পুলিসকর্ম্মচারীর পদাবনত হইতে হয় জমিদার ৩০।৪০।৫০ প্রভৃতি টাকা উৎকোচ প্রদানপূর্ব্বক আপন পক্ষের গোয়েন্দাগিরি লেখাইয়া দিয়া ৫০০ টাকাব ধাক্কা হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন। অন্যথা প্রতি নম্বর বে-আইনী পোক্তানে তাঁহাকে ১০০ টাকা হিসাবে দণ্ড দিতে হইবেক এই প্রকারে তাহাদের ধনপ্রাণ রক্ষকেরা (!!) এ অঞ্চলে শান্তিরক্ষা করিতেছেন।

অল্পদিন হইল এ প্রদেশের প্রায় ৫০ ঘর প্রজা বর্ণিত প্রকার অত্যাচাবে হৃতসর্ব্বস্ব ও হতমান হইয়াছে। গত ২৭এ চৈত্র শনিবার আমার এলাকা মহাজন নামক গ্রামে উল্লিখিত কাণ্ড সংঘটিত হয়। আটজন নিরীহ প্রজা অকৃতাপরাধে ধৃত, প্রহারিত ও নানাপ্রকারে অত্যাচারিত হইয়াছে। অপহৃত হওয়ারই বা আশ্চয্য কি? গোয়েন্দাগণ যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ লোক। শ্রীঘর দর্শন করে নাই এরূপ লোক তাহাদিগের মধ্যে অতি বিরল। যাহা হউক, উল্লিখিত আট জনের মধ্যে কেবল ৩ জন মাত্র কাঁথির ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। যদিও আইনে বিধি আছে আসামীকে ২৪ ঘণ্টার ঊর্দ্ধ পুলিসকর্ম্মচারি রাখিবেক না, কিন্তু প্রাগুক্ত ৮ জন হতভাগ্যকে দুই দিবসকাল অনাহারে থাকিয়া গারদের নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছে। নরকেবই বা অভাব কি? কনষ্টাবলদিগের পবিত্র মুখে গণ্ডা গণ্ডা নরক বিদ্যমান! তাহার উপব আবার প্রহারাদিও আছে। মহাশয়! উপরি বর্ণিত বিষয়ে আমি ইনস্পেক্টর সাহেবের বিষম কোপে পতিত হইয়াছি। প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে তিনি আমার প্রতি প্রসন্নতা প্রদর্শনে উন্মুখ ছিলেন, কি আমি তাঁহার ভয়ঙ্কর ও ঘৃণিত প্রসাদ গ্রহণে অসম্মত হইয়াছি প্রসন্নতা আর কি, গোয়েন্দাগিরিতে নাম লেখাইয়া লওয়া। আপনার রক্ষার্থে নিরাপরাধ দুঃখী প্রজাগণের উপরে মিথ্যা দোষারোপ করিয়া গোয়েন্দার শ্রেণীভুক্ত হওয়া নিতান্ত নীচতার ও অধাম্মিকতার কার্য্য এই বিবেচনায় আমি ইনস্পেক্টর সাহেবের মতানুসাবে চলিতে পারি নাই সুতরাং তাঁহার পুর্ণ আক্রোশে পতিত হইয়াছি। যাহা হউক, ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সহিত নির্দ্দোষী প্রজার দণ্ড হয়, কি মুক্তিলাভ হয়, তাহার সংবাদ পশ্চাৎ মহাশয়ের গোচর করিতে যত্নশীল হইব।

এক্ষণে রাজপুরুষদিগের নিকটে দুই একটী কথা বলিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করা আবশ্যক। তাঁহারা আর কতদিন অযোগ্য ব্যক্তির হস্তে পুলিষ কার্য্য সমর্পণ করিয়া পুলিসকে ঘৃণিত ও আপনাদিগকে কলঙ্কিত করিবেন? তাঁহারা যাহাদিগকে প্রজার রক্ষক করিয়াছেন, তাহারাই ভক্ষক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহাতে কি তাঁহাদের অযশ হইবে না? নিমক মহলের দরিদ্র প্রজাগণের প্রতি কি তাঁহাদের স্নেহ নাই? অথবা এ অঞ্চলে প্রজার বসতি রাখা তাঁহাদের অভিপ্রেত নহে? যদি এরূপ হয়, তাহা হইলে এক সাধারণ বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রজাগণকে দেশত্যাগ করিয়া যাইতে বলুন, এবং জমিদারদিগকে জমিদারী ছাড়িয়া

দিতে আদেশ করুন, তাহা হইলে এক প্রকার মন্দের ভাল হয়। 'কিন্তু নৃশংস কর্ম্মচারিদিগের হস্তে ফেলিয়া দগ্ধ করা রাজার ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম নহে।

পরিশেষে বক্তব্য এই, নিমক মহলের প্রজাগণের প্রতি যদি রাজপুরুষদিগের স্নেহ থাকে তাহা হইলে তাঁহারা চোরাপোক্তান গ্রেপ্তার ঘটিত অত্যাচার নিবারণের কোন সদুপায় শীঘ্রই করিয়া দিউন, যত বিলম্ব হইবেক ততই প্রজার অমঙ্গল। আমার সামান্য বিবেচনায় দুইটী উপায় অবলম্বনীয় বলিয়া বোধ হইতেছে। প্রথম, সচ্চরিত্র লোক নিয়োগ। দ্বিতীয়, বে-আইনী পোক্তানের সন্দেহবশতঃ যখন কাহার ঘর অনুসন্ধান করিতে হইবেক, তখন যেন পুলিষকর্ম্মকারকেরা জমিদার অথবা জমিদারের প্রধান কর্ম্মচারিকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়। তাহা হইলে কখনই অত্যাচার হইতে পারিবেক না। যেহেতু, প্রায় জমিদার মাত্রেরি প্রজাকে অন্যকৃত অত্যাচাব হইতে মুক্ত করিবার আন্তরিক ইচ্ছা আছে। বিশেষতঃ জমিদারের প্রতি যখন চোরাপোক্তান বিষয়ে সঙীন আইন রহিয়াছে তখন তাঁহার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে তাহা সপ্রমাণ করিয়া দণ্ড করাই ন্যায়ানুগত।

দেহুড়দা। কৈলাসচন্দ্র রায় মহাশয়।

স্বতন্ত্র মজুরশ্রেণী। ১০ শ্রাবণ ১২৭২। ৩৬ সংখ্যা

যাঁহারা কর বৃদ্ধি বিষয়ে জমিদারদিগের হস্তে অসীম ক্ষমতা সমর্পণের সক্ষপতা করেন, এদেশে শ্রমজীবী একটী পৃথক শ্রেণী করা তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য। অত্রত্য জমিদারেরা যদি ইংলণ্ডীয় ভূম্যধিকারদিগের ন্যায় কর বৃদ্ধি করিতে পারেন, কাজে কাজেই একদল মজুর শ্রেণী হইয়া উঠিবে। তাঁহারা বলেন, স্বতন্ত্র মজুর শ্রেণীর আবির্ভাব সভ্যতা ও বর্দ্ধনশীল বাণিজ্যের একটি প্রধান আবশ্যক অঙ্গ, এবং এই শ্রেণী স্বতন্ত্র না থাকাতে উন্নতির অনেক ব্যাঘাত হইতেছে।

আমরা বরাবর এ প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছি, প্রস্তাবকারিদের দুশ্চেষ্টা দর্শন করিয়া আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে হইতেছে। এদেশে অমঙ্গল ও দারিদ্র্য বৃদ্ধি হইবে এরূপ নয় গবর্ণমেণ্টেরও বিপদের কারণ হইয়া উঠিবে। আমাদিগের দেশের তৃতীয় শ্রেণীস্থ লোক মাত্রেই প্রায় কৃষক। ইহারা যত দরিদ্র হউক না কেন, কখন অন্নবিনা জীবন ত্যাগ করে না। দুর্ভিক্ষ হইলেও তাহাদিগকে নিঃসহায় ও হতাশ হইতে হয় না। জমিদারদিগের এই একটি বিশেষ গৌরবের বিষয় সে তাঁহারা আপদের সময়ে কৃষকদিগকে ধান্য প্রভৃতি দিয়া সাহায্য করিয়া থাকেন। শেষে "শতকে সইয়ে, কাহনে দেড়ার" হিসাবে সুদশুদ্ধ সমুদায় আদায় করা হয় বটে, কিন্তু কৃষকের অন্ন কষ্ট হইলে হয় জমিদার নচেৎ গ্রামের মহাজন তৎক্ষণাৎ সেই কষ্ট দূর করেন। কৃষকের ভূমি ও শস্য তাহাদিগের প্রদত্ত টাকায় প্রতিভূস্বরূপ থাকে। জমিদার ও মহাজন উভয়েই জানেন যতদিন

কৃষক বাটী ত্যাগ করিয়া পলায়ন না করিতেছে, ততদিন তাহাদিগের টাকার মারি নাই। কৃষকের উপর যত বিশ্বাস থাকুক আর না থাকুক তাহার অধিকৃত ভূমি ও শস্তের উপর সকলে সমান বিশ্বাস করিয়া থাকেন। কৃষকও "এক মাঘে শীত পালায় না" এই ভাবিয়া ক্ষতিগ্রস্থ হইলেও বিশ্বাস ভঙ্গ করে না। পক্ষান্তরে মজুরের উপরে এরূপ বিশ্বাস জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। সুদখোরেরা সচরাচর অতিশয় সন্দিগ্ধচিত্ত ও পরিণাম চিন্তাকারী হইয়া থাকে। তাহারা মনুষ্য জীবনের ক্ষণভঙ্গুরতা স্মরণ করিয়া সম্পদহীন ব্যক্তিকে প্রায় বিশ্বাস করে না। বিশেষতঃ মজুরদিগের মজুরীই সম্পত্তি। দীর্ঘকালস্থায়ী পীড়াদি জন্মিলে অথবা মজুরীর ব্যাঘাত হইলে তাহাদিগের নিকট হইতে টাকা আদায় হওয়া দুষ্কর হয়। ইউরোপীয় দেশসমূহের মজুর শ্রেণীর দশা দর্শন করিয়া আমাদিগের এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে দিবস এদেশে ঐ প্রকার মজুর হইবে, সে দিনটা আমাদিগের অতিশয় দুর্ভাগ্যের দিন বলিয়া পরিগণিত হইবে সন্দেহ নাই আমেরিকার যুদ্ধের পূর্ব্বে মাঞ্চেষ্টরের মজুরেরা পরম সুখে ছিল, কিন্তু তুলার আমদানী বন্ধ হইবামাত্র চারি লক্ষ মজুর নিষ্কর্ম্মা হইয়া পড়িল। তাহারা যে কত কষ্ট সহ্য করিয়াছে, এবং কত চেষ্টায় ইংলণ্ডীয় ভদ্রলোকেরা যে তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন, ইহা কাহার অবিদিত আছে? ইংলণ্ড বলিয়া এত লোক রক্ষা পাইয়াছে। আর কোন্ দেশে চাঁদা দ্বারা এত লোক প্রতিপালিত হইবার সম্ভাবনা আছে? অন্য দেশ হইলে বিপ্লব ঘটিত সন্দেহ নাই ভারতবর্ষ হইলে শত শত লোক অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করিত। ইংলণ্ডের ন্যায় পৃথিবীর কোন খণ্ডেরই বাণিজ্য নাই। ইংরাজ বণিকেরা প্রসিদ্ধ দানশীল। ইংলণ্ডের অধীনে বিস্তর দেশ আছে। এই সকল কারণে মাঞ্চেষ্টরের মজুরগণ রক্ষা পাইয়াছে। অন্য স্থানের কথা থাকুক, যে ইংলণ্ডে মজুরদিগের প্রতি এত সদ্ব্যবহার সেখানেও মধ্যে মধ্যে তাহাদিগের কি দুরবস্থা না ঘটে? কার্য্য বন্ধ হইলে অনেককে হয় অসহায়ে প্রাণত্যাগ নচেৎ নানা পাপক্রিয়া দ্বারা উদর পুরণ করিতে হয়। নিশ্চয় করা হইয়াছে, ইংলণ্ড ও আয়ারলণ্ডের মজুর শ্রেণীর মধ্যে ব্যভিচার দোষ অতিশয় প্রবল। এদেশের প্রধান প্রধান নগরের মজুর স্ত্রীলোকদিগের দুশ্চরিত্রতার জন্যও কোন ব্যক্তি না আক্ষেপ করেন? দারিদ্র্য কি এই দুশ্চরিত্রতার প্রধান কারণ নহে? এক্ষণে সকল দেশের সমাজের যে অবস্থা দাড়াইতেছে। তাহাতে ধর্ম্মনীতি রাজনীতির পরস্পরের সবিশেষ সম্বন্ধ হইয়া উঠিয়াছে। মজুরদিগের ধর্ম্মনীতি সমাজ সম্বন্ধে উপেক্ষণীয় রাজনীতিজ্ঞেরা ইহার গুরুত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

পক্ষান্তরে আমাদিগের তৃতীয় শ্রেণীস্থ অধিকাংশ লোকের মজুরী ও কৃষি উভয় সম্বন্ধ থাকাতে ইউরোপ খণ্ডের মজুরদিগের ন্যায় সময়ে সময়ে মারাত্মক কষ্ট উপস্থিত হয় না। অতএব স্থির হইতেছে স্বতন্ত্র মজুর শ্রেণী করা দূরে থাকুক, যাহাতে কৃষকদিগের সহিত ভূমির বন্দোবস্ত উৎকৃষ্ট ও চিরস্থায়ী হয়, এরূপ করা কর্ত্তব্য।

কুলি। ২৪ পৌষ ১২৭৩

আসাম প্রভৃতি স্থান সমূহে যে সকল কুলি প্রেরিত হইয়া থাকে, আইন অনুসারে তাহাদিগকে মাজিষ্ট্রেটের নিকটে লইয়া যাইতে হয়। মাজিষ্ট্রেটেরা মজুরদিগকে জিজ্ঞাসা করেন তাহারা কোথায় যাইতেছে? আপন আপন ইচ্ছায় যাইতেছে কি না? গন্তব্য স্থানে কোন বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে কি না? ইত্যাদি। মজুর যদি এই উত্তর দেয় যে সে জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক যাইতেছে, তাহা হইলে মাজিষ্ট্রেট তাহাকে লইয়া যাইবার আজ্ঞা দেন, নচেৎ তাহাকে ছাডিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু আমরা নিজে অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি, যদিও আইনে এই সকল আছে, কার্য্যতঃ ইহার কিছুই হইতেছে না। কুলিদিগকে সেই পূর্ব্বের ন্যায় ভুলাইয়া আনয়ন করা হয়। সংগ্রাহকেরা বলে, কলিকাতা ছাড়িয়া দুই তিন দিবসের পথে এক স্থানে তাহাদিগকে যাইতে হইবে। বেতন যথেষ্ট দেওয়া হইবে, এবং খাটিতে হইবে না। সেই স্থানে খাদ্য দ্রব্য অতিশয় স্বল্প মূল্য, এবং গবর্ণমেণ্টের নিজের কাজ সুখের সীমা নাই। যখন তাহাদিগকে মাজিষ্ট্রেটের নিকটে আনা হয়, সংগ্রাহকেরা মজুরদিগকে বলে যদি তাহারা যাইতে না চায় তাহা হইলে মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাদিগকে জরিমানা করিবেন। মাজিষ্ট্রেট নিয়মিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে সকলে ভয় প্রযুক্ত "হাঁ" বলে। সংগ্রাহকদিগের আর একটি বিষম প্রতারণা এই, তাহারা দুই একজনকে দাঁড করাইয়া রাখে। তৎকালে কুলির তালিকায় তাহাদিগের নাম লেখা থাকে, কিন্তু তাহারা তাহাদিগের শিক্ষিত লোক। সংগ্রাহকেরা তাহাদিগকে যেমন বলিয়া দেয়, তেমনি বলে। তাহারা কখন আসামে যায় না। মাজিষ্ট্রেট জিজ্ঞাসা করিলে আমরা সকলে ইচ্ছাপুর্ব্বক যাইতেছি, এই কথা বলে। অন্য অন্য কুলিরা "জরিমানার" ভয়ে "হাঁ" বলে। এই অজ্ঞ লোকেরা সহজে সকল কথা বিশ্বাস করে। তাহারা সংগ্রাহকের চাপরাস গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে যাইতেছে, সকলের এই সংস্কার। আমরা অত্যুক্তি করিতেছি না, অনুসন্ধান করিলেই আমাদিগের লেখার যথার্থ সপ্রমাণ হইবে।

এখানে প্রশ্ন হইতেছে, এই অনিষ্ট নিবারিত হইতেছে না কেন? সহজে অনেকে মাজিষ্ট্রেটদিগের দোষ দিবেন কিন্তু এই হতভাগ্য কর্ম্মচারীদিগকে গবর্ণমেণ্টের বাগানের মালিগিরি অবধি সকল কাজ করিতে হয়। ইহাদিগের দ্বারা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার আশা করা অন্যায়। কুলি রেজিষ্টরের এক এক জন কেরাণী আছেন। ২০।২৫ জন কুলি আসিলে তিনি মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হন। মাজিষ্ট্রেট প্রধানতম বিচারালয় ও গবর্ণমেণ্টের ভয়ে মকদ্দমার কাগজেও স্বাক্ষর করেন, কুলির বিবরণও শ্রবণ করেন, সুতরাং তাঁহা হইতে তত্ব নির্ণয় হইবার সম্ভাবনা কি? আমরা তন্নিমিত্ত প্রস্তাব করিতেছি, কুলিদিগের রেজিষ্টরের জন্য সপ্তাহের এক বিশেষ দিন ও বিশেষ সময় দেওয়া নির্দ্দিষ্ট করা কর্ত্তব্য। একজন ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের উপরে এই ভার দেওয়া হউক। তিনি এই নির্দ্দিষ্ট

সময়ে আর কোন কাজ করিবেন না, এই কাজ তাঁহার মাসিক কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত হইবে। যদি মকদ্দমার সংখ্যা অধিক প্রদর্শন করিয়া প্রধানতম বিচারালয়ের সন্তোষ সাধন করিতে হয়, তাহা হইলে এ অভিষ্ট সিদ্ধি হইবে না। এ পর্য্যন্ত আইন ফলোপধায়ী হয় নাই, সেই প্রলোভন সেই জুয়াচুরি রহিয়াছে। চুক্তি ভঙ্গের ফৌজদারী দণ্ড ও বাহ্য আড়ম্বর এই মাত্র সার।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, শিক্ষা ও রথ্যা কর এবং বৃটিশ জাতির প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ।

১২ বৈশাখ ১২৭৮। ২৩ সংখ্যা

বিশ্বাস পরম ধন। বিশ্বাসই মনের প্রধান নিয়ন্তা। শান্তি, ভক্তি, প্রীতি প্রভৃতি সমুদায় উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তিরই প্রধান পোষক বিশ্বাস। বিশ্বাস সূত্রেই সংসারের সকল শৃঙ্খলা গ্রথিত রহিয়াছে। বিশ্বাসাভাবে জনক জননীকে শত্রুবৎ বোধ হয়। মিত্রকে প্রতারক বিবেচনা হয়, সহধর্ম্মিণীকে পিশাচিনীর ন্যায় উপলব্ধি হয় এবং রাজাকে দুর্ব্বৃত্ত দস্যুর ন্যায় প্রতীতি জন্মে, অধিক কি, বিশ্বাসের ব্যাঘাত হইলে হৃদয়ের ধন যে ঈশ্বর, তাঁহাকেও হারাইতে হয়। অবিশ্বাস বা অন্ধ বিশ্বাসের শাসনে বহুতর দেশ অসভ্যতা নিগড়ে আবদ্ধ রহিয়াছে, পৃথিবী বহুবার নর শোণিতে প্লাবিত হইয়াছে, কত প্রতাপান্বিত রাজ মুকুট চূর্ণীকৃত হইয়াছে। অল্পদিন হইল ফ্রান্সের প্রচণ্ড ভূপতি সম্রাট নেপোলিয়ন প্রকৃতি পুঞ্জের বিশ্বাস হারাইয়া জর্ম্মনদিগের নিকট পরাজিত ও বন্দীভূত হইয়াছেন, সুসভ্য ফ্রান্স দেশ হতমান ও হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াছে। পক্ষান্তরে দেখ, কেবল বিশ্বাস সূত্রেই ব্রিটিশ জাতি ১৭৫৭ খৃঃ অব্দে বঙ্গে সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া ক্রমশঃ স্বর্ণময়ী ভারতভূমির একাধিপতি হইয়াছেন এবং প্রজাপুঞ্জের বিশ্বাসভাজন হইয়াই তাঁহাদের অনুরাগ লাভ করিয়াছেন। মধ্যে লার্ড ডেলহাউসীর ঔদ্ধত্য ও অবিমৃষ্যকারিতায় ইংরাজদিগের বিশ্বাস বিচলিত হইয়াছিল, তাহাতেই ভয়ানক সিপাহী বিদ্রোহ ১৮৫৭ অব্দে সংঘটিত হয়। পরে লার্ড কানিঙ স্বীয় দয়া, ক্ষমা ও সুবিচারাদি গুণে প্রজাপুঞ্জের শ্রদ্ধাভাজন হওয়াতে ভারতবর্ষে পুনর্ব্বার শান্তি স্থাপিত হইয়াছে; কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়, ভারতবর্ষের এক্ষণকার শাসনকর্ত্তাগণ এমন একটি ঘৃণিত ও ন্যায়বিরুদ্ধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, যে উহাতে সমুদায় বঙ্গদেশের সৌভাগ্যসূর্য্য অস্তমিত হইবে, ব্রিটিশ জাতির অঙ্গীকারভঙ্গ স্বরূপ দুরপনেয় কলঙ্ক ধ্বজা দিগদিগন্তরে উড্ডীয়মান হইবে এবং তাঁহারা ভারতবাসিদিগের বিশ্বাস রত্ন চিরকালের জন্য হারাইবেন। রাজপুরুষেরা সম্প্রতি বঙ্গদেশের ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভঙ্গ করিবার যে অনুষ্ঠান করিতেছেন, তাহাই উপরি লিখিত ন্যায়বিরুদ্ধ কার্য্য, তাহাই ব্রিটিশ জাতির চির কলঙ্কের নিদান, তাহাই আমাদের বর্ত্তমান প্রস্তাবের লক্ষ্য বিষয়।

কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্য শাসনকালে সুবিখ্যাত গবর্ণর জেনরল লার্ড কর্ণওয়ালিশ

সন ১৭৯৩ সালের ২২এ মার্চ্চ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইনের সৃষ্টি করেন, উহাই ১৭৯৩ সালের ১ আইন। তৎকালীন রাজমন্ত্রী পিট ও ডনডাস এবং ডিরেক্টর সভার অনুমোদিত হইয়া ঐ বন্দোবস্ত স্থিরতর ও বদ্ধমূল হয়। উল্লিখিত বন্দোবস্তের পূর্ব্বে রাজস্ব সংগ্রহের যেরূপ প্রণালী ছিল, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের উত্তরোত্তর ক্ষতি এবং সুবিস্তৃত বঙ্গরাজ্যের প্রায় তৃতীয়াংশ ভূমি নিবিড় বনাকীর্ণ ছিল, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের গুণেই রাজস্বের সকল দোষ সংশোধিত হইয়াছে, অরণ্যময় স্থানগুলি গ্রাম নগরাদিতে পরিণত হইয়াছে, হিংস্র জন্তুর বাসস্থল মনুষ্যের আবাস স্থান হইয়াছে এবং বহুকালের অকৃষ্ট ভূমিও শস্য শোভিত হইয়াছে। জমিদারের অত্যল্প লাভ (শতকরা ১০ টাকা মালিকানা) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পন্ন হয়, এমন কি জমার অধিকারবশতঃ উক্ত বন্দোবস্তের পর ১০ বৎসরের মধ্যেই শতকরা ৮০ খানি বৃহৎ জমিদারী নীলামে বিক্রীত হইয়া প্রথম অধিকারীর হস্ত পরিভ্রষ্ট হয়। জমিদারেরা ক্রমশঃ পতিত জমি আবাদ করিয়া করের কাঠিণ্য পরিহারের চেষ্টা করেন। নূতন গ্রাম স্থাপনার্থ দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর, লাখেরাজ আদি নানাপ্রকার নিষ্কর ভূমি প্রদান করা হয়, ব্যবসায়িদিগকে জায়গীর দেওয়া হয়, জঙ্গল পরিষ্কারার্থ মূলধন বিনিয়োজিত হয়, অনেক স্থলে কূপ তড়াগাদি খাত হয় এবং নানাপ্রকারের প্রজাগণকে উৎসাহ দিয়া বসতি করাইয়া পতিত ভূমি আবাদ করা হয়। এইরূপে অশেষ চেষ্টায় বহু বর্ষ পরে জমিদারগণ লাভের মুখ দেখিতে পান এবং প্রজাদিগেরও সুখ সৌভাগ্যের বৃদ্ধি হয়। ফলতঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা দেশের যে অশেষ উপকার হইতেছে তাহাতে এখন আর প্রায় মতদ্বৈধ নাই। জমিদারদিগের শত্রুরাও ইহা স্বীকার করিয়া থাকেন।

নির্দ্দিষ্ট করে ভূমির উপর চিরস্বত্ব প্রাপ্ত হওয়াতে জমিদারেরা কতক লাভ রাখিয়া সেই স্বত্ব অন্যকেও প্রদান করিয়াছেন, তাহাতেই প্রজা ও জমিদারের মধ্যবর্ত্তী পত্তনিদার, দরপত্তনিদার, মোকররিদার, আয়েমাদার আদির সৃষ্টি হইয়াছে এবং গবর্ণমেণ্টও সময়ে সময়ে আবশ্যকমত প্রচলন (১) দ্বারা উক্ত মধ্যবর্ত্তী স্বত্বগুলি বিধিসিদ্ধ করিয়াছেন ইহাতে এই ফল হইয়াছে যে, ভূমি আবাদের কার্য্যভার বহুলোকের মধ্যে বিভক্ত হওয়াতে উহা সুন্দর রূপে সম্পন্ন হইয়া আসিয়াছে এবং জমিদার প্রভৃতির নির্দ্দিষ্ট করে চির ভোগ স্বত্ব উত্তরোত্তর ক্রমশঃ দৃঢ়ীভূত হইয়া রাজভক্ত ও ভূসম্পত্তি বিশিষ্ট এক দল সম্ভ্রান্ত লোক অভ্যুত্থিত করিয়াছে। মহারাণী যখন এদেশের শাসন ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন, তৎকালেও তাঁহার ঘোষণায় উল্লিখিত বন্দোবস্ত অব্যাহত থাকে। এইরূপে প্রায় ৮০ বৎসরকাল উক্ত বন্দোবস্ত চলিয়া আসিয়াছে, ইহার মধ্যে কত ঘটনা ঘটিল, কত রাজ মন্ত্রীর পরিবর্ত্তন হইল, কত শাসন কর্ত্তারও পরিবর্ত্তন হইল, কত ব্যবস্থাপক ও কত বিচারপতি চলিয়া গেলেন, কিন্তু কেহই উহার অলঙ্ঘনীয়তা অস্বীকার করেন নাই, প্রত্যুত অনেকেই পোষকতা করিয়াছেন; সুতরাং এই দীর্ঘকাল উহা লার্ড কর্ণওয়ালিস মহোদয়ের কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ, ব্রিটিশ জাতির ন্যায় পরতা

ও বাক্য-নিষ্ঠার উজ্জ্বল পতাকা স্বরূপ এবং বঙ্গদেশের মঙ্গল তারকা স্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে।

লার্ড ডেলহাউসীর নিয়োগাদি বিষয়ক আইনের (১৮৫৬ সালের ২০ আইনের) পাণ্ডুলেখ্য হইয়াছিল, তৎকালে জমিদারদিগের উপরে এক বিশেষ কর স্থাপনের প্রস্তাব হয় এবং ঐ প্রস্তাবানুসারে কার্য্য হইলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ব্যতিক্রম হইবে কি না এই বিষয় লইয়া তর্ক হয়। তৎকালীন ল'মেম্বর (পরে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি) সর বার্ণেস পিকক সাহেব ১৮৫৪ সালের ৬ই মার্চ্চ তদ্বিষয়ে এক যুক্তিগর্ভ মিনিট লিখেন। তাহাতে তিনি স্পষ্টই ব্যক্ত করিয়াছেন যে, যখন ১৭৯৩ সালের ১ আইনের ৪ ধারায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে যে জমা নির্দ্ধারিত হয়, উহা চিরকাল অপরিবর্ত্তনীয় থাকিবে বলিয়া অঙ্গীকার করা হইয়াছে, আর যখন ঐ আইনের ৭ ধারায় ডিরেক্টর সভার নিয়োজিত কোন শাসনকর্ত্তাই ভবিষ্যতে ঐ জমা বৃদ্ধি করিতে সমর্থ নহেন বলা হইয়াছে এবং জমিদারেরা নিজ নিজ পরিশ্রম ও সুশৃঙ্খলার ফল চিরকাল নির্ব্বিবাদে ভোগ করিতে পারিবেন এরূপও বলা হইয়াছে, তখন জমিদারদিগের উপর প্রস্তাবিত কর স্থাপিত হওয়া বিধেয় নহে আইন বিশারদ পিকক মহোদয়ের এই মত গবর্ণর জেনরল ও তাঁহার মন্ত্রীগণ বিধিসঙ্গত বোধ করিলেন এবং জমিদারগণের উপরে বিশেষ কর স্থাপন প্রস্তাবও পরিত্যক্ত হইল।

সম্প্রতি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মূলে আঘাত করা হইতেছে। তাহার সংক্ষেপ বৃত্তান্ত এই—ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনরল সর জন লরেন্স শিক্ষা ও রাস্তার জন্য ভূমির উপরে একটী স্থানীয় কর স্থাপনের প্রস্তাব করেন। বর্ত্তমান গবর্ণর জেনরল লার্ড মেয় বাহাদুর ও তাঁহার মন্ত্রীগণ ঐ প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়া বাঙ্গালায় ভূতপূর্ব্ব লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর সর উইলিয়ম গ্রে সাহেবের প্রতি উক্ত কর সংগ্রহের প্রণালী স্থির করিতে বলেন। ন্যায়পরায়ণ গ্রে মহোদয় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সত্তে ভূমির উপরে কর গ্রহণ ন্যায়বিরুদ্ধ স্পষ্টই নির্দ্দেশ করেন। তাহাতে ঐ বিষয়ে ষ্টেট সেক্রেটারী লার্ড আর্গাইল মহোদয়ের নিকট মীমাংসার জন্য প্রেরিত হয়। তাঁহার কাউনসিলের ১৫ জন মেম্বরের মধ্যে ৮ জন (২) প্রস্তাবিত বিষয়ের অনুকূলে এবং ৭ জন (৩) প্রতিকুলে স্ব স্ব অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। বঙ্গদেশের অবস্থাজ্ঞ ও ন্যায় পরায়ণ ব্যক্তি মাত্রেই প্রতিকূলবাদী হইয়াছিলেন। কিন্তু লার্ড বাহাদুর অনুকূলবাদিদিগের সহিত একমত হইয়া প্রস্তাবিত শিক্ষা ও রথ্যাকর স্থাপনে সম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার প্রধান যুক্তি এই যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সত্ত্বেও জমিদারেরা ইনকম টাক্স দিয়াছেন, তখন প্রস্তাবিত কর না দিবেন কেন? এ যুক্তিটী নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক; কারণ ইনকম টাক্স এবং শিক্ষা ও রথ্যাকর কোন রূপেই তুল্যপ্রকৃতি নহে। ইনকম টাক্স একটী সাধারণ কর। সকল প্রদেশের প্রায় সর্ব্বশ্রেণীস্থ লোকের উপরেই উহা স্থাপিত হয়। বিগত সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে দারুন অর্থ কৃচ্ছের

একমাত্র উপায় স্বরূপ উহা অবলম্বিত হইয়াছিল, সুতরাং জমিদারের রাজভক্তি প্রদর্শন জন্য তাঁহাদের চিরস্বত্ব প্রদাতা গবর্ণমেণ্টের স্থায়িত্ব রক্ষার জন্য তাহাতে অসন্তোষ প্রকাশ করেন নাই। বিশেষতঃ ইনকম টাক্স কিছু বিশেষরূপে ভূমির উপস্বত্বের উপরেই স্থাপিত হয় নাই। ইনকম টাক্সের আদি স্থাপনকর্ত্তা উইলসন সাহেব ১৮৬০ সালে যে বক্তৃতা করেন তাহাতে তিনি এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে "ভূমির উপরে যে কোন কর হউক, তাহা হইতে জমিদারেরা মুক্ত বটে কিন্তু সাধারণের সহিত যে টাক্সের সংশ্রব, তাহা তাঁহাদের প্রতিও বর্ত্তিবে।" সর বার্ণেস পিককও তৎকালে উইলসন সাহেবের পোষকতা করিয়া বলিয়াছিলেন "আমি পূর্ব্বে জমিদারদিগের উপরে যে কর স্থাপনের প্রতিবাদী হইয়া মিনিট লিখি, সে একটী বিশেষ কর; ইনকম টাক্স সেরূপ নয়; ইহা দেশ সাধারণের পক্ষেই খাটিতেছে। তৎকালে কেবল জমিদারের উপর কর স্থাপনের কথা হইতেছিল, তাহা করিলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে যে অঙ্গীকার করা হয় তাহা ভঙ্গ হইত সন্দেহ নাই।" দেখ উইলসন ও পিকক মহোদয়ের বাক্যদ্বারা ইনকম টাক্স যে একটী সাধারণ কর, শ্রেণী বিশেষের স্বত্ব সম্বন্ধে তাহার কোন সম্পর্ক নাই, এটী প্রতীয়মান হইতেছে। কিন্তু শিক্ষা ও রথ্যা কর সেরূপ নহে। এটী শ্রেণী বিশেষের কর। সাধারণ করের সহিত বিশেষ করের তুলনা করিয়া স্বমত স্থাপন করাতে ইহাই উপলব্ধি হইতেছে যে লার্ড আর্গাইল বাহাদুর ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। যাহা হউক, ফলে ষ্টেট সেক্রেটারী ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবের অনুমোদন করাতে প্রস্তাবিত কর কিরূপ নিয়মে সংগৃহীত হইবে, তাহা স্থির কবণার্থ এক কমিটী স্থাপিত হইয়াছিল, তাঁহারা স্থির করিয়াছেন, জমিদারদিগের মফস্বলের উৎপন্ন জমার উপবে প্রতি টাকায় ৪ (বার পাইয়ে আনা) চারি পাই হিসাবে কর স্থাপিত হইবে- তাহার তিন ভাগ প্রজারা দিবে, এক ভাগ জমিদারেরা দিবেন। এই চারি পাই যে ভবিষ্যতে কিরূপ ভয়ানক আকারে পরিণত হইবে ত' । কে বলিতে পারে? বিলক্ষণ বোধ হইতেছে শীঘ্রই এবিষয়ের একটী আইন বিধিবদ্ধ হইবে। অতএব চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আসন্নকাল উপস্থিত এবং জমীদার ও প্রজাদিগের চিরস্বত্বের লো. . হইয়া ঘোরতর বিপদের সম্ভাবনা হইয়াছে।

এক্ষণে চিন্তনীয় বিষয় এই যে, যে ব্রিটিশ জাতি ন্যায়পরতা, বাক্যনিষ্ঠা, দয়া ও ঔদার্য্যাদি গুণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই জাতির ধর্ম্ম নীতি কি এত হীনবল হইযা পডিয়াছে যে তাঁহারা সমীচীন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবেন? তাঁহাদের সাধুতার উপবে বিশ্বাস করিয়া যাঁহারা ভূসম্পত্তির উন্নতি সাধনে শরীর পাত কবিয়াছেন, আর যাঁহারা যাবজ্জীবন পরিশ্রম পূর্ব্বক রাশি রাশি মূলধন খাটাইয়াছেন, তাঁহাদের সন্তানেরা কি পিতৃস্বত্ব ও পিত্রোপার্জ্জিত লাভ হইতে বঞ্চিত হইবে? যে সকল জমিদার মোকররি পাট্টা দিয়াছেন, এই অনুদার রাজনীতি বশতঃ তাঁহাদেরও কি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ নিবন্ধন সম্মানের হানি ও অধর্ম্ম হইতেছে না? কোথায় রাজা সচ্চরিত্রতা ও ন্যায়পরতার

আদর্শ স্বরূপ হইবেন, না, তিনি অনায়াসে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গদোষে লিপ্ত হইতে বসিয়াছেন! ইহা কি সামান্য লজ্জা ও আক্ষেপের বিষয়? কি আশ্চর্য্য! সত্য সত্যই কি ইংরাজ জাতির মহত্ব এতদিনে অন্তর্হিত হইল? যদি আজি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভঙ্গ হয়, তবে কালি যে কোম্পানির কাগজ (গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটী) এক কথায় উঠিয়া যাইবে তাহারই বা বিচিত্র কি? গবর্ণমেণ্ট যে ধর্ম্ম বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না বলিয়াছেন, সে কথাতেই বা বিশ্বাস কি? যাঁহাদের নিষ্কর ভূমি আছে, তাঁহারও নিঃশঙ্ক থাকিতে পারেন না। কোন্ দিন নিষ্কর ভূমির উপরেও কোন বিশেষ কর স্থাপিত হইতে পারে। সে ব্যবস্থা বিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞদিগের প্রগাঢ় গবেষণার ফল, যাহা প্রতিজ্ঞা স্বরূপ বহুকাল পর্য্যন্ত মান্য হইয়া আসিয়াছে, এমন অলঙ্ঘনীয় ব্যবস্থার যখন অন্যথা হইতে চলিল, তখন গবর্ণমেণ্টের সমুদয় কার্য্যেই যে লোকের অবিশ্বাস জন্মিবে তাহাতে বিচিত্র কি? তখন শাসনকার্য্যে যে কি বিশৃঙ্খলাই ঘটিবে, তাহা চিন্তা করিলে হতবুদ্ধি হইতে হয়।

উপসংহারে এতদ্দেশীয়দিগের প্রতি বক্তব্য এই তাঁহাদের যদি জন্মভূমি ও চিরস্বত্বের প্রতি মমতা থাকে, শরীরে প্রাণ ও শিরায় রক্ত সঞ্চার থাকে, তাঁহারা যথোচিতরূপে উপস্থিত বিপদের প্রতীকার চেষ্টা করুন; ব্রিটিশ-জাতির সর্ব্বোচ্চ বিচার স্বত্ব প্রতিপাদন করুন; অবশ্যই জয় লাভ হইবে। প্রস্তাবিত বিষয় উপলক্ষে গত ৩রা এপ্রেল জমিদার ও তালুকদার প্রভৃতি বিস্তর সম্ভ্রান্তলোকের এক সভা হইয়া মহাসভায় এক আবেদন প্রেরণই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হয়। যাহাতে সভার উদ্দেশ্য সুসাধিত হয় তদ্বিষয়ে বঙ্গবাসী মাত্রেরই প্রাণপণে যত্ন করা উচিত। আমাদের বিবেচনায় দেশীয় লোকদিগের মধ্য হইতে দুই জন উপযুক্ত প্রতিনিধি ইংলণ্ডে প্রেরণ করিলে অভীষ্ট লাভ হইতে পারে।

দেশের বর্ত্তমান অবস্থা। ১২ অগ্রহায়ণ ১২৬৮। ২ সংখ্যা

আট মাসের পর রাজ প্রতিনিধির রাজধানী প্রবেশ অনল্প বিস্ময়াবহ সন্দেহ নাই। গত দশ বৎসরাবধি রাজস্ব বিষয়ক রাজনীতি লইয়া প্রজাদিগের সহিত গবর্ণমেণ্টের নিরন্তর মতভেদ হইতেছে। যুদ্ধ বিগ্রহাদির পর টাকার অনুসার হয় সুতরাং তখন কর বৃদ্ধির আবশ্যকতা হইয়া থাকে। কিন্তু এখানে সর জন লরেন্সের সময় অবধি প্রগাঢ় শান্তির সময়ে কর বৃদ্ধি হইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান শাসন কর্ত্তার সময়েও প্রকৃতপক্ষে প্রজার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করা হইতেছে বলিলে বড় অত্যুক্তি হয় না। প্রজাগণকে এই বলিয়া প্রবোধ দেওয়া হয় যে শাসন কার্য্যের সুশৃঙ্খলা করিতে গেলেই ব্যয় বৃদ্ধি হয় কিন্তু "সুশাসন" এই শব্দটী আমরা কেবল শুনিয়াই আসিতেছি কাজে ত কিছুই দেখিতে পাই না। রাজধানীর মধ্যে চুরি ও হত্যা হইলে দশটার মধ্যে একটাও ধরা পড়ে না। মফস্বলের ত কথাই নাই। সর্ব্বত্র লাল পাগড়ি দেখ, কিন্তু প্রয়োজনের বেলা কাহাকেও পাইবে না। মফস্বল ও

রাজধানীর উভয় স্থানেই অনুসন্ধানী পুলিষ আছেন, কিন্তু তোমার বাটীতে চুরি গেল তুমি যদি ইহাঁদিগের গাড়ী ভাড়া দিয়া নিরন্তর ইহাঁদিগকে সঙ্গে লইয়া অনুসন্ধান করিতে পার, তাহা হইলে ইহাঁরা চোর ধরিয়া বাহাদুরী লইতে পারেন। নিজে পরিশ্রম না করিয়া যদি পুলিষের উপরে নির্ভর কর, অপহৃত দ্রব্য লাভের কোন সম্ভাবনা নাই। বিচারালয় হইতে সুবিচার লাভের আশাও ক্রমশঃ পরিত্যাগ করিতে হইতেছে। আজিকালি আদালতে প্রকৃত কাজ যত হউক, আর না হউক বাহ্য আড়ম্বর বিলক্ষণ বৃদ্ধি হইয়াছে। একটী কুট-তর্ক করিয়া মকদ্দমা অগ্রাহ্য করিতে পারিলে বিচারপতিগণ তাহার দোষ গুণ বিচারে বড় প্রবৃত্ত হন না। বিচারপতিগণের এই রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। এদেশের অধিকাংশ লোক দরিদ্র, সুতরাং এখানে অল্প টাকার মকদ্দমার সংখ্যাই অধিক কিন্তু বিচারপতিগণ ও গবর্ণমেণ্ট যাহাতে খাস আপীলের সংখ্যা কমে তন্নিমিত্ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন। প্রকৃতার্থে এককালে ইহা উঠাইয়া দেওয়া তাঁহাদিগের অভিপ্রেত। তাঁহারা এই কারণ প্রদর্শন করেন যে বিষয় লইয়া মকদ্দমা হয়, তাহার মূল্য অপেক্ষা গবর্ণমেণ্টের ব্যয় অধিক পড়ে। এটী অযথার্থ নয়; কিন্তু অর্থদ্বারা সুবিচারের কি পরিমাণ করা কর্ত্তব্য। জেলার জর্জদিগের যেরূপ তাহাতে খাস আপীলের নিয়ম উঠাইয়া দিলে দরিদ্রদিগের যে কি দশা হইবে তাহা স্মরণ করিলেও হৃদয় আকুলিত হইয়া উঠে। ভূমিই আমাদিগের প্রধান উপজীব্য। আমরা জানিতাম, যে জাতিই এদেশে প্রভুত্ব করুন, যতই অত্যাচার হউক না কেন, কেহই আমাদিগের ভূমি মস্তকে করিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন না। কিন্তু ইনকম টাক্স মিউনিসিপাল টাক্স, রথ্যাকর প্রভৃতিতে ভূমির সমুদায় রস শোষণ করিতেছে। যাবতীয় করভার দরিদ্র কৃষকের উপরেই পতিত হইতেছে। কয়েক বৎসরাধি বাণিজ্য বৃদ্ধি নিবন্ধন কৃষকদিগের অবস্থার কতক উন্নতি হইতেছিল, কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভঙ্গ করিবার যে রাজনীতি অবলম্বন করা হইয়াছে, তাহাতে দশ বৎসরের মধ্যে কৃষকদিগকে পুনর্ব্বার সেই পূর্ব্বতন অবস্থায় পতিত হইতে হইবে। শস্যের উপরে রপ্তানী কর স্থাপিত হইলে বাণিজ্য বৃদ্ধি দ্বারা এদেশের কৃষকের অবস্থার উন্নতি সম্ভাবনা নাই। ইহাতেও গবর্ণমেণ্ট বলিয়া থাকেন, তাঁহারা নিম্ন শ্রেণীর পরম বন্ধু!

উচ্চতর শ্রেণী সম্বন্ধে বক্তব্য এই, গবর্ণমেণ্ট পুনর্ব্বার তাহাদিগকে মূর্খ করিয়া রাখিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছেন। জমিদারগণ ত শাসনকর্ত্তাদিগের চক্ষুঃশূল; কৃষি, স্বাধীন ব্যবসায়, বাণিজ্য অথবা চাকুরী, এই কয়েকটী মধ্যশ্রেণীর অবলম্বনীয়, কৃষিকার্য্যে যত সুখ লাভ হয় তাহা পুর্ব্বেই বলা হইয়াছে। স্বাধীন ব্যবসায়ের মধ্যে চিকিৎসা এবং ওকালতী। কিন্তু অনেকে এই ব্যবসায় অবলম্বন করাতে ইহাতেও আর তাদৃশ লাভ নাই। গবর্ণমেণ্টের রাজস্ববিষয়ক রাজনীতি নিবন্ধন এদেশের শিল্পের বিলক্ষণ অনিষ্ট হইতেছে। বোধ হয়, ইংলণ্ডে যদি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে শস্য জন্মিত, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট এদেশের কৃষি কার্য্য বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতেন। শিল্পজাত দ্রব্যের উপরে এত কর হইয়াছে, যে তাহার দ্বারা

লাভ হওয়া কঠিন। বাণিজ্যের পথে এত কণ্টক যে বিদেশের সহিত ভারতবর্ষীয়গণের বানিজ্য করা অতিশয় কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। বিদেশের দ্রব্য ক্রয় করিয়া এদেশীয়দিগের নিকটে বিক্রয় করিবার পথ উন্মুক্ত রহিয়াছে বটে কিন্তু দেশের দ্রব্য লইয়া বিদেশে বিক্রয়ের পথ বন্ধ হইয়াছে। সেনাদলের দ্বার রুদ্ধ আছে। ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটদিগের যে কিঞ্চিৎ সম্মান ছিল, কাম্বেল সাহেবের অনুগ্রহে তাহাও গিয়াছে। অচিহ্নিত বিচারপতিগণকে ত পদে পদে অপমানিত হইতে হইতেছে। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি যে রূপ ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহাতে যে কয়েকজন এতদ্দেশীয় সিবিলিয়ান হইয়াছেন, তাঁহারা যে উচ্চতর পদলাভ করিবেন সে সম্ভাবনাও অল্প। যাবতীয় ক্ষমতা ক্রমশঃ শাসন হইতেছে। এতদ্দেশীয়গণ ইহার অংশভাগী নহেন।

আমরা যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই অত্যাচার লক্ষিত হয়। করভারে দেশ উৎসন্ন হইল। তথাপি গবর্ণমেণ্ট ক্ষান্ত নহেন। বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট মিউনিসিপাল আইনের সংশোধন করবার ভাণ করিয়া শিক্ষা ও শান্তি রক্ষার সম্পূর্ণ ব্যয় স্থানীয় আয় হইতে সংগ্রহ করিবার চেষ্টায় আছেন। তদ্ভিন্ন তামাকের উপর কর স্থাপিত হইতেছে। ইনকম টাক্স ও "সেস" কর উঠাইয়া এই কর করিলে বুদ্ধির কাজ হয়, কিন্তু আমাদিগের শাসনকর্ত্তৃগণ যাহা একবার ধরিবেন তাহা পরিত্যাগ করিবেন না। দেশের লোকে প্রতিবাদ করিতেছেন বটে কিন্তু যে পয্যন্ত ডিউক অব অর্গাইল তাহাদের পক্ষে থাকেন, মহাসভায় কোন গোলযোগ না হয়, সে পর্য্যন্ত তাঁহার কাহারও কথা গ্রাহ্য করেন। শাসন কর্ত্তৃগণ রাজধানীতে আসিতেছন, লোকের হৃদয় শুষ্ক হইতেছে। আবার কবে কি হয়। ইনকামটাক্স বাড়ে অথবা কমে। সর্ব্বসাধারণের চিন্তার সীমা নাই। প্রধান শাসনকর্ত্তা যেরূপ রাজস্বমন্ত্রী তদপেক্ষা ন্যূন নহেন। এদিকে প্লাবন পীডা ও দুর্ভিক্ষে দেশ উৎসন্ন করিতেছে। লোক সংখ্যা সর্ব্বত্র কমিতেছে। তথাপি গবর্ণমেণ্ট কর সংগ্রহে ক্ষান্ত নহেন। এই সকল চিন্তা করিয়া আমাদিগের হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠিতেছে। রাজপুরুষগণ যদি দেশের যথার্থ কল্যাণ কামনা করিয়া সাধারণ মতের প্রতি মনোযোগী হইয়া স্বকর্ত্তব্য সাধন করেন, তাহা হইলে ছয় মাসের মধ্যে লোকের কষ্টের অবসান হয়। কিন্তু তাঁহাদের সে চেষ্টা কোথায়? তাঁহারা কেবল দেশ ভ্রমণ দরবার ও ভোজ দিতেই বিশেষ অনুরক্ত। সত্য কথা বলিতে কি, লার্ড মেয়ের সময়ে দেশের যেরূপ দুরবস্থা ও সাধারণের যেরূপ অসন্তোষ হইয়াছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্থাপন অবধি কখন এরূপ হয় নাই। এ অবস্থার পরিণাম যে সুফল প্রসূ নহে, চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই তাহা বুঝিতে পারিবেন।

দুরাত্মা জমিদারদিগের হস্ত বোধ করিবার একটী উপায় করা আবশ্যক

৯ মাঘ ১২৭৮। ১০ সংখ্যা

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অশ্বশালার বানর হইয়াছে। যেখানে যত দৌরাত্ম্য হউক, ঘোড়ার আপদ বালাইয়ের ন্যায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের স্কন্ধে পতিত হয়। কত লোক কত প্রকার আক্রোশ প্রকাশ করেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। অসৎ জমিদারেরা অসাধুতা করিতেছে, প্রজার উপরে অত্যাচার করিতেছে, তাহাতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দোষ কি, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কি অত্যাচার করিবার উপদেশ দেয়? প্রজার কল্যাণ উদ্দেশ করিয়াই এ বন্দোবস্ত করা হয়। এতদ্দ্বারা লার্ড কর্ণওয়ালিসের প্রশস্তহৃদয়তারই পরিচয় হইয়াছে। যদি কেহ বলেন, লাড কর্ণওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না করিলে এ আপদ ঘটিত না, এটী অকিঞ্চিৎকর বাক্য। জগদীশ্বর সৃষ্টি রক্ষার্থই প্রজননশক্তি প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু যদি কেহ অত্যাচার করিয়া অপরের সেই শক্তির বিনাশ সম্পাদন করে, ঈশ্বরের প্রতি দোষারোপ ন্যায়ানুগত হয় না। অত্যাচাবকারী জমিদারদিগের দৌরাত্ম্য নিবারণের উপায় বিধান কি সাধ্যায়ত্ত নয়? চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভঙ্গ করা সে উপায় হইতে পারে না। অনেকে ইংরাজদিগের বাক্যের উপর বিশ্বাস করিয়া অনেক ব্যয় ও অনেক বন্দোবস্ত করিয়াছেন। এখন যদি উহার অন্যথা হয়, কেবল যে ইংরাজদিগের প্রতিজ্ঞাভঙ্গ দোষ ঘটিবে এরূপ নয়, অনেকে অনেক প্রকার আপদে পতিত হইবেন। সে সমস্ত আপদের কথা চিন্তা করিলে অন্তঃকরণ একান্ত আকুলিত হয়। তন্নিমিত্ত আমরা অনেকদিন অবধি এই প্রস্তাব করিয়া আসিতেছি, জমিদারদিগকে মধ্যে রাখিয়া এরূপ একটা বন্দোবস্ত করা উচিত যে জমিদারেরা প্রজার নিকট হইতে এক পয়সা অধিক লইতে না পারেন।

ইচ্ছা করিয়া পত্তন দরপত্তন প্রভৃতি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিশুদ্ধ হইয়া আসিবে। অনেকবার এই সোমপ্রকাশে এগুলি রহিত করিবার এক বিধি-বিধানের অনুরোধ করা হইয়াছে। এতন্নিবন্ধন কত অনিষ্ট ঘটিতেছে, নিম্নলিখিত পত্রখানি তাহার পরিচয় দিয়া দিবে।

প্রজার মঙ্গল সাধন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কর্ত্তার অভিপ্রেত ছিল বটে, তদনুরূপ সুবিধান কিছুই হয় নাই। তবে ১৮৫৯ অব্দের ১০ ও ১৮৬৯ অব্দের ৮ আইনের দ্বারা যে কিছু সুব্যবস্থা হইয়াছে মাত্র কিন্তু তাহাও সম্পূর্ণরূপে কার্য্যে পরিণত হইবার অনেক বিঘ্ন রহিয়াছে। যে হেতু ঐ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জমা নির্ণয়ার্থ জমীদার প্রভৃতির প্রদত্ত পাটওয়ারি জমাওয়াশীল প্রভৃতি কাগজে প্রজাগণের জমা লিখিত ছিল। ঐ কাগজের দ্বারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বের জমা প্রমাণ করা সুসাধ্য হইত। কোন কোন জেলাব প্রজাগণের দুভাগ্যবশতঃ সে কাগজ নষ্ট হইয়া

গিয়াছে। রাজপুরুষগণের কাগজ নষ্ট করা একটী রোগ হইয়াছে। কেবল প্রজাগণের অশেষবিধ ক্ষতি ক্লেশ হয়। ইহাতে কাগজ নষ্ট করিবার বিধির প্রণেতা রাজপুরুষগণ প্রত্যবায়ভাগী হইতেছেন এবং ঐ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে কেবল জমিদার তালুকদার প্রভৃতির প্রকৃত উপকার দর্শিয়াছে। তাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে প্রচুর লাভ করিতেছেন। অধীনস্ত প্রজাপুঞ্জের যথাসর্ব্বস্ব শোষণ করিয়া ক্রমে তাঁহাদিগের লোভের বৃদ্ধি হইতেছে। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর প্রজারা কি পরিমাণে ও কি নিয়মে কর দিবে, তাহার একটি সুবিধান হইলে ভূম্যধিকারিগণের দৌরাত্ম্য হইতে নিঃস্ব প্রজারা পরিত্রাণ পাইতে পারে। ফলতঃ জমিদারগণের হস্তবুদের কাগজ দর্শন করিয়া যেমন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও জমা ধার্য্য হইয়াছিল, তদনুরূপ কোন একটা উপায়ের দ্বারা নিম্ন শ্রেণীর প্রজাগণের একটী স্থায়ী জমা নির্ণয়ের বিধান হইলে জমির প্রতি প্রজার মমতা জন্মে। ভূমির উন্নত অবস্থা দেখিলে এক্ষণে জমিদার পত্তনিদার প্রভৃতি নানা কৌশল দ্বারা প্রজাগণের কর বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করেন. এই শঙ্কাবশতঃ প্রজারা কোন কারণে কখন দায়গ্রস্ত হইলে ঐ সকল জমা বন্ধক বা কোনরূপে হস্তান্তর করিয়া তদ্দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে না। এই, জন্য প্রজারা ভূমির অবস্থার উন্নতির নিমিত্ত অধিক পরিশ্রম করেন না।

বঙ্গদেশে আর একটী পাকা জুয়াচুরির সৃষ্টি ও তাহা বদ্ধমুল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেকানেক ভূম্যধিকারী পত্তনি বন্দোবস্ত করিবার ঘোষণা করিয়া দেন। দুর্ব্বৃত্ত ও প্রজাঘাতক ধনবানেরা যাইয়া ডাক সুরু করেন অর্থাৎ কেহ বলেন, যত শেলামী দিব তাহার শতকরা ॥০ আনা হিসাবে সুদ ও ॥০ আট আনা হিসাবে শরঞ্জামী হস্তবুদ জমা হইতে বাদ দিয়া অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহাই জমা ধার্য্য করিয়া আমাকে দেন। কেহ বলেন, আমি সুদ শরঞ্জামী কিছুই চাই না। মফস্বল যত হস্তবুদ আছে তাহাই জমা ধার্য্য ও তৎপরিমাণে কি তাহার দ্বিগুণ পরিমাণে যত টাকা হয় শেলামি দিব এবং ঐ হস্তবুদ মফস্বলে যাচাই করিতে চাহি না, এইরূপ কথা ও ডাক হইতে হইতে যতদূর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইতে পারে তাহা করিয়া সেই শেলামিই গ্রহণে বিশেষ লাভ হয়, এরূপে পত্তনি বন্দোবস্ত করিয়া রীতিমত তাহার লেখাপড়া করিয়া লইয়া পত্তনিদারের হস্তে খড়্গ দিয়া বিদায় করা হয়। পত্তনিদার মফস্বলে আসিয়া দেখেন, জমিদারের প্রদত্ত হস্তবুদে অনেক মিথ্যা আছে। কি করেন, তথায় ঐ মিথ্যা হস্তবুদ এবং নিজের শরঞ্জামি ও অন্য অন্য খরচ ও শেলামী টাকার সুদ প্রভৃতি বাদে আপনার লাভ করিয়া লওয়ার জন্য প্রজাদের মস্তকে খড়্গাঘাত করিতে প্রবৃত্ত হন। আমাদিগের রাজপুরুষেরা কিঞ্চিৎ মনোযোগ করিয়া ১০ ও ১৫ বৎসরের মধ্যে যে সকল পত্তনি, দরপত্তনী তালুকের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার পাট্টা ও কবুলতি ও মফস্বলের হস্তবুদ ·তলব ও তদন্ত করিয়া দেখিলেই ঐ সকল জুয়াচুরি অনায়াসে বুঝিতে পারেন।

কোনগ্রামের একজন নির্দ্দয় জমিদার চতুরতা করিয়া মফস্বলের প্রজার প্রকৃত

হস্তবুদ অপেক্ষা অধিক জমা ধার্য্য করিয়া স্বীয় জমিদারি পত্তনি বন্দোবস্ত করিয়া প্রচুর সেলামী গ্রহণ করেন। ভদ্রলোক পত্তনিদার শেষে অধিক করভার বহনে অসমর্থ হওয়াতে ১৮১৯ অব্দের ৮ আইন অনুসারে ঐ পত্তনি নিলাম করা হয়; কিন্তু লোকশানী মহল জানিয়া অন্য অন্য ধনবান জমিদার (যাঁহারা প্রজাপীড়নে অপটু) তাঁহারা কেহই ক্রয় করিতে অগ্রসর হন না। কেবল একজন সঙ্গতিশালা প্রজাপীড়ক জমিদার মহাশয় উল্লিখিত লোকশানের বৃত্তান্ত উত্তমরূপে জ্ঞাত থাকিয়াও উহা ক্রয় করিয়া এক্ষণে ঐ নাজাই জমা ও শরজামী ও অন্য অন্য খরচা ও পণের টাকার সুদ ও পত্তনিদারের লভ্য এই কয়টীর সংগ্রহার্থ প্রথমতঃ প্রজাগণের নিকট তাহারদের জমার উপরে ফি টাকায় তিন চারি আনা হিসাবে আবুআব চাহেন। ইহা না দেওয়াতে ন্যায্য কর গ্রহণে অসম্মত হইয়া ঐ সকল প্রজার অন্য অন্য নিষ্কর ইত্যাদি ভূমি স্বীয় পত্তনির ভূমি বলিয়া জরিপ করিতে সচেষ্ট ও সুদ সহিত অবশিষ্ট করের দাওয়া এবং অন্য অন্য প্রকার মকদ্দমা প্রজাগণের বিরুদ্ধে উপস্থিত করিতেছেন। ইচ্ছা এই যে, তাহাদিগকে নানা প্রকার খরচা ইত্যাদিতে বিব্রত করিয়া স্বীয় অভীষ্ট সাধন করিবেন। ভাল, সম্পাদক মহাশয়! নিরীহ দুঃস্থ প্রজারা উপরি উক্ত মত বর্দ্ধিত জমায় পত্তনি বন্দোবস্ত করিতে পত্তনিদাতা বা গ্রহীতাকে অনুরোধ করে নাই এবং ঐ লোকশানী পত্তনি-মহল ক্রয় করিতেও দিব্য দেয় নাই। তবে কি অপরাধে তাহারা এক্ষণে ঐ ক্ষতি পুরণ ও লাভ করিয়া দিতে বাধ্য হইবে? পত্তনির নিলাম ক্রেতা তাঁহার ক্ষতি পুরণ ও লাভ করিয়া দিতে বাধ্য হইবে? পত্তনির নিলাম ক্রেতা তাঁহার ক্ষতি পুরণের নিমিত্ত জমিদারের বিরুদ্ধে নালিশ করুন, যদি তাহা না হয় এবং লোকশান দিতে না পারেন, তবে ক্রয়স্বত্ব পরিত্যাগ করুন। নিরীহ প্রজাগণকে পীড়ন করিয়া স্বীয় উদর পুরণ করা কর্ত্তব্য হয় না।

অন্যায় বল প্রকাশ ও জরিপ এবং কর গ্রহণ ইত্যাদি অত্যাচার নিবারণ ও ন্যায্য কর গ্রহণে অসম্মত হইলে সুদ খরচায় অব্যাহতি লাভের নিমিত্ত রাজপুরুষগণ হইতে বিবিধ প্রকার আইন হইয়াছে বটে কিন্তু সেই আইন অনুসারে প্রবল জমিদারের সহিত বিবাদ করিয়া তিষ্ঠিয়া থাকে অর্থাৎ মকদ্দমাদির ব্যয় করিয়া উঠে, এমন সঙ্গতি সম্পন্ন ও সাহসী প্রজা প্রায় কোন দেশে নাই।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হওয়া অবধি এ পর্য্যন্ত ঐ প্রদেশে ভূমি জরিপ বা প্রজার কর বৃদ্ধি হয় নাই। কিন্তু জমিদারকে ঐ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সময়ে যে মালিকানী শরঞ্জামী দেওয়া হয়, জমিদার তদপেক্ষা প্রচুর ৷৶৷ ভোগ করিতেছেন। তাঁহার উক্ত অবধারিত সদর জমা ও মালিকানা শরঞ্জামির অন্যথা হয় নাই, ভূমির বা প্রজার উন্নতির নিমিত্ত অর্থ ব্যয় করিতেও হয় নাই, তবে এক্ষণে প্রজার কর কি জন্য বৃদ্ধি হইবে? ঐ বন্দোবস্তের পর জমিদার কোন কোন প্রজার সহিত ভূমির বন্দোবস্ত করিয়াছেন, সত্য তাহাও স্বীয় বিবেচনানুসারে লাভ হয়, এরূপ করিয়া বন্দোবস্ত ও কর গ্রহণ করিয়াছেন।

যেহেতু তাঁহার ইচ্ছা ও সম্মতি প্রজারা জমিদারকে জোর করিয়া ঐ বন্দোবস্ত করিয়া লইতে ও কর দিতে পারে নাই। যখন জমিদারের প্রচুর লভ্য থাকা দৃষ্ট হইতেছে, তখন তাঁহার অধীন পত্তনিদারের স্বীয় লভ্যের নিমিত্ত প্রজার উপরে কর বৃদ্ধি করা কোনক্রমেই ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে না। জমিদার একাল পর্য্যন্ত সে প্রজার নিকট যে পরিমাণে কর গ্রহণে লাভ করিয়াছেন, পত্তনিদারের সে প্রজার নিকট অধিক কর লওয়ার প্রত্যাশা করা অন্যায়। পত্তনিদার পরিশেষ না জানিয়া শুনিয়া যদি বিষপান করিয়া থাকেন, তন্নিমিত্ত নির্দ্দোষ প্রজারা কি ফাঁকে যাইবে, আমরা যন্ত্রণা ভোগ করিতে অসমর্থ হইয়া প্রার্থনা করিতেছি, রাজপুরুষেরা কিঞ্চিৎ মনোযোগী হইয়া এই সমস্ত অত্যাচারের নিবারণ করুন।

"দুঃখী প্রজার কেহই নাই।" ১৮ ভাদ্র ১২৭৯। ৪২ সংখ্যা

এই শীর্ষক দিয়া প্রয়াগদূতে একটী প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে। সোমপ্রকাশে পূর্ব্বের ন্যায় দুঃখী প্রজার সপক্ষতা করা হয় না বলিয়া সোমপ্রকাশের প্রতি দোষারোপও করা হইয়াছে। আমরা এই প্রস্তাবটী পাঠ করিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলাম। প্রয়াগদূত সবিশেষ না জানিয়া দোষারোপ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। সোমপ্রকাশের ধনী ও জমিদার এবং দুঃখী ও প্রজা বলিয়া ইতর বিশেষ করা নাই। সোমপ্রকাশ অত্যাচার পীড়িতের সপক্ষ ও অত্যাচার কারীর বিপক্ষ। জমিদারেরা প্রজার উপরে অত্যাচার করিলে সোমপ্রকাশ যেমন প্রজার পক্ষ অবলম্বন করেন তেমনি প্রজারা ধর্ম্মঘট করিয়া জমিদারের প্রতি অত্যাচার করিলে প্রজার বিপক্ষ হইয়া থাকেন। তবে আজি কালি নব্য দলের অনেক সোমপ্রকাশকে দুঃখী প্রজার প্রতি উদাসীন জ্ঞান করেন, তাহার একটী কারণ ঘটীয়াছে। আজি কালি গবর্ণমেণ্ট ইতরশ্রেণীর বিদ্যাশিক্ষার্থ কোলাহল আরম্ভ করিয়াছেন। নব্যদলও সেই ধুয়া ধরিয়াছেন। সোমপ্রকাশ নব্যদলের ন্যায় ইতর শ্রেণীর বিদ্যাশিক্ষা করিয়া মত্ত হন নাই, এই সোমপ্রকাশের দোষ। আমরা দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি, গবর্ণমেণ্ট ইতর শ্রেণীর বিদ্যাশিক্ষার্থ যে চেষ্টা পাইতেছেন, তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না, তদ্বিষয়ে যে ব্যয় করিবেন, তাহা বিফল হইবে, মধ্যে আর একটি অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। এদেশে স্ত্রীশিক্ষা ও ইতরশ্রেণীর শিক্ষা উভয়ের তুল্য অবস্থা। এখন এ উভয় বিষয়ে যাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদিগের ধরিয়া ভদ্র ঘটান হইতেছে। এরূপ ভদ্র ঘটনায় প্রকৃত ভদ্র হয় না। প্রয়াগদূত কি শুনেন নাই স্থানে স্থানে কত বালিকা বিদ্যালয় ও চাষাদিগের অধ্যয়নার্থ নৈশ বিদ্যালয় হইতেছে, ত্রিরাত্র না যাইতে যাইতে তাহা আবার উঠিয়া যাইতেছে? যে বিষয়ে স্বার্থবোধ না হয়, তাহার কখন উন্নতি হয় না। বিশেষতঃ স্বচ্ছলের অবস্থা না হইলে বিদ্যাশিক্ষা

হয় না। যে যে ভদ্রলোকের অবস্থা ভাল নয় তাঁহাদিগের সন্তানগণের লেখাপড়া ভাল হয় না, বোধহয় প্রযাগদূতের ইহা অবিদিত নাই। পক্ষান্তরে যে যে ইতর লোকের অবস্থা ভাল, তাহাদিগের সন্তানগণ লেখাপড়া শিখিতেছে। তাহাদিগের নিমিত্ত স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজন হয় নাই, তাহাদিগকে স্বতন্ত্র উৎসাহ দিবারও প্রয়োজন হয় নাই। তবেই স্থির হইতেছে যাবৎ ইতর শ্রেণীর স্বচ্ছল অবস্থা ও স্বার্থবোধ না জন্মিবে, তাবৎ তাহাদিগের লেখাপড়া হওয়া কঠিন। তাবৎ সহস্র চেষ্টা পাইলেও কৃতার্থতা লাভ সম্ভাবনা নাই। বোধহয় প্রযাগদূত শুনিয়া থাকিবেন, চাষাপ্রধান গ্রামের বিদ্যালয়ে বর্ষা-কালে ও অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে ছাত্র হয় না। চাষ তত্তৎ গ্রামের উপজীবিকা। সুতরাং চাষারা চাষের সময় সন্তানদিগের বিদ্যালয়ে গমন বন্ধ করিয়া ক্ষেত্রে লইয়া যায়। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে চাষাদিগের অগ্রে অন্ন চিন্তা, তাহার পর বিদ্যা চিন্তা, তাহারা বিদ্যার আশায় কৃষিকার্য্যের ক্ষতি করে না। এই কারণে আমরা বহুবার এই অনুরোধ করিয়াছি, যাহাতে চাষাদিগের স্বচ্ছল অবস্থা হয়, তাহাদিগের সহিত তাদৃশ কোন প্রকার ভূমির স্থায়ী বন্দোবস্ত করা উচিত।

গবর্ণমেণ্ট ইতরশ্রেণীর বিদ্যাশিক্ষা দিবার চেষ্টা পাইতেছেন, তাহাতে পণ্ডব্যয়, বিফল ও প্রত্যুত অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। আমরা উপরে যে লিখিলাম তাহার কারণ এই, গবর্ণমেণ্ট এ নিমিত্ত স্বতন্ত্র ব্যয় দিবেন না। হয় উচ্চ শিক্ষার্থ ব্যয় বন্ধ করিয়া এ ব্যয় দেওয়া হইবে নতুবা এ নিমিত্ত স্বতন্ত্র কর হইবে। উভয়েরই লোকের অসন্তোষ। কি কারণে লোকের এ অসন্তোষ। তাহাও একবার বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। এমনি একটী কাজের নিমিত্ত লোকে বার্ষিক ৫০০ টাকা বেতন পান তাহার অনুরূপ কোন কার্য্য হইতেছে না। একজন উপযুক্ত লোকের হস্তে এ ভার দিলে এবং তাঁহার প্রকৃত যত্ন থাকিলে অনেক কাজ হইতে পারিত। হিউম সাহেব উপযুক্ত হইলে এতদিন কতক কাজও করিতে পারিতেন। রিপোর্ট লিখিয়া সর্ব্বসাধারণকে বিমোহিত করিবার সময় অতীত হইয়াছে।

দুঃখী প্রজাদিগের কেহই নাই? ৮ ভাদ্র ১২৭৯। ৪২ সংখ্যা

প্রযাগদূত হইতে উদ্ধৃত

জনসমাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? এক কথায় অনেকে বলিবেন, কেন দেশের বড বড ধনী, জমিদার ও জ্ঞানি লোক? সাধারণের ত ইহাই সংস্কার যে দেশের উচ্চপদস্থ কিম্বা সম্ভ্রান্ত লোকই বড লোক বলিয়া পরিগণিত। এ সংস্কারটী সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। জনসমাজের অধিকাংশ লোক কোন্ শ্রেণীর? শ্রমোপজীবী সামান্য লোকই অবশ্য জনসমাজ রক্ষা করে। কাহারা তাহার পরিচ্ছদ দিয়া মানব সমাজকে জীবিত রাখে?

কে সর্ব্বপ্রকার সুখ সামগ্রী আহরণ করিয়া মানবমণ্ডলীকে সুখী করে? শ্রমোপজীবী সামান্য লোকেরাই জমিদারের ধনসম্পত্তি ও বলবীর্য্য। কাহাদের অর্থে গবর্ণমেণ্টের ধনকোষ পূর্ণ হইতেছে? ইহা কি সামান্য লোকের পরিশ্রমের ফল নহে? কাহাদের অর্থে গবর্ণমেণ্টের উৎকৃষ্ট কল্পনা ও উন্নত কার্য্য সকল সম্পন্ন হইতেছে? ইহা কি দুঃখী প্রজাদের যত্নে ও অর্থে নহে? বাস্তবিক সামান্য দুঃখী প্রজারাই জনসমাজের সুখ সম্পদ বলবীর্য্য, ধনীর মুখাপেক্ষা না করিয়া ইহারা চলে, কিন্তু ইহাদের উপর নির্ভর না করিলে সংসার অচল হয়, ধনীর জীবিকা নির্ব্বাহ করা দুষ্কর হইয়া উঠে। ইহাদের ধনেই মনুষ্য ধনী, ইহাদের পরিশ্রমেই সকলে সুখী। শত শত ভদ্র সন্তান কাহাদের অর্থে উচ্চ উচ্চ বিদ্যালয়ে উৎকৃষ্ট শিক্ষা লাভ করিতেছেন? তাহা কি সাধারণ দুঃখী লোকের অর্থ নহে? তবে গরিব লোকেরা কি জনসমাজের শ্রেষ্ঠ লোক নয়?

এদেশে মকদ্দমা বৃদ্ধির কারণ। ১৮ অগ্রহায়ণ ১২৭৯। ৩ সংখ্যা।

অনেকে বলেন, এদেশীয়েরা মকদ্দমা ভালবাসেন বলিয়া মকদ্দমার এত বৃদ্ধি হইয়াছে। মকদ্দমাপ্রিয়তা যদি স্বভাবসিদ্ধ হইত, এদেশীয়দিগের এই ভাব চিরকাল নয়নগোচর হইত সন্দেহ নাই। আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি, বৃদ্ধেরা মকদ্দমা নাম শুনিলে কম্পিতকলেবর হইতেন, পেয়াদা দেখিলে গৃহপ্রবিষ্ট হইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিয়া থাকিতেন। গ্রামস্থ লোকদিগের পরস্পর বিবাদ হইলে উভয়েই মিলিয়া এক সঙ্গে যে প্রধান তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া আপনাদিগের অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেন। তিনি উভয়ের বক্তব্য শ্রবণ করিয়া বিবাদের মীমাংসা করিয়া দিতেন। উভয়েই তাহাতে সন্তুষ্ট হইতেন। পরস্পরের মনোমালিন্য দূর হইত। গ্রামবাসিদিগের বিবাদ সচরাচর ঘটিত না। এতদ্দ্বারা নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে এদেশীয়দিগের মকদ্দমাপ্রিয়তা স্বভাবসিদ্ধ নহে। মকদ্দমা বৃদ্ধির ইহা কারণ নয়, অন্য কোন বিশেষ কারণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। সে কারণ এই, এদেশে অল্প শিক্ষার প্রাদুর্ভাব ও তন্মূলক ভক্ত তেজস্বিতার বৃদ্ধি। অল্প শিক্ষা যে বহু অনিষ্টের কারণ হয়, এখানকার রাজপুরুষেরা তাহা না বুঝুন সেকেলে পোপ বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। আমরাও উহার ফল অহরহঃ প্রত্যক্ষ করিতেছি। আজি কালি বঙ্গদেশের অধিকাংশ লোক কিছু কিছু লেখা পড়া শিখিয়াছে, তন্নিবন্ধন এই অনিষ্ট ঘটিয়া উঠিয়াছে। কাহাকে প্রকৃত তেজস্বিতা বলে, উহারা তাহা না বুঝিয়া বৃথা অভিমানের একান্ত পরবশ হইয়াছে। তাহার এই ফল ফলিয়াছে, এখন আর গুরু লঘু জ্ঞান ও বৃদ্ধের সম্মান নাই। পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হইলে প্রায় কেহ আর গ্রামবৃদ্ধের নিকটে গমন করে না, তাঁহার কৃত মীমাংসাতেও সন্তুষ্ট হয় না, আদালতের দ্বার খোলা আছে বলিয়া মকদ্দমা আরম্ভ করিয়া দেয়। বিজ্ঞ ব্যক্তির যুক্তিসঙ্গত বাক্যে উপেক্ষা

করা, গুরু লোকের আজ্ঞা অগ্রাহ্য করা যদি শিক্ষার ফল হইল, ইহার পর বিড়ম্বনা না আর কি আছে? এই অল্প শিক্ষা প্রাদুর্ভাবনিবন্ধন কেবল যে মকদ্দমার বৃদ্ধি হইয়াছে এরূপ নয়, গ্রামবাসিরাও একান্ত অসুখিত হইয়াছে।·· কাণ্ড ঘটিতেছে, পূর্ব্বে একজন বৃদ্ধের একটী বাক্য দ্বারা সহজে উহার মীমাংসা হইয়া যাইত। এ অবস্থা শোচনীয় সন্দেহ নাই। এই শোচনীয় অবস্থার উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই লক্ষিত হইতেছে।

পাবনার প্রজাবিদ্রোহ। ২৪ আষাঢ় ১২৮০। ৩৪ সংখ্যা

হুজুকে বাঙ্গালা। একগুণ হইলে এখানকার লোকে শতগুণ করিয়া তুলে। মধ্যে বিদ্রোহ বিদ্রোহ বলিয়া যে প্রকার রব উঠিল, বোধ হইল যেন ১৮৭৩ অব্দের পাবনার বিদ্রোহ হইতে ১৮৫৭ অব্দের উত্তরপশ্চিম অঞ্চলের বিদ্রোহ বিস্মৃত হইতে হয়। উপস্থিত বিদ্রোহের যে হেতুবাদ ও স্বরূপ বর্ণনা করা হয়, তাহাতে আমাদিগের সম্পূর্ণ সংশয় ছিল, তাহা অত্যুক্ত হউক আমরা বিরক্ত হইতেছিলাম, পাবনা সুশাসিত প্রদেশ, সেখানে পুলিষ ও মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি জাজ্বল্যমান তবে এরূপ হইতেছে কেন? উদয়কালেই উহার উন্মূলন না হইবার কারণ কি? যাহা হউক আমরা এক্ষণে শুনিয়া আনন্দিত হইলাম কমিসনর মাজিষ্ট্রেট পুলিষ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রভৃতি সকলেই কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন। লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর এ বিষয়ে উদাসীন নহেন। তিনি যে একটী ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমরা অধিকতর প্রীতিলাভ করিলাম। প্রজা ও জমিদার উভয়কেই বৈধ উপায় অবলম্বন করিয়া আপন আপন প্রার্থয়িতব্য সাধনের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

আপাততঃ যে উপায় অবলম্বিত হইল, ইহাতে উপস্থিত আপদের প্রতীকার হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার মূল উদ্ধৃত করা আবশ্যক। তাহা না করিলে ইহার পুনরায় উদ্ভেদ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা রহিল। লেপ্টনাণ্ট গবর্নর বলেন, জমিদারেরা নিরিখ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করাতেই এই গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ব্বে এ প্রকার নিরিখ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিলে এপ্রকার গোলযোগ হইত না, এখন হয় তাহার কারণ কি? অনেকে ১০ আইনের প্রতি দোষারোপ করেন। যাহারা একথা বলেন, তাঁহারা জমিদার-দিগের পক্ষ সন্দেহ নাই। ১০ আইন জমীদারের হস্ত রোধ করিয়াছে। এটী জমিদার ও তাহার অত্যাচার দর্শনোৎসুক মিত্রগণের অতি অসুখের হইয়াছে। তাঁহারা যাহা বলুন ১০ আইনের গুণ বিনা দোষ নাই। রুশিয়ার সর্ফদিগের ন্যায় বাঙ্গলাদেশের প্রজার যে শোচনীয় অবস্থা ছিল, ১০ আইন তাহার অনেক সংশোধন করিয়াছে। এই আইনটী প্রজাগণের স্বাধীনতার চারট্যর স্বরূপ।

আমরা বলি ১০ আইনের দোষে প্রস্তাবিত গোলযোগ উপস্থিত হয় নাই। বাঙ্গালাদেশে কতগুলি অর্দ্ধক্ষিপ্ত অর্দ্ধশিক্ষিত আছেন। বৈধ উপায় দ্বারা অভীষ্ট সাধন চেষ্টা পাইলে

জগতের যে অভ্যুদয় লাভ হয়, তাঁহাদিগের সে শিক্ষা হয় নাই। বিপ্লব উপস্থিত করিয়া কার্য্যসাধনকেই তাঁহারা সাধীয়ান জ্ঞান করেন। চাষারা পশুপালের তুল্য, তাহাদিগের পরিণাম দর্শন ও হিতাহিত বোধ নাই। তাহাদিগকে যে দিকে ফিরান যায়, সেই দিকেই ফিরে। উক্ত অর্দ্ধক্ষিপ্তেরা একটী মুল পাইলেই ইহাদিগের অধিনায়ক হইয়া বসেন। অর্দ্ধক্ষিপ্তদিগেব নাম বাহির করিবারও মনে মনে একটী বলবতী ইচ্ছা আছে। উহারাই যাবতীয় বিপ্লব ঘটাইবার মুল। আমরা অনুরোধ কবি, লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর অনুসন্ধান করুন, উপস্থিত বিপ্লবেব কে কে অধিনায়ক, তাহাদিগের গুরু দণ্ড বিধান করুন। অপর অনুরোধ এই, ১০ আইন আছে বটে কিন্তু আজিও অনেক জমিদাব আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আপনাদিগের অভীষ্ট সাধন চেষ্টায় ঔদাসীন্য করেন। তাঁহারা স্বহস্তে আইন গ্রহণ করিয়া প্রজাদিগকে স্ববশে রাখিবার চেষ্টা পান, তাহাদিগকে ধরিয়া নিজ বাটীতে আনয়ন করেন, প্রহারেও পরাঙ্মুখ হন না। উপস্থিত ঘটনায় যদি কোন জমিদারেব উল্লিখিত দুর্ব্ব্যবহাব দোষ থাকে, তাহারও অনুসন্ধান ও গুরুদণ্ডবিধান বিধেয়। তাহা হইলে ভবিষ্যতে এ প্রকাব বিদ্রোহ ঘটনার পুনবাবিভাব সম্ভাবনা অল্প হইবে সন্দেহ নাই।

উভয়সঙ্কট। ২৪ ভাদ্র ১২৮০। ৪৩ সংখ্যা

সম্প্রতি জমিদারের সহিত প্রজাদিগের যে বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে, ইহাব মীমাংসা করিতে গিয়া গবর্ণমেণ্ট যে অবস্থায় পড়িয়াছেন, আমবা তাহাব উভয়সঙ্কট নাম দিলাম। সেদিন পাবনাতে ঘোরতর বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্বলিত হইল এবং তাহা নির্ব্বাণ হইতে না হইতে আবার শুনা যাইতেছে ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানে প্রজাবা জমিদারদিগেব বিপক্ষ হইয়া দলবদ্ধ হইয়াছে। সকল স্থানেই যে কব বৃদ্ধি কিম্বা জমিদাবদিগেব অত্যাচাব এইরূপ দলবদ্ধ হইবাব কাবণ তাহাব বোধ হইতেছে না। আমবা যাহাদিগকে ন্যায়-পরাযণ ও ধর্ম্মভীরু বলিয়া জানি, একপ কোন কোন জমিদারের অধিকারের মধ্যেও এইরূপ ধর্ম্মঘট হইবার কথা শুনা যাইতেছে। এ সকল নিবাবণেব উপায কি? গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে যে দিকে যাইবেন সেই দিকেই বিপদ। প্রথম, জমিদাবেরা যে সকল আইন-বিরুদ্ধ কর আদায় কবেন, তাহা অন্যায় বলিয়া যদি প্রজাদিগের নিকটে ঘোষণা করা হয় তাহা হইলে মূর্খ প্রজাবা অতি গর্হিত ব্যবহার কবিতেছে, ন্যায়সঙ্গত সমুদায় কর আদায় করিবার বিষয়ে জমিদারদিগের অধিকার আছে, গবর্ণমেণ্ট প্রজাদের এ অন্যায় আপত্তি শুনিবেন না, তাহা হইলে আবার প্রজারা হতাশ হইয়া পড়ে এবং জমিদারেরা গবর্ণমেণ্টকে অনুকুল মনে করিয়া অবাধে অত্যাচার আরম্ভ করেন। এই কারণেই এ বিষয়ে লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরকে নানা কথা কহিতে হইতেছে। সেদিন পাবনা ঘটিত ঘোষণাতে বলিলেন সে আইন বিরুদ্ধ কর গ্রহণ নিবারণের জন্য প্রজাদিগের ন্যায়সঙ্গত ধর্ম্মঘট করিবার

অধিকার আছে। আবার সম্প্রতি তাঁহার যে ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন "ভূমির ন্যায় কর ভিন্ন অনেকগুলি কর জমিদার ও প্রজা উভয়ের সম্মতি অনুসারে নির্দ্ধারিত এবং চিরক্রমাগত সুতরাং সেগুলির নিবারণ করিলে জমিদারদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয় অতএব অনেক বিবেচনা করিয়া গবর্ণমেণ্ট আপাততঃ এ সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা অনুচিত বলিয়া স্থির করিয়াছেন।" এ কথার এই ফল হইবে যে জমিদারগণ গবর্ণমেণ্টের সম্মতি জানিয়া এই সকল করের উপলক্ষ করিয়া হয়ত অনেক অত্যাচার করিবেন। এই পত্রে লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর মাজিষ্ট্রেট কালেক্টরদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন যে তাঁহাদের এলাকার মধ্যে যদি কোন জমিদার বল প্রকাশ কিম্বা অত্যাচার দ্বারা ন্যায়বিগর্হিত কর আদায়ের চেষ্টা পান, তৎক্ষণাৎ তাঁহারা সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন। কিন্তু কোন্ করগুলি ন্যায়বিগর্হিত এবং কোন্‌গুলি চির প্রথাসিদ্ধ ও উভয়ের সম্মতিতে স্থাপিত, তাহার কোন মীমাংসা হইল না। লোকে সচরাচর যেগুলিকে "বাব" বলিয়া জানেন, তাহা সকল প্রদেশে কিম্বা সকল বিভাগে সমান নহে। সুতরাং এক প্রদেশ ধরিয়া মীমাংসা হইতে পারে না। আবার ভাবিয়া দেখা যাউক সে ক্রমেই ভূমির আয় বৃদ্ধি হইবে, যদি সেই বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে করের বৃদ্ধি না হয়, জমিদারদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। প্রজারা যেরূপ মূর্খ, তাহাতে তাহারা বরং পাঁচটা বাহিরের "বাব" দিতে পারে কিন্তু বর্দ্ধিত কর দিতে সহজে সম্মত হয় না। এই কারণেই এই সকল বাবের সৃষ্টি হইয়াছে। জমিদারেরা এক দিকে এই সকল উপায় দ্বারা সেই ক্ষতি পূরণ করেন। প্রজারাও এই গুলিকে সাময়িক ও আইন বহির্ভূত-জানিয়াও সম্মত হয়। কারণ, তাহারা মনে করে যদি কোন কারণে তাহারা এগুলি দিতে অসমর্থ হয়, জমিদারেরা আইনের সাহায্যে তাহা আদায় করিতে পারিবেন না। ভাবিয়া দেখিলে দেখা যায় এই কারণেই অত্যাচার করা অনেক সময়ে আবশ্যক হইয়া পড়ে। এই সকল বাব আদায় না করিলে জমিদারদিগের লাভ হয় না, কিন্তু আদায় জন্য রাজদ্বারেও যাইবার উপায় নাই, সুতরাং বল প্রয়োগ কিম্বা ভয় প্রদর্শন দ্বারা আদায় করিয়া লইতে হয়। প্রজারা যদি ভূমির আয়ের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বর্দ্ধিত কর দিতে প্রস্তুত, তাহা হইলে এই সকল বাব এবং তাহা আদায়ের জন্য অত্যাচার এত হইত না। প্রজার বিরুদ্ধে রাজদ্বারে অভিযোগ উত্থাপন করিলে কর বর্দ্ধিত করিয়া লওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু প্রত্যেক প্রজার বিরুদ্ধে এরূপ অভিযোগ করিতে গেলে জমিদারকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। এই সকল কারণেই জমিদার ও প্রজার বর্ত্তমান সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যদি কোন দিন ইহার নিবারণের কোন বিশেষ উপায় নির্দ্ধারিত না হয়, তত দিন এইরূপ চলিতে থাকিবে। অত্যাচার করিলে জমিদারের নামে অভিযোগ করিয়া কৃতকার্য্য হওয়া দরিদ্র প্রজাদের পক্ষে সহজ নয়, সুতরাং তাহারা সহ্য করিয়া থাকে এবং এই সুবিধা অবলম্বন করিয়া অনেক হৃদয়শূন্য জমিদার সহস্র প্রকারে প্রজাদিগকে শোষণ করিয়া থাকেন। সকল বাব যে চিরক্রমাগত তাহাও নয়, বৎসর বৎসর নতুন বাবের সৃষ্টি হয়। জমিদারের

বাটীতে পূজা প্রভৃতির সকল ব্যয় অবশেষে প্রায় প্রজাদিগের স্কন্ধেই পড়িয়া যায়, বাস্তবিক বিষয়টী বড জটিল। বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে ত প্রজারই সমূহ কষ্ট। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা জমিদারের দেয় কর চিরকালের জন্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কিন্তু প্রজাদিগের দেয় করের সীমা নাই। তন্নিবন্ধন জমিদারদিগের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই সুতরাং রোড সেস প্রভৃতির উদ্ভাবন করিতে হইতেছে। লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর রোড সেস সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে বলিয়াছেন প্রজারা বৎসর বৎসর নানা বাবে জমিদারদিগকে যে টাকা দেয় তাহার সহিত তুলনা করিলে রোড সেস সম্বন্ধে যাহা দিবে তাহা কিছুই নয় বলিলে হয়। এই দ্বেষ অপক্ষপাতে প্রজা ও জমিদার উভয়ের উপর করা হইয়াছে বলিয়া তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন, কিন্তু তাঁহার ভাবা উচিত ছিল যে প্রজারা চিরকাল যে সকল বাব দিয়া আসিতেছে তাহার নিবারণ করিয়া যদি রোড সেস স্থাপন করিতে পারিতেন তাহা হইলে তাহাদের ভারের লাঘব হইত। প্রত্যুত ইহাতে ভার বৃদ্ধি হইল। দ্বিতীয়ত. জমিদারদিগের উপর সেসের যে অংশ নির্দ্ধারিত হইয়াছে গোপনে গোপনে তাহার অধিকাংশ প্রজাদিগের স্কন্ধে পড়িবে। প্রজারা শিক্ষিত হইতে আরম্ভ হইলে এবং জমিদারদিগের কার্য্যাদির উপর গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি থাকিলে এই সকল অত্যাচারের অনেক হ্রাস হইতে পারে বটে কিন্তু এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয় বিবেচনা করিয়া গবর্ণমেণ্ট যেরূপ ঔদাসীন্য অবলম্বন করিতেছেন তাহাতে এ সকলের নিবারণ সম্ভাবনা নাই। অতএব আমাদের প্রস্তাবিত প্রস্তাব সহিত স্থায়ী বন্দোবস্ত যাবৎ না হইতেছে তাবৎ গবর্ণমেণ্ট যদি ১৫ কিংবা ২০ বৎসর অন্তর এক এক বার সমুদায় প্রদেশের আয় বৃদ্ধি দেখিয়া এক একটা করের হার স্থির করিয়া দেন তাহা হইলে প্রজারাও বুঝিতে পারে যে সেই পরিমাণে কর দিতে হইবে এবং জমিদারেরাও বুঝিতে পারেন যে তাহার অধিক প্রার্থনা করিবার তাঁহাদের অধিকার নাই। তাহার অতিরিক্ত কর গ্রহণের চেষ্টা হইলেই কঠিন দণ্ড দ্বারা যেন তাহার নিবারণ করা হয়। তাহা হইলে জমিদারদিগের অত্যাচার শেষ হইতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে যে সকল কর্ম্মচারী আছেন, তাহাদের দ্বারা গবর্ণমেণ্ট সেই সেই প্রদেশের ভূমির আয় কিরূপ বৃদ্ধি হইতেছে তাহার নিরূপণ করিতে পারেন। এরূপ উপায় অবলম্বন করিলে যদিও জমিদারদিগের নিজ ভূমির কর সম্বন্ধে যে স্বাধীনতা আছে তাহাতে হস্তক্ষেপ করা হয় কিন্তু তাহা না হইলে প্রজারা বাঁচে না, তাহা না হইলে কৃষকদিগের হস্তে কোন কালে অর্থ সংগ্রহ হইতে পারিবে না। কৃষকদিগের হস্তে অর্থ সংগ্রহ না হইলে এবং তাহাদিগের মনে সুখ না থাকিলে কৃষিকার্য্যের উন্নতি হইবে না এবং তাহাদের দরিদ্রতা ও যন্ত্রণার অবসান না হইয়া দিন দিন বৃদ্ধি হইবে।

প্রজাদিগের আর একটী প্রধান কষ্টের কারণ এই ঘটিয়াছে যে তাহাদিগকে একেবারে এক ব্যক্তির নিকট সমুদায় কর না দিয়া অনেক সময় এক জমিদারের ভিন্ন ভিন্ন অংশীর নিকট স্বতন্ত্র স্বতন্ত্ররূপে গোমস্তার খরচা প্রভৃতি নানা বাবে ব্যয়স্বীকার করিতে হয়। ১৭৯৩

অব্দের ৮ আইনে এরূপ বিপদের আশঙ্কা করিয়া এই প্রকার লিখিত হয় যদি ভবিষ্যতে কোন জমিদারির ভাগ হয় সেই সমুদায় অংশীরা একজনকে কার্য্য সম্পাদক নিযুক্ত করিবেন এবং প্রজারা তাহারই নিকট সরকারি কর জমা দিবে। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে আজিও এই মতে কার্য্য হইতেছে কিন্তু ১৮০৫ অব্দ হইতে কতকগুলি জমিদারের আবেদনে বাঙ্গলা দেশে এই নিয়ম রহিত হইয়াছে। সুতরাং তদবধি প্রজাদিগের কষ্টের বৃদ্ধি হইয়াছে। উড়িষ্যার কমিসনর প্রেসিডেন্সি ডিবিজনের কমিসনর প্রভৃতি অনেক বিজ্ঞ বিজ্ঞ ব্যক্তি ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের পুনরায় সেই নিয়ম প্রচলিত করিয়া এই কষ্ট দূর করা উচিত।

উপসংহারকালে বক্তব্য এই, আমাদিগের দেশীয় জমিদারেরা যদি ধর্ম্মভীরু ও ন্যায়পর হইতেন তাহা হইলে এত কথা বলার প্রয়োজন হইত না। কিছু দিন হইল আয়ার-লণ্ডের কয়েকটী প্রদেশে উপযুক্ত রূপ শস্যাদি না হওয়াতে প্রজাদিগের অত্যন্ত ক্লেশ হয়, তাহাতে সেই সেই প্রদেশের অনেকগুলি জমিদার আপনা হইতে প্রজাদিগকে লিখিয়া পাঠান সে বৎসর তাহাদের নির্দ্ধারিত করের অর্দ্ধেক মাত্র দিলেই হইবে। জমিদারেরা যদি এইরূপ সদ্বিবেচক ও সহৃদয় হন, তাহা হইলে তাহাদের অধিকারে বাস করা সুখের বিনা অসুখের ব্যাপার হয় না। আমরা এস্থলে আর একটী প্রস্তাব করিতেছি আজিও কৃষকেরা যেরূপ অজ্ঞ আছে তাহাতে তাহারা যে ত্বরায় আপনাদের কষ্ট গবর্ণমেণ্টের গোচর করিতে শিখিবে এরূপ আশা করা যায় না। অতএব দেশীয় কৃতবিদ্যদিগের মধ্যে যাঁহারা কৃষকদিগের জন্য বাস্তবিক ভাবিয়া থাকেন, তাঁহারা যদি একটি সভা করিয়া সর্ব্বদা কৃষকদিগের অভাব ও কষ্টের বিষয় গবর্ণমেণ্টের গোচর করেন তাহা হইলে এ সম্বন্ধে বিশেষ উপকার সাধিত হইতে পারে। বর্ত্তমান বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন এবং হিন্দুপেট্রিয়ট জমিদারদিগের পক্ষে যেরূপ কার্য্য করিতেছেন যদি কৃষকদিগের পক্ষে সেরূপ কোন উপায় থাকিত তাহা হইলে আজ অনেক অত্যাচার প্রকাশ হইয়া পড়িত ও তাহার নিবারণ হইত তাহার সন্দেহ নাই। জমিদারদিগের সকলেই যে অত্যাচারী এবং প্রজারা যে সকলেই নিরপরাধ এরূপ বলা আমাদের অভিপ্রেত নহে। জমিদারদিগের মধ্যে অনেকে আছেন যাঁহারা বাস্তবিক দরিদ্র প্রজাদিগের দুঃখ বুঝিয়া থাকেন এবং তাহাদের প্রতি যথেষ্ট দয়া প্রদর্শন করিয়া থাকেন। অনেক প্রজা এরূপ দুরন্ত যে বিনা অত্যাচারে বশীভূত হয় না। কিন্তু সবল দুর্ব্বলের সমাগমে দুর্ব্বলের ক্ষতিগ্রস্ত হইবার অধিক সম্ভাবনা, ইহা একটী চিরপ্রসিদ্ধ কথা। দুর্ব্বলের পক্ষ হইয়া তাহাকে রক্ষা করা রাজার প্রধান ধর্ম্ম। এই জন্যই আমরা গবর্ণমেণ্টকে এ বিষয়ের একটী উপায় করিয়া দিতে অনুরোধ করিতেছি। ফল কথা এই প্রজাদিগের কষ্টের কথা আর সহ্য হয় না। শ্রমজীবী ও কৃষক শ্রেণীর উন্নতি না হইলে সমাজের প্রকৃত উন্নতি হইবে না। সমাজের মধ্যে অলস ও অকর্ম্মণ্যেরা যতদিন পরিশ্রমী ও কর্ম্মিষ্ঠদিগের রক্তমাংসে প্রতিপালিত হইবে ততদিন দেশের ভদ্রস্থতা নাই।

সঞ্চয় । ২৪ অগ্রহায়ণ ১২৮০ । ৪ সংখ্যা

দারিদ্র্য বঙ্গসমাজের বর্ত্তমান প্রধান কষ্ট বলিয়া বোধ হয়। সমাজের মধ্যে যাঁহারা উচ্চ শ্রেণী বলিয়া গণ্য অর্থাৎ অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকেন, তাঁহারও বিশেষ সঞ্চয় করিয়া যাইতে পারিতেছেন না। তদপেক্ষা নিম্ন শ্রেণীস্থ ব্যক্তিদিগের কথা বলা বাহুল্য মাত্র। তাঁহারা ঋণ দায়ে বিব্রত ও অন্নচিন্তায় জর্জ্জব হইয়া যেরূপে দিনপাত করিতেছেন, তাহা স্মরণ করিলে মনে ভয় ও ক্লেশের উদয় হয়। প্রায় এমন দিন যায় না, যেদিন দুই চারি জনের মুখে সাংসারিক অসচ্ছলের কথা শুনিতে না পাওয়া যায়। চতুর্দ্দিকে এই প্রকার দুরবস্থা দেখিয়া ও শুনিয়া হৃদয়ে অত্যন্ত চিন্তার উদয় হয় এবং এই দারিদ্র্য বৃদ্ধির কারণ কি? বারম্বার এই প্রশ্ন উপস্থিত হইতে থাকে। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে ইহার অনেকগুলি কারণ দেখিতে পাওয়া যায়। ১মতঃ দিন দিন দেশের রপ্তানীর ও বাণিজ্যের বৃদ্ধি হওয়াতে পুর্ব্বাপেক্ষা দ্রব্যাদি দুর্ম্মূল্য হইয়াছে স্থতরাং সংসার নির্ব্বাহ করা পুর্ব্বাপেক্ষা বহু-অর্থসাপেক্ষ হইয়া পডিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মনেব সংস্কার ও হৃদয়ের ইচ্ছাব ব্যতিক্রম ঘটাতে অনেক নূতন-বিধ ভোগ্য বস্তু, নূতন-বিধ সামগ্রী অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। সেগুলি না হইলে সমাজে হেয় ও অবগণিত হইতে হয়, স্থতরাং সেগুলির আহরণের জন্য লোকে ব্যয় স্বীকার করিয়া থাকে। যেমন একদিকে লোকেব ব্যয়ের বৃদ্ধি হইয়াছে অপরদিকে অর্থাগমেরও অনেক দ্বার মুক্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু ইংলণ্ডের সহিত সম্পর্ক হওয়াতে আমাদিগেব অভাবই বাডিয়াছে, হিন্দু সমাজের পুরাতন রীতি নীতি ও প্রথা প্রচলিত থাকাতে, যে যৎকিঞ্চিৎ অর্থাগম হইতেছে, তাহাতে বিশেষ সাহায্য বোধ হইতেছে না। আমরা পাঠকগণকে আমাদের মনের ভাব অবগত করিবার জন্য কতকগুলি প্রথার উল্লেখ করিতেছি এবং কতকগুলি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি। প্রথাগুলির দোষ গুণ বিচার করা আমাদের এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নয় কেবল সেই প্রথাগুলির, লোকের অর্থের ও ব্যয়ের সহিত কতদূর সম্বন্ধ তাহাই প্রদর্শন করা আমাদের লক্ষ্য

প্রথমতঃ একান্নবর্ত্তিতা। এই প্রথার সপক্ষে বলিবার অনেক কথা আছে, কিন্তু ইহা যে লোকের দরিদ্রতা বৃদ্ধির অন্যতর কারণ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই প্রথা প্রচলিত থাকাতে একদিকে দশজন নিষ্কর্ম্মা, অথবা অল্পোপার্জ্জক একজন উপার্জ্জনশীল ও পরিশ্রমী ব্যক্তির গলগ্রহ হইয়া থাকে। অনায়াসে আপনাদের এবং পরিবারদের উদরের অন্নের সংস্থান হয় বলিয়া শ্রম করিতেও তাহাদের প্রবৃত্তি জন্মে না। অপর দিকে পরিশ্রম করিয়া নিজের নিজের ও নিজ পরিবারের উন্নতির বিশেষ আশা না থাকাতে সেই উপার্জ্জনশীল ব্যক্তিরও অধিক উপার্জ্জনের জন্য প্রয়াস হয় না। অথচ সেই উপার্জ্জিত অর্থ বহুভাগ হওয়াতে কাহারও অভাব সম্পূর্ণরূপে দূর হয় না।

দ্বিতীয়তঃ বাল্যবিবাহ। এই প্রথা প্রচলিত থাকাতে উপার্জ্জন সম্বন্ধে দুইটী অপকার হয়ঃ (১) পুত্রকন্যাদিগকে উপার্জ্জনের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া কঠিন হইয়া পড়ে (২) ক্রমেই ব্যয় বাড়িতে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে কর, এক ব্যক্তির একটী পুত্র আছে। যে ব্যক্তি নিজে মাসে ৩০ টাকা উপার্জ্জন করে, তাহাতে কোনরূপে তাহার পরিবারের ভরণপোষণ চলিয়া যায়। পুত্রটীর ১৪।১৫ বৎসরের সময় একটি বিবাহ দিল, তাহাতে একটী পরিবার বৃদ্ধি হইল। পরে ১৮।১৯ বৎসর হইতে পুত্রটীর সন্তান জন্মিতে আরম্ভ হইল। আর ৩০ টাকাতে সংসার নির্ব্বাহ হয় না। সুতরাং তিনি পুত্রটীকে বিদ্যালয় ছাড়াইয়া অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন, শিক্ষা অসম্পূর্ণ সুতরাং তাহারও উপার্জ্জন অল্প হইতে লাগিল, কিন্তু সন্তানের স্রোত অপ্রতিহত রহিল। এদিকে বৃদ্ধ পিতা উপার্জ্জনাক্ষম হইয়া পড়িলেন। এরূপ অবস্থায় অন্নকষ্ট ও সাংসারিক অসচ্ছল অপরিহার্য্য।

তৃতীয়তঃ পিতামাতার শ্রাদ্ধ ও পুত্রকন্যার বিবাহ প্রভৃতি। এই কার্য্যগুলির বিরুদ্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য নাই। এগুলি অত্যাবশ্যক ও পুণ্য কর্ম্ম কিন্তু এগুলির এত প্রকার ব্যয়ের সহিত সংস্রব আছে, যে অনেক সময় তজ্জন্য অনেক ব্যক্তিকে বিপদ-গ্রস্ত হইতে হয়। চতুর্থতঃ চিরবৈধব্য। এই প্রথা প্রচলিত থাকাতে কতকগুলি নিরুপায় স্ত্রীলোকের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের ভার আত্মীয়স্বজনদিগকে লইতে হয় এবং চিরদিন তাহা বহন করিতে হয়! অন্যান্য দেশে তাহারা পুনরায় পত্যন্তর গ্রহণ করেন সুতরাং তাহাদের জন্য কোন পরিবারপোষী আত্মীয়কে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয় না।

পঞ্চমতঃ জাতিভেদ ও জাত্যভিমান। যদিও ইংরাজী শিক্ষা বহুল প্রচার হওয়াতে ক্রমেই ভিন্ন ভিন্ন জাতির সমতা হইয়া আসিতেছে এবং অনেক উচ্চ জাতির লোক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য শাস্ত্র-বিরুদ্ধ ও হীন জাতিদিগের চিরাবলম্বিত অনেক কার্য্য অবলম্বন করিতেছেন, তথাপি এখনও অনেকে জাত্যভিমান নিবন্ধন অশেষ কষ্ট ও সাংসারিক অসচ্ছল সহ্য করেন, কিন্তু কষ্ট নিবারণের উপায় থাকিতে নীচ ও হেয় বলিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না। হিন্দু রাজাদিগের রাজত্বকালে এবং হিন্দুধর্ম্মের সৌভাগ্য ও শ্রীবৃদ্ধির সময় সেই সকল উচ্চ জাতির উপর লোকের যেরূপ শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল, বিধর্ম্মী রাজাদিগের সংস্রবে সে শ্রদ্ধা ও ভক্তির বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, সুতরাং তাঁহাদের আয়েরও ব্যাঘাত হইয়াছে। এক্ষণে একদিকে অন্নকষ্ট অপরদিকে নীচ কর্ম্মাশ্রয় ব্যতিরেকে আর গত্যন্তর নাই, প্রায় এইরূপ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। নীচ কর্ম্মাশ্রয় করিবেন তাহাই বা কোথায়!! বিদেশীয় দ্রব্যের আমদানী হওয়াতে লোকে কর্ম্মহীন হইয়া পড়িতেছে। তন্তুবায় কর্ম্মকার প্রভৃতির কার্য্য ত এক প্রকার উঠিয়া যাইতেছে। সে সকল শ্রেণীরা কোথায়। এক ব্যবসায়, তাহাতেই বা কত লোককে নিযুক্ত রাখিতে পারে? দ্বিতীয় কৃষিকার্য্যে এত লোক প্রতিপালিত হইতে পারে সেরূপ ভূমিই বা কৈ? বিশেষ সে

সকল কার্য্য নীচ বলিয়া সংস্কার থাকাতে লোকের সহজে সে দিকে যাইতে প্রবৃত্তি হয় না। সকলেই অপেক্ষাকৃত সভ্য "চাকরীব" অন্বেষণে তৎপরতা এইরূপে শিক্ষকতা কেরাণীগিরি, ডাক্তারী, ওকালতি প্রভৃতি কতকগুলি কার্য্য অপেক্ষাকৃত ভদ্র মনে করিয়া তাহাতে রাশি রাশি লোক প্রবেশ করিয়াছেন সুতরাং তাঁহাদের মুল্য অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। এ সকল কার্য্যের দ্বারা যে আয়ের সম্ভাবনা তাহাতে লোকের সচ্ছলে দিন চলা দুর্ঘট। সুতরাং পুর্ব্বাপেক্ষা লোকের দরিদ্রতা বর্দ্ধিত হইয়াছে।

আমরা উপরে বর্ত্তমান সময়ের দরিদ্রতা বৃদ্ধির যে সকল কারণ প্রদর্শন করিলাম তা ভিন্ন অন্যান্য কারণও আছে কিন্তু এইগুলি প্রধান। এই সকল কারণে লোকের সঞ্চয় করা দূরে থাকুক সচ্ছন্দে দিনপাত করা কঠিন হইয় উঠিয়াছে। এইরূপ নানা প্রকার ব্যয়ে এদেশীয়দিগের অর্থ পর্য্যবসিত হয়, সুতরাং দেশে হিতকর কিম্বা সাধারণের উপকার জনক কোন কার্য্যে ব্যয় করিবার আব উপায় থাকে না। সেই জন্য ইংরাজেরা মনে করেন হিন্দুরা স্বার্থপব ও অর্থ-গৃধ্নু কিন্তু সমাজের গঠনপ্রণালী ও এই প্রথাগুলির ফলাফল বুঝিতে পারিলে সে সংস্কারের অনেক হ্রাস হয়। হিন্দু সমাজে প্রতিদিন কত নিরাশ্রয় নিরুপায় ও নিরুপার্জ্জক লোক প্রতিপালিত হয তাহা গণনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়।

একান্নবর্ত্তী পরিবারেব লোকেরা যেরূপ নিঃস্বার্থতাব পরিচয় প্রদান করে এবং আপনার ধন দিয়া অন্যদিগকে যেরূপে রক্ষা করে, তাহার মধ্যে কি প্রশংসা করিবাব কিছু নাই? যাহা হউক এবিষয়ে আমাদিগের আরও কিছু বক্তব্য আছে তাহা বাবান্তবে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

অসৎ জমিদারের কি কিছুতেই চৈতন্য হইবে না? ৬ আশ্বিন ১২৮১। ৪৪ সংখ্যা

এই দুর্ভিক্ষে অনেকের অনেক প্রকাব শিক্ষা হইল। অলসেরা পরিশ্রম কবিতে শিখিল। অমিতব্যয়িরা মিতব্যয়িতার শিক্ষালাভ করিল। যে জমিদারের ভালমন্দ বুঝিবার অল্পমাত্রও ক্ষমতা আছে, প্রজা যে কেমন সামগ্রী এবার তিনি বুঝিলেন। প্রজাই অনেক জমিদারের একমাত্র অবলম্বন। প্রজার নিকটে যতক্ষণ খাজনা পান, ততক্ষণ তাঁহাদিগের চলে। খাজনা বন্ধ হইলেই তাঁহাদিগের হাত পা বন্ধ হইয়া যায়। এবার এই দুর্ভিক্ষের প্রভাবে অনেক প্রজাব গৃহে অন্ন নাই। অনেক প্রজা জমিদারকে এক কপর্দ্দকও দিতে পারে নাই। অনেক জমিদারই অন্ধকার দেখিয়াছেন। যে সকল জমিদারের এবার শিক্ষালাভ হইল, প্রজা যে কেমন সামগ্রী বোধ হয় অনেককাল তাঁহাদিগের মনে থাকিবে। বোধ হয় তাঁহারা আর প্রজার উপরে অত্যাচার করিতে উন্মুখ হইবেন না। কি আশ্চর্য্য! জগতের কি বিচিত্র ভাব! যে কৃষকদল অলস জমিদার

ধনবান ও অন্য অন্য শ্রেণীর অবলম্বন, যো পাইলে কেহই তাহাদিগের উপরে অত্যাচার করিতে বিমুখ হন না। যাহাদিগের এদেশে বাস, তাঁহারাই যে কেবল অত্যাচার করেন এরূপ নয়, বিদেশ হইতে যাঁহারা আইসেন, তাঁহারাও কম নন। তাঁহাদিগের অধিকতর অত্যাচারপটুতা দৃষ্ট হয়। কৃষকদলের সহিত তাঁহাদিগের যোগ নাই। কৃষকেরা সম্পন্ন হউক তাহাতেও তাঁহাদিগের লাভ নাই। তাঁহাদিগের স্বার্থলাভ হইলেই হইল।

এই দুর্ভিক্ষে জমিদারদলের শিক্ষালাভ হইল, তাঁহারা কৃষকদিগের উপরে অত্যাচারের ইচ্ছা একেবারে পরিত্যাগ করিবেন, আমরা এইরূপ চিন্তা করিতেছি, এমন সময়ে একখানি পত্র আমাদিগের হস্তে উপস্থিত হইল। আমরা পত্রখানি পাঠ করিয়া দেখিলাম, তাহাতে একজন জমিদারের অত্যাচার বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। তাহাতে যে সমস্ত অত্যাচারের কথা লিখিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিলে সজীবের কথা দূরে থাকুক, নির্জ্জীব ব্যক্তিরও হৃদয় উদ্দীপিত হইয়া উঠে। আমরা পত্রখানি স্থানান্তরে প্রকাশ করিলাম। কিন্তু জমিদারের নাম ও পত্রের শেষ অংশ পরিত্যক্ত হইল। পাঠকগণ! ঐ পত্রের উপরিভাগে "বিদ্রোহ" এই কয়টী অক্ষর লিখিত আছে।

যাঁহারা জমিদার-পক্ষপাতী, তাঁহারা বলিবেন, জমিদার অপরাধী এ কথা কে বলিল? প্রজারাই অপরাধী। তাহারা ধর্ম্মঘট করিয়া জমিদারের বিপক্ষতা করিতেছে, জমিদার কি করেন, স্বার্থরক্ষার্থ তাঁহাকে অগত্যা প্রজার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে। এ আপত্তির খণ্ডনার্থ আমাদিগের একটী বক্তব্য আছে। জমিদার অত্যাচার না করিলেও প্রজারা ধর্ম্মঘট করিয়া জমিদারের বিপক্ষ হয়, এটী যদি সিদ্ধান্ত বাক্য হইত, তাহা হইলে জমিদার ও প্রজার বিবাদজনক কোলাহল আমাদিগের শ্রুতিমূলে প্রবিষ্ট হইত সন্দেহ নাই। বঙ্গদেশে যে সমস্ত সাধু সদাশয় আছেন, তাঁহাদিগের কয়জনের সহিত প্রজার বিরোধ হইতেছে? তাঁহারাও অত্যাচার করেন না, প্রজারাও ধর্ম্মঘট করিতেছে না। তবে যে প্রজারা ধর্ম্মঘট করে, তাহার কারণ জমিদারের অত্যাচার, ইহাই কি স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে না? এই কারণেই আমরা উপরে কহিয়াছি, অসৎ জমিদারের কি কিছুতে চৈতন্য হইবে না?

ঐ সকল অসৎ জমিদারের চৈতন্য সম্পাদনের উপায় কি? এখন এই প্রশ্নের মীমাংসা করা আবশ্যক হইতেছে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বরদার গুইকুমারের বিষয়ে যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, দুরাত্মা জমিদারের বিষয়েও সেই উপায় অবলম্বন করুন। যে জমিদারের সর্ব্বদা প্রজার সহিত বিরোধ হইবে, গবর্ণমেণ্ট অগ্রে তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিন, তিনি যদি স্বচরিত্র সংশোধন করেন, ভাল, অন্যথা তাঁহার বংশে যিনি সচ্চরিত্র হইবেন, জমিদারীর কর্ত্তৃত্বভার তাঁহার হস্তে সমর্পিত হইবে। আর যদি তাঁহার বংশে সচ্চরিত্র না পাওয়া যায়, তাহার জমিদারী রিসিবরের জিম্মা হইবে। যতদিন তাঁহার বংশে সচ্চরিত্র ও উপযুক্ত লোক না মিলিবে, ততদিন জমিদারী রিসিবরের হস্তে থাকিবে,

সচ্চরিত্র উপযুক্ত লোক মিলিলেই তাঁহার হস্তে ন্যাস্ত হইবে। এই উপায় হউক, আর অন্য উপায় হউক একটী অবলম্বিত না হইলে দুরাত্মা জমিদারদিগের দৌরাত্ম্য নিরাকরণ সম্ভাবিত নহে।

আমাদিগের বর্ত্তমান বাণিজ্য ব্যবসায়। ১৪ শ্রাবণ ১২৮৫। ৩৬ সংখ্যা

আজকাল যেরূপ অবস্থায় ও নিয়মে এই বাণিজ্য ব্যবসায় আমাদিগের দেশে সম্পাদিত হইতেছে তাহা নিতান্ত শোচনীয়। সচরাচর বাণিজ্য ব্যবসায় এই যুগ্ম শব্দ আমাদিগের শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। এ দুটী শব্দের অর্থ ভেদ আছে কিনা নির্ণয় করা আবশ্যক। বাণিজ্য ব্যবসায় এই দুটি শব্দের অর্থগত বিস্তর বৈলক্ষণ্য আছে। ব্যবসায় অর্থে জীবনোপায়ের সাধারণ পথ। এক্ষণে যিনি জীবনোপায় নির্ব্বাহের জন্য যে পথ অবলম্বন করেন, তিনি সেই ব্যবসায়ী। কেহ ডাক্তার, কেহ উকীল, কেহ মোক্তার, কেহ সূত্রধর, কেহ কুম্ভকার, কেহ বণিক ইত্যাদি। এই বণিকের ব্যবসায়ের নামই বাণিজ্য ব্যবসায়।

বাণিজ্য কি? এক স্থানের দ্রব্যাদি নৌকা বা রেলওয়ে বা অন্য কোন সুযোগে অন্য কোন স্থানে বহন করিয়া লইয়া গিয়া তাহা বিক্রয় করা বা তদ্বিনিময়ে তদ্দেশজাত উত্তমোত্তম দ্রব্য আনয়ন করার নাম বাণিজ্য। প্রধানতঃ এই বাণিজ্য দুই প্রকার, বহির্বাণিজ্য ও অন্তর্বাণিজ্য। এক দেশজাত দ্রব্য অন্য দেশে লইয়া গিয়া ক্রয় বিক্রয়ের নাম বহির্বাণিজ্য ও সে দেশজাত দ্রব্য, সেই দেশেই ক্রয় বিক্রয় করার নাম অন্তর্বাণিজ্য। পূর্ব্বে রেলওয়ে না থাকাতে নৌকা ও অর্ণবযানাদি দ্বারা বিদেশে দ্রব্যাদি প্রেরিত হইত। তাহাতে বহুকাল বিলম্ব হইত। এখন রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ হওয়াতে এই বাণিজ্যকার্য্যের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। এক দিনে এক মাসের পথে দ্রব্যাদি পৌছিয়া দিতেছে। সেখানে কোন বিপদ বা দ্রব্যাদির অসুবিধা হইলে তৎক্ষণাৎ টেলিগ্রাফযোগে সমাচার পাওয়া যাইতেছে। পুর্ব্বে যদিও ইহা ছিল না, কিন্তু পুরাকালের বাণিজ্যের বিষয় ও অবস্থা যদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমালোচনা করা যায়, তবে তাহাকে এখন কাল্পনিক বলিয়া প্রতীতি হয়। সে সম্বন্ধে আধুনিক বাণিজ্য ব্যবসায়কে প্রকৃতরূপে বাণিজ্য ব্যবসায় বলিতে পারা যায় না। তখন ভারতের প্রত্যেক গ্রাম, প্রত্যেক পল্লী, অধিক কি প্রত্যেক স্বাধীনচেতা মনুষ্য হৃদয় "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ" এই হৃদয়োত্তেজক বীজমন্ত্রের ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। প্রত্যেক স্বাধীনচেতা ব্যক্তিই এই বীজমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া অকাতরে পিতা মাতা পুত্র পরিবারবর্গের বিচ্ছেদক্লেশ তুচ্ছ করিয়া অর্ণবযান আরোহণ পূর্ব্বক সিংহল, সুমাত্রা, বালী প্রভৃতি দূরতর স্থানে বাণিজ্য করিতে

যাইতেন। চাঁদ সওদাগর ধনপতি সওদাগর প্রভৃতি তাহার নিদর্শন স্থল। এতদ্ব্যতীতও ভূরি ভূরি প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। অদ্যাপিও বালী দ্বীপে হিন্দুগণ বাস করিতেছেন। বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় তখন অর্ণবপোতে দূরদেশে যাত্রা করা দূষণীয় ছিল না। করিলেও কেহ চিরকালের জন্য সমাজচ্যুত হইতেন না। এখন অর্ণবযানে আরোহণ করিলে তিনি আর হিন্দুসমাজে স্থানপ্রাপ্ত হন না। চিরকালের জন্য হিন্দুসমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইতে না পারিলে আর কাহারও সমুদ্রপথে বিদেশে যাইবার উপায় নাই, সুতরাং অনেকে ইচ্ছা সত্ত্বেও সমাজচ্যুত হইবার ভয়ে বিশেষতঃ স্ত্রীপুত্রদিগের প্রেম-পাশ ছিন্ন করিতে না পারিয়াই বিদেশে যাইতে স্বীকৃত নহেন। এই সকল কারণে বহির্বাণিজ্য একালে অন্তর্হিত হইয়াছে। যদিও আবার এখন বোম্বাইবাসীদিগের ২।১ খানি অর্ণবযান সমুদ্রপথে ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানে যাইতে শিখিতেছে, সেও ইংরেজদিগের সাহায্যে। সম্পূর্ণ সাহায্যহীন হইয়া তাঁহারা অর্ণবযান চালাইতে আজও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তবে তাঁহাদিগের যেরূপ পরিশ্রম ও অধ্যবসায় দেখা যাইতেছে তাহাতে যে অচিরাৎ কৃতকার্য্য হইবেন সে বিষয়ে কিছুমাত্রও সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে বাণিজ্য ব্যবসায় শিক্ষা করিবার জন্য বণিকপুত্রগণ বাল্যকাল হইতে নিয়মিতরূপে বহুজ্ঞ ব্যবসায়ীদিগের দ্বারা শিক্ষিত হইতেন, তাহাব অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। তাহারা সন্তানগণকে অভিজ্ঞতা ও সাহস লাভ করাইবার জন্যও অনেক সময়ে তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া অর্ণবযানে আরোহণ পূর্ব্বক বিদেশে বাণিজ্য করিতে যাইতেন। তাহারাও অনেক দেখিয়া শুনিয়া সুবিজ্ঞ বাণিজ্য ব্যবসায়ীরূপে পরিণত হইলে পর পিতার জীবদ্দশাতেই বা পরলোকান্তে আপনারা স্ব স্ব হস্তে বাণিজ্যভার গ্রহণ পূর্ব্বক দূরতর দেশে যাত্রা করিয়া বাণিজ্য কার্য্যে রত হইত। এরূপ বাণিজ্য বহু মূলধন সাপেক্ষ। যাহারা এরূপ মূলধন সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইতেন, তাঁহারা অভাব পক্ষে যৎসামান্য মূলধন লইয়া অন্তর্বাণিজ্যে নিযুক্ত হইতেন। নিতান্ত দুরবস্থাপন্ন না হইলে কেহই প্রাণান্তেও পরের সেবায় দেহ নিযুক্ত করিত না। তখন বাণিজ্যের নিম্নে কৃষি ব্যবসায় ছিল। সর্ব্বনিম্নে ভিক্ষা-বৃত্তিতে যে সমাজের বিন্দুমাত্রও উপকার নাই বরং সময়ে সময়ে বিশেষ অপকার হইয়া থাকে তাহা পূর্ব্বকাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ও করিতেছেন। নিতান্ত অপদার্থ কাপুরুষ না হইলে যাচকতা বৃত্তি অবলম্বন করিত না। কিন্তু হায়! বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, ভারতের বর্ত্তমান অধিকাংশ অভাগা সন্তানগণ এই সমাজঘৃণিত ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া যথা কথঞ্চিৎ রূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে।

কালচক্রের কুটিল আবর্ত্তনে সেই ভারত প্রতিধ্বনিত "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ" এই স্বাধীনতা ও হৃদয়োত্তেজক বীজমন্ত্র ভারতবাসীর অদৃষ্ট দোষে কালচক্রের নিম্নভাগে

পড়িয়া গিয়াছে। এখন তৎপরিবর্ত্তে "হা অন্ন হা ভিক্ষাবৃত্তি!" এই হৃদয় বিদারক চীৎকার শব্দে কুমারিকা হইতে হিমাচল পর্য্যন্ত ভারত ভূমি স্থানে স্থানে পরিপূরিত হইতেছে। যাঁহার এই দুরন্ত কালচক্র, সেই অনাদি ঈশ্বর অবগত আছেন কতদিনে আবার ভারতের সুপ্রভাত হইয়া এই বর্ত্তমান হৃদয়বিদারক ধ্বনি কালচক্রের নিম্নে পড়িয়া যাইবে এবং পুনরায় "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ" এই বীজমন্ত্র ভারতের প্রত্যেক নগরে প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক পল্লীতে অধিক কি প্রত্যেক স্বাধীন চিত্তে প্রতিধ্বনিত হইবে। সে দিন কি আর হইবে? যদি হয় 'ত' সাহস করিয়া বলিতে পারি তাহা বোম্বাইবাসীদিগের অসাধারণ অধ্যবসায় যত্ন ও প্রাণস্বরূপ প্রতিজ্ঞাবলে হইবে। আমাদিগের বঙ্গীয় ভ্রাতারা অদ্যাপিও চাকুরিতে শশব্যস্ত। চাকুরিই আমাদিগের জীবনের প্রধান লক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছে। কোনরূপে বহু অনুসন্ধানের পর যদি একটী কর্ম্ম জুটিল ত তিনি জন্মের মত পরিশ্রমের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। অনেক শ্রমকাতর আত্মীয় কুটুম্বও আসিয়া তাঁহার গলগ্রহস্বরূপ হইয়া পড়িলেন। শতকরা ৩ টাকা করিয়া সুদে গবর্ণমেণ্টে টাকা জমা দিবেন, সেও সহস্র গুণে ভাল, তথাপি প্রাণান্তেও স্বাধীন দেশহিতকর বাণিজ্যকার্য্যে মনকে ক্ষণকালের জন্যও বিচলিত হইতে দিবেন না। সে চেষ্টাও নাই। তবে যে জনকতক লোক বাণিজ্য ব্যবসায় করিয়া থাকেন, সে সামান্য অন্তর্বাণিজ্য মাত্র। তদ্দ্বারা দেশের কিছুমাত্র উপকার হয় না। কেবল কোনরূপে পরিবারবর্গ প্রতিপালন করা ও অমূল্য সময় ক্ষেপণ করার উদ্দেশ্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিরূপে যে দিন দিন বাণিজ্যের উন্নতি লাভ হইবে, কিরূপেই বা নূতন নূতন উপায়ের পথ আবিষ্কৃত হইয়া অভাগা ভারতবাসিগণ ভিক্ষাবৃত্তি হইতে পরিত্রাণ পাইবে সে বিষয়ে কেহই ভ্রূক্ষেপ করেন না। তাহাদের অধিকাংশ সম্পূর্ণ অশিক্ষিত। এমন পূর্ব্বকালের ন্যায় বাণিজ্য ব্যবসায় শিক্ষা করিবার জন্য কেহই সন্তানদিগকে বহুজ্ঞ বিজ্ঞ ব্যবসায়ী দ্বারা শিক্ষা প্রদান করাইতে অভ্যস্ত বা ইচ্ছুক নন। ভারতের অধিকাংশ লোক আজও জানিতে পারেন যে ইংলণ্ডে প্রায় ৮০০০০০০ লোক ও অগণ্য অর্ণবযান বহির্বাণিজ্যে নিযুক্ত হইয়া পৃথিবীর সকল দুরগম্য স্থানে যাতায়াত করিয়া বাণিজ্যকার্য্যের উন্নতি দ্বারা ইংলণ্ডকে সকল দেশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছেন। এমন সাগর নাই যেখানে ব্রটিশ বাণিজ্য-তরীর গতিবিধি নাই। ইংলণ্ড এখন জগৎপূজ্য। যাহার বহির্বাণিজ্য এতদূর বিস্তৃত, তাহার অন্তর্বাণিজ্য যে কতদূর প্রবল তাহা মনেও ধারণা করা যায় না। ইংলণ্ডে বাণিজ্য সংক্রান্ত ৩৬ খানি সংবাদপত্র, পারিসে ৩১ খানি, অধিক কি বোম্বায়ে দেশীয় ভাষায় তিনখানি সংবাদপত্র মুদ্রিত হইতেছে, সংবাদপত্র উন্নতির একটী প্রধান কারণ। আমাদিগের বাঙ্গালায় এরূপ সংবাদ পত্র একখানিও নাই। অধিক কি, হইলেও উপযুক্ত সাহায্যের অভাবে অকালে কালগ্রস্ত হইয়া পড়ে। অনেকেই অবগত আছেন বাবু শ্রীনাথ দত্ত বিলাত হইতে কৃষি শিক্ষা করিয়া আসিয়া স্বদেশবাসিদিগের উন্নতির জন্য "ব্যবসায়ী" নামে (যদিও তাহাতে বাণিজ্য

কার্য্যের কোন বিষয় সুন্দররূপে লিখিত হয় না) একখানি মাসিক পত্র বাহির করিলেন। কিন্তু উপযুক্ত সাহায্যের অভাবে গবর্ণমেণ্টের আশ্রয়ভাগী হইতে হইয়াছে। ইহা বড় অল্প দুঃখের বিষয় নহে। সম্প্রতি ১০ই জুলাইয়ের "বেহার বন্ধুতে" "সৌদানরীমে" "ভেড়িয়াসাবন" নামক একটী প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। তাহাতে বাণিজ্যের যে সামান্য অংশ লিখিত হইয়াছে, উৎকৃষ্ট বোধে নিম্নে তাহার সারাংশ সঙ্কলন করিয়া দিলাম। তিনি বলেন "বর্ত্তমান অশিক্ষিত বাণিজ্য ব্যবসায়ীরা গড্ডলিকা প্রবাহভুক্ত। মেষেরা যেমন দলপতিকে কোনদিকে গমন করিতে দেখিলে অন্যেও নির্ব্বিকারচিত্তে ও অবলীলাক্রমে সেই দিকে দলে দলে গমন করিতে থাকে, আমাদিগের মধ্যে যদি কেহ, অমুক ব্যক্তি দ্রব্যের বাণিজ্য করিয়া এত লাভ করিলেন শুনিতে পাইলেন অমনি দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া যত পারিলেন খরিদ করিলেন এবং যদি একবার মূলধনচ্যুত হইলেন ত চিরকালের জন্য বাণিজ্যকে প্রণাম করিয়া চাকুরির অনুসন্ধানে দ্বারে দ্বারে ফিরিতে লাগিলেন। কিন্তু বোম্বাইবাসীরা সেরূপ নহে। দুর্ভাগ্যক্রমে একবার ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও বসিয়া না পড়িয়া কপাল ঠুকিয়া আবার দ্বিগুণ উৎসাহে কাহারও সাহায্যভাগী হইয়া বাণিজ্য কার্য্যে রত হয় এবং অসাধারণ অধ্যবসায় বলে অল্প দিনেই ক্ষতি পূরণ করিয়া লয়। ফল কথা তাহারা আর বাঙ্গালিদিগের ন্যায় সামান্য একটী সূঁচ হইতে প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্যের জন্য পরমুখ প্রত্যাশী থাকিতে ভালবাসে না। তাহারা সাবান, দেশলাই, কাপড, সূতা, প্রভৃতির কল বিলাত হইতে আনয়ন করিয়া এক্ষণে তাহার কতদূর উন্নতি করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহাদের কাছে কি কলিকাতার বাণিজ্য-ব্যবসায়ীরা ব্যবসায়ী নামে অভিহিত হইতে পারেন, ব্যবসায়ী বোম্বাইবাসী প্রেমচাদ, রায়চাঁদ যাহাদের নামে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্টুডেণ্টসিপ পরীক্ষোত্তীর্ণ দুই জন ছাত্রের ১০০০০ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত আছে। আনুমানিক কোটি টাকা তাঁহাদের আয় ও পুণ্য কার্য্যেও অসংখ্য টাকা ব্যয়। ব্যবসায়ী আহম্মদাবাদে জলশত ভাই মনুভাই। যাহাদের প্রথমে এককপর্দ্দকও সংস্থান ছিল না কিন্তু এক্ষণে কুবেরতুল্য ঐশ্বর্য্য। ব্যবসায়ী মুরারজি গোকুল দাস ও নর মঙ্গল দাস থানু ভাই। যাহাদিগের কলে কাপড ও সুতা বপন করিয়া কুলান করিতে পারিতেছে না। বাণিজ্য ব্যবসায়ী নারসীকেশব জী কোং। যাহাদিগের আফিঙ্গের ব্যবসায়ে কলিকাতাওয়ালা বড় বড় চতুর ব্যবসায়ীরাও সর্ব্বদা শঙ্কিত ইত্যাদি। বাস্তবিক প্রকৃতরূপে ইঁহারাই মহাজন ও সওদাগর প্রভৃতি নামে অভিহিত হইতে পারেন। বঙ্গবাসিগণ! যদি তোমরা প্রকৃত বাণিজ্য ব্যবসায় করিতে ইচ্ছুক হও, যদি আর অধিককাল সাংসারিক নিত্য আবশ্যক দ্রব্যের জন্য পরমুখ প্রত্যাশী থাকিতে বাঞ্ছা না কর, যদি বাণিজ্য ব্যবসায়ের কিরূপ গৌরব, ও তদ্দ্বারা এক সময়ে দেশের কিরূপ শ্রীবৃদ্ধি সংসাধিত হইয়াছিল এবং এক্ষণেও ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইউনাইটেড ষ্টেট প্রভৃতি স্থানে কিরূপ হইতেছে

জানিতে পারিয়া থাক, তবে পরস্পরে একবাক্য ও একাগ্রচিত্ত হইয়া ঈর্ষ্যা বা প্রবঞ্চনা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া দৃঢ়ব্রতে ব্রতী হইয়া বিশ্বাস ও বাণিজ্য সংবাদপত্র সহচর করিযা বোম্বাইবাসীদিগের অনুকরণে রত্ত হও, এবং অধিক মূলধন সংগ্রহ করিয়া বিলাত প্রভৃতি স্থান হইতে আপাততঃ নানা প্রকার কল আনয়ন করিয়া বাণিজ্য ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে, কোন সময়ে "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ" এই প্রাচীন মহাজনমুখ বিনিসৃত হৃদয়োত্তেজক শব্দে ভাবতকে পুনরায় প্রতিধ্বনিত হইতে দেখিতে পাইবে নতুবা এখন যেরূপ বাণিজ্য করিতেছ তাহা করিয়া কখনই দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে পারিবে না। এক্ষণে অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন বঙ্গবাসীরা কোথায় এরূপ মূলধন পাইবে? কেই বা সাহস দান কবিবে? এতদুত্তরে প্রথমেই বঙ্গবাসী জমিদার ও ধনীদিগের উপর আমাদের দৃষ্টি পতিত হয়, এবং হৃদয় হঠাৎ তাঁহাদিগের নিকটে তাঁহাদের হস্ত ধরিয়া এরূপ বলিতে প্রবৃত্ত হয় : ও ভ্রাতঃ কলিকাতা ও মফস্বলবাসী জমিদাব ও ধনিগণ। আপনাবা অতঃপর ৩ পার্শেন্ট ৪ পার্শেন্ট সুদে গবর্ণমেণ্টে টাকা জমা না দিয়া ৪।৫।৬ জনে একত্রিত ও প্রণয়সূত্রে বদ্ধ হইয়া মূলধন সংগ্রহ করিয়া বিদেশ হইতে বাণিজ্যোপযোগী দ্রব্যাদি আনয়ন ও স্বদেশোৎপন্ন দ্রব্যে বাণিজ্য জাহাজে পরিপূরণ করিয়া সমুদ্রপথে দূর দেশে চালান দিয়া বহির্ব্বাণিজ্যে নিযুক্ত হও। আর মধ্যবিত্ত লোকেরা এতত্র মিলিয়া আপন আপন অবস্থানুসারে মূলধন প্রয়োগ করিয়া মুঙ্গেবের হিন্দু কো-অপারেটিব সোসাইটীর ন্যায় স্থানে স্থানে বাণিজ্যিক সভা ও ব্যবসায় খুলিয়া অন্তর্বাণিজ্যেব শ্রীবৃদ্ধি সাধনে মনোনিবেশ করুন। আমবা এ পর্য্যন্ত মুঙ্গেবেব হিন্দু কো অপারেটিং সভাব ত বেশ উন্নতি শুনিতেছি। তাহাতে ঈর্ষ্যা ও শঠতা কীট প্রবেশ করিতে পারে নাই। ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা করি যেন দিন দিন ইহার উন্নতি হয়। এই দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া বঙ্গবাসীরাও যেন বাণিজ্য কার্য্যে যত্নবান হন। স্বদেশহিতৈষী কৃতবিদ্য বহুজ্ঞগণ স্বদেশের বাণিজ্যোন্নতির জন্য স্ব স্ব স্কন্ধে অনুগ্রহপূর্ব্বক বাণিজ্য বিষয়ক সংবাদপত্রের ভাব বহন করুন। বঙ্গবাসীবাও কায়মনোবাক্যে তাঁহাদেব উৎসাহ বর্দ্ধন কবিতে যত্নবান হউন। সংবাদপত্রে কোন্ দেশের কোন্ জাতির কিরূপ বাণিজ্যেব অবস্থা? কোন্ দ্রব্য কিরূপ লভ্য হইতেছে? কিরূপেই বা সেই সেই দ্রব্য উৎপন্ন করিয়া বিদেশে চালান দিতেছেন? সেই সকল ও আমাদিগের দেশের কোথায় কিরূপ বাণিজ্যের সুবিধা, কিরূপ উপায় অবলম্বন করিলে কিরূপ ব্যবসায়েব উন্নতি হইবে, কোথায় কিরূপ দর ইত্যাদি বিশেষরূপে লিখিতে দৃঢ়ব্রতী হউন। ব্যবসায়ীরাও প্রধান প্রধান স্থানেব দ্রব্যাদির দর অবগত হইতে পারিয়া মফস্বলস্থ সকলে একত্র হইয়া কমিটি কবিযা সেইরূপ গডপড়তা ধরিয়া ইংরাজদিগের ন্যায় একটী দরে ক্রয়-বিক্রয় করিবেন।"

এদেশীয়দিগের উচ্চতর রাজকার্য্যে নিয়োগ। ১৫ বৈশাখ ১২৮৭। ২ সংখ্যা

বিধাতা দেহের স্বাস্থ্যরক্ষার্থ কটু কষায়াদি ষডরসের সৃষ্টি করিয়াছেন, আর মনের স্বাস্থ্যরক্ষার্থ কবিগণের নবরস সৃষ্টি। শৃঙ্গার বীর করুণাদি ভিন্ন ভিন্ন রসের ভিন্ন ভিন্ন দেশে সমাদর। কোন দেশের লোকে বীররস ভালবাসেন। কোন দেশের লোকের আদিরস প্রিয়। কিন্তু হাস্যরসের সকল দেশেই সমান আদর, পাঠক। ইতিহাস পাঠ কর দেখিতে পাইবে অনেক সময়ে অনেক দেশে অনেক প্রকারে হাস্যরসের অভিনয় হইয়াছে। যখন রোমকেরা গ্রীসদেশীয়দিগের স্বাধীনতা দানের ঘোষণা করেন তখন এই হাস্যরসের একবার অভিনয় হয়। গত শতাব্দীতে যখন সর্ব্বশক্তিমান সিন্ধিয়া আপনাকে পেশোবার পাদুকাবাহক বলিয়া ঘোষণা করেন তখনও এই রসের অভিনয় হয়। আমাদের দেশেও আমাদের গবর্ণমেণ্ট গত বৎসব এই রসের অভিনয় করিয়াছেন। ভারতবর্ষীদের যে রাজপদ লাভ বিষয়ে ইউরোপীয়ের সহিত সমানস্বত্বের অধিকারী, এ কথা ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট অনেকবার স্বমুখে স্বীকার করিয়াছেন, কায্য কিন্তু কথার সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রথমতঃ বলা হইল সিবিল সর্বিস পরীক্ষা ইংলণ্ডে নিরপেক্ষভাবে গৃহীত হইবে। এ পরীক্ষায় কি ইংলণ্ডীয় কি ভারতবর্ষীয় সকলেরই সমান স্বত্ব। ভারতবর্ষীয়েরা যদি ইচ্ছা করে ইংলণ্ডে গিয়া পরীক্ষা দিতে পারিবে। প্রথমে পরীক্ষা দিবার জন্য ২১ বৎসর নির্দ্ধারিত হইল। তাহার পর যখন দেখা গেল, ভারতবর্ষীয়েরাও ২১ বৎসর বয়সে অনায়াসে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছে, তখন ঐ বয়স কমাইয়া ১৯ বৎসর করা হইল। কিন্তু সমান স্বত্বের যে ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, তাহার কোন ব্যতিক্রম করা হইল না! এই ত গেল এক অভিনয়।

দ্বিতীয় অভিনয়—গত বৎসর সিবিল সর্বিস লইয়া মহা ধুমধাম পডিয়া গেল। বিলাতে পর্য্যন্ত "সমান স্বত্বের" গৌরব রক্ষার ঢেউ উঠিতে লাগিল। ভারতের মুখ উজ্জ্বলকারক বাবু লালমোহন ঘোষ দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া ইংলণ্ডীয়দিগের মনে সমান স্বত্ববিষয়ক সংস্কার দৃঢ়তর করিয়া দিলেন। বিলাতী মন্ত্রিসভা অমনি ভারবর্ষীয়দিগকে বিনা পরীক্ষায় সিবিল সর্বেণ্ট করিয়া দিবার অনুমতি দিলে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এমনি সসজ্জ যে···মুখ হইতে বাক্য নির্গত হইতে না হইতেই দুই তিন জনকে সিবিল সর্বেণ্ট করিয়া ফেলিলেন, জয়জয়কার শব্দ উত্থিত হইল। সকলে আনন্দে উন্মত্ত হইলেন। সেই আনন্দোন্মাদ হেতু বেতনের বিষয়ে কাহারই লক্ষ্য রহিল না। বলা হইয়াছিল বিনা পরীক্ষায় নিয়োজিত সিবিল সার্বেণ্ট-দিগের বেতনের দুই-তৃতীয়াংশের অনধিক বেতন পাইবেন, কথার বাঁধনী কেমন? দুই-তৃতীয়াংশের অধিক অর্থাৎ দুই-তৃতীয়াংশও নয়, শেষ দাঁড়াইল দুইশত টাকাও নয়। কিন্তু "নামে গোয়ালা ভক্ষণ ঝাঁজি"। ফলতঃ নামে সিবিল সর্বিস, আড়ম্বরও সিবিল সর্বিসের অধিক। কিন্তু রুধিরের বিষয়ে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের অপেক্ষা হীন। নামে যেরূপ হউক

ফলে ডেপুটী ও সিবিল উভয়ই সমান হইল। অনেক উপযুক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট এই শ্লাঘনীয় সিবিল সর্বাণ্ট পদের নিমিত্ত দরখাস্তও করিলেন না। যাহাতে লাভ নাই, তাহার জন্য বৃথা চেষ্টা কি জন্য লোকে করিবে। গবর্ণমেণ্টও দেখিলেন যে সত্য সত্যই ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটি ও সিবিল সর্বিস এক হইল, এই সুযোগে আমরা ব্যয় বিষয়ে কিঞ্চিৎ সুবিধা লই। অমনি ডেপুটীদিগের বেতন কমিয়া গেল। দুই শত টাকা হইতে দেড়শত হইয়া দাঁড়াইল। বঙ্গীয় যুবকদিগের অন্ততঃ আট দশ জন প্রতি বৎসর দুই শত টাকা বেতনে রাজকার্য্যে প্রবেশ করিতে পারিবেন। অবশিষ্ট সকলকে ১৫০ টাকায় প্রবেশ করিতে হইবে, সিবিল সর্বিস সম্বন্ধে ইউরোপীয়ের সমানস্বত্বের কল্যাণে প্রাচীন অবিসম্বাদিত স্বত্বও লোপ হইল অথচ ইংলণ্ডের লোকেরা জানিলেন বিনা পরীক্ষায় দেশীয়দিগকে সিবিল সর্বেণ্ট করা হইল। ডেপুটীরা যেমন পূর্ব্বে অনেক বেতন পর্য্যন্ত উঠিতে পারিতেন এখন আর সে উঠিবার যো রহিল না। এখন পাঁচ মত্তের উপর উঠা অতিশয় কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে। সিবিলিয়ান ত নিযুক্ত হইলেন, ইহাদের কি অবস্থা দাঁড়ায় আর কিছু দিন পরিদর্শন না করিয়া বলিতে পারা যায় না, কিন্তু ইহা প্রায় স্থিরই যে ইহারা ইংলণ্ডীয় সিবিলিয়ানের ন্যায় উচ্চপদ ও উচ্চ বেতন পাইবেন না। গবর্ণমেণ্ট যাহাই স্থির করুন, আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধি লোক আমরা এই বুঝিলাম, গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা দেশে দুই জন করিয়া রূপান্তর ডেপুটী মনোনীত করিবেন, কিন্তু ইহাদিগকে ডেপুটীদিগের অপেক্ষা অনেক অধিক কাজ করিতে হইবে। অবশিষ্টগুলি সব-ডেপুটী হইলেন, তাঁহাদিগকে ডেপুটীর কার্য্য করিতে হইবে অথচ ডেপুটীর মত বেতন পাইবেন না।

উপসংহারে দুঃখ সহকারে দয়ালু গবর্ণমেণ্টকে বিনীতভাবে জানাইতেছি, প্রজার প্রতি এরূপ ব্যবহার আমাদের মহামনা গবর্ণমেণ্টের উচিত নয়।

চটের ব্যবসায়। ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৮৭। ৮ সংখ্যা

বঙ্গদেশীয়েরা যে কেমন অনুদ্যমশীল, তাহারা যে আয় বৃদ্ধির কেমন প্রশস্ত দ্বার উন্মুক্ত করিবার সুযোগ পরিত্যাগ করিয়াছেন, এই প্রস্তাবটী পাঠ করিলেই পাঠকের তাহা সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে। স্কটলণ্ডের অন্তর্গত ডণ্ডি নামক স্থানে ১২।১৪ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাণ্ড চটের ব্যবসায় ছিল। পৃথিবীর নানা স্থান হইতে তথায় পাট আমদানী হইত। সেখানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কল ছিল। তথায় ঐ সকল পাটে গুণ (গানী) ও থলিয়া প্রস্তুত হইয়া দেশবিদেশে নীত হইত। তৎকালে ইংলণ্ডের যত গুণ থলিয়ার প্রয়োজন হইত, ডণ্ডি তৎসমুদয়ের সরবরাহ করিয়া অনেক লক্ষ টাকার দ্রব্য উপনিবেশে

ও ইউরোপের অন্যান্য প্রদেশে প্রেরণ করিত। কিন্তু এক্ষণে ডণ্ডির প্রয়োজনানুরূপ থলিয়া ও গুণ প্রস্তুত হইতেছে না। ইংলণ্ডের লোকে বলে যে ডণ্ডি এক্ষণে হুগলী নদীর উভয় তীরে স্থাপিত হইয়াছে। ইহার অর্থ এই, এখন গঙ্গাব উভয় তীরে এত চট প্রস্তুত হইতেছে যে, ডণ্ডির প্রাদুর্ভাব কমিযা গিয়াছে। ডণ্ডিব বণিকগণ ঈর্ষ্যা কষায়িত লোচনে হুগলী নদীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কবিতেছে। এমন কি ডণ্ডিব অনেক বণিক গঙ্গার উভয় তীরে কল নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাঙ্গালা দেশ যখন চটের ব্যবসায়ে স্কটলণ্ডকেও পরাভূত কবিতেছে, তখন এ ব্যবসায়েব অবস্থা বর্ণন বঙ্গীয় পাঠকগণের একান্ত প্রীতিকর হইবে সন্দেহ নাই।

১২৮৫ সালে কেবল এক বঙ্গদেশ হইতে এক কোটী তিন লক্ষ মণ পাট কলিকাতায় আমদানী হইয়াছে। চাউলের ব্যবসাযে নৌকায় আমদানী যেমন অধিক হয়, পাটের ব্যবসায়েও ঠিক সেই রূপ হইযা থাকে। উক্ত এক কোটি তিন লক্ষের মধ্যে আটাত্তর লক্ষ মণ নৌকায় ও একত্রিশ লক্ষ মাত্র রেলওযেতে আসিয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরের সহিত তুলনা করিলে রেলওয়ের আমদানীতে এগার লক্ষ মণ বেশী হইয়াছে। চাউল ও পাটের আমদানী ও রপ্তানী দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হইতেছে, নৌকাযোগে দ্রব্যসামগ্রী কলিকাতায় আনিতে রেল অপেক্ষা অনেক কম খরচ এবং অনেক সুবিধা হয। কিন্তু বিলাতী কাপড ও লবণের আমদানী ও রপ্তানী দেখিলে বোধ হইবে কলিকাতা হইতে মফস্বলে রপ্তানী কবিতে হইলে রেল দ্বারা করিলেই অধিক সুবিধা হয়। আসিবাব সময় এক টানায় ভাটিয়া নৌকা অল্প কালে ও সহজে আইসে। যাইবাব সময় উজান ঠেলিয়া যাইতে অনেক সময় লাগে ও বড কষ্ট হয়। দিনাজপুর, রাজসাহী, রঙ্গপুর, পাবনা, ঢাকা, পুর্ণিয়া সংক্ষেপতঃ সমস্ত উত্তর বাঙ্গালায় এবং দক্ষিণ বঙ্গের মধ্যে ২৪ পরগণায প্রচুর পরিমাণে পাটের চাষ হইয়া থাকে, পশ্চিম বাঙ্গালায বড অধিক পাট জন্মে না। পূর্ব্ব ভারত রেলওয়ে দিয়া অতি অল্প পাটই কলিকাতায় আনীত হইয়া থাকে।

পাঠকবর্গ মনে করিতে পারেন, যে বাঙ্গালায় যেখানে যত পাট জন্মে, সে সমুদয়ই কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী কলসমূহে আনীত হয়। বাস্তবিক তাহা নহে। আজিও দিনাজপুর, পূর্ণিযা, জলপাইগুডি, ত্রিপুরা—এমন কি হুগলী, এবং চব্বিশ পরগণায়ও চট বোনা বন্ধ হয় নাই। মফস্বলের কলে থলিয়া হয়, তাহার প্রায় দশগুণ অধিক এখনও প্রস্তুত হইয়া থাকে। উত্তরোত্তর হাতে বোনা থলিয়া উৎকৃষ্টতর হইতেছে।

এতদ্ভিন্ন সিরাজগঞ্জে পাটের কল আছে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে কলিকাতায় এক শত তিন লক্ষ মণ পাট আনীত হয়। পোর্ট কমিশনরের রিপোর্টে দেখা গেল, ৭৮ লক্ষ মণ পাট কলিকাতা হইতে বিদেশে নীত হইয়াছে। এই ৭৮ লক্ষ মণের অধিকাংশই ইউরোপ ও আমেরিকায় নীত হইয়াছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য বন্দরে ৭২ হাজার মণ মাত্র গিয়াছে।

আমদানী হইতে যদি রপ্তানী বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে প্রায় পঁচিশ লক্ষ মণ পাট কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশে ব্যয়িত হইয়াছে। কটন সাহেব অনুমান করিয়াছেন, কলের প্রত্যেক তাঁতে ৫৫০ মণ পাট প্রতি বৎসর লাগে। কলে ৪২৭৮ খানি তাঁত চলিতেছে। সুতরাং কল সমূহেই কিঞ্চিদধিক ২৩ লক্ষ মণ প্রয়োজন হয়। পাট কলিকাতায় আসিবার পুর্ব্বে অত্যন্ত অপরিষ্কৃত থাকে। কলিকাতায় আসিয়া পরিষ্কৃত হয়। তাহাতেও পাটের ওজন অনেক কমিয়া যায়।

৭৫।৭৬ খ্রীঃ অব্দে (১৮৭৫-৭৬) চটের ব্যবসায় মন্দ হয়। অর্থাৎ গঙ্গার উভয় তীরে ও ডণ্ডি প্রভৃতি যে সকল স্থানে পাটের কল ছিল, তথায় এত অধিক পরিমাণ থলিয়া ও গুণ মজুত থাকে। ঐ দুই বৎসর চটের ব্যবসায়ের বিষম সঙ্কট উপস্থিত হয়। বাস্তবিক ঐ দুই বৎসরেই পাটের কাজে কোন দেশের ক্ষমতা কত, তাহা প্রকাশ পায়। দুই বৎসর পরে দেখা গেল যে বঙ্গদেশেরই জয় হইল ও স্কটলণ্ডের পরাজয় হইল। ইহার কারণ এই বাঙ্গালায় পাট উৎপন্ন হয় বাঙ্গালার শ্রমজীবিদিগের বেতন অল্প, সুতরাং বাঙ্গালায় যত অল্প ব্যয়ে গুণ ও চট প্রস্তুত হইতে পারে, স্কটলণ্ডে সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নয়। পুর্ব্বোক্ত-বৎসরদ্বয় ব্যাপী ব্যবসায় সংঘর্ষের পর আবার বঙ্গীয় চট ব্যবসায় ক্রমশঃ পুনরুজ্জীবিত হইতেছে। তদনুসারে পাটের মূল্যও বৃদ্ধি হইতেছে। নিম্নলিখিত তালিকায় তাহা স্পষ্ট উপলব্ধ হইবে।

সাল	রপ্তানি মণ	মূল্য
১২৮২	৭০ লক্ষ	২৮০ লক্ষ
১২৮৩	৬২ লক্ষ	২৬৬ লক্ষ
১২৮৪	৭৩ লক্ষ	৩৫০ লক্ষ
১২৮৫	৭৮ লক্ষ	৩৬৩ লক্ষ

পুর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, প্রায় ২৩ লক্ষ মণ পাট কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের কলে ব্যয়িত হইয়াছে, ইহার মধ্যে কিঞ্চিদধিক ছয় লক্ষ মণের গুণ ও কিঞ্চিন্ন্যূন সতর লক্ষ মণের থলিয়া প্রস্তুত হয়। কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে আঠারটী পাটের কল আছে। প্রত্যেক কলে ন্যূনাধিক লক্ষ মণ পাট ব্যয় হয়। কলের অধ্যক্ষেরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, এক মণ পাটে ৩৫টী করিয়া থলিয়া প্রস্তুত-হইতে পারে। সুতরাং মণ করা ৩৫টী থলিয়া ধরিয়া কিঞ্চিন্ন্যূন সতর লক্ষ মণ পাটে ৫৮৬ লক্ষ থলিয়া প্রস্তুত হয়। এতদ্ভিন্ন প্রায় ২৬৩ লক্ষ থলিয়া উত্তর বাঙ্গালা ও অন্যান্য প্রদেশ হইতে আনীত হইয়াছে। যত থলিয়া আইসে, তাহার অধিকাংশই নৌকায় আসিয়া থাকে। জাহাজে তের লক্ষ মাত্র আসিয়াছে। এই তের লক্ষেরও অধিকাংশ ভারতবর্ষীয় বন্দর সমূহ হইতে

আনীত হইয়াছে। ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্যদেশ হইতে চারি লক্ষ মাত্র আসিয়াছে। ব্রিটিশ দ্বীপ হইতে এত থলিয়া আনীত হয় নাই। ব্রিটেনে পাটের ব্যবসায় যেরূপ চলিতেছে, তাহাতে বোধ হয় যে উক্ত দেশে নিজ ব্যয়োপযোগী থলিয়া প্রস্তুত হয় এই মাত্র।

কলিকাতায় যে সকল থলিয়া প্রস্তুত হইয়াছে ও কলিকাতায় যে সকল থলিয়ার আমদানী হইয়াছে তাহার গণনা করিয়া সর্ব্বশুদ্ধ ৮৩৬ লক্ষ থলিয়া হয়। ইহার মধ্য হইতে ৮২৬ লক্ষ থলিয়া বিদেশে গিয়াছে। তাহাব মধ্যে ৬৩৭ লক্ষ থলিয়া জাহাজে রপ্তানী হইয়াছে, ইংলণ্ডে সব্বশুদ্ধ ৭১ লক্ষ মাত্র গিয়াছে।

আমদানী ও রপ্তানীর তুলনা করিলে দৃষ্ট হইবে, ২০ লক্ষ মাত্র থলিয়া কলিকাতায় থাকে। আপাততঃ বোধ হয়, ইহাতে কলিকাতার ব্যয়নির্ব্বাহ হওয়া সম্ভাবিত নয়। কিন্তু পুর্ব্ব পুর্ব্ব বৎসর পাটের ব্যবসায় মন্দ হওয়াতে অনেক মাল মজুত ছিল। এবার তাহা হইতেই চলিয়া গিয়াছে।

গোণী বা চট দুই প্রকার হয়। এক কলজাত, দ্বিতীয় হস্তনির্ম্মিত। কলজাতের পরিমাণ ৮০ গজ ও হস্তনির্ম্মিতের পরিমাণ ২২ গজ। হস্তনির্ম্মিত চট হুগলী ও চব্বিশ-পরগণায় নির্ম্মিত হয়। ১২৮৫ সালে সর্ব্বশুদ্ধ ১১ লক্ষ গজ হস্তনির্ম্মিত চটের মধ্যে ৫৭ হাজার গজ বিদেশে ও অবশিষ্ট নিজ কলিকাতায় ব্যয় হইয়াছে। পুর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে কলে কিঞ্চিদধিক ছয় লক্ষ মণ পাটের চট প্রস্তুত হয়। মণ করা ৮০ গজ চট ধরিলে ৫৩৯ লক্ষ গজ চট কলে প্রস্তুত হইয়াছে বলিতে হইবে। ইহার মধ্যে ১৮ লক্ষ গজ ইংলণ্ডে, ২৭ লক্ষ গজ অন্য দেশে, ৩১ লক্ষ গজ ভারতবর্ষীয় বন্দর সমুহে এবং ৪৩ লক্ষ গজ রেল ও নৌকাযোগে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে প্রেরিত হইয়াছে। কলিকাতার ব্যয়ার্থ প্রায় দশ লক্ষ গজ মজুত আছে। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে যে চট গিয়াছে, তাহা কলিকাতা হইতে যায় নাই, ইছাপুর গৌরীপুর ঋষড়া প্রভৃতি স্থান হইতে একেবারে চালান গিয়াছে।

চটের ব্যবসায়-সংঘর্ষে বঙ্গদেশ স্কটলণ্ডকে পরাজয় করিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাতে বঙ্গবাসীর কি লাভ হইয়াছে? বাঙ্গালীরা ঐ ব্যবসায়ের লাভের কত অংশ পাইতেছেন? প্রণিধানপুর্ব্বক যদি বিবেচনা করিয়া দেখা যায় দৃষ্ট হইবে, লাভ অতি অল্পই হইয়াছে। বঙ্গীয় কৃষকেরা পাটের চাষ করিয়া লাভবান হইয়াছে সত্য, এবং কতকগুলি বঙ্গীয় শ্রমজীবী কলে কাজ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে সত্য, কিন্তু উক্ত শ্রমজীবীদিগের সংখ্যা পুর্ব্বকার শিল্পজীবীদিগের সংখ্যা অপেক্ষা অনেক অল্প। কলের সমস্ত টাকাই ইংরাজের, উহাতে বাঙ্গালী অংশী অতি অল্পই আছেন। সুতরাং লাভের অংশ সমুদয়ই ইংরাজের, বাঙ্গালীর কিছুই নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বাঙ্গালীরা যে থলিয়া ও চটের কার্য্যে আর অর্থ ও শ্রম ব্যয়

করে, তাহার যো নাই। আর অধিক কল চলিলে ব্যবসায় মন্দা হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। হস্তে প্রস্তুত করিয়া গুণের কারবার করিলেও কলের সহিত যুঝিয়া উঠা যাইবে না। এখনও যে হস্তে চট প্রস্তুত হইতেছে, তাহার কারণ এই, উহা শ্রমজীবীরা বিশ্রামের সময় প্রস্তুত করে, কৃষিকর্ম্ম শেষ হইলে যে কয়েক মাস ঘরে বসিয়া থাকিতে হয়; সেই সময়ে উহারা চট বুনিয়া থাকে। অতি অল্প লাভেই তাহারা সন্তুষ্ট হয়। সুতরাং তাহাদের ব্যবসায় বোধ হয় কোন কালেই মারা যাইবে না।

উপরে যে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণিত হইল, তাহা দেখিয়া পাঠকের কি স্পষ্ট বোধ হইতেছে না, যদি বাঙ্গালী ধনিগণ অধিক পরিমাণে চটের কলে অর্থ ব্যয় করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা পরিণামে বিলক্ষণ লাভবান হইতে পারিতেন? কারণ বাঙ্গালায় অনেক সুবিধা আছে। যেখানে পাট জন্মে, সেইখানেই কল, পৃথিবীর আর কুত্রাপি এমন সুবিধা নাই। এই সুবিধা থাকাতেই বাঙ্গালায় পাটের কলের এত সমৃদ্ধি ও উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, এক অনুদ্যম ও অনুৎসাহশীলতা ধনী বাঙ্গালীদিগের একটী প্রশস্ত আয়দ্বারা রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। এখন তাহারা ইংরাজদিগের প্রতিষ্ঠিত কলের অংশ ভূরি পরিমাণে ক্রয় করুন, তাহা হইলেও পরিণামে কথঞ্চিত লাভবান হইতে পারিবেন।

রায়তদিগের সভা। ২৭ পৌষ ১২৮৭। ৯ সংখ্যা

আমরা সমাচারপত্র পাঠে জানিলাম, কৃষ্ণগঞ্জে রায়তদিগের একটা মহতী সভা হইয়া গিয়াছে। রেণ্ট বিল নামে জমিদারী করসংক্রান্ত আইনের উপস্থিত পাণ্ডুলেখ্যটী যাহাতে বিধিবদ্ধ হয়, গবর্ণমেণ্টে সেই প্রার্থনা করা হইবে, সভায় এই স্থির হইয়াছে।

আমরা দেখিতেছি, করসংক্রান্ত উল্লিখিত আইনটী হিন্দু ও মুসলমানের উপাসনার দিক ও ভোজনপাত্র কদলীপত্র হইয়া উঠিয়াছে। সতিনীর বাটি বলিলেও হয়। হিন্দুরা পুর্ব্বদিকে আপনাদিগের উপাসনাকার্য্যের প্রশস্ত দিক বলিয়া স্থির করিলেন, মুসলমানেরা অমনি তাহার বিপরীত পশ্চিম দিক অবলম্বন করিলেন। দেব দিবাকরের তীব্র করজালে যে মুখমণ্ডল দগ্ধ হইবে, সে বিবেচনা করিলেন না। হিন্দুর বিপরীত আচরণ করা চাই বলিয়া তাহাও শ্রেয়োজ্ঞান হইল। হিন্দুরা কদলীপত্রের মসৃণ ও চিক্কণ পৃষ্ঠে ভোজন করেন, মুসলমানের তাহার বিপরীত করা চাই, অতএব তাঁহারা কদলীপত্রের বন্ধুর ও অপরিষ্কৃত পৃষ্ঠটী ভোজনার্থ শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিলেন। এক সতীন

ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া অপর সতীনের বাটিতে অতি অপবিত্র দ্রব্য ভক্ষণ করিল। অপবিত্র দ্রব্য সংযোগে সপত্নীর বাটিটি নষ্ট হইবে, এই তাহার লক্ষ্য, অপবিত্র দ্রব্য ভক্ষণে যে আপনার অনিষ্ট ঘটিবে, সে বিচার নাই।

কলিকাতায়, বাঁকিপুরে ও অন্য স্থানে জমিদারেরা সভা করিয়া রেণ্ট বিলের প্রতিবাদ করিয়াছেন, রাইয়তদিগের তাহার বিপরীত করা চাই, অতএব তাহার অনুমোদন করিয়া যাহাতে তাহা বিধিবদ্ধ হয়, রাইয়তদিগের সভা সেই চেষ্টা আরম্ভ করিলেন। আমরা দুঃখিতচিত্তে দেখিতেছি, উভয় পক্ষ কেবল বিবাদমগ্ন হইয়াছেন, কোন পক্ষই আপনাদিগের ইষ্টানিষ্ট দর্শন করিতেছেন না। রেণ্ট বিলটী এখন যে আকারে আছে, উহা যদি ঐ আকারে বিধিবদ্ধ হয়, উভয় পক্ষেরই অনিষ্ট হইবে। অতএব উভয় পক্ষের একপরামর্শী হইয়া করা উচিত, উভয়ে যদি উভয়ের স্বার্থরক্ষা করিয়া এক পরামর্শী হইয়া কার্য্য করেন, উভয়েরই মঙ্গল হইতে পারে।

আমরা দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি, জমিদারদিগের আর ভদ্র নাই। প্রজারা এখনই ত প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছে ক্রমে যে উহারা উপরি পদ আক্রমণ করিবে, তাহার উপক্রম দেখা যাইতেছে। মহাকবি কালিদাসের একটা মহার্ঘ কাব্য আছে :

নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ।

শকট চক্রের নিম্নস্থ অংশ গমন কালে যেমন উপরে উঠে এবং উপরিস্থ অংশ নিম্নে আইসে, সেই রূপে মানুষের দশা বিপর্য্যয় ঘটিতেছে।

জমিদারেরা এত দিন প্রজাদিগকে রসাতলে দিয়াছিলেন, যা ইচ্ছে তাই করিয়াছেন, তাহাদিগকে যার পর নাই কষ্ট দিয়াছেন, এখন তাহাদের সময় উপস্থিত। জমিদারেরা নিজ দেশে ও তাহাদের মূর্খ কর্ম্মচারির দোষে ক্রমে অপদস্থ হইতেছেন। এখন সেই পূর্ব্বের মত পৌষ মাসের রাত্রিতে পুষ্করিণীতে স্নান করাইয়া পাখার বাতাস দেওয়া ও রস খাওয়ান এবং জ্যৈষ্ঠমাসের দারুণ গ্রীষ্মে চূণের গুদামে বন্ধ করা নাই বটে, কিন্তু এখনও জমিদারের মূর্খ কর্ম্মচারিরা আইনবিরুদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠানে বিমুখ নহে। আমরা কয়েকদিন শুনিতেছি, একজন জমিদারের গোমস্তা বলপূর্ব্বক প্রজার ধান্য কাটিয়াছিল বলিয়া হাজতে গিয়াছে। এ মূর্খতা কেন? গবর্ণমেণ্ট যেমন প্রজার হিতসাধন চেষ্টা পাইতেছেন, তেমনি জমিদারের সুবিধা করিয়া দিবার বিষয়েও অনিচ্ছুক নহেন। যে প্রজা দুষ্টতা করিবে, জমিদার জানিতে পারেন, সময়ে আদালতে জানাইয়া অনায়াসে তাহার শস্য ক্রোক করিয়া আপনার টাকা আদায় করিয়া লইতে পারেন। এমন সুগম পথ থাকিতেও বেআইনী কাজ করিয়া কেবল আপনাদিগের মূর্খতার পরিচয় দেওয়া হয় এই মাত্র। সমাচার পত্র পাঠে জানিতে পারিলাম, বাবু নফরচন্দ্র পালের লোকে প্রজাকে বন্ধন পূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল, জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট স্বচক্ষে তাহা দেখিয়া নফর বাবুর লোকের কারাদণ্ড দিয়াছেন। যখন রাজপ্রতিনিধিদিগের

জমিদারের উপরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পড়িয়াছে, তখন তাঁহাদিগের সাবধান হইয়া চলা উচিত। প্রজারাও এই সময়ে রাজপ্রশ্রয় পাইয়া বজ্জাতি আরম্ভ করিয়াছে। আমরা একবার শুনিয়াছিলাম, আমাদের এ অঞ্চলের একজন জমিদার কয়েকজন প্রজাকে ডাকাইয়াছিলেন। তাঁহার লোকে প্রজাদিগকে বন্ধন বা প্রহার করে নাই, তাঁহার লোকে প্রজাদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেছিল এই মাত্র। কিন্তু প্রজারা এমনি দুষ্ট, যে তাহারা বারুইপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের কাছারির কাছে গিয়া এই বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল যে জমিদারের লোকে তাহাদিগকে বাঁধিয়া লইয়া যাইতেছে। কোন কোন প্রজা বস্ত্রমধ্যে লুকাইয়া দড়ি আনিয়াছিল, সেই দড়ি বাহির করিয়া আপনা আপনি দুই এক জনকে বাঁধিয়া ফেলিল নফর বাবুর প্রজাদিগের সে ঘটনা ঘটন সম্ভাবিত নয়।

নফর বাবুর কথায় জমিদারদিগের আর একটী মহৎ দোষের কথা আমাদিগের মনে পড়িয়া গেল, তাহার উল্লেখ না করিয়া নীরব হইতে পারিলাম না। অনেক যশোলিপ্সু ক্ষুদ্রাশয় জমিদার আছেন, তাঁহারা বাহিরে মহাদান করিয়া বাহাদুরী করেন কিন্তু তাঁহাদের দানের টাকা প্রজার শোণিত শোষণ করিয়া আদায় করা হয়। নফর বাবু কেবল ধরা পড়িয়াছেন, কিন্তু অনেকে অন্তঃসলিলে বহিয়া থাকেন। আমাদিগের রাজপুরুষেরা দান দেখিয়াই ভুলিয়া যান, কিন্তু ভিতরে যে কি কাণ্ড হয়, তাহা বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা নিশ্চয় জানিবেন, ব্যবসায়ের উপরে কর করিলে যেমন দরিদ্র ক্রেতাদিগকে তাহার ভার বহন করিতে হয়, জমিদারেরা যে দান করেন, তাহার অধিকাংশের অর্থভার দরিদ্র প্রজাদিগকে বহন করিতে হয়। জমিদারের লোকের জলৌকার ন্যায় প্রজার নিকট হইতে তাহার সংগ্রহ করেন। এটীও জমিদারদিগের নিন্দা ও অপদস্থ হইবার একটী প্রধান কারণ হইয়াছে।

সকল জমিদারেই যে ঐ নিন্দনীয় নিকৃষ্ট কর্ম্ম করেন, আমরা এই কথা বলিতেছি, রাজপুরুষেরা যেন এ সিদ্ধান্ত না করেন। মহারাণী স্বর্ণময়ী ও পাইকপাড়ার রাজা প্রভৃতি কতকগুলি প্রধান প্রধান জমিদার আছেন, তাঁহাদের জমিদারীতে পীড়ন নাই, অথচ তাঁহাদের দানশোভায় দেশ সুশোভিত হইয়াছে।

উপসংহারে আমরা জমিদার ও প্রজা উভয় পক্ষকেই অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা পরস্পর-বিরোধিভাব পরিত্যাগ করিয়া ঐকমত্যে আপনাদিগের চিরবিবাদের নিষ্পত্তি করিয়া লউন। এমন সুসময় আর পাইবেন না। ইডেন সাহেব বঙ্গদেশের শীর্ষস্থানে আছেন। তিনি বঙ্গদেশে অনেক দিন অতিবাহিত করিলেন। তিনি বঙ্গদেশের যেমন বিশেষজ্ঞ, রাজপুরুষদলে এমন লোক অতি অল্প আছেন। তিনি কোন পক্ষে পক্ষপাতী নন। উভয় দলের মঙ্গল হয়, তাঁহার এই ইচ্ছা। এ সময়ে যদি উভয় দলে পরস্পর-বিরোধ করিয়া আপনাদের অনিষ্ট স্থাপনা করেন, তাহাতে ইডেন সাহেব দোষী হইবেন না।

বাণিজ্যের স্বাধীনতা। ১৯ মাঘ ১২৮৭। ১২ সংখ্যা

বাণিজ্যের স্বাধীনতা স্বাধীনতা বলিয়া একটী রব উত্থিত হইয়াছে! সে রবটী দুর্ব্বল নয়। প্রবল স্থান হইতে উঠিয়াছে। অতএব উহা যে পশ্চিম মেঘের ন্যায় অমোঘ হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ২৯ শে ডিসেম্বর কয়েকজন প্রধান লোক তুলাজাত দ্রব্যের মাসুল রহিত করিবার অভিপ্রায়ে ল্যাঙ্কাসায়ারের প্রতিনিধি হইয়া ইণ্ডিয়া হাউসে আমাদের বর্ত্তমান ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারি লার্ড হার্টিংটনের নিকটে গমন করিয়াছিলেন। উভয় দলে পরস্পর যেরূপ কথোপকথন হয়, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে, ল্যাঙ্কাসায়ারের মনোরথই পূর্ণ হইবে। প্রার্থীর মনোরথ যত পূর্ণ হয়, লোকের যত সুবিধা ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের উপায় হয়, ততই আহ্লাদের বিষয়। অতএব ল্যাঙ্কাসায়ারবাসিদিগের মনোরথ পূর্ণ হউক, তাহাতে আমরা কম আহ্লাদিত নহি। কিন্তু সেই মনোরথ পূর্ণ হইবার পথ ও যুক্তি কি? বিশুদ্ধ পথ ও যুক্তি না থাকিলেও যদি কোন প্রার্থীর প্রার্থনা পূর্ণ করা হয় তাহাতে পক্ষপাতিতা প্রকাশ পায়, কিন্তু পক্ষপাতিতা করা রাজার ধর্ম্ম নয়। তবে ল্যাঙ্কাসায়ারের মনোরথ পূর্ণ করিবার অনুকূল একটী বিশুদ্ধ যুক্তি আছে। সে যুক্তি এই বাণিজ্যের স্বাধীনতা। বাণিজ্যের স্বাধীনতাদান অর্থশাস্ত্রবিৎ নীতিজ্ঞদিগের একান্ত অভিমত। তাঁহারা বাণিজ্য সম্বন্ধে কোন প্রকার বন্ধন বা বিঘ্ন ভালবাসেন না। বাস্তবিক বাণিজ্য যত স্বাধীন হইবে, ততই দেশের মঙ্গল, ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই লাভবান হন, বাণিজ্যের স্বাধীনতারূপ যুক্তি অবলম্বন করিয়া যদি ল্যাঙ্কাসায়ারের মনোরথ পূর্ণ করিতে হয়, তাহা হইলে ইংলণ্ডের যে যে স্থানে বাণিজ্য-সম্বন্ধ আছে সর্ব্বত্রই স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। ল্যাঙ্কাসায়রের মনোরথ পূর্ণ করিতে গেলে ভারতবর্ষের ক্ষতি আছে, এই নিমিত্ত ভারতবর্ষের কথা আমরা আগে কহিতেছি। বাণিজ্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের একটী প্রশস্ত আয়দ্বার। ল্যাঙ্কাসায়রের মনোরথ পূর্ণ করিতে গেলে সে আয় সঙ্কুচিত হইয়া আসিবে। যে মাসুল কমান হইয়াছে, তাহাতে বঙ্গদেশের যে আয়ক্ষতি হইয়াছে, তন্নিমিত্ত বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। আরও যে প্রকার প্রস্তাব হইয়াছে, তাহা যদি কার্য্যে পরিণত হয় তাহা হইলে যে অধিকর্ত্তার অসন্তোষ বৃদ্ধি হইবে, সে বিষয়ে সংশয় নাই। কিন্তু যদি এই সভ্যকালোচিত বাণিজ্যের সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা দান করা হয়, সে ক্ষতি সহ্য হইতে পারে। সে ক্ষতির কোন সদৃশ উপায় বিধান করা দুরুহ নয়। ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া সে ক্ষতি পূরণ করা যাইতে পারে অথবা সঙ্গতিশালী ব্যক্তিদিগের উপর ইনকম ট্যাক্স করিয়া করা হইতে পারে।

বাণিজ্যের স্বাধীনতা-যুক্তি ভিন্ন ল্যাঙ্কাসায়রের মনোরথ পূর্ণ করিবার দ্বিতীয় উপায় হইল, তাহা হইলে সাধারণ্যে বাণিজ্যের স্বাধীনতা দান কর্ত্তব্য। সে স্বাধীনতা দান করিতে গেলে অগ্রে ভারতের লাইসেন্স ট্যাক্স উঠাইয়া দিতে হয়। লাইসেন্স ট্যাক্স বাণিজ্যের

একটী প্রধান বিঘ্ন। এই ট্যাক্সটী থাকাতে অতি দরিদ্র ক্রেতাকেও তাহার অনিষ্ট ফল ভোগ করিতে হইতেছে। যে কর সাক্ষাৎ ও পরম্পরা সম্বন্ধে দরিদ্রের কষ্টদায়ক, সেই কর অবলুপ্ত থাকিবে, আর ধনী ল্যাঙ্কাসায়রবাসিদিগের সুবিধার নিমিত্ত তুলাজাত দ্রব্যের মাসুল পরিত্যাগ করা হইবে, ইহা উদারনীতির অনুমোদিত নহে। যে কার্য্য করা হউক, তাহাতে উদার ব্যবহার একান্ত আবশ্যক। ভারতবর্ষ হইতে যে সকল দ্রব্য নীত হয়, তাহার মাসুল উঠিয়া যাউক, ইংলণ্ড হইতে যে সকল দ্রব্য ভারতবর্ষে আনীত হয় তাহারও মাসুল পরিত্যক্ত হউক, সেই সঙ্গে সঙ্গে লাইসেন্স টাক্স রহিত হইয়া যাউক। যদি এরূপ সমঞ্জস-ব্যবহার ও ব্যবস্থা হয় তাহা হইলে কাহারও আপত্তি থাকে না। তাহা না করিয়া যদি কেবল ল্যাঙ্কাসায়রের সুবিধা করিয়া দেওয়া হয়, সেটি যে পক্ষপাতের কার্য্য হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এদেশীয়দিগকে রাজপদ দিবার ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারির দ্বিতীয় আদেশ

৯ চৈত্র ১২৮৭। ১৯ সংখ্যা

"ক্ষীণে কস্যাস্তি গৌরবং" এই একটী মহার্থ প্রাচীন নীতিবাক্য আছে। ইহার অর্থ এই, কেহই দুর্ব্বলের গৌরব করে না। একটু বেগবান বায়ু প্রবাহিত হইলে দুর্ব্বল দীপশিখা অমনি নির্ব্বাণ হইয়া যায়, কিন্তু ঐ বেগবান্ বায়ু বলবান দাবানলকে নির্ব্বাণ করিতে পারে না। প্রত্যুত তাহার সহায়ভূত হইয়া থাকে, আমরা সাংসারিক কার্য্যে সচরাচর ইহার ভূরি পরিমাণ উদাহরণ দেখিয়া থাকি, আমাদের রাজপুরুষেরা আবার পদে পদে ইহার পর সহস্র প্রমাণ দেখাইতেছেন। ভারতবাসিরা ক্রন্দন করিয়া জানাইলেন, এ অসচ্ছলের সময়ে একদল ধনী বণিকের উদর পূরণার্থ তুলাজাত দ্রব্যের মাসুল কমান বা পরিত্যাগ করা উচিত নয়, কিন্তু তাঁহারা দুর্ব্বল বলিয়া তাঁহাদের প্রার্থনা উপেক্ষিত হইল। এইরূপে প্রবলের সন্তোষ সাধনার্থ ভারতের আয় কমিয়া যাইতেছে, ওদিকে সেই আয় ক্ষতিপূরণার্থ ভারতবাসীর গলে রজ্জু দিয়া টানাটানি আরম্ভ করা হইতেছে।...

আমাদের রাজপুরুষেরা অট্টালিকায় বাস করেন, রাজভোগ উপভোগ করেন, দরিদ্র ভারতবাসী যে কি কষ্টভোগ করে তাঁহারা তাহা কিরূপে জানিতে পারিবেন? তাঁহারা দিব্য শকটে গমনকালে দেখিতে পান ভারতবাসিরা ছাতা মাথায় ও জুতা পায়ে দিয়া রাস্তায় চলিয়া যাইতেছে। তাঁহারা মনে করেন, ইহাদের পর সুখী আর নাই। কলিকাতায় যখন সুপ্রিমকোর্ট স্থাপিত হয়, যাঁহারা ঐ আদালতের প্রথম জজ হইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহারা বঙ্গবাসিদিগের খালি পা ও গা দেখিয়া

পরস্পর বলাবলি করিয়াছিলেন, যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ত বড় অত্যাচারী, তাঁহারা প্রজার উপরে এমনি অত্যাচার করিয়াছেন যে, ইহাদিগের পায়ে ষ্টকিং জুতা ও গায়ে কোর্ত্তা পর্য্যন্ত নাই। অতএব আমরা এ অত্যাচার নিবারণ করিয়া ইহাদিগকে জুতা, ষ্টকিং, কোর্ত্তা পরাইয়া-: তবে শান্ত হইব। সুপ্রিমকোর্টের প্রথম জজদিগের বঙ্গবাসির খালি পা ও খালি গা দেখিয়া যেরূপ সংস্কার জন্মিয়াছিল আমাদিগের এক্ষণকার লক্ষীবান্ রাজপুরুষদিগেরও ভারতবাসির পায়ে জুতা মাথায় ছাতা দেখিয়া সেইরূপ সংস্কার জন্মিয়াছে, কিন্তু ভারতবাসির যে কত দুঃখ কত কষ্ট ও কত প্রকার রাজকর রাজসংসারে দিতে এবং রাজপুরুষদিগের ভ্রম প্রমাদকৃত কত ব্যয়ভার বহন করিতে হয়, তাহা তাঁহারা জানিয়া জানেন না। ভারতবাসীরা যদি সুখী হইত, তাহা হইলে ১৫ টাকার একটা চাকরীর নিমিত্ত হাজার হাজার লোক লালায়িত হইত না। এই কি ভারতবাসির সৌভাগ্যলক্ষীলাভের চিহ্ন।

ভারতবাসী এক এক ব্যক্তিকে রাজসংসারে কত প্রকারে টাকা দিতে হয় তাহা রাজপুরুষেরা জানিয়াও জানেন না। প্রধান গবর্ণমেণ্ট ও অপ্রধান গবর্ণমেণ্টের ভিন্ন ভিন্ন রাজস্বপ্রণালীর যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাই যত অনর্থের মূল। ঐ ব্যবস্থা ভারতবাসির ইষ্টের না হইয়া অনিষ্টেরই কারণ হইয়াছে। এক ব্যক্তিকে যে কত প্রকার কর দিতে হয় পাঠক একবার তাহা বুঝিয়া দেখুন। বোধ কর এক ব্যক্তির মিউনিসি-প্যালিটীর অধিকার নাই, এমন স্থানে কতকগুলি জমি আছে, তাহাকে সেই জমির ও বসতিবাটীর খাজনা প্রধান গবর্ণমেণ্টকে এবং ঐ জমির রোডসেস ও পাবলিক ওয়ার্কসেস স্থানীয় গবর্ণমেণ্টকে দিতে হয়। আর যে মিউনিসিপালিটীর অধীনে বাস, সেই মিউনিসি-পালিটী তাহার কাণ আকর্ষণ করিয়া ট্যাক্স আদায় করিয়া থাকেন। সেই ট্যাক্স আবার একরূপ নয়, জল আলোক প্রভৃতিতে নানা রূপ ধারণ করিয়াছে।

এখন পাঠক বুঝিয়া দেখুন, আমরা উপরে "ক্ষীণে কস্যাস্তি গৌরবং" বলিয়া যে কবিতার এক চরণ উদ্ধৃত করিয়াছি, কার্য্যে তাহা ঘটিতেছে কি না? যে ভারতবাসির উল্লিখিত অবস্থা তাহাকে মারিয়া স্বোদর ম্যাঞ্চেষ্টর বণিকের উদর পূরণ করা হইবে, কি আশ্চর্য্য! পাঠক! আফগান যুদ্ধের ব্যয়ের বিষয়টী একবার চিন্তা করিয়া দেখুন। রুশ ভারতসীমা আক্রমণ করিয়াছে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে সেই আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছে, যদি এরূপ হইত, আমাদের স্কন্ধে সে ব্যয়ভার নিক্ষেপ করিলে অসঙ্গত হইত না। রুশ যে ভারত আক্রমণ করিবেন, তাহার স্থিরতা নাই, কেবল অনুমান করিয়া কল্পনা করা হইতেছে মাত্র। রুশ ভারত আক্রমণ না করিলেও করিতে পারেন। এরূপ স্থলে এক ব্যক্তির খেয়াল বা বৈরনির্য্যাতনস্পৃহা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত ঘোর যুদ্ধ বাধাইয়া ক্ষীণস্কন্ধ ভারতের স্কন্ধে যে বৃহৎ ব্যয়ভার নিক্ষেপ করা হইল, এটা কি দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের সচরাচর যে ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহাই নয়? সে

ভার সামান্য নহে, কুড়ি কোটী টাকার (১) ভার। ইংলণ্ড তাহার মধ্যে পাঁচ কোটী দিবার অভিপ্রায় করিয়াছে। কিন্তু সর স্ট্যাফোর্ড নর্থকোট যে ধুয়া ধরিয়াছেন, তাহাতে সহজে যে সে টাকা (২) পাওয়া যায়, তাহা বোধ হইতেছে না। ইংলণ্ডের লোকেরা প্রবল, অনায়াসে ইহার বাধা দিতে পারিবেন। ভারত দুর্ব্বল, তাহার বাধা দিবার শক্তি নাই, সুতরাং তাহাকে কাঁধ পাতিয়া বহিতে হইবে।

পাঠক! ভারতের আর একটী ক্ষীণতার প্রমাণ দর্শন করুন, আমাদের এখনকার রাজপুরুষেরা ভারতকে ক্ষীণ বিবেচনা করিয়া বলপূর্ব্বক পক্ষপাতদূষিত মুদ্রাযন্ত্রসংক্রান্ত ৯ আইন করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারি তাহা রহিত করিবার আদেশ দিয়াছেন কিন্তু আমাদের রাজপুরুষেরা সে আদেশ সেল্‌ফয়াত করিয়া রাখিয়াছেন। অদ্য আমরা যে বিষয়ের প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হইয়াছি তাহা ভারতের ক্ষীণতার একটী প্রধান প্রমাণ। ষ্টেট্ সেক্রেটারি ভারতবাসিদিগকে বহুল পরিমাণে রাজপদে নিয়োজিত করিবার পূর্ব্বে একবার যে আদেশ দেন, বোধ হয় তাহা এতদিনে সেল্‌ফ মধ্যে থাকিয়া কীটনিষ্কুষিত হইয়া গেল। ষ্টেট সেক্রেটারি আবার ঐ বিষয়ের আদেশ পাঠাইয়াছেন। ইহাও বোধ হয় সেল্‌ফগত হইয়া পুস্তিকার ভক্ষ হইবে। যাহা হউক, আমরা ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারিকে ভারতের সর্ব্বময় কর্ত্তা বলিয়া বিবেচনা করিতাম, কিন্তু আমরা এখন দেখিতেছি গতি-শক্তি ও ক্রিয়াশক্তি-হীন গৃহস্থ যেমন গৃহের কর্ত্তা, ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারিও তেমনি ভারতের কর্ত্তা। স্টেট্ সেক্রেটারি এদেশীয়দিগকে বহুল পরিমাণে কার্য্য দিবার যে আদেশ করিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহা এই :

রাজনীতি ও রাজস্ব বিষয় বিবেচনা করিয়া ইংলণ্ডেশ্বরী ভারতবর্ষীয় উপযুক্ত লোকদিগকে যতদূর সাধ্য তাহাদের দেশের সিবিল কার্য্যে নিযোজিত করা অতিশয় আবশ্যক বিবেচনা করিযাছেন।

যদিও কোন কোন স্থলে প্রথমক্ষণে ও প্রথম অবস্থায় ইংরাজ প্রার্থীদিগের দ্বারা কার্য্য সুন্দর ও সন্তোষকররূপে সম্পাদিত হইবার সম্ভাবনা আছে, তথাপি ভারতবর্ষীয়-দিগকে ঐ সকল কার্য্যে নিয়োজিত করা উচিত।

বাস্তবিক এ বিষয়ে যে বহুদর্শিতা লাভ করা গিয়াছে, তাহাতে এই প্রমাণ করিয়া দিতেছে, যখন ইংরাজদিগের স্বদেশীয়ের সমক্ষে কোন অফিসের কর্ত্তার অনুগ্রহ লাভ বিষয়ে ভারতবর্ষীয়ের সহিত উপযোগিতা উপস্থিত হয়, তখন ইংরাজদিগের যতদূর কৃতকার্য্য হওয়া উচিত, সচরাচর তদপেক্ষা অধিকতর কৃতার্থতা লাভ হইয়া থাকে।

---

(১) ইউরোপীয় সমাচারে দেখা গেল গ্লাডষ্টোন সাহেব বলিযাছেন ১৩ কোটী টাকা।

( ) প্রস্তাব লেখা শেষ হইলে দেখা গেল ৫ কোটী টাকা দিবার বিষয়ে কমন্স সভা একবাক্যে মত প্রদান করিযাছেন।

আপনি (গবর্ণর জেনরল) যথার্থ কথাই বলিয়াছেন, সিবিল ও মিলিটরি অফিসর-দিগের যে সকল সন্তানের অন্যত্র কোন উপায় হয় না, তাহাদের সংখ্যাই ভারতে অধিক। তাহারা সর্ব্বদা কাজের নিমিত্ত অফিসরদিগকে ধরিয়া থাকে। তাহারা উপযুক্ত হউক, আর না হউক, তাহাদিগের নিমিত্ত অনুরোধপত্র পড়িয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন আরো কতকগুলি লোক আছে, রাজনীতি সম্বন্ধে হউক আর স্বার্থ সম্বন্ধে হউক, তাহাদের সহিত অফিসের অধ্যক্ষদিগের এরূপ বাধ্যবাধকতা সম্বন্ধ আছে যে, সম্পূর্ণরূপে তাহাদের হাত ছাড়াইবার যো নাই, সময়ে সময়ে হাত ছাড়াও কঠিন হয়। ইহার এই ফল হয়, অফিসের কর্ত্তাদিগকে কর্ত্তব্যপথ হইতে·· হয়, গবর্ণমেণ্টের প্রচারিত রাজনীতির অনুরূপ কার্য্য হইবারও বাধা জন্মে। এই নীতির সম্পূর্ণ প্রয়োগ বিষয়ে যে প্রতিবন্ধক আছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে অন্তরিত করিবার নিমিত্ত ইংলণ্ডেশ্বরীর গবর্ণমেণ্ট ইহ৷ পরামর্শসিদ্ধ বিবেচনা করিয়াছেন যে, উপরিলিখিত যুক্তির সম্মান রক্ষার্থ মাসিক দুইশত টাকারও অধিক বেতনের অচিহ্নিত কার্য্যে ভারতবর্ষীয়দিগকে নিয়োজিত করিতে হইবে। ইহাতে কয়েকটী বর্জ্জনবিধি থাকিবে, তবে সময়ে সময়ে এরূপ অবস্থা ঘটিয়া উঠিবে যে, উল্লিখিত নিয়ম প্রতিপালন করা কঠিন হইবে সন্দেহ নাই, সে সকল স্থলে ষ্টেট সেক্রেটারির মত লইয়া কার্য্য করিলে কোন প্রকার কষ্ট অনুভূত হইবে না ইত্যাদি।

এদেশীয়দিগের চাকুরীপ্রিয়তা। ২১ বৈশাখ ১২৮৮

এদেশীয়দিগের চাকুরীপ্রিয়তা এমনি প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, যে ইউরোপীয়েরা ইহাকে একটী রোগের স্বরূপ বিবেচনা করিতেছেন। তাঁহারা অবসর ও সুযোগ পাইলেই সদুপদেশ দানরূপ ঔষধ দ্বারা রোগের প্রতীকার চেষ্টা পাইয়া থাকেন। সেদিন জষ্টিস উইলসন সাহেব কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতাকালে এ দেশীয়দিগের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ বলিলেন বিদ্যাশিক্ষা জ্ঞানের নিমিত্ত, চাকুরীর নিমিত্ত নয়। চারলস টর্নার সাহেবও মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি দান সভায় ঐরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। এদেশীয়দিগকে এরূপ উপদেশ দেওয়া ইউরোপীয়েরা নূতন মনে করেন বটে, কিন্তু এদেশে ঐরূপ উপদেশ নূতন নয়। এদেশের যাবতীয় শাস্ত্রেরই জ্ঞানার্থ বিদ্যাশিক্ষা, এইমত "বিদ" ধাতুর অর্থই জানা। জ্ঞান লাভই সকল শাস্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু এখন যেরূপ কাল দিন পড়িয়াছে তাহাতে সে উদ্দেশ্য বিপরীতভাব অবলম্বন করিয়াছে। একজন কবি লিখিয়াছেন, "সর্ব্বং শূন্য দরিদ্রস্য"—দরিদ্র হইলে সে সকলই শূন্য দেখে। জঠরানল জ্বালা প্রবল হইলে জ্ঞান শিক্ষার্থ বিদ্যা শিক্ষা এ বোধ থাকে না। সুতরাং তাহাদিগের পক্ষে জ্ঞানার্থ বিদ্যা শিক্ষা এ উপদেশ যদি কথঞ্চিৎ ফলোপধায়ী হয় তাহা আমরা বলিতে পারি না। যাহা হউক আমরা সচরাচর

দেখিতে পাই, আমাদিগের দেশের লোকেরা পুত্রকে যে লেখা পড়া শিখান, মূলে চাকুরীই তাহার উদ্দেশ্য। পুত্র লেখাপড়া শিখিয়া কৃতি হইবেন, তাঁহার দ্বারা দেশের উপকার হইবে, স্বাধীন প্রবৃত্তি ও মত হইবে, এচেষ্টা আমাদিগের দেশের লোকের অন্তঃকরণে এক মুহূর্তের জন্যও বোধ হয় স্থান প্রাপ্ত হয় না। সমাজে বল, সভায় বল, পিতা মাতা গুরুজনের নিকট বল, চাকুরীর যত সমাদর এমন কিছুরই নহে। অন্য উপায়ে সহস্র সহস্র টাকা উপার্জ্জন কর তথাপি চাকুরীর ন্যায় লোকের তাহা তত শ্রবণ সুখকর ও নয়ন তৃপ্তিকর নহে। সাহেবের সহিত দুটা কথা কহিলে, সাহেব ভাল বলিলে চাকুরে ভাবে গদ্‌গদ্ হইয়া থাকেন। যিনি বড় চাকুরী করেন, যিনি মোটা বেতন পান অধুনা সমাজে তাঁহাদিগের যত সম্মান, স্বদেশের উপকার সাধন অথবা স্বাধীন বাণিজ্য ব্যবসায় করিয়া তদপেক্ষা অধিক টাকা উপার্জ্জন করিতেছেন তাঁহার তত সমাদর নহে। যিনি বড় চাকুরী করেন, মোটা বেতন পান তাঁহার পিতা মাতা, বড় চাকুরের পিতা মাতা মনে করিয়া সুখানুভব করিয়া থাকেন। আত্মীয় গুরুজনেরাও আপনাদিগের স্ব স্বসম্পর্কীয়কে বড় চাকুরে মনে করিয়া আনন্দানুভব করিয়া থাকেন, প্রতিবেশিরাও আপন পুত্রকে তাঁহার অনুকরণে প্রবৃত্তি দিয়া থাকেন, এমন কি সে সমাজে ও ঘরে বাহিরে সকল স্থানেই সম্মানের একশেষ হইয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা সম্মান করেন তাঁহারা জানেন না যে চাকুরেকে কত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। ১০ টাকা বেতনের চাকরও চাকর, সকলকেই প্রভুর মন যোগাইয়া চলিতে হয়, তবে প্রভেদ এই, বড় চাকুরে চেয়ারে বসিয়া টানা পাখার বাতাস পান আর ছোট চাকুরে না হয় সপে বসিয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে প্রভুর কার্য্য করিতে থাকেন। কিন্তু বড় চাকুরেকে যে ছোট চাকুরের অপেক্ষা কত ভাবিতে হয়, কত গুরুতর কার্য্য করিতে হয়, কত নির্ব্বোধ কর্ম্মচারীর কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতে হয় তাহা কেহ দেখেন না। কত কষ্টে কত শ্রমে, ও কত খোসামুদিতে ও কত লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া যে বড় চাকুরে হওয়া যায় লোকে যদি সেদিকে একবার দৃষ্টিপাত করিত তাহা হইলে নিশ্চয় ইহার অনিষ্টকারিতা বুঝিয়া পারতপক্ষে এ দুষ্কর্ম্ম করিতে স্বীকার করিত না। ইহাতে তেজোহানি, শরীর হানি, মান হানি সকল প্রকার হানি আছে। শাস্ত্রেও দাসত্বের তুল্য পাপ আর নাই বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে কিন্তু সেই দাসত্ব সমাজে প্রচলিত হওয়াতে উহা এক্ষণে ঘৃণাকর না হইয়া ববং মানেরই হইয়াছে।

চাকুরীর মান বেশি হওয়াতে মানুষ সেই লোভে অন্য কোন স্বাধীন চিন্তাশীল ও শ্রমের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছাও করে না। কাজেই ক্রমে ক্রমে ঐ প্রকার কার্য্য হতাদৃত হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে চাকুরীর এখন যে রূপ দুরবস্থা তাহার অপেক্ষা সামান্য মুদির দোকান করিয়া দিনাতিপাত করা ভাল। আমাদিগের সমাজে অলস অপদার্থ ও অশিক্ষিত লোকের সংখ্যা অধিক বলিয়াই এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে, তাই শিক্ষিত অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত ধনী ও দরিদ্র সকলেই ইউরোপীয়ের পদলেহনে প্রস্তুত। এখন কৃষি-

কার্য্য করা ভদ্রলোকের কর্ম্ম নহে, তাহাতে লোক চাষা বলিবে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতরও এই সংস্কার হওয়াতে ক্রমে লোকের চাকুরীপ্রিয়তা বৃদ্ধি হইতেছে এবং সেই কারণে কৃষকেরা পর্য্যন্ত ভদ্র হইবার প্রত্যাশায় জাতিব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া এখন চাকুরীর চেষ্টা করিতেছে। কর্ম্ম অপেক্ষা প্রার্থী অধিক সুতরাং কর্ম্মের মূল্য বাড়িতেছে, কাজেই দশ পনর টাকা বেতনের চাকুরীর জন্য দশ হাজার প্রার্থী পাওয়া যাইতেছে, আর এক কথা আমাদিগের দেশে কৃতবিদ্য লোকের সংখ্যা কম তাই ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানের ন্যায় বিশ্বস্ত লোকও পাওয়া যায় না। সুতরাং কোন ব্যবসায় আরম্ভ করিলে তাহাতে ক্ষতি ভিন্ন লাভের প্রত্যাশা থাকে না, সুতরাং সে কারণও লোকে সহজেই বাণিজ্য অথবা কৃষিকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। এতদ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে এখনও আমাদিগের সমাজ অন্ধ তামসে আবৃত। কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পাইলে অথবা দুই চারিটা বক্তৃতা করিলে দেশ কখন প্রকৃত উন্নত ও সভ্যতাসম্পন্ন হইতে পারে না। যাবৎ লোকের মন হইতে চাকুরীপ্রবৃত্তি বিদূরীত হইয়া দেশের উন্নতির চেষ্টা ও স্বাধীন কার্য্যে প্রবৃত্তি না জন্মিবে তাবৎ প্রকৃত উন্নতির সম্ভাবনা নাই, সমাজের প্রকৃত উন্নতি করিতে চাহিলে অগ্রে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত করিতে ও ভদ্র হইতে ইতরলোকদিগকে পর্য্যন্ত প্রকৃতরূপে শিক্ষাদান করিতে হইবে, তাহারা ক্রমে যত শিক্ষিত হইবে সমাজ হইতে তত দাসত্বের ইচ্ছা দূরীভূত হইবে। মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টও বঙ্গদেশের ন্যায় তথায়ও চাকুরের প্রাদুর্ভাব দেখিয়া সকলকে স্ব স্ব জাতীয় ব্যবসায় করাইবার একটী নিয়ম করিতে চেষ্টা করিতেছেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সাধারণতঃ ঐরূপ একটী নিয়ম করিলে দেশীয় মাত্রেরই বিশেষ উপকার হইতে পারে। ফাক্টরী আইন করিয়া যেমন মজুরদিগকে বাঁচাইয়াছেন, এ বিষয়ে তেমনি কোন আইন করিলে দেশীয় মাত্রেকে উচ্ছেদদশা হইতে রক্ষা করা হয়। যাহার যে ব্যবসায় সে তাহার উন্নতির চেষ্টা করিলে সম্যক্‌প্রকারে দেশের উন্নতি হইবে, লোকে শারীরিক শ্রমী হইয়া এবং স্ববৃত্তি নিরত থাকিয়া বিলক্ষণ দশ টাকা উপার্জ্জনও করিতে পারিবে।

স্থানে স্থানে শিল্পকার্য্যালয় প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক

১৯ বৈশাখ ১২৮৯। ২৪ সংখ্যা

অগ্রে শিক্ষা না করিয়া কার্য্যানুষ্ঠানে উৎকর্ষলাভ হয় না। এদেশে শিল্পশিক্ষার প্রথা নাই বলিলেই হয়। শিক্ষা প্রথা না থাকাতেই শিল্পকার্য্যের প্রাচুর্য্য নাই। যাহারা যে কিছু শিল্পচর্চ্চা করে, তাহারা প্রায় না পড়িয়া পণ্ডিত। পিতৃপিতামহক্রমে পুরুষপরম্পরা যে কার্য্যনীতি প্রচলিত আছে, তদনুসারে কার্য্য করিয়া আসিতেছে। এদেশে জাহাজ, রেলের

গাড়ি, ও মুদ্রাযন্ত্র প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ কার্য্যে কাহারও হস্তক্ষেপ দেখিতে পাই না। কামার কুমার কাঁসারি তাঁতি প্রভৃতি যে যে ব্যবসায় সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কেবল কাজ চালান গোছের ব্যবসায়। আমাদের এগুলি না হইলে চলে না, কর্ম্মকার কুম্ভকার প্রভৃতি যথা কথঞ্চিৎ ঐগুলি প্রস্তুত করিয়া দেয়। কামার বৃদ্ধ হইলেন, লোহা শক্ত হইল, তিনি আর পারেন না, তাঁহার যুবা পুত্র সেই কার্য্যে ব্রতী হইল। পিতা যে রীতিতে কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন, শিক্ষার মধ্যে তাহার সেই শিক্ষা হইল। সেই যন্ত্র সেই উপকরণ সেই কার্য্যপ্রণালী, কিছুরই পরিবর্ত্ত হইল না। তবে যেখানে ভদ্র সমাজে, সমাজের লোকে অধিক উৎসাহ দেন সেখানে কামার কুমারাদির কার্য্যের কিছু উৎকর্ষ হয় বটে, কিন্তু সে উৎকর্ষ সকল কামারে বা সকল কুমারে লাভ করিতে পারে না। যাহার কিছু অধিক বুদ্ধি যোগ থাকে, সেই কেবল কিছু উৎকর্ষ সাধন করিতে পারে। ঢাকা ও শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানের তাঁতিরা সর্ব্বসাধারণ্যে অত্যুৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারে না। দুই চারিঘরের গুণে ঐ ঐ স্থান বিখ্যাত হইয়াছে। এ দেশের একটী মহৎ দোষ এই, যাহারা অসামান্য বুদ্ধিযোগে নূতন কৌশল উদ্ভাবন করে, তাহারা আপনাদিগের লাভ ক্ষতির ভয়ে অন্যকে কৌশল শিখায় না, সুতরাং সেই সেই ব্যক্তির মৃত্যু হইলে সেই সেই কৌশলের লোপ হইয়া যায়। আমরা ইহার দুই একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি। শ্রীরামপুরের কৃষ্ণচন্দ্র কর্ম্মকার নিজ বুদ্ধিগুণে অতি সুশ্রী সীসার অক্ষর প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তিনি সে কৌশল আর কাহাকে শিখান নাই। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সেই সুশ্রী অক্ষরগুলি অন্তর্হিত হইয়াছে। বর্দ্ধমান জিলার অন্তঃপাতী কুমারগঞ্জ নামক স্থানের কয়েকজন কাঁসারি পিত্তলে অতি সুন্দর রঙ করিতে পারিত। আমরা আমাদের বাসগ্রামের সন্নিহিত কয়েকজন কাঁসারিকে সেইরূপ রঙ প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত আদর্শ দিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। এখন শুনিতে পাই, কুমারগঞ্জের সেই পূর্ব্ব কারিকরদিগের মৃত্যু হইয়াছে, এখন আর পিত্তলের সেরূপ রঙ হয় না।

এই সকল কারণে আমরা প্রস্তাব করিতেছি, স্থানে স্থানে শিল্পকার্য্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া এদেশীয়দিগকে শিল্প বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। যদি বল, ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল লর্ড রিপণ বাহাদুর দেশীয় শিল্পের পক্ষপাতী হইয়াছেন, ইহার উন্নতি সাধন বিষয়ে তাঁহার ঐকান্তিক ইচ্ছা জন্মিয়াছে, তিনি দেশীয় শিল্পকারদিগকে উৎসাহ দিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ এই দেশ হইতে যথাসাধ্য ক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, অতএব তদ্দ্বারাই শিল্পের সমুন্নতি হইবে। তদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই, যাবৎ বহুলভাবে শিল্পকার্য্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া এ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া না হইবে, তাবৎ লার্ড বাহাদুরের চেষ্টা সম্যক্ ফলবতী হইবে, এ আশা অল্প। অগ্রে ভিত্তি দৃঢ় করিয়া যদি তিনি কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন, তাহা হইলে অদ্য এ সম্বন্ধে আমাদিগকে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে হইত না। আমাদিগের আশঙ্কা জন্মিতেছে, কেবল উৎসাহ দানে শিল্প উন্নতশ্রী ধারণ করিবে না।

গবর্ণমেণ্টের প্রয়োজনীয় কয়েকটী দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় দ্বারা তাহারই কথঞ্চিৎ হইবার সম্ভাবনা; কিন্তু শিল্পের সাধারণতঃ যেরূপ দুরবস্থা, তাহা অপনীত হইবার সম্ভাবনা নাই। জর্জ্জ সি. এম. বার্ডউড সাহেব তাঁহার ভারতীয় শিল্প নামক গ্রন্থে শিল্পদ্রব্যের যেরূপ সুন্দর কতকগুলি প্রতিকৃতি প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্দর্শনে আমাদিগের কোনক্রমেই এরূপ বোধ হয় না যে ভারতবর্ষের লোকে শিল্প বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিলেন। পূর্ব্বে ভারতবাসিরা সর্ব্বপ্রকার শিল্প দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া যে বিক্রয় করিতেন তাহা এই গ্রন্থখানি পাঠ করিলে বিশেষরূপে উপলব্ধি হয়; কিন্তু কালসহকারে অবস্থা-বৈগুণ্যে সে সমুদায়ই লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। এখন তাহার পুনরুদ্ধার করিতে হইলে দেশের লোকের ও গবর্ণমেণ্টের বিশেষ প্রয়াস পাওয়া আবশ্যক। আমাদের মহানুভব গবর্ণর জেনরল স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া এ বিষয়ে অনুকুল দৃষ্টিদান করিয়াছেন, এবং গবর্ণমেণ্টের আবশ্যক শিল্পদ্রব্য এখান হইতে ক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এখন দেশের লোকের কর্ত্তব্য এই, তাঁহারা স্বদেশজাত শিল্পদ্রব্য ক্রয় করিয়া এদেশীয় শিল্পিদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করুন। তাঁহারা বিদেশীয় শিল্পদ্রব্য ক্রয় করিতে বিরত হউন। দেশের ধনী লোকদিগের নিকটে আর একটি বক্তব্য এই, আমরা স্থানে স্থানে শিল্পকার্য্যালয় প্রতিষ্ঠার যে প্রস্তাব করিলাম, তাহার সম্পাদন বিষয়ে তাঁহারা সাধ্যানুসারে সাহায্য দান করুন। এদেশের শিল্প বাণিজ্য কৃষি, সকলেরই অবস্থা অনুন্নত। অতএব দেশের অবস্থা হীন না হইবে কেন? যাহাদের হৃদয়ে দেশের এই হীন অবস্থা দূর করিবার ইচ্ছা না হয়, তাঁহারা যে স্বদেশকে ভালবাসেন না, তাহা বলা বাহুল্য। দেশের লোকের স্বদেশের প্রতি মমতা বিনা কি উন্নতি হইবার সম্ভাবনা আছে? যাঁহাদের পল্লীগ্রামে বাস, তাঁহারা চতুর্দ্দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখুন গ্রামের অধিকাংশ লোক কি রূপে কালক্ষেপ করিয়া থাকেন। অধিকাংশেরই কোন কাজকর্ম্ম নাই, কোন কাজকর্ম্ম করিবেন, সে উপায়ও নাই; সুতরাং তাঁহাদের জীবন একপ্রকার বিড়ম্বনা হয়, তাঁহারা নিতান্ত অকর্ম্মণ্য হইয়া কাল হরণ করেন। কিন্তু চতুর্দ্দিকে যদি কৃষি বাণিজ্য ও শিল্পের উৎকর্ষ সাধন চেষ্টা হয়, সকলেই কাজের লোক হইয়া উঠিবে। গবর্ণমেণ্টের ও দেশের লোকের চেষ্টা ব্যতিরেকে কি এ অভীষ্ট সিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা আছে?

এ স্থলে আমাদের আর একটী বক্তব্য এই, স্থানে স্থানে শিল্পকার্য্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া কেবল অভিলষিত সিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। এখানে নিবারক বিধি প্রচলিত করিয়া ক্ষুদ্র শিল্পী ও ব্যবসায়িদিগকে রক্ষা করিতে হইবে। যদি বল, এ বিধি প্রবর্ত্তিত করিলে রাজার পক্ষপাতদোষ ঘটিয়া উঠিবে, তদুত্তরে আমরা যদি বলি যদি রাজার সর্ব্ব বিষয়ে সমব্যবহার দৃষ্ট হইত, তাহা হইলে এ প্রস্তাবে আমাদের ধৃষ্টতা প্রকাশিত হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু সে পূজনীয় সমব্যবহার কোথায়?

ইংরাজেরা নিষ্কর বাণিজ্যের পক্ষপাতী কিন্তু কার্য্যতঃ ইহা ঘটিয়া উঠে না। বস্ত্রের শুল্ক রহিত করিলে ম্যাঞ্চেষ্টরের বণিকদিগের উপকার করা হইবে, তন্নিমিত্ত সকলেই নিষ্কর

বাণিজ্যের প্রশংসাবাদ করিতেছে। কিন্তু এতদ্দেশ হইতে প্রেরিত চা শর্করা প্রভৃতি পণ্য দ্রব্যের উপর শতকরা পঞ্চাশ টাকা করিয়া কর নির্দ্দিষ্ট আছে, এস্থলে কই, অপক্ষপাতিতা ও সমদর্শিতার সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ নাই, নিষ্কর বাণিজ্যের গুণ ঘোষণাও এখানে নীরব হইয়া আছে। আমরা বলিতে না পারি, কিন্তু মনে মনে রাজনীতির মর্ম্ম বুঝিতে পারিতেছি,—যে কার্য্যে ইংলণ্ডের অভীষ্ট সিদ্ধ হয় তাহাই যুক্তিযুক্ত ও সমাজের হিতকর; আর যে কার্য্যে ভারতের উপকার সম্বন্ধ আছে, তাহা অবশ্য পরিত্যাজ্য, তাহা হইতে কল্যাণ হয় না। যাহা হউক অন্য অন্য বিষয়ে সমব্যবহার থাকিলেও আমাদের প্রস্তাবিত বিষয়ে সমব্যবহার দূষণীয় নয়। দুর্ব্বলকে রক্ষা কবা এবং উৎসাহ দিয়া দুর্ব্বলকে সবল করিয়া তোলা রাজার প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। নিবারক-বিধি ব্যতিরেকে অধিকাংশ স্থলে যে কাজ চলে না, তাহা ক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে।

আমরা প্রথমে বাণিজ্যকেই উদাহরণ স্থলে গ্রহণ করিলাম। বাণিজ্যে নিবারক বিধির প্রয়োজন হইতে পারে কি না, এবং তদ্দ্বারা লোকের উপকার আছে কি না, পাঠক অগ্রে সেই বিষয়টী বিবেচনা কবিয়া দেখুন। নিবারক কর প্রবর্ত্তিত হইলে লোকের যে কোন উপকার হয় না, আমরা এ কথা স্বীকার করিতে পারি না, কিম্বা এই ব্যবস্থা যে এককালে ঔদার্য্যগুণের বিরোধিনী, তাহাও আমাদের বিশ্বাস্য নহে। ইহার প্রকৃত ফলাফল কার্য্য দ্বারাই স্পষ্টীকৃত হইতেছে। নিবারক বিধি আব কিছুই নহে, এটী কেবল নিতান্ত অসমর্থের রক্ষক মাত্র। বড কর্ম্মকুশল শিল্পিগণ, সুদক্ষ কারিকরদিগের সমকক্ষ হইতে পারে না। অতএব এটা কেবল সেই অল্পপ্রাণ শিল্পিগণের বিপদুদ্ধাবের উপায় ভিন্ন আর কিছুই নহে। সর্ব্বত্র প্রবল দুর্ব্বলকে গ্রাস করিতেছে। প্রবল শিল্পীরা দুর্ব্বল শিল্পীর ব্যবসায় নষ্ট করিতেছে, নিবারক বিধি সেই দুর্ব্বল ব্যবসায়িদিগেব ব্যবসায় রক্ষার একমাত্র উপায়। অল্পপ্রাণ শশক পদবলে প্রবল হিংস্র পশুর দন্ত হইতে আত্মরক্ষা করে, নিবারক বিধি দুর্ব্বল ব্যবসায়ীর সেই বল। ইহার দ্বারা প্রবল ব্যবসায়ীর গ্রাস হইতে তাহারা মুক্তিলাভ করিয়া থাকে।

পাঠক! আবার দেখুন, ক্ষেত্রবিশেষে ঔদার্য্য গুণেরই অনুরোধে নিবারক বিধির প্রয়োজন হইতে পারে কি না? বিদ্যালয়ে বিদ্যানুরাগী সুদক্ষ বালককেই পারিতোষিক দান করা হয়। যিনি শাস্ত্রার্থ জ্ঞানে বিলক্ষণ নিপুণতা প্রকাশ করিতে পারেন, তিনিই সকলের প্রশংসাভাজন হন। আমরা দেখিতে পাই, কৃতিমান পুরুষকে তদীয় গুণানুরূপ প্রশংসা করিলে সদানুষ্ঠানের নিমিত্ত উত্তরোত্তর তাহার উৎসাহ বৃদ্ধি হইতে থাকে। তিনি কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধনে অধিকতর যত্নবান হন। বিদ্যালয়ে ছাত্র ও শিক্ষক উভয়েই থাকেন। ছাত্ররা ও শিক্ষকের পরীক্ষা এক শাস্ত্রে প্রকাশিত গৃহীত হয়, শিষ্যেরা কি গুরুর সমকক্ষ হইতে পারেন? গুরুকে বিদ্যাবুদ্ধিতে পরাভূত করিয়া শিষ্যগণ কি সেই পারিতোষিকের অধিকারী হইতে পারেন? শিষ্যেরা কদাচ সে পারিতোষিক লাভ করিতে পারেন না,

সুতরাং ছাত্রের উৎসাহ বৃদ্ধিরও সম্ভাবনা থাকে না। পাঠক দেখুন, এস্থলে নিবারক বিধির প্রয়োজন হইল। শিক্ষাস্থলে শিক্ষার্থীর প্রতি কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ না করিলে চলে না। তদ্রূপ ক্ষেত্রে সমদর্শী ও সমব্যবহারী হইলে দুর্ব্বলের বিনাশ সাধন হয়। অজাতদন্ত শিশু ও পূর্ণবয়স্ক যুবার প্রতি যত্তপি তুল্য ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে দুগ্ধপোষ্য শিশু অচিরে কালগ্রাসে পতিত হইতে পারে। যুবাকে ক্রোড়ে লইতে হয় না, কোমল ও তরল সামগ্রী ভোজন ও পান করাইতে হয় না, সে স্বয়ংই আপনার খাদ্যসামগ্রী আহরণ করিয়া আত্মরক্ষণে সমর্থ হয়। পক্ষান্তরে, যদি সমদর্শিনী নীতির অনুরোধে শিশুকেও ক্রোড়ে না লই, তাহাকে কোমল ও তরল দ্রব্য ভোজন ও পান না করাই, তবে শিশু কতক্ষণ জীবিত থাকিতে পারে?

ভারতবাসীরা শিল্পকৌশলে এখনও অজাতদন্ত নিঃসহায় শিশুর তুল্য। তাঁহারা কদাচিৎ দুই একটী শিল্পকর্ম্ম শিক্ষা করিতে অভিলাষ করিতেছেন। ইউরোপীয়েরা তাঁহাদের শিক্ষাগুরুর নিকট কতকাল উপদেশ গ্রহণ করিলে তবে তাঁহাদের শিল্পবিদ্যায় ব্যুৎপত্তি জন্মিবে। এখনও এদেশীয়দিগের শিল্পকার্য্যে পরিপক্ক হইতে অনেক বিলম্ব আছে; এ সময় যদি শিক্ষকেরা শিষ্যের প্রতিযোগী হইয়া দাঁড়ান, আর কি কখন তাঁহারা মস্তক উন্নত করিতে পারিবেন? ভারতবর্ষ ত শিল্প বিষয়ে নিতান্ত নিম্নে পতিত হইয়া আছে; যে নিম্নে পড়িয়া আছে তাহার আর পতনের স্থান কোথায়?

পাঠক! কি বলেন, এরূপ স্থলে ব্যবহারের ইতর-বিশেষ আবশ্যক হয় কিনা? ঔদার্য্যগুণের পরিচয় দিবার ইহাই কি উৎকৃষ্ট স্থান নয়? পীড়িত ব্যক্তির জন্যই ঔষধ ব্যবস্থা করিতে হয়, এবং অসমর্থকেই আশ্রয় দিতে হয়। ভারত নিতান্ত নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়াছে, আশ্রয় বিরহে তাহার উত্থানশক্তি সম্ভাবিত নহে। রাজপুরুষদিগের যদি যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষা থাকে, যদি তাঁহারা ঔদার্য্যগুণের পক্ষপাতী হইতে অভিলাষ করেন, তবে ভারতবর্ষকে আশ্রয় প্রদান করুন।

ভারতের কুলিনির্ব্বাসন। ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১২৮৯। ৩০ সংখ্যা

বোধ করি সকলেই অবগত আছেন, বেহার উত্তর পশ্চিমাঞ্চল এবং মধ্য ভারতে যে সমস্ত কুলি বৎসর বৎসর সংগৃহীত হয়, তাহারা যে কেবল ভারতবর্ষের অন্তর্গত আসাম কাছাড় ও শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলে নিদারুণ কষ্টকর প্রাণের ফলভোগ করিতে যায়, এমত নহে, সেই অন্নবস্ত্রবিহীন মনুষ্য মূর্ত্তির কাঙ্গাল অবতারের ললাটের লিখন সম্ভোগ করিবার জন্য দেশ দেশান্তরেও প্রেরিত হয়। কুলিরা কিরূপ, তাহাদিগকে জাহাজে পুরিয়া ঠাসিয়া মারিয়া বিদেশে লইয়া যাইতে হইবে, পথের এই সমস্ত অসহনীয় ক্লেশ সহ্য করিয়া জীবিত থাকিতে থাকিতে যথাস্থানে উপস্থিত হইতে পারিবে কি না, ইহার যথাযথ

অবস্থা পরীক্ষা করিবার জন্য একজন মনস্বী চিকিৎসক নিযুক্ত আছেন। তাঁহার নাম গ্রাণ্ট সাহেব। তিনিই এখন কলিকাতায় থাকিয়া যাবতীয় কুলির তত্বাবধান করিয়া থাকেন। যে সমস্ত লোক কুলি সংগ্রহ করিয়া স্থানান্তরে প্রেরণ করেন, তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী নহেন। যে সকল সওদাগর কুলি সংগ্রহ করেন, তাঁহাদের নিকট ঐ সমস্ত ব্যক্তি যথাসম্ভব কিছু কিছু পারিশ্রমিক প্রাপ্ত হন। কলিকাতা রাজধানীতে সর্ব্বসমেত ছয় জন কুলির এজেণ্ট আছেন। তন্মধ্যে চারি জন ইংরাজ, এক জন ওলন্দাজ, এবং এক জন ফরাসি।

ভারতের বহির্ভূত আটটী স্থানে এতদ্দেশীয় কুলিরা প্রেরিত হয়। তন্মধ্যে ছয়টী স্থান ইংরাজদিগের অধিকারভুক্ত। একটী স্থান ফরাসিদিগের শাসনগত। গতবর্ষে যে যে স্থানে যতগুলি কুলি প্রেরিত হইয়াছিল, নিম্নে তাহার একটী তালিকা দর্শিত হইতেছে—

স্থানের নাম	কোন্ জাতির অধিকৃত	কুলির সংখ্যা	কুলির বেতন
মরিসস	ইংরাজের	২৫৫	খোরাক ও বেতন ৫৲
ডেমেরাবা	ঐ	৪৪১৬	ঐ
ট্রিনিডাড	ঐ	৩৩৪২	১৬৲ টাকা মাত্র
জ্যামেকা	ঐ	৫১৩	১৫৲ ঐ
লুশিয়া	ঐ	৩২১	১৬৲ ঐ
নেট্যাল	ঐ	৯৮০	৫৲ এবং খোরাক
স্থরিনাম	ওলন্দাজের	৯৬৫	১৫৲ টাকা মাত্র
গোয়াডিলোপ	ফরাসির	১৪১৩	৫৲ এবং খোরাক

বাসস্থানের নিমিত্ত কুলিরা সর্ব্বত্রই সরকারী গৃহ পাইয়া থাকে। কেহ পীড়িত হইলে সরকার হইতে চিকিৎসার ব্যয়ও নির্ব্বাহিত হয়। যে স্থলে কুলিদের কেবল মাত্র বেতন নির্দ্দিষ্ট আছে, তত্তৎ স্থলে তাহারা সমুচিত মূল্যে খাদ্য সামগ্রী প্রাপ্ত হয়। ইংরাজের অধিকৃত কোন স্থানে কুলিরা প্রেরিত হইলে তাহাদের সঙ্গে দশ বৎসরের একরার পত্র লিখিত হয়, তৎকাল যাবৎ তাহারা ঐ একরার পত্রের সর্ত্তে আবদ্ধ থাকে। ঐ সময় অতীত হইলে তাহারা স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে পারে। স্বদেশে প্রত্যাগমনের পাথেয় কুলিদের লাগে না। ওলন্দাজ এবং ফরাসি অধিকৃত কোন স্থানে যাইতে হইলে পাঁচ বৎসরের নিমিত্ত কড়ার পত্র লিখিত হয়। ঠিক ব্যবস্থানুসারে কার্য্য চলিলে এই বিধি প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। বিদেশীয় রাজার অধীনে কুলিরা কষ্ট পাইলে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার বিশেষ সুবিধা ও স্বাধীনতা নাই, সে কারণে তাহাদের মেয়াদের সময় অল্প করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

যে সমস্ত কুলি বিদেশে প্রেরিত হয়, তন্মধ্যে অনেকেই পশ্চিম প্রদেশ হইতে সংগৃহীত

হইয়া থাকে। উপরে ১২,১৮৫ জন কুলির যে তালিকা দর্শিত হইয়াছে, তাহারা নিম্ন লিখিত স্থান সমুদায় হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল:

পশ্চিম	৭১৬০
অযোধ্যা	১৯১৩
বেহার	১৭৫৮
পঞ্জাব	৭৬২
বাঙ্গালা	২৩৬
মধ্য ভারতবর্ষ	২১১
নেপাল	৪৩
উড়িষ্যা	১৯
অন্যান্য স্থান	৮৩

পথিমধ্যে কুলিদের যাহাতে কোনপ্রকার কষ্ট না হয়, তৎপ্রতি গবর্ণমেণ্টের তীব্র দৃষ্টি আছে। যে সমস্ত জাহাজে তাহাদিগকে প্রেরণ করা হয়, গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী বিশেষরূপে সেই সকল জাহাজ পরীক্ষা করিয়া দেখেন। প্রত্যেক জাহাজে একজন করিয়া ডাক্তার থাকেন। গত বৎসর উল্লিখিত ১২,১৮৫ জন লোক পঁচিশখানি জাহাজে প্রেরিত হইয়াছিল, অর্থাৎ প্রত্যেক জাহাজে গড়ে কিঞ্চিদধিক ৪৮৭ জন কুলি আরোহী ছিল, কিন্তু সকল জাহাজের লোকসংখ্যা সমান ছিল না। আমাদের বিবেচনায় প্রত্যেক জাহাজে আরও কিছু কম লোক লইয়া গেলে ভাল হয়। আজিকালি পালতোলা জাহাজে বাণিজ্য দ্রব্যই প্রেরিত হইয়া থাকে, আরোহীর নিমিত্ত বাষ্পপোত চালিত হইয়াছে। পালতোলা জাহাজের গতি অত্যন্ত মন্দ, সুতরাং নির্দ্দিষ্ট স্থানে সত্বর পৌছিতে পারে না। বাষ্পপোত দ্রুতগামী, সে কারণ অনতিকাল বিলম্বে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হয়। অধিককাল জাহাজে থাকিলে আরোহিদিগের অত্যন্ত কষ্ট হয় এবং দেহ স্কভি প্রভৃতি রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে। যাহাদের জলপথে গমনাগমনের অভ্যাস নাই, তাদৃশ ব্যক্তি এই কষ্ট অতিশয় অনুভব করে। কুলিদিগকে অন্যূন তিন চারি মাস কাল জাহাজে থাকিতে হয়। যে সকল ব্যক্তি কস্মিন্ কালে সমুদ্রের মুখ দেখে নাই, আগে আর কোন সুখ না ঘটুক—উঞ্ছবৃত্তির অনুসরণে সমস্ত দিন মাঠে শস্য খুঁটিত—তাহাদের ভাগ্যে নির্ম্মল বায়ুসেবন ঘটিত। কিন্তু জলপথে যাত্রার সময় তিন চারি মাস জাহাজে ঠাসাঠাসি করিয়া উপবিষ্ট থাকা তাহাদের পক্ষে সামান্য ক্লেশের কথা নহে। ডাক্তারেরা পরীক্ষা করিয়া কেবল সুস্থ ও সবল ব্যক্তিকে বিদেশে প্রেরণ করেন, তথাচ জাহাজে ২০০ হইতে ৬০০ লোক বোঝাই হইয়া থাকে।

গত বৎসর যে পঁচিশখানি জাহাজ প্রেরিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে ১৯ খানির মৃত্যু সংখ্যার হিসাব পাওয়া গিয়াছে। এই ১৯ খানিতে ৯২৮৬ জন আরোহী ছিল, তন্মধ্যে

১০৯ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে। পাঠকের গোচরার্থ নিম্নে আমরা একটী বিস্তারিত তালিকা দিতেছি,—১৯ খানি জাহাজের হিসাব দর্শিত হইল, বক্রি ছয়খানি জাহাজের হিসাব পাওয়া যায় নাই। ভগবান জানেন, তাহারা দুর্ভাগ্যে কুলিদিগকে প্রাণে প্রাণে

জাহাজের নাম	কোথা যাত্রা করিয়াছে	কলিকাতা হইতে যাত্রা	নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিবার দিন	কতদিনে পৌঁছিয়াছিল	আরোহীর সংখ্যা	মৃত্যু সংখ্যা
ঐলসা	সুরিনাম	১১ সেপ্টেম্বর ১৮৮০	২৬ নবেম্বর	৭৭ দিন	৪৯০	৩১
লী	গোয়াডিলোপ	২৬ সেপ্টেম্বর	২৪ ডিসেম্বর	৯০ „	৫২৩	২৪
এল্লোরা	ডিমেরারা	১২ অক্টোবর	১লা জানুয়ারী ১৮৮১	৮২ „	৪৬১	২৫

জীবিত থাকিতে যথাস্থানে লইয়া পৌঁছিতে পারিয়াছে কি না। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন হিসাব না দেওয়ায় আমাদের মনে নানা প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। কুলিদিগের এই প্রকার নির্ব্বাসনপ্রথা ভাবিলে যশোহরের কই খলিসা মৎস্যের আমদানি আমাদের স্মৃতিপথে উদিত হয়। মৎস্য ব্যবসায়িরা নৌকাতে গাদাগাদি করিয়া কই খলিসা মৎস্য বোঝাই করে, তৎপরে মরা গলা খসা বাদ দিয়া যতগুলি জীবিত থাকে তাহাই লাভ। কুলি নির্ব্বাসন প্রণালীও ঠিক তদনুরূপ; অলসগামী পালতোলা জাহাজে গাদাগাদি করিয়া অসংখ্য লোক বোঝাই করা হয়, তৎপরে পীড়ার মুখ হইতে অব্যাহতি পাইয়া যতগুলি লোক নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিতে পারে তাহাই লাভ। আমরা বাকি ছয়খানি জাহাজের মৃত্যুসংখ্যার হিসাব পাই নাই, তাহাতে স্পষ্ট অনুমিত হইতেছে, সে সংখ্যা সাধারণ্যে প্রকাশ করিবার যোগ্য নয়। যদি প্রকাশ করিবার যোগ্য হইত তবে এতকাল গুপ্ত থাকিত না।

আমরা স্বীকার করি যে, কুলিদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। কিন্তু সে চেষ্টা সর্ব্বথা শুভদায়িনী হয় না। সেটী তত্ত্বধায়ক কর্ম্মচারিদিগেরই দোষ। যাহা হউক কুলিদিগকে বাষ্পপোতে পাঠাইবার জন্য এজেণ্টদিগকে আদেশ করা উচিত। অধিকন্তু ক্ষেত্রে স্বামীগণ কুলিদিগের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করেন, তাহা প্রকাশিত হয় না, ইহাতে কোন প্রকার দোষ সংশোধন হইতে পারে না। গবর্ণমেণ্টের এইরূপ আদেশ আছে প্রত্যেক কুলি সপ্তাহে কেবল ছয় দিন কার্য্য করিবে এবং প্রতিদিন সাত ঘণ্টা হইতে নয় ঘণ্টা পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিতে পারিবে। কুলিরা নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিলে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে কার্য্য করিতে থাকে। ঐ সমস্ত ক্ষেত্র সহরের নিকটবর্ত্তী নহে, সুতরাং ক্ষেত্রস্বামীরা মজুরদের প্রতি কি প্রকার আচরণ করেন, তাহা প্রকাশিত হইবার কোন উপায় নাই। কিন্তু ভারতবর্ষের বহির্ভূত স্থানে কুলিদের প্রতি

বিশেষ অত্যাচার হয় না আমাদের এমন বিশ্বাস আছে। যাহারা স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া পুনর্ব্বার নিজ নিজ কর্ম্মস্থানে স্বেচ্ছানুসারে যাইতে ইচ্ছুক হয়, ইহাই তাহার অভ্রান্ত বহুলোত্তর প্রমাণ। তাহারা অত্যাচারিত হইলে কদাপি পুনর্ব্বার সাগরাভিমুখী হইতে সাহস করিত না। গত বৎসর ১২১৮৫ কুলি বিদেশে প্রেরিত হয়, তন্মধ্যে ৪৮৫ জন পুরাতন কুলি; তাহারা একবার স্বদেশে আসিয়া পুনর্যাত্রা করিয়াছে। এতদ্ভিন্ন আমরা দেখিতেছি, কুলিরা স্বদেশে প্রত্যাগমনের সময় প্রচুর অর্থও লইয়া আইসে। গত বৎসর ৪১৩৭ জন কুলি এদেশে প্রত্যাগত হয়, তাহারা সর্ব্বসমেত ৭৪৭,৩৭০ টাকা আনিয়াছিল অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি গড়ে প্রায় ১৮০৷৷০ টাকা আনিয়াছে। এই টাকা সঞ্চিত হইয়াছিল, ইহাও পরম আহ্লাদের বিষয় সন্দেহ নাই।

এই সমস্ত অবস্থার পর্য্যালোচনা করিলে কুলিরা বিদেশে পরিশ্রম করিয়া সুখ স্বচ্ছন্দে থাকে, তাহার অনেকটা প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু তাহাদের প্রতি এককালে কোন অত্যাচার যে হয় না, আমরা এমন কথা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। ফরাসি শাসনান্তর্গত গোয়াডিলোপে রিউইন নামক একটী স্থান আছে। তথায় ইউরোপীয়-দিগের ঔরসে এবং নিগ্রো স্ত্রীর গর্ভে উৎপন্ন ক্রিযোভোন নামক একটী সঙ্করজাতি বাস করে। আমরা অনেক স্বদেশ প্রত্যাগত কুলির প্রমুখাৎ শুনিয়াছি, উক্ত ক্রিয়োভোন কর্ম্মচারীরা কুলিদিগের উপর যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করিয়া থাকে। ভীরু ভারতবর্ষ-বাসীরা অত্যাচারের নৃশংস হস্তে কণ্ঠগতপ্রাণ হইলেও কখন দ্বিরুক্তি করিতে জানে না। যখন অসদ্ব্যবহার সীমান্ত দেশে গিয়া উত্তীর্ণ হয়, যখন অত্যাচারীর নিষ্ঠুর হস্ত হইতে নিস্তার লাভের আর কোন উপায় দেখিতে পায় না, তখন আর গতি কি?—ধীর-হৃদয় নম্র-প্রকৃতি কুলিরা মনস্তাপে বাসায় প্রত্যাগমন পুর্ব্বক উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করে। এদেশে যদ্রূপ মহোদয় শ্রীল শ্রীযুক্ত সাহেবেরা কিল ঘুসি লাথি চড় চাপড় প্রভৃতি মণিহারীর দোকানের ন্যায় নানাজাতীয় প্রহারের ধমকে সন্নিকটস্থ চাপ্রাসীর, বেহারার, চাকরের প্লীহা ফাটাইয়া দেন, ক্রিয়োভোন জাতির অত্যাচার ততোধিক। তাহারাও মর্ম্মান্তিক প্রহারের ধমকে অনেক কুলির প্রাণ সংহার করে। সচরাচর এই সমস্ত লোমহর্ষণ দুর্ঘটনার বৃত্তান্ত প্রায় প্রকাশিত হইতে পায় না, ক্বচিৎ যদ্যাপি প্রকাশিত হয়, তবে সাহেবেরা ভারতবাসিদিগের প্রাণনাশ করিলে যে প্রকার অত্যাশ্চর্য্য বিচার হইয়া থাকে, সেখানেও ক্রিয়োভোন জাতি নরহত্যাপরাধে দোষী হইলে বিচারকার্য্যের রকমটা ঠিক তদনুরূপ। সেখানেও অপরাধীর নিষ্কৃতিলাভের অনেকগুলি সদুপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। বলিতে কি, তৎসমস্ত উপায় স্বল্পবুদ্ধিতে কল্পিত হয় নাই, অনেকটা মস্তিষ্ক চালান করিতে হইয়াছে। প্রথম, কুলিদিগের সাক্ষ্য বিশ্বাস নহে। দ্বিতীয়, সাক্ষিদিগের বাক্যে বিস্তর গোল উপস্থিত হয়। তৃতীয়, অসভ্য কুলিদিগের কুব্যবহারে সহসা ক্রোধোদ্রেক হইয়া থাকে। চতুর্থ, কুলিরা এতদ্দেশীয় লোক; সুতরাং তাহাদের প্লীহা ও যকৃৎ নিতান্ত

ভঙ্গপ্রবণ। পঞ্চম, যদ্যপি যম-দণ্ডসম যষ্টিপ্রহারে কুলির প্রাণ বিয়োগ হয়, তবে অবশ্যই মাথার খুলি জীর্ণ ও দুর্ব্বল ছিল, তাহার ভারসহ শক্তি নাই বলিলেই চলে। ষষ্ঠ, প্রহারকালে অত্যাচারীর মানসিক বিকার জন্মিয়া থাকে, কাজেই সে অজ্ঞাতসারে লোক হত্যা করে। কদাচিৎ যদ্যপি অপরাধীর পক্ষে প্রাগুক্ত কোন ধারা না খাটে, তবে অগত্যা তাহার কিঞ্চিৎ অর্থদণ্ড অথবা দুই তিন মাস কারাবাসের আদেশ দেওয়া হয়। এটী কেবল কুলিদিগের প্রবোধার্থ, তাহাও সহস্রপরাধের একটী স্থলে ঘটে কি না সন্দেহ।

এই ফরাসি রাজ্যে ইংরাজদিগের একজন কন্সল আছেন। অত্যাচারের সংবাদ পাইলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিকারার্থ যত্ন করেন; কিন্তু তাঁহার নিকট প্রায় যথাযথ সমাচার উপযুক্ত সময়ে উপস্থিত হয় না। দ্বিতীয়তঃ, কোন অত্যাচারের বিবরণ তাঁহার কর্ণগোচর হইলে তাহা সপ্রমাণ করা সুকঠিন হইয়া উঠে। তৃতীয়তঃ উক্ত কন্সল স্বাধীনভাবে নিজ বিবেচনামত কার্য্য করিবেন। তাঁহার এত কি ক্ষমতা আছে? আমরা নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে অনুরোধ করি, কুলিদিগের রক্ষার্থে গবর্ণমেণ্ট সত্বর কোন উপায় অবলম্বন করুন। যেস্থানে কুলিদিগের প্রতি যৎসামান্য অত্যাচারের কথা প্রচারিত হইবে, সে স্থানে কুলি প্রেরণ করা একেবারে রহিত করুন। তদ্ভিন্ন যে যে স্থলে এতদ্দেশীয় কুলি প্রেরিত হয়, তত্তৎস্থলে ন্যায়পরায়ণ, সাহসী এবং সত্যনিষ্ঠ কন্সল নিযুক্ত করা আবশ্যক। তিনি যেন নিয়ত কুলিদিগের তত্ত্বাবধান করেন। প্রতি বৎসর কুলিরা কীদৃশ অবস্থায় থাকে, কোন্ কোন্ স্থান হইতে কত কুলি প্রেরিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কতজন নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইতে পারিয়াছে, বৎসর বৎসর কতজন জীবিত থাকিতেছে, ইহার পরিষ্কার তালিকা গবর্ণমেণ্টে প্রেরণ করা তাঁহাদিগের উচিত। এ সম্বন্ধে গ্রাণ্ট সাহেব বর্ষে বর্ষে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া থাকেন তাহাতে কেবল প্রেরিত কুলির সংখ্যামাত্র নিরূপিত থাকে। অতঃপর কুলিদিগের অবস্থার আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। যাঁহারা কুলিদিগকে নিযুক্ত করেন, তাঁহারা সকলেই ধর্ম্মভীরু ও মহাশয় ব্যক্তি নহেন। বিশ বৎসর পুর্ব্বে এই সম্প্রদায়ের লোকেই আমেরিকার দুর্ভাগ্য নিগ্রোদিগের প্রতি ঘোরতর অত্যাচার করিত। আঙ্কল টমস নামক ইংরাজি পুস্তকে এই উৎপীড়নের বৃত্তান্ত যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তৎপাঠে অশ্রুবেগ সম্বরণ করা যায় না। শোণিত-মাংস নির্ম্মিত কোমল মনুষ্য হৃদয়ও যে কতদূর কঠিন ও নৃশংস, এবং মানুষেরা স্বজাতির প্রতি কতদূর যে নির্দ্দয় আচরণ করিতে পারে, ঐ পুস্তক পাঠে তাহা সুন্দররূপ হৃদয়ঙ্গম হয়। বিংশতি বৎসর পুর্ব্বে যে জাতি নির্দ্দয় রাক্ষসের ন্যায় আচরণ করিয়াছিল, ইতিমধ্যে তাহারা যে দয়ার সাগর হইয়া উঠিয়াছে, ইহা আমরা বিশ্বাস করি না। অতএব গবর্ণমেণ্ট আদ্যোপান্ত সমুদায় অবস্থা জ্ঞাত হইয়া কি উপায় দ্বারা দরিদ্র কুলিদিগকে নিরাপদে রাখিতে পারিবেন, তৎপক্ষে যত্নবান হউন। কুলিরা স্বদেশে জঠর-যন্ত্রণায় কাতর

হইবে, বিদেশে অত্যাচারীর হস্তে উৎপীড়িত হইবে, তবে ত্রৈলোক্যেও কি তাহাদের ভাগ্যে সুখস্বচ্ছন্দতা ঘটিবে না?

কুলি-সংগ্রাহকদিগের অবৈধ আচরণ। ১৩ আষাঢ় ১২৮৯

ছোটনাগপুর বিভাগের অন্তর্গত পালামোর এলাকাধীন সুর্য্যগ্রামের মঙ্গরী নাম্নী এক বালিকাকে আসামের চা ক্ষেত্রে লইয়া যাওয়া হয়। এই বালিকাটি অবিবাহিতা। তাহার পিতা কি অন্য অভিভাবক কেহই নাই, আত্মীয়ের মধ্যে কেবল নয়নবিহীন বৃদ্ধ জননী, মঙ্গরী সেই অন্ধ মাতার বৃদ্ধদশার যষ্টিস্বরূপ। আসামের অন্তবর্ত্তী তেজপুরের চা-কর ব্রিস্কো সাহেবের সর্দ্দার উক্ত বালিকাকে তাহার মাতার অনভিমতে ও অজ্ঞাতসারে আসামে লইয়া যায়। বৃদ্ধ জননী কন্যার অদর্শনে কাতরা হইয়া রোদন করিতে থাকে। অতঃপর রাঞ্চির ডেপুটি কমিশনর বিস্কো সাহেবের নামে ওয়ারেন্ট জারি করিয়া তাহাকে আসাম হইতে রাঞ্চিতে আনাইলেন। গত ৩১শে মে মকর্দ্দমার নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে, বিচারে অভিযুক্ত ব্যক্তিদ্বয় নির্দ্দোষ সপ্রমাণ হইয়াছে। আমরা এই অভিযোগ সম্বন্ধে অধিক কিছু স্বাভিমত প্রকাশ করিতে সাহস করি না, বিশেষতঃ অভিযুক্ত ব্যক্তিদ্বয় বিচারে নিরপরাধ সপ্রমাণ হইয়াছে, তখন এতাদৃশ স্থলে কোন স্বতন্ত্র মত প্রকাশ করিবার আমাদের অধিকারও নাই। কিন্তু মকদ্দমাটির যে প্রকার আদ্যোপান্ত অবস্থা আমরা পাঠ করিলাম, তাহাতে দু'একটি কথা না বলিলেও কর্ত্তব্য কর্ম্মের প্রতি অবহেলা প্রকাশ করা হয়। মকর্দ্দমাটির স্থূল তাৎপর্য্য এই, যে মঙ্গরীর (অপর নাম মহরী) আসাম যাত্রাকালে ষোডশবর্ষ বয়ঃক্রম উত্তীর্ণ হইয়াছিল কিনা? গবর্ণমেণ্টের কুলি নির্ব্বাসন সংক্রান্ত বিবিধ ব্যবস্থা এই যে, কোন বালিকা ষোড়শ বর্ষের ন্যূন বয়ঃক্রম কার্য্যসূত্রে স্থানান্তরে গমন করিলে তাহার সঙ্গে কোন আত্মীয়স্বজন থাকা চাই। ষোড়যবর্ষ অতিকম করিলে সকলেই আপন ইচ্ছায় স্বচ্ছন্দে স্থানান্তরে গমন করিতে পারে, তদ্বিরুদ্ধে কেহ কোন আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন না। উপস্থিত ডাক্তার সাহেব বলিতেছেন যে পরীক্ষাকালে মঙ্গরীর বয়ঃক্রম ষোডশবর্ষ অনুমিত হইয়াছিল। কিন্তু কুলির তালিকা পুস্তকে তন্নাম্নী এক বালিকার বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসর লিখিত আছে। এই তালিকাকৃত মঙ্গরীর মকদ্দমার উদ্দিষ্ট মঙ্গরী কি না তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। অপহৃত মঙ্গরীর আর একটি নাম মহরী। উক্ত তালিকায় এ নামটি উল্লিখিত নাই। এদিকে ডাক্তার সোএন সাহেব বলিতেছেন যে, কুলি পরীক্ষাকালে তিনি দুইবার মঙ্গরীকে দেখিয়াছিলেন। তৎকালে উহার বয়ঃক্রম ষোড়শবর্ষ অনুমিত হইয়াছিল। কিন্তু তালিকাধৃত মঙ্গরীর বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসর লিখিত আছে। মঙ্গরী নাম্নী অন্য কোন বালিকা আসাম যাত্রা করিয়াছে কিনা তাহার কোন অনুসন্ধান পাওয়া যাইতেছে না।

অতএব উদ্দিষ্ট মঙ্গরীর বয়ঃক্রম সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতেছে। এদিকে কন্যাটির বৃদ্ধ জননী বিস্তর বলিতেছে যে মঙ্গরীর বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসর যদিচ এই মতিচ্ছন্ন বর্ষীয়সী রমণী সাক্ষ স্থলে বিস্তর গোল করিয়াছিল, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় এককালে মার্জ্জনীয়। কারণ ইতর লোক কখন আপনাদের বয়স নিশ্চিতরূপে বলিতে পারে না, এবং কোন কথায় বারম্বার জেরা করিলে তাহারা এ প্রকার পরিহাসজনক উত্তর দেয় যে তৎশ্রবণে হাস্য সম্বরণ করা কঠিন হইয়া ওঠে। এস্থলে পাঠকদিগকে একটি কৌতুককর গল্প উপহার দিতেছি। একদা এক মোক্তার এক অশিক্ষিত ইতরজাতীয় সাক্ষীকে বলিলেন, দেখ, কদাচ মিথ্যা বলিবে না, মিথ্যা বলিলে কি হয়, তাহা জান? সাক্ষী উত্তর করিল—হুজুর! আমরা মূর্খ লোক তাহা কেমন কবিয়া জানিব? মোক্তার তাহাকে পুনশ্চ উপদেশ দিলেন—মিথ্যা বলিলে অন্ধ হয়, নরকে যায়। সাক্ষী বলিল—তা কই ত দেখি নাই আপনারা বলিতে পারেন! অজ্ঞ ইতর লোকের এই ত কথার ধারা। এতাদৃশ্য বিষয়-বুদ্ধি বিহীন দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য মূর্খ লোককে জেরা করিলে তাহারা কুট প্রশ্নের যে প্রকার সদুত্তর দিবে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে। মঙ্গরীর মাতা সুকারু নিজ বয়ঃক্রম নিশ্চিত বলিতে পারে নাই, কিন্তু তাহার অজ্ঞাতসারে কন্যাটি প্রস্থান করিয়াছে। তাহা স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছে। ধনসহায় বলিল, সে সুকারুকে দশ টাকা দিয়া মঙ্গরীকে লইয়া গিয়াছে। এস্থলে প্রকৃত ঘটনা যাহাই হউক, কিন্তু বৃদ্ধা ও অন্ধ জননী তাহার একমাত্র সন্তান মঙ্গরীকে যে এতাদৃশ দুঃসময়ে আসামে বিদায় দিয়াছিল, তাহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। বিশেষত যদি ধনসহায়ের কথাই সত্য হয়, সুকারু যদ্যপি দশ টাকা গ্রহণ কবিয়া স্বীয় কন্যাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে, তবে ইহাও কি দোষাবহ নহে? উনবিংশ শতাব্দাতে ইংরাজ শাসনেও কি মনুষ্য বিক্রয় প্রথা প্রচলিত আছে! এমনও হইতে পারে মঙ্গরী বয়োদোষে ধনসহায়ের সঙ্গে প্রেমাসক্ত হইয়া তাহার অনুগামিনী হইয়াছিল, কিন্তু কুলিসংগ্রাহকদিগের তাদৃশ আচরণও নিন্দনীয় সন্দেহ নাই। আসামের কার্য্যক্ষেত্র সুবিস্তীর্ণ, আমরা স্বীকার করি। তথায় কার্য্যোপযোগী শ্রমিক পাওয়া যায় না, এমন স্থলে মজুর লোক তথায় গিয়া উপনিবেশ করিলেই মঙ্গল। কিন্তু দুঃখের কথা এই, গবর্ণমেণ্টের বিহিত ব্যবস্থানুসারে সর্ব্বত্র কার্য্য হয় না। অজ্ঞ মজুর লোকেরা সময় সময় দারুন কষ্ট পাইয়া থাকে। ভবিষ্যতে প্রত্যেক কুলির নাম ও পিতা মাতার নামও লিখিত থাকিলে ভাল হয়, এবং কুলি সংগ্রহের প্রতি গবর্ণমেণ্ট আরও একটু তীব্র দৃষ্টি রাখুন। গত ঘটনাটিতে এই একটি অনুমান করিতে হইবে যে সুকারু একজন দরিদ্র বৃদ্ধা স্ত্রীলোক সে একটি মিথ্যা ঘটনা কল্পনা করিয়া এবম্বিধ হুলুস্থুল করিয়াছে, তাহা কখন বিশ্বাস্য নহে। ইহার অভ্যন্তরে কোন গূঢ় তাৎপর্য্য থাকিবে, এমন অনুমান হইতেছে।

লৌহজাত শিল্পে গবর্ণমেণ্টের আনুকূল্য। ২২ ভাদ্র ১২৮৯

আমরা পাঠকদিগকে পূর্ব্বেই জ্ঞাত করিয়াছি যে এতদ্দেশে বিস্তর লৌহের আকর আছে। সেই আকরত্তোলিত লৌহের যথোপযুক্ত ব্যবহার হইলে ভারতবর্ষে আর বৈদেশিক লৌহের আমদানী করিবার প্রয়োজন হইবে না। পুর্ব্বে আমাদের মহামান্ত ষ্টেট সেক্রেটরি মহোদয় এদেশে শিল্পবিস্তাবের উদ্দেশ্যে স্থানে স্থানে লৌহের কারখানা খুলাইবার প্রস্তাব করেন, পরে লোক-হিতৈষী মহাত্মা লার্ড রিপণ সেই প্রস্থাবে কার্য্য-কারিতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া যাহাতে শীঘ্র নানা স্থানে লৌহের কারখানা স্থাপিত হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নবান্ হইয়াছেন, অন্যান্য দেশহিতৈষী মুখভারতীসার মিষ্টভাষী মহাত্মাদের ন্যায় লার্ড রিপন কেবল কাগজে কলমে একটি মিনিট লিখিয়া কর্ত্তব্যকর্ম্মের সমাপ্তি হইল, এমন জ্ঞান করেন না, যতক্ষণ তাহার প্রস্থাব কার্য্যে পরিণত না হয় ততক্ষণ তিনি নিস্তব্ধ হইতে পাবেন না, এক্ষণে যে সমস্ত স্থানে লৌহের আকর আছে, তত্তৎস্থলে এক একটি কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইবে, সেই সমস্ত কারখানা রেলওয়ের লৌহময় দ্রব্য সামগ্রীর আঞ্জাম কবিবেন, ফলতঃ এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের অনেকটা আনুকূল্য করিতে সম্মত হইয়াছেন, আমরা ভরসা করি এতদ্দেশীয় ধনবান্ ব্যক্তিরা যেন, বিলাতের দিকে দৃষ্টিপাত না করেন, অবশ্য আমরা স্বীকার করি, এই বৃহৎ কার্য্যে বিস্তর ধন আবশ্যক, কিন্তু ঐ মূলধন যে এ দেশ হইতে সংগৃহীত হইতে পারিবে না, তাহার কোন কারণ নাই, কিঞ্চিৎ সাহস প্রকাশ করিলে অবশ্যই এই দেশ হইতে সমস্ত মূলধন সংগৃহীত হইতে পারিবে, তবে অন্যের মুখাপেক্ষা করিবার প্রয়োজন কি? বিশেষতঃ চা-বাগানে এবং নীলের চাষে দেখিযাছি সাহেব অংশীদাবে এদেশীয় লোকের সুবিধা হয় না সাহেবের সঙ্গে ভাগে হাউস খুলিয়া এদেশীয় লোকেব সুবিধা হয় নাই, সর্ব্বত্রই বোকা ভারতবর্ষবাসীদিগকে ঠকতে হইয়াছে, তাহাদিগকে ঘরের টাকা বাহির করিয়া অনেক স্থানেই হাত মুখ চাটিতে চাটিতে গৃহে আসিয়া পুনর্মূসিক হইতে হইয়াছে। তাই বলিতেছি, কেবল দেশীয় ধনবান্ ব্যক্তিরা কিঞ্চিৎ সাহসী হইয়া ভাণ্ডার হইতে কিছু অর্থ বাহির করুন। গবর্ণমেণ্ট লৌহের ব্যবসায়ে কিছু আনুকূল্য করিবেন শুনিয়া ভারতবর্ষের চিরন্তন ছিদ্রান্বেষী ইংলিসম্যান দুশ্চিন্তায় গলদ্ঘর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছেন, মূর্চ্ছিত হন নাই, হইতে হইতে চৈতন্য পাইয়াছেন, কেন না গবর্ণমেণ্ট এ প্রকার প্রশ্রয় ত চিরকাল দিবেন না, ব্যবসায় বিশেষে গবর্ণমেণ্ট সাহায্য করিলে বাণিজ্য স্ফূর্ত্তিলাভ করিতে পারে না। সহায়তা তিরোহিত হইলেই সে বাণিজ্য এককালে বিনষ্ট হইয়া যায়, এইরূপ নানা প্রকার বাক্যব্যয় করিয়া ইংলিসম্যান ব্যবহারিক শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা স্বীকার করি কারখানা বিশেষের প্রতি খরিদ্দার যত্তপি সর্ত্তে আবদ্ধ হইয়া থাকেন এবং দ্রব্যের গুণানুসারে স্বেচ্ছাক্রমে দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় না করেন, তাহা হইলে কোন

ব্যবসায়ে প্রতিযোগিতা না হইলে সে ব্যবসায়ে উন্নতি হয় না। প্রতিযোগী ব্যক্তিরা সাধ্যানুসারে স্বগুণে অন্যকে পরাস্ত করিতে চেষ্টা করেন কিন্তু যদ্যপি গুণাগুণের বিচার না করিয়া কেবল এক জনের প্রতি কৃপা করা হয় তবে অন্যান্য লোকে নিরুদ্যম হইয়া পড়ে, তজ্জন্য দেশের উন্নতিসাধনার্থ সমস্ত কার্য্যে প্রতিযোগীতা আবশ্যক, কিন্তু এই ব্যবস্থা কাহার পক্ষে সুসংযত? এই ভারতবর্ষের পক্ষে কেবল এই ব্যবস্থা খাটিতে পারে। যথায় লোকে সকল তুল্যরূপ অঙ্গ সকলে উন্নতির অভিমুখে সবে ধাবিত হইতেছে, তদ্রূপ স্থানে এই ব্যবস্থা সংগত হয়, ফলতঃ অসমান ক্ষেত্রেই এ ব্যবস্থা উপকারিণী ও উপযোগিনী। বোধ কর এক পক্ষ উন্নতিমার্গে অগ্রসর হইয়া নানা কার্য্যে পরিপক্ক হইয়া আছে, আর এক পক্ষের নিকট এক্ষণে সকলেই নূতন, তাদৃশ স্থলে এ ব্যবস্থা না করিলে বলবান্ দুর্ব্বলকে চাপিয়া ধরিয়া থাকিবে, কদাচ তাহাকে মস্তক উন্নত করিতে দিবে না, অতএব অসমান ক্ষেত্রে দুর্ব্বলকে আশ্রয় না দিলে কখন সে প্রবলের সমকক্ষ হইয়া উঠিতে সমর্থ হয় না, সদ্যঃপ্রসূত শিশুতে এবং বিংশতি বৎসরেব দৃঢ়কায় যুবাতে সমান নহে অতএব সে প্রতিযোগিতার স্থলে, এরূপ অনেক ব্যবস্থা আছে, তাহা সঙ্গত ও হিতকর হইলেও তাহাদের প্রয়োগের উপযুক্ত স্থল আছে। উপযুক্ত পাত্রে এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে তৎসমস্ত ব্যবস্থা প্রযুক্ত না হইলে বরং অনিষ্টকর হইয়া ওঠে, ঔষধ রুগ্ন ব্যক্তির পক্ষে ব্যবস্থেয়, সুস্থ-দেহে ঔষধ অনিষ্টকর হইয়া থাকে। ঔষধ সেবন করিতে হইবে বলিয়া সকলেই কিছু রাশি রাশি ঔষধ হাঁউ হাঁউ করিয়া গিলিবে না, পাত্র বুঝিয়াই ঔষধ প্রয়োগ করা চাই। ব্যবসায়ে প্রতিযোগিতার নিয়ম বিশেষ হিতকর সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রতিযোগিতা ব্যবসায় পাত্রাপাত্র বিবেচনা আছে, পাত্র বুঝিয়া এই ব্যবস্থা প্রযুক্ত না হইলে ইষ্টসিদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক, বরং অনিষ্ট ঘটিয়া পড়ে, অতএব গবর্ণমেণ্ট যদ্যপি এতদ্দেশীয় শিল্প-কার্য্যে অনুকূল্য কবেন, তাহাতে প্রতিবন্ধক হওয়া কেবল বিদ্বেষ ও মূঢ়তাব কর্ম্ম, আমরা দেখিতেছি, আমাদের সকল উন্নতিপথে ইংলিসম্যান সচরাচর অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়া থাকেন আমবা তাঁহাকে একটি পরমর্শ দিই, তাহার চিরাচরিত ব্রতটি এইবার উদযাপন কবিলে ভাল হয় না।"

ইংরাজী মূলধন বিনিয়োগে ভারতের উপকার কি? ১৮ বৈশাখ ১২৯০

যাঁহারা ইলবার্ট সাহেবের প্রস্তাবের বিরোধী, তাঁহাদের একটি প্রধান হেতুবাদ এই, এদেশীয় বিচারপতির নিকটে ইংরাজের বিচারের ব্যবস্থা হইলে মফস্বলে আর কোন ইংরাজ থাকিবেন না, অতএব ইংরাজের মূলধন বিনিয়োগে ভারতবাসীর যে উপকার হইতেছিল তাহা হইতে ইহারা বঞ্চিত হইবেন, আমরা অন্যের কথা তত ধর্ত্তব্য করি না, লার্ড সালিসবরিও সে দিন বারমিংহামে যে বক্তৃতা করেন তাহাতেও তিনি এ বিষয়ের বিশেষ

রূপে উল্লেখ করিয়াছিলেন, লার্ড সালিসবরি একদা এই ভারতের একজন কর্ত্তা ছিলেন তাঁহার বাক্য কোন ক্রমেই উপেক্ষার যোগ্য নহে। কিন্তু তাহার বাক্যে কতদূর বিশুদ্ধ যুক্তির প্রাদুর্ভাব আছে তাহা একবার বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত, সে বিবেচনা করিতে গেলে ইংরাজী মূলধন বিনিয়োগে ভারতবাসীর ও ইংরাজের কাহার কিরূপ উপকার লাভ হয় তাহার একবার বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। একজনের ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া দশ টাকা উপার্জ্জন করিবার বড ইচ্ছা ছিল, সে নানা প্রকার ব্যবসা করিল কিন্তু কোন ব্যবসায়েই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। এক দিবস তাহার এক আত্মীয় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি এক্ষণে কি ব্যবসা করিতেছ? সে পূর্ব্বেই ক্ষুব্ধ হইয়াছিল, আত্মীয়ের ঐ প্রশ্নে বিরক্ত হইয়া উত্তর দিল, আমি এক্ষণে বিড়াল ব্যবসা করিতেছি, আত্মীয় তাহাতে কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল তাহাতে লাভ কি? সে উত্তর দিল, অন্য যত লাভ থাকুক না থাকুক, আঁচডকামড রূপ বিলক্ষণ-উপরি লাভ আছে, ভারতবাসীর ঐ রূপ ইংরাজী মূলধন বিনিয়োগে অন্য যত লাভ হউক না হউক বিলক্ষণ আঁচডকামড় লাভ আছে, আমরা এক একটি করিয়া কয়েকটা উদাহরণ দিই, তাহা হইলেই পাঠক আমাদের বাক্যের তাৎপয্য বুঝিতে পারিবেন। প্রথমে নীলকরের মূলধন বিনিয়োগের পর্য্যালোচনা করিয়া দেখুন, তাঁহারা ভারতবর্ষে অনেক মূলধন বিনিয়োগ করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহাতে ভারতবাসীর যে উপকার লাভ, তাহা বঙ্গ দেশের নীল অভিনয়ে সুস্পষ্ট পরিব্যক্ত হইয়াছে, বেহারের নীলকরদিগের কার্য্যেও এখন বিলক্ষণ পরিবর্ত্তন হইতেছে, পাঠক! একবার নীলকরদিগের দাদন দিবার প্রথাটি স্মরণ করিয়া দেখুন, যে চাষা একবার দাদন লইত তিন পুরুষ খাটিয়া দিয়াও তাহার পরিত্রাণ হইত না, চাষার যত ভাল জমি নীলকরেরা প্রায়ই তাহা গ্রাস করিয়া ফেলেন, সে জমি চাষার হস্তে থাকিলে সে তাহাতে স্বাধীনভাবে পরিশ্রম করিয়া দশ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিত, সে পথ বন্ধ হইয়া যায়। এখন পাঠক! বুঝিতে পারিলেন ভারতবাসী, ইংরাজী মূলধন বিনিয়োগে কেমন লাভবান হইতেছে, নীলপ্রধান প্রদেশে কৃষিকায্যে তাহার যে স্বাধীনতা ছিল তাহা বিনষ্ট হইল, তাহাকে পরাধীন হইয়া কথঞ্চিৎ দিন যাপন করিতে হইল, তাহার অন্নকষ্ট হইল, স্বাধীনতা গেল, নীলকর সার তুলিয়া লইলেন পরের পরিশ্রমে তাহার নবাবি বাড়িল, তিনি বিলক্ষণ দশ টাকার সঙ্গতিশালী হইয়া উড্ডীয়মান পক্ষীর ন্যায় স্বদেশে উড়িয়া গেলেন। ইংরাজী মূলধন বিনিয়োগে ইংরাজের না ভারতবাসীর কাহার লাভ, পাঠক! সেটী কি বুঝিতে পারিলেন? ভারতবাসীর আর একটী মহালাভের কথা বলি মন দিয়া শুনুন। ইংরাজ নীলকর আসিয়া নীলের কারখানা খুলিলেন, নিকটস্থ গ্রামবাসী কয়েকজন ভদ্রসন্তান দাসত্ব স্বীকার করিয়া তাহার কাজকর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিলেন, তাহারাই চাষাদিগের প্রবৃত্তি লওয়াইয়া দাদন গ্রহণ করাইলেন এবং ক্ষেত্রে চাষ করাইতে লাগিলেন, যাহারা অসঙ্গত দাদনের অঙ্গীকার প্রতিপালনে অসক্ত হইল ঐ সকল কম্মচারী তাহাদিগকে ধরিয়া আনিয়া

চুণের গুদামে পুরিলেন, রামকান্ত ও শ্যামচাঁদ প্রহার করিলেন, যাহারপরনাই অত্যাচার করিলেন, হয় ত তাহার বাটী লুট হইল এবং তাহার স্ত্রী কন্যাদির সতীত্ব নষ্ট হইল। কেমন পাঠক! ইংরাজী মূলধন বিনিয়োগে এটী ভারতবাসীর মহালাভ নয়? "যার শিল তারই নোড়া তাহারি ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া" এ দেশে যে একটি প্রসিদ্ধ প্রবাদ বাক্য আছে উপস্থিত স্থলে সেটী কি অবিকল খাটিতেছে না। নীলকর এদেশীয় লোককে দিয়া এদেশীয় লোকের উপরে অত্যাচার করাইলেন, সেই মূল হইতে আপনারা দশ টাকা উপার্জ্জন করিলেন, ইহা কি ভারতবাসীর সামান্য লাভ? বোধ হয় ভারতবর্ষ ব্যতিরেকে কোথাও এইরূপ কাণ্ডের অভিনয় হয় না, বোধ হয় বিদেশীয় লোকে বিদেশে আসিয়া তদ্দেশীয় লোক দ্বারা তদ্দেশীয়েরই মাংস ও শোণিত ভক্ষণ করান অন্যদেশে ঘটে না। কথায় বলে কাক কাকের মাংস খায় না, কিন্তু ভারতে ইংরাজি মূলধন বিনিয়োগের প্রভাবে কাকের মাংস কাকে খাইতেছে। নীলকর কর্ম্মচারীদিগের লাভ কি? দেশীয় লোকদিগের মাংস শোণিতে যজ্ঞ করিয়া তাহার দক্ষিণা স্বরূপ কিঞ্চিৎ কাঞ্চন মূল্য চারি পাঁচ টাকা মাসিক বেতন! ইংরাজী মূলধন বিনিয়োগে উক্ত কর্ম্মচারিদিগের যে মহালাভ হইল তাহাও একবার পাঠক গণনা করিয়া দেখুন। তাহাদিগের ভদ্রতা গেল, মনস্বতা গেল, তেজস্বিতা গেল স্বাধীনতা গেল পেটের দায়ে স্বদেশীয়ের উপর যে অকর্ত্তব্য অত্যাচার তাহাও করা হইল। এখন যদিও নীল সংক্রান্ত অত্যাচারের অনেক হ্রাস হইয়াছে তথাপি আমরা উপরে ইংরাজ নীলকরের মূলধন বিনিয়োগে এ দেশীয়ের লাভের যে গণনা করিলাম, তাহার বড় ন্যূনতা হয় নাই। ইংরাজ চা-করেরা এ দেশে আসিয়া যে মূলধন বিনিয়োগ করিতেছেন তাহাতেও যে দেশীয়ের লাভ, উপরি উক্ত বৃত্তান্ত দ্বারা পাঠক তাহার অনুমান করিয়া লইবেন। চা-প্রদেশে কেবল স্বজাতীয়ের দ্বারা যে স্বজাতীয়ের পীড়ন হয় এরূপ নয়, তথায় রজ্জুবদ্ধ পশুর ন্যায় আইনবদ্ধ মজুর দ্বারা চা এর উৎপাদন করা হইয়া থাকে। মজুরদিগের মুখ থাকিতে বলিবার চোখ থাকিতে দেখিবার এবং কাণ থাকিতে শুনিবার শক্তি থাকে না। তাহারা সজীব হইয়াও নির্জ্জীব জড়-পদার্থের ন্যায় স্বদেশীয় প্রহারকারী প্রহরীর দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে, এই ত গেল ভারতবাসীর লাভ ইঁহাদিগের আঁচড়-কামড় সার যেটী বাস্তবিক লাভ তাহা চা-করের, চা-কর মূলধন বিনিয়োগ করিলেন, এ দেশীয়দিগকে পশুবৎ খাটাইয়া লইলেন, দশ টাকা উপার্জ্জন করিলেন, শেষে ধনী হইয়া দেশে চলিয়া গেলেন, ইংরাজী মূলধন বিনিয়োগে কাহার লাভ এখন পাঠক, তাহা ত দেখিতে পাইলেন! এদেশীয়ের লাভের মধ্যে স্বাধীনতা সংহার চাকুরী ও মুহুরী, তাহাও পর্য্যন্ত লাভজনক নহে। এখন রেলওয়ে ইংরাজী মূলধন বিনিয়োগে এ দেশীয়েরা কিরূপ লাভবান্ হয় পাঠক! তদ্বিষয়টীরও একবার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখুন। রেলওয়ের যে প্রকৃত লাভ ইউরোপীয়েরাই তাহার ভাগী, এদেশীয়দিগের দাসত্বমূলক ও মজুরীমূলক যে লাভ তাহা অতি সামান্য। এ দেশীয়দিগের আর একটি লাভ এই, ইঁহারা রেলগাড়ী চড়িয়া

হাসিতে হাসিতে ইতস্ততঃ গমনাগমন করিয়া থাকেন, মনে করেন বড় সুবিধা হইয়াছে, গাড়ী চড়িয়া বেড়াইতেছি। কিন্তু সুবিধার স্বরূপটি যে কি তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখেন না। ভারতবাসিরা ত সহজে শ্রম করিতে চান না। পথ চলিবার অনুরোধে যে শ্রম ছিল তাহাও গিয়াছে, সকলে গতিশক্তিহীন হইয়া ক্রমে খোঁড়া হইয়া পড়িতেছেন যত গতিশক্তিহীন হইতেছেন ততই পীড়া আসিয়া চাপিয়া ধরিতেছে, ভারতে রেলওয়ের সৃষ্টি হওয়াতে ভারতবাসীর কি কোন সারবৎ লাভ হইয়াছে? ইঁহারা কি কল প্রস্তুত করিতে শিখিলেন? ইঁহারা স্বাধীনভাবে কোন স্থানে রেলওয়ে করিতে পারিলেন? ব্যবসায়ে যেকিছু সুবিধা হইয়াছে সেটীও এদেশীয়ের পক্ষে সামান্য লাভ।

এতদ্ভিন্ন পাটের কল, তুলার কল, প্রভৃতিতে ইংরাজরা যে মূলধন বিনিয়োগ করেন, তাহাতেও এ দেশীয়দিগের চাকুরী বা মজুরীর লাভ ভিন্ন অন্য কিছু বিশেষ লাভ দেখিতে পাই না। অতএব স্থির হইতেছে, ভারতে ইংরাজ মূলধন বিনিয়োগে ইংরাজেরই লাভ, ভারতবাসীর যে লাভ সে সামান্য মাত্র, অনিষ্টের সহিত সে লাভের গণনা করিলে সে লাভ লাভ বলিয়াই পরিগণিত হইতে পারে না। ইলবার্ট্ সাহেবের প্রস্তাবের বিরোধী যে সকল ইউরোপীয়, প্রস্তাবটি বিধিবদ্ধ হইলে ভারতে ইউরোপীয় মূলধন বিনিয়োগ বন্ধ হইয়া যাইবে। তাহাতে ভারত ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, এই বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিতেছেন, তাঁহারা কি ভ্রান্ত। ক্ষতি তাঁহাদিগেরই, তাহাদিগেরই নিজের স্বার্থরক্ষার্থ ভারতের স্বার্থ হরণে যে উদ্যত হইতেছেন এটা অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এস্থলে আমরা জিজ্ঞাসা করি, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যদি ন্যায়ানুসারে কার্য্য না করেন, তাহা হইলে কি ভারতের স্বার্থহানি হইবে না? ভারতের প্রধান স্বার্থহানি—অবিচার। যাবৎ এদেশীয় বিচারপতির উপরে মফস্বলস্থ ইউরোপীয় অপরাধীর বিচারভার অর্পিত না হইবে, তাবৎ সুবিচারের সম্ভাবনা নাই। এখন ত মফস্বলস্থ ইউরোপীয়েরা যাহা ইচ্ছা তাহা করে তাহাদিগের অপরাধানুরূপ দণ্ড হয় না। এখন অপরাধানুরূপ দণ্ড হইবার সম্ভাবনা নাই। বোধ কর মফস্বলের একান্ত প্রান্তে একজন ইউরোপীয় একজন এদেশীয়ের উপরে অত্যাচার করিল। বিশ ক্রোশ অন্তরে ইউরোপীয় মাজিষ্ট্রেট আছেন তাঁহার নিকটে বিচার হইবে। ঘটনাস্থলের সাক্ষীদিগকে সেইখানে লইয়া সাক্ষ্য দিতে হইবে, ইহা কি এদেশীয় দরিদ্রলোকের পক্ষে সুবিধার বিষয়? পূর্ব্বে কলিকাতা সুপ্রিমকোর্টে ইউরোপীয় অপরাধীর বিচারের ব্যবস্থা থাকাতে যে ফল ফলিত এখন মফস্বলস্থ ইউরোপীয়ের ইউরোপীয় বিচারপতির নিকটে বিচারের ব্যবস্থা থাকাতে সেই ফল ফলিতেছে, অর্থাৎ অবিচার হইতেছে। মফস্বলে ইউরোপীয়ের অপরাধের বিচার না হয়, তাহারা এখন যেমন যথেচ্ছাচার করিতেছেন। চিরকাল সেইরূপ করিতে পারেন। এই কি ইলবার্ট সাহেবের প্রস্তাবের বিরোধী ইউরোপীয়দিগের ইচ্ছা? এই স্থলে আমাদিগের জিজ্ঞাস্য এই যে গবর্ণমেণ্ট রাজধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতে ইচ্ছা করেন, সে গবর্ণমেণ্ট কি এ ইচ্ছা করিতে পারেন? আমরা বড় দুঃখিত হইলাম যে লার্ড সালিসবরি যে বক্তৃতা

করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার এই ইচ্ছা প্রকাশ পাইতেছে যে ভারতের মফস্বলস্থ ইউরোপীয়েরা যেমন অত্যাচার করিয়া আসিতেছেন, তেমনি করুক তাহার প্রতীকার হইয়া কাজ নাই, কারণ তিনি কহিয়াছেন, চীন তুরস্ক প্রভৃতি যে যে স্থানে ইংরাজ অধিকার আছে, সেই সেই স্থানেই ইংরাজের অপরাধের বিচার ইউরোপীয় বিচারপতির নিকটে হইয়া থাকে, কি আশ্চর্য্য! যিনি একজন মহাপ্রাজ্ঞ, প্রধান রাজনীতি দক্ষ বলিয়া বিখ্যাত তিনি কিরূপে অন্যায় কার্য্যের উদাহরণ দিয়া অন্যায় কার্য্যের সমর্থন করিলেন। চীনে অন্যায় কার্য্য হয় বলিয়া ভারতবর্ষেও হউক, এ কথা কি লার্ড সালিসবরির সদৃশ বিজ্ঞলোকের বলা উচিত? আমাদিগের বোধ হয় বিশুদ্ধযুক্তির মত এই, চীন প্রভৃতি প্রদেশে যে অন্যায় আছে তাহা নিবারিত হউক এবং ভারতবর্ষে অন্যায় আছে তাহাও নিবারিত হউক।

কিরূপ দ্রব্য শুল্ক নির্দ্ধারণের উপযুক্ত? ২৯ শ্রাবণ ১২৯০

বিলাসিতার ক্রীড়াপুত্তুল, শেরি স্যাম্পিন বিয়ারপায়ী বারনারীপ্রিয়, রসিকরাজ অথবা ক্ষীরছেনক নবনীত-ভোজী নিটোল-শরীর, দিব্য কমনীয় কান্তি, মনোহরদ্যুতি বিশিষ্ট ধনী যিনি কন্দর্পকে লজ্জা দিতেছেন, তিনি কিম্বা অঙ্গুলিপ্রমাণ দীর্ঘ বুক্‌ড়ি চাউলের অন্ন ও শাকাদি ভোজী আতপতাপ পীড়িত, কৃষ্ণবর্ণ রুক্ষকেশ, দৃঢ়কায়, চীরবস্ত্র পরিধায়ী কৃষক অথবা মজুর, ইহাদিগের মধ্যে কে অধিক দয়ার পাত্র? কাহার এক পয়সা ব্যয় এক ছটাক রক্ত দানের সহিত সমান? ধনী অকাতরে অজস্র অর্থব্যয় করিতেছেন, আপনার শারীরিক ও মানসিক সুখের জন্য পয়সাকে পয়সা জ্ঞান করিতেছেন না অর্থ তাঁহার প্রিয়তর, না যে ব্যক্তি দিনান্তেও উদরপূর্ত্তি করিয়া আহার করিতে পায় না, পীড়া হইলে অর্থাভাবে চিকিৎসা করাইতে পারে না, ধনীর গৃহ পূর্ণ করিবার জন্য যাহার জন্ম তাহার অধিক প্রিয় পদার্থ? মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া যাহারা অর্থ উপার্জ্জন করে তাহারাই আয়ের গৌরব করিতে জানে, অর্থ যে কি প্রিয়পদার্থ তাহা তাহারা যেমন বুঝিতে পারে অনায়াসে যাহারা অতুল ঐশ্বর্য্য পাইয়া থাকে তাহারা তেমন বুঝিতে পারে না, ব্যবসায়ী জমিদার অপেক্ষা অর্থসঞ্চয় করিতে জানে, কিন্তু পোষ্যপুত্র আবার জমিদারের ন্যায়ও অর্থের মর্য্যাদা বুঝে না, ব্যবসায়ী মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া অর্থ উপার্জ্জন করে, কিন্তু পোষ্যপুত্র নিজের বাপকে ছাড়িয়া অপরকে বাপ বলিয়া অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হয়, সুতরাং অর্থের আদর তাহার জানাই অসম্ভব। পাচক ব্রাহ্মণ ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিবার সময়ে তাহাতে লবণাদি দিতে ভুলিয়া গিয়াছে ভোজনার্থী ভোজন করিতে বসিয়া তাহা মুখে দিতে পারিল না কিন্তু পাচক ব্রাহ্মণ আহারের সময় তৎসমস্তই ভক্ষণ করিল—কেন? কারণ সে বহু শ্রম করিয়া তাহা প্রস্তুত করিয়াছে, সুতরাং

সে যদি উহা সিদ্ধও না করিত তথাপি তাহার মুখে অমৃততুল্য লাগিত, তবেই প্রমাণ হইতেছে শ্রমই মূল বস্তু। শ্রম না করিয়া যে অর্থ উপার্জ্জন হয় তাহার তত মর্য্যাদা হয় না। অতএব যে ব্যক্তি নিজ অর্থের মর্য্যাদা জানিল না, গবর্ণমেণ্ট তাহার অর্থের মর্য্যাদা করেন কেন? সত্য, পুত্র অবিমৃষ্যকারিতা নিবন্ধন কোন অন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে পিতার তাহার নিবারণ চেষ্টা পাওয়া কর্ত্তব্য, গবর্ণমেণ্ট পিতৃস্থানীয় সুতরাং ধনীর অর্থ যাহাতে রক্ষা হয় সে বিষয়ে তিনি যত্ন করিবেন, কিন্তু যে দরিদ্র যাহার কিছুই নাই তাঁহারা তাহার কি রক্ষা করিবেন? তাহার রক্ষার কিছুই নাই বটে কিন্তু সে আবার যাহাতে ধনসঞ্চয় করিতে পারে সে যাহাতে উদরপূর্ত্তি করিয়া আহার করিতে পারে, তাহার জন্য বাজারের দ্রব্য যাহাতে সস্তা হয় তদুপায় গ্রহণ করা কি সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য নহে? একজন অনাহারে মরিবে ও একজন অনাহারে মারিতেছে ইহাদিগের মধ্যে কাহাকে অগ্রে রক্ষা করা উচিত? পাঠক! আমরা উপরে বলিয়াছি, দরিদ্রের জন্য বাজারের দ্রব্য যাহাতে সস্তা হয়, তাহার উপায় বিধান করা গবর্ণমেণ্টের উচিত, কিন্তু তা বলিয়া আমরা এরূপ বলিতেছি না, যে হাটের দ্রব্য ধনী এক মূল্যে পাইবে দরিদ্র অন্যরূপ মূল্যে পাইবে, এরূপ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব আমাদিগের অভিপ্রায় এই, সাধারণতঃ দরিদ্র ও ধনী যে সকল দ্রব্যের ব্যবহার করেন, গবর্ণমেণ্ট তাহার শুল্ক গ্রহণ পরিত্যাগ করিয়া যে দ্রব্য সচরাচর ধনীরাই ব্যবহার করেন তাহারই উপর শুল্ক নির্দ্ধারণ করেন, দেখিবেন এই সহজ উপায় দ্বারা লাভবান হইবেন অথচ ধনীর কোন বিশেষ ক্ষতি হইবে না এবং গবর্ণমেণ্টেরও আয় হইতে থাকিবে, কাহারও কাহারও মত এই, ব্যবসায়ী বিশেষের উপর করনির্দ্ধারণ না করিয়া সাধারণতঃ যে দ্রব্য সকলেই ব্যবহার করে তাহারই উপর কর নির্দ্ধারণ করিলে যে ব্যক্তি যত পরিমাণে সেই দ্রব্য ক্রয় করিবে তাহাকে তত পরিমাণে শুল্কের দায়ী হইতে হইবে, ইহাতে এই একটী বিশেষ লাভ হইবে যে লোকে আয়ানুসারে শুল্কের দায়ী হইবে এবং সাধারণের চক্ষে ইহা বিসদৃশ বোধ হইবে না। কিন্তু আমরা এ মতের পক্ষপাতী নহি, ইহার সারবত্তা আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতেও সক্ষম নহি, মনে করুন এক ধনী গৃহস্থের পরিবার সংখ্যা ত্রিশজন, মাসে তাহার বিংশতি মণ চাউল খরচ হয়, কিন্তু বার্ষিক চল্লিশ সহস্র টাকা। ঐরূপ একটি দরিদ্র লোকের অথবা মধ্যবিত্ত অবস্থার গৃহস্থের ত্রিশটি পরিবার মাসে তাহারও বিংশতি মণ চাউল খরচ হইয়া থাকে, বার্ষিক আয় ৩০০ শত টাকা মাত্র, বাজারে চাউলের মূল্য প্রতি মণ দুই টাকা, গবর্ণমেণ্টের শুল্ক চার আনা, সুতরাং প্রতি মণ নয়সিকা হইল। ধনী অক্লেশে তাহা দিলেন, কিন্তু দরিদ্র অথবা মধ্যবিত্ত অবস্থার লোকের মাসিক ১৭।৫৮ টাকা আয়ের পাঁচ টাকা যদি শুল্কে গ্রাস করিল, তাহা হইলে নিশ্চয় তাহাকে ঋণগ্রস্ত অথবা দুই এক দিন উপবাসী থাকিতে হইল, এরূপ অবস্থার লোকে বিলাসিতার দ্রব্য যে ব্যবহারে সমর্থ হয় না, ঘৃত দুগ্ধাদি ভাল খাদ্য দ্রব্যও খাইতে পায় না। মোটা ভাত

ও মোটা কাপড় পাইলেই তাহারা যথেষ্ট জ্ঞান করে, সুতরাং সেই সকল দ্রব্যের উপর গবর্ণমেণ্ট যদি শুল্ক নির্দ্ধারণ করিয়া চাউল, ডাউল, লবণ কাপড় প্রভৃতি দরিদ্রের জীবিকা-নির্ব্বাহের অবশ্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর শুল্ক উঠাইয়া দেন তাহা হইলে তাহাদিগের অপেক্ষাকৃত সুখ-বৃদ্ধি হইতে পারে সন্দেহ নাই।

বিশেষতঃ বিলাস দ্রব্যের উপর শুল্ক নির্দ্ধারণ একটী মহোপকার লাভের বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে, মানুষ বিলাসী হইলে তাহার শারীরিক শ্রমশক্তি অপগত হইয়া থাকে, ইন্দ্রিয়দোষ প্রবল হয় সুতরাং মানসিক উন্নতির ক্ষেত্র উষর হইয়া পড়ে, উন্নত ও সভ্য জাতির অবনতির ইহাই মূলীভূত কারণ, অতএব বিলাস-দ্রব্যের উপর শুল্ক নির্দ্ধারণ নিবন্ধন যদি মধ্যবিত্ত অবস্থার লোকে সেই সকল দ্রব্য ক্রয় করিতে না পারে, তাহা হইলে উপকার ব্যতীত অপকারের সম্ভাবনা কি? ঘৃত, চিনি, গন্ধক দ্রব্য কাচ নির্ম্মিত পাত্র, রেশমী বস্ত্র প্রভৃতি যেগুলি ধনী ব্যতীত দরিদ্র লোকে সচরাচর ব্যবহার করিতে পারে সেই সকল দ্রব্যের উপর অল্প পরিমাণে শুল্ক স্থাপিত হইলে ধনী লোকের অনুযোগের অবসর থাকিবে না, মাদক দ্রব্যের উপরেই যাহাতে অধিক পরিমাণে শুল্ক নির্দ্ধারিত হয় তাহাই আমাদিগের একান্ত ইচ্ছা, মদ্যপান করিয়া সে সকল লোক পরম প্রিয়বস্তু শরীর নষ্ট করিতে কুণ্ঠিত নহে আমরা তাহাদিগের ধনরক্ষার পক্ষপাতী নহি।

ভারতবর্ষের বাণিজ্যোন্নতি। ২৫ ভাদ্র ১২৯০

ভারতবর্ষের যে প্রকার বর্ত্তমান অবস্থা ঘটিয়াছে, ইহা জাতীয় বৃদ্ধির কিছুই অনায়াসসাধ্য উপায় নাই। একে অর্থ সঞ্চয় করাই কঠিন, কেবল আমাদের পক্ষে নয় সকল জাতির পক্ষেই ইহা দুষ্কর ও দুরারোহ। কেবল গৃহে মধ্যে গালে হাত দিয়া চিত্রপটের মত বসিয়া ভাবিলে ধনবৃদ্ধি হয় না। পৃথিবীতে ইংরাজের মত ধনাঢ্য জাতি আর নাই। কিন্তু চাহিয়া দেখ ইংরাজেরা এই অর্থ সংগ্রহের জন্য কি-না করিতেছেন মানুষের বল-বিক্রম সাহস ও বুদ্ধিতে যতদূর কুলায় ইংরাজেরা তাহার কোন ত্রুটি করিতেছেন না উদয়াস্ত পরিশ্রম করিতেছেন, তাঁহাদের শ্রম দেখিলে পাষাণ কাঁপিয়া উঠে। বুদ্ধি চালনা করিয়া কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য অভিনব বিষয়ের উদ্ভাবন করিতেছেন। আমাদের পক্ষে সে সকল এখন দূরের কথা, এখন কত কাল বিদ্যানুশীলন ও মস্তিষ্ক চালনা করিলে তবে যদি বুদ্ধি বিকাশ হয়, তবে যদি আমরা নূতন বিষয়ের আবিষ্কার করিতে পারি। এক্ষণে ভারতবর্ষের ধনবৃদ্ধির দুইটি উপায় আছে। এক শিল্প বিস্তার, আর কৃষিজাত দ্রব্যের বিদেশে চালান। ভারতবর্ষে শিল্প নাই কিন্তু এখন যাহা আছে তাহাতেই আমরা স্বদেশের বিলক্ষণ শ্রী সাধন করিতে পারি। কাশ্মিরী শাল, রামপুরী চাদর, লুধিয়ানার কার্পাস-বস্ত্র, মীনের অলঙ্কার, গজদন্তের ছবি, লৌহ-অস্ত্র, পাথরের বাসন,

ধাতুময়ী প্রতিমূর্ত্তি, রৌপ্য-অলঙ্কার প্রভৃতি অনেক দ্রব্য এখনও এদেশ হইতে বিদেশে পাঠাইতে পারা যায়। ইউরোপে কাচপাত্রের ব্যবহার আছে, সেখানে ধাতুময় তৈজসাদির চলন নাই। কিন্তু কাচ-পাত্র অত্যন্ত ভঙ্গুর, সামান্য প্রকার আঘাত লাগিলেই সহসা ভাঙ্গিয়া যায়। সেজন্য বৎসর বৎসর গৃহস্থে বিস্তর ক্ষতি হয়। পাথরের পাত্রও ভঙ্গুর সন্দেহ নাই, কিন্তু কাচের মত নহে। একবার প্রস্তর-পাত্র ক্রয় করিলে অনেক কাল চলিতে পারে। আগ্রায় যে সমস্ত শ্বেত-প্রস্তরের পাত্রাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে, কাচের পরিবর্ত্তে তাহা ব্যবহার করা যায়। মূল্য অধিক পড়ে বটে, কিন্তু ইহা অধিককাল স্থায়ী এবং দেখিতেও সুন্দর। বিলাতে আমাদের এজেন্সী নাই। সে কারণ ঐ সকল বাসন ইউরোপে কদাচিৎ বিক্রিত হয়। এখানে যে সকল বৈদেশিক বণিক আছেন পাছে স্বদেশের ক্ষতি হয় তজ্জন্য তাঁহারা এদেশোৎপন্ন দ্রব্য লইয়া যান না। কিন্তু আমাদের এইরূপ বিশ্বাস ইউরোপে এজেন্সী খুলিলেই এখানকার প্রস্তর পাত্র নিশ্চিত তথায় বিক্রীত হইবে। দ্বিতীয় কাশ্মীরের শাল রুমাল, রামপুরের চাদর, আগ্রার ও ঝাঁন্সীর শতরঞ্চ গালিচা, দুলিচা ইত্যাদি ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি সকল স্থানেই বিক্রীত হইতে পারে। চিত্রকার্য্যে এবং প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণেও এখন ভারতবাসী সুপটু আছে। আমেরিকায় একটি প্রদর্শনীর নিমিত্ত সম্প্রতি চারিটা মাটির পুতুল নির্ম্মিত হইয়াছিল। একটি মেছুনীর মূর্ত্তি, সম্মুখে দুইটি রুইমাছ রহিয়াছে, মাচের দর করিতেছে। আর একটি বঙ্গ দেশের কৃষ্ণবর্ণ কৃষক যে বর্ণের জন্য আজ আমরা এত হেয়—সেই কাল বর্ণের কৃষক তরকারীর দাম করিতেছে, একটী মূলা হাতে, আর কয়েকটী মূলা, বেগুন ও রম্ভা সম্মুখে সাজান আছে তৃতীয় মূর্ত্তি মাড়য়ারী ব্যবসায়ী। কাণে স্বর্ণ মাকড়ী, মাথার পাগ। চতুর্থ মূর্ত্তি একটি দোকানীর। তৌলহস্তে দোকানী বিক্রেয় দ্রব্য ওজন করিতেছে। প্রদর্শনী সম্বন্ধে কোন কার্য্যোপলক্ষে আমরা ত্রৈলোক্যবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করিতে গিয়াছিলাম। কিঞ্চিৎ দূর হইতে পুতুল চারিটি দেখিয়া স্পষ্ট জীবিত মনুষ্য বলিয়া ভ্রম হইল। বাস্তবিক না বলিয়া দিলে দূর হইতে কেহই সেগুলিকে পুতুল বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিবেন না। নবদ্বীপের যদুনাথ পাল নামক একজন কুম্ভকার ঐ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছে। কলিকাতায় যে প্রদর্শনী হইবে তাহার জন্য নানাপ্রকার মৃন্ময়ী প্রতিমা নির্ম্মিত হইতেছে। ব্যবসায় করিলে এই সকল কারিকর উত্তম উত্তম মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া বিদেশে পাঠাইতে পারিবে। এদেশে চিত্রকরও এখন পর্য্যন্ত অনেক আছেন। তাহাদের চিত্র কৌশল দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। যাঁহারা কলিকাতার শিল্প বিদ্যালয়ে শিক্ষা করিয়া চিত্রকর হইতেছেন আমরা তাঁহাদের কথা বলিতেছি না। মুসলমান সম্রাটদিগের রাজত্বকাল হইতে এদেশে যে প্রকার উৎকৃষ্ট চিত্রকর্ম্ম চলিয়া আসিতেছে, আমরা তাহারই উল্লেখ করিতেছি। অবশ্য সম্রাট আকবরের সময় এ দেশের চিত্রকরেরা যে প্রকার দক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল, এখন তাহাদের নিপুণতা ততদূর নাই। উৎসাহের অভাবে ইহার বিস্তর হ্রাস হইয়া

পড়িয়াছে। তথাপি দিল্লী লক্ষ্ণৌ প্রভৃতির শহরের চিত্রকরেরা অদ্যপি হাস্তদন্তে যে প্রকার প্রতিমূর্ত্তি চিত্র করিয়া থাকেন তদ্দর্শনে চমৎকৃত হইতে হয়। ইউরোপের প্রথিতনামা চিত্রকরেরা যে প্রকার অনুরূপ মূর্ত্তির অইল পেইণ্ট করিয়া থাকেন, আমাদের দেশের এই সকল চিত্রকরেরা তদপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। বরং ইহাঁদের কোন কোন চিত্রকৌশল দেখিলে বিলাতি চিত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মে। আমাদের আত্মীয় বাবু রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় পারস্যের আইন-ই-আকবরীর বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিতে ব্রতী হইয়াছেন ঐ পুস্তকে অনুকৃতি দিবার নিমিত্ত তিনি দিল্লী প্রভৃতি নগর হইতে গজদন্তে চিত্রিত যে প্রকার উৎকৃষ্ট চিত্রপট আনাইয়াছেন তাহা দেখিলে ইউরোপীয় কারিকরও লজ্জিত হইবেন। বিলাতী প্রথানুসারে এখন সকলে অইল পেইণ্ট প্রস্তুত করাইয়া থাকেন কিন্তু আমাদের বিবেচনায় গজদন্তের পাতলা পাত করিয়া তাহাতে অক্লেশে বৃহদাকার ফলক নির্ম্মিত হইতে পারে। সেই ফলকে যদি এদেশের প্রথানুসারে সকলে আপন আপন প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত করান তাহা হইলে সে পট দেখিতে আরও সুন্দর ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। এবং এ দেশের বাণিজ্যও বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে, এইরূপে এক একটি শিল্পকর্ম্ম বৃদ্ধি করিতে হইলে বিদেশে তাহার এজেন্সী খুলিতে হয়, এবং এজেণ্টগণ তত্তদ্দেশের প্রয়োজন বুঝিয়া এখানে যদি নানা প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত করাইতে থাকেন তাহা হইলে সত্বর এদেশের জাতীয় ধন বৃদ্ধি হয়। কৃষিকর্ম্মের পক্ষে আমাদের বক্তব্য এই দেখা যাইতেছে এখন উত্তরোত্তর মজুর দুর্ম্মূল্য হইয়া পড়িতেছে, সুতরাং চাষে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যয় হইবে, সে কারণ যাহাতে অধিক উৎপন্ন হয়, তাদৃশ উপায় উদ্ভাবন করা আবশ্যক, আজ আমরা অন্য কোন বিষয়ের উল্লেখ করিব না, আজকাল গমের ব্যবসায় সকলের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছে, গত রুশ তুরস্কের যুদ্ধের পর কৃষ্ণসাগরের পূর্ব্বদিক হইতে গোধূম আর ইউরোপে আনীত হয় না, পূর্ব্বে ঐ সকল অঞ্চল হইতে বৎসর বৎসর যথেষ্ট পরিমাণে গম ইউরোপে প্রেরিত হইত। ঐ আমদানী বন্ধ হওয়ায় এক্ষণে ভারতবর্ষে গমের বিলক্ষণ টান ধরিয়াছে, ইউরোপীয়েরা এক্ষণে এই দেশের গোধূমই ক্রয় করিয়া থাকেন মেলবোরণে যখন প্রদর্শনী হয় তৎকালে উত্তর পশ্চিমাঞ্চল এবং পাঞ্জাব হইতে বিস্তর গোধূম সকলেরই মনোনীত হয়, যাহাতে এদেশে প্রচুর মাত্রায় গম জন্মে এবং ইউরোপে সস্তাদরে তাহা বিক্রয় করিতে পারা যায় তদ্বিষয়ে যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য, আমেরিকা আমাদের প্রতিযোগী, যদি সস্তাদরে গোধূম না দিতে পারা যায়, তবে হয় ত একদিন আমেরিকা আমাদের ব্যবসায়টী কাড়িয়া লইবেন, গম সস্তা করিবার দুইটি উপায় আছে, এক উপায়, ইহা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপাদন করা আর এক উপায় মাল পাঠাইবার ভাড়া সস্তা করা। বঙ্গদেশের অনেক স্থানে এখন উত্তমরূপ ধান্য জন্মে না অনেকে কলির মাহাত্ম্যের উপর দোষারোপ করিয়া ক্ষান্ত থাকেন। আমরা কলিযুগের দোষগুণ ততটা বুঝি না তবে কৃষকদিগকে এই উপদেশ দিতে পারি এক্ষণে মৃত্তিকার গুণ পরিবর্ত্তিত

হইয়া আসিতেছে, পুর্ব্বে যে স্থান জলাভূমি ছিল এখন তাহা উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে, জলা মৃত্তিকায় ধান্য জন্মে, জমি উচ্চ হইয়াতে আর সুচারুরূপে ধান্যোৎপাদনের সম্ভাবনা নাই, তাদৃশ স্থলে অন্য ফসল জন্মিবে, সে শিক্ষা উত্তর পশ্চিমাঞ্চল বলিয়া দিতেছে, উচ্চ ক্ষেত্রে গম ভালরূপ জন্মে অতএব এক্ষণে বঙ্গদেশের অনেক স্থান গম উৎপাদনের উপযোগী হইয়াছে, সেই সকল স্থানে গম রোপণ করিলে পর্য্যাপ্তমাত্রায় জন্মিতে পারে এ দেশেরও ধন বৃদ্ধি হয়, ভাড়া সস্তা করিবার কর্ত্তা রেলওয়ে কোম্পানী যেখানে কস্মিন্‌কালে বাণিজ্য ছিল না, রেলওয়ের প্রসাদে সম্প্রতি তেমন স্থলে বাণিজ্য বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। মেজর বেয়ারিং রেলওয়ের ভাড়া অনেক কমাইয়া গিয়াছেন, কিন্তু এখনও আর কিছু না কমাইলে বাণিজ্যের সুবিধা হইবে না, সে কারণ এ বিষয়ে রেলওয়ে কোম্পানীর ও গবর্ণমেণ্টের মনঃসংযোগ দেওয়া উচিত।

উপনিবেশে কুলি প্রেরণ সংক্রান্ত ১৮৮২-৮৩ অব্দের রিপোর্ট। পৌষ ১২৯০

কুলি প্রেরণ সংক্রান্ত রিপোর্টগুলি যখন আমাদিগের নয়নপথে পতিত হয় তখন মনে হইতে থাকে যেন দয়া ধর্ম্ম ভদ্রতা ও মনুষ্য জীবনের সহিত স্বার্থের বিরোধ চলিতেছে। স্বার্থের নিকটে দয়া ধর্ম্মাদি সকলের বলি হইয়া থাকে। ভারতবর্ষ হইতে যে সকল কুলি উপনিবেশে গমন করিয়া প্রাণত্যাগ করে, তাহাদিগের বিভব অতঃপর যাহাতে তাহাদিগের উত্তরাধিকারীরা প্রাপ্ত হয়, তদ্বিষয়ের চেষ্টা করা হইতেছে, অনেকে জাহাজে যাইবার কষ্টে, ও অনেকে গন্তব্য-স্থানে পৌছিয়া দিবা রাত্রি রৌদ্রে ও হিমে কাজ করিয়া পীড়িত হয় এবং প্রাণত্যাগ করে, সুতরাং টাকা পাওনা প্রায় হয় না। যাহারা জীবিত থাকে, তাহারা তথায় অবস্থিতিকালে কেবল প্রাণধারণের উপযোগী খাদ্যদ্রব্য প্রাপ্ত হয়, প্রত্যাগমনকালে হিসাব পত্র করিয়া যাহা কিছু আনিতে পারে, তাহা অতি সামান্য। ইহারও আবার নানা বিঘ্ন। মূর্খ শ্রমকাতর দরিদ্র লোকেই প্রায় উপনিবেশে গমন করিয়া থাকে, যাহাদিগের শ্রম করিবার শক্তি আছে অথবা যাহারা বুদ্ধিমান, তাদৃশ লোক প্রায় উপনিবেশে যায় না। যাহারা নিরক্ষর পশুসদৃশ লোকদিগকে লইয়া যায় তাহারা ব্যবসায়ী, তাহারা কুলিদিগকে যত খাটাইতে পারিবে, ততই তাহাদিগের লাভ, সুতরাং কার্য্যানুরোধে তাহাদিগকে নির্ম্মম হইয়া উঠিতে হয়। বিশেষতঃ উপনিবেশের অধিকাংশ কর্ম্মচারী বিজাতীয় লোক। ভারতবাসীর উপরে তাহাদিগের স্নেহ মমতা নাই। তাহারা কুলিদিগের প্রতি যে নিষ্ঠুর আচরণ করিবে, তাহা বিস্ময়াবহ নহে। যদি কেহ নিষ্ঠুর ব্যবহার না করে তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। ঐ মূর্খ কুলিদিগের হিসাব পত্রের ভার যাঁহাদিগের হস্তে ন্যস্ত, তাঁহারা আয়ের এমন সুযোগ কদাচ পরিত্যাগ করেন না। হিসাবকারীদিগের হিসাব করিবার সময়ে যখন সভ্য-দেশেও হিসাবে ভুল হয়, তখন

কুলিদিগের হিসাবের ভুল হওয়া বিচিত্র নহে। বিশেষতঃ যাহারা কুলিদিগের হিসাব করিয়া দেয় তাহাদিগেরও ধর্ম্ম জ্ঞান অল্প। তাহারা দুর্ব্বলকে চুষিয়া স্বোদরের তৃপ্তি সাধন করিয়া থাকে। অতএব তাহারা নির্ব্বোধ ও মূর্খের সহিত হিসাব করিবার কালে যে ঠিক হিসাব করিবে, তাহার সম্ভাবনা নাই। এইরূপে পাঁচ কারণে হিসাব ভুল হইয়া কুলিরা যৎকিঞ্চিৎ যাহা কিছু প্রাপ্ত হয়, তাহাই দেশে আসিবার সময় আনয়ন করে, মরিয়া গেলে তাহার আর পাইবার প্রত্যাশা কি? যদি বা তাহাদিগের বাটী ও উত্তরাধিকারীর সন্ধান করিয়া মৃত ব্যক্তির প্রাপ্য টাকা দান করিবার চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে মূর্খ উত্তরাধিকারীও যে পত্রাদি পড়িয়া কুলি আপীস হইতে প্রাপ্য টাকা লইয়া যাইতে পারিবে, তাহাতে বিশ্বাস হয় না। বঙ্গদেশের কুলিরা ইচ্ছাপূর্ব্বক উপনিবেশে যাইয়া যাহাতে মজুরী করে, শুনা যাইতেছে সে চেষ্টা করা হইবে। কিন্তু এ চেষ্টা যে সফল হইবে, তাহা বোধ হইতেছে না। কারণ, বঙ্গবাসিরা স্বভাবতঃ চতুর, তাহারা স্বদেশে থাকিয়া যে কোন উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করে। বঙ্গদেশে মজুরীর ও সামান্য ব্যবসায়ের দ্বার প্রশস্ত। স্বদেশে তাহাদিগের যে লাভ হয়, উপনিবেশে তদপেক্ষা অধিক লাভ না হইলে তাহাদিগের চিত্ত আকৃষ্ট হইবে না। যাহারা কুলি দ্বারা কৃষিকার্য্য সম্পাদন করিয়া লাভবান হইবার অভিলাষী, তাহারা যে অধিক বেতন দিবে, সে সম্ভাবনা অল্প, বঙ্গদেশীয়েরা ত স্বভাবতঃ স্বগৃহ প্রিয়। তাহারা এমন ধনী নয় যে অধিক লাভ না দেখিলে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করে, তবে যাহারা অল্পবুদ্ধি, অলস ও অপরিণামদর্শী, তাহারা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাদিগকে লইয়া যাওয়া আর না যাওয়া তুল্য। ফলতঃ যাবৎ উপনিবেশ সমূহের অবস্থা উন্নত, কুলিদিগকে স্বাধীনতাদান ও অধিকতর বেতনদান ব্যবস্থা কুলিদিগকে যাঁহারা লইয়া যান, তাঁহারা শান্তমূর্ত্তি ধারণ না করিতেছেন এবং চিকিৎসাদির সুব্যবস্থা না হইতেছে তাবৎ আমরা সে উদ্দেশ্যসিদ্ধির সম্ভাবনা দেখিতে পাই না। আজকাল আসামের কুলিদিগের দুরবস্থার বিষয়ে আমরা কাহাকেও উচ্চ বাচ্য করিতে দেখি না। গবর্ণমেণ্টও বলেন, নূতন আইন হওয়াতে তাহাদিগের উপর চা-করদিগের অত্যাচারের হ্রাস হইয়াছে কিন্তু আজিও আমরা আমাদিগের বিশ্বস্ত বন্ধুর পত্রে তাহাদিগের যেরূপ শোচনীয় অবস্থার বৃত্তান্ত পাঠ কবি, তাহাতে অশ্রুবারি সম্বরণ করা যায় না। এমন কি, তাঁহারাই চা-কর সাহেবদিগের অত্যাচার ভয়ে সংবাদপত্রে কুলিদিগের অবস্থার আন্দোলন করিতে সাহসী হন না। এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন ভাই! তুমি আমাকে চা বাগানের কুলিদিগের প্রতি সাহেবদিগের ব্যবহারের বিষয়ে লিখিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছ কিন্তু কাহার ঘাড়ে দশটা মাথা যে এ বিষয়ে কোন কথা লিখিতে সাহস করিবে? এই নিবিড় অরণ্যে চা কর সাহেব লেখকের প্রাণবধ করিলে এমনও এক ব্যক্তিও নাই যে সংবাদ তোমাদিগের নিকট উপস্থিত করিবে, এ যে কিরূপ স্থান, তাহা লিখিয়া ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য। 'যদি মিলটনের পারাডাইজ লষ্টের নরক বর্ণন পাঠ করিয়া থাক, যদি মেঘনাদ

বধ কাব্যের ভীষণ যমপুরীর চিত্র কখন মনে অঙ্কিত করিয়া থাক, যদি পল ও ভার্জিনিয়া নামক পুস্তকে ক্রীতদাসের প্রতি অত্যাচারের বিষয় দেখিয়া থাক, যদি রবিনসন্স ক্রুশোর বনবাসের কথা শুনিয়া থাক, তবেই এ স্থানের চিত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে। এক একটী চা-বাগানে এই সকলের একত্র সমাবেশ আছে।" সত্য বটে প্রজাসংখ্যা বৃদ্ধি হইলে জীবিকা নির্ব্বাহের কষ্ট দূর করিবার জন্য এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লোক পাঠাইলে দেশের মঙ্গল হয়। সত্য বটে গবর্ণমেণ্ট প্রজার পিতৃস্থানীয়, সুতরাং এ কার্য্যে, তাঁহাদিগের উদ্যোগী হওয়া বিশেষ কর্ত্তব্য। কিন্তু উপনিবেশে যদি স্বার্থ ও তন্মূলক অত্যাচারের একাধিপত্য থাকে, এবং দয়া ধর্ম্ম ও সুবিচারাদি সে স্থান পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে অভীষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই, একবার যে ব্যক্তি উপনিবেশ হইতে প্রত্যাগত হইয়াছে, কাগজে ও কলমে যিনি যতই সাফাই করুন, সে প্রাণান্তেও আর সেখানে যাইতে চাহে না, ইহার কারণ কি? সে তাহার কষ্ট ও দুঃখের কথা তাহার আত্মীয় স্বজনের নিকট গল্প করিয়া তাহাদিগের উপনিবেশে যাইবার পথ রুদ্ধ করিয়া ফেলে। মজুরেবা গবর্ণমেণ্টের রিপোর্ট পাঠ করে না অথবা ভদ্র লোকের উপদেশ বাক্য শ্রবণ করে না, তাহাদিগের শ্রেণীস্থ ভুক্তভোগী ব্যক্তির কষ্টের কথা পরম্পরাক্রমে শুনিয়া তাহাদিগের যে ধারণা হয়, তাহার আর কিছুতেই অপনোদন হয় না, সুতরাং কুলিসংগ্রাহকদিগকে প্রতারণা প্রবঞ্চনা করিয়া কুলি সংগ্রহ করিতে হয়। কুলিসংগ্রাহকদিগের অত্যাচাবের সংবাদ সংবাদ-পত্রে যত আন্দোলিত হইতেছে, মজুরদিগের তত চৈতন্য হইতেছে। ভাল অপেক্ষা মন্দ সংবাদেব আন্দোলন শ্রবণে লোকের মন স্বভাবতঃ ধাবমান হয়। এই জন্য কুলিদিগের উপনিবেশে যাওয়ার উপকারিতা অপেক্ষা অপকারিতার কথা তাহারা অধিক মনোযোগ দিয়া শুনে এবং ছেলেধরার ভয়ের ন্যায় কুলিধরার হাতে পড়িবাব ভয় করিয়া থাকে। সত্য বটে প্রজার যাহাতে মঙ্গল হয়, গবর্ণমেণ্টের তাহাই একমাত্র কর্ত্তব্য, তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে কাহারও কোনপ্রকার অনুযোগেব কারণ থাকে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, তাহা প্রায় যথাবিধি কার্য্যে পরিণত হয় না। কুলিদিগের যাঁহারা লইয়া যান, তাঁহারা আঁটঘাট বাঁধিয়া কাজ করেন। তাঁহারা অগ্রে স্থানীয় রাজকর্ম্মচারীদিগকে মোহনমন্ত্রে মুগ্ধ করেন, তৎপরে অভিলষিত কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন। যেখানে এরূপ পাকা বন্দোবস্ত, সেখানে রহস্যোদ্ভেদ করিয়া অত্যাচারের শাস্তি করা কি মূর্খ কুলিদিগের সাধ্যায়ত্ত? বিশেষতঃ অন্য গবর্ণমেণ্টের উপনিবেশে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট মিত্রতাসূত্রে ভারতবর্ষ হইতে যে সকল কুলি প্রেরণ করেন, তাহাদিগের উপর অত্যাচার হইলে আমাদিগের গবর্ণমেণ্টকে কে তাহার গোচর করিবে? আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীন স্থানে কুলিদিগের যে অত্যাচার হয় তাহাই যখন গবর্ণমেণ্টের শ্রুতিমূলে উপস্থাপিত হয় না, তখন অন্য গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীন স্থানে ভারতবর্ষীয় কুলিদিগের যে কি দুরবস্থা হয়,

তাহা কি কাহারও জানিবার উপায় আছে? কুলিদিগকে উপনিবেশে লইয়া যাইবার সময়ে তাহাদিগকে তথায় যে বেতনে যাইয়া যতক্ষণ ও যে যে কাজ করিতে হইবে, একখানি কাগজে যদি লিখিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে যাহার ইচ্ছা হইবে সেই যাইতে পারে, কিন্তু নিয়মগুলি কতদূর পালন হইতেছে, তাহার অনুসন্ধান কে করিবেন? স্থানীয় রাজকর্ম্মচারীরা যদি কুলিদিগের সুখ দুঃখের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তাহা হইলে বর্ত্তমান বন্দোবস্তেও তাহাদিগের তাদৃশ কষ্টের সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু তাঁহারা তাহার প্রতি সম্যক্ দৃষ্টিপাত করেন না। এই কারণে আমাদিগের ইচ্ছা, লেপ্টনণ্ট গবর্ণর স্বয়ং অথবা স্থানীয় কমিশনর এবং বৈদেশিক গবর্ণমেণ্টের রাজ্যে আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের যে সকল প্রতিনিধি অবস্থিত করিতেছেন তাঁহারা প্রতি-বর্ষে এক একবার উপনিবেশগত কুলিদিগের অবস্থার অনুসন্ধান করেন। নিয়মিত দিনে কুলিরা এক স্থানে একত্র সমবেত হইবে এবং তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাদিগের সুখ দুঃখের কথা শুনিবেন। এরূপ হইলেও অত্যাচারের অনেক শান্তি হয়। কিন্তু কুলিরা সমবেত হইয়া যাহার উপস্থিতি নিবন্ধন ভয়ে কিছু বলিতে সাহস না করিবে, তাহাদিগকে সে স্থানে থাকিতে দেওয়া না হয়। কমিশনর প্রভৃতি সেই সকল শুনিয়া যথা কর্ত্তব্য অবলম্বন করিবেন। উপসংহারে আমারা পুনর্বায় কহিতেছি উপনিবেশ হইতে যদি স্বার্থ ও তন্মূলক একাধিপত্য দূরীকৃত না হয়, কুলীদিগকে সমধিক স্বাধীনতা ও সমধিক বেতন দান করা না হয়, উপনিবেশে কুলি প্রেরণ অভীষ্টসিদ্ধি হইবে না। কুলিরা মানুষ। তাহাদিগের সহিত মানুষেব মতই ব্যবহার করিতে হইবে। তাহারা গো-মেষ মহিষাদি নয়। অতএব তাহাদিগেব প্রতি গো-মেষ-মহিষাদিবৎ ব্যবহার করিলে উপনিবেশের উত্তরোত্তর অবনতিই ঘটিবে।

ইউরোপায় বাণিজ্য সংঘর্ষে দেশীয় শিল্পেরও বিষম দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। ২৬ চৈত্র ১২৯০

গত বৎসর বঙ্গদেশে কৃষিকার্য্য হইতে এতদ্দেশীয় লোকেরা দেশীয় ও বৈদেশিক বাণিজ্যে যে লাভালাভ করিয়াছেন, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রস্তাবে দেশভিজাত শিল্প সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবসায় হইয়াছে, তাহার আলোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে বৈদেশিক বাণিজ্যসংস্রবে দেশীয় শিল্প ব্যবসায় ক্রমেই লোপ হইতেছে। যে শিল্পকার্য্য সভ্যতার অকাট্য প্রমাণ, যে শিল্পকার্য্যে দেশের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি ও শ্রমশক্তি বৃদ্ধি ও অর্থের অভাব দুরীভূত হয়, বঙ্গের যাহাতে মানব সমাজের ভূরি পরিমাণে কল্যাণ সাধিত হয়, দারিদ্র্য দুঃখ অপহৃত হয়, বঙ্গের সেই শিল্পের কিরূপ হীনদশা উপস্থিত হইয়াছে, পাঠকবর্গ এতৎ প্রস্তাব পাঠে অনায়াসেই তাহার উপলব্ধি করিতে পারিবেন। বঙ্গদেশের এমন কোন শিল্পজাত দ্রব্য নাই যাহা বিদেশে আগ্রহসহকারে নীত হইয়া

থাকে। পূর্ব্বে ঢাকা অঞ্চলের নানাবিধ মনোহর সূক্ষ্ম বস্ত্রসকল নানা দেশে প্রেরিত হইত, এক্ষণে তন্তুবায়গণ সে প্রকার উৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারে না, ঢাকাই জামদান নবাব সুবারা পাইয়া কত আনন্দ প্রকাশ করিতেন, এক্ষণে সে সকল বস্ত্রের নামমাত্র অবশিষ্ট হইয়াছে। দেশীয় শিল্পীগণ আপন আপন ব্যবসায় ভুলিয়া যাইতেছে। দেশীয় শিল্পীগণ এটি দেশের শ্রীবৃদ্ধির কি অবনতির চিহ্ন তাহা পাঠক অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন। এক্ষণে বঙ্গদেশের মধ্যে যে কিছু শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহা বঙ্গদেশ ছাড়িয়া বাহিরের মুখ দেখিতে পায় না। পূর্ব্বে যে যে শিল্পের সদ্ভাব ছিল, পাশ্চাত্য বাণিজ্য সংস্রবে তাহার যে মহত্তর অনিষ্ট ঘটিয়াছে, চিন্তাশীল লোকমাত্রেই তাহা অনুভব করিয়াছেন। ১৮৮২।৮৩-এর বঙ্গদেশীয় শাসন সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনীতে স্পষ্ট লিখিত হইয়াছে যে "ইংলণ্ড হইতে বাহুল্যরূপে বস্ত্রের আমদানী হওয়াতে দেশীয় উৎকৃষ্ট শিল্প ও যন্ত্রসকল বিনষ্ট হইতেছে।" পূর্ব্বের ন্যায় আর ঢাকায় মসলিন প্রস্তুত হয় না, এখানকার ঢাকাই তন্তুবায়গণ আর সে প্রকার সূতা প্রস্তুত করিতে পারে না। তাঁহারাও সম্পূর্ণরূপে ম্যাঞ্চেষ্টারের অধীন হইয়া পড়িয়াছে। দেশীয় তন্তুবায়ের সূতার কাজ প্রায় পরিত্যাগ করিয়াছে। বিলাত হইতে যে সকল সূতার আমদানী হয়, এখানকার তাঁতিরা তাহারই ব্যবহার করে। বস্ত্রবয়ণ কার্য্য প্রায় উঠিয়া গেল। এক্ষণে চটের থোলের ব্যবসায় তৎস্থান অধিকার করিয়াছে। কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানাদিতে চটের কলে খাটিয়া অধিকাংশ লোক জীবিকা উৎপাদন করে। এক্ষণে যে যে স্থানে যে যে সামান্য প্রকার দ্রব্য উৎপন্ন হয় তদ্বৃত্তান্ত লিখিত হইতেছে। বর্দ্ধমান বিভাগে কালনায় লালবাগানে যে সকল ধুতি ও শাড়ী প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহা এখনও উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রসিদ্ধ। বিলাতের বস্ত্রের আমদানিতে ইহারও ক্রমশঃ অবনতি হইতেছে। বর্দ্ধমান জেলায় ৯টা পাটের কল ও ৩টা কাপড়ের কল আছে। এই সকল কলে চট ও বস্ত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। রামপুর উপবিভাগে পাটের দড়ি অধিক হইয়া থাকে। গত বৎসর পাটের কলে ৭১৪৭৫৭ মণ দ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছিল। হাবড়ায় তুলার কলের কার্য্যের ক্রমশই হ্রাস হইয়া আসিতেছে। পশ্চিম অঞ্চলে তুলার কলে যেরূপ লাভ হইতেছে, হাবড়ার কলে সে রূপ হইতেছে না। কিন্তু চটের কলে উত্তমরূপ লাভ হইতেছে। পাটের গাঁইট কষার জন্যে ৩টি কোম্পানী হইয়াছে। বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলায় কতকগুলি লাক্ষার কারখানা আছে। এক বাঁকুড়ায় ৩৪টা লাক্ষার কল হইয়াছে। উক্ত জেলায় লাক্ষার ব্যবসায়ই প্রধান। বীরভূমে ইসলাম বাজার নামক স্থানে এ দেশীয়দিগের ৮টি লাক্ষার কারখানা আছে। এস্থলে বলাবাহুল্য যে বহির্বাণিজ্য সম্বন্ধে ঐ একটি পদার্থ এ দেশের প্রধান দ্রব্য। বর্দ্ধমান, হুগলী ও মেদিনীপুর অঞ্চলে ধাতু পাত অধিকাংশ প্রস্তুত হয়, তাহাও বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। ১৮৮২।৮৩ অব্দে বর্দ্ধমান জেলা হইতে আট লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার টাকার কাঁসা

বিলাতে প্রেরিত হইয়াছিল। ঐ অব্দে হুগলি হইতে ছয় লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার ও মেদিনীপুর হইতে আটাশ লক্ষ উনষাইট হাজার টাকার পিত্তল বিলাতে রপ্তানি হয়। বৰ্দ্ধমান জেলার মধ্যে কাঞ্চন নগর শিল্পের একটি প্রসিদ্ধ স্থান। তথায় ছুরি কাঁচি প্রভৃতি অস্ত্র সকল অতি উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়া থাকে। রাণীগঞ্জ ও বৰ্দ্ধমানের কাটরা বিভাগে কুম্ভকারের কার্য্যের কিছু কিছু উন্নতি আছে। বৰ্দ্ধমানের মধ্যে রঘুনাথ চক নামক স্থানে পোর্ট সিমেণ্ট প্রস্তুত করিবার একটি কারখানা হইয়াছে। উহার বাণিজ্যে কিছু কিছু লাভ হইতেছে। রাণীগঞ্জে উক্ত সিমেণ্ট করিবার জন্য একটি বৃহৎ কারখানা প্রস্তুত হইতেছে। ইহার কায্য অদ্যাপি আরম্ভ হয় নাই। বালির কাগজের কার্য্য-উত্তমরূপ চলিতেছে। ২৪ পরগণার মধ্যে ৩৪টি কল আছে। ঐ সকল কলে সাতাইশ হাজার লোক খাটিয়া থাকে। ঐ সকল কলে, থোলে, কাপড, সূতা, ইট, চাউল, তৈল, লাক্ষা প্রস্তুত হয়। কেরোসিন তৈলের আমদানি নিবন্ধন রেডি তৈলের আমদানি কলের কার্য্য মন্দ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উক্ত বিভাগে মৃৎপাত্র লৌহ ও পিত্তল পাত্র, অস্ত্রাদিও শৃঙ্গের কার্য্য বহুল পরিমাণে হইতেছে। শান্তিপুবেব উৎকৃষ্ট বস্ত্র ব্যবসায় বিলাতি বস্ত্রের আমদানি নিবন্ধন ক্রমেই অবনতি হইতেছে। বেশম প্রস্তুত কবিবার প্রধান স্থান মুর্শিদাবাদ। এ ব্যবসারও ক্রমে লোপ হইবার সূচনা হইয়াছে। নদীয়াতে রেশমের একটি কুটি আছে। বিলাতি সার্টিন ও অন্যান্য বস্ত্রের আমদানি হেতু এ ব্যবসায়টিও লোপ পাইতে বসিয়াছে। খুলনা জেলাতে মৃত্তিকাপাত্র পাটও অধিক জন্মে। কোন কোন স্থানে লবণও প্রস্তুত হইয়া থাকে। রাজসাহী ও কুচবিহার বিভাগ হইতে চটের থান ও থলে প্রস্তুত হইয়া জেলায় জেলায় আইসে। দিনাজপুব জেলাতেই উক্ত দ্রব্য অধিক প্রস্তুত হয। পাবনা জেলায় উত্তম বস্ত্রসকল হইয়া থাকে। এই ব্যবসাতে উক্ত জেলা ক্রমশঃ খ্যাতিলাভ করিতেছে। রাজসাহী ও রঙ্গপুরের পিত্তলের বাসন বিদেশে অধিক রপ্তানি হইয়া থাকে। দিনাজপুর, বগুডা জলপাইগুডি পাবনা প্রভৃতি জেলাতে নানা প্রকার মাদুরের ব্যবসা আছে! রঙ্গপুরের অন্তর্গত থানা বডবাড়ীতে হস্তিদন্তে অনেক দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়। রঙ্গপুরেও স্বর্ণ রৌপের নানা অলঙ্কার প্রস্তুত হয়। ঢাকা বিভাগে অধিক পাটের গাঁইট প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। বস্ত্রের বাণিজ্য অপেক্ষাকৃত বেশি হয় বটে কিন্তু পাটের তুল্য নহে। ঐ বিভাগে শঙ্খের কাজ, নারিকেল তৈল, চিনি, পিত্তলপাত্র, স্বর্ণ ও রৌপ্যের দ্রব্যাদি, মাদুর, সাবান, পনির ইত্যাদি অনেক দ্রব্য উৎপন্ন হয়। ইহা ভিন্ন নৌকা নির্ম্মাণ প্রভৃতি সূত্রধারের কার্য্য ও কুম্ভকারের কার্য্যও অধিক হয়।

এদেশীয়েরা কি উচ্চতর পদলাভের অযোগ্য। ২৪ বৈশাখ ১২৯১। ২৫ সংখ্যা

সম্পাদকীয়

যোগ্যতায় এ দেশীয়েরা উচ্চতম পদলাভের অযোগ্য নন, কেবল কতকগুলি দুর্দ্দয় ইংরাজের গর্ব্ব ও অভিমান ইহাদিগকে অযোগ্য করিয়া রাখিয়াছে। ঐ সকল ইংরাজ কোন বিষয়ে এ দেশীয়দিগের অধীনতা স্বীকারে সম্মত নহেন। এদেশীয়েরা যদি উচ্চে উঠিলেন, উঁহারা মনে করিলেন যেন নীচে পড়িয়া গেলেন। উঁহাদিগের হৃদয়জাত বিজাতীয় জাতীয় বিদ্বেষও এদেশীয়ের অধীনতা স্বীকার করিতে দেয় না। গবর্ণমেণ্টও স্বজাতি-বিরোধভয়ে এদেশীয়দিগকে ইংরাজের সমকক্ষভাবে উচ্চতম পদদানে সাহসী হন না। কিন্তু বাস্তবিক এদেশীয়েরা উচ্চতম পদলাভের অযোগ্য নন। কি হিন্দুর রাজত্ব, কি মুসলমানের রাজত্ব, কাহারই রাজত্বে, এদেশীয়েরা উচ্চতম পদলাভের অনধিকৃত ছিলেন না।

মুসলমানদিগের আধিপত্য কালে এদেশীয়েরা রাজ্যের সকল কার্য্যেই নিয়োজিত হইতেন। অন্য কথা কি, তাঁহাদিগের হস্তে মুসলমান সাম্রাজ্যের রক্ষার ভার ছিল। স্বদেশ বলিয়া তাঁহারা কখন সত্যের ও ন্যায়ের বিপরীত কার্য্য করিতেন না। মুসলমান সম্রাটগণ দেশীয়দিগের হস্তে রাজ্যশাসনের ভার প্রদান করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন। ন্যায়পরতা ও রাজভক্তি হিন্দুচরিত্রের অকাট্য প্রমাণ। মুসলমান রাজারা হিন্দুদিগকে কোন বিষয়ে অবিশ্বাস করিতেন না। কিন্তু বিদেশীয় রাজা বলিয়া ইংরাজের রাজত্বে প্রথম অবধিই বিপরীত ব্যবহার দেখিতেছি। স্বদেশীয়ের ও স্বজাতীয়ের প্রতিপালন ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের যে মুখ্য উদ্দেশ্য, তাহা আমরা এদেশে ইংরাজি রাজত্বের সূত্রপাত অবধি দেখিয়া আসিতেছি। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির যখন এদেশে প্রথম রাজত্বলাভ হয়, তখনও তাঁহারা স্বজাতীয়দিগে: সুবিধার অন্বেষণ করিতেন। উচ্চপদগুলি তাঁহাদিগকেই দিতেন। তাহাতে ইংলণ্ডের বহু নিরন্ন লোকের অন্ন সংস্থান হইত, এদেশীয়দিগকে সামান্য বেতনে সামান্য পদে নিয়োজিত করিতেন। লর্ড বেণ্টিঙ্ক অতি মহাত্মা লোক ছিলেন। তাঁহারই দেশীয়দিগকে উন্নত পদে নিয়োজিত করিবার প্রথম যত্ন জন্মে। তিনি এ দেশীয়দিগের উন্নতভাবে দেওয়ানি বিচারপতি পদলাভ প্রথার প্রথম সৃষ্টি করেন। ইহার পুর্ব্বে দুই প্রকার দেশীয় বিচারালয় ছিল। তাঁহারা সামান্য মাত্র ক্ষমতা পরিচালন করিতে পারিতেন। বিচারপতিদিগের বেতনও অতি সামান্য ছিল। উচ্চ শ্রেণীর বিচারপতিরা সদর আমীন ও নিম্ন শ্রেণীর বিচারপতিরা মুন্সেফেরাই ইহার পুর্ব্বে কমিশনরের কার্য্য করিতেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস এই পদের সৃষ্টি করেন। ইউরোপীয় বিচারপতিগণের সুবিধা করাই এ পদটী সৃষ্টি করিবার প্রধান উদ্দেশ্য। ১৮০৩ অব্দে সদর আমীন পদের সৃষ্টি করা হয়। সদর আমীনদিগের ১০০৲টাকার পর্য্যন্ত মকদ্দমা

করিবার ক্ষমতা ছিল। ১৮২১ অব্দে মুন্সেফ ও সদর আমীনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয়। তাহাতে মুন্সেফেরা ১৫০ টাকার ও সদর আমীনেরা ৫০০ টাকা পর্য্যন্তের মকদ্দমা নিষ্পন্ন করিতে পারিতেন। ১৮২৭ সালে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ঐ সকল এদেশীয় বিচারপতির বেতন বৃদ্ধি করিয়া সংখ্যা ও ক্ষমতার বৃদ্ধি করিয়া দেন ঐ সময়ে প্রধান সদর আমীন পদের সৃষ্টি হয়। প্রধান সদর আমীনেরা যত অধিক টাকার হউক মকদ্দমায় নিষ্পত্তি করিতে পারিতেন। তাঁহাদের নিষ্পাদিত মকদ্দমার পুনর্ব্বিচার জন্য ইউরোপীয় বিচারপতিদিগের নিকট আপীল করিবারও রীতি ঐ সঙ্গে প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছিল। ১৮৬০ অব্দে সর জন পিটর গ্রাণ্টের উদ্যোগে বঙ্গদেশে ছোট আদালত সমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়। পর বৎসর ছোট আদালতের জজ ও প্রধান সদর আমীন পদের বৈষম্য উঠাইয়া দেওয়া হয়। তৎকাল অবধি প্রধান সদর আমীনেরা সুবার্ডিনেট জজ বলিয়া নির্দ্দেশিত হন। তাঁহারা দেওয়ানী বিচারকার্য্য করেন, ছোট আদালতের বিচার কার্য্যও নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।

১৮৩৩ অব্দে ৯ আইন হইলে অচিহ্নিত ডেপুটী কালেক্টরের পদের সৃষ্টি হয়। তৎকালে কেবল এতদ্দেশীয় লোককেই ঐ কার্য্যে নিয়োজিত করিবার নিয়ম করা হইয়াছিল। ১৮৪৩ অব্দে দশ আইন হইয়া ঐ পদে সকল জাতির ও সকল ধর্ম্মাবলম্বির তুল্য অধিকার দেওয়া হয়।

ভারতের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনেরল মহানুভব লর্ড বেণ্টিঙ্ক ১৮৩১ অব্দে এতদ্দেশীয়দিগের উন্নতপদে উত্থিত হইবার প্রথম সোপান সংঘটন করিয়া যান। তৎপূর্ব্বে কোন দেশীয় ব্যক্তি এরূপ উন্নত পদে অভিসিক্ত হন নাই, হইবেন এরূপ আশাও ছিল না। যাহা হউক, এখন আমাদের প্রশ্ন এই, মাহাত্মা লর্ড বেণ্টিঙ্কের যত্নে এদেশীয়েরা উন্নত পদে অভিসিক্ত হইয়া অবধি গবর্ণমেণ্টের উত্তরোত্তর সাহায্য করিয়া আসিতেছেন কিনা? আমরা ত দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছি, ভারতবাসিরা উচ্চ পদ লাভ করাতে কেবল ভারতের নয়, গবর্ণমেণ্টেরও রাজ্য কার্য্যের বিলক্ষণ মঙ্গল হইয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশের মধ্যে যে সকল দেশীয় কৃতবিদ্য গবর্ণমেণ্টের অধীনে কার্য্য করিতেছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই বিচার বিভাগে নিযুক্ত হইয়াছেন। যে কার্য্যে অধিক দায়িত্ব, সেই কার্য্যেই এতদ্দেশীয় কৃতবিদ্যগণ অগ্রসর। তাহারা সুবিচার করিতেছেন কি অন্যায় বিচার করিতেছেন, তাহা গবর্ণমেণ্ট বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন। বিচার কার্য্যে কিরূপ গুরুতর পরিশ্রম করিতে হয়, এবং এই বিভাগে প্রবিষ্ট হইতে হইলে কতদূর কার্য্যদক্ষতার প্রয়োজন, তাহা কে না অবগত আছেন? যাঁহারা এ বিভাগে কার্য্যদক্ষতার পরিচয় দিয়া প্রশংসাভাজন হইতেছেন, তাঁহারা যে অন্য বিভাগে কার্য্যদক্ষতার পরিচয় দিতে পারেন না, ইহা কি সম্ভাবিত? অন্য উচ্চতম বিভাগের কার্য্যভার দিয়া কি পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে। অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে গবর্ণমেণ্ট কয়

জন দেশীয় ব্যক্তিকে অন্য বিভাগে উচ্চতম পদে অধিকার দিয়াছেন? আমরা বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের অধীন রাজপদগুলির নামোল্লেখ করিতেছি, পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া বলুন, এ দেশের কয়জন লোক ঐ সকল পদের মধ্যে উচ্চতম পদে অধিকার লাভ করিয়াছেন?

লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর	১
প্রাইবেট সেক্রেটারি ও এডিকং	২
সেক্রেটারি, জএণ্ট ও অণ্ডার সেক্রেটারি	১৩
হাইকোর্টের বিচারপতি	১২
রেবিনিউ বোর্ডের মেম্বার	২
হাইকোর্টের রেজিষ্ট্রার	২
সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং লিগ্যাল রিমেম্বে্রসর	১
ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও লিগ্যাল রিমেম্বে্রসর	১
কষ্টম কালেক্টর	১
আসিষ্টাণ্ট কষ্টম কালেক্টার ও হেড এপ্রাইজর	১
সালকিয়ার নিমকের গোলার রিপ্রিজেণ্টেটিভ	১
সর্ব্বিসের সুপারিণ্টেডেণ্ট	১
কলিকাতা পোষ্ট অফিসের ও শিপিং মাষ্টার	১
ডেপুটি শিপিং মাষ্টার	১
সহকারী ঐ	১
ষ্ট্যাম্প ও ষ্টেশনারির সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট	১
রেজিষ্ট্রেসনের ইনস্পেক্টর জেনেবল	১
রেজিষ্টরি অফিসের ইনস্পেক্টর জেনেরল	২
রেজিষ্টারি অফিসের ইনস্পেক্টর	১
কলিকাতা ডিষ্ট্রিক্ট রেজিষ্ট্রার	১
কলিকাতার কালেক্টার ও আবগারি রেবিনিউ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট	১
পুলিষ কমিসনর ও কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল সভাপতি	১
পুলিষের ডেপুটি কমিশনর প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেট	২
পুলিষ ইনস্পেক্টর জেনেরল	১
পুলিষ ইনস্পেক্টর জেনেরলের সহকারী	১
পুলিষের ডেপুটী ইনস্পেক্টর জেনেরল	২
জেল ইনস্পেক্টর	১
জেল ইনস্পেক্টর জেনেরলের সহকারী	১

জেলের শিল্পকার্য্যের সুপারিণ্টেডেণ্ট	...	...	১
জেলের সুপারিণ্টেডেণ্ট	...	...	২
স্বাস্থ্য কমিশনার	...	...	১
ছোট আদালতের জজ রেজিষ্ট্রার প্রধান অফিসর		...	৫
বিদেশে প্রেরিত কুলি সুপারিণ্টেডেণ্ট	..	...	১
পুলিষ চিকিৎসা সংক্রান্ত ইনস্পেক্টর	...	...	২
শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার	..	..	১
স্কুল ইনস্পেক্টর	...	...	২
প্রেসিডেন্সি, সংস্কৃত, মাদ্রাসা প্রভৃতি কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকগণ			২৫
রয়াল বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেডেণ্ট	..	...	১
মিটিয়রলজিকাল রিপোর্টার	..	...	১
গবর্ণমেণ্ট আর্কিটেক্ট		...	১
গবর্ণমেণ্ট ছাপাখানার সুপারিণ্টেডেণ্ট		...	১
একাউণ্টাণ্ট জেনেরল ও ডেপুটি ও সহকারী একাউণ্টাণ্ট জেনেরল		...	৪
পুলিষ সর্জ্জন	.	.	১
কলিকাতার স্বাস্থ্যদর্শী	...	...	১
শিল্পবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ	...	..	১
কলিকাতার লর্ড বিশপ	...	...	১
কলিকাতার আর্চ্চডিকন	...	...	১
বঙ্গদেশের সর্জ্জন জেনেরল	...	...	১
মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ, অধ্যাপক প্রভৃতি	..	..	১৫
গোবীজে টীকা প্রদানের সুপারিণ্টেডেণ্ট	.	.	১
গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালী অনুবাদক	...	...	১

সাধারণ আইনের অন্তর্ভূত জেলা

বিভাগীয় কমিশনর	..		৮
জেলা ও সেসন জজ	...	...	২৮
জেলার জজ ও সহকারী সেসন জজ	..	.	১
১ম শ্রেণী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর	..	...	১৫
২য় ঐ ঐ ঐ	...	...	১৫
৩য় ঐ ঐ ঐ	...	...	৭
১ম শ্রেণীর জএণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর		...	২৩

১ম শ্রেণীর প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর		...	৪
২য় শ্রেণীর জএন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর		...	১২
সহকারি মাজিষ্ট্রেট	...	...	৮৯
ক্যাণ্টনমেণ্ট ঐ	...	...	৩
ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর	...	...	২৩৩
সব ডেপুটি কালেক্টর	...	...	৭৭
যশোহর ও নদীয়ার ছোট আদালত সমূহের প্রধান বিচারপতি		...	১
ছোট আদালতের জজ ও সুবর্ডিনেট জজ	...	...	৪৯
মুন্সেফ	...	...	২৩৫
বিশেষ সব রেজিষ্ট্রার	...	...	১৮
রুরাল সব রেজিষ্ট্রার	...	...	১৭৩
পুলিষের ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট	...	...	৫১
সহকারী ঐ ঐ	..	...	৩৭
স্কুল ইনস্পেক্টর	...	...	৪
কালেজ সমূহের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক	...	...	২৮

সাধারণ নিয়মের বহিভূর্ত জেলা

কমিশনর	...	...	১
বিচার সংক্রান্ত কমিশনর	..	...	১
প্রথম শ্রেণীর ডেপুটি কমিশনর	. .	...	২
২য় ঐ ঐ	...	...	৩
৩য় ঐ এ	...	...	৬
৪র্থ ঐ ঐ	...	.	১
১ম শ্রেণীর সহকারী কমিশনর	...	..	৩
২য় ঐ ঐ ঐ	...	...	২
৩য় ঐ ঐ ঐ	...	..	১

এখন পাঠক অনুসন্ধান করিয়া দেখুন, উপরি পরিগণিত উচ্চতম পদগুলিতে এদেশীয় কয়জন অধিকার লাভ করিয়াছেন? আমরা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতেছি, নিম্নপদে এদেশের যে সকল লোক নিয়োজিত আছেন, তাঁহারা যখন প্রশংসার সহিত স্বকর্ত্তব্যকার্য্য সম্পাদন করিয়া কার্য্য শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা ও পারদর্শিতা লাভ করিতেছেন, তখন তাঁহারা উচ্চতম পদে অধিষ্ঠিত হইলে যে স্বকর্ত্তব্য সম্পাদনে সমর্থ

হইবেন না, ইহা সম্ভাবিত নহে। কেবল কতগুলি অমুন্নতমনা ইংরাজের অভিমানই এদেশীয়দিগের উচ্চতম পদ লাভের বিরোধী হইয়াছে। এতএব যাহাতে সেই অভিমান আর কার্য্যকারী না হইতে পাবে, এ দেশের জনসাধারণের চেষ্টা পাওয়া কর্ত্তব্য। পার্লামেণ্ট সভার আশ্রয় গ্রহণ ব্যতিরেকে অন্য উপায় নাই। ঐ সভায় বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত করা আবশ্যক। যদি জাতি ও ধর্ম্মাদির বিচারবিহীন হইয়া যোগ্যতা অনুসারে সমভাবে উচ্চতর পদদান করা না হয়, ইংলণ্ডেশ্বরীর ১৮৫৮ অব্দের ঘোষণা বিফল হইয়া যায়। ঘোষণায় কেবল বৈফল্য নয়, ইংরাজ রাজনীতি পক্ষপাতদোষে দূষিত, এ কলঙ্কের বিলোপ হইবে না। এত বড সভ্যতম ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের এ কলঙ্ক থাকা কোনক্রমেই শোভা পায় না।

বঙ্গে দুর্ভিক্ষ। ৮ পৌষ ১২৯১। ৬ সংখ্যা

নিদারুণ অনশন আইন আবাব,
আবাব ভীষণ রোলে
বঙ্গের কোমল কোলে
পড়িল কালের বজ্র, উঠে হাহাকার।
ভীমবেশে এলোকেশে বিস্তার বসনা,
কঙ্কাল ধবিয়া করে
একে একে নৃত্য করে
অতি ঘোব শঙ্কাময়ী নিয়তি যাতনা।
সুকুমার শিশুলতা অকালে শুকায়,
পড়িয়া নাথের বুকে
প্রিয়া মরে অন্নদুখে,
বাঙ্গালা শ্মশান বুঝি হল এ ধরায়!
স্নেহময়ী মাতা কাঁদি উদর জ্বালায়
পুত্র মুখ পানে চায়,
উপায় না পায় হায়
পুত্র কাঁদে উচ্চস্বরে মাতার ব্যথায়।
দেখিতে দেখিতে গৃহ শূন্য হয়ে যায়,
পিতা কোলে ভগ্নি ভ্রাতা,
পুত্র কোলে মৃতমাতা;
নৃত্য করে কাল দূত হাসে উভ রায়।

অহে ধনি। বড় সুখে কাটাতেছ কাল
যাতনার একেশেষ
অন্নভাবে কত ক্লেশ
কখন পাওনি তুমি ভোগনি জঞ্জাল।
তিলেক বিলম্ব হলে আহার সময়
(কি জ্বালা উদরে জ্বলে
প্রাণ জ্বলে ক্ষুধানলে)
নিজ দশা ভেবে অন্যে দিও গো আশ্রয়।
স্তূপাকার অর্থপরে বসিয়াছ সুখে
পুত্র কন্যা পিতা মাতা
হেসে খেলে ভগ্নি ভ্রাতা।
জান না হে মরে কত হত্যভাগ্য দুখে।
জীবনের অঙ্ক সবে ফুরাতে তোমার
ছাড়িয়া চলিবে ভব,
প্রাণের কুমার তব
সাধের শরীরখানি করিবে অঙ্গার।
তুমি কার কে তোমার মজো না মায়ায়,
সঙ্গে কিছু নাহি যাবে
সঙ্গে কারে নাহি পাবে,
একা এলে হবে যেতে একাকী তোমায়।
প্রমোদ কাননে হাস,
রঙ্গ রস ভাল বাস,
দেখ, কত নর • ারী অন্নাভাবে মরে।
ভুলে না বুঝিলে কভু পর উপকার
কখন দুখীর পানে
চাওনা ব্যাকুল প্রাণে
চরমে কি হবে তব ভাব একবার।
জনক জননী তব নন্দন নন্দিনী
যেমন ব্যাকুল হলে
ভাস তুমি আঁখি জলে,
অন্ধকার দেখ দুখে অখিল মেদিনী
তেমনি তাদের দুখে হইও সদয়।

রঙ্গ রস তেয়াগিয়া
এক মুষ্টি অন্ন দিয়া
এই হতভাগাগণে রেখ ধনাশয়।

বঙ্গেশ্বর। তুমি নাকি বড বিচক্ষণ,
বিষম দুর্ভিক্ষদাপে
সমগ্র বাঙ্গালা কাঁপে
তুমি বড় ভাবিবার নাহি প্রয়োজন।

তুমি সুখে আন ঘরে প্রচুব বেতন
বঙ্গেতে পডিলে বাজ
তব দুখে কিবা কাজ
হয় হোক মরুভূমি বঙ্গ নিকেতন।

তোমার বুদ্ধির গুণে অহে বঙ্গেশ্বব।
বাঙ্গালা শ্মশান হলে
ভিক্টোরিয়া পদতলে
দিও উপহার শেষে কঙ্কাল নিকব।

ইংরাজের বড প্রিয় তুমি টমসন,
বাঙ্গালিব প্রতি কেন
তুমি হে নিদয হেন,
যায় মুছে বঙ্গ রাজ্য কর দরশন।

করিতে হবে না তব নিজ অর্থব্যয
এই ভারতের ধন
কর তুমি সমর্পণ
নিজ রাজ্য রাখ রাজা ধব সদুপায়!
কোথা মা ইংলণ্ডেশ্বরী! চাও একবার
ধুয়ে মুছে রাজ্য যায়
কেহ ফিরে নাহি চায়
সোণার বাঙ্গালা শেষে হল মরুসার।
শ্মশান বাঙ্গালা হল কি হবে উপায়
স্বর্ণ প্রসূ এই দেশ
মরু হলো অবশেষ!
হে রিপণ এ সময় চলিলে কোথায়?

হতভাগ্য নরনারী হারায় জীবন,
ভীষণ দুর্ভিক্ষ পাপ
বঙ্গে করে বড় দাপ ;
তুমি এর সদুপায় কর নির্ব্বাচন।
বিদায়ের কালে প্রভো মেলিয়া নয়ন
দেখ বাঙ্গালী মুখ
বিষাদে গলিবে বুক ;
বীর ভূমি বর্দ্ধমানে কি হয় এক্ষণ।
পুরবাসী সবে আজি আনন্দে পাগল ;
এ ভীম সংবাদ আর
প্রাণে নাহি পসে কার
শ্মশান নিকটে তবু হয় না বিকল।
তবু যত নর পশু মত্ত রঙ্গরসে,
বহু ক্লেশে অকাতরে
কতই উৎসব করে !
গোরু কেটে জুতা দান করে সব বসে !
স্বার্থপর বঙ্গবাসি নিজ স্বার্থ চাও !
নিঃস্বার্থ প্রেমের ধার
শিক্ষা নাহি হয় কার,
স্বার্থ হেতু উৎসবে পরাণ মাতাও !
স্বার্থ ভিন্ন বঙ্গবাসী চলে না কখন।...

সংবাদ। ২৮ মাঘ ১২৯১। ১৩ সংখ্যা

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জাহাজ'

কলিকাতার প্রসিদ্ধ বাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বড একটী আনন্দের সংবাদ সাধারণের গোচর করিতেছেন, সাধারণের ব্যবহারার্থ 'ভারত' নামে আর একখানি নূতন জাহাজ হইতেছে। তিনি লিখিয়াছেন--

"লর্ড রিপণ নামক জাহাজ খুলনা হইতে বরিশাল পর্য্যন্ত একদিন অন্তর যাতায়াত করিতেছে। প্রবল জাহাজ চালাইতে পারা যাইবে কি না আমার সন্দেহ ছিল। কিন্তু বরিশাল ও খুলনা অঞ্চল নিবাসী লোকের স্বদেশের উপর এবং স্বদেশীয় অনুষ্ঠানের উপর যেরূপ আন্তরিক টান দেখিলাম তাহাতে চমৎকৃত হইয়াছি। একদিন দৈববশতঃ

বাগেরহাটে লর্ড রিপণ পৌছিতে এক ঘণ্টা বিলম্ব হয়। সেদিন বাদলার দিন। ফ্লটিলা কোম্পানীর জাহাজ সময় মত পৌছিলে যাত্রিগণের একপ্রাণীও তাহাতে না গিয়া সমস্তক্ষণ বৃষ্টিতে ভিজিয়া লর্ড রিপণ জাহাজের প্রতীক্ষায় ঘাটে দণ্ডায়মান ছিলেন। লর্ড রিপণ পৌছিলে উৎসাহের সহিত তাঁহারা তাহাতে উঠিলেন। কেহ কেহ এরূপ স্থির করিয়াছিলেন বরং ফিরিয়া যাইবেন তথাপি ফ্লটিলার জাহাজে যাইবেন না। এরূপ চমৎকার কাণ্ড, এরূপ একতা, এরূপ জাতীয় অনুরাগ বোধ হয় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে অসম্ভব বলিয়া বোধ হইত। শুধু বাগেরহাট কেন, সকল স্থানেরই লোক ঘরের কাজ মনে করিয়া সাহায্য করিতেছেন ও অসীম উৎসাহ প্রকাশ করিতেছেন।

এক্ষণে আমি তাঁহাদের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া ভারত নামক আর একখানি জাহাজ সত্বর খুলনায় পাঠাইবার সঙ্কল্প করিয়াছি।

সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে আগামী সোমবার হইতে 'ভারত' ও 'ভারত বন্ধু রিপণ' উভয়ে মিলিয়া প্রতিদিন তাঁহাদের কাজে নিযুক্ত থাকিবেন।"

দেশীয় লোকের কার্য্যের প্রতি এদেশীয় লোকের যে এত অনুরাগ বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা আমরা জানিতাম না, তাই এই সংবাদটী পাইয়া আমরা এত আহ্লাদিত হইলাম।

বাঙ্গালীর দারিদ্র্য। ৯ ভাদ্র ১২৯২

কোন জাতির দারিদ্র্য বলিতে মোটামুটি আমরা সেই জাতির ধনাভাব বুঝি। ধন কাহাকে বলে? স্বর্ণ রৌপ্যের মুদ্রা বিশেষকে কি ধন বলে? না, কেবল বিনিময়ের সুবিধার জন্য মুদ্রা, গবর্ণমেণ্ট নোট প্রভৃতির সৃষ্টি। কোন জাতির জীবন ধারণোপযোগী ও সাংসারিক অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদার্থ সমূহকে এবং সেই সকল পদার্থ উৎপাদন ও প্রস্তুত করণোপযোগী উপকরণ সমূহকে জাতীয় ধন বলে, অতএব জাতীয় দারিদ্র্য বা ধনাভাব বলিলে প্রকৃতপক্ষে মুদ্রার অভাব বুঝায় না। জাতীর জীবন রক্ষণোপযোগী দ্রব্য সমুহের অভাব বুঝায়। তবে সাধারণ ভাবে মুদ্রাকেই লোকে ধন বলে; কারণ বিনিময়াত্মক থাকিলেই প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাওয়া যায়; সেইজন্য মুদ্রা ও ধন একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক্ষণে বাঙ্গালীর দারিদ্র্যের বিষয় আলোচনা করা এ-প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। তাহা হইলে বাঙ্গালী জাতির কয় প্রকার উপজীবিকা আছে, কি কারণে সেই সকল উপজীবিকার ব্যাঘাত বা অভাব হইতেছে, তাহাই অগ্রে দেখা কর্ত্তব্য। ঐরূপ ভাবে আলোচনা করিলে বাঙ্গালীর প্রকৃত দারিদ্র্যের কারণ নির্ণীত হইবে। কেহ এরূপ আপত্তি করিতে পারেন—জাতীয় দারিদ্র্যের বিষয় সাধারণভাবে আলোচনা করিলেই বাঙ্গালীর দারিদ্র্যের হেতু বুঝা যাইত। বাঙ্গালীর দারিদ্র্যের সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনার আবশ্যকতা কি? তদুত্তরে এই বলি, বাঙ্গালী পরাধীন জাতি; বঙ্গদেশের প্রকৃতি ও বাঙ্গালীর স্বভাব সামর্থ্য, আচার ব্যবহার

ধর্ম্ম ইত্যাদি ভেদে, উপজীবিকার প্রভেদ আছে। সুতরাং অন্য ধর্ম্মাবলম্বী স্বাধীন জাতির সহিত বাঙ্গালীর জাতীয় দারিদ্র্যের হেতু সমূহের অনেক স্থলে মিল নাই। এ সমস্ত বিষয় করিয়া বুঝাইতেছি।

সর্ব্বাগ্রে বাঙ্গালীর উপজীবিকা বিভাগ করা যাইতেছে।

১ম। সামান্য ব্যবসা বাণিজ্য; এই শ্রেণীতে আড়তদার গোলাদার দোকানদার হইতে সামান্য মুদি ও ফেরিওয়ালা পর্য্যন্ত এবং যাহারা নগদ টাকা ও ধান্য ইত্যাদির তেজারত করে, সে সমস্তই বুঝিতে হইবে। কারণ ইহারা সকলেই একটা মূলধন লইয়া লাভ লোকসানের দায়িত্ব স্বীকারে জীবিকা অর্জন করে।

২য়। ভূসম্পত্তির উপস্বত্ব ভোগ, এই বিভাগে জমীদার পত্তনীদার, তালুকদার, জোতদার, গাঁতিদার, বৃত্তি ব্রহ্মোত্তর ভোগী ও কৃষক শ্রেণী বুঝিতে হইবে। কারণ ঐ সকল সম্প্রদায় ভূমির উপস্বত্ব ভোগ দখল দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

৩য়। দৈহিক ও মানসিক শ্রম বিক্রয় অথবা চাকুরি, হাইকোর্টের জজ হইতে সামান্য মুটে মজুর, চা বাগান অথবা রেলওয়ে প্রভৃতিতে নিযুক্ত কুলি ইত্যাদি সকলকেই বুঝিতে হইবে। উকীল, মোক্তার, ডাক্তার প্রভৃতিও এই শ্রেণীভুক্ত। কারণ উহারা সকলেই অপরের কার্য্য উপকার সাধন অথবা অভাব মোচন জন্য নিরূপিত মাসিক সাপ্তাহিক, দৈনিক বা উপস্থিত বেতন গ্রহণে নিয়োগকর্ত্তার রুচি অনুসারে শ্রম বিক্রয় করিয়া গ্রাসাচ্ছাদন ও সাংসারিক অভাব দূর করে।

৪র্থ। জাতীয় ব্যবসাযোগে জীবিকা-শিল্পী, ইহাতে পুরোহিত, ধোপা, নাপিত, তন্তুবায় কর্ম্মকার, সূত্রধর, কাংসকার, গন্ধ ও সুবর্ণবণিক প্রভৃতি বুঝায়। কারণ উহারা প্রাচীনকাল হইতে কার্য্য ব্যবসায়ভেদে সেই জাতি বা শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে, সেই হেতু পুরাকালপ্রতিষ্ঠিত জাতীয় কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

৫ম। তোষামোদ, ভিক্ষা ও উঞ্ছবৃত্তি চাটুকার, পরভোগ্যোপজীবী, ভিক্ষুক, পরমুখাপেক্ষী, উঞ্ছবৃত্তিধারী, পরতেজস্বস্তু সংগ্রহ করিয়া দিনপাত করে। নিতান্ত অক্ষমতায়, ধর্ম্মের জন্য অথবা আলস্য পরবশ হইয়া অনেকে ঐরূপ ঘৃণিত বৃত্তি অবলম্বন করে।

জীবিকা নির্ব্বাহ জন্য অধুনা আরও কয়েকটী পন্থা অবলম্বিত হইতেছে। পুরাকালে হিন্দুজাতির মধ্যে এরূপ কুপ্রবৃত্তিমূলক জঘন্য বৃত্তি অবলম্বিত হইত, এরূপ বোধ হয় না।

৬ষ্ঠ। আত্মবিক্রয় অথবা ধর্ম্মবিক্রয়, বেশ্যাবৃত্তি, বিবাহের কন্যা বিক্রয় ও বি এ, এম-এ পাশযুক্ত পুত্রের প্রভূত পণ গ্রহণ, শিষ্যের নিকট গুরুর অর্থ গ্রহণ; এ সকল বৃত্তি প্রাচীন সমাজে বড় প্রচলিত ছিল না। হিন্দুশাস্ত্রে ঐরূপ বৃত্তি অবলম্বনে বিশেষ নিষেধ আছে ও ঘোর অধর্ম্ম বলিয়া দণ্ডের বিধান আছে।

৭ম। প্রতিভা বিক্রয়: এই বিভাগে প্রতিভাসম্ভূত কাব্য নাটক নভেল বিক্রয়,

বিজ্ঞান রসায়নশাস্ত্র ধর্ম্মশাস্ত্র অথবা উপদেশপূর্ণ কোনরূপ সাময়িক পত্রাদি বিক্রয় দ্বারা আবিষ্কর্ত্তা, প্রণেতা রচয়িতা যে স্বত্ব ভোগ করেন, সেই স্বত্বাধিকারিগণকে প্রতিভাবিক্রেতা বলা যায়। পুরাকালে এ প্রথাটি প্রচলিত ছিল না। ঐ সকল বৃত্তি ব্যতীত চৌর্য্য, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি বৃত্তি কেহ কেহ অবলম্বন করেন। কিন্তু সাধারণ বা প্রকাশ্যবৃত্তি নহে বলিয়া উহাকে বৃত্তি মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে না।

এক্ষণে উল্লিখিত উপজীবিকা বিভাগের ব্যাঘাত সংঘটন কিভাবে হইতেছে, তাহাই দেখান যাইতেছে।

প্রথমতঃ আমাদের দেশে ব্যবসায় বাণিজ্য আছে, কিন্তু সামান্য পরিমাণে। বৈদেশিক বা আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যই ধনাগমের প্রধান উপায়। কিন্তু সেরূপ বাণিজ্য বা সওদাগরি আমাদের দেশে নাই। ভিন্ন জাতীয় ভিন্নদেশীয় লোকের হস্তে ঐরূপ বাণিজ্য একচেটে হইয়া রহিয়াছে। সেই জন্য এদেশজাত দ্রব্যাদি অন্যদেশে রপ্তানি করিয়া ও ভিন্ন দেশের দ্রব্যাদি এই দেশে আমদানি করিয়া প্রভূত লাভ করিতেছে। আমাদের দেশে যে শ্রেণীর লোকে ব্যবসায় করে, তাহারা লাভাংশ সামান্য পরিমাণে পায়। আজকাল আবার তাহাতে প্রতিযোগিতাও বিস্তর হইয়াছে। এক দ্রব্যের প্রয়োজনে অতিরিক্ত ব্যবসাদার হইয়াছে। সুতরাং যাহা কিছু লাভাংশ তাহাও শত শত সহস্র ভাগে বিভক্ত হইয়া কাহারো অভাব বিদূরিত হয় না। তবে ঐ উপায় অবলম্বনে সামান্য সামান্য সংখ্যক লোকের উন্নতি দেখা যায়, যে উন্নতি ব্যক্তিগত, জাতীয় উন্নতি নহে। বৈদেশিক বাণিজ্যের আমদানির ও রপ্তানির হরণ পূরণ হইয়া যে পরিমাণ দ্রব্য বেশী রপ্তানী হয় সেই পরিমাণ জাতীয় ধনের ক্ষয় হয় ও ক্রমে লোক দরিদ্র হয়। আবার ঐ বৈদেশিক বাণিজ্য সম্ভূত লাভাংশ বিদেশেই সঞ্চিত ও ব্যবহৃত হয়, সুতরাং এদেশের তাহাতে কোন লাভ নাই, বরং ক্ষতি আছে।

দ্বিতীয়তঃ, জমিদার, তালুকদার, পত্তনীদার, প্রভৃতি যাঁহারা উক্ত শ্রেণীর ভূস্বত্বাধিকারী, তাঁহাদেরও অনেক সুবিধা ঘটিয়াছে। কৃষক শ্রেণী বা প্রজা স্বচ্ছল থাকিলে জমিদারের লাভাংশ পাইতে কোন ব্যাঘাত ঘটে না। অধুনা কৃষক শ্রেণীর বড় শোচনীয় অবস্থা। মধ্যে মধ্যে অজন্মাহেতু ইহারা দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই অজন্মা ভূস্বত্বাধিকারীদিগের উপজীবিকার প্রধান প্রতিবন্ধক। এই অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক ঘটনা বশতঃ হয়। সে বৎসর দেশের যে কতদূর ধনক্ষয় হয় তাহা সকলেই অনায়াসে বুঝিতে পারেন। এইরূপ ধনক্ষয় আজকাল ভারতের কোন না কোন প্রদেশে প্রতি বৎসরই ঘটিতেছে। এইরূপ দুর্ঘটনায় কৃষক শ্রেণীর এত অপ্রতুল যে কাল কি খাইবে, এমন খাদ্যও ঘরে সঞ্চয় করিতে পারে না। এক এক জন কৃষক ভূমিকর্ষণ দ্বারা যাহা উৎপন্ন করে, তাহাতে তাহার পারিবারিক জীবিকানির্ব্বাহ ও অভাবমোচন হইয়া কিছুই সঞ্চয় থাকে না। বরং অনেকস্থলে আয়ের

অতিরিক্ত ব্যয় হয়, সুতরাং মহাজনের বা জমিদারের নিকট দেনাদার হয়। ইহার উপর যদি অজন্মা হইল তবে আগামী পাঁচ বৎসরে ও বহু চেষ্টায় নিজ অবস্থার সংশোধন করিতে পারে না। ক্রমে তাহাদের হাল গরু জমি বিক্রয় হইয়া যায়, দুর্দ্দশার চরমসীমায় উপস্থিত হয়। এদেশের পক্ষে কৃষকই যথার্থ ধনউৎপাদক। সে শ্রেণীর এরূপ দুর্দ্দশা হইলে, দেশেরও দুর্দ্দশা, উপস্থিত জমিদার, তালুকদারেরও দুর্দ্দশা। ইহার উপরে আবার গবর্ণমেণ্টের আইন কানুনের উপসর্গে এই দারিদ্র্যরোগ আরও বর্দ্ধিত হয়। সে সমস্ত কথা দারিদ্র্য উপসর্গ বিভাগে বলিব। বৈজ্ঞানিক শিল্পপ্রধান দেশে এরূপ দুর্দ্দশা ঘটে না। কারণ বৈজ্ঞানিক ও কল কারখানার কার্য্যের উপর প্রাকৃতিক বা দৈব ঘটনার আধিপত্য নাই। অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি হউক, তাহাতে মেসিনারির বল ও কার্য্য সমান ভাবেই হইতে থাকে। সেই জন্য শিল্পপ্রধান দেশ ধনী এবং কৃষকপ্রধান দেশ দরিদ্র।

তৃতীয়তঃ, শ্রমবিক্রয় অর্থাৎ চাকুরি কিম্বা মুটে-মজুরিতে অনেকে অনেকটা সুবিধা বিবেচনা করেন কিন্তু ঐ কার্য্যে এত লোকের প্রবৃত্তি হইয়াছে, চাকুরির জন্য লোক লালায়িত যে, প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রার্থী হইয়াছে সুতরাং চাকুরির বাজার সস্তা হইয়াছে। শ্রমবিক্রয়ে এক্ষণে যে অর্থ মিলে তাহাতে দারিদ্র্য কিছুমাত্র অন্তর্হিত হয় না। আবার শ্রমবিক্রয়ের উৎকৃষ্টাংশ রাজপুরুষ বা রাজানুগৃহীতের একচেটে। তাঁহাদের যোগ্যতা বা শ্রম যে মূল্যে দেশীয় ধন দ্বারা ক্রীত হয়, তদপেক্ষা অল্পমূল্যে দেশীয় যোগ্যতা ও শ্রম পাওয়া যাইতে পারে। আবার তাঁহাদের সঞ্চিত ধনের ও পেন্সনের অধিকাংশই বিদেশে চলিয়া যায় ও তথায় ব্যয়িত হয়, দেশীয়ের সঞ্চিত ধন পেন্সন দেশেই থাকে।

চতুর্থতঃ, জাতীয় ব্যবসায়ী অথবা শিল্পী, এই বিভাগের অনেক শ্রেণীরই অন্ন মারা গিয়াছে। আমাদের দেশে কোনরূপ শিল্পকার্য্যের উন্নতি কোন কালে ছিল না বা এখনও নাই। কল কৌশলে শিল্পকার্য্য হইলে সুন্দর অথচ সুলভ দ্রব্য প্রস্তুত হয়। এদেশে সেরূপ কল বল কোন কালে ছিল না, এখনও নাই। ইউরোপীয় কল কৌশল নিষ্পন্ন দ্রব্যাদির সংঘর্ষণে, এদেশের জাতীয় ব্যবসায় অথবা শিল্পী শ্রেণী একেবারে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। যে সকল দ্রব্য বিলাত হইতে আমদানি হয় না, সামান্যাকারে সেই সকল দ্রব্য প্রস্তুত ও বাজারে বিক্রয় হয়। ইহাতে দেশের দারিদ্র্য ভঞ্জনের কোন কারণ নাই। বরং বিদেশীয়ের হস্তে শিল্পকার্য্য ন্যস্ত থাকায়, তদুৎপন্ন প্রচুর লাভ তাহারা বিদেশে বসিয়া উপভোগ করে।

পঞ্চম শ্রেণীর উপজীবিকার কথা আর কি বলিব? দরিদ্রের নিকট ভিক্ষুকেরও প্রত্যাশা নাই চাটুকারেও আদর নাই, উঞ্ছবৃত্তিরও উপায় নাই।

ষষ্ঠ সম্প্রদায়ভুক্ত উপজীবিগণ নিতান্ত ঘৃণ্য। তাহারা সমাজের অব্যবহার্য্য জীব তবে তাহাদেরও যে নিতান্ত দীন দশা, তাহা তাহাদের বৃত্তিতেই পরিচয় দেয়।

সপ্তম শ্রেণীর উপজীবিকা যদিও পূর্ব্বকালে হিন্দুসমাজে প্রচলিত ছিল না, কিন্তু এইরূপ বৃত্তি অবলম্বনে কোন দোষ দেখা যায় না বরং প্রার্থনীয় বলা যাইতে পারে। ঐরূপ শ্রেণীর লোকসংখ্যাও এত অল্প যে উহাকে উপজীবিকা বিভাগে না ধরিলেও হানি ছিল না। যাঁহারা আছেন তাঁহাদের অবস্থাও ভাল নহে। কারণ কুরুচি আসিয়া সুরুচিকে তাড়াইয়া দিতেছে।

বাঙ্গালীর উপজীবিকা বিভাগ ও প্রত্যেক বিভাগের ব্যাঘাত ও অসুবিধার বিষয় বলা হইল। এতদ্বারা বাঙ্গালীর দারিদ্র্যের কারণ অনেকটা অনুমিত হইবে। উহা ব্যতীত বাঙ্গালীর দারিদ্র্য রোগের আরও কয়েকটী ভয়ানক উপসর্গ আছে, যদ্দ্বারা দারিদ্র্য ব্যাধি আরও জড়িত ও বর্দ্ধিত হয়। সেই সকল উপসর্গের কথা এক্ষণে বলিব।

১ম। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ও স্বদেশপ্রিয়তা। সেন্সসে দেখা যায় বঙ্গদেশে ক্রমেই লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। বঙ্গদেশে যে পরিমাণ ধনোৎপত্তি হয় ও ধনোৎপত্তি হইবার যে সকল উপায় আছে, তদতিরিক্ত লোকসংখ্যা হইলে কোন মতে জীবিকার সঙ্কুলান হয় না। ইহার উপর আবার বিদেশীয়েরা ও বিদেশীয় গবর্ণমেণ্ট সেই ক্লেশার্জ্জিত অনটন ধনের অংশ দ্বারা পরিতুষ্ট হন। এস্থলে আমরা নবজীবন সম্পাদক কথিত ধর্ম্মব্যথার বশবর্ত্তী হই। যথা—"আপনি খাইতে পাই না, রাজপুরুষদিগকে চর্ব্ব, চোষ্য, লেহ্য, পেয় চতুর্ব্বিধ আহার দিতেই হইবে। সুতরাং এই অসাধ্য, অস্বাভাবিক ধর্ম্মের জ্বালায় বাঙ্গালী দিন দিন দরিদ্র হইতেছে। আবার স্বদেশপ্রিয়তা হেতু বাঙ্গালী অন্য দেশে যাইয়া ও তথায় বাস করিয়া তদ্দেশজাত ধনে প্রতিপালিত হইতে আদৌ ইচ্ছা করে না। ইহারা পরের গ্রাসের ভাগ লইতে জানে না। জন্মভূমি ইহাদের নিকট স্বর্গ হইতেও গরীয়সী। বাঙ্গালী ঘরে পড়িয়া অনাহারে মরিবে, তথাপি বাহিরে যাইয়া আহারান্বেষণ করিবে না। সুতরাং বাঙ্গালীর উল্লিখিত প্রবৃত্তিদ্বয় দারিদ্র্য ব্যাধির ঘোর উপসর্গ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

২য়। আমাদের সামাজিক রীতি নীতি, আচার ব্যবহার আমাদের উন্নতির প্রধান অন্তরায়। বাঙ্গালীর বিবাহপ্রিয়তা বা বাধ্যতা বাঙ্গালীর দারিদ্র্যের প্রধান সহায়। অনুপযুক্ত ও বহুবিবাহ এবং বাল্যবিবাহ, বিবাহপ্রিয়তা বা বাধ্যতা হেতু সংঘটিত হয়। ঐ হেতু লোকসংখ্যাবৃদ্ধি ও কত অর্থপাত হয় তাহা উদাহরণ দ্বারা বুঝাইতেছি।

মনে করুন—কর্ত্তা, গৃহিনী, একটী পঞ্চদশ বর্ষীয় পুত্র, সপ্তদশ ও দ্বাদশ বর্ষীয়া দুইটী বিধবা কন্যা এই পাঁচটীতে একটী ব্রাহ্মণ পরিবার আছে। কর্ত্তা কলিকাতার কোন হাউসে পঞ্চাশ টাকা বেতনে চাকুরী করেন। কর্ত্তা কুলীন, দুই বৎসর পূর্ব্বে কন্যাদ্বয়ের আত্মাকে একেবারে কোন পঞ্চপত্নীক বৃদ্ধবরের আত্মার সহিত "একীকরণ" করিয়া হিন্দুবিবাহের "আধ্যাত্মিকতা" সম্পাদন ও অতি সুলভে কুলরক্ষা করিয়াছিলেন। বিবাহের মাসান্তেই বৃদ্ধ মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিল। কিন্তু বৃদ্ধের পরলোকগমনে কন্যাদ্বয় বিধবা হইল না। কারণ "পরলোকে বিশ্বাস হিন্দু জাতির ধর্ম্ম"। সেই পরলোকে বৃদ্ধের আত্মা বিরাজিত

আছে। সুতরাং কন্যাদ্বয় বিধবা হইল না অথচ সুলভে কর্ত্তার কুলরক্ষা হইল। অতি চমৎকার পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে। কর্ত্তার কুলরক্ষা হইল। অবস্থা চমৎকার স্বচ্ছল নহে, সেই জন্য কন্যাদ্বয়ের "আধ্যাত্মিক একীকরণ সম্পাদন" জন্য দুইশত টাকা কর্জ্জ করিতে হইয়াছিল। ক্রমে টাকার সুদ বাড়িয়া সুদে আসলে তিন শত হইল। কর্ত্তার দেনা শোধের ভরসা পুত্রের বিবাহ অথবা একীকরণ। সুতরাং গৃহিনীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া পঞ্চদশ বর্ষীয়া বালকের সহিত দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকার "আধ্যাত্মিক যোগ" শুভদিনে শুভক্ষণে সিদ্ধ হইল, কুলীনের ছেলে, তাহাতে ট্রেনিং অ্যাকাডেমির তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে; কাজেই "আধ্যাত্মিক যোগের" মূল্য স্বরূপ পাঁচশত টাকা পিতার লাভ হইল। পূর্ব্বঋণ পরিশোধ হইল। ক্রমে ছেলে এণ্ট্রান্স ক্লাশে কষ্টে স্বষ্টে উঠিলেন। বিবাহ অবধি ছেলের পড়াশুনায় তাদৃশ মন ছিল না। অজীর্ণ, মাথাধরা, অল্প জ্বরে ছেলের প্রফুল্ল মুখ ক্রমে শুকাইতেছিল। এণ্ট্রান্স ক্লাশে পদার্পণ করিতেই ছেলের একটী ছেলে হইল। কর্ত্তা পৌত্রের মুখ দেখিয়া জন্মসার্থক করিলেন। ছেলে অথবা নবীন পিতা পরীক্ষার একমাস থাকিতে প্রণয়নীর পুনঃ গর্ভসঞ্চারজনিত অসুখের সেবা শুশ্রূসায় নিযুক্ত হইলেন। সুতরাং সেইবার পরীক্ষা দেওয়া হইল কিন্তু পাশ হইতে পারিলেন না। পুনরায় পড়িতে লাগিলেন। ফিরে বারে থাডগ্রেডে পাশ পাইলেন। এবার তাঁহার প্রণয়িনীর পুনরায় গর্ভসঞ্চার হইয়াছে মাত্র। যাহা হউক সেই আর একটী কন্যা সন্তান হইল। কিন্তু দুঃখের বিষয় কর্ত্তার মৃত্যু হইল এবং তাহার একমাস পরে নবীন পিতার প্রথম পুত্রটী অকালে কালকবলে পতিত হইল। পিতার ও পুত্রের চিকিৎসার জন্য একশত টাকা দেনা দাঁড়াইল। সংসারে বিধবা মাতা, বিধবা ভগ্নিদ্বয়, স্ত্রী, দুইটী শিশু কন্যা এবং স্বয়ং; সাকুল্যে সাতজন ও একশত টাকা দেনা। বৃদ্ধ পিতার সময়ে পাঁচজন পরিবার ছিল, এক্ষণে সাতজনে পরিবারের কলেবর বৰ্দ্ধিত হইয়াছে। নবীন পিতার মস্তক ঘুরিয়া গেল। সংসার অন্ধকার দেখিলেন। বিদ্যার মধ্যে তৃতীয় বিভাগে এণ্ট্রান্স পাশ। এরূপ পরিবার লইয়া কলিকাতায় বাস করা দুরূহ ব্যাপার। ভাবিয়া চিন্তায় উপায় কি? নিজের অর্দ্ধাঙ্গিনীকে পিত্রালয়ে পাঠাইলেন। স্বয়ং চাকুরির চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। অনেক চেষ্টায়, উপরোধে অনুরোধে কুড়ি টাকা বেতনের একটী চাকুরী বা কুকুরী পাইলেন। নবীন পিতা সানন্দে সেই দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন। চাকুরির কথা শুনিয়া অর্দ্ধাঙ্গ আবার আসিয়া পুর্ণ "এক" হইলেন। কুড়ি টাকায় চলে না, দেনার জ্বালায় অস্থির। ক্রমে বিধবা ভগ্নীদ্বয়, ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূর চক্ষুশূল হইল। তাহারা সাংসারিক ও বাচনিক যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া বড় সহরের জঘন্য বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইল। ভ্রাতার ক্রমেই বংশবৃদ্ধি, চাকুরির বেতন বৃদ্ধি সেরূপ নাই। ক্রমে পৈতৃক বাটী বন্ধক পড়িল। ঋণজালে ক্রমেই জড়িত, নিরুপায়, উদরান্ন আর চলে না। চিন্তাজ্বরে অস্থিচর্ম্মা বিশিষ্ট! এদিকে ভগ্নীদ্বয়ের খুব পশার! সামান্য দিনে

সংগতিও হইয়াছে। ভ্রাতার দুরবস্থা দেখিয়া বাটী বন্ধক খালাশ করিয়া দিল। মাসিক সাহায্য করিতেও প্রতিশ্রুত হইল। ভ্রাতাও আকাশের চাঁদ হাতে পাইল। এই উদাহরণে বোধ হয় বুঝাইতে পারিয়াছি যে অনুপযুক্ত বিবাহ অর্থাৎ বৃদ্ধের সহিত বালিকার বিবাহ ও বহুবিবাহ সমাজে দারিদ্র্য ও নিরাশ্রয়তা আনয়ন করে এবং জঘন্য পাপস্রোত প্রবাহিত করে। বাল্যবিবাহ স্বাস্থ্য ভঙ্গ করিয়া কার্য্যে অক্ষম করে, অধিক অকর্ম্মণ্য সন্তানোৎপত্তিহেতু লোকসংখ্যা বর্দ্ধন, অকালমৃত্যু সংঘটন ও দারিদ্র্য বর্দ্ধন করে এবং অবশেষে ঘোর দারিদ্র্য হেতু হৃদয়কে নীচ প্রবৃত্তির রঙ্গভূমি করিয়া ফেলে, উপযুক্ত বিদ্যাভ্যাস বা শিক্ষার প্রতিবন্ধক হয়। অতএব বিবাহপ্রিয়তা বা বাধ্যতা হেতু অনুপযুক্ত ও বাল্যবিবাহের সৃষ্টি হইয়া দারিদ্র্য ও পাপস্রোত পরিবর্দ্ধিত হয় তদ্বিষয়ে সংশয়াভাব।

৩য়। কৌলীন্য প্রথা, এই প্রথা হইতে বিবাহে পুত্র কন্যার পণ গ্রহণের নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে এবং ঐ অনুকরণে ব্রহ্মেণেতর জাতির মধ্যেও ঐ প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। ইহাতে অনেক পরিবাবকে দারিদ্র্য ব্যাধিগ্রস্থ হইতে হয়। এই সামাজিক নিয়মে বাধ্য হইয়া অনেককে প্রভূত ব্যয় স্বীকার করিতে হয়, দুরপণেয় ঋণপঙ্কে লিপ্ত হইতে হয়, এমন কি অনেক সময়ে ভিক্ষাবৃত্তিও অবলম্বন করিতে হয়। আবার এইরূপ কৌলীন্য প্রথায় একদিকে অনুপযুক্ত, বাল্য ও বহুবিবাহের প্রশ্রয় পায়, অন্যদিকে বংশজ অথবা শ্রোত্রীয়দিগের আদৌ বিবাহ হয় না। যদি হইল, তবে একটী বিবাহের উচ্চপণে দরিদ্র হইয়া পড়িতে হয়। একটী ১৬।১৭ বৎসরের বালককে পৈতৃক সম্পত্তি বন্ধক দিয়া ঋণ গ্রহণ পুর্ব্বক একটী আঠার মাসের কন্যাকে তিন শত টাকা পণ দিয়া বিবাহ করিতে দেখিয়াছি। এইটী কন্যার উচ্চপণ ও বাঙ্গালীর বিবাহপ্রিয়তার চরম উদাহরণ। এ প্রথাগুলিকে অত্যন্ত অবনতিব্যঞ্জক বলিতে হয়।

৪র্থ। একান্নবর্ত্তিতা। বহু পরিবারের এক অন্নে থাকা, বঙ্গীয় সমাজের চির প্রচলিত এই প্রথায়ও দারিদ্র্য আনয়ন করে। ভাবুন, একটী পরিবারে একজন উপায়ক্ষম আছেন। সে উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলে চতুর্দ্দিক হইতে দূর সম্বন্ধীয় জ্ঞাতি কুটুম্ব আসিয়া তাহার গলগ্রহ হইল। তাহারা নিষ্কর্ম্মা হইয়া একজনের উপার্জ্জিত অর্থে উদর পোষণ করিতে লাগিল। সুতরাং উপার্জ্জনকারীর কিছুমাত্র সংস্থান হইল না, অথচ আলস্য পরবশ জ্ঞাতি কুটুম্বগণ ও সমাজের অকর্ম্মণ্য জীব হইয়া কেবল ধনক্ষয় করিতে লাগিল, সামাজিক নিয়মে বাধ্য হইয়া, তুমি তোমার কন্যাকে বা ভগ্নীকে উপযুক্ত পাত্রে সম্প্রদান করিতে পারিলে না, কারণ সে তোমার সমান বংশের লোক নহে। কাজেই এক অযোগ্য পাত্রে বিবাহ দিতে বাধ্য হইল। সে ব্যক্তির কিছুমাত্র সংস্থান বা ক্ষমতা নাই। সুতরাং তোমাকে ভগ্নিপতি অথবা জামাতাকে পর্য্যন্ত প্রতিপালন করিতে হইল। আবার তাহাদের পুত্র, কন্যা পর্য্যন্ত প্রতিপালন করিতে ও বিবাহাদি দিতে হইল। ক্রমে তোমার পরিবার রাবণের পরিবারের ন্যায়

আকার ধারণ করিল। আবার তোমার ভগ্নি বা কন্যা যদি বিধবা হইল, তুমি তাহাদের পুনরায় বিবাহ দিতে পারিলে না। সুতরাং চিরদিনের জন্য তাহারা তোমার গলগ্রহ হইল। ঐরূপ ভাবের নারীকে কুপোষ্য বলে। বঙ্গীয় সমাজে এইরূপ কত কুপোষ্য একজনের পোষ্য হইয়া তাহার সর্ব্বনাশ উপস্থিত করে, ইহা বাঙ্গালীমাত্রেরই অবিদিত নাই।

৫ম। ধর্ম্মাদেশে কতকগুলি কার্য্য বাধ্য হইয়া করিতে হয়। যথা—পিতৃ-মাতৃ শ্রাদ্ধ, ঠাকুর সেবা উৎসব ও পার্ব্বণ ইত্যাদি। ক্ষমতা স্বত্বে একর্ম্মগুলি করা কর্ত্তব্য। অক্ষমতা স্থলে বাধ্য হইয়া করিলে ব্যক্তিগত দারিদ্র্য বৃদ্ধি হয়। তবে একটী কথা আমাদের দেশে ধনীর হস্ত হইতে যে ভাবে অর্থটা সাধারণের হস্তে যায়, সেভাব বা নিয়মটা স্থায়ী নহে। বিবেচনা করুন একস্থানে পঞ্চাশ হাজাব টাকা ব্যয়ে একটী বারইয়ারি পূজা হইল। যাত্রা, মহোৎসব, নাচ, তামাসা, সাজ সরঞ্জাম, ঠাকুর গঠন প্রভৃতিতে সেই ৫০ হাজার টাকা ব্যয়িত হইল, অর্থাৎ ধনীর হস্ত হইতে সে টাকাটা দশজনের হস্তে পড়িল। বারইয়ারির পর দিবসে সে অর্থ ব্যয়েব চিহ্নও থাকিল না। কিন্তু ভাবুন দেখি, এই বঙ্গদেশে শুদ্ধ বাবইয়ারি উপলক্ষ্যে একবৎসরে যে টাকাটা ব্যয় হয়, সেই অর্থ দ্বারা যদি পাঁচটী উচ্চদরের কারখানা খোলা যায়, তবে তাহাতে কত লোক কত দিনের জন্য প্রতিপালিত হইতে পারে। আমাদের দেশে ক্রিয়া কর্ম্মে যাগ যজ্ঞে ও মহোৎসবে অধিক টাকা ব্যয় হয়। কিন্তু ইহাতে সাধারণকে আলস্য পরবশ করে। কিন্তু অতিথিশালা স্থাপন করিলেন বা অন্নসত্র দিলেন, কতকগুলি লোক তথায় পরপিণ্ডে পেট পুরিয়া আলস্য ও পাপের আশ্রয় দিতে লাগিল ও অকর্ম্মণ্য হইয়া সমাজের অব্যবহার্য্য জীব হইতে চলিল। ধনীর ধন বিতরণের এরূপ পন্থা প্রশস্ত নহে। ইহাতে দারিদ্র্য আনয়ন করে।

৬ষ্ঠ। বংশগত মর্য্যাদা ও শাস্ত্রোক্ত নিষেধ: কোন জমিদার সন্তানের প্রপিতামহ সুপ্রসিদ্ধ মান্যগণ্য জমিদা ছিলেন। তাঁহার বার্ষিক আয় পঞ্চাশ হাজার টাকা ছিল। দেশহিতকর কার্য্যে অর্থব্যয় করায় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রাজোপাধি দিয়াছিলেন। তিনি পাঁচ পুত্র ও তিন কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার সঞ্চিত সম্পত্তি পুত্র কন্যাদিগের মধ্যে বিভক্ত হইল। আবার তাঁহাদিগের বংশবৃদ্ধি হওয়ায়, চারি পুরুষের মধ্যে ঐ-সম্পত্তি কড়ায় গণ্ডায় ভাগ হইল। বর্ত্তমান জমিদার বা রাজসন্তান নয় গণ্ডা তিন কড়ার মালিক, তাহাতে যে আয় হয়, তদ্দ্বারা সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহ হয় না। জমিদার সন্তানের যেরূপ বিদ্যা বুদ্ধি আছে, পরের দ্বারস্থ হইলে মাসিক একশত টাকা বেতন পাইতে পারেন। যে জমিদারের দ্বারস্থ হইতে হইবে, তিনি হীনবংশ। সুতরাং নয় গণ্ডা তিন কড়ার জমিদার বংশের মর্য্যাদা হেতু, হীন বংশীয়ের চাকুরী স্বীকার করিতে পারিলেন না। তাঁহার প্রপিতামহ রাজা

ছিলেন, এই অভিমানে ফাটিয়া ঘরে পড়িয়া উপবাস করিতে লাগিলেন ক্রমে বৃথা অভিমানে, চিন্তায়, দারিদ্র্যতায় অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন এবং তাঁহা হইতেও দরিদ্র কতকগুলি অপগণ্ড শিশুসন্তান বিধবা স্ত্রী, ভগ্নী প্রভৃতি সাত আট জনকে দুস্তর সংসার সাগরে নিরবলম্বনে ভাসাইয়া গেলেন। ইহাকে বলে বংশগত অভিমানের অত্যাচার।

এক্ষণে শাস্ত্রোক্ত নিষেধের কথা বলিতেছি। তুমি ব্রাহ্মণ সন্তান, তুমি স্বহস্তে হলচালন করিতে যবন বা ম্লেচ্ছের দাসত্ব করিতে পারিবে না। সংক্ষেপতঃ শাস্ত্রোক্ত নিষেধ মানিলে, ব্রাহ্মণের ভিক্ষাবৃত্তি ভিন্ন অন্য উপায় নাই। ব্রাহ্মণেতর জাতির সম্বন্ধেও অনেক প্রকার নিষেধ আছে। সে সকলের বিস্তৃত বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। মনু প্রভৃতির সংহিতা পাঠে পাঠক জানিতে পারিবেন। সুখের বিষয় যে, অধুনা অনেকে ঐ সকল সংহিতার নিষেধ বিধি মানেন না। তথাপি যেটুকু পালন করেন, তাহাতে অবনতির আশঙ্কা আছে।

৭ম। জাতিভেদ ও কর্ম্মভেদ জাতীয় অবনতির দুইটির প্রধান সহায়। জাতি ও কর্ম্মভেদে পরস্পরের সহিত ঐক্য থাকে না, কোন সভা সমিতি সংগঠিত হয় না। কেহ কাহারো জন্য চিন্তা করে না, সহানুভূতিও থাকে না। কেহ কাহাকে বিশ্বাস করে না। কোন সাধারণে দেশহিতকার্য্যে সকলে একত্র হইয়া বদ্ধপরিকর হয় না। দুরূহ কার্য্যে একাগ্রতা ও একভাব বলপ্রয়োগ আবশ্যক হইলে, তাহা পাওয়া যায় না। তখন কেহ উজান কেহ বা ভাটা বাহিতে আরম্ভ করে, কেমন চা ভঁা লাগিয়া যায়। ইহার উদাহরণ আজকাল বিরল নহে। পাঠক একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। এরূপ অবস্থা, জাতীয় উন্নতির ও ধন বৃদ্ধির প্রধান অন্তরায়।

৮ম। শিক্ষা বিভ্রাট: এক্ষণে যেভাবের শিক্ষা হইতেছে, তাহাতে কার্য্যক্ষম হওয়া যায় না। নানা প্রকার শিল্প কৌশল, বিজ্ঞান প্রভৃতি অর্থকরী ও কার্য্যকরী শিক্ষা, এদেশে নাই বলিলেই অত্যুক্তি হয় না। যে ভাবের শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাতে কেবল শূন্যে কেল্লা নির্ম্মাণের বৃদ্ধি হয়, বচনে খৈ ফুটাইবার ক্ষমতা হয়, শিমুল ফুলের মত অল্প বাতাসে ফাটিয়া চটিয়া দেশময় হওয়ার সুবিধা হয়, এরূপ নিষ্ফল শিক্ষায় দারিদ্র্য ও দুঃখ্যের স্রোত প্রবলবেগে বহিবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

৯ম। কার্য্যক্ষেত্রের অভাব: যাহার যেরূপ শিক্ষা ও পারদর্শিতা, তাহার জন্য সেইরূপ কার্য্যক্ষেত্র আবশ্যক। আমাদের দেশের লোকসংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছে। কতক পরিমাণ শিক্ষাও হইতেছে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্র নিতান্ত সংকীর্ণ সেইজন্য অনেক লোক উপযুক্ত কার্য্যাভাবে ভয়ানক দারিদ্র্য যন্ত্রণা ভোগ করে। রেলওয়ে, ট্রামওয়ে, চা বাগানে, সওদাগরের বাটীতে অনেক লোক প্রতিপালন হয়। বিদেশীয় বণিকদিগকে আশীর্ব্বাদ করি। তাঁহাদের দ্বারে খাটিয়া বিস্তর লোক জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে।

দেশীয় ধনী গুণপুরুষদিগের এ সকল বিষয়ে আদৌ দৃষ্টি নাই। দেশের কিসে উন্নতি হয়, অবনতি হয় দারিদ্র্য দূর হয়, এরূপ চিন্তায় কোনদিন কোন মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহাদের অসাড় মস্তিষ্ক আলোড়িত হয় না। যদি আজ বিদেশীয় বণিকগণ তাহাদের কাজকারবার কল কারখানা ভারত হইতে উঠাইয়া লয়, তবে এই অগণ্য দরিদ্র ভারতবাসীর দশা কতদূর শোচনীয় হয়, তাহা ভাবিতেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। সেইজন্য এই বলি, কেবল বিদেশীয়ের মুখাপেক্ষী ও বিদেশীয়ের ভাগ্যোপজীবি হইলে দেশের দারিদ্র্যতা কখনও ঘুচে না।

১০ম। গবর্ণমেণ্টের বিদেশপ্রিয়তা, বিজাতীয়তা ও ধর্ম্মান্ধতা—গবর্ণমেণ্টের এই তিনটী গুণ দেশীয় দারিদ্র্য ভয়ানক দুশ্চিকিৎসা উপসর্গ। গবর্ণমেণ্টের এই গুণত্রয়ে শুদ্ধ বঙ্গদেশে কেন, সমস্ত ভারতে কতদূব অমঙ্গল, অবনতি ও অনর্থপাত হইতেছে, তাহাই বলিতেছি। দেশীয় ধনবৃদ্ধি, উন্নতি অথবা অবনতি সম্বন্ধে বিদেশীয় গবর্ণমেণ্টের ততদূর দৃষ্টি থাকে না। দেশীয় প্রজার উপর সহানুভূতি জন্মে না। সকলেই জানেন, গত বৎসর হইতে বীরভূম, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানে দুর্ভিক্ষ বা অন্ন কষ্ট হইয়াছে। মনে করুন—ঐ স্থানে গবর্ণমেণ্টের ত্রিশ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হয়। ভূমিতে কিছুমাত্র শস্যোৎপত্তি বা ধনোৎপত্তি হয় নাই। প্রজারা জমিদারকে এক কপর্দ্দকও কর দিতে পারিল না। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট নিরূপিত দিনে অন্যায়ি আইন জারি দ্বারা জমিদারের নিকট হইতে নিজ প্রাপ্য রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় আদায় করিলেন। এটী ঘোব অবিচার। প্রজা হইতে রাজা পর্য্যন্ত সকলেহ ভূমির উৎপত্তি অংশই উপভোগ করেন। যখন ভূমিতেই কিছুমাত্র উৎপন্ন হইল না, তখন কাহারো রাজস্ব পাওয়া উচিত নহে। কিন্তু রাজার বিদেশীয়তা ও বিজাতীয়তা হেতু প্রজার উপর সহানুভূতি না থাকায় তিনি অন্যায়রূপে ঐ ত্রিশ লক্ষ টাকা লইলেন। আবার ভাবুন, ঐ অন্যায় অর্জ্জিত অর্থ গবর্ণমেণ্ট বিলাতি আমলাবর্গের বেতন দেওয়ার জন্য তথায় পাঠাইলেন কিংবা রুশের সহিত যুদ্ধের আশঙ্কায় আমীরকে উপহার দিলেন, তাহা হইলে ঐ-টাকাটা সাত সমুদ্র তের নদী পারে যাইয়া সঞ্চিত বা ব্যয়িত হইল: এদেশে ব্যবহৃত হইল না। সুতরাং জাতীয় ধনের ক্ষয় হইল।

গরীবের কি মা বাপ নাই? ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৩। ২৯ সংখ্যা

পাঠক! লও সাহেবের অনুগ্রহে নীলকর ও নীলের কুলিদিগের চিত্র দেখিয়াছেন। অনেকে মনে করেন সে দিন আর এখন নাই। ব্রিটিশ শাসনের ন্যায়দণ্ডে ধনী দরিদ্র সমান ব্যবহৃত হইতেছেন। কিন্তু ব্রিটিশ রাজই হউন আর স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রই হউন, দরিদ্র কুলিদিগের কাহারও হস্তে নিস্তার নাই। "ঢেকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে"। দরিদ্র কুলির ধানভানা অদৃষ্ট কেহই লঙ্ঘন করিতে পারে না।

ভারতে যখন ব্রিটিশ সিংহের জয় পতাকা প্রথম উড্ডীয়ান হয় তখন অরাজক রাজ্য। মুসলমানের হস্তে রাজস্ব মহাত্মারা ভাবতবর্ষে কেবল ধনোপার্জ্জনের নিমিত্তই আগমন করিতেন। রাজ্যশাসন তাঁহাদেব উদ্দেশ্য ছিল না—ভারতের উন্নতিসাধন কিম্বা ভারত-বাসীর স্বার্থরক্ষা এ সকল ত দূরের কথা—কেবল অর্থসংগ্রহ, কেবল লুটমার ইহাই তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল। দরিদ্র জীবন তখন পিপীলিকা ও ছারপোকার প্রাণের ন্যায় অনাবশ্যকীয়। ক্রমে সে ভাব গিয়া ইংরাজের হস্তে বিচারের ভার আসিল। ইংরাজ কর্ম্মচারিগণের বেতন বাড়িল। লুটমার কমিল বটে, কিন্তু দরিদ্রের অদৃষ্টের কিছুই পরিবর্ত্তন হইল না। তখন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত জমিদারের এবং জমিদারগণের সহিত প্রজাবর্গের সম্বন্ধ নির্ণয়ের সময। একটা মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। জমিদারেরা প্রজাপীডন কবিযা তাহাদের পূর্ব্বসঞ্চিত যাহা কিছু সত্বাধিকার ছিল সমস্তই লোপ করিয়াছিলেন। গরীবেব ত মা বাপ নাই। স্বতবাং অর্থের বলে জমিদার গবর্ণমেণ্টের বন্দোবস্তী ভূমি সমুদাযে নিজের স্বত্ব স্থাপিত করিলেন। রাজা টোডরমলের সময় হইতে দরিদ্র প্রজা যে সকল অধিকার ভোগ করিয়া আসিতেছিল এক ইঙ্গিতে তাহার সমস্তই বঙ্গোপসাগবের অতল জলে ডুবিয়া গেল। তারপর ক্রমে পশ্চিমভারতেব প্রান্ত হইতে একটা বিদ্রোহেব শিখা উঠিযা উত্তরপশ্চিম প্রদেশ ব্যাপিয়া পডিল। ই'রাজ সশব্যস্ত হইলেন। দরিদ্রের ধনধান্য দস্যুর হস্তে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল, কে কাহাকে দেখে? আপনার প্রাণ লইয়া ইংরাজ, বাঙ্গালী, মাডওয়ারী, খোট্টা সকলেই ব্যতিব্যস্ত। দরিদ্রের ধন প্রাণ রক্ষা করিবার কেহই তখন রহিল না। ইংরাজের গুণেই হউক আর রাজভক্ত শিখ, নেপালী, গুর্খা অথবা ভারতেব শত শত রাজার সাহায্যেই হউক সে ভীষণ সিপাহিবিদ্রোহের অনল নিবিযা গেল। ই'লণ্ডেশ্বরী রাজ্যভার নিজহস্তে গ্রহণ করিযা প্রচার করিলেন ভারতেব প্রজা এখন হইতে অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রতিপালিত হইবে, কাহারও আর কোন ভযেব কারণ থাকিবে না। কাণ পাতিযা শুনিলাম, বডই আশা কবিযা ভাবিলাম গরীবেব প্রাণ এইবারে বুঝি রক্ষা পাইবে। ক্রমে ভারতেব পক্ষে ইংরাজ পতাকা দৃঢরূপে প্রোথিত হইল দেখিয়া দলে দলে ইংরাজ ব্যবসাযীরা ব্যবসায জন্য ভারতে আসিতে লাগিলেন। স্থানে স্থানে চা বাগান, নীলকুঠী, কোথায় বা জঙ্গলকাটি আবাদ এইরূপে বিলাতের সওদাগরগণ ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ব্যবসা আরম্ভ করিলেন। ব্যবসায মুটে মজুর, খালাসী, চাপরাসী চাষী শ্রমজীবী সকল প্রকার লোকেরই আবশ্যক হইতে লাগিল। এক দেশ হইতে দেশান্তরে কুলি লইযা যাইবার জন্য স্থানে স্থানে কণ্ট্রাক্টার নিযুক্ত হইল—অর্থের লোভ পাইয়া দরিদ্র কুলি অমনি ছুটিয়া আসিল। তাহাদের সহিত কণ্ট্রাক্টার সাহেব কি বন্দোবস্ত করিলেন তাহা বুঝিতে পারিল না। কার্য্য স্থলে আসিয়া ক্রমে অত্যাচার। ৬ ঘণ্টার স্থানে ৮ ঘণ্টা পরিশ্রম, অর্দ্ধেক বেতন, সাহেবের

প্রহার, রমণীর উপর বল প্রকাশ, বিদেশে আসিয়া অর্থোপার্জ্জনের সুখ গরীবেরা ক্রমে অনুভব করিতে লাগিল। মানুষের কত সহ্য হয় কাজেই কড়ার ভাঙ্গিয়া হতভাগ্য কুলি ধন প্রাণ ও রমণীর সতীত্বের দায়ে দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিতে লাগিল।

সাহেবের তাহাতে কার্য্যের ব্যাঘাত। সুতরাং পলায়নপর কুলিদিগের কোন প্রকারে আবার টানিয়া ঘানিতে জুতিয়া দেওয়া আবশ্যক, কিন্তু আদালত ছাড়িয়া ব্যবসায়ী টম, জোনস্ ম্যাগ্রিগর চা-কর নীলকর জঙ্গলকাটা সাহেব দলে দলে গবর্ণমেণ্টের দ্বারে উপস্থিত হইল। গবর্ণমেণ্ট দেখিলেন সামান্য "কালা আদমী"দের অনাবশ্যকীয় প্রাণের জন্য বণিক ব্যবসায়ীর ক্ষতি হয়। সুতরাং ব্যবস্থাপক সভায় এ বিষয়ে একটা আন্দোলন করা আবশ্যক। ইংরাজের নিকট ব্যবস্থাযন্ত্রের দ্বার অবারিত। যে যখন যে আবদাব করে ব্যবস্থাপক সভার স্বজাতিপ্রেম এমনি প্রবল যে সভ্যেরা দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া, সাধারণ লোকের ভাবাভাবের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া দুই একজন ঐ আবদেরে ব্যবসায়ীর প্ররোচনায় এক অদ্ভুত প্রকারের আইন প্রস্তুত করিয়া বসিলেন। এই আইনখানির মর্ম্ম আজ আমরা পাঠককে অবগত করিব। ইহা ১৮৫৯ সালের ১৩ আইন। যে সকল কুলি ব্যবসায়ী সাহেবদিগের হস্ত হইতে পলাইয়া যন্ত্রণার দায় এড়াইতে চায় ইহাতে সেই দরিদ্রের দলন করিবার ব্যবস্থা দেওয়া আছে। সে সময়ে আইনটী লইয়া যে আন্দোলন হয় নাই তাহা নহে। কোন কোন সম্বাদ পত্রিকায় ইহাকে আফ্রিকার দাস ব্যবস্থা বলিয়া আখ্যাত করা হইয়াছে, কিন্তু বাঙ্গালীর আন্দোলন চিরস্থায়ী নহে। আমরা মনে করি কোন বিষয়ের যোগ্যাযোগ্যতা সম্বন্ধে একবার সম্বাদ পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিলেই আন্দোলনের চুড়ান্ত হইল, দরিদ্র কুলির উপর অত্যাচার ও তাহাতে গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন ও সাহায্য, একথা একবার শুনিবামাত্রই আমাদের শিরায় শিরায় যেন প্রবল বেগে রক্ত ছুটিয়া উঠিল, দুই চারিবার আন্দোলনের পর একেবারেই আমরা সে কথা ভুলিয়া গেলাম। বাস্তবিক এরূপ আন্দোলনের কোন উপকারিতা নাই। ১৮৫৯ অব্দের ১৩ আইনে যে কঠোব ব্যবস্থা লেখা আছে তাহা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কলঙ্ক। কোন সভ্য জাতির হস্তে এরূপ ড্রেকোর আইন প্রচলিত হওয়া অপেক্ষা বর্ব্বরতার পরিচয় আর কিছুই হইতে পারে না। ইহাতে লেখা আছে কুলিদের নিয়োগকর্ত্তা তাহাদের সহিত মুখে মুখে যদি কোনরূপ বন্দোবস্ত করেন আর সেই বন্দোবস্ত ভঙ্গ করিয়া কুলিরা যদি পলায়ন করে তবে মাজিষ্ট্রেট তাহাদে তিনমাস কাল কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাদণ্ড দিবেন। কথাটী শুনিবামাত্র সমগ্র বঙ্গদেশটা জ্বলিয়া উঠিল। আবার কালের চক্রে সে আন্দোলনের বেগ ক্ষীণ হইয়া সকলকেই নীরব করিল। আইনও তেমনি ১৮৫৯ খৃঃ অব্দ হইতে ২৭ বৎসর কাল অবিরোধে খড়্গ ধরিয়া দরিদ্রের উপর পীড়ন করিতে লাগিল। এতদিনের পর কুলিদের উপর আর একটী নূতন আইন জারি হইয়াছে তাহার

সমালোচনা করিতে গিয়া সুযোগ্য সহযোগী "বেঙ্গলী" সেই পুরাতন ১৩ আইনের কাহিনী বর্ণনা করিলেন। নীরবে ভারতের সম্বাদপত্রগণ কুলিদের উপর যে অত্যাচার দেখিয়া আসিতেছিলেন আজ বেঙ্গলী তাহার গূঢ়োদ্ভেদ করিয়া সাধারণকে কাঁদিতে বলিলেন। পাঠক! প্রতিবিধান করিবার কি ক্ষমতা আছে? না স্বদ্ধ আমাদের মত কাঁদনি গাহিয়াই নিশ্চিত হইবেন। কেহ যদি ক্ষমতাবান হন, আইনকর্ত্তাগণকে এই ঘৃণিত ১৩ আইনের সংশোধন করিতে বাধ্য করিবার যদি কাহারও সাধ্য থাকে, তবে তাঁহারা নিম্নে আইনটীর অনুবাদ দেখিয়া ইহার নিষ্ঠুরতার পরিচয় পাইতে পারিবেন।

"যেহেতু কলিকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই এবং অন্যান্য প্রেসিডেন্সিতে শিল্প, মজুর শ্রমজীবী, তাহাদের নিয়োগকর্ত্তাগণের সহিত যেরূপ বন্দোবস্তে অগ্রিম বেতন লইয়া কার্য্যে নিযুক্ত করা হয় তাহা প্রায়ই ভঙ্গ করিয়া তঞ্চকতা প্রদর্শনপূর্ব্ব ব্যবসায়ী প্রভুগণের যথেষ্ট অনিষ্ট করিয়া বসে এবং তাহাদের নামে দেওয়ানি আদালতে ক্ষতি পূরণের নালিস করিয়া যে টাকা পাওয়া যায় তাহাতে বাস্তবিকপক্ষে সমস্ত ক্ষতি-পূরণ হয় না, এবং এই সকল তঞ্চক কার্য্যের জন্য অপরাধীর দণ্ড পাওয়া নিতান্ত উপযুক্ত ন্যায়ানুগত অতএব বিধান করা গেল :"

১। "যদি কোন শিল্পী, শ্রমজীবী, অথবা মুটেমজুর কোন নগর বা প্রেসিডেন্সিতে বাস করিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন এরূপ কোন নিয়োগকর্ত্তা তাঁহার হইয়া কার্য্য করিতেছেন এরূপ কোন ব্যক্তির নিকট হইতে, তাঁহাদের কোন কার্য্য করিয়া দিবে বলিয়া কোন অর্থ অগ্রিম লইয়া থাকে, এবং সেই শিল্পী শ্রমজীবী অথবা মুটে মজুর চুক্তিভঙ্গ করিয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কোন আইন ও ন্যায়সঙ্গত কারণ ব্যতীত উক্ত কার্য্য করিতে বা করাইতে অবহেলা বা অস্বীকার করে, তাহা হইলে ঐ মনিব কি নিয়োগকর্ত্তা অথবা উল্লিখিত প্রকার অপর কোন ব্যক্তি কোন পুলিস মাজিষ্ট্রেট উক্ত ব্যক্তিকে সমন বা ওয়ারেণ্ট দ্বারা আদালতে আনয়ন করিয়া মকদ্দমার বিচার করিতে পারিবেন।"

২। "যদি পুলিষ মাজিষ্ট্রেটের বিচার করিয়া প্রতীতি জন্মে যে উল্লিখিত কর্ম্মচারিগণ বাস্তবিকই অগ্রিম বেতন লইয়া চুক্তিভঙ্গ করিয়া চুক্তিকৃত কার্য্যাদি করিতে অবহেলা বা অস্বীকার করিতেছে তাহা হইলে মাজিষ্ট্রেট নিয়োগকর্ত্তার ইচ্ছামত অগ্রিম টাকা ফেরত দিতে অথবা চুক্তিকৃত কার্য্য করিতে অথবা তাহাতে অস্বীকার করিলে তিনি মাসের অনধিক কাল কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাস করিতে দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিবেন। যদি স্বদ্ধ টাকা ফেরত দিবার আজ্ঞা হয় তবে তিন মাসের অনধিক কাল অথবা যে পর্য্যন্ত টাকা পরিশোধ না করিবে ততদিন কারাবাস করিতে হুকুম দিবেন। এইরূপ দণ্ডের বিধান হইলে উত্তমর্ণ কোন দেওয়ানি আদালতে টাকা আদায়ের জন্য নালিস করিতে অপারক হইবেন না।"

৩। "যদি পুনরায় চুক্তিকৃত কার্য্য করিতে হুকুম দেওয়া হয়, তবে নিয়োগকর্ত্তা ইচ্ছা করিলে ভবিষ্যতে চুক্তি অনুসারে কার্য্য সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত কুলিকে মাজিষ্ট্রেটের সন্তোষজনক জামিন ও মুচলেকা দিতে হইবে, অপারক হইলে তিন মাসের অনধিক কঠোর পরিশ্রমের সহিত কারাবাস।"

৪। "এই আইনে চুক্তি অর্থে—লিখিত বা কথিত সমস্ত এগ্রিমেণ্ট এবং কোন নিরূপিত সময় বা নিরূপিত কার্য্যের জন্য এগ্রিমেণ্ট।"

৫। "ইচ্ছা কবিলে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত গবর্ণর জেনারেল কিম্বা কোন স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে যে বিভাগীয় পুলিষ মাজিষ্ট্রেটের হস্তে বিশেষ ক্ষমতা অর্পণ করি.বন তাঁহারাই এইরূপ মকদ্দমার বিচার কবিতে পাবিবেন।"

উল্লিখিত আইনটী উদ্ধৃত করিযা দিবার পব ইহাব উপব আর মন্তব্যের অপেক্ষা করে না। পাঠক ইহাব ভিতব দেখিতে পাইবেন কেবল ব্যবসায়ী ইংরাজদিগের আবদার রক্ষা করিয়া দরিদ্র পীডন কবাই এই বিচিত্র আইনের উদ্দেশ্য। উপস্থিত ১৮৮২ অব্দের ১ আইনে এই আইনটীব কোন পবিবর্ত্তন কবা হয় নাই। ১ আইনে কেবল যে সকল কুলি লিখিত ও রেজেষ্টারিকৃত চুক্তিভঙ্গ করিয়া পলাযন করিবে তাহাদেরই দণ্ডের বিধান দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু উল্লিখিত ঘৃণিত ১৩ আইনের প্রবলতার কিছুই হ্রাস করা হয় নাই। আসামের চিফ্ কমিশনব সমযে সময়ে এই আইনেব বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্টকে লিখিয়াছিলেন কিন্তু গবর্ণমেণ্টেব তাহাতে লক্ষ্য নাই। দেশের লোকেও সেদিকে বড দৃক্‌পাত করিতেছেন না। তবে কি দবিদ্রের অদৃষ্টে, এই সভ্যতাব দিনে, উন্নতিব আন্দোলনের দিনে, সুবিচারক ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের হস্তে ভগবান কি কোন সুখ সচ্ছন্দই লিখেন নাই? এই ঘোর অত্যাচারের হস্ত হইতে দবিদ্রকে উদ্ধাব কবে সহৃদয বাঙ্গালীব ভিতর গরীবের কি এমন "মা বাপ" নাই?

উচ্চপদে দেশীয় কর্ম্মচারী নি.য়াগ। ৯ কার্ত্তিক ১২৯৩। ৪৯ সংখ্যা

রাজা হরিশ্চন্দ্র এক ব্রাহ্মণের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া স্বীয় বাজ্য সম্পত্তি স্ত্রী পুত্র পর্য্যন্তও দান করিয়াছিলেন। সেই অবধি রাজার কথায় আমাদের দৃঢ বিশ্বাস। প্রজার নিকট রাজা যাহা প্রতিজ্ঞা করেন সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া প্রজার সহিত প্রতারণা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। যে দেশের প্রজা রাজবিদ্রোহী, রাজা সেখানে স্তোকবাক্য কার্য্যসিদ্ধি করিয়া প্রবঞ্চনা করিতে পারেন, কিন্তু যেখানকার প্রজা রাজাকে দেবতার সমান জ্ঞান করে সেখানে এরূপ প্রবঞ্চনার কোন কারণ নাই। রোম দেশের প্রজাবর্গ কখন কখন বিদ্রোহী হইয়া রাজার সর্ব্বনাশ করিতে যাইত। সেখানে রাজা তখন দুর্ব্বল রাজনীতিব অনুবর্ত্তী হইয়া প্রজাগণকে নানাপ্রকারে প্রলোভন দেখাইয়া

নিস্তার করিতেন। অসভ্য জাতির ইতিহাসে কখন কখন এইরূপ স্তোকবাক্যে প্রজা ভুলানোর কথা শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সভ্য জাতি ও সভ্য সমাজে প্রবঞ্চক রাজার কথা কখনও শুনা যায় নাই। ভারতবর্ষে রাজার প্রতারণার কথা নিতান্ত অশ্রুতপূর্ব্ব। হিন্দুরাজা সময় বিশেষে স্বেচ্ছাচারী হইতেন কিন্তু মিথ্যা আশা দিয়া প্রজার প্রীতিভাজন হইতে ঘৃণা বোধ করিতেন। মুসলমান অত্যাচারী ও প্রজাপীড়ক ছিলেন, কিন্তু "দিব" বলিয়া আশা দিয়া কখনও প্রজাকে প্রত্যাখ্যান করিতেন না। তারপর ইংরাজ বাহাদুর যখন ভারতের রাজদণ্ড মুসলমানের হস্ত হইতে কৌশলে কাড়িয়া লইয়া সমগ্র ভারত একছত্র করিয়া বসিলেন তখন নূতন রাজা আমাদিগকে কি বলেন শুনিবার জন্য আমরা উৎগ্রীব হইয়া রহিলাম। ইংরাজ ঘোষণা করিলেন: জাতিবিচার থাকিবে না, ধর্ম্মের বিচার থাকিবে না, জন্মভূমির ভেদাভেদ থাকিবে না, শ্বেত কৃষ্ণাঙ্গ সকল প্রজা ইংরাজের অধীনে তুল্যদৃষ্টিতে লক্ষিত হইবে, সমানরূপে রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইবে বলিয়া গবর্ণমেণ্ট উপযুক্ত কর্ম্মচারীকে উপযুক্তপদে বরণ করিবেন। আমরা ভাবিলাম এই উদারতা গুণেই ভগবান সোনার থাল ভারতকে ইংরাজের হস্তে প্রদান করিয়াছেন। বৎসরের পর বৎসর গেল, ইংরাজের মহত্বের কথা আবালবৃদ্ধবণিতার শ্রুতিগোচর হইল,—ক্রমে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের মহাসভায় আইনজারী হইল ভারতবর্ষে ভারতবাসী ইংরাজের সহিত সমান অধিকার পাইবেন। ডিরেক্টারসভা এই আইনটীর ৩।৪ ধারা ব্যাখ্যাত করিয়া ভারতবর্ষে প্রেরণ করিলে—ভারতবর্ষীয় শিক্ষিত সম্প্রদায় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া ইংরাজকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। এইরূপে দিন যায়, প্রতিজ্ঞার একটী বর্ণও পুরণ হয় না, ভারতবাসী উপযুক্ত হইয়াও ইংরাজের অধীনে উচ্চপদ প্রাপ্ত হইতে পারেন না। ২০ বৎসর কাটিয়া গেল, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজের ন্যায় ভারত-বাসীকেও সিবিল সর্ব্বিসে গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা হইল। তখন সমুদ্রপারে জাতি খোয়াইয়া চিহ্নিত হইতে কে যায়? অতি অল্প লোকই হিন্দুধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া সিভিলিয়ান মর্য্যাদা লাভ করিয়া আসিলেন, কিন্তু ইংরাজের সমান উচ্চপদে অভিষিক্ত হওয়া তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটিল না।

কোম্পানির মল্লুক ক্রমে মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার করকমলে ন্যস্ত হইল। মহারাজ্ঞী ভারত সাম্রাজ্য খাসে লইয়া আবার ঘোষণা করিলেন "জাতি বিচার থাকিবে না, ধর্ম্মের বিচার থাকিবে না, উপযুক্ত হইলেই ভারতবাসীই ইংরাজের অধীনে সকল পদেই অভিষিক্ত হইতে পারিবেন।" আমরা শুনিলাম ইংরাজ এত দিন যে যে প্রতিজ্ঞার ঘোষণা করিয়া আসিতেছেন স্বয়ং মহারাজ্ঞীর মুখে ইহাও সেই ঘোষণা। এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজের প্রতিজ্ঞার কাণ্ডের প্রথম অভিনয় শেষ হইল।

তিন বৎসর পরে চিহ্নিত এবং অচিহ্নিত কর্ম্মচারীর প্রভেদ হইল, প্রতিজ্ঞা কাণ্ডের দ্বিতীয় অভিনয় আরম্ভ হইল। পার্লিয়ামেণ্টের আর একখানি আইনে প্রচার হইল যে

চিহ্নিতের পদ অচিহ্নিত কর্ম্মচারী প্রাপ্ত হইবে না। এই ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন হইবামাত্রই কয়েকজন উচ্চপদস্থ দেশীয় কর্ম্মচারীকে পদচ্যুত করা হয়। ক্রমে যে সকল পদে দেশীয় কর্ম্মচারীর নিয়োগ ব্যবস্থা করা হয় তাহাও একটী করিয়া চিহ্নিত ইংরাজ অধিকার করিয়া লইলেন। কয়েকজন পুরাতন কর্ম্মচারী ভিন্ন উচ্চ পদে আর কাহারও স্থান হইল না। দলে দলে ইংরাজ মহাপুরুষগণ আসিয়া দেশীয়ের প্রাপ্য অধিকার করিতে লাগিলেন। দলপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের মনে জাতিবৈরিতা প্রবল হইয়া উঠিল। ভারতবাসী উপরে বসিয়া হুকুম দিবেন, ইংরাজ অবনতশিরে সেই হুকুম তামিল করিবেন, এই চিন্তা চিহ্নিতের মনে অসহ্য হইয়া উঠিল। চিহ্নিত বিদেশী দেবতাগণের তুষ্টি সাধন মানসে গবর্ণমেণ্টও উপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

জিত বিজেতার পার্থক্য লইয়া যখন প্রবল আন্দোলন, লার্ড লরেন্স সেই সময়ে দেশীয় লোকের সহায় হইয়া তাহাদের বিলাত গমনের নিমিত্ত নয়টী বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। সে প্রবল স্রোতের মুখে লরেন্সের সাধু উদ্দেশ্য ভাসিয়া গেল। এক বৎসরের মধ্যে বৃত্তিগুলি উঠাইয়া দিয়া ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট প্রচার করিলেন ভারতবাসী যাহাতে উচ্চপদে স্থান পাইতে পারেন তজ্জন্য পার্লিয়ামেণ্ট হইতে বিশেষ উপায় নির্দ্দিষ্ট হইবে। উপায়ও নির্দ্দিষ্ট হইল, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহা এ পর্য্যন্ত কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলেন না। সিভিলিয়ান সম্প্রদায়ের ভয়ে গবর্ণমেণ্ট আইনানুযায়ী কার্য্য করিতে বিমুখ হইলেন। ষ্টেটসেক্রেটারি আর্গাইল চিহ্নিত এবং অচিহ্নিতের বিলক্ষণ পার্থক্য রাখিলেন কিন্তু চিহ্নিত দেশীয় পার্থক্য বজায় রাখা তাঁহার অভিমত হইল না।

এইখানে প্রতিজ্ঞাকাণ্ডের তৃতীয় অভিনয় আরম্ভ হইল। চিহ্নিত ইংরাজ প্রভুগণ প্রস্তাব করিলেন দেশীয় লোকে আর চিহ্নিত হইতে না পায়। কেহ কেহ বলিলেন জেতৃর অধীনে বিজেতার কার্য্য করা সম্পূর্ণ রাজনীতিবিরুদ্ধ। কাহারও বিবেচনা হইল দেশীয় লোকে উচ্চপদে অভিষিক্ত হইলে ইংরাজের রাজ্য শীঘ্রই বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিবে। কোন কোন মহাপুরুষ বলিতে লাগিলেন ইংরাজেরা জাতিশ্রেষ্ঠ। দেশীয়ের উপর প্রভুত্ব করা তাঁহাদের গোত্রাধিকার। এইরূপ বিষম আন্দোলনে সিভিলিয়ান সমাজ উন্মত্ত হইয়া উঠিল। লর্ড লিটন তখন ভারত সিংহাসনের প্রতিনিধি সম্রাট। ইনি আবার সিবিলিয়ান সম্প্রদায়ের শিরোভূষণ, উদার নীতির দ্বেষ্টা ও স্বেচ্ছাচার শাসনের বিধানকর্ত্তা। লার্ড লিটন বুঝিলেন ভারতবাসীকে প্রশ্রয় দেওয়া ভাল নহে, বিজেতার নিকট জেতার অধীনতাও নীতিসঙ্গত নহে। ভারতবাসী হাজার বুদ্ধিমান হউন, লেখাপড়া শিখুন, তথাপি তিনি "কালা আদমী।" ইংলণ্ডবাসী হাজার মূর্খ হউক হৃদয়হীন হউক, অত্যাচারী হউক প্রজাপীড়ক হউক, তথাপি তিনি জেতৃজাতি ইংরাজ—জেতাবিজেতা কখনই সমহার সমান অধিকার লাভ করিতে পারে না। ষ্টেট সেক্রেটারি পার্লিয়ামেণ্টকৃত ব্যবস্থা এবং মহারাজ্ঞীর

প্রতিজ্ঞাবাক্য স্মরণ করিয়া লীটনের স্বার্থপরতায় সম্মতি প্রদান করিতে পারিলেন না। সিভিল সার্ব্বিস প্রশ্ন জলে স্থলে পড়িয়া রহিল।

লীটনের কার্য্যকাল হইতে ইংরাজ সিভিলিয়ানদিগের একপ্রকার মনোরথ সিদ্ধ হইয়াছে। তিনি দেশীয় ব্যক্তিগণকে সিভিল সার্ব্বিস হইতে তাড়াইবার অভিপ্রায়ে তাহাদের জন্য একটী স্বতন্ত্র মধ্যবর্ত্তী পরীক্ষা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। ইংরাজ সিভিলিয়ান সম্প্রদায় তাঁহার কার্য্যকাল হইতেই অধিক পরিমাণে স্বেচ্ছাচারী হইয়া পড়িয়াছেন। এখন সিবিলিয়ান সম্প্রদায়ের অনেকেই ভারতবাসীকে মানুষ বলিয়া বিবেচনা করেন না, দেশীয় লোকের অধিকার তাহাদের সহিত সমান হইতে পারে ইহা হুজুরদিগের বিচারে সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। লীটনের সময় হইতে ইহাদের বিচারও একদেশদর্শী হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বে আমরা অনেক ম্যাজিষ্ট্রেট, জজ ও কমিসনারের কথা শুনিয়াছি তাঁহাদের নাম আজ পর্য্যন্ত আমাদের চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। লীটনের সময় হইতে পার্থক্য ভাব প্রবল হয়, দেশীয়ের উপর ইংরাজের ঈর্ষা বৃদ্ধি হয়। এখন সিভিলিয়ান প্রভুদিগের শতের মধ্যে ৫ জনকেও নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতে দেখা যায় না।

লীটনের পর লার্ড ডফরিণ দেশী বিদেশীর সামঞ্জস্য করিয়া সাধারণের প্রীতিভাজন হইয়া চলিয়া গেলেন। লার্ড ডফরিণের সময়ে এখন প্রতিজ্ঞাকাণ্ডের চতুর্থ অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে। মহারাজ্ঞী ভারতেশ্বরীর গবর্ণমেণ্ট এতদিনের পর আবার এই সিভিল-সার্ভিস প্রশ্নের উত্থাপন করিয়াছেন। এবার যাহাতে ইউরোপীয়দিগের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ভিন্ন অন্যান্য কার্য্যে ভারতবাসিগণ নিযুক্ত হইতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য একটী কমিশন নিযুক্ত করা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের রেজোলিউসন পাঠ করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে এবার প্রতিজ্ঞাবাক্য সম্পূর্ণরূপে লঙ্ঘন করিবার জন্য এই কমিসন নিয়োগের আড়ম্বর। ভাবে বোধ হইতেছে লীটনের মধ্যবিদ্ সিভিলসার্ভিস পরীক্ষার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট ক্ষান্ত হইবেন। বিষয়টি বড় গুরুতর আবার লার্ড লীটনের সমনৈতিক লার্ড ডফরিণ যখন ইহার মধ্যবর্ত্তী তখন বোধ হয় আমাদের দেশের রাজনৈতিক উন্নতি সম্বন্ধে এমন প্রয়োজনীয় বিষয় আর দ্বিতীয় নাই। লীটনের কৃত ছেলে ভুলান মধ্যবিদ্ সিভিল সার্ভিস লইয়া কখনই আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারি না। ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট একবার ন্যায়যুক্তি এবং সহৃদয়তা প্রদর্শন করিয়া ২৫ কোটী লোকের সম্মুখে সমগ্র সভ্য জগতের প্রতিনিধিগণের সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া যে প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইলেন কর্ত্তব্যশীল, ধর্ম্মপরায়ণ ব্রিটীশ জাতি সেই প্রতিজ্ঞা পরিপূর্ণ করেন ইহাই আমরা দেখিতে চাই। কূটদর্শী শাসনকর্ত্তাগণ, স্বার্থপর অনুদারনৈতিক এংলোইণ্ডিয়ানগণ রাজরাজেশ্বরীর প্রকাশ্য প্রতিজ্ঞালঙ্ঘন করিয়া ইংরাজ জাতিকে নরকস্থ করিতে পারিবেন তাহা আমাদের বোধ হয় না। যদি মনুষ্যত্ব এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ইংরাজকে পরিত্যাগ করিয়া না থাকে তবে রাজপ্রতিজ্ঞা কখনই লঙ্ঘন হইবে না। এই একটী কার্য্যে সভ্যজগৎ জানিতে পারিবে

ইংরাজ রাজ্যের মূলদেশে সত্য এবং সাধুতার বল আছে কিনা। আমরা নকল সিভিলসার্ভিস প্রার্থনা করি না। ইংরাজের সহিত সমান অধিকার লাভ করিয়া আসল চিহ্নিত সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষার্থী হওয়াই আমাদের অভিপ্রায়। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এতদিন নামতঃ ভারতবাসীর জন্য সিভিল সার্ভিস খুলিয়া রাখিয়াছিলেন কিন্তু কার্য্যতঃ উনিশ বৎসরের অনূর্দ্ধ বয়স্ক দুগ্ধপোষ্য বালকগণকে পরীক্ষা দিবার আদেশ করিয়া ভারতবাসীর পরীক্ষা পথে কণ্টক বসাইয়া দিয়াছেন।—এ কণ্টকটী উঠাইয়া দিয়া যাহাতে পরীক্ষার জন্য ২৫ বৎসরের অনূর্দ্ধকাল বয়স নির্দ্দিষ্ট হয়, ইহাই আমাদের দ্বিতীয় প্রার্থনা। তারপর পরীক্ষা দিবার জন্য বিলাতে যাইবার একটী ব্যবস্থা আছে, ভারতসভার অভিমত যে ভারতবর্ষেও ইংলণ্ডের ন্যায় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। ব্যবস্থাটী সুবিধাজনক বটে—কিন্তু আমাদের বিবেচনা হয় সিভিল সারভাণ্টগণের বিলাতে যাওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। সিভিল সার্ব্বিস পরীক্ষা যদি উচ্চতমশিক্ষার চূড়ান্ত পরীক্ষা হয়, তবে বিলাতের আচার ব্যবহার, কথাবার্ত্তা, শিক্ষাপদ্ধতি, রুচি প্রবৃত্তি ইত্যাদি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করা আবশ্যক। বিলাতে গিয়া কিছুদিন না কাটাইলে ইংরাজী শিক্ষা কখনই সম্পূর্ণ হইতে পারে না। বৈষ্ণবের যেমন নদীয়া ও বৃন্দাবনে না গেলে ধর্ম্ম বৃত্তি চরিতার্থ হয় না, ইংরাজী শিক্ষার্থীর ইংলণ্ডে গিয়া অভিজ্ঞতা লাভ না করিলে, তাহার ইংরাজী শিক্ষা সেইরূপ কখন সম্পূর্ণ হইতে পারে না। এদেশে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার ব্যবস্থা করার অনেক সুবিধা আছে। চিহ্নিত পরীক্ষার জন্য বিলাতে যে সকল প্রশ্ন নির্দ্দিষ্ট হইয়া পরীক্ষা হয় এখানেও সেই সকল প্রশ্ন নির্দ্দিষ্ট হইয়া পরীক্ষা হয়, এখানেও সেই সকল প্রশ্ন দিয়া সেই প্রকারেই পরীক্ষা গ্রহণ করা যাইতে পারে, কিন্তু বিলাতে গিয়া সম্পূর্ণ শিক্ষা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

সিভিল সার্ব্বিস সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য, সংক্ষেপে প্রকাশ করিলাম। সিভিল সার্ব্বিস পরীক্ষা লইয়া অনেক বার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। তাহারও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আমরা পাঠককে অবগত করিলাম, পাঠক দেখিবেন যে কয়টী পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহার পরিণামে আমাদের অমঙ্গল ভিন্ন মঙ্গল সাধিত হয় নাই। মহারাজ্ঞীর প্রতিজ্ঞাবাক্য, পার্লিয়ামেণ্টের ব্যবস্থা এ সকলের সম্মান রক্ষা হয় নাই। যে উদ্দেশ্যে উপস্থিত কমিসন নিযুক্ত হইয়াছে তাহাতেও প্রজার উপর অবিশ্বাস ও পার্থক্যভাবের প্রচারমাত্র হইয়াছে। আমরা চাই কেবল মহারাজ্ঞীর প্রতিজ্ঞানুযায়ী কার্য্য হউক, ইংরাজ জাতির সম্মান রক্ষা হউক, আমাদেরও প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হউক। এক উদ্যোগে এতগুলি গৌরবের কার্য্য সম্পন্ন হয় ষ্টেট সেক্রেটারীকে তাহা বুঝাইয়া দিবার জন্য ইংলণ্ডে কি লোক নাই? মেকলে ইহজগত ত্যাগ করিয়াছেন, ভারতবাসিকে সিভিল সার্ভিসে সম্পূর্ণ অধিকার দিবার জন্য আর কে চেষ্টা করিবে?

সরকারী কার্য্যে মুসলমান নিয়োগ। ২৩ কার্ত্তিক ১২৯৩। ৫১ সংখ্যা

সেদিন বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট বঙ্গদেশীয় মুসলমান ছাত্রদিগের প্রতি বিশেষ কৃপাদৃষ্টি করিয়া তাহাদের জন্য ৪৫টা নূতন ছাত্রবৃত্তির সৃষ্টি করিলেন, আবাব সম্প্রতি একটি রেজলিউসন বাহির হইয়াছে যে সরকারী কার্য্যে মুসলমান কর্ম্মচারীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প। যাহাতে এই সংখ্যার বৃদ্ধি হয় উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণ স্ব স্ব বিভাগে তাহার ব্যবস্থা করিবেন। কোন্ উপায়ে রাজ সরকারে অধিক সংখ্যাব মুসলমান কর্ম্মচারী নিযুক্ত কবিতে পারা যায়, অথচ গুণের অনাদর কবা হয় না, বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট তৎসম্বন্ধে কার্য্যাধ্যক্ষগণের পরামর্শ চাহিয়াছিলেন। অধ্যক্ষগণ তাঁহাকে যে বিপোর্ট লিখিয়া পাঠাইয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া ছোট লাট স্থির করিয়াছেন মুসলমানদিগের সংখ্যা এবং গুণের বিবেচনা করিয়া অনেক ডিষ্ট্রিক্টে তাহাদিগকে সবকাবী কাযো নিযুক্ত করা হয় না।

এখন দেখা যাক্ মুসলমানেরা যে সরকাবী কাযো অধিক সংখ্যায় নিযুক্ত হইতে পান না তাহার কাবণ কি? লড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের শাসনকালে পুর্ব্বে যখন উর্দ্দু ভাষাই বঙ্গদেশের আদালতের ভাষা ছিল তখন উকিল মোক্তারেব দলে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা অধিক ছিল। বিচাব বিভাগে মুসলমান সবকারী পদগুলিতে একেবাবে একচেটিয়া করিয়া বসিয়াছিল। বেণ্টিঙ্ক যেই বিচাবালয়ে প্রাদেশিক ভাষাব প্রচলন করিবাব ব্যবস্থা করিলেন, অমনি বিচার বিভাগে মুসলমানের দল ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িল। জুডিসিয়াল ও একজিকিউভ্ বিভাগে উর্দ্দু ভাষাব প্রচলন যেদিন হইতে বন্ধ হইয়াছে হিন্দু জাতি সেইদিন হইতে মুসলমানেব স্থান অধিকাব কবিতে আরম্ভ কবিযাছেন। মুসলমান জাতি ভাষা শিক্ষা কবিতে বডই ভালবাসেন। তাহাবা হাকিম অপেক্ষা মৌলবীব সম্মান অধিক করেন। অর্থের নিমিত্ত স্বীয় জাতিভাষায় জলাঞ্জলি দিয়া ইংবাজি শিক্ষা করিতে তাহারা নিতান্ত অসম্মত। মুসলমানগণ একে বাঙ্গালী হইয়া বাঙ্গালা ভাল জানেন না, তাহার উপর ইংরাজি শিখিতেও তাহারা বড কাতর, সুতরাং বাজসবকাবে তাহাদেব সংখ্যা অধিক থাকিবে কি প্রকারে? হিন্দুর সন্তান পঞ্চমবর্ষ বয়ক্রম হইতে ইংরাজি ও বাঙ্গালা ভাষা শিখিতে আরম্ভ করেন, প্রথম হইতে ইংরাজি শিক্ষাব প্রতি তাহার যত টান্ বাঙ্গালা শিখিতেও ততদূব থাকে না। এইজন্য প্রথম হইতে রাজকর্ম্মচাবিদিগের সহিত তাহার অধিক ঘনিষ্ঠতা হইয়া পডে। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরও ইহার যে যে কাবণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহারও এই মর্ম্ম। মুসলমান যে হিন্দুর ন্যায় চাকরির প্রত্যাশী নহেন তাহা তাঁহারা নিজের মুখেই স্বীকার করিয়া অহঙ্কার করিয়া থাকেন।

বোর্ড অব রেভিনিউ হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে ১৮৮৫ অব্দে মুসলমানেরা বি. এ. পরীক্ষার্থিগণের মধ্যে শতকরা ২০৪ সংখ্যায় এবং বি. এল. পরীক্ষার্থিগণের মধ্যে ২০০৬ সংখ্যায় দাঁড়াইয়াছিলেন। এক বৎসরের মধ্যে ইহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহারা

বি. এ. পরীক্ষায় শতকরা ৩২৪ সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। কালে ইংরাজি শিক্ষায় প্রবৃত্তি জন্মিলে মুসলমান হিন্দুর সমান রাজসংসারে নিযুক্ত হইতে পারিবেন। তাহার সম্ভাবনায় গবর্ণমেণ্ট মুসলমানদিগকে অধিক সংখ্যায় রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিবার পূর্ব্বে যাহাতে তাহাদের ইংরাজি শিক্ষার বহুল বিস্তার হয় তাহার চেষ্টা করেন তাহা হইলে উদ্দেশ্য সাধনের নিকট সম্ভাবনা। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর গুণের অমর্য্যাদা করিতে বিবেচকের ন্যায়ই কার্য্য করিয়াছেন। শিক্ষা এবং গুণের অমর্য্যাদা করিয়া মুসলমানদিগকে অনুগ্রহ করিলে তাহাতে তাঁহাদের নিগ্রহ করা হইত। মুসলমানদিগের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ দেখাইবার জন্য অনেকে ছোটলাটকে ২৫ বৎসরের নিয়মটী পরিবর্ত্তন করিতে বলিয়াছিলেন। অনেকেই জানেন ২৫ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক যুবকগণ আর সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারেন না। মুসলমানদিগের সম্বন্ধে এ নিয়মটী উঠাইয়া দিলে দুই পাঁচজন উপযুক্ত শিক্ষিত মুসলমান সরকারী কার্য্যে প্রবিষ্ট হইতে পারেন কিন্তু ছোটলাট বলেন মুসলমানের উপর এই অনুগ্রহ প্রকাশ করিলে নিয়মটীর উদ্দেশ্যের ব্যতিক্রম ঘটিবে। যাহাতে রাজসরকারে পেনসনগ্রাহীর সংখ্যার হ্রাস হইয়া যায় তাহাই এই নিয়মের উদ্দেশ্য। এইরূপ উদ্দেশ্যের ব্যাঘাত করিয়া কাহারও প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করা গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত নহে। আমরাও এইজন্য ছোটলাটকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।…

সোমপ্রকাশ

সমাজ

রচনা-সংকলন

সমাজ

হিন্দু সমাজের সহিত ব্রাহ্মদিগের সংস্রব রাখা উচিত কিনা ?

২৭ মাঘ ১২৭০। ১৩ সংখ্যা।

১৩ই মাঘের সোমপ্রকাশে হিন্দু সমাজের বলক্ষয় বলিয়া যে প্রস্তাব লিখিত হয়, তাহার সপক্ষ ও বিপক্ষ কয়েকখানি পত্র আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। সেই সকল পত্রে সার কথা অল্প আছে, বিশেষতঃ কোন কোন পত্রে পত্রপ্রেরক অতিশয় ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিয়াছেন, এই নিমিত্ত সেগুলি প্রকটিত হইল না। একজন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন "যে সকল ব্রাহ্ম হিন্দুদিগের সহিত সংস্রব করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের কপটতা করা হয়, তাঁহাদিগের ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দেওয়াও নিতান্ত অকর্ত্তব্য।" ব্রাহ্ম ও হিন্দু উভয়ে স্বতন্ত্র জাতি কি না ? ব্রাহ্ম ও হিন্দুধর্ম্ম এ উভয় সেই স্বতন্ত্র জাতির ধর্ম্ম কি না ? হিন্দুদিগের সহিত সংস্রব রাখিলে ব্রাহ্মদিগের কপটতা হয় কেন ? অগ্রে এ সকলের নির্ণয় না হইলে উল্লিখিত বাক্যের অর্থ হৃদয়ঙ্গম হওয়া সহজ নহে। অতএব অগ্রে তন্নির্ণয় আবশ্যক হইতেছে।

হিন্দু মুসলমান ও খৃষ্টান প্রভৃতি যেরূপ স্বতন্ত্র ধর্ম্মাবলম্বী ও স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে, ব্রাহ্ম ও হিন্দু সেরূপ নহে। ব্রাহ্মেরা এক ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকেন, ইহাই তাঁহাদিগের ধর্ম্ম। হিন্দুদিগেরও এই আদিধর্ম্ম। জনক, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন। আজিও সচরাচর অনেক পরমহংস দৃষ্ট হইয়া থাকেন, তাঁহারা কি স্বতন্ত্র জাতীয় লোক, হিন্দুর মধ্যে বৈষ্ণব শাক্ত গাণপত্য প্রভৃতি অনেক সম্প্রদায় আছে, তাহারা কি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া পরিগণিত হন, রোমান কাথলিক ও প্রটেষ্টাণ্ট প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা কি এক ধর্ম্মাবলম্বী ও এক জাতীয় নহেন। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের কি অনুষ্ঠান ও চিহ্ন ভেদ নাই ? অনুষ্ঠান ও চিহ্ন ভেদ থাকাতে কি তাঁহারা পরস্পর ঈশ্বরের একান্ত বিদ্বিষ্ট হইয়া নরকগামী হইবেন ? ফলতঃ ব্রাহ্মে ও হিন্দুতে বৈলক্ষণ্য নাই, উভয়ে এক জাতীয় ও এক ধর্ম্মাবলম্বী, কেবল কিঞ্চিৎ প্রস্থান ভেদ এই মাত্র। যদি এরূপ হইল, তবে পরস্পর সংস্রব পরিত্যাগ চেষ্টা কেন ? সে চেষ্টা কি উপহাসাস্পদ ও অসঙ্গত নয় ?

এদেশে যত দিন পুরাণাদির প্রাদুর্ভাব না হইয়াছিল, ততদিন কি হিন্দুধর্ম্মের এরূপ অবস্থা ছিল ? তদানীন্তন তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা কি কেবল এক ঈশ্বরের উপাসনাবিধি প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টায় ব্যগ্র ছিলেন না ? একমাত্র ঈশ্বর নিরূপণই কি ষড়দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে ? শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতবাদ সংস্থাপনার্থই কি দিগ্বিজয় করিয়া বেড়ান নাই ? ফলতঃ

অদ্বৈতবাদই এদেশের প্রধান ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্ম নানা কারণে ক্রমে বিকৃত হইয়া ইদানীন্তন দুর্দ্দশাপন্ন হিন্দুধর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে ইহার সংস্কার আবশ্যক। ইহাকে সংস্কৃত করিয়া পুনরায় পুর্ব্বেকার অবস্থায় লইয়া যাইতে হইবে। ব্রাহ্মেরা সেই সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা যদি হিন্দুদিগের সংস্রব পরিত্যাগ করেন, ইহার সংস্কার হইবার সম্ভাবনা কি? হিন্দুরা কুসংস্কারাবিষ্ট, বিশুদ্ধ যুক্তির অনুসরণ করিয়া তাঁহাদিগের কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই, সুতরাং তাঁহারা ব্রাহ্মদিগের সংস্রব পরিত্যাগ করিতে পারেন। কিন্তু ব্রাহ্মেরা বিশুদ্ধ যুক্তির মর্ম্মজ্ঞ হইয়াছেন, তাঁহাদিগের কোন ক্রমেই উচিত নয় যে, তাঁহারা কুসংস্কারাবিষ্টের ন্যায় সামান্য কারণে অথবা অকারণে হিন্দু সংসর্গ পরিত্যাগ করেন।

পত্র প্রেরক লিখিয়াছেন, হিন্দু সংস্রবে থাকিলে কপটতা করা হয়। যজ্ঞোপবীত ধারণ ইহার উদাহরণ স্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে। যাবতীয় শব্দের প্রয়োজনানুরূপ অর্থ হয় না। এক একটি শব্দ এক একটি নির্দ্দিষ্ট অর্থে প্রথম প্রযুক্ত হয়; তাহার পর শব্দরচয়িতারা আপনাদিগের শ্রমের লাঘব করিবার নিমিত্ত আংশিক কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য দর্শন করিলেই অন্য অর্থেও সেই সেই শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। কপটতা ও সাধুতা প্রভৃতি শব্দ সেইরূপে অনমুরূপ অর্থেও প্রযুক্ত হইয়াছে। আশয়ের অসাধুতা না থাকিলে কখন প্রকৃত কপটতা হয় না এবং সে কপটতা হইতে পাপও জন্মে না। যদি কোন ব্যক্তির ব্রাহ্মণানুষ্ঠেয় স্বস্ত্যয়ন শান্তি প্রভৃতি কর্ম্মে শ্রদ্ধা না থাকে, অথচ তাহার মনে মনে এরূপ ইচ্ছা থাকে যে, লোকে উত্তম ব্রাহ্মণ বোধ করিয়া তাহাকে ঐ সকল কার্য্যে শ্রদ্ধাবান্ বোধ করুক এবং তাহার দ্বারা ঐ সকল কার্য্য করাইয়া লউক, তাহা হইলেই সে পাপী হইবে। এই অভিপ্রায়ে যে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবে, তাহারই প্রকৃত কপটতা হইবে। কিন্তু যে ব্যক্তির যজ্ঞোপবীত ধারণের এরূপ অসৎ অভিসন্ধি নাই, সমাজের উন্নতি সাধন করা অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহাতে উপেক্ষা করিলে আমি সেই কর্ত্তব্য সাধনে সমর্থ হই না, সুতরাং আমাকে উপবীত ধারণ করিতে হইতেছে, এই বিবেচনা করিয়া যে ব্যক্তি অগত্যা যজ্ঞোপবীত ধারণ করে, তাহার প্রকৃত কপটতা হইবে কি না? আর তাহার পাপ জন্মিবে কি না? আমি যদি আমার আত্মার কিঞ্চিৎ অপকর্ষ স্বীকার করিয়া অন্য সহস্র সহস্র আত্মার উৎকর্ষ সাধন করিতে পারি, তাহা আমার কর্ত্তব্যতা কি না? ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তাহা পাপ কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইবে কি না?

অপর পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন "ব্রাহ্মগণের ঈশ্বরের প্রীতি মাত্র উদ্দেশ্য, তাঁহারা দক্ষিণে বামে দৃষ্টিপাত না করিয়া সোজা পথে লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইবেন, উহাতে সংসারে যে ফলেরই উৎপত্তি হউক না কেন, এই তাঁহাদের ধর্ম্ম।" বনবাসী ঋষিগণের ন্যায় সর্ব্বত্যাগী হইয়া কেবল অনবরত ঈশ্বর ঈশ্বর করিয়া বেড়াইলেই কি ঈশ্বর প্রীতি হয়? না তাঁহার প্রিয় কার্য্য করিলে তাঁহার প্রীতি হয়? যিনি যে সমাজে

বাস করিতেছেন, সর্ব্বপ্রযত্নে ও সর্ব্বান্তঃকরণে তাহার উন্নতিসাধন চেষ্টা কি ঈশ্বরের প্রধানতম প্রিয় কার্য্য নহে? বোধ কর, এক বালক জলে ডুবিয়া যাইতেছে, সেখানে কয়েকটী স্ত্রীলোক ও বৃদ্ধ আছে, তাহারা বালকটীর উদ্ধারসাধন চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না: উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে। এমন সময়ে এক ব্যক্তি আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া লম্ফ দিয়া জলে পতিত হইয়া বালকটীর উদ্ধার সাধন করিল। পতনকালে দুই একটী বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোককে কিছু আঘাত লাগিল এখন সে পাপী হইবে কিনা? বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোকেরা যে স্থানে দাড়াইয়াছিল, তাড়াতাড়ি বালককে তুলিতে গেলে কোন ক্রমেই তাহাদিগের আঘাত পরিহার করা যায় না, বালকের উদ্ধারকর্ত্তা সেই আঘাতরূপ অনুচিত ব্যাপার ঘটনার শঙ্কা করিয়া যদি বালকের উদ্ধার না করিত, আর সে প্রাণত্যাগ করিত, সেটী ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য হইত কিনা? ভাল আমরা উপবীত ধারণের যেন কপটতা নাম প্রদান করিলাম, কিন্তু এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই একদিকে সেই নামমাত্র কপটতা, অপরদিকে হিন্দু সংস্রব পরিত্যাগ করিলে সমাজের উন্নতিসাধনরূপ কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান হয়, এরূপ স্থলে কি কর্ত্তব্য?

আমরা শুনিয়া বিস্মিত হইলাম, কোন কোন ব্রাহ্ম বলেন, ব্রাহ্মেরা যদি হিন্দুদিগের সহিত একত্র হইয়া থাকেন, ব্রাহ্মের সংখ্যাবৃদ্ধি ও ব্রাহ্মধর্ম্মের বিস্তার জানা যাইবে কেন? লোককে জানাইবার নিমিত্তই কি ধর্ম্মগ্রহণ? তাহা যদি উদ্দেশ্য হয়, দুর্গোৎসবাদিকালে উৎসব কর্ত্তারা যেমন ঢোল ও ঢক্কা (ঢোলের শব্দ অপেক্ষাকৃত অনুচ্চ বলিয়া ঢক্কার সৃষ্টি করা হইয়াছে) প্রভৃতি বাজাইয়া আপনাদিগের ধর্ম্মানুষ্ঠান সকলকে জানাইয়া থাকেন, ইহারাও সেইরূপ ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণকালে ঢোল ঢক্কা ব্যবহার করুন। এস্থলে আর একটী বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক হইতেছে। আমরা ব্রাহ্মদিগের প্রবর্ত্তিত অনুষ্ঠানের বিরোধী কেন, অনেকে তাহা বুঝিতে পারেন না। অদ্য তাঁহাদিগের সংশয় দূর করিয়া দেওয়া যাইতেছে। প্রথম এক্ষণকার প্রচলিত হিন্দু অনুষ্ঠান প্রণালী অকিঞ্চিৎকর ও অনর্থমূল বলিয়া আমাদিগের ভাল লাগে না। ব্রাহ্মদিগের প্রবর্ত্তিত অনুষ্ঠান প্রণালীর অনুবাদ মাত্র। যে ব্যক্তির মূলে অপ্রীতি জন্মিল, তাহার অনুবাদে প্রীতি জন্মিবার সম্ভাবনা কি? অনুবাদ উৎকৃষ্ট হইলেও একদিন প্রীতিকর হইত, তাহাও নহে। আমরা একবার এক রাজার কৃত রাসেলাসের অনুবাদ দেখিয়াছিলাম। তাহাতে আর ইহাতে বড় বৈলক্ষণ্য বোধ হয় না। তাহার অর্থ নাই, ইহারও অর্থ নাই। সেই গ্রন্থখানি কেবল নিরর্থক কতকগুলি শূন্যগর্ভ আড়ম্বর সার নামে পরিপূর্ণ। দ্বিতীয়, যদি এরূপ অকিঞ্চিৎকর অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্ত আকৃষ্ট হয়, প্রকৃত অনুষ্ঠানে ঔদাসীন্য জন্মে সন্দেহ নাই। এক ঈশ্বরের আরাধনা ও ধর্ম্মনীতির অনুষ্ঠানই প্রকৃত অনুষ্ঠান। তাহাই জগতের যাবতীয় মঙ্গলের নিদান।

উপসংহারকালে আমাদিগের আর একটি জিজ্ঞাস্য উপস্থিত হইতেছে। ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। ধীর্ব্বিদ্যা সত্যমক্রোধোদশকং ধর্ম্মলক্ষণং।

এই দশটীর অনুষ্ঠান আর জাতকর্ম্মাদির অনুষ্ঠান এ উভয়ের কোন্ অনুষ্ঠান্ ব্রাহ্মদিগের ভাল লাগে ও কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়।

কন্যাদায়। ১৪ বৈশাখ ১২৭১। ২৪ সংখ্যা

কন্যাবিক্রেতা ব্যতিরেকে এদেশীয়েরা কন্যাজন্মকে বিপদ জ্ঞান করিয়া থাকেন। বিপদ জ্ঞান করিবার অনেকগুলি কারণ আছে। প্রথম, কৌলীন্য। কৌলীন্যের অনুরোধে অযোগ্য পাত্রে কন্যা সমর্পণ করিতে হয়। যোগ্যে যোগ্যে মিলন না হইলে প্রণয় হইবার সম্ভাবনা অল্প। পরস্পর প্রণয় ব্যতিরেকে সংসার বিষময় হইয়া উঠে। কন্যা ও জামাতার অপ্রণয় মাতাপিতার হৃদয় শল্য স্বরূপ হয়। দ্বিতীয়, বাল্যবিবাহ প্রথা। এই কুৎসিত প্রথাও যোগ্য পাত্রে কন্যা সমর্পণের অপর প্রতিবন্ধক। ইহা কন্যাপাত্রের পরস্পর ভাব, মন ও দোষ গুণ অনেক স্থলে পরস্পরবিরুদ্ধ স্বভাবের একত্র সমাগম হয়। এরূপ অবস্থায় সংসারিক সুখভোগের যত সম্ভাবনা, অনুভবশালী ব্যক্তিদিগের তাহা অবিদিত নাই। অনেক স্থলে এরূপও ঘটনা হয়, স্বপরিবারের অন্য ইচ্ছা চরিতার্থ করা দূরে থাকুক, পুরুষ তাহাদিগের ভরণ পোষণেও সমর্থ হয় না। অকৃতী পতির প্রতি পত্নীর ভক্তি থাকা দুর্ঘট। তৃতীয়, শিক্ষাবিরহ। স্ত্রীদলে শিক্ষা নাই বলিলেই হয়, পুরুষদলেও ইহার অনুগ্রহ অল্প। শিক্ষাবিরহে স্ত্রী স্বামির প্রতি ও স্বামী স্ত্রীর প্রতি স্ব স্ব কর্তব্য বোধে সমর্থ হয় না। সুতরাং অনেক স্থলে সংসার সুখের নিমিত্ত হয় না। চতুর্থ কন্যার বিবাহ দায়।

অদ্য শেষোক্ত বিষয়টীর প্রসঙ্গ করাই এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। অনেককে কন্যার বিবাহ দানকালে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়।

যাহাদিগের ছোট, মোটা কাপড় এবং যব ও গমের সংস্থান আছে, প্রলয় উপস্থিত হইলেও তাহারা অবসন্ন হয় না, যদি কন্যা না জন্মে।

কন্যা জন্মিলেই সর্ব্বনাশ! বরের অথবা বরের পিতামাতার অসঙ্গত অর্থলোভই এই বিপত্তির কারণ। অনেক স্থলে এই রীতি দেখিতে পাওয়া যায়, পরিণয় সম্বন্ধ উপস্থিত হইলে বরের পিতামাতা কন্যার পিতামাতার নিকট অসঙ্গত অর্থ প্রার্থনা করে। উচ্চ ঘরে কন্যা সম্প্রদান না করিলে কুলক্ষয় হইবে এই শঙ্কায় কন্যার পিতামাতাকে সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়াও অগত্যা সেই প্রার্থনা পরিপূরণ করিতে হয়। এই কুৎসিত রীতি নিবন্ধন অযোধ্যায় কন্যাহত্যা প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। কন্যা জীবিত থাকিলে তাহার সম্প্রদানকালে আপনাদিগকে দরিদ্র হইতে হইবে, এই

ভয়ে মাতাপিতা কন্যার স্নেহবন্ধন ছেদন করিয়াও তাহার প্রাণবধ করিত। ক্রমে উহা প্রথারূপে পরিণত হইল। সম্প্রতি ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের যত্নে উহা নিবারিত হইয়াছে। তম্মূলক আর একটী শুভ ফল উৎপন্ন হইয়াছে। অযোধ্যার তালুকদারেরা দেখিলেন, কন্যাসম্প্রদান কালের অসঙ্গত অর্থদান নিয়ম যদি অপরিবর্ত্তিত থাকে, তাহা হইলে কন্যাহত্যা নিবারণ নিয়ম সম্যক ফলোপধায়ী হইবে না, এই বিবেচনা করিয়া অল্পদিন হইল, তাঁহারা এই নিয়ম করিয়াছেন, কেহ আপন বার্ষিক উপস্বত্বের অর্দ্ধকের অধিক কন্যা সম্প্রদানকালে ব্যয় করিতে পারিবেন না। এই নিয়মটী যেরূপ হওয়া উচিত, সেরূপ হয় নাই বটে, কিন্তু এতদ্দ্বারাও কষ্টের অনেক নিবারণ সম্ভাবনা হইয়াছে।

বঙ্গদেশে কন্যাহত্যা প্রথা নাই, কিন্তু অনেক স্থলে কন্যার মাতাপিতাকে বরের মাতাপিতার যেরূপ অসঙ্গত অর্থলোভতৃষ্ণা চরিতার্থ করিতে হয়, তাহাতে অনেকে এককালে দরিদ্র হইয়া পড়েন। কলিকাতার স্বর্ণবণিকদিগের যিনি দরিদ্রমধ্যে পরিগণিত, তিনিও ৫০ ভরি স্বর্ণের ন্যূনে কন্যা সম্প্রদানকালে অব্যাহতি পান না। কুলীন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক অর্থগ্রহণপ্রবাদ চিরপ্রসিদ্ধ আছে। এই সকল কারণে কন্যার পিতামাতা আপনাদিগকে কন্যাদানগ্রস্ত বিবেচনা করেন।

এই কুৎসিত প্রথা যে পুর্ব্বে ছিল না, তাহা ধর্ম্মশাস্ত্রকারদিগের বচনদ্বারাই সপ্রমাণ হইতেছে। স্মৃতিকারেরা যে আট প্রকার বিবাহের লক্ষণ করিয়াছেন তন্মধ্যে কিছু এরূপ লিখিত হয় নাই যে, কন্যাদাতাকে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া বরের পিতামাতার অর্থতৃষ্ণা চরিতার্থ করিতে হইবে। কন্যার পিতামাতার যেরূপ সঙ্গতি, তাঁহার কন্যাকে তদনুরূপ বসন ভূষণদ্বারা ভূষিত করিয়া বিদ্বান্ ও সচ্চরিত্র পাত্রে কন্যাদান করিবেন, শাস্ত্রের এই অভিপ্রেত কিন্তু আমাদিগের দেশে প্রায়ই ইহার বৈপরীত্য লক্ষিত হইয়া থাকে। লোকের স্বার্থপরতাদি দোষে শাস্ত্র যথাবিধি প্রতিপালিত হয় না, অনেক স্থলে লোকের স্বার্থ অনুসারে উহা পরিবর্ত্তিত করা হইয়া থাকে।

যাহা হউক, এতদিন মূর্খতার আধিপত্য ছিল, এতদিন যে অসঙ্গত ব্যবহার চলিয়া আসিয়াছে, তাহার কথা নাই, এখন দিন দিন কৃতবিদ্যের দলপুষ্টি হইতেছে, এখন আর এ ব্যবহার শোভা পায় না। কৃতবিদ্যেরা ঔদাসীন্য পরিত্যাগ করিয়া সামাজিক নিয়ম পরিবর্ত্তনে যত্নবান হউক। স্বর্ণবণিকদলেই ইহার সমধিক প্রাবল্য দেখিতে পাওয়া যায়, অতএব তাঁহারা অগ্রে একটী সভা করিয়া অযোধ্যার তালুকদারদিগের ন্যায় একটী সঙ্গত নিয়ম স্থাপন পূর্ব্বক অন্যের আদর্শ পথে দণ্ডায়মান হউন।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের প্রতি উপদেশ। ৮ আষাঢ় ১২৭১। ৩২ সংখ্যা

দিন দিন ব্রাহ্মসমাজের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, দিন দিন সুশিক্ষিত দল ব্রাহ্মধর্ম্মে অনুরাগী হইতেছেন, এটী আনন্দকর শুভলক্ষণ সন্দেহ নাই। মানুষের যে নৈসর্গিক

ধর্ম্মপ্রবৃত্তি আছে, তাহা ভ্রমান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে, বিদ্যার বিমল জ্যোতি যত বিকীর্ণ হইতে থাকিবে, তত সেই ভ্রমান্ধকার দূরীভূত হইয়া বিশুদ্ধ ধর্ম্মের উদয় হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্মই একমাত্র বিশুদ্ধ ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম সর্ব্বাগ্রে ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থানব্যাপী হইয়া সমধিক উজ্জ্বলরূপে শোভা পাইবে সন্দেহ নাই, ভারতবর্ষীয়েরা ধর্ম্মহীন অসভ্য নহেন। ইহাঁদিগের চিরকালের একটী প্রাচীন ধর্ম্ম আছে। তাহা সর্ব্বতোভাবে নির্দ্দোষ অনপকারক বিশুদ্ধ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর না হউক, তাহা অনুৎকৃষ্ট নহে। সুশিক্ষা যখন ইহাঁদিগকে নির্দ্দোষ অনপকারক বিশুদ্ধ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ধর্ম্মের অবলম্বনে প্রবৃত্তি বিধান করিবে, তখন ইহাঁরা ব্রাহ্মধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যে অন্য ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন ইহা কোনক্রমেই সম্ভাবিত বোধ হয় না। ফলতঃ এই ধর্ম্ম কালে কেবল যে ভারতবর্ষের নয়, জগতের একমাত্র ধর্ম্ম হইবে, তাহা বিলক্ষণ বোধ হইতেছে।

এক্ষণে ইহার যেরূপ উন্নতি দৃষ্ট হইতেছে, যদি কয়েকটী প্রতিবন্ধক না থাকিত এতদিন ইহার অধিকতর উন্নতি হইত সন্দেহ নাই। অদ্য উহার অন্যতর একটী প্রতিবন্ধকের কথা উল্লেখ করা যাইতেছে। এটী গুরুতর, শীঘ্র ইহার প্রতীকারের একটী সদুপায় করা নিতান্ত আবশ্যক। অনেক স্থানে ব্রাহ্মসমাজ হইয়াছে যথার্থ, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য উপাচার্য্য ও অধ্যক্ষদিগের যেরূপ ত্যাগশীল, সচ্চরিত্র উদারাশয় ও পরহিতৈষী হওয়া উচিত, অনেক স্থানের ব্রাহ্মেরা সেরূপ হইতে পারেন নাই। না হইবার একটী প্রধান কারণ আছে, সে কারণ এই:

সচরাচর যে যে স্থানে ব্রাহ্মসমাজ দেখিতে পাওয়া যায়, তত্রত্য বিষয়ী লোকেরাই প্রায় তাহার আচার্য্য উপাচার্য্য ও অধ্যক্ষ হইয়া থাকেন। এককালে বিষয় কর্ম্ম এবং ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যতাদি সুশ্লিষ্টরূপে সম্পন্ন হওয়া সম্ভাবিত নহে। বিষয় কর্ম্মের এমনি স্বভাব যে লোককে প্রকারান্তর করিয়া তুলে। এই নিমিত্তই প্রাচীনকাল অবধি ধর্ম্ম বর্ণ বিভাগ ও তন্মূলক শ্রেণী বিভাগ হইয়া আসিয়াছে। এক ব্যক্তি নানাবিষয়ে ব্যাপৃত হইলে কোন কার্য্যেই যথাযথরূপে সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারেন না। ধর্ম্ম কর্ম্ম ও বিষয় কর্ম্ম এ উভয়ের ত বহু অন্তর, যে সকল বিষয় কর্ম্মের পরস্পর সৌসাদৃশ্য আছে, তাহারই অধিক কর্ম্ম এক ব্যক্তির দ্বারা সুন্দর রূপে সম্পাদিত হয় না। এক ব্যক্তির উপরে মাজিষ্ট্রেটী কালেক্টরী ও জজগিরি কর্ম্মের ভার যথাবিধি সম্পন্ন করিতে পারেন?

ভারতবর্ষে যখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি শ্রেণী বিভাগ হয়, তৎকালে বিভাগকর্ত্তারা ব্রাহ্মণদিগের উপরে কেবল ধর্ম্মচর্চ্চা ধর্ম্মরক্ষা ও ধর্ম্মাক্রিয়ানুষ্ঠানের ভার দেন, বিষয় কর্ম্মের সহিত তাঁহাদিগের কোন সম্পর্ক রাখেন নাই, প্রত্যুত ব্রাহ্মণের শূদ্রাদি কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। মনু প্রভৃতিতে ব্রাহ্মণের যে কর্ত্তব্য কর্ম্মের নির্দ্দেশ আছে, তদ্দ্বারাই ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। সে কর্ম্ম

এই : যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ। এ সমুদায়গুলিই ধর্ম্মসংক্রান্ত কর্ম্ম, বিষয় কর্ম্মের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিদিগের মধ্যেও বিষয়ির ও ধর্ম্মযাজকদিগের দল স্বতন্ত্র।

অতএব আমরা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজকে পরামর্শ দিতেছি আচার্য্যতাদির সহিত বিলক্ষণ লোকের সংস্রব পরিত্যাগ করাইবার চেষ্টা করুন। তাঁহারা মূল, অন্য স্থানের ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাদিগের শাখা স্বরূপ। যাহাতে সর্ব্বত্র উৎকৃষ্ট রীতি ও নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়, সে ভার তাঁহাদিগের উপরেই সমর্পিত আছে। তাঁহারা সে ভার গ্রহণ না করিলে অভীষ্ট ফললাভ দুর্ঘট। ভিন্ন স্থানের ব্রাহ্মগণ যদি স্বেচ্ছাচারী হইয়া কার্য্য করেন, ব্রাহ্মসমাজ যুগসহস্রেও আবশ্যক বল প্রাপ্ত হইবেন না। যে উপায়ে কার্য্য করিলে সমাজ কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন, আমরা অদ্য তাহারও নির্দ্দেশ করিতেছি।

প্রথমে যে যে স্থানে ব্রাহ্মসমাজ আছে, তাহার সংখ্যা করিয়া আচার্য্য উপাচার্য্য ও সম্পাদকের বেতনের ব্যয় সংখ্যা করিতে হইবে। সেই সেই স্থানের যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মে অনুরাগী হইবেন, তাঁহাদিগের নিকটে চাঁদা করিতে হইবে। চাঁদায় যে অর্থ সংগৃহীত হইবে, তদ্দ্বারা যদি ঐ তিন ব্যক্তির বেতন ব্যয় সম্পন্ন না হয়, যাহা অপ্রতুল পড়িবে মূলসভা সে ব্যয় দিবেন। আচার্য্য উপাচার্য্য ও সম্পাদক অন্য কোন কর্ম্ম করিবেন না, যাহাতে লোকের ব্রাহ্মধর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে, সর্ব্বোতোভাবে তাঁহাদিগকে সেই সেই চেষ্টা করিতে হইবে। সে চেষ্টা পাইতে গেলে তাঁহাদিগকে অনেকগুলি মহৎ ও সৎ বিষয়ের অনুষ্ঠান অবলম্বন আবশ্যক হইবে। প্রথমে ঈশ্বরে অপকট ভক্তি, চরিত্রদোষ সংশোধন, ত্যাগশীলতা, ক্ষমা, ঔদার্য্য, স্বদেশানুরাগ ও স্বদেশের হিতচিকীর্ষা, তাঁহাদিগের এই গুণগুলির সদ্ভাব অতিশয় আবশ্যক। দ্বিতীয়, তাঁহারা অবসরকালে ধর্ম্ম ও পদার্থাদি সংক্রান্ত নানা বিষয়ের অধ্যয়ন, অধ্যাপন ও শ্রবণ দ্বারা আত্মার উন্নতি সাধন ও নিয়তকাল সেই শি [illegible] আচরণ করিবেন।

এইরূপ ব্রহ্মকে দর্শন করিলে কোন্ ব্যক্তির চিত্ত আপনা হইতেই তাহার প্রতি ভক্তিভাবাপন্ন না হইবে? তখন আ কি ব্রাহ্মধর্ম্মে লোকের প্রবৃত্তি জন্মাইবার নিমিত্ত অধিকতর যত্ন পাইতে হইবে? যাহারা এক্ষণকার ব্রাহ্মসমাজ সকলের আচার্য্য ও উপাচার্য্যাদি পদে অধিষ্ঠিত আছেন, তাহাদিগের কেহ আদালতের কেরাণী, কেহ নাজীর, কেহবা ডিক্রীজারীর মুহুরি এইরূপ। প্রথমত আদালতের আমলা ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ, এই কথা শুনিলেই [illegible] অভক্তি জন্মে। আদালতের আমলারা ভাল লোক হন না বলিয়াই ত এদেশের লোকের হৃদয়ে একটী সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া আছে। এই কারণেই ব্রাহ্মসমাজের যথাযথ উন্নতি হইতেছে না।

হিন্দু সমাজ। ৫ অগ্রহায়ণ ১২৭৩

আমাদের সমাজের অধুনাতন অবস্থা সকলেরই আক্ষেপের স্থল হইয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন সম্প্রদায় আক্ষেপ করেন, দেশের সনাতন ধর্ম্ম, সরল ব্যবহার পরিমিত পান ভোজনাদি ও অন্যান্য সামাজিক গুণ ক্রমশ লোপ হইতেছে। নব্য সম্প্রদায় এই বলিয়া আক্ষেপ করিয়া থাকেন, আমাদিগের ধর্ম্ম অতি জঘন্য, ইহা উপধর্ম্ম দ্বারা একান্ত উপহত, সামাজিক ব্যবহার অরুচিকর। বিদেশীয়েরা উভয় দলের প্রতিই দোষারোপ করিয়া বলেন, আমাদিগের তাদৃশ সদনুষ্ঠান নাই, উৎসাহ ও অধ্যবসায় নাম মাত্র, সামাজিক উৎকর্ষ সাধন প্রস্তাবমুখেই লীন হইয়া যায়, কাজ সেই সেকেলে জঘন্য প্রথানুসারে হইয়া থাকে, আমাদিগের অন্তঃপুর প্রণালী স্ত্রী শিক্ষা, ধর্ম্মসংস্কার প্রভৃতি উপহাসের বিষয় হইয়া রহিয়াছে, আমরা ইউরোপীয়দিগের বাহ্য আড়ম্বর ও পাপ সকলের অনুকরণে রত হইয়াছি, পান ভোজনে যত দূর হউক, সেই পর্য্যন্ত আমাদিগের সভ্যতা। অধিক কথা দূরে থাকুক, আমরা আজিও স্বাস্থ্যরক্ষার প্রথম উপায় অবলম্বন করিতে সমর্থ হইলাম না, আমাদিগের গৃহ নির্ম্মাণ প্রণালী কদর্য্য, বাটী পক্ষিপিঞ্জরের ন্যায় সঙ্কীর্ণ ও চতুর্দ্দিকে রুদ্ধ, তাহাও আবার মল পরিপূর্ণ, আমরা কষ্ট ভোগ করিতেছি, কষ্টের কারণ অবগত হইতেছি, তথাপি জাতিসাধারণ আলস্য ও ঔদাসীন্য দোষে তদমূলনে সমর্থ ও প্রিয়পরিজনের প্রাণরক্ষায় যত্নবান হইতেছি না। এক শত দশ বৎসর হইল ইংরাজ সাম্রাজ্য হইয়াছে, ইহার মধ্যেই আমাদিগের সমাজ উচ্ছলিত হইয়া উঠিয়াছে সত্য, কিন্তু আমরা জল হইতে কর্দ্দম স্বতন্ত্র করিতে সমর্থ হইতেছি না। উপরিভাগে যে পরিষ্কৃত জল আমাদিগের নয়নগোচর হইতেছে তাহার নীচে কর্দ্দম রহিয়াছে, স্বল্পমাত্র আলোড়ন হইলেই পুনর্ব্বার তাহা কর্দ্দম দ্বারা কলুষিত হইয়া উঠে। এ অবস্থার সংশোধন ও উৎকর্ষলাভের উপায় কি? যদি বল রাজশক্তি দ্বারা সে অভীষ্ট সাধিত হইবে, তাহা কত দূর যুক্তিসঙ্গত ও সম্ভাবিত তাহা একবার বিবেচনা করা আবশ্যক।

সত্য বটে এদেশে এক্ষণে ইংলণ্ডের ক্ষমতা দৃঢ়ীভূত হইয়াছে, পূর্ব্বতন মহারাষ্ট্রীয় দৌরাত্ম্য, শিখ যুদ্ধ অথবা ১৮৫৭ অব্দের বিদ্রোহের পুনর্ঘটনের সম্ভাবনা নাই। এদেশে প্রগাঢ় শান্তি বিরাজমান হইতেছে; গবর্ণমেণ্ট নিজে আভ্যন্তরীণ শাসন প্রণালীর উৎকর্ষ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যতদূর সম্ভব পদার্থ ও শাসন সংক্রান্ত উৎকর্ষ সাধন গবর্ণমেণ্টের দ্বারা হইতেছে, আরও হইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু সমাজে গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই। অধিকার থাকিলেও ইহাতে হস্তার্পণ করা তাঁহাদিগের অভিপ্রেত নহে। ইচ্ছা থাকিলেও সে হস্তক্ষেপে অনিষ্ট বিনা ইষ্টলাভ সম্ভাবনা নাই। সিজরের প্রাপ্য সিজরকে দেওয়াই কর্ত্তব্য। সমাজের উন্নতি সাধন সমাজের নিজেরই কর্ত্তব্য।

যদি রাজা দ্বারা না হইল, তবে আমাদিগের সমাজের উন্নতি কাহার দ্বারা কিরূপ হইবে? খৃষ্ট, মহম্মদ ও লুথর প্রভৃতির কাল অতীত হইয়াছে। আমাদিগের দেশের একটী বিশেষ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। আমরা আদিম আমেরিকান অথবা প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপবাসিদিগের তুল্য শূন্যহৃদয় নহি যে, যে কোন উপদেশ আমাদিগের হৃদয় ক্ষেত্রে দৃঢ়তর রূপ বদ্ধমূল হইবে। আমাদিগের প্রাচীন ধর্ম্ম ও প্রাচীন ব্যবহার আছে। যাঁহারা এ সকল ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা অসময়ে পরিপক্ক হইয়াছেন। তাঁহাদিগের দ্বারা দেশের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই। যেরূপ রাজনীতি সম্বন্ধে হইতেছে, সমাজেরও সেইরূপ জাতিসাধারণ্যে উন্নতি সাধন চেষ্টা করা আবশ্যক। আমাদিগের উদ্দেশ্য এই দেশের প্রধান প্রধান লোকেরা ইংলণ্ডের "সামাজিক বিজ্ঞান সভার" (সোসিয়াল সায়েন্স কংগ্রেসের) ন্যায় এক সভা করুন। মধ্যে মধ্যে দেশের স্থানে স্থানে সভার অধিবেশন হউক। রেলওয়ে হওয়াতে এই উপায় সহজ হইয়া উঠিয়াছে। সভ্যগণ সমাজের অবস্থা ও উন্নতির প্রস্তাব ও তৎসম্পাদন চেষ্টা করুন। তাহা হইলে যথার্থ কাজ হইবে। রাজপুতনার সর্দ্দারগণ ও অযোধ্যার তালুকদারেরা একবাক্য হইয়া বিবাহের অসঙ্গত ব্যয় ও শিশুকন্যা হত্যা নিবারণ করিয়াছেন। একতার এই ফল। কলিকাতা, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, পাঞ্জাব, বোম্বাই ও মান্দ্রাজের প্রধান প্রধান লোকেরা সভা করিয়া এই সকল বিষয়ের আলোচনা ও তর্ক করুন। ইংলণ্ডীয় "সামাজিক বিজ্ঞান সভা" অনেক কাজ করিতেছেন, এ দেশেও সে প্রকার না হইবে কেন? রেবরেণ্ড লঙ সাহেব মধ্যে এই চেষ্টা পান কিন্তু তাহা ফলবতী হয় নাই। আমরা আপনারা চেষ্টা না পাইলে অভীষ্ট লাভের সম্ভাবনা নাই। আমাদিগের কাজ আমাদিগেরই করা কর্ত্তব্য

নবদলে ময়ূরসজ্জা। ৫ অগ্রহায়ণ ১২৭৫

গল্পে আছে, কাক ময়ূরের পক্ষ হইয়া ময়ূর সাজিয়াছিল, শেষে সে কাক ও ময়ূর উভয় দল হইতেই তাড়িত হয়। আমরা এক্ষণে সেই ময়ূরসজ্জা প্রত্যক্ষ করিতেছি। নব্যদলের কতকগুলি অসার লোক ইংরাজী পড়িলাম সাহেব হইলাম মনে করিয়া সুরা ও সাহেব দ্রব্য ভোজে অনুরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন। ইহাতে এই ফল লাভ হইয়াছে, তাঁহারা হিন্দু ও ইংরাজ উভয় দলেরই অগ্রাহ্য হইয়াছেন। তাহারা হিন্দুদিগের নিষিদ্ধ অভক্ষ্য ভক্ষণ ও অপেয় পান করেন বলিয়া হিন্দুরা ঘৃণা করেন। আর সাহেবরা অসার ও অপদার্থ ভাবিয়া অশ্রদ্ধা করেন। উভয় দলের এরূপ অশ্রদ্ধেয় হইয়া থাকা বিড়ম্বনা সন্দেহ নাই। ইংরাজেরা যে বড়লোক হইয়াছেন সে পান ভোজনের গুণে নয়, তাঁহাদিগের বিশেষ গুণ ও বিশেষ ক্ষমতা আছে। তাঁহাদিগের অনুকরণ প্রবৃত্ত হইয়া

পান ভোজনে রত হইয়া নব্যদলের তত্তদগুণার্জ্জনে যত্নবান হওয়াই উচিত। নব্যদল বলিবেন, আমাদিগের সমাজ এরূপ নয়, তত্তদ্‌গুণার্জ্জনে চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হওয়া যায়। প্রতি পদক্ষেপে নানা প্রকার প্রতিবন্ধক আসিয়া উপস্থিত হয়। নব্যদলের কর্ত্তব্য, সমাজদোষ সংশোধন করিয়া সেই সেই বিঘ্ন অতিক্রম করিবার চেষ্টা পান। সমাজ সংশোধিত হইয়া যদি পরিশুদ্ধ হইয়া উঠে, ইংরাজেরা যে যে গুণের নিমিত্ত এত উন্নত হইয়া উঠিয়াছেন, সেই সেই গুণান্বিত বহুসংখ্যক লোক এই হিন্দু সমাজ হইতে প্রাদুর্ভূত হইবে সন্দেহ নাই। একতা অধ্যাবসায় ও সৎক্রিয়াসাহস থাকিলে না হয় এমন কর্ম্ম নাই। ঈদৃশ গুণান্বিত লোক হিন্দু সমাজ মধ্যে বিরল বটেন, কিন্তু মধ্যে মধ্যে যে দুই এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহাদিগের তত্তদ্‌গুণ প্রভাবে হিন্দু সমাজের বহুতর উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে ও হইতেছে। যদি এরূপ হইল, অধিক সংখ্যক ব্যক্তির যত্ন হইলে যে হিন্দুসমাজদোষ সংশোধিত হইবে না, ইহা সঙ্গত বাক্য নহে। কালও অলক্ষিতভাবে বিশেষ রূপ সহাযতা করিবে। কাল প্রভাবে প্রতি বৎসরই বহুল পরিবর্ত্ত নয়ন গোচর হইতেছে। উপসংহারকালে নব্য সম্প্রদায়ের প্রতি বক্তব্য এই, তাঁহারা স্ত্রীজনোচিত পান ভোজনাদিতে মত্ত না হইয়া পুরুষোচিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন।

বাল্যবিবাহ ও হিন্দুসমাজের পরিবর্ত্তন। ২০ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৫। ৬০ সংখ্যা

সম্পাদকীয়

দিন দিন হিন্দুসমাজে বহুতর পরিবর্ত্ত হইতেছে। আমরা বাল্যাবধি যে পরিবর্ত্ত দর্শন করিলাম, তাহা যদি একত্র গণনা করিয়া দেখা যায়, হৃদয় বিস্ময়রসে আপ্লুত হইয়া উঠে। দশ-বৎসর পূর্ব্বে কোন পল্লীগ্রামে প্রবিষ্ট হইলে বোধ হইত, বাঙ্গালিরা কেবল ক্রীড়া ও আলস্যে কালক্ষেপ করিবার নিমিত্ত সৃষ্টি হইয়াছেন। গ্রামের বালক অবধি বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই ক্রীড়াসক্ত। বালকদিগের পড়াশুনার নামগন্ধ নাই, যুবকদিগের বিষয় চিন্তা নাই, বৃদ্ধদিগের অন্য কোন কর্ম্ম নাই, কেবল দলাদলি, লোকের নিন্দা, বৃথা গল্প ও ক্রীড়া লইয়া আছেন। এখন সেই সেই গ্রামে প্রবেশ করিলে গ্রামের আর সে ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না। বালকেরা লেখা পড়ায় অভিনিবিষ্ট হইয়াছে, যুবক ও প্রৌঢ়েরা বিষয়কর্ম্মে ব্যস্ত হইয়া বেড়াইতেছে, বৃদ্ধদিগেরও দেখিয়া শুনিয়া পূর্ব্বভাবের অনেক পরিবর্ত্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে সকলে আলস্য ও ক্রীড়ায় কালক্ষেপ করিতেন বটে, উহার সমুচিত ফল ভোগও করিতেন, অধিকাংশেরই সংসারের বিলক্ষণ অসচ্ছল ছিল। সাংসারিক সুখভোগ দূরে থাকুক, অনেকে অশনবসনাদিরও যারপর নাই কষ্ট পাইতেন। এক্ষণে আর সেরূপ নাই। এখন কি কৃষক, কি শ্রমজীবী মজুর কেহই প্রায় অন্নের নিমিত্ত হাহাকার করে না। গ্রামের মধ্যে যে দুই চারিজন জাত্যাভিমানাদি নিবন্ধন

শ্রমবিমুখ হইয়া আলস্যে কালাতিপাত করে, তাহাদিগেরই যে কিছু কষ্ট আছে এইমাত্র। সাধারণ্যে বলিতে গেলে এই কথা বলিতে হয়, পল্লীগ্রামগুলি পূর্ব্বাপেক্ষা বহুগুণে সৌভাগ্য-সম্পন্ন হইয়াছে।

বিদ্যাদান কার্য্যের প্রাচুর্য্য, বাণিজ্যের উন্নতি ও রেলওয়ের সৃষ্টি এই তিনটীই পল্লীগ্রামের অবস্থা পরিবর্ত্তের প্রধান কারণ। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট যেমন আমাদিগের যাবতীয় কল্যাণের কারণ, তেমনি ইংরাজদিগের সংসর্গ ও তাঁহাদিগের দৃষ্টান্তদর্শন কতগুলি মারাত্মক অনিষ্টের কারণ হইয়াছে। এস্থলে সে পরিবর্ত্তগুলিরও গণনা করা একান্ত আবশ্যক হইতেছে। প্রথমতঃ মাদকদ্রব্য সেবনের সমধিক প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিয়াছে, তৎসহচর অন্য অন্য দোষেরও আবির্ভাব হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ অনেকে যথেচ্ছাচারী হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দুধর্ম্মে এমন অনাস্থা জন্মিয়াছে যে, যে কিছু হিন্দুশাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়, অনেকের তাহা মৌখিকমাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন আর ত্রিকালীন সন্ধ্যাবন্দন ও জপহোমাদি প্রায় দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। কোশাকুশি ও শালগ্রামশিলা অনেকের বাটী পরিত্যাগ করিয়াছেন। অনেকের বাটীতে পূজার পাত্র অনাদরহেতু মনোদুঃখে মলিন হইয়া মঞ্জুষাগত হইয়া আছে। যেগুলিতে অপকার, তাহা বিনা সঙ্কোচে অবলম্বিত হইতেছে, কিন্তু যে পরিবর্ত্তে হিন্দুসমাজের উন্নতি ও মহোপকার লাভের সম্ভাবনা আছে, সেদিকে প্রায় কেহ অগ্রসর হন না। বাল্যবিবাহের উন্মূল একটী মহোপকারক বিষয়। সে পরিবর্ত্তে অল্প লোকের অভিরুচি দেখিতে পাওয়া যায়। সোমপ্রকাশের দুইজন পত্রপ্রেরক দুটী বালকের বিবাহ হইতে দেখিয়া আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন। বাল্যবিবাহ বহু দোষের আকর। আমরা যে এত হীনবীর্য্য ও হীনবল, দেশের জলবায়ু প্রভৃতির দোষই তাহার একমাত্র কারণ নয়, বাল্যবিবাহ বহুল পরিমাণে উহার সহায়তা করিয়া থাকে। কাহার বৃক্ষ রোপণের ইচ্ছা জন্মিলে সে কখন চারা গাছের অপুষ্ট বীজ লইয়া সে ইচ্ছা চরিতার্থ করে না, কিন্তু বঙ্গদেশীয়েরা অনায়াসে অপুষ্ট বীজে সন্তান উৎপন্ন করিতেছেন। সে সন্তানের বলিষ্ঠ ও দীর্ঘজীবী হইবার সম্ভাবনা কি? এদেশের লোকে অধিক বয়স পর্য্যন্ত অধ্যবসায়সহকারে যে কোন কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন না, বাল্যবিবাহ তাহার অন্যতর প্রধান কারণ।

এদেশের দাক্ষিণাত্য বৈদিক শ্রেণীর যে বাল্যবিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে, তাহাই এবিষয়ের চূড়ান্ত। এই শ্রেণীর প্রায় পেটে পেটে সম্বন্ধ হইয়া থাকে। বালকের যখন দশ বা একাদশবর্ষ বয়ঃক্রম হয়, সেই সময়ে উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া যায়। অত অল্প বয়সে দারপরিগ্রহ করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হইলে কত অনিষ্ট হয়, অনুভব করিতে পারেন। তাঁহাদিগের কষ্টের কথা বর্ণন করিয়া শেষ করা যায় না। বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে লেখা পড়া প্রায় সাঙ্গ হয়। অনেকে অল্প বয়সে সংসার ভারাক্রান্ত হইয়া নানাবিপদগ্রস্ত হইয়া পড়েন। অন্য অন্য জাতি দারপরিগ্রহ করিয়া যে সময়ে সংসারে প্রবেশ

করেন, বৈদিকেরা তখন পৌত্র প্রপৌত্রাদি বহু পরিবারে বেষ্টিত হইয়া বিষম বিব্রত হন। তাঁহাদিগের হইতে সেই বহু পরিবারের যথাবিধি লালন পালন ও বিদ্যাশিক্ষা প্রভৃতি সম্পন্ন হওয়া ভার হইয়া উঠে। যিনি বাটীর কর্ত্তা, তাঁহাকে একটী দ্বিপদবিশিষ্ট জন্তু বলিলে হয়। তাঁহার না আছে বিদ্যা বুদ্ধি, না আছে চিত্তের ঔদার্য্য, না আছে বহুদর্শন, না আছে অর্জ্জন ক্ষমতা; অল্প বয়সে বিবাহ সমুদয় হরণ করিয়া লয়। তাদৃশ কর্ত্তার অধীন পরিবারেরা যে কীদৃশ দুর্দ্দশাপন্ন হয়, তাহা অনুভবশালীদিগের দুর্ব্বোধ নহে। পুরুষপরম্পরা এই দুর্দ্দশা হইয়া আসিতেছে; এই নিমিত্ত বৈদিকশ্রেণী মধ্যে প্রকৃত ঐশ্বর্য্যবান্ ব্যক্তি নয়নগোচর হন না, দাক্ষিণাত্য বৈদিকশ্রেণী নিরবধি হতভাগ্য বলিয়াই প্রসিদ্ধ। যতদিন এই শ্রেণীর এ প্রথা প্রচলিত থাকিবে, ততদিন যে ইঁহারা শুধরিয়া উঠিবেন, সে সম্ভাবনা নাই।

এই মাত্র অনিষ্ট হয়। বৈদিক দম্পতীর অন্যান্য জাতিসাধারণে একটি বিপরীত ভাব নয়নগোচর হয়। অন্যান্য জাতীয় পুরুষেরা স্ত্রীর উপরে প্রভুত্ব করেন; কিন্তু বৈদিকশ্রেণীর স্ত্রী পুরুষের উভয়েরই প্রায় দশ বৎসরের অধিক বয়স হয় না। এদেশে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, স্ত্রীলোকেরা অল্প বয়সে পুরুষের অপেক্ষা অধিকতর বর্দ্ধমান হইয়া উঠেন, সুতরাং বৈদিক স্ত্রীগণ অতিশয় ব্যাপিকা হইয়া পড়েন। তাঁহাদিগের ব্যাপিকা হইবার আর একটী বিশেষ কারণ আছে। সমবয়স্ক হওয়াতে পুরুষেরা স্ত্রীর মনোরঞ্জনে সমর্থ হন না। সম্পংসুখভোগ করাইয়া যে তাঁহাদিগের চিত্ত আকর্ষণ করিবেন, পুরুষের সে ক্ষমতাও জন্মে না, কাজে কাজেই পুরুষকে স্ত্রীর অনুগত হইয়া চলিতে হয়। যে ভর্ত্তা হইতে ভর্ত্তৃ কর্ত্তব্য কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না, তাঁহাকে ভর্ত্তা বলিয়া স্ত্রীলোকের ভক্তি করিবার রুচি জন্মিবে কেন?

আর একটি অনিষ্ট এই, বৈদিকদিগের স্ত্রীপুরুষে দেখিতে অতি বিসদৃশ হয়। ইঁহাদিগের বাঞ্ছানুরূপ ভোগ সুখ ত হয় না, পুরুষেরা যখন যৌবন সীমা উত্তীর্ণ হন, স্ত্রীলোকদিগের তখন যৌবনচিহ্ন বিগলিত হইতে থাকে।

একটি আশ্চর্য্য এই বৈদিকেরা অষ্টপ্রহর এই কষ্টভোগ করিতেছেন, কিন্তু কাহাকেই প্রায় ঐ জঘন্য প্রথার উন্মূলনে যত্নবান দেখিতে পাওয়া যায় না। এটাও এই শ্রেণীর অপদার্থতার অপর পরিচয়। বৈদিক শ্রেণীর সম্বন্ধ পরিত্যাগ করা অতি সহজ কর্ম্ম। সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিলে জাত্যান্তর হইতে হয় না, একঘরে হইয়াও থাকিতে হয় না; কিন্তু সম্বন্ধ পরিত্যাগের কথা উত্থাপন করিলে যাঁহারা কিছু লেখা পড়া শিখিয়াছেন, তাঁহারা যে উত্তর দেন, আর যাঁহারা কিছু জানেন না, তাঁহারাও সেই উত্তর দিয়া থাকেন। পুর্ব্বপুরুষের প্রতি কি চমৎকার ভক্তি! মদ্যপান করিবার, গাঁজা খাইবার এবং অগম্যাগমন করিবার সময় পুর্ব্বপুরুষ কোথায় থাকেন? ঐ সকলে প্রবৃত্তি বিধানকালে কি কেহ পুর্ব্বপুরুষের দোহাই দিয়া উহা হইতে নিবৃত্ত হন? পুর্ব্বপুরুষেরা কি ঐ সকল কাজ করিয়াছিলেন?

উপসংহারকালে বক্তব্য এই, আমরা বাল্যবিবাহের অনিষ্টকারিতা সুন্দররূপে পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার নিমিত্তই উল্লিখিত কুৎসিত প্রথার বিস্তারিতরূপে বর্ণন করিলাম, পাঠকগণ এটীকে অপ্রাসঙ্গিক জ্ঞান করিবেন না। তাঁহারা বহুদোষকর বাল্যবিবাহের এরূপ উদাহরণ আর পাইবেন না।

চিঠিপত্র। ১৮ কার্ত্তিক ১২৭৫। ৫০ সংখ্যা

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন সম্পর্কে

আমরা দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত ও দুঃখিত হইলাম যে কতিপয় ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়কে ঈশ্বর প্রেরিত মুক্তিদাতা জ্ঞান করিয়া তাহার চরণে পতিত হইয়া তাহার নিকট পরিত্রাণের জন্য প্রার্থনা করেন এবং কেহ কেহ তাঁহার চরণধূলি লহেন কারণ তাঁহাদের বিশ্বাস যে এক্ষণে এই ভারতবর্ষে তাঁহার চরণাশ্রয় ব্যতীত কাহার মুক্তি হইবে না। তিনি একজন ঈশ্বরাবতার। ঐ সকল ব্রাহ্মের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাদের পত্রে কেশববাবুকে "দয়াল প্রভু" "পাপীর গতি" প্রভৃতি শব্দে সম্বোধন করিয়া থাকেন। কখন কখন তাঁহারা কেশববাবুকে লইয়া কোন বিশেষ সঙ্গীত করিতে করিতে রাজপথে পরিভ্রমণ করেন। ব্রহ্মোপাসনাকেও তাঁহারা এমনি সঙ্কুচিত করিয়া ফেলিয়াছেন যে, তাহার আদ্যোপান্ত যোগদান করা সুকঠিন হইয়াছে। কেশববাবুকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা ব্রহ্মোপাসনার এক অঙ্গস্বরূপ করা হইয়াছে। আমরা এক দিবস একজন ব্রাহ্মকে এইরূপ প্রার্থনা করিতে শ্রবণ করিলাম, "হে দয়াল প্রভু। আমি অত্যন্ত পাপী, ঈশ্বর আমার বাক্য শ্রবণ করিবেন না, অতএব আপনি আমার জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করুন।" পত্রেতে কেহ কেহ এইভাবে তাঁহাকে লিখিয়া থাকেন "আপনার দয়াল পিতাকে এই কথা বলিবেন।"

কেশববাবুকে এইরূপ অযথা অধিকার প্রদান করা, তাহাকে পরিত্রাতা বলা, তাহার নিকট পরিত্রাণের জন্য প্রার্থনা করা, তাহার চরণ লেহন করা, তাঁহার নামে বিশেষ সঙ্গীত রচনা করিয়া পথে পথে অথবা সমাজে প্রচার করা ব্রাহ্মধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ কার্য্য। যে সকল ব্রাহ্ম এইরূপ আচরণ করেন, আমরা তাঁহাদিগকে সত্যের ও ভ্রাতৃভাবের অনুরোধে সানুনয় বাক্যে কহিতেছি যে তাঁহারা তদ্রূপ আচরণ করিয়া আপনাদের ও কেশববাবুর মঙ্গলের পথে কণ্টকারোপণ না করেন। যাঁহার নিকট আমরা উপকার লাভ করিতেছি, তাঁহাকে মনুষ্যোচিত শ্রদ্ধা ভক্তি করা অবশ্যই কর্ত্তব্য, কিন্তু তাহাকে "পরিত্রাতা" "ঈশ্বরাবতার" বলা অথবা নীচভাবে তাঁহার চরণ লেহন করা ঈশ্বর এবং সত্যের অবমাননা বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হইতেছে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম কেবল একমাত্র অদ্বিতীয় পবিত্র পরমেশ্বরকে মুক্তিদাতা বলিয়া স্বীকার

করেন। মনুষ্যের উপাসনা করা ব্রাহ্মধর্ম্মের সম্পূর্ণ অননুমোদিত কার্য্য। যে ব্যক্তি অনন্যগতি হইয়া ভক্তির সহিত সেই সত্যস্বরূপ, ন্যায়স্বরূপ, মঙ্গলস্বরূপ, পবিত্র করুণাময় পাপীর গতি ও আশ্রয় পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইবেন এবং তাঁহার নিকট ক্রন্দন ও প্রার্থনা করিবেন, তিনি তাঁহাকে মুক্তিদান করিবেন। প্রত্যেক মনুষ্যের হৃদয়ে তিনি তাঁহাকে লাভ করিবার ইচ্ছা নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন। কোন মনুষ্য বা পুস্তক তিনি ঈশ্বর ও মুক্তিলাভের জন্য নিয়োগ করেন নাই।

উপসংহারকালে কেশববাবুর নিকট আমাদের নিবেদন যে উক্ত ব্রাহ্মগণ তাঁহার সম্বন্ধে যেরূপ আচরণ করিতেছেন, তাহা যদি তাঁহার গর্হিত বলিয়া বোধহয়, তাহা হইলে ঐ স্রোত বন্ধ করিবার কোন উপায় অবলম্বন করিবেন, নতুবা সাধারণের এইরূপ বিশ্বাস জন্মিবে যে, তিনি উক্ত কার্য্যে অনুমোদন করেন।

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী
শ্রীনীলকমল দেব

শান্তিপুর ১৭৯০ শক
৬ কার্ত্তিক।

বাবু কেশবচন্দ্র সেন, তাঁহার অনুচর ও পত্রপ্রেরকগণ। ৫ পৌষ ১২৭৫। ৭ সংখ্যা

সম্পাদকীয়

বাবু কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার অনুচরগণের ব্যবহারবিষয়ক বিস্তর পত্র সোমপ্রকাশে প্রকাশিত হইয়াছে। আরো অনেকগুলি দীর্ঘপত্র আমাদিগের হস্তে রহিয়াছে। এক বিষয় লইয়া অধিকতর আন্দোলন করা আমাদিগের ব্যবহারানুগত নহে। বিশেষতঃ কেশববাবু ও তাঁহার অনুচরগণ বালকবৎ ব্যবহার করিতেছেন। এতদ্বৃত্তান্তপাঠে প্রধানদিগের বিরাগ জন্মিবার সমধিক সম্ভাবনা। অতএব পত্রপ্রেরকদিগের পত্র আমারদিগের হস্তে আছে, তাহাও প্রকাশিত হইবে না, ইহাতে কেহ ক্ষুব্ধ না হন।

বাবু কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার অনুচরগণ ভালরূপে লেখাপড়া জানেন বলিয়া অভিমান করেন। আমাদিগেরও এতদিন ঐ সংস্কার ছিল। কিন্তু তাঁহাদিগের কার্য্য দেখিয়া এখন বিপরীত জ্ঞান জন্মিতেছে। মানুষের চরণরেণুলেহন এটী কি কৃতবিদ্যের পক্ষে লজ্জাকর ব্যাপার নহে? কৃতবিদ্যের এত নীচ কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মে, আমরা অগ্রে ইহা জানিতাম না। কেশববাবু ও তাঁহার অনুচরগণ বিদ্যার অবমাননা করিবার নিমিত্ত কি বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছেন। বাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী আপনার প্রেরিত শেষ পত্রে লিখিয়াছেন, কেশববাবুর দোষ নাই। যিনি অকার্য্যে বা অনুচিত কার্য্যে অনুমোদন করেন, তিনি যে দোষী নন, আমরা এই নূতন শুনিলাম। এক ব্যক্তি হত্যায় উদ্যত হইয়াছে,

আর একব্যক্তি সেখানে আছেন, তিনি চেষ্টা পাইলে হননোন্মতকে নিবারণ করিতে পারিতেন; কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না। তিনি কি প্রত্যবায়ভাগী হইবেন না?

আমরা কেশববাবুকে সরলহৃদয় বলিয়া জানিতাম কিন্তু বাবু যদুনাথ চক্রবর্ত্তী তাঁহার অগ্রে যে প্রশ্ন করেন, আর তিনি তাহার যে উত্তর দেন, তাহাতে তাঁহার সরলহৃদয়তার লেশমাত্রও লক্ষিত হয় না। যে রাজনীতিজ্ঞ দীর্ঘকাল সন্ধি বিগ্রহ চিন্তা করিয়া পরিপক্ক হইয়াছেন, তাঁহার মুখ হইতেও সহসা ঐ প্রকার জটিল ও কুটিল উত্তর নির্গত হয় না।

বাবু কেশবচন্দ্রের কোন্ আলোক সামান্যগুণে যে তাঁহার অনুচরেরা মোহিত হইয়া তাঁহার চরণ রেণু লেহন করেন এবং তাঁহাকে অবতার বলিয়া গণনা করেন, আমরা তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। তিনি সচ্চরিত্র ও ধার্ম্মিক, যদি তাঁহার এই গুণ তাঁহার অনুচরগণের মোহের কারণ হয়, তাহার তুল্য বিস্ময়কর বিষয় আর নাই। মানুষের যেরূপ হওয়া উচিত, তিনি তাহাই হইয়াছেন, তাহাতে অলোকসামান্যতার অণুমাত্র সম্পর্ক নাই, এরূপ সচ্চরিত্র ও ধার্ম্মিক লোক সহস্র সহস্র দৃষ্ট হইয়া থাকেন। যে দেশে ও যে সময়ে ধার্ম্মিক ও সচ্চরিত্র লোক দর্শন দুরূহ, সেই দেশে ও সেই কালে যদি কেশববাবু প্রাদুর্ভূত হইতেন, তাহা হইলেও তাঁহার প্রতি কথঞ্চিৎ চরণরেণু লেহন প্রবৃত্তি বিধায়িনী ভক্তির উদয় হইত, কিন্তু এ সে দেশ নয়, সে কালও নয়। যদি বল তাঁহার উৎকৃষ্ট বক্তৃতাশক্তি আছে, প্রাচীনকালের ডিমস্থিনিস ও সিসিরোর কথা দূরে থাকুক, ইদানীন্তন কালের বার্ক ও সেরিডান প্রভৃতির কথা দূরে থাকুক, তিনি কি বক্তৃতাশক্তিতে ডাক্তার ডফের অপেক্ষা অধিক উজ্জ্বল? তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ কি ডাক্তার ডফের অপেক্ষা প্রবল? কয়জন লোকে ডাক্তার ডফের চরণরেণু লেহন কবিতেছেন, আর কয়জন লোকেই বা তাঁহাকে অবতার মধ্যে গণনা করিয়া তাঁহার চরণাবনত হইতেছেন? কেশববাবুর এক বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র বিশেষ ক্ষমতা আছে বলিয়া যদি তাঁহাকে দেববৎ পূজা করা এবং তাঁহার চরণরেণু লেহন করা সঙ্গত হয়, যাবতীয় বিষয়ে যিনি অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাঁহাকে কি করা উচিত? প্রধানতম ইতিহাসবেত্তা নেবুর জুলিয়স সীজারের বিষয় যেরূপ লিখিয়া গিয়াছেন, কেশববাবুর অনুচরেরা তাহা একবার মন দিয়া শ্রবণ করুন।···

সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে ধর্ম্ম ও বিদ্যা কাহার অধিকতর উপযোগিতা? ১০ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৭

ধর্ম্ম প্রচার ও বিদ্যাদান এ উভয়ের অন্যতর কোনটীর দ্বারা মিসনরিরা এদেশের অধিকতর উপকার সাধন করিয়াছেন? ধর্ম্মান্ধ মিসনরিরা বলিবেন, ধর্ম্ম দ্বারা কিন্তু বাস্তবিক ধর্ম্ম দ্বারা নয়, বিদ্যাদান দ্বারাই তাঁহারা এদেশের অধিকতর উপকার সাধন করিয়াছেন। কেবল ধর্ম্ম গ্রহণ দ্বারা আত্মার উন্নতিলাভ ও মুক্তিলাভ হয় না। যাহাদিগের

হিতাহিতবোধ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান ও চিত্ত শুদ্ধি নাই, তাহাদিগের আত্মার উন্নতি ও মুক্তিলাভ সম্ভাবনা কি ? মূর্খ যে ধর্ম্ম অবলম্বন করুক তাহার এ সকল গুণ হয় না।··· মূর্খের দুষ্কর্ম্ম প্রবৃত্তি দুর্নিবার। আমাদিগের বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট অর্দ্ধ শতাব্দীরও অল্পকাল এদেশে বিদ্যাদান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে এদেশে কি কি ইষ্টলাভ না হইয়াছে ? এদেশে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে বলিলেও হয়। আর সে দেশব্যাপিনী মূর্খতা নাই। অনেকেই মানুষের মত হইয়াছেন। ধর্ম্মনীতির সবিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। অনেকের রাজকার্য্যে সবিশেষ দক্ষতা জন্মিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট বিদ্যাদানে নিবৃত্ত হইয়া যদি কেবল ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হইতেন, সহস্র বর্ষেও এত কাজ করিতে পারিতেন না। বিদ্যালোক ব্যতিরেকে ধর্ম্মও অন্ধকারময় হইয়া থাকে। দুঃখের বিষয় এই, আমাদিগের কতকগুলি যুবক এটী বুঝিতে পারিতেছেন না। তাহারা লেখাপড়া পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া ক্ষেপিয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাদিগের হইতে দেশের ইষ্টসাধক কোন কাজই হইতেছে না। তাঁহারা অকার্য্যকেই কার্য্য জ্ঞান করিতেছেন। একজন বেশ্যার বিবাহ দিয়া মনে করিলেন দেশের অভূতপূর্ব্ব অদ্ভুত শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিলেন! উচ্ছৃঙ্খল স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তিদিগের ইচ্ছা পূরণই যদি কাজ হয়, কেহ যদি এরূপ একটী সম্প্রদায় করেন যে এ সম্প্রদায়ে কোন প্রকার সামাজিক বন্ধন থাকিবে না, যাঁহার যে স্ত্রীকে ও যে স্ত্রীর যে পুরুষে গমনের ইচ্ছা গমন করিবেন, অন্যান্য সমাজে যে কার্য্যকে কুকার্য্য বলিয়া গণনা করেন, ঐ সম্প্রদায়ে সে গণনা থাকিবে না, তাহা হইলে ঐ সম্প্রদায়ে কি লোক প্রবেশ নিবারণ করিয়া রাখা যায়। এ প্রস্তাবে আমাদিগের বক্তব্য এই, যুবকেরা লেখাপড়ায় জলাঞ্জলি দিয়া ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া ক্ষেপিয়া না বেড়ান। যাহাতে বিদ্যার অধিকতর অনুশীলন হয়, তাহা করুন। কতকগুলি লোক বিজ্ঞান সভা করিয়া উহার চর্চ্চা করুন। কেহ কেহ সাহিত্য সভা, কেহ কেহ বার্ত্তা শাস্ত্রাদির আলোচনা সভা, এই প্রকার নানা সভা করিয়া দেশ উজ্জ্বল করিয়া তুলুন। এ সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান না করিলে তাঁহারা দেশের কোন কাজেই লাগিবেন না, নিশ্চয় জানিবেন।

ব্রাহ্মদিগের পৌত্তলিক অপবাদ। ৪ আশ্বিন ১২৭৭

অদ্য সাত বৎসর হইল, কলিকাতার ব্রাহ্মেরা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছেন। যে দলটি আদিসমাজ হইতে বাহির হইয়া আপনাদিগের নাম "উন্নত ব্রাহ্ম" রাখিয়াছেন, তাঁহারা বরাবর আদিসমাজের প্রতি পৌত্তলিক অপবাদ আরোপ করিতেছেন, কিন্তু আদি সমাজ যথার্থই মাতার ন্যায় তাঁহাদের অত্যাচার সহ্য করিয়া আপনার গৌরবের পরিচয় দিয়া আসিতেছেন। ভরসা ছিল, যে কালে ঈশ্বরের নামে এক প্রকার ভাব শান্ত হইবে, কিন্তু এই বৎসর গত হইতে চলিল, উন্নত ব্রাহ্মেরা আদিসমাজের প্রতি অপবাদ আরোপ করিতে

ক্ষান্ত হইলেন না। সুতরাং এসময়ে ইহাতে আমাদের হস্তক্ষেপ করা অনুচিত বোধ হইতেছে না।

উন্নত ব্রাহ্মেরা আপনাদের ধর্ম্মতত্ত্ব প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক পত্রিকায় ক্রমিক উক্ত অপবাদের ঘোষণা দিতেছেন, তৎসমুহ খণ্ডন করা উচিত হইলে তাহা আদিসমাজ করিবেন। এখন উন্নত ব্রাহ্মদিগকে উপদেশছলে এরূপ বলা দুষ্য নহে, যে তাঁহারা সমাজের যে রূপ দোষ থাকা মনে করিতেছেন, প্রায় সেই প্রকারের অনেক দোষ তাঁহাদেরও মধ্যে রহিয়াছে, এবং লোকে দিব্য চক্ষুতে দেখিতে পাইতেছেন। প্রার্থনা করি, তাঁহারা অগ্রে আপনাদের সে সকল দোষ নিবারণ করুন, তবে যেন অন্যকে অপবাদ দে· । উন্নত ব্রাহ্মগণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, তাঁহারা আপনার অনেক পৌত্তলিক ভাব পোষণ করেন কি না? ইহা অনেকেই জানেন যে তাঁহারা হিন্দু পৌত্তলিকতার সহিত সংশ্রব রাখেন না, কিন্তু তাঁহারা যে এক অন্যবিধ বিজাতীয় পৌত্তলিকতা ধরিয়া বসিয়াছেন তাহা তাঁহারা দেখিতে পাইতেছেন না?

প্রথমতঃ যাঁহারা হিন্দুদের কোন ক্রিয়ায় উপস্থিত হওয়া যেমন পাপজনক বোধ করেন, বোধ হয় সাহেবদের গীর্জায় যাওয়াকে সেবকম পাপজনক কনে করেন না, কিন্তু তথায় সাহেবেরা যীশুখ্রীষ্টকে যেরূপ অবতার ও জগদগুরু রূপে ঈশ্বরের সিংহাসনে বসান, তাহা কি প্রতিমা পুজাব ন্যায় পাপজনক নহে? সাহেবগণও প্রাচীন বাইবেল হইতে যত আলৌকিক গল্প বক্তৃতা কবেন তাহা কি পৌত্তলিক গল্প নহে? আডাম ইবের উপন্যাস, মেঘ ভেদ করিয়া ইন্দ্রের ন্যায় যজ্ঞভূমিতে ঈশ্বরের অবতরণ, এবং নূতন বাইবেল যীশুখ্রীষ্টের ভূত ঝাডান প্রভৃতি কি পৌত্তলিকতা নহে? এ সকল কথা ভক্তির সহিত গির্জাতে ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া পাঠ হয়, উন্নত ব্রাহ্মেরা গির্জায় গিয়া তাহা অক্লেশে শুনিতে পারেন। তাঁহারা তৎকাযাকে পাতিত্যজনক বোধ করেন না. কেন না, সাহেবেরা করিয়া থাকেন. কিন্তু তাঁহাবা হযত হিন্দুদিগেব পুবাণ পাঠ শ্রবণ করিতে যাওয়া পাপজনক বলিয়া বোধ করিবেন। তাহারা সাহেবদের এতদূব ভক্ত হইয়া উঠিয়াছেন যে, আপনারা আস্তে আস্তে যে তাঁহাদের ফাঁদে পড়িয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না।

দ্বিতীয়তঃ একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টিয়ানেরা যীশুখ্রীষ্টকে ধর্ম্ম শিক্ষার প্রধান আদর্শ বলিয়া জ্ঞান করেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া উন্নত ব্রাহ্মেরাও যীশুখ্রীষ্টকে ধর্ম্মশিক্ষার প্রধান আদর্শ ও প্রধান গুরু বলিয়া স্থির করিয়াছেন, সেরূপ করা কি এক প্রকার পৌত্তলিকতা নহে? এবং তদ্দ্বারা কি পর্য্যন্ত না মন্দ ফল ফলিতে পারে? ঐ সূত্র ধরিয়াই ত মুঙ্গেরের ব্রাহ্মেরা বড দিন ও গুড ফ্রাইডে উপলক্ষে যীশুর নিকট প্রার্থনা ও যীশুর উপাসনাসৎকারে উৎসব করিয়াছিলেন, আর শুনা গিয়াছে যে রামকৃষ্ণপুরে কোন উন্নত ব্রাহ্ম অন্য কোন ব্রাহ্মের বাটীতে একখানি যীশুখ্রীষ্টের প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া আগ্রহের সহিত সেইখানির চরণে মস্তকাবনত করিয়াছিলেন। এ সকল ব্যাপার কি পৌত্তলিকতা নহে?

তৃতীয়তঃ মুঙ্গের নগরে কোন ব্রাহ্ম যে তাঁহাদের প্রধান আচার্য্যকে পুজা ও তাঁহার চরণে পাপ মোচনের প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং কেহ একথাও বলিয়াছিলেন যে "তাঁহাকে লোকে পৌত্তলিক বলে বলুক তথাপি তিনি সে চরণ ছাড়িতে পারিবেন না" সে সকল কি পৌত্তলিকতা হইতে অল্প? বোধ হয় উন্নত ব্রাহ্মেরা লোকভয়ে এখন আর সেরূপ করিতেছেন না। কিন্তু তাঁহারা মন হইতে কি সেগুলি পরিত্যাগ করিয়াছেন?

চতুর্থতঃ। উন্নত ব্রাহ্মেরা গৌরাঙ্গের খোল লইয়া নগরসংকীর্ত্তন করেন। তাহাতে অনেক হিন্দু যোগদান করেন। ইহা দেখিয়া উন্নত ব্রাহ্মগণ বড় স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন, ভাবেন বুঝি হিন্দুরা তাঁহাদের পথে আসিতেছেন। ফলে সে রূপ মনে করা তাঁহাদের ভুল, কেন না হিন্দুরা অতি উদার স্বভাব, বিশেষ যাঁহারা বৈষ্ণব, তাহারা একদিকে গৌরাঙ্গের খোল ও বৈষ্ণবীর সুর ও অন্য দিকে ভগবানের নাম পাইতেছেন, বাস্তবিক ইহাতেই আনন্দিত হইয়া অথবা কেহ কেহ আমোদে পড়িয়া ঐ সংকীর্ত্তনে যোগ দেন, কিন্তু ব্রাহ্ম হইবার জন্য নহে। বরং নির্ব্বোধ বৈষ্ণবেরা ইহাও মনে করিয়া থাকেন, যে ব্রাহ্মেরা বুঝি হরি ও গৌরাঙ্গের ভক্ত হইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, এইরূপ বোধ করিয়া তাহারা আপন বৈষ্ণবীয় মতেরই পোষকতা প্রাপ্ত হন। উন্নত ব্রাহ্মেরা এপ্রকার কার্য্যদ্বারা কি চতুর্দ্দিকে পৌত্তলিকতাকে পোষণ করিতেছেন না।?

পঞ্চমতঃ উন্নত ব্রাহ্মেরা আপনাদের ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকায় সময়ে সময়ে খ্রীষ্ট, পল, পরীক্ষিৎ, ও প্রহ্লাদ প্রভৃতির চরিত্র ও মাহাত্ম্য প্রকাশ কবেন। ঈশ্বর ভক্তির দৃষ্টান্ত দেখাইবার নিমিত্তে ঐ সকল উপকথা প্রকাশ করা হয়। কিন্তু হিন্দুরা তাদৃশ হিন্দুশাস্ত্রোক্ত উপন্যাস-গুলিকে হিন্দুভাবে, এবং খ্রীষ্টীয়ানগুলিকে খ্রীষ্টীয়ান ভাবে গ্রহণ করেন। তাহাতে কি বিশেষ বিশেষ প্রকারের পৌত্তলিকতাকে পোষণ করা হয় না।?

উপসংহারকালে বলিতেছি যে, উন্নত ব্রাহ্মেরা যীশুর কল্পিত সদ্গুণ এবং অবশ্য তৎসঙ্গে তাঁহার কোন কল্পিত রূপ আপনার সহিত তাহাকে যেরূপে মনে মনেও অনুকরণ করিয়াছেন হিন্দুরাও আদিতে সেইরূপ কতকগুলি ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির সদ্গুণ ও অগত্যা তাঁহাদের রূপ ভাবনার সহিত তাঁহাদের প্রতি ভক্তি করিতেন। সেই ভক্তি ও রূপ ভাবনা যেমন ভারতের কতিপয় প্রতিমার প্রসূতি হইয়াছিল, উন্নত ব্রাহ্মদের ঐ খ্রীষ্টপ্রেম ও খ্রীষ্টরূপ ভাবনাও হয়ত একদিন খ্রীষ্টের প্রতিমা প্রসব করিয়া ভারতের দেবগণের বৃদ্ধি করিবে।

অতএব বিনয় পুর্ব্বক হিতোপদেশ দিতেছি যে, উন্নত ব্রাহ্মেরা যেমন উন্নত নাম লইয়াছেন তেমনি ঐ সকল বিজাতীয় পৌত্তলিক ভাব পরিত্যাগ করিয়া দেশের শ্রীসাধন করেন, এবং আদি সমাজের যদি কোন দোষ থাকে, তাঁহাদিগকে আত্মীয়ভাবে তাহা সংশোধন করিতে বলুন।

দ্বারভাঙ্গা

শ্রাবণ ১৭৯২ শক শ্রীচন্দ্রশেখর বসু।

হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজ। ৯ ফাল্গুন ১২৭৭

শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত এই সমাজটীর সংস্থাপন করেন। ৭ই ফাল্গুন শনিবার ইহার দ্বিতীয় সাংবাৎসরিক উৎসব অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন ও অন্য অন্য ব্রাহ্ম মিসনরিরা সমাজস্থলে উপস্থিত হইয়া উহার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। সমাজস্থলে উপাসনা সঙ্কীর্ত্তন প্রভৃতি যে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, সেগুলি সম্পূর্ণাবয়বে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। অপরাহ্ণে গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া সঙ্কীর্ত্তন করা হয়।

একচত্বারিংশৎ বর্ষ অতীত হইল, রাজা রামমোহন রায় কলিকাতার ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। কৈশব সম্প্রদায়ের ব্রাহ্ম সমাজ তাহারই পরিণাম বিশেষ। এটি উন্নতিরূপ পরিণাম কি বিকৃতিরূপ পরিণাম, তাহা সহজে নির্ণেয় নহে, সে নির্ণয় করিতে হইলে সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া কি কি ফল লাভ হইয়াছে, কি কি ফল লাভ হইবারও সম্ভাবনা, তদনুসন্ধান আবশ্যক। সে অনুসন্ধান করিতে গেলে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা দ্বারা কি ইষ্টলাভ হইয়াছে অগ্রে তদ্দর্শন কর্ত্তব্য।

অন্য অন্য দেশের লোকেরা দুই একটী অবতার ও দুই চারিটী সম্প্রদায় লইয়াই সন্তুষ্ট, ভারতবর্ষীয়েরা তাহাতে সন্তুষ্ট নহেন। ইঁহারা তেত্রিশ কোটী দেবতা, দশ অবতার ও অসংখ্য সম্প্রদায় করিয়াও সন্তুষ্ট হন নাই, আবার নূতন দুটী অবতার স্বীকার করিয়াছেন। এক নদীয়ার চৈতন্যদেব, দ্বিতীয় কলুটোলার বাবু কেশবচন্দ্র সেন। একাদশ অবতার দ্বারা ধর্ম্ম সংক্রান্ত বিষয়ের কি উন্নতি ও লৌকিক বিষয়েরই বা কি উন্নতি হইয়াছে তদনুধাবন করিয়া দেখিলেই দ্বাদশ অবতার দ্বারা কি ইষ্টলাভ সম্ভাবনা আছে, তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। ভারতবর্ষে যত অবতারের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে ততই ধর্ম্ম ও লোকযাত্রা উভয়গত অনিষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছে। দর্শনকারেরা ঈশ্বর বিষয়ক যে বিশুদ্ধ মত সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন, অবতারদিগের পূজারূপ ও ভস্মদ্বারা তাহা আচ্ছাদিত ও বিলুপ্তপ্রায় হইয়া আছে। লোকের বুদ্ধি বিশদ ও পরিস্ফুট না হইয়া ক্রমে কলুষিত হইয়া গিয়াছে। ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানা মতভেদ ও বিশৃঙ্খলা ঘটাতেই "ধর্ম্মার্থ কামা সমবেম সেব্যাযোহ্যেমসক্ত সজনো জঘন্যঃ" সম বিভাগ করিয়া ধর্ম্ম অর্থকাম এই তিনের সেবা করিতে হইবে, যে ব্যক্তি একে আসক্ত হয়, সে জঘন্য ইত্যাদি সাধু বচনন্যস্ত উপদেশগুলি অনাদৃত হইয়া লোকের এমনি ভাব দাঁড়াইয়া যায় যে তাঁহারা লৌকিক বিষয়ের উন্নতি সাধনে একান্ত বিমুখ হন। তাঁহাদিগের এই সংস্কার জন্মে, ধর্ম্মই সার, ধন জন গৃহ উপভোগ প্রভৃতি সমুদায়ই অসার। সুতরাং সামান্য অশন বসনাদিতেই পরিতৃপ্ত হন। এরূপ স্থলে লৌকিক বিষয়ের উন্নতি সম্ভাবনা কি? অভাব জ্ঞান না হইলে তৎপূরণ চেষ্টা হয় না, তৎপূরণ চেষ্টা না জন্মিলে লৌকিক প্রসিদ্ধ

পথও নূতন উপায় আবিষ্কৃত হয় না। চরিত্রদোষও বিলক্ষণ ঘটিয়া গিয়াছে কৃষ্ণোপাসক গোস্বামীদিগের রাসলীলা ও চৈতন্যোপাসক……কাণ্ড… বৃত্তান্ত? চৈতন্য উপাসকদিগের জাতি বিচার নাই, সকলে একত্র আহারাদি করেন, স্ত্রী পুরুষে একত্র উপাসনা করেন, কেশব ভক্তদিগের ব্যবহারও ইহা হইতে ভিন্ন নহে। চৈতন্য উপাসকেরা যেরূপ সঙ্কীর্ত্তন করিতেন, কেশব ভক্তেরাও সেইরূপ আরাধনা করিতেছেন। এখনকার প্রশ্ন এই গৌরাঙ্গ ও তদ্ভক্তগণ হইতে জগতের কি উপকার লাভ হইয়াছে? কোন প্রকার উপকারই ত আমাদিগের নয়নগোচর স্মৃতিপথে আবির্ভূত হইতেছে না, কেবল কতকগুলি ভ্রষ্টচরিত অলস ভোগোপজীবি অপদার্থের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে মাত্র। এপ্রকার লোক হইতে জগতের যে প্রকার শ্রীবৃদ্ধিলাভের সম্ভাবনা, তাহা বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগের বুদ্ধির অবিষয় নয়, ঐ সম্প্রদায় হইতে কুকর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি নয়নগোচর হইতেছে। যে ব্যক্তিতে সার নাই, তাহা হইতে জগতের শ্রেয়স্কর কার্য্যের কি অনুষ্ঠান সম্ভাবনা আছে? কেশব সম্প্রদায় হইতে গৌরাঙ্গ সম্প্রদায়ের অপেক্ষা যে জগতের কিছু অধিক ইষ্ট লাভ হইবে, আমাদিগের ত ভক্তেরা এইকথা বলিবেন, গৌরাঙ্গ সম্প্রদায়ের অধিকাংশ অশিক্ষিত লোক আছে, কেশব সম্প্রদায়ের শিক্ষিত লোকেব ভাগই অধিক। কথা অযথার্থ নয়, কিন্তু এই স্থলেও এই বিবেচনা করিতে হইবে, শিক্ষিতেরা যদি বিষয় বিশেষ মত্ত হন, অশিক্ষিতেব সহিত তাঁহাদিগের বড় ভেদ থাকে না। আমাদিগেরও ত দুঃখ এই যে সকল বালক লেখাপডা করিতেছেন, যাঁহাদিগকে হইতে দেশের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ লাভেব সম্ভাবনা আছে, তাঁহারা ধর্ম্মমত্ত হইয়া কাজের বাহির হইয়া যাইতেছেন।

যাঁহারা ধর্ম্মের চর্চ্চা করেন ও ধার্ম্মিক হন, তাঁহারাই বাতুল, একথা বলাই কি আমাদিগের অভিমত? আমরা কি সকলকে অধার্ম্মিক হইবার উপদেশ দিতেছি? পাঠকগণ এ বিবেচনা করিবেন না। আমাদিগের যুবকগণ সুশিক্ষিত ধার্ম্মিক ও কাজের লোক হন, ইহাই আমাদিগের অভীষ্ট, গিরজা করিয়া উপাসনায় আডম্বর করিলে ধার্ম্মিক হওয়া যায় না, যাঁহারা ঈশ্বরনিষ্ঠ, ধর্ম্মনীতিতে দৃঢতাসম্পন্ন হইয়া সমাজের শ্রেয় সাধনে নিয়ত উদ্যুক্ত হন, তাঁহারাই প্রকৃত ধার্ম্মিক। আমরা যে সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, যে সমাজে প্রতিপালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছি, সেই সমাজে কোন অভাব না আছে? আমরা যদি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সেই অভাব দর্শন ও তৎপ্রতীকার চেষ্টায় উদাসীন হইয়া কেবল ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া বেডাই, আমরা কি ঈশ্বর সন্নিধানে অপরাধী হইব না? কেশবভক্তেরা গৌরাঙ্গ সেবকদিগের ন্যায় যখন স্বতন্ত্র সম্প্রদায় হইয়া পডিলেন, তখন তাঁহাদিগের হইতে আমাদিগের সমাজের প্রত্যুপকার লাভের প্রকৃত আশা নাই। হিন্দু সমাজের যে সকল ব্যক্তি খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন তাঁহাদিগের হইতে হিন্দু সমাজের কি উপকার লাভ হইতেছে? আমরা দুর্ব্বল ও নিস্তেজ বলিয়া বলবান জাতিমাত্রের

উপেক্ষিত হইয়া থাকি; আমরা সাহস ও অধ্যবসায়হীন বলিয়া দুস্তর সাগরাদি গমনাগমন করিয়া বাণিজ্য করিতে পারি না। বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ প্রথা থাকাতে এবং বিধবাবিবাহ প্রথা না থাকাতে সমাজের কত অনিষ্ট ও কষ্ট হইতেছে, এইগুলি চিন্তা করিয়া কৈশব সম্প্রদায়ভুক্ত যুবকেরা যদি সমাজ মধ্যে থাকিয়া উহার সংশোধনের উপায় অন্বেষণ, স্বয়ং তদবলম্বন এবং দৃষ্টান্তপ্রদর্শন করিয়া অন্যের তদ্বিষয়ে প্রবৃত্তি বিধান চেষ্টা করিতেন, আমাদিগের যে কি সুখের বিষয় হইত, স্মরণ করিলে শরীর লোমাঞ্চিত হয়।

এদেশীয়দিগের ইংলণ্ডে গমন। ১৬ ফাল্গুন ১২৭৭

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রথমাবস্থার সহিত ইহার বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। যখন এখানে ইংরাজি শিক্ষার তাদৃশ চর্চ্চা ছিল না, তখন যিনি ৩০০।৪০০ ইংরাজী কথা জানিতেন, তাঁহাকে এক জন বড়লোক বলিয়া পরিগণিত করা হইত, যখন এখানে রেলওয়ের সৃষ্টি হয় নাই এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চল অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল তখন "পশ্চিমে পলায়ন" একটি প্রথা ছিল; সর্ব্বদা যুদ্ধ বিগ্রহাদি হইত। হিন্দুস্থানীরা তখন অশিক্ষিত ছিলেন, গবর্ণমেণ্টও তাঁহাদিগকে বিশ্বাস করিতেন না। বাঙ্গালীরা তখন ইংরাজ শাসনকর্ত্তাদিগের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ ছিলেন, কেবল শাসনকর্ত্তা কেন সেনাপতিগণও মধ্যে মধ্যে ইহাদিগের পরামর্শ লওয়া আবশ্যক বোধ করিতেন। কিন্তু কালসহকারে কতই উন্নতি লক্ষিত হইতেছে, কত বিষয়েই পরিবর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। যে সকল বিষয় মনেও কল্পনা করা যায় নাই তাহা এক্ষণে প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে। লার্ড বেণ্টিক ও সর চারলস ট্রিবিলিয়ান প্রভৃতি মহাত্মাগণ যে জ্ঞানলোক দ্বারা বঙ্গদেশের অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত করিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলেও বিকীর্ণ হইয়াছে। তত্রত্য লোকের সহিত এক্ষণে বাঙ্গালীদিগের প্রতিযোগিতা দাঁড়াইয়াছে। এখন উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে গিয়া পূর্ব্বের ন্যায় প্রতিপত্তি লাভের আশা নাই, সুতরাং পশ্চিমে পলায়নের প্রথাও এক প্রকার উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু এক্ষণে আর একটী নূতন "পশ্চিম" আবিষ্কৃত হইয়াছে। এক্ষণে প্রতি বৎসর বহুসংখ্যক যুবক ইংলণ্ডে গমন করিতেছেন। উন্নতির আশা প্রায় সকলেরই গমনের একমাত্র কারণ। এটি অতিশয় সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। কারণ ইংরাজেরা প্রদেশের শাসনকর্ত্তা; তাঁহাদিগের মাতৃভূমিতে গমন করিয়া তাঁহাদিগের আচার ব্যবহার ও রীতিনীতি দর্শন করা একান্ত আবশ্যক, এটি কেবল পুস্তক ও সংবাদপত্র পাঠে হয় না। পূর্ব্বে ইংলণ্ডে গমন করিলে জাতি ভ্রষ্ট হইতে হইত, কিন্তু এক্ষণে সমাজের আর সেরূপ অবস্থা নাই, বিদ্যালোক প্রভাবে

সমাজ ক্রমেই উন্নতি সোপানে আরূঢ় হইতেছে, লোকের পূর্ব্বতন কুসংস্কার সকল দূরীভূত হইতেছে। অধিক সংখ্যক ভারতবর্ষীয় ইংলণ্ডে গমন করেন, ইহা কাহারও অনুমোদিত নহে, কিন্তু এদেশের প্রধান লোকেরা অগ্রে গমন করেন, এটি একান্ত প্রার্থনীয়। রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি ভারতবর্ষের আদর্শ স্বরূপ ব্যক্তিরা ইংলণ্ডে গমন করাতে অনেক ফল হইয়াছে। ইঁহাদিগের সহিত আলাপ করিয়া তত্রত্য অনেক ইংরাজ ভারতবর্ষীয়দিগের রীতি নীতি জাতির বিষয় উত্তমরূপে বুঝিতে পারিয়াছেন। এখানে আমাদিগের রাজনীতি সংক্রান্ত শত্রুগণ আমাদিগকে মিথ্যাবাদী ও জুয়াচোর বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পান, কিন্তু এ পর্য্যন্ত যে সকল ভারতবর্ষীয় বিলাতে গিয়াছেন, তাঁহারা এই সকল বাক্যের অসারতা প্রতিপাদন করিয়া আসিয়াছেন। আমাদিগেরও আরও সতর্ক হইয়া কার্য্য করা উচিত। ভারতবর্ষের কিছু বিষয়ে ক্রমশঃ ইংলণ্ডীয় সর্ব্বসাধারণের চক্ষু উন্মীলিত হইতেছে। আমরা যুবকদিগকে অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা শিক্ষিত না হইয়া যেন ইউরোপে গমন না করেন, তাঁহাদিগের যেন স্মরণ থাকে তাঁহারা সকলেই ভারতবর্ষের প্রতিনিধি স্বরূপ। তাঁহারা তথায় যে পরিমাণে সদ্ব্যবহার করিবেন, সেই পরিমাণে ইংরাজ জাতি ভারতবর্ষকে স্নেহমনে দর্শন করিবেন। লণ্ডন ও প্যারিসের ন্যায় প্রলোভনের স্থান আর নাই। তাঁহারা যেন ঐ সকল প্রলোভনের হস্তে পতিত না হন। তাঁহারা অত্রত্য যুবকবৃন্দের গুণগুলি গ্রহণ করিয়া দোষ ভাগটী পরিত্যাগ করেন, এই আমাদিগের প্রার্থনা। যে সকল ব্যক্তি স্ব স্ব আত্মীয়-দিগের ইংলণ্ডে প্রেরণ করিতে চাহেন, তাঁহারা যেন অগ্রে ঐ সকল লোকের চরিত্রের বিষয় উত্তমরূপে পরীক্ষা করেন। একবার ইংলণ্ডীয় সর্ব্বসাধারণে আমাদিগকে মন্দ বলিয়া জানিলে, সহজে সে সংস্কার অপনীত হইবে না।

বিশপ মিলমান ও খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের কৌতুকাবহ উপায়। ২৩ ফাল্গুন ১২৭৭

এদেশে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ হইলে অত্রত্য বালকেরা প্রথম প্রথম খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন, এখন আর সেরূপ করিতেছেন না। এটি অনেক মিশনারি ও অনেক খৃষ্টানুরক্তের খেদ ও অসুখের কারণ হইয়াছে। অসুখ জ্ঞান না হইলে তৎপ্রতিকার চেষ্টা জন্মে না। সম্প্রতি সেই চেষ্টায় বলবতী দৃষ্ট হইতেছে। কলিকাতার মিলমান খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের এক কৌতুকাবহ উপায়ের আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহার উপায় ইচ্ছা ও চেষ্টা এই যে কথকেরা যেমন রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া কথকথা করেন, বাইবেল অবলম্বন করিয়া তেমনি কথকথা করা হয়। বিশপের অভিপ্রেত এই, এই উপায়ে অনেকে আকৃষ্ট হইবেন।

এই উপায়টি চতুর ও মধুর। যাহাতে প্রমোদলাভ হয়, এমন উপায় দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার চেষ্টা পাইলে সমধিক কৃতার্থতা লাভ হয়। কথকতায় সঙ্গীতের আমোদ আছে। এদেশের আপামর সাধারণের মুখে যে রাম ও হরিগুণ শুনিতে পাওয়া যায়, কথকেরা তাহার অন্যতম কারণ। কিন্তু এ উপায়ে মিলমানের অভীষ্টলাভ দুর্ঘট বোধ হইতেছে। হিন্দু শাস্ত্রকারেরা দিবা বিভাগ করিয়া ষষ্ঠ ও সপ্তম বেলা ইতিহাস ও পুরাণ শ্রবণ দ্বারা অতিবাহিত করিবার বিধি দিয়াছেন। হিন্দুরা ধর্ম্মবোধেই উহা শ্রবণ করিয়া থাকেন। খৃষ্ট বিষয়ক কথকতা আরম্ভ হইলে, হিন্দুধর্ম্মে আস্থাবান ব্যক্তিরা ধর্ম্মবোধে কি তাহা শ্রবণ করিবেন? বিদ্যা প্রভাবে যাঁহাদিগের মহাভারত ও রামায়ণাদির কথকতা শ্রবণে অনাস্থা জন্মিয়াছে, তাঁহারা কি খৃষ্ট বিষয়ক কথকতা শ্রবণে অনুরাগী হইবেন? বিদ্বান ব্যক্তিদিগের অনাস্থা হওয়াতেই ক্রমে কথকতা লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে। এখন আর লোকের তেমন অনুরাগ নাই, এখন আর তেমন কথকতাও হইতেছে না। উদার ও বিশুদ্ধ বিদ্যা যত লোকের হৃদয়ের শন্যস্থান আবিষ্কার করিবে, ততই এসকল বিষয়ে অনাস্থা জন্মিবে। এখন যে ভারতীয় যুবকেরা বহুল পরিমাণে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেছেন না তাহারও কারণ এই। তখনকার যুবকদিগের ন্যায়মার্জ্জিত বিদ্যা ও বহুদর্শিতা হইত না, সুতরাং তাঁহারা একটি নূতন প্রকার ধর্ম্ম স্বদেশে অবতীর্ণ দর্শন করিয়া আগ্রহ সহকারে তাহা গ্রহণ করিতেন। নূতন লোকের সমধিক অনুরাগ প্রবৃত্তি জন্মে। এক্ষণে বহুদর্শিতা প্রস্তাবে কোন বিষয়ের আর নূতনতা নিবন্ধন আকর্ষণী শক্তি নাই। কৃষ্ণের উপাখ্যান যাঁহাদিগের কণ্ঠস্থ আছে, খৃষ্টের উপাখ্যানে তাঁহারা কিছুই নূতন দর্শন করিবেন না। কৃষ্ণ ও খৃষ্ট উভয়ের জন্মাদি বহু বিষয়ে সৌসাদৃশ্য আছে। কৃষ্ণের জন্মের পূর্ব্বে দৈববাণী হয়, খৃষ্টেরও জন্মের পূর্ব্বে দৈববাণী হইয়াছিল। কৃষ্ণের জন্মের পর কংস যেমন তাঁহার নিধন চেষ্টা করেন, হেরোজ তেমনি খৃষ্টের প্রাণবধের চেষ্টা পাইয়াছিলেন। বাসুদেব জন্মের পরেই কৃষ্ণকে লইয়া যেমন নন্দালয়ে রাখিয়াছিলেন, খৃষ্টের পিতা তেমনি খৃষ্টকে লইয়া মিসরে পলায়ন করেন। কৃষ্ণ যেমন গোবরধনাদি ধারণ দ্বারা পঞ্চভূতের উপরে ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া যান, খৃষ্টও তেমনি পদব্রজে সমুদ্রপারে গমন এবং তিরস্কার বাক্যে ঝড় ও সমুদ্রকে নিস্তব্ধ করিয়াছিলেন। খৃষ্ট পাঁচটা রুটি ও দুই মৎস্য দ্বারা পাঁচ হাজার লোককে ভোজন করাইয়াছিলেন, কৃষ্ণ অনুকূল দৃষ্টি প্রদান করাতে দ্রৌপদী কণামাত্র দ্রব্য দ্বারা বহুসংখ্য ঋষির পর্য্যাপ্ত ভোজন সম্পাদনে সমর্থ হইয়াছিলেন। খৃষ্টের ক্রুসে বিদ্ধ হইয়া প্রাণ বিয়োগ হয়, কৃষ্ণও ব্যাধের বাণে আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। লাভের মধ্যে এই হইবে, শ্রোতৃগণ খৃষ্ট বিষয়ক কথকতা শ্রবণ করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিবেন, ইউরোপীয়েরা আমাদিগের কৃষ্ণকেই আরাধ্য দেবতা বলিয়া খৃষ্ট নামে আরাধনা করিতেছেন। অতএব আমাদিগের কৃষ্ণকে পরিত্যাগ করিয়া খৃষ্ট ভজনার প্রয়োজন কি? খৃষ্ট বিষয়ক কথকতা

আরম্ভ হইলে বিরূপ দ্বেষ ঘটনা দুর্নিবার হইয়া উঠিবে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট নিরবিচ্ছ বিদ্যাদান করিয়া উপধর্ম্মের উন্মূলন করিতেছেন। লার্ড বিশপ খৃষ্ট বিষয়ক কথকতার সৃষ্টি করিলেই উপধর্ম্মকে বদ্ধমূল করিয়া তুলিবেন। খৃষ্ট তখন আমাদিগের কৃষ্ণের ন্যায় নিঃসংশয় পদ্মচন্দনাদি দ্বারা পূজিত হইবেন, তাহার প্রতিমা পূজাও বিরল প্রচার হইবে না।

সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভা। ১৩ ফাল্গুন ১২৭৭

অবসরোচিত বক্তার ন্যায় অবসরোচিত কর্ম্ম কাহার আদরণীয় না হন? পূর্ব্বাচরিত আচার ব্যবহার এককালে পরিত্যাগ করিয়া স্বচ্ছন্দচারী হওয়া যেমন দোষের, দোষানুসন্ধান ও পরিবর্ত্তন চেষ্টা পরাঙ্‌মুখ হইয়া নিতান্ত অন্ধ ও দুরাগ্রহগ্রস্তের ন্যায় উহাতে একান্ত আসক্ত হওয়াও তেমনি দোষের হয়। সময় বুঝিয়া কাজ করাই বুদ্ধিমানের কর্ম্ম। সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভা হিন্দু সমাজের আচার ব্যবহারের সময়ানুরূপ সংস্কারে প্রবৃত্ত হওয়াতে সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই আনন্দিত হইয়াছেন। সভা উইলিয়ম গ্রে মহোদয়কে যে অভিনন্দন দান করেন, তাহার প্রত্যুত্তর দানকালে, সভা কলের জলপান ও গোবীজে টীকা দিবার ব্যবস্থা দিয়া যে ঔদার্য্য প্রদর্শন করেন তিনি তাহার উল্লেখ করিয়া সভার উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

সভা কি মূর্খের নিন্দার শঙ্কা করেন? সভার যদি মূর্খকৃত নিন্দায় উপেক্ষা করিবার সাহস না থাকে, আর অধিবেশন না করেন, ইহাই প্রার্থনীয়। আমরা তারস্বরে বলিতেছি, সভা হিন্দু শাস্ত্রোদিত আচার ব্যবহারের সময়ানুরূপ সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলে, কোন বিজ্ঞ ব্যক্তিই তাঁহাকে দূষিত করিবেন না। হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার পরিবর্ত্তনীয় নয় এরূপ নয়।...পূর্ব্বে সমুদ্র যাত্রাদি প্রতিষিদ্ধ ছিল না। কলির প্রথমে কতকগুলি মহাত্মা একত্র হইয়া ইহার পরিবর্ত্তন করেন। পরিবর্ত্তনের কোনপ্রকার প্রয়োজন তাহাদিগের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল সন্দেহ নাই। ·

এক্ষণে প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ আবশ্যক।... এই এক্ষণে এদেশে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থই সর্ব্বপ্রধান। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ উভয়েই অনেকগুলি শ্রেণীভেদ আছে। ঐ সকল শ্রেণীর পরস্পর কন্যা আদান প্রদান প্রথা নাই। কিন্তু ঐ প্রথাটা যাহাতে প্রচলিত হয় সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভার তাহা করা কর্ত্তব্য। রাঢ়ীয়ে ও বারেন্দ্রে, বারেন্দ্রে ও বৈদিকে, বৈদিকে ও রাঢ়ীয়ে পরস্পর কন্যা আদান প্রদানের শাস্ত্রে নিষেধ নাই। কায়স্থদিগেরও দক্ষিণ ও উত্তর রাঢ়ীয়ে পরস্পর আদান প্রদান শাস্ত্রে প্রতিষিদ্ধ নয়। অতএব এ প্রথার প্রচলন বিষয়ে অণুমাত্র কাঠিন্য অনুভূত হইতেছে না। পক্ষান্তরে এ প্রথা প্রচলিত হইলে বহুতর ইষ্ট লাভের সম্ভাবনা আছে। আজিকালি ব্রাহ্মণ কায়স্থ উভয় জাতিরই বিশেষতঃ কায়স্থদিগের কন্যা

সম্প্রদান নিতান্ত কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। যদি দক্ষিণ ও উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থদিগের পরস্পর আদান প্রদান চলিত হয়, তাহা হইলে আর মনোমত বরপাত্র মিলা ভার হইবে না। সুতরাং এক্ষণে মনোমত বরপাত্র সচরাচর না মিলাতে বিবাহ দেওয়ার যে কষ্ট হয়, তাহা দূর হইবে। কেবল এইমাত্র নয়, যাবতীয় অনিষ্টের মূল যে কৌলীন্যপ্রথা তাহা ছিন্নমূল হইবে। কৌলীন্য প্রথা উন্মূলিত হইলেই কুলীন ও মৌলিক বিচার থাকিবে না। তাহা হইলে ঘর ও বর উভয়ই সচ্ছল হইবে। এক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর যে অন্তর আছে, বৈবাহিক সম্বন্ধ হইলে তাহা অন্তঃরিত হইয়া পরস্পরের গাঢ়তর সৌহার্দ্দ বন্ধন হইবে। এখন কৌলীন্য প্রাদুর্ভাব থাকাতে অনেক অযোগ্য বর কন্যার সংযোগ হইয়া অনেক অনিষ্ঠ ও উন্নতি প্রতিবন্ধ ঘটিতেছে, কিন্তু আমরা যে প্রস্তাব করিতেছি, তদনুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইলে যোগ্য বর কন্যার সংযোগ হইয়া অধিকতর উন্নতি হইবারই সম্ভাবনা।

মোগলসরাই বিদ্যোৎসাহিনী সভা ও বিধবাবিবাহ। ৩০ ফাল্গুন ১২৭৭

আমরা অতিশয় আনন্দ সহকারে পাঠকগণের গোচর করিতেছি, হিন্দু সমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিবার নিমিত্ত মোগলসরাই বিদ্যোৎসাহিনী সভা বিশেষরূপে চেষ্টা করিতেছেন। এ চেষ্টা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। বিধবাবিবাহ শাস্ত্র বিরুদ্ধ কি না?… সম্প্রতি উক্ত সভায় এই প্রশ্ন হয়। সভা এ বিষয়ে একটী প্রস্তাব মুদ্রিত করিয়া উহা ভিন্ন ভিন্ন স্থানের পণ্ডিতদিগের নিকটে এবং ধর্ম্মসভায় প্রেরণ করিয়াছেন। আমাদিগের নিকটেও উহার একখণ্ড প্রেরিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যে সকল প্রমাণ প্রয়োগ উপস্থিত করিয়া বিধবাবিবাহের বৈধতা প্রতিপাদন করিয়াছেন, প্রতিপক্ষ পণ্ডিতগণ অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহা খণ্ডন করিতে পারেন নাই। অতএব ইহা যে শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে, তাহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইয়াছে। বিধবাবিবাহ প্রচলিত না থাকাতে যে সকল অনিষ্ট ঘটিতেছে, তাহাও কাহারো অবিদিত নাই। আমরা সভার সহিত সর্ব্বসাধারণকে অনুরোধ করিতেছি যাহাতে বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইয়া সমাজের মঙ্গল সাধিত হয়, তদ্বিষয়ে তাঁহারা সাধ্যানুসারে সভার সাহায্য করেন। দেশহিতৈষী মাত্রেরই এ বিষয়ে স্ব স্ব মত প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। সভা যে রূপে সাধারণের অভিপ্রায় প্রার্থনা করেন, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল:

বিধবাবিবাহ শাস্ত্র ও যুক্তি অনুসারে পণ্ডিতগণের ও সাধারণের অভিপ্রায়	বাসস্থান	স্বাক্ষর

ব্রাহ্মদিগের বিবাহের আইন। ৫ বৈশাখ ১২৭৮

সম্পাদকীয়

ব্রাহ্মদিগের বিবাহ বিষয়ক আইনের পাণ্ডুলেখ্য হইয়াছে। প্রথমে যে পাণ্ডুলেখ্যটী হইয়াছিল. কৈশব সম্প্রদায় ভিন্ন কোন ব্যক্তিই উহার অনুমোদন করেন নাই, প্রত্যুত স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট প্রভৃতি উহার প্রতিবাদ করেন। তন্নিবন্ধন সিলেক্ট কমিটি বহুলভাবে উহার অবয়ব পরিবর্ত্তন করিয়া বিষয় সঙ্কোচ করিয়া আনিয়াছেন। এক্ষণে উহা যেরূপ হইয়াছে, এখন উহাতে ব্রাহ্ম ভিন্ন অন্যের সম্বন্ধ নাই। কেশববাবু ও সর জন লরেন্স যে আইন করাইবার চেষ্টা পান, তাহা বিধিবদ্ধ হইলে সোনাগাছির অনেক গুণবতীর সন্তান বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইত অথচ গুণবতীদিগেব ব্যবসায়ের অণুমাত্র ব্যতিক্রম হইত না। বর্ত্তমানে পাণ্ডুলেখ্যে প্রস্তাব কবা হইয়াছে. বেজিষ্ট্রাবের নিকটে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সপ্রমাণ করিতে হইবে ঃ

প্রথম, বিবাহার্থীরা উভয়েই ব্রাহ্ম ধর্ম্মাবলম্বী। দ্বিতীয়, বিবাহার্থীর স্ত্রী ও বিবাহার্থিনীর স্বামী নাই। তৃতীয়, বরের অন্যান ১৮শ ও কন্যার ১৪শ বৎসর বয়স হইবে। চতুর্থ, প্রদেশীয় ব্যবস্থানুসাবে যে ব্যক্তির সহিত যে ব্যক্তিব বিবাহ সম্বন্ধের নিষেধ আছে, তাহার সহিত তাহার বিবাহ হইবে না। পঞ্চম, স্ত্রীর ১৮শ বর্ষের ন্যান বয়স হইলে তাঁহার পিতা অথবা রক্ষাকর্ত্তার সম্মতি হইতে হইবে।

তৃতীয় ধারায় আছে, কন্যার বয়স ন্যান হইলে তাহাব পিতার অথবা রক্ষাকর্ত্তার সম্মতি আছে কি না? এবং তিনজন সাক্ষী স্বাক্ষর করিয়াছেন কি না? এ ভিন্ন রেজিষ্ট্রার আর কোন অনুসন্ধান করিবেন না কিন্তু এতাবন্মাত্র অনুসন্ধানে প্রকৃত অনিষ্ট ঘটনার নিবারণ দুর্ঘট হইতেছে। বোধ কব একজন ধূর্ত্ত বেশ্যা বিবাহের পূর্ব্ব দিবস ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন কবিল, অনুরক্ত যুবা তিনজন সাক্ষী দিয়া বিবাহ করিল, বেশ্যা নিজ ব্যবসায় পরিত্যাগ করিল না, দৈবাৎ বিবাহকর্ত্তা যুবার মৃত্যু হইল, বেশ্যা তাহার সমস্ত বিভবের অধিকাবী হইয়া বসিল। এরূপ বিবাহ যে অভীষ্ট নয়, যাহারদিগের কিছুমাত্র বিবেচনাশক্তি আছে, তাহারা স্বীকার করিবেন সন্দেহ নাই। আমাদিগের মতে বিবাহার্থিদিগকে প্রমাণ করিতে হইবে, অন্ততঃ এক বৎসর কাল তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, এবং সচ্চরিত্রভাবে অবস্থান করিতেছেন, ইহার প্রামাণ্যার্থ রেজিষ্ট্রারের নিকটে ব্রাহ্মসমাজের কোন আচার্য্যের প্রমাণপত্র দিতে হইবে। স্বামীর বয়স ১৮শ বর্ষ থাকুক, কিন্তু স্ত্রীর বয়সের বিষয়ে কিছু পরিবর্ত্ত করা আবশ্যক। এদেশ উষ্ণপ্রধান এখানে ১৩ বৎসরে স্ত্রীলোকেরা যৌবন প্রাপ্ত হন, অতএব চতুর্দ্দশ বৎসর নিয়ম না করিয়া বিবাহের বয়স দ্বাদশ বৎসর করা কর্ত্তব্য। অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে, এদেশের যে সকল স্ত্রীলোক ব্যভিচারিণী হয়, তাহাদিগের

প্রথম পাপ প্রায় ১৩।১৪ বৎসরেই ঘটিয়া থাকে। অতএব ১২ বৎসর অন্যূন পরিমাণ না করিলে ব্যভিচার বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। ৯ ধারায় আছে, এক স্ত্রী সত্ত্বে পত্ন্যন্তর গ্রহণ দণ্ডবিধির ৪৯৪ ধারানুসারে দণ্ডার্হ, কিন্তু কোন হিন্দু স্ত্রী যদি ব্রাহ্ম স্বামীর সহিত যাইতে না চান, তাহা হইলে স্বামী বিবাহ করিতে পারিবেন কি না? স্ত্রী ব্যভিচারিণী অথবা স্বামী অত্যাচারকারী হইলে পরস্পর পরস্পরকে পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় বিবাহ করিতে পারিবেন কি না? যখন নূতন বিবাহ আইন হইতে চলিল, তখন এ সকল দোষের প্রতিবিধানের উপায় করা কর্ত্তব্য। পরিত্যক্ত স্ত্রী ও বর্ত্তমান স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানদিগের উত্তরাধিকারের নিয়মেরও প্রয়োজন হইতেছে। স্ত্রীলোকদিগের স্বাধীনরূপে বিবাহের সময় ১৮শ বর্ষ করা হইয়াছে; কিন্তু ১৬ বৎসর করা আমাদিগের অভিমত। এই বয়সে কেবল এদেশের কেন, সকল দেশের স্ত্রীলোকেরাই স্বামী মনোনীত করিতে পারেন। ১০ ধারায় আছে, ইতিপূর্ব্বে যে সকল ব্রাহ্ম বিবাহ হইয়া গিয়াছে, তাহা সিদ্ধ হইবে। তবে ইহা প্রমাণ করিতে হইবে যে, তিন জন সাক্ষীর সম্মুখে বিবাহ হইয়াছে এবং যে ব্যক্তির সহিত যে ব্যক্তির বিবাহ সম্বন্ধের নিষেধ আছে, তাদৃশ ব্যক্তির বিবাহ হয় নাই। অপর অষ্টাদশ বর্ষের ন্যূন বয়সে যদি বিবাহ হইয়া থাকে, স্ত্রীর পিতা অথবা রক্ষাকর্ত্তা সম্মতি দিয়াছেন কি না? পূর্ব্বে যে সকল বিবাহ হইয়া গিয়াছে, তাহার বিষয়ে এ সকল অনুসন্ধান করিতে গেলে গোল হইবার সম্ভাবনা। এরূপ ঘটিতে পারে কোন কোন বিবাহে সকল সাক্ষীরই মৃত্যু হইয়াছে। হয়ত এরূপও ঘটিয়াছে, অষ্টাদশ বর্ষের ন্যূন বয়স্ক স্ত্রীলোকের বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু পিতার সম্মতি লওয়া হয় নাই।

ধর্ম্মরক্ষিণী সমাজ। ৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৮। ২৭ সংখ্যা

আহা কিবা শোভা! ধর্ম্মরক্ষিণী সমাজ,
স্থাপিত হয়েছে মহা নগরীর মাঝ,
সম মনু, পরাশর, মিলিয়া পণ্ডিত বর,
কত রাজা, রাজতুল্য মান্যগণ্য জন,
সকলে সভার শোভা করেন বর্দ্ধন।

সনাতন ধর্ম্ম রক্ষা সুমহৎ কাজ,
দেখি পুষ্প বৃষ্টি করে দেবতা সমাজ।
ভূলোক পুলকময়, পিতৃলোক তুষ্ট হয়,

ভারতে শোভিছে সভা পূর্ণিমার ইন্দু,
উথলিল হিন্দুদের সৌভাগ্যের সিন্ধু।

ধন্য ধন্য সাধু সাধু সভাসদগণ,
পণ উঠাইতে ভাল করিয়াছ পণ।
শাস্ত্রে আছে নিরূপণ, নিষিদ্ধ কন্যার পণ,
লোভেতে নরকদণ্ড মানে না কুলীন।
বহু বিবাহ পাপেতে হতেছে মলিন।

বল্লাল বেঁধেছে কুল নবগুণ দিয়া,
কালেতে করেছে বৃদ্ধি যত পাপ ক্রিয়া।
ন-গুণে কুলীন হয়, নির্গুণে কুলীন নয়,
এই রীতি ধর্ম্ম সভা কর প্রবর্ত্তন।
বহু বিবাহ প্রথার কর উন্মূলন।

পণ হেতু কত দুঃখ কর বিবেচনা,
বিবাহে বঞ্চিত নয় নারী কতজনা।
কষ্টে সৃষ্টে যার হয়, সমযোগ্য তাহা নয়
বালিকাতে বৃদ্ধপতি বিষম জঞ্জাল,
বিসদৃশ হয় যেন আকাশ পাতাল।

আবার কুলীন বর বহু স্ত্রীর পতি,
না পারি বর্ণিতে আহা! তাদের দুর্গতি।
সধবা বিধবা প্রায়, দেখ সভা! হায় হায়!
কে খাওয়ায়, কে পরায়, কে সাধ মেটায়
পতি হয়ে লাভ হেতু 'কাটনা কাটায়'!

যা হোক বাঁচিলে পতি নাহি কোন কথা,
এক স্বামী মরে খান কত স্ত্রীর মাথা।
হিন্দুর কপালে হায়! সিন্দুর ঘুচিয়া যায়,
পতির বিরহে দহে সতীর জীবন,
পতির উপায় এক মতির শাসন।

এ সকল অবিচার দুর্গতি যাতনা
দেখিয়া ধর্ম্মরক্ষিণী, কর বিবেচনা।
বহু বিবাহ কুপ্রথা, তুলিয়া ঘুচাও ব্যথা,
রাজাও সাপেক্ষ তাহে সঙ্গত সৎক্রিয়া।
কি করিবে নবদ্বীপ বিপক্ষ হইয়া।

মহাসভা সমীপেতে আরো নিবেদন।
বাল্য বিবাহ কুপ্রথা কর নিবারণ।
মনুর ব্যবস্থা ধর দ্বাদশ বৎসর কর।
বিবাহ ধর্ম্ম বন্ধন, পতির মর্য্যাদা,
কন্যার হইবে বোধ, উপজিবে সুধা।

যদি সভা ক্ষমা কর আর কিছু বলি,
"কলৌ পরাশর স্মৃতা" এই কাল কলি।
নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে আদি পঞ্চ বিপত্তিতে
পতিরন্যো বিধীয়তে দাও সভা বিধি।
মনে হয় সভা যেন অবতীর্ণ বিধি।

বিধবার কত কষ্ট কহা নাহি যায়।
আমাদের ব্যবহার দোষে দুঃখ পায়।
ঈশ্বরের এ নিয়ম, করি তার ব্যতিক্রম,
পক্ষপাত অবিচার পাপে মগ্ন দেশ।
স্ত্রীর প্রতি বিধি নয় পুরুষে আদেশ !!!

কৃতবিদ্য জ্ঞানিদের মত সবাকার।
বিধবা বিবাহ প্রথা হউক প্রচার।
রাঁধা ভাত বেড়ে খাও, চলতি মতে মত দাও
জাতি, কুল, ধর্ম্ম, মান, সব রক্ষা হবে।
দেশপূর্ণ হবে সভা ধন্য ধন্য রবে।

আহার ব্যবহার আর ধর্ম্ম সংস্কার,
সকল বিষয়ে সভা করহ বিচার।

লইযা পণ্ডিতগণ, ধনী, মানী, সাধারণ
বিশুদ্ধ পদ্ধতি এক কব সম্বল।।
আশা পূর্ণ হবে হলে একতা স্থাপন।

সমুদায ভাবতের কর্ত্তা হবে সভা।
তাহা কর যাতে বাড়ে এ সভার প্রভা।
যা কবিবে তা হইবে কার সাধ্য কি কহিবে
যে ব্যবস্থা দিবে সভা শাস্ত্র হবে তাই।
কালোচিত কার্য্য কব এই ভিক্ষা চাই।

কলিকাতা
৫ই জ্যৈষ্ঠ। ১২৭৮ } শ্রী শ্রীবাম পালিত

দলাদ'লি ও সুরাপান। ২৬ বৈশাখ ১১৭৮। ২৫ সংখ্যা

সকল পদার্থেবই শুক্ল ও কৃষ্ণ দুটী পৃষ্ঠ আছে। কৃষ্ণ পৃষ্ঠ দর্শন কবিযা পদার্থেব উৎকর্ষ ও অপকর্ষ বিবেচনা ন্যাযানুগত হয না। কিন্তু সচবাচব দেখিতে পাওযা যায, লোকে অদূবদর্শিতা ও স্বার্থপবতাদি দোষে পদার্থেব কৃষ্ণ পৃষ্ঠ দর্শন কবিযাই উৎকর্ষ অপকর্ষ নির্ণয কবিযা থাকে। এই কাবণে এক্ষণে দলাদলি শব্দটী নিতান্ত নিন্দিত ও একান্ত শ্রুতিকটু হইযা উঠিযাছে। অধিকাংশ লোকে দলাদলিব হিংসাদ্বেষাদিকাবিতা রূপ কৃষ্ণ পৃষ্ঠটী দর্শন কবেন, তাহাতেই ইহা কুৎসিতরূপে প্রতীযমান হইযা থাকে। কিন্তু দলাদলিব একটী শুক্ল পৃষ্ঠ ছিল। ইহাতে অনেক অনিষ্টেব নিবাবণ কবিযা বাখিয়াছিল। আমবা সুবাপানকেই উদাহবণ স্থলে গ্রহণ কবিলাম। পূর্ব্বে হিন্দুসমাজে কেহ সুবাপান করিতে পারিতেন না। সমাজকে উপেক্ষা কবিযা কেহ সুরাপানে আসক্ত হইলে সমাজস্থ কোন ব্যক্তিই তাঁহার অন্ন গ্রহণ অথবা তাঁহাব সহিত যৌনসম্বন্ধ কবিতেন না। সমাজ মধ্যে অশ্রদ্ধেয ও অপাঙ্‌ক্তেয হইযা থাকা অতিশয বিড়ম্বনার বিষয়। এই কারণে কেহ সুবাস্পর্শ করা দূরে থাকুক, উহার নামও কবিতেন না। সুবার প্রতি হিন্দু সমাজের এমনি দ্বেষ ছিল যে, কেহ গোপনেও ইহার সেবনে সাহসী হইতেন না। সাহসী হইতেন না বলিযা সুরাপায়ীরা মধ্যে তন্ত্রের সৃষ্টি কবেন। কিন্তু উহা সহজ কর্ম্ম নয়, এই কারণে অনেকে তৎসেবনে ভগ্নোৎসাহ হইতেন। তন্ত্রশাস্ত্রের অন্য অন্য সম্প্রদায়েও সবিশেষ সমাদর ছিল না। এই সকল হেতুতে সুরাপাযীর দল বৃদ্ধি ও সৃষ্টি হয় নাই। যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, সুরাপায়ীর দল বৃদ্ধি না হইবার মুখ্য

কারণ দলাদলি। এক্ষণে সে দলাদলির বল হ্রাস হইয়াছে, দলপতিদিগের নিজ গৃহেই সুরা প্রবেশ করিয়াছে। আজিকালি যেরূপ হইয়া উঠিয়াছে পঙক্তি ভোজনেও সুরা চলিত হয়, আর বড় বিলম্ব নাই। এখন আর প্রায় কেহ সঙ্কোচ করেন না। পঙক্তি ভোজনে সুরা চলিলে বড় কৌতুকের হইবে। নিমন্ত্রয়িতা ও নিমন্ত্রিত উভয়ে মদ্যপানে মত্ত হইয়া যখন মাছের মুড়া ও পাঁটার মাথি হাতে লইয়া পঙক্তির মধ্যে নৃত্য করিতে থাকিবেন কোন্ প্রকৃতিস্থ ব্যক্তির তাহা দেখিয়া মন মোহিত না হইবে?

পরিহাস করি আর যা করি, মনের কথা বলিতে কি আমরা বড় শঙ্কিত হইয়াছি? হিন্দুসমাজের একটী ভাবী মহৎ অনিষ্ট লক্ষিত হইতেছে। মদ্য এদেশের উপযোগী নহে। যাঁহারা সুরাপান আরম্ভ করেন, তাঁহারা অল্পে সন্তুষ্ট হন না। লজ্জা, সঙ্কোচ ও ভয় দূরীভূত হইয়া অবাধে ইহার সেবন আরম্ভ হইলে এদেশের যে কি শোচনীয় অবস্থা ঘটিবে তাহা আমরা অনুমান করিয়া লইতে পারিতেছি না। এখনই ত এরূপ কতকগুলি কারণ ঘটিয়াছে যে, আমরা পূর্ব্বের ন্যায় বলবান ও দীর্ঘজীবী লোক অধিক দেখিতে পাই না; মদ্য সাধারণ্যে চলিত হইলে যে আর দেখিতে পাইব সে আশা থাকিবে না। এই মারাত্মক অনিষ্ট নিবারণের ত কোন উপায় দেখা যাইতেছে না। সুরাপান নিবারণী সভা অকৃতার্থ হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট যে আবকারীর আয় পরিত্যাগ করিয়া দণ্ডবিধান দ্বারা এতৎ সেবন রুদ্ধ করিবেন, সে সম্ভাবনা নাই। তবে উপায়ের মধ্যে একটি আছে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এই একটী আইন করুন যে ভোজে মদ্য চলিবে, তাহাতে শতকরা একশত টাকা টাক্স দিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট এ প্রস্তাবটীকে অসঙ্গত জ্ঞান করিতে পারেন না। বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট ভোজের উপরে টাক্স প্রস্তাব করিয়া পথ প্রদর্শন করিয়াছেন।

ইউরোপীয় ও ভারতবর্ষীয় উভয়ে কন্যা আদান প্রদান। ২৬ বৈশাখ ১২৭৮। ২৫ সংখ্যা

পূর্ব্বের ন্যায় চাতুর্ব্বর্ণ্য বিবাহ, পরস্পর অন্নগ্রহণ, সমুদ্র যাত্রা স্বীকার, জমিদারী প্রণালীর উচ্ছেদ প্রভৃতির ন্যায় ভারতবর্ষীয় ও ইউরোপীয়ে বিবাহ প্রথা প্রচলিত হয়, অনেকের একান্ত বাঞ্ছনীয় হইয়াছে। উভয় সংযোগে ভারতবর্ষীয়দিগের বলবীর্য্য ও অন্য অন্য গুণাদির উৎকর্ষসাধন এ প্রস্তাবের মুখ্য কারণ। বাঙ্গালাদেশের নব্য সম্প্রদায়ের কতকগুলি লোক এ বিষয়ে সবিশেষ আগ্রহবান্ দৃষ্ট হইয়া থাকেন। তাঁহাদিগের আগ্রহের বিশেষ কারণ এই, ইউরোপীয়েরা তাঁহাদিগকে নির্ব্বীর্য্য বলিয়া অবজ্ঞা করেন, তাহাতে তাঁহারা অতিশয় ক্ষুণ্ণ হন, ভাবেন, আর যত গুণ অর্জ্জিত হউক, সকলই সূর্য্যের অগ্রে অন্যান্য আলোকের ন্যায় নিতান্ত নিষ্প্রভ হইয়া যায়। জগতে বীরপুরুষেরই সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক সমাদর দৃষ্ট হয়। কার্য্যেও শৌর্য্যবান ব্যক্তি হইতে জগতের যত ইষ্ট ও অনিষ্ট

হয়, অন্য হইতে তত হয় না। অসভ্যেরা রোম নগরীয় নানা দুরবস্থা করিল, সমধিক বিদ্যা বুদ্ধি সম্পন্ন সভ্যতম রোমকেরা প্রতীকারে অসমর্থ হইয়া চিত্তপুত্তলিকার ন্যায় দর্শন করিলেন। বঙ্গদেশীয় নব্য সম্প্রদায় অন্য অন্য গুণের অপেক্ষা শৌর্য্যের এইরূপ উপযোগিতা দর্শন করিয়া তল্লাভে আকাঙ্ক্ষী হইয়াছেন। কিন্তু ব্যায়ামচর্চ্চা, যুদ্ধশিক্ষা, আহার ও বাসস্থানাদির উৎকর্ষ সম্পাদন প্রভৃতি যে সমস্ত উপায়ে শরীর দৃঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ ও শৌর্য্যসম্পন্ন হয়, ইঁহারা আলস্যাদি কয়েকটী দোষে তদবলম্বন চেষ্টায় অনুরাগী হইয়া ভারতবর্ষীয় ও ইউরোপীয়ে বিবাহ প্রথা প্রচলিত করিয়া অভীষ্ট সাধনে উদ্যত হইয়াছেন, পক্ষান্তরে যে জাতি উভয় দেশীয়ের সংযোগে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদিগের নির্ব্বীর্য্যতা ও অসচ্চরিত্রতা দর্শন করিয়া উভয় দেশীয়ের বিবাহ প্রথা প্রচলিত হইলে যে কিছু বিশেষ ইষ্টলাভ হইবে তাহাদিগের সে আশা নাই। কিন্তু যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, তাঁহাদিগের হতাশতা নিষ্কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। এক্ষণে উভয় দেশীয়ের সংযোগে যাহারা উৎপন্ন হইতেছে, তাহাদিগের নিকৃষ্টতার বিশেষ কারণ আছে। তাহারা উভয় দেশীয় নিকৃষ্ট লোক হইতেই জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকে। সুতরাং তাহাদিগের উৎকৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা কি? কারণের যেরূপ গুণ কার্য্যের সেইরূপ হইয়া থাকে। যদি সচ্চরিত্র ভদ্র ইউরোপীয়ের সহিত ভারতবর্ষীয়ের বিবাহ হয়, উল্লিখিত অনিষ্টাশঙ্কা দূরীকৃত হইয়া বঙ্গদেশীয় নব্য সম্প্রদায়ের অভিষ্ট সিদ্ধ হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু ভদ্র ইউরোপীয়ের সহিত ভদ্রবংশীয় ভারতবর্ষীয়ের বৈবাহিক সম্বন্ধ হওয়া এক্ষণে নিতান্ত দুর্ঘট। উভয়ের মনে এক্ষণে বিলক্ষণ অভিমান আছে। উভয়েই উভয়ের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ বিধানে ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। অতএব এক্ষণে এ প্রস্তাব অসাময়িক সন্দেহ নাই।

মুসলমানদিগের কুসংস্কার। ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৮। ২৮ সংখ্যা

সম্প্রতি বেরিলিতে হিন্দুদিগের সহিত মুসলমানদিগের যে দাঙ্গা হয়, তদ্বিষয় চিন্তা করিয়া গবর্ণমেণ্ট ও সর্ব্বসাধারণে একান্ত অসুখিত হইয়াছেন। মুসলমানদিগের রাজত্বকালে যে সকল কাণ্ড হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে তাহা হইবার যো নাই। ব্রিটিশ অধিকারে ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রজার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। অধিক কথা কি, ব্যবস্থাপক সভা এই স্বাধীনতায় প্রজার উৎসাহ বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়েই হিন্দু শাস্ত্র অগ্রাহ্য করিয়া এই আইন করিয়াছেন, ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলেও দায়াধিকারের কোন বিঘ্ন ঘটিবে না। গোঁড়া হিন্দুরা শাস্ত্রের অনাদর দেখিয়া সময়ে সময়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন বটে, কিন্তু মনে মনে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের এই স্বাধীনতানুরাগিতার প্রশংসা করিয়া থাকেন। হিন্দু ধর্ম্মের উন্নতি অনুমিত হইতেছে। কেবল মিসনরিরা নহেন, কৃতবিদ্য ভারতবর্ষীয়েরা বহু সহস্র বৎসরের কুসংস্কার ভিত্তির উন্মূলনে ব্যাপৃত হইয়াছেন। কিন্তু আমরা দুঃখিত হইলাম, মুসলমান

সম্প্রদায়ে এই উন্নতি লক্ষণ লক্ষিত হইতেছে না।. বঙ্গদেশে এমন অনেক মুসলমান দৃষ্ট হন, যাঁহারা কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু মুসলমান সমাজের ক্ষমতা এত প্রবল যে, কুসংস্কারমুক্ত ব্যক্তিরা প্রকাশ্যরূপে কোন কাজ করিতে সাহসী হন না। মৌলবী আবদুল লতিফের সদৃশ ব্যক্তিদিগেরও অগত্যা গোঁড়ার দলে মিশ্রিত হইতে হইয়াছে, তাঁহারা ভীরুস্বভাব নহেন, কিন্তু কি করেন, গোঁড়ার দল এত পুষ্ট যে, বিপরীত চেষ্টা করিতে গেলে আপনাদিগকে অপদস্থ হইতে হয়। বঙ্গদেশের বাহিরে আবদুল লতিফের সদৃশ লোক দেখিতে পাওয়া ভার। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও দক্ষিণ ভারতবর্ষে গোঁড়ামীর অণুমাত্র এই ধর্ম্মে যে ব্যক্তি বিশ্বাস না করে, সে পাপিষ্ঠ, তাহাকে হত্যা করিলে পাপ হয় না; এই ভয়াবহ কুসংস্কার আজিও অনেক মুসলমানের আছে. বঙ্গদেশের কৃতবিদ্য হিন্দু ও মুসলমানের সেকেলে বৈরীভাব নাই বটে, কিন্তু অন্য অন্য প্রদেশে বিদ্বেষ ও ঈর্ষ্যা প্রভৃতির বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব আছে। উল্লিখিত দাঙ্গা ও হত্যা ইহা সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। আমরা সম্প্রতি দুই একটী ফতোয়া দর্শন করিয়াছি, তাহাতে কতকগুলি মৌলবী এই ব্যবস্থা দিয়াছেন যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি তাঁহাদিগের বিদ্বেষ নাই কারণ ইংরাজেরা তাঁহাদিগের ধর্ম্মের শত্রু নহেন। মৌলবীদিগের এ ব্যবস্থা প্রীতিকরী সন্দেহ নাই, কিন্তু এটী সকলের মনোগত এরূপ বোধ হয় না। যাহারা ধর্ম্মের সহায়তা না করেন, তাহারাই শত্রু, এটী কেবল মুসলমানধর্ম্মের অভিমত নহে, যে ধর্ম্মে গোঁড়ামী আছে, সেই সম্প্রদায়েরই এই সংস্কার। গোঁড়া বৈষ্ণব বিল্ববৃক্ষ দর্শন করিলে নয়ন মুদিত করেন, পাছে পৌত্তলিকতার উৎসাহ দেওয়া হয়, এই ভয়ে কেশব সম্প্রদায় হিন্দুদিগের পুত্র কন্যাদির বিবাহাদি ক্রিয়া কলাপে নিমন্ত্রণে যান না। আজিও এরূপ অনেক গোঁড়া হিন্দু আছেন, যাঁহারা ইংরাজী শিক্ষাকে ধর্ম্মনাশের কারণ বিবেচনা করেন। গবর্ণমেণ্ট এত নিরপেক্ষ যে মিশনারি দল তাহাদিগকে এক প্রকার পৌত্তলিক বলিয়া নিন্দা করেন, তথাপি সেই সকল গোঁড়া হিন্দু গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাপ্রণালীকে ধর্ম্মনাশের মূল বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন, মুসলমানদিগের গোঁড়ামী অধিক। এক হস্তে কোরাণ অপর হস্তে তলবার এটী মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারের মূল নিয়ম। গোঁড়াদিগের ইহাতে সম্পূর্ণ আস্থা আছে। এ ধর্ম্মে ঔদার্য্য ও নিরপেক্ষতা নাই। "আমাদিগকে সাহায্য কর, না কর, তুমি কাফের ও বধ্য" ইহা মুখে না বলা হউক, গোঁড়া মুসলমান মাত্রেরই মনোগত। ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় মুসলমান ধর্ম্মবন্ধনও শিথিল হইতেছে। এই নিমিত্ত গোঁড়া মুসলমানেরা ইংরাজী শিক্ষার প্রতি অনুরক্ত নহেন। যে কৃতবিদ্য মুসলমান মহম্মদের ধর্ম্মে অবিশ্বাস করেন. তিনিই শত্রু বলিয়া বিবেচিত হন। এই সকল কারণে মুসলমানদিগের রাজভক্তিও অল্প। স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা মানুষের স্বভাবসিদ্ধ, যাহার এ চেষ্টা ও ইচ্ছা নাই, তাহাকে মানবশ্রেণীর মধ্যে গণনা করা বিধেয় নয়। এ চেষ্টা ও ইচ্ছা থাকিলেই যে রাজভক্তি থাকে না, একথা সঙ্গত নহে। রাজভক্তি শব্দের অর্থ এই, যাঁহাকে ভক্তি করা যায়, তাঁহার

অপেক্ষা আর উত্তম শাসনকর্ত্তা নাই; অতএব তাঁহার নিকটে বিশ্বস্ত থাকা একান্ত আবশ্যক। বিদেশীয় গবর্ণমেণ্ট এতদপেক্ষা অধিক প্রভুভক্তির প্রত্যাক্ষ করিতে পারেন না। হিন্দু ও কৃতবিদ্য মুসলমানদিগের দৃঢ় বিশ্বাস এই, ভারতবর্ষ অথবা পৃথিবীতে এমত লোক বা জাতি আব নাই, যাঁহারা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ন্যায় দেশ শাসন করিতে পারেন। তাঁহারা জানেন, অদ্য যদি এই সাম্রাজ্য নষ্ট হয়, কল্যই সমুদায় দেশ বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িবে এবং গত এক শত বর্ষে যে সকল উন্নতি হইয়াছে, তাহা এককালে লোপ পাইবে, এই ভাবিয়া তাঁহারা এই বলিয়া জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দেন যে, তিনি আমাদিগের এমন সুসভ্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টেব হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টকে সুসভ্য গবর্ণমেণ্ট বলিয়া বোধ থাকাতেই এ গবর্ণমেণ্টের পরিবর্ত্ত হয়, তাঁহাদিগের এরূপ ইচ্ছা নাই। কিন্তু গোঁড়া মৌলবী ও মোল্লাদিগের সে সংস্কার নহে। তাঁহারা অদ্যাপিও ভাবেন, কোরাণের তুল্য উৎকৃষ্ট ধর্ম্মনীতি ব্যবস্থা সংগ্রহ আর নাই। তাঁহাদিগের মতে সারেসেনেব জাতিব প্রাথমিক রাজগণই আদর্শ স্বরূপ। আকবব তাঁহাদিগের মতে অধার্ম্মিক এবং আলমগির ধার্ম্মিক চূড়ামণি ছিলেন। যাবতীয় মন্দির ও গিরজা তাঁহাদিগের চক্ষুঃশূল। শাসনকর্ত্তার এগুলি নষ্ট করা উচিত। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহা করিতে দেন না। প্রত্যুত তাঁহাদিগের প্রবর্ত্তিত শিক্ষা প্রণালী সকল শ্রেণীর কুসংস্কারের উন্মুলন কবিতেছে। অতএব গোঁড়া মুসলমানেরা যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টেকে বন্ধু অথবা রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া জ্ঞান করিবেন, ইহা সম্ভাবিত নহে। কাহা হইতেই বা রক্ষা করিবেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পুর্ব্বে কোন্ ব্যক্তি মুসলমানধর্ম্মের প্রতি আক্রমণ করিতেন যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে তাঁহারা ধর্ম্মেব রক্ষাকর্ত্তা জ্ঞান করিবেন। মুসলমানেরাই তো সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন, তাঁহারাই অন্য ধর্ম্মকে আক্রমণ করিতেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগেরই হস্ত রোধ করিয়াছেন। ফলতঃ মৌলবীরা ফতোয়াই দিন আর যাহা বলুন, তাঁহাদিগের বর্ত্তমান সংস্কার যত দিন থাকিবে, তত দিন তাঁহাবা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে মিত্র জ্ঞান করিতে পারেন না। তাঁহাদিগের ফতোয়ারও এই ভাব, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যদি ধর্ম্মের বন্ধু হন, তাহা হইলেই তাঁহাদিগের শ্রদ্ধাস্পদ হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাবা সে ভাবের বন্ধু নহেন, সুতরাং শত্রু। সত্যের অনুরোধে ভারতবর্ষেব মঙ্গল ও কৃতবিদ্য মুসলমানদিগের সম্মানার্থ আমরা বলিতেছি, যাহাতে এই সংস্কার দূবগত হয়, সেই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

এক্ষণে কি উপায় অবলম্বন করা উচিত? যে সকল লোকের বিদ্যা কেবল কোরাণ ও কতকগুলি আরবী ও পারসী পুস্তক পাঠ করিয়া হয়, তাঁহারা প্রায়ই গোঁড়া হন। মাদ্রাসা সমূহের যে সকল ছাত্র ইংরাজীর প্রতি অনুরক্ত নহেন, তাঁহারা এই সকল লোকই ওহাবিদিগের পরম বন্ধু। যাহাতে মুসলমানেরা অধিক পরিমাণে ইংরাজী ও দেশীয় ভাষা শিক্ষা করেন, গবর্ণমেণ্টের সেই লক্ষ্য হওয়া উচিত। আমরা বারম্বার প্রস্তাব করিতেছি মাদ্রাসা সকলে আরবী ও পারসীর এত চর্চ্চা রাখা উচিত নহে। মুসলমান মাত্রেই

জ্ঞান করেন, আরবী ও পারসী তাঁহাদিগের মাতৃভাষা, এই কারণে তাঁহারা ভারতবর্ষীয় হইয়াও ভারতবর্ষের কোন আদিম ভাষা শিক্ষা করিতে যত্নবান হন না। অনেক হিন্দু পারসী ও আরবী জানেন, কিন্তু একজনও মুসলমান এ পর্য্যন্ত সংস্কৃতে বুৎপত্তি প্রদর্শন করিতে সমর্থ হন নাই। তাহার কারণ এই, সংস্কৃতকে তাঁহারা বিজাতীয় ও অধার্ম্মিক-দিগের ভাষা জ্ঞান করেন। ইংরাজীর প্রতিও এই ভাব। শিক্ষা প্রণালীর দোষে মুসলমান ছাত্রগণ কোরাণকেই সর্ব্ববিদ্যার আধার জ্ঞান করিয়া থাকেন, ইহাই তাঁহাদিগের আত্মশ্লাঘা ও মূর্খতার মূল। মুসলমানদিগের নিমিত্ত পৃথক বিদ্যালয়ের আর প্রয়োজন রাখে না। ভারতবর্ষের অন্য অন্য স্থানে যে শিক্ষা প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, মুসলমান-দিগকেও তাহার অধীনস্থ করা কর্ত্তব্য। আমরা মধ্যে মধ্যে কৌতুকাবহ এই আক্ষেপ বাক্য শ্রবণ করি যে, জেলা স্কুল সমূহে সংস্কৃত ও বাঙ্গালার নিমিত্ত যেমন পণ্ডিত আছেন, সেই প্রকার উর্দ্দু শিক্ষক নাই বলিয়া মুসলমান ছাত্রগণ কিছু করিতে পারেন না। বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা কি উর্দ্দু? তবে উর্দ্দুশিক্ষার নিমিত্ত শিক্ষকের কি প্রয়োজন হয়। হিন্দু ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি কি প্রকারে পরীক্ষা দেন? মুসলমান হইলেই উর্দ্দু, পারসী ও আরবী মাতৃভাষা হয়, এই সংস্কারটী অনিষ্টের মূল; ইহাতেই মুসলমানগণ কখনই আপনাদিগকে ভারতবর্ষের সন্তান বলিয়া জ্ঞান করিতে পারিলেন না। ইহাতেই তাঁহারা ইংরাজী শিখিতে অসম্মত। গোঁড়ামী ইহার ফল। গোঁড়ামী হইতে অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি ঘৃণা ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি গোপনীয় বিদ্বেষ ভাব জন্মে।

সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভা: কন্যাপণ ও বহুবিবাহ নিবারণার্থ গবর্ণমেণ্টের আবেদন

২০ আষাঢ় ১২৭৮। ৩৩ সংখ্যা

স্বুবর্ণ সদৃশং পুষ্পং ফলে রত্নং ভবিষ্যতি।
আশয়া সেবিতো বৃক্ষঃ পশ্চাৎ ঝন ঝনায়তে॥

সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভা কন্যাপণ ও বহুবিবাহ নিবারণ এবং কৌলীন্য প্রথার উন্মূলন বিষয়ে চেষ্টা পাইতেছেন শুনিয়া আমাদিগের হৃদয় আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল। আমরা মনে ভাবিয়াছিলাম, সভা অপূর্ব্ব ফল প্রসব করিবেন, কিন্তু যে উপক্রম দেখিতেছি, বুঝি ফল ঝন ঝন করে। একজন পত্রপ্রেরক হৃষ্টচিত্ত হইয়া লিখিয়াছেন, সভা গবর্ণমেণ্টের আবেদন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। এ সংবাদটী আমাদিগের সুখের না হইয়া অতিশয় অসুখের হইল। এ চেষ্টাটী আমাদিগের দেশের লোকের স্বভাবের ঠিক অনুরূপ হইয়াছে। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, এদেশের অধিকাংশ লোকের শ্রমশক্তি নাই, অধ্যবসায় নাই, স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়া কষ্টসাধ্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিবার ক্ষমতা নাই, পরের স্কন্ধে কষ্ট ও আপদ বিপদ নিক্ষেপ করিয়া স্বয়ং

তাহার ফলভোগ বাসনা করেন। ইহাতেই আপনাদিগকে বাহাদুর জ্ঞান করিয়া থাকেন। অলসের এইরূপ বাহাদুরী চিরকালই আছে। আপনাদিগের স্কন্ধে ভার গ্রহণ করিয়া বহু-বিবাহাদির নিবারণ চেষ্টা পাইতে অনেক অর্থব্যয় করিতে হইত, অনেক চিন্তা করিয়া শিরোবেদনায় অভিভূত হইতে হইত। পক্ষান্তরে গবর্ণমেণ্টের স্কন্ধে ভার ক্ষেপ করিলে কোন আপদ বালাই নাই, কোন যন্ত্রণা নাই, কোন ভাবনা নাই। যদি গবর্ণমেণ্ট সদয় হন, আইন করেন, আপনাদিগের বাহাদুরী হইল, সদয় না হন, তেঁতুল গাছ কেহ ছাড়ায় না।

সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভার সভ্যগণ উত্তম উপায়ের উদ্ভাবন করিয়াছেন, উত্তম উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, যেমন গদিতে বসা, সরু চাউলের অন্ন আহার ও গালগল্প করিয়া কালহরণ করা অভ্যাস, এ উপায়টী তাহার উপযুক্ত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সামাজিক দোষের নিবারণ চেষ্টা পাইলে কি কি অনিষ্ট ঘটে, তোমরা কি একবার তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছিলে? প্রথম, আমাদিগের স্বাধীনতা হানি। রাজ-সংক্রান্ত কোন বিষয়ে আমাদিগের স্বাধীনতা আছে, ঐ সকল চেষ্টা পাইতে গেলে ক্রমে তাহার লোপ হইবার সম্ভাবনা। দ্বিতীয়, আমাদিগের স্বয়ং কার্য্যকারিতার ব্যাঘাত। আমরা যদি চিরকালই বালকের পিতৃমুখাপেক্ষার ন্যায় সমুদায় কার্য্যেই গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষা করিব, কবে আমরা স্বয়ং কার্য্য করিতে শিখিব, জগদীশ্বর আমাদিগকে যে হস্তপদাদি ও বুদ্ধিবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, কবে আমরা তাহার বিনিয়োগ করিতে শিখিব, কবে আমরা অনলস হইয়া কার্য্যদক্ষতা প্রদর্শন করিব? তৃতীয়, যদি ভারতবর্ষের লোক সংখ্যা করা হয় তাহার মধ্যে কতগুলি লোক কন্যা বিক্রয়কারী ও বহুবিবাহকারী তাহার গণনা করা যায়, এক আনা হয় কি না, সন্দেহ। এই মুষ্টিমেয় লোকের ইষ্ট বিধানার্থ অসংখ্য লোককে কষ্টে পতিত করা কি বিচারসহ হইতে পারে? স্বরসিক ব্যবহারকাম ব্যক্তিমাত্রেই অনায়াসে তাহার অনুমান করিয়া লইতে পারিবেন। চতুর্থ, অগ্রে দম্পতীর পরস্পর পরিত্যাগ বিধি না করিয়া বহুবিবাহ নিষেধের আইন করা বিধেয় নহে। যে ভারতবর্ষীয় স্ত্রীজাতির সুখ স্বচ্ছন্দতা সম্পাদনার্থ এত যত্ন এত চেষ্টা হইতেছে, বহুবিবাহ নিষেধক বিধি তাহাদিগের যার পর নাই কষ্টের কারণ হইবে। এখন যাঁহারা একাধিক রমণীর পাণিগ্রহণ করেন, তাঁহাদিগের অধিকাংশই ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত করিয়া থাকেন, স্বতরাং কোন স্ত্রীর প্রতি একান্ত অনাদর হয় না। সকলেই পর্য্যায়ক্রমে স্বামীসম্ভোগসুখ লাভ করিয়া থাকেন, কিন্তু যদি বহুবিবাহ নিষেধক আইন হয়, পুরুষকে অন্য স্ত্রীর পাণিগ্রহণকালে পূর্ব্ব স্ত্রীকে অসতী অপ্রিয়বাদিনী অথবা বন্ধ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে হইবে। তন্মূলক পূর্ব্ব স্ত্রীর সহিত বিষম শক্রতা জন্মিয়া উঠিবে। তাদৃশ পতির আলয়ে বাস আর সসর্পগৃহে বাস তুল্য। পুরুষ পূর্ব্বস্ত্রীর প্রতি যে কোন একটী দোষের আরোপ করিয়া স্বচ্ছন্দে অন্য নারীর কর গ্রহণ করিবেন,

আর সেই হতভাগ্যাকে পত্যন্তর গ্রহণ অনধিকৃত ও তাদৃশ নৃশংস পতির অনুগ্রহাধীন হইয়া চির বিরহিণী ও চির দুঃখিনী হইয়া কালক্ষেপ করিতে হইবে, ইহার পর নিষ্ঠুর কার্য্য আর কি আছে ?

সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভার সভ্যগণ ! আমরা তোমাদিগকে পুনরায় সম্বোধন করিয়া কহিতেছি, তোমরা রাজার আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া স্বয়ং যদি প্রস্তাবিত বিষয়ে প্রবৃত্ত হও, তোমাদিগের কৃতার্থতা লাভের কি সম্ভাবনা নাই ? হিন্দু সমাজের যেগুলি প্রধান গণনীয় ও মাননীয় লোক, তোমরা সেই সকলগুলি ত একত্র হইয়াছ, তোমরা কেন এই প্রতিজ্ঞায় আরূঢ় হও না, আমরা নিজ বাটীতে বহুবিবাহ প্রভৃতি দোষের আবির্ভাব হইতে দিব না, আমাদিগের অনুগত লোকদিগকেও তত্তৎ বিষয় হইতে নিবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করিব। যদি এই প্রতিজ্ঞায় আরোহণ করিয়া আন্তরিক দৃঢ়তর যত্ন সহকারে কার্য্য কর, অভীষ্টলাভে সমর্থ হইবে সন্দেহ নাই। কাল তোমাদিগের সহায়তা করিতেছে। যত দিন দিন লেখা পড়ার অধিকতর চর্চ্চা হইতেছে, ততই লোকের মন ফিরিয়া যাইতেছে। কৃতবিদ্যেরা ত বহুবিবাহ দিব ত্রিসীমা দিয়া চলেন না। অনেকে তাঁহাদিগের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতেছেন। যাহারা লেখাপড়া করেন নাই, তাঁহারাও বহুবিবাহাদিজনিত কন্যাদির কষ্ট ও নানা প্রকার অনিষ্ট দর্শন করিয়া কালকৌলীন্য প্রথা প্রতিপালনে বীতরাগ হইয়াছেন। কাল যে তোমাদিগের প্রতি অনুকূল তোমরা কি তাহা বুঝিতে পারিতেছ না ? তোমরা উল্লিখিত অনুষ্ঠান করাতে কে তোমাদিগকে উৎসাহদান না করিতেছেন ? যে সকল ব্যক্তি তোমাদিগকে গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিবার অনুরোধ করিতেছেন, তোমরা তাহাদিগকে কেন বল না, তাঁহারা স্বয়ং স্বয়ং কন্যাপণ গ্রহণাদির নিবারণ চেষ্টা করেন। সকলের সমবেত চেষ্টা যে কিরূপ ফলোপদায়িণী হয়, তাহা কি আজিও আমাদিগকে বলিয়া দিতে হইবে ?

ব্রাহ্মবিবাহ ও স্ত্রীলোকের বিবাহের বয়োনির্ণয়। ২ শ্রাবণ ১২৭৮। ৩৫ সংখ্যা

ব্রাহ্মবিবাহ বিষয়ক আইনের যে পাণ্ডুলেখ্য হইয়াছে, তাহাতে ন্যূনকল্প বয়স চতুর্দ্দশ বর্ষ স্থির করা হইয়াছে ; কিন্তু ব্রাহ্মেরা ইহাতে সন্তুষ্ট নহেন। তাহাদিগের সংস্কার এই, অধিক বয়সে বিবাহ হওয়াতেই ইউরোপীয় জাতি সকল এত বলবান ও তেজস্বী। ইউরোপীয়দিগের বলবত্তা ও তেজস্বিতার ইহাই প্রধান কারণ কি না, এস্থলে তাহার বিচার অনাবশ্যক। এস্থলে আমাদিগের বক্তব্য এই, দুর্ব্বলতার প্রকৃত কারণ বিবাহ, না, অসাময়িক ও অসঙ্গত স্ত্রীসহবাস ? যদি শেষোক্তটি কারণ হয়, তাহা হইলে আইন কি তন্নিবারণে সমর্থ হইবে ? "উন্নতি হউক" বলা এক পদার্থ আর কার্য্য দ্বারা সেই উন্নতি সাধন অন্য পদার্থ। প্রস্তাবিত বিষয়ে দেশের জলবায়ু লোকের

শরীরের গঠন ও ইন্দ্রিয়ের উন্মাদনী শক্তি, এই সকল দেখিয়া কাজ করাই কর্ত্তব্য। ডাক্তার চিবর্স, ফেরার, সরকার প্রভৃতি বড় বড চিকিৎসক স্থির করিয়াছেন, ১৬ বৎসর স্ত্রীলোকের বিবাহের প্রকৃত সময়। আমরা যদি ইহার বিপরীত বাদে প্রবৃত্ত হই, উপহাসনীয় হইব সন্দেহ নাই, আমরা ইহা বিলক্ষণ বুঝিতেছি, তথাপি ব্রাহ্মদিগের হিতার্থ আমাদিগকে কিছু বলিতে হইতেছে। উল্লিখিত চিকিৎসকগণ কেবল মূল নিয়ম ধরিয়া স্বমত প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদিগের প্রস্তাবানুরূপ কার্য্য হইলে মঙ্গল হইবে কি না, তাহা তাঁহারা বিবেচনা করেন নাই। প্রথম যৌবনই বিবাহের প্রকৃতকাল। এদেশে সচরাচব স্ত্রীলোকেরই প্রথম যৌবন উপস্থিত হইয়া থাকে। ইউবোপে গডে ১৫ বৎসরে প্রথম যৌবন হয়। প্রথম যৌবনের পরেই পুরুষ সহবাসের ইচ্ছা জন্মে। এ সময়ে বিবাহ না দিলে বহুতব অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। প্রকৃতির অপলাপ করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। ১৬ বৎসরের পর এদেশের স্ত্রীলোকদিগের যৌবনের মধ্যাবস্থা হয়, এতদ্দেশীয় মাত্রেই একথা স্বীকার কবিবেন। লক হাঁসপাতালের অধ্যক্ষগণকে জিজ্ঞাসা কর, তাহারা বলিবেন, এদেশের যে সকল স্ত্রী ভ্রষ্টা হয়, তাহাদিগের ১৩।১৪ বৎসব বয়সেই প্রায় দোষ ঘটিয়া থাকে। এই সময়েই উহাদিগের চিত্তের বিষম বিকার উপস্থিত হয়। তখন স্বামীর নিকটে থাকা অতিশয় আবশ্যক, কিন্তু আইনে যদি ১৬ বৎসরের পূর্ব্বে বিবাহ করিতে নিষেধ করে, তাহা হইলে কি অনিষ্ট ঘটিবে না? ১৩।১৪ বৎসরে অধিক সংখ্যা স্ত্রীলোক যে অসৎপথে গমন করে, তাৎকালিক ইন্দ্রিয়ের উন্মাদনাবস্থা কি তাহার কারণ নহে? ফল এই হইবে, যে সুখ স্বামীসহবাসলভ্য, অনেক হতভাগ্য স্ত্রীলোক তাহার পরপুরুষ সংসর্গদ্বারা উপার্জ্জন করিবে। কৌলীন্য ও বহুবিবাহে ব্যভিচার ভ্রূণহত্যা প্রভৃতিতে সকল পাপ হইতেছে। একে ত আমরা এত চেষ্টা করিয়াও এপর্য্যন্ত সে সমুদায়ের নিবারণ করিতে পারিতেছি না। আবার উন্নতির নামে সেই অনিষ্টকে আহ্বান করা কি উচিত? আমাদিগের নব্য সম্প্রদায় হিন্দুশাস্ত্রকারদিগকে যেরূপ অপদাথ জ্ঞান করেন, তাঁহারা বাস্তবিক সেরূপ ছিলেন না, তাঁহাদিগের মতে একদা সুশৃঙ্খলরূপে রাজকার্য্য চলিয়াছে। যে রাজা তাঁহাদিগের মতে কাজ করিয়াছেন, তিনি প্রশংসিত হইয়াছেন। তাঁহারা এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের ত্রয়োদশ বর্ষে যৌবনোন্মাদ হয়, ইহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। এই নিমিত্তই তাঁহারা দ্বাদশ বর্ষের মধ্যে বিবাহের বিধি করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে আমরা ব্রাহ্মদিগকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা দেশের জলবায়ু, লোকের শরীর, ইন্দ্রিয়ের উন্মাদনী শক্তি ও ইচ্ছা বিবেচনা করিয়া যেন কাজ করেন। যদি নাবিকেরা সমুদ্রের জল পান করিয়া থাকিতে পারে, তাহা হইলে ত অনেক ব্যয় ও যত্নের প্রয়োজন রাখে না; কিন্তু তাহা হয় কৈ? ১৬ বৎসরের স্ত্রীর অন্ততঃ ২৪ বৎসরের স্বামী হওয়া উচিত। ২৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত স্ত্রীসহবাস করিবার ইচ্ছা দমন করিয়া

রাখিতে পারেন, এমন লোক কয়জন আছেন? অতএব আমাদিগের বক্তব্য এই, বিবাহের বয়স নির্দ্ধারিত করা উচিত নহে। সামাজিক বিষয়ে রাজবিধির আশ্রয় লইতে গেলে অনিষ্ট বিনা ইষ্ট হয় না। সমাজের হস্তেই এ ভার থাকা উচিত। ইংলণ্ডেও বিবাহযোগ্য বয়সের কোন বিশেষ বিধি নাই। অনিশ্চিত শারীরিক বল ও তেজস্বিতার আশায় ধর্ম্মনীতিকে নিশ্চিতরূপে জলাঞ্জলি দেওয়া অতিশয় অন্যায়। ১৬ বৎসরের পুর্ব্বে স্ত্রীলোকের বিবাহ নিষেধ করিলে ধর্ম্মনীতির যে ভ্রংশ হইবে, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

বহুবিবাহ হওয়া উচিত কিনা? ৩০ শ্রাবণ ১২৭৮। ৩৯ সংখ্যা

বিধাতা হিন্দু সমাজের প্রতি একান্ত বাম। শীঘ্র যে এ সমাজের সৌভাগ্য লাভ হয়, সে সম্ভাবনা নাই। সমাজ সংস্কার প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলেই ঋষি শ্রাদ্ধের কাণ্ড উপস্থিত হয়। ফল যত হউক না হউক, আড়ম্বরের সীমা থাকে না। অগ্রে শাস্ত্র বিচার আরম্ভ হয়, কিন্তু সে বিচার বিচার নয়, ঋষি হত্যা। উভয় পক্ষই ঋষির বচন তুলিয়া আপনার মনোমত তাহার ব্যাখ্যা করিয়া স্বপক্ষ সমর্থন চেষ্টা পান। ঋষিরা কি উভয় পক্ষেরই যাহাতে মনোরথ পুর্ণ হয়, এইরূপ বচন রচনা করিয়া গিয়াছেন? একি মকদ্দমাকারিদিগের কালীঘাটের স্বস্ত্যয়ন? যাহার যথার্থ মকদ্দমা তিনিও সস্ত্যয়ন আরম্ভ করিলেন, আর যাহার মকদ্দমা অযথার্থ, তিনিও স্বস্ত্যয়ন আরম্ভ করিলেন, এখন কালী কাহার মন বক্ষা করেন? আমরা এত দিন কৌতুক দেখিতেছিলাম, তুই দল পণ্ডিত শাণিতাস্ত্র হস্তে লইয়া রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। একদল কহিতেছেন বহুবিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ আর এক দল কহিতেছেন শাস্ত্রসিদ্ধ। নিষেধবাদী দলই প্রবল আমরা ভাবিতেছিলাম, এবার আর বহুবিবাহের নিস্তার নাই।…

বহুবিবাহ একটীমাত্র ক্ষুদ্র বিষয়, শত শত পণ্ডিত যোদ্ধা মল্লবেশে ধাবমান হইয়াছেন, রাজা প্রতিকূল, বিধাতাও পুর্ব্বেই প্রতিকূল হইয়াছেন।

আমরা এইরূপ ভাবিতেছি, এমন সময়ে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ আমাদিগের হস্তে পতিত হইল, উহার মূর্দ্ধস্থানে বহুবিবাহ বলিয়া লিখিত আছে, আমরা আগ্রহসহকারে উহার পাঠ আরম্ভ করিলাম। বিদ্যাসাগর কুলীনদিগের অত্যাচার ও কুলীন কন্যাদিগের ক্লেশের বিষয় যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন, তাহা পড়িতে অনেকবার আমাদিগের নয়নযুগল অশ্রুজলে পরিপ্লুত হইল। মনে মনে এদেশের পুরুষদিগকে কতই ধিক্কার দিলাম। অন্য অন্য দেশের লোকেরা দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার নাম শ্রবণমাত্র ক্রোধে একান্ত অধীর হন এবং তৎক্ষণাৎ তাহার নিবারণ করেন, কিন্তু আমাদিগের দেশের লোকেরা অক্ষুব্ধভাবে অবলা জাতির প্রতি অত্যাচার অনায়াসে সহ্য করিতেছেন।

হিন্দু শাস্ত্রকারেরা বলেন, ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম এই পঞ্চ ভূতে মনুষ্যদেহ নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু আমাদিগের বোধ হয়, বিধাতা এদেশের পুরুষনির্ম্মাণকালে তেজের অংশ দিতে বিস্মৃত হইয়াছেন।

প্রস্তাবিত গ্রন্থের অত্যাচার বর্ণনাটীই যে কেবল চমৎকারিণী হইয়াছে এমন নহে, বিদ্যাসাগর বহুবিবাহকে শাস্ত্রনিষিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে যে অংশে শাস্ত্রের বিচার করিয়াছেন, সে অংশটীও অতি মনোহারী হইয়াছে। যিনি ঐ অংশ পাঠ করিয়া বিদ্যাসাগরের প্রতিভা গুণের, তর্ক শক্তির, লিপি নৈপুণ্যের ও লিখন চাতুর্য্যের প্রশংসা না করেন, এরূপ লোক অতি বিরল, কিন্তু আমরা বিস্মিত হইলাম, উল্লিখিত পণ্ডিত দলের ন্যায় বিদ্যাসাগরও বহুবিবাহকে শাস্ত্রনিষিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত বৃথা বহুল প্রয়াস পাইয়াছেন। ইহাতে ইষ্টলাভ কি? বহুবিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ এই কথা শুনিলেই কি এদেশের লোকে ভীত হইয়া তাহা হইতে বিরত হইবেন? ইঁহারা মুখে বলেন, শাস্ত্র অনুসারে চলেন কিন্তু ব্যবহার দেখিয়া বোধ হয়, শাস্ত্র মানেন না। ইঁহাদিগের পরিণামদর্শিতা নাই, যাহাতে আশুলাভ বোধ করেন, সেই কর্ম্মই করিয়া থাকেন। অনেক কুলীনের ঘরে ত্রিশ চল্লিশ বৎসরের অনূঢ়া কন্যা আছে। এরূপ কন্যাকে গৃহে রাখা কি শাস্ত্রানুমত কর্ম্ম, তবে বলিবেন, বহুবিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ ইহা প্রতিপন্ন না হইলে গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে সঙ্কুচিত হইবেন। আমরা গবর্ণমেণ্টের সঙ্কুচিত হইবার ত কোন কারণ দেখিতেছি না। "বহূন্ দারান্ পরিগৃহ্লীয়াৎ" যদি এরূপ বিধি থাকিত, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ সাপরাধ হইত বহুবিবাহের নিত্য বিধি দেন, বোধ হয় কোন দেশে এরূপ নির্ব্বোধ শাস্ত্রকার নাই। নিত্য বিধি হইলে হিন্দুমাত্রেই একাধিক বিবাহকারী লক্ষিত হইতেন। পক্ষান্তরে অনেককে একাধিক বিবাহ করিতেও দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, একাধিক বিবাহ রাগপ্রাপ্ত, যে রাগপ্রাপ্ত বিষয় হইতে অধিকতর অনিষ্ট সম্ভূত হয়, তন্নিবারণ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপের বাধা কি?

বহুবিবাহের বিধি যখন নিত্য বিধি বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে না, তখন গবর্ণমেণ্ট অনায়াসে ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন, কিন্তু সামাজিক বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ বিধেয় কি না, ইহার বিবেচনা করা আবশ্যক। যদি গবর্ণমেণ্টের সাহায্য লইয়া আমাদিগের সমাজ সংস্কার আবশ্যক হয়, অসংখ্যবার তাঁহাদিগের শরণ লইতে হইবে। প্রতি পদক্ষেপে দাদাকে ডাকা সুখের নয়। তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট দ্বারা সমুদায় আচার ও ধর্ম্মেরও সংস্কার করা আবশ্যক হইয়া উঠে। অত উতলা হইলে চলে না। নব্য সম্প্রদায়ের কতকগুলি লোক অতিশয় উতলা হইয়াই হিন্দু সমাজের উপরে বিরক্ত হইয়াছেন, বিরক্ত হইয়া কৈশব সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছেন। স্থির হইয়া থাকিলে সমাজিক লোক হইতেই সমাজ সংস্কারের যে সম্ভাবনা আছে, বিদ্যাসাগরের লিখিত প্রস্তাবিত গ্রন্থ সে আশা প্রদান

করিতেছে। তিনি লিখিয়াছেন, কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তি স্থানে ইংরাজী শিক্ষার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, এখানকার লোকের মনের যে প্রকার ভাব, অন্য স্থানের লোকের সে প্রকার নয়। এতদ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, ইংরাজী শিক্ষা বলে আমাদিগের দেশের লোকেরা অন্যদীয় সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া স্বয়ংই সমাজ সংস্কারে সমর্থ হইবেন।

যাবৎ ইঁহারা স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়া সমাজ সংস্কার করিতে না পারিতেছেন, তাবৎ কালের নিমিত্ত আমরা একটী সদুপায় বলি, সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভার সভ্য মহোদয়গণ তদবলম্বন করুন। তাঁহারা এই বলিয়া গবর্ণমেণ্টে আবেদন করুন, শাস্ত্রোক্ত কয়েকটী কারণ ব্যতিরেকে যাঁহারা একাধিক বিবাহ করিবেন, তাঁহাদিগকে প্রত্যেক বিবাহে ৫০০ টাকা করিয়া টাক্স দিতে হইবে। অর্থসম্বন্ধ আছে, শ্রবণমাত্র এ আবেদন গবর্ণমেণ্টের হৃদয়গ্রাহী হইবে, আমাদিগেরও অভীষ্টসিদ্ধি হইবে। নিঃস্ব অপদার্থ কুলীন কুমারেরাই উপদ্রব করিয়াছেন, তাঁহাদের বিবাহ ব্যবসায় বন্ধ হইয়া যাইবে। অপর লাভ এই, গবর্ণমেণ্টের সামাজিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা হইল না।

ব্রাহ্মদিগের বিবাহের আইন। ৬ ভাদ্র ১২৭৮। ৪০ সংখ্যা

আজিকালি প্রায় সমুদায় সামাজিক বিষয়েই গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করা হইতেছে। ব্রাহ্মদিগের বিবাহ বিষয়ক রাজবিধি প্রার্থনাই প্রস্তাবের উদাহরণ স্থল। আদি ব্রাহ্মসমাজের সভ্যেরা যে সমস্ত আপত্তি করিয়াছেন, তাহার একটীও যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে না। আদৌ এ বিধিবিধান প্রার্থনা নিষ্প্রয়োজন। শালগ্রামশিলা সম্মুখে না রাখিয়া পাণিগ্রহণ করিলে বিবাহ সিদ্ধ হয় না, কোন হিন্দু শাস্ত্র ব্যবস্থাপক একথা বলিতে সাহসী হয় না। কুশণ্ডিকা না করিলেও বিবাহ অসিদ্ধ হয় না। উপবীত ত্যাগীরও হিন্দুমতে বিবাহের বাধা দেখা যাইতেছে না। "সকৃৎ কন্যা প্রদীয়তে" এই শাস্ত্রই বিবাহ বিষয়ে সর্ব্বপ্রধান ও অনুল্লঙ্ঘনীয়। কন্যাকর্ত্তা জানিতে না পারিয়া ব্রাহ্মণ বোধে যদি কোন মুসলমানকে কন্যা দান করেন, তাহার আর অন্যথা হয় না। হিন্দুশাস্ত্রকারেরা বিবাহের এই লক্ষণ করিয়াছেন, ইনি আমার ভার্য্যা, ইত্যাকার জ্ঞানকে বিবাহ বলে। যদি এরূপ হইল, রাজবিধির প্রয়োজন কি? ধনাধিকারার্থ? তাহারও ত বাধা দেখা যাইতেছে না। ব্রাহ্মধর্ম্ম অধিক সংখ্যক ব্যক্তির অবলম্বিত হইলে হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মাদির ন্যায় স্বতন্ত্র ধর্ম্ম বলিয়া পরিগৃহীত হইবে সন্দেহ নাই। তাহা হইলেই অভীষ্টসিদ্ধি হইল। তখন আর কাহারই ধনাধিকারে কাহারই বাধা জন্মাইবার শক্তি থাকিবে না। তবে বলিবেন, পিতা হিন্দু, কন্যা ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বিনী, সেই কন্যা সেই পিতার একমাত্র উত্তরাধিকারিণী। আপাততঃ সে ধনটা হাত-ছাড়া হয়। গবর্ণমেণ্ট যদি বিবাহের আইন করেন, তাহা হইলে আর তাহা হাতছাড়া

হয় না। কৈশব সম্প্রদায় এ লোভ নাই করিলেন। ত্যাগশীলতা ব্রাহ্মধর্ম্মের একটী প্রধান লক্ষণ। কৈশব সম্প্রদায় যখন সর্ব্বস্ব ত্যাগে উদ্যত হইয়াছেন, তখন কি এই সামান্য ত্যাগ স্বীকার করিয়া অন্তঃকরণকে নির্ব্বৃত্ত করিতে পারেন না?

আদি সমাজের ব্রাহ্মগণ বিবাহের নূতন আইনপ্রার্থী নহেন। অতএব ব্রাহ্মদিগের বিবাহবিষয়ক আইনের পাণ্ডুলেখ্য বলিয়া যে নামটী দেওয়া হইয়াছে, তাহাও সঙ্গত হইতেছে না।

যাহা হউক আদি ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ প্রস্তাবিত পাণ্ডুলেখ্যে আপত্তি করিয়া আপনাদিগের উদারভাবের পরিচয় দিয়াছেন সন্দেহ নাই। তাহাদিগের উদ্দেশ্যটী অতি মহৎ ও প্রশংসনীয়। তাঁহারা কৈশব সম্প্রদায়ের ন্যায় হিন্দু সমাজত্যাগী না হইয়া হিন্দু সমাজকে সংস্কৃত করিয়া উন্নত করিয়া তুলিবার চেষ্টা পাইতেছেন, এ নিমিত্ত কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি তাঁহাদিগের নিকটে কৃতজ্ঞতাভাজন না হইবেন। তাহাদিগের নিকটে গবর্ণমেণ্টেরও কৃতজ্ঞতাভাজন হওয়া উচিত। গবর্ণমেণ্ট কতকগুলি তরলমতি তরুণের বাক্যে যদি উল্লিখিত বিবাহবিধি করেন, একটী মহা দোষে লিপ্ত হইবেন। যখন এদেশের প্রচলিত বিবাহবিধি ব্রাহ্মদিগের মনোরথ সম্পাদনে অপর্য্যাপ্ত নয়, তখন নূতন বিধি করিলেই যে প্রচলিত বিধির মস্তকে আঘাত করা হইল, সে বিষয়ে অনুমাত্র সংশয় নাই।

বহুবিবাহ। ১৩ ভাদ্র ১২৭৮। ৫১ সংখ্যা

স্ত্রী বন্ধ্যা অথবা পুরুষ বন্ধ্যা কিরূপে তাহার নির্ণয় হইবে, এই আশঙ্কা করিয়া ৬ই ভাদ্রের সোমপ্রকাশে যে প্রস্তাব লিখিত হয়, শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার প্রত্যুত্তর লিখিয়া একখানি পত্র আমাদিগের নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন। বহু মান সহকারে তাহা এই স্থলেই গৃহীত হইল। এ বিষয়ে আমাদিগের যে কিছু বক্তব্য আছে, তাহা পশ্চাৎ উল্লিখিত হইতেছে।

বিদ্যাসাগরের চিঠি

সম্পাদক মহাশয়! গত ৬ই ভাদ্রের সোমপ্রকাশে লিখিত হইয়াছে "যাহারা রাজবিধি দ্বারা বহুবিবাহ প্রতিষেধ প্রয়াস পাইতেছেন···রাজবিধির বলে এই অন্যায়-কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে রাজা কি প্রত্যবায়ভাগী হইবেন না" আপনকার এই লিপি-দর্শনে অনায়াসে বোধ হইতে পারে এদেশে স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে পুনরায় দারপরিগ্রহের প্রথা নাই, রাজবিধি দ্বারা বহুবিবাহ নিবারণপ্রার্থীরা ঐ প্রথা প্রবর্ত্তিত করিবার নিমিত্ত নূতন প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, এবং বহুবিবাহ বিষয়ে

তাঁহাদের উদ্দেশ্যে কি, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখিলে আপনি তাঁহাদের নিকটে এই প্রশ্ন করিতেন না।

স্ত্রী বন্ধ্যা বা ব্যভিচারাদি দোষাক্রান্ত হইলে শাস্ত্রকারেরা পুরুষের পক্ষে পুনরায় দারপরিগ্রহের বিধি দিয়াছেন এবং সেই বিধি অবলম্বন করিয়া অনেকে দারপরিগ্রহ করিয়া থাকে। তদ্ব্যতিরিক্ত, যদৃচ্ছাক্রমে যত ইচ্ছা বিবাহ করিবার প্রথা বিলক্ষণ প্রবল হইয়াছে, এবং এই প্রথার প্রবলতা প্রযুক্ত সংসারে ঘোরতর অনিষ্ট সংঘটন হইতেছে। রাজবিধি দ্বারা বহুবিবাহ নিবারণ প্রার্থীদের উদ্দেশ্য এই, এই লজ্জাকর, ঘৃণাকর, অনর্থকর, অধর্ম্মকর, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড রহিত হইয়া যায়, এবং সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায়ান্তর দেখিতে না পাইয়া তাঁহারা রাজবিধি দ্বারা তৎসাধনার্থ উদ্যোগ করিয়াছেন। যেরূপ রাজবিধি তাঁহাদের প্রার্থনীয়, "বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার" পুস্তকের শেষে তাহার পাণ্ডুলেখ্যের স্থূলমর্ম্ম এই, পূর্ব্ব পরিণীতা স্ত্রী বন্ধ্যা, জাতিভ্রষ্টা চিররোগিণী ব্যভিচারিণী অথবা শাস্ত্রানুসারে অবিবাহ্যা অথচ অনবধানবশতঃ বিবাহিতা এরূপ দোষাক্রান্ত না হইলে, তাহার জীবদ্দশায় কেহ পুনরায় বিবাহ করিতে পারিবেন না, এইরূপ বহুবিবাহ নিবারণী ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইলে যদৃচ্ছ প্রবত্ত বহুবিবাহকাণ্ড এককালে রহিত হইতেছে এবং শাস্ত্রানুসারে যে যে স্থলে পুনরায় বিবাহ করা নিতান্ত আবশ্যক, তাহার ব্যাঘাত ঘটিতেছে না। শাস্ত্রকারেরা বন্ধ্যা স্ত্রীর জীবদ্দশায় পুনরায় বিবাহ করিবার বিধিদান করিয়াছেন এবং তাঁহারাই তাহার কাল নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন। অর্থাৎ প্রথম ঋতুদর্শনের সময় হইতে আট-বৎসরের মধ্যে সন্তান না জন্মিলে, স্ত্রীকে বন্ধ্যা স্থির করিয়া বিবাহ করিবেক, স্ত্রী ও পুরুষ এ উভয়ের মধ্যে কাহার দোষে সন্তান হইতেছে না, তাহার নির্ণয় বা অনুসন্ধানের আবশ্যকতা রাখেন নাই। এইরূপে স্ত্রী বন্ধ্যা বা অন্যবিধ দোষাক্রান্ত হইলে শাস্ত্রানুসারে এতদ্দেশীয় লোকের, পূর্ব্বপরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্দশায় পুনরায় বিবাহ করিবার যে চিরন্তন অধিকার আছে, রাজবিধি দ্বারা বহুবিবাহ নিবারণ প্রার্থীরা তদ্বিষয়ে প্রতিপক্ষতা করিতে উদ্যত নহেন, এইমাত্র ইহাতে "স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে, পুরুষ, দারান্তর পরিগ্রহ করিতে পারিবেন এই প্রস্তাব করা হইয়াছে," এরূপ নির্দেশ কোনমতে সঙ্গত হইতে পারে না। আর যদি তাঁহাদের প্রার্থনানুসারে, প্রকাশিত পাণ্ডুলেখ্যের অনুরূপ কোনও ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হয়, এবং স্ত্রী প্রথম ঋতুদর্শনের সময় হইতে আট বৎসরের মধ্যে পুত্রবতী না হইলে কোন ব্যক্তি নিজে হীনবীর্য্য হইয়াও স্ত্রীকে বন্ধ্যা স্থির করিয়া তাহার জীবদ্দশায় পুনরায় বিবাহ করে, তাহাতে রাজা সে বিষয়ে নূতন বিধি প্রবর্ত্তিত করিতেছেন না। লোকে এ বিষয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধি অনুসারে চলিতে চাহিতেছেন, রাজা তাহাতে আপত্তি করিতেছেন না, এইমাত্র। যাহা হউক, আপনি রাজা বা রাজবিধি দ্বারা বহুবিবাহ নিবারণ প্রার্থীদিগকে এবিষয়ে যে অপরাধী করিতে উদ্যত হইয়াছেন তাহা কোনও মতে ন্যায়োপেত বোধ হইতেছে না।

যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড অশেষ দোষের আস্পদ, তাহা আপনি সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়া থাকেন এবং এই নৃশংস প্রথার নিবারণ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, তাহারও অঙ্গীকার করেন; কেবল তদর্থে রাজবিধি প্রার্থনা করিতে সম্মত নহেন, কারণ তাহা হইলে রাজাকে সামাজিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে দেওয়া হয়। কিন্তু রাজা বহুবিবাহের উপর গুরুতর কর নির্দ্ধারণ করিয়া কৌশলক্রমে তাহা রহিত করুন, অনায়াসে এই প্রস্তাব করিতেছেন এবং এই প্রস্তাবটি সর্ব্বাংশে নির্দোষ ও ফলোপধায়ক বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এবিষয়ে জিজ্ঞাস্য এই, বহুবিবাহ বিষয়ে গুরুতর কর নির্দ্ধারণ করিলে রাজার কি সামাজিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা হইতেছে না? কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলে কেবল সামাজিক বিষয়ে নহে ধর্ম্ম বিষয়েও হস্তক্ষেপ করা হইবেক; কারণ স্ত্রী বন্ধ্যা বা অন্যবিধ দোষাক্রান্ত হইলে শাস্ত্রকারেরা পুনর্বায় বিবাহ করিবার বিধি দিয়াছেন। বহুবিবাহের উপরে গুরুতর কর নির্দ্ধারিত হইলে নিঃস্ব ব্যক্তির ঐ বিধি প্রতিপালনের পথ রুদ্ধ হইয়া যাইতেছে। বলিতে কি আপনকার এই প্রস্তাবটি সমুচিত বিবেচনা পূর্ব্বক করা হয় নাই। গুরুতর কর নির্দ্ধারণ দ্বারা বহুবিবাহ প্রথা রহিত করা অপেক্ষা রাজবিধি দ্বারা বহুবিবাহ নিবারণ প্রার্থীদের অভিমত ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিয়া এই কুৎসিত প্রথা রহিত করা সর্ব্বাংশে শ্রেয়ঃকল্প, অন্তত অপেক্ষাকৃত অনিন্দনীয় ও সমধিক ফলোপধায়ক, স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিলে, বোধ করি আপনকারও তাহা হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। যদি আপনকার প্রস্তাব অনুসারে এতদ্দেশীয় লোকের বহুবিবাহের উপর কর নির্দ্ধারিত হয়, তাহাতে যদৃচ্ছা প্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ডের সর্ব্বতোভাবে নিবারণ হইবেক না; লাভের মধ্যে ইঙ্গরেজ জাতি পৃথিবীস্থ অন্যান্য সভ্যজাতির নিকট যার পর নাই হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইবেন।

কাশীপুর
৮ই ভাদ্র ১২৭৮

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

সম্পাদকীয় উত্তর

বিদ্যাসাগর মহাশয় কহিতেছেন "এক স্ত্রী প্রথম ঋতু দর্শনের সময় হইতে ৮ বৎসরের মধ্যে পুত্রবতী না হইলে কোন ব্যক্তি হীনবীর্য্য হইয়াও স্ত্রীকে বন্ধ্যা স্থির করিয়া তাহার জীবদ্দশায় যদি পুনরায় বিবাহ করে, তাহাতে রাজা প্রত্যবায়ভাগী হইবেন কেন? রাজা সে বিষয়ে নূতন বিধি প্রবর্ত্তিত করিতেছেন না। লোকে সে বিষয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধি অনুসারে চলিতে চাহিতেছেন, রাজা তাহাতে আপত্তি করিতেছেন না এই মাত্র।" এ বিষয়ে আমাদিগের অনেকগুলি বক্তব্য উপস্থিত হইল। বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ, ইহা প্রতিপন্ন হইলে রাজা তাহাতে অনুমোদন করিলেন, এইমাত্র, কোন

অংশে কোন প্রকার কিছু নূতন করিলেন না। সুতরাং রাজা নিন্দিত অথবা ধিক্কৃত হইলেন না। কিন্তু রাজা এইরূপ অনুমোদন মাত্র না করিয়া যদি কিছু নূতন করিতে চাহিতেন, যিনি বিধবাবিবাহ না করিবেন, তিনি দণ্ডনীয় হইবেন, এইরূপ কোন বিধি করিতেন, তাহা হইলে যার পর নাই নিন্দিত হইতেন সন্দেহ নাই। বহুবিবাহ যদি ঐরূপ শাস্ত্রনিষিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইত, আর রাজা কেবল তাহাতে অনুমোদন করিতেন, কিছু নূতন না করিতেন, কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু রাজা তাহা করিতেছেন না, শাস্ত্রকারদিগের উপর কলম চালাইতেছেন। যিনি বহুবিবাহ করিবেন, রাজা তাঁহার ৫ বৎসর কারাবাস ও পাঁচ হাজার টাকা দণ্ড বিধানে উদ্যত হইতেছেন, শাস্ত্রকারেরা এ প্রকার দণ্ডের বিধি করেন নাই। যদি এরূপ হইল, রাজার কেবল শাস্ত্র অনুসারে কৈ চলা হইল? তিনি ত তবে কিছু নূতন করিতে চলিলেন, এক অংশে শাস্ত্র অনুসারে চলিবেন, অপর অংশে ইচ্ছামত ব্যবহার করিবেন, এটী রাজোচিত ব্যবহার নয়। অপর, শাস্ত্রকারেরা ৮ বৎসর সময় নির্দ্দেশ করিয়া স্ত্রী বন্ধ্যা, ইহা স্থির করিবার যেমন উপায় করিয়া গিয়াছেন, ব্যভিচারিণী স্থির করিবার তেমন কোন উপায় করিয়া যান নাই। যদি কোন দুষ্টাশয় লম্পট আপনার সাধ্বী স্ত্রীর প্রতি ব্যভিচারিণী এই দোষারোপ করিয়া পুনরায় বিবাহার্থী হয়, বহুবিবাহার্থীর দণ্ডবিধানোদ্যত রাজাকে তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে সন্দেহ নাই। অতএব রাজা কিছু করিতেছেন না, কিরূপেই বা বলি। ব্যভিচারিণী সন্দেহ স্থলে রাজা যে অনুসন্ধান করিতেছেন, বন্ধ্যা স্থলে সে অনুসন্ধান করিবেন না, ইহা সঙ্গত হইতে পারে না। এই সকল কারণেই আমরা কহিয়াছিলাম, রাজা যদি বহুবিবাহ নিষেধক আইন করিতে চান, কাহার দোষে সন্তান হইতেছে না, স্ত্রী বন্ধ্যা অথবা পুরুষ বন্ধ্যা তাহার নির্ণয় করিবার যুক্তিসিদ্ধ উপায় করা কর্ত্তব্য। তাহা না করিয়া আইন করিলে কতকগুলির সুবিধা করিতে গিয়া অপর কতকগুলির প্রতি অন্যায় করা হইবে, তাহাতে প্রত্যবায়ভাগী হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। এই কথা বলাই আমাদিগের অভিপ্রেত। স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে এদেশে পুনরায় বিবাহ করিবার রীতি নাই, রাজা এবিষয়ে নূতন প্রস্তাব করিতেছেন একথা বলা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে।

বহুবিবাহের উপরে গুরুতর কর নির্দ্ধারণ প্রস্তাব প্রসঙ্গে আমাদিগের বক্তব্য এই, একাবিধ উদ্দেশ্য খ্যাপন করিয়া অপরবিধ কার্য্য সম্পাদন না করিলে কৌশল হয় না। বহুবিবাহ নিবারণ উদ্দেশ্য করিয়াই গুরুতর কর নির্দ্ধারণ করা হইতেছে, ইহা স্পষ্টাক্ষরে সাধারণের গোচর করিয়া রাজা যদি বহুবিবাহের উপরে গুরুতর কর নির্দ্ধারণ করেন, তাঁহার "কৌশল" সম্ভাবনা কি? গুরুতর কর নির্দ্ধারণ প্রস্তাব "নির্দোষ" ভ্রমক্রমেও আমরা এরূপ বিবেচনা করি নাই। জন্মাবধি সোমপ্রকাশ গুরুতর কর প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছে, ইহা অপ্রসিদ্ধ নয়। বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট ভূমিকর আয়কর রথ্যাকর শিক্ষাকর প্রভৃতি নানাবিধ করের সৃষ্টি করিয়া প্রজার বিরাগভাজন হইতেছেন,

সোমপ্রকাশ একথা সর্ব্বদা রাজগোচর করিয়া থাকে। তবে বহুবিবাহের উপরে গুরুতর কর নির্দ্ধারণ প্রস্তাবটী অগত্যাকৃত কণ্টক দ্বারা কণ্টক শোধন সদৃশ। রাজা সামাজিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া যদি বহুবিবাহকারীর গুরুদণ্ড বিধানের আইন করেন, সেটী শরীব প্রবিষ্ট দূষিত কণ্টকের ন্যায় বহু অনর্থের হেতু হইয়া উঠিবে। এই আশঙ্কা করিয়াই আমরা তাহাব নিষ্কাশক কণ্টকের ন্যায় বহুবিবাহের উপরে গুরুতর কর নির্দ্ধারণ প্রস্তাব করিয়াছিলাম। এতদ্দ্বারা দণ্ড বিধান প্রস্তাবটী যদি রহিত হয়, এই আমাদিগের আশা।

কোন বিষয়ে কব গ্রহণ করিলে তাহাতে হস্তক্ষেপ করা হয়, এটী সিদ্ধান্ত বাক্য নহে। করগ্রাহী রাজারও এ সংস্কার নয়। শিক্ষাকর রথ্যাকর গ্রহণ প্রস্তাব হইলে জমিদারেরা স্থায়ি বন্দোবস্ত ভঙ্গ শঙ্কা করিয়া পালিয়ামেণ্ট সভায় এক আবেদন করেন, মহাসভা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, শিক্ষাকর ও বথ্যাকর গ্রহণ দ্বাবা স্থায়ী বন্দোবস্ত ভঙ্গ সম্ভাবনা নাই। বহু দিন হইল, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ব্রহ্মোত্তর ভূমির উপব কর গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ব্রহ্মোত্তর ভূমি আব কোন সমাজে নাই। উহাতে ব্রাহ্মণদিগেরই কেবল স্বত্ব আছে। অনুধাবন কবিয়া দেখিলে উহা হিন্দুদিগের সামাজিক বিষয় বলিয়া প্রতীয়মান হয় সন্দেহ নাই। উহাতে কর গৃহীত হওয়াতে সামাজিক বিষয়ে কি রাজাব হস্তক্ষেপ করা উচিত হইয়াছে? লবণের ব্যবহাব নিষেধের আইন এ উভয়ের বহু বৈলক্ষণ্য আছে। কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলেই তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। অবশেষে বক্তব্য এই, গৌণ মুখ্য যেরূপে হউক কোনরূপে যদি কব নির্দ্ধারণ প্রস্তাব দ্বারা রাজার সামাজিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ সম্ভাবনা থাকে, এ প্রস্তাব উপেক্ষা বিধানই সাধীয়ান।

রাজা যদি আমাদিগেব কব নির্দ্ধারণ প্রস্তাবেব অনুসাবী কার্য্য কবেন, তাঁহার ধর্ম্ম বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা হইবে, এই যে আশঙ্কা কবা হইযাছে তাহার মূল নাই। ··

দণ্ডবিধান প্রস্তাব আব কর নির্দ্ধাবণ প্রস্তাব এ উভয়েব মধ্যে কোন্‌টী সমধিক ফলোপধায়ী, এক্ষণে তদ্বিষয়েব বিবেচনা করা আবশ্যক হইতেছে। যাহারা কৌলীন্য অভিমানে একান্ত অন্ধ তাহারা বহুবিবাহ বিষয়ক পাণ্ডুলেখ্যটী বিধিবদ্ধ হইলে দণ্ডভয়ে নিতান্ত হতাশ হইয়া উঠিবেন। অথচ কৌলীন্য অভিমান পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না, দণ্ড ভয়ে কন্যা, ভগিনী প্রভৃতির বিবাহ দানেও সাহসী হইবেন না। তাহাতে অবিবাহিতারই সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে। পক্ষান্তরে কর নির্দ্ধারণ প্রস্তাবের অনুযায়ী কার্য্য হইলে মোহান্ধ কুলীনদিগের নিতান্ত হতাশ হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহারা কষ্ট পাইয়াও অর্থ সংগ্রহ করিয়া কন্যা ভগিনী প্রভৃতির বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করিবার চেষ্টা পাইবেন। সেই চেষ্টায় তাঁহাদিগের মনে কষ্ট ও অপমান বুদ্ধি প্রভৃতির উদয় হইয়া কৌলীন্য প্রথার প্রতি ঘৃণা জন্মিলে বহুবিবাহ প্রথা আপনা হইতে উন্মূলিত হইয়া আসিবে। দণ্ড পক্ষের ন্যায় এ পক্ষে অবিবাহিতার সংখ্যা বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই।

উপসংহার কালে বক্তব্য এই, অনেকে যোগ্য ঘর পান না বলিয়া এক পাত্রে দুই তিন কন্যা প্রদান করিয়া থাকেন, তাহাতেই বহুবিবাহ প্রথা প্রাদুর্ভূত হয়। ঐ কারণেই উত্তরোত্তর উহার এতদূর শ্রীবৃদ্ধিও হইয়াছে। যে মূল হইতে বহুবিবাহ প্রথার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার উৎপাটন হইলেই বহুবিবাহ প্রথা আপনা হইতে অন্তর্হিত হইবে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কর্ত্তব্য, তিনি সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভার সভ্যগণের সহিত মিলিত হইয়া কুলীনদিগকে ডাকিয়া একটী সভা করেন, ঐ সভাতে সকলে মিলিয়া এমন একটী নিয়ম করুন, অপেক্ষাকৃত হীন ঘরে কন্যাদান করিলেও কুলমর্য্যাদার হানি হইবে না। তাহা হইলে বর সুলভ ও বহুবিবাহও ক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া আসিবে। একব্যক্তি মেল বন্ধন চেষ্টা পাইলে কৃতার্থতা লাভ করিতে পারিবেন না আমাদিগের এরূপ বোধ হয় না। এরূপ হইলে, দণ্ড প্রস্তাব অথবা কর নির্দ্ধারণ প্রস্তাব কোন প্রস্তাবেরই প্রয়োজন হইবে না।

চিঠি। ১৩ ভাদ্র ১২৭৮। ৪১ সংখ্যা

প্রসিদ্ধনামা মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় আমাদিগের নিকটে যে একখানি পত্র পাঠাইয়াছেন, আমরা তাঁহার সম্মানার্থ এই স্থানেই তাহা গ্রহণ করিলাম।

বহুবিবাহ প্রসঙ্গে শ্রীতারানাথ তর্কবাচস্পতির চিঠি

মহাশয়! নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

সম্প্রতি কল্যাণভাজন শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য মহোদয় বহুবিবাহ বিষয়ক যে একখানি ক্রোড়পত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার উপসংহারে লিখিত আছে "অনেকের মুখে শুনিতে পাই তাঁহারা কলিকাতাস্থ রাজকীয় সংস্কৃত বিদ্যালয়ের ব্যাকরণ শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পরামর্শে, সহায়তায় ও উত্তেজনায় বহুবিবাহবিষয়ক শাস্ত্রসম্মত বিচারপত্র প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু সহসা এ বিষয়ে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না।" বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্যের সহিত আমার যে প্রকার চিরপ্রণয় ও আত্মীয়তা সম্বন্ধ আছে তাহাতে পরমুখে শ্রবণ মাত্রই উহা প্রচার না করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল। এককাণে শোনা কথা প্রচার করা বিদ্যাসাগর সদৃশ ব্যক্তির উপযুক্ত ও কর্ত্তব্য হয় না। তিনি কি জানেন না যে তাঁহার কথার মূল্য কত? যাহা হউক বিদ্যাসাগরের হঠকারিতাদর্শনে আমি বিস্মিত ও আন্তরিক দুঃখিত হইয়াছি। ফলতঃ বিদ্যাসাগর মিথ্যাবাদী লোক দ্বারা বঞ্চিত ও মোহিত হইয়াছেন। আমি উক্ত বিষয়ে পরামর্শ, সহায়তা ও উত্তেজনা কিছুই করি নাই। তবে প্রায় একমাস গত হইল, সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভা পরিত্যাগ করিবার কয়েকটী কারণ মধ্যে বহুবিবাহ শাস্ত্র-

সম্মত ইহার প্রমাণ্যার্থে একটী বচন উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছিলাম, যে বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত কিনা, তাহার রহিত করণ বিষয়ে ধর্ম্মসভার হস্তক্ষেপ করা অন্যায়, তাহাতেই যদি বিদ্যাসাগরের নিকটে কেহ সহায়তা করা কহিয়া থাকে বলিতে পারি না; কিন্তু সম্পাদক মহাশয়! বহুবিবাহ যে শাস্ত্রসম্মত ইহা আমার চিরসিদ্ধান্ত আছে এবং বরাবর কহিয়া আসিতেছি এবং এক্ষণেও কহিতেছি যে, বহুবিবাহ সর্ব্বদেশপ্রচলিত ও সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত চির প্রচলিত, তদ্বিষয়ে বিদ্যাসাগরের মতের সহিত আমার মতের ঐক্য না হওয়ায় দুঃখিত হইলাম। তিনি বহুবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদনার্থে যেরূপে শাস্ত্রের অভিনব অর্থ ও যুক্তির উদ্ভাবন করিয়াছেন, অবশ্য বুদ্ধির প্রশংসা করিতে হয়; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ঐ অর্থ ও যুক্তি শাস্ত্রানুমোদিত বা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত হইলেও ভঙ্গকুলীন ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যে প্রণালীতে উহা সম্পন্ন হইয়া আসিতেছিল এবং কতক পরিমাণে এ পর্য্যন্ত প্রচলিত আছে, তাহা অত্যন্ত ঘৃণাকর লজ্জাকর ও নৃশংস। ইহা বিলক্ষণ আমার অন্তরে জাগরূক আছে এবং উহার নিবারণ হয় ইহাতে আমার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল এবং আছে। অধিক কি এইজন্য ৫।৬ বৎসর গত হইল "তৎকালে উপায়ান্তর নাই বিবেচনা করিয়া সামাজিক বিষয় হইলেও" নিরতিশয় আগ্রহ ও উৎসাহ সহকারে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ঐ বিষয়ের নিবারণার্থ বিশেষ উদ্যোগী ছিলাম; কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি, বিদ্যাচর্চ্চার প্রভাবে বা যে কারণে হউক ঐ কুৎসিত বহুবিবাহ প্রণালী অনেক পরিমাণে ন্যূন হইয়াছে। আমার বোধ হয় অল্পকাল মধ্যে উহা এককালে অন্তর্হিত হইবে। অতএব তজ্জন্য আর আইনের আবশ্যকতা নাই, সকল সময়ে সকল আইন আবশ্যক হয় না। এই নিমিত্তই ব্যবস্থাপক সমাজ হইতে বর্ষে বর্ষে আইন পরিবর্ত্তিত হয়।

শ্রীতারানাথ তর্কবাচস্পতি

চিঠিপত্র। ১৩ ভাদ্র ১২৭৮। ৪১ সংখ্যা

বহুবিবাহ প্রসঙ্গে

"বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা" এই নাম দিয়া শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় যে ক্ষুদ্র পুস্তক প্রচার করিয়াছেন, সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই দেখিবেন, বহুবিবাহ যে অশাস্ত্রীয় এ সমাজের সমধিক অনিষ্টকর প্রথা, বিদ্যাসাগর উক্ত গ্রন্থে তাহা বিধিবৎরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সম্প্রতি ৩০শে শ্রাবণের সোমপ্রকাশ পত্রিকায় তাহার বিরুদ্ধে কিছু লিখিত হইয়াছে দেখিয়া আমরা নিতান্তই খেদিত হইলাম। বিজ্ঞ সম্পাদক ঐ প্রস্তাবের একস্থানে বলিয়াছেন যে "কিন্তু আমরা বিস্মিত হইলাম, উল্লিখিত পণ্ডিত দলের ন্যায় বিদ্যাসাগরও বহুবিবাহকে শাস্ত্রনিষিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত বৃথা বহুল প্রয়াস

পাইয়াছেন।" তবে কি সামান্যতঃ বহুবিবাহ প্রথা, সত্যই শাস্ত্রাদিষ্ট নয় (১)। বিদ্যাসাগর বহুবিবাহকে অশাস্ত্রীয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পান নাই, সমধিক পরিশ্রমও করেন নাই। শুদ্ধ শাস্ত্রীয় দৃঢ়তর প্রমাণ কতিপয় উদ্ধৃত ও তাহার যথাযথ ব্যাখ্যা করিয়াছেন মাত্র। বহুবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা এবং অনিষ্টকারিতা এই সর্ব্ব প্রথমে বিদ্যাসাগরের লেখনী হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে এমত নহে, প্রায় একশত বৎসর হইল, পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননও ইহার আন্দোলন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার "বিবাদ ভঙ্গার্ণব" নামক স্মৃতিগ্রন্থের একস্থানে লিখিত আছে যে "অত্র কেচিৎ এতদ্দেশীয় ব্যবহারস্বধিকোঽয়ং কচিন্মহাবংশ প্রসূতা ব্রাহ্মণাঃ সন্তি, তেভ্যঃ কন্যাং সম্প্রদদতাং বংশেন সহ মানবৃদ্ধির্ভবতি, অদানে চ মানহানিঃ হেচ বহুভ্যঃ কন্যাং স্বীকুর্ব্বন্তি, নতাঃ তং সন্তভীর্বা পুষ্ণন্তি। এতাদৃশ ব্যবহারে প্রসিদ্ধে যদি ভর্ত্তা মহাবংশ প্রসূতায় কন্যাং দত্বামৃতঃ, সাচকন্যা সাধ্ব্যাপি ভর্ত্তা ন পোষ্যতে, যতস্তৎ পূর্ব্ব পুরুষ মাহাত্ম্যেনৈব তৎপত্নী গ্রাসাচ্ছাদনাদিকং, সতি সম্ভবে উত্তর কালীন ভরণার্থং ভূম্যাদিকঞ্চ তৎ শ্বশুরো দদাতীতি বহু ব্যবহার সিদ্ধত্বাৎ নিয়ম এব অতস্তস্যা দুহিতুঃ পোষণং সতি সম্ভবে মাত্রা কর্ত্তব্যং। অন্যথা নাথবত্যপি অনাথা-ইব দুহিতা কুত্র ভুঞ্জীত। এবং শ্বশুর দুহিতুরপি অয়মেব ব্যবহারো উচিতঃ তাদৃশ কর্ম্মণা তন্তর্তৃমানবৃদ্ধেঃ। দুহিতৃদুহিতুশ্চ পোষণং সতি সম্ভবে আবশ্যকম্। তস্যা অপি তাদৃশত্বাৎ মহাবংশ প্রসূতানাং মহাবংশ প্রসূতায় কন্যা দানস্যাবশ্যকত্বাদিতি শ্রীমন্মহারাজ বল্লাল সেনোপকল্পিত মানমূলকোযং মহাজন পরিগৃহীতঃ পন্থাঃ। শাস্ত্রেহ দৃষ্টেপি ব্যবহার জ্ঞাপনার্থং লিখিতো বিবেচনীয়স্ত শ্রীমদ্ভিরতস্যা অপি স্ত্রিয়ঃ ইত্যনেন গ্রাহ্যাঃ। অথবা এতাদৃশী বহুবিবাহ রীতি নিবর্ত্তনীয়া ইত্যাহুঃ।" তৎপরে পণ্ডিতবর শ্যামাচরণ সরকার মহাশয় তাঁহার "ব্যবস্থাদর্পণ" নামক স্মৃতি সংগ্রহে সমস্ত শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া, পশ্চাৎ নিষ্কর্ষ-রূপে যাহা লিখিয়াছেন তাহাও বিবেচনীয়, যথা, "এবম্প্রকারেণঃ সবর্ণা বিবাহস্য নিষিদ্ধত্বে দ্বিবিবাহো বহুবিবাহশ্চ কলৌ স্মৃতবাং প্রতিষিদ্ধোভূদিতি নিশ্চেতুমর্হ্যঃ। কিন্তু নব্যাঃ স্মার্ত্তা বিবেচয়ন্তি—যৎ কলৌ অসবর্ণায়াঃ পাণিগ্রহণমনিষিদ্ধমিতি জ্ঞেয়ং। ইদমত্যন্তানিষ্ট করাচরণং শিষ্ট সমাজেষু গর্হিতত্বেন বিবেচিতমপি কুলীনানাং মধ্যে অদ্যাপি প্রচলিতং (২)। সোমপ্রকাশ সম্পাদক, অনন্তর বলিতেছেন—"ইহাতে ইষ্ট লাভ কি? বহুবিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ এই কথা শুনিলেই কি এদেশের লোকে ভীত হইয়া তাহা হইতে বিরত হইবেন? ইত্যাদি।"

(১) এইমাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে, পূর্ব্বে হিন্দু সমাজ মধ্যে হিন্দু শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্মজ্ঞ অনেক অধ্যাপক এবং হিন্দুশাস্ত্রে অকপট আস্থাবান অনেক হিন্দু ছিলেন, বহুবিবাহ শাস্ত্রনিসিদ্ধ হইলে উহা কখন প্রচলিত হইত না। (স.)

(২) বিবাদ ভঙ্গার্ণব ও ব্যবস্থাদর্পণে যে অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে তদ্দ্বারা বহুবিবাহ নিষিদ্ধ ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে না। রাঢ়ায় কুলীনদিগের কুৎসিত প্রথা শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না, বিবাদ ভঙ্গার্ণবে ইহাই লিখিত হইয়াছে, এ কুৎসিত ব্যবহার আমাদিগের অভিমত প্রমাণ নহে। (স.)

তিনি স্থানান্তরে বলিয়াছেন "তবে বলিবেন, বহুবিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ ইহা প্রতিপন্ন না হইলে গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে সঙ্কুচিত হইবেন,—ইত্যাদি।" পাঠকবর্গ! ইহাতে আপনারা কি বুঝিতেছেন? যেন বিদ্যাসাগর মহাশয় জনসমাজের ও গবর্ণমেণ্টের প্রবৃত্তি আকর্ষণের নিমিত্ত শাস্ত্রীয় বিধানকে (১) অশাস্ত্রীয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহিতেছেন, ইহাই বুঝাইতেছে না। কিন্তু, বস্তুতঃ সহৃদয় বিদ্যাসাগরের তাদৃশ কোন অভিসন্ধি নাই। (২) তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই প্রকৃত শাস্ত্র। যথা—ধর্ম্ম প্রজা সম্পন্নে দারে নান্যং প্রকুর্ব্বীতান্যতরাপয়েতু কুর্ব্বীত (৩) বুল্লূকভট্টধৃতাপাস্তম্ববচনং।

বহুদর্শী সম্পাদক অতঃপর বলিয়াছেন "যে বহুবিবাহের বিধি যখন নিত্যবিধি বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে না, তখন গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ বিধেয় কিনা, ইহাই বিবেচনা করা আবশ্যক। যদি গবর্ণমেণ্টের সাহায্য লইয়া আমাদিগের সমাজ সংস্কারের আবশ্যকতা হয়, অসংখ্যবার তাহাদের শরণ লইতে হইবে, প্রতিপদক্ষেপে দাদাকে ডাকা সুখের হয় না। তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের দ্বারা সমুদয় আচার ও ধর্ম্মের সংস্কার আবশ্যক হইয়া উঠে। এত উতলা হইলে চলে না।" সম্পাদকের এই অসার মন্ত্রণার সমুচিত উত্তর (৪) বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুস্তকের ষষ্ঠ আপত্তির উত্তরে সম্যকরূপে প্রদত্ত হইয়াছে, পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

বিচক্ষণ সম্পাদক প্রস্তাবের উপসংহারে লিখিয়াছেন,—"যাবৎ ইহারা স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়া সমাজ সংস্কার করিতে না পারিতেছেন, তাবৎ কালের নিমিত্ত আমরা একটী সদুপায় বলি, সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভার সভ্য মহোদয়গণ অবলম্বন করুন। তাঁহারা এই বলিয়া গবর্ণমেণ্টে আবেদন করুন, শাস্ত্রোক্ত কয়েকটী কারণ ব্যতিরেকে যাঁহারা একাধিক বিবাহ করিবেন, তাঁহাদিগকে প্রত্যেক বিবাহে ৫০০ টাকা টাক্স দিতে হইবে। অর্থসম্বন্ধ আছে, শ্রবণমাত্র এ আবেদন গবর্ণমেণ্টের হৃদয়গ্রাহী হইবে, আমাদিগেরও অভীষ্টসিদ্ধি হইবে। নিঃস্ব অপদার্থ কুলীন কুমারেরাই উপদ্রব করেন, তাহাদিগের বিবাহ

---

(১) অবশ্য বহুবিবাহ করিতে হইবে, শাস্ত্রে এরূপ বিধি নাই পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বহুবিবাহ রাগপ্রাপ্ত। কেহ ইচ্ছা করেন, একাধিক বিবাহ করিবেন, ইচ্ছা না করেন, বিবাহ করিবেন না, শাস্ত্রকারদিগের ইহাই অভিমত। (স.)

(২) বিদ্যাসাগর লোক অথবা গবর্ণমেণ্টকে ভুলাইবার নিমিত্ত বহুবিবাহকে শাস্ত্রনিষিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন, আমরা কুত্রাপি এরূপ অসৎ অভিপ্রায় প্রকাশ করি নাই। শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া তাঁহার যেরূপ বোধ হইয়াছে, তিনি সেইরূপই লিখিয়াছেন; কিন্তু উহাই শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রেত কি না তাহার বিচার আবশ্যক। (স.)

(৩) এতদ্দ্বারা ধর্ম্মকাম ও সন্তানকামের দারান্তর পরিগ্রহ প্রতিষিদ্ধ হইতেছে বটে, কিন্তু রাগপ্রাপ্ত বহুবিবাহের নিষেধ হইতেছে না। (স)

(৪) ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে এ সকল দুর্ব্ব্যবহারের যে উন্মূলন হয়, বিদ্যাসাগরের রচিত গ্রন্থই তাহা প্রমাণ করিয়া দিয়াছে। এই নিমিত্ত আমরা উতলা না হইয়া কাল প্রতীক্ষা করিবার পরামর্শ দিয়াছি। (স)

ব্যবসায় বন্ধ হইয়া যাইবে। অপর লাভ এই, গবর্ণমেণ্টের সামাজিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা হইল না।” উনবিংশ শতাব্দীতে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রাচীন সম্পাদকের লেখনী হইতে এরূপ সারশূন্য হাস্যজনক প্রস্তাব যে বাহির হইতে পারে, ইহা স্বপ্নেরও অগোচর! সম্পাদক মহাশয়! ভাল, গবর্ণমেণ্ট বহুবিবাহের টাক্স ধার্য্য করিলেন, টাক্স না দিয়া কেহ একাধিক মহিলার পাণিগ্রহণ করিলে তাহার দণ্ডের বিধিও অবশ্য ঐ আইনে হইল, ইহা কি পাকতঃ বহুবিবাহ নিবারণের আইন নয় (১) ? এতদ্দ্বারা কি সামাজিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ হয় না? ইহাতে কি সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে নিরপেক্ষতা দূর হইতেছে না? পক্ষান্তরে এরূপ বিধান বিধিবদ্ধ হইলেও বহুবিবাহ নিবারণের আশা সুদূর পরাহত। যাহাদের কুলাভিমান আছে, ঐ প্রস্তাবিত নিয়ম কার্য্যে পরিণত হইলেও তাঁহাদের তাহা দূর হইবে না। লাভের মধ্যে কন্যাভারগ্রস্ত কুলীনেরা এক্ষণে যৎসামান্য অর্থ সংগ্রহ করিয়া কন্যাকে পাত্রস্থ করিতে পরিতেছেন, অতঃপর বরের দেয় ৫০০ মুদ্রা টাক্সও তাঁহাদিগকে সংগ্রহ (২) করিয়া দিতে হইবে। হয় ত এই কারণে অনেক কুলীনকন্যার মুলেই বিবাহের নামও (৩) করিতে হইবে না।

কলিকাতা } ১২৭৮ ইত্যলং বিস্তরেণ

শ্রীকৈলাসনাথ বসু

ব্রাহ্মবিবাহ বিষয়ক আইনের পাণ্ডুলেখ্য। ২৫ পৌষ ১২৭৮। ৮ সংখ্যা

চিঠিপত্র

ব্রাহ্মবিবাহ বিষয়ক আইনেব সংশোধিত পাণ্ডুলেখ্যখানি অনেক বিষয়ে সুন্দর হইয়াছে। রেজিষ্ট্রারের সম্মুখে বিবাহ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ করিতে পারিবেন:

যাঁহারা খৃষ্টীয়ান, ইহুদি, হিন্দু জৈন মুসলমান, পারসী অথবা বৌদ্ধ নহেন, এবং (অথবা) যাঁহারা হিন্দু জৈন, সলমান পারসী অথবা বৌদ্ধ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিম্বা তাহা হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছেন—আদি ব্রাহ্মগণ আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেন অতএব তাঁহাদিগের আশঙ্কার প্রয়োজন রাখে না। কিন্তু যে কয়েকটী সম্প্রদায়ের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহারা ব্যতীত আরও সম্প্রদায় আছে। সাঁওতাল শিখ…যথার্থ হিন্দু নহে। বর্ত্তমান বিল কি তাঁহাদিগের প্রতি খাটিবে? খাটিবে না যে আইনে তাহার বিধি কৈ? ব্যবস্থাপকগণ এক-

(১) সুবাপান নিষেধক আইন, আব তাহাব উপব কব গ্রহণ এ উভযেব কি তুল্যতা আছে? (স.)

(২) আজিকালি এ সংগ্রহ সহজ নহে। (স.)

(৩) পত্রপ্রেবক ও তৎসদৃশ বহুবিবাহদ্বেষিবা কি তাদৃশ কন্যাদিগকে স্বযংবরা হইবার পবামর্শ দিতে পারেন না? (স.)

কালীন যথাস্থানে লক্ষ্য করেন না কেন? কেশববাবু ও তাঁহার অনুচরগণ প্রস্তাবিত আইনটী চাহিতেছেন, অতএব তাঁহাদিগের নাম ধরিয়া আইন করা কর্ত্তব্য হইতেছে। নচেৎ ভবিষ্যতে অতিশয় গোলযোগ হইবে। এক ব্যক্তি নাস্তিক লম্পট ও চোর, হিন্দু অথবা মুসলমানসমাজ তাহাকে বহিষ্কৃত করিয়াছেন। এ ব্যক্তি কি বর্ত্তমান বিলের সাহায্য পাইবে? উভয় স্ত্রী পুরুষ কৈশব ধর্ম্মাক্রান্ত হইবেন এবং বিবাহের পুর্ব্বে অন্ততঃ এক বৎসর ঐ ধর্ম্মানুসারে উপাসনা করিবেন এই করা আবশ্যক, কারণ কেবল বিবাহের অনুরোধে অনেকে ব্রাহ্ম নাম লইতে পারে। বিবাহের পর যদি কোন ব্যক্তি ধর্ম্মান্তরে বিবাহ করেন তাহা হইলে এক পত্নী থাকিতে কি অপর পত্নী গ্রহণ করিতে পারিবেন? ও বয়ঃক্রম অষ্টাদশও স্ত্রীলোকেরা চতুর্দ্দশ বর্ষ করা অতি সঙ্গত হইয়াছে। প্রথম ধারার চতুর্থ প্রকরণ কিছু অস্পষ্ট। ষ্টিফেন সাহেব প্রস্তাব করিয়াছেন বিবাহার্থিগণ যে ধর্ম্মাক্রান্ত আছেন তাহাতে যে যে সম্বন্ধীয় লোককে বিবাহ করা নিষেধ তাহাকে বিবাহ করিতে পারিবেন না। কৈশব ধর্ম্মে এক্ষণে ইহার কিছুই নির্ণয় করে নাই। আমাদিগের মতে এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পুর্ব্বে যিনি যে ধর্ম্মাক্রান্ত ছিলেন সেই সেই ধর্ম্মে যে যে ব্যক্তিকে বিবাহ করিতে নিষেধ আছে সেই লোককে বিবাহ করা যাইবে না স্পষ্ট ব্যবস্থা করা উচিত।

এই আইনানুসারে যাঁহারা বিবাহ করিবেন ১৮৬৫ অব্দের ১০ আইনানুসারে তাঁহাদিগের উত্তরাধিকার হইবে আমরা ইহার প্রতিবাদ করিতেছি। ধর্ম্মে উত্তরাধিকার পরিবর্ত্ত করিতে পারে না, আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট ইহা ইতিপূর্ব্বে লেক্সলোসাই আইনে স্বীকার করিয়াছেন। তবে কৈশবগণ ইচ্ছা করেন সাহেব হইতে পারেন, কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করিতেছি এক ব্যক্তি কৈশব হইবার পরে তাহার পিতার মৃত্যু হইল, উত্তরাধিকার কি প্রকারে হইবে? তিনি কি নিজের বেলা হিন্দুশাস্ত্রের উপকার লইবেন, আর পরের বেলা ১৮৬৫ অব্দের ১০ আইনের আশ্রয় পাইবেন? এ বিষয়ে স্পষ্টবিধি করিলে ভাল হয়। অন্য অন্য বিষয়ে আমাদিগের বিলের প্রতি আপত্তি নাই।

চিঠিপত্র। ১৩ চৈত্র ১২৭৮। ১৮ সংখ্যা

স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রসঙ্গে

কিছুকাল পুর্ব্বে এদেশে স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা লইয়া তর্ক বিতর্ক হইত। কোন কোন সহৃদয় নারী সমাজের প্রতিনিধি হইয়া, তাঁহাদের পক্ষ সমর্থন করিতেন, কোন কোন কুতার্কিক তর্কজাল বিস্তার করিয়া, মুলেই স্ত্রীজাতির স্বাধীনতার স্বত্ব অস্বীকার করিতেন। সৌভাগ্যক্রমে এক্ষণে আর প্রায়ই সেরূপ দ্বন্দ্বধ্বনি শ্রুতিগোচর

হয় না। এক্ষণে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেই স্ত্রীজাতির স্বাধীনতার স্বত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু তথাপি বিরোধের শান্তি হয় নাই। একদল বিচক্ষণ, আজিই রমণী মণ্ডলীকে পুরুষের সহিত নির্ব্বিশেষে স্বাধীনতার স্বত্ব ভোগাধিকার প্রদানার্থ সাতিশয় উৎসুক, অন্যদল আরো কিছুকাল প্রতিক্ষা করিতে বলেন। সদাশয় বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই এই উভয় দলের অন্যতর দলনিবিষ্ট, তাহার সন্দেহ নাই।

এক্ষণে বিবেচ্য এই যে, ঐ উভয় দলের কোন্ দল যথার্থ ন্যায়ের পথে চলিতে চাহেন? আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এই বুঝিতে পারি যে, পরমেশ্বর প্রদত্ত স্বত্ব, স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই নিমিত্ত সমানাংশে বিভাজ্য হওয়া উচিত, তাহার কোনই সন্দেহ নাই, এবং অস্মদাদির আদি পুরুষেরাও যে নারী সম্প্রদায়কে অবাধে স্বাধীনতার স্বত্ব সমপরিমাণে ভোগ করিতে দিতেন, পুরাণজ্ঞ বিজ্ঞ মাত্রেই তাহা হস্তামলকবৎ প্রত্যক্ষ দর্শন করেন। তবে যে কারণেই হউক, বহুশত বৎসর হইতে, এদেশীয় স্ত্রী সমাজ স্বাধীনতা পরিভ্রষ্ট হইয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, সর্ব্বথা অধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ ও অন্তঃপুরের চতুঃসীমায় নিরুদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন। স্বরূপতঃ বলিতে গেলে, কানন বিহারিণী পক্ষিণীকে ধরিয়া দুটী ডানা ভাঙ্গিয়া দিয়া পিঞ্জরে রুদ্ধ করিয়া রাখিলে তাহার যেরূপ অবস্থা হয়, বর্ত্তমান সময়ে এদেশের নারী সমাজের অবস্থাও ঠিক সেইরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, অতএব এ সময় রমণীমণ্ডলাকে স্বাধীনতার স্বত্ব ভোগাধিকার প্রদানার্থে সহসা দ্বার মুক্ত করিয়া দিলে ভগ্নপক্ষ বিহগীকে পিঞ্জরমুক্ত করিয়া বনে ছাড়িয়া দিলে তাহার যেরূপ শোচনীয় অবস্থা হয়, নিঃসন্দেহ সেইরূপ অবস্থা ঘটিবে। তবে কি স্ত্রী-সমাজকে অধীনতার শৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখাই বিধেয়? কখনই নহে। বনবিহারিণী বিহগীকে পিঞ্জররুদ্ধ করিয়া রাখা অপেক্ষা নারীজাতিকে অন্তঃপুরে রুদ্ধ করিয়া রাখা আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানে অন্যায়—গুরুতর অন্যায়। অতএব আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কহিতেছি যে, ঈশ্বরপ্রদত্ত স্বাধীনতার স্বত্ব ভোগার্থে পিঞ্জরবদ্ধ বিহঙ্গিনীকে, এবং অন্তঃপুরে রুদ্ধ রমণীমণ্ডলীকে ছাড়িয়া দাও। কিন্তু পক্ষভগ্ন পক্ষিণীকে ছাড়িয়া দেওয়ার পূর্ব্বে, তাহাকে এমন সবল ও সহজ গতি প্রতিগতি করিতে সক্ষম করিয়া দেওয়া উচিত, যেন অন্য বন্য পক্ষীতে তাহাকে উৎপীড়ন করিতে না পারে, যেন সে পূর্ব্ববৎ স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া বেড়াইতে পারে। সেইরূপ স্ত্রীজাতিকে এমন অবস্থাপন্ন করিয়া অধীনতার কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া দেওয়া বিধেয় যেন তাঁহারা সর্ব্বতঃ প্রকারে স্বাধীনতার নামে সতীত্ব রত্ন হারাইয়া পাপহ্রদে চিরনিমগ্ন হইয়া না রহেন, যেন, আপাত মুগ্ধকর প্রলোভনে পড়িয়া ভারতভূমির চিরোপার্জ্জিত গৌরবজ্যোতিঃ দুরাশা-তিমিরে আচ্ছন্ন করিয়া না ফেলেন।

এক্ষণে কথা এই হইতেছে যে, আমারদিগের অভিলষিত স্ত্রীসমাজের যে অবস্থার উল্লেখ আমরা করিয়াছি সে কি অবস্থা? সে আর কিছুই নয়, কেবল সুশিক্ষা ও সদ্ধর্ম্মোপদেশ দ্বারা তাঁহাদিগের চিত্ত সবল করিয়া দেওয়া। তাহা হইলে তাঁহারা আপনারদের হিতাহিত, ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সকলই পর্য্যালোচনা করিতে পারিবেন।

ধর্ম্মের নির্ম্মল জলপূর্ণ সরোবর সম্মুখে থাকিতে, কখনই পূতিগন্ধময় সজল সলিলপূর্ণ অধর্ম্মের অন্ধকূপে অবগাহন করিবেন না।

পরিশেষে এই প্রশ্ন হইতেছে যে, স্ত্রীসমাজের উক্ত বিধ শিক্ষোন্নতির সুবিধান কি? আমরা এবারে এই মাত্র বলিয়া এ প্রস্তাবের উপসংহার করিতেছি যে, বর্ত্তমানে আমাদের রমণীমণ্ডলীব যেরূপ শিক্ষা বিধান হইতেছে, তাহাতে ফলগত বিলাসিতারই বাহুল্যতা দৃষ্ট হইতেছে। ওরূপ শিক্ষাদ্বারা ধর্ম্মনীতি সবলা হওয়ার প্রত্যাশা নাই।

কলিকাতা। কৈলাসচন্দ্র বসু।

সামাজিক 'লোফার'। ১ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৯। ২৬ সংখ্যা

সকলেই লোফাবদিগকে জানেন। ইহাবা ক্ষমতা থাকিতে পরিশ্রম করে না। ভিক্ষা অথবা অপহরণ দ্বারা পরের দ্রব; লইয়া কাল যাপন করা ইহাদিগের অভ্যাস। কিন্তু ইহারা ভিক্ষুকের ন্যায় নম্র নয়। দস্যুগণ বলে "টাকা দাও, নতুবা তোমার প্রাণ গেল।" লোফারদিগের ভিক্ষাও সেই প্রকার। লাম্পট্য, চুরি, সুরাপান, মিথ্যা কথা, দাঙ্গা প্রভৃতি বিস্তব পাপ ইহাদিগের একচেটিয়া। লোফার নাম শুনিলেই একজন ছিন্নবস্ত্র পরিধায়ী বিকটমুখ বলবান অর্দ্ধ-দস্যুর আকৃতি মনোমধ্যে উদয় হয়। ইহাবা নগরের লোফার। এভিন্ন সমাজে এক প্রকার লোফাব আছে। ইহারা আকৃতিতে নাবিক লোফারের ন্যায় না হউক, আর সকল বিষয়ে নিষ্কর্ম্মা নাবিক অপেক্ষা প্রধান। শেষোক্ত ব্যক্তি কেবল আহার ও সুরাপান করিতে পাইলেই সন্তুষ্ট হয। কিন্তু সামাজিক লোফার ইহাতে সন্তুষ্ট নহে। এই মহাপুরুষদিগের কিঞ্চিন্মাত্র লেখাপড়া জ্ঞান আছে, কিন্তু বাহিরে এরূপ ভাব প্রকাশ করা হয় যে, এমন প্রগাঢ় পণ্ডিত আর নাই। কোন পণ্ডিতের কথা হইতেছে, সামাজিক লোফার অমনি বলিয়া উঠেন "সে কি জানে? আমি অমুক সময়ে তাহার সহিত কথা কহিয়া ছিলাম, সামান্য ঐতিহাসিক ঘটনাগুলিও সে বলিতে পারে না।" কিন্তু সামাজিক লোফারের বাটী অনুসন্ধান করিলে একখানি পুস্তক পাওয়া যায় না। বিদ্যালয়ে যে সকল পুস্তক পাঠ করা হইয়াছে, বহুকাল সেগুলি হকারের নিকটে সের দরে বিক্রয় করা হইয়াছে। নূতন পুস্তক অথবা সংবাদ-পত্র একখানিও নাই। তথাপি আমাদিগের লোফার মিলের শেষ গ্রন্থের দোষ গুণ ও প্রিন্স বিসমার্কের শেষ কার্য্যের নিগূঢ় তাৎপর্য্যের বিষয়ে কথোপকথন করিতে পারেন। সাহিত্য, বিজ্ঞান, আইন যে বিষয়ের কথা পাড়িবে লোফার সে সকলই জানেন। "১৮৫৯ অব্দের ৮ আইনে ফৌজদারী বিচারপতিদিগকে ভূমি জরিপ কবিতে বলা হইয়াছে" লোফারের একথা কাহার সাধ্য খণ্ডন করেন। তুমি বল ইহা নিতান্ত ভ্রম, লোফার অমনি বলিবেন "এখানে জুয়াচুরি করিলে খাটিবে না।"

ভদ্রলোককে এরূপ অসমসাহসী মূর্খতা দর্শন করিয়া স্তব্ধ হইতে হয়। লোফার ভাবেন, আমার প্রশংসা বৃদ্ধি হইল। তবে এই সকল লোক এক বিষয়ে সতর্ক হয়। তাহারা কখন উপযুক্ত তৃতীয় ব্যক্তির সম্মুখে কোন কথা বলে না। মূর্খের দলে একা বাল্মীকিকে পাইলেও বলে, তিনি চারি ছত্র কবিতা লিখিতে পারেন না, কিন্তু উপযুক্ত মধ্যস্থ থাকিলেই লোফারের মুখ বন্ধ হয়। নিকৃষ্ট দলে বাহাদুরী করা এই সকল লোকের অভ্যাস। মূর্খগণ ভাবে এত বড় লোক যখন আমার বন্ধু তখন আমার ভাবনা নাই। লোফারের বিদ্যা ইহাদিগের নিকটে সমুদ্রবৎ বোধ হয়। সামাজিক লোফার পরিশ্রম করে না। মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র কাহারই নিমিত্ত ইহারা চিন্তা করে না। আপনার তৃপ্তি হইলেই হইল। ইহাদিগের এমন চমৎকার ক্ষমতা এই, তোমার টাকা লইবে, কিন্তু দেখাইবে যেন তোমার টাকা লইয়া তোমারই মহা উপকার করিল। বলিতে থাকে, তোমাকে ভালবাসি বলিয়াই সাহায্য লইতেছি। "অমুক আমার পিতৃব্য, আমি চাহিলে তিনি পাঁচ সহস্র টাকা দিতে পারেন, কিন্তু তাহা আমি লই না, কেন তাঁহার নিকটে লঘুতা স্বীকার করিব।" লোফার এরূপ ভাব দেখায় যেন দেশে এমন বড় লোক নাই যাঁহার সঙ্গে তাহার বন্ধুত্ব না আছে। অল্প বুদ্ধি ও আত্মাভিমানী লোক ইহাতে মোহিত হইয়া ভাবে 'দ্বারে হস্তি বাঁধিয়াছি।" নাবিক লোফারের উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ ও আহারের দিকে তত দৃষ্টি নাই। কিন্তু সামাজিক লোফার উত্তম বস্ত্র না হইলে পরিধান করিতে পারে না। সাদা ভাত ইহাদিগের মতে শূকরের আহার। অম্বুরি তামাক যে না খায় সে ছোট লোক। যাঁহারা লোফারের কুহকে পড়েন, তাঁহারা পাছে লোফার মহাশয় ইতর ভাবেন বলিয়া নিজে উত্তম বস্ত্র পরিধান ও উত্তম আহার করেন, সেই সঙ্গে প্রিয় সহচরকেও সেই প্রকার, কখন কখন তদপেক্ষা উৎকৃষ্টও দিতে হয়। লোফার এক একজনকে পাইয়া বসিলে তাহার ভিটায় ঘুঘু না চরাইয়া ছাড়ে না। যে সে প্রকারে তাহার টাকা লওয়া হয়, এবং সুবিধামত উপকারকের স্ত্রী ভগিনী কন্যা প্রভৃতিকে কুপথগামিনী করিতে পারিলেও ছাড়ে না। এইরূপে নিজ ব্যয় চলে। কিন্তু পরিবারের যারপর নাই কষ্ট হয়। লোকে যতই অল্পবুদ্ধি হউক না কেন, তথাপি যখন দেখে যে, এক ব্যক্তি কেবল আপনার আমোদ লইয়াই আছে, তখন অবশ্যই মনে মনে ভাবে "এ ব্যক্তি আপনার পরিবারকে খাইতে দেয় না, বাটী যায় না যেখানে পায় সেইখানে আহার ও শয়ন করে। এমন ব্যক্তি কি যথার্থ ভদ্রলোক হইতে পারে?" লোফার এই আশঙ্কার পথ পূর্ব্ব হইতে রুদ্ধ করিয়া রাখে। মধ্যে মধ্যে ধর্ম্মের কথা হয়। বলিয়া থাকে পুত্র কন্যা সম্বন্ধ কেবল ঐহিক মাত্র, পরিবারকে অন্নদান না করিলে পাপ নাই। পাপ পুণ্য সকলই ঐহিক। যাহাতে মনের কষ্ট হয় তাহাই পাপ, যাহাতে সুখ হয় তাহাই পুণ্য। ঈশ্বরের অস্তিত্ব কেবল ক্ষীণমতি লোকেরা স্বীকার করে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা আনুমানিক। সুখদুঃখও আনুমানিক, পীড়া স্বাস্থ্যও আনুমানিক। নিজের কষ্টের

ন্যায় পরের কষ্টও আনুমানিক। ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধেও এই তর্ক। ব্যভিচার, চুরি, প্রতারণা, বৈরনির্য্যাতন স্পৃহা প্রভৃতিতে যদি মনের আনন্দ হয়, তবে অবশ্য তাহা করিবে। যাহারা নিজে হীনমতি তাহাদিগের পক্ষে এই সকল তর্ক বিশেষ সুখকর। পরকালের ভয় না থাকিলে অনেক ভয় যায়। সুতরাং ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমাদিগের সামাজিক লোফার বেদ স্বরূপ হইয়া উঠে।

সামাজিক লোফারের অবস্থা এই, কিন্তু পাছে যে ব্যক্তির স্কন্ধে চাপিযাছে তাহার অর্থ যাইবার ভয় হয়, সেই নিমিত্ত সর্ব্বদা বলা হয় "আমি চেষ্টা পাইতেছি, শীঘ্র আমার অবস্থা ভাল হইবে, তখন তুমি বিশেষ সাহায্য পাইবে।" যাহার স্কন্ধে চাপে তাহার পয়সা যায়, কিন্তু আশা থাকে, কোন কালে তাহার প্রত্যুপকার হইবে। এই জন্য হীনমতি লোকের তাহাকে কিছু বলিতে সাহস হয় না। সে এই সুযোগে যত ইচ্ছা স্বার্থ সাধন করে। লোফারের সর্ব্বদাই ভবিষ্যৎ আশা আছে। লোফার দুই বৎসর পরে রাজা হইয়া অমুকের সর্ব্বনাশ করিবে, লোফারের সৌভাগ্যের সীমা থাকিবে না, পৃথিবী বিস্মিত হইযা স্বীয় দোষ স্বীকার করিযা বলিবেন, এত বড় লোক লুকাইযাছিল তাহা আমরা জানিতাম না।" কিন্তু বর্ত্তমানে তাহার কিছু হইবার যো নাই। সে নিজে কোন আশা করে না, সে যে মন্দ লোক তাহার জ্ঞান আছে এবং তাহার কখন ভাল হইবে না তাহারও সন্দেহ করে না। কিন্তু যাহাদিগকে দোহন করিতে হইবে তাহাদিগকে দেখায় যে তাহার দুভাগ্যের সুখতারা শীঘ্র উদিত হইবে।

এই সকল লোক সমাজের ভয়ানক কণ্টক। ইহারা না মাতার, না পিতার, না স্ত্রীর, না সন্তানের, না আত্মীয়ের। স্বার্থ ইহাদিগের সকলই। তবে কিছু দিন ইহারা লোককে এই বলিয়া বিমোহিত করে, যেন পৃথিবীর ঐশ্বর্য্যকে গ্রাহ্য করে না এবং যদি সমুদায় ভারতবর্ষের এক বর্ষের রাজস্ব এক দিনে পায়, সমুদায় দান করিতে পারে। কিন্তু প্রকৃত ভাব শীঘ্র প্রকাশিত হয়। সুখ দুঃখ আনুমানিক, মুখে লোফার এই কথা বলেন, কিন্তু একটা ব্যঞ্জন বিস্বাদ হইলে বৃষের ন্যায় গর্জ্জন করিতে থাকেন। যে ৫০-কোটি টাকা দান করিতে পারে সে এক টাকা বাজার করিতে পাইলে চারি আনা চুরি করিতে ছাড়ে না। সূক্ষ্মদর্শী লোক শীঘ্র বুঝিতে পারেন, লোফারের উপকার করা আর তাহার শত্রু হওয়া সমান। এই নিমিত্ত সামাজিক লোফারেরা এক অদ্ভুত উপায অবলম্বন করে। তাহারা সুযোগ পাইলেই উপকারকের সহিত বিবাদ করিয়া লোককে জানায, যে তৎপ্রদত্ত উপকার সে তুচ্ছজ্ঞান করে। একে এ সকল লোকের কৃতজ্ঞতা নাই, তাহাতে আত্মাভিমান বিলক্ষণ আছে, ইহাদিগের সহিত সমাজে একত্র হওয়া অতিশয় কষ্টের হয়। ঋণের তমাদিকাল তিনবৎসর, লোফারের উপকারের তমাদি এক দিনেই হইযা যায়। ইহাদিগের উপকার করা বৃথা। কৃতজ্ঞতা স্বীকার ইহারা অপমানের বিষয় জ্ঞান করে, তাহা করিলে ইহাদিগের ব্যবসায়ের হানি হয়, আর কাহাকে ঠকাইতে

পারে না। যখন বড় কৃতজ্ঞতা দেখান হইল, তখন উর্দ্ধসংখ্যা বলা হয়, উপকার করা মানুষের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, যে ব্যক্তি এ নিমিত্ত কৃতজ্ঞতা চায়, সে মূঢ়!! যাঁহারা সমস্ত জীবন ধর্ম্মকার্য্যে বিনিয়োজিত করেন, তাঁহারাও প্রত্যুপকাব স্বরূপ পরকালের নিস্তার আশা করেন। ঈশ্বর এত উপকার করিয়াছেন, তথাপি তিনিও আশা করেন যে জীব সকল ইহা ভোগ করিয়া তাঁহার গুণগান করিবে কিন্তু সামাজিক লোফারের কোষ্ঠীতে ইহা লিখে না।

সামাজিক লোফাবদিগেব আব এক ভয়ঙ্কব গুণ আছে। ইহাদিগের সমবয়স্ক মাত্রেই ইহাদিগের শত্রু। নিজেদেব বুদ্ধি বিদ্যা নাই, সমাজ সম্মান নাই, তথাপি সমবয়স্ক কেহ প্রধান হইলে রাগেব সীমা থাকে না। লোফাবের উক্ত ব্যক্তির ন্যায় নিজের বড হইবার বাসনা নাই, কিন্তু তাঁহাব পতন হইবে ও আপনি বড হইব একান্ত এই বাসনা। ফলত মানুষেব যত দোষ জন্মিতে পারে, লোফাবেব তাহা আছে। ইহারা অধার্ম্মিক, নাস্তিক, অকৃতজ্ঞ, ইন্দ্রিয়পবায়ণ, জুযাচোব, বিশ্বনিন্দুক, উপকারকের শত্রু ও আত্মীয়ের কণ্টক। যতক্ষণ সাহায্য পাইবে ততক্ষণ বন্ধুতা, তাহার শেষ হইলেই প্রকাশ্য শত্রুতা। ইহাদিগের যদি কখন সৌভাগ্য হয, তাহা কেবল লোকের কষ্ট ও অপমানের হেতু হইয়া থাকে। অন্য একজন বাটীতে অন্নদাস হইয়া আছে, কল্য যদি সৌভাগ্য হইল (লোফাবেব ভাগ্যে ইহা প্রায হয় না) তবে আব সে বাটীতে সাধিলেও আহার হইবে না। তখন কলাইব ডাউল ঘোড়ার খোরাক বোধ হয়। দীর্ঘকাল লোফাবেব এই প্রতবণা চলে না। যে সকল ব্যক্তি অতি নির্ব্বোধ তাহারাও বুঝিতে পাবে কেবল ঠকানই লোফাবেব ব্রত। লোফারের যথার্থ সৌভাগ্য সূর্য্যের কখন উদয় হয় না। কিছু দিন ইহাবা ঠকাইয়া খায, কিন্তু ইহারা পরিণামে আত্মীয়-হীন সমাজচ্যুত ও দরিদ্র হইযা পড়ে। পৃথিবী কর্ত্তৃক পবিত্যক্ত হইলেও স্ত্রী পুত্রের নিকটে স্নেহ পাওয়া যায। কিন্তু লোফাবেব ভাগ্যে তাহাও ঘটে না। জীবনের শেষাংশ প্রায জেলে অতিবাহিত হয়। চিন্তা, আত্মভৎসনা, পৃথিবীব উপরে বিরক্তি এইগুলি লোফাবেব জীবনেব পবিণা। বুদ্ধিমান লোকে ইহাদিগকে চিনিবামাত্র পরিত্যাগ করিয়া বক্ষা পান, যে সকল লোক ইহা না করে, তাহাদিগের পরিণাম প্রায় লোফারেব ন্যায় হইযা উঠে।

চিঠিপত্র। ৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৯। ২৭ সংখ্যা

কন্যাসন্তান বিষযে

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

মহাশয়। আজিকালি এই কলিকাতা নগরী মধ্যে বসাক বাবুরা সম্পন্ন লোক বলিতে হইবে। অনেকে বিশেষ সঙ্গতিপন্ন এবং বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়েও বিশেষ পারদর্শী,

কিন্তু দুঃখের বিষয় সমাজসংস্কার বিষয়ে ইহারা আজিও সর্ব্ব পশ্চাতে রহিয়াছেন। আজি আমরা একটী বিষয়ের উল্লেখ করিব, যাহাতে শত শত পরিবার নিরন্তর দুঃখ-সাগর নিমগ্ন রহিয়াছে।

এই জাতি মধ্যে বিবাহপ্রথা এত জঘন্য হইয়াছে যে, তাহা শ্রবণ করিলে আশ্চর্য্য হইবেন। যদি কোন ব্যক্তির কন্যাসন্তান জন্মে তাহা হইলে অমনি যেন তাহার মস্তকে বজ্রাঘাত হয়। কন্যার পিতা তখন মনে ভাবেন (প্রকাশ করিতেও লজ্জা বোধ করেন না) যে কেন ওটা জন্মিয়াই নষ্ট হইল না। এমন কি যদ্যপি লুণ খাওয়াইয়া মারিয়া ফেলিলে আইন মতে দণ্ডনীয় না হইত তাহা হইলে বোধ হয় অনেকে তদ্বিষয়েও সঙ্কোচ বোধ করিতেন না। কন্যাসন্তান এত ঘৃণিত হইবার একমাত্র কারণ এই যে, কন্যার বিবাহ দিতে অনেক ব্যয় পড়ে। এই হেতুই অনেকে তাহাদিগের বিদ্যাশিক্ষা এমন কি সম্যক লালনপালন বিষয়েও যত্ন করেন না। সত্য বটে আজিকালি বিদ্যার আলোকে কুসংস্কারান্ধকার দূরীভূত হইয়াছে এবং অনেকে কন্যার প্রতি সন্তানোচিত ব্যবহার করিতে শিখিয়াছেন এবং নানা প্রকারে তাহাদিগের উন্নতি চেষ্টাও করিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় বসাকবাবুদের মধ্যে বোধ হয় এটি আজিও স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হয়। তাঁহারা আজিও কন্যার প্রতি যথার্থ ব্যবহার শিখেন নাই। কেবল একমাত্র বিবাহ পদ্ধতিই ইহার অদ্বিতীয় কারণ নির্দ্দেশ যাইতে পারে। ইহাদিগের মধ্যে বিবাহে এত ব্যয় যে শুনিলে অবাক হইবেন। যদি কাহারও পুত্রসন্তান থাকে, তাহা হইলে অহঙ্কারে তাঁহার আর মাটিতে পা পড়ে না। তাঁহার পুত্রের সহিত নিজ কন্যার বিবাহের নিমিত্ত লোক প্রেরণ কর, (পূর্ব্বে ত কোন প্রকারেই মুখ তুলিয়া কথা কহিবে না) অনেক অনুনয় বিনয়ের পর বলিবেন যে নগদ দুটি হাজার টাকার এক পয়সা কমে হইবে না—তা তিনি নিজে বিশেষ সম্পন্ন হউন বা না হউন, ছেলে লেখা পড়া জানুক বা নাই জানুক আর মাতালই হউক বা বদমায়েস হউক, তাহার ডাক দুটি হাজার টাকা !! ইচ্ছা হয় অগ্রসর হও। তাহারা অবিবাহিত ছেলেকে সচরাচর "কোম্পানির কাগজ" বলিয়া থাকেন। ভাঙ্গালেই টাকা। যাহার একটি ছেলে তাহার খুব ভরসা। আর দুটি তিনটি থাকিলে তার অন্ন আর খায় কে ? অভাব পক্ষে প্রতি ছেলে ভাঙ্গাইলে এক হাজার টাকা ত কেও ঘুচায় না !! মহাশয় ! এক্ষণে মনে করুন, যে ব্যক্তির দুইটি বা তিনটি কন্যা, তাঁহার নিজের আয় জোর মাসে ৫০।৬০ টাকা, পরিবারও শত্রুর মুখে চিনি দিয়ে অনেকগুলি, সুতরাং যেমন আয় তেমনি ব্যয়। এমনস্থলে দুর্ভাগ্য পিতা কেমন করিয়া কন্যা কয়টির বিবাহ দেয়। ঘটি বাটী অলঙ্কার প্রভৃতি যা আছে তাহা বাঁধা, অধিক কি বসতবাটী বিক্রয় না করিলে আর পণের টাকা যোগাড় হইবার উপায়ান্তর নাই। এতদ্ভিন্ন আরও অন্যান্য ব্যয় আছে। যাঁহারা বিশেষ সম্পন্ন তাঁহাদিগের কোন কষ্ট হয় না বটে, কিন্তু যাহারা নিত্য খেটে খায় বা

যাহারা দুঃখী, তাহাদিগের বাস্তবিক সর্ব্বনাশ ঘটে। এদিকে বিবাহ না দিলে জাত যায়; সুতরাং কন্যার পিতাকে চুরি করেই হউক, বা ডাকাতি করেই হউক যে প্রকারেই হউক টাকা সংগ্রহ করিয়া স্বার্থপর নিষ্ঠুর বরের পিতার উদর পুরণ করিতে হইবে !! কি ভয়ানক স্বার্থপরতা !! এই প্রকারের বিবাহ প্রণালী প্রচলিত থাকাতে কত কত পরিবার গৃহশূন্য ও উপায়বিহীন হইয়া অহর্নিশি রোদন করিতেছে। আবার এই হেতুই অনেক অনেক সৎপাত্রী অতি জঘন্য, মাতাল,·· পতির হস্তে পড়িয়া যাবজ্জীবন কষ্ট ভোগ করে, এবং ইহা হইতেই বোধ হয় সময়ে সময়ে কন্যা নিজকুলে জলাঞ্জলি দিতে ত্রুটি করে না। ইহাতে কত অনিষ্ট উৎপন্ন হইতেছে তাহা এক্ষণে কৃতবিদ্য মহাশয়গণ ভাবিয়া দেখুন। দুঃখের বিষয় যে এই জাতি মধ্যে অনেক অনেক ধনী ও কৃতবিদ্য মহোদয় সত্ত্বেও এই জঘন্য প্রথা নিবারণের কোন উপায় হইতেছে না। ফলতঃ এ বিষয়ে কাহারও চেষ্টা নাই। যাঁহার অর্থ আছে তাঁহার ইচ্ছা বা প্রয়াস নাই (কেননা তাঁহার ত আর কোন ভাবনা নাই), যাঁহার প্রয়াস আছে তাঁহার উপায় নাই; সুতরাং দিন দিন এই প্রথা আরও ভয়ানক মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে। এই প্রকার ভয়ানক সর্ব্বনাশোৎপাদক প্রথা আজিও প্রচলিত থাকে ইহা সামান্য দুঃখ ও লজ্জার বিষয় নহে। আমরা বাবু রাধাকৃষ্ট শেঠ, বাবু গৌরদাস বসাক প্রভৃতি অনেকগুলি ধনী ও কৃতবিদ্য মহাশয়ের নামোল্লেখ করিতে পারি, যাঁহারা একবার মনোযোগ করিলেই এ বিষয় সুসম্পন্ন হইতে পাবে। এই বিষয় আন্দোলনের নিমিত্ত একটি বিশেষ সভা আহূত হউক, এবং জাতীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গ সমবেত হউন। বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত দ্বারা স্থিরীকৃত হইলে এমন নিয়ম করা হউক যে যাহার যেরূপ সঙ্গতি তাহার নিকট হইতে তদ্রূপ পণ গ্রহণ করা হইবে, যিনি সেই নিয়মানুসারে কার্য্য না করিবেন তাঁহার সহিত কেহ আহার ব্যবহার করিবেন না। এই সকল বিষয় অনুসন্ধানের নিমিত্ত একটি বিশেষ কমিটী নিযুক্ত হউক। তাহা হইলেই সকল মঙ্গলের সম্ভাবনা। নচেৎ হতভাগ্য কন্যাভারগ্রস্ত পিতা আর কতকাল রোদন করিবে? কতকাল আর কন্যাদিগের প্রতি লোকের এই প্রকার অনাদর ও বিষদৃষ্টি থাকিবে? কতকালই বা আর এই কুপ্রথা নানা অনিষ্ট প্রসব করিবে?

কলিকাতা চড়কডাঙ্গা }
২রা জ্যৈষ্ঠ ১২৭৯ }

কস্যচিৎ কন্যাভারগ্রস্তা
হতভাগ্যস্য

বাঙ্গলা দেশের একটী শোচনীয় অবস্থা। ১ শ্রাবণ ১২৭৯। ৩৫ সংখ্যা

সম্রাটদিগের সময়ে রোমের যে অবস্থা হইয়াছিল, আজিকালি বাঙ্গলা দেশের তদনুরূপ দশা ঘটিয়াছে। সাধারণতন্ত্রকালে রোমদিগের গুণে পক্ষপাত, দোষে দ্বেষ,

পাপে ঘৃণা, ব্যসনাসক্তিশূন্যতা, মিতব্যয়িতা, ব্যায়াম চর্চ্চা, শৌর্য্য বীর্য্য পরিশীলনাদি যে যে উদার গুণ ছিল, যাহার প্রভাবে রোম পৃথিবীর মধ্যে অদ্বিতীয় হইয়া উঠিয়াছিল, সম্রাটদিগের অধিকারকালে ক্রমে সে সমুদায় অন্তর্হিত হয়। তখন আর জঘন্য কার্য্যে অরুচি ছিল না, পাপে ঘৃণা ছিল না, পাপ কর্ম্ম করিয়া কেহ লজ্জিত হইত না। সামান্য কার্য্যে আমোদ প্রমোদেই কালাতিপাত। ব্যসন একছত্র হইয়া তৎকালে রোমে আধিপত্য করে। সম্রাট (নিরো) রঙ্গভূমিতে রথ চালাইতেছেন, বীণা বাজাইতেছেন, গান করিতেছেন, প্রজারা চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইয়া বাহবা দিতেছে। পাপের প্রতি ঘৃণা এমনি কমিয়া গিয়াছিল, পূর্ব্বে কন্সলেরা এক একটী দেশ জয় করিয়া আইলে যে প্রকার মহোৎসব হইত, নরাধম নিরো মাতৃবধাদি বীভৎস কার্য্য করিলে সেইরূপ উৎসব আদিষ্ট হয়। পাপক্রিয়ার অনুষ্ঠান-কারির লজ্জা ছিল না, তাহার প্রমাণ এই, নিরো যে যে গর্হিত কার্য্য করেন, লোকে তাহা লইয়া অবাধে বিদ্রূপ করিত, নিরো তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিতেন না।

আজিকালি বাঙ্গলা দেশেও ঐরূপ ব্যসনের একাধিপত্য। অধিকাংশ লোকের আমোদ প্রমোদে কালক্ষেপ। গান বাদ্য যাত্রা অভিনয় লইয়াই অনেকে ব্যতিব্যস্ত। পাপ কর্ম্মে ঘৃণা অল্প। কুকর্ম্ম করিলে কেহ কাহাকে কিছু বলেন না। সমাজে তিনি হতাদর হন না। পুরুষোচিত গুণের অর্জ্জনে কাহার যত্ন নাই। কতকগুলি লোকে বুদ্ধিবৃত্তির মার্জ্জনাকারী কেবল কিছু লেখাপড়া শিখিয়া তৃপ্ত হইয়া আছেন। যাঁহারা সুশিক্ষিত হইয়াছেন তাঁহারা ঐ দলের অন্তর্নিবিষ্ট নন বটে, কিন্তু এ দলেরও অধিকাংশ ব্যসনের হস্ত হইতে মুক্ত নহেন। আমরা বাঙ্গলা দেশের এই যে শোচনীয় অবস্থার উল্লেখ করিলাম, কয়েকটী কারণে ইহা ঘটিয়াছে। প্রথম, অর্দ্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিতের ভাগ অধিক। উহারা ইউরোপীয়দিগের গুণ গ্রহণে সমর্থ হয় নাই, দোষগুলি জয় করিয়া লইয়াছে। দ্বিতীয়, পূর্ব্বে শাস্ত্রে দৃঢ়তর শ্রদ্ধা ছিল, শাস্ত্রকৃত নিয়ম লঙ্ঘন করিলে পাপ জন্মিবে এই আশঙ্কা ছিল, এখন আর নাই। এখন সুরাপানাদি করিলে ধর্ম্মে পতিত অশ্রদ্ধেয় ও অপাঙক্তেয় হইয়া থাকিতে হয় না। তৃতীয়, সামান্য চাকরীর বাহুল্য ও বাণিজ্য প্রভাবে অধিকাংশ লোকের সচ্ছল হইয়াছে। অর্থ সঙ্গতি না থাকিলে ব্যসন বাসনা চরিতার্থ করিবার যে ব্যাঘাত জন্মে এখন সে ব্যাঘাত নাই। চতুর্থ, বাঙ্গালিদিগের বাণিজ্যে প্রবৃত্তি নাই, সংগ্রামে গতি নাই, আয়াসকর কার্য্যে মতি নাই, ভোজ্য ও শয়ন অতি কোমল, সুতরাং বিলাসেই গাঢ়তর অনুরাগ জন্মিয়াছে। এটী বাস্তবিক শোচনীয় অবস্থা সন্দেহ নাই। বঙ্গদেশের এই স্ত্রৈণভাব দূরীভূত হইয়া যে কবে পুরুষ ভাব হইবে, আমরা ভাবিয়া আকুল হইতেছি। রাজপুরুষেরা বাঙ্গালিদিগের এই স্ত্রৈণভাব দেখিয়াই এত অশ্রদ্ধা করেন।

বঙ্গদেশীয় রমণীগণের স্বাধীনতাদান। ১২ শ্রাবণ ১২৭৯। ৩৮ সংখ্যা

আমাদিগের ইংরাজীতে শিক্ষিত যুবকেরা অভিমন্যুর ন্যায় ব্যূহভেদ করিতে শিখিয়াছেন, কিন্তু নির্গম শিখেন নাই। প্রাচীন আর্য্যেরা যে ধর্ম্ম ও আচার ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন, যুবকেরা একৈকক্রমে তাহা ভেদ করিতেছেন, কিন্তু পরে যে কি হইবে সে চিন্তা করিতেছেন না। আমরা স্ত্রীর স্বাধীনতা দান প্রস্তাবই উদাহরণ স্থলে গ্রহণ করিলাম। কতকগুলি যুবক মত্তপ্রায় হইয়া স্ত্রীর স্বাধীনতা বলিয়া চীৎকার আরম্ভ করিয়াছেন, ব্যূহভেদে উদ্যত হইয়াছেন। কিন্তু ব্যূহভেদ করিলে যে কি ঘটনা ঘটিবে, তাহা ভাবিতেছেন না। ভারতবর্ষীয় রমণীগণের স্বাধীনতা আছে কি না? শাস্ত্রকারেরা যে স্ত্রীর স্বাধীনতা দানের নিষেধ করিয়াছেন, তাহার অভিপ্রায় কি? পূর্ব্বে এদেশে কিরূপ ব্যবহার ছিল? সে ব্যবহার রহিত হইল কেন? বঙ্গদেশীয় রমণীগণের স্বাধীনতা দানার্থী যুবকেরা কতদূর স্বাধীনতা দিতে চান? তাঁহাদিগের অভিমত অনুযায়ী স্বাধীনতা প্রদত্ত হইলে যে অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, তাহার প্রতীকারের উপায় কি? এগুলি চিন্তা না করিয়া তাঁহারা এককালে মত্তপ্রায় হইয়া চীৎকার আরম্ভ করিয়াছেন।

উল্লিখিত যুবকেরা আমাদিগের স্ত্রীগণকে এরূপ পরাধীনা করিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পান যেন আমরা তাঁহাদিগকে দাসী করিয়া রাখিয়াছি। কিন্তু বাস্তবিক তাঁহাদিগের দাসীভাব নাই। সাংসারিক কার্য্যে তাঁহাদিগের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। তাঁহারা স্বচ্ছন্দে তীর্থাদি স্থলে যাইতেছেন। উৎসবাদি দর্শনও তাঁহাদিগের নিষিদ্ধ নয়। তবে এক্ষণে তাঁহারা সর্ব্বসমক্ষে বাহির হন না এই মাত্র। পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় রমণীগণ স্বামি সমভিব্যাহারে প্রকাশ্যরূপ উৎসবাদি স্থলে গমন করিতেন। ভারতাদিতে তাহার ভূরি উদাহরণ আছে। সুভদ্রার যে বিবাহ মহোৎসব হয়, নাগরিক লোকেরা সস্ত্রীক হইয়া তদ্দর্শনার্থ গমন করেন। কাব্য নাটকাদিতেও সস্ত্রীক উৎসব দর্শনাদির বর্ণনা দৃষ্ট হয়। এই সকল দ্বারা স্পষ্ট বোধ হইতেছে, পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় রমণীগণ প্রকাশ্যরূপে উৎসবাদি স্থলে গমন করিতেন। তবে এই বিশেষ ছিল তাঁহারা স্বামি সমভিব্যাহারে যাইতেন। পরে এই ব্যবহার রহিত হইয়া যায়। তাহার এই কারণ অনুমিত হয়, উত্তরকালে যে রাজত্ব হয়, তাহাতে রাজশাসন ভাল ছিল না। পুলিশও অতি জঘন্য ছিল। স্ত্রীলোকের উপরে উপদ্রব হইত। এরূপ গল্প শুনা আছে, দিনকাল এ প্রকার হইয়া উঠিয়াছিল যে, সুন্দরী স্ত্রীর পথ দিয়া শ্বশুরালয় হইতে পিত্রালয়ে ও পিত্রালয় হইতে শ্বশুরালয়ে গমন কঠিন হইয়াছিল। দুরাত্মারা বলপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে ধরিয়া লইয়া সতীত্ব নাশ করিত। এই উৎপাতের নিমিত্তই এদেশীয় রমণীগণের প্রকাশ্যস্থলে গমনের রীতি রহিত হয়। মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারেরা স্ত্রীর স্বাতন্ত্র্য নাই এই যে কথা কহিয়াছেন তাহার অভিপ্রায় এই, তাঁহাদিগকে স্বামী প্রভৃতির মতানুবর্ত্তী হইয়া সকল কাজ করিতে হইবে,

তাঁহারা স্বেচ্ছাচার করিতে পারিবেন না, উৎসবাদি স্থলে গমন করিবার ইচ্ছা হয় স্বামীর সমভিব্যাহারে যাইতে হইবে। স্বেচ্ছানুসারিণী হইতে পারিবেন না, ইহাই শাস্ত্রকারদিগের অভিমত। তাঁহাদিগের এরূপ অভিমত নয় যে স্ত্রীগণকে দাসী করিয়া রাখা হইবে। আমাদিগের যুবকেরা কি শাস্ত্রকারদিগের অভিমত স্ত্রীজাতির পরাধীনতা ভালবাসেন না? তাঁহাদিগকে কি স্বেচ্ছাচারিণী করিতে চান? স্বেচ্ছাচারিণী করিতে চান না, যদি একথা বলেন, তাহা হইলে ত শাস্ত্রকারদিগের মতের সহিত তাঁহাদিগের মতের সংবাদ হইল। তাঁহারা কি আপন সমভিব্যাহারে স্ত্রীগণকে প্রকাশ্য স্থলে লইয়া যাইবার অভিলাষী হইয়াছেন? ইহাতে যে একটী বিষম বিঘ্ন আছে, তাহা নিরাস করিবার কি করিয়াছেন? বর্ত্তমান রাজার পূর্ব্বে যিনি রাজা হন, তাঁহার অধিকার-কালে পুলিশ ভাল ছিল না, রাজশাসন ভাল ছিল না, স্ত্রীগণের উপরে উপদ্রব হইত, তাহাতেই এদেশীয় রমণীগণের প্রকাশ্যরূপে বাহির হইবার ব্যবহার রহিত হয়। এখন রাজশাসন ভাল হইয়াছে, স্ত্রীগণ প্রকাশ্যস্থলে গমন করিলে তাঁহাদিগের উপরে অত্যাচার হইবার আর আশঙ্কা নাই। কিন্তু এখন আর একটী উপদ্রব শঙ্কা আছে। পূর্ব্বে আর্য্যজাতীয় রমণীগণ পতিকে দেবতাজ্ঞান করিতেন। তাঁহারা কায়মনোবাক্যে পতিকে অতিক্রম করিতেন না। পতি কুরূপ হইলেও অধর্ম্ম ভয়ে তাহাতেই অনুরক্ত থাকিতেন। এখন যাঁহারা আর্য্যধর্ম্মে শ্লথাদর হইয়াছেন, তাঁহাদিগের আর পতিকে সে দেবজ্ঞান নাই। এখন ইহাঁদিগের উপযোগিতা ধরিয়াই ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণয়। পরিণেতা কুরূপ হইলে অপর সুন্দর পুরুষে অনুরাগ প্রদর্শন উপযোগিতামূলক, ধর্ম্মের বিরুদ্ধ কর্ম্ম নয়। প্রকাশ্যস্থলে গমনাগমন ব্যবহার হইলে সেই সুন্দর পুরুষ সুলভ হইয়া উঠিবে। বোধকর স্ত্রী পরিণেতার নিকটে রহিলেন, গোপনে মনোমত সুন্দর পুরুষের নিকটে গমনাগমন করিতে লাগিলেন। পরিণেতা তাহা জানিতে পারিলেন। এখন তিনি কি করেন? তিনি কি সেই স্ত্রীতেই অনুরক্ত হইয়া থাকিবেন? তাঁহার মনে কি ঈর্ষ্যার উদয় হইবে না? আমাদিগের ইংরাজিতে শিক্ষিত যুবক মনকে কি এমনি সাধিয়া তুলিয়াছেন যে তাঁহার স্ত্রীর ঐরূপ ভাব দেখিয়া তাঁহার মনে বিকার উপস্থিত হইবে না? যদি বল, স্ত্রীর মন শিক্ষানিবন্ধন এমনি দৃঢ় হইয়াছে যে তিনি কখন পরিণেতা ভিন্ন অন্যের প্রতি অনুরাগিণী হইবেন না, একথা অকিঞ্চিৎকর। মানুষের এরূপ স্বভাব নয়। মানবচিত্ত বিলক্ষণ দুর্ব্বল। যে জাতির নিকটে আমাদিগের যুবকদিগের শিক্ষা, তজ্জাতীয় স্ত্রীপুরুষদিগের কি এই প্রকার চিত্তদৌর্ব্বল্য লক্ষিত হয় না? আমাদিগের যুবকেরা কি তাহার লক্ষ লক্ষ উদাহরণ দর্শন করিতেছেন না? তাঁহাদিগের ধর্ম্মে ব্যভিচার দোষের আত্যন্তিক নিষেধ আছে। সে ধর্ম্মও আমাদিগের যুবকগণের অবলম্বিত ধর্ম্মের ন্যায় স্বকপোল কল্পিত নহে। ইংরাজ জাতির ধর্ম্মের মূল ঈশ্বর। যাঁহারা তদ্ধর্ম্মাবলম্বী, তাঁহাদিগের দৃঢ়তর ধর্ম্মভয় থাকা নৈসর্গিক। তথাপি তজ্জাতীয় স্ত্রীগণের অনেকে যখন প্রকাশ্য স্থলে

গমনাগমনাদির সুবিধা থাকাতে সহজে পুরুষান্তরে আসক্ত হইতেছেন, তখন যাঁহাদিগের ধর্ম্মের ভিত্তি বালুকাময় তাঁহাদিগের অধিকাংশ স্ত্রী যে পুরুষান্তর গমন লোভ পরিত্যাগ করিবেন, ইহা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। যদি এরূপ হইল, অগ্রে আশঙ্কিত দোষের প্রতীকারের একটি উপায় করিয়া স্ত্রীগণকে স্বেচ্ছাচারিতাদান কর্ত্তব্য। সে উপায় স্ত্রীও পতি পরিত্যাগের একটি বিধি।

বাঙ্গালিদিগের প্রতি ইউরোপীয়দিগের ঈর্ষ্যা। ১১ আশ্বিন ১২৭৯। ৪৭ সংখ্যা

বাঙ্গালিদিগের শারীরিক বল হ্রাস করিয়া বিধাতার যে কলঙ্ক হয়, ইহাঁদিগের মানসিক বল বৃদ্ধি করিয়া তিনি তাহার অপনয়ন করিয়াছেন। অনেক শূরবীর জাতি বুদ্ধিমত্তা অংশে ইহাদিগের নিকটে পরাস্ত হইয়া আছেন। ইহাঁদিগকে যে কোন বুদ্ধিসাধ্য কার্য্যে নিযুক্ত কর তাহাতেই ইহাঁরা কৃতকার্য্য হইবেন। এই গুণ দেখিয়া অনেক ইউরোপীয়ের ইহাদিগের প্রতি ঈর্ষ্যা জন্মিয়াছে। ইহাঁরা চির অপদস্থ হইয়া থাকেন, উন্নতিলাভ করিতে না পারেন, এই তাঁহাদিগের চেষ্টা। বাজে ইউরোপীয়েরা ইহাঁদিগের শুভদ্বেষ করুন আর ঈর্ষ্যা করুন, তাহাতে আমরা তত ক্ষুব্ধ হই না। কোন কোন রাজ-পুরুষও যে ইহাদিগকে চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা পাইতেছেন, তাহাই আমাদিগের আন্তান্তিক দুঃখের হইয়াছে। বাঙ্গালিরা বহুল পরিমাণে সিবিল সার্ব্বেণ্ট হইতে চলিলেন, ইহা উল্লিখিত ইউরোপীয়দিগের একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। ঈর্ষ্যা এমনি জঘন্য পদার্থ যে ইহা যাহার শরীরে প্রবেশ করে; তাহার মানমর্য্যাদার ভয় থাকে না। সেদিন ইংলিসমান প্রভৃতি কয়েকজন সমাচারপত্র-সম্পাদক অনায়াসে বলিলেন, সিবিল সার্ব্বেণ্ট পদ পরীক্ষালভ্য করিয়া দেওয়াতে অধিক সংখ্যা বাঙ্গালি সিবিল সার্ব্বেণ্ট হইতে চলিলেন, অতএব পরীক্ষার প্রথা রহিত করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় লোক বাছুনী করিয়া লইবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করা কর্ত্তব্য। কি দুঃখ, কি লজ্জার বিষয়। এ প্রস্তাব করিবার কালে উক্ত সম্পাদকদিগের জিহ্বা কি একবারও সঙ্কুচিত হইল না? কেহ কেহ এরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, যাহারা পরীক্ষার প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন, তাহারা ভাবিয়াছিলেন, বাঙ্গালিদিগের ধর্ম্ম ও জাতি ঘটিত অনেক বাধা আছে, তাহারা ইংলণ্ডে আসিয়া পরীক্ষা দিতে পারিবেন না, অতএব বাঙ্গালিদিগের পরীক্ষার নিষেধ করিয়া অনুদারতা প্রকাশের প্রয়োজন কি? এই ভাবিয়া সাধারণ পরীক্ষার বিধি করেন, কিন্তু ইহা এক্ষণে অনুতাপের কারণ হইয়াছে। এ অভিপ্রায় প্রকাশের এই ফল হইতেছে, যে সকল মহাত্মা পক্ষপাতশূন্য পরীক্ষার সৃষ্টি করিয়া নিজ চিত্তের ঔদার্য্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে অধঃপাতে দেওয়া হইল। কোন কোন সম্পাদক বাঙ্গালিদিগের সিবিল সার্ব্বেণ্ট পদ লাভের অযোগ্যতা সপ্রমাণ

করিবার অভিপ্রায়ে কয়েকটি যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু অনুধাবন করিয়া দেখিলে সেগুলি যুক্তি বলিয়া নয়, প্রলাপবাক্য বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। একটী প্রলাপবাক্য এই, বাঙ্গালি সিবিল সার্ব্বেণ্ট হইয়া উত্তরপশ্চিমাদি অঞ্চলে গমন করিলে অত্রত্য লোকেরা অসন্তুষ্ট হইবেন। বিজিত বলিয়া তাঁহাদিগের মনে যে দুঃখ আছে, তাহার অধিকতর বৃদ্ধি হইবে। সম্পাদকেরা অনুমান বলে লিখিয়াছেন, না, অসন্তোষক ফল প্রত্যক্ষ করিয়া এরূপ লিখিয়াছেন? কি আশ্চর্য্য। উত্তরপশ্চিম অঞ্চল প্রভৃতির লোকের সহিত বাঙ্গালিদিগের ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহারাদিগত সৌসাদৃশ্য আছে, একদেশীয় বলিয়া স্নেহানুবন্ধ হইবার সম্ভাবনা, এরূপ ব্যক্তি বিচারকর্ত্তা হইলে উত্তরপশ্চিমাঞ্চল প্রভৃতির লোকদিগের অসন্তোষ বৃদ্ধি হইবে, আব যাহাদিগের সহিত কোন বিষয়ে সৌসাদৃশ্য নাই, তাদৃশ ইউরোপীয় বিচারপতি হইলে উহারা সন্তুষ্ট হইবে? উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের লোকেরা কাহার প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ কবে? বাঙ্গালির প্রতি না, ইউবোপীয়ের প্রতি? বাঙ্গালিরা মাছ খায় বলিয়া উহাবা ঘৃণা করে, এ ঘৃণাব অল্পেই অপনয়ন সম্ভাবনা। কিন্তু বিদ্বেষের সেরূপ সহজে অপনয়ন সম্ভাবনা নয়।

বাঙ্গালি দ্বেষী সম্পাদকেবা এত উতলা হইয়াছেন কেন? তাঁহাদিগেব চিত্তকে ঈর্ষানলে দীর্ঘকাল দগ্ধ কবিবাব প্রয়োজন নাই। এখানে যেরূপ বন্দোবস্ত হইতেছে তাহাতে বাঙ্গালিদিগকে আর ইংলণ্ডের দিকে মুখ কবিতে হইবে না। মহোদয় কাম্বেল সাহেব এদেশীয়দিগেব নিমিত্ত যে সিবিল সার্ব্বেণ্ট পদেব সৃষ্টি কবিয়াছেন এদেশীয়দিগকে তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকিতে হইবে।

এক্ষণে বাঙ্গালিদিগকে কিছু উপদেশ দেওয়া আবশ্যক হইল। তাহাদিগের উপরে চতুর্দ্দিক হইতে বিলক্ষণ উপদ্রব আবম্ভ হইযাছে, তাঁহারা যদি এসময়ে নিশ্চেষ্ট ও নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকেন, তাঁহাদিগেব ভাবী সৌভাগ্যের পথ রুদ্ধ হইবে সন্দেহ নাই, যাহাতে সিবিল সার্ব্বিস পদ অধিক বিস্তাবিত হয, সেই চেষ্টা পাওয়া উচিত। তাঁহারা এই প্রার্থনা করুন, প্রদেশেও সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষার প্রথা প্রবর্ত্তিত হউক। ইংলণ্ডেশ্বরী ন্যায্য প্রার্থনা শ্রবণগোচর করিবেন সন্দেহ নাই।

এদেশীয়দিগকে কাজের লোক করিয়া তুলিবার চেষ্টা। ২৫ অগ্রহায়ণ ১২৭৯। ৪ সংখ্যা

সম্পাদকীয

বঙ্গদেশীয়েরা দুর্ব্বল, আমাদিগের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর কাম্বেল সাহেব সন্তরণ অশ্বে আরোহণ উল্লম্ফন প্রলম্ফন প্রভৃতি শিখাইয়া ইহাদিগকে বলবান করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। এদেশীয়েরা শিল্প বিষয়ে অপটু ও কৃষি বিদ্যায় অব্যুৎপন্ন। অতএব লেপ্টনণ্ট গবর্ণর ঐসকল বিষয়ে ইহাদিগকে সবিশেষ ব্যুৎপন্ন করিয়া তুলিবার বিশিষ্ট চেষ্টা করিতেছেন।

লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের এই সকল সাধুতর চেষ্টা দেখিয়া কোন্ ব্যক্তির হৃদয় আনন্দিত না হইবে? এ স্থলে আমাদিগের কয়েকটী কথা জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা জন্মিল। এখন বাঙ্গালিরা কিছু লেখাপড়া শিখিয়াছেন। অনেক ইংরাজের চোখ টাটিয়া উঠিয়াছে। ইহাদিগের আর অধিক লেখাপড়া না হয়, ইঁহারা ইউরোপীয়দিগের বিচারকার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ না হন, ইঁহারা ইংরাজদিগের সমকক্ষ হইতে না পারেন, অনেকের যেমন এই চেষ্টা জন্মিয়াছে, ঐরূপ লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের প্রবর্ত্তিত ব্যায়ামাদি প্রণালীর গুণে এদেশীয়েরা যদি ক্রমে বলিষ্ঠ ও সাহসী হইয়া উঠেন ইংরাজদিগের অনেকের চোখ টাটিয়া উঠিবে কি না? কাম্বেল সাহেবের পরাধিকারেরা তাঁহার প্রবর্ত্তিত ব্যায়ামাদি প্রণালী রহিত করিবেন কি না? দ্বিতীয়, এদেশীয়দিগকে বলিষ্ঠ করিবার অভিপ্রায়ে অশ্বারোহণ ও সন্তরণাদি শিখান হইতেছে, যুদ্ধ শিখান হইতেছে না কেন? যুদ্ধের তুল্য লোককে বলিষ্ঠ ও সাহসী করিবার উত্তম উপায় নাই।

তৃতীয়, কেবল সন্তরণ শিক্ষা ও অশ্বারোহণাদিতে লোককে কি বলিষ্ঠ করিতে পারে? পুষ্টিকর আহার সামগ্রী ব্যতিরেকে বলবান হইবার সম্ভাবনা নাই। এদেশীয়দিগের যে আহার প্রণালী আছে তাহাব পরিবর্ত্তন ব্যতিরেকে এ বিষয়ে বাঞ্ছানুরূপ ফললাভের সম্ভাবনা অল্প। লেপ্টনণ্ট গবণর আহার-প্রণালী পরিবর্ত্তনের কি কোন উপায় চিন্তা করিয়াছেন?

চতুর্থ, লেপ্টনণ্ট গবর্ণর এদেশীয়দিগকে শিল্প বিষয়ে ব্যুৎপন্ন করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। এ বিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য এই, আমরা অনেকবার কহিয়াছি এদেশীয়েরা যে বিষয়ে বিশিষ্ট লাভ দেখিতে না পান সে বিষয়ে মনোযোগ দেন না। শিল্প বিষয়ে ইহারা ব্যুৎপন্ন হইলে যে লাভবান হইতে পারিবেন লেপ্টনণ্ট গবর্ণর তাহার কি উপায় চিন্তা করিয়াছেন? ·

মুসলমানদিগের কৌশল। ৩ পৌষ ১২৭৯। ৫ সংখ্যা

সম্পাদকীয়

আচার্য্যদিগের এই শৈলী, তাঁহারা নিজ অভিপ্রায় পরোপদেশের ন্যায় করিয়া বর্ণনা করেন। আমরা বঙ্গদেশীয় মুসলমানদিগের ঐরূপ শৈলী দেখিতেছি, নিজ দোষকে গবর্ণমেণ্টের দোষ করিয়া বর্ণন করিতে৻৹। বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে তাঁহাদিগের নিজের অণুমাত্র অনুরাগ নাই। কিন্তু সংবাদপত্রে দেখা যাইতেছে, তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের প্রতি এই বলিয়া দোষারোপ করিতেছেন, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের শিক্ষার সদুপায় বিধান করিয়া দিতেছেন না। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের আরবী ও পারসী পাঠনার সুব্যবস্থা করেন নাই। এটী বড় কৌতুকাবহ দোষারোপ। আরবী পারসীর সহিত

এদেশীয় মুসলমানদিগের কি কুটুম্বিতা আছে, আমরা তাহা ত বুঝিতে পারিতেছি না। আরবী পারসীর সহিত হিন্দুদিগের যে কুটুম্বিতা, এদেশীয় মুসলমানদিগেরও সেই কুটুম্বিতা। এদেশীয় মুসলমানেরা আরবী পারসীর যে কি ধার ধারেন, তাহা সহজে বুঝিবার যো নাই। বাঙ্গলাদেশ তাঁহাদিগের জন্মভূমি, বাঙ্গলাভাষা তাঁহাদিগের মাতৃভাষা। তাঁহাদিগের বাঙ্গলা ও ইংরাজী শিক্ষাই আবশ্যক। আমরা পূর্ব্বে এক প্রস্তাবে লিখিয়াছিলাম, বঙ্গদেশে যে সকল মুসলমান আছেন, তাঁহাদিগের অধিকাংশ পূর্ব্বে হিন্দু ছিলেন, ক্রমে যবনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাঁহারা যবনের ঔরসে ও যবনীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগেরও বাঙ্গলা দেশে দীর্ঘকাল বাস নিবন্ধন প্রায় হিন্দুদিগের ন্যায় স্বভাব হইয়া গিয়াছে। অতএব বঙ্গবাসী হিন্দুদিগের ইংরাজী সংস্কৃত ও বাঙ্গলা শিক্ষা করিয়া যে মহোপকার লাভ হইয়াছে, উহাদিগেরও ঐ সকল বিষয়ে শিক্ষা করিলে সেই লাভ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। যে শিক্ষা প্রভাবে বঙ্গবাসী হিন্দুদিগের চিত্তের ঔদার্য্য ও কুসংস্কার পরিহার হইয়াছে উহাদিগেরও কি ঐ শিক্ষা প্রভাবে ঐ প্রকার গুণ লাভ সম্ভাবনা নয়? উহারা গবর্ণমেণ্টকে স্বতন্ত্র শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিবার যে পরামর্শ দিতেছেন, গবর্ণমেণ্ট যদি তাহা শ্রবণ ও তদনুসারে কার্য্য করেন, গবর্ণমেণ্টের কেবল যে নিজের পদে কুঠারের আঘাত করা হইবে, এরূপ নয়, মুসলমানদিগেরও যার-পর-নাই অনিষ্ট করা হইবে। আরবী ও পারসী পাঠনা বিধি প্রবর্ত্তিত করা আর কুসংস্কারের কুলায় নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়া তুল্য কথা। ঐ কুলায়ে এরূপ এক অদ্ভুত জন্তু জন্মগ্রহণ করিবে যে উহা শিক্ষাদাতা ও শিক্ষাকর্ত্তা উভয়েরই অনিষ্ট সাধনে উদ্যত হইবে।

বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে মুসলমানদিগের অনুরাগ জন্মিবার একটী প্রধান প্রতিবন্ধক আছে, এস্থলে তাহার উল্লেখ করা অসঙ্গত হইতেছে না। ইহারা অল্প বয়সে সুখাভিলাষী হইয়া পড়ে। সুতরাং অল্প বয়সেই ইহাদিগের অর্থাজ্জন লালসা বলবতী হইয়া উঠে। কেহ খানসামা হইতে গেল, কেহ বাবুর্চি হইল, কেহ তামাক ব্যবসায় আরম্ভ করিল, কেহ গাড়োয়ানী করিতে চলিল। যাহারা চাকরী করিতে না যায়, তাহারা কৃষি-কার্য্যে ব্যাসক্ত হয়। সুতরাং উহাদিগের অবসর হয় না। যদি মনু প্রভৃতি মাননীয় মহর্ষিগণ হিন্দুদিগের কার্য্য বিভাগের অনুসারে বর্ণ বিভাগ করিয়া না যাইতেন, বঙ্গবাসী হিন্দুদিগেরও বঙ্গবাসী মুসলমানদিগের ন্যায় শিক্ষা বিষয়ে অনুরাগ দৃষ্ট হইত সন্দেহ নাই। অত্রত্য হিন্দুগণ যে বিদ্যা বিষয়ে এত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন ইহা প্রাচীন মহর্ষিগণের অসামান্য বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতার ফল। জাতিভেদ এ অংশে মহোপকার সাধন করিতেছে। বঙ্গবাসী হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থরাই প্রধান। লেখাপড়াই ইহাদিগের ব্যবসায়। জাত্যভিমান থাকিতে ইঁহারা অন্য কর্ম্মকে নীচ কর্ম্ম জ্ঞান করিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হন না। এই কারণেই বঙ্গবাসী হিন্দুরা বিদ্যা বিষয়ে এত উন্নতি লাভ করিয়াছেন।

এখন পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন, বঙ্গবাসী মুসলমানদিগের যে বিদ্যা শিক্ষা হইতেছে না, গবর্ণমেণ্টের তাহাতে দোষ আছে কি না? গবর্ণমেণ্ট সকল প্রজার পক্ষেই শিক্ষাদ্বার সমভাবে খুলিয়া রাখিয়াছেন। কোন প্রজার পক্ষে ঐ দ্বার রুদ্ধ আর কোন প্রজার পক্ষে উহা উদ্ঘাটিত নয়। মুসলমানদিগের শিক্ষা বিষয়ে যে কিছুমাত্র অনুরাগ নাই, আমরা তাহার আর একটী অবিসম্বাদিত প্রমাণ দিতেছি। আমাদিগের হস্তে একটী বিদ্যালয় আছে। হিন্দুবালকদিগের ন্যায় মুসলমান বালকেরাও তাহাতে অধ্যয়ন করে, এ বিষয়ে আমাদিগের বিশেষ যত্ন আছে। কিন্তু প্রায়ই মুসলমান বালকেরা বিদ্যালয়ে আগমন করে না। যদি কদাচিৎ দুই এক জন আইসে তাহারাও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে মুসলমানেরা সংবাদপত্রে বিদ্যালয় সম্পাদকদিগের প্রতি এই বলিয়া যে দোষারোপ করিয়াছেন, তাঁহারা (সম্পাদকেরা) কৌশলক্রমে মুসলমান বালকদিগকে বিদ্যালয় হইতে দূরীভূত করেন, তাহা সম্পূর্ণ অলীক।

কোন্ ব্রাহ্ম সম্প্রদায় বাস্তবিক উন্নত? ১১ চৈত্র ১২৭৯। ১৯ সংখ্যা

"প্রকৃত অসম্প্রদায়িকতা কাহাকে বলে?" এবং "আদি ব্রাহ্মসমাজ" এই নামের শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু প্রণীত বাঙ্গলা ও ইংরাজি দুইখানি গ্রন্থ আমাদিগকে উল্লিখিত প্রশ্নের প্রণয়নে প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। উহার অন্যতর গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে "ঔদার্য্য ও অসম্প্রদায়িকতা বিষয়ে হিন্দু ধর্ম্মের সহিত ব্রাহ্ম ধর্ম্মের একপ ঐক্য আছে ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণ নাই। যেহেতু হিন্দু ধর্ম্ম হইতে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম সমুদ্ভূত হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের সমুন্নত আকার মাত্র। হিন্দুধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে উন্নত হইয়া পরিশেষে এখন এক আকার ধারণ করিয়াছে যাহা সম্পূর্ণরূপে অসম্প্রদায়িক ও বিশ্বজনীন। অতএব ব্রাহ্মধর্ম্ম উভয় হিন্দুধর্ম্মের সমুন্নত আকার এবং বিশ্বজনীন ধর্ম্ম।" অপর গ্রন্থে লিখিত দৃষ্ট হয়, "প্রাচীন ধর্ম্মের প্রতি ইহার (আদি ব্রাহ্ম সমাজের) বন্ধুভাব। কিন্তু যাহাতে ঐ ধর্ম্মের সংশোধন ও সংস্কার হয় সে চেষ্টা আছে, ইহাই ভারতবর্ষের ব্রাহ্মসমাজের সহিত আদি ব্রাহ্মসমাজের স্পষ্ট ভেদ করিয়া দিতেছে। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রাচীন ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ ভাব আছে। প্রাচীন ধর্ম্মকে উৎসন্ন না করিয়া তাহার পূর্ণতা সম্পাদন আদি সমাজের অভিপ্রেত" ইত্যাদি।

পাঠকগণ উপরের উদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলেন, এখন আপনারা বিবেচনা করিয়া বলুন কোন্ সম্প্রদায় বাস্তবিক উন্নত? যাহার শত্রু মিত্র সকলের প্রতি সমভাব, যিনি সকলকে সন্দেহ নয়নে দর্শন করেন, যিনি সুহৃদভাবে দোষাক্রান্ত ব্যক্তি বা বিষয়ের দোষ সংশোধন চেষ্টা পান এবং সকরুণ চিত্তে সকলের উন্নতি কামনা

করেন তিনিই যথার্থ উন্নত। আদি ব্রাহ্ম সমাজেরি সেই ভাব লক্ষিত হইতেছে। অপর সম্প্রদায়েব ইহার বিপরীত ভাব। রাজনারায়ণবাবু যথার্থ কথাই কহিয়াছেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম নূতন ধর্ম্ম নহে, হিন্দুধর্ম্মের সমুন্নত আকার মাত্র। যাঁহারা সেই হিন্দুধর্ম্ম শিক্ষা করিয়াছেন আজি যদি তাঁহারা সমুদয় হিন্দুকৃত বিষয়ে অবজ্ঞা করেন, হিন্দু বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করেন, তাঁহারা কেমন লোক? পাঠকগণ কি তাঁহাদিগের উন্নত চিত্ত বলিয়া প্রশংসা করিতে ইচ্ছা করেন? ইহাই কি উন্নতির লক্ষণ? উহাকে যদি উন্নতিভাব বলা সঙ্গত হয় তবে কাহাকে ক্ষুদ্রাশয়তা বলা যাইবে। ক্ষুদ্রাশয় ব্যক্তিদিগের হৃদয়েই ধর্ম্মের বিশ্বজনীন ও অসম্প্রদায়িক ভাব প্রবেশাধিকার পায় না। ধর্ম্মান্ধতাই ঐ ক্ষুদ্রাশয়তাব কারণ। ধর্ম্মান্ধতা ক্ষুদ্রাশয়তার অপর পর্য্যায় একথা বলিলে বোধ হয অত্যুক্তি হয় না

বাঙ্গালা সংবাদপত্রের উপর লোকের এত অশ্রদ্ধা কেন?

৫ই শ্রাবণ ১২৮১। ৩৫ সংখ্যা

সাধারণ এই শব্দ ও ব্যক্তি বিশেষ এই শব্দ এ দুটীর অন্তর্গত বহু অন্তর আছে। যদিও ব্যক্তির সমষ্টির নাম সাধাবণ তথাপি একের সম্বন্ধে যে কথা বলা সঙ্গত ও সত্য হয় অপরের পক্ষে তাহা সঙ্গত নহে। বুদ্ধিমান মাত্রেই এই প্রভেদ স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই অনেক সম্পাদক এ প্রভেদ বুঝিতে পাবেন না কিংম্বা বুঝিয়াও স্বীকার করা আবশ্যক মনে করেন না। সাধাবণভাবে কোন বিষয়েব প্রসঙ্গ হইলে তাঁগারা হয়ত ব্যক্তি বিশেষকে লইয়া টানাটানি আবম্ভ করেন, আবার হয়ত ব্যক্তি বিশেষের কোন কার্য্যের প্রসঙ্গ হইলে সাধারণকে সেখানে আনিযা ফেলেন। এ প্রকার দোষ বুদ্ধিমান লোক মাত্রেবই পক্ষে দূষণীয়, বিশেষতঃ সম্পাদকদিগেব এই প্রকার দোষ অতিশয় ঘৃণার্হ। বলিতে কি এই দোষেই অধিকাংশ বাঙ্গালা সংবাদপত্র ঘৃণিত হইয়াছে। প্রতিকূল শক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক বিপক্ষের যুক্তি খণ্ডন কবাই ভদ্রেব কার্য্য, ভদ্র কেন মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য, বিপক্ষের যুক্তির দিকে দৃষ্টিপাত না কবিয়া তাঁহার চরিত্রের গূঢ কথা বা ক্রটীর বিষয় প্রকাশ কবিয়া তাঁহাকে লোকেব নিকট অপদস্ত করিবাব চেষ্টা করা অভদ্র ও অমানুষের কার্য্য, কিন্তু যত সম্পাদক এই প্রকাব অমানুষ আচরণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা ক্রোধে অধীর হইয়া বিপক্ষের সদর মফস্বল বাছিতে পারেন। যে সকল কথার প্রকৃত প্রস্তাবের সহিত কোন সম্পর্ক নাই তাহা সাধারণেব গোচর করিবার জন্য অগ্রসর হন এবং হৃদয়স্থিত গরল বমন করিয়া আপন আপন পত্র ভদ্ররুচির অস্পৃশ্য করিয়া ফেলেন। আমরা সম্পাদক বিশেষকে লক্ষ্য কবিয়া বলিতেছি না। মনে কর 'অমৃতবাজার পত্রিকা' বলিলেন যে "উন্নতিশীল ব্রাহ্মগণ হিন্দুধর্ম্মের প্রতি লোকের বিদ্বেষ জন্মাইবার চেষ্টা

করিতেছেন।" এই কথার উত্তরে যদি উন্নতিশীল ব্রাহ্মদিগের মধ্যে প্রধান প্রধান ব্যক্তির কথা উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করা যায় যে হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু সমাজের প্রতি ব্রাহ্মদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে, তাহা হইলে প্রকৃত উত্তর হয়। কিন্তু 'সুলভ সমাচার' তাহা না লিখিয়া বলিয়া বসিলেন যে অমৃতবাজারের সম্পাদক গোপনে বরাহবংশ ও কুক্কুটবংশ নির্ব্বংশ করিয়া থাকেন এবং স্বীয় পিতৃকন্যার অহিন্দুমতে বিবাহ দিয়াছেন। মনে কর 'ইণ্ডিয়ান মিরর' লিখিলেন যে কাম্বেল সাহেব অকপটে এদেশীয়দিগের কল্যাণকর কার্য্যের উদাহরণ ধরিয়া দিলেই ইহার প্রকৃত উত্তর হয়, কিন্তু অমৃতবাজার লিখিলেন যে কাম্বেল সাহেব কেশববাবুর শিক্ষয়িত্রী-বিদ্যালয়ে ২০০০ টাকা দিয়াছেন সেইজন্যই মিরর এত ভক্ত হইয়াছেন।

মনে কর সোমপ্রকাশ বলিলেন যে মহান্তের মকদ্দমার বিচার না হইতে সে বিষয়ে সংবাদপত্র সম্পাদকদিগের কোন কথা বলা উচিত নয়, অমনি সাপ্তাহিক সমাচার সোমপ্রকাশ সম্পাদক ইহা করিয়াছেন তাহা করিয়াছেন বলিয়া কতকগুলি অসম্বদ্ধ প্রলাপ করিয়া বসিলেন। আমরা সকলেই অল্পাধিক এই দোষে দোষী। কাহার দোষ দিব। কিন্তু এদোষ দূর না হইলে যে আমাদের পত্রগুলি ভদ্র লোকদিগের পাঠের উপযুক্ত হইবে না তাহাতে আর সন্দেহ নাই। দেশের লোকে আমাদের অত্যন্ত অনাদর করেন বলিয়া দুঃখ করিয়া থাকি কিন্তু কি দেখিয়া আদর করিবেন? ইংলণ্ডের যত বুদ্ধিমান ও বিদ্বান লোক, তাঁহারাই সংবাদপত্রের সম্পাদক ও লেখক হইয়া থাকেন। মেইন সাহেব ষ্টিফেন সাহেব প্রভৃতি এক একজন সংবাদপত্রের লেখক রূপে পরিচিত। এরূপ স্থলে সংবাদপত্রের গৌরব হইবে না কেন? আমাদের দেশে যাহাদের অন্য কোন কর্ম্ম জুটে না, ভাল চাকরির উপযুক্ত বিদ্যা বুদ্ধি নাই, লোকের নিকট প্রতিপত্তি লাভের উপায়ান্তর নাই, তাহারাই প্রায় সংবাদপত্রের সম্পাদক হইয়া থাকেন। তবে আর কিরূপে বাঙ্গালা সংবাদপত্রের গৌরব বৃদ্ধি হইবে? দেশীয় সংবাদপত্র প্রশংসনীয় এবং ভদ্র রুচির গ্রাহ্য হইতে এখনও অনেক দিন লাগিবে।

দুর্গোৎসব। অগ্রহায়ণ ১২৮১। ১ সংখ্যা

পূজা উপলক্ষে সমুদায় বঙ্গদেশ দুই সপ্তাহ অবকাশ ও আমোদ ভোগ করিয়াছেন। পুনর্ব্বার পরিশ্রম করিবার সময় আসিয়াছে। কেবল দেওয়ানী আদালতের বিচারপতি ও কর্ম্মচারিগণের অদ্যাপিও কার্য্যে নিযুক্ত হইবার সময় আইসে নাই। পাঠকদিগের অনুগ্রহে আমরাও দুই সপ্তাহ বিশ্রাম লাভ করিয়াছি। পূজার পর আত্মীয়গণের সহিত প্রিয় সম্ভাষণ ও তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করা অসম্ভব, অতএব আমরা তাঁহাদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতেছি।

পূজায় অবকাশ ও তন্নিবন্ধন আমোদ প্রকৃত প্রস্তাবে প্রার্থনীয় কি না? ইহাতে মঙ্গল কি অমঙ্গল হইতেছে? কয়েক বৎসর হইল আমাদিগের দেশের কতকগুলি উষ্ণমস্তিষ্ক উৎকর্ষবাদি যুবক পূজায় আমোদের প্রতিবাদ করিয়া বলিতেন এই উপলক্ষ্যে বিস্তর অর্থের অপব্যয় এবং অনেক কুব্যবহার হইয়া থাকে। তাঁহারা ইউরোপীয়দিগকে জানাইতেন যে দুর্গা পূজা উপলক্ষে সমুদায় দেশ পাপসাগরে নিমগ্ন হন। কিন্তু ক্রমশঃ এই দলের অস্তিত্ব লোপ অথবা তাহাদিগের মনের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ভারতবর্ষের চারিদিকে রেলওয়ে হওয়াতে অনায়াসে একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা সম্বৎসর পরিশ্রম করেন তাঁহারা এই অবকাশ উপলক্ষে নানাস্থান দর্শন করিয়া ক্লান্তি দূর করিতে সমর্থ হন। ক্রমাগত লিখিয়া কেরানির হস্ত প্রায় স্পন্দহীন হইয়াছে। বণিক প্রত্যহ বাজারের দর জানিয়াছেন এবং ক্ষতি না হইয়া কিছু লাভ হয় এই কারণে এক মুহূর্ত্তকালও অলস থাকেন নাই। যাঁহাদিগের হস্তে বিচারের ভার এবং এই কার্য্য আমরাও যাহাদিগকে উকীলের স্বরূপ সাহায্য করিতে হয় তাহাদিগের কষ্ট তাঁহারাই জানেন। সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা কাহারও পশ্চাতে নহেন, এদেশে এই শ্রেণীর লোকের লাভ অল্পই হয়। কিন্তু যাঁহারা এই কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, যাঁহাদিগকে নিয়মিত সময়ের মধ্যে একটী নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিতে হয়, তাঁহারা পরিশ্রম কাহাকে বলে তাহা জানেন। তাঁহাদিগের পক্ষে কিঞ্চিৎ কালের অবসর অতিশয় সুখের হয়। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে পূজার অবকাশ নিতান্ত প্রার্থনীয়। পূজা, আত্মীয় ও বন্ধুগণের সহিত পুনর্মিলনের একমাত্র সময়। যাঁহারা কার্য্যোপলক্ষে দূরে বাস করিতে বাধিত হন তাঁহারা এই সময়ে আপন আপন গৃহে প্রত্যাগমন করেন। এই মিলনে কি সুখ নাই? প্রাচীন গ্রীকগণ ওলিম্পীয় ভোজ উপলক্ষে শত্রুতা বিস্মৃত হইতেন, বিজয়ার আলিঙ্গন উপলক্ষে অনেক বিবাদ ভঞ্জন হয় একথা কোন্ ব্যক্তি অস্বীকার করিবেন? ইহা কি লাভের নহে? পূজার সময়ে সকলেরই ব্যয় হয়। যাঁহারা দুর্গোৎসব করেন তাঁহাদিগকে অবশ্যই অধিকতর ব্যয় করিতে হয়। কিন্তু যে উৎসব উপলক্ষে আগন্তুক ব্যক্তিমাত্রেই ভোজন করিতে পান, যে সময়ে দুঃখি লোকেরা উত্তম খাদ্যের মুখাবলোকন করে, সে উৎসবকে কপটবেশি বকধার্ম্মিকেরা অন্যায় বলিতে পারে, কিন্তু যিনি উদার নেত্রে সমুদায় দর্শন করেন ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার আস্থা না থাকিলেও এই দানের অনুমোদন করিতে হয়। যে সময়ে দরিদ্রের পক্ষে লোকের অবারিত দ্বার সে সময় প্রার্থনীয় নহে, ইহা কাণ্ডজ্ঞানবিশিষ্ট লোকে বলিতে পারেন না।

উৎকর্ষকারীদিগের শেষ তর্ক এই, যে পূজার সময়ে নানাবিধ ধর্ম্মনীতিবিরুদ্ধ কার্য্য হইয়া থাকে। ইণ্ডিয়ান মিরার ও তদ্দলস্থ কোন কোন ব্রাহ্মের মত এই। সম্প্রতি উক্ত পত্র বলিয়াছেন "এই সময়ে যে কুসংস্কারজনিত উপধর্ম্ম দৃশ্যতা ও ধর্ম্মনীতিবিরুদ্ধ কার্য্য হয় তাহাতে মন আত্যন্তিক দুঃখ ভোগ করে, নব্য বাঙ্গালিগণ আমোদের বিষ ত্যাগ করিয়া কি তাহার মধুপানে সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না?"

দুর্গোৎসব সুরাপায়ী ও বেশ্যাসক্ত লোকদিগের দ্বারা হয় না। যাঁহারা এই উৎসবের প্রতি বিশ্বাস করেন তাঁহারা বাটীতে আনয়ন করিতে দেন না। তবে এই উপলক্ষে মাতালের দল আমোদ করিয়া লন। তাঁহারা সকল ছুটিই এই প্রকারে অতিবাহিত করেন। খৃষ্টের জন্মতিথি ও মহরম উপলক্ষেও ঐরূপ আমোদ হয়। ব্রাহ্মগণ যে দিবস নগরকীর্ত্তন করেন গবর্ণমেণ্ট যদি উক্ত দিবস যাবতীয় কার্য্যালয় বন্ধ করিতেন মাতাল মহাশয়গণ সে দিবসও যথারীতি আমোদ করিতেন, এটী উৎসবের দোষ? না ব্যক্তি বিশেষ অবকাশ পাইলেই এই প্রকারে সময় অতিবাহিত করে। দুর্গোৎসব ধর্ম্মনীতিবিরুদ্ধ কোন কার্য্যের উৎসাহদান করে এটী আমরা এই প্রথম শ্রবণ করিলাম। মিরার অবশ্যই ইউরোপীয়দিগের নিমিত্ত এই বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু অল্প ইউরোপীয় ইহাতে বিমোহিত হইবেন। বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার একজন বড়দরের ব্রাহ্ম। তিনি কেশববাবুর উত্তরাধিকারী, এই ব্যক্তি সম্প্রতি নব্য বাঙ্গালিদিগকে এই বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন যে তাঁহারা এক হস্তে গোমাংস ও অপর হস্তে বিয়ারের বোতল লইয়া রাস্তায় রাস্তায় ভ্রমণ করেন। কিন্তু একজন সিবিলিয়ান তৎক্ষণাৎ বলিয়াছেন যে এই দোষারোপ সম্পূর্ণ অলীক। ব্রাহ্ম প্রধানেরা স্বদেশীয়দিগের এই প্রকার বর্ণনা করেন। তাঁহারা এই উপায় অবলম্বন করিয়া দেশের মঙ্গল সাধন করিতে মনস্থ করিয়াছেন। যাঁহারা স্বদেশীয়দিগকে এই অনুগ্রহ করেন, দেশবাসিগণ তাঁহাদিগকে কোন নেত্রে দর্শন করিবেন, তাহা কি আমাদিগের বলিয়া দিতে হইবে? মিরার ও উন্নতিশীল ব্রাহ্মদলের অস্তিত্বলোপ এবং ব্রাহ্ম মন্দির ভূমিসাৎ হইলেও দুর্গোৎসব থাকিবে। আমাদিগের জাতীয় আমোদ শীঘ্র যাইতেছে না, যাওয়াও প্রার্থনীয় নহে। তবে পেচকেরা চীৎকার করিবে, বাটীর গৃহিণীরা এই অলক্ষণ সূচক পক্ষীর মুখবন্ধ করিবার উপায় জানেন।

স. চ

সন্তান বিক্রয়। ১৮ পৌষ ১২৮১। ৭ সংখ্যা

কলিকাতা মেডিকেল কালেজের চিকিৎসালয়ের সূতিকাগৃহে যে সকল স্ত্রীলোক প্রসব করিতে আইসে, তাহাদিগের অনেকে আঁতুড়গৃহ হইতে চলিয়া যাইবার সময় সন্তান বিক্রয় করিয়া যায়। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি, এই সকল সন্তানের এক একটী চারিপাঁচ টাকা দিলে অনায়াসে ক্রয় করিতে পারা যায়। অনেক লোকে এখান হইতে সন্তান ক্রয় করিয়া থাকে, কিন্তু এই সকল সন্তানের অতি অল্প সংখ্যাই ভদ্রগৃহে স্থান প্রাপ্ত হয়, অধিকাংশ বালিকা বেশ্যাদিগের গৃহে নীত ও প্রতিপালিত হইয়া তাহাদিগের ভাবী সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে, বালকেরাও সচরাচর অসৎসংসর্গে

থাকিয়া দস্যু তস্করের শ্রেণীর পুষ্টি বিধান করিতেছে। প্রসূতিগণ কি কারণে মাতৃস্নেহ অতিক্রম করিয়া সন্তানদিগকে বিক্রয় করে, তাহার অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে এই সকল সন্তানদেব অধিকাংশই অপগর্ভজাত, তাহাদিগকে গৃহে লইয়া গেলে কিম্বা আপনার নিকট রাখিলে প্রসূতিদিগের কলঙ্ক হইয়া থাকে। এই কলঙ্ক দূর করিবার নিমিত্তই তাহারা সন্তানদিগকে বিক্রয় করিয়া যায় এবং সকল সন্তান জীবিত থাকিয়া বেশ্যা ও দস্যু তস্কবের সংখ্যা বৃদ্ধি করে, ইহা কখনই আকাঙ্ক্ষনীয় নহে। কিন্তু কি উপায়ে ইহা নিবারণ করা যাইতে পারে তাহাও বিশেষ বিবেচনার বিষয়। প্রসূতিগণ যাহাতে সন্তান বিক্রয় করিতে না পারে, পুলিষ কর্ম্মচারিদিগকে সেই বিষয়ে সতর্ক হইবার অনুমতি দিলে বরং অধিকতর অমঙ্গলই ঘটিবে। সন্তান বিক্রয় করার অপরাধে ধৃত হইয়া দণ্ড পাইবার আশঙ্কায় প্রসূতিগণের সন্তান বিক্রয় না করিবারই সম্ভাবনা, কিন্তু তখন তাহারা আত্মকলঙ্ক গোপনোদ্দেশে সন্তানদিগকে বিক্রয় না করিয়া গোপনে হত্যা করিতে প্রবৃত্ত হইবে, অথবা বিক্রয় না করিয়া সন্তান দান করিয়া যাইবে। সুতরাং বিনা পয়সায় সন্তান পাইবে, এই উত্তেজনায় অনবধান প্রকৃতির লোকেরাও এই অসহায় শিশুদিগকে গ্রহণ করিবেন। এইরূপে এই শিশুদিগের অধিক পরিমাণে অকালমৃত্যু হইবার সম্ভাবনা। আর যে সকল লোক মূল্য দিয়া এই সকল সন্তান গ্রহণ করিত, তাহাদিগের পথও সমভাবেই মুক্ত থাকিবে।

গবর্ণমেণ্ট ও আমাদিগের দেশের সহৃদয় লোকেবা যদি প্রকৃতপক্ষে এই দুর্গত শিশুদিগের উপকার করিতে চান, তবে ইউরোপেব ফাউণ্ডিলিং হস্পিটালের অনুকরণে এখানে পরিত্যক্ত শিশুদিগের একটি আশ্রয় করা আবশ্যক। উপযুক্ত সংখ্যক ধাত্রী রাখিয়া পরিত্যক্ত শিশুদিগকে প্রতিপালন ও পবে তাহাদিগের শিক্ষা বিধান করিলে তাহারা আর সমাজের কলঙ্ক বৃদ্ধি করিবে না, বরং চেষ্টা থাকিলে তাহাদিগের অনেকে কালক্রমে সমাজের গণ্য লোক হইতে পারিবে। কেহ কেহ এই প্রস্তাব পাঠ করিয়া আশঙ্কা কবিতে পারেন, আমাদিগের প্রদর্শিত উপায় অবলম্বিত হইলে কুকাজের অধিকতর প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। কিন্তু এইরূপ আশঙ্কা আমাদিগের নিকট সঙ্গত বোধ হইতেছে না। সামাজিক নিয়মের সংশোধন না করিলে পাপ কার্য্যকে কোন কৌশলে চাপা দিয়া রাখিবার উপায় নাই। তাহার এক পথ বন্ধ কর, আর এক পথ নূতন আবিষ্কৃত হইবে। আমরা যতদিন কোন পাপ কার্য্যের মূল উচ্ছেদ করিতে না পারিব, ততদিন সেই পাপানুষ্ঠানকারীদিগের প্রতি অনুগ্রহ ব্যবহাব করা আবশ্যক। তাহারা যে পাপ করে কেবল তাহাদিগের নিজ দোষে নহে, আমরাও সেই দোষের অংশভাগী। অনেক সামাজিক নিয়মের অনুচিত কাঠিন্য মনুষ্যকে পাপ পথে লইয়া যায়। অনেকে আমাদিগের নীতিশাস্ত্রের প্রশংসা না করিতে পারেন, তথাপি কর্ত্তব্যানুরোধে আমাদিগকে এই অপ্রিয় সত্য বলিতে হইল! আমরা

আশা করি গবর্ণমেণ্ট ও দেশহিতৈষিগণ উপস্থিত প্রস্তাবের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিবেন না।

বাঙ্গালিদিগের নূতন করিবার ক্ষমতা। ২১ পৌষ ১২৮১। ৮ সংখ্যা

বাঙ্গালিদিগের পুরাণ লইয়াই নাড়াচাড়া, নূতন কবিবার ক্ষমতা নাই, এই বিষম অপবাদ হইয়াছে। বিধাতা বাম হইয়া ইহাদিগকে নূতন করিবার ক্ষমতায় এককালে বঞ্চিত করিয়াছেন অথবা ইহাদিগেব নূতন কবিবার বাস্তবিক ক্ষমতা আছে, কোন নিগূঢ় কারণ প্রভাবে তাহা প্রকাশ পাইতেছে না? বাঙ্গালিরা বুদ্ধিমান। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা নূতন করিবার ক্ষমতা হইতে স্বভাবতঃ বঞ্চিত, ইহা সম্ভাবিত নহে। যাবৎ কষ্ট বোধ, প্রয়োজন জ্ঞান ও স্বার্থলাভেব আশা হৃদয়ে তীব্রতর হইয়া না উঠে, তাবৎ মানুষ অলস অধ্যবসায়হীন ও অপদার্থ বলিয়া প্রতীযমান হয়। বাঙ্গালিরা এতদিন স্বল্পে সন্তুষ্ট ছিলেন। সামান্য পরিশ্রমে তাঁহাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। সুতরাং তাঁহাদিগের পবিশ্রম ও অধ্যবসায়াদি গুণ প্রকাশের প্রযোজন হয় নাই। এখন দিন দিন তাঁহাদিগেব নানা বিষযে কষ্ট বোধ প্রয়োজনজ্ঞান ও স্বার্থলাভের আশা প্রবল হইয়া উঠিতেছে, দিন দিন তাঁহাদিগের উৎসাহ অধ্যবসায় ও নূতন করিবার ক্ষমতার পবিচয় হইতেছে। যাহাতে মনুষ্যকে উচ্চ পদবীতে অধিরোহিত করে, বাঙ্গালিব সে সমুদায় গুণ আছে, কাবণ বিবহে তাহা এতদিন মলিন ও প্রচ্ছন্ন হইয়াছিল। বস্তুতঃ তাঁহাদিগকে যে কার্য্যে দিবে তাহাতেই কৃতকার্য্য হইয়া উঠিবেন। এদেশে অধিক লোকে ইংরাজী শিখিতে আবম্ভ করিল, ক্রমে ইংরাজদিগের কর্ম্মার্থির সংখ্যা অধিক হইয়া পড়িল। সেই সংখ্যা হ্রাস কবিবাব অভিপ্রায়ে ক্রমে পরীক্ষা প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইল। এণ্ট্রান্স, এ. এ., বি. এ., এম. এ. প্রভৃতি পরীক্ষায় নিয়ম হইল, বাঙ্গালিরা তাহাতে পরাঙ্মুখ না হইয়া সেই সকল পবীক্ষায উত্তীর্ণ হইতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া ক্রমে সেই সকল পবীক্ষা অধিক কঠিন করা হইতে লাগিল, বাঙ্গালিরা তাহাতেও কৃতার্থতা লাভ কবিতে লাগিলেন। সিবিল সর্ব্বিস পদের পরীক্ষার সৃষ্টি করা হইল, বাঙ্গালিরা তাহাতেও প্রবৃত্ত ও কৃতকার্য্য হইলেন। ক্রমে সেই সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষায় এরূপ কতকগুলি প্রতিবন্ধক উপস্থিত করা হইল যে বাঙ্গালিরা সহজে তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারেন। কিন্তু বাঙ্গালিরা তাহাতেও ভগ্নোৎসাহ হইলেন না। সেই সকল প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে লাগিলেন। কেবল সিবিল সর্ব্বাণ্ট ও বারিষ্টার বলিয়া নয়, বাঙ্গালিরা বাঙ্গলাব হইয়া সমগ্র ইংরাজের মধ্য হইতে পুরস্কার লাভ করিতে আরম্ভ কবিলেন।

আমরা যে কারণে এত কথা কহিলাম তাহা এই, 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' লিখিয়াছেন

"কুমারখালিতে বস্ত্র বয়নকারী জোলা নামে এক জাতি আছে। তাহারা সম্প্রতি বিলাতি ব্যাপারের অনুকরণ করিয়া কার্পাসসূচ দ্বারা এক প্রকার র‍্যাপার প্রস্তুত করিতেছে। ইহা দেখিতে ঠিক বিলাতি র‍্যাপারের ন্যায়, কোন অংশে বিভিন্ন নহে, ইহা দরিদ্রদিগের বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। উক্ত জোলারা নিজবুদ্ধি কৌশলে এক প্রকার নূতন তাঁত প্রস্তুত করিয়া বস্ত্র বয়ন করিতেছে। ইহাতে উহাদের পরিশ্রমেরও লাঘব হইতেছে। ঐ সকল বস্ত্র এত সস্তা দরে বিক্রয় করিতেছে যে, সকলেই উহা ক্রয় করিতে পারে। এই জন্য আজিকালি কুমারখালিতে এবং তাহার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী হাটে কেবল র‍্যাপারই বিক্রীত হইতেছে। বহু দূরদেশ হইতে ব্যাপারীরা আসিয়া উহা লইয়া যাইতেছে। বিশেষতঃ পুর্ব্বাঞ্চলে উহা অধিক পরিমাণে রপ্তানী হইতেছে। এমন কি প্রতি হাটে ৩।৪ হাজার টাকার র‍্যাপার বিক্রীত হয়, ইহাতে জোলারা বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন হইতেছে। এক্ষণে পাঠকগণ দেখুন গবর্ণমেণ্ট যদি এদেশে শিল্পবিদ্যা ও বাণিজ্যের উৎসাহ দেন, এদেশের কতদূর শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে।"

স্ত্রীলোকদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করা উচিত কিনা? ৩ বৈশাখ ১২৮৫

এখনকার সুশিক্ষিত নব্য সম্প্রদায় স্ত্রীলোকদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করিবার জন্য মহাব্যস্ত। তাঁহারা অবলা কুলকামিনীদিগকে বিবি সাজাইয়া রাজসভায়, দেবসভায় ও গন্ধর্ব্বসভায় লইয়া যাইতে অভিলাষী। হা অদৃষ্ট! হা হতভাগিনী বঙ্গমহিলাগণ! বোধ হয় এত দিন তোমাদিগের কুল মান লজ্জা সকলই নষ্ট হইল। হায়! জন্মদাতা পিতা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি চাহিতে যাহার নয়ন যুগল নিমীলিত হইয়া আইসে, বদনমণ্ডল ব্রীড়াবনত হয়, তাহাকে সভা মধ্যে পরপুরুষ সম্মুখে প্রকাশিত হইয়া হাস্যালাপ করিতে হইবে! যাহা হউক, যাহারা রমণীদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করিতে ব্যস্ত, একথা কি তাঁহারা একবার বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন? স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়া কুলকামিনীগণ আপনাদিগের কুল মান রক্ষা করিতে কি সমর্থা? এ কথায় অনেকে মনে করিতে পারেন আমরা স্ত্রী স্বাধীনতার বিরোধী। কিন্তু তাহা নহে। যাহাতে কুলকামিনী-দিগকে আর এরূপে নিবিড় অন্ধকূপে নিমগ্ন থাকিতে না হয়, যাহাতে তাহাদিগের নয়নযুগল উন্মীলিত হয়, যাহাতে জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোকে তাঁহাদিগের হৃদয়কমল প্রফুল্ল হয়, যাহাতে তাঁহাদিগের মনোবৃত্তিসকল পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয়, আর তাহারা যাহাতে স্বচ্ছন্দ-বিহারিণী হইয়া হাস্যালাপ করিতে পারে, ইহাই আমাদিগের একান্ত বাসনা। কিন্তু তাই বলিয়া অদ্যই আমরা আমাদিগের লজ্জাশীলা কুলবধূদিগের লজ্জার মূলে কুঠারাঘাত করিতে প্রস্তুত নহি। অদ্যই তাহাদিগকে পরপুরুষের সহিত গাড়ি ঘোড়া চড়িয়া হাস্যালাপ করিতে দিতে স্বীকৃত নহি। সে সময় আজিও উপস্থিত হয় নাই। যখন

হিন্দুদিগের মধ্যে একজনও স্বপ্নে ভাবেন নাই বিধবার বিবাহ হইতে পারে, যখন সমস্ত লোক এ বিষয়ে অপ্রস্তুত ছিল, সেই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাবিবাহ বিষয়ক পুস্তক প্রচার করেন আব তজ্জন্যই তাহা বিশেষ ফলোপধায়ক হয় নাই। বিধবাবিবাহ বিষয়ক পুস্তক প্রচারের তখনও যেমন উপযুক্ত সময় উপস্থিত হয় নাই, স্ত্রীজাতিকে স্বাধীনতা প্রদান করিবার এখনও তেমনি উপযুক্ত সময় হয় নাই। এখন তাহাদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করিলে অবশ্যই তাহাতে বিষময় ফল ফলিবে। অতএব এ বিষয়ে প্রয়াস পাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

কিন্তু যখন সুশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ এরূপ মহাব্যস্ত তখন আমরা মূর্খ। আমাদের এ বিষয়ে লেখনী চালনা করা চাপল্য বই আর কি হইতে পাবে? উপহাসাস্পদ হইব বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকাও কর্ত্তব্য বোধ হয় না, যেহেতু ইহাতে দেশের অমঙ্গল ঘটিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। দিব্য চক্ষে দেখিতেছি যদ্যপি আমরা এক্ষণে স্ত্রীলোকদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করি, তাহা হইলে পরে আমাদিগকে অনুতাপ কবিতে হইবে। অতএঃ যাহাতে তাঁহাদিগের এই কুসংস্কার শীঘ্র দূর হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান হওয়া বিধেয়। কারণ মুনিদিগের মতিভ্রম ঘটিয়া থাকে। বঙ্গমহিলাগণ যতই কেন বিদ্যার সংস্কার করুন না, তাঁহাদের মধ্যে কেহই প্রকৃত শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েন নাই। মধ্যে মধ্যে যে দুই একখানি পুস্তক স্ত্রীলোকেব রচিত বলিয়া প্রচাবিত হয়—তাহা কেবল সেই সেই গ্রন্থকর্ত্তাদিগেব চাতুরী। অবলা স্ত্রীলোকেব উপর ভব করিয়া ভবনদী পাব হইবাব প্রত্যাশায় তাহারা ঐরূপ ছলনাবৃত্তি অবলম্বন কবিযা থাকেন। ইহাব দৃষ্টান্তস্থল আমাদের "ভুবনমোহিনী প্রতিভা।" আদৌ ভুবনমোহিনী নাম্নী কোন কামিনী নাই। এটী নবীনবাবুব লীলা। নবীন-বাবুর দুই স্ত্রী। প্রথমা সামান্যরূপ পড়িতে পাবেন, দ্বিতীয়া পড়িতে আরম্ভ কবিয়াছেন। আর একথারই বা প্রয়োজন কি? যাঁহার কিঞ্চিৎ মাত্র বুদ্ধি আছে, সেই বুঝিতে পারিবে "ভুবনমোহিনী প্রতি– " স্ত্রীলোকেব লেখা নহে।

পণ্ডিত জনসন বলিয়াছেন, অনুকরণ করিয়া কেহ কখন বড় হয় নাই। যদিও আমরা এ কথা সম্পূর্ণ মানি না তথাপি স্বীকাব করি অনুকরণ দ্বাবা প্রকৃত জ্ঞান বা উন্নতি লাভ হয় না। মনুষ্যস্বভাব এই দোষাংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন, আমরা এক প্রকার নকলনবীস হইয়া পড়িয়াছি। কাহার কোন্ গুণটী অনুকবণ করা উচিত, সেটা বড় একটা বিবেচনা করিয়া দেখি না। সাহেবদের আমরা যাহা দেখিতেছি, তাহা প্রায় তাহাই অনুকরণ কারিতেছি, কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয় তাঁহাদেব যে সকল গুণ আছে তাহার একটীরও অনুকরণ করিতে যত্নশীল নহি। হ্যাট পবিলাম, কোট পরিলাম, পেণ্টুলেন পরিলাম, হিন্দুধর্ম্ম নিষিদ্ধ খাদ্য ভক্ষণ কবিলাম, মাতৃভাষা পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজীতে কথাবার্ত্তা কহিলাম—কিন্তু যে বাঙ্গালী কাজে ও ভিতরে সেই বাঙ্গালীই রহিলাম। কই আমাদের সাহস উৎসাহ? কই আমাদের সহানুভূতি, একতা? কই

আমাদিগের অধ্যবসায়, স্বজাতিপ্রিয়তা? পাঠকগণ প্রত্যক্ষ দেখুন, আমরা ইংরাজের সমস্ত দোষগুলি গ্রহণ করিয়াছি কিন্তু তাঁহাদিগেব একটী গুণের অধিকাবী হইতে পারি নাই।। পাঠক। একবার মিস ডনেলিকে স্মরণ করুন, একটী সামান্য কুলোদ্ভবা কামিনীকে লইয়া ভাবতবর্ষীয় কি ছোট কি বড সমস্ত ইংরাজ কিরূপ হুলস্থূল কাণ্ড করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু হায়। কত শত দেশীয় নিরপরাধে প্রত্যহ শমন সদনে আতিথ্য গ্রহণ করিতেছে, কত উৎকট যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, কত শত গুইকুমার রাজ্যচ্যুত হইতেছেন, কাহারও মুখে একটী কথা নাই। তবে আমরা ইংরাজের কোন্ গুণটী পাইয়াছি? কিন্তু যখন আমাদিগের সমস্তই বিজাতীয়, তখন যে আমরা বিজাতীয় রীতিনীতি অবলম্বন কবিয়া চলিব, তাহা বিচিত্র কি? আমাদের ভাষা সংস্কৃত হিন্দী ও উডিয়া মিশ্রিত, আমাদের পোষাক অর্দ্ধেক মুসলমান।

ইংরাজ মহিলাগণ স্বচ্ছন্দবিহারিণী। তাহারা অনাযাসে স্বামীর বিনা অনুমতিতে যথা ইচ্ছা গমনাগমন কবিতে পারেন। কিন্তু একথা বিবেচনা করা উচিত ঐ প্রথা এদেশে প্রচলিত হইলে আমাদের মঙ্গল কি অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা? আরো বিবেচনা করা উচিত, ইংলণ্ডে কি অপর কোন দেশে যে আইনটী কিম্বা যে প্রথাটী মঙ্গলকর ও প্রয়োজনীয়, সেই আইনটী বা সেই প্রথাটী এখানেও মঙ্গলকর হইতে পারে কি না? সকলকেই স্বীকাব করিতে হইবে তাহা সম্ভবপব নয়। যেমন শীতপ্রধান দেশেব (Frizid Zone) মোহিনীকে সর্ব্বদা মোটা ও উষ্ণ বস্ত্রাদি পরিধান করিযা থাকিতে হয়, কিন্তু গ্রীষ্ম প্রধান দেশের (Torrid Zone) কামিনীর পক্ষে সামান্য সূক্ষ্ম বস্ত্রই যথেষ্ট। তবে তিনি মোটা ও উষ্ণ বস্ত্রাদি ব্যবহাব কবেন না বলিয়া কি তিনি নিন্দার পাত্রী? কখনই নহে, যেহেতু তাঁহার ঐসকল সামগ্রীব প্রয়োজন নাই। কিন্তু সম্প্রতি আমাদের কুলকামিনীদিগেব যে দারুণ দুরবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, ইহাব কোনরূপ প্রতিবিধান করা উচিত।

শ্রী হঃ

আমাদের কেশববাবু। ১০ বৈশাখ ১২৮৫

চিঠি

আমাদের কেশববাবু কুচবেহারেব সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিয়া কএকটী অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন, ধর্ম্মপথ হইতে কতকদূরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছেন। তিনি বালবিবাহে ও পৌত্তলিকতাতে যোগ দিয়া নিজের দুর্ব্বলতা প্রদর্শন করিয়াছেন—কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সম্প্রতি বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও বাবু গৌরগোবিন্দ রায় অন্ধভাবে কেশব-বাবুর উক্ত ন্যায়বিরুদ্ধ কার্য্যের সমর্থন করিয়া জগৎকে কেশববাবু নির্দ্দোষী বলিয়া

জানাইয়া ইণ্ডিয়ান মিরারে ও ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকাতে একখানি দীর্ঘ পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে, তাঁহাদের এরূপ বিশ্বাস যে, তাঁহারা যাহা লিখিয়াছেন সাধারণ লোকে তাহা ঈশ্বরবাক্য বলিয়া গ্রহণ করিবেন। ইহার প্রমাণ এই যে, মিরারের অন্য একস্থলে এইভাবে লেখা হইয়াছে যে, বিবাহ সম্বন্ধে প্রকৃত ঘটনা যাহা তাহা প্রকাশ করা হইল, মফস্বল হইতে যে সকল ব্রাহ্ম কেশববাবুর কার্য্যের বিরুদ্ধে মত দিয়াছিলেন, তাঁহারা নিজের ত্রুটি স্বীকার না করিলে প্রচারকেরা তাঁহাদের নিকট আর যাইবেন না! কিন্তু মিরারের এরূপ লেখার পূর্ব্বে মফস্বলের ব্রাহ্মরা প্রচারকদিগের জন্য আকাঙ্ক্ষী কি না তাহা একবার বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত ছিল। আমরা যতদূর জানি তাহাতে সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, এক্ষণে নূতন প্রচারকদিগের প্রয়োজন। পুরাতন প্রচারকদিগের কার্য্য এক প্রকার শেষ হইয়াছে, এক্ষণে তাঁহাদের দ্বারা আর কাহারও কিছু মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহাদের দ্বারা সাধারণের মঙ্গল হওয়া যে সময়ে সম্ভব ছিল, এক্ষণে সে সময় গত হইয়াছে, এক্ষণে সাধারণতঃ সকলের উন্নতাবস্থা। উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে অধিকতর জ্ঞান উপার্জ্জন করা জীবন ও উপদেশের উৎকর্ষ সাধন করা বর্ত্তমান প্রচারকদিগের একান্ত আবশ্যক ছিল, কিন্তু তাঁহারা তাহার কিছুই করেন নাই। করিবার মধ্যে তাঁহারা "দয়াময়ের" পরিবর্ত্তে "হরি" নাম গ্রহণ এবং বাইবেল, কোরাণ, জেন্দেভাস্তা, ঈশা, মহম্মদ প্রভৃতির পরিবর্ত্তে বেদ, পুরান, ভাগবত, ভগবৎগীতা এবং দেবর্ষি মহর্ষিদিগের দোহাই দিতে আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু ইহার দ্বারা কি বর্ত্তমান অভাব পূরণ হইবার সম্ভাবনা আছে? কখনই না। অতএব মিরারের জানা কর্ত্তব্য যে, তাঁহার ধমকে গলিয়া অথবা ভুলিয়া যায় এক্ষণে এরূপ লোক অতি বিরল হইয়াছে। কেশববাবুর কন্যার বিবাহে যোগ দিয়া প্রচারকেরা নিজেই অপরাধী হইয়াছেন। অতএব তাঁহারা ত্রুটি স্বীকার না করিয়া যাঁহারা কর্ত্তব্যের অনুরোধে ন্যায়ের অনুরোধে তাঁহাদের কাযের প্রতিবাদ করিয়াছেন, মিরারের মতে তাঁহারাই অনুতাপ করিবেন। চমৎকার সিদ্ধান্ত!! স্বার্থ! তুমিই ধন্য, তোমার জন্য মানুষ পারে না এমন কার্য্যই নাই।

যাহা হউক প্রতাপবাবুদের পত্রখানি দ্বারা কেশববাবুর নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ হইয়াছে অথবা তিনি যে বাস্তবিকই অপরাধী তাহারই পোষকতা করা হইয়াছে একবার তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত হইতেছে। প্রতাপবাবুরা একস্থানে লিখিয়াছেন যে "আচার্য্য মহাশয় বিবেকের আদেশে এই কার্য্যে (বিবাহে) প্রবৃত্ত হইয়াছেন।··· একদিনের জন্যও তিনি পাত্রানুসন্ধান করিতে ব্যস্ত হন নাই। ঘটনাক্রমে ঈশ্বর যখন পাত্র আনিয়া দিলেন, তিনি তাহা অকুণ্ঠিতভাবে গ্রহণ করিলেন। তিনি ফলবাদী নহেন সুতরাং ফলের দিকে দৃষ্টি করেন নাই। উচিত কি না? তিনি কেবল এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার হৃদয় বলিল "উচিত" এবং ঘটনা দ্বারা

জানা গেল যে পাত্রটী ঈশ্বর কর্ত্তৃক আনীত"। কেশববাবুর প্রতি যতগুলি দোষারোপ করা হইয়াছে, পত্রলেখকেরা একটী কথা দ্বারা সেগুলিকে ঢাকিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। সে কথাটী এই যে, "পাত্রটী ঈশ্বরেব আনীত" সুতরাং বিবাহের বিরুদ্ধে যতই কেন যুক্তি প্রদর্শিত হউক না, পাত্রটী যখন ঈশ্বর দ্বারা প্রেরিত, তখন সে সকল যুক্তি কোন কার্য্যেরই নহে। লেখকদিগের বুদ্ধি কৌশলকে বলিহারি যাই! কেমন এক কৌশল দ্বারা তাঁহাবা সাধারণের মুখ বন্ধ করিতে সযত্ন হইযাছেন! কিন্তু এখানে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, তাঁহাবা যে ঘটনাটীকে উপলক্ষ্য কবিযা "পাত্রটী ঈশ্বর দ্বারা প্রেরিত" বলিয়াছেন, সে ঘটনাটী বিশদরূপে ও সবিস্তারে প্রকাশ কবেন নাই কেন? যদি তাহা কবিতেন তাহা হইলে পাত্রটী যথার্থই ঈশ্বব দ্বারা আনীত কি না তাহা সকলে বুঝিতে পারিতেন। নতুবা তাঁহারা কে, যে তাঁহাবা ঈশ্বর দ্বারা আনীত বলিলেই সাধাবণ লোক নতশিরে তাহা গ্রহণ কবিবে? যদি বল তাহা বলিতে তাঁহারা বাধ্য নহেন কিন্তু আমবা জিজ্ঞাসা কবি এতদিন পরে সেই সুদীর্ঘ (ধর্ম্মতত্ত্বের আট স্তম্ভ) পত্রখানি প্রকাশ করিবাব কারণ কি? কেশববাবু যে নির্দ্দোষ তাহা সাধারণকে বুঝাইয়া দেওয়াই কি তাহার কারণ নহে? কেশববাবু সত্য সত্যই বিবেকের আদেশে এই বিবাহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইযাছিলেন যদি এরূপ স্বীকাব করা যায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ঈশ্বরের উপর কতকটা দোষ আসিযা পড়ে। কাবণ, আমি নিশ্চয বলিতে পারি, আমি এবং আমাব ন্যায অনেকেই দ্বেষ হিংসাবশতঃ নহে কিন্তু কর্ত্তব্যজ্ঞানে ও বিবেকেব অনুরোধে কেশববাবুব কার্য্যেব প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছি। সুতবাং বলিতে হইবে যে ঈশ্বব একজনকে যে কার্য্য করিতে বলেন, অপবকে আবাব সেই কার্য্যেরই প্রতিবাদ করিতে উত্তেজনা করেন। কিন্তু ঈশ্বব বাস্তবিকই যে এরূপ অব্যবস্থিত ও অন্যাযবান হইবেন তাহা কখনই সম্ভব নহে। প্রস্তাবিত বিবাহেব যখন আগাগোড়ায় সকলই দোষ দেখা যাইতেছে তখন ঈশ্বব কখনই তাহাতে সম্মতি দেন নাই, কেশববাবু স্বার্থানুরোধে অন্ধ হইযা তাহা সম্পন্ন করিয়াছেন এবং আপনাকে স্ফটিকের ন্যায় নির্ম্মল বলিয়া প্রতীতি করাইবাব জন্য সমস্ত দোষ ঈশ্বরের স্কন্ধে নিক্ষেপ করিয়াছেন।

প্রতাপবাবুরা আর এক স্থলে লিখিয়াছেন যে "গবর্ণমেণ্ট উহার (বিবাহেব) মধ্যে না থাকিলে এবং বিশেষ উদ্যোগ না করিলে নিশ্চয়ই বিবাহ প্রস্তাব গ্রাহ্য হইত না।" পাঠকেরা দেখুন উপরে একবার বলা হইয়াছে যে, পাত্রটী ঈশ্বব দ্বারা আনীত হইয়াছিল বলিয়া কেশববাবু নির্ব্বিচারে অর্থাৎ পাত্র ও পাত্রী বালক ও বালিকা হইলেও, পাত্র মূর্খ ও ব্রাহ্ম কিনা তাহার অনুসন্ধান না করিয়াও, এ বিবাহে কাহারও মঙ্গলামঙ্গল হইবে কিনা তাহা বিবেচনা না করিয়াও, এ বিবাহে সম্মতি দিয়াছিলেন—আর এখানে বলা হইল, গবর্ণমেণ্ট বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছিলেন বলিয়াই কেশববাবু বিবাহের প্রস্তাব

গ্রাহ্য করিয়াছিলেন !! বাস্তবিক নিজ দোষ গোপন করিবার জন্য, সাধারণের চক্ষে ধূলি দিবার জন্য কেশববাবুর ন্যায় লোকেরাও যে এরূপ কুটিল উপায় সকল অবলম্বন করিতে পারেন তাহা আমরা পূর্ব্বে জানিতাম না। (এখানে কেশববাবুর নাম উল্লেখ করিবার কারণ এই যে, প্রতাপবাবুরা বলিয়াছেন যে, তাঁহারা যাহা কিছু লিখিয়াছেন তাহা কেশববাবুর বিনা সম্মতিতে নহে) কিন্তু কেশববাবুর জানা উচিত যে, স্বার্থরূপ আবরণ দ্বারা সত্যরূপ সূর্য্যকে কখনই প্রচ্ছন্ন রাখা যাইতে পারে না।

প্রতাপবাবুরা লিখিয়াছেন যে কেশববাবু বিবাহ সম্বন্ধে ১৩টী প্রস্তাব করিয়া পাঠান। তাহার মধ্যে একটি এই যে "রাজা যে ব্রাহ্ম অথবা একেশ্বরবাদী তাহা 'লেখায়' "স্বীকার করিতে হইবে।" যখন কেশববাবু সঙ্গত অসঙ্গত, ন্যায় অন্যায়, মঙ্গল অমঙ্গল, নিজে কিছুই বিবেচনা না কবিয়া পাত্রটী ঈশ্বরের প্রেরিত বলিয়া বিবাহে সম্মতি দিয়াছিলেন, তখন আবার কায়দা করিয়া পাত্রটির নিকট হইতে "ব্রাহ্ম" বলিয়া লেখাইয়া লইবার কারণ কি ? পাত্রটি ঈশ্বরের দ্বারা আনীত কেশববাবু যখন ইহা বিশ্বাস করেন, তখন সেই পাত্র যে সর্ব্বাংশেই উত্তম হইবে তাহাতে কি তিনি বিশ্বাস করেন না ? যদি করেন তবে আবার "লেখাব" দ্বারা পাত্রের নিকট হইতে "ব্রাহ্ম" বলিয়া অস্বীকার করাইয়া লইবার প্রযোজন কি ? এরূপ লেখাইয়া লওয়াতে ইহাই কি প্রমাণ হয় নাই যে কেশববাবু "ঈশ্বরের বিধানের" উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারেন নাই ? মনে কর রাজা যদি "ব্রাহ্ম" অথবা "একেশ্বরবাদী" স্বীকার না করিয়া এরূপ লিখিয়া দিতেন যে "আমি ঘোর পৌত্তলিক, ব্রাহ্ম নহি" তাহা হইলে কেশববাবু কি করিতেন ? যদি তিনি নিজ কন্যার সহিত রাজার বিবাহ না দিতেন তবে ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার যে সম্পূর্ণ নির্ভর ও বিশ্বাস নাই ইহা যেমন প্রমাণিত হইত, ঈশ্বরের দানের প্রতি সন্দেহ ও তাহার পবীক্ষা দ্বাবাও সেইরূপ তিনি ঈশ্বরকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভর করেন নাই তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সর্ব্বসাধারণে জানিয়াছেন যে প্রস্তাবিত বিবাহটি বাল্যবিবাহ, পাত্র পাত্রীর বয়স ১৫॥ ও ১৩॥ বৎসর মাত্র, ইহাও জানিয়াছেন যে গোবর খাওয়াইয়াই হউক অথবা স্বর্ণমুদ্রা স্পর্শ করাইয়াই হউক (ইহার অন্যতর প্রতাপবাবুরা নিজেই স্বীকার কবিয়াছেন) পাত্রীকে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়াই আংশিক পৌত্তলিক বিধানানুসারে অর্থাৎ খিচড়ী পাকাইয়া বিবাহ কাষ্য সম্পন্ন হইয়াছে। এক্ষণে সর্ব্বসাধারণে ইহাও জানিলেন যে পাত্রটি ঈশ্বর দ্বারা আনীত বলিয়া ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভর করিয়া কেশববাবু যে নিজ কন্যার বিবাহ দিয়াছেন তাহা নহে, তিনি কেবল মাত্র নীচ স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিজ ধর্ম্মবিশ্বাস ও সংস্কারের বিরুদ্ধে বাল্যবিবাহ ও পৌত্তলিকতাতে যোগ দিয়া নিজের দুর্ব্বলতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

পরিশেষে আর একটি কথার উল্লেখ করা একান্ত আবশ্যক হইতেছে। প্রতাপ-বাবুরা বিবাহটী যে সম্পুর্ণ অপৌত্তলিক বিধানানুসারে সম্পন্ন হয় নাই তাহার এই

মাত্র কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন যে, গবর্ণমেণ্ট নিজে তাঁহাদের কথা রক্ষা করিতে পারেন নাই, বিবাহটী সিদ্ধ করিবার জন্য শেষে আংশিকরূপে পৌত্তলিকতাতে যোগ দিতে হইয়াছিল। আমরা জিজ্ঞাসা করি ইহাতে গবর্ণমেণ্টের অপরাধ কি? এরূপ স্থলে গবর্ণমেণ্টের প্রতি নির্ভর করা হইয়াছিল কেন? গবর্ণমেণ্ট কেবল যে রাজার রক্ষক স্বরূপ ছিলেন, গবর্ণমেণ্ট যে ন্যায়ানুসারে কোন প্রকারে রাজার সামাজিক আচার ব্যবহার ও কর্ম্মানুষ্ঠানের উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না তাহা কি কেশববাবু জানিতেন না? অথবা কন্যা রাজরাণী হইবে এই আহ্লাদে আটখানা হইয়া সে সকল কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়া ছিলেন? "স্বাধীন দেশ" "কুচবেহারে ইংরাজ আইন খাটে না" "কুচবেহারে সামাজিক আচার ব্যবহারে ইংরাজের হস্তক্ষেপ করিবার কোন অধিকার নাই" এই সকল বাক্য অবলম্বন করিয়া তাঁহার দলের লোকেরাই না চিৎকার ধ্বনিতে মেদিনী বিকম্পিত করিয়াছিলেন? তবে নিজ ব্যবস্থানুসারে অথবা গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থানুসারে বিবাহ সম্বন্ধের সময় তাহা একবার বিবেচনা করিয়া দেখা হইল না কেন? যে কোন প্রকাবে হউক কাযসিদ্ধি কবিয়া লওয়া, নিজ কন্যাকে রাজরাণী করাই কি কেশববাবুব একমাত্র উদ্দেশ্য নহে? যদি বল যে কুচবেহার হইতে পণ্ডিত আনাইয়া বিবাহের নিয়মাদি স্থির করা হইয়াছিল কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, কুচবেহার হইতে যখন তারে এই ভাবে সংবাদ আসে যে "বিবাহের যে সকল নিয়মাদি করা হইয়াছে তাহার মধ্যে অনেক ব্রাহ্মপদ্ধতি সন্নিবিষ্ট কবা হইয়াছে অতএব এরূপ নিয়মে বিবাহ হইতে পারে না" তখন একটা শেষ মীমাংসা না করিয়া কন্যাকে দৌড়াদৌড়ি করিয়া লইয়া যাওয়া হইল কেন? পণ্ডিতকে আনান, নিয়মাদি স্থির করা, ইহা কেবল একটা কথার কথা, কেবল একটা "পলিসী" মাত্র কি নহে? তারযোগে উক্ত বিরূপ সংবাদ আসিলেও কন্যাকে কুচবেহারে লইয়া যাওয়া সম্বন্ধে প্রতাপবাবুরা এইরূপ লিখিয়াছেন যে যখন সংবাদ আসে তখন বেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষদিগের সহিত স্পেশাল ট্রেনের সমস্ত বন্দোবস্ত হইয়াছে, স্থতরাং তখন না গেলে বৃথা অর্থদণ্ড হইত। বিবাহের কোন স্থিরতা নাই এবং কুচবেহারে কন্যাকে লইয়া গেলেও যদি কোন স্থিরতা না হয়, তবে গমনাগমনের জন্য গাড়ি ভাড়া প্রভৃতি দ্বিগুণ ব্যয় হইবে ইহা জানিয়াও কন্যাকে যখন লইয়া যাওয়া হইয়াছে তখন তাহাতে কি বুঝাইতেছে? ব্রাহ্ম মতেই হউক, পৌত্তলিক মতেই হউক অথবা অন্য কোন মতেই হউক যখন গবর্ণমেণ্ট সহায় তখন যে কোন উপায়ে হউক কন্যাকে রাজরাণী করিতে সক্ষম হইবই, কেশববাবুর মনে এরূপ দৃঢ বিশ্বাস ছিল বলিয়া না তিনি ওরূপ স্থলে কন্যাকে কুচবিহারে লইয়া যাইতে সাহসী হইয়াছিলেন? অতএব ইহা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে গবর্ণমেণ্ট কথা রক্ষা করিতে পারেন নাই বলিয়া নহে, কিন্তু বাল্যবিবাহ ও পৌত্তলিক মতে বিবাহ দিতে প্রস্তুত হইয়াই কেশববাবু কুচবেহারে গমন করিয়াছিলেন।

প্রতাপবাবুদের পত্রখানি সম্বন্ধে আমাদেব বলিবার অনেক কথাই আছে কিন্তু ক্রমে ক্রমে এই পত্রখানি দীর্ঘ হইয়া উঠিল, অতএব আমরা এইখানে উপসংহার করিতে বাধ্য হইলাম।

মোকামা
১৬ এপ্রেল ১৮৭৮

শ্রীভগবতীচরণ দে

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ। ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৮৫। ২৭ সংখ্যা

চিঠি

গত ২রা জ্যৈষ্ঠ বুধবাব কলিকাতায় "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ" নামে একটী ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছে। যে সকল ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেনেব অনুবর্ত্তী ছিলেন, তাঁহারা পৃথক হইযাই এই সমাজ স্থাপন কবিলেন। বিভিন্ন ভাবাপন্ন সর্ব্বদেশীয় এক ঈশ্বরবাদী ব্রাহ্মেরা এই সমাজে যোগ দিতে পারেন, এই উদ্দেশ্যে ইহার নাম "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ" রাখা হইয়াছে।

কেশববাবুর সম্বন্ধে এইবার যে সকল বাদানুবাদ চলিতেছে, তাহাতে আমরা নীরব ছিলাম। কাবণ, কেশববাবুকে আমবা বহুকাল হইতে চিনি এবং তাঁহার সম্বন্ধে যাহা বলিবার তাহা বহুকাল বলিযা রাখিয়াছি, নূতন বক্তব্য কিছু নাই। ইহার ৯ বৎসর পুর্ব্বে কেশববাবুব মহাপুরুষত্ব স্থাপন চেষ্টা দেখিয়া আমরা লিখিয়া রাখিযাছি—

"(১) যিনি জ্ঞাতসারে হউক বা অজ্ঞাতসারে হউক, কোন প্রকারে ব্রাহ্মধর্ম্মে কলঙ্কারোপ করিতে যাইবেন, ঈশ্বরের ব্রাহ্মধর্ম্মে আপনার কিছু প্রবিষ্ট করিয়া দিতে যাইবেন—তিনি অপসারিত হইবেন।

(২) ঈশ্বব এমন অপুর্ব্ব কৌশলে ব্রাহ্মধর্ম্মেব প্রচাব করিবেন যে, ইহার মধ্যে কাহারই মস্তক অন্য লোকেব অপেক্ষা উচ্চ হইযা উঠিবে না।

(৩) ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতির জন্য না'না লোকে চেষ্টা কবিবেন কিন্তু গঙ্গাব সহিত ভগীরথের নামের ন্যায ব্রাহ্মধর্ম্মেব সহিত কাহারো নাম গ্রথিত থাকিবে না।"

(১৭৯১ শকের বৈশাখ মাসের মুদ্রিত "শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন ও ব্রাহ্ম ধর্ম্ম" নামক পুস্তকের ৯ পৃষ্ঠা।)

ঈশ্বর ইচ্ছায় এতদিনে উল্লিখিত বাক্যগুলি সফল হইল। কেশববাবু অপসারিত হইলেন। কিন্তু আবার এই যে একটী সভা হইল, ইহা হইতে কি ফল প্রসূত হয়, কে বলিবে? কেশববাবু যে ধুমমন্ত্রজালে আকাশ আচ্ছন্ন করিয়াছিলেন, তাহা প্রায় সকলেরই বিদিত আছে। এখন সেই আকাশ পরিষ্কার হইতে আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু কিছু ফরসা হইয়া আবার ঘোর ঘনঘটা, ঝড় তুফান ও মুষলধারে বৃষ্টি হইতেও দেখা যায়। কে

জানে, এই নূতন সমাজ আবার কি করিবেন? এই সমাজের নিয়মাবলী এখনও স্থির হয় নাই, কিন্তু যে কয়েকটী প্রস্তাব অবধারিত হইয়াছে, তাহা হইতেই নানা আশঙ্কা উপস্থিত হয়।

প্রথমতঃ। প্রস্তাব হইয়াছে যে অনুষ্ঠানকারী "উন্নতিশীল" ব্রাহ্মেরাই এই সমাজের আচার্য্য ও উপদেশক হইবেন। অনুষ্ঠানকারী "উন্নতিশীল" ব্রাহ্ম হইলেই যে উৎকৃষ্ট লোক হয়, এ ভ্রম কি এখনও থাকিবে? অনুষ্ঠানকারী উন্নতিশীলেরা দুই দলে বিভক্ত হইয়া এখন পরস্পরের কপটতা, মিথ্যাবাদিতা, অকৃতজ্ঞতা, স্বার্থপরতা, দ্বেষ, হিংসা কি না দেখাইয়াছেন? ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে লোক ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে "অনুষ্ঠানকারী" ও "উন্নতিশীল" হয়, সময়ক্রমে তাহাদের প্রকৃত মূর্ত্তি প্রকাশ পায়, আপাততঃ তাহাদের ধর্ম্মাবরণ দেখিয়া তাহাদিগকে উৎকৃষ্ট "উন্নতিশীল" মনে করা উচিত হইবে না।

দ্বিতীয়তঃ। এই নূতন সমাজের এইরূপ মত হইতে পারে যে যাহারা অনুষ্ঠানকারী, তাহারাই যে উন্নত ব্রাহ্ম এমন নহে, কিন্তু যাহারা অনুষ্ঠানকারী নয়, তাহারা কখনই উন্নত ব্রাহ্ম হইতে পারেন না। এ মতেও সকলে সায় দিতে পারেন কিনা সন্দেহ। কারণ, যে সকল হিন্দুসন্তান অনুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মদলভুক্ত হয়েন নাই তাঁহাদের মধ্যে অতি উৎকৃষ্ট লোক আছেন, তাঁহারা কেবল সমাজদ্রোহী হইতে চাহেন না, এই জন্য সামাজিক অনুষ্ঠান ত্যাগ করেন না। তাঁহারা বলেন, সমাজের অনুরোধে কিছু কিছু পৌত্তলিকতা করাতে পাপ নাই, পৌত্তলিকতাতে সম্বন্ধ এই মত স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে।

তৃতীয়তঃ। এই সমাজের প্রকাশ্যভাব এই যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে মতভেদ সত্ত্বেও যাহাতে সকল প্রকার ব্রাহ্মদিগের মধ্যে ভ্রাতৃভাব জন্মে এমন চেষ্টা করিবেন। কিন্তু এই সমাজের মধ্যে যাঁহারা প্রধান এবং যাঁহাদিগকে আচার্য্য ও উপদেষ্টা করিয়া সকলের আদর্শ স্থল করিয়া তুলা হইতেছে, তাঁহারা সাহেবী ধরণে চলিবেন এবং ৩ আইনের অনুবর্ত্তী হইবেন! তাহা হইলে তাঁহাদের সহিত হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত "ব্রাহ্মদিগের" পদে পদে ঠকাঠকি চলিবে। যেহেতু সাহেবী নীতি ও হিন্দু নীতিতে বিস্তর প্রভেদ এবং ৩ আইনের ব্যবস্থাগুলিকে বীভৎস বলিয়া অনেক কৃতানুষ্ঠান ব্রাহ্মেরাও স্বীকার করেন। যে সমাজে এই সকল ব্রাহ্ম আদর্শস্থলী হইয়া দাঁড়াইবেন সে সমাজে স্থিরচরিত্র হিন্দু ব্রাহ্মেরা যোগ দিবেন কি না সন্দেহ। পরন্তু যদি ইঁহারা আচারে ও বিচারে হিন্দুনীতি সকলকে বিপর্য্যস্ত করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে হয়ত হিন্দু সমাজস্থ ব্রাহ্মগণ ইঁহাদিগকে অকল্যাণকারী শত্রু জ্ঞান করিবেন।

চতুর্থতঃ। কেশববাবুর "মহাপুরুষ" "স্বর্গ রাজ্য" "প্রত্যাদেশ" এবং "৩ আইন" প্রভৃতি বিষয়ে মতের উৎপত্তির সময় আমরা ঐ সকল মতের প্রতিবাদ করিয়া কতই লিখিয়াছি। এখন যাহারা ঐ সকল মতের প্রতিবাদ করিতেছেন, তখন তাঁহাদিগেরই ঐ সকল মতের প্রতি অনুরাগ দর্শন করিয়া আমরা দেশের ও সমাজের পক্ষে নানা অনিষ্ট

আশঙ্কা করিতাম। এখন আশা হয়, সে সকল কুমন্ত্রজাল খণ্ডিত হইবে। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে সে সকল মতের সৃষ্টি হইয়াছিল, সেই উদ্দেশ্য এই "সাধারণ" ব্রাহ্মসমাজের নেতৃগণেরও ঘটিতে পারে। ইহারা কি দলবন্ধনোপযোগী ঐরূপ কোন মত উদ্ভাবন করিবেন না?

নূতন ব্রাহ্ম সমাজ সম্বন্ধে এই সকল আশঙ্কা হওয়াতে তাহা বিনয়পুর্ব্বক ব্রাহ্মমহাশয়দিগের গোচর করিতেছি। অতঃপর ঐ ব্রহ্মসমাজ যে সকল নিয়ম প্রণয়ন করিবেন, তন্মধ্যে এরূপ আশঙ্কার কারণ সকল পরিহার হয় ইহাই কামনা।

সর্ব্বজাতীয় ও সকল সম্প্রদায়ের মনুষ্যগণ মধ্যে ভ্রাতৃভাব জন্মে, এই উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মসমাজের পত্তন হইয়াছে। এখন মহাপুরুষদিগের স্বার্থপরতা দোষে নূতন নূতন মত উদ্ভাবিত হইয়া ব্রাহ্ম নামে একটী পৃথক সম্প্রদায় হয় এবং তাহা অন্যান্য সম্প্রদায়ের বৈরী স্বরূপ হয়, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় কিছু নাই।

৫ই জ্যৈষ্ঠ
১৮০০ শক

ঈশানচন্দ্র বসু।

বাল্যবিবাহ ও হিন্দুহিতৈষিণী। ২৫ ভাদ্র ১২৮৫। ৪২ সংখ্যা

আমরা গ্যারেট সাহেবের মতেব পোষকতা করিয়া একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। গ্যারেট সাহেবের মতের পোষকতা করাই যে আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য তাহা নহে, বাল্যবিবাহ হইতে বঙ্গদেশের ভুরি অনিষ্ট হইতেছে, ইহা রহিত হয় এই আমাদিগের অভিপ্রেত। আমরা দেখিয়া দুঃখিত হইলাম, আমাদের প্রস্তাবে অনেকে—বিশেষতঃ হিন্দুহিতৈষিণী অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। গ্যারেট সাহেব ডিরেক্টর সাহেবকে এ সম্বন্ধে যে এক পত্র লিখেন, বোধ হয় সেই পত্রখানিই হিন্দুহিতৈষিণীর অসন্তোষের কারণ হইয়াছে। সে পত্রখানি এই:

"বঙ্গদেশের সাধারণ বিদ্যাধ্যাপনের ডিরেক্টর সাহেবের নিকট

এ. ডবলিউ. গ্যারেট সাহেবের পত্র।

২৭ এপ্রেল ১৮৭৮

আপনি বিশেষরূপে অবগত আছেন যে বাল্যবিবাহ বালিকা বিদ্যালয়ের উন্নতির প্রধান অন্তরায়। প্রতিবর্ষেই ইনস্পেক্টর, ডিরেক্টর এবং গবর্ণমেণ্ট এই বলিয়া আক্ষেপ করিয়া থাকেন যে কন্যাদিগকে বিবাহের পুর্ব্বে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার অভিলাষ থাকিলেও হিন্দুসমাজের শিক্ষিত লোকেরাও তাঁহাদের কন্যাদিগকে ১০।১১ বৎসরের সময়ে বিবাহ দিয়া থাকেন। এই কার্য্যের প্রতিবাদ করিলে তাঁহারা তদুত্তরে বলিয়া থাকেন যে বাধ্য

হইয়াই তাঁহারা ঐরূপ কার্য্য করেন, যতদিন এই বাল্যবিবাহের প্রথা সাধারণ্যে প্রচলিত থাকিবে, ততদিন ইহা ভঙ্গ করা কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে। উক্তপ্রথা উল্লঙ্ঘন করিলে কন্যার উপযুক্ত বর পাওয়া কঠিন ব্যাপার হয়। সুতরাং এই রীতি ন্যায়বিরুদ্ধ জানিয়াও কার্য্যতঃ উহা অনুমোদন করেন। এই প্রথা দূর করিবার যাঁহাদের ইচ্ছা আছে, তাঁহাদের উপকার মানসেই আপনার নিকট আমার এই লিখিবার মুখ্য উদ্দেশ্য।

আপনি ইহা অবগত আছেন যে বালকদিগকে উচ্চশিক্ষা দেওয়ার ইচ্ছা বৃদ্ধি হওয়াতে পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে তাহাদের বিবাহও বিলম্বে দেওয়া হয়।

২০ বৎসর পূর্ব্বে বালিকাদিগের ৭।৮ বৎসরের সময় বিবাহ হইত, এক্ষণে ১০।১২ বৎসরের সময়ে বিবাহ হইয়া থাকে। এই যে কথঞ্চিৎ উন্নতি দেখা যায়, যাহাতে সত্বরে তাহা বৃদ্ধি হয়, তদুদ্দেশেই আমি এই প্রস্তাব করিলাম। সেই প্রস্তাব (যাহা কতিপয় হিন্দু সম্ভ্রান্ত লোক কর্ত্তৃক প্রথম উপস্থিত করা হয়। এই যে—এই নিয়ম প্রকাশের পর যাহারা বিবাহ করিবে তাহাদিগকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে দেওয়া না হয়। এই প্রস্তাবে এরূপ হাস্যজনক ভাব আছে যে আমার বোধ হয় ইহা কোন ইউরোপীয়ের নিকটে সঙ্গত বলিয়া বোধ হইবে না। কিন্তু অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলিয়াছেন যে ইহাতে প্রভূত সুফল উৎপন্ন হইবে।

এই প্রস্তাবের অনুকূলে কি প্রতিকূলে আমি নিজে কোন যুক্তি প্রদর্শন করিব না। ডিষ্ট্রীক্ট কমিটি সমূহের মত সংগ্রহ করা হয় এই আমার ইচ্ছা। ডিষ্ট্রীক্ট কমিটি সাধারণ সভার মত গ্রহণ করিতেও আদিষ্ট হইতে পারেন।"

হিন্দুহিতৈষিণী সম্পাদকের এই আশঙ্কা জন্মিয়াছে যাহাতে হিন্দু বালিকাগণের অধিক বয়সে অশাস্ত্রীয় বিবাহ হয় গ্যারেট, সাহেব কৌশলে সেই চেষ্টা পাইতেছেন। সম্পাদক যদি কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিতেন, কখন তাহার হৃদয় এই অলীক শঙ্কায় আকুল হইত না। বিবাহিত বালকের প্রবেশিকা পরীক্ষার নিষেধবিধি দ্বারা গ্যারেট সাহেবের বালিকাবিবাহ রহিত করিবার চেষ্টা কৌশল কোন ক্রমেই সফল হইবার সম্ভাবনা নাই। গ্যারেট সাহেব লিখিয়াছেন "এ প্রস্তাবে এরূপ হাস্যজনক ভাব আছে যে আমার বোধ হয়, ইহা কোন ইউরোপীয়ের নিকটে সঙ্গত বলিয়া বোধ হইবে না।" কেবল ইউরোপীয়ের নিকটে কেন কোন দূরদর্শী বাঙ্গালির নিকটেও ইহা সঙ্গত বলিয়া বোধ হইবে না। যাঁহারা গ্যারেট সাহেবকে পরামর্শ দিয়াছেন, তাঁহারা ততদূর তলিয়া বুঝেন নাই। ষোল বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার কাল। পুরুষের যদি ষোল বৎসরে বিবাহ না হইয়া সতর আঠার বৎসরে বিবাহ হয়, তাহাতে গ্যারেট সাহেব বা তাঁহার পরামর্শদাতাদিগের অভীষ্টসিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা কি? কি প্রতিবাদ করিয়া এই কথা বলিবেন, যোগ্য পাত্র পাওয়া যাইবে না, সুতরাং অগত্যা শাস্ত্রবিধি ভঙ্গ করিয়াও অধিক বয়স পর্য্যন্ত কন্যা রাখিতে হইবে; তাহাতে কেবল যে নিষিদ্ধের আচরণ হইবে, এরূপ নয়, প্রভূত অনিষ্টও ঘটিয়া উঠিবে।

পুরুষের সতর আঠার বৎসরে বিবাহের নিয়ম হইলে কন্যাকেও যে তের চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত অবস্থায় রাখিতে হইবে, তাহার কারণ কি ? মনুর সময়ে ত্রিশ বৎসরের পুরুষ দ্বাদশ বর্ষের কন্যার পাণিগ্রহণ করিত, এ বিবাহ যখন সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, তখন অষ্টাদশবর্ষীয় পুরুষ দ্বাদশবার্ষিকী কন্যার পাণিগ্রহণ করিবে, এ বিধি যে কেন সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে না তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। "ত্রিশদ্বর্ষোবহেৎ ভার্য্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীং।" এই মনু বচনের স্বরসে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, বার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কন্যাকে অনায়াসে অবিবাহিত অবস্থায় রাখা যায়। অনেকদিন অবধি বঙ্গদেশে শাস্ত্রমর্য্যাদা লুপ্ত হইযাছে, অনেকদিন অবধি বঙ্গবাসিরা শাস্ত্রকারদিগের উদ্দেশ্যবোধে অক্ষম হইয়াছেন, তাহাতেই পুত্তল পুত্তলিকার ন্যায় বালক বালিকার বিবাহ বঙ্গদেশে প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু পুতুলের বিবাহ দেওয়া শাস্ত্রকারদিগের অভিমত নহে। বালকবালিকাদিগের কি প্রকৃতরূপে এ জ্ঞান হইবার সম্ভাবনা আছে ? যদি সে জ্ঞান না জন্মিল, বিবাহই সিদ্ধ হইল না। দাম্পত্য সুখ সংসারের একটা প্রধান সুখ। পুরুষ কাজের লোক ও সচ্চরিত্র না হইলে সে সুখ হয না। শাস্ত্রকারেরা ইহা বিলক্ষণ বুঝিতেন। তাঁহারা নির্ব্বোধ ছিলেন না। মনু স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়া গিয়াছেন, বিদ্বান ও সচ্চরিত্র পাত্র দেখিয়া কন্যাদান করিবে, যদি সৎপাত্র না পাওয়া যায, অধিক বয়স পর্য্যন্তও কন্যাকে অবিবাহিত অবস্থায় রাখিবে। অযোগ্য পাত্রে কন্যাদান কোন দেশের কোন বিজ্ঞ ব্যক্তিরই মত নয়। ষোল বৎসর ত শৈশবের সীমা, এই সীমায় অধস্থ বালককে সচ্চরিত্র ও বিদ্বান বলিয়া জানিবার কি সম্ভাবনা আছে ? যাঁহারা বাল্যবিবাহের সপক্ষ, তাঁহাদিগকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা বলুন দেখি, বাল্যবিবাহ বঙ্গদেশের দুর্দ্দশার একটী প্রধান কারণ কি না ? বাল্যকালে বিবাহ হয়। বিবাহকর্ত্তা অর্জ্জন-ক্ষমতা জন্মিতে না জন্মিতে অনেকগুলি পুত্রকন্যার জন্মদাতা হইযা উঠে। শেষে বিষম বিব্রত হইয়া পড়ে, না পারে পরিবার প্রতিপালন করিতে, না পারে পুত্রকন্যাদিগকে ভালরূপে আহার দিতে, তাহারা ক্রমে জীর্ণশীর্ণ হইযা পড়ে, রোগ আসিযা চাপিযা ধরে। এই বাল্যবিবাহই সংক্রামক রোগের ও অকালমৃত্যুর প্রধান কারণ। অনেকের যে ভাল লেখাপড়া হয় না, অকর্ম্মণ্য ও অপদার্থ হইয়া যায় এই বাল্যবিবাহই তাহার অন্যতর কারণ। হিন্দু-হিতৈষিণী বলেন "সোমপ্রকাশ সম্পাদক সমুদায বিস্মৃত হইয়াছেন। যৌবনোদ্গমের পুর্ব্বে বিবাহ দেওয়া যে উচিত, আর আমাদের দেশে বালিকাদিগের ১২ বৎসরের সময়েই যে যৌবনোদ্গম হয়, এবং এই সময়ে বিবাহ না দিলে কি কি অনিষ্টের সম্ভাবনা সোমপ্রকাশের অনেক প্রস্তাবে তাহা প্রদর্শিত ও আলোচিত হইয়াছে" ইত্যাদি। আমাদিগের প্রস্তাবে বালিকা বিবাহের নামগন্ধও ছিল না। তবে হিন্দুহিতৈষিণী আমাদিগকে লইয়া টানাটানি করিতেছেন কেন ? বালকদিগের যে ১২ বৎসরে বিবাহ দেওয়া অতিশয় গর্হিত, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই। আমাদের মতে পঠদ্দশায় বিবাহ করা বা বিবাহ দেওয়া

পরামর্শসিদ্ধ নহে। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই অল্প বয়সে বিবাহ করিয়া অনেক বালকের উন্নতির পথ চিরকালের মত রুদ্ধ হইয়া যায়।

অধ্যাপক মনিয়র উইলিয়মস ভারত পর্য্যটন করিয়া গিয়া কোন বিখ্যাত পত্রিকায় একটী সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। তাহাতে বলেন ভারতের রমণীগণের শ্রীছাঁদ, সৌন্দর্য্য, সৌষ্ঠব, নবীনত্ব নাই; যৌবনেই তাহারা বৃদ্ধা, পুরুষেরা দুর্ব্বল, ক্ষীণ ও নিরুৎসাহ। বাল্যবিবাহকে তিনি লোকের এই সকল দুরবস্থার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরাও তাহাই বলি। ১৪।১৫ বৎসর বয়স্ক বালকের ঔরসে ১৩ কি ১৪ বৎসর বয়সের বালিকার গর্ভে যে সন্তানের উৎপত্তি হইবে, সে কি করিয়া দীর্ঘজীবী, বলিষ্ঠ বা উৎসাহ সম্পন্ন হইবে?

যাহা হউক, আজকাল বাল্যবিবাহের প্রতি অনেকের বিদ্বেষ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম ১৭ই আগষ্ট কলিকাতায় ছাত্রসভার আলবার্ট হলে একটী অধিবেশন হইয়াছিল। প্রায় ৪০০ শত ছাত্র ঐ সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। বাল্যবিবাহ রহিত করাই এই অধিবেশনের মুখ্য উদ্দেশ্য। সভা যে প্রস্তাব করিয়াছেন দুর্গাপুজার অবসরে সমালোচিত হইবে। সভা নিয়ম করিতেছেন ২১ বৎসরের পুর্ব্বে কোন ছাত্র বিবাহ করিতে পারিবে না। যে যে ছাত্র এই মতে সম্মত হইবেন, তাঁহাদিগকে শপথ করিতে হইবে যে তাঁহারা এ বয়সের পুর্ব্বে বিবাহ করিবেন না। এই বিষয় সভা বঙ্গদেশের সমস্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের নিকট পত্র দ্বারা প্রচার করিয়া দিয়াছেন। ইঁহারা কন্যার বিবাহে হস্তক্ষেপ করিতেছেন না।

বঙ্গসমাজের একটী সুন্দর চিত্র। ১৫ বৈশাখ ১২৮৭। ২ সংখ্যা

কোণেব বউ

চিঠি

বঙ্গদেশে একজাতি মনুষ্য আছে, তাহাদিগকে কোণের বউ বলে। কোণের বউ হওয়া যে কি ভয়ানক দায়, তাহা যাঁহারা কোণের বউ তাঁহারাই জানেন, যাঁহারা সরলচিত্তে তাহা অনুভব করিয়া থাকেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারেন। কোণের বউ প্রতিপদেই অপরাধী, প্রতি কার্য্যেই দোষী। গমনে, ভোজনে, রন্ধনে, বাক্য কথনে, অঙ্গ চালনে সকলেতেই কোণের বউ দোষী। কোণের বউ ক্ষুধা হইলে বলিতে পাইবে না, খাইতে পাইবে না—উদর পুরিয়া খাইতে পাইবে না; কোন ইচ্ছা হইলে প্রকাশ করিতে পাইবে না—তিরস্কার করিলে কাঁদিতে পাইবে না—পীড়া হইলে বলিতে পাইবে না—হাসিয়া কথাটী কহিতে পাইবে না—যাতনা হইলে প্রকাশ করিতে পাইবে না—প্রাণ ওষ্ঠাগত দেখিয়াও গাত্রবস্ত্র খুলিতে পাইবে না—ত্বরিত চলিতে

পাইবে না—স্পষ্ট করিয়া কথা কহিতে পারিবে না! ইহাই বঙ্গসমাজের নিয়ম। ইহাই বঙ্গসমাজে চির প্রচলিত, ইহাই বঙ্গসমাজে আদরের ধন। কোণের বউ সকল দিকেই অপরাধী; দ্রুত চলিলে ফড়্‌কা, মন্থরে কুড়ে; হাসিলে লজ্জাহীনা, না হাসিলে অহঙ্কারী, কথা কহিলে বাচাল, না কহিলে গর্ব্বিতা, ক্ষুধায় খাইলে রাক্ষসী, না খাইলে তাচ্ছিল্যকারিণী ইত্যাদি বিশেষণ দেওয়া হয়। অধিক পীড়ার যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া যন্ত্রণাসূচক সামান্য চিহ্ন প্রকাশ করিলেও অসহিষ্ণু বলিয়া তাহার কত গুণ ব্যাখ্যা হইয়া থাকে? কোণের বউ নিজে কিছু বলিতে পায় না। তাহার হইয়া বলিবারও কেহ নাই। কোণের বউ পৃথিবীর সকল সুখে বঞ্চিত, অধিক কি কথাটী কহিবারও যো নাই। কথা কহিয়া যে সুখ, কোণের বউয়ের তাহা নাই, হাসিয়া যে সুখ, কোণের বউয়ের তাহা নাই। যাহার হাসিবার ও কথা কহিবার অধিকার নাই, পৃথিবীতে তাহার কি সুখ? গৃহে কোন ক্ষতি হইলে কোণের বউ তাহার দায়ী; কুক্কুরে হাড়ি খাইলে কোণের বউ দায়ী। কোণের বউ কথা কহিতে পারে না, কোণের বউ উত্তর করিতে পারে না; কোণের বউ নিজ পক্ষ সমর্থন করিতে পারে না, সুতরাং অপরাধী। গৃহিণীর শত অপরাধ হইলেও মার্জ্জনীয় কিন্তু বউয়ের পাণে চুণ খসিলেই প্রমাদ উপস্থিত, তাহার লাঞ্ছনা গঞ্জনা, তিরস্কারের সীমা থাকে না। শাশুড়ী মুক্তকণ্ঠ, ননন্দ খড়্গহস্ত, কোণের বউয়ের কাঁদিবারও যো নাই। কাঁদিলে আরও ভৎর্সনা, আরও গঞ্জনা। কোণের বউ ছাদ হইতে শুষ্ক বস্ত্র আনিয়াছেন এবং দৈবাৎ তাহারই নিজ গৃহে তাহা নিপতিত হইয়াছে, অনুসন্ধানে প্রকাশ হইল, কণের বউয়ের ঘরে পাওয়া গেল, অতএব বউ চোর। কোণের বউ চোর—এ অপবাদের আর সীমা নাই—এ কলঙ্ক রাখিবার আর স্থান নাই। শাশুড়ী তীক্ষ্ণ বাক্যাবলীতে তাহার অন্তর বিদ্ধ করিলেন; ননন্দ শতমুখী হস্তে করিলেন ঠাকুরজামাই তাহাতে অনুমোদন করিলেন। পাড়ার লোকে কাণাঘুষা করিতে লাগিল। "কোণের বউ চোর।" কোণের বউ ভয়ে, বিস্ময়ে, লজ্জায় অবনতমুখী, মুখে কথা নাই, চক্ষে নিদ্রা নাই, উদরে আহার নাই; পরাধীনা সম্পূর্ণ পরাধীনা। যতক্ষণে দিবে ততক্ষণে খাবে—সকলে বিরক্ত, কে দিবে? যথাকালে দিবে তথাকালে খাইবে। পেট জ্বলিয়া গেল, পিপাসায় তালু শুষ্ক হইয়া গেল—কে দেখিবে, কে জিজ্ঞাসিবে? যে যথাকালে স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া দিবে, তথাকালে খাইবে। কোণের বউয়ের হইয়া কে বলিবে? কোণের বউয়ের দুঃখ কে দেখিবে? কে শুনিবে? কে তাহার সহিত সহানুভূতি করিবে? বউ চোর না হইলেও সামাজিক গতিকে চোর! সকল বিষয়েই তাহার মর্ম্মান্তিক—তাহার বুকে পাথর চাপা।

সুখের জীবন যৌবন। জীবনের সুখ যৌবন। কত উৎসাহ, কত আমোদ, কত আহ্লাদ, কত উল্লাস, কত আকাঙ্ক্ষা; কত আশা, কত ভরসা, কত সৌন্দর্য্য

এই সময়ে হইয়া থাকে। কিন্তু হইলে কি হইবে। তৎসমুদয় অঙ্কুরিত হইতে না হইতেই সেই পতি-সোহাগিনীর অন্তরে পাথর চাপা পড়িল। মর্ম্ম পীড়ায়, দুঃখ ও চিন্তায় সুবর্ণ বর্ণ কালিমা প্রাপ্ত হইতে লাগিল; কমনীয় লাবণ্য তিরোহিত হইতে লাগিল; নবীনা দিন দিন ক্ষীণা, মলিনা, শীর্ণা হইতে লাগিল। এইরূপ দুর্দ্দশায়—এইরূপ নিরুৎসাহে তাহার সুখের যৌবনকাল অতিবাহিত হইল। পৃথিবীর সকল সুখে জলাঞ্জলি দিল—তাহার অন্তর ভাঙ্গিয়া গেল। ভবিষ্যতের সকল সাধু আশা ভরসা তাহা হইতে তিরোহিত হইল।

কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলেরই যে অবস্থায় ধর্ম্ম, বিদ্যা, উৎসাহ ও উন্নতির মূল স্থাপিত হয়—যে অবস্থায় যশঃ, গৌরব, প্রতিষ্ঠা, আশা অঙ্কুরিত হয়—যে অবস্থায় দয়া ও দাক্ষিণ্যের হস্ত প্রসারিত হইতে আরম্ভ হয়—নীতিশিক্ষা পাইলে মানুষ যে অবস্থায় বিবিধ সুমিষ্ট ফলে ফলবান হইতে থাকে—যে অবস্থায় শরীর ও মন সতত প্রফুল্ল থাকে—উৎসাহবারি নিক্ষিপ্ত হইলে যে অবস্থায় শরীরের তেজ ও কান্তি, দেহের লাবণ্য, গঠনের সৌন্দর্য্য, মনের উল্লাস দিন দিন দ্বিগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এবং দীর্ঘজীবনের ভিত্তিমূল দৃঢ় সংস্থাপিত করে, সেই অবস্থায়—সেই যৌবন অবস্থায়—যাহারা মুখচাপ পাইল, যাহাদের সকল আশা, সকল ভরসা, সকল উৎসাহ সমূলে উৎপাটিত হইল—যাহাদের দয়া, ধর্ম্ম, যশঃ, গৌরব, প্রতিষ্ঠার আশাবীজ অঙ্কুরিত অবস্থাতেই গৃহ-পেষণী দ্বারা নিষ্পেষিত হইল—উল্লাস, আনন্দ, প্রফুল্লতা, যাহাদের শোকে, দুঃখে ও চিন্তায় পরিণত হইল, এ জীবনে—এ পাপ-জীবনে—তাহাদের সুখ কোথায়? কান্তিপুষ্ট দেহই বা কোথায়? দীর্ঘজীবনই বা কোথায়? সংসারসুখে—পৃথিবীর সকল সুখে—আমোদ আহ্লাদে জলাঞ্জলি দিয়া তাহারা অনবরত উন্মনা ও চিন্তা-নিমগ্ন। তাহাদিগের হইতে আমাদের উপাদেয় ফললাভের আশা কিরূপে হইতে পারে? আহা! স্বামীর যে স্ত্রী বাল্যকালের ক্রীড়ার সঙ্গিনী, কৈশোরে জীবন সুখের প্রথম শিক্ষাদাত্রী, যৌবনে যে সংসার-সৌন্দর্য্যের প্রতিমা, বার্দ্ধক্যে যে জীবনাবলম্বন, গৃহে যে দাসী, শয়নে যে অপ্সরা, বিপদে যে বন্ধু, রোগে যে বৈদ্য, কার্য্যে মন্ত্রী, ক্রীড়ায় যে সখী, বিদ্যায় যে শিষ্য, ধর্ম্মে যে গুরু, আশ্রমে যে আরাম, প্রবাসে যে চিন্তা, স্বাস্থ্যে যে সুখ, রোগে যে ঔষধ, অর্জ্জনে যে লক্ষ্মী, ব্যয়ে যে যশঃ, বিপদে যে বুদ্ধি, সম্পদে যে শোভা, তাহার সহিত কি ঐরূপ ব্যবহার করা উচিত? সমস্ত জীবন যাহার উপর নির্ভর করে, তাহার জীবনতরুমূলে কি ঐরূপ কুঠারাঘাত করা উচিত? ইহাতে কি পরিণামে সুফল ফলিয়া থাকে? না; পরিণামে অমৃত ফল না ফলিয়া বিষময় ফলই উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিশেষতঃ আমরা যে সকল গুণের উল্লেখ করিলাম, সুশিক্ষিতা না হইলে আমরা কখন উত্তমরূপ আশা করিতে পারি না। কিন্তু স্ত্রীশিক্ষার নাম শুনিলেই প্রাচীনেরা জ্বলিয়া উঠেন; বিবরস্থিত সর্পের ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠেন। সেই হেতু অনেক স্ত্রীই পিঞ্জরবদ্ধা বিহঙ্গিনীর ন্যায় অন্ধকারাবৃতা থাকিয়া নানারূপ যাতনা সহিতে থাকেন। সকল স্ত্রীই

প্রথমে কোণের বউ। সকল স্ত্রীরই এই দুর্দ্দশা, সকল স্ত্রীরই এই লাঞ্ছনা। সকল স্ত্রীরই এই পরিণাম। ইহার মূল কারণ পরাধীনতা। যাঁহারা স্বাধীন না হইয়া বিবাহ করেন, তাঁহাদেরই জীবন বিষাদময় তাঁহাদের উভয় সঙ্কট। একদিকে সমাজ-বন্ধন ছিন্ন করিতে পারেন না। অপরদিকে সুখে জীবন উপভোগ করিতে পারেন না। এতএব স্বাধীন হইয়া বিবাহ করা ও দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনায় প্রাচীনদিগের কার্য্য করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

শ্রীসতীপ্রসাদ সেন।"

সম্পাদকের উত্তর

বাবু সতীপ্রসাদ সেন সুনিপুণ চিত্রকরের ন্যায় বঙ্গসমাজের যে একটী চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা অতি সুন্দর হইয়াছে। চিত্রের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির সৌষ্ঠব ও উন্নত ভাব দর্শন করিলে চিত্রকরের লিখননৈপুণ্যে ও উন্নতভাবের প্রশংসায় বিরত হওয়া যায় না। তিনি যে কেবল অতি উত্তমরূপ রঙ ফলাইয়াছেন এরূপ নয়, তাঁহার তুলির টানগুলি দেখিলেও চমৎকৃত হইতে হয়। কিন্তু আমরা দুঃখিত হইলাম, চিত্রখানি সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন ও সম্পূর্ণ হয় নাই। সতীপ্রসাদবাবু নববধূর কষ্টের বিষয়ই বর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু কি কারণে যে সে কষ্ট হয়, তাহা বিশেষ করিয়া বলেন নাই। এ কষ্ট বাল্যবিবাহ ও অশিক্ষার ফল। শৈশবকালে বিবাহ হয়, বালিকারা শৈশবেই পতিগৃহে যায়। তখন তাহাদের কর্ত্তব্যবোধ হয় না, গুরুজন বা অন্য অন্য পরিবারের প্রতি কিরূপ আচরণ করিতে হয় তাহা তাহারা জানে না। ভ্রম প্রমাদ ঘটে ও বুদ্ধি স্খলিত হয়। গুরুজনেরা তাহাদের সেই ভ্রমপ্রমাদ সংশোধন করিয়া তাহাদিগকে সুশিক্ষিত করিবার চেষ্টা পান। কিন্তু অধিকাংশ গুরুজন অশিক্ষিত। পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন অশিক্ষিতের নিকটে শিক্ষালাভ কেমন বিড়ম্বনার বিষয়। যেরূপে শিক্ষা দিতে হয়, তাহারা তাহা জানে না। সুতরাং বানরের হাতে খন্তা দিবার ন্যায় বিপরীত ফল ফলিয়া উঠে। গুরুমহাশয়ের বেত্রবাহিনী শিক্ষার ন্যায় এ শিক্ষা অনেক স্থলে নববধূর অঙ্গে রুধির ধারা বর্ষণ করিয়া বঙ্গসমাজের শোচনীয় অবস্থার প্রমাণ করিয়া দেয়।

সতীপ্রসাদবাবু যে প্রথার নিন্দা করিয়াছেন, সে প্রথা নববধূদিগের বিষম কষ্টের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাঁহারা ঐ প্রথা প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন, নববধূদিগকে কষ্ট দেওয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল না। তাহাদের একটী সৎ ও মহৎ উদ্দেশ্য ছিল। বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত নয়, পক্ষান্তরে বাল্যবিবাহ চিরপ্রচলিত। এরূপ স্থলে পতিগৃহই স্ত্রীগণের শিক্ষার প্রধান স্থান। বিবাহের পর বালিকারা পতিগৃহে যদি গুরুজনের নিকটে থাকে, গুরুজন যদি সজ্জন ও ধীর প্রকৃতি হন, তাহা হইলে তাঁহারা অনায়াসে তাহাদিগকে নীতিগর্ভ সৎ উপদেশ দিয়া সুশিক্ষিত করিয়া তুলিতে পারেন। গুরুজনেরা এই শিক্ষা দিবেন বলিয়াই সমাজের অধিনায়ক বিজ্ঞ ব্যক্তিরা স্ত্রীগণের শৈশবকালেই পতিগৃহ বাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, বঙ্গদেশের দুর্ভাগ্যক্রমে অধিকাংশ স্থলে সেই অশিক্ষার বিষময় ফল ফলিয়া থাকে। কিন্তু যেখানে গুরুজন সুশিক্ষিত এবং নববধূ বিনীত, সলজ্জ ও কর্ম্মিষ্ঠ, সেখানে সতীপ্রসাদবাবুর বর্ণিত কষ্টের অভিনয় হয় না। বোধ হয় সতীপ্রসাদবাবুও ইহা অনুভব করিয়া দেখিয়া থাকিবেন।

কালচক্র কুম্ভকার চক্রের ন্যায় খরতর ভ্রমণ করিতেছে, সেই ভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে সকল বিষয়েরই পরিবর্ত্তন হইয়া যাইতেছে। আমাদের দেশীয় লোকেরা সেই পরিবর্ত্ত-স্রোতে গা ঢালিয়া দেন না, উজান যাইবার চেষ্টা পান। সুতরাং বিপরীত স্রোতোগামীর যে দারুণ কষ্ট, তাহা ভোগ করিয়া থাকেন। বাল্যবিবাহ এখনকার সময়ের উপযোগী নয়। বাল্যবিবাহের পরিবর্ত্তন তখন একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশের লোকেরা এমনি অনাশ্রব (একগুঁয়ে) কালের গতির এমনি বিরোধী, প্রাচীন প্রথার এমনি ভক্ত, যে বাল্যবিবাহ নিবন্ধন দেশের বিষম দুর্দ্দশা ঘটিতেছে, দেশ বলবীর্য্য-হীন হইতেছে, অপ্রতিবিধেয় রোগ শোকের অবসর হইতেছে, অকালমৃত্যুর ক্রীড়ার স্থান হইতেছে, তাঁহারা ইহা দেখিয়াও দেখেন না! তথাপি তাঁহাদের চৈতন্য হয় না, তথাপি তাঁহাদের বাল্যবিবাহ-পরিবর্ত্তন-চেষ্টা জন্মে না! সতীপ্রসাদবাবু যে বিষয়ের প্রসঙ্গ করিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন, বাল্যবিবাহের পরিবর্ত্তন ও সুশিক্ষার বহুল প্রচার ব্যতিরেকে কি তাহার সংশোধনের সম্ভাবনা আছে?

বঙ্গদেশের দুর্ভাগ্যের দুটী বিশেষ কারণ ঘটিয়াছে। প্রথম, যে পরিবর্ত্তনে দেশের উপকার আছে, সে পরিবর্ত্তন-চেষ্টা নাই, প্রত্যুত, যাহাতে অপকার আছে, সেই পরিবর্ত্তন-স্রোত অবধারিতরূপে বহিতেছে। দ্বিতীয়, যদি কোন বিষয়ের পরিবর্ত্তন করা হয়, প্রাচীন বিষয়ের সংস্কার-চেষ্টা করা হয় না। পরিবর্ত্তনস্থলে বিজাতীয় বিষয় আনিয়া সমাজমধ্যে প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা পাওয়া হয়। তাহার এই ফল ফলে, অনেকে তদ্‌গ্রহণে অসমর্থ ও অননুরক্ত হয়। সুতরাং অভীষ্টসিদ্ধ হয় না।

পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে বঙ্গদেশীয়দিগের ব্যবহার দর্শন করিলে ইঁহাদিগকে সজীবতা ও সহৃদয়তা শূন্য বলিয়া বোধ হয়। দুই একটী উদাহরণ প্রদর্শিত হইলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন। বঙ্গদেশে বারমাসে তের পার্ব্বণ ও সেই পার্ব্বণকালীন বাদ্যোদ্যম প্রথম উদাহরণ। সম্প্রতি যে চৈত্র-পার্ব্বণ অতীত হইয়াছে, পাঠক তাহারই বিষয় একবার বিচার করিয়া দেখুন। বাণরাজা যে ঢক্কার সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, যাহার শব্দে কর্ণে বধিরায়মাণ ও শিরোবেদনা উপস্থিত হয়, সেই ঢকার শব্দ ও তাহার তালে তালে আজও ভূতের নৃত্য হইয়া থাকে। বঙ্গদেশীয়েরা এমনি বিকৃত-রুচি-সম্পন্ন ও নয়ন-শ্রবণহীন যে তাহাতে কষ্ট বোধ নাই। কষ্ট বোধ থাকিলে অবশ্যই উহার পরিবর্ত্তন স্পৃহা জন্মিত। দ্বিতীয়, বস্ত্র-পরিধান। এ বিষয়ে বঙ্গবাসীদের রুচি যে কেমন বিকৃত, পাঠক কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। স্ত্রীলোকদিগের শাটী পরিবার

যে এক রীতি আছে, তাহাতে ত প্রথমতঃ সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে আবৃত হয় না, তাহা আবার লোকে যত সৌখীন হইতেছে, ততই সূক্ষ্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শরীর আবরণ করা বস্ত্র পরিধানের উদ্দেশ্য, কিন্তু অনেকেরই বস্ত্র সে উদ্দেশ্য সাধনে সমর্থ হয় না। সামাজিক লোকেরা সেই সর্ব্বাঙ্গদর্শী বস্ত্র পরিধান করিয়া পরিবারগণকে প্রকাশ্যস্থানে কিরূপে গমন করিতে অনুমতি দেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। যে দেশের অবস্থা এইরূপ, যে দেশের রুচি এই প্রকার বিকৃত, সে দেশে সতীপ্রসাদবাবুর বর্ণিত বিষয়ের শীঘ্র প্রতীকার হইবার সম্ভাবনা নাই। দেশের এমনি বিকৃত শোচনীয় অবস্থা যে, সকল অমঙ্গলের আকর যে বাল্যবিবাহ তাহা সমাজের দৃঢ়রুদ্ধ অর্গল ভগ্ন করিতে পারিতেছে না, কিন্তু শাস্ত্রনিষিদ্ধ সুরাপান সেই অর্গল ভগ্ন করিয়া সমাজভিত্তিতে শত শত ছিদ্র করিতেছে, তাহাতে কোন কথা নাই। পক্ষান্তরে, যদি অনুদ্ভিন্নযৌবন-চিহ্ন নিজ কন্যাকে চৌদ্দ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত অবিবাহিত অবস্থায় রাখ, সামাজিক লোকেরা তোমাকে জাত্যন্তর করিবে, তোমার হুঁকা বারণ করিবে। কিন্তু তুমি যদি মদের পিপাকে পিপা পার করিয়া সহরের মদ মহার্ঘ্য করিয়া ফেল, কেহ উচ্চবাচ্য করিবে না। শাস্ত্রে বলে, যে সুরা পান করে, যে তাহার সংসর্গে থাকে সেও মহাপাতকী হয়। সেই সুরা এমন নিত্য সেব্য হইয়া উঠিয়াছে।

ঢাকুরিয়া গ্রাম ও মিউনিসিপালিটী। ১৯ শ্রাবণ ১২৮৭

ঢাকুরিয়া গ্রামটী কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব সাউথ সুবরবন নামে যে মিউনিসিপালিটী আছে, উহা তাহার অন্তর্গত। কলিকাতার এত নিকটে যে যদি কলিকাতা কখন পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করেন, তাহার চুল গিয়া উহার গায়ে লাগিবে। এত নিকটবর্ত্তী হইয়াও ঐ গ্রামের রাস্তাঘাটের কথা গ্রামবাসিদিগের নিকট যেরূপ শুনিলাম তাহাতে আমাদের অতিশয় আশ্চর্য্য বোধ হইল। গ্রামবাসিরা বলেন, দশ বার বৎসর হইল, ঢাকুরিয়া উলুবেড়িয়া প্রভৃতি কয়েকটি গ্রাম উক্ত মিউনিসিপালিটীর অন্তর্গত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, এই দীর্ঘকাল মধ্যে উক্ত স্থানগুলির উন্নতি সাধন বিষয়ে কোন প্রকার চেষ্টাই করা হয় নাই। রাস্তাঘাট প্রভৃতি পূর্ব্বে যেমন কার্য্য ছিল এখনও সেইরূপ আছে। বিশেষতঃ বর্ষাকালে গ্রামগুলির দুর্দ্দশা দর্শন করিলে মনে যারপর নাই কষ্ট উপস্থিত হয়। আমরা মিউনিসিপালিটী সভার অধ্যক্ষকে অনুরোধ করিতেছি তিনি একবার স্বচক্ষে গ্রামগুলির অবস্থা দর্শন করিয়া আসুন। রাস্তাগুলি কর্দ্দমে এরূপ পরিপূর্ণ যে ভদ্রলোকে বর্ষাকালে গ্রাম মধ্যে গমনাগমন করিতে পারেন না।

কি আশ্চর্য্য? সহরের নিকটবর্ত্তী একটী প্রধান মিউনিসিপালিটীর অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রামের আজও এরূপ দুর্দ্দশা। কাদার ভয়ে ভদ্রলোকে গ্রাম মধ্যে যাইতে চান না!

মিউনিসিপালিটী যদি রাস্তাঘাটের উৎকর্ষ সাধন না করেন, তবে সে মিউনিসিপালিটীতে প্রয়োজন কি? ঢাকুরিয়াতে কি নামে মিউনিসিপালিটী, কাজে নয়? গ্রামবাসীরা কি ট্যাক্স দেন না? তাঁহারা যদি রাস্তা করিয়া না দিলেন, তবে মিউনিসিপালিটী ট্যাক্স লন কেন? ঢাকুরিয়ার ট্যাক্সের টাকা কিসে ব্যয় হয়? কেবল এক কনষ্টেবলে কি সমস্ত টাকা উদরসাৎ করে? তাহাদের উদরে কি ভস্মকীট আছে?

আমরা আর একটী কথা শুনিয়া অধিকতর আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। গ্রামবাসীরা সুবরবন মিউনিসিপালিটীর অধ্যক্ষের নিকটে রাস্তা পাকা করিবার প্রার্থনা করিয়া আবেদন করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি গ্রামবাসীদিগের নিকটে চাঁদা চাহিয়াছেন গ্রামবাসীরা মিউনিসিপাল ট্যাক্স দিবেন, আবার রাস্তা পাকা করিবার নিমিত্ত অতিরিক্ত চাঁদা দিবেন, এ ত বড় চমৎকার কথা! যেখানে মিউনিসিপালিটী নাই, সেখানেও ত গ্রামবাসীরা অর্দ্ধেক চাঁদা দিলে গবর্ণমেণ্ট রাস্তা পাকা করিয়া দেন। তবে মিউনিসিপালিটীর মধ্যে বাস করিয়া লাভ কি? লাভের মধ্যেও এই দেখিতে পাই, দুই দিন ট্যাক্স দিতে বিলম্ব হইলে ওয়ারেণ্ট হয়, তাহার আবার খরচা দিতে হয়, শেষে ঘরের কবাট চৌকাট বিক্রয় হয়। এই সুখের নিমিত্ত কি আমাদের মিউনিসিপালিটীতে বাস? রাস্তা ভাল হইল না, জল নির্গমের ভাল পথ হইল না, বিশুদ্ধ পানীয় জলের সংস্থান হইল না, মিউনিসিপালিটীতে বাস করিয়া কোন সুখই হইল না, সুখের মধ্যে কেবল বিল-সরকারের গোঁপনাড়া তিরস্কার, আর ওয়ারেণ্টের খরচা যোগান।

ঢাকুরিয়া গ্রামটী সাউথ সুবরবন মিউনিসিপালিটীর যে অন্তর্গত হইয়া আছে, তাই আমরা দেখিতেছি যত অনর্থের মূল হইতেছে। রাজপুর প্রভৃতি গ্রামগুলি যতদিন ঐ মিউনিসিপালিটীর অন্তঃপাতী ছিল, ততদিন তাহাদেরও ঐরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল, কিন্তু এখন স্বতন্ত্র হওয়াতে সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছে। আমরা দেখিতেছি এখন সেখানে রাস্তা পাকা হইতেছে, কিন্তু কেহ ট্যাক্স ভিন্ন স্বতন্ত্র চাঁদা চাহে না।

যাহা হউক, আমরা ঢাকুরিয়াবাসীদিগকে এই পরামর্শ দিতেছি, তাঁহারা পুনরায় মিউনিসিপাল কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করুন। যদি তাঁহারা তাহাতে কর্ণপাত না করেন, লেপ্টেনণ্ট গবণরের নিকটে আবেদন করিবেন। আমাদের ন্যায়পরায়ণ লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর কখনই তাঁহাদের প্রার্থনাবাক্য উপেক্ষা করিবেন না।

বিহারে বাঙ্গালীর একাধিপত্য। ১৯ শ্রাবণ ১২৮৭

এতদিনের পর বুঝি বিহার হইতে আমাদের অন্ন উঠিবার সূত্রপাত হইল। বিহারবাসীরা বাঙ্গালী শিক্ষকদিগের নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিয়া কৃতবিদ্য হইয়া সংবাদ-পত্রের সাহায্যে আমাদের অন্নে ধূলি নিক্ষেপ করিতে বসিয়াছে। ভাগলপুরবাসী আমাদের

শ্রদ্ধাস্পদ বাবু রামরতন মজুমদার মহাশয়ের সম্পাদিত গত ১৬ই জুলাইয়ের "কলিযুগে একজন বিহারী" বিহারস্থ বাঙ্গালীদিগের উপর ভয়ানক কটাক্ষপাত করিয়া বলিয়াছেন, এখানকার সমুদয় আদালতেই বাঙ্গালীর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, এমন কি পাটনার কমিসনরের আফিসে শতকরা ৫ জন বিহারী দেখিতে পাওয়া যায় কি না সন্দেহস্থল। তাঁহারা সমুদয়, উচ্চপদগুলি একরূপ একায়ত্ত করিয়া লইয়া অপরাপর কার্য্যে স্বজাতীয়গণকে নিযুক্ত করিতে এত ব্যগ্র, যে ভুলিয়াও হতভাগ্য বিহারীদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে সময় পান না, বা ইচ্ছা করেন না। তবে যে দুই একজন এদেশীয় সব-ডেপুটী কালেক্টর বা সব-রেজিষ্টরীপদে নিযুক্ত হন, সে কেবল তাঁহাদের উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ নিবন্ধন, বিদ্যার সহিত তাঁহাদের বড সম্পর্ক নাই।

এরূপ তিনি আবও অনেক কথা বলিযা প্রকারান্তরে বাঙ্গালীদিগকে (আমাদিগকে) পক্ষপাতী বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। আজকাল অনেক উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ আমাদের উপর সে প্রকার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছেন, তাহাতে বিহারবাসিগণের এইরূপ অন্যায় প্রস্তাব সকল তাঁহাদের নয়নগোচর হইলে আমাদের বিস্তর ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা আছে জানিতে পারিয়া অদ্য আমবা এসম্বন্ধে দুই একটী কথা সোমপ্রকাশের বিজ্ঞ পাঠকবর্গকে ও গবর্ণমেণ্টকে জানাইতে ইচ্ছা করিতেছি। অনুগ্রহ করিয়া স্থানদান করিয়া বাধিত করিবেন। বলা কর্ত্তব্য "কলিযুগে ও" সভা হইতে প্রতিবাদ করা হইবে।

বিহারবাসিগণ বিদ্যাশিক্ষা দ্বারা দিন দিন যে আপনাদের স্বত্ব বুঝিতে পারিতেছেন ইহা অতিশয় আনন্দেব বিষয়। কোন সম্প্রদায় যত দিন তাহাদের স্বত্ব বুঝিতে সমর্থ হইয়া সকলে মিলিয়া রক্ষা করিবার চেষ্টা না করে, ততদিন তাহাদের জাতীয় উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই। বিহারবাসীবা এখন জাতীয় উন্নতি লাভের চেষ্টায় মনোনিবেশ কবিয়াছেন সত্য বটে, কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি বিহাববাসিগণকে বঞ্চিত করিয়া বঙ্গবাসিগণ যে বিহারের আদালতাদির সর্ব্বোচ্চ পদে (সে মাদ.র, পার্শনাল আসিষ্টাণ্ট, কমিশনব ইত্যাদি পদে) অধিরূঢ় হইতেছেন, বিদ্যা ও কার্য্যপটুতাই কি উহার প্রকৃত কারণ নহে? বিহারবাসী কয়জন এ পর্য্যন্ত সমর্থ হইয়াছেন? কয়জন বাঙ্গা-, আসেসর উৎকোচ গ্রহণ অপরাধে বিহারে রাজদ্বারে দণ্ডিত হইয়াছেন? এ পর্য্যন্ত কয়জন বিহারী ইঞ্জিনিয়ার হইয়াছেন? আমরা ত একজনকে স্মরণ করিতে সক্ষম হইতেছি না! বলিতে কি বিহারবাসীবা এখনও রেলওয়ে ও পুলিষেরই কার্য্যে কেবল উপযুক্ত, বাঙ্গালীরা তাঁহাদের বিপক্ষ একথা না হয় বিচারমুখে স্বীকার করিলাম, কিন্তু গবর্ণমেণ্টে ত তাঁহাদেব বিপক্ষ নহেন। কলিকাতার পুলিষে বাঙ্গালী অপেক্ষা পশ্চিম দেশীয় কনেষ্টবলের সংখ্যা প্রায় ৮।১০ গুণ অধিক, কার্য্যদক্ষতাই কি তাহার কারণ নহে? ফলকথা বিহারবাসিগণ আজিও যে বাঙ্গালীর অপেক্ষা অনেক অংশেই অনুপযুক্ত ইহা প্রস্তাবকারীও স্বীকার করিয়াছেন এবং এদেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও ইহার আর একটী প্রমাণস্থল। এখানকার স্কুলসমূহ হইতে প্রায়

প্রতিবৎসরই অধিক পরিমাণে বাঙ্গালী বালক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন, তাই বলি, বিহারবাসী ভ্রাতৃগণ! সত্য বটে বিহারের রাজকীয় পদগুলিতে আমাদের অপেক্ষা তোমাদের অধিক দাওয়া আছে, কিন্তু অগ্রে উপযুক্ত হও, তারপর আমাদিগকে এ প্রদেশ হইতে দূরে করিবার জন্য লেখনী ধারণ করিও!

ভাগলপুর আসোসিয়েসন। শ্রীবিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়।

বিলাতী গাম্ভীর্য্য বা আত্মগরিমা। ১৯ শ্রাবণ ১২৭৭

মনুষ্যমাত্রেই অনুকরণপ্রিয়—অনুকরণই সামাজিক উন্নতির ভিত্তিমূল। অনুকরণ ব্যতীত কোন জাতিরই সামাজিক কুনিয়ম সংস্কৃত হইয়া তৎস্থলে অভিনব বিশুদ্ধ নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না। অন্য কোন জাতির কোন সুনিয়ম দেখিলে তাহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থিরকরণে ঔৎসুক্য জন্মে এবং সেই নিয়মটি যুক্তিসঙ্গত হইলে তদনুবর্ত্তী হইয়া অতি অসভ্য জাতিরও অবস্থার উন্নতি হয়। সামাজিক উন্নতিসাধন বিষয়ে অনুকরণপ্রবৃত্তি কার্য্যকারিণী হয়। কিন্তু অনুকরণকারির অবিমৃষ্যকারিতায় সময়ে সময়ে অতি বিষময় ফলও ফলিয়া থাকে। কুপথ প্রদর্শকের অনুগমন করিয়া অন্ধের কি দুর্দ্দশা না হইতে পারে? অন্ধবৎ অনুকরণ দোষে কিয়দ্দিবস হইল, একজন প্রসিদ্ধ ইংরাজি সংবাদপত্রের সম্পাদক গালিবর্ষণ করিতে কিঞ্চিমাত্র সঙ্কুচিত হন নাই। মোগল রাজত্বকালে তাহাদের অনুকরণ করিতে গিয়া আমরা না মোগল না আর্য্য ছিলাম; এক্ষণে ইংরাজ রাজত্বে রাজপুরুষগণের অনুকরণ করিয়া আর্য্য মোগল-ইংরাজি প্রথা সমাজে প্রবিষ্ট হইয়া ত্র্যহস্পর্শ দোষ ঘটিয়া উঠিয়াছে। মোগল ও ইংরাজের আপাতমনোরম কুনিয়মগুলি অনুরকণ-দোষে সমাজে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। মোগলদিগের ভোগবিলাস ও ইংরাজগণের বাহ্যাড়ম্বর বঙ্গসমাজের আভ্যন্তরীন উন্নতি-পথের কণ্টক -স্বরূপ হইয়াছে। মোগল শাসনাধীনে থাকিয়া বাঙ্গালী এক্ষণেও বিলাসী, আবার ইংরাজ অনুকরণে বঙ্গবাসী বচনবাজি ও গলাবাজিতে সুনিপুণ ও কার্য্যকলাপ বাহ্যাড়ম্বর-পূর্ণ। ইংরাজ অনুকরণে যে বিবিধ দোষ ঘটিয়াছে, তন্মধ্যে পেচকবৎ বিলাতি (!!) গাম্ভীর্য্যে সমাজের যে অনিষ্টপাত হইতেছে, তাহার সমালোচনাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

প্রায় শিক্ষিত বঙ্গবাসিমাত্রেই বিলাতী গাম্ভীর্য্যে পূর্ণ। এই অভিনব গাম্ভীর্য্যে ইদানীং বঙ্গচরিত্রকে এমন কলঙ্কিত করিয়াছে যে, যে বঙ্গবাসিগণের সরলতা ও সামাজিকতা প্রধান ভূষণ ছিল, জাতীয় গৌরব মূল ছিল, যাহাদের ধর্ম্মে আত্মাভিমানের ভূয়োভূয় নিন্দাবাদ ও শাসন রহিয়াছে এবং সারল্যের প্রশংসা আছে, সেই বঙ্গবাসী আত্মাভিমানে—আত্মগরিমামূলে বিলাতি গাম্ভীর্য্যে—এক অদ্ভুত জন্তু বলিয়া পরিচিত হইতে কিঞ্চিমাত্র কুণ্ঠিত নহে।

ইংরাজি বা বিলাতি গাম্ভীর্য্য কি? অহঙ্কার বা আত্মগরিমা কি এই গাম্ভীর্য্য? ইতিপূর্ব্বে সমাজের একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি কায়িক শ্রমের দ্বারাও অতি সামান্য ব্যক্তির উপকার সাধনে বিমুখ ছিলেন না, কিন্তু খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় সভ্যতায় বিলাতী গাম্ভীর্য্যে সেই বঙ্গবাসী হীনাবস্থাসম...

সহরের নিকটে বাসের ফল। ১৯ আশ্বিন ১২৮৭। ২৫ সংখ্যা

দেশের অসভ্যতার অবস্থায় নিকৃষ্ট জীব সকলই ভয়ের কারণ ছিল, এবং তাহাদিগের হইতে দূরে বাস করিবার উপদেশ প্রদত্ত হইত, এখনকার সভ্যসমাজে দুইটী নূতন পদার্থ জন্মগ্রহণ করিয়াছে যাহার নিকটে বাস করিলে ভদ্রস্থতা নাই এবং যতদূরে বাস করা যায় ততই শান্তি লাভ করা যায়।

এই উভয় পদার্থের প্রথমটী আদালত। দ্বিতীয়টী কলিকাতার সহর। পাঠকগণ এই উভয় বিসদৃশ বস্তুর একত্র সমাবেশ দেখিয়া হয়ত হাস্য করিবেন কিন্তু আমাদের এই দুইটীকে অনর্থের মধ্যে গণ্য করিবার যুক্তি আছে।

প্রথমতঃ আদালত নিকটে থাকাতে নানা প্রকার নূতন উপদ্রব বৃদ্ধি হইয়াছে। পূর্ব্বে লোকের বিবাদ বিসম্বাদ ঘটিলে দেশের দশজনকে ডাকিয়া মীমাংসা করিয়া লইত। এক্ষণে অর্দ্ধ হস্ত ভূমির জন্য লোকে চতুর্দ্দশবার আদালতে ছুটাছুটি আরম্ভ করিয়াছে। এই ছুটাছুটি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় প্রত্যেক গ্রামে একশ্রেণীর নূতন লোক দেখা দিয়াছে। লোকের বিবাদে সাহায্য করা উহাদের কাজ। ঐ সকল অলস পরশ্রীকাতর লোকের হয়ত অন্নের সংস্থান আছে, পরেব কাজ পাইলে ইহাদেব সময়টা একটু সুখে যায়। ইহাদের অনেকে হয়ত দুই দশবার আদালতে যাতায়াত করিযা আদালতের কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা লাভ করি. াছে। কোন্ বিষয়ের জন্য কি ভাবে আবেদন করিতে হয়, কোন্ বিষয়ের জন্য কোথায় আবেদন করিতে হয়, কোন্ বিষয়ের জন্য কত ব্যয় করিতে হয়, এ সকল ইহাদের বিদিত। সুতরাং মূর্খ ও নির্ব্বোধ লোকে অনেক সময় ইহাদিগকে পরামর্শদাতারূপে আশ্রয় করিয়া থাকে। ইহারাও সেই সূত্রে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উপার্জ্জন করিয়া লয়। ইহারা তীর্থের কাকের ন্যায় আদালতের পার্শ্বে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং নির্ব্বোধ লোক দেখিলেই কিঞ্চিৎ লাভ করিবার চেষ্টায় থাকে। মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে, জাল মকদ্দমা প্রস্তুত করিতে, উকীল, সাক্ষী পভৃতির বন্দোবস্ত করিতে ইহারা বড় পটু। ইহারা একজনের পক্ষ হইয়া অপরের সর্ব্বনাশ করে, আবাব সুযোগ পাইলে প্রথম ব্যক্তির সর্ব্বনাশের চেষ্টা পায়। আদালত সকল নিকটবর্ত্তী হওয়াতে লোকের এই সকল ক্লেশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সহর নিকটে থাকাতেও আমাদের নানাপ্রকার ক্লেশ উপস্থিত হইয়াছে। প্রথমতঃ সহরের নিকটে বাস করিয়া আমরা অর্থ থাকিতে ভাল

করিয়া আহার করিতে পাই না। আমাদের ক্ষেত্র সকলে যে কিছু ভাল শস্য জন্মে সে সমুদায় রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে আর এদেশে থাকে না। সমুদায় সহরে গিয়া উপস্থিত হয়। অপকৃষ্ট দ্রব্য সকলই এখানকার বাজারে পড়িয়া থাকে। যাহা থাকে তাহাও দুর্ম্মূল্য হয়। এইরূপে আমাদের অর্থ অধিক যায় অথচ ভাল করিয়া আহার করিতে পারি না।

সহরের নিকটে থাকাতে নানাপ্রকার সামাজিক বিপ্লবও ঘটিয়াছে। সমাজের প্রাচীন শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে যখন গ্রামের মধ্যে দুই চারিজন ধনী ও ক্ষমতাশালী লোক থাকিত এবং অপর সকলে সাক্ষাৎ বা পরম্পরাভাবে তাহাদের অধীন থাকিত তখন সমাজের এক প্রকার শৃঙ্খলা দৃষ্ট হইত, উক্ত ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের দ্বারা অনেক সময়ে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন হইত। এক্ষণে সকলেই স্বাধীনভাবে কিছু কিছু উপার্জ্জন করিয়া থাকে, কেহ কাহারও অধীন বা বশবর্ত্তী নয়। সুতরাং কেহ কাহারও শাসনানুগত নহে। এই কারণে সমাজের অনেক লোক রীতিনীতি সম্বন্ধে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছে। ধর্ম্মশাস্ত্রের যে শাসন ছিল তাহাও ইংরাজী শিক্ষার গুণে ও সহরের বাতাসে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, এখন শাস্ত্র এবং সমাজবিরুদ্ধ পাপ সকল সমাজ মধ্যে অবারিত হইতেছে। নিবারণের উপযুক্ত শাসনশক্তি কাহারও নাই।

সহরে যাঁহারা থাকেন সহরের দোষ ভাগের সঙ্গে সঙ্গে সহরের গুণ ভাগেরও অংশী হইয়া থাকেন। সেখানকার শিক্ষা ও আত্মোন্নতির উৎকৃষ্ট উপায় সকলও তাঁহারা লাভ করেন, কিন্তু আমাদিগের ন্যায় সহরের নিকটে যাঁহাদের বাস তাঁহারা সহরের গুণ ভাগ না পাইয়া দোষ ভাগই অধিক ভোগ করিয়া থাকেন।

সহরের নিকটে থাকায় আর একটী অসুবিধা আছে। যে সকল গ্রাম সহর হইতে অনেক দূরে অবস্থিত সেখানকার শিক্ষিত লোকেরা যখন নয় মাস, ছয় মাস অন্তর এক একবার ঘরে যান তখন কিছু দীর্ঘকাল গৃহে বাস করিয়া থাকেন। সুতরাং দেশের অবস্থার দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি পতিত হয়। দেশের উন্নতি সাধনের জন্য অনেক প্রকার উপায় অবলম্বন করা হয়। কিন্তু সহরের নিকটবর্ত্তী স্থানের অধিকাংশ লোক সমুদায় সপ্তাহ সহরেই বাস করেন, তাঁহাদের নিজের উন্নতি সম্বন্ধে যাহা কিছু প্রয়োজনীয় তাহা সেইখানেই প্রাপ্ত হন। সপ্তাহের মধ্যে যে একদিন গ্রামে আগমন করেন তাহাও বিশ্রাম এবং আমোদ প্রমোদের জন্য। সুতরাং দেশের উন্নতির জন্য তাঁহাদের বিশেষ মনোযোগ দৃষ্ট হয় না। এইজন্য সহরের নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকল সহরের নিকটে থাকিয়াও অনেক সময় দূরবর্ত্তী স্থান অপেক্ষা হীনাবস্থায় পড়িয়া থাকে।

সহরের নিকটে থাকায় আর একটী অসুবিধা আছে। দূরস্থিত জনপদ সকলের লোকদিগের বিলাস বাসনা অল্প। সামান্য আহার, সামান্য পরিচ্ছদে সন্তুষ্ট হইয়া তাহারা সুখে দিন যাপন করে। কিন্তু সহরের নিকটবর্ত্তী স্থানের নিত্য নূতন নূতন বিলাস

সামগ্রী দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে লোকের বায় বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আদালত এবং সহর এই উভয়ের সৃষ্টি হইয়া দেশের কল্যাণ কি অকল্যাণ হইয়াছে, এ প্রশ্নের মীমাংসা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। এ প্রশ্ন অতি জটিল প্রশ্ন, কিন্তু এই দুইটির দ্বারা আমাদের যে যে উপকার দর্শিতেছে তৎ সঙ্গে সঙ্গে যে কতকগুলি অনর্থের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার উল্লেখ করাই এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

কলিকাতায় প্রকাশ্যস্থানে ধর্ম্মপ্রচার। ৩২ জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮

কিয়দ্দিবস হইতে এই আন্দোলন চলিতেছে যে কলিকাতায় পুলিষ কমিশনর খ্রীষ্টমিশনরিদিগকে প্রকাশ্যস্থানে ধর্ম্মপ্রচার করিতে না দিয়া ভাল কাজ করিয়াছেন কি না? আমরা মুঙ্গের রামলীলার সময়ে মিশনরিদিগের যেরূপ বক্তৃতা শুনিয়াছিলাম, তাহাতে আমাদিগের বিবেচনায় কলিকাতার পুলিষ কমিসনর প্রকাশ্যস্থানে ধর্ম্মপ্রচার নিষেধের আদেশ দিয়া ভাল কাজই কবিযাছেন। স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়া আমাদের এই সংস্কার জন্মিয়াছে, মিশনরিদিগের ধর্ম্মপ্রচারকালীন বক্তৃতা কেবল পরধর্ম্ম দ্বেষ ও পরধর্ম্ম শাসকদিগের আরাধ্য দেবতার নিন্দাবাদেই পর্য্যবসিত হয়। প্রকাশ্য স্থানে প্রাতে ও বৈকালে বহুলোকের সমাগম হইয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে কেহ হিন্দু, কেহ মুসলমান, কেহ বা কোন ধর্ম্মের এক সম্প্রদায় ভুক্ত, কেহ বা অন্যসম্প্রদায় ভুক্ত। যাহার যে ধর্ম্মে বিশ্বাস আছে, তাহাব সেই ধর্ম্মেব ও উপাস্য দেবতার নিন্দাবাদ শুনিলে তাহার হৃদয়ে যে অতিশয় আঘাত লাগে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাহাতে নিঃসংশয় তাহার ক্রোধ উদ্দীপ্ত হয়। পরস্পর ধর্ম্মেব আক্রমণ নিবন্ধন সেদিন লাহোরে হিন্দু ও মুসলমানে যে মহাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে তাহা কাহারও অবদিত নাই। তবে যদি কোন ধর্ম্মপ্রচারক তাঁহাব ধ র উৎকর্ষ প্রদর্শনার্থ শ্রোতৃবর্গের সমক্ষে তাহাদের ধর্ম্মের নিন্দা করিয়া আপন ধর্ম্ম বিশদ করিয়া বুঝাইয়া দেন এবং তাঁহার সেই ধর্ম্মের দিকে সাধারণের মন আকৃষ্ট করিবার জন্য তাহার ধর্ম্মের উৎকৃষ্ট উপদেশগুলি বিশদ করিয়া শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেন, তাহাতে ক্ষতি হয় না। কিন্তু সচরাচর আমরা দেখিতে পাই যে অধিকাংশ খ্রীষ্ট মিশনরি তাহা না করিয়া শ্রোতৃবর্গের ধর্ম্মের ও আরাধ্য দেবতার প্রতি গালিধারা বর্ষণ করিয়া সর্ব্বতোভাবে সেই ধর্ম্মের উপর তাঁহার বিদ্বেষের পরিচয় দিয়া থাকেন। তাহার ফল এই ঘটে যে ধর্ম্মপ্রচারকের বক্তৃতায় মনোযোগ দেওয়া দূরে থাকুক, শ্রোতৃগণ বক্তার প্রতি অতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠেন। এমন কি সময়ে সময়ে ধর্ম্ম বিষয়ক বক্তৃতার ফল মারামারি ও দাঙ্গাহাঙ্গামায় পরিণত হয়।

পুলিষের প্রধান কার্য্য সমাজের শান্তিরক্ষা করা। সেই শান্তিরক্ষার্থ তাঁহারা

বিহিত উপায় অবলম্বন করিলে, এবং সেই উপায় নীতিবিরুদ্ধ, অন্যায় ও অসঙ্গত না হইলে তাহার প্রতিবাদ করা অন্যায়। ষ্টেটসম্যান ইহার প্রতিবাদ করিতে গিয়া মিশনারিদিগের স্বত্বের তর্ক উত্থাপন করিয়া মহাভ্রমে পতিত হইয়াছেন। ষ্টেটসম্যান বলেন যে প্রকাশ্য স্থানগুলি মিউনিসিপাল কমিশনরদিগের নিজের সম্পত্তি নহে, কিন্তু তাঁহারা করদাতাদিগের প্রতিনিধি বলিয়া তাহার তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণে তাঁহাদিগের অধিকার আছে। তাঁহারা সাধারণের ট্রষ্টীর ন্যায় এই সকল সম্পত্তির স্বামী। ষ্টেটসম্যানের এই বাক্যে আমরা সর্ব্বতোভাবে অনুমোদন করি।

কিন্তু তাহা হইতে তিনি যে তর্ক পরম্পর উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহা কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না। ষ্টেটসম্যান বলেন যখন প্রকাশ্য স্থানগুলি সাধারণের সম্পত্তি হইল, তখন মিশনরিগণ সাধারণের প্রতিনিধিস্বরূপ তথায় ধর্ম্মপ্রচার করিতে পারিবেন না কেন? আমাদের সহযোগীকে জিজ্ঞাসা করি, খ্রীষ্টান মিশনরিরা খ্রীষ্টান ভিন্ন হিন্দু ও মুসলমান সাধারণের প্রতিনিধি কিরূপে হইলেন? খ্রীষ্ট হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের উপর অজস্র গালি বর্ষণ করেন, তাঁহাদের হৃদয়ে বেদনা দেন বলিয়া কি তাঁহাদের প্রতিনিধি? যিনি এইরূপ কার্য্য করিবেন, তিনিই প্রতিনিধি, এই কি প্রতিনিধি শব্দের অর্থ? এতদ্ভিন্ন ষ্টেটসম্যান প্রকাশ্যস্থান সমূহে মিশনরিদিগের বক্তৃতা কবিবার স্বত্বাধিকারের কথা লইয়া অনেক বাগজাল বিস্তার করিয়াছেন। আমবা জিজ্ঞাসা করি, সে স্বত্বটী কি? হিন্দু ও মুসলমান ও অন্যান্য ধর্ম্মাবম্বীর ধর্ম্মের নিন্দা করাই কি সেই স্বত্ব? ববাবর যদি একটী নিন্দিত কার্য্য করিলেও তাহাতে স্বত্ব জন্মে, তাহা হইলে চোরও ত বলিতে পারে সে বরাবর পুরুষানুক্রমে চুরি করিয়া আসিতেছে, অতএব চুরি কার্য্যে তাহারও স্বত্ব জন্মিয়াছে। আমরা কোনদেশে কোন আদালতে, কোন আইনের গ্রন্থে এপ্রকার স্বত্বের কথা শুনিও নাই, দেখিও নাই।

পরধর্ম্মের নিন্দা করিলে পেনাল কোডেব ২৯৮ ধারায় তাহার দণ্ডের বিধি আছে বটে, কিন্তু আদালতের ব্যয় ও কষ্ট সহ্য করিবার ভয়ে কেহই আদালতের আশ্রয় গ্রহণে অগ্রসর হয় না। এই সকল কারণে আমাদের এই ব্যবস্থা বিধান কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইতেছে যে, কি খ্রীষ্ট মিশনরি কি ব্রাহ্ম মিশনরি, কি হিন্দু ও কি মুসলমান ধর্ম্মপ্রচারক কেহই পরধর্ম্ম দ্বেষ ও নিন্দাপূর্ণ ধর্ম্মপ্রচারার্থ প্রকাশ্য স্থানে স্থানপ্রাপ্ত না হন।

যাঁহারা বিলাতে যান, তাঁহাদের হইতে দেশের লাভ কি? ২১ আষাঢ় ১২৮৮

এই বহুলোকগর্ভ ভারতবর্ষে অনেক সম্প্রদায়ের লোক বাস করে। কাজেই পরস্পরের সহানুভূতি নাই বলিলেই চলে। কোথা হইতে সহানুভূতি থাকিবে? যেখানে

এক সাম্প্রদায়িক লোকে অন্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধাচারী ও বিরুদ্ধমতাবলম্বী, সেখানে ঘৃণা বিনা মমতার উদ্রেক হয় না। ধর্ম্ম সম্বন্ধে মত বিশ্বাসে বল, সমাজিকতায় বল, আচার ব্যবহারে বল, সকলি বিভিন্ন। এ সমস্ত বিভিন্ন হইলে মতের একতা থাকে না; মতের একতা না থাকিলে পরস্পর পরস্পরের নিন্দাবাদ করিয়া থাকে। সুতরাং মনে মনে বৈরভাবের সঞ্চার হয়। তুমি পরম বৈষ্ণব, হরিনামের অলকায় সর্ব্বাঙ্গ অলঙ্কৃত করিয়া জপমালা ও ঝুলি লইয়া হরিনাম করিতেছ, আমি শক্তি, পাঁচ পাত্র সামগ্রী করিয়াছি, তোমাকে দেখিয়া বলিলাম কি বাবাজি! কুঁড়োজালি নিয়ে কি হচ্ছে? তুমি ক্রোধান্ধ হইয়া উঠিলে। আমি শিষ্টাচারী ও ভদ্র হইলেও তোমাকে একটুকু ব্যঙ্গ করিতে ইচ্ছা করে, কেননা তুমি আমার পথের পথিক নও।

আবার আমি তোমাকে যদি কিছু নাও বলি, তবে অনেকস্থলে আমার সঙ্গে তুমি লোকলৌকতা ও আত্মীয়তা করিতে পারিবে না। আমার বাটীতে সমারোহে দুর্গোৎসব হইবে, আমি তোমাকে আদর করিয়া নিমন্ত্রণ করিলাম। তুমি বৈষ্ণব, কাটাকে বিনানো বল, আমার নিমন্ত্রণ তুমি রক্ষা করিতে পারিবে না। আমার গৃহে অধিষ্ঠান করিলে বলিদান দেখিতে হইবে, ছাগরক্ত সম্মুখে পড়িবে। কাজেই আমার বাটীতে তোমার আসা হইল না। লোকের সঙ্গে ব্যবহার দর্পণে মুখ দেখা; আমার বাটীতে আসিলে না তোমার বাটীতে আমি যাইব কেন? অতএব তোমাতে আমাতে বন্ধুতা থাকিল না।

আমার ও তোমার মত ও বিশ্বাস হয়ত এক, কিন্তু তুমি ভারি কুলীন আমি বংশজ। তোমার সন্তানের সঙ্গে আমার কন্যার বিবাহ দিয়া পাকা রকম কুটুম্বিতা আঁটিব, সে পথ রহিল না। হয় তো এই বৈবাহিক সম্বন্ধে আমাদের উভয়ের নিতান্ত আগ্রহ জন্মিল, কিন্তু সমাজের ভয়ে কিছুই করিতে পারিলাম না। এইরূপ জাতিভেদ মতভেদ প্রভৃতি নানা কারণে সমাজ মধ্যে আমরা অনেক কাজ করিতে পারি না, সে জন্য সময়ে সময়ে সমাজের ে ার অনিষ্ট হয়, সেই জন্যই এই অসীম ভারতবর্ষ এত হীনবল, নচেৎ কোন্ দেশ ইহার সমকক্ষ হইতে পারে? ভারতবর্ষে সুশিক্ষা ও সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মত ও সাম্প্রদায়িক ভেদ তিরোহিত না হইলে দেশের যথার্থ উন্নতির প্রত্যাশা করা বৃথা। পশ্চিমাঞ্চল ও দাক্ষিণাত্যে হিন্দুমুসলমানে কতবার হুলুস্থুল ব্যাপার ঘটিয়া গেল। সেগুলি তো এখনকার সময়োচিত কাজ হয় নাই। ধর্ম্মান্ধতার দিন চলিয়া গিয়াছে। হিন্দু মুসলমানের সজীব দেবতারা অনেক বলি খাইয়াছেন, আর কেন? এখন অন্য কোন নৈবেদ্যের আহরণ কর। যাহাতে দেশের মুখশ্রী উজ্জ্বল হয়, তাহার চেষ্টা দেখ।

জাতিভেদ দুদিনে ঘুচিবার নয়-কিন্তু পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্য একদণ্ডে বর্দ্ধিত হইতে পারে। অতএব হিন্দু মুসলমানের পরস্পর বিদ্বেষ ভাবনা থাকিলে তদ্বিষয়ে সকলের যত্নবান হওয়া উচিত।

অজ্ঞলোকের সম্প্রদায়ে সুনিয়ম প্রচলিত করা সহজ কাজ নহে, তাহাতে অনেকটুকু ক্লেশ পাইতে হয়। কিন্তু অজ্ঞ লোকের কথা বলিব কি! কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগেরও মনের গতি প্রভৃতি দেখিয়া আমরা অবাক হইতেছি। বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত যাঁহারা বিলাতে যান, স্বদেশে প্রত্যাগত হইলে তাঁহাদের কেবল সাবেক বর্ণটুকু থাকে, আর আর সকলি এক রাত্রির মধ্যে বদলিয়া যায়। বিলাতে পৌছিতে বিলম্ব সয় না। জাহাজে পা দিলেই খানা পরণা ফিরিল। বিলাতে উপস্থিত হইলে আর উপায় কি? ভাল, যেখানে যেমন সেখানে তেমন। পরে স্বদেশে ফিরিয়া আসিলে আর যেন মানুষ নয়। রোমান অক্ষরে তখন চাল চলন হইতে থাকে। ভাষা বাঙ্গালা, কিন্তু রোমান বর্ণে লিখিত, ভিতরে বাঙ্গালী কিন্তু ইংরাজি কেতাস্তে সমাজে পরিচিত। এঁরা দেশীয় লোকের ভারি শত্রু। খাঁটী সাহেবেরাও বরং ভারতবর্ষবাসিদিগকে স্নেহ মমতা করেন, কিন্তু ইহাঁদের হৃদয়ে দয়ার লেশ মাত্রও নাই। যাঁহাদের মানুষ, যাঁহাদের সঙ্গে থাকিয়া এত বড হইলেন, দুদিন বিলাতে যাইয়া তাঁহাদিগকে নিগার্ড বলেন। যৌবন কালের শোণিতের উষ্ণতাই উহার কারণ। বিলাতে বিদ্যাশিক্ষা করিতে যাওয়া নিন্দনীয় নহে, কিন্তু ইহার আনুষঙ্গিক দোষগুলিকে মার্জ্জনা করা যায় না। কৃতবিদ্য ব্যক্তিদের দ্বারা কোথা দেশের অবস্থা ফিরিবে, না তাঁহারা সমাজের দারুণ শত্রু হইতে লাগিলেন। সে দিন দাক্ষিণাত্যে জনৈক বিলাত ফেরত যুবক আপনার পত্নীকে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। চারুশীলা কুলবধুর অপরাধ কি? তিনি স্বামীর সঙ্গে গো মাংস ও শূকর মাংস খাইতে অনিচ্ছুক। এ অপরাধ সভ্য পুরুষের গায়ে সহ্য হয় নাই। আমরা বলি উচ্চতর বিদ্যাশিক্ষার পরিণাম ফল যদি এইখানে আসিয়া দাঁড়ায়, তবে তেমন বিদ্যাশিক্ষাকে দূর হইতে নমস্কার করিয়া এই অজ্ঞতাপূর্ণ ভারতগর্ভেই তাঁহারা থাকুন, আর উন্নতির কাজ নাই। ইহাতে কেবল বিলাত ফেরত যুবকদিগকে দোষী করিতে পারি না। আমাদেরও সমাজের প্রচুর নিষ্ঠুরতা আছে। সাহেব বাবুরা আসিয়া হ্যাম মটন্ চামচে কাঁটা লইয়া বসিয়া গেলেন, সমাজের প্রতি ঔদাসীন্য, বিরাগ, ভারতবর্ষকে জন্মস্থান বলিতে আন্তরিক ঘৃণা, হিন্দুদের কাহাকেও চান না, সব কুসঙ্গ। আবার হিন্দুদের সমাজও তেমনি—বিলাত গিয়াছিলেন, কত অখাদ্য সামগ্রী পেটে গিয়াছে, হাতের জল অস্পৃশ্য, প্রায়শ্চিত্ত কর, তবে স্থান পাইবে। কেহ প্রায়শ্চিত্ত করেন না, কাজেই হিন্দুসমাজের আচার ব্যবহার তাঁহারা মানেন না, কাজে কাজেই সমাজে স্থান পান না। ইহাতে হিন্দুসমাজ দিন দিন অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। সুযোগ্য পাত্রগুলি ক্রমে ক্রমে যখন সমাজের বহির্ভূত হইতে চলিলেন, তখন মঙ্গলের আশা কোথা? শীঘ্র ইহার প্রতিবিধান যদি না করা হয়, তবে কেহ যেন সন্তানদিগকে বিলাত পাঠাইবার প্রস্তাব না করেন। কোন বিষয়ে দুইজন মানুষ একরকমের পাইবে না। চির প্রসিদ্ধ একটা কথা ছিল—"আপরুচি খানা পররুচি পিঁধনা"। কালে সকল কাজেরই উল্টা

ব্যবহার হইতেছে, এ প্রবাদবাক্যও উলটিয়া গিয়াছে। এখন, আপরুচি পিঁধনা পররুচি খানা। মুখে ভাল লাগে না, তবু সাহেব খায় বলিয়া মুখ বিকট করিয়া রোষ্ট টোষ্ট মাংসগুলা রাক্ষসের মত হাঁস ফাঁস করিয়া গিলিতে হইবে। এ পররুচি খানা নয়ত কি বলিব? পোষাকেও দেখ, পাঁচ জনের চক্ষে যাহা ভাল লাগে তাহা তেমন কাপড় পরা হইবে না। নিজের একটা পছন্দ মত বানাইয়া লইতে হইবে। কাহারও কোটের গলায় গলাসী, জুব্বার পুটে ঝালর; এক শত জন বাঙ্গালীকে কোন স্থানে রাখিয়া দেখ দুইজনের বসন ভূষণ একরকম পাইবে না। পরিচ্ছদ দেখিয়া অন্য জাতিকে চিনিতে পারা যায়, কিন্তু বাঙ্গালীকে চিনিবার যো নাই। ভিন্ন মত ভিন্ন রুচি ভিন্ন প্রবৃত্তিই এই সমস্ত বিভিন্নতার কারণ।

যাঁহারা সমাজসংস্কারক, দেশের উন্নতিসাধনে তৎপর, এই সকল ক্ষুদ্র বিষয় হইতে একতা বন্ধনের চেষ্টা করুন। ক্ষুদ্র বিষয় উপেক্ষা করিয়া এককালে বৃহৎব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা বিড়ম্বনা মাত্র।

ব্রাহ্মসাধারণের প্রতি বিনীত নিবেদন। ১৮ শ্রাবণ ১২৮৮

ভ্রাতৃগণ! আমাদের সাদর সম্ভাষণ গ্রহণ করুন। দয়াময় ঈশ্বরকে অন্তরের ধন্যবাদ যে তিনি পাপীর পরিত্রাণের জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম জগতে প্রেরণ করিয়াছেন। এই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আমরা যে কত উপকৃত হইয়াছি, তাহা বাক্যে প্রকাশ অসম্ভব। ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আমরা প্রকৃত মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং ব্রাহ্মসমাজ আমাদিগের হৃদয়ের প্রিয়তম পদার্থ। ব্রাহ্মসমাজের পবিত্রতা রক্ষা ও শত্রু হস্ত হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মকে রক্ষা করা প্রত্যেক ব্রাহ্মের কর্ত্তব্য। নতুবা ভয়ানক কৃতঘ্নতা ও হৃদয়হীনতা অপরাধে আমাদিগকে অভিযুক্ত হইতে হইবে।

সকলেই অবগত আছেন বাবু কেশবচন্দ্র সেন কয়েকমাস হইতে "নববিধান" নামে একটী নূতন অদ্ভুত ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। এই ধর্ম্মে নানাপ্রকার দূষিত ও ঘৃণিত মত প্রচারিত হইতেছে। এমন কি ঘোর পৌত্তলিকতাকেও নববিধানীগণ বিন্দুমাত্র অন্যায় মনে করিতেছেন না। বলিতে লজ্জায় মস্তক অবনত হয়, দুঃখে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, যে মন্দির কেবলমাত্র পরব্রহ্মের পূজার ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, বিধানীগণ সেই মন্দিরে নিশানের ও ধর্ম্মগ্রন্থের পূজা করিলেন। আবার সেই দিন বিধানাধিপতি সশিষ্য হোম করিয়াছেন ও কোমল সরোবরে খ্রীষ্টের নামে বাপ্তাইজিত (Baptised) হইয়াছেন। ধর্ম্মতত্ত্ব, নববিধান, রবিবাসরীয় মিরার ও বঙ্গবন্ধু প্রভৃতি পত্র যাঁহারা পাঠ করেন, তাঁহারা জানেন যে ব্রাহ্মসমাজ হইতে কেশববাবু ও তাঁহার শিষ্যগণ কত নীচে পড়িয়া গিয়াছেন। এ সকল দেখিয়া কে না বলিবে যে

নববিধান ব্রাহ্মধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরোধী এবং নববিধান জগতে অন্যান্য ভয়ানক কুসংস্কার-পূর্ণ উপধর্ম্মের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছে। কেশববাবু ও তাঁহার শিষ্যগণ যদি সাধারণভাবে স্বীকার করিতেন যে তাঁহারা আর ব্রাহ্ম নহেন এবং সমাজের সহিত তাঁহাদিগের কোন সহানুভূতি নাই তাহা হইলে আমরা এ বিষয়ে কোন কথাই উত্থাপিত করিতাম না। কিন্তু তাঁহারা নিলর্জ্জভাবে নববিধান ধর্ম্মকে ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্ম্মকে শত্রু হস্ত হইতে রক্ষাকারি বলিতেছেন। আমাদিগের মস্তকে একটী গুরুতর কর্ত্তব্য রহিয়াছে। আসুন প্রত্যেক ব্রাহ্ম ব্রাহ্মসমাজে সমবেত হইয়া জগৎ সমক্ষে ইহা জানাই যে "নববিধান" ব্রাহ্মধর্ম্ম নহে, ইহা ব্রাহ্মধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরোধী, এই উপধর্ম্মের সহিত আমাদিগের বিন্দুমাত্রও সহানুভূতি নাই। এবং যদি কোন মফস্বলস্থ সমাজ অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া নববিধানকে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন অথবা গ্রহণ করেন তবে তাঁহাদিগের সহিত ব্রাহ্মসমাজের কোন সহানুভূতি থাকিবে না। যে ব্রাহ্মই যে স্থানে থাকুন তাঁহার কর্ত্তব্য যে সেই স্থান হইতে তিনি কোন প্রকাশ্য পত্রে সাধারণের নিকট ইহা জানান যে নববিধান ব্রাহ্মধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরোধী।

শ্রীহট্ট
১০ই জুলাই ১৮৮১

নিবেদক
শ্রীচন্দ্রকুমার ঘোষ।
" ব্রজেন্দ্রনাথ সেন।
" কৃষ্ণকিশোর মজুমদার।
" প্রসন্নকুমার চৌধুরী।
" অভয়াচরণ বিশ্বাস।
" কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
" রাধানাথ চৌধুরী।
" রাজচন্দ্র চৌধুরী।
শ্রীহট্ট প্রার্থনা সমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যগণ।

অধিকাংশ বিদ্যাভিমানী প্রবাসী বঙ্গীয় যুবকের চরিত্র। ৪ মাঘ ১২৮৮

শারীরিক বৃত্তির সহিত মানসিক বৃত্তির অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে যে, একে বিকার প্রাপ্ত হইলে অন্যেও বিকারপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। শরীর যদি অসুস্থ হয়, তবে মনের সুস্থতা থাকে না; আবার মনের অসুস্থতায় শরীরেও স্ফূর্ত্তি বা উন্নতি হয় না। উভয়ে সুদৃঢ় প্রণয় শৃঙ্খলে আবদ্ধ। কিন্তু এতদুভয়ের মধ্যে বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, শারীরিক

বৃত্তিই মূল স্বরূপ। ইহারই উৎকর্ষাপকর্ষ নিবন্ধন মানসিক বৃত্তির উন্নতি বা অবনতি হইয়া থাকে। যদি এইরূপই হয়, তবে এস্থলে একথা অনায়াসে জিজ্ঞাসা করিতে পারা যায়, আমাদের অধিকাংশ বঙ্গীয় যুবকদের মানসিক বল কিরূপ? সাধারণতঃ মন সবল কি দুর্ব্বল?

মন সবল কি দুর্ব্বল, একথা জানিতে অধিক দূর যাইবার আবশ্যকতা নাই। আপন আপন শরীরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই এ প্রশ্নের উত্তর প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। অনেকেই মুখে শক্ত; কিন্তু বলে তালপত্রের সিপাহী, অল্প শ্রমেই বিশেষরূপ ক্লান্ত হইয়া পড়েন। বাঙ্গালী সাধারণতঃ দুর্ব্বল বলিয়া জগতে কেবলমাত্র পরিচিত নহে, বিশেষরূপ ঘৃণিত। যাহাদের শরীর দুর্ব্বল, হৃদয় দুর্ব্বল, তাহাদের মনও যে দুর্ব্বল, তাহাতে সন্দেহ নাই। দুই এক জনের মানসিকবৃত্তি বিলক্ষণরূপ সবল বলিয়া সকলের মন যে সবল, একথাও বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। যিনি যতই কেন শিক্ষিত হউন না, যতই কেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী লাভ করিয়া পণ্ডিতম্মন্য বলিয়া পরিচয় দিন না, সত্য কথা বলিতে কি অনেকেরই মন বড দুর্ব্বল, তাহার কিছুমাত্র দৃঢ়তা নাই। আজিও অনেকে মনের বন্ধন কিরূপ, তাহা শিখিতে ও জানিতে পারেন নাই।

যাহাদের মনের স্থিরতা, দৃঢ়তা বা বন্ধন নাই, যাহাদের মন অন্তঃসারশূন্য কিংশুক ফলের ন্যায়, সামান্য কারণরূপ উত্তাপে ফট্ করিয়া কেবল কতকগুলি তুলাসম লঘুকার্য্য করিয়া চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হইয়া সমাজের পবিত্র দেহকে মলিন করিয়া থাকে, তাহাদের হৃদয়ে ধর্ম্মের ভাব কিরূপ স্থায়ী ও প্রবল, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। সেই হৃদয়ে ধর্ম্ম বিশাল তরঙ্গান্দোলিত অনন্ত সমুদ্রে অর্ণবযানের তুল্য। এই আছে এই নাই। একবার ডুবিয়া ডুবিয়া চলিতেছে! সেই জন্য আমাদের সমাজও ডুবিয়া ডুবিয়া চলিতেছে। বালক বৃদ্ধের কথায় আবশ্যকতা নাই, যাঁহারা পণ্ডিতাভিমানী যুবক, যাঁহাদের দ্বারা সমাজের উন্নতি সাধিত হইবার সম্ভাবনা, তাঁহাদের দোদুল্যমান মগ্নপ্রায় ধর্ম্মাশ্রিত মনের গতিকেই যখন সংশয়াপন্ন তখন সমাজের অবস্থাও সেইরূপ শোচনীয় কেননা হইবে? যে সমাজে ধর্ম্মবন্ধন শিথিল, সে সমাজের উন্নতি কোথায়?

চরিত্রই মানসিক আধ্যাত্মিক বলের ন্যায় পরিজ্ঞাপক। যাঁহার চরিত্র যত উন্নত, তাঁহার মনও তদ্রূপ উচ্চ, বলবান্। যাঁহারা বিদ্যাভিমানী হইয়া বিদেশে থাকিয়া ২০।২৫ টাকা বেতনে রেলওয়ের খালাসী বা নিরাশ্রয় পথিকদিগের অথবা পোষ্ট অফিসের পিয়নদিগের উপর বনগ্রামের অবুক রাজার মত বিলক্ষণ আধিপত্য প্রদর্শন দ্বারা অনবরত ঘণ্টা নাড়িয়া আত্মশ্লাঘা প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মন কিরূপ উন্নত, উচ্চভিলাষসম্পন্ন, তাহা চরিত্রেই প্রকাশিত হইতেছে। এই জন্য মনে বড় ইচ্ছা হইতেছে, একবার চক্ষুর

লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের চরিত্র সাধারণ সমক্ষে প্রকাশ করি। এক্ষণে সোমপ্রকাশ আশ্রয় ও সাহসদান করিলে অনুগৃহীত হইব। তাঁহারা যখন গৃহে থাকেন, তখন যেন গৃহ-পালিত মার্জ্জারের ন্যায় শান্তস্বভাবসম্পন্ন। গুরুজন দেখিলে মান্য করেন, আন্তরিক না হইলেও সমাজের অনুশাসনে দেবভক্তি প্রদর্শন করেন, ধাম্মিকাগ্রগণ্য হইয়া সকল কার্য্য করিতে থাকেন, ভয়ে ভয়ে থাকিয়া নিরাশ্রয় ধর্ম্মকে (!) কোনো গোলযোগে ফেলেন না। পরে যখন কর্ম্মস্থানে আসিবার জন্য ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির (অন্য কোন কোম্পানির বা দিকের কথা বলিবাব আবশ্যকতা নাই।) টিকিট ক্রয় করিয়া গাডীতে আরোহণ করেন, অমনি স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইতে থাকে। বর্দ্ধমানে আসিয়াই অমনি গ্রাম্যস্বভাবের পরিবর্ত্তন হইয়া বন্যস্বভাব প্রাপ্ত হন, বনমার্জ্জার হইয়া বসেন। তখন হিন্দুব জলে পিপাসা শান্তি হয় না। হিন্দুব খাদ্য গ্রহণে রসনা অনুমতি দেয় না। মুসলমানের জলগ্রহণ বা বিস্কুট ভক্ষণ বিনা তৃপ্তিলাভ হয় না। সমাজের ভয় তখন চলিয়া যায়। কর্ম্মস্থলে আসিয়া উন্নতজীব হইয়া পডেন। সকলেরই সহিত একত্র ভোজন করিয়া উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কবিবেন না কেন? ইংবাজী পডিয়াছেন, সুসভ্য হইয়াছেন; সুসভ্য অবস্থায় নিজ হস্তে রন্ধন করিতে অক্ষম। অথচ অল্প বেতন। সে বেতনে উত্তম সংবর্ণজাত পাচক বাখিবাব ক্ষমতা নাই। কাজে কাজেই রিফর্ম্মার হইয়া সকলের রন্ধন ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য মনে হয়।

এই সময় ক্ষৌরকারকে বঞ্চনা করিবার জন্য শ্মশ্রু রাখা হয়। পৈতা ভাল মিলে না বলিয়া পৈতা ফেলিয়া দিয়া ধর্ম্মান্তব গ্রহণ কবা হয়। লোকসমাজে পরিচিত হইবার জন্য সংস্কারকবেশে অবতীর্ণ হইয়া বাহ্বাস্ফোটনপূর্ব্বক অনবরত খৈ ফুটার ন্যায় ধর্ম্মবক্তৃতা করা হয়, সংবাদপত্রে লেখা হয় স্বধর্ম্মকে নিন্দা কবিয়া উন্নতিব সর্ব্বোচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে চেষ্টা করা হয়। অথবা একেবারে উচ্চে উঠিয়া নাস্তিক হইয়া পডেন। ইহার অপেক্ষা উন্নতির আর কি আছে? ইহাই উন্নতির চবম সীমা!

আবার বাটী আসিবার সময় অন্য ভাব! শ্মশ্রু ফেলিয়া দেওয়া ও উপবীত গ্রহণ করা হয়। বাটী গিয়া অচলা ভক্তিসহকারে পুর্ব্বে যাহাদিগকে পৌত্তলিক বলিয়া নিন্দা করা হইত, যে হিন্দুদেবদেবীকে কেবল খড দডির সমষ্টি ভাবা হইত, সেই পৌত্তলিকদিগের সহিত মিলিত হইয়া আনন্দে সেই খডদডিবিশিষ্ট প্রতিমাকে এক ব্রহ্মজ্ঞানে পুজা করা হয় ইত্যাদি। আমাদের এ কথায় অনেক মহাপ্রভু ক্রুদ্ধ হইবেন সন্দেহ নাই, কিন্তু সে ভয় পরিত্যাগ করিয়া জিজ্ঞাসা করি, অল্পজলের শফরী বলিয়াই কি এরূপ করা হয়? না অন্য কারণ আছে? বোধ হয় গভীর জলের রোহিত হইলে এরূপে সমাজকে প্রতারিত করিবার ইচ্ছা কদাচিত হইত না।

তাই বলি যাঁহাদের চরিত্র এইরূপ, যাঁহারা অব্যবস্থিতচিত্ত, তাঁহারা কি মানসিক বলে উন্নত? কখনই নয়। তাঁহাদের শরীরও দুর্ব্বল, মনও দুর্ব্বল। এই দুর্ব্বলমনা

ব্যক্তিদিগের দ্বারা কি কখন সমাজের উন্নতি হইতে পারে? এই সকল ব্যক্তি ভ্রমজালে আচ্ছন্ন, আর যাঁহারা এই সকল ব্যক্তি হইতে সমাজের উন্নতির আশা করেন, তাঁহারাও ভ্রান্ত। তাঁহারা বহুরূপী, তাঁহাদিগের উঠা বড়ই কঠিন।

তাং ২০শে পৌষ ৮৮। শ্রীলঃ—

সম্পাদকীয়। ৬ আষাঢ় ১২৮৯। ৩১ সংখ্যা

হিন্দুস্থানীরা বাঙ্গালাদেশে ও উড়িষ্যায় আসিয়া যেরূপ অর্থ উপার্জ্জন করে, কটকের এক ব্যক্তি তাহার একটী কৌতুককর বৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। নিম্নে তাহা মুদ্রিত হইল। পাঠক দেখুন, একজন নিজ পরিশ্রমে ও চতুরতাবলে কেমন সঙ্গতিশালী ও অপর ব্যক্তি নিজ আলস্য ও বুদ্ধিদোষে কেমন উৎসন্ন যাইতেছে। এটী অনেকের শিক্ষাস্থল হইবে সন্দেহ নাই।

"ভোজপুরিয়া ও জয়পুরিয়া প্রভৃতি স্বদেশ হইতে আসিয়া কোন আত্মীয় স্বজনের নিকট হইতে প্রথমতঃ এক মণের এক গাঠরি কাপড় স্কন্ধে এবং এক বাণ্ডিল ছাতি বগলে লইয়া দ্বারে দ্বারে কিছুদিন বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। পরে সামান্যতঃ একখানি দোকান খুলিয়া সরকারি আমলা, কেরাণী ও কিছু সঙ্গতিপন্ন লোক দেখিয়া এক টাকা মূল্যের দ্রব্য দেড় টাকা মূল্যে ধার দিয়া কারবার আরম্ভ করে। গ্রহীতা কিছু জড়াইয়া পড়িয়া আদায়ে অক্ষম হইলে তখন টাকায় আধআনা ও কোন কোন স্থলে এক আনা হারে সুদ ধরিয়া খত লিখিয়া লয়। খতের মিয়াদ গত হইতে না হইতে নালিশ করিয়া বসে। অভিযুক্ত ব্যক্তির অবস্থা যদি সচ্ছল থাকে, নালিশের পর সে টাকা শোধ দিয়া দায়ে মুক্ত হয়, আর সে ব্যক্তি শোধ দিতে না পারে, তাহার উপর ডিক্রী করিয়া, সে চাকুরে হইলে মাহিয়ানা ক্রোক করে, না হয় কিছু বিষয়াদি বা ভদ্রাসন থাকিলে, তাহা ক্রোকে নিলাম করিয়া কিম্বা ওয়ারেণ্ট গ্রেপ্তার করিয়া যে কোন প্রকারে হউক, কড়ায় গণ্ডায় আদায় করিয়া লয়।

"এই প্রকারে কারবার বদ্ধমূল ও অর্থ জমিয়া উঠিলে তাহার পর রাজারাজড়া ও বড় বড় জমিদার দেখিয়া সুদি কারবার আরম্ভ করে। রাজারাজড়া ও জমিদারদিগের আমলাগণ ঐ সব ব্যবসায়ির প্রায়ই গোয়েন্দা স্বরূপ হইয়া থাকে। অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি বশতঃ প্রভুর রাজ্যে বা তালুকে অজন্মা হইল, রাজস্বের টাকা অপ্রতুল পড়িল। পাঁচ হাজার টাকার প্রয়োজন হইল, আমলারা বলিল, অমুক মহাজনের নিকট হইতে টাকা লওয়া হউক, পূর্ব্বে যাহার নিকট হইতে দশ হাজার টাকা আনা হইয়াছে, তাহার জন্য সে সর্ব্বদা খিট খিট করিতেছে, আবার তাহার নিকট গেলে সে গরজ বুঝিয়া সুদ ও মিয়াইখিয়া (কটকাঞ্চলে মিয়াইখিয়া একটী নূতন কথা) বিষয়ে চাপিয়া ধরিবে, অমুক

লোক আজকাল অনেককে দিতেছে, এবং শুনিয়াছি লোকও বড় ভাল, আমরা যেখানে হউক টাকা লইব সুদ দিব তার কি? বলেন ত উহাকে এখানে ডাকিয়া আনি। প্রভু উত্তর দিতেন, তাই ভাল সন্ধ্যাতে স্থির করা যাইবে। আমলাদিগের যোগে এইরূপ পুরাতন মহাজনকে পরিত্যাগ করিয়া নূতন মহাজনকে ডাকা হইল।

"মহাজন বাটীতে আসিলেন, ঋণগ্রহীতা পাঁচ হাজার টাকা কর্জ্জ লইবার প্রস্তাব করিয়া সুদ প্রভৃতির বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাজনও দিবার মানসেই আসিয়াছে, সে কথা শুনিয়া বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিল "হজুরকা যেত্তা দরকার লিজিয়ে, আপকা যেইসা হুকুম হোগা, বন্দা হাজির হেয়, হুজুর রাজ, জমিদারবন্দা পরদেশী মেহরবানি হোনসে বন্দা পরবস্থী হোগা, হজুরকো তো সব মালুমহে, ব্যাজ (সুদ) শত্তমে দো দো রুপেয়া ঔর মিথাইয়া হাজারে মে কোহি সত্ত ভি দে আচ্ছা, কোহি পচাসভি দে আচ্ছা, ইসমে হজুরকা যেইসা মরজি ওই হোগা, উসমে হরজ ক্যাহে। লেকিন বন্দাসে কুছ কপড়া ভি তো লেনা চাইয়ে, আচ্ছা আচ্ছা বড়িয়া বনারসি পোষাক, টৌপি ঔর চিজ বন্দা মঙ্গায়াহে, হজুর লোগ নহি লেনে সে ঔর কোন লেগা" এই প্রকারে মহাজন তোষামোদ করিল, অনেকে তোষামোদের প্রিয় না হইয়াও কি করেন দায়গ্রস্ত, বিশেষতঃ এ নূতন বলিয়া (টোপ মিলাইবার জন্য) হাজারকরা ৫০ টাকা মিয়াইখিয়া লইতে সম্মত হইতেছে, দেখিয়া স্বীকার করিলেন।

"পাঁচ হাজার টাকার আবশ্যকতা স্থলে সাড়ে ছয় হাজার টাকার খত লেখা হইল, তন্মধ্যে নগদ পাঁচ হাজার টাকা ও পাঁচশত টাকা মুল্যের বারাণসী কাপড় প্রভৃতিতে আটশত টাকা দেওয়া হইল, বাকি সাত শত টাকার মধ্যে মহাজনের মিয়াইখিয়া হাজারে ৫০ টাকা হিসাবে ২৫০ শত টাকা নিয়া অবশিষ্ট ৪৫০ টাকা খতের ইষ্টাম্প প্রভৃতি খরচা। ইত্যাদি।"

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে ও দেশীয় যাত্রী। ১৭ই আশ্বিন ১২৮৯। ৪৮ সংখ্যা

আজকাল সিমলা পাহাড়ে একটী অধিবেশন হইতেছে। ঐ সভায় রেলওয়ের অনেকগুলি কর্তৃপক্ষ উপস্থিত থাকিয়া কোন কোন বিষয়ে কি উপায় অবলম্বন করিলে রেল সম্বন্ধীয় কার্য্যের সুশৃঙ্খলা সাধিত হইতে পারিবে তাহা স্থির করিতেছেন। এতদ্দেশীয় যাবতীয় যাত্রিগণের সুখ স্বচ্ছন্দতা পরিবর্দ্ধন করাই তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য। তৃতীয় শ্রেণীর দেশীয় যাত্রিগণ রেলওয়ে কোম্পানির প্রধান আয়ের স্থান; সুতরাং ইঁহারা যাহাতে সুখে স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করিতে পারেন, তাদৃশ সদুপায় উদ্ভাবন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। গবর্ণমেণ্ট ও রেলওয়ে কোম্পানি এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনার্থ বিশেষ উদ্যোগী হইয়া আছেন, তাহা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু নিম্নশ্রেণীস্থ কর্ম্মচারিদিগের গর্ব্বে, দম্ভে এবং অবিচারে

উপরিতন অধ্যক্ষগণের উদ্দেশ্য ফলবান্ হইতে পায় না। তাঁহারা দরিদ্রলোকের প্রতি ঘোরতর অত্যাচার করিয়া থাকেন। নিম্ন শ্রেণীস্থ যাত্রিগণের যে যে বিষয়ে অত্যাচার হইয়া থাকে, সম্প্রতি তৎসম্বন্ধে আমরা গুটিকতক কথা বলিতেছি। আমাদের উল্লিখিত কষ্টগুলি কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা যদ্যপি মোচন করিতে পারেন তবে সাধারণের সম্পূর্ণ উপকার হইবে।

প্রথম, টিকিট লইবার কষ্ট। এই দারুণ কষ্টটী প্রায় বড বড ষ্টেশনেই ঘটিয়া থাকে। হাবড়া, এলাহাবাদ, কাণপুর প্রভৃতি ষ্টেশনে যাও দেখিবে—টিকিট লইবার যন্ত্রণা, শ্মশানশায়িত শবের সঙ্গে যেন তুল্যতা বিধান করিতেছে, ষ্টেশনে একেবারে ছেঁড়াছিঁড়ি কাণ্ড পডিয়া গিয়াছে। যমদ্বারের ন্যায টিকিট ঘবের ক্ষুদ্র দ্বারে সর্ব্বাগ্রে যাইবার নিমিত্ত সকলেই ব্যস্ত, মানুষের হুডাহুডি, পায়ের হুডাহুডি, তাহার উপর জুয়াচোর ও পুলিষের তাডাতাডি। থানার পুলিষ আর বেলওয়ের পুলিষ বিধাতার সৃষ্টির একই পদার্থ, গ্রাম্য বিডাল বনে গেলেই বনবিডাল হয়। এই পা, এই চোখ কাণ নাক, মানুষের মত এই সকলি, কিন্তু পুলিষবিভাগে প্রবেশ করিলেই অমনি তাহার বাক্ষসের মত ক্ষুধা হইয়া পডে, নির্দিষ্ট মাসিক বেতনে উদর পরিপূর্ণ হয় না,—কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উপরি পাওনা চাই। ষ্টেশনের ঘর লোকে লোকারণ্য, টিকিটবাবু অহঙ্কাবের গাছ, দাঁডাইয়া আছেন, খটাস খটাস শব্দে টিকিট কাটিতেছেন, এক এক বার ভিতরের ইয়ার-বয়স্কের সঙ্গে মুচ্‌কে মুচ্‌কে হেসে আমোদের কথা কহিতেছেন। যাত্রিরা ব্যস্ত হইয়া বলিতেছে—"টিকিট দিন বাবু"—বাবু অমনি বদন ভরিয়া গালি দিতে দিতে মানবজন্ম সার্থক করিতেছেন। পুলিষের কনষ্টেবলেরা যাত্রিদের কাণে কাণে কি বলে আর ভিতর হইতে টিকিট আনিয়া দেয়।

কোন কোন সময়ে বড বড ষ্টেশনগুলিতে এত ভিড হইয়া উঠে যে, টিকিট পাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠে। অনেক ঠেলাঠেলি করিয়া কেহবা শুধুই টিকিট পান, কেহ বা কনষ্টেবলকে কিম্বা টিকিটবাবুকে কিঞ্চিৎ পারিতোষিক দিয়া টিকিট লাভ করেন। পশ্চিমাঞ্চলেই এই রীতিটী বিশেষ প্রচলিত। জুয়াচোরেরাও হাত পাতিয়া বলে,—টাকা দাও টিকিট আনিয়া দিই। অজ্ঞ যাত্রী না বুঝিয়া যদ্যপি জুয়াচোরের হাতে টাকা দিল, তবে সে আজও প্রস্থান করিল কালও প্রস্থান করিল।

আজ কয়েক দিবস অতীত হইল, আমাদের জনৈক আত্মীয় রাত্রিকালের গাডিতে পূর্ব্বাঞ্চলে আসিতেছিলেন। সে রাত্রিতে ষ্টেশনে অধিক জনতা ছিল না। তথাপি, যাত্রিদের টিকিট পাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার কারণ মহামান্য মুল্লুকের মালিক মহোদয় শ্রীযুক্ত টিকিটকাটা বাবু আপনার গুহার সিংহাসন হইতে হুকুম জারি করিতেছিলেন,—"দুয়ারের ভিতর কেহ হাত দিও না।" উপস্থিত কনেষ্টবলেরাও সকলকে দ্বারের ভিতর হাত দিতে নিষেধ করিতেছিল; সুতরাং যাত্রীগণ টাকা হস্তে দাঁডাইয়া ছিল। কনেষ্টবলটী এক এক বার যাত্রিদের কাণে কাণে কি বলিতেছিল, আর টিকিট আনিয়া দিতেছিল।

আমাদের আত্মীয় কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া দ্বারের ভিতর টাকা দিতেছেন ইত্যবসরে কনেষ্টবল আসিয়া হাত ধরিল। আত্মীয়টী বলিলেন,—"একি তুমি আমার হাত ধর কেন, আমাকে টাকা দিয়া টিকিট লইতে দিবে না?" তখন ভিতর হইতে বাবুটী বলিলেন,—"আপনি টিকিট লউন।" ইহার তাৎপর্য্য কি, বোধ করি পাঠকদিগকে তাহা ব্যক্ত করিয়া বলিতে হইবে না। যাত্রিদিগের নিকট হইতে টাকা লইবার আর একটী উপায় আছে। টিকিট বাবু ঢিলে আস্তিনের জামা পরিয়া নটবর বেশে টিকিট বিতরণ করিতে থাকেন। কেহ টাকা দিলে, বাবুজি মহাশয় গণিতে গণিতে তাহার এক আধটী আস্তিনের ভিতর সরাইয়া কম করিয়া ফেলেন, সুতরাং সহায়হীন অজ্ঞ যাত্রাকে পুনর্ব্বার গুণাগার দিতে হয়। এই সমস্ত অসঙ্কুচিতচিত্ত মূর্খ কর্ম্মচারিদিগের কদাচার দেখিলে বাদসাই আমলের লালা কায়েতদিগের কুব্যবহার আমাদের স্মৃতিপটে উদিত হয়। বাদসাহী আমলে তাহাদের অর্থগৃধ্নুতা এত প্রবল ছিল যে, আজ তাহা উদাহরণ স্থানীয় হইয়া আছে, আমাদের উৎকোচ গ্রহণ নিবারণার্থ মহাত্মা আকবর সাহ বিস্তর প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কথিত আছে যে, একবার এক কায়েত কর্ম্মচারীর উপর তিনি নিরতিশয় বিরক্ত হইয়া বলিলেন যে "তোমাকে যে কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়, তাহাতেই তুমি উৎকোচ গ্রহণ কর। তোমাকে কিছুতেই নিবারণ করিতে পারিলাম না। অতএব এবার তোমাকে অন্য কোন কার্য্যের ভারার্পণ করিব না। তুমি যমুনাকূলে বসিয়া তরঙ্গমালা গণনা কর, দেখি—এবার তুমি কিরূপে উৎকোচ গ্রহণ কর"। বাদসাহের আজ্ঞানুসারে তিনি যমুনাকূলে গিয়া বসিলেন। তৎকালে আগ্রা ভারতের রাজধানী ছিল, নানা দেশ দেশান্তর হইতে তথায় নৌকা আসিত। নৌকা আসিলেই লালা সাহেব তৎক্ষণাৎ তাহা আটক করিতেন। তিনি নাবিকদিগকে বলিতে লাগিলেন, বাদসাহ তাঁহাকে ঢেউ গণনা করিবার আদেশ দিয়াছেন, অতএব নৌকা যাতায়াত করিলে ঢেউ গোলমাল হইয়া যাইবে। অগত্যা নাবিকেরা তাঁহাকে উৎকোচ দিয়া যাতায়াত করিতে লাগিল। আকবর এই সংবাদ পাইয়া বিস্ময়াপন্ন চিত্তে তাহাকে কার্য্যচ্যুত করিলেন। রেলওয়ের কর্ম্মচারিদিগের মধ্যেও এমন অনেক মহাপুরুষ আছেন, তাঁহাদের প্রতি তীব্র দৃষ্টি না রাখিলে সাধারণের কষ্ট দূরীভূত হওয়া দুষ্কর।

দ্বিতীয় কষ্ট এই, এক এক কামরার প্রত্যেক বেঞ্চে পাচজন আরোহী বসিবার আছে। কিন্তু এটী কেবল কথা মাত্র। কোন পার্ব্বণ উপস্থিত হইলে যাত্রিদিগের ঘোরতর কষ্ট হইয়া থাকে। গুদামে মাল ঠাসিবার মত কামরার ভিতর অবোধদিগকে ঠাসিয়া বোঝাই করা হয়। গাড়ীতে তিল রাখিবার স্থান নাই, তথাপি ষ্টেশন মাষ্টার ও গার্ড সাহেব ধাক্কা ও ঘুসি মারিয়া কামরা জমাট করিয়া দিতে থাকেন। এ উপদ্রব অনায়াসেই নিরাকৃত হইতে পারে।

তৃতীয় কষ্ট, যাত্রীদিগের অবস্থিতির স্থানাভাব, দূর দেশ হইতে যাত্রী আসিল, ষ্টেশনের সন্নিকটে সরাই নাই। যাত্রীরা কোথায় অবস্থিতি করে? বড় বড় ষ্টেশনে যাত্রিদিগকে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত গাড়ীর প্রতীক্ষায় অবস্থিতি করিতে হয়। কিন্তু বিশ্রামের তাদৃশ ঘর নাই, অতএব তাহাদের কি পর্য্যন্ত ক্লেশ হইয়া থাকে, তাহা কথায়িতব্য নহে। বিশেষতঃ কষ্টের ও অসুবিধার একশেষ হয়। যাত্রিদিগের কষ্ট নিবারণার্থ কাণপুরের কতকগুলি ভদ্রলোক মিলিত হইয়া একটী হোটেল সংস্থাপন করিয়াছেন; কিন্তু ঐ হোটেল সাধারণ লোকের হিতসাধক হয় নাই। কোথায় হোটেল আছে, কেহই তাহা জ্ঞাত নহে। সে কারণ হোটেলের কর্ম্মচারিগণ যাত্রিদিগকে হোটেলে আনিবার জন্য রেলওয়ে কোম্পানির নিকট আবেদন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের দরখাস্ত না মঞ্জুর করা হইয়াছে। ইহার কারণ কি, আমরা বুঝিতে পারিলাম না। ইংরাজি হোটেলের চাপরাশীরা ইংরাজ যাত্রীদিগকে ষ্টেশন হইতে ডাকিয়া আনে, কই—তাহাদিগকে ত নিষেধ করা হয় না।

চতুর্থ কষ্ট, ষ্টেশনের পাইখানা। প্রাতঃকালে মলমূত্র ত্যাগের নিমিত্ত যাত্রিদিগকে যে কি পর্য্যন্ত ক্লেশ পাইতে হয়, তাহা অকথনীয়। একটী ঘরের ভিতর খাদামি খাদরি খোপ, সারি সারি লোক মলমূত্র ত্যাগ করিতে বসিয়া গিয়াছে। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এতদ্দেশীয় লোককে সভ্যভব্য হইতে উপদেশ দিয়া থাকেন, কিন্তু রেলওয়েতে আরোহণ করিলে তৃতীয় শ্রেণীর আরোহিদিগকে লজ্জাসরম গৃহে রাখিয়া আসিতে হয়।

পঞ্চম কষ্ট, মধ্যশ্রেণী গাড়ীর ভাড়া। এই শ্রেণীতে ভ্রমণ করিবার লোক নিতান্ত অল্প। যাঁহারা ধনবান্ ব্যক্তি, তাঁহারা প্রথম কিম্বা দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে যাতায়াত করেন। মধ্যবিত্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা অধিক হইলেও সচরাচর তাহারা এই শ্রেণীর গাড়ীতে ভ্রমণ করিতে পারেন না। তাহারা ভদ্রবংশজাত হইলেও তাহাদের অবস্থা সচ্ছল নহে। অতএব যেমন তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া কমিয়া গিয়াছে, মধ্যশ্রেণীর ভাড়াও কিঞ্চিৎ কম করিয়া দেওয়া আবশ্যক। ইহার ভাড়া অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ স্বল্প হইলে অনেক ভদ্রব্যক্তি এই ক্লাসে অনায়াসে যাতায়াত করিতে সক্ষম হন.

পাঠকগণের স্মরণ থাকিবে, আমরা ইতিপূর্ব্বে একটা প্রস্তাবে লিখিয়াছিলাম যে, কলিকাতা হইতে এলাহাবাদ পর্য্যন্ত যে মেল ট্রেণ যাতায়াত করে, তাহার সঙ্গে আর তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী সংযোজিত থাকিবে না, এইরূপ প্রস্তাব হইতেছে। ইহা কার্য্যে পরিণত হইলে সাধারণের পক্ষে দারুণ কষ্টদায়ক হইয়া উঠিবে। কিন্তু সম্প্রতি রেলওয়ের অধ্যক্ষগণ এই প্রস্তাব করিয়াছেন যে, এক্ষণে মেল ট্রেণ যে প্রকার বেগে যাতায়াত করে, নূতন বন্দোবস্ত হইলে আরোহীর গাড়ী সেইরূপ বেগে যাতায়াত করিতে থাকিবে, এবং মেল ট্রেণের বেগ আরও অধিক করিয়া দেওয়া হইবে। এই মেল ট্রেণে ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাস থাকিবে না। কারণ ইহাতে বহুসংখ্য গাড়ী জুড়িয়া দিলে ট্রেণের বেগাধিক্যের সম্ভাবনা

নাই। কিন্তু আমাদের একান্ত ইচ্ছা যে, অন্ততঃ উহাতে দুইখানি মধ্যশ্রেণীর গাড়ী যোজিত থাকিলে ভাল হয়। এতদ্দ্বারা সাধারণের বিশেষ উপকার সাধিত হইবে।

বঙ্গদেশে পুত্র বিক্রয়। ১০ আষাঢ় ১২৯১। ৩২ সংখ্যা

পাঠক! প্রস্তাবের শিরোনামাটী দেখিয়া হয়ত চমকিয়া উঠিবেন। ভাবিবেন আজিও কি বঙ্গদেশে দাসব্যবসায় আছে। বঙ্গদেশে ভারতেশ্বরীর আধিপত্য যেমন প্রবল, ভারতেশ্বরীর প্রভাব যেমন ঘরে ঘরে বাচা দিতেছে, এরূপ আর কুত্রাপি নাই। এখানে আজও দাস ব্যবসায় চলিতেছে এটী বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। পাঠক! আমরা আফরিকার, মিশরের ও তুরস্কের দাস ব্যবসায়ের কথা কহিতেছি না। হিন্দুশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, পুর্ব্বে এদেশে দাস প্রথা ছিল, বহুকাল হইল উঠিয়া গিয়াছে। অতি প্রাচীনদিগেরও সে প্রথার কথা স্মরণ হয় না। তবে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মিশরের ন্যায় দাসপ্রথা এখানে নাই বটে, কিন্তু প্রকারান্তরে নাই তাহাও বলা যায় না। অনেক অপদার্থ সন্তান পরের দাসত্ব করিয়া বহুমূল্য জীবন বিনষ্ট করিতেছে। আমরা আজ সে সকল বিষয়ের কথা এ স্থলে উল্লেখ করিতেছি না। বঙ্গদেশে বিবাহকালে যে পুত্র বিক্রয় হইতে আরম্ভ হইয়াছে, অদ্য তাহারই প্রস্তাবনা আমাদের অভিপ্রেত।

মনু যে কয় প্রকার বিবাহের লক্ষণ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে আসুর নামে একটী বিবাহ আছে। পণ গ্রহণ করিয়া কন্যার যে বিবাহ দেওয়া হয় তাহারই নাম আসুর। এটী নিন্দিত বিবাহ। বঙ্গদেশে অনেকদিন অবধি এ বিবাহটী চলিয়া আসিতেছে। কুলীন মৌলিক বংশজ প্রভৃতির ব্যবস্থাই এ কুৎসিত প্রথার কারণ। শাস্ত্রকারেরা এ বিবাহের অতিশয় নিন্দা করিয়াছেন। ভদ্রসমাজেও এ বিবাহটী নিন্দিত ও উপেক্ষিত দেখিতে পাওয়া যায়। একে এই প্রথার জ্বালায় বাঁচা যায় না, কত বৃদ্ধ ও গুণহীন কাপুরুষ গুণবতী ও রূপবতীর পাণিগ্রহণ করিতেছে। ঐ সকল ঘটনা দর্শন করিলে কোপানলে হৃদয় দগ্ধ হইতে থাকে। এ জ্বালার উপরে আবার পুত্রবিক্রয়ের জ্বালা উপস্থিত। এই পুত্র বিক্রয়ের প্রথা উপস্থিত হওয়াতে সকল শ্রেণীরই বিশেষতঃ কায়স্থশ্রেণীর কন্যার বিবাহ হওয়া ভার হইয়া উঠিয়াছে। যাঁহার দুই তিনটী কন্যা জন্মে, তিনি অগাধ বিপদসাগরে নিমগ্ন হন। বরকর্ত্তার চিত্তসন্তোষ সাধনার্থ তাঁহাকে ইটে ভিটে বিক্রয় করিতে হয়। লক্ষ্মী তাঁহার গৃহে বাস বাঁধেন না।

ছেলে যে পরিমাণে পাস দিতে আরম্ভ করে, সেই পরিমাণে মূল্য বৃদ্ধি হইতে থাকে। যাহার ছেলে তিনটী পাস দিল তাহার পিতা অহঙ্কারে মট মট করিতে থাকেন। কন্যাকর্ত্তা তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলে সংবাদ পাইয়া তিনি অন্তঃপুর হইতে ছোরা ঢুকাইয়া বাহিরে আইসেন। এ কি সভ্য ব্যবহার? যত লেখাপড়া বৃদ্ধি হইতেছে, ততই

আমরা দেখিতেছি অসভ্যতা এ অংশে বৃদ্ধি হইতেছে। যাঁহারা পাস দেন, তাঁহাদের ত চৈতন্য হইতেছে। তাঁহারা স্বয়ং যে এ বিষয়ের প্রতিবাদ করেন না, এটী অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয়। অভিমানই এরূপ ব্যবহারের মূল। অভিমান যত স্ফীত হইতেছে, ততই এই দুর্ব্ব্যবহারের বৃদ্ধি হইতেছে। অভিমান খর্ব্ব করিলেই সহজেই এ দুর্ব্ব্যবহারের নিবারণ করা যায়। কিন্তু এ অভিমান খর্ব্ব করে কে? আপনা হইতে সে অভিমান খর্ব্ব হয়, তাহার সম্ভাবনা দেখা যায় না। অভিমান যদি আপনা হইতে খর্ব্ব হইত, তাহা হইলে দুর্য্যোধন সবংশে নিহত হইত না।...পাস্ করা ছেলের পিতার যে অভিমান সহজে খর্ব্ব হইবে তাহার সম্ভাবনা নাই। একটী বিশেষ বিধান আবশ্যক।...অনেক স্থলে অনেকে যেমন সমাজ সংস্কার ব্যাপারে প্রবর্ত্তিত হইয়াছেন, এ বিষয়েও তেমনি সকল জাতীয়ের সকল লোকেরই একটী সংস্বাব ক্রিয়া আরম্ভ করা কর্ত্তব্য। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকেরা পরস্পর মিলিত হইয়া এইরূপ এক একটী নিয়ম করুন যে, বিবাহকালে কোন বরকর্ত্তা কন্যাকর্ত্তার নিকটে কোন প্রকার অসঙ্গত দাওয়া করিতে পারিবেন না। কন্যাকর্ত্তা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক যাহা দেন তাহাতেই বরকর্ত্তাকে সন্তুষ্ট হইতে হইবে। আমাদের কন্যাদানের যে প্রথা আছে তাহাতে কন্যাকর্ত্তা প্রায় বিত্তসাধ্য করেন না। শাস্ত্রেও আছে সবস্ত্রা সালঙ্কারা কন্যা দান কবিতে হইবে। অতএব যাহার যেমন সঙ্গতি তিনি তেমনি কন্যাভরণ, বরাভরণ প্রভৃতি দিতে ক্রুটী কবেন না। তবে কন্যাকর্ত্তাকে পীডন কবা কেন? যিনি পীডন করিবেন, তিনি সামাজিক দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। সামাজিক লোকেরা তাঁহার সহিত আহার ব্যবহার পরিত্যাগ করিবেন, এরূপ কঠোর নিয়ম না হইলে প্রস্তাবিত প্রথার নিবারণ হওয়া দুর্ঘট। এই কুপ্রথার নিবারণ না হইলেও সমাজের মঙ্গল নাই। নিঃসংশয়ে অনেকেই উৎসন্ন যাইবেন। এ ব্যাপারটী যে কেমন ভয়াবহ হইয়া দাঁড়াইয়াছে বাবু রূপচাঁদ দাসের প্রণীত সঙ্গীতটী তাহার স্বরূপ বলিয়া দিবে। রূপচাঁদ দাসকে যদি পাঠক জানিতে চান, 'পক্ষী' উপাধিটী তিনি বড ভালবাসেন। ঐ উপাধি দ্বারা তিনি দেশবিখ্যাত। এই কথা বলিলেই তাঁহার পর্য্যাপ্ত পরিচয় হইবে। সঙ্গীতটী এই:

(রূপচাঁদ পক্ষী বিবচিত)

বাগিনী সিন্ধুভৈবৰী- তাল ঠুংবি।

আ মরি কি নাকাল, কন্যাবিবাহের কাল, আজ কাল
হচ্ছে বঙ্গদেশেতে।
মাতৃদায়, পিতৃদায়, এর আগে লাগে কোথায় ভিটে
মাটি চাটি হয়, বিয়ের ব্যয়েতে॥
কত শত মানির হতেছে মানহানি, ছাই চাপা পডে
গেছে মানের মূলেতে।

বল্লালী বাধাকুল, প্রায় হলো নির্ম্মূল, বিশ্ববিদ্যালয়
স্কুল, সুরু যে হতে।
এনট্রান্স একপেসে, এল. এ. দুপেসে, বি. এ.
তেপেসে মান্য ভারতে॥ ১
বল্লভি সর্ব্বানন্দ, ফুলে খড়দহ হয় না সম্বন্ধ পাস করা
ছেলে পছন্দ সকল মেলেতে,
কন্যা দিতে হয় ব্যস্ত, অর্থ নাই শূন্যহস্ত, হইয়া
ঋণগ্রস্ত, পড়েন মস্ত দায়েতে॥ ২
অর্থাভাবে কতলোকে, পড়িয়ে বিষম বিপাকে, থুবড়ি
মেয়ে ঘরে রাখে, নিরুপায়েতে।
নোট কেটে কর্জ্জ করে, খুঁজে দেশ দেশান্তরে, সগর্ভ দান
করে, বৎস সহিতে॥ ৪
বারেন্দ্র বৈদিক, সকলে ততোধিক, কি আর কব
অধিক, নারি বর্ণিতে।
সম্বন্ধ না হতে, বয়ের মুরুব্বিতে, এক লম্বা ফর্দ্দ দেয়
হাতে, নবাবি মতে॥ ৪
মহামান্য কুলীন ঘরে, পাস করা বায়াস্তুরে, আদায়
করে ধরে তারে, হয় কন্যা দিতে।
জড়োয়া গহনা রূপার খাট, ঘড়ীর চেইন আলবাট
বর যাত্রের মদের চাট, হয় যোগাতে॥ ৫
কন্যাকর্ত্তা এসে, বরণ করে বিশেষে, কলঙ্ক করিবে
সব, দেশের লোকেতে।
বরপাত্র রেগে কয়, আমরা ত কুলীন নয়, তেপেসে দিগ্বিজয়,
ঊনবিংশতে॥ ৬
ক্ষেত্রী বৈশ্য শূদ্রজাতি, ছিল না এ পদ্ধতি, সব বর্ণে হয় সম্প্রতি,
দেশের রীতিতে।
জন্মে পাস করা নয়, বয়াটে ফেল বয়, বরের বাবা মিথ্যা কয়,
ধনের লোভেতে॥ ৭
দাতব্য পাঠশালে, চিরকাল পড়ে ছেলে, বিয়ের সম্বন্ধ এলে,
দেন স্কুলেতে।
বিবাহে মেরে মাল, অমনি গুটিয়ে লয় জাল, যে রাখালকে সেই
রাখাল, পাচনি হাতে॥ ৮

চারিপেসের কর্ত্তাপক্ষ, ঠিক যেন সর্ব্বভক্ষ্য, যার ছেলে গণ্ডমূর্খ,
সে মরে, দুঃখেতে।
ছেলে থাকিলে গুণবন্ত, একরাত্রে হতাম ভাগ্যবন্ত, পোড়াকপালী
ভেড়াকান্ত, ধল্লেন গর্ভেতে ॥ ৯
বিবাহের গোল ভারি, বণিকে কমিটী করি এক হুকুম কল্লে
জারী, সপ্তগ্রামেতে।
সাধ্যমতে দিবে সোণা, অধিক চাহিতে কেউ না, স্বাক্ষর করে
সর্ব্বজনা, চলে না মতে ॥ ১০
অলঙ্কার চায় না ইদানি, কোম্পানীর কাগজ রেভিমনি, পাট্রা সোণার
গিণি চায় হাতে হাতে।
মেয়ের বেলা বেলতলা, নিমতলা, কেব্‌ড়াতলা, দুর্ভরির সোনার বালা,
ছাঁদলা তলাতে ॥ ১১
বাইসপোঁচ কাল কাক্রি, পাসকরার বড় জারি, পাত্রী খোঁজে
সুশ্রী কিন্নরী হতে।
পাকা বাড়ী মার্ব্বেল মেজ, দ্বারোয়ানের রূপার বেজ, হীরার আংটী
সোনার লেজ, ঝুলিবে পশ্চাতে ॥ ১২
বিবাহের গণ্ডগোলে, যত ইয়ংবেঙ্গলে, ঢুক্‌চে গিয়ে ব্রাহ্মের দলে,
জ্বালা এড়াতে।
বর্ণের বিচার কে আর করে, এক কোর্টসিপেতে কর্ম্ম সারে, কেউ
দিচ্ছে কুচবিহারে, কেউ সবর্ণেতে ॥ ১৩
উচ্চ শিক্ষার প্রভাবে, দেশের উন্নতি হবে, সমাজের কুক্রিয়া যাবে,
বিদ্যার জ্যোতিতে।
হিতে হলো বিপরীত, পাসকরা বাড়ায় কুরীত, এশিক্ষা কার মনোনীত,
হয় অনিষ্ট যাতে ॥ ১৪
নব্য সভ্য গুণবন্ত, সকলে কর সিদ্ধান্ত, যাতে হয় এবিষয় ক্ষান্ত
চূড়ান্ত মতে।
বিয়ে কত্তে টাকা চায়, ছি ছি মরে যাই লজ্জায়, আর্য্যদের কলঙ্ক
রটায়, আর্য্যাবর্ত্তবাসিতে ॥ ১৬
সমাজের দেখে দুঃখ, আপশোষেতে ফাটে বক্ষ, সকলেতে হও এক
ঐক্য, সখা ভাবেতে।
খগপতির এই মিনতি, যার যেরূপ হয় সঙ্গতি, দেওয়া লওয়া সেই
পদ্ধতি, হউক আর্য্যদের মতে ॥ ১৬

আমাদের যুবকগণের এখন প্রধান কর্ত্তব্য কি? ৩ ভাদ্র ১২৯১। ৪০ সংখ্যা

ধর্ম্মপ্রচার, ধর্ম্মবিষয়ের আন্দোলন, হরি-সভা, আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভা, নববিধান সভা, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, আদি ব্রাহ্মসভা ইত্যাদি লইয়া যুবকগণ মাতিয়াছেন ও দেশ মাতাইয়া তুলিয়াছেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং" তাহার কি করিলেন? যুবকগণ ধর্ম্ম লইয়া ব্যস্ত, কিন্তু ধর্ম্মের প্রসাধন সাধন যে শরীর, তাহার রক্ষার, তাহাকে বলবীর্য্য সম্পন্ন করিবার, মানুষের মত হইবার কি করিলেন? ম্যালেরিয়া যে শরীর জর জর করিতেছে, ক্ষীণদেহ ও হীনবীর্য্য বলিয়া বিদেশীয়েরা যে পদদ্বারা দলিত করিতেছে, ভীরু ও কাপুরুষ বলিয়া যে দুর্ণাম রটিতেছে, যুবকগণ এ সকল বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার কি করিতেছেন?

আমরা উপরে যে সকল সভার কথা কহিলাম, তাহার কোন সভা হইতেই ধর্ম্মের প্রধানসাধন শরীরের উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই। আজ অমুক স্থানের হরিসভার বার্ষিক উৎসব হইল; মহা ধুমধাম হইয়া গেল। আজ অমুক স্থানের হরিভক্তি প্রদায়িণী সভার ষান্মাসিক হইল, আনন্দের সীমা নাই। এ সংবাদগুলি শুনিলে আমাদের মনে আনন্দ জন্মিয়া গাঢ় বিষাদ জন্মে। যুবকগণ ধর্ম্মের আলোচনা করেন, সচ্চরিত্র হইবার চেষ্টা পান, অতুল হরিপ্রেমানন্দ ভোগ করেন, ইহা আমাদের বিষাদের কারণ নয়। বিষাদের কারণ এই, হরিসভার কথা শুনিলেই আমাদের মনে পড়ে বৈদিক সময়ের প্রাচীন আর্য্যেরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই বর্ণবিভাগ ও কার্য্যবিভাগ করিয়া যে আলস্য বীজ বপন করিয়া যান এবং পৌরাণিক সময়ের আর্য্যেরা তাহাতে সমুচিত বারি সেচন করিয়া সেই বীজকে অঙ্কুরিত ও ফলপুষ্পে সুশোভিত করেন; ইদানীন্তন হরিসভা ও অন্য অন্য ধর্ম্মসভাকারক যুবকগণ তাহাতে প্রচুর পরিমাণে বারি সেচন করিয়া তাহার ঘোরতর বলবৃদ্ধি করিতেছেন। ক্ষত্রিয়েরা যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত রহিলেন, বৈশ্যেরা বাণিজ্য ও কৃষি অবলম্বন করিলেন; ব্রাহ্মণেরা যজন যাজনে রত হইলেন। এইরূপ কার্য্যবিভাগ হওয়াতে ব্রাহ্মণেরা নিশ্চিন্ত হইলেন। ক্রমে আলস্যের দাস হইয়া উড়িলেন। কেহ দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন; কেহ বর্ষসাধ্য কেহ মাসসাধ্য কেহ পক্ষসাধ্য যজ্ঞে ব্রতী হইলেন। আলস্য ত তাঁহাদিগকে একান্ত নিজ আয়ত্ত করিয়া লইল। ক্রমে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ভারত বিলুপ্ত হইল; উচ্চশ্রেণীর মধ্যে কেবল এক ব্রাহ্মণ রহিলেন ঐ সকল ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন অধ্যাপন যজন যাজনাদি কার্য্যে রত হইয়া ক্রমেই আলস্যপরতন্ত্র হইতে লাগিলেন। বঙ্গদেশে আসিয়া যখন তাঁহারা বাস করিলেন, মণিকাঞ্চন যোগ হইল; জল বায়ুর দোষ সহযোগী হইয়া ঐ আলস্যকে অধিকতর বর্দ্ধিত করিয়া তুলিল। সেই আলস্য এখন হরিসভা ও অন্য অন্য ধর্ম্মসভার রূপ ধারণ করিয়া যুবকগণকে আশ্রয় করিয়াছে। এখন হরিসভা ও অন্য অন্য সভার কথা শুনিলেই মনে হয়, যুবকগণ যুবজনোচিত শ্রম পরিত্যাগ করিয়া বৃদ্ধের ন্যায় অকর্ম্মা হইয়া কালযাপন করিতেছেন।

যুবকগণ পরকালের যেন পথ করিলেন, ইহকালের কি করিলেন? চিরকালই কি ভীরু ও কাপুরুষ বলিয়া নিন্দিত ও পরপদ দ্বারা দলিত হইবেন এবং ম্যালেরিয়ার প্রকোপে পড়িয়া জীর্ণ ও শীর্ণভাবে কষ্টে কালক্ষেপ করিবেন? এক আধবার কি পদদ্বয় এদিকে ওদিকে ফেলিবেন না? নড়িবেন চড়িবেন না? ধর্ম্মালোচনার সহিত কি শরীরের উন্নতিসাধনের বিরোধ আছে? তাহা নাই। প্রত্যুত, নীতিজ্ঞেরা ধর্ম্মালোচনার অগ্রে শরীরের উন্নতিসাধনের উপদেশ দিয়াছেন।

আমরা অনুরোধ করিতেছি, যুবকগণ আমাদের উপরিলিখিত বাক্যগুলির তাৎপর্য্য একবার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখুন। স্থানে স্থানে শারীরিক উন্নতি বিধায়িনী সভা করিলে হয় না? সভা করিয়া কেবল বক্তৃতার ধ্বনিতে সভা পুর্ণ করিলে কর্ত্তব্যকার্য্যের শেষ হইল, এ বিবেচনা করিয়া নিশ্চিন্ত হইলে চলিবে না। যে যে কার্য্য দ্বারা শারীরিক উন্নতি বলবীর্য্য ও সাহসাদির বৃদ্ধি হয় অকপট হৃদয়ে সেই চেষ্টা পাওয়া কর্ত্তব্য। সে চেষ্টা পাইতে গেলে অনেকগুলি অনুষ্ঠান আবশ্যক। কার্য্যপ্রণালী আহার-প্রণালী ও বাসপ্রণালী, এ সমুদয়েই পরিবর্ত্ত করিতে হইবে। আমরা যাহাতে পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্নভাবে অবস্থান করি, লর্ড রিপন বাহাদুর তন্নিমিত্ত আত্মশাসন-প্রণালীর প্রবর্ত্তন করিতেছেন, এ প্রণালীটার কার্য্যে পরিণত হইবার অনেক বিঘ্ন দেখিতেছি। ইহার অনেক শত্রু। যিনি শত্রু থাকেন থাকুন যুবকগণ যদি নিজ নিজ বাসভবন ও অধিকৃত স্থান পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন রাখেন, আপনা হইতেই আত্মশাসন-প্রণালীর উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইয়া উঠিবে। ঘরের টাকা বাহির করিয়া দিয়া পরাধীনতাশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে হয় না। যুবকগণ দেখ দেখি আমরা কেমন উজবুক। মিউনিসিপাল ট্যাক্স দিই, অথচ নরক ভোগ করি; দূষিতবাষ্পে শরীর নষ্ট করি, সর্ব্বদা দুর্ব্বল অবস্থায় কালযাপন করিয়া থাকি। ট্যাক্স দিতে না ঘটী বাটী বিক্রয় হয়। এ অবস্থার তুল্য শোচনীয় অবস্থা আর কি আছে? আমাদের নির্ব্বুদ্ধিতা অকর্ম্মণ্যতা ও পরস্পর অনৈক্য কি এই শোচনীয় অবস্থার কারণ নয়?

শারীরিক উন্নতি সাধন করিতে গেলে, শারীরিক পরিশ্রম করিতে গেলে, আহার প্রণালীর পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হইয়া উঠিবে। কেবল ক্ষুদ্র মৎস্যের যুষ ও সরু চাউলের ভাতে চলিবে না, পুষ্টিকর দ্রব্য ভোজন করিতে হইবে।

আমাদের শরীর বলিষ্ঠ হইবার প্রধান প্রতিবন্ধক বাল্যবিবাহ। অপুষ্ট বীজে কখন বর্দ্ধনশীল বৃক্ষ জন্মে না। বাল্যবিবাহের কেবল এই একমাত্র অনিষ্টকারিতা নয়। অল্প বয়সে বিবাহ হইলে অল্পকালের মধ্যে কতকগুলি সন্তান সন্ততিতে বিব্রত হইতে হয়। তাহাদেরও সম্পূর্ণ লালন পালন হয় না। তাহারা ক্রমে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া দেশের দুর্ণাম ঘটাইবার কারণ হয়। অতএব যাহাতে বাল্যবিবাহ রহিত হয়, সভা করিয়া যুবক-দিগের সে চেষ্টা পাইলে হয় না? রাজা প্রমথভূষণ দেবরায় যেমন বিধবা বিবাহের

উদ্যোগী হইয়াছেন তেমনি যদি যুবকগণ বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহাদি নিবারণের উদ্যোগী হন, আমরা যে শারীরিক উন্নতিসাধনের প্রস্তাব করিতেছি, তাহা কি সহজে সম্পন্ন হইয়া উঠে না?

হিন্দুসমাজ ও ধর্ম্মসংস্কার। ৭ ভাদ্র ১২৯১। ৪২ সংখ্যা

…আজি হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অনেকের শ্রদ্ধা হইতেছে। অনেকে বলেন, পুরাতন হিন্দুধর্ম্ম শীঘ্র পুনরজ্জীবিত হইবে। আবার হিন্দুগণ আর্য্য মুনিঋষির প্রতিষ্ঠিত শাস্ত্রানুসারে চলিবেন। এদেশের ধর্ম্মপুস্তকে যে সকল হিতকর ব্যবস্থা আছে, সেগুলি যাহাতে লোকসমাজে পুনর্ব্বার প্রচলিত হয়, আমাদেরও সেই ইচ্ছা। কিন্তু আমরা এইবেলা বলিয়া রাখিতেছি, যিনি যতই কেন চেষ্টা করুন না খাঁটী হিন্দুধর্ম্ম আর চলিত হইতে পারিবে না। সেদিন অনেক কাল চলিয়া গিয়াছে। আমাদেরও ইচ্ছা নয় যে, আবার সমস্ত হিন্দুধর্ম্ম নীতি সমাজে অবিকল প্রচলিত হউক। তাহা প্রচলিত হইলে অনিষ্ট বিনা ইষ্টলাভের প্রত্যাশা নাই। দুই একটী স্থল ভাবিয়া দেখিলেই আমাদের বাক্যের সারবত্তা পাঠক বুঝিতে পারিবেন। উদাহরণ স্বরূপ আমরা কুমারীবিবাহ, বিধবার ব্রত এবং একাদশীর উল্লেখ করিতেছি। আজিকালি বাল্যবিবাহ রহিত করিবার জন্য সকলেই যত্নবান্ হইতেছেন। বাল্যবিবাহের ফল যে ঘোর অনিষ্টকর তাহা সকলেরই বোধগম্য হইয়াছে। ইহাতে হিন্দুরা দিন দিন অল্পায়ু অল্পমেধা এবং রুগ্ন হইতেছেন, এ বিশ্বাস করাইয়া দিতে আর কষ্ট নাই। তবেই হইল, লোকের মঙ্গল দেখিতে গেলে, অষ্টবর্ষা ভবেৎ গৌরী ইত্যাদি বচনধৃত বিবাহের কালনির্ণয় ব্যবস্থাটী চাপা দিয়া রাখিতে হয়। তাহার পর বিধবাবিবাহ। এসম্বন্ধে যতই কেন মতান্তর থাকুক না, শিক্ষিত হিন্দুরা তাহা মানিবেন না। এখন যাহা মানিতেছেন, সে কেবল সামাজিক আচার ব্যবহার নিবন্ধন। কিন্তু আর দুই এক পুরুষের মধ্যেই সকলের মন ও প্রবৃত্তি সমান হইয়া দাঁড়াইলে তখন আবার বিধবাদের বিবাহ দেওয়াই সমাজের প্রশস্ত আচার হইয়া আসিবে। তাহার পর একাদশীর উপবাস। রঘুনন্দন নামক হিন্দুদের লাইকারগস্ পণ্ডিতের শোণিতময় কালিতে লিখিত এই ব্যবস্থার ভিতরে যতই কেন গূঢ় তত্ত্ব থাকুক না, কিন্তু রুগ্ন বিধবা মাতা, ভগিনী প্রভৃতির নির্জলা একাদশীর উপবাস কষ্ট, অধিক দিন হিন্দুরা সহ্য করিতে পারিবেন না।

সকল দেশেই রাজনিয়ম, সামাজিক নিয়ম এবং ধর্ম্মনিয়ম বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু কখন একপ্রকার নিয়ম স্থির থাকে না। যুগে যুগে মনুষ্যসমাজ যত পরিবর্ত্তিত হইতেছে, ঐ সকল নিয়মেরও তত অবস্থান্তর ঘটিতেছে। এমন ক্ষমতা তাহারও নাই যে, একপ্রকার নিয়ম চিরকাল প্রচলিত রাখিবেন। মানুষের প্রবৃত্তি ও

সমাজের অবস্থানুসারে যখন যে নিয়ম আবশ্যক হইবে, সে সময় তাহাই প্রচলিত হইয়া পড়িবে। তজ্জন্যই আমাদের দেশে শাস্ত্রের মধ্যে এত মতভেদ দেখা যায়। সত্যযুগে সে নিয়মের আদর ছিল, ত্রেতা ও দ্বাপরে লোকে তদনুসারে চলিতেন না। আবার ত্রেতা ও দ্বাপরে যে বিধি সকলে মানিতেন ইদানীং তাহার চলন নাই। সম্প্রতি হিন্দু-ধর্মের ও হিন্দু আচার ব্যবহারের সম্পূর্ণ বিপ্লবদশা উপস্থিত। এখন যদি বিশুদ্ধ হিন্দু-নীতি রক্ষা করিবার কেহ চেষ্টা করেন তাহা নিষ্ফল হইবে।

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থা দেখুন, লোকের প্রবৃত্তি কেমন এবং মনুষ্যের সমাজ কিরূপ তাহারও বিচার করুন। মানুষের প্রয়োজনের উপযোগী ব্যবস্থাই স্থির থাকিবে, অন্য ব্যবস্থা লোপ পাইয়া যাইবে। যে বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থার উপযোগী নয়, তাহাতে লোকের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস জন্মিলেও তাহা প্রচলিত হওয়া কঠিন, আবাব যে নিয়ম বর্ত্তমান অবস্থায় বেশ খাটিবে তদ্বিরুদ্ধে কোটি কোটি লোক খড়্গহস্ত হইয়া উঠিলেও তাহার নিবারণ করিতে পারিবেন না। এই মত প্রতিপাদন করিবার অনুকূল অনেক প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। প্রায় দেড শত বৎসর হইয়া গেল রাজা রাজবল্লভ বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিবার নিমিত্ত যত্ন পাইয়াছিলেন। তদানীন্তন বিখ্যাত পণ্ডিতগণ তাহার অনুকূল বিস্তর শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তখনকার সমাজ ও লোকের শিক্ষা অন্যরূপ ছিল, তাহাই তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহ-বিধি লিপিবদ্ধ করিলে চাবিদিকে হুলস্থুল উঠিল বটে, কিন্তু তিনি একেবারে বিফলযত্ন হইলেন না। তাঁহার মতানুসারে দুই একটী কবিয়া স্থানে স্থানে বিধবাবিবাহ হইতেছে। যৎকালে কলিকাতায় মেডিক্যাল কালেজ সংস্থাপিত হয়, হিন্দুরা ইংবাজি চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষার্থ সহসা ঐ কালেজে ভর্ত্তি হইতে পারেন নাই। তাহার পর বিদ্যাশিক্ষার জন্য বিলাত গমনেব দৃষ্টান্ত দেখুন, এককালে কলিকাতার মেডিক্যাল কালেজে ভর্ত্তি হইতে হিন্দু সন্তানদিগকে যন্ত্রণা ভোগ কবিতে হইয়াছিল। কিন্তু এখন তাঁহারাই আবার হাসিতে হাসিতে সাত সমুদ্র পার হইয়া ইংলণ্ডে যাইতেছেন, ইংলণ্ডগমনের শাস্তি লঘু নয়। গৃহ ও জনকজননীদিগকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিতে হয়। এ ব্যবস্থাও বর্ত্তমান সমাজের উপযোগী হইয়াছে। যাঁহাবা বিলাতে গিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেছেন, তাঁহাদিগের অর্থ ও মানসম্ভ্রম বাড়িতেছে। তাঁহারা বিবাহ করিতে পাইতেছেন এবং তাঁহাদের পুত্রকন্যারও বিবাহ হইতেছে। অতএব ঐহিক সুখের কিছুই অসদ্ভাব নাই। বিলাত গমন করিলে যদি অর্থ ও মানসম্ভ্রম লাভ না হইত, কেহ তাঁহাদিগকে যদি কন্যা সম্প্রদান না করিত, তবে ইংলণ্ড গমনে কাহাবও প্রবৃত্তি জন্মিত না। এখন যতই কেন বিঘ্ন থাকুক না, বিদ্যাশিক্ষার জন্য উত্তরোত্তর অনেকেই ইংলণ্ডে যাইবেন, হিন্দুসমাজ আর তাঁহাদিগকে বাধা দিয়া রাখিতে পারিবেন না। অতএব সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা না করিলে ফল হয় না।

এখন আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা কিরূপ? আমাদের বর্ত্তমান প্রবৃত্তির ও সমাজের অবস্থা এই,—আমরা ইংরাজ সহবাসে থাকিয়া কাজকর্ম্ম করিব। বিদ্যাশিক্ষা ও বাণিজ্যের জন্য ক্রমে দেশবিদেশে যাইব। ভারতবর্ষের হিন্দু, পার্সী ও অন্যান্য জাতির সঙ্গে সহানুভূতি করিব। এই কয়েকটী ব্যবস্থা বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের পক্ষে ইষ্টকর ও উপযোগী। যে নিয়ম এই কয়েকটী উদ্দেশ্য সাধনের অনুকুল, এখন তাহাই থাকিবে। যে ব্যবস্থা উহাদের প্রতিকুল, এখন তাহা লোপ পাইবে। এখন ঐ কয়েকটী প্রস্তাবের উপকারিতা এবং হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের সঙ্গে তাহাদের কিরূপ বিরোধ, এগুলি বিচার করিয়া দেখা চাই। তাহা হইলে খাঁটি হিন্দুমত চলিবে কিনা, আমরা নিশ্চিন্ত করিতে পারিব।

প্রথম প্রস্তাব। ইংরাজ সমাজে থাকিয়া আমাদিগকে কর্ম্ম করিতে হইবে। এদেশের অধিকাংশ লোকেই এখন চাকুরীজীবী হইয়াছেন। চাকুরী না করিলে হিন্দুদের দিন নির্ব্বাহ হওয়া কঠিন। কিন্তু চাকুরী করিতে গেলে প্রায় ইংরাজদের সহবাসে থাকিতে হয়। ইংরাজ সহবাসেব আর এক নাম হিন্দুশাস্ত্রবিহিত আচারের মূলে কুঠারাঘাত। সাহেবেরা হিন্দুদের অস্পৃশ্য গোমাংস প্রভৃতি নানা প্রকার অখাদ্য ভোজন করেন। তাঁহাদের শাস্ত্রে ভোজনান্তে আচমনের ও মলত্যাগের পর জলশৌচের ব্যবস্থা নাই, দেখিতে দিব্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বটে, কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে সাহেবদেব সর্ব্বাঙ্গ সগডীতে মাখা, হিন্দুরা কার্য্যোপলক্ষে সেই সাহেবদিগকে স্পর্শ করিতেছেন, তাঁহাদের খানাখাবার টেবিলের কাগজপত্র লইয়া ব্যবহার করিতেছেন। কেহ কেহ সমস্ত কাগজপত্র আপন গৃহে আনিয়া শয্যাদিতে রাখিতেছেন। এ সকল কাজ না করিলে চলে না। এখানে হিন্দু আচারকে একটু সঙ্কুচিত করিযা রাখিলেই হইবে। যাঁহারা আশা করেন যে, হিন্দুধর্ম্ম অচিরে পুনর্জ্জীবিত হইবে, বোধ কবি তাঁহাবা হিন্দু দেবার্চ্চনার কথা বলিতেছেন, হিন্দুমত বিশ্বাস ও আচার ব্যবহারের কথা নয়। কারণ এগুলিকে বর্ত্তমান সময়ানুসারে কিছু কিছু রূপান্তরিত করিয়া না লইলে লোকের অসাধ্য হইয়া উঠিবে। তবেই হইল, আর ষোল আনা হিন্দুধর্ম্ম মানিবার উপায় নাই।

আমাদের দ্বিতীয় প্রস্তাব বিদ্যাশিক্ষা ও বাণিজ্য বিস্তার। মানুষের শিক্ষা বুভুৎসা স্বাভাবিক। কোন নূতন হিতকর বিষয় দেখিলেই তাহা শিক্ষা করিবার জন্য সকলেরই স্বভাবতঃ ইচ্ছা জন্মে। এখন বিলাতে এমন অনেক বিদ্যা আছে যাহা এদেশে নাই, এদেশে বসিয়া তাহা শিখিবারও যো নাই। রসায়ন-বিদ্যা, বিজ্ঞান, শিল্প এবং চিকিৎসাশাস্ত্র তন্মধ্যে প্রধান। ভারতের যদি কখন অদৃষ্ট ফিরে, তবে এই কয়েকটী উচ্চ অঙ্গের বিদ্যা শিক্ষা করিলেই ফিরিবে। ভারতবাসীরা যখন ইউরোপ ও আমেরিকাতে গিয়া ঐ সকল শাস্ত্র যত্নপুর্ব্বক অধ্যয়ন করিবেন, অধ্যয়ন করিয়া এই দেশে শিল্পাদির উন্নতি করিতে পরিবেন, সেই দিন আমাদের ভাগ্য প্রসন্ন হইবে। আমরা নানাবিধ বিলাতি দ্রব্য ক্রয় করি। বস্ত্র লৌহের দ্রব্য, কাঠের দ্রব্য, কাগজ, কলম, কালি,

ঔষধ, দেশলাই—আর কত বলিব? দুই একটি ভিন্ন প্রায় সকল দ্রব্যই। কেন? ঐ সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুত করিবার উপকরণ কি এদেশে নাই, আছে, কিন্তু প্রস্তুত করিবার বিদ্যা বুদ্ধি ও ক্ষমতা নাই, তাই এদেশে হয় না। তুলা আছে পাট আছে কিন্তু বিলাতের মত সস্তা ও সুচিক্কণ বস্ত্র এদেশে হয় না। রেশম আছে, কিন্তু বিলাতের মত রেশমী বস্ত্র ভারতবর্ষে জন্মে না। মানুষের কষ্ট হইলেই তাহা মোচন করিবার ইচ্ছা স্বভাবতঃ জন্মে, অভাব হইলেই তাহা পূরণ করিবার চেষ্টা হয়। এখন আমরা কোন একটী মনোহর চমৎকার বিলাতী দ্রব্য দেখিলে গাল ভরিয়া হাসিতে হাসিতে তাহা ক্রয় করি। তদ্দ্বারা আমরা দরিদ্র হইয়া পড়িতেছি, এখন সে জ্ঞানোদয় অনেকেরই হইয়াছে। যখন এ জ্ঞান জন্মিয়াছে তখন ইহার প্রতীকারও হইবে। বিলাতী ধুতি প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে ম্যাঞ্চেষ্টারের এজেন্টেরা এদেশের ধুতির নমুনা পাঠাইয়াছিলেন। বিলাতের তাঁতিরা তাহা দেখিয়া প্রস্তুত করিতেছে। ফরাসিরা আর কাশ্মীরী শাল প্রায় ক্রয় করেন না, তাঁহারা ঐ শাল দেখিয়া স্বদেশে এক প্রকার নকল শাল প্রস্তুত করিতেছেন। আমরাও ক্রমে বিলাতী দ্রব্য দেখিয়া তাহার মত দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে শিখিব। কিন্তু সেই শিক্ষা গৃহে বসিয়া হইবে না। হিন্দু আচারকে সাগরের জলে ভাসাইয়া কালাপানী পার হইতে হইবে, তবেই ঐ সকল অর্থকরী বিদ্যা শিখিতে পারিব। আর যদি পবিত্র হিন্দুধর্ম্মকে কোলে করিয়া থাকি, তাহা হইলে বৃক্ষের গলিত পত্র ভিন্ন আমাদের ভাগ্যে আর অধিক কিছু ঘটিয়া উঠিবে না।

বাণিজ্য বিস্তার করিতে হইলেও বিদেশগমন নিতান্ত আবশ্যক। কেবল পল্লীর ভিতরে বসিয়া তৈল লবণ বেচিলে বাণিজ্য করা হয় না। যখন এখানকার শিল্পোন্নতি হইবে তখন নানা দেশে এজেন্ট রাখিতে হইবে, নচেৎ দ্রব্যাদি বিক্রয় হইবে না। বাণিজ্যের জন্য পণ্যদ্রব্যও জাহাজে করিয়া দেশে বিদেশে লইয়া যাইতে হইবে। পার্সীরা বোম্বাইয়ের বস্ত্র অনেক দূর দেশে লইয়া যাইতেছেন, তাই তাঁহাদের যত্ন নিষ্ফল হয় না। নতুবা লিটনের রাজবুদ্ধির প্রসাদে বস্ত্রের শুল্ক রহিত হওয়াতে বোম্বাইয়ের বণিক সম্প্রদায়কে আজি চক্ষের জলে ভাসিতে হইত। ভারতবর্ষে এখনও যে সমস্ত শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইউরোপে এবং আমেরিকায় এজেন্ট রাখিলে তাহার বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে। কটকের ও ঢাকার রূপার দ্রব্য, মেদিনীপুর ও বালেশ্বরের মহিষের শৃঙ্গের যষ্টি, মুর্শিদাবাদ ও দিল্লীর হস্তিদন্তের দ্রব্য, মোরাদাবাদের বাসন, জয়পুরের মীনা অলঙ্কার, কাশ্মীরের শাল প্রভৃতি নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট দ্রব্য এখনও এদেশে জন্মিতেছে। একবার বক সাহেবের চেষ্টায় অনেকগুলি বিক্রয়ও হইয়াছিল, কিন্তু বেগারে কাজ হয় না। ব্যবসায়ীরা ইউরোপে এজেন্ট রাখিতে পারিলে তবে সম্পূর্ণ উপকারের সম্ভাবনা। এখন আমাদের বক্তব্য এই, বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম্মকে মাথায় করিয়া থাকিলে এই সকল উদ্দেশ্যসিদ্ধি ঘটিবে কি না? ঘটিবে না, তাহা

নিশ্চিত। সে জন্য বলিতেছি, হিন্দুধর্ম্ম যদি পুনর্জ্জীবিত হয়, তবে উহার অনেক লেজামুড়া বাদ দিতে হইবে। অন্যান্য প্রস্তাবের সমালোচন এবং বর্ত্তমান সময়ে আমাদের কর্ত্তব্য কি, তাহা বারান্তরে লিখিত হইবে।

বিধবাবিবাহ সাধারণ্যে চলিত কেন হইতেছে না? ২৪ ভাদ্র ১২৯১। ৪৩ সংখ্যা

চিঠিপত্র

এ কথার উত্তরে আমি এই বলিতে চাই যে আইনের অসম্পূর্ণতাই বিধবাবিবাহ সাধারণ্যে প্রচলিত না হইবার একমাত্র কাবণ।

মহাত্মা দয়ার্দ্রহৃদয় শ্রীযুক্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় রাজদ্বারে নানাবিধ যত্ন ও বহু পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিয়া যে একটী আইন পাশ করাইয়াছেন, তাহাতে বিধবা পুনর্বিবাহিতা হইলে পুর্ব্ব স্বামীর ধনাধিকারে বঞ্চিতা হইবে, এই একটী বিধি হইয়াছে, "মুনীনাঞ্চ মতিভ্রম" বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই স্থলে সম্পূর্ণ ভ্রম হইয়াছে। বিধবা পুনর্বিবাহিতা হইলে পুর্ব্ব স্বামীর ধনে আজীবন অধিকারিণী থাকিবে, এইরূপ একটী বিধি ঐ আইনে হইবার জন্য যত্ন করা তাঁহার উচিত ছিল। এই প্রকার বিধি হইলে বোধ হয় এতদিনে দেশব্যাপকরূপে বিধবাবিবাহ বিনা চেষ্টায় চলিয়া যাইত। রাজা জমিদার ধনী লোকরাই নানা কারণে সমাজের নেতা এবং সমাজের উপর আধিপত্য করিতে সক্ষম। বালবিধবার সংখ্যাও ঐ ঐ শ্রেণীর মধ্যে অধিক। ঐ ঐ শ্রেণীর অশিক্ষিত অমিতাচারী যুবাসকল অকালে কালকবলে পতিত হইয়া এক একটী বালিকাকে মরণান্তকালের জন্য বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ করিতে রাখিয়া যান। ঐ সকল বাল্যবিধবা প্রচুর ধনের অধিকারিণী হইয়া এবং প্রচুর বিলাসসামগ্রী ও প্রচুর ভোগ্য-বস্তু পাইয়া ব্যভিচারিণী না হইয়া যদি সতীত্বরত্ন রক্ষা করিয়া কালযাপন করেন, তাহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়। ইহাদিগের ব্যভিচারিণী হইবার পথও পরিষ্কৃত হইয়াছে। কারণ, নজীর হইয়াছে, বিধবা হইবার পর ব্যভিচারিণী হইলে ধনাধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে না। সুতরাং যাহারা নিঃশঙ্ক হইয়া ব্যভিচারে রত হয়, তাহাদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ করিবার প্রয়োজন হয় না। ঐ নজীরই ধনী বিধবাদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ করিবার প্রধান প্রতিবন্ধক হইয়াছে। বিবাহ করিলে পুর্ব্ব স্বামীর ধন হইতে বঞ্চিত হইবে, বিবাহ না করিয়া যদি ব্যভিচাররত হয়, মৃত স্বামীর ধন হস্তভ্রষ্ট হয় না। ধন হস্তে থাকাতে তৎকৃত সমস্ত সুখের স্বচ্ছন্দে ভোগ হয়, এবং নজীরের কৃপায় ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার পথও পরিষ্কার আছে, তবে কেন তাহারা বিবাহ করিয়া ধনসুখ হইবে তঞ্চিত হইবে।

কিন্তু যদি এই সকল শ্রেণীর বিধবাদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ হয়, তাহা হইলে

সমাজ কাতর হইয়া পড়িবে। গুরু বলিতে পারেন না যে আমি মন্ত্র দিব না, পুরোহিত বলিতে পারেন না যে, আমি ব্রত করাইব না, জ্ঞাতি কুটুম্ব আত্মীয় স্বজনগণ বলিতে পারেন না যে আমরা হস্তের অন্ন খাইব না, সকলেই ধনের দাস, কেহ আপত্তি করিলেও তাহার মুখবন্ধ করা অতি সহজ কার্য্য। ঐ সকল শ্রেণীর বিধবাবিবাহে স্বদেশ বিদেশবাসী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়দিগকে নিমন্ত্রণ করিলে বোধহয় কৃপা করিয়া তাঁহারাও ঐ বিবাহের সভায় উপস্থিত হইয়া পদধূলি দিতে অসম্মত হইবেন না।

সম্প্রতি শিক্ষিতদিগের মধ্যে বিধবাবিবাহে মতদ্বৈধ নাই। কেবল সমাজের ভয়ে কেহ অগ্রসর হইতে সাহস করেন না। কিন্তু আইনের ঐ বাধাটি ঘুচিয়া গেলে, বোধ হয় বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইতে অধিক বিলম্ব হইবে না এবং অন্য কাহারও বিশেষ যত্ন করিতে হইবে না।

সম্পাদক মহাশয়গণ সকলে একবাক্য হইয়া যুক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক ব্যবস্থাপক সভাকে অনুরোধ করিলে এবং পুনঃপুনঃ লেখনী চালনা করিলে অবশ্যই ঐ আইনটীর সংশোধন হইবে এমত আশা করা যায়।

বাল্যবিবাহ। ৩১ ভাদ্র ১২৯১। ৪৪ সংখ্যা

মালাবারির লিখিত প্রস্তাবটী আজি আমাদিগের এবিষয়ে হস্তক্ষেপের কারণ হইয়াছে। আমাদের দেশ কেবল শস্যের পক্ষে উর্ব্বরাশক্তি সম্পন্ন নয়, বুদ্ধিমান মনুষ্যের উৎপাদন সম্বন্ধেও ইহার বিলক্ষণ উর্ব্বরাশক্তি আছে। যে দেশে ভূরি পরিমাণে বুদ্ধিমান মানুষ জন্মে, সে দেশের এমন দুর্দ্দশা কেন? সে দেশ চিরকাল পর পদে দলিত হয় কেন? "বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য" যাহার বুদ্ধি আছে তাহার বল আছে। যখন আমাদের দেশ বুদ্ধিমান, তখন বলবান সন্দেহ নাই। যদি বলবান্ হইল, তবে নিতান্ত দুর্ব্বলভাবে দীন বচনে পরপ্রত্যাশী হইয় কালযাপন করে কেন? এত অকর্ম্মণ্য ও অপদার্থ লোক দেখিতে পাই, তাহারই বা কারণ কি? অনেক সংসারে কিছুমাত্র সুখ স্বাচ্ছন্দ্য নাই, সর্ব্বদা বিবাদ বিসম্বাদ ঝগড়া কলহ। দিন নির্ব্বাহ হওয়া ভার, এরূপ ঘটনাই বা কেন? আমাদের বিবেচনায় বাল্যবিবাহ ও স্ত্রীগণের অশিক্ষা ইহার প্রধান কারণ। পরিবার প্রতিপালন ক্ষমতা জন্মিবার পূর্ব্বে দারপরিগ্রহ হয়, অল্প বয়সেই সন্তান-সন্ততি জন্মে, গৃহস্থের বাহ্য দুর্ব্বহভার স্কন্ধে নিক্ষিপ্ত হয়, সুতরাং বাল্যবিবাহকারী পুরুষ বিব্রত হইয়া পড়ে। সংসার বিপদের আধার হইয়া উঠে। সন্তানসন্ততির রীতিমত প্রতিপালন ও তাহাদের সুশিক্ষা হয় না। তাই আমরা এত অপদার্থ দেখিতে পাই, তাই আমরা এত জীর্ণদেহ ও জীবিকা অর্জ্জনের অক্ষম দেখিতে পাই।

এইরূপ একটী নিয়ম হওয়া আবশ্যক পুরুষ যাবৎ যোগ্য না হইবে, তাবৎ

জীবিকা অর্জ্জনে সমর্থ না হইবে, তাবৎ পুরুষের বিবাহ হইবে না। এ নিয়মটী বলবৎ হইলে ক্রমে কন্যার বিবাহকালেরও পরিবর্ত্তন হইয়া আসিবে···ফলতঃ আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি, পুরুষেরা যোগ্য ও উপার্জ্জনক্ষম হইয়া বিবাহ করিবার রীতি অবলম্বিত না হওয়াতেই আমাদের দেশের অধিকাংশ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে

এ পর্য্যন্ত ত গেল আমাদের নিজের কথা। মালাবারি মহোদয় বাল্যবিবাহের দোষারোপ সম্বন্ধে যে অভিপ্রায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এখন পাঠক একবার তদ্বিষয় শ্রবণ করুন। আমরা মালাবারির লিখিত পত্রের কিয়দংশের এখানে অনুবাদ করিয়া দিলাম, তাহা পাঠ করিলেই পাঠক বাল্যবিবাহের অপকারিতা বিষয়টী সুন্দররূপে বুঝিতে পারিবেন।

"বাল্যবিবাহ শরীর নষ্ট করে এবং শরীর মধ্যে পীড়া প্রবেশিত করে। বালক স্বামীকে পাঠ পত্যিাগ করিতে হয়, পীড়িত সন্তানের জন্ম হয়, পরিবার প্রতিপালন করা আবশ্যক হয়; দারিদ্র্য ও অধীনতাই বিরাজ করে, সংসারনির্ব্বাহ প্রণালী বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে, পাপ জন্মে। সংক্ষেপে এই কথা বলিলেই পয্যাপ্ত হইবে, বাল্যবিবাহে বিবাহিত দম্পতির জীবন ভগ্ন হইয়া পড়ে; যৌবনে বার্দ্ধক্য উপস্থিত হয় কিন্তু দম্পতি বাল্যবিবাহসূত্রে বদ্ধ না হইলে অধিক দিন বাঁচিতে পারিত। এইমাত্র অনিষ্ট নয় আরো অনেক আছে। অসময়ে স্বামী অথবা স্ত্রীর মৃত্যু হয়। যদি স্বামী কালগ্রাসে পতিত হয়, লক্ষ লক্ষ বিধবা সংখ্যার আর একটী সংখ্যা বৃদ্ধি হয় এবং দুই কিম্বা তিনটী শিশু মাতাপিতৃহীন বালকের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। প্রজা বৃদ্ধি হইলে দেশের দারিদ্র্য বৃদ্ধি হয়, এই যে একটি সিদ্ধান্ত আছে, এস্থলে তাহারও বিচারের অবসর উপস্থিত হইতেছে। যে ধনজন সম্পন্ন দেশে অতিরিক্ত প্রজাবৃদ্ধি হেতুক কষ্টের নিবারণের উপায় আছে, সেই দেশেই যখন কষ্ট অনুভূত হয়, তখন দরিদ্র দেশে উহার যে বিষময় ফল ফলে, তাহার আব কি বর্ণন করা যাইবে। এই ভারতবর্ষে এই অনিষ্ট বৃদ্ধির অনেক অস্বাভাবিক কারণ আছে" ইত্যাদি।

মালাবারি মহোদয় বাল্যবিবাহ নিবারণের যে কয়েকটী উপায়ের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা এই: "শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ এই কথাটি বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া দিন কোন বিবাহিত পুরুষকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিতে দিবেন না। প্রস্তাব লেখক শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে এই পরামর্শ দিয়াছেন, তাঁহারা সভা করিয়া বিবাহের একটী সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া এই স্থির করুন, তাহারা ন্যূন বয়সে বিবাহ করিবেন না এবং অতি বালিকারও পাণিগ্রহণ করিবেন না। তিনি গবর্ণমেণ্টের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের কর্ত্তাদিগকে এই নিয়ম অবলম্বন করিবার অনুরোধ করিতেছেন যে তাঁহারা তুল্য গুণসম্পন্ন দুইজন কর্ম্মার্থী উপস্থিত হইলে বিবাহিতকে পরিত্যাগ করিয়া অবিবাহিতকে কর্ম্ম দেন।"

প্রস্তাব লেখক বাল্যবিবাহ নিবারণের উপযোগী এইরূপ কয়েকটী উপায় চিন্তা করিয়াছেন। আমরা সমাজের অবস্থা দেখিয়া বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি, গবর্ণমেণ্ট

হস্তক্ষেপ না করিলে পিতামাতার ইচ্ছাকৃত পুত্রের পুত্তলিকা বিবাহের নিবারণ হইবে না। গবর্ণমেণ্ট আইন করুন, যে পিতামাতা বার বৎসরের ন্যূনে কন্যার এবং বিশ বৎসরের ন্যূনে পুত্রের বিবাহ দিবেন, তিনি দণ্ডনীয় হইবেন। এরূপ একটী কঠোর নিয়ম না হইলে বাল্যবিবাহের নিবারণ হইবে না। এই নিয়মটী সমাজের অবস্থার পরিবর্ত্তন এবং কালক্রমে বাল্যবিবাহের অবস্থার পরিবর্ত্ত করিয়া তুলিবে। আমাদিগের মতে বিবাহ সম্বন্ধে এককালে যুগপ্রলয় উপস্থিত করা উচিত নয়। তাহাতে মহাবিপাক উপস্থিত হইবে।

প্রস্তাব লেখক পিতামাতার অর্থলোভে বৃদ্ধের সহিত বালিকার পাণিগ্রহণ প্রসঙ্গে আক্ষেপ করিয়া শেষে আমাদিগকে একটী নূতন কথা শুনাইয়াছেন। তিনি বলেন, কোন কোন স্থলে ১০।১৫ বৎসর বয়সের কন্যার সহিত ৮।১০ বৎসর বয়সের বরের বিবাহ হয়! এতন্নিবন্ধন অনেক স্থলে পিতৃহত্যা ও ভ্রাতৃহত্যা হইয়া থাকে। আমরা বিস্মিতচিত্তে এই নূতন বৃত্তান্তটী শুনিলাম। বঙ্গদেশের এরূপ ঘটনা হইবার সম্ভাবনা নয়। শাস্ত্রে আছে, বয়োজ্যেষ্ঠা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবে না। তবে যদি কুলীন মহাপ্রভুর দলে এরূপ ঘটনা হয়, তাহা বলিতে পারি না।

বাল্যবিবাহ। ৮ পৌষ ১২৯১। ৬ সংখ্যা

বোম্বাই নগরের ইণ্ডিয়ান স্পেক্টেটার নামক সর্ব্বপ্রধান সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের সুযোগ্য সম্পাদক মিষ্টর বাইরাম জি. এম. মালাবারি একজন বিচক্ষণ লোক। আমরা ইতিপূর্ব্বে ইঁহার বাল্যবিবাহ বিষয়ক ক্ষুদ্র পুস্তিকার সমালোচনা করিয়াছি। তাঁহার এই প্রস্তাব অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও উত্তর পশ্চিমের দেশীয় সংবাদপত্র সমূহে বাল্যবিবাহ এবং বালবৈধব্য সম্বন্ধে মহা আন্দোলন উঠিয়াছে। অনেকেই বাল্যবিবাহের বিরোধী, এই বিষময়ী কুপ্রথা দিন দিন যে ভারতের হিন্দু এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের হৃদয়রক্ত শোষণ করিয়া তাহাদিগকে ক্রমে শারীরিক ও মানসিক তেজোহীন করিয়া তুলিতেছে, ইহা প্রায় সকলেই স্বীকার করেন, কিন্তু মালাবারি মহাশয় যে যে উপায়ে এই কুপ্রথা নিবারণ করিতে চাহেন, তৎপ্রতি অধিকাংশ লেখকের সহানুভূতি নাই। সেগুলিকে অনেকেই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করেন না। সাধারণের ভাবগতিক দেখিয়া এবং মতামত সংগ্রহ করিয়া মালাবারি মহাশয় তাঁহার পূর্ব্ব প্রস্তাবসমূহ সংশোধিত ও কিয়দংশে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। মালাবারি মহাশয় আমাদিগের ধন্যবাদের পাত্র সন্দেহ নাই। মালাবারি স্বয়ং হিন্দু বা মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত নহেন। তিনি পারসী, পারসীদিগের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত নাই। গত জনসংখ্যার তালিকা হইতে জানা যায় যে এই সম্প্রদায়ের যুবতীগণের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ বিংশতি বর্ষের পরে বিবাহিতা হইয়া থাকেন। সুতরাং মালাবারির স্বয়ং বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা নাই। এইজন্য একদিকে

তাঁহার বর্ত্তমান চেষ্টা অতিশয় প্রশংসার্হ সন্দেহ নাই। অপরদিকে তিনি হিন্দু নন বলিয়াই, হিন্দুদিগের মতামত ভাবস্বভাব বেশী জানেন না বলিয়াই, তাঁহার প্রস্তাবিত উপায় সম্বন্ধে এত মতভেদ হইতেছে। আমাদের আর একটী দুঃখ হয় যে হিন্দুদিগের দুর্গতি দেখিয়া ভিন্ন সম্প্রদায় ভুক্ত, ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী মালাবারি মহাশয় ব্যথিতপ্রাণ হইয়া তাহা দূর করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। সেই হিন্দুগণ আমরা আপনাদিগের সামাজিক মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি এত উদাসীন এ দুঃখ রাখিবার স্থান কোথায়? মালাবারির মত সুবিজ্ঞ এবং পদস্থ কোন হিন্দুসন্তান উৎসাহ সহকারে এ বিষয়ের সংস্কার সাধনে যত্নবান হইলে অতি সহজে যে এই ভীষণ কুপ্রথা সমাজ হইতে দূরীভূত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে আমাদিগের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ পর্য্যন্ত হিন্দুসমাজ মধ্যে বাল্যবিবাহনিবারণের জন্য উপযুক্ত চেষ্টা করা হয় নাই। ব্রাহ্মগণ এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ চেষ্টা করিয়াছেন সত্য, পুস্তিকা প্রচার, বক্তৃতা ও অন্য অন্য উপায়ে আন্দোলন করিয়া তাঁহারা এই কুপ্রথার প্রতি হিন্দুসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা সমাজের লোক নন বলিয়া তাঁহাদের সমুদয় যত্ন ও চেষ্টা বিফল হইয়া গিয়াছে, সমাজ তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপও করেন নাই। তাঁহাদের যত্নে কেবল ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের মধ্যেই যাহা কিছু বাল্যবিবাহের নিবারণ করিতে পারিয়াছে। কিন্তু আমাদিগের স্থির ধারণা এই যে মালাবারি মহাশয় আজ যে রূপ যত্ন করিতেছেন, এবং কিছুকাল পূর্ব্বে বাঙ্গালার ব্রাহ্ম সম্প্রদায় যতটুকু চেষ্টা করিয়াছেন, হিন্দুসমাজভুক্ত কোনও পদস্থ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যদি ততটুকু যত্ন কবিতেন এতদিনে এই কুপ্রথা বহুল পরিমাণে নিবারিত হইয়া যাইত।

বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিবার জন্য হিন্দুসমাজে কিয়ৎ পরিমাণে চেষ্টা করা হইয়াছে। বিদ্যাসাগর এই সংস্কারসাধনার্থে বহু শ্রম চেষ্টা ও অর্থব্যয় করিয়াছেন ও করিতেছেন। বিধবাবিবাহ প্রচলিত করা যত কঠিন বাল্যবিবাহ নিবারণ করা তত কঠিন নহে। উপযুক্ত বয়সে বালিকার বিবাহ দিলে আজ কাল কাহাকেও সমাজচ্যুত হইতে হয় না। সুতরাং বিদ্যাসাগরের মত পদস্থ এবং সুবিজ্ঞ কোন হিন্দুসন্তান যদি বাল্যবিবাহ নিবারণের জন্য চেষ্টা করিতেন, আজ সমাজ হইতে তাহা বহুল পরিমাণে দূরীকৃত হইত। তাহাতে চিরবৈধব্যের কষ্টও বহুল পরিমাণে হ্রাস হইত। বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করিবার চেষ্টা বালবিধবাদিগের কষ্ট নিবারণই প্রধান উদ্দেশ্য। বয়স্থা হইয়া যাঁহারা বিধবা হইয়াছেন তাঁহাদিগের পুনর্ব্বিবাহ হইল বা না হইল সমাজ তজ্জন্য বিশেষ চিন্তিত হন না; তাঁহাদের আত্মীয় স্বজনবর্গও তৎপ্রতি বড় ভ্রূক্ষেপ করেন না। কিন্তু যাঁহারা বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিবার চেষ্টা করিয়া বিফল প্রযত্ন হইয়া হতাশ হইয়াছেন, তাঁহারাও যদি অপরদিকে আপনাদিগের শক্তি, উৎসাহ এবং চেষ্টা নিয়োগ করিয়া বাল্যবিবাহ নিবারণের চেষ্টা করিতেন, হিন্দুবিধবাদিগের চিরবৈধব্য জনিত কষ্টরাশি

অনেকটা নিবারিত হইতে পারিত। গত সংখ্যা অনুসারে কেবল বাঙ্গালায় দশবৎসরের ন্যূনবয়স্কা ৩৬,৩৯৪টী হিন্দু বালবিধবা ছিল এবং দশ হইতে চতুর্দশবর্ষ বয়স্কা ৭০,৩০৬টী বালবিধবা ছিল। আর পঞ্চাদশ বর্ষের লক্ষাধিক বালিকা বৈধব্যদশাগ্রস্থ ছিল। যদি সমাজ মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রথা এত বহুল পরিমাণে প্রচলিত না থাকিত তাহা হইলে এই লক্ষাধিক বালিকার অধিকাংশকেই আজীবন এই ভীষণতম বৈধব্যযাতনা ভোগ করিতে হইত না। সুতরাং যাঁহারা বালবিধবাদিগের অশ্রুজল নিবারণ করিতে ব্যগ্র, তাঁহারা যেমন একাধিক সমাজে এই সকল বালবিধবার পুনর্ব্বিবাহ প্রচলিত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন, সেইরূপ যদি অপব দিকে বিশেষ উৎসাহ ও যত্নসহকারে বাল্যবিবাহ নিবারণ করিবার চেষ্টা করিতেন, তাহাতে, দূরতঃ তাঁহাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য সফল হইত এবং সমাজমধ্যে বাল্যবিবাহের সংখ্যা বিশেষরূপে কমিযা যাইত।

বাঙ্গালার হিন্দুসমাজে বর্ত্তমান সময়ে বাল্যবিবাহের অবস্থা কি, আলোচনা নাম্নী মাসিক পত্রিকার গত মাসের (অগ্রহায়ণ) সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত তালিকা দৃষ্টে তাহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে। যথা:

পুরুষ

	বযস	বযস	বযস	বযস
	০—১৩	১৩—১৪	১৫—১৯	০—১৯
মোট হিন্দুবালক	৬৪৫১৮১৬	২৫২২৪৫৫	১৭৩৮৮৬৮	১০৭১৩১৩৯
মোট অবিবাহিত	৬০৮৪৩৯৪	১৯১০২৫৮	৯৩১২৪৬	৮৯২৫৯৯৮
মোট বিবাহিত	৩৫৭৮৮০	৬০৭৭২২	৮০৪০৮১	১৭৬৯৬৮৩
অনুপাত বিবাহিত	১/১৮	১/৫	১/২	১/৬

স্ত্রীলোক

মোট হিন্দু বালিকা	৬৪৬৬২৯৯	৬০৮৭৪১	০	৮৫০১১৩১
মোট অবিবাহিত	৫৫৭৪১১	৬০৮৭৪১	০	৬১৬৬১৫২
মোট বিবাহিত	৮৭৬২৮৬	১৪২৪১৯৭	০	২৩২০৪৮৩
অনুপাত বিবাহিত	১/৮	১/৩	০	১/৪

স্ত্রী পুরুষ উভয়

মোট বালকবালিকা	১২৯১৬৭১৯	৪৫৫৮৬৮৩	১৭৩৮৮৬৮	১৯২১৪২৭০
মোট অবিবাহিত	১১৬৪১৮০৬	২৫১৮৯৯৯	৯৩১২৪৬	১৫৯২০২
মোট বিবাহিত	১২৫৪১৬৬	২০৩১৯১৯	৮০৪০৮১	৪০৯০১৬৬
অনুপাত বিবাহিত	১/১১	১/৬	১/২	১/৬

এখন দশ বৎসরের ন্যূনবয়স্কা প্রায় নয় লক্ষ বিবাহিতা বালিকার মধ্যে চারি পাঁচ বৎসরের মধ্যে যে কতকসংখ্যক বালিকা বিধবা হইবে তাহা কে বলিতে পারে? বাল্য-বিবাহপ্রথা যদি নিবারিত হইয়া যায় তাহাতে বালবিধবার সংখ্যাও হ্রাস হইয়া যাইবে। আমাদিগের দৃঢ় ধারণা চিরবৈধব্য জনিত দুঃখরাশি আংশিকরূপে নিবারণ করিতে চাহিলে বাল্যবিবাহ প্রথার বিশেষ সংস্কার সাধন করা প্রয়োজন। এই দিকে সামাজিক নেতৃবর্গের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা।

আমরা এতক্ষণ আমাদিগের নিজের কথাই বলিলাম। কিন্তু তাহাতেই প্রবন্ধ সুদীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। মালাবারির নূতন প্রস্তাব সমূহের বিস্তৃত সমালোচনা বারান্তরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

ভারতে বাঙ্গালী। ২৯শে পৌষ ১২৯১। ৯ সংখ্যা

কিছুকাল পূর্ব্বে এই ভারতক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রকার রাজনৈতিক সামাজিক আন্দোলনে বাঙ্গালাই হিন্দুসমাজের অগ্রণী ছিল। যখন মান্দ্রাজ ঘোর অন্ধকারে সমাচ্ছাদিত যখন বোম্বাইও অর্দ্ধ নিদ্রাভিভূত তখন বাঙ্গালার লোকেরা সভা করিতে বক্তৃতা করিতে এবং গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন প্রেরণ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তখনও বাবু রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি স্বদেশহিতৈষী বাঙ্গালিগণ মাতৃভূমির বিবিধ উন্নতি সাধনে যত্নবান ছিলেন। কিন্তু এক্ষণে বোম্বাই জাগরিত হইয়া উঠিয়াছে, মান্দ্রাজের অমানিশা ভেদ করিয়া আলোকচ্ছটা প্রকাশ পাইতেছে কিন্তু এখন বাঙ্গালার সে তেজ সে বীর্য্য, সে উৎসাহ হ্রাস পাইয়াছে। আজ বাঙ্গালা আর ভারত সমাজের অগ্রণী নহে। রিপণ উৎসবে আমরা দেখিয়াছি যে বোম্বাই ও মান্দ্রাজের যে নবতেজের নবোদ্যমের নূতন স্ফূর্ত্তি প্রকাশ পাইতেছে, তাহার সমক্ষে বাঙ্গালার পূর্ব্ব গৌরব লোপ পাইবার উপক্রম হইতেছে। এখন বিশেষ চেষ্টা না করিলে বাঙ্গালীরা আর তাঁহাদিগের পূর্ব্ব মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিবেন না। বাঙ্গালা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করুক, স্বার্থপরের মত আপনি আলোকে থাকিয়া বোম্বাই ও মান্দ্রাজকে অন্ধকারেই ফেলিয়া রাখিবার চেষ্টা করুক, আত্মম্ভরী হইয়া আপনি সকল গৌরব ভোগ করিবার বাসনা করুক, কিন্তু আর কৃতার্থতা লাভের সম্ভাবনা দেখি না। বোম্বাই ও মান্দ্রাজ যেরূপ দ্রুতবেগে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে যেরূপ গাঢ় উৎসাহ সহকারে মাতৃসেবায় নিযুক্ত হইতেছে, বাঙ্গালাও সেইরূপ দ্রুতবেগে তাদের সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হউক এই আমাদের ইচ্ছা।

যাঁহারা ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বিশেষতঃ বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রদেশে কখন ভ্রমণ করিতে গিয়াছেন, তাঁহারাই জানিতে পারিয়াছেন, তত্তৎ দেশবাসী শিক্ষিত ব্যক্তিগণ আজিও বাঙ্গালিদিগকে কত সম্মান করেন। উত্তর পশ্চিমে বা পঞ্জাবে এই ভাব উজ্জ্বলরূপে

দৃষ্ট হয় না বটে, কিন্তু একেবারে এ ভাবের বিলোপ নাই। উত্তর পশ্চিম ও পঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে বহুতর বাঙ্গালী কেরাণী কর্ম্মোপলক্ষে বাস করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের অনেকেই অর্দ্ধশিক্ষিত, অনাচারী, অবিনীত এবং উদ্ধত স্বভাব। তাঁহাদের হইতে বাঙ্গালীর নাম উত্তর পশ্চিমে ঘৃণার বস্তু হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু আজিও শিক্ষিত হিন্দুস্থানিদিগের বাঙ্গালার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি অক্ষুণ্ণ আছে। বোম্বাই, বিশেষতঃ মান্দ্রাজের কথাই নাই। মান্দ্রাজী শিক্ষিত হিন্দুরা বাঙ্গালী জাতিকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। এই শ্রদ্ধার ভাব দেখিয়া বাঙ্গালী পর্য্যটক লজ্জায় নতশিরা হন। এই শ্রদ্ধার মূল কি? বাঙ্গালীর স্বদেশ হিতৈষণা, বাঙ্গালীর বাকপটুতা, বাঙ্গালীর রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে অমিত উৎসাহ, এইগুলিই এই গভীর শ্রদ্ধার মূল। কিন্তু ক্রমে যত কাল যাইতেছে, যত অপরাপর প্রদেশবাসিগণের চক্ষু ফুটিতেছে, যত তাঁহারা স্বয়ং আপনাদিগের উৎসাহ কার্য্যক্ষমতা ও স্বদেশহিতৈষিতার পরিমাণ করিতে শিখিতেছেন, তত তাঁহাদের বাঙ্গালীর প্রতি শ্রদ্ধা হ্রাস হইয়া যাইতেছে, ইহা কি দুঃখের বিষয় নহে? ভারতে যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও উপজাতির বাস, পরস্পাবের প্রতি শ্রদ্ধাভাব ভিন্ন তাহাদের কখন প্রকৃত প্রস্তাবে একতা জন্মিবে না। বিশেষ ব্যবধান হইয়া চলিতে হইবে। ভারতের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের মুখ চাহিয়া যাহাতে আপনাদিগের সৎগুণাবলির প্রকাশ কবিয়া বোম্বাই ও মান্দ্রাজের শ্রদ্ধা ও ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পাবি, তদ্বিষযে বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করিতে হইবে।

বাঙ্গালী ভারতের জাতিসমূহের মধ্যে শারীবিক বলবিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা হীন। উন্নতকায় পঞ্জাবী বা হিন্দুস্থানী, বিশালবক্ষা মহারাষ্ট্রীয় অথবা কষ্টসহিষ্ণু মান্দ্রাজবাসীর সমক্ষে আমবা অতি ক্ষুদ্র জীব। ভারতের অপর সকল জাতিরই সৈনিক হইবার অধিকার আছে, কেবল বাঙ্গালী সে অধিকার হইতে বঞ্চিত। ভারতের অপর সকল জাতির ইতিহাস শাবীরিক বলেব গৌরবমালায় সুশোভিত, কেবল বাঙ্গালী সুশোভিত নহেন। আমরা শারীবিক বলে হীন বটে, কিন্তু "বুদ্ধি র্যস্য বলং তস্য" এই প্রবাদবাক্য অনুসাবে বুদ্ধিবলে ও বিদ্যাবলে বলীয়ান ছিলাম। কিন্তু অ মরা এ বলেও দিন দিন ক্ষীণ হইতে চলিলাম। যে মান্দ্রাজকে অশিক্ষিত অসভ্য বলিয়া বাঙ্গালী দুই দিন পুর্ব্বে ঘৃণা করিয়াছেন, সেই মান্দ্রাজে এক্ষণে যত লোক লিখিতে ও পড়িতে পারেন ও তথায় যত বালক বালিকা লিখিতে ও পডিতে শিক্ষা করিতেছে, ভারতের অপর কোন প্রদেশের লোকে সেরূপ লিখিতে পড়িতে পারেন না। বোম্বাইও শিক্ষা বিষয়ে বাঙ্গালার অপেক্ষা হীন বলিয়া এতকাল অনেকের বিশ্বাস ছিল, কিন্তু তাহাও ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। স্বদেশ হিতৈষিতার কথা আর কি বলিব? বোম্বাই ও মান্দ্রাজে যে নূতন জাতীয় শক্তির অভ্যুদয় হইতেছে, তাহার সমক্ষে বাঙ্গালীর অভ্যুদয়, অভ্যুদয় বলিয়াই পরিগণিত হয় না। সেই সেদিন এক পুণা নগরে একটী স্ত্রী বিদ্যালয়ের জন্য লক্ষাধিক টাকা নিমেষমাত্রে সংগৃহীত হইয়া গেল। কিন্তু আমাদের জাতীয় ভাণ্ডারে ধনসংগৃহীত এত চেষ্টা, এত যত্ন, এত বক্তৃতা, এত গণ্ডগোল,

এত বাদবিসম্বাদ কিন্তু আজিও অৰ্দ্ধলক্ষ টাকা সংগৃহীত হওয়া দূরে থাকুক স্বাক্ষরিত পৰ্য্যন্ত হইল না। আর আমাদের দেশহিতৈষিতার গৌরব কোথায়? এই রিপণ উৎসব উপলক্ষে বোম্বাই যাহা করিয়াছে, আমরা কি তাহার শতাংশেরও একাংশ করিতে পারিয়াছি? বোম্বাই রিপণের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ একটী বিদ্যালয় সংস্থাপন করিবার সঙ্কল্প করিয়া এতদর্থে কত না চেষ্টা করিতেছেন আর বাঙ্গালাদেশ কতিপয় সহস্র মুদ্রা জ্বালাইয়াই সন্তুষ্ট হইয়া আছে। নির্দ্ধন মান্দ্রাজও এ বিষয়ে বদ্ধপরিকর হইয়াছে, কিন্তু ধনী বাঙ্গালা নিশ্চেষ্ট হইয়া আছে। এতকাল আমাদের এই অভিমান ছিল আমরা ভারতীয় জাতিসমূহের মধ্যে বাগ্মিতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কিন্তু সেদিন বোম্বাইয়ের রিপণ সম্বৰ্দ্ধনা সভায় শ্রীযুক্ত মেথা মহোদয় যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহার মত সুন্দর, সুললিত, সারগর্ভ ও ওজস্বিনী বক্তৃতা বাঙ্গালায় এক লালমোহন ঘোষ ভিন্ন আর কেহ করিতে পারেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হয় না। বাঙ্গালা যে যে বিষয়ে এতকাল প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, সেই সেই বিষয়েই আজ হীন হইয়া পড়িতেছে ইহা কি আজ আমাদিগের ভাবিবার বিষয় নহে?

চিঠি। ২০ জ্যৈষ্ঠ ১২৯২

মহাশয়,

"নবজীবনে"র সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার সরকারের "হিন্দু বিধবার পুনর্ব্বিবাহ হওয়া উচিত কিনা" বক্তৃতার সারমর্ম্ম পাঠ করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে শিক্ষিতাভিমানী একজন কৃতবিদ্য যুবক সাধারণ সমক্ষে হিন্দুবিধবার বিবাহ হওয়া উচিত কি না ও তদ্বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করিবেন, ইহা আমাদিগের কখন কল্পনায়ও উদিত হয় নাই। বিধবাবিবাহ প্রচলিত না হওয়াতে দিন দিন যে বঙ্গগৃহ নরক-তুল্য হইতেছে, তাহা যাঁহারা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াও হিন্দুবিধবার বিবাহ হওয়া উচিত কি না এই বিষয়ে বক্তৃতা করিতে অগ্রসর হন, তাঁহারা নিশ্চয় কোন সাংঘাতিক মস্তিষ্কপীড়ায় পীড়িত, তাঁহাদিগের সুচিকিৎসার আবশ্যক। অক্ষয়বাবু বিধবাবিবাহ সম্পূর্ণ শাস্ত্রসঙ্গত নহে, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য অনেক কুযুক্তি ও সুযুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন এবং নিজের বুদ্ধিমত্তা ও উদারতার পরিচয় দিয়াছেন। অক্ষয়বাবুর বক্তৃতার সারমর্ম্ম এই যে, বিধবাগণ বিবাহ না করিয়া চিরজীবন ব্রহ্মচর্য্য পালন করিলে পবিত্র আর্য্যবংশের চিরগৌরব রক্ষিত হয়। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, হিন্দুশাস্ত্র সাম্যবাদী নহে, কাজে কাজেই পুরুষের স্ত্রীবিয়োগ হইলে তিনি পুনরায় দারপরিগ্রহ করিতে পারেন বলিয়াই যে, স্ত্রীলোকের স্বামী বিয়োগ হইলেই পুনরায় স্বামী গ্রহণ করিতে পারিবেন, তাহা শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রেত নহে। এক্ষণে অক্ষয়বাবুকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, হিন্দুশাস্ত্র সাম্যবাদী নহেন তিনি কিরূপে বলিলেন? কোন্ গ্রন্থে তিনি পাঠ করিয়াছেন যে, তিনি

এরূপে বলিলেন? কোন্ গ্রন্থে তিনি পাঠ করিয়াছেন যে, আর্য্য ঋষিগণ সাম্যবাদী ছিলেন না? আর তিনি যে ব্রহ্মচর্য্য ব্রহ্মচর্য্য করিয়া চীৎকার করিতেছেন সেই ব্রহ্মচর্য্যের অর্থই বা কি? ব্রহ্মচর্য্য কি কতকগুলি বাহ্যিক আড়ম্বরের উপর নির্ভর করে, না তাহার আত্মার উৎকর্ষতা সাধনের আবশ্যক করে? বর্ত্তমান সমাজের বিধবাগণ যেসকল ব্রত উপবাসাদি করিয়া থাকেন এবং পিশাচসম পুরুষগণের অত্যাচারে আহার বিহার সম্বন্ধে যে সকল ত্যাগ স্বীকার করেন এবং যাহা অক্ষয়বাবুর স্থূল দৃষ্টিতে ব্রহ্মচর্য্যের চুড়ান্ত সীমা বলিয়া অনুভূত হইয়াছে, সেগুলি প্রকৃতপক্ষে কি ব্রহ্মচর্য্যের সহায়তা করে, চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ কেবল বুঝিতে পারিবেন আমাদিগের সমাজের শাসনভয়ে বিধবাগণ কেবল ধর্ম্মকার্য্য করেন, প্রকৃতপক্ষে তাহা ধর্ম্মকার্য্যই নহে। দায়ে পড়িয়া বা বাধ্য হইয়া যদি কেহ কোন সৎকার্য্য করে, ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে সে, সেই সৎকার্য্যের ফলভোগী হইতে পারে না। যদি আত্মার উৎকর্ষতা সাধনই ব্রহ্মচর্য্য হয় এবং তাহা হইলে যাঁহারা হিন্দু বিধবাগণকে ব্রহ্মচারিণী দেখিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা তদ্বিষয়ে কি উপায় অবলম্বন করিতেছেন? আমরা ত দেখিতে পাই যাঁহাবা ব্রহ্মচর্য্য বলিয়া চীৎকার করেন তাঁহারাই বিধবাদিগের দ্বারা সাংসারিক সকল কার্য্য করাইয়া লন। স্ত্রীকে লেখাপডা শিখাইতে মহা যত্ন, কিন্তু বিধবা ভগ্নীর হস্তে পুস্তক দেখিলেই মহা বিপদ মনে করেন। আত্মার উৎকর্ষসাধন করিতে হইলে তাহার জন্য নিয়মিত বিদ্যাভ্যাস ও শিক্ষার প্রয়োজন কিন্তু হিন্দুবিধবাব কি শাস্ত্রাধ্যয়ন করিবার সময় আছে? সে সংসারের দাসী এবং পরিচারিকা। দাদা বিধবাবিবাহ হওয়া উচিত নহে, বক্তৃতা করিতে গিয়াছেন, সে বেচারি এই বৈশাখ মাসের রৌদ্রে দাদার জন্য বেলের পানা, চিনির সরবৎ প্রস্তুত করিতেছে, দাদা তাহা পান করিয়া ভাবিলেন হিন্দুবিধবাকে যাঁহারা বিবাহ দিতে ইচ্ছা করেন তাহারা অতি অর্ব্বাচীন, তাহাদিগের বিবাহ দিলে এমন নিষ্কাম ধর্ম্মাচরণ, তাহারা করিবে? বক্তৃতাস্থলে "বঙ্গবাসীর পঞ্চানন্দ" ওরফে মামদো উপস্থিত থাকিয়া বেশ সুরসিকত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বঙ্গবাসীর সম্পাদককে অনুরোধ করি, তিনি নৈহাটির প্রসিদ্ধ ভূতের ওঝা গঙ্গা ময়রাকে আনয়ন করিয়া তাঁহার ঘাড় হইতে পঞ্চানন্দকে তাড়াইয়া দিউন, ইহার উপদ্রবে সমাজ ছারখার হইল।

২৫এ মে ১৮৮৫ বিনয়াবনত

জামালপুর। শ্রী

হিন্দু বিধবার আবার বিবাহ হইবে কিনা। ২ আষাঢ় ১২৯২। ১১ সংখ্যা

'নবজীবনে' প্রকাশিত প্রবন্ধের সমালোচনা

এই প্রবন্ধ গত ২৮এ বৈশাখ কলিকাতার সাবিত্রী লাইব্রেরিতে সুশিক্ষিত লব্ধপ্রতিষ্ঠ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সরকার কর্ত্তৃক পঠিত ও জ্যৈষ্ঠ মাসের নবজীবনে প্রকাশিত হইয়াছে।

সভাস্থ শ্রোতৃবর্গ ও নবজীবনের পাঠক পাঠিকাগণ উক্ত সুদীর্ঘ প্রবন্ধের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন এবং বিধবার পুনর্বিবাহের ঔচিত্যানৌচিত্যের একরূপ সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছেন। প্রবন্ধে বিধবাবিবাহের অনৌচিত্য প্রতিপন্ন করিবার জন্য লেখক বিস্তর প্রয়াস পাইয়াছেন কিন্তু সে বিষয়ে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা উচিত। অক্ষয়বাবু হিন্দুসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত সুশিক্ষিত নায়করূপে খ্যাত, সুতরাং তাঁহার মতামতের উপর হিন্দুসমাজের মঙ্গলামঙ্গল ও সংস্কার অনেকটা নির্ভর করে। বিশেষ তিনি প্রধান নগরীর প্রধান সভায় নিজ মত বিস্তৃতভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় তাঁহার পঠিত প্রবন্ধের সমুচিত আলোচনা হওয়া উচিত। আমাদের সামান্য জ্ঞান ও শক্তি সঞ্চালনে অক্ষয়বাবুর সুদীর্ঘ প্রগাঢ় প্রবন্ধের পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। ভরসা কবি পাঠকগণ ধৃষ্টতা ক্ষমা করিবেন।

প্রবন্ধের প্রারম্ভে অক্ষয়বাবু একটী গূঢ় তত্ত্বের কথা বুঝাইয়াছেন। তিনি বলেন—জাগতিক সমস্ত অনুষ্ঠানই দুই দিক দিয়া দুই ভাবে দেখা উচিত। এই দুই ভাবের একটী বৈজ্ঞানিক বা জড়ভাব, অন্যটী ধর্ম্মের বা আধ্যাত্মিক ভাব। জগতের সমস্ত পদার্থই উভয় ভাবে কেমন করিয়া দেখিতে হয় উপযুক্ত উদাহরণাবলী দ্বারা লেখক তাহা বিশদ করিয়া বুঝাইয়াছেন। সে সকল উদাহরণের পুনরুল্লেখ এস্থলে অনাবশ্যক। প্রবন্ধ পাঠে পাঠক বুঝিতে পারিবেন।

কোন তত্ত্ব বা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ জন্য অক্ষয়বাবু বিজ্ঞানকে তুচ্ছ করিয়া কেবল ধর্ম্মকে অবলম্বন করিতে বলিয়াছেন। তিনি আরও বলেন কোন একটী তত্ত্বের, বিজ্ঞান যে অংশ দেখায় সে অতি সামান্য। সেটুকুর পর্য্যালোচনা কর্ত্তব্য কিন্তু গৌণকল্পে। অগ্রে, মধ্যে, শেষে সর্ব্বস্থলে ধর্ম্মাধর্ম্ম রূপ বহুবিস্তৃত অংশের পর্য্যালোচনা করাই মুখ্য কর্ত্তব্য। অক্ষয়বাবুর ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তির এরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করা উচিত হয় নাই। অক্ষয়বাবু যখন প্রথমেই সমস্ত পদার্থের ও তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক দুইভাব, দুইদিক, দুইপিঠ দেখাইয়াছেন, তখন সেই দুইভাব বজায় রাখাই কর্ত্তব্য। সকল পদার্থই যখন জড় ও আধ্যাত্মিক গুণে সংশ্লিষ্ট এবং ঐ দুইটী গুণ যখন সম্পূর্ণ বিরুদ্ধভাবাপন্ন তখন একটী ত্যাগ করিয়া অন্যটী বজায় করিতে গেলে, প্রকৃত পুরুষার্থের অসম্ভাব হইবে, তৎপক্ষে কিছুমাত্র সংশয় নাই। অতএব গভীর চিন্তায় ইহাই স্থির হইবে যে বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের সামঞ্জস্য রক্ষা করাই সর্ব্বতোভাবে উচিত। তাহা না করিলে সংসারের কোন কার্য্যই সুসিদ্ধ হয় না। আর লেখক যে ধর্ম্মের বহু বিস্তৃত অংশ দেখেন, বিজ্ঞানের সঙ্কীর্ণ অংশ দেখেন, তাহারও কারণ আছে। বিজ্ঞান মনুষ্যের জ্ঞান ও বুদ্ধির আয়ত্তগত জড়তাময় পদার্থ, ধর্ম্ম মনুষ্যের চরমোৎকৃষ্ট কল্পনাসম্ভূত আধ্যাত্মিক পদার্থ। সুতরাং বিজ্ঞানকে সংকীর্ণ ও ধর্ম্মকে বিস্তৃত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বিজ্ঞান বুদ্ধির আয়ত্ত বলিয়া অসাধ্য। সুতরাং

সাধারণ চক্ষে এতদুভয়ের আদর্শ পরিমাণের বিস্তর প্রভেদ প্রতীয়মান হইবে বিচিত্র কি? তবে তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিগণ এতদুভয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া কার্য্য করেন এবং উভয়েরই আতিশয্যাংশ বাদ দিয়া সত্তবাংশে অপূর্ব্ব মাধুর্য্য দেখিতে পান।

ধর্ম্মের ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষার জন্য মনুষ্যত্ব পক্ষে মাংসাহার সম্বন্ধে মনুর কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া অক্ষয়বাবু মনুর মীমাংসাকে বলবান করিয়াছেন। যথা—

"প্রবৃত্তিরেবা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাবলা।"

"জীবগণের মাংসাহারিদি প্রবৃত্তির নিবৃত্তিতেই মহাফল।"

এস্থলে জীবগণ বলিতে অবশ্য মনুষ্যগণ বুঝিতে হইবে। কারণ জীব-সম্বন্ধে ঐ ব্যবস্থা খাটিতে পারে না। যথা—সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি শ্বাপদও মাংসাসী জীবগণ।

এক্ষণে দেখা উচিত উল্লিখিত ধর্ম্মের ব্যবস্থা মনুষ্য কতদূর পালন করিতে পারে। কেবলমাত্র আত্মসুখের জন্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয় বিষয়ের পরিতৃপ্তির জন্য প্রাণী বধকরা ও অনর্থক প্রাণিদিগকে ক্লেশ দিতে ইচ্ছা করা অন্যায় ও ধর্ম্ম বিগর্হিত। এ পর্য্যন্ত ধর্ম্মের অনুজ্ঞা অবশ্য পালনীয়। কিন্তু যে স্থলে মাংসে শোণিত শুক্র বৃদ্ধি করিয়া দেহের সবলতা সম্পাদন করিবে সেখানে প্রাণী বধের ক্লেশের কথা মনে করিয়া ক্ষান্ত থাকিলে আত্মরক্ষা হইবে না। যে ভাবেই হুউক আত্মাকে সতত রক্ষা করিতে হইবে; ইহা ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানানুমোদিত। তবে মানবের ধর্ম্মভাব থাকাতে এইমাত্র প্রাধান্য আছে যে, প্রাণী ব্যতীত অন্য কোন পদার্থে জীবন রক্ষার উপযোগী ও মাংসের ন্যায় গুণকারী বস্তু পাইলে অনর্থক প্রাণী বধ করিবে না। সেই জন্য পণ্ডিত প্রবর কোমথ বলিয়াছেন "যাহাতে শরীরের পুষ্টি হয় সেইরূপ খাদ্য গ্রহণ করাই আমাদের কর্ত্তব্য; কেবল জিহ্বার শিরা বিশেষের তৃপ্তির জন্য কোনরূপ খাদ্য গ্রহণ করা অকর্ত্তব্য।" এই বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থার সহিত "নিবৃতিস্ত মহাবলা" এই ধর্ম্মের ব্যবস্থার সামঞ্জস্য রাখিয়া কার্য্য করাই মনুষ্যের কর্ত্তব্য এবং তাহা হইলেই নির্ব্বিঘ্নে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হয়। প্রত্যেক অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের সামঞ্জস্য না রাখিলে কার্য্য হয় না। সকল পদার্থেই যখন দুই দিক দুই পীঠ, দুই ভাব এবং যেমন তাহার বিরুদ্ধ গুণাত্মক, সেইরূপ সেই উভয়ের সামঞ্জস্য রক্ষার নামই মনুষ্যত্ব। এই সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে বলিয়াই মনুষ্য অন্যান্য জীব হইতে শ্রেষ্ঠ এবং জীব জগতের সর্ব্বোচ্য পরিণতি মনুষ্য।

অক্ষয়বাবুর প্রদর্শিত দ্বিতীয় উদাহরণেরও ঐরূপ মীমাংসা করা যাইতে পারে। জলমগ্নোন্মুখ ব্যক্তিকে বাঁচাইতে পারিলে ধর্ম্মের কথা শুনা উচিত। আর যে ব্যক্তি না পারে, তাহার বিজ্ঞানের যুক্তিই গ্রহণ করা উচিত। যে ব্যক্তি বিজ্ঞানের পরামর্শ না শুনিয়া ধর্ম্মোন্মত্ত হইয়া নদীতে ঝাঁপ দেয়, তিনি দুর্ব্বলতাহেতু নিজে মরেন এবং যাহাকে বাঁচাইতে যান সেও মরে। এইরূপ দাহকে ধর্ম্মোন্মত্ততা বলে, ধার্ম্মিকতা বলে

না। আবার যিনি বিজ্ঞানের ক্রীতদাস হইয়া মরোণন্মুখ ব্যক্তির দিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য করেন বা তাহাকে দেখিয়া কাতর হন না, তিনিও বিজ্ঞানোন্মত্ত, প্রকৃত বৈজ্ঞানিক নহেন। যেমন বিজ্ঞানের পরামর্শে সর্ব্বস্থলে কার্য্য করিলে, মনুষ্যত্বের হানি হয়, সেইরূপ ধর্ম্মের অনুজ্ঞানুসারে সকল স্থানে কার্য্য করিলে অনর্থপাত হয়।

যিনি বিজ্ঞানবাদী, তিনি কেবলমাত্র ধর্ম্মবাদীকে অকর্ম্মণ্য ভাবেন। এই সাম্প্রদায়িক-ভাবে পরিচালিত হইয়া উভয়ের দোষোল্লেখে ব্যস্ত। কিন্তু যথার্থবাদী কখন দোষী হন না। তিনি ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে একটী মধুর সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া জগতের তত্ত্ব নিরূপণ ও কার্য্য করেন। "আডাম স্মিথ" প্রণীত অর্থনীতিশাস্ত্র ও তৎপ্রণীত ধর্ম্মতত্ত্ব বিচার, এই দুইখানি গ্রন্থের বিষয় লেখক উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার প্রথমখানির অনুজ্ঞানুসারে চক্ষুলজ্জাবিহীন হইয়া কাগক্রান্তি, তোলা, মাসার হিসাব করিলে কর্ম্ম চলে না। দ্বিতীয়খানির উপদেশানুসারে কেবল হৃদয়ের ব্যাপার, গাঢ়রূপ পুঁজি করিয়া তাহাকে সুদে খাটাইলে, চোটা চালাইলে আসল বাড়ে না। এ সংসারে কর্ম্ম কাণ্ডই প্রধান। যিনি কেবল বিজ্ঞানের কথা শুনেন তিনিও একটী প্রাকটিক্যাল জানোয়ার, আবার যিনি কেবল ধর্ম্মের কথা শুনেন তিনিও একটী সম্পূর্ণ সেন্টিমেণ্টাল জানোয়ার। উভয়ের কাহার দ্বারা কর্ম্মকাণ্ড সুসিদ্ধ হয় না। কর্ম্ম করিতে হইলে, কোন স্থলে বিজ্ঞানকে খাট করিয়া ধর্ম্মকে প্রবল করিতে হইবে, কোথাও বা ধর্ম্মকে হ্রাস করিয়া বিজ্ঞানকে বলবান করিতে হইবে। এই সকল অনুপাত ও এইরূপ সুসঙ্গতি রক্ষা করিতে পারিলেই মানবজীবন সার্থক হয় ও মনুষ্যত্ব রক্ষা হয় এবং ইহাকেই প্রকৃত একটি প্রাকটিক্যালবাদিত্ব বলা যায়। বিজ্ঞানবাদী ও ধর্ম্মবাদী বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের চরম আদর্শ স্থির করিয়াছেন। লেখক প্রদর্শিত আডাম স্মিথের নির্দ্দয় নির্ম্মম হৃদয়ে রতি মাসা, কাগ, ক্রান্তির গণনাই বিজ্ঞানের চরম আদর্শ। মানবচরিত্র সংগঠনের ও সঞ্চালনের আদর্শ ব্যবস্থার নাম "ধর্ম্ম"। লেখক ধর্ম্মের এই লক্ষণ নিরূপণ জন্য অনেক পণ্ডিতে অনেক কথা বলিয়াছেন ও ধর্ম্মকে অনেকভাবে দেখিয়াছেন। সে সকল কথার উল্লেখ এস্থলে নিস্প্রয়োজন। লেখকের লক্ষণই এখানে স্থির রাখা গেল।

অক্ষয়বাবুই স্বীকার করিয়াছেন—ধর্ম্মের কোন আদর্শেরই পূর্ণ ভোগ হয় না, সম্পূর্ণ আয়ত্ত হয় না, ধর্ম্ম কখন হস্তামালক হন না। ধর্ম্ম মরীচিকার মত মিথ্যা মোহজ পদার্থ নহে। ধর্ম্মকে কেহই ত্যাগ করিতে পারে না। সাধনাবলে ধর্ম্মের সহিত সামীপ্য ক্রমেই গাঢ়তর হয় অথচ সাযুজ্য ইহকালে সাধ্য নহে। এ সকল কথা স্বীকার্য্য। কিন্তু "সাযুজ্য অনন্তকাল সাধ্য" একথা বর্ত্তমান অবস্থায় স্বীকার করিতে পারা যায় না। পরোক্ষ বা অনন্তকালে কি অবস্থায় কি হইবে, তদ্বিষয়ে আমাদের কিছুমাত্র দর্শন নাই। সুতরাং বিষয়ে নিশ্চিতবাদ, ইহকালে কাল্পনিক বিশ্বাস মাত্র।

বৈজ্ঞানিক চেষ্টাকে লেখক প্রাকটিক্যাল বলিয়াছেন। কিন্তু সে কথা প্রাকৃতিক

বিজ্ঞান সম্বন্ধে খাটে। যাহারা মরুতে সাগর তরঙ্গ শৈবাল, সমুদ্র শুষ্ক করা পর্ব্বত উড়াইয়া দেওয়া, আজ অসাধ্য আছে, কালে তাহা সাধ্য হইতে পারে, কিন্তু মনুষ্যের কার্য্য-কলাপে, আচার ব্যবহারে কেবল মাত্র বৈজ্ঞানিক ভাব অথবা চেষ্টা, সাধ্য নহে। কেবল মাত্র বিজ্ঞানের চরম আদর্শ লক্ষ্য করিয়া মনুষ্য কখন সংসারে কার্য্য করিতে পারে না। একথা পূর্ব্বেও বুঝান হইয়াছে।

অতএব কেবলমাত্র ধর্ম্মের অথবা বৈজ্ঞানিক আদর্শ লক্ষ্য করিয়া মনুষ্যজীবন কার্য্যক্ষম হয় না অথবা মনুষ্যত্ব রক্ষা হয় না। একথা বোধ হয় বুঝাইতে পারিয়াছি। তবে মনুষ্যের কর্ত্তব্য কি? বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের সামঞ্জস্য রক্ষা করা, সুসংহতি রক্ষা করা, স্থল বিশেষে, পদার্থ বিশেষে উভয়ের অনুপাত ঠিক রাখা, মনুষ্যের কর্ত্তব্য ও ইহাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব। তাহা হইলেই বিজ্ঞানে ও ধর্ম্মে মিলন হয়, মিশ্রিত হয়, দুইটি বিসদৃশ ভাবের একত্র মিলন, সুসংগতি বিজ্ঞানে ধর্ম্মে বিবাহ কি অপূর্ব্ব ভাব! ইহাকেই বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বৈজ্ঞানিক ধর্ম্ম অথবা প্রাকটিক্যাল ধর্ম্ম বলেন। প্রাকটিক্যাল ধর্ম্ম অশ্বডিম্ব নহে। বৈজ্ঞানিক ধর্ম্ম "হাস্যকর শব্দ সংযোগ" নহে। কেবল সাম্প্রদায়িকভাবে পরিচালিত হইয়া ধর্ম্মবাদী প্রাকটিক্যাল ধর্ম্ম আর অশ্বডিম্ব সমান কথা বলেন, বৈজ্ঞানিক ধর্ম্মকে "নিতান্ত হাস্যকর" শব্দ সংযোগ বলেন। পক্ষান্তরে বিজ্ঞানবাদীরা বলেন "There are theories which are never serious, because they are not practical." ইত্যাদি অর্থাৎ "যাহা সহজে যাজনা হয় না, তাহা ধর্ম্ম নহে" এই কথা বলিয়া ব্যঙ্গ করেন। অতএব ঐরূপ বাক্য প্রয়োগ কেবল উভয় পক্ষের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ব্যঞ্জক মাত্র। ঐ সকল কথার অন্য কোন অর্থ বা মূল্য নাই॥

"যে আপনাকে ভুলিলে আমাদের অস্তিত্ব থাকে না, যে আপনাকে ভুলা অসম্ভব, ঘোরতর (আন-প্রাকটিক্যাল) সেই আপনাকে ভুলিবার চেষ্টা করিবে, আপনারই অন্ন সংস্থান করিয়া উঠিতে পারি না, অথচ পরকে দুমুঠা দিতেই হইবে, নিজে রোগ শোকের জ্বালায় অস্থির, তবু পরকে সান্ত্বনা দিব" ইত্যাদি উপদেশগুলি কার্য্যতঃ নিশ্চয় অসম্ভব, উহার আয়ত্তি কখন সম্ভব নহে। তবে শুদ্ধ জপ তপ, ধ্যান ধারণায় ঈশ্বর প্রাপ্তির চেষ্টার ন্যায় ঐ সকল উপদেশ সাধনার নাম মাত্র চেষ্টায় যদি কোন ফল হয় হউক, প্রকৃতপক্ষে কার্য্যতঃ কোন ফল নাই ইহা নিশ্চয়।

উল্লিখিত ধর্ম্মের উপদেশ মাত্র অবলম্বন করিয়া অক্ষয়বাবু এতক্ষণ পরে মূল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেছেন। আমরাও তদনুসরণে আলোচ্য বিষয়ে আস্তে আস্তে সভয়ে উপনীত হইতেছি।

ধর্ম্মের এই রহস্যভাব (অর্থাৎ অসাধ্য হইলেও যাজনার চেষ্টা) আমাদের সর্ব্বদাই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। কোন সদনুষ্ঠানের সম্পূর্ণ যাজনা হয় না বলিয়া সেই অনুষ্ঠানের পরিবর্ত্তন করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই; যদি অনুষ্ঠান ভাল হয়, তবে কিসে

তাহার সুচারু যাজনা হইতে পারে তাহাই দেখা আমাদের কর্ত্তব্য।" মনুষ্য মাত্রেই স্বভাবতঃ যাজনার বা চেষ্টায় অসাধ্য স্থলে নির্দ্দোষভাবে সেই অসাধ্য সদনুষ্ঠানকে সাধ্যায়ত্ত করিবার চেষ্টা করে ও সেই পরিমাণে পরিবর্ত্তন করে। চেষ্টা করিয়া বারবার পদস্খলন ও সমস্ত জীবনে ভগ্নোদ্যম হওয়া অপেক্ষা সাধ্যায়ত্ত করিয়া সেই অসাধ্য অনুষ্ঠানকে কার্য্যে পরিণত করিলে হানি কি? যাহা হউক তারপর অক্ষয়বাবু যাহা বলিতেছেন অবহিত চিত্তে শুনুন।

"হিন্দুবিধবার পুনর্ব্বিবাহ হওয়া উচিত কিনা? এই প্রশ্ন আর একভাবে বলিলে এই বলিতে হয় যে, বিধবার ব্রহ্মচর্য্য পালনীয় কিনা? বিধবার ব্রহ্মচর্য্য যদি সদনুষ্ঠান হয়, তবে পালনীয় বটে, কঠোর হইলেও পালনীয়। সম্পূর্ণ যাজন অসম্ভব হইলেও (Unpractical) অবশ্য পালনীয়।

হিন্দুবিধবার পুনর্ব্বিবাহ হওয়া উচিত কিনা? এখানে হিন্দু শব্দ প্রয়োগ করিয়া সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় নাই। লেখক যেমন প্রবন্ধের আরম্ভ হইতে এ পর্য্যন্ত সকল বিষয়েরই সাধারণভাবে আলোচনা করিয়া আসিতেছেন, এস্থলেও সেইরূপ করা উচিত ছিল। বিধবার পুনর্ব্বিবাহ উচিত কিনা? এই কথারই বিচার উদারভাবে হওয়া উচিত। সাম্প্রদায়িকতা সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য। যদি বিধবার পুনর্ব্বিবাহ যুক্তিসিদ্ধ না হয়, তবে সর্ব্ব দেশের সকল সভ্য জাতিই ঐ প্রথা অমঙ্গলজনক ও কুশলপ্রদ বলিয়া জানিবেন এবং উহার অসদ্ভাবে হিন্দুসমাজের শ্রেষ্ঠত্ব অবশ্য স্বীকার করিবেন। এক্ষণে মূল কথার বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

বিধবার ব্রহ্মচর্য্য আধ্যাত্মিকভাবে ধর্ম্মের ভাবে, অত্যন্ত কঠোর, প্রায় সর্ব্বস্থলেই অসাধ্য সদনুষ্ঠান। এই সদনুষ্ঠান পালনীয় কিন্তু অনেক স্থলে ইহার যাজনা অসম্ভব। অক্ষয়বাবু বলেন "সম্পূর্ণ যাজন অসম্ভব হইলেও, অবশ্য পালনীয়। ধর্ম্মের অন্যান্য আদর্শের যেরূপ কতক পবিমাণ যাজন আছে, সামীপ্য আছে সাযুজ্য নাই। বিধবার ব্রহ্মচর্য্যের অথবা সতীত্বধর্ম্মের কতক পরিমাণ যাজন নাই বা সামীপ্য নাই। সতীত্বধর্ম্মের যাজন ও সাযুজ্য একসময়ে একেবারেই সিদ্ধ করিতে হইবে। সতীত্বধর্ম্ম পালনের অথবা সাযুজ্য লাভের পরিমাণের কম বেশি নাই। সর্ব্বদেশে সকল বিধবাকেই একভাবে এক অবস্থাতে এককালে পূর্ণমাত্রায় সতীত্বধর্ম্মে সিদ্ধ হইতে হইবে। সতীত্বধর্ম্ম যাজনে সময় বা অবস্থার কিছু মাত্র ব্যবধান নাই। উহার যাজন যাহাকে বলে, সিদ্ধিও তাহাকে বলে। এরূপ স্থলে "সম্পূর্ণ যাজন অসম্ভব হইলেও পালনীয়" একথা বলিলে এরূপ বুঝায় যে, বিধবা যতটুকু পারেন ততটুকু সতীত্বধর্ম্ম যাজন করিবেন। তবে কি অক্ষয়বাবু বিধবাদিগের সতীত্বধর্ম্ম যাজন হইতে, উহাতে সিদ্ধিলাভ পর্য্যন্ত একটা সময় কল্পনা করিয়া, ঐ সময়ের মধ্যে দুই চারিবার পদস্খলন স্বীকার করেন ও ক্ষমা করেন? এ ভাবই বা কিরূপে মনে আনিতে পারি? তবে কি অক্ষয়বাবু বিধবার আতপ তণ্ডুল আহার, মস্তক মুণ্ডন, মলিন

বস্ত্র ব্যবধান, মৎস্য মাংস ত্যাগ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার বাহ্যিক আড়ম্বর পরিত্যাগকে ব্রহ্মচর্য্য বলেন? তাই বা কেমন করিয়া হয়? সাটিনের গাউন পরিহিতা, কারুকার্য্য খচিত অঙ্গাবরণে আবৃতা, মাংস মাংসাশিনী, সুগন্ধযুক্তা মুক্তকেশী বিধবার কি সতীত্বধর্ম্ম বা ব্রহ্মচর্য্য পালনে অধিকার নাই? আমরাও একথা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। বিশেষ যখন অক্ষয়বাবু কেবল মাত্র "বিধবার ব্রহ্মচর্য্য" বলিয়াছেন, উঁহার অন্য কোন লক্ষণ নির্দ্দেশ করেন নাই, তখন জাতি বা দেশ নির্ব্বিশেষে কায়মনোবাক্যে মৃত পতির শয্যার পবিত্রতা রক্ষাকেই সতীত্ব ধর্ম্ম অথবা ব্রহ্মচর্য্য বলি। এক্ষণে সকলেই দেখুন সতীত্ব ধর্ম্মের এরূপ আদর্শ হইলে উহার যাজন ও সিদ্ধির মধ্যে দেশ, কাল, ব্যবধান আদৌ থাকে না, সামর্থ অসামর্থ থাকে না, পরিমাণে ইতর বিশেষ থাকে না, জাতি বা দেশ বিশেষের বিচার থাকে না। এ বিষয় বিশদ করিবার জন্য পুরুষের সৎ-ধর্ম্মপালনের তুলনায় বুঝাইতেছি। পুরুষের জিতেন্দ্রিয়তা সাধনে পদস্খলন ক্ষমাযোগ্য, কিন্তু স্ত্রীজাতির সতীত্ব ধর্ম্ম সাধনে পদস্খলন ক্ষমাযোগ্য নহে। অন্ততঃ বর্ত্তমান সময়ে কোন সমাজেই এরূপ পদস্খলনকে ক্ষমা করেন না। সুতরাং পুরুষের জিতেন্দ্রিয়তার যাজন ও সিদ্ধিলাভে সময়ের ব্যবধান আছে এবং তাহা সতীত্ব ধর্ম্ম যাজন অপেক্ষা অনেক গুণে সহজ। উদাহরণ দ্বারা বুঝাইতেছি।

পরাশর ব্যাসদেব প্রভৃতি ঋষি মুনিগণ হইতে বর্ত্তমান সময়ের সাধুগণ পর্য্যন্ত সকলেই জিতেন্দ্রিয়তা সাধনে অনেকবার পদস্খলন সত্ত্বেও সিদ্ধিলাভ করিয়া জিতেন্দ্রিয়, মহাযোগী, সাধুনাম ধারণ করিয়াছেন ও প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছেন। কিন্তু বলুন দেখি কোন্ কালে কোন্ বিধবা বা সধবা একমাত্র পদস্খলন সত্বে সতী পদবাচ্য হইতে পারিয়াছেন? তবে কেহ কেহ এস্থলে প্রাতঃস্মরণীয়া পঞ্চকন্যার নামোল্লেখ করিতে পারেন। আমরাও বলি যদি কেহ দুহিতা বা ভগ্নিকে পঞ্চকন্যার ন্যায় প্রাতঃস্মরণীয়া সতী করিয়া ঘরে রাখিতে চান রাখুন। তাঁহার পক্ষে বিধবার পুনর্ব্বিবাহ অসঙ্গত হইতে পারে। কিন্তু অনেকেই এইরূপ সতী ঘরে রাখিতে চান না, সেই জন্য তাঁহারা বিধবার পুনর্ব্বিবাহের প্রচলন জন্য সতত ব্যস্ত ও উৎকণ্ঠিত

হিন্দু বিধবার আবার বিবাহ হইবে কি না? ৯ আষাঢ় ১২৯২। ১১ সংখ্যা।

সমালোচনা

আর একটী বিষয় বিবেচনা করা উচিত। পুরুষের ও স্ত্রীর পক্ষে ধর্ম্মের আদর্শে ব্যবস্থা সমান নহে। পুরুষ পক্ষে চরিত্র সংগঠন ও সঞ্চালন জন্য ধর্ম্মের অনেক ব্যবস্থা আছে। তাহার মধ্যে যে কোন আদর্শ অবলম্বনে পুরুষ সাধু ও যশস্বী হইতে পারেন। সর্ব্বজীবে দয়া, বিশ্বব্যাপী প্রেম, দানে মুক্তহস্ততা, সত্যপ্রিয়তা ন্যায়নিষ্ঠতা, জিতেন্দ্রিয়তা

প্রভৃতি অনেকগুলি আদর্শ আছে। উহাদের কোন একটী বা দুই চারিটী কতক পরিমাণে সাধন করিতে পারিলেই, পুরুষ সাধুপদ বাচ্য হইতে পারেন। অথবা যিনি নিজে যে পরিমাণে সাধনা ও সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন। সতীত্ব রক্ষায় অসমর্থা হইয়া, স্ত্রী হাজার দয়াবতী হউন, মুক্তহস্তা বা ন্যায়পরায়ণা হউন, কিছুতেই তিনি যশস্বিনী বা সাধুচরিত্রা হইতে' পারিবেন না। স্ত্রীর পক্ষে সতীত্বই প্রথম ও শেষ আদর্শ ব্যবস্থা। অন্য কোন গুণ না থাকিলেও এবং সতীত্ব রক্ষাতেই, স্ত্রী সাধ্বী ও যশস্বিনী, পক্ষান্তরে সহস্র গুণ সত্ত্বে সতীত্ব হানিতে, স্ত্রী অসতী ও কলঙ্কিনী। আবার দেখুন—পুরুষের পক্ষে আশ্রম বিভাগ আছে। বাল্যকালে বিদ্যাভ্যাস, যৌবনে ধন, জন, পুত্র, কলত্র, পরিব্রত হইয়া ঐহিক সুখ ভোগ, প্রৌঢ়ে ধর্ম্মোপার্জ্জন, চতুর্থে বনগমন ও বানপ্রস্থ অবলম্বন। সুতরাং পুরুষপক্ষে অবস্থা সময়ানুযায়ী ধর্ম্মের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু বিধবার ষোড়শ বর্ষেও যে ব্রহ্মচর্য্য ব্যবস্থা, অশীতি বৎসরেও সেই ব্রহ্মচর্য্য ব্যবস্থা। সেই জন্য পূর্ব্বে বলিয়াছি বিধবার ব্রহ্মচর্য্য যাজনায় কাল, অবস্থা, পরিমাণ ইত্যাদি কিছুরই ব্যবধান নাই। অতঃপর পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখুন বিধবার ব্রহ্মচর্য্য পালন কত কঠোর, কতদূর সদনুষ্ঠান। এরূপ অসাধ্য কঠোর ধর্ম্ম যদি লক্ষ বিধবার মধ্যে একজনও সাধন করিতে পারেন, তবে তাঁহাকে আমরা স্বর্গীয়া দেবী মূর্ত্তি বলিয়া মানবমন্দিরে পূজা করি, ঊর্দ্ধরেতা ভীষ্মদেবের ন্যায় তাঁহাকে সম্মান করি, মানবীর মধ্যে তাঁহাকে গণনা করি না।

তারপর অক্ষয়বাবু হিন্দুবিধবাবিবাহের মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে হিন্দুবিবাহ পদ্ধতি পর্য্যালোচনা করিলে হিন্দুবিধবার পুনর্ব্বিবাহ হইতেই পারে না। মন্ত্রে আছে ধ্রুবতারার ন্যায় স্ত্রী পতিকুলে ধ্রুব থাকিবে, অরুন্ধতীর ন্যায় পতিতে আবদ্ধা থাকিবে, শ্বশুর শ্বশ্রূ, ননন্দী দেবরে সম্রাজ্ঞী হইবে। স্ত্রী কেবল "The empress of my heart" হইলে চলিবে না, "The slave empress of a whole family হওয়া চাই" ইত্যাদি মন্ত্রে ও বাক্য দ্বারা স্ত্রী কখনই পতিকুল ত্যাগ করিতে পারেন না। পতিকুল ত্যাগ করিলেই কুলত্যাগিনী, কুলটা, ব্যভিচারিণী হইল। এস্থলে বলা আবশ্যক যে হিন্দুশাস্ত্রে আমাদের প্রগাঢ় দর্শন নাই। শাস্ত্রের বাক্যই হউক, ধর্ম্মের অনুজ্ঞাই হউক, বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলে যুক্তি অবলম্বনই শ্রেষ্ঠ ও শ্রেয়ঃ। বৃহস্পতি বলিয়াছেন যুক্তিহীন বিচারে ধর্ম্মহানি হয়। এক্ষণে দেখা যাউক যুক্তি অবলম্বনে ঐ সকল শ্লোকের কিরূপ অভিপ্রায় বুঝা যায় আমাদের এই ধারণা যে পতি বিদ্যমানে স্ত্রী পতিকুলে ধ্রুব থাকিবে, অরুন্ধতীর ন্যায় পতিতে আবদ্ধা থাকিবে, পতির সম্বন্ধে পতির পরিবাররূপ সাম্রাজ্যে সাম্রাজ্ঞী হইবে। স্ত্রী ও পতি বর্ত্তমানেই এই সকল অঙ্গীকার বাক্যের কার্য্য হইবে। কিন্তু পতির বর্ত্তমানে যে উহার কার্য্য হইবে, একথা উদ্ধৃত মন্ত্রের তাৎপর্য্যার্থে বোধ হয় না। তবে কেহ আপত্তি করিতে পারেন "পতিকুল শব্দ" প্রয়োগের সার্থকতা কি? আমরা বলি রাজা হইলে যেরূপ রাজকুল

বলিতে হয়, সেইরূপ পতির পরিবারকে পতিকুল ভিন্ন আর কি বলিবে? আবার যেমন রাজত্ব অভাবে রাজকুল বলা যাইতে পারে না, সেইরূপ পতিত্বের অবিদ্যমানে পতিকুল বলা যাইতে পারে না। আবার দেখুন ইংলণ্ড যেমন এক্ষণে ভারতের স্বামী ভারত এক্ষণে ইংলণ্ডের নিকট যে সকল প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ, ইংলণ্ডের স্বামিত্বের অপলাপে কি ভারত ঐ সকল পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞায় বাধ্য থাকিলেও দায়িত্ব স্বীকার করিবে, কখনই না; সেইরূপ স্বামীর অবিদ্যমানে স্ত্রীর বিবাহকালীন অঙ্গীকার ও দায়িত্ব কখনই স্থির থাকিতে পারে না। হিন্দু মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি প্রত্যেক সভ্য জাতির মধ্যেই বিবাহবিধি প্রচলিত আছে। প্রত্যেক জাতির নরনারীর মধ্যেই বিবাহকালীন কতকগুলি প্রতিজ্ঞা পঠিত হইয়া থাকে। অন্য কোন জাতির স্ত্রী পতি অভাবে পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ জ্ঞান করে না এবং সে সকল সমাজও মৃতপতি স্ত্রীকে পতিকুলে আবদ্ধ করিয়া রাখে না। লেখক যেন স্ত্রীকে পতিকুলে ধ্রুবের ন্যায় রাখার জিদ বজায় রাখার জন্য বলেন—"হিন্দু-স্ত্রীর বিবাহ কোন একটী পরিবার কিম্বা কুলের সহিত হয় কুলই মুখ্য বিশেষ পুরুষ কেবল পাত্র মাত্র।" এইরূপ কোন ফাঁকি সিদ্ধান্ত লেখকের ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তির করা উচিত নহে। কারণ আবার হিন্দুই বলেন "যদি কিঞ্চিৎ বার দোষঃ কিং কুলেন নবা।" কুল কেবল বংশ মর্য্যাদার পরিচায়ক সেই জন্য অগ্রে জিজ্ঞাস্য কুলের সহিত কোন জাতিরই বিবাহ হয় না। লেখক বলেন—হিন্দুর বিবাহ বিলাতের মত রূপজ গুণজ মোহের মিলন নহে, নেড়া-নেড়ীর কাণ্ডও নহে। আমরা বলি—যেদেশ বিধবার ব্যভিচার ও পাপ স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে, সেদেশের লোকের মুখে ওরূপ সদর্প ব্যঙ্গোক্তি শোভা পায় না। লেখক হিন্দুবিবাহের দুইভাব দেখাইয়াছেন। একটী নিকৃষ্ট অর্থাৎ জড়ভাব, তাহার কার্য্য ইন্দ্রিয়ভাব চরিতার্থ ও পুত্রোৎপাদন। দ্বিতীয়টী আধ্যাত্মিকভাব ও যোগের বিষয় স্ত্রী অর্দ্ধাংশ, পুরুষ অর্দ্ধাংশ, এই দুই অংশে মিলিয়া পূর্ণ এক হওয়া, হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য "এই মিশ্রণ এবং একীকরণ।" এই বিবাহের আধ্যাত্মিক ভাব ও যোগের বিষয় লেখক এরূপ কবিত্বপূর্ণ ভাষায় প্রাঞ্জলভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, উহা পাঠ করিলেই উচ্চশ্রেণীর কবি প্রণীত কাব্য, নভেল নাটক প্রভৃতির নায়ক নায়িকাকে মনে পড়ে, হৃদয়ে আনন্দের উৎসব উথলিয়া উঠে। কিন্তু পরক্ষণেই যখন যে মহাত্মা কোন ব্যবস্থা করেন কোন ধর্ম্মশাস্ত্র কিম্বা কোন কাব্যাদি প্রণয়ন করেন, তিনি তখন তাহার চরমোৎকর্ষের আদর্শই সৃষ্টি করেন। তাই বলিয়া কি সাংসারিক সমস্ত ঘটনার সেই আদর্শের মিলন হয় অথবা তদনুসারে কার্য্য হয়? কখনই হয় না। সেই জন্য আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ধর্ম্মের ও বিজ্ঞানের ব্যবস্থার পরস্পর সামঞ্জস্য রক্ষা করিলেই মনুষ্যত্ব রক্ষা হয় ও কার্য্য হয়। কোন বিষয়েরই চরম আদর্শ এ সংসারে সাধ্য বা প্রাপ্য নহে।

অক্ষয়বাবুর আর একটী ফাঁকি সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিতে হইল। তিনি বলেন হিন্দুর দৃঢ় বিশ্বাস মানবের পঞ্চত্বপ্রাপ্তিতে তাঁহার আত্মার ধ্বংস হয় না, পরকালে

বিশ্বাস হিন্দুর জাতিধর্ম্ম। "এখন দেখা উচিত পরলোকগত পতির সহিত বিদেশগত পতি অভাবে যেমন স্ত্রীর বিবাহের দাবী নাই; পরলোকগত পতি অভাবেও সেইরূপ দাবী চলিতে পারে না। কিন্তু পরলোকগত পতিও বিদেশগত পতিতে অবস্থাগত অনেক প্রভেদ দেখি। বিদেশগত পতির পর্ব্বকায়া, পুর্ব্বাবস্থার সহিত পুনরাগমনের প্রত্যাশা নাই। পরলোকগত পতির সহিত কি ভাবে, কি অবস্থায় মিলন হইবে, তাহার স্থিরতা নাই, বিদেশগত পতির সহিত ঠিক পুর্ব্বমিলনের ন্যায় মিলন হওয়ায় সম্পূর্ণ সম্ভব আছে। সুতরাং পরলোকগত পতির অভাবে ইহকালে ঐহিক সুখের জন্য অন্য পতি গ্রহণে আবশ্যক হইলে বিদেশগত পতি অভাবে অন্য পতি গ্রহণও আবশ্যক হয় না। কারণ বিদেশগত পতির পুনরাগমে ঐহিক সুখের সম্ভোগ পুর্ব্ববৎই হইবে।

তদনন্তর লেখক বিধবার ক্ষেমঙ্করী, শান্তিময়ী দেবীমুর্ত্তি অপুর্ণ ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে বিধবার কার্য্যকারিতা ও উপকারিতা মধুরভাবে বিবৃত করিয়াছেন। সে কার্য্যকারিণী অনুপমা প্রতিমার ফটোগ্রাফ স্থানাভাবে এস্থলে তুলিতে পারিলাম না। পাঠক প্রবন্ধ পাঠে সেই বিমল আনন্দ উপভোগ করিবেন। অক্ষয়বাবুর ন্যায় চিত্রকর বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজে দুলভ একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। তবে কথা এই তিনি বঙ্গীয় ব্রহ্মচারিণী বিধবারূপ দাসীমূর্ত্তি চিত্রিত করিতে অমৃতময় কবিত্বভাণ্ডারের অপব্যয় করিয়াছেন। স্বাধীনতা বিহীনা, সমাজের কঠোর শাসনে শাসিতা, দীনা, মলিনা, বঙ্গীয়া ব্রহ্মচারিণী বিধবা আর ক্রীতদাসী উভয়ই সমান। কারণ যাহার স্বাধীন কর্তৃত্ব নাই, তাহার পরসেবা, পরোপকার, দায়ঠেকা দাস্যবৃত্তি ভিন্ন কিছুই নহে। সুতরাং সামাজিক দায়িত্বকে সতীত্বপালন বলা যুক্তিসঙ্গত হয় নাই। আর এক কথা কোন বিষয়ের বা তত্ত্বের অন্যায়, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ করিতে হইলে প্রকৃত বিষয় প্রকৃত অবস্থায় রাখিয়া তাহার বিচার প্রণালী যথাযথ লিপিবদ্ধ করাই উচিত। সেদিকে দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল কবিত্বের দিকে দৃষ্টি রাখিলে প্রবন্ধ অতিরঞ্জন দোষে দুষিত হয়, মুল তত্ত্ব নির্ণয়ের ব্যাঘাত হয়, সত্যাসত্য বুঝা কঠিন হয় অনেক সময়ে পাঠকের মনে কবিত্বের চটকের ধাঁধা লাগে। আর একটী কথা লেখককে জিজ্ঞাসা করি—তিনি যেমন পবিত্রতা আদর্শ সতীমুর্ত্তি চিত্রিত করিয়া পাঠকের চিত্ত দ্রব করিয়াছেন; সেইরূপ তাঁহার ন্যায় কবির লেখনীপ্রসূতা অসতী কলঙ্কিনী পিশাচী মুর্ত্তি দেখিলে, তিনি ভয়ে, বিস্ময়ে, ঘৃণায়,, লজ্জায়, শুম্ভিত হন কি না? তিনি নানা কারণে বিধবার ব্রহ্মচারে ব্যভিচারের কথা প্রবন্ধে তুলেন নাই, আমরাও তুলিলাম না। বোধহয় তিনি আদর্শ সীতার দেবী মুর্ত্তির অপুর্ব্ব দিব্যশ্রীতে মুগ্ধ হইয়া উহার বিকৃত ছবি আঁকিতে লজ্জাবোধ করিয়াছেন ও সতী মুর্ত্তিকে কলুষিত করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছেন। কিন্তু তিনি যখন প্রবন্ধের ভূমিকায় সকল পদার্থের দুই পিঠ দেখার কথা বলিয়াছেন, তখন সত্যের অনুরোধে বিধবা

চরিত্রের দুই পিঠ দেখান উচিত ছিল। যাহা হউক ও কথার আন্দোলনে আবশ্যক নাই। আজকাল বোধহয় বঙ্গের প্রতি গৃহেই ঐ পিশাচীমূর্ত্তি ব্যাদিত বদনে বিরাজিতা আছে।

অবশেষে অক্ষয়বাবু স্বীকার করিয়াছেন যে বিধবাবিবাহের পুর্ব্বপক্ষ, উত্তরপক্ষ হইয়া তর্কবাদ করা, তাঁহার সঙ্কল্প নহে। ধর্ম্মাধর্ম্মের দোহাই দিয়া প্রসঙ্গক্রমে অনেক কথা বলিয়াছেন মাত্র। আমরাও সেইরূপ দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনায় প্রাকটিক্যাল ধর্ম্মের দোহাই দিয়া এই বলি যে, যেমনি শাস্ত্রে বিধবার পক্ষে তিনটী পন্থা আছে, সেই তিনটীই অবারিত থাকুক। যাহার ইচ্ছা হয় পুনর্ব্বিবাহ করুক, যাহার ইচ্ছা হয় ব্রহ্মচারিণী হউক। (পতির অনুগমন বলিতে গবর্ণমেণ্ট নিবারিত অনিচ্ছা সত্ত্বে বুকে বাঁশ দিয়া শ্মশানে মৃতপতির সহিত পোড়ান বুঝিবেন না। পতি অভাবে সতীর জীবন থাকিতেই পারে না। পতিপ্রাণা সতী যে ভাবে, যে উপায়ে হউক পতির অনুগমন করিবেই করিবে। সেইরূপ অনুগমনের কথা বুঝিতে হইবে)। আর বোধহয় উক্ত তিনটী পন্থা সর্ব্বদেশে সকল সভ্য জাতির মধ্যেই কোন না কোনভাবে প্রচলিত আছে। তবে অক্ষয়বাবুর সহিত একথা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি যে, সাধ্বী বিধবা পুনর্ভূ অপেক্ষা সমধিক সম্মানিত এবং আমরণ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া পরোপকারব্রতে জীবন যাপন করেন. এরূপ নরনারীর সম্প্রদায় সর্ব্বত্র সর্ব্বথা পুজ্য ও সকল সভ্য দেশেই আছে। সেই হেতু সবিনয়ে নিবেদন ঐরূপ ইচ্ছা প্রবৃত্তা ব্রহ্মচারিণী বিধবার সম্প্রদায় সংগঠন ও সংস্থিতি জন্য এবং চিকিৎতরূপে বুঝিবার জন্য, বিধবার পক্ষে শাস্ত্র প্রদর্শিত ও যুক্তিসম্মত তিনটী দ্বারই উন্মুক্ত রাখা উচিত। তাহা হইলেই স্বাধীনতা বা স্বানুবর্ত্তিতার পথ পরিষ্কার রাখিতে হয়। ছলে, বলে, কৌশলে আইনে আন্দোলনে সহৃদয়তায় সভ্যতায়, বিধবাকে পুনর্ব্বিবাহে প্রলুব্ধ করার কোন প্রয়োজন নাই। এরূপ স্থলে অক্ষয়বাবু কর্ত্তৃক উদ্ধৃত পণ্ডিতবরের যুক্তিই যথেষ্ট।—"I advocate it (widow marriage) on the broad ground of individual liberty of choice."

উল্লিখিতভাবে বিধবাবিবাহের সম্মতিদানে কোন হানি দেখা যায় না। কিন্তু অক্ষয়বাবু অমঙ্গল আশঙ্কা করেন। তিনি ভাবেন—বিধবাবিবাহে সম্মতি দিলেই একটী সমাজবিপ্লব উপস্থিত হইবে। হিন্দুয়ানি রক্ষা হইবে না। তাহা হইলে তিনি মনে মনে জানেন যে বিবাহ সম্বন্ধে সামাজিক সম্মতি পাইলেই একেবারে লক্ষ লক্ষ বিধবা পুনঃ পতি গ্রহণে উদ্যতা হইবে। সুতরাং সমাজবিপ্লব উপস্থিত হওয়াও বর্ত্তমান হিন্দুয়ানি লুপ্ত হইবে। যদি এরূপ অবস্থা হয়, তবে তিনি বঙ্গের ব্রহ্মচারিণী বিধবার চরিত্রবর্ণনে এত কবিত্ব প্রকাশ, এত পণ্ডশ্রম, এত ভণ্ডোক্তি করিলেন কেন? আমরা কিন্তু অক্ষয়বাবুর মত ভীরু ও ভণ্ড নহি। আমরা বেশ জানি বিবাহের

সামাজিক সম্মতি পাইলেও, অনেকে বিধবাবিবাহ করিবেন না। এমন অনেক বিধবা আছেন যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য পালনকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিবেন। তবে জ্ঞানহীন বাল্য-বিধবার কথা স্বতন্ত্র তাঁহারা অবশ্য কর্ত্তৃপক্ষের মতে চালিত হইবে। সুতরাং সমাজ বিপ্লবের কোন কারণ দেখি না। বর্ত্তমান ভাবের হিন্দুয়ানিও হঠাৎ লোপের কোন আশঙ্কা নাই। তবে কালে কি হইবে, তাহার আলোচনা বর্ত্তমানে অনাবশ্যক। অক্ষয়বাবু টাকী শ্রীপুরের শ্রীমতী পটেশ্বরী অধিকারীর মত সমর্থন করিয়া বলেন—"বাল্যবিবাহই বৈধব্যের মূল কারণ।" বাল্যবিবাহ বৈধব্যের মূল কারণ হইতে পারে। তিনি যেন বাল্যবিবাহের কার্য্যতঃ প্রতিবাদ করিয়া বাল্যবৈধব্যের প্রতিরোধ করিতে পারেন। কিন্তু কিশোরী অথবা যুবতী বিধবার কি করিবেন? আর বর্ত্তমান সময়ে সমাজে যে লক্ষ লক্ষ বাল্যবিধবা বিদ্যমান আছে ও তাঁহার "কার্য্যতঃ প্রতিবাদ" সুসম্পন্ন হওয়া পর্য্যন্ত যতগুলি বাল্যবিধবা হইবে যেগুলিকে তিনি (বিবাহ হয় নাই অথচ বিধবা বলেন) তাহাদের দশা কি হইবে? তাহাদের সম্বন্ধে বিবাহের ব্যবস্থাটা দিয়া, বাল্যবিবাহের কার্য্যতঃ প্রতিবাদ করিলে ভাল হয় না? ভাল কথা—পাশ্চাত্য শিক্ষাবিহীনে সেকেলে প্রাচীন গোঁড়া হিন্দুব মুখে বিধবাবিবাহের সরল প্রতিবাদ বেশ লাগে, সহ্য হয়। কিন্তু আধাদেশী আধা বিলাতী শিক্ষিত যুবকের বেহায়াদের লম্বাচৌড়া প্রতিবাদ নিতান্ত অশ্রাব্য অসহনীয়।

উপসংহারে এই বলি অক্ষয়বাবু বিধবার পুনর্ব্বিবাহ হিন্দুসঙ্গত নহে, তাহা প্রমাণ করার জন্য বিস্তর প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু তাহাতেই বা লাভ কি? যদি এটা স্বীকার করিতে হইবে যে যুগ যুগান্তরের ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন আবশ্যক অথবা স্বভাবতই হইয়া থাকে। একথা সর্ব্বদেশের তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। হইতে পারে প্রাচীনকালে প্রাচীন সমাজে ধর্ম্মের প্রোজ্জ্বলভাব বিধবার হৃদয়ে সমধিক প্রজ্বলিত থাকায়, তাহার কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মপালনে অসমর্থা ছিল। সুতরাং সে সময়ে বিধবার ব্রহ্মচর্য্য ও সহগমন প্রচলিত প্রথা ছিল, পুনর্ব্বিবাহের ব্যবস্থা লোপ হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে কি সেইরূপ ধর্ম্মের সময় আছে, সে ব্যবস্থা আছে, সে শিক্ষা আছে, বর্ত্তমানে সব বিপরীত হইয়াছে ধর্ম্মের স্থান বিজ্ঞানে অধিকার কবিয়াছে, পরাধীনতায় দুরবস্থার একশেষ হইয়াছে, এতদ্ব্যতীত সামাজিক কতরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, যাহা লেখক প্রবন্ধে প্রাঞ্জল ভাবে বিবৃত করিয়াছেন। তথাপি তিনি জানিয়া শুনিয়া বিধবা-বিবাহে সম্মতি দিতে কুণ্ঠিত হন কেন? তিনি জানেন না মনুষ্য তাহাদের পিতৃপুরুষের ন্যায় হওয়া অপেক্ষা কাল ধর্ম্মানুযায়ী গুণপ্রাপ্ত হয়। মহম্মদের জামাতা বিজ্ঞবৃদ্ধ খালিপ আলি এই সারগর্ভ কথা বলিয়া গিয়াছেন এবং টেম্পারার নামক মার্কিন পণ্ডিত সমর্থন করিয়াছেন। নিম্নে সেই কথা উদ্ধৃত করিয়া অক্ষয়বাবুকে ও পাঠক পাঠিকাকে উপহার দিয়া সমালোচনার উপসংহার করিলাম।

"In the course of my long life" said the Khalif Ali, "I have often

observed that Men are more like the times they live in than they are like their and others." This profoundly philosophical remark of the son-in-law of Mohameed is strictly true ; for, though the personal, the bodily ligaments of a man may indicate his parentage, the constitution of his mind, and therefore the direction of his thoughts is determined by the environment which he lives".—"History of the Conflict Between Religion and Science" by John William Draper M. D. L. L. D. Chapter 4, page 102.

ভারতীয় মুসলমান জাতি এবং গবর্ণমেণ্ট। ৯ ভাদ্র ১২৯১

ভারতীয় মুসলমানগণ আপনাদিগের জাতীয় উন্নতি বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সুযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে আবেদন করিয়া থাকেন, প্রায় ১৫ বৎসর হইল মহাত্মা লর্ড মেও মহোদয়ের শাসনকাল হইতে এই আন্দোলন চলিয়া আসিতেছে। বঙ্গদেশে এবং বোম্বাই প্রদেশে শিক্ষিত মুসলমানের সংখ্যা শিক্ষিত হিন্দুদিগের সংখ্যা অপেক্ষা অতিশয় অল্প। বঙ্গদেশে মহাত্মা সার জর্জ "কাম্বেল মুসলমানদিগকে শিক্ষা বিষয়ে উৎসাহ দিবার জন্য অনেক যত্ন করিয়াছিলেন তিনি ঢাকা চট্টগ্রাম এবং রাজসাহি প্রদেশে কেবল মুসলমান বালকদিগের অধ্যয়নের নিমিত্ত নূতন বিদ্যালয় সকল সংস্থাপন করিয়াছিলেন এবং অন্য অন্য স্থানীয় অথবা গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ে মুসলমান ছাত্রদিগের পাঠের সুবিধার জন্য স্বতন্ত্র ১৮০০০ টাকা ব্যয় করিতেছিলেন। এক্ষণেও নানাস্থানের মুসলমান স্কুলগুলি কলেজরূপে পরিণত হওয়াতে ক্রমশই গবর্ণমেণ্ট এই জাতির উপর পক্ষপাত এবং সদয়ভাব প্রদর্শন করিতেছেন। তথাপি ইহাদিগের তৃপ্তি নাই। ইহারা বলেন যে গবর্ণমেণ্টে দেশীয় কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। সম্প্রতি এই জন্য ইঁহারা গবর্ণমেণ্টের নিকট এই মর্ম্মে আবেদন করিয়াছিলেন যে, এখন হইতে মুসলমানজাতিকে উৎসাহ দিতে হইলে ইঁহাদিগকে বহুল পরিমাণে কর্ম্মে নিযুক্ত কবা উচিত। এইরূপ আবেদন কতদূর সঙ্গত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে দুই একটী কথা না বলিয়া থাকা যায় না। গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ে এবার অনেক পরিমাণে সূক্ষ্ম বিচার করিয়াছেন। পঞ্জাব উত্তর পশ্চিম প্রদেশে এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে মুসলমানগণ বোম্বাই এবং বঙ্গদেশের মুসলমানগণের ন্যায় হিন্দুদিগের অপেক্ষা উন্নতি বিষয়ে ততদূর পশ্চাৎপদ নহেন। বস্তুতঃ পঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশে গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী মুসলমান অনেক দৃষ্ট হইয়া থাকে। এক্ষণে বঙ্গদেশে এবং বোম্বাই প্রদেশে যাহাতে পক্ষপাতের সহিত এই জাতিকে কর্ম্মে নিযুক্ত করা হয়, তদ্বিষয়ে সম্ভ্রান্ত মুসলমানগণ গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃপক্ষগণকে বারম্বার অনুরোধ করিয়া একপ্রকার হিন্দুজাতির উপর মৎসরি

ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। যখন পারস্যভাষা বিচারালয়ে এবং অন্যান্য সাধারণ কর্ম্মস্থানে প্রচলিত ছিল তখন মুসলমানেরা অধিক পরিমাণে কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইতেন কিন্তু উইলিয়ম বেণ্টিংয়ের শাসনকাল হইতে যে নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে এবং তৎকালাবধিই মুসলমানদিগের পক্ষে কর্ম্মচারী হওয়া সুকঠিন হইয়া পড়িয়াছে মুসলমানদিগের একপ্রকার জাতীয় ভাষণ (পারস্য) যখন এতদূর সমাদৃত ও প্রচলিত ছিল এবং যখন উক্ত জাতি গবর্ণমেণ্টের বিশেষ বরণীয় হইয়াছিলেন তখন হিন্দুজাতি এরূপ মৎসরি ভাব প্রকাশ করেন নাই, এ ঘটনা দ্বারা আমাদের বর্ত্তমান ভ্রাতৃস্থানীয় মুসলমানদিগের কিঞ্চিৎ উদারতা শিক্ষা করা উচিত। ইংরাজি ভাষা সুচারুরূপে শিক্ষা করা অনেকের পক্ষে নিতান্ত দুরূহ বোধ হওয়াতেই বোম্বাই প্রদেশীয় এবং বঙ্গদেশীয় মুসলমানদিগের আধুনিক অধোগতি হইয়াছে। ইংরাজি ভাষা যেমন তাঁহাদিগের জাতীয় ভাষা নহে, তদ্রূপ ইহা হিন্দুদিগেরও জাতীয় ভাষা নহে। হিন্দুরা আপনাদিগের ক্ষমতা বলেই অধিকতর কর্ম্মপটু হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভাব কখন সূচনা হয় নাই এবং তাঁহারা গবর্ণমেণ্টকে পক্ষপাতী হইবার জন্য কখন অনুরোধ করেন না। জাতি বা ব্যক্তিবিশেষের মুখাপেক্ষা করিতে পারেন না। জাতিবিশেষের উন্নতি করিতে হইলে গবর্ণমেণ্টের যাহা করা কর্ত্তব্য, মুসলমানদিগের উপর প্রায় তাহার সকল প্রকার অনুষ্ঠানই করা হইয়াছে। ইহাতেও যদি তাঁহারা কৃতবিদ্য না হইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের নিজেব অসারতা প্রকাশ হইয়া পড়িবে। তবে গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মনিয়োগের সময় কর্ম্মঠ কৃতবিদ্য হিন্দুকে উপেক্ষা করিয়া তৎপরিবর্ত্তে জাতি বিশেষের উৎসাহ দিবার জন্য অপেক্ষাকৃত অকর্ম্মণ্য অজ্ঞপ্রায় মুসলমানকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিলে কিরূপ কার্য্য হইতে পারে, তাহা সহজ বুদ্ধিতে বুঝা অত্যন্ত দুরূহ। একজাতি দোষ করিবে এবং সেই দোষের জন্য অপর জাতিকে কষ্ট পাইতে হইবে, এ নিয়ম এ জগতে অদ্যাপি দৃষ্টিগোচর হয় নাই। এক্ষণে ভারতের যেরূপ অবস্থা তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন জাতি এবং ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় পরস্পর বিদ্বেষভাবাপন্ন হইলে আর রক্ষা থাকিবে না। রাজ-নৈতিক একতা আমাদের বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে এক্ষণে জাতীয় অসূয় পরিত্যাগ করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট সাধারণের নিকট সাধারণের দুঃখ ও অভাব দূরী-করণের জন্য মিলিতভাবে বিনীত হইয়া দণ্ডায়মান হইতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট তাহা হইলেই আমাদের প্রস্তুত অভাব বুঝিতে পারিয়া সেই অভাব মোচনের জন্য চেষ্টা করিবেন সন্দেহ নাই।

মেদিনীপুর জেলার জঙ্গল মহাল। ১৮ পৌষ ১২৯২

মেদিনীপুর জেলা প্রশস্ত স্থান ও ভিন্ন ভিন্ন দিকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ও বিবিধ ধর্ম্মাবলম্বীর বাস। উহারা উত্তরপূর্ব্ব প্রান্ত হুগলিনিবাসীদের অনুকরণ অনুযায়ী ব্যবহার

করিয়া থাকেন। পুর্ব্ব-দক্ষিণ পার্শ্বের অধিবাসীবৃন্দ উৎকল ও বঙ্গ উভয় দেশের আচারাদি অবলম্বনে মিশ্রিতভাবে দিনাতীত করে। আর দক্ষিণ-পশ্চিম ও পশ্চিম-উত্তর প্রান্তব্যাপী সমুদয় জঙ্গল মহল। নিজ মেদিনীপুরের চালচলনও অনেকটা আধুনিক সভ্যতার আভাস বিমিশ্র, পুর্ব্ব দক্ষিণ দিকবাসীগণের ন্যায় এবং জঙ্গলা ধরণাবিশিষ্ট। বলা বাহুল্য যে, মেদিনীপুর পুর্ব্ব উৎকল সীমাভুক্ত ছিল। রূপনারায়ণ নদের পশ্চিম পারে উড়িষ্যা বলিয়া প্রসিদ্ধ। অদ্যাপি উৎকলের প্রথা অনুযায়ী মেদিনীপুরে আসলি সাল প্রচলিত ও উড়িষ্যার রাজস্ব সংগ্রহের নিয়মমত কর আদায় প্রভৃতি অনেক নীতি পরিচালিত হইয়া থাকে। উহাও বাঙ্গালি জাতিকেই নৈতিক ব্যাপারে আকর্ষণ করিতেছে, জঙ্গলাদের আজোয়া করও তাই। এরূপ অভিপ্রায়ে অনেক আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন যে জঙ্গলে জঙ্গলা জাতি ভিন্ন আর কি কেহ বসতি করে না, আর যদি করে তাহা হইলে তাহারাও কি অপরিবর্ত্তনীয় অবস্থায় সময়াতীত করিতেছেন। সত্য বটে, জঙ্গলা, মাঝি সাঁওতাল নবা প্রভৃতি কতকগুলি জাতি ভিন্ন বিপিনাভ্যন্তরে অন্য অন্য জাতি অবস্থিত। প্রধানতঃ নানাদিকদেশাগত রাজবংশধরগণ ও পুর্ব্ব কালের বল বীর্য্য সম্পন্ন ব্যক্তি ব্যূহ জঙ্গল খণ্ডে সমাগত হইয়া স্ব স্ব বাহুবলে মধ্যে মধ্যে রাজ্য স্থাপন করেন এবং তাঁহাদের উত্তরাধিক্রমে অদ্যাপি নানাস্থানে রাজ্য শাসন করিতেছেন। প্রস্তাবিত রূপে প্রথম উৎকলে যিনি যে স্থলে রাজধানী স্থাপন কবিয়াছেন, সেই স্থলে স্বীয় কার্য্য নির্ব্বাহার্থে নানা শ্রেণীর নানা জাতির লোক ভিন্ন স্থান হইতে আনয়নপুর্ব্বক বৃত্তি প্রদানান্তর রাজধানীতে কি রাজধানীর সমীপস্থ স্থলে বসবাস করান। নৃপকুলের ন্যায় আনীত লোকসমুহের বংশপরম্পরাও অদ্যাপি ঐ ঐ স্থলে দিনাতিপাত করিতেছে।

পরিতাপের বিষয় এই যে মেদিনীপুর বঙ্গদেশেব অন্তর্গত বহুদিন হইয়াছে এবং মহানগরী কলিকাতার পার্শ্বে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না কিন্তু অদ্যাপি এস্থলের আশানুরূপ উন্নতি কিছুই লক্ষ্য হয় না।। একেবারে তিলমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই বলিলেও মিথ্যা হইবে না। ২৪ পরগণা, হুগলি ও মেদিনীপুরের পুর্ব্বদক্ষিণ প্রান্তের কি জমিদার কি প্রজা সকলেরই কিছু না কিছু পরিবর্ত্তন ও উন্নতির আকাঙ্ক্ষা দৃষ্ট হইবে। জঙ্গল মধ্যে রামগড, লালগড, বাঁশবুনী, ঝাডগ্রাম, নয়াগ্রাম প্রভৃতি অনেকগুলি রাজ্য ইহা ভিন্ন মধ্যে মধ্যে ওয়াটসন কোং আদি জমিদারও আছেন, এই সকল রাজা ও জমিদারের এলাকার অন্তর্গত কি জঙ্গলি প্রজা কি দেশীপ্রজা কি রাজা সকলেরই সমান অবস্থা। হায়! সুদূর বেহার প্রদেশের প্রজাপুঞ্জের দুরবস্থার বিষয় বিবিধ বিধানে আলোচিত হইয়া প্রতীকারের চেষ্টা উদ্যোগ হইতেছে, অথচ মেদিনীপুরের জঙ্গলারা যে একাহারে দিনযাপন করিতেছে, তাহা কেহ কখন দর্শন করেন নাই। এমন কি সাঁওতাল প্রভৃতির মধ্যে এরূপও দৃষ্ট হয় পাঁচ ছয় জন পরিবারে আহারের সংস্থান একসের চাউল! কি করে ঐ তণ্ডুল এক কলসী জলে সিদ্ধ করিয়া ফেনের ন্যায় করত সকলে আহার করিয়া দিনাতীত করে। তদ্ভিন্ন বুনো

ওল কচু ও নানাপ্রকার বন্য আলু আহারেই ইহাদের বর্ষের অধিক দিন গত হয়, এক একটী মূলে একমণ অবধি হয়। ঐ আলুতে একপ্রকার আসব আছে দেশীয় লোকে উদরস্থ করিলে উন্মাদের ন্যায় হয়, কিন্তু সাঁওতাল প্রভৃতি বন্যেরা অনায়াসে আহার করে, যদিও উহারা ঐ আলু ভক্ষণ করে কিন্তু মত্ততার হস্ত হইতে অব্যাহতি পায় না। আজকাল অনেকে আসবপ্রিয়, সেই আসবামোদী মহাত্মাগণ প্রস্তাবিত আসববিশিষ্ট আলুটী পরিষ্কাররূপে সংগ্রহ করিতে পারিলে অর্থের অনটন জনিত আসব পানের অভাব অসুখ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন।

বোধ হয় কেন আহারের পরিচয়ই আহারের যথেষ্ট পরিচয় হইয়াছে আর বেশী কি দেখাইব, তবে পাঠকগণ কেবল জঙ্গলা জাতির ঐ দশা এমন মনে করিবেন না। জঙ্গলাবাসী দেশী জঙ্গলা সকলেরই সমান অবস্থা, এই দারুণ হিমানীতে শরীর অসাড হইয়া যায়। হায়! জঙ্গলবাসীদিগের কি, বোধ হয় সাধারণ লোকেরও রীতিমত গাত্রবস্ত্র নাই। জানু ভানু কৃশানুই ইহাদের শীত নিবারণের প্রধান অবলম্বন। আর জঙ্গলের কাষ্ঠ সংগ্রহের উপায় থাকায় রজনীতে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করিয়া তাহার চতুঃপার্শ্বে সকলে শয়ন করিয়া শীতের প্রকোপে পরিত্রাণ পায়। কিন্তু কয়েক বৎসর ভূস্বামীগণ স্ব স্ব জঙ্গলের আয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করায় গরিবদিগের যদৃচ্ছা কাষ্ঠ সংগ্রহের ব্যাঘাত ঘটিয়াছে, এক্ষণে কষ্টে শ্রেষ্টে গরিবগণ কাষ্ঠ আহরণ করে। এই সকল নিঃস্ব প্রজাদিগেব প্রতি দয়া করিয়া কি প্রকারে ইহারা খাইতে পরিতে পায়, বোধ হয় এ বিষয় ভাবিবার কেহই নাই। ভূম্যধিকারিগণ ইহাদিগের সহিত যেরূপ ব্যবহার করেন (কয়েকজন কচিৎ ভিন্ন ভাবের ভূম্যধিকারী থাকিতে পারেন) তাহাতে স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়, যেন প্রজাকুল কেবল তাঁহাদের সুখবর্দ্ধনার্থ সৃষ্টি হইয়াছে। প্রথমতঃ উহারা প্রবল নিরক্ষর আইনকানুনের মর্ম্ম কিছুই জ্ঞাত নয়, ভূস্বামী যেদিকে ফেরান সেই দিকেই ফেরে। কাহারো চল্লিশ বর্ষের জোত হইলেও জোতস্বত্ব প্রজার হয় না, এমন কি কোন জোতদার ভূম্যধিকারীর বিনা অনুমতিতে ক্রোপা বিলিও করিতে পারেন। জোতস্বত্ব বিক্রয় নাই বলিলেই হয়। সঙ্গতিপন্ন প্রজা হইলে ভবিষ্যতে প্রতিদ্বন্দ্বি হইতে পারে অতএব প্রতিকুল যাহাতে পরিপুষ্ট না হয় তজ্জন্য লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য এভাবের আভাসও কোন কোন ভূস্বামী প্রকাশ করিয়া থাকেন, এবং তাঁহাদের কার্য্য প্রণালী দৃষ্ট করিলে উল্লিখিত আসুরিক অশ্লীল ভাব চিন্তাশীলেরা অনেকটা অনুভব করিতে পারেন। তাই বলি পরিপুষ্ট বেতনভোগী শাসনকর্ত্তারা ও দেশীয় প্রতিনিধি মহোদয়গণ মফঃস্বল পরিদর্শনে শুভাগমন করেন, মফঃস্বল সম্বন্ধে কি প্রকার প্রজ্ঞালাভ করেন আমরা ত চিন্তা করিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারি না, প্রকৃতপক্ষে বুঝিতে হইলে মনকে প্রবোধ দিতে হয় যে বিদেশীগণ কিপ্রকারে দেশী গরীবদের অবস্থা জ্ঞাত হইবেন। তবে আক্ষেপ এই অনেক দেশী মহোদয়েরাও প্রস্তাবিত প্রস্তাবে পরিলিপ্ত আছেন, তাঁহাদের দ্বারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মফঃস্বলের অবস্থা সংগ্রহ ও গবর্ণমেণ্টে এবং সাধারণে প্রচার না হওয়াই

আশ্চর্য্য! হায় আমরা কবে এমন দিন দেখিব যে প্রজাপালকগণ প্রকৃতি বিষয়ীনী বহুদর্শিতা লাভে সক্ষম হইবেন। আর ইহা কি অল্প আক্ষেপ যে নিরন্ন কৃষকেরা ক্লেশে কতকগুলি শস্য উৎপন্ন করিয়াও তাহা উচিতমত ভোগে বঞ্চিত হইল। আর তদীয় শ্রমলব্ধ দ্রব্য অপরের বিলাসিতায় কি নির্বুদ্ধিতায় নষ্ট হইল, আরো এক কথা ভূপতিগণ প্রজা শোষণে যাহা সঞ্চয় করেন যদি তাহার উপযুক্ত সংব্যয় করিতেন তাহা হইলেও বোধ করিতে পারিতাম যে যেমন বিরুদ্ধভাবে সঞ্চয় করিলেন তেমনি প্রকৃতির হিতকর কার্য্যে অর্পিত হইল। প্রস্তাবিত মহোদয়গণের সৎকার্য্যের মধ্যে কতকগুলি অবলাকে অন্দরে পোষণ করিয়া পালন করেন। তদীয় গর্ভজাত কুলপ্রদীপ গুণপুরুষগণের জীবিকার জন্য রাজাংশ জায়গীররূপে প্রদান করেন, আর লম্পট কপট সাধুবেশী পশুদিগের প্ররোচনায় আত্মবিস্মৃত হইয়া সেই সকল পাষণ্ড সেবায় মুক্তহস্ত হন। ইহা ভিন্ন চটুকার পোষণ প্রসিদ্ধ ব্যবহার। বেশীর মধ্যে আর একটি ব্যাপার দৃষ্ট হয় এই স্বজাতি কি স্বদেশী গণ্ডমূর্খ হইলেও তাহার প্রতি অচল বিশ্বাস, অধিকাংশ জমিদারীর গুরুভার উক্তমত কাণ্ডজ্ঞানশূন্য লোকের হস্তে ন্যস্ত হয়। তিনি হুজুরের নিকট যাইয়া এক দীর্ঘছন্দের প্রণাম ঠুকিয়া বলিলেন মহাপ্রভু যত ইংরাজী পড়া ও খপরের কাগজ পড়াশুনো সব মহোদয়ের ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই, যদি উহাদের হাতে কাজ দিতে হয় কি করা যাবে কোনরূপে নেওয়া যাবে, কিন্তু আমাদের ভেতরের সন্ধান কিছু বলা হবে না। আর ওরা কাজ জানে কি, কেবল কতকগুলো পড়ে মরে বই ত নয়, তবে মনে করুন কেমন জমাজমি শূন্য। গত বৎসর প্রজার নিকট বাকি পড়িয়াছে তাতে হানি নাই, কারণ সেতো পাওয়ানা কোথা যাবে একসময় সব নেব। এইরূপ কর্ম্মচারির সম্বোধন শুনিয়া ভূপতি বলিলেন হাঁ তো বটেই তুমি দেশীয় লোক তোমার উপর সব ভার। তবে ভদ্রলোক না চটে গুছায়ে কাজ কর। কর্ম্মচারী অমনি উত্তর করিলেন যে আজ্ঞা ভদ্রলোককে চটাব কেন তবে সেইদিনের কথা আমার শ্যালক পুত্র যে শাল যদিও একশত টাকায় পাঠায় ও লোকটী সেইরূপ শাল যদিও সত্তর টাকায় স্থির করিয়াছেন ভদ্রলোকের আনীত শালের পশমে ঘুনধরা এবং টক আস্বাদ, তাই তে' অমত করা গেছে। এরূপ উচিত কথায় যদি ভদ্রলোক চটেন কি কার। আমি কেমন করিয়া হঠাৎ তেমন দ্রব্য লইতে বলি? আমাদের লোক যাহা পাঠাইয়াছে তাই ঠিক তার প্রমাণ দেখুন আমাদের লোক পাঁচ সিকায় কেমন ছুরি পাঠাইয়াছে, আর যদিও ঐরূপ কারিকরেরা বার আনায় আনিয়াছে তাহাতে বিশ্বাস হইতে পারে না। বিদেশী লোকের হয়ত ঐ ছুরির লোহার মধ্যে কাঁচ মিশান আছে, পুট করে ভেঙ্গে যাবে, আমাদের পাঁচ সিকায় ভাল। এইরূপ কার্য্যে মন্ত্রিগণের সাহায্যে উৎকল ও জঙ্গল মহলে বহুলোক পথের ভিখারী হইয়াছেন তথাচ তাহাই রহিয়াছে সেই জন্য বলি জঙ্গলবাসীদের অদ্যাপি কিছুই উন্নতি হয় নাই, ইহার মধ্যে কয়েকজন বাঙ্গালী কর্ম্মচারী যাহারা রাখিয়াছেন, সেই স্থলেই সুফল হইতেছে, পার্শ্ববর্ত্তী ভূপতিগণের দৃষ্টি করিয়া চৈতন্য হইতেছে না-ইহাই আশ্চর্য্য।

ভারতবাসিগণের বিলাত যাত্রা। ১৭ চৈত্র ১২৯২। ২০ সংখ্যা

ইংলণ্ডে ভারতীয় ও অন্যান্য উপনিবেশীয় প্রদর্শনী উপলক্ষে যাহাতে অনেক হিন্দুর সমাগম হয় তজ্জন্য অনেকে আন্দোলন করিতেছেন। কেহ কেহ বলিতেছেন হিন্দুসমাজ হইতে এরূপ ব্যবস্থাপত্র প্রচারিত হওয়া উচিত যাহাতে হিন্দুগণ নির্ভয়ে বিলাত যাইতে পারেন এবং পূর্ব্ব জাতি বজায় রাখিয়া আবার হিন্দুগৃহে প্রবিষ্ট হইতে পারেন। আমাদের সহযোগী মিরার ও অন্যান্য সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ এরূপ ষ্টীমার দেখিতে ইচ্ছা করিতেছেন যাহাতে পাচক ব্রাহ্মণদিগের বিশেষ সুব্যবস্থা থাকে। গঙ্গাজল শিবপূজা ইত্যাদি কিছুরই অভাব না হয় তজ্জন্য তাঁহারা নানা কোম্পানিকে অনুনয় বিনয় করিতেছেন। সহযোগীদিগের এইরূপ প্রস্তাবে আমরা কোনরূপেই হাস্য সম্বরণ কবিতে পারিলাম না। আকাশে উড়িবার সাধ আছে অথচ ব্যোমযানে উঠিব না—যেমন মৃত্তিকায় বেড়াইতেছি তেমনি বেড়াইব অথচ আকাশে উড্ডয়ন করা হইবে এরূপ আশা যেমন হাস্যজনক, ইংলণ্ড আমেরিকা যাইব. নানাভাবে ভাবুক হইব অথচ দেশীয় মুর্খমণ্ডলীর কুসংস্কার বজায় রাখিব ইত্যাদি চিন্তা কি তদ্রূপ নহে? সহযোগী স্থির করিয়াছেন যে দুই চারিজন পাচক ব্রাহ্মণ থাকিলেই হিন্দুগণ বিলাতে যাইবেন এরূপ সিদ্ধান্ত একপ্রকার বিডম্বনা মাত্র। হিন্দুগণ এক্ষণে সমুদ্র যাত্রাতেই ধর্ম্মবিরুদ্ধতা দেখিতেছেন তাঁহারা পাচক ব্রাহ্মণের জন্য ব্যস্ত নহেন। অনেক হিন্দু রেলযানে গমনকালে পথিমধ্যে হিন্দু হোটেলের জলবিন্দু স্পর্শেও ধর্ম্মহানি মনে করেন। যাঁহারা হিন্দুত্ব লইয়া ব্যস্ত তাহাদিগের যতই সুব্যবস্থা কবা হউক না তাঁহারা কিছুতেই বিলাত যাইবেন না। তবে যাঁহারা বাহ্য হিন্দু থাকিতে চান অথচ বিলাত গমন ও বিজাতীয়গণের আহারীয় দ্রব্য গ্রহণে নিপুণ হইয়াছেন তাঁহাদেব সুবিধার জন্য এ ব্যবস্থা সুবিধাজনক হইতে পারে। কিন্তু আমরা বলি যদি বাহ্য হিন্দুগণের জন্য সহযোগী এতই ব্যস্ত হইয়া থাকেন তবে তাঁহাদেব এরূপ ব্যবস্থাব জন্য চেষ্টা পাওয়া উচিত, যাহাতে সহজে জাতি ফিরিয়া পাওয়া যায়। সহজে জাতি ফিরিয়া পাওয়ার জন্য এরূপ ব্যবস্থা হইলে ভাল হয়, যে হিন্দু বিলাত গমন করিয়া পুনরায় ভারত স্পর্শ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ পবিত্র হইবেন। এক্ষণে এরূপ নানা ব্যবস্থাই প্রচলিত আছে। যথা "পন্থা বাতেন শুধ্যতি" "দ্রব্যং মুল্যেন শুধ্যতি" ইত্যাদি। সেইরূপ সমুদ্রপারগামী "স্বদেশস্পর্শেন শুধ্যতি" ইত্যাদি এক ব্যবস্থাতেই সমুদায় চুকিয়া যায়, ইহার জন্য এত আয়োজনের কোন প্রয়োজন দেখিতেছি না। সমুদ্র গমন এক সময়ে হিন্দুদিগের দোষাবহ ছিল না। শ্রীমন্ত সওদাগর কোথায় না গিয়াছিলেন? যবদ্বীপ আজিও হিন্দুগণের অক্ষয়কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। সেই সমুদ্র গমন আজি উচ্চারিত হইলে হিন্দুগণ কর্ণে অঙ্গুলি দেন—মহাপাতক স্পর্শ মনে করেন। এরূপ স্থলে তাঁহাদের জন্য এত ব্যস্ত হইয়া বন্দোবস্ত করা বৃথা। যাঁহারা বিলাতে যাইতে প্রস্তুত অথচ অধিক ভাড়া বলিয়া অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না, তাঁহাদের জন্য অল্প ভাড়া

ব্যবস্থা করিবার জন্য সহযোগিগণ চীৎকার করিলে ভাল হইত। ভাড়া অল্প ও দেশীয় রকমের আহারাদি ব্যবস্থা হইলে বোধ হয় অনেক (বর্ত্তমান) হিন্দু অনায়াসেই বিলাতে গমন করিতে পারেন। আমাদিগের সমাজের নিজের উন্নতির ইচ্ছা থাকিলে অনায়াসেই হইতে পারে। আপনাদিগের উপকারের জন্য যাহা আপনারাই করিতে পারি তাহাতে অপরের সহায়তা প্রার্থনা করা এক প্রকার হাস্যোৎপাদক বলিতে হইবে। প্রায়শ্চিত্ত পদ্ধাতর একটু বিস্তার করিয়া লইলেই সকল প্রকার অভীষ্ট সাধন হইতে পারে।

সম্পাদকীয়। ১৭ চৈত্র ১২৯২। ২০ সংখ্যা

উপাধি লইয়া আর কি হইবে? মান্দ্রাজেব লাট গ্রাণ্ট ডফ বলিয়াছেন উপাধিধারী ইংরাজী শিক্ষিত ছাত্রকে গবর্ণমেণ্ট আর প্রতিপালন করিতে পাবেন না। বি. এ., এম. এ. তোমাদের গবর্ণমেণ্টের নিকট আর আদর হইবে না। তোমরা চাষ আবাদ কর, কুমাব ছুতবের ব্যবসা শিক্ষা কর। সুদ্ধ উপাধি লইযা যে আমাদের বাস্তবিক কোন উপকার হইবে না তাহা আমরা স্বীকার করি। পিসিমাযেব মুখে তালপত্রেব ঘোডা, দোরাণীব সোরাণীর গল্পেব মত একথা আমবা অনেকদিন হইতে শুনিযা আসিতেছি, বলিয়াও আসিতেছি। কিন্তু কার্য্যে তাহার অল্পই দেখিতে পাই। শীঘ্রই যে অধিক দেখিব ইহারও কোন প্রত্যাশা নাই। হহার কারণ কি?—ভাবতের দাবিদ্র্য।

স্কুল কলেজের ছাত্রগণেব ভিতরে অনুসন্ধান করিয়া দেখ—ধনীর ভাগ অল্প দরিদ্রেব ভাগ অধিক। কাহারও হয়ত পিতা মাতা ঘরের ঘটী বাটী বন্ধক দিয়া পুত্রকে লেখা পডা শিখাইতেছেন। কেহ হযত লোকের বাটীতে রন্ধনীবৃত্তি করিয়া এক মুষ্টি খাইতেছেন, আর বিদ্যালযের বেতন যোগাইতেছেন। কেহ হয়ত অপেক্ষাকৃত ধনবানের গৃহে তাহার সন্তানগণের পাঠনাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া কষ্টেশ্রেষ্টে বাসা ঘরচ ও স্কুলের মাহিনা দিতেছেন। কত ছাত্র মাসে মাসে অপরেব নিকট স্কুলের বেতন ভিক্ষা করিয়া আসিতেছেন। এইরূপে তাঁহাব. পাঁচ বৎসর অনবরত পরিশ্রম করিয়া লেখাপডা শিখেন—দুই একটী উপাধি লাভ করেন ইচ্ছা যে কোন প্রকারে একটী সরকারী কর্ম্ম পান। অর্থের সংস্থান যে মুলধন ধরিয়া বাণিজ্য অথবা শিল্পের উন্নতি করিবেন তাহা নহে। মানর দায়ে, বংশমর্য্যাদার দায়ে লাঙ্গল ধরিয়া চাষ করিতে পারেন না, হাতুড়ি ধরিয়া লোহ পিটাতেও পারেন না। পারিলেও আমাদের দেশে বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা হইতে যাহা কিছু পাওয়া যাইবে তাহাতে এতদিনের পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়া যে শিক্ষা লাভ করা হইয়াছে তাহার ফল পাওয়া দূরে থাকুক মোটা ভাত কাপড় জুটাইয়া কোন রকমে দিন যাপন করাও অসম্ভব হইয়া উঠে। গবর্ণমেণ্টও কৃষি অথবা শিল্পের কার্য্যে আমাদের বিশেষ একটা ভরসা

দিতেছে না। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে শিক্ষার্থিগণ আর কোনও উন্নতির প্রত্যাশা করিতে পারে না, চিকিৎসা বিভাগে প্রকৃতপক্ষে আর একজনের স্থান হয় না, স্বাস্থ্যবিভাগ বলিয়া যে একটা স্বতন্ত্র বিভাগ আছে এবং তাহা হইতে অর্থোপার্জ্জন হয় ইহা আমাদের দেশের লোকে এখনও কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। ধর্ম্মযাজন কার্য্যে গভর্ণমেন্টের সহায়তা লাভ করিবার প্রয়াস পাওয়া বাতুলতা মাত্র। কৃষি কার্য্যেও যে গবর্ণমেণ্ট সহানুভূতি দেখাইবেন তাহাও নহে। যাঁহারা বহুল অর্থ শ্রাদ্ধ করিয়া সিরেণসেষ্টার কলেজ হইতে কৃষি বিদ্যায় উপাধি লাভ করিয়া আসিলেন, তাঁহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় পর্য্যন্ত হইয়া উঠিতেছে না। এই সকল অসুবিধায় বর্ত্তমানে গ্রাণ্ট ডফ আমাদিগকে কোন্ পথে যাইতে বলেন? ধরা গেল যেন এম. এ. পাস দিয়া আমি সূত্রধরের নিকট কিয়দ্দিন জানালা দরজা প্রস্তুত করিতে শিখিলাম। লোকের নিকট আমার কার্যের আদর বাড়িতে লাগিল, কিন্তু আমি সমস্তদিন গলদ্ঘর্ম্মে খাটিয়া রোজ মজুরী আট আনার পয়সা অর্থাৎ মাসে ১৫টা টাকার উপর এক পয়সাও উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইলাম না। যদি অধিক পরিশ্রম করিতে পারি ২০টা টাকার অধিক আমার অদৃষ্টে কোন কালেই জুটিবে না। কিন্তু আমি যদি চেষ্টা করিয়া ৪০ টাকা বেতনের একটা সরকারী কেরাণীগিরি পাই তাহা হইলে ক্রমে ৫০, ৬০ করিয়া · টাকা পর্য্যন্ত আমার মস্তিষ্কের আলোচনা করিয়া আমি আরও কত উপার্জ্জনের উপায় দেখিতে পারি। এমন সুখকর সম্মান অর্থকরী পদের অনুসন্ধান না করিয়া উপবাসের প্রলোভনে সূত্রধর হইতে যাওয়া কি মনুষ্য প্রকৃতিতে সম্ভাবনীয়?

লেখাপড়া শিখিয়া কিরূপেই বা সামান্য অশিক্ষিত লোকদিগের সহিত একই প্রকারের ব্যবসা করিতে পারা যাইবে? যাহাদের ভাষা ব্যবহার ও রুচি শিক্ষিত ব্যক্তিগণের হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন তাঁহাদের সহিত অষ্টপ্রহর কথাবার্ত্তা ভ্রমণ উপবেশন কিরূপে সম্ভবে? শিক্ষার গুণে হউক আর দোষে হউক যাহাদিগকে সর্ব্বদা হীন মনে করি, তাহাদের সহিত মেশামেশি সহজে হয় না। গবর্ণমেণ্ট যদি শিক্ষিত ব্যক্তিগণের শিল্প ও ব্যবসা শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন ও পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়া দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে উত্তীর্ণ ছাত্রগণের জন্য, কৃষি শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে নিরূপিত রাখিয়া তাঁহাদিগকে তৎ তৎ কার্য্যে নিযুক্ত করেন তবেই এ শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের পার্থক্য বজায় থাকে দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়, গবর্ণমেণ্টকেও কেরাণী সম্প্রদায়ে প্রতিপালনের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইতে হয় না।

শিক্ষিত অর্থে আমরা এখানে অর্দ্ধশিক্ষিতকেও গ্রহণ করিলাম। যে সকল ভদ্রসন্তান সামান্য রূপ ইংরাজী শিখিয়া চাকরির জন্য লালায়িত হন তাঁহাদিগেরও এই অবস্থা। সুদ্ধ ভারতে কেন সকল দেশেই কেরাণীনবীশগণের সরকারী কর্ম্ম পাইবার লালসা অত্যন্ত প্রবল দেখিতে পাওয়া যায়, তবে ভারতে জিত বিজেতার যে পার্থক্য

বর্ত্তমান অন্যান্য দেশে তাহা না থাকায় কেরাণীগণ স্বল্লায়াসে মসী পেষন করিতে পান। ভারতেও যদি ফিরিঙ্গী সম্প্রদায়ের সহিত ইহাদিগকে সমদৃষ্টিতে দেখা হয় তাহা হইলে ইহাদিগের জন্য সরকারী চাকরির বড় একটা অভাব হয় না।

গবর্ণমেণ্টের চাকর হইয়া স্বচ্ছন্দে ও সসম্মানে দিন কাটাইবার জন্য কাহার না ইচ্ছা হয়? রাজা উচ্চপদস্থ রাজ কর্ম্মচারিগণের নিকট পরিচিত ও তাহাদের অনুগ্রহের পাত্র হইবার জন্য কোন্ শিক্ষিত যুবক উৎসুক না হন? সকল দেশেরই স্বাভাবিক অনুরক্তস্রোতের বিপরীতদিকে ওজন ঠেলিয়া লইয়া যাওয়া কি দুঃসাধ্য নহে।

গ্রাণ্ট ডফ দক্ষিণ দেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়কে একেবারে নিরাশ করেন নাই। তিনি বলেন দেশীয়গণ ইংরাজের অধীনে এখনও সকল পদের উপযোগী হইতে পারেন নাই। কালে রাজনৈতিক বিষয়ে আরও অভিজ্ঞতা লাভ করিলে সেই সকল পদ তাঁহাদিগেরই হইবে। ইংরাজের কার্য্য এখন ইংরাজে করুন দেশীয়ের মধ্যে "ভাল ভাল" লোক বাছিয়া তাঁহাদিগকে নিম্ন শ্রেণীর কার্য্য দেওয়া হউক। "ভাল ভাল" লোক কি প্রকারের গ্রাণ্ট ডফ তাহা বলেন নাই। কতটুকু শিক্ষা ও রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা লাভ করিলে "ভাল ভাল" লোক হইয়া নিম্নশ্রেণীর সরকারী পদের উপযোগী হইতে পারা যায় গ্রাণ্ট ডফ তাঁহার সুবিজ্ঞ বক্তৃতায় সে বিষয়েও কিছুই প্রকাশ করেন নাই। আমাদের বুঝা উচিত "ভাল ভাল" অর্থে সুশিক্ষিত ও সচ্চরিত্র। কিন্তু কায্যতঃ আমাদের বুঝিতে হয় গবর্ণমেণ্টের তোষামোদকারী ও স্বদেশীবিদেশী। যাহাই হউক আমরা লাট গ্রাণ্ট ডফের আশ্বাসবাক্যে কতকটা আশ্বস্ত হইলাম। কতদিনে যে আমরা যোগ্য হইয়া গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহ লাভ করিব তাহারই প্রত্যাশায় বসিয়া রহিলাম।

দেশীবিদেশী জাতিবর্ণের ভেদাভেদ বিচার না করিয়া অগ্রে কেবল সুশাসনের দিকেই যে ভারত গবর্ণমেণ্টের ও পার্লিয়ামেণ্টের দৃষ্টি আছে একথা আর আমরা কতবার শুনিব? গ্রাণ্ট ডফ ও তৎপন্থী যেখানে সেখানে সুশাসনের দোহাই দিয়া ইংরাজকে সরকারী কর্ম্মে নিযুক্ত করে৹ আর শিক্ষিত দেশীয় যুবকগণকে বলেন তোমরা গবর্ণমেণ্টের মুখোপেক্ষা না করিয়া কোদাল কুড়ুল ধর, চাষ আবাদ কর, শিল্প বাণিজ্যে স্বদেশের উন্নতি কর, আমরা তাঁহার সদুপদেশের সারবত্তা স্বীকার করি, কিন্তু কথাটী বড় পুরাতন কথা। এখন গ্রাণ্ট ডফের মুখে নূতন ভাবে শুনিলে যেন কিছু পার্থক্যে দুর্গন্ধ আছে বলিয়া অনুভূত হয়।

গ্রাণ্ট ডফ বক্তৃতার শেষে দেশীয় সংবাদপত্রের উপর একটু তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া মধুরে সমাপ্তি করিয়াছেন। আমরা অনেকের কটাক্ষে বিদ্ধ হইতেছি। কিন্তু চক্ষে চক্ষে পচিয়া না গিয়া বরং আমাদের দল ক্রমে পুষ্ট হইতেছে। গ্রাণ্ট ডফ কেন, অনেক সিভিলিয়ান প্রভুর পক্ষে আমরা ইদানীং বড় ক্লেশদায়ক হইয়া উঠিয়াছি।

গ্রাণ্ট ডফ একজন সুদক্ষ শাসনকর্ত্তা। আমরা তাঁহার গুণের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া

থাকি। শিক্ষিত সম্প্রদায়কে তিনি যে সমস্ত উপদেশ দিয়াছেন যদি সে সকল উপদেশ সরল উপদেশ বিশ্বাসসম্ভূত হয় তবে আমাদের এই কয়েকটী কথা যেন তাঁহার স্মরণ থাকে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। ৮ আষাঢ় ১২৯৩। ৩২ সংখ্যা

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ১০ বৎসর অতিবাহিত করিতে পারিলেন না, ইতিমধ্যেই উক্ত সমাজের প্রধান পরিপোষক পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সমাজের সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিলেন। গোস্বামী মহাশয় বলেন তিনি হিন্দু, খৃষ্টান, ব্রাহ্ম সকল সমাজের সেবক। প্রত্যেক স্থান, প্রত্যেক সমাজ হইতে সত্য গ্রহণ করাই তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্ম। এক ঈশ্বরকে যে কোন নামে ডাকা যাক না কেন তাহাতেই তাঁহাকে ডাকা হয়। কালী, দুর্গা, কৃষ্ণ, হরি, ইত্যাদি নাম ভেদে ঈশ্বরের বা ধর্ম্মের কোন ভিন্নতা প্রকাশ পায় না। বাস্তবিক ঈশ্বর যেমন একমাত্র ও অদ্বিতীয় তাঁহার ধর্ম্মও সেইরূপ দ্বিতীয়হীন। সমাজভেদ ও ধর্ম্ম অহঙ্কারও অধর্ম্মের পরিচায়ক। হিন্দুর রাধাকৃষ্ণলীলায় গভীর আধ্যাত্মতত্ত্ব নিহিত আছে। পৌত্তলিকতা পাপ, একমাত্র চিদঘন আনন্দ স্বরূপ পরমেশ্বরকে উপাসনা করাই পরম ধর্ম্ম। ঈশ্বরে প্রীতি করা ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করাই উপাসনা। মানবাত্মায় পরমাত্মার সমাধান করাই প্রকৃত যোগ।

আমরা পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণের ধর্ম্মমত তাঁহার প্রকাশিত দুইখানি পত্র হইতে সংক্ষেপ করিয়া প্রকাশ করিলাম। এই মতগুলির সহিত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কি কোন ব্রাহ্মসমাজের যে অনৈক্য আছে তাহা বোধ হয় না। ব্রাহ্ম আর এখন কালীনাম উচ্চারণ করিলে জিহ্বা কর্ত্তন করেন না, দেব মন্দির দেখিলে চক্ষু বুজাইয়া চলিয়া যান না। পরধর্ম্মের প্রতি ঘৃণা করা যে মহাপাপ ব্রাহ্মগণ এখন তাহা বুঝিতেছেন। নিখিল জগতের মধ্যে কেবল সে একমাত্র সনাতন পবিত্র ধর্ম্ম বিরাজমান হিন্দুধর্ম্মই তাহার উপদেশ দিয়াছেন। মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেই মূল সত্যের প্রচার করিয়াছেন, কালী দুর্গা নামভেদে যে ঈশ্বরে ভেদজ্ঞান হয় না ইহাও কিছু নূতন কথা নহে। কেশব এই সার সত্য হিন্দুধর্ম্ম হইতে গ্রহণ করিয়া সাধারণ্যে প্রচার করেন। রাধাকৃষ্ণ তত্ত্বের অধ্যাত্ম ব্যাখ্যা কেশবের কণ্ঠে যেমন সুমধুর শব্দে গীত হইয়াছে ব্রাহ্মসমাজের ভিতর হিন্দু কখনও তেমন সুস্বর শ্রবণ করেন নাই। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কেশব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কেশবের এই রাধাকৃষ্ণ ব্যাখ্যার প্রতিবাদী হন। পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণই একদিন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে প্রকাশ্য সভায় স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন—কেশবের প্রাণে পৌত্তলিকতার দুর্গন্ধ প্রবেশ করিয়াছে। কেশবের মুখে রাধাকৃষ্ণ নাম তখন গোস্বামীর কর্ণে বড়ই কদর্য্য শুনাইয়াছিল। আমরা ঐ সভায় উপস্থিত ছিলাম। বিজয় গোস্বামী যখন বেদীর পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া কেশব রচিত একটী রাধাকৃষ্ণ নাম গাথার দুর্নাম প্রচার করিতেছিলেন তখন সহস্রাধিক যুবকের করতালি শব্দে সাধারণ

ব্রাহ্মসমাজের গৃহের ছাদদেশ বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। ৮ বৎসর পূর্ব্বে পৌত্তলিকতা সম্বন্ধে বৃদ্ধের স্বতন্ত্র মত ও স্বতন্ত্র ভাব ছিল। একদিন তিনি যাহা ঘৃণা করিয়াছেন, আজ তাহাকেই পূজা করিতে হইল। একদিন যাহাকে ঘোর পৌত্তলিকতা বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন, আজ তাঁহারই পাদদেশে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রেমের অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে হইল। একদিন প্রকাশ্যভাবে যে কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মমত সহস্রশ্রোতার সম্মুখে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের উদার ধর্ম্মমতের বেদীর উপর বলি দিয়াছেন, আজ আবার সেই সাধারণ উদারতা পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ লক্ষ লোকের সম্মুখে প্রকাশ্য পত্রিকায় সেই চিরঘৃণিত পৌত্তলিক মতেরই পোষকতা করিতে হইল। যাহা কিছু সাধারণ, যাহা কিছু সমাজী ভ্রাতাগণের মঙ্গলের সামগ্রী, একদিন গোস্বামী মহাশয় তাহারই পক্ষপাতী ছিলেন। আজ সে সাধাবণ ভাব দূর হইয়াছে, গোস্বামীকে এখন স্বার্থপরভাবে নদীয়ার পথ অন্বেষণ করিয়া স্বজাতি ও স্বপদবীর সার্থকতা সাধনে যত্নবান হইতে হইয়াছে। যে সমাজকে তিনি কেশবহারা করিয়া রত্ন হারা দরিদ্র করিয়াছিলেন আজ সেই সমাজ দশমবর্ষে পদার্পণ কবিতে না করিতেই তিনি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন। তাই বলিতেছিলাম গোস্বামী মহাশয়ের সে দিন গিয়াছে। বুড়া বয়সে বালকদিগেব উপর বৃদ্ধের স্নেহটুকুও সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হইয়াছে।

দুই দিনের ভিতবে যে ধর্ম্মসমাজের একজন অধিনায়কের ধর্ম্মের মতের এত পরিবর্ত্তন, সে ধর্ম্মসমাজের বন্ধনী যে কিরূপে রক্ষিত হইবে তাহা আমবা বুঝিতে পাবতেছি না। যদি জিজ্ঞাসা করা যায় সমাজ পরিত্যাগের কারণ কি? গোস্বামী মহাশয় উত্তর করিবেন এক সমাজে আবদ্ধ থাকিলে সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়, ইহা তাঁহাব ধর্ম্মমতের বিরুদ্ধ। যদি জিজ্ঞাসা কবা হয় এ ধর্ম্মমত দুই দিন অগ্রে কোথায় ছিল? গোস্বামী বলিবেন উন্নতিই ধর্ম্মজীবনের স্বভাব। দুই দিন অগ্রে তাঁহার যে মত ছিল আজ উন্নত হইয়া তাহার পরিবর্ত্ত হইয়াছে। আমাদের বোধ হয় দুই দিনেই যাঁহার ধর্ম্মমতের এত পরিবর্ত্তন এত উন্নতি, কোন সময়ে তাঁহার ধর্ম্মমতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিবার সময় লোকের সাবধান হওয়া উচিত।

সমাজের আশ্রয় ছাড়িয়া গোস্বামী এখন নিভৃতবাস গ্রহণ করিতেছেন। ঘোর সমাজী ব্যক্তি এখন সন্ন্যাসী হইতেছেন। কিন্তু সন্ন্যাসী হইয়া তিনি কি দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবেন? লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় শুভকামনায় অরণ্যে গিয়া অতিবাহিত করিবেন? এরূপ কথা স্বতন্ত্র কথা বটে, কিন্তু যদি তাঁহাকে গৃহে থাকিতে হয়, লোকালয়ে বসবাস করিতে হয়—তবে কি তিনি সাধারণ ও সমাজী হইলেন না? ব্রাহ্মসমাজের যেগুলি ধর্ম্মমত তাঁহারও তাই। ব্রাহ্মসমাজের সহিত মূল পক্ষে সামান্য বিষয়েও তাঁহার মতভেদ নাই। অন্যান্য সমাজের সহিত তাঁহার ঐক্যও নাই। এইরূপ অবস্থায় হিন্দুসমাজ, কি খ্রীষ্টীয়সমাজ, কি মুসলমান সম্প্রদায়,

তাঁহাকে ব্রাহ্ম ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারেন না। যদি কখনও তাঁহাকে সামাজিক কার্য্যে যোগদান করিতে হয়, ব্রাহ্মসমাজ ভিন্ন আর কোন সমাজই তাঁহাকে সাহায্য করিবেন না। সুতরাং সমাজ পরিত্যাগ করিয়া তিনি যে বিশেষ কি লাভ পাইয়াছেন তাহা বলা যায় না। আর এক কথা হইতে পারে তাঁহার অধ্যাত্ম চিন্তা এখন উন্নত হইয়াছে, সমাজ সংশ্লিষ্ট হইলে সে উন্নতির স্রোত রুদ্ধ হইবে। সে কারণে আর্য্য ঋষিগণ সংসার পরিত্যাগ করিয়া বনবাসী হইয়াছিলেন সেই আত্মোন্নতি ধর্ম্মজীবনের উৎকর্ষ সাধন ও জগদীশ্বরের প্রাণ সমাধানের উদ্দেশেই তিনি ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমরা বলি যদি গোস্বামী মহাশয় ধর্ম্মের পরিপাক করিতে পারিয়া থাকেন তবে সে পরিপক্ক অবস্থায় সমাজিদিগকে উপনীত করিবার চেষ্টা করা কি তাঁহার উচিত নহে। যদি তিনি ধর্ম্ম সাধনের কোন নূতন উপায় আবিষ্কার করিয়া থাকেন তবে তাঁহার ব্রাহ্ম ভ্রাতাগণকে তাহা অবগত করা কি কর্ত্তব্য নহে? যদি তিনি কোন নূতন সত্যের অধিকারী হইয়া থাকেন, সমাজে যাঁহারা এতদিন তাঁহার মুখাপেক্ষা করিয়াছিলেন তাঁহারা কি তাহাতে অধিকার পাইতে পারেন না? গোস্বামী মহাশয় সমাজে থাকিলে তাঁহার স্বীয় উদ্দেশ্য সাধিত হইত, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইত না। আমাদিগের নিকটেও তাঁহার ধর্ম্মমতের চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইত না।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ব্রাহ্মনাম পরিহার করিতে চান না। অথচ সমগ্র ধর্ম্মসমাজ তাঁহার। সমাজ পরিত্যাগ করিতে তাঁহার মমতা হয়। তিনি যে কোন সত্যের আবিষ্কার করিয়াছেন একথা তিনি বলেন না। যদি মনে মনে তাঁহার সে বিশ্বাস থাকে, যদি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে তাঁহার মতেরও কোন ভিন্নতা থাকে, তবে তাঁহার ব্রাহ্মনাম রক্ষা করিবার উদ্দেশ্য কি? সমাজের নামটী পর্য্যন্তও বজায় রাখিব অথচ সমাজী হইব না একি অসঙ্গত নহে?

সমাজ থাকিলে তিনি যে অপর ধর্ম্মসম্প্রদায় ও ধর্ম্মসমাজের দাস হইতে পারিবেন না এরূপ নহে। তিনি যে ধর্ম্মই অবলম্বন করুন না, সকল ধর্ম্মের দাস না হইলে তিনি অধিকারী নহেন। কোন ধর্ম্মসমাজে যোগদান না করিয়া তিনি যদি নিভৃতবাসী ও নিভৃতচারী হন কোন সমাজেই তিনি বিশেষ সহানুভূতি লাভ করিতে পারিবেন না। প্রকৃত দাসত্ব যাহাকে বলে তাহা তিনি কোন সমাজেরই করিতে সমর্থ হইবেন না। যদি তিনি লোকালয়ে বসবাস করিতে চান তবে তাঁহার ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ অথবা কোন সমাজ সংশ্লিষ্ট না থাকাই দোষাবহ। যদি প্রকৃত বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া গোস্বামী মহাশয় লোকলোচনের অন্তর্হিত হন, তবে কাহারও কথা কহিবার আবশ্যকতা থাকে না।

হিন্দুসমাজ বহুদিন হইতে ব্রাহ্মসমাজের ভাবগতিক উন্নতি ও অবনতির অবস্থা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন। পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজের উপর লোকের যে বিদ্বেষভাব ছিল ক্রমে তাহা অন্তর্হিত হইতেছে ব্রাহ্মসমাজ হইতে হিন্দুসমাজ যে কোন উপকার লাভ

করেন নাই একথা বলিলে কৃতঘ্নতা প্রকাশ পায়। ক্রমে ব্রাহ্ম হিন্দুকে চিনিতেছেন। কেশবের নববিধান হইতে ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুকে আদর করিতে শিখিয়াছেন, জনকয়েক অজাত শত্রু ধাৰ্ম্মিক বেশধারী বালক ভিন্ন বয়স্থ ব্রাহ্মগণ হিন্দুর মাহাত্ম্য প্রচার করিতে শ্লাঘা মনে করিতেছেন, অনেক কার্য্যে হিন্দু ব্রাহ্ম মিলিত হইয়া ধর্ম্মের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছেন। এরূপ অবস্থায় বোধ হয় ব্রাহ্ম সমাজ সম্বন্ধে আমাদের দুই এক কথা বলিবারও অধিকার জন্মিয়াছে।

আৰ্য্য সমাজ। ১৫ আষাঢ় ১২৯৩। ৩৩ সংখ্যা

অধুনা আমাদের প্রাচীন ভারতীয় সমাজ মধ্যে আৰ্য্য সমাজে বড়ই হুলুস্থুল ব্যাপার পড়িয়া গিয়াছে। ধৰ্ম্মনৈতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের ঘাত প্রতিঘাতে ভারতে এক নূতন যুগের আরম্ভ হইয়াছে। একি উন্নতি? উন্নতি দূরে থাক আমরা দেখিতেছি ক্রমশঃই আর্য্যধৰ্ম্মশাস্ত্রের, আর্য্যধৰ্ম্মশাসনের অবস্থা ক্রমশই হীন হইয়া পড়িতেছে যথেচ্ছাচারিতা এতদূর পরাক্রমের সহিত অধিকার করিয়াছে যে পূৰ্ব্বকালের অপূৰ্ব্ব সমাজবন্ধন এখন বিচ্ছিন্নপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে। পুনরায় তাহার সংস্কার করা প্রয়োজন। কিন্তু যে আর যেমন তেমন মুখের কথার কাজ নয়। এখনও বোধ হয় সমাজ সংস্কারকগণ বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না যে সমাজের কোন্ অংশের সংস্কার সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। কেহ বলিতেছেন ধৰ্ম্মনৈতিক আন্দোলন, কেহ বলিতেছেন রাজনৈতিক সমালোচনা, কেহ বা বলেন সমাজনৈতিক সমালোচনা করিলেই ভারতের উন্নতি হইবে। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিযা যাঁহার যাহা অভিরুচি, তিনি তদ্রূপ প্রস্তাব করিতেছেন কিন্তু এখনও প্রকৃত অনুসন্ধানের সূত্রপাত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। এখনও আর্য্যধর্ম্মের সহিত আর্য্যভারতের অধঃপতনের বিন্দুমাত্রও বিরামিত হইতেছে না। কেন হইতেছে না, হইতেছে কিনা সে সম্বন্ধে সমাজ সংস্কারক-বর্গের নিয়ত বিশেষ সতর্কভাবে অনুসন্ধান করা নিতান্ত প্রয়োজন, কিন্তু বোধ হয় এখনও সেরূপ অনন্যকর্ম্মা, শ্রদ্ধাস্পদ, বিজ্ঞ, ধাৰ্ম্মিক, সহিষ্ণু, সমদর্শী, সমাজ সংস্কারক-গণের আদৌ অবির্ভাব হয় নাই। ইদানীন্তন সংস্কারলিপ্সু সমুৎসুক মহাত্মাগণ এখনও তাদৃশ সময় পান নাই।। আমাদের মনে যেন এই হয় যে পুনরায় পূৰ্ব্ববৎ ব্রাহ্মণ-বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক নিঃস্বার্থভাবে ধৰ্ম্মার্থ জীবনোৎসর্গ করিয়া নিত্য নিয়মিত সমাজচিন্তা করিতে না পারিলে সমাজ সংস্কার কার্য্যের সমস্ত সদনুষ্ঠান সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিয়া উঠিতে পারা যায় না। প্রাচীন ভারতীয় দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি রাজর্ষি প্রভৃতি সাধুগণের সম্মত প্রকৃতি অবলম্বন না করিলে অর্থ চিন্তা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার ভোগ বিলাসিতার পরিহার করিয়া মিতাহারী অশেষ ক্লেশসহিষ্ণু সন্তোষশীল এবং ব্রতী না হইলে এতাদৃশ গুরুতর কার্য্যে

কৃতকার্য্যতা লাভ করা নিতান্ত অসম্ভব। এক সম্প্রদায়ের তাদৃশ প্রকৃতি ও জ্ঞান না জন্মিলে সেরূপ বিশুদ্ধ সংশোধন ঘটিতেছে না। সমাজের ধনীদিগেরও তাহাতে সাহায্য আবশ্যক। সংস্কার চেষ্টায় এখন আর অধিক আয়াস স্বীকার করিতে হয় না। কেবল প্রাচীন পদ্ধতির প্রতি কিঞ্চিৎ দৃষ্টি করিলেই চলিতে পারে। আমাদের "নিউ ফ্যাসন" পক্ষপাতী ইউরোপীয় তেজে তেজিয়ান নব্যসমাজে কি একথা গৃহীত হইবেক? "স্বার্থপরায়ণ ব্রাহ্মণগণই জাতিভেদাদি নানাপ্রকার কুব্যবস্থা দ্বারা সমাজ সমুন্নতি প্রতিরোধকারী।" আধুনিক অদূরদর্শী ঈর্ষাপরায়ণ বিদেশীয় বিধর্ম্মিগণের শিক্ষায় শিক্ষিত বাবুরা কি ইহা বুঝিবেন? আধুনিক সমাজের ভাবভক্তি দেখিয়া শুনিয়া আমাদের তো সেরূপ ভরসা সেরূপ বিশ্বাস হয় না। তবে বলিতে পারি না, ভারতের এমন সৌভাগ্যের দিন যদি নিকট হইয়া থাকে, যদি নব্য ও প্রাচীন সমস্ত সভ্যতম-বর্গ সমবেত হন, যদি তাঁহারা পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বীভাব পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত জনকে বন্ধু বলিতে লজ্জাভিমান পরিত্যাগ করিতে পারেন, ভারতের উন্নতির জন্য যদি যথার্থই তাঁহাদের চিত্ত আকুল হইয়া থাকে, তবে ধর্ম্মনীতিই বলুন, রাজনীতিই বলুন আর সমাজনীতিই বলুন, যে কোন নৈতিক সমালোচনা করিতে গেলেই তৎসঙ্গে আধ্যা-নৈতিক সমালোচনাই সর্ব্বাগ্র গণ্য বলিয়া বোধ হইবেক। তাহার পরে বিশেষ পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবেক যে ধর্ম্মনীতি রাজনীতি প্রভৃতি সমস্তই এক মহা সমাজনীতির অন্তর্গত। উহার যে কোন অঙ্গের সংস্কার অনুষ্ঠান করিতে গেলে অপর অঙ্গের সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা বোধ হয়, অথবা একাঙ্গের মঙ্গলামঙ্গলে অপরাঙ্গের মঙ্গলামঙ্গল স্বতঃই সংঘটিত ও সংগঠিত হইয়া আসে। সকলই পরস্পরের সাপেক্ষ। অথবা সেই আর্য্যসমাজ নৈতিক সংস্কার সম্বন্ধে সমালোচনার প্রয়োজন হয় যাহাতে সকল জাতীয় শিল্প, কৃষি প্রভৃতি ব্যবসায়িগণ বিদেশে যাইয়াই হউক বা দেশে থাকিয়া বিদেশীয় শিক্ষক আনাইয়া হউক, বিস্তারিতরূপে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, সংস্কার কার্য্যেও তাহা দেখিবার বিষয় হয়।

পূর্ব্বকালের ভারতীয় প্রথানুসারে শিক্ষার্থী হইলে উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্তির জন্য ব্যয় করিতে হইত না। লোকে যাহাতে বিনা ব্যয়ে শিখিতে পায় তাহার সদুপায় না হইলে নির্ধন কর্ম্মকার, কুম্ভকার, সূত্রকার, তন্তুবায় প্রভৃতি সম্প্রদায় স্ব স্ব ব্যবসায়ের উন্নতি করিতে পারে না। এক ব্যবসায়ী ব্যক্তি ভিন্ন ব্যবসা অবলম্বন করিলে কোন ব্যবসারই উন্নতি হইবে না। ইহাদিগকে যাহার যে ব্যবসা তাহাই তাহাকে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।

স্বাধীনতা, স্বাবলম্বন আত্মশাসন প্রভৃতি লইয়া অত আন্দোলন করিয়া কি হইবেক? প্রজালোকে রাজ্যেশ্বরের অধীন চিরকালই থাকিবে। নিজে নিজের ব্যাপার লইয়া যে আন্দোলন তাহা একপ্রকার আর্থিক। গবর্ণমেণ্ট যাহা করিতেছেন ও করিবেন, তাহাই করুন, তাহার মধ্যে বাড়িয়া সকলে মিছে গণ্ডগোল করিয়া কি হইবেক? চক্ষের উপর

কত কাঁদিতেছে, কত পরামর্শ দিতেছে, কত বলিতেছে, গবর্ণমেণ্ট কি তোমাদের কথা শুনিয়া কর্ম্ম করিয়া থাকেন না? কোনও পরামর্শ গ্রহণ করিয়া থাকেন? গবর্ণমেণ্ট যতই তোমাদিগকে দূরে রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন ততই তোমরা চাপিয়া ধরিয়া বৃথা ত্যক্ত হইতেছ। তোমরা বুঝ না যে তোমরা দুর্ব্বল সকলের কার্য্যের সমালোচনা করিবার সামর্থ্য তোমাদের হইবে কেন? তোমাদের স্বার্থ ও সকলের স্বার্থ বিস্তর বিভিন্ন। গবর্ণমেণ্ট কখন কোন্ অভিপ্রায়ে কোন্ কাজ করেন, কোন্ আইন পাস করেন তাহার মূল অভিসন্ধি কি তোমাদের কিছু বুঝিবার সুযোগ কি সাধ্য আছে? অবশ্যই সকলেরই ভ্রান্তি আছে, কিন্তু যদি গবর্ণমেণ্টের কোন ভুল হয়, আর তোমরা তাহার প্রতিবাদ কর, গবর্ণমেণ্ট কি কোন রাজপুরুষ তোমাদের কথায় ক্রটী স্বীকার করেন? ভারতবর্ষের জন্য ইংলণ্ড নয়। ইংলণ্ডের জন্যেই ভারতবর্ষ, এ মূলমন্ত্র কি তোমাদের কথায় আজ ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিতে পারেন? আমরা বলি, এ বৃথা চেষ্টায় আবশ্যক কি? যে দেশে অর্থ নাই, লোকের আহার চলিতেছে না, ক্রমে অসময় জরা আক্রমণ করিয়া লোককে দুর্ব্বল করিতেছে, দিবারাত্রি অশ্রুজলে ভাসমান হইয়া একেবারে উৎসাহবিহীন হইয়া পড়িতেছে কেবল রাজনৈতিক আন্দোলন করিয়া তাহাদের কি উপকার হইবেক? যে দেশের লোকে ইচ্ছামত দুটী সমুচিত আহার লাভে বঞ্চিত, সে দেশের লোকে আত্মশাসন লইয়া কি করিবে? ইংলিস গবর্ণমেণ্ট যদি প্রকৃতপ্রস্তাবে ভারতীয়দিগকে আত্মশাসন শিখাইবার চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে ভারতকে ক্রমে নিস্তেজ, নিরাশ্রয়, নির্দ্ধন, নিরন্ন করিতে চেষ্টা করিতেন না। ভারতীয়দিগকে যদি মিত্র জ্ঞান করিতেন তাহা হইলে তাহাদের সঙ্গে চতুরতা করিতে অবশ্যই অধর্ম্ম ও হানি বোধ করিতেন। ভারতীয়গণ ক্রমে স্বধর্ম্মে জ্ঞানে সতেজ ও সরল হইয়া উঠিতে লাগলে ইংলিস গবর্ণমেণ্ট কি কেবল প্রকৃত আনন্দ অনুভব করেন? না কেবল ভয়ের কারণ ক্ষতির কারণ মনে করেন? তাই বলি, এ সমুদায় রাজনৈতিক আন্দোলনের সময় এখন নয় উহাতে কিছুই হইবেক না, উহা ছাড়িয়া দিয়া অগ্রে যাহাতে নিজ পরিবারবর্গ, পাড়াপড়সি, প্রতিবাসী, গ্রামবাসী, দেশবাসী আত্মীয় বন্ধুগণ অনাহারে মারা না যায়, তাহারই চেষ্টা কর, তাহারই আন্দোলন করিয়া দেখ কোন সদুপায় আছে কিনা? ঝড়, বন্যা, মহামারি প্রভৃতি দৈব দুর্ঘটনা এদেশে হইয়াছিল কিন্তু কখনও এরূপ ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ হইত না। এখন কেন এরূপ হয়? তখন লোকের ঘরে অন্ততঃ ২।৩ বর্ষ ভোগ্য দ্রব্যসামগ্রী সঞ্চিত থাকিত, দৈবাৎ কোন আপদ উপস্থিত হইলে লোক চিন্তিত হইত না। এখন আর তেমন নাই। শুষ্ক ...গাছটীও আর লোকের ঘরে সঞ্চিত থাকিতে পায় না। নতুবা এখন পূর্ব্বের ন্যায় শস্যাদির উৎপন্নের কোন ন্যূনতা জন্মে নাই বরং উন্নতি হইয়াছে। এখন কি ভারতের কৃষকগণ শ্রম করিতে পরাঙ্মুখ? না ভারতীয় ভূমির উর্ব্বরতাশক্তির হ্রাস হইয়াছে? হায়, হায়, ভারতের কি ব্রহ্মশাপ, কি মহাপাপ ঘটিয়াছে! ইহার কি মোচন নাই?

যদি সমাজ সংস্কার করিতে হয় আগে লোকের দাবি নিবারণের আবশ্যক। কেবল চেঁচাচেঁচি লেখালিখিতে তাহা হইবে না। সমাজ সমাজ করিয়া, উন্নতি উন্নতি করিয়া, পাগল হইলে চলিবে না। যদি কোন সদুপায় থাকে তবে সে ধর্ম্মোন্নতি। উপযুক্ত বেদজ্ঞ ধর্ম্মপরায়ণ বিলাসত্যাগী ব্যক্তিগণ আর্য্যধর্ম্মের পঙ্কোদ্ধার কার্য্যে নিযুক্ত হউন। এরূপ লোক বাছিয়া লওয়া আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। যিনি ধর্ম্মানুষ্ঠাতা নিরভিমান, সমস্ত বেদ বেদাঙ্গ, ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতি ধর্ম্ম শাস্ত্রজ্ঞ, সর্ব্বভূতে সমদর্শী হয়েন, এমন লোক সংস্কারক হইলেই সমাজের প্রকৃত সংস্কার হইবে। এরূপ লোক নিভৃতবাসী। আমাদের অধর্ম্ম দেখিয়া তাঁহারা অন্তরালে বাস করিতেছেন। যদি কেহ ধর্ম্মপিপাসু থাকেন ইঁহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করুন, শ্মশানে প্রান্তরে জলে জঙ্গলে এইসকল আর্য্য গুরুদের আন্দোলন করিবার জন্য ধর্ম্মাত্মাগণ নিযুক্ত হউন। লোকসমাজে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া যাঁহাদের ব্রত, তাঁহারা অনন্যকর্ম্মা হইয়া যদি এই অন্বেষণকার্য্যে ব্রতী হন তবেই ভারতের আত্মার উন্নতির আশা হয়। ব্রাহ্মণ্যতেজ আবার তাহাতে প্রজ্জ্বলিত হয়। হিন্দুসমাজের প্রকৃত সংস্কার হইয়া আবার সত্যগুণের আবির্ভাব হয়। যে ভারত ধর্ম্মশিক্ষার মাতৃভূমি আজ মোক্ষমূলার আসিয়া যেখানে ধর্ম্মশিক্ষা দেয়, যে ভারত বেদ বেদাঙ্গের জন্মক্ষেত্র সেখানে অলকট আসিয়া গায়ত্রীমন্ত্র শিখাইতে যায়। হা ভারত, হা আর্য্যকুলতিলক ধর্ম্মাত্মাগণ! পতিত ভারতবাসীর এ দুর্দ্দশা কি দূর হইবে না? তোমরা যেখানে থাক হিমালয়ের নিভৃত প্রদেশ, নিবিড় অরণ্যের মধ্যস্থল যেখানেই তোমাদের বিহারভূমি হউক না কেন ভারতবাসী যদি তোমাদিগকে খুঁজিয়া না আনিতে পারে তবে তাহাদের ধর্ম্মই বৃথা, সংস্কার চেষ্টাই বৃথা। আজ কি ভারতীয়গণের সামান্য লজ্জার কথা! যে যে তেজের নিকটে তাৎকালিক তাদৃশ ক্ষত্রিয় তেজও মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের নিকটে দীপশিখার ন্যায় বারম্বার পরাজয় স্বীকার করিয়াছে, আজ সেই সকল দৈবশক্তি, যোগবলসম্পন্ন ব্রাহ্মণ তেজ, ক্রমাগত আরবীয় কুজ্ঝটিকা সমাবৃত হইয়া ইউরোপীয় তেজে কিনা বিলীন হইয়া গেল!! কি আশ্চর্য্যের কথা! আজ অলকট সাহেব কিনা ভারতীয় যোগশাস্ত্রের অনুষ্ঠাতা উপদেশকর্তা পদাভিসিক্ত!!! একি সাধারণ লজ্জার কথা, সামান্য ঘৃণার কথা!! হা ভারতীয়গণ, হা আর্য্য সন্তানগণ, হা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ, তোমরা যদি তোমাদের সেই সমুদায় অপৌরুষের যোগ-শাস্ত্রাদির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে তাদৃশ তাপক্লেশ সহ্য করিতে অভ্যাস করিতে তবে আজ অলকট নিশ্চয়ই ভারতে বুড়া দাদাকে গায়ত্রী শিখাইতে লজ্জিত ও ভীত হইতেন। এক কথা বলিতে আর এক কথা বিস্তর উঠিয়া গিয়াছে এখন সে থাক্। আমরা বলি পদে পদে প্রত্যেক কথায়, প্রত্যেক কাজে গবর্ণমেণ্টকে বিরক্ত না করিয়া, ইউরোপীয়দিগের দ্বারে দ্বারে যাইয়া আত্মদৌর্ব্বল্য, গৃহছিদ্র ব্যক্ত না করিয়া নীচের মত, সামান্য ভিখারীর মত ভ্রমণ না করিয়া রাজপ্রসাদের জন্য রাজদ্বারে খাটিয়া

খাইবার জন্য, সিবিল হইবার জন্য লালায়িত না হইয়া, কিসে ভারতের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইবে, কিসে ভারতের মুখ উজ্জ্বল হইবেক, প্রকৃত প্রস্তাবে কেবল সেই প্রসঙ্গে, সেই উদ্দেশ্য সেই দৈবজ্ঞান লাভমানসে ইউরোপে যাও আমেরিকায় যাও, আর ভারতে বসিয়াই পাও, সেই যোগবল সেই তপোবল সাধন করিতে চেষ্টা কর, যে যোগবলের নিকট আধুনিক বিজ্ঞানবলও অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়।

অতএব আমরা বলি হে আর্য্যকুলতিলকগণ! এখনও যদি ভারতের প্রকৃত উন্নতি চাও, এখনও যদি ভারতের প্রকৃত সমাজসংস্কার চাও, রাজনীতি সমালোচনা ইউরোপীয় শাসনের কুৎসা, ছিদ্রানুসন্ধান পরিত্যাগ কর। যদি প্রকৃত সংস্কার করিতে চাও, প্রকৃত আত্মশাসন আত্মোন্নতি প্রয়োজন বলিয়া বুঝিয়া থাক, তবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বেদবাণী দৈববাণীর প্রতি বিশ্বাস করিয়া অগ্রে সমাজশৃঙ্খল কর, কেহ ব্রাহ্ম, কেহ বৈষ্ণব, কেহ শৈব হইয়া দলাদলি বাধাইয়া দ্বেষাদ্বেষী করিয়া সর্ব্বনাশ করিও না।

শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র শিরোমণি
তালা চতুষ্পাঠী।

সংবাদ। ১১ শ্রাবণ ১২৯৩। ৩৭ সংখ্যা

হিন্দু ও মুসলমান

হিন্দু মুসলমানের ভিতর একটা বিদ্বেষভাব দাঁড় করাইয়া দেওয়া পাইওনিয়ারের একান্ত ইচ্ছা। সহযোগী বলেন কলিকাতায় শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত বাবুরা মনে করেন তাঁহারাই সর্ব্বজ্ঞ মহাপুরুষ, মুসলমানেরা কিছুই জানেন না। গবর্ণমেণ্টও সময়ে সময়ে এই বিদ্বেষবহ্নি জ্বালাইয়া উভয় ধর্ম্মাক্রান্ত লোকদিগকে নিস্তেজ করিতে চাহেন। এটী কি কাপুরুষতা নহে! পাইওনিয়ার শুনিয়া দুঃখিত হইবেন বাঙ্গালার মুসলমান কৃষক সম্প্রদায় হিন্দুর সহিত মিলিয়া নানা স্থানের প্রজাসমিতিতে যোগদান করিয়াছেন। উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানও শিক্ষিত বাঙ্গালীর সহিত সহানুভূতি করিয়া রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিয়াছেন।

পাইওনিয়ারের একজন সংবাদদাতা আবার পাইওনিয়ারের উপযুক্ত মন্ত্রী। তিনি বিগত টাউনহল সভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রভু বলেন টাউনহলে যেরূপ সভা হইয়াছে পাটনা ও ঢাকা কলেজের ছাত্রগণ ইচ্ছা করিলে সেরূপ বালকের সভা করিতে পারে। বাঁশের চেয়ে কঞ্চি টন্‌ক।

বাবু অমৃতলাল রায় ও হিন্দুসমাজ। ১১ শ্রাবণ ১২৯৩। ৩৭ সংখ্যা

গৌরিভা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন রায়ের পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল রায় বিলাত ও আমেরিকা ভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। দেশে আসিয়া তিনি যথাবিধি

প্রায়শ্চিত্ত করিয়া হিন্দুসমাজে প্রবেশলাভ করিতেছেন। বাবু অমৃতলাল একজন বিনীতস্বভাব উদারচিত্ত উৎসাহী যুবক। এতদিন পাশ্চাত্য প্রদেশে বাস করিয়া, পাশ্চাত্য ব্যবহার ও পাশ্চাত্য ভাষায় অভ্যস্ত হইয়া তিনি জন্মভূমির কথা ভুলেন নাই। আমেরিকা পরিত্যাগ করিবার পুর্ব্বে তিনি মাতৃভূমির দুঃখ কাহিনী বর্ণনা করিয়া যে হৃদয়গ্রাহী পত্রখানি লিখিয়াছেন তাহাতে তাঁহার স্বদেশপ্রিয়তা, স্পষ্টবাদিতা ও প্রকৃত মহত্ত্বের কথা সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বাবু অমৃতলাল রায় প্রথমে জামালপুর মাইনর স্কুল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া এট্রান্স ও এল. এ. পরীক্ষা দেন। তৎপরে বিদেশ ভ্রমণ বিশেষতঃ ইংলণ্ড গমনের জন্য তাঁহার ইচ্ছা জন্মে। ক্রমে সেই ইচ্ছা এত বলবতী হয় যে বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের কোন কথাতেই কর্ণপাত না কবিয়া একবারে তিনি কলিকাতা হইতে বিলাত যাইবার জন্য বাহির হন। তাহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া তিনি নিতান্ত দুঃখিত ও ভগ্নোত্যম হইয়া পড়েন। তাঁহাব পিতা জামালপুরে ট্রাফিক আফিসের একজন প্রধান কর্ম্মচারী। তিনি পুত্রের এই বলবতী প্রবৃত্তি দমন করিতে না গিয়া ক্রমে বিলাত যাত্রা করিবার জন্য পুত্রকে সাহায্য করাই উচিত বিবেচনা করিলেন। বাবু অমৃতলাল কৃতকার্য্য হইবার সুযোগ দেখিয়া আর কালবিলম্ব না করিয়া বিলাত যাত্রা করিলেন। লোকে যেমন অর্থকরী বিদ্যা লাভ করিবার জন্য বিলাতে যায়, অমৃতলালের সে উদ্দেশ্য ছিল না। লেথাপডা শিখিয়া কিসে তিনি ইংলণ্ডবাসীকে ভারতের দিকে আকৃষ্ট করিবেন ইহাই তাঁহার ইচ্ছা ছিল। আমেরিকাতেও তিনি সেই উদ্দেশ্যে গমন করেন। সেখানে বিশিষ্টনামা ব্যক্তিবর্গ তাঁহার সহিত যেরূপ সহানুভূতি করিয়াছিলেন তাহাতে বোধহয় অমৃতবাবু অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। আমেরিকাবাসিরা যে ভারতের পক্ষপাতী হইয়াছেন, সেও কেবল বাবু অমৃতলালেব চেষ্টায়। এই চেষ্টায় তিনি অনেকের অনেক কথা শুনিয়াছেন, সেদিন পর্য্যন্তও পাইওনিয়াব তাঁহার উপর কটাক্ষ কবিতে ক্রটী কবেন নাই। অমৃতলাল সেদিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই। তাহার উদ্দেশ্য—স্বদেশের দুঃখের কাহিনী কীর্ত্তন করা। বিদেশী আমেবিকানকে তিনি সে দুঃখের কাহিনী এমন করিয়া শুনাইয়াছেন, ভারতের অভাব, ভারত গবর্ণমেণ্টের ক্রটী এমন করিয়া বলিয়াছেন যে হিন্দু জাতির একদিকের গৌরবের কথা, প্রতাপেব কথা, ঐশ্বর্য্যের কথা, আর একদিকের অধঃপতনের কথা, বীর্য্যহীনতার কথা, দুর্ব্বিসহ দারিদ্র্যের কথা কোন দেশের কোন জাতির গোচর হইতে বাকি নাই। অমৃতভাষী অমৃত এখন ঘরে আসিয়াছেন—দীনহীন বিনীতের ন্যায় ম্লেচ্ছসহ-বাসরূপ সামাজিক অপরাধের জন্য শাস্ত্রীয় মতে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া হিন্দুসমাজে প্রবেশ লাভ কবিবার জন্য সমাজদ্বারে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। হিন্দু সমাজ কি তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিবেন? অমৃতলালের আর হ্যাটকোট নাই, টেবিলে খানা নাই, পাশ্চাত্য রুচি নাই, পাশ্চাত্য ব্যবহারের বিন্দুমাত্রও তাঁহাতে বর্ত্তমান নাই, এখন তিনি ধুতি চাদর ধরিয়াছেন, দেশীয় আহারে সন্তুষ্ট হইয়াছেন, বৈদ্য সন্তানের উপযুক্ত হিন্দুনীতি ও হিন্দু-

ব্যবহার-সম্মত সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন—অধিকন্তু তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি, উৎসাহ ও স্বদেশহিতৈষণা ভারতের মঙ্গলের জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয়। হিন্দুসমাজ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবেন? অমৃতলাল স্বজাতির মঙ্গলের জন্য স্বজাতিচ্যুত হইয়া স্বীয় পিতামাতা, বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের বিরহ সহ্য করিয়া দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিয়া আসিলেন হিন্দুসমাজ কি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া কৃতঘ্নতা দেখাইবেন? স্বজাতীয়ের জন্য যাঁহার প্রাণ কাঁদে, হিন্দুসমাজ কি তাঁহাকে চৌরঙ্গীতে বিজাতীয়ের সহিত বসবাস করিবার জন্য দূর করিয়া দিবেন?

আমরা কখনই এরূপ কার্য্যের প্রশ্রয় দিতে পারি না। যাহাতে হিন্দুসমাজ ছিন্নাঙ্গ, হতশ্রী ও সৌষ্ঠববিহীন হয় আমরা কখনই এরূপ ব্যবস্থার পক্ষপাতী নহি। বিলাত ফেরতগণকে সমাজ হইতে দূরীভূত করিয়া দিলে হিন্দু আর কিরূপে ইংরাজ রাজ্যে সুখের বাসনা করিতে পারেন? আমাদের মধ্যে যাঁহারা ইংরাজের দেশে গিয়া ইংরাজী ভাষা ইংরাজী রীতিনীতি ও আচারব্যবহার শিক্ষা করেন স্বভাবতঃ তাঁহারাই ভারতে ইংরাজের কিছু অধিক ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠেন, তাঁহাদিগের উপর ইংরাজের বিশ্বাস হয়, কোন অন্যায় কার্য্য করিতে গেলে তাঁহাদের দেখিয়া ইংরাজের ভয় হয়—কারণ ইঁহারা ইংরাজের ঘরের কথা জানেন। বিলাত ফেরতেরা কৃতবিদ্য তাঁহাদের ঘরে রাখিলে হিন্দু ইংরাজের রাজ্যে নানাপ্রকারে লাভবান হইতে পারেন। তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিলে হিন্দুর নানাপ্রকারের ক্ষতি। গবর্ণমেণ্টকৃত অন্যায়াচারণের প্রতিবাদ করিয়া ইঁহারা যতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন ইতরের পক্ষে সেরূপ কৃতকার্য্য হওয়া দুষ্কর। রামমোহন রায় যদি বিলাতে না যাইতেন, কেশব যদি বিলাতে না যাইতেন, সুরেন্দ্র কি লালমোহন যদি বিলাতে না যাইতেন, বিলাতে বসিয়া যে সকল খ্যাতনামা ভারতবাসী ভারতের মঙ্গলোদ্দেশে অনবরত পরিশ্রম করিতেছেন তাঁহাদিগকে যদি বিলাতে যাইতে দেওয়া না হইত, তাহা হইলে কি ইংরাজ রাজত্বে ভারতের কোন দুঃখ দূর হইত? বিলাত না গিয়াও অনেকে আমাদের হিতসাধন করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহা আমরা স্বীকার করি। রামগোপাল, হরিশ ও কৃষ্ণদাসের হস্তে ভারতবর্ষ কতটুকু উপকার পাইয়াছেন তাহা এই বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত দেখিয়া শুনিয়া আমরা যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছি আমাদের দেশীয় নব্যসহযোগিগণের মধ্যে বোধ হয় অল্পই ততদূর জানিতে সক্ষম হইয়াছেন। এই রামগোপাল হরিশ ও কৃষ্ণদাসই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, ইংরাজের হস্তে সুশাসন ও সুখস্বচ্ছন্দলাভ করিবার নিমিত্ত ভারতবাসীর বিলাতে যাওয়া প্রয়োজন। আমরা এই সকল মহাত্মারই উপদেশবাক্য গ্রহণ করিয়া বলি, হিন্দুসমাজ হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিয়া ক্ষতিগ্রস্থ হইবেন না।

কেহ কেহ লাভ ক্ষতি ছাড়িয়া কেবল ধর্ম্মের দোহাই দিয়া বিলাত-ফেরতকে সমাজ হইতে তাড়াইতে চান! অনেকেই এই বৃদ্ধের ধর্ম্মোপদেশ অনেকবার শুনিয়াছেন, এখন যাঁহারা কৃতবিদ্য হইয়া সংবাদপত্রের সম্পাদক হইয়া ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে স্ব স্ব

অভিমত ব্যক্ত করিতে শিখিয়াছেন তাঁহাদের অনেককেই বিদ্যাসাগরের ক, খ পড়িতে দেখিয়াছি। তাঁহারা একবার যেমন বৃদ্ধের কথা শুনিয়াছিলেন এখন তেমনি আর একবার শ্রবণ করুন। ম্লেচ্ছদেশে বাস, ম্লেচ্ছান্ন ভোজন ও ম্লেচ্ছ স্ত্রীগণ ইত্যাদি জ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য যথাবিবি প্রায়শ্চিত্ত করিলে শাস্ত্রানুসারে অপরাধীকে হিন্দুসমাজে গ্রহণ করা যাইতে পারে। প্রমাণের জন্য শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিবার অধিক আবশ্যক নাই। বাবু অমৃতলালকে সমাজে গ্রহণ করিবার জন্য ভট্টপল্লিবাসী পণ্ডিতবর চন্দ্রনাথ, রাখালচন্দ্র ও মধুসূদন ভট্টাচার্য্য মহোদয় প্রমুখ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ যে সকল প্রমাণাদি প্রয়োগপূর্ব্বক ব্যবস্থা দিয়াছেন তাহাই আমাদের মত সমর্থনের জন্য যথেষ্ট হইবে। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম বাবু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী উদ্যোগী হইয়া পণ্ডিতগণের মতামত গ্রহণ পুর্ব্বক অমৃতলালকে সমাজে লইবাব চেষ্টা কবিতেছেন। বৈদ্য সমাজের অন্তর্ভূত অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিও এই মতের স্বপক্ষ হইয়াছেন। কলিকাতা এবং অন্যান্য স্থানে যে সকল বৈদ্য সম্প্রদাযভুক্ত ব্যক্তি অমৃতলালকে সমাজে লইবার পক্ষে প্রতিবাদী হইয়াছেন আমরা তাঁহাদিগকে ক্ষান্ত হইতে উপদেশ দি। বিলাত ফেরতগণকে সমাজে গ্রহণ করিলে সমাজবন্ধনী শিথিল হইবে না, ধর্ম্মের পক্ষে বিশেষ কোন ব্যাঘাত হইবে না। আমাদের দেশের যে সকল ব্যক্তি বিলাতে না গিযা ঘবে বসিয়া ম্লেচ্ছাচার করিয়া থাকেন তাঁহারা যেমন হিন্দুধর্ম্মের শত্রু বিলাতে গিয়া ম্লেচ্ছ ভোজনে বাধ্য হইয়া বিলাত ফেরতগণ হিন্দুধর্ম্মের ততদূব শত্রু হইতে পারেন না। যাঁহারা আমাদের মতের প্রতিবাদী তাঁহারা ঘরের শত্রু অগ্রে দূর করিতে পারিলে তবে বাহিরের লোককে শত্রু বলিবার অধিকার পাইবেন, লোকাচারের উপর ধর্ম্মের শাসনও তাঁহাদিগকে গ্রাহ্য করিতে হইবে।

সম্পাদকীয়। ১১ শ্রাবণ ১২৯৩। ৩৭ সংখ্যা

অধ্যাপক মক্ষমুলার হিন্দুবিবাহ সম্বন্ধে মিঃ মালাবারিকে লিখিয়াছেন: "বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে আপনি যে যুদ্ধ বাধাইয়াছেন তাহাতে আমার বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। আপনাকে এ সম্বন্ধে কিছু লিখি নাই, তাহার কারণ আমি সকল বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না। আমি জানি আমাব অপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তি অনেক আছেন—এ বিষয়ে তাঁহাদেরই উপদেশ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। আমার বোধ হয় যখন বৃদ্ধ ব্যবস্থাপকেরা আপনারই মতালম্বী তখন এইরূপ বিষয়ে যাহা অস্বাভাবিক গবর্ণমেণ্টের তাহাই নিবারণ করা কর্ত্তব্য। লোকে যে আপনা হইতেই সব করিয়া লইবে ইহা দুরাশা। তাহাদিগকে আইনের সাহায্য দেওয়া আবশ্যক, কেন না আইন সাধারণের মতের সমষ্টি মাত্র। আমার মতে অপুষ্টদেহ বালক-বালিকার

বিবাহ দেওয়া উচিত নয়, কিন্তু বাল্যবিবাহের উৎসাহ দেওয়াই কর্ত্তব্য কেন না তাহা না করিলে আপনারা দূষিত ইউরোপীয়প্রথার অনুবর্ত্তক হইয়া পড়িবেন।"

অধ্যাপক মক্ষমূলারের মতামত চাহিবার অগ্রে দেশীয় পণ্ডিতগণের মতামত প্রার্থনা করা মালাবারির উচিত ছিল। মক্ষমূলার জ্ঞানী ও সংস্কৃতজ্ঞ হইতে পারেন, কিন্তু এ দেশীয় আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁহার মত সহসা গ্রহণ করিবার জন্য আমরা প্রস্তুত নহি। বাল্যবিবাহ যুবকগণের নিকট নিন্দনীয় বলিয়া বোধ হইলেও আমরা উহা হইতে যে পরিমাণে মঙ্গললাভ করি, অমঙ্গলের পরিমাণ তাহা অপেক্ষা অধিক নহে। এই বাল্যবিবাহের জন্যই হিন্দুর মধ্যে ইউরোপের ন্যায় ব্যভিচারদোষ ঘটে না। দরিদ্রের স্ত্রী বিধবা হইলে ইউরোপে যেমন নানা প্রলোভনে পতিত হইয়া ইহ-পরকাল নষ্ট করেন, হিন্দুসমাজে প্রায় সেরূপ দেখা যায় না। বাল্যবিবাহের ফলে পতিপত্নী উচ্ছৃঙ্খল হইতে পায় না, কেহ কাহাকেও উপেক্ষা করিয়া স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে পারে না। উভয়েব প্রীতি বলবতী হয় এবং উভয়ের দায়িত্ববোধ জন্মে। বাল্যবিবাহে হস্তক্ষেপ না করিয়া গবর্ণমেণ্ট শিশুবিবাহ-নিবারক ব্যবস্থা প্রচলিত করেন ইহাই মক্ষমূলারের অভিমত। আমি বলি গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে সমাজে একটা দারুণ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া উঠিবে। সমাজ হইতেই এই দূষিত-প্রথা নিবারণ করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। সমাজের ভিতর যাহা অহিতকর হইবে তাহারই জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট ছুটিয়া যাইবাব কোন আবশ্যক নাই। শিশুবিবাহ নিবারণ এমন কিছু কার্য্য নহে যে তাহার জন্য গবর্ণমেণ্টের শরণাপন্ন হইতে হয়। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে শিশুবিবাহ এক প্রকাব রহিত হইয়াছে। অশিক্ষিতের মধ্যে মুসলমান সম্প্রদায়ই শিশুবিবাহের পক্ষপাতী। হিন্দুর মধ্যে যে জাতিকে পণ দিয়া বিবাহ করিতে হয় তাঁহাদের কন্যার সংখ্যা অল্প, সুতরাং কন্যার মূল্য অধিক হওয়ায় লোকে কন্যার শিশুকাল হইতে বিবাহার্থী হয়। কোন কন্যা পিতৃমাতৃহীন হওয়ায় তাহার আত্মীয়বান্ধবেরা শীঘ্র শীঘ্র কন্যার বি হ দিতে পারিলেই নিশ্চিন্ত হন। কোথাও বা পিতামাতা আহ্লাদ করিয়া শিশুকন্যার বিবাহ দেন। এইরূপে শিশুদের বিবাহের উৎপত্তি হয়। শিশুবালকের বিবাহ হিন্দুর মধ্যে প্রায়ই রহিত হইয়াছে। যাহা আজও বর্ত্তমান অছে সমাজের দলপতি কি সমাজসংস্কারকগণ কিছুদিন চেষ্টা করিলে তাহা নিবারিত হইতে পারে। আইন ব্যবস্থায় সমাজসংস্কার করিতে যাওয়া, বিশেষতঃ একজাতীয় সমাজের পক্ষে ভিন্নজাতীয় রাজা হস্তে সমাজব্যবস্থা প্রার্থনা করা নিতান্ত অযৌক্তিক ও অন্যায় কার্য্য।

ছেলেধরা। ১৮ শ্রাবণ ১২৯৩। ৩৮ সংখ্যা

সহরে বড় ছেলেধরার ভয় হইয়াছে। খৃষ্টীয় মিসনরিদিগের প্রতাপকালে আর একবার এই ভয় উঠিয়াছিল। বাঙ্গালী হিন্দুর ছেলে তখন নূতন নূতন সাহেবের সহিত মিশিতে পাইয়া, স্কুল কলেজে মিসনরী অধ্যাপকদিগের নিকট যিশুখৃষ্টের দশটী আজ্ঞা কণ্ঠস্থ করিয়া, পথেঘাটে সাহেবদিগের হাতনাড়া মুখনাড়া দেখিয়া একেবারে ভুলিয়া যাইত। শিক্ষকের কথা ছাত্রে যেমন শিরোধার্য্য করে পিতামাতার কথা ততদূর মানে না, শিক্ষকের একটী আকর্ষণশক্তি আছে, ছাত্রের মনের উপর একটা টান আছে ছাত্র তাহাতে স্বভাবতই শিক্ষকের দিকে ধাবিত হয়। সাহেব অধ্যাপক বাইবেলের উপাসনার পাঠ পড়াইয়া ছাত্রদিগকে উপদেশ দিলেন—পৌত্তলিকতা মহাপাপ। ছাত্র অমনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন ভবিষ্যতে আর তিনি পুত্তলিকার পূজা করিবেন না। সাহেব বলিলেন শিশু পরিত্রাণের আর উপায় নাই। ছাত্র অমনি স্বধর্ম্মত্যাগ করিয়া পরিত্রাণের পথ খুঁজিয়া লইবার কল্পনা করিলেন। ইহার উপর যাঁহার আচার হিন্দুর কুলে কালি দিয়া ঐশ্বয্য প্রতিপত্তির লোভে লাঙ্গুল কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন তাঁহারাও তরলমতি ছাত্রবৃন্দের ভবিষ্যতের আশার উপর ভেল্কির খেলা খেলিতে লাগিলেন। যে বালককে একটু ইংরাজপ্রিয় দেখিতে পাইলেন অমনি তাহাকে গোরা বিবি, মোটা বেতন গাড়িঘোড়া ও হ্যাট কোটের প্রলোভন দেখাইয়া অল্পে অল্পে টানিতে আরম্ভ করিলেন। এই সব টানাটানিতে দুই একটী ছেলে ধরা পড়িল, স্তন্য ছাড়িয়া পিতার শাসন এড়াইয়া জাতি, ধর্ম্ম আত্মীয়বান্ধব সকলের স্নেহমমতায় জলাঞ্জলি দিয়া একেবারেই তাঁহারা অন্ধকার হইতে আলোকে প্রবেশ করিল। অভিভাবকেরা সতর্ক হইলেন, কেহ কেহ ছেলেধরার ভয়ে বালকের স্কুলে পড়া বন্ধ করিলেন। ছেলেধরা মিসনারির ভয়ে তখন হিন্দু সমাজে একটা বড় হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল।

কিয়দ্দিন এইরূপে যায়, অভিভাবকদিগের তাড়নায় ছেলেধরার আশঙ্কা কিছু কমিয়া আসে, গবর্ণমেণ্ট বেগতিক বুঝিয়া এক একটী নিরপেক্ষ স্কুল কলেজ স্থাপন করিয়া বর্গীর ভয় শান্ত করেন। তারপর ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রথম অভ্যুদয়। হিন্দুর বালক যিশু ছাড়িয়া একেবারেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের লোভে দলে দলে মির্জাপুরের গির্জ্জায় আসিয়া জুটিতে লাগিল। খৃষ্টধর্ম্মের প্রলোভনস্রোত বন্ধ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম কতকটা এই ছেলেধরার ভয় নিবারণ করিলেন। জাতি ধর্ম্ম ছাড়িয়া যে সকল বালক একেবারে হিন্দু সমাজের বহির্ভূত হইয়াছিল ব্রাহ্মধর্ম্মে তাহাদের প্রবৃত্তির অনুকুল বিষয় পাইয়া তাহারা আর অগ্রসর হইল না। ক্রমে ব্রাহ্মের ভিতরও ছেলেধরা দেখা দিলেন। কিন্তু খৃষ্টীয় ছেলেধরার ন্যায় ইহাঁরা ততদূর বাড়াবাড়ি করিলেন না। দুই চারি জন ঘরের বাহির হইয়া কিছু দিনের পর আবার স্ব স্ব গৃহে স্থান পাইলেন।

ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয়কালে ব্রাহ্মের উপর লোকের যে একটা বিদ্বেষভাব জন্মিয়াছিল সেই ভাবের সহায়তায় স্থানে স্থানে হরিসভা স্থাপিত হইল। হরিসভা ব্রাহ্মসমাজের বিদ্বেষ্টা। দেশের ভিতর স্থানে স্থানে যদি ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত না হইত কোথাও কখনও বর্ত্তমান পদ্ধতিক্রমে হরিসভা স্থাপিত হইত কিনা সন্দেহ। এই সকল হরিসভার অধিকাংশ সভ্য কাহারা? যাহারা "আর্য্যধর্ম্ম" সনাতন "হিন্দুধর্ম্মের" নাম ডাকিয়া এককালে বেদব্যাসের জন্ম দিতে চায়, পৈত্রিক ধর্ম্মত্যাগী অনাচারী নাস্তিক বলিয়া ব্রাহ্মগণকে ঘৃণা করে, মস্তকের উপর শিখা রাখিয়া, কণ্ঠী ও জপের ঝুলি ধারণ করিয়া গৌর নাম জপ করিতে করিতে দোকানদারী করে আদালতের আমলা হইয়া নিতাইয়ের নামে উৎকোচ গ্রহণ করে, রাধা নামে উন্মত্ত হইয়া বেশ্যার পদতলে আত্মসমর্পণ করে, আর রসকলি কাটিয়া প্রতিবাসিদিগের বৌ-ঝির সর্ব্বনাশের চেষ্টায় বিচরণ করে। যাহারা বাস্তবিক বৈষ্ণব নামের অধিকারী আমরা তাঁহাদিগকে এই ঘৃণিত দলভুক্ত করিয়া পাপের ভাগী হইতে পারি না। যে সকল সভ্য বাস্তবিক ধর্ম্মাত্মা তাঁহাদিগের চরণে একশতবার প্রণাম করিয়া দূরে রাখিয়া দি। কিন্তু একশতের মধ্যে একজনও যদি এইরূপ সাধুহৃদয় ব্যক্তি থাকেন তিনিও এই বাক্যের দলে সারস বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন না। অবশিষ্ট নিরানব্বই জনের ধর্ম্মের আড়ম্বর যেমনই অধিক তাহাদের পশুবৎ ব্যবহার কলঙ্কিত প্রবৃত্তি ও ভয়ানক অত্যাচারের কাহিনীও তেমনি বিচিত্র। পাঠক! হরিসভায় গিয়া ইহাদের প্রেমের ঢলাঢলি দেখিয়া আসিয়াছেন, যদি একবার এই পাশববৃত্তিপরায়ণ পাণ্ডবদিগের চরিত্রের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন এই পাষণ্ডেরাই প্রকৃতপক্ষে সমাজ ও ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত করিয়া বঙ্গদেশকে ছারখার করিয়া ফেলিতেছে। এই পাষণ্ডদিগের এক একটী সম্প্রদায় আছে। নদীয়া ও শান্তিপুরের বৈষ্ণবেরা যেমন শ্রীচৈতন্যের এক একজন শিষ্যকে কুলদেবতাস্বরূপে গ্রহণ করিয়া এক একটী স্বতন্ত্রদলে বিভক্ত হইয়াছেন এই চাকুরে বৈষ্ণবেরাও তেমনি শয়তানের অবতারস্বরূপ এক একজন পাপাচারী গোঁড়া বৈষ্ণবকে গুরুস্বরূপে গ্রহণ করিয়া তাহাদের অধীনে ধর্ম্মের নামে পাপাচারের নূতন নূতন উপায়সকল শিক্ষা করিতেছেন। এই গুরু আখ্যাধারী ষণ্ডগুলা প্রকৃত বৈষ্ণবসমাজ হইতে দূরীকৃত হইয়া সহরে ও গ্রামের ভিতর আশ্রয় লইয়াছে। সাধুহৃদয় বৈষ্ণবগণের নিকটে থাকিয়া তাহারা যে সকল পদাবলি গীতমন্ত্র ও আচরণ শিক্ষা করিয়া আসিয়াছে তাহাই তাহাদের শিষ্যসংগ্রহের সম্বল। সেই সম্বল লইয়া তাহাদের অনুচরবর্গ ' লে ধরিবার জন্য ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে থাকে। কোন তরলমতি বালককে দেখিতে পাইলে ছোঁ মারিয়া গুরুর নিকট আনয়ন করে। সেখানে আড়ম্বরে ভুলাইয়া দুই পাচ দিন মালসা-ভোগের সেবা দিয়া "ব্যাপ্টাইজ" করিয়া বসে এবং জাতিধর্ম্ম পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব এমন কি নিজের পৈত্রিক নামটী পর্য্যন্তও বহির্ব্বাসের ন্যায় ছাড়াইয়া ফেলিয়া গুরুমন্ত্রে দীক্ষা দেয়। ক্রমে বালক ধর্ম্মভাব

ছাড়িয়া চতুরতা করিতে শিখে, গুরু ও গুরুভাইদিগের চরিত্র অনুকরণ করিতে শিখে। প্রবল পাপের স্রোতে পড়িয়া আর তাহাকে সংসারের দিকে, কর্ত্তব্যের দিকে আপনার লোকের দিকে ফিরিয়া তাকাইতেও দেখা যায় না। এই দারুণ ছেলেধরার ভয় এখন এত প্রবল হইয়াছে যে অভিভাবকের ছেলে সামলান ভার। একবার ছেলে যদি বাহির হইয়া এই সকল গুরুর খপ্পরে পড়ে, একশতবার কাঁদিলে কাটিলেও আর সে ছেলে ঘরে ফিরিতে চায় না। হায়! হায়!! শ্রীচৈতন্যের পবিত্রধর্ম্মের কি দুর্দ্দশাই ঘটিয়াছে!!

আমরা আজ পাঠকগণকে একজন ছেলেধরা গুরুর বিবরণ দিব। বিবরণটী আমরা তাঁহার একজন পুরাতন শিষ্যের নিকট অবগত হইয়াছি কলিকাতার...বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে...গোস্বামী একজন উল্লিখিত প্রকারের ভক্ত বিটেলগুরু। ইনি অনেক রমণীকে মজাইয়াছেন এবং অনেক বালকের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। গোস্বামী মহাশয় শিষ্যগণের নিকট বৃত্তি আদায় করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করেন। একপণ পানের খিলি ও এক একটী অবিদ্যা না হইলে তাঁহার দিবারাত্রি অতিবাহিত হয় না। শিষ্যগণের উপর ইঁহার যেরূপ দাবীদাওয়া পুত্রের উপর পিতারও সেরূপ হয় না।

এই শিষ্যগণের চাকরী ও দোকানদারী হইতে গুরুভার গ্রহণ করিয়া তিনি যেরূপ সুখের সেবায় দিনাতিপাত করেন বিষয়ী ব্যক্তিরও ততদূর হওয়া সম্ভব নহে। এই বাবাজীর শিক্ষার গুণে রাজপুর নিবাসী তাঁহার একজন শিষ্য সম্প্রতি যেরূপ ভয়ানক অত্যাচার করিয়া একটী গৃহস্থরমণীর সর্ব্বনাশ করিয়াছে তাহা শুনিলেও কর্ণে অঙ্গুলি দিতে হয়। রমণী ভদ্রবংশীয় পুরুষানুক্রমে বিষ্ণুমন্ত্রের উপাসক। শিষ্য এক ব্যক্তি অনেকদিন হইতে তাহার সহিত আত্মীয়তা করিয়া গুরুমন্ত্র দেওয়াইবার জন্য প্রস্তাব করে এবং একদিন হঠাৎ কালকাতায় গুরুর নিকট লইয়া গিয়া মন্ত্র দেওয়াইতে চায়। রমণীর মাতা প্রথমে অস্বীকৃত হয়। পাষণ্ড তাহাকে ভগ্নী ও মাতৃ সম্বোধন করিয়া তাহার ও তাহার মাতার মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া দেয়, তাহাকে কলিকাতায় লইয়া যাইবার ছল করিয়া বিশ্বাসঘাতকতা পুর্ব্বক দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করে, এবং তাহার সতীধর্ম্ম বিনষ্ট করিয়া আবার গুরুর নিকট ফিরিয়া আসে। পাষণ্ড এখন তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, বেশ্যাবৃত্তি ভিন্ন তাহার আর উপায়ান্তর নাই।

গুরুবাবাজীর আর একজন শিষ্য চাঙ্গড়িপোতা নিবাসী একজন ভদ্র ব্রাহ্মণ বালক। গুরু তাহাকে নিজের খপ্পরে রাখিয়া এমনি করিয়া ফেলিয়াছে যে তাহার পিতামাতা কাঁদিয়া কাঁদিয়া দিনাতিপাত করেন, তথাপি ছেলেধরার খপ্পর হইতে তাহাকে বাটী আনিতে পারেন না। বালক উপযুক্ত হইয়া দুই পয়সা উপার্জ্জন করিতে সক্ষম—দরিদ্র পিতামাতা এক গুরুর উৎপাতে তাহার এক পয়সাও উপার্জ্জনলাভে বঞ্চিত। সে তাঁহাদের দিকে দৃকপাতও করে না। গুরুর পদসেবা করিয়া তাহার দিনাতিপাত হয়। পিতামাতা ভগ্নীর কথা একবারও তাহার মনে উদয় হয় না। যে শিষ্যটীর মুখে আমরা এই সমাচার পাইয়াছি তিনি সেদিন বালককে ভয় দেখাইয়া বাটীতে আনেন। সে সেই দিনই আবার গুরুর নিকট

পলায়ন করে। গুরু যে এখন তাহাকে কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছে তাহা বলা যায় না। আর একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সন্তানও এই ব্যাধের জালে আবদ্ধ হইয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। এইরূপ ছেলেধরা গুরু আজকাল বঙ্গদেশের প্রায় সকল স্থানেই দেখা দিতেছেন। যুবকদলের ভিতরে যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের উপর বীতশ্রদ্ধ হইতেছেন অথবা সংসারে ভেক ধরিয়া চলিবার উপকার কি তাহা বুঝিতে পারিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই গুরুগ্রহণের জন্য লালায়িত। গ্রামে গ্রামে এমন কত যুবক যে মজিবার উপায় অনুসন্ধান করিতেছেন তাহার সংখ্যা করা যায় না। সাধুসঙ্গ না হইলে, গুরুর উপদেশ না পাইলে ধর্ম্ম হয় না, পরকাল রক্ষা হয় না, এই সার উপদেশবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া পাপাচারী বৈষ্ণবনামধারী পিশাচেরা এই গোঁসাইজির মত ভেক অবলম্বন করিয়া স্থানেস্থানে যুবকদিগের পূজা গ্রহণ করিতেছে এবং ছেলে ধরিয়া উপার্জ্জনের এক নূতন পথের আবিষ্কার করিতেছে। ধর্ম্মসংস্কারাভিমানী ধর্ম্মপ্রচারকগণ কি এই সকল দেখিয়া শুনিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন? ধর্ম্মের সংস্কারের দিকে যদি তাঁহারা অগ্রে টানাটানি না করিয়া এই ধর্ম্মকঞ্চুক ধাম্মিকদিগের সংস্কারে প্রবৃত্ত হন, বঙ্গসমাজ তাঁহাদের নিকট বিশেষ উপকৃত হইবেন। হিন্দুপরিবার এই ছেলেধরা বর্গীর ভয়ের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া সুস্থ হইবেন। এইসব বৈষ্ণবদিগের গুরুব্যবসা আজকাল যেরূপ ভাব ধারণ করিয়াছে আফ্রিকার দাসব্যবসা তাহার নিকট হার মানে। ভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত কোন লোকে যদি আমাদের ধর্ম্মের উপর একটুও বা কটাক্ষপাত করে অমনি আমাদের স্বধর্ম্মপ্রিয়তার বৃদ্ধি হয়, সর্পের লাঙ্গুলে অমনি যেন পা পড়ে। বিলাতে গিয়া যদি কেহ কখনও অখাদ্য ভোজন করিয়া আসিয়া আবার হিন্দুসমাজে প্রবেশ করিতে চান অমনি সংস্কারকগণ সহস্রকণ্ঠে তাহার প্রতিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু স্বধর্ম্মে থাকিয়া ধড়াচুড়া পরিয়া মালা ঠুকিতে ঠুকিতে যাহারা রমণী ও বালকের সর্ব্বনাশ করিতেছে, ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের স্রোত প্রবাহিত করিতেছে, সমাজের ভিতর তাহাদের একটা শাসন করিবার জন্য কাহারও চেষ্টা নাই। যদি বাস্তবিকই সমাজ ও ধর্ম্মের সংস্কার করিবার আবশ্যক লইয়া থাকে, সমাজীদিগের উচিত অগ্রেই এ পাষণ্ডদিগের দমন করা। বালকের উপর যখন ভবিষ্যসমাজের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে তখন সেই বালকদিগকে ধরিয়া ধরিয়া যে সকল ছেলেধরা তাহাদের সর্ব্বনাশ করিতেছে অগ্রে তাহাদের শাস্তিবিধান করা সংস্কারকগণের অবশ্যকর্ত্তব্য। উপেক্ষা করিবার আর সময় নাই। সমাজ এখন সতর্ক হউন, গুরু ব্যবসায়ী অধাম্মিক বৈষ্ণবগণ সাবধান হউন, এই দাসব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় চরিত্র সংশোধনের উপায় দেখুন, নচেৎ দেশ উৎসন্ন যায় সমাজধর্ম্ম রসাতলে যায়। আমরা যে গুরুজীর কথা এই প্রস্তাবে উল্লেখ করিয়াছি অনুগ্রহ করিয়া অদ্য তাঁহার নাম প্রকাশ করিলাম না। এখন হইতে যদি তিনি সাবধান না হন আমরা পরে তাঁহার নামপ্রকাশে বাধ্য হইব এবং পুলিস ও সমাজের সাহায্যে তাঁহাকে ভাল করিয়া শিক্ষা দিব।

সংবাদ। ১৮ শ্রাবণ ১২৯৩। ৩৮ সংখ্যা

স্ত্রীস্বাধীনতাপ্রিয় বাঙ্গালী যুবক কি এই ইতিহাসটী মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিবেন? হিন্দু রমণীর অবরোধপ্রথা কেন? ঘাটে মাঠে স্ত্রীলোকের হাতধরিয়া বেড়াইতে গেলে কি হয় এখন তাঁহারা বেশ করিয়া বুঝিয়া লউন। আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা মুর্খ ছিলেন না। সমাজনীতিতে যেমন তাঁহারা অভিজ্ঞতালাভ করিয়া-ছিলেন কোন সভ্যজাতি আজ পর্য্যন্ত তাহা লাভ করিতে পারেন নাই। হিন্দুর সমাজবন্ধনী যেমন দৃঢ, লোকের চরিত্র বিশুদ্ধ রাখিবার পক্ষে যেমন অনুকুল, তেমন আর পৃথিবীর মধ্যে কোন জাতিরাই নহে। তিব্বতের বৌদ্ধসমাজ দেখিলাম স্ত্রীলোকের উপর শাসন না করিলে ব্যভিচারের প্রশ্রয় পায়, তাই এক অসভ্যরুচিসঙ্গত ব্যবস্থার প্রচার করিয়া ফেলিলেন। হিন্দুসমাজের ব্যবস্থাপকেরা দেখিলেন স্ত্রীলোকের চরিত্র নির্ম্মল রাখিতে গেলে তাহাদের কমনীয়কান্তি, সুন্দর বদনচন্দ্রিমা লোকলোচনের অন্তর্হিত করিয়া রাখা চাই; তাই সভ্য নীতিসঙ্গত অবরোধপ্রথা হিন্দু সমাজের ভিতর প্রবর্ত্তিত করিলেন। এই অবরোধপ্রথার বলে হিন্দুরমণীরা জগতের সম্মুখে সতীত্বের আদর্শস্বরূপে পরিচিতা হইয়াছেন। অবরোধপ্রথা না থাকিলে ইউরোপীয় সমাজের যে দুর্দ্দশা আমাদেরও সেই দুর্দ্দশা ঘটিত। অশিক্ষিত সমাজানভিজ্ঞ ইংরাজ এবং অর্দ্ধশিক্ষিত অপরিণামদর্শী ইংরাজের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙ্গালীযুবক স্ত্রীস্বাধীনতার জন্য উন্মত্ত, কিন্তু একবার যদি তাঁহারা কোন শিক্ষিত সমাজচিন্তাশীল ইংরাজের নিকট উপদেশ চাহেন, উপদেষ্টা নিশ্চয়ই বলিবেন "ইউরোপীয় প্রথায় স্ত্রীস্বাধীনতা বিষম অনর্থের মুল।" যিশুখ্রীষ্ট বলিয়া গিয়াছেন ব্যভিচার যে কেবল কার্য্যে হয় তাহা নহে, যে ব্যক্তি কুদৃষ্টিতে রমণীর মুখের দিকে নিরীক্ষণ করে সেও ব্যভিচার করিয়া বসে। সাধারণ লোকের মধ্যে এমন অল্প লোক আছেন যাঁহারা স্ত্রীলোকের মুখের দিকে কেবল পবিত্রভাবেই নিরীক্ষণ করিয়াছেন, ইতর লোকের কথা ত অনেক দূরে। যে সকল কেরাণীবাবু একটা রাজনৈতিক আন্দোলন উঠিলে মরিয়া যান, হরিসভা ও ব্রাহ্মসভায় গিয়া সপ্তাহে সপ্তাহে এক এক বোঝা ধর্ম্ম কুড়াইয়া আনেন, বেলা চারিটার পর অফিসের ছুটী হইলে মেছোবাজার ও হাড়কাটার ভিতর দিয়া আসিবার সময় যদি তাহাদেরই তামাসাটা একবার ভাল করিয়া দেখা যায় তাহা হইলেই বোধ-হইবে বাঙ্গালীর মধ্যে শিক্ষিত অশিক্ষিত, সাধু অসাধু অনেকেই প্রলোভনের হাত ছাড়াইয়া রমণীর উপর সাধু দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে শিখেন নাই। যখন রমণীর মুখ প্রলোভনের সামগ্রী, তখন সাধারণকে তাহা দেখিতে না দিয়া প্রলোভন নিবারণ করা কি সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর নহে। মনু বলিয়াছেন "ঘৃতকুম্ভ সম নারী তপ্তাঙ্গার সমঃ পুমান তস্মাৎ ঘৃতঞ্চ বহ্নিঞ্চ নৈকত্র স্থাপয়েৎ বুধঃ।" স্ত্রীস্বাধীনতাপ্রিয় বাঙ্গালী যুবক

যদি অনুধাবন করিয়া দেখেন তবে ভারতের সহিত বিলাতের রমণীদিগের অবস্থার তুলনা করিলে আর তাহাদিগের অবরোধপ্রথার পক্ষপাতী হইতে ইচ্ছা হইবে না।

মালাবারির বিবাহব্যবস্থার প্রস্তাব সম্বন্ধে লর্ড ডফরিণের অভিমত

১৬ কার্ত্তিক ১২৯৩। ৫০ সংখ্যা

মালাবারি যে হিন্দুবিবাহ সম্বন্ধে আইন করিবার জন্য বড়লাটের নিকট আবেদন করেন তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে পাঠকগণকে অবগত করিয়াছি। লর্ড ডফরিণ প্রত্যুত্তরে ইণ্ডিয়ান গেজেটে প্রকাশ করিয়াছেন যে এরূপ আইন করিতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টসকল এবং গবর্ণমেণ্টের প্রধান কর্ম্মচারীগণের সম্মতি নাই। লর্ড ডফরিণও তাঁহাদের সহিত একমত হইয়া হিন্দুবিবাহে হস্তক্ষেপ করিতে সম্মত নহেন। তাঁহার অসম্মতিব কাবণগুলিও গেজেটে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বডলাট বলেন:

মালাবারি যে বিষয়ের প্রস্তাব করিয়াছেন তদনুরূপ কার্য্যে ভারত গবর্ণমেণ্ট কয়েকটী নীতি দ্বাবা পরিচালিত হইয়া থাকেন। যেখানে জাতিগত অথবা দেশাচারগত কোন কার্য্যে বর্ত্তমান ফৌজদারী আইনের ব্যাঘাৎ হয় গবর্ণমেণ্ট সেখানে আইনেব বশবর্ত্তী হইয়া কায্য কবিবেন। যেখানে জাতি বা দেশাচারগত কোন নিয়ম দেওয়ানী আদালতের দ্বারা কার্য্যকবী হইতে পারে কিন্তু যাহাতে সাধারণনীতি অথবা ধর্ম্মনীতির ব্যাঘাৎ জন্মে গবর্ণমেণ্ট সে নিয়ম কার্য্যে পরিণত করিতে অস্বীকার করিবেন। যে কোন বিষযেব নিয়মাদি করিবার ক্ষমতা প্রজাগণের হস্তে এবং যাহা কায্যে পরিণত করিতে দেওয়ানী আদালতের সাহায্য আবশ্যক করে না, তাহাতে গবর্ণমেণ্ট কোন সম্পাদক রাখিতে ইচ্ছা করেন না।

এই সকল সাধারণ নীতি বিশেষ বিশেষ কার্য্যে প্রয়োগ করিবার সময় অনেক মতভেদ হওয়া সম্ভব। সেজন্য একটী সামান্য নিয়ম এই সকল বিষয় স্থির করিতে হয়। সে নিয়মটী এই—গবর্ণমেণ্টের হস্তে যতটুকু শাসনক্ষমতা আছে তাহাব চালনা করিয়া প্রস্তাবিত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পাবা যায় কি না, যদি না পারা যায় তবে বর্ত্তমান কার্য্যপদ্ধতির ব্যতিক্রম করিয়া কোন ব্যবস্থা করা গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত নহে। এই সামান্য নিয়মের প্রয়োগ করিয়াই মালাবারির প্রস্তাবে গবর্ণমেণ্ট সম্মতি প্রদান করিতে পারেন নাই। এ সকল বিষয় প্রজাবর্গের বিবেচনার উপর নির্ভর। কালক্রমে দেশের ভিতর শিক্ষার ক্রমবিস্তার হইয়া অধিবাসিগণেরা যেমন উন্নত হইবেন সেই পরিমাণেই তাঁহাদের সমাজও উন্নত হইয়া উঠিবে।

ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থামতে ধর্ম্মনীতির যেরূপ আদর্শ ধরা হইয়াছে তাহা এতদ্দেশীয় জাতিবৈষম্যগত ধর্ম্মনীতির সহিত কোন কোন স্থলে অসদৃশ। গবর্ণমেণ্টের

আদর্শ ধর্ম্মনীতি প্রয়োগ করিলে দেশীয় নীতিপদ্ধতি ক্রিয়াকলাপ দেশাচার এবং চিন্তা-প্রণালী সংস্কৃত হইলেও হইতে পারে, কিন্তু উপদেশ দেওয়া আইনের উদ্দেশ্য নহে। এই কারণেই একদিক হইতে আইন এবং অন্যদিক হইতে জাতিভেদ ও দেশাচারের বিবাদ বাধিলে আইনের কর্ত্তব্য স্বীয় নির্দ্দিষ্ট গণ্ডির ভিতরে কার্য্য করা।

আমরা লর্ড ডফরিণের কথায় আপ্যায়িত হইয়াছি। কথাগুলি তাঁহার ন্যায় বিবেচক রাজনীতিজ্ঞের উপযুক্তই হইয়াছে। মালাবারি সমাজসংস্কার ভ্রমে সমাজের যে মহানিষ্ট সাধন করিতে গিয়াছিলেন লর্ড ডফরিণ তাহা নিবারণ করিয়া প্রজাবর্গের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। মালাবারি একজন উন্নতমনা শিক্ষিত ব্যক্তি। লর্ড ডফরিণের উপদেশবাক্যে তিনিও জ্ঞানলাভ করিতে পারিবেন। আমাদের রাজা বিদেশী, তাঁহাদের রুচি ভিন্ন, চিন্তাপ্রণালী ভিন্ন এবং ধর্ম্মনীতি ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিতে যাওয়াও নিতান্ত অযুক্তি। রাজা যদি স্বদেশী হইতেন সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডের উপর তাঁহার কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে কাহারও আপত্তি থাকিত না। হিন্দুরাজাই পূর্ব্বাপর দেশাচারের ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছেন এখন ইংরাজের হস্তে সেই ক্ষমতাটুকু যাচিয়া দিতে গেলে আমাদের সর্ব্বনাশ। বিবেচক শাসনকর্ত্তাও তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়া মালাবারির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছেন। সমাজসংস্কারের জন্য যদি মালাবারির তৃষ্ণা বাড়িয়া থাকে তিনি সামাজিক উপায় অবলম্বন করিয়া সে তৃষ্ণা নিবারণ করুন। একে ত যে সকল বিষয়ে আইনের প্রয়োজন, তাহাতেই আমরা আইনের জ্বালায় অস্থির তাহার উপর আবার যদি সামাজিক বিষয়ে আইন প্রবিষ্ট করা হয় তাহা হইলে চতুর্দ্দিকে হাহাকার শব্দ পড়িয়া যাইবে। মালাবারি অনেকবারই রাজনীতি ছাড়িয়া সমাজসংস্কারক হইয়াছেন। তাই এখনও আইনের আকর্ষণ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। যদি সমাজসংস্কারের প্রয়োজন হয়, তবে আমরা বলি মালাবারি অগ্রে হিন্দুধর্ম্মের আলোচনা করুন। যিনি স্বধর্ম্মের গূঢ় ভেদ করিতে না পারিয়াছেন, তাহার পক্ষে সমাজ সংস্কারের চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। হিন্দুধর্ম্মের সহিত হিন্দুর আচারব্যবহারের নিকট সম্বন্ধ। মালাবারি অগ্রে ধর্ম্মের আলোচনা না করিয়া সমাজসংস্কার করিতে গেলে পদেপদেই ভ্রমে পতিত হইবেন।

চিঠিপত্র। ২১ অগ্রহায়ণ ১২৯৩। ২ সংখ্যা

বিলাতযাত্রীর সমাজচ্যুতি প্রসঙ্গে

সম্পাদক মহাশয়! বিলাত প্রত্যাগত ব্যক্তিদিগকে হিন্দুসমাজে গ্রহণ করা শাস্ত্রসম্মত ইহা ভট্টপল্লি, নবদ্বীপ, কলিকাতা প্রভৃতি প্রসিদ্ধস্থানের অনেক মহা-মহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ প্রমাণ করিয়াছেন। বিশেষতঃ স্বর্গীয় মহাত্মা রাজা স্যার

রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের পতিতোদ্ধার গ্রন্থে ইহার বিশেষ স্বপ্রমাণ হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় শিক্ষিত, সচ্চরিত্র ব্যক্তি সমাজ হইতে দূরীকৃত হইবে, আর অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত অসচ্চরিত্র ব্যক্তির দ্বারা সমাজের সৌষ্ঠব সাধন হইবে ইহা কি আকাশ-কুসুমের ন্যায় অসম্ভব নহে? বিশ্বাসই ধর্ম্ম। বিলাতাগত ব্যক্তিগণের হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা না থাকিলে কখন প্রায়শ্চিত্তাদি স্বীকার করিতেন না। যাঁহারা ইহাদিগকে অধার্ম্মিক বলিয়া ঘৃণা করেন তাঁহারা কি এদেশস্থ ধনশালী ব্যক্তিদিগের আচরণ জানেন না? অধিকাংশ ধনী সন্তানেরা যে অভক্ষ্য ভক্ষণ, অগম্য গমন চিরব্রত করিয়াছেন অথচ ইহারাই আবার সমাজে মান্যগণ্য ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত। ইহা কি সামান্য পরিতাপের বিষয়? যে সমাজ পবিত্রতার আধার, ন্যায়ধর্ম্মের আকর ছিল, তাহাতে এখন আর কি আছে। দেখুন কলিকাতার অদূরবর্ত্তী আদি-গঙ্গার সমীপস্থ কোন ধনাঢ্য ব্রাহ্মণদিগের বাটীতে মুসলমান সুপকার নিযুক্ত। ইহাতেও তাঁহারা সমাজের উচ্চ আসন অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। সকল জাতির শবচ্ছেদ করিয়া ডাক্তারেরা জাতিপ্রাপ্ত হইলেন। সুরাপান, কলের চিনি, লবণ এবং চর্ব্বি-মিশ্রিত ঘৃত ভক্ষণ করিয়া হিন্দুত্ব গেল না। কেবল বিদ্যাশিক্ষার্থ বিলাত যাত্রাতেই হিন্দুত্ব বিলোপ হইল? যদিও ইহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ হয় তথাচ তাঁহারা শাস্ত্রমত প্রায়শ্চিত্ত করিতে সম্মত। অপিচ ইঁহারা অন্যধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই। তবে কি কারণে সমাজ হইতে দূরীভূত হইবেন? যখন প্রায় সমস্ত ভারত বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল তখন বেদবিহিত কার্য্য কিছুমাত্র ছিল না। আবার যখন হিন্দুধর্ম্ম ভারতে প্রবল হইল, তখন সকলেই হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিল, যদি প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা না থাকিত তাহা হইলে আজি ভারতে পবিত্র হিন্দুধর্ম্ম এককালে তিরোহিত হইত। ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী, বেদপাঠ, বিষ্ণুপূজা ব্যতীত ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব থাকে না, কিন্তু নব্য সম্প্রদায়ের কয়জন ব্রাহ্মণ আচরণ করিয়া থাকেন। তবে কি তাঁহারা অহিন্দু বলিয়া সমাজ হইতে পৃথক আছেন? যে সকল মহাপুরুষেরা ইহার বিরুদ্ধ মতাবলম্বী তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, তাঁহাদের স্বজন, যজমান ও শিষ্যরা কিরূপ শাস্ত্রসম্মত আচরণ করেন। সুরাপান মহাপাতক মধ্যে গণ্য। সেই মহাপাতক যজমান শিষ্যকে মন্ত্রপাঠ করাইয়া সংস্রবদোষে কি আপনারা পতিত নহেন? অশাস্ত্রীয় কার্য্য হওয়া উচিত নহে তবে শাস্ত্রমত কার্য্য না হওয়াও আক্ষেপের বিষয়। যাহারা হিন্দুধর্ম্মের কোন এলাকা রাখেন না, অসৎকর্ম্মের চূড়ামণি তাঁহারাই সহসা রত্নাকর নাম ফিরাইয়া বাল্মিকঋষি হইয়া বসেন, আর বলেন উহাকে সমাজে লওয়া হইবে না। যিনি নিজে অন্ধ তিনি আবার সমাজের পথপ্রদর্শক। ইহা কতদূর পরিতাপ ও কৌতুকাবহ ব্যাপার। শাস্ত্রে উক্ত আছে যে জাতির চাকুরী করা যায় চাকর তজ্জাতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এখন ইংরেজের চাকরী সকলেই করিতেছেন? তবে আর সমাজের কি

বিচার রহিল? কলিকাতার কোন বড়ঘরের কায়স্থসন্তান বিলাত হইতে বাটী আসিয়া বিনা প্রায়শ্চিত্তে সমাজে প্রবেশ করিলেন আর কেবল দুঃখী বৈদ্যসন্তান লইয়া সমাজের এত আটআট হইতেছে কেন? পরিশেষে বক্তব্য যে যখন সদাচারী শাস্ত্রজ্ঞ হিন্দু চূড়ামণি ভট্টপল্লির আচার্য্য ব্যক্তিগণকে যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সমাজে গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছেন, তখন গোঁড়াগণ যুক্তিহীন প্রমাণ দিলে তাহাতে কেহই কর্ণপাত করিবে না। যদি কেহ শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা উপরোক্ত সুধীগণকে নিরস্ত করিতে পারেন, তদ্রূপই সমাজ চলিবে ইহাতে দোষ নাই।

৮ই অগ্রহায়ণ
১২৯৩

শ্রীরামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
সাং পানিহাটী।

সোমপ্রকাশ

রাজনীতি

রচনা-সংকলন

রাজনীতি

নিরস্ত্রকরণক্রিয়া। ১৪ ভাদ্র ১২৬৬। ৪২ সংখ্যা

সম্পাদকীয়

রাজা রাগদ্বেষাদি কারণবশতঃ সপক্ষপাত ব্যবহার করিলে সাধুলোকের কর্ত্তব্য তাঁহাকে নিবারণ করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু রাজা পক্ষপাত করিতে অনিচ্ছুক হইলে তাঁহাকে তদ্বিষয়ে প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করা সাধুর কর্ত্তব্য নহে। ইংরাজি সম্পাদকদিগের অনেকের সেই স্বভাবটি বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। রাজপুরুষদিগের মনে এই সংস্কার জন্মিয়াছে, প্রজাদিগের যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহার নিষেধ না করাতেই ১৮৫৭ খৃষ্ট অব্দের বিদ্রোহ ঘটনা হইয়াছে। অতএব তাঁহারা ঐ বিষয়ের নিবারণে দৃঢসঙ্কল্প হইয়াছেন। ঐ বিষয়ের নিষেধ চেষ্টা উত্তম কল্প কিনা আমরা পশ্চাৎ উল্লেখ করিতেছি, আপাততঃ রাজপুরুষেরা যেরূপে ঐ নিয়ম প্রচলিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহার গুণ দোষ বিচার করা যাইতেছে।

রাজপুরুষেরা কি এদেশীয় কি ইউরোপীয় যাবতীয় প্রজার নিকট হইতেই যুদ্ধাস্ত্র গ্রহণ করিবার আদেশ দিয়াছেন। তাঁহাদিগের এই আজ্ঞা যুক্তিমার্গানুসারিণী হইয়াছে সন্দেহ নাই।

ভালই হউক মন্দই হউক, যখন যে নিয়ম করিতে হয় সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি রাখিয়া সেই নিয়ম করিলেই রাজধর্ম্ম প্রতিপালন করা হয়। অন্যথা রাজোচিত কর্ম্ম করা হয় না। রাজারা জাতিভেদে নিয়মগত ইতর বিশেষ করেন না, এরূপ নয়। কিন্তু সেই ইতর বিশেষ করা সভ্য অবস্থায় শোভা পায় না। যাবৎ সভ্যতার সম্যক্ উদয় না হয়, তাবৎ রাজগণের কৃত নিয়মপদ্ধতি পক্ষপাতদোষে দূষিত দৃষ্ট হয়। সভ্যতার উদয় সহকারে নিয়মগত সেই পক্ষপাত ক্রমে অন্তর্হিত হইতে থাকে। তাৎকালিক নিয়মগত পক্ষপাত বহু অনর্থের হেতু হয়। সে সময়ে প্রজাগণের ন্যায়ান্যায়বোধে বিলক্ষণ ক্ষমতা জন্মে। সুতরাং সে সময়ে রাজা অন্যায় ব্যবহার করিলে প্রজাগণ তাহা কোন ক্রমেই সহ্য করে না। একদা ভারতবর্ষীয় প্রজাগণ ন্যায়ান্যায় বোধে অসামর্থ্য প্রযুক্ত রাজকৃত নিয়মাবলি বহু দোষে দূষিত হইলেও তাহাতে অসন্তোষ প্রদর্শন করে নাই। কিন্তু এক্ষণে কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম হইলেই তৎক্ষণাৎ অসন্তুষ্ট হইয়া যায়। অতএব ঈদৃশ অবস্থায় রাজার সপক্ষপাত ব্যবহার কোন রূপেই বিধেয় নহে। যাহা হউক রাজপুরুষেরা সকল প্রজার নিকট হইতে তুল্যরূপে অস্ত্র গ্রহণের যে নিয়ম করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদিগকে প্রশংসা করিতে হইবে। কতগুলি প্রজা সশস্ত্র আর কতগুলি প্রজা নিরস্ত্র থাকিলে শস্ত্রধারী প্রজারা নিরস্ত্র প্রজাদিগের উপরে নির্ব্বিঘ্নে উপদ্রব করিতে পারে। সকলের একবিধ অবস্থা হইলে

আর সে শঙ্কা থাকে না। ফলতঃ রাজপুরুষেরা এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় উভয়বিধ প্রজার নিকট হইতে তুল্যরূপে অস্ত্রগ্রহণ করিয়া অপক্ষপাতিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ইংরাজি পত্র সম্পাদকেরা যেরূপ বলুন তাহাতে ক্ষতি নাই আপনাদিগকে বড় বলিয়া তাঁহাদিগের মনে বিষম অভিমান আছে। অতএব তাঁহারা এতদ্দেশীয়দিগের সহিত অভিন্ন ব্যবহার দর্শন করিলে যে ক্রুদ্ধ হইবেন তাহা আশ্চর্য্য নহে।

রাজপুরুষেরা নিরস্ত্রকরণ ক্রিয়ার অনুষ্ঠানের যে আদেশ করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত হইয়াছে কিনা এক্ষণে তাহা বিবেচনা করা যাইতেছে। যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহার অনুমত থাকিলেই প্রজারা বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হয়, ইহা প্রমাণিক বাক্য নহে। অস্ত্র ধারণ বিদ্রোহ প্রবৃত্তির কারণ নয়। রাজা ও রাজপুরুষদিগেব অন্যায়, অত্যাচার এবং বিসদৃশ ব্যবহার প্রভৃতি বিদ্রোহের মূল কারণ। সেই সকল কারণের নিরাকবণ করিলেই বিদ্রোহের মূলচ্ছেদন করা হয়, তাহা না করিয়া কেবল অস্ত্র গ্রহণ দ্বারা বিদ্রোহ নিবারণ করিবার সম্ভাবনা নাই। প্রজারা যখন বিদ্রোহী হয়, তখন তাহাদিগেব যুদ্ধাস্ত্র লাভ দুর্ঘট হয় না। আমাদিগের দেশে অনেকে আত্মবক্ষার্থ অস্ত্র রাখেন। সেই অস্ত্রের ভয়ে দুষ্ট লোকেবা তাঁহাদিগের অনিষ্ট সাধনে সমর্থ হয় না। নিরস্ত্রকরণ ক্রিয়া দ্বাবা তাঁহাদিগের সেই অস্ত্র গ্রহণ করিয়া কেবল তাঁহাদিগকে আত্মরক্ষার উপায় হইতে বঞ্চিত করা হইতেছে। যদি বলেন রাজার লোকেই দস্যুতস্করাদির উপদ্রব হইতে রক্ষা করিবে প্রজার আত্মরক্ষার্থ অস্ত্রগ্রহণের প্রয়োজন কি? একথা যথার্থ বটে কিন্তু অদ্যাপি আমাদিগের দেশের সেরূপ অবস্থা হয় নাই।

অপর অনেক সম্মানচিহ্ন জ্ঞান করিয়া অস্ত্রধারণ করেন। তাঁহাদিগের নিকট হইতে অস্ত্র গৃহীত হইলে তাঁহারা অপমান বোধ করিয়া অতিশয় অসুখিত হইবেন সন্দেহ নাই নিরস্ত্রিকরণ ক্রিয়া দ্বাবা যেমন যৎকিঞ্চিৎ ইষ্টলাভের সম্ভাবনা তেমন বহুতর অনিষ্ট হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। বরং রাজপুরুষেরা এরূপ নিয়ম করুন বদমাহেস বলিয়া যাহাদিগের উপরে সন্দেহ জন্মিবে তাঁহাদিগের নিকট হইতে অস্ত্র গ্রহণ করিবেন। নিরস্ত্রকরণ ক্রিয়ার আর একটি মহৎ দোষ আমাদিগের প্রত্যক্ষ-গোচব হইতেছে। আমরা প্রায়ই সমাচার পাইয়া থাকি, যাহাবা নিরস্ত্রকরণ কার্য্যে ব্যাপৃত আছে, তাহারা প্রজাগণকে আত্যন্তিক পীডন করিতেছে। ঐ ব্যাপার তাহাদিগের অর্থ উপার্জ্জন করিবার এক উৎকৃষ্ট উপায় হইতেছে। যাহারা ভদ্রলোক, যাহাদিগের গৃহে অস্ত্র নাই, নিরস্ত্রকরণ ক্রিয়া প্রবৃত্ত পুলিসের লোকেরা তাহাদিগের গৃহে অস্ত্র আছে বলিয়া তাহাদিগকে বিপাকে ফেলিতেছে। নিরস্ত্র-করণ ক্রিয়া শেষ হইলেই যে তাঁহারা ঐ উৎপাত হইতে মুক্ত হইবেন এরূপ সম্ভাবনা নাই। ইহার পরেও দুর্বৃত্ত পুলিসের লোকেরা তাহাদিগের গৃহে অস্ত্র আছে এই বদনাম দিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণ চেষ্টার ত্রুটি করিবে না।

ভারতবর্ষের আত্মশাসন। ১৫ পৌষ ১২৬৯

সম্পাদকীয়

ভারতবর্ষের শ্রীবৃদ্ধিকারিসহায় ইংরাজ সমাচার পত্র সম্পাদকদিগের কটু, স্বার্থপর, অসঙ্গত বাক্য অহরহ শ্রবণ করিয়া যাঁহাদিগের কর্ণ কণ্টকিত হইয়াছে তাঁহারা আজি ইংলণ্ডের অন্যতর যথার্থদর্শী সম্পাদকের নিরপেক্ষ অমৃতায়মান বচন শ্রবণগোচর করিয়া শ্রবণদ্বয়কে পরিতৃপ্ত করুন। ভারতবর্ষীয় ইংরাজী পত্রের সহিত ইংলণ্ডের সমাচার পত্রের কি মহৎ বৈলক্ষণ্য! যে সকল পত্র তথায় শ্রীবৃদ্ধিকারিদিগের সহায়তা করেন, তাঁহারাও ভারতবর্ষের বৃথা অবমাননা করেন না।

সম্প্রতি আমরা "প্রেস নামক" ইংলণ্ডীয় এক সমাচারপত্রে "ভারতবর্ষের আত্মশাসন" এই শিরোনামাঙ্কিত একটী প্রস্তাব পাঠ করিয়া অপরিসীম হর্ষপ্রাপ্ত হইলাম। লেখক ইহাতে ইংলণ্ডের যে যে কর্ত্তব্য ও ভারতবর্ষের যে যে আবশ্যক তাহা উত্তমরূপে বর্ণন করিয়াছেন। কয়েক বৎসর মাত্র হইল, এদেশে রেইলওয়ে, রাস্তা, কল প্রভৃতি হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তিনি বলেন, ইহার পূর্ব্বে "যদি আমরা ভারতবর্ষ হইতে বহিষ্কৃত হইতাম, তাহা হইলে আমাদিগের স্মরণার্থ কিছুই থাকিত না। পূর্ব্বে যদিও আমাদিগের হৃদয়ে ভারতবর্ষের ইষ্ট সাধনের ইচ্ছা ছিল বটে কিন্তু আমারদিগের উদার রাজনীতির অনুসরণরীতি ছিল না। আমরা এতদিন কেবল আমাদিগের নিজের লাভের আশায়ই ভারতবর্ষ শাসন করিয়া আসিয়াছি। আমরা স্বার্থপর ছিলাম যে ভারতবর্ষীয়দিগকে তাঁহাদিগের স্বদেশ শাসন সংক্রান্ত কার্য্য ও প্রধান প্রধান পদ হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলাম। তাঁহাদিগের অধঃপাতন সাধন আমাদিগের যেরূপ অভিপ্রেত ছিল, উন্নতি সাধন সেরূপ ছিল না।"

১৮৫৭ অব্দের বিদ্রোহ আমাদিগের যেমন অপকার করিয়াছে, তেমনি মহত্তর শ্রেয়ঃ সাধনও করিয়াছে। পূর্ব্বে আমরা এরূপ মনোহর বাক্য শ্রবণ করি নাই; যদি বা কখন শ্রুতিপথ প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, আমরা তাহার মাধুর্য্যরসের আস্বাদনে সমর্থ হই নাই। বিদ্রোহই ইংরাজদিগের অনেকের চৈতন্যোদয় করিয়া দিয়াছে। ভারতবর্ষীয়দিগকে ঘৃণা করা পূর্ব্বে অসচরাচর ছিল না। এই কু-সংস্কার দূরীভূত হইবার পর অবধি গবর্ণমেণ্ট মানী ব্যক্তিদিগের মানবর্দ্ধনে যত্নশীল হইয়াছেন; এতদ্দেশীয়দিগকে ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশাধিকার দানে সম্মত হইয়াছেন এবং গবর্ণমেণ্ট অধীনস্থ রাজগণের রাজ্য লইয়া স্বরাজ্য বৃদ্ধি করিবার ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়াছেন। তথাপি আমরা একটী চমৎকার দেখিতেছি, ভারতবর্ষে আজিও এরূপ একদল আছেন, তাঁহারা সর্ব্বদা এতদ্দেশীয়দিগের অপমান করিবার চেষ্টায় ফিরিতেছেন এবং আমাদিগের দেশের রাজা, নবাব এবং সম্রান্ত ব্যক্তিদিগকে অধঃশ্রেণীর তুল্য কক্ষ করিবার চেষ্টায় আছেন। "ভারতবর্ষের

শ্রীবৃদ্ধি” এই শব্দটী তাহাদিগের প্রকৃতভাব গোপনে রাখিবার এবং জগৎকে ভুলাইবার মহামন্ত্র হইয়াছে। তাহাদিগের অন্তঃকরণের প্রকৃত ভাব কি? পাঠকগণ জানিবার নিমিত্ত উৎসুক হইতে পাবেন। আমরা ইদানীন্তন কালের সর্ব্বপ্রধান বক্তা ও একজন উপযুক্ত রাজনীতিজ্ঞের বাক্য উদ্ধৃত করিয়া তাহা পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিতেছি। বর্ক বলেন “অসভ্য জেতৃগণ বিজিত জাতিকে ঘৃণা ও অপমান করে, তাহারা সর্ব্বদা বিজিত দেশের প্রাচীন ধর্ম্ম, রাজনীতি, আইন ও আচার ব্যবহার বিপ্লাবিত ও পরিবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা পায়। প্রদেশের সীমা বিপর্য্যস্ত করা, সাধারণকে দারিদ্র্যকূপে নিক্ষিপ্ত করা রাজা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে অধঃপাতিত করা এই সকল বিষয়েই তাহারা সতত যত্নবান হয়। যে সকল বিষয় বা ব্যক্তিদ্বাবা তাহাদিগের অত্যাচার নিবারণের সম্ভাবনা থাকে, তাহা উন্মুলন করা তাহাদিগেব একান্ত অভিপ্রেত।”

আমাদিগের শ্রীবৃদ্ধিকাবিদলেব কি এইরূপ চেষ্টা নয়? তাঁহারা কি এতদ্দেশীয় রাজাগণকে পদচ্যুত করিবার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে অবমানিত করিবার প্রধান উদযোগী নহেন? যে সকল রাজাবা পদচ্যুত হইয়াছেন তাঁহাদিগের নাম পর্য্যন্ত লোপ করাই কি তাঁহাদিগের অভিপ্রেত নয়? আমাদিগের দেশীয় ভ্রাতৃগণ ফ্রেণ্ডের লিখিত মুরশিদাবাদ ও হায়দরাবাদের নবাবের বিরোধী প্রস্তাবগুলি পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন।

উল্লিখিত প্রস্তাবে লেখক অযোধ্যার ভারতবর্ষীয় সভার প্রশংসা করিয়া তত্রত্য তালুকদারদিগের হস্তে কোন কোন ক্ষমতা দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন এবং তৎপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন “এই সকল লোককে আমবা পূর্ব্বে অপমান করিয়া তাঁহাদিগের নাম পর্য্যন্ত লোপ করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলাম। তথাপি ১৮৫৭ অব্দের ভয়ানক বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে যখন আমরা ক্ষমতাহীন ও উপায়হীন হইয়া হতাশপ্রায় হইয়াছিলাম, এই শ্রেণীর মধ্য হইতেই আমরা বিশ্বস্ত বন্ধু ও সহকাবী পাইয়াছিলাম।”

পাতিয়ালার রাজা ইহার দৃষ্টান্তস্থল, তথাপি এতদ্দেশীয় ইংরাজীপত্রে তাঁহাকে বিশ্বাসঘাতক পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে। অনন্ত প্রস্তাব লেখক সর চাবল্‌স উডকে অযোধ্যা ও অন্য অন্য স্থানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত করিবার অনুরোধ করিয়া 'শেষে লিখিয়াছেন “অযোধ্যার তালুকদারেরা যেরূপ গুরুতর বিষয় সকলের তর্ক বিতর্ক করিতেছেন, তদ্দ্বারা যদিও বক্তৃতা শক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হয় নাই বটে, তথাপি বুদ্ধিমত্তা ও রাজনীতিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তাঁহারা যে সকল বিষয়ে তর্ক করিতেছেন, তাহা কেবল অযোধ্যার নহে, সমুদায় ভারতবর্ষের শুভকর। যখন এই সভার এই প্রকারে কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে, তখন আমরা স্পষ্টাক্ষরে কহিতে পারি, ভারতবর্ষীয় উচ্চশ্রেণীস্থ লোকদিগের এক সভা করিয়া শাসন ও আইন বিষয়ে পরামর্শ লওয়া কর্ত্তব্য! ভারতবর্ষীয়-দিগকে শাসন কার্য্যের অংশভোগী করিবার আমাদিগের যে ইচ্ছা আছে, তাহা আমরা এই উপায় দ্বারা সম্পাদন করিতে সমর্থ হইব।”

উল্লিখিত প্রস্তাব লেখককে ধন্যবাদ দিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করা হইতেছে। এদেশে একটি জাতি সাধারণ সভা করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। আমরা বারম্বার ইহার প্রস্তাব করিয়াছি। আমাদিগের সুখের বিষয় এই, যখন আমাদিগের ভারতবর্ষীয় সভা নিদ্রিত আছেন, এবিষয়ে ইংলণ্ডে আন্দোলিত হইতেছে। যতদিন ইহা না হইতেছে, ততদিন আমাদিগের যথার্থ স্বাধীনতা ও যথার্থ উন্নতি হইতেছে না। সকল বিষয়েই গবর্ণমেণ্টের বদান্যতার উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে কেবল আপনাদিগের অলস ও নিরীহ স্বভাবের পরিচয় দেওয়া হয় এই মাত্র। চেষ্টা না করিয়া কোন্ দেশের মঙ্গল হইয়া থাকে? ইংলণ্ড ও ইতালীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই আমাদিগের বাক্যটী স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে। আমাদিগের দেশের লোকেরা কি এখনও এই মহাভীষ্ট সাধনে পরাঙ্মুখ থাকিবেন?

আগরার দরবার। ১২ অগ্রহায়ণ ১২৭৩

আগরার দরবারের শেষ হইয়াছে। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে বিস্তর রাজা, সর্দার ও জমিদার এবং গবর্ণমেণ্টের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের অনেক প্রধান কর্ম্মচারী এই উপলক্ষে তথায় গমন করেন। আগরা আকবরের প্রিয় রাজধানী, সজিঁহানের সময় অবধি উহার ক্রমশঃ শ্রী হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু ১০ই নভেম্বর অবধি ১৮ই পর্য্যন্ত এই শুষ্ক তরু পুনর্ব্বার নূতন পল্লবে শোভিত হইয়াছিল। প্রায় এক লক্ষ লোক তথায় সমবেত হইয়াছিলেন। আগরা ঐ কয় দিন ইঁহাদিগের পরিচ্ছদ বস্ত্র, গৃহ, অশ্ব, হস্তী, শকট ও নানা বর্ণের বসন দ্বারা এমনি শোভিত হইয়াছিল যে একজন উপযুক্ত চিত্রকর তাহা হইতে এক পরম রমণীয় চিত্র গ্রহণ করিতে পারিতেন। ১০ই নভেম্বর সর জন লরেন্স আগরার বেলওয়ে ষ্টেশনে উপনীত হন। নগরের যে বিস্তীর্ণ প্রান্তর আছে, সেই স্থানে গবর্ণর জেনারল ও সর্দ্দারদিগের বস্ত্রগৃহ সন্নিবেশিত হয়। পর দিবস গবর্ণর জেনারল যথারীতি কয়েকজন পারিষদকে মহারাজ সিন্ধিয়া ভূপালের বেগম ও যোধপুরের রাজার স্বাস্থ্য জানিবার জন্য প্রেরণ করেন। রাজগণও ঐ প্রকার শিষ্টাচার প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তৎপরে দুই দিবস গোপনীয় দরবার হয়। প্রত্যেক সর্দ্দার ১৫ মিনিট পর্য্যন্ত গবর্ণর জেনারলের সহিত কথোপকথন করিয়া শেষে আতর ও পান লইয়া বিদায় হন। প্রত্যেক সর্দ্দার ১৫ ও প্রত্যেক সহচর এক এক স্বর্ণ মোহর সাম্রাজ্ঞীর প্রতিনিধিকে উপঢৌকন দিয়াছেন। সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় এক শত সর্দ্দারের আগমন হয়। মহারাজ হোলকার উদয়পুরের রাজা ও রামপুরের নবাব পীড়িত থাকাতে আসিতে পারেন নাই। ১৮ই এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় যাবতীয় প্রধান লোক গবর্ণর জেনারলের প্রধান অভ্যর্থনা গৃহে গমন করেন। ঐ স্থানের উপরিভাগে একটি বৃহৎ বিতান, মধ্যে সিংহাসন ও তদুপরি স্বর্ণখচিত চন্দ্রাতপ ছিল। উভয় পার্শ্বে উজ্জ্বল স্বর্ণজল মণ্ডিত আসনে সর্দ্দারগণ, লেপ্টন্যাণ্ট গবর্ণরেরা ও প্রধান

সেনাপতি প্রভৃতি উপবেশন করেন। সর্দ্দারগণকে তাঁহাদিগের নিজ নিজ মর্য্যাদানুসারে গবর্ণর জেনারলের বামভাগে স্থান দেওয়া হইয়াছিল। অন্য অন্য লোকেরা আপন আপন নামাঙ্কিত এক পত্র প্রদান করেন। এডিকঙ তাঁহাদিগের নাম পাঠ করেন। তাঁহারা এক দ্বার দিয়া আনিত হইয়া অপর দ্বার দিয়া বিসর্জ্জিত হন। তাঁহারা গবর্ণর জেনারলকে এক একটি সেলাম করেন, আব গবর্ণর জেনারল ক্রমাগত মস্তক কিঞ্চিত নত করিয়া রাখিয়াছিলেন, কাহারও সহিত বাক্যালাপ করেন নাই। ফলতঃ এসকল দরবারে প্রায় এই রূপই হইয়া থাকে। বিশেষ পরিচিত হইলে শাসনকর্ত্তা দুই এক কথা কহিয়া থাকেন। কিন্তু উপস্থিত স্থলে কিছু বিশেষ ছিল, সর জন লরেন্সের প্রথমাবধিই "ইংরাজদিগের প্রভাব প্রদর্শন" অভিপ্রেত ছিল, সুতবাং তিনি বরাবর একইভাবে অবস্থান করিয়াছিলেন।

১৫ই সৈন্যদিগেব শিক্ষানৈপুণ্য প্রদর্শিত হয়। ৭০০০ ইউবোপীয় ও এতদ্দেশীয় সৈন্য গবর্ণর জেনাবলেব সম্মুখে রণপাণ্ডিত্য প্রকাশ কবিয়াছিল, প্রধান সেনাপতি নিজে অধ্যক্ষতা করেন এবং একটী তামসিক যুদ্ধ হয়। গোলন্দাজদিগের ক্ষিপ্রহস্ততা, পদাতিকদিগের গমন কৌশল ও অশ্বাবোহিদিগের তরবারি ক্রীড়া দর্শনে সকলেই সবিশেষ সন্তোষ লাভ করেন। কি ইউরোপীয় কি এতদ্দেশীয় সৈনিক পুরুষই রণনৈপুণ্য প্রদর্শন করে। এতদ্দেশীয় বাজগণ পূর্ব্বেই জানিতেন এবং এখনও দেখিলেন এই সকল সৈন্যের নিকটে তাঁহাদিগের অর্দ্ধশিক্ষিত সৈন্যগণ কোন কাজেব নহে। এই তামসিক যুদ্ধে কয়েকটী দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। বিশেষ আক্ষেপেব বিষয় এই একজন অশ্বারোহী অগ্রসর হইবার সময়ে অশ্ব সহিত পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিযাছে। কামানেব শব্দে কয়েকটি হস্তী ভয়ে পলায়ন করাতে তদ্দ্বারা তিন জন হত ও প্রায় ১০ জন গুরুতররূপে আহত হইয়াছে।

১৫ই গবর্ণব জেনারল প্রধান প্রধান বাজাদিগের তাঁবুতে গিয়া তাঁহাদিগেব সহিত সাক্ষাৎ করেন। মহারাজ সিন্ধিয়া ভূপালেব বেগম প্রভৃতি কয়েকজন মাত্র এই সম্মানভাজন হন।

১৬ই নবেম্বর প্রধান দরবার হইয়া নূতন ষ্টাব প্রদান করা হয়। বেলা সাড়ে এগারোটার সময়ে সর্দ্দারেরা তাঁবুতে আসিতে আবম্ভ করেন, যাঁহার যে প্রকার সম্মান, সেইরূপ তোপ হয়। দুই প্রহরের সময়ে গবর্ণর জেনারল উপস্থিত হইলেন, ২১টি তোপ হইল। সকলেই তাঁহার সম্মানার্থ দণ্ডায়মান হইলেন। তৎপরে সেক্রেটারি মুইর সাহেব ইংরাজী ও হিন্দুস্থানীতে রাজ্ঞীর পত্র সকল পাঠ করিয়া জানাইলেন, তিনি অমুক অমুক সর্দ্দার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে নাইট পদ প্রদান করিয়াছেন। তৎপরে প্রধান সেনাপতি প্রত্যেক নাইটকে গবর্ণর জেনারেলের সম্মুখে লইয়া গেলেন। সর জন লরেন্স স্বহস্তে গলদেশে ফিতা ও গলাবন্ধ দিয়া হস্তে ষ্টারটি দিলেন। তৎপরে গবর্ণর জেনারল হিন্দুস্থানীতে

এক বক্তৃতা করিলেন। যোধপুরের রাজাকে তিনি বলিলেন "আপনি পৃথিবীর মধ্যে অতি প্রাচীন রাজ-বংশোদ্ভব, আপনার যেমন কুলমর্য্যাদা আছে, সেইরূপ রাজ্য শাসন বিষয়ে প্রাধান্য হইলেই পদের শোভা হয়, আমার এই একান্ত প্রার্থনা।" অতঃপর কিরৌলিবর রাজা মদন পালকে সম্বোধন করিয়া বলা হইল, বিদ্রোহের সময়ে তিনি ও তাঁর সাহসী সৈন্যগণ গবর্ণমেণ্টের সবিশেষ সহায়তা করেন, তাহাতে ইংলণ্ড ও ভারতেশ্বরী সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এই সম্মান করিতেছেন। স্বীয় রাজ্য উত্তমরূপে শাসন করিয়া তিনি যশস্বী হন, ইহাই ইংলণ্ডেশ্বরী ও গবর্ণর জেনারলের ইচ্ছা। ঐ প্রকার বলরামপুরের ও মায়ামাউএর রাজাকে বলা হইল। তৎপরে গবর্ণর জেনারল সাধারণো সম্বোধন করিয়া বলিলেন যাবতীয় নাইট ও সহচরকে (কম্পানিয়নকে) তিনি পৃথক পৃথক করিয়া সম্ভাষণ করিতে পারিলেন না। কিন্তু সামান্যতঃ সকলকে এই অনুরোধ করা হইল ভারতবর্ষীয় ষ্টার অতি প্রধান সম্মান চিহ্ন। রাজ্ঞী নিজে ইহা ধারণ করিয়াছেন। প্রিন্স অব ওয়েলস প্রধান নাইট। অতএব যাঁহারা এ সম্মান-ভাজন হইলেন, তাঁহারা রাজ্ঞীর ঔদার্য্য স্মরণ করিয়া যেন তাঁহার প্রতি ভক্তি ও তাঁহার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করেন।

১৭ই নবেম্বর মহারাজ সিন্ধিয়া ভোজ দেন। ঐ দিবস বিখ্যাত তাজমহল ও তন্নিকটবর্ত্তী উদ্যান নানাবর্ণের দীপমালায় ভূষিত হয়। সহস্র সহস্র দীপ যমুনার জলে ভাসাইয়া দেওয়া হইয়াছিল—ইতিপূর্ব্বে আগ্রার মিউনিসিপালিটি ঐ প্রকার আলোক দিয়াছিলেন। রবিবার কিছু হয় নাই। সোমবার গবর্ণর জেনারলের পীড়া হওয়াতে দরবার বন্ধ হয়। মঙ্গলবার সর্ব্বপ্রধান দরবার হয়। ঐদিবস যাবতীয় সর্দ্দার ও গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী মহাসমারোহে গমন করেন। সর জন লরেন্স এক বক্তৃতায় রাজা ও সর্দ্দারদিগকে রাজ্ঞীর প্রতি ভক্তি প্রদর্শন ও উত্তমরূপে আপন আপন রাজ্য শাসন করিবার অনুরোধ করেন। এ বক্তৃতায় নূতন কিছুই ছিল না। ভয় ও ক্ষমতা প্রদর্শন এই সকল দরবারের উদ্দেশ্য, তাহা সিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু লার্ড কানিঙ যে গাম্ভীর্য্য ও বিনয়নম্রতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সর জন লরেন্স তৎ প্রদর্শনে সমর্থ হন নাই। রাজভাব তাঁহাকে নূতন শিখিতে হইয়াছে। যাহা হউক তিনি দরবারের আড়ম্বরে লর্ড কানিঙকে জয় করিয়াছেন। আমরা এবার দরবারের বৃত্তান্ত মাত্র বর্ণন করিলাম, কিন্তু ইহার যে ফল ফলিয়াছে এবং মহারাজ হোলকার দরবারে আসিতে না পারাতে ইংলিসমান যে নান্দী পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন, তদ্বিষয় অবগত হইবার নিমিত্ত পাঠকগণকে আগামীবার পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিতে হইল।

দরবারের ফল। ১৯ অগ্রহায়ণ ১২৭৩

আগরায় দরবারে কি উদ্দেশ্য সাধিত হইল? দুর্ভিক্ষে গবর্ণমেণ্ট ২০ লক্ষ টাকার

শস্য পাঠাইয়া দেন, তাহার মধ্য হইতে ঊর্দ্ধ সংখ্যা পাঁচ লক্ষ টাকা লোকের কষ্ট নিবারণার্থ প্রদত্ত হইয়াছে। অবশিষ্ট ১৫ লক্ষ টাকার শস্য বিক্রয় করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে দরবারে ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইল। এমত কষ্টের সময়ে দশ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবার প্রয়োজন কি? সর জন লরেন্স ও তাঁহার অনুবৃত্তিকারিরা বলেন, ইহার দ্বারা রাজনীতি সম্বন্ধে এই ফললাভ হইয়াছে, ভারতবর্ষীয় রাজারা আকবরের রাজধানীতে ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রতিনিধিকে সম্মান প্রদর্শন করিতে আসিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা দর্শন করিলেন। ইহাঁদিগের অপর তর্ক এই, আসিয়ার লোকমাত্রেই বাহ্য আড়ম্বর ভালবাসেন, সর জন লরেন্স প্রথমে যে পরিমাণে কৃপণতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেই পরিমাণে আড়ম্বর না করিলে তাঁহার প্রতি লোকের ভক্তি ও ভয় হয় কৈ?

ভারতবর্ষীয় রাজগণ কি পঞ্জাবের যুদ্ধে বিশেষত: ১৮৫৭ অব্দের বিদ্রোহ কালে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা ও প্রভাব জানিতে পারেন নাই? যাঁহারা মনস্বী ও তেজস্বী পুরুষ, অগত্যা অধীনতা পাশে বদ্ধ হইয়া আছেন, সেই অধীনতাসূচক কোন ব্যাপার অথবা চিহ্ন যদি তাঁহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করা অথবা অনুভব করান হয়, তাঁহারা কি তাহাতে সুখিত হন? অনেকের এই রূপ প্রকৃতি আছে, সেই চিহ্ন দর্শন করিয়া অধীনতা নিগড় ভঙ্গ করিবার চেষ্টা জন্মে। ইতিহাসও ইহা সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছে। কোন রাজা স্বাধীনতালাভের সুযোগ পাইয়া তাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন? আসিয়া খণ্ডেই চিরকাল এই রীতি চলিয়া আসিয়াছে, যিনি প্রধান রাজা হইতেন অধীন রাজারা নিয়মিত রূপে তাঁহার চরণ সেবা করিতেন। কিন্তু এটা কি ইষ্টকর প্রথা? আমরা কাব্য নাটকাদিতে যখন

অস্তাপাস্তসমস্তভাসি নভসঃ
পাবং প্রয়াতে বরা
বাস্থানীং সময়ে সমং নৃপজনঃ
সায়ন্তনে সম্পতন।
সম্প্রত্যেষ সরোরুহদ্যুতিমুষঃ
পাদাংস্তবাসেবিতুং
প্রীত্যুৎকর্ষকৃতো দৃশামদয়ন
স্ত্বেন্দোরিবোদ্বীক্ষতে॥

পাঠ করিতাম তখনি ইহা দূষিত বলিয়া বোধ হইত। এই দূষিত ও নিকৃষ্ট প্রথার অনুমোদন ও তাহাতে উৎসাহদান কি সভ্য গবর্ণমেণ্টের বিধেয় হয়? যতদিন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এ প্রথা প্রবর্তিত করেন নাই তত দিন কি গবর্ণমেণ্ট উপেক্ষণীয় ছিলেন? অপর আসিয়ার লোকেরা আড়ম্বর ভালবাসেন, কিন্তু এ আড়ম্বরকে তাঁহারা একটি তামাসা বলিয়া জ্ঞান করেন, অথবা ইহা প্রভুভক্তি বদ্ধমূল করিবার উপায় বলিয়া বিবেচনা করেন জানা উচিত। যদি বল রাজগণ গবর্ণর জেনারলের ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া ভীত হইবেন। সে

বিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য এই, সর্পকেও লোক ভয় করেন, ব্যাঘ্রকেও ভয় করেন আবার যথার্থ শ্রদ্ধাস্পদ প্রধানকেও ভয় করেন। এ ভয় কি প্রকার ভয়, তাহাও একবার জানা আবশ্যক।

লার্ড কানিঙ যে দরবার করিয়াছিলেন, তাহাতে সর্দ্দারদিগের প্রতি স্নেহ ও সদ্ভাব প্রদর্শিত হইয়াছিল। পিতা যে প্রকার পুত্রকে বলেন "যদি ধর্ম্মপথে না চল, তবে আমি তোমাকে আমার উত্তরাধিকারী করিব না।" সেইভাবে লার্ড কানিঙ রাজাদিগকে প্রভুভক্ত হইবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। রাজগণ বিদ্রোহানল বিষয়ে সাহায্য দান করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি তাঁহাদিগের নিকটে কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু সর জন লরেন্স রাজাদিগকে এক এক প্রকারে অবমাননা করিয়াছেন। কেহ তাঁহার পদোচিত তোপের অনুমতি হয় নাই, বলিয়া বিরক্ত হইয়াছেন, কাহাকে যথাযোগ্য আসন দেওয়া হয় নাই, কেহ বা প্রবেশ কালে দৌবারিক দ্বারা নিষিদ্ধ হন, কেহ ভ্রমবশতঃ জুতা লইয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন বলিয়া তিরস্কৃত হইয়াছেন। তিনি এদেশের ব্যবহার ও লোকের মনোভাব জানেন বলিয়া আমাদিগের সংস্কার ছিল। কিন্তু রাজনীতিজ্ঞের যাহা জানা উচিত তাহা তিনি জানেন না। এদেশীয় লোকেরা বাহ্য সম্মান লাভেই অধিকতর লোলুপ। ১৮১৪ অব্দের ১২ই নভেম্বর আডমস সাহেব লক্ষ্ণৌয়ের রেসিডেণ্টকে লিখেন "যাবতীয় প্রকাশ্য কার্য্যে নবাবকে স্বাধীন রাজার ন্যায় ব্যবহার করিবেন, কিন্তু কার্য্যতঃ তিনি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ থাকিবেন। এটী থাকিলে বাহ্য সম্মান কি পরিমাণে দেওয়া গেল তাহা বিবেচনা করিবার প্রয়োজন নাই।" কিন্তু সর জন লরেন্স ইহার বিপরীত কাজ করিতেছেন।

দ্বিতীয় অনিষ্টটি এতদপেক্ষা গুরুতর। তাজমহল বৈঠকখানা নহে, ইহা একটি কবর। মুসলমানের মৃতদেহ ইহার নিচে আছে। মোগল রাজত্বে মুসলমান ভিন্ন আর কেহ ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিতেন না। কি গত দরবার উপলক্ষে "কাফেররা" কেবল যে ইহাতে প্রবেশ করিয়াছিলেন এমত নহে, এই বাটীতে ভোজ হইয়াছিল। শূকরের মাংস দ্বারা ইহার অপবিত্রতা সম্পাদিতও হইয়াছে। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের মুসলমানেরা ইহাতে কি যাহার পর নাই দুঃখিত ও বিরক্ত হন নাই? পরাজিত জাতির প্রতি ইহা অপেক্ষা আর কিসে অধিক ঘৃণা প্রকাশ করা যায়? কোন ব্যক্তির মনে না ইহাতে কষ্ট হয়? যদি কোন জাতি ইংলণ্ড জয় করিয়া সেণ্ট পাল গিরজায় বলিদান দেন, অথবা ওয়েষ্ট মিনষ্টার আবি ভগ্ন করিয়া কবর সকল নষ্ট করিয়া উহাতে উদ্যান করেন তাহা হইলে ইংরাজদিগের যে কষ্ট জন্মে তাজমহলে আহার করাতে মুসলমানদিগের সেই মনোবেদনা হইয়াছে।

প্রেস সংক্রান্ত আইনের ইতিহাস। ২১ শ্রাবণ ১২৮৫। ৩৬ সংখ্যা

"রাম না হ'তে রামায়ণ" এ আমরা পুর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম। ইহার ভিতরে বঙ্গহিতৈষী মহাত্মা ইডেন সাহেব নিশ্চয়ই আছেন আমরা ঠিক অনুমান করিয়াছিলাম। কুক্ষণে বেল্‌ভিডিয়রে দুর্ব্বার হইয়াছিল, কুক্ষণে সকলে রাজপ্রসাদ গ্রহণ করিতে গিয়াছিলেন। এইখানেই আমাদের কপাল ভাঙ্গিল—এইখানেই এই দুরবস্থার সূত্রপাত! পাঠক! মহানুভব ইডেন সাহেবই এই ঘোর অমঙ্গলকর "নয় আইনের" মূল। বঙ্গবাসী কি কখন স্বপ্নেও ভাবিয়াছিলেন যাহাকে চন্দনতরু জ্ঞানে চিরকাল হৃদয়ের সহিত ভক্তি করিয়া আসিয়াছেন আজ সেই বৃক্ষ কালকুটময় ভয়ঙ্কর ফল প্রসব করিবে? মনুষ্য কি অজ্ঞান! আশা কি মায়াবিনী! ইডেন সাহেব রাজা হইলেন শুনিয়া আমরা কতই আশা করিয়াছিলাম, কতই আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলাম! কিন্তু

"অভাগা যদ্যপি চায় সাগর শুকায়ে যায়
হেদে লক্ষ্মী হন লক্ষ্মীছাড়া।"

আমরাও এমনই হতভাগা সুধা লইয়া ভক্ষণ করিতে গেলাম, অমনই তাহা গরল হইয়া উঠিল।

বেলবিডিয়রের দুর্ব্বার সংবাদ বোধ হয় ভারতবাসীর চিরকাল স্মরণ থাকিবে—এই সাল হইতে একটী নূতন অব্দ ইডেনাব্দ জন্মগ্রহণ করিল। এই দুর্ব্বারের অব্যবহিত পরেই ইডেন সাহেব লাট সাহেবকে একখানি পত্র লেখেন। তাহার মর্ম্ম এইরূপ :

"দশ বৎসর অবধি আমরা যেরূপ লেখা সহ্য করিয়া আসিতেছি বোধ হয় পৃথিবীর কোন রাজাই একপ সহ্য কবিতে পারিতেন না। এক সময় লার্ড নর্থব্রুক এই বিষয়ে হস্তার্পণ করেন, এবং আমরাও সকলে আপন আপন অভিপ্রায় জানাইয়া ছিলাম। কিন্তু পরিশেষে অনিচ্ছাবশতঃ তিনি আর ইহার কিছুই করিলেন না। সেই সময় হইতে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট (সর রিচাড টেম্পল) রাজদ্রোহী সম্পাদকদিগের প্রশংসা ও খোসামোদ করিতে আরম্ভ করেন, ক্রমে তাহাদের আচরণ একান্ত অসহ্য হইয়া উঠে। দেশের লোকের সহিত ইহাদের তাদৃশ সহানুভূতি নাই, গবর্ণমেণ্ট একটু কোপনভাব প্রদর্শন করিলেই তাহারা ক্ষান্ত হইবে। সমস্ত পত্রিকাই কর্ম্মচ্যুত কেরাণী অথবা ছলান্বেষী শিক্ষকের দ্বারা লিখিত হয়; কিন্তু আমরা তিরস্কার অবধি ইহারা স্বভাবের কিছু পরিবর্ত্তন করিয়াছে, এবং আমার বিবেচনায় ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য যে অন্যান্য স্থানীয় গবর্ণমেণ্টেকে লেখেন যে তাঁহারা দেশীয় ভাষায় লিখিত সংবাদ পত্রের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন এবং মধ্যে মধ্যে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিবেন। এই রাজবিদ্রোহী সম্পাদকদল এক্ষণে বেশ ভয় পাইয়াছে, অতএব তাহাদিগকে এই ভাবেই রাখা উচিত। তাহারা কটু বিদ্রোহানল বর্ণন করিয়া থাকে, এমন কি মধ্যে

মধ্যে স্বাধীনতা উদ্ধারের জন্য যুদ্ধেরও কথা বলিয়া থাকে—যদিও সে সমস্ত রাবিশ, তাহাতে সন্দেহ নাই—কিন্তু রাবিশও আমরা সহ্য করিব না।"

বিষবৃক্ষের বিষম বিষময় বীজ এইখানে রোপণ করা হইল! সদাশয় ইডেন সাহেবের এই ভয়ঙ্কর পত্রখানি নয় আইনরূপ ভয়ঙ্কর বিষবৃক্ষের বীজ! এই পত্র পাইবামাত্র লর্ড লিটন বাহাদুরের মাথা ভোঁ ভোঁ করিয়া ঘুরিতে লাগিল, নয়ন যুগলে তিনি জগৎমণ্ডল ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখিতে লাগিলেন—ভাবিলেন ভারতবর্ষ ইংরাজের হস্তচ্যুত হইল! তিনি তাড়াতাড়ি পুরাণ খাতা-পত্র খুলিয়া দেখিতে লাগিলেন সম্পাদকদিগের মুখবন্ধ করিবার জন্য ইতিপূর্ব্বে আর কখন কোন কথা উঠিয়াছিল কি না। দেখিতে দেখিতে প্রকাশ হইয়া পড়িল গুইকুমারকে লইয়া গোলযোগের সময় লার্ড সালিসবারি লাট সাহেবকে লিখিয়াছিলেন—"যদি সম্ভব হয় ও কর্ত্তব্য বোধ কর, অমৃতবাজারের সম্পাদককে কয়েদ করিবে।" কিন্তু একথা তখন উপেক্ষিত হইয়াছিল এখন আর কোথা যায়। লার্ড সালিসবারির বাক্যটী লার্ড লিটনের এই অত্যুচ্চ কীর্ত্তিস্তম্ভের ভিত্তিমূল হইল!—ইহারি উপরে সুপ্রসিদ্ধ নয় আইনের সংস্থাপন। তিনি গোপনে গোপনে এইভাবে সারকুলারজারী করিলেন যে, সমস্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট দেশীয় সংবাদ পত্র সম্বন্ধে আপনাদের অভিপ্রায় লিখিয়া সত্বর তাহার সমীপে পাঠাইয়া দিবেন। বিদ্রোহী সম্পাদকদিগের মুখবন্ধ করিবার জন্য একটি আইনের সৃষ্টি হইবে।" "একে চায় আরে পায়" "একে মনসা তায় ধুনার গন্ধ" সুবিখ্যাত ইডেন মহোদয় নিমেষের মধ্যে আপনার অভিপ্রায় লিখিয়া পাঠাইলেন। কি লিখিলেন পাঠক অনুমান করিয়া লউন। অনেকেই প্রায় এক প্রকারে না এক প্রকারে কালস্বরূপ ৯ আইনের বিধিবন্ধন পক্ষে মত দিলেন তবে যাঁহাদের শরীরে তেজ আছে, তাঁহারা মত দেন নাই। কলিদের সত্যসত্যই কিছু সকল লোকের অন্তঃকরণকে অধিকার করিতে পারেন নাই। মান্দ্রাজের গবর্ণর মহোদয় ডিউক অব্ বাকিংহাম বলেন, তাঁহার প্রজারা বিশেষ রাজভক্ত, ওরূপ কোন আইনের কিছুই আবশ্যক নাই, তাহার মতে প্রজার মুখবন্ধ করা অপেক্ষা প্রজাকে স্বাধীনভাবে রাজার কার্য্যকলাপ সমালোচনা করিতে দেওয়া সভ্য ও বুদ্ধিমান রাজা মাত্রেরই কর্ত্তব্য, এইরূপ তিনি অনেক সারগর্ভ উপদেশ দেন নাই। টেম্পল সাহেব এক প্রকার রীতিমত কিছুই বলেন নাই। আবার কেহ কেহ ইংরাজী ও দেশীয় সমস্ত সংবাদ পত্রেরই সমভাবে মুখবন্ধ করিতে বলেন, নতুবা গবর্ণমেণ্টকে পক্ষপাত দোষে দূষিত হইতে হইবে। তাঁহাদের কথায় উপেক্ষা করিয়া লাট সাহেব মার্চ্চ মাসের ১৪ই এই আইন বিধিবদ্ধ করেন এবং লার্ড সালিসবারিকে তারে এই সংবাদ দেন "ভারত-সাম্রাজ্য রক্ষার একমাত্র উপায় দেশীয় সম্পাদকদিগের মুখবন্ধ করা!" লার্ড সালিসবারি তখন তুরস্ক ও রুষিয়া লইয়াই ব্যস্ত, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের তিনি ৫০০০ হাজার ক্রোশ দূরে অবস্থিত। যাঁহারা ভারত রাজ্যের রক্ষক, তাঁহারা বলিতেছেন

ভারতবর্ষ যায় যায় হইয়াছে, সম্পাদকদিগের মুখ বন্ধ না করিলে আর থাকে না! সুতরাং অনুমতি না দিয়া এ অবস্থায় তিনি কি করিতে পারেন? অগত্যা তাঁহাকে সম্মতি দিতে হইল। অতঃপর ইডেন সাহেবের বিক্ষিপ্ত বীজ অঙ্কুরিত হইল—নয় আইনরূপ বিষবৃক্ষের জন্ম হইল। এইটী আইনের ইতিহাস।

এই ইতিহাস পাঠ করিয়া আমাদিগের এই সিদ্ধান্ত হইল, সাহেবেরা এদেশের লোকের মনের ভাব কখনই বুঝিতে পারিবেন না। ইডেন সাহেবের ন্যায় কোন সাহেবই বোধ হয় বঙ্গদেশে এতকাল থাকেন নাই ও এত লোকের সহিত মিশেন নাই। তাঁহারই এত ভ্রান্তি! আমরা লার্ড লিটনের দোষ দিতে পারি না। তিনি নূতন এদেশে আসিয়াছেন, এদেশের কিছুই জানেন না। বিশেষতঃ ইডেন সাহেবের উপরে তাঁহার অতি বিশ্বাস আছে। সেই অতি বিশ্বাসই তাঁহার অন্তঃকরণের উদার ভাবকে কলুষিত করিয়াছিল। অতএব তাহার হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হওয়া বিচিত্র নয়। এই কারণেই নীতিশাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন "বিশস্তে নাতিবিশ্বসৎ', যাহা হউক, শারদীয় মেঘের ন্যায় ইডেন সাহেবের প্রতি অতি বিশ্বাস তাঁহার হৃদয়ের উদার ভাবকে ক্ষণকালের জন্য আচ্ছন্ন করিয়াছিল বটে, কিন্তু পরেই তাহা মেঘাচ্ছন্ন শারদীয় চন্দ্রমার ন্যায় নৈসর্গিক শোভায় শোভিত হইয়া উঠিল। তাহা না হইলে ইডেন সাহেব যে যো তুলিয়াছিলেন তাহাতে এতদিন প্রধান প্রধান সংবাদ পত্রগুলি বন্ধ হইয়া যাইত। গ্লাডষ্টোন সাহেবের প্রস্তাব পার্লিয়ামেণ্ট সভায় অগ্রাহ্য হওয়াতে আমাদিগের আর এই একটী সিদ্ধান্ত হইয়াছে, ইংরেজ জাতির সেই পূর্ব্বেকার সমদর্শিতা ধর্ম্ম ও ন্যায়নিষ্ঠা আর নাই। তাহা থাকিলে তাহারা কখন অনায়াসে অক্ষুণ্ণ মনে ঘোর পক্ষপাত দূষিত ৯ আইনে মত প্রদান করিয়া গ্লাডষ্টোন সাহেবকে পরাস্ত করিয়া দিতেন না। আমাদিগের রাজপুরুষেরা যদি সমদর্শী হইয়া ইংরাজী বাঙ্গালা সমুদয় সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ করিয়া দিতেন, দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র থাকুক আর উঠিয়া যাউক তাহাতে আমাদিগের ক্ষোভ হইত না! আমাদিগের কর্ত্তারা ঘোর পক্ষপাতী হইলেন। এরূপ পক্ষপাতী হইয়া কিরূপে রাজ্য করিবেন। এদেশীয়দিগকে তাঁহারা যে অসন্তুষ্ট দেখিতে পান, তাহাদিগের পক্ষপাতিতাই তাহার কারণ। এদেশীয় সম্পাদকেরা যে কটু বলেন সেই পক্ষপাতিতাই তাহার কারণ। আমরা স্পষ্টাক্ষরে মহানুভব লর্ড লিটনকে জানাইতেছি, এদেশের কোন লোকেরই এমন ইচ্ছা নয় যে ইংরাজেরা রাজ্যচ্যুত হন বা উৎসন্ন যান। ইংরাজেরা কতকগুলি অন্যায় কাজ করেন বলিয়াই এদেশীয়েরা সময়ে সময়ে চটিয়া যান। ইংরাজেরা কতকগুলি অন্যায় কাজ করেন বলিইয়াই এদেশীয়েরা সময়ে সময়ে চটিয়া উঠেন এবং রুক্ষভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাহাতেই ছালপাতলা রাজপুরুষেরা এদেশীয় সংবাদ-পত্র সম্পাদকদিগকে বিদ্রোহী বোধ করেন। কিন্তু মহানুভব লর্ড লিটন যদি অনুধাবন করিয়া দেখেন, দেখিতে পাইবেন, ইংরাজী পত্রের ইংরাজ সম্পাদকদিগের অপেক্ষা

এদেশীয় সম্পাদকেরা গবর্ণমেণ্টকে অধিক কটু বলেন না। এদেশীয় সংবাদপত্র হইতে অধিক অনিষ্ট হয় বলিয়া তাঁহাকে যে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা ছল মাত্র, বাস্তবিক নয়।

ভারতের দুঃখ সঙ্গীত। ১৮ই ভাদ্র ১২৮৫। ৪১ সংখ্যা

(পার্লামেণ্ট মহাসভায় সংবাদপত্র সংক্রান্ত আইন রহিত করণের আবেদন অগ্রাহ্য হওয়ায়)

সিন্ধুখাম্বাজ—একতালা।

(আস্থায়ী)

কোথা হে বিধাতা, জগতের পিতা
মনোদুখ আজ জানাব তোমায়।
তোমা বিনে আর কে আছে আমার
মনোব্যথা আর দেখাব কাহায় ?

(অন্তরা)

হৃদি চিরে আজ দেখাব সকল,
অন্তরেতে তার জ্বলে যে অনল,
দহিতেছে পিতা হৃদি অধস্তন,
দয়া করে কবে নিবাবে গো তায় ?
কাঙ্গালিনী আমি অতি অভাগিনী
তনযা তোমার চির পরাধীনী,
দুখ বই আর সুখ নাহি জানি,
কেন বা বিধাতঃ ! সৃজিলে আমায়।
মনে মনে কত পুষি আশা পাখী,
হৃদয় পিঞ্জরে সমাদরে রাখি,
শেষে সেই পাখী দিয়ে মোরে ফাঁকি
গহন কাননে উড়িয়ে পলায়।

ভারতসভার নিকট আমাদিগের একটী প্রাথনা। ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৮৭

অর্থের কি মোহিনী শক্তি ! ইহার বলে দুষ্কর্ম্ম সুকর্ম্ম বলিয়া এবং দুর্জ্জন সাধু বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। যে বঙ্গবাসিগণ গৃহের বাহিরে এক পদক্ষেপন করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন তাঁহারাও এখন অর্থের নিমিত্ত অনায়াসে দূর দেশে ব্যাঘ্রের মুখেও জীবন বিসর্জন দিতে উদ্যত হইয়াছেন।

আমাদিগের রাজপুরুষগণের এই অসাধারণ গুণসম্পন্ন অর্থের প্রয়োজন হওয়াতে তাঁহারা অস্মদেশে এমন একটী মারাত্মক উপায় বাহির করিয়াছেন যে তদ্দ্বারা আমরা দিনদিন অধঃপাতে যাইতেছি। আমরা ধনেপ্রাণে বিনিষ্ট হইতে বসিয়াছি। তাঁহারা একবার সন্তান তুল্য প্রজার ভাবী ইষ্টানিষ্টের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলেন না তাঁহারা একেবারে আমাদের শমন ভবন গমনোদ্যত জীর্ণ দেহের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিতেও বিস্মৃত হইয়া গেলেন। গবর্ণমেণ্ট আব্‌গরির স্বাধীনতা প্রদান করিয়া আমাদের সর্ব্বনাশের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। যে সে এখন লাইসেন্স দিলেই স্বাধীনভাবে ভাঁটী করিয়া মদ্যাদি বিক্রয় করিতে পারিতেছে। ভারতের প্রত্যেক বর্দ্ধিষ্ণু পল্লীতেই এখন ৩।৫টী করিয়া মদের ভাঁটী, মদ এখনও ৪।৫ আনায় বোতল! যে যত পারিতেছে মনের সুখে তত পান করিয়া, শীঘ্র শীঘ্র যমালয়ে যাইয়া শাসন রাজ্যের প্রজার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দিতেছে। যেরূপ রাস্তার গতিক দেখা যাইতেছে তাহাতে শমনরাজকে নিশ্চয় অতি শীঘ্র হয় পোল টাক্স, না হয়, আর একটী উপনিবেশ সংস্থাপন করিতে হইবে।

আমরা রহস্য করিতেছি না, দারুণ ব্যথিত এ সকল সত্য কথা বলিতেছি। পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের হস্ত একমাত্র আবগারী বিভাগে থাকাতে মুদ্রাদির মূল্য অধিক ছিল; কাজে কাজেই দরিদ্র ভারতের দরিদ্র প্রজাগণ ইচ্ছামত মাদকাদি সেবন করিতে পারিত না। কিন্তু এখন স্বাধীন হওয়াতে মদ্যপানের আর সে দুঃখের দিন নাই, সুদিন উপস্থিত হইয়াছে। যে, দুরন্ত রৌদ্রে মস্তকের ঘর্ম্ম পদতলে নিক্ষেপ করিয়া মজুরি দ্বারা প্রত্যহ ।৵০ আনা উপার্জ্জন করিয়া থাকে, সে ব্যক্তিও তাহার শ্রমের অর্দ্ধাংশ সুরার পাদপদ্মে অর্পণ করিতেছে। এমন অবস্থায় তাহার অনাথ পরিবারবর্গের অনশনব্রতাবলম্বী ছাড়া ভিন্ন উপায় কি আছে? যদি বুঝিতে পারিতাম, অতিরিক্ত মদ্যপানে শরীরের কোন না কোন উপকার হইতেছে তাহা হইলেও না হয় আত্মপ্রিয় ব্যক্তিগণ আপন পরিবার-বর্গকে বঞ্চিত করিয়া আপনারা সুখী হইত; তাহা ক্ষোভের বিষয় হইত না, কিন্তু মদ্যে "ইতো নষ্ট স্ততোভ্রষ্টঃ" ইহকাল পরকাল দুইই নষ্ট হইয়া থাকে। রাস্তায় বহির্গত হইলেই চতুর্দ্দিকে দেখিতে পাওয়া যায়, কেহ বা সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া দিগম্বর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, কেহ বা মৃতবৎ অচেতন হইয়াই নর্দ্দমায় পড়িয়া, বিকটাকার দশন বিস্তার করিয়া রহিয়াছে, মুখের ভিতর দলে দলে মাছি ভন ভন করিয়া প্রবিষ্ট হইতেছে, অন্য কেহ বা অশ্লীল ভাষার গান করিতে করিতে চলিয়া যাইতেছে, কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, সময়ে সময়ে শৃগাল বানরের সহিতও অসঙ্কুচিত চিত্তে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে:

এই ত গেল প্রথম অবস্থা। দ্বিতীয়তঃ আমরা শীতপ্রধান দেশবাসী মাংসভোজী জাতি নহি, যে মাংসের বলে মদ্যাদি জীর্ণ করিয়া ফেলিব। আমরা উষ্ণদেশবাসী শাকান্নভোজী নিরীহস্বভাবে সম্পন্ন দরিদ্র বাঙ্গালী। আমাদের জঠরানলে সুরা কিরূপে জীর্ণ হইবে? একদিন না হয় দুই দিন জীর্ণ হইল, কিন্তু চিরদিন কখন জীর্ণ হইতে

পারে না। ক্রমে এক দিকে বলকারী সারবান দ্রব্যে শরীর পুষ্টির অভাবে, অন্যদিকে সুরার তীক্ষ্ণতায় শরীর দিন দিন দুর্ব্বল হয়, ত্বরায় যকৃৎ প্লীহাদি দুরন্ত ব্যাধিতে দেহমন্দির পরিপূর্ণ হইয়া উঠে এবং অকালে আমাদিগকে শমন সদনে প্রেরণ করে। বৎসর বৎসর কত হতভাগ্য যে, পিতা মাতা প্রভৃতি পরিজনবর্গকে অনন্ত দুঃখ সাগরে ভাসাইয়া অকালে জীবলীলা শেষ করিয়া চলিয়া যাইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, এত দেখিয়া শুনিয়াও অবশিষ্ট মদ্য পায়িগণের চৈতন্য হইতেছে না; বরং তাঁহারা দিন দিন অধিকতর অচৈতন্য হইয়া পড়িতেছেন। বোধ হয় স্বর্ণপ্রসূ বঙ্গভূমি ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুপূর্ণ সুন্দরবনে পরিণত না হইলে আর আমাদের চৈতন্যোদয় হইবে না। তৃতীয় কথা এই সুরার সহিত বারবিলাসিনীগণের যে কি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, তাহা সকলেই প্রায় বিশেষরূপ অবগত আছেন। যেখানে মদের ভাঁটী, সেইখানেই বারবনিতাগণ সানন্দে নরাধমগণের পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পাদন করিতেছে। অবোধ মনুষ্যগণ মন্ত্রবাদৌষধ চতুর ব্যক্তিগণের বাদ্যধ্বনির ন্যায় তাহাদের আপাত মনোহরস্বরে মোহিত হইয়া সর্পের ন্যায় বিস্তৃত হইয়া সমাজবিরুদ্ধ নহে। ভারতে হত্যা অপরাধে আজিও যে সকল লোক প্রাণদণ্ডরূপ কঠিন দণ্ডে দণ্ডিত হইতেছে, সে কেবল ইহাদেরই কৃপায়। ইহাদের গুণের অন্ত নাই। মদের প্রাদুর্ভাব অল্প না হইলে ইহাদের অত্যাচারেরও হ্রাস হইবার সম্ভাবনা নাই।

সুরা হইতে আরও অনেক অনিষ্ট সংঘটন হইতেছে। দয়ালু গবর্ণমেণ্ট প্রচুর অর্থের লোভে এ সকলের প্রতি একবারেও দৃকপাত করিলেন না। মহামান্য সর জর্জ্জ কাম্বেল যাহাতে সাঁওতাল পরগণা হইতে সুরাপান উঠিয়া যায়, তাহার চেষ্টা করিয়া অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন; কিন্তু এখন সেই সাঁওতালদিগের কি শোচনীয় অবস্থা। সেদিন একজন উচ্চপদস্থ সুশিক্ষিত ইংরাজ ভ্রমণার্থ বহির্গত হইয়া পথিপার্শ্বে ইহাদের অবস্থা দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইয়া অনেক দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। এ দুশ্চিকিৎস্য রোগের ঔষধ কি? গবর্ণমেণ্ট যখন অদ্যাপিও এ বিষয়ে মনোযোগী হইলেন না, তখন আমরা আর কাহার নিকটে তজ্জন্য ক্রন্দন করিব? আমাদের দেশের যে অবস্থা, তাহাতে যে কেহ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ইহার বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্ট আবেদন করিবেন, সে আশাও অল্প। আমরা দিন দিন করভারে প্রপীড়িত হইয়া পড়িতেছি এবং করভার সহ্য করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম হইতেছি, তথাপি গবর্ণমেণ্টকে জানাইতেছি, সুরালভ্য অর্থ না হয় অন্য কোন উপায়ে উপার্জ্জন করুন অথবা আর কোন নূতন করের সৃষ্টির কি আবশ্যকতা আছে? রাজস্ব মন্ত্রী ষ্ট্রাচি সাহেব ত অনেক টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়াছেন।

আমাদের আর অন্য উপায় নাই। কেবল ভারতের প্রতিনিধি ভারতবন্ধু ভারত সভাই আমাদের সম্পূর্ণ আশার স্থল। আমরা সানুনয় অনুরোধ করিতেছি, একবার এই জন্য গবর্ণমেণ্টে আবেদন করুন। মুদ্রাযন্ত্র ও অস্ত্র সংক্রান্ত আইনাদির বিরুদ্ধে যখন

পার্লিয়ামেণ্টে আবেদন করিবেন, তখন এটি যেন বিস্মৃত না হন। ইহা সভার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

রাজনীতিজ্ঞদিগের সরল পথে চলিলে কি চলে না? ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৮৭

যাহারা নীতিশাস্ত্রের বহুতর আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা লিখিয়া গিয়াছেন, রাজনীতির পথ অতি বক্র, জটিল ও কুটিল, সহজে এ পথে ভ্রমণ করা যায় না। আমাদের প্রশ্ন এ পথটী স্বভাবতঃ বক্র অথবা বক্র লোকে এই পথের নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহাতেই বক্র ও দুর্গম হইয়া উঠিয়াছে। সরলভাবে যদি রাজনীতির স্বরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যায়, এপথ স্বভাবতঃ বক্র নয় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। রাজনীতিজ্ঞদিগের সরলপথে চলিলে কি চলে না তাহাও নয়। যাঁহাদিগের উপরে রাজ্যের কর্ত্তব্য কর্ত্তব্যের বিবেচনার ভাব ও সন্ধি বিগ্রহাদির ভার সমর্পিত হয়, ভ্রান্তি, শঙ্কা ও সঙ্কীর্ণতাদি দোষে তাঁহাদের বুদ্ধি, প্রায় সরল পথগামী হয় না। সুতরাং তাঁহারা যে পথের সৃষ্টি করেন, তাহা বক্র হইয়া উঠে। কোন স্থানে সরল ব্যবহারে অনিষ্ট নাই, কোন স্থানে বা আত্মগোপন করা আবশ্যক হয়, অনেক রাজনীতিজ্ঞ এটী বুঝিতে পারেন না। সুতরাং তাহারা সকল স্থানেই অসরল ব্যবহারের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। নীতিশাস্ত্রে আছে "গূহেৎ কূর্ম্ম ইবাঙ্গিনী" রাজা কূর্ম্মের ন্যায় অঙ্গ গোপন করিবেন। এরূপ আচরণের স্থলবিশেষ আছে। রাজা যে, সকল বিষয়েই আত্মগোপন করিবেন, তৎপ্রতিপাদন এ বচনের উদ্দেশ্য নয়। বিপক্ষ জীগীষু রাজা যখন রাজ্যের আক্রমণার্থী হয়, তখন সেই আক্রমণীয় রাজার মন্ত্রাদি গোপনের উপদেশার্থ ঐ বচনের সৃষ্টি করা হইয়াছে। আক্রমণার্থী বিপক্ষ রাজা যদি আক্রমণীয়ের সকল পরামর্শ জানিতে পারে, যদি কোষদণ্ডজ তেজ, অর্থাৎ সৈন্যবল ও অর্থবল পরিজ্ঞানে সমর্থ হয়; তাহা হইলে আক্রমণার্থী আক্রমণীয়ের সৈন্যাদির পরাভবে সমর্থ হয়। সৈন্য সংখ্যা যত অপ্রকাশ থাকে ততই ভাল। বিপক্ষ রাজা আক্রমণীয়ের সৈন্যাদির পরিমাণ না জানিতে পারিলে সে এ আক্রমণে শঙ্কিত হয়। সেটী মঙ্গলের কারণ সন্দেহ নাই। এই শুভ উদ্দেশ্যেই ভগবান মনু লিখিয়াছেন,

গিরি পৃষ্ঠং সমারুহ্য প্রাসাদং বা রহোগতঃ।
অরণ্যে নিঃশলাকে বা মন্ত্রয়েদ্ভাবর্তবিনে॥

নির্জ্জন গিরিপৃষ্ঠে বা প্রাসাদে আরোহণ করিয়া অথবা নির্জ্জন অরণ্যে গমন করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের মন্ত্রণা করিবে।

"ষষ্ঠ কর্ণো ভিন্থতে মন্ত্রঃ ছয় কান হইলে মন্ত্র ভঙ্গ হইয়া যায়। ইত্যাদি মহার্থ যে সমস্ত উপদেশবাক্য আছে, সেগুলি ঐ মন্ত্রগোপনেরই উপদেশক কিন্তু অসরল ব্যবহারের উপদেশক নয়। বোধ কর একজন শত্রুর সহিত সন্ধি হইল, সন্ধিপত্রে কয়েকটী গ্রাম বা

কতগুলি অর্থের আদান-প্রদানের কয়েকটী নিয়ম করা হইল ; নিয়ম কর্ত্তারা অসরল ব্যবহার ও চাতুরতা করিয়া সন্ধি নিয়ম ভঙ্গ করিবেন, এবং আপনাদের অসাধুতা মিথ্যাবাদিতা ও কাপুরুষতার পরিচয় দিবেন, এ নিমিত্ত "গৃহেৎ কূর্ম্ম ইবাঙ্গিনি" ইত্যাদি বাক্যের সৃষ্টি করা হয় নাই। প্রজার সহিত কার্য্যকালে রাজার অসরল ব্যবহারের কথা ত নাই। কোন নীতি গ্রন্থকার সে উপদেশ দিয়া নিজ গ্রন্থকে দূষিত করেন নাই।

ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব ও নূতন মন্ত্রিসম্প্রদায়ের ব্যবহার কার্য্যই আজ আমাদের এই প্রস্তাবের অবতারণার কারণ হইয়াছে। নূতন মন্ত্রিসম্প্রদায় যেরূপে কার্য্য করিবেন, তাহা স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়াছেন। আমরা ইউরোপীয় সমাচার পাঠে জানিতে পারিলাম ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারী প্রশ্নোত্তরে কহিয়াছেন, ভারতবর্ষের নূতন গবর্ণর জেনারল মারকুইস রিপণ সাহেব ভারতবর্ষের মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত ৯ আইন ও লাইসেন্স টাক্স বিষয়ে বিবেচনা করিয়া ইংলণ্ডে রিপোর্ট করিবেন। আফগান যুদ্ধের বিষয়ে বলা হইয়াছে, আফগানজাতীয় একজন ক্ষমতাবান রাজা পাইলেই তাঁহাকে কাবুলের সিংহাসন প্রদান করিয়া ইংরাজেরা তথা হইতে চলিয়া আসিবেন। আফগান যুদ্ধের প্রকৃত ব্যয় সাত কোটী টাকা, এতদ্ভিন্ন সীমা রেলওয়ে ব্যয় আছে। তুরস্কের সুলতানকে গ্রীস মণ্টিনিগ্রো ও আর্ম্মেনিয়ার গোলযোগ শান্তি করিতে বলা হইয়াছে। তিনি যদি কথা না শুনেন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া জুলাই মাসে বার্লিনে ইউরোপীয় রাজগণের এক সভা হইবে।

নূতন মন্ত্রিসম্প্রদায় সরলভাবে এই বিষয়গুলির উল্লেখ করিয়া নিজ সরল কার্য্য-প্রণালীর যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাহাদের গৌরব না অগৌরব? তাহাতে তাঁহাদিগের প্রতি প্রজার অনুরাগ বৃদ্ধি হইবে না বিরাগ জন্মিবে, তাহাতে তাঁহাদের কার্য্যের সমধিক কৃতার্থতালাভ হইবে, অথবা তাহারা অকৃতকার্য্য হইবেন?

সরলতার একটী মহোদার অদ্ভুত গুণ আছে। এই গুণের প্রভাবে তাঁহারা সকলের প্রশংসাভাজন হইয়া অনায়াসে অতি দুঃসাধ্য কার্য্যেরও সাধন করিয়া তুলিতে পারবেন। যদি বা কোন কারণে কোন কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিতে না পারেন, তথাপি তাঁহারা কাহারও বিরাগভাজন হইবেন না। পক্ষান্তরে, ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রিগণ কোন কার্য্যেই সরল ব্যবহার করেন নাই। এই নিমিত্ত ইউরোপ, এসিয়া ও আফ্রিকা এই তিন মহাদেশেই মহা গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। কেবল যে জীবহত্যা অর্থনাশ প্রভৃতি শোচনীয় কাণ্ডের ঘটনা হইয়াছে তাহা নয়, গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিশ্বজনীন বিরাগ জন্মিয়াছে। বোধ হয় ডিসরেলীর মন্ত্রিত্বের ন্যায় কাহারও মন্ত্রিত্বকালে সাধারণ্যে এপ্রকার বিজাতীয় বিরাগের প্রাদুর্ভাব হয় নাই। ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রীগণের অসরল ভাবই রুশ তুরস্ক যুদ্ধের কারণ। মন্ত্রীগণ এমন বক্র আচরণ করিয়াছিলেন, যে তুরস্কেরা বুঝিয়াছিল, ইংলণ্ড তাহাদিগকে আসন্নকালে পরিত্যাগ করিবেন না। সেই আনুমানিক সাহায্য বলদাপিত হইয়াই উহারা সংগ্রামানল প্রজ্বলিত করিল। নূতন মন্ত্রীগণের ন্যায় ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রীগণ যদি স্পষ্টাক্ষরে স্বাভিপ্রায়

ব্যক্ত করিতেন, তাহা হইলে তুরস্কের সুলতান বার্লিনের সভায় নত হইয়া পড়িতেন সন্দেহ নাই।

এদিকে ভারতবর্ষীয় গভর্ণর জেনরল ইংলণ্ডেশ্বরীর ভারতেশ্বরীর উপাধি গ্রহণকালে ভারতে যে মহাসভা করেন, তাহাতে নিমন্ত্রিত হইয়া কাবুলের আমীর সিমার আলী আগমন করেন নাই। সেই অপমানে ও সেই কোপে লর্ড লিটন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, আমীরকে উৎসন্ন দিবেন। সীমার আয়াস বৃদ্ধি তাঁহার ছল হইল। পাঠক দেখুন ভারতবর্ষের পুর্ব্ব গবর্ণমেণ্টের কেমন অসরল ভাব। এই অসরল ভাব নিবন্ধন তাঁহারা যারপর নাই প্রজার বিরাগভাজন হইয়াছেন।

১৮৭৮ অব্দের ৯ আইনটীও ভারতবর্ষের পুর্ব্ব গবর্ণমেণ্টের অসরলতার ফল। দেশীয় সংবাদপত্রে তাঁহাদিগকে অযোগ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। সেই কোপে নানাপ্রকার দোষের অনুসন্ধান করিয়া এক আইন করিয়া বসিলেন, এবং দেশীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা লোপে প্রবৃত্ত হইলেন।

পক্ষান্তরে নূতন মন্ত্রীসম্প্রদায়ের সরলতাময়ী কার্য্যপ্রণালীতে যে উপাদেয় ফললাভের সম্ভাবনা আছে, তাহাতে একটী উদাহরণ দিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন। নূতন মন্ত্রী-সম্প্রদায় তুরস্কের সুলতানকে স্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছেন যদি তিনি গ্রীস মণ্টিনিগ্রো ও আরমেনিয়ার গোলযোগের নিষ্পত্তি না করেন, এবং স্বরাজ্যের অন্তর্গত অত্যাচারের নিবারণ করিয়া সুশৃঙ্খলা সম্পাদন না করেন, তাঁহার রাজ্য থাকিবে না। এই স্পষ্ট সরল বাক্যে যে কত কাজ হইবে বোধ হয় পাঠক তাহা সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন। এখন তাঁহাকে প্রাণপণে রাজ্যের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিতে হইবে সন্দেহ নাই।

ইংরাজ অধিকারে ভারত সুখী কি অসুখী? ২২ ভাদ্র ১২৮৭

এই বিষয় লইয়া কয়েকজন বিজ্ঞ, বহুদর্শী পদস্থ উপযুক্ত লোক বাকযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এ যুদ্ধের যোদ্ধাদিগের লক্ষ্য সিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না। গবর্ণমেণ্ট যে সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা হইতে বিচলিত হইবার নহেন।

ভারতবর্ষে পুর্ব্বে শান্তি ছিল না, দস্যু তস্করাদির অধিক উপদ্রব ছিল, এখন সে সকল নাই। এ অংশে ব্যক্তিদিগের মত বিসংবাদ নাই। সকলেই একবাক্যে এ উৎকর্ষ স্বীকার করেন। অন্য অন্য অংশেই মতভেদ দৃষ্ট হইতেছে। আমরা প্রথমে হাইণ্ডমান সাহেবের বাক্যের উল্লেখ প্রবৃত্ত হইলাম। ইনি ভারতবর্ষীয় প্রজাগণের দুঃখে দুঃখিত, ভারতবর্ষের যাহাতে মঙ্গল হয় ইহার এই আন্তরিক ইচ্ছা। ইংলণ্ডের লোকে ভারতবর্ষের দূরবস্থার বিষয় প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারেন, এই তাঁহার সবিশেষ চেষ্টা। অর্থশাস্ত্রের কূটার্থ নির্ণয়ে তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা আছে। যখন লাইসেন্স ট্যাক্স স্থাপিত হয়, বৎসরে ১০০ টাকা

আয় থাকিলেই টাক্স দিতে হইবে, যখন এই ব্যবস্থা হয়, তখন হাইণ্ডমান সাহেব তেজস্বিনী লেখনী ধারণ করিয়া দেখাইয়াছিলেন ভারতবর্ষে যাহারা সপ্তাহে দুই টাকার অধিক উপার্জ্জন করিতে পারে না, তাহাদিগকে দুই তিন টাকা ট্যাক্স দিতে হয়। সে সকল কারণে ৫শত টাকা আয়ের নীচে লাইসেন্স ট্যাক্স উঠিয়া গেল। হাইণ্ডমান সাহেবের প্রবন্ধ তাহার অন্যতম কারণ। পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধ প্রকাশের পর অবধি তিনি ভারতবর্ষের প্রকৃত অবস্থা পরিজ্ঞানার্থ অনবরত শ্রম করিতেছেন। কিছুদিন হইল "রক্ত নিঃসারণে মৃত্যু" এই শীর্ষক দিয়া নাইন্টিন্থ নামক প্রসিদ্ধ ইংলণ্ডীয় পত্রে উহা প্রকাশ করিয়াছেন। ইউরোপীয় রীতিতে রাজপুরুষগণের রাজকার্য্য সম্পাদনের ইচ্ছাই তাঁহার মতে ভারতের প্রধান অমঙ্গলের কারণ। দেশীয় যাহা কিছু সকলই হেয় ও পরিত্যজ্য। দেশীয় উপায়ে পথ ঘাট নির্ম্মাণ, দেশীয় উপায়ে যুদ্ধ বিভাগের ব্যয়সঙ্কোচ সমুদায়ই পরিত্যক্ত হইয়াছে। এ সমুদায়েই ইংরাজেরা ঠকিতেছেন। যে ভ্রমাত্মক সংস্কারে একবার ঠকিয়াছেন, আবার সেই সংস্কার অনুসারে কার্য্য করিতেছেন, আবার ঠকিতেছেন তথাপি দেশীয় কার্য্যপ্রণালী তাঁহাদের মনঃপুত হইতেছে না। ইংরাজেরা যে শুদ্ধ ইউরোপীয় প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, সেইখানেই তাহারা কৃতকার্য্য হইয়াছেন। সর মাধব রাওয়ের অধীনে বরদা তাহার প্রমাণ। বাঙ্গলায় এক কালে সব সাহেব ছিল। শেষে ব্যয় সংকুলান করিতে না পারিয়া বিচার ও রাজকার্য্যের এক একটী বিভাগ স্থাপিত হইয়াছে। অল্প ব্যয়ে কার্য্য যে কতদূর ভাল হইতেছে বলা যায় না। এত দেখিয়াও ইংরাজেরা দেশীয় লোক দ্বারা দেশীয় প্রণালীতে কার্য্যনির্ব্বাহ করিতে চাহেন না।

হাইণ্ডমান সাহেব দেশীয় রাজ্যের প্রজার সহিত ইংরাজ রাজ্যের প্রজার সহিত অবস্থার তারতম্য করিয়া যে কয়টী বাক্যের উপন্যাস করিয়াছেন, তাহা এই :

১। ইংরাজ রাজ্যের আবাদী জমি ও তাহার বিশ্রাম দিবার জন্য যে জমি পতিত থাকে, উভয়েরই সমান খাজনা, কিন্তু স্বাধীন দেশীয় রাজ্যে পতিত জমির খাজনা আবাদী আট ভাগের একভাগ। ইংরাজরাজ্যে জমি বিশ্রাম পায় না। সুতরাং অতি অল্প দিনের মধ্যেই জমির উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস হইয়া আইসে। খাজনার বৃদ্ধি সহকারে ভূমির দাম এত অধিক হইয়া যায় যে লোকের পক্ষে গোরু পোষা কঠিন হয়। বাস্তবিকও ইংরাজ রাজ্যে গোজাতি ক্রমে অবসন্ন দশাগ্রস্থ হইতেছে।

২। দেশীয়রাজ্যে গোচারণের মাঠে খাজনা লাগে না। কিন্তু ইংরাজেরা গোচারণ মাঠের ঘাস বিক্রয় করেন।

৩। ইংরাজ রাজ্যে প্রজারা নিজ জমিতে নিজব্যয়ে কূপ খনন করিলে তাহাকে বৎসর ১২ টাকা দিতে হয়।

৪। স্থানীয় করভারে ইংরাজ রাজ্যের প্রজারা অতিশয় পীড়িত কিন্তু স্বাধীন রাজ্যে এ হাঙ্গামা একেবারেই নাই।

৫। যদি শস্যোৎপত্তির সম্পূর্ণ অথবা আংশিক ব্যাঘাত হয় তবে দেশীয় রাজ্যের প্রজারা খাজনা হইতে অব্যহতি পায়। ইংরাজ রাজ্যে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত।

৬। দেশীয় রাজ্যে খাজনা দুই তিন বৎসরের বাকী পড়িলে সুদ দিতে হয় না। ইংরাজেরা তাহার উপর পূর্ণমাত্রায় সুদ আদায় করিয়া লন। বাকীপড়া শব্দটী তাঁহাদের অভিধানে একেবারে লেখে না রাজারা চারি কিস্তিতে খাজনা লন, ইংরাজদিগের দুটী বৈ কিস্তী নাই।

ইংরাজ রাজ্যে দেওয়ানী আদালতের খরচ অতি ভয়ানক। ইহাতে প্রজার একেবারে সর্ব্বনাশ হইয়া যায়। ষ্টাম্পের কতই ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে, আর কতই ভিন্ন ভিন্ন মূল্য আছে তাহার ঠিকানাই নাই। সকল সময়ে উহাদের নামও মনে থাকে না। এত সর্ব্বনাশের পর আবার সিবিল জেল আছেন। দেশীয় রাজ্যে সিবিল জেলের নামও নাই। এই সমস্তই প্রজাদিগের অমঙ্গলের কারণ। যে বিশ কোটী টাকা ইংলণ্ডে যায়, সে সম্বন্ধে হাইণ্ডমান সাহেব বলেন "এরূপ ব্যয়াধিক্যের নাম সুশাসন বলিতে চাও বল উহা যে অপব্যয় নহে তাহা প্রমাণ করিবার জন্য যত পার চেষ্টা কর কিন্তু উহা ভিন্ন প্রজার অসঙ্গতির আর কোন কারণ নাই। যদি গত বৎসর ইংলণ্ডের সমস্ত জমিদারের উপস্বত্ব সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ৬৭ কোটী টাকা ইউরোপে নীত হইত, তথাপি ইংলণ্ডের ৬৭ কোটী আর দরিদ্র ভারতের ২০ কোটীতে অনেক অন্তর। প্রথম আমাদের স্মরণ থাকা উচিত যে এই সমস্ত টাকা ইংলণ্ডে যায়, ইহাতে প্রজাদের মতামত প্রকাশের কোন অধিকার নাই। সুবিচার পক্ষপাত বহিত্য ইত্যাদিব কথা আমরা কহিতেছি না আমবা বলি যে ভারতবর্ষে শান্তি ও ভারতবর্ষীয় রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণের জন্য যে কয়জন ইংরাজের একান্ত আবশ্যক তাহা অপেক্ষা কোন একজনও ইংরাজ ভাবতবর্ষে না যায়। যে সকল বৃত্তি ও যে সকল সুদ আমরা অকারণে ভারতবর্ষীয় কোষাগার হইতে দিয়া থাকি তাহা যেন আর না দেওয়া হয়। ভারতবর্ষের প্রধান প্রয়োজন মূলধন, আমরা এক্ষণে সেই মূলধন জলের মত আমাদের দেশে আনিয়া ফেলিতেছি। ভারতবর্ষীয় বুদ্ধিমান লোকদিগকে আমরা রাজকার্য্যে প্রবেশ করিতে দি না। রাজস্ব বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা দক্ষতম যে লোক ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি হিন্দু। তাঁহাকে মোগল জেতার পৌত্র একজন মুসলমান রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, আমরা যদি আকবরের উদার নীতির অনুসবণ না করিয়াও দেশের রাজস্ব দক্ষ ব্যক্তিদিগের উপরে রাজস্ব বিষয়ের ভার অর্পণ করি, অনেক লাভ হইতে পারে।"

দুর্ভিক্ষের বিষয়ে হাইণ্ডমান সাহেব বলেন, "ইংরাজ অধিকারে দুর্ভিক্ষ যে পুনঃ পুনঃ ঘটিতেছে. তাহা কাহারও অবিদিত নাই। টাক্স প্রায় চরম সীমায় আরোহণ করিয়াছে। রাজস্বের আর বৃদ্ধি হইবার উপায় নাই, ব্যয় ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। অধিকাংশ স্থানে ভূমির শস্যোৎপাদিকা শক্তি ক্রমেই কমিতেছে। অর্দ্ধাহার ত অনেক দিনই হইয়াছে, অনাহারের আর বিলম্ব নাই।"

ডি. বি. স্মুলেট সাহেব বলেন "তিনি ভারতবর্ষে দীর্ঘকাল কাটাইয়াছেন। ঐ দেশের সম্বন্ধে রাজনীতিজ্ঞরা একদল যেমন মন্দ অন্য দলও সেইরূপ। ভারতবর্ষীয় প্রজাগণ লর্ড বিকন্স ফিলডের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার তদপেক্ষা অধিক ইচ্ছা প্রকাশ করিবেন না, তাঁহার এরূপ বিশ্বাস নাই। তাঁহার বিশ্বাস এই ভারতবর্ষে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট প্রজার অতিশয় অপ্রিয়। ভারতবাসীরা জানে ইংরাজেরা ধর্ম্ম, আচার. ব্যবহার ও শোণিত সম্বন্ধে তাহাদের হইতে ভিন্ন। ইংরাজেরা তাহাদের মধ্যে বাস করে, আবার চলিয়া যায়, কোন চিহ্ন রাখিয়া যায় না, কিন্তু তাহারা যখন ইংলণ্ডে যায় বিলক্ষণ সম্পত্তি লইয়া যায়, কিন্তু বক্তার ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই। তিনি অতি অল্প মাত্র লইয়া বাটীতে আসিয়াছেন। ইংরাজেরা ভারতে এরূপ গবর্ণমেণ্ট স্থাপন করিয়াছেন উহা অন্তরায় সাধ্য। উহা ইউরোপীয় নীতিতে স্থাপিত হইয়াছে আসিয়ার নীতিতে স্থাপিত হয় নাই। তাঁহার বিবেচনায় এটি মহৎ ভ্রম। গবর্ণমেণ্ট মহাক্ষমতা সম্পুর্ণ ব্যবস্থাপক ভারতে পাঠাইয়া দেন, সেই ব্যবস্থাপকগণ ভারতের সদৃশ দরিদ্র দেশে ওয়েষ্টমিনিষ্টর হল ও চানসরি আদালতের ব্যবহার প্রচলিত করিবার অভিপ্রায় করিয়া যান। ইংরাজেরা ভারতে ভূমির অতি জঘন্য রাজস্ব প্রণালী স্থাপন করিয়াছেন।" ইত্যাদি।

ডেবার্শ সাহেব যে কথা বলেন, তাহারও কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে: "আমি স্বীকার করি না যে তিনি সর্ব্বদা প্রজার উপকারার্থ ভারতবর্ষ শাসন করিয়া থাকেন। ইংলণ্ডের উপকারই ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কতকগুলি কার্য্য প্রবৃত্তির প্রধান কারণ। ইহাই স্বভাবসিদ্ধ যে রাজা দেশ জয় করিয়াছেন, তাহার উপকারার্থ আপনার স্বার্থত্যাগ কবিবেন, এরূপ আশা করা একান্ত অসঙ্গত। কতকগুলি লোক সর্ব্বদা বলিয়া থাকেন, ইংলণ্ডের ভারতবর্ষ শাসন কেবল প্রণয় ও ঔদার্য্যের কার্য্য। ইংরাজেরা ভারতবর্ষে যে সকল গৌরবান্বিত কার্য্য করেন, তাহার সহিত বাক্যের কোন সম্বন্ধ নাই। এ বাক্যে আমার অতিশয় আপত্তি আছে। আমি পুনরায় স্বীকার করি ভারতে ব্রিটিশ শাসন হওয়াতে প্রজারা নিরাপদ হইয়াছে। বিদেশীয়ের আর আক্রমণ শঙ্কা নাই। পূর্ব্বে এই উপদ্রব সর্ব্বদা উপস্থিত হইত। পুর্ব্ব দেশ যে পরস্পর গৃহ বিবাদে উৎসন্ন হইত, তাহাও আর নাই। কিন্তু আমি এ কথা বলি ব্রিটিশ শাসনে প্রজার সৌভাগ্য হয় নাই। ক্ষুধাসন্ন দারিদ্র্যহত অধিকাংশ প্রজা ইহার প্রমাণ। অপর সত্য বটে, ব্রিটিশ শাসনে প্রজার জীবন সম্পত্তি নির্বিঘ্ন হইয়াছে, কিন্তু নয় দশমাংস প্রজার জীবন এমনি ঘৃণিত দুঃখ ও অভাবগ্রস্থ যে তাহার বলিবার যোগ্য নয়। তাহাদের সম্পত্তি কিছুই নয়। তাহাদের নিজের বলিতে কিছুই নাই। তাহারা সামান্য বস্ত্র পরিধান করে, অতি সামান্য কুটীরে বাস করে। তাহাদিগের যা কিছু আছে। তাহা ঋণদাতা মহাজনদিগের সম্পত্তি। তাহাদিগকে অগত্যা উহাদিগের আশ্রয়গ্রহণ করিতে হয়।"

এই সকল বহুদর্শী বিজ্ঞ ব্যক্তি যে কথা বলেন তাহা কি অলীক? ইউরোপ হইতে যাঁহারা ভারতে আগমন করেন, উপরিভাবে ভারতের অবস্থা দেখিয়া যান, এবং মুসলমানদিগের অধিকার কালের ইতিহাস সম্মুখে রাখিয়া সেই অবস্থার তুলনা করেন, তাঁহারা ভারতকে মহাসুখী জ্ঞান করিয়া থাকেন।

ব্রিটিশ শাসনপ্রণালীর মহাদোষ। ৫ আশ্বিন ১২৮৭

শীর্ষোল্লিখিত বাক্যটী পাঠ করিলেই অনেকে আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে আমাদিগের বাক্যের যথার্থ স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে। ইংরাজদিগের রাজ্যের শাসনপ্রণালী দর্শন করিলেই হঠাৎ বোধ হইবে ইহাতে স্বেচ্ছাচারিতার নামগন্ধ নাই। কেহ যে ইচ্ছামত কোন অন্যায় বা অত্যাচারের কাষ্য করিবে সে সম্ভাবনা নাই। তাহার কারণ ব্রিটিশ শাসনপ্রণালীব গ্রন্থন ও স্বরূপ দর্শন করিলে কোনরূপে এরূপ বোধ হয় না যে ইহাতে স্বেচ্ছাচারিতার নামগন্ধ আছে। দেখ, প্রথমে রাজ্ঞী তারপর মন্ত্রীসভা, তাহাব পর লর্ডদিগের সভা, তাহার পর সাধারণের সভা। উপর হইতে দেখিলে সৌব জগতের ন্যায় পরস্পরকে এমনি শৃঙ্খলা-বদ্ধ বলিয়া বোধ হয় যেন কেহ কাহাকে অতিক্রম করিয়া কোন কাজ করেন না। ভারতবর্ষ প্রভৃতি অধীন প্রদেশগুলি এই অদ্ভুত শাসনপ্রণালীর পরাধীন। সে সে স্থানেও যেন কিছুমাত্র স্বেচ্ছাচারিতা নাই অথবা স্বেচ্ছাচারিতা হইবার যো নাই। কিন্তু ফল ইহার বৈপরীত্যের পরিচায়ক। গত মন্ত্রীসভা ও বর্ত্তমান মন্ত্রীসভা ও অধীনস্থ প্রদেশ সকলের গত শাসনকর্ত্তা ও বর্ত্তমান শাসনকর্তাদিগের কাষ্য ও ব্যবহার দেখিয়া বোধ হয় ব্রিটিশ শাসনপ্রণালী মধ্যে স্বেচ্ছাচাবিতা মূর্ত্তিমতি হইয়া যেন বিরাজ করিতেছে। কার্য্য দেখিলে বোধ হয় মুসলমান রাজাদিগের এরূপ স্বেচ্ছাচারিতা ছিল কিনা সন্দেহ। পাঠক এমন বিবেচনা করিবেন না মুসলমান রাজারা মূর্খতা নিবন্ধন যে সকল অসভ্যজনোচিত কাজ করিয়াছে ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রীগণ ও তাহাদিগের অধীনস্থ শাসনকর্তৃগণ প্রজার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন পরদার হরণাদি অতি গর্হিত কার্য্য করিয়াছেন।

ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রীগণ ও তাঁহাদের অধীনস্থ শাসন কর্তৃগণ যে যে স্বেচ্ছাচারিতার কার্য্য করিয়াছেন তাহা সভ্যজাতি, অর্দ্ধ সভ্যজাতি, অধিক কি জংলা জুলু জাতিরও হৃদয়াধারে ও শরীরের শিরায় শিরায় বিদ্ধ হইয়া আছে। এতএব তাহার উল্লেখ করা কি বিফল? এখন আমাদের প্রশ্ন এই স্বেচ্ছাচারজনিত যে সকল অন্যায় ও অত্যাচার-কার্য্য সম্পাদিত তাহা নিবারণের উপায় কি লর্ড বিকন্স ফিলড স্বাধিপত্যকালে যা মনে করিলেন তাই করিলেন। তিনি লর্ড সভাকেও অগ্রাহ্য করিলেন। কমন্স সভাকেও তৃণজ্ঞান করিলেন। তিনি অন্যায় কার্য্য করিতেছেন যাঁহারা বুঝিতে পারিলেন না

বহু ব্যক্তির মতে কার্য্য সম্পাদিত হয়। লর্ড বিকন্স ফিলড কতকগুলি লোককে হস্তগত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তিনি যে যে কাজ করিয়াছেন তাঁহারা তাঁহার মতে মত দিয়া গিয়াছেন। সুতরাং যাঁহারা প্রতিবাদার্থে উপস্থিত হইয়াছিলেন তাঁহারা অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। রোমেও এক সময়ে ঠিক এরূপ কার্য্য হইয়াছিল। এখন সদাশয় ব্যক্তিরা মন্ত্রিসম্প্রদায় ভুক্ত হইয়াছেন যদি কোন বিশেষ ইষ্ট না হয় তথাপি ইহাদের হইতে অনিষ্ট হইবে না। কিন্তু ইহাদের পর যদি লর্ড বিকন্স ফিলডের দলের ন্যায় উশৃঙ্খল দল আসিয়া মন্ত্রীসভা ভুক্ত হন তাহা হইলে পূর্ব্বাভিনীত কাণ্ডের যে অভিনয় হইবে না তাহার প্রমাণ কি?

অতএব আমাদের বক্তব্য এই, যাঁহারা ব্রিটিশ শাসনপ্রণালীকে স্বজাতীয় উন্নতির মূল বলিয়া বিবেচনা করেন, ব্রিটিশ শাসনের গৌরবে যাঁহারা আত্মগৌরব জ্ঞান করেন তাঁহাদের কর্ত্তব্য এই আমরা যে যে অনিষ্টের উল্লেখ করিলাম যাহাতে তাহার নিবারণ হয়, তাহার একটি উপায় করেন। একটি প্রবাদ বাক্যে বলে "হাতি আপনার বল আপনি বুঝিতে পারে না" ব্রিটিশজাতি যে কিরূপ মহিমাশালী তাহা আমরাই বুঝিতে পারি, অনেক ইংরাজে তাহা বুঝিতে পারে না। তাঁহারা নিজ বলদর্পে কেবল মত্ত হইয়া আছেন। তাঁহাদের বলের মহিমাতেই মহিমা নয়। তাঁহাদের ধর্ম্মনীতির মহিমাতেই মহিমা। তাঁহারা যতদিন ধর্ম্মনীতির অনুসারে কার্য্য করিয়াছেন ততদিন লোকের তাঁহাদিগের উপর দেবতাবৎ ভক্তি জন্মিয়াছিল। তাঁহারা যে অবধি ধর্ম্মনীতির মস্তকে পদাঘাত করিয়াছেন সেই অবধি তাঁহাদিগের উপরে লোকের ভক্তির বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে অধিক সংখ্যক লোক খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছিল, এই খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে না কেন? এখন লোকে দেখিতে পাইতেছে খ্রীষ্ট মিশনারীরা যে মহার্থ উপদেশ দিতেছেন খ্রীষ্ট শিষ্যেরা তাহার বিপরীত আচরণ করিয়া সেই উপদেশকে রসাতলে দিতেছেন। পরস্পর দুটি বিরুদ্ধ মত হইলে তাহার কোনটিই জনসমাজে সমাদৃত হয় না। আর যে স্থলে মত এক প্রকার আর কার্য্য তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত সেখানে সে মত আদৃত হইবার সম্ভাবনা কি? এই কারণেই খ্রীষ্ট মিশনারীরা কি বিফল-যত্ন হইতেছেন।

ভারতবর্ষকে হস্তে রাখিয়া ইংলণ্ডের লাভ কি? ৫ আশ্বিন ১২৮৭

পার্লিয়ামেণ্ট সভা বন্ধ করিবার সময় মহারাণীর উক্তি নামে যে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা প্রকাশিত হয়, তাহাতে এরূপ আশা দেওয়া হইয়াছে, যে আফগান যুদ্ধের ব্যয়ভারের কিয়দংশ ইংলণ্ড নিজস্কন্ধে গ্রহণ করিবেন। বর্ত্তমান মন্ত্রীগণের এই প্রকার অভিসন্ধির সূচনা পাইয়া ইংলণ্ডের অনেক লোক অসন্তোষ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা

বলেন, যদি ভারতবর্ষ হস্তে রাখিয়া অবশেষে এই ফল দাঁড়ায় যে ইংলণ্ডকে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ভ্রমের ফলভোগ করিতে হয় তাহা হইলে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। সুবিখ্যাত টাইমস সম্প্রতি একটী প্রস্তাবে স্পষ্টাক্ষরে এইরূপ কথা বলিয়াছেন। আমরা টাইমসের উক্তিগুলি অনুবাদ করিয়া দিতেছি। টাইমস বলেন:

"ইংলণ্ডের ধনাগার হইতে সম্প্রতি যে অর্থ চাওয়া হইতেছে, যদি এরূপ প্রার্থনা ন্যায়সঙ্গত হয় তবে এরূপ ন্যায়সঙ্গত প্রার্থনা যে আর হইবে না তাহার প্রমাণ কি? আফগান যুদ্ধে যে ভ্রম হইয়াছে সে জন্য যদি ইংলণ্ডের অর্থদণ্ড সহ্য করা আবশ্যক হয়, তবে যখনই ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ কোন ত্রুটি কাবিবেন তখনই কেন এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া কার্য্য করা হইবে না? যদি এদেশের (ইংলণ্ডের) লোকের মনে এই প্রশ্ন উদয় কবিয়া দেওয়া হয়, যে ভারতবর্ষ রাখিয়া এমন লাভ কি আছে, যে সে জন্য ভারতবর্ষ রক্ষার ব্যয়ভার ইংলণ্ডকে বহন করিতে হইবে, তাহা হইলে ভারতবর্ষের ভাবী কল্যাণেব পক্ষে সমূহ বিপদ। আমরা ভারতবর্ষীয় প্রজাদিগের প্রতিভূ স্বরূপ হইয়া এক শতাব্দী কাল ভারতবর্ষ শাসন করিয়াছি, এবং তিন পুরুষ ধরিয়া নিস্বার্থভাবে ও ন্যায়পরতার সহিত এই ভার বহন করিয়াছি। ভারতবর্ষ হইতে আমরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন প্রকারে লাভবান করিতে ইচ্ছা করি নাই, বরং পরম্পরা সম্বন্ধে অনেক দায়ীত্বভাব আমাদিগকে বহন করিতে হইয়াছে। এরূপ স্থলে যদি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ভ্রমের জন্য ইংলণ্ডের প্রজাদিগকে দণ্ডিত করা হয়, তাহা হইলে ইংলণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের যে সম্বন্ধ আছে অযথা ব্যবহার হইবে।"

টাইমস যাঁহাদের মুখপাত্র স্বরূপ তাঁহাদের মনের ভাবের একপ্রকার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। লোকে যদি নিজের পদ ও সম্ভ্রমের বৃদ্ধির জন্য ব্যয় স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয় না। কিন্তু এই শ্রেণীর ইংরাজেরা তাহাও করিতে স্বীকৃত নন। তাঁহারা বলেন ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ড সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন প্রকার লাভবান হন না, ইহার অর্থ এই যে ভারতবর্ষকে বর্ষে বর্ষে করস্বরূপ ইংলণ্ডের ধনাগারে অর্থ প্রেরণ করিতে হয় না। সে কথা সত্য কিন্তু ভারতবর্ষ হস্তে থাকাতে ইংলণ্ড যে আরও অশেষ প্রকারে লাভবান হইতেছেন তাহা কি অস্বীকার করিবেন? ভারতবর্ষের বাণিজ্য দ্বারা কি ইংলণ্ডের ধনবৃদ্ধি হয় নাই? ভারতবর্ষের অধীশ্বর হওয়াতে ইংলণ্ডের প্রতাপ ও মর্য্যাদা কি বৃদ্ধি হয় নাই? সহস্র সহস্র ইংলণ্ডীয় যুবক কি ভারতক্ষেত্রে স্বীয় স্বীয় বুদ্ধি বিদ্যার বিকাশ করিবার এবং রাশি রাশি ধন উপার্জ্জন করিবার অবসর পাইতেছে না? সে ধনের অধিকাংশ কি ইংলণ্ডের দিকে প্রবাহিত হইতেছে না? ইংলণ্ডীয় ধনীদের অর্থ কি ভারতবর্ষের অনেক কাজে খাটিতেছে না? যাঁহার সহিত এরূপ সম্বন্ধ আছে, যে এরূপ লাভের উপায় স্বরূপ, তাহার বিপদ বা দুর্দ্দশার সময় সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হওয়া কি ভদ্রতা ও ন্যায়সঙ্গত কার্য্য? ইংলণ্ডের চরিত্রে

দুইটী দোষ বা গুণ আছে, সেই জন্যই টাইমস স্পষ্টাক্ষরে এইরূপ লাভের উপায় স্বরূপ, তাহার বিপদ বা দুর্দ্দশার সময় অপহাস্য করিতে পারিয়াছেন, অন্যে হইলে পারিত না। প্রথম অর্থ সম্বন্ধীয়, সকল বিষয়ে ইংরাজ প্রকৃতি কিঞ্চিৎ অনুদার, দ্বিতীয় তাঁহাদের চক্ষুলজ্জা কিঞ্চিৎ অল্প। চক্ষুলজ্জা থাকিলে মানুষ এরূপ বলিতে পারে না। ভারতবর্ষের সহিত ইংলণ্ডের যেরূপ সম্বন্ধ এবং ভারতবর্ষের রাজকোষের যেরূপ দুরবস্থা, তাহাতে ইংলণ্ডের কোষ হইতে ভারতবর্ষের নিত্যব্যয়ের সাহায্য করিলে অন্যায় হইত না, কিন্তু তাহা দূরে থাকুক যে ব্যয়ভার ন্যায়ানুসারে ইংলণ্ডের বহন করা কর্ত্তব্য, তাহার কিয়দংশ ইংলণ্ডকে বহন করিতে হইবে বলাতে এতদূর বিরক্তি উৎপাদন করিয়াছে, যে ভারতবর্ষ রাখার ফল কি, এরূপ প্রশ্নও উদিত হইতেছে! জিজ্ঞাসা করি ভূতপূর্ব্ব গবর্ণমেণ্ট যে আফগান যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহা কি ভারতবর্ষের কোন আততায়ী শত্রুকে নিবারণ করিবার জন্য, অথবা ইংলণ্ডের ইউরোপীয় রাজনীতির কোন বিশেষ লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য? যদি দ্বিতীয় লক্ষ্য সত্য হয় তবে এ ব্যয়ভার বহন করা উচিত? এরূপ অবস্থায় যদি ইংলণ্ড সে ভারের কিয়দংশ বহন করেন তাহাও কি অসহ্য জ্ঞান করা কর্ত্তব্য?

যাহা হউক এই বিবাদ হইতে আমরা একটী শিক্ষালাভ করিতেছি। নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ একটী ভ্রম করা যত সহজ, সে ভ্রমের সংশোধন করা তত সহজ নয়। যখন লর্ড বিকন্স ফিলডের গবর্ণমেণ্ট এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন তখন ইংলণ্ডের প্রজারা কোথায় ছিলেন? পার্লিয়ামেণ্ট কেন তখন আপনার অসন্তোষ প্রকাশের কোন উপায় করেন নাই? এ ভ্রম ত কেবল ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ভ্রম নয়। এ যুদ্ধ যে রাজনীতির ফল, সে নীতির অঙ্কপাত ইংলণ্ডের মন্ত্রীসভাতেই হইয়াছিল। তখন এ ভ্রমকে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ভ্রম বলিলে চলিবে কেন? এখন সে ব্যয়ভার কিঞ্চিৎ বহন করিতে অস্বীকার করিলে ভদ্রতা রক্ষা হইবে কেন? ইংলণ্ডের প্রজাগণ দেখিয়া শিক্ষা লাভ করুন।

আমাদের স্পষ্টই বোধ হইতেছে আগামী বর্ষে যখন পার্লিয়ামেণ্ট বসিবে তখন এই প্রশ্ন লইয়া ঘোর বিতণ্ডা উপস্থিত হইবে। ইংলণ্ডের প্রজারা সহজে যে অর্থ দিবেন এরূপ বোধ হয় না। গবর্ণমেণ্ট যদি বাধ্য করেন, অনেকে অসন্তোষ ও বিরক্তির সহিত দিবেন। কিন্তু বর্ত্তমান মন্ত্রীসভার এ অভিপ্রায়টী তাঁহাদের উদার নীতির অনুরূপ হইয়াছে, এতদ্বারা তাঁহারা ন্যায়ানুসারে রাজ্য শাসন করিতে ইচ্ছুক তাহা প্রকাশ পাইবে, ভারতবর্ষের প্রজাদিগের ইংলণ্ডের ন্যায়পরতার প্রতি আস্থা বর্দ্ধিত হইবে, এবং ইংলণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের যে সম্বন্ধ আছে, তাহা ঘনীভূত হইবে।

উপসংহারকালে আর একটী বিষয়ের উল্লেখ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। সেটী এই এতদিন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যে সকল ভ্রমের কার্য্য

করিতেন, ইংলণ্ডের দিবার দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হইত না; ভারতবর্ষের প্রজারা ক্লেশ ভোগ করিতেন এবং সে ক্লেশ প্রকাশ করিতেন, কিন্তু তাঁহাদের আর্ত্তনাদ এই দেশেই বিলীন হইত; এক্ষণে ইংলণ্ডকে মধ্যে মধ্যে সেই সকল ভ্রমের দণ্ড সহ্য করিতে হয়; তাহা হইলে নিশ্চয় তাঁহাদের দৃষ্টি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইবে। ইংলণ্ডের ধনে হস্ত দেওয়া এবং সর্পের আগুনে পদার্পণ করা সমান। তাঁহাদিগকে জাগ্রত করিবার এই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপায়। তাঁহারা যদি জাগ্রত থাকেন, এবং ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কার্য্য সকল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে আমরা অনেক ভ্রমের কার্য্য হইতে বাঁচিয়া যাইব, এরূপ আশা হইতেছে। ইহাও একটা আনন্দের বিষয়।

দেশীয় সভা সকলের নির্জ্জীব ভাব। ১১ ফাল্গুন ১২৮৭। ১৫ সংখ্যা

গত দুই বৎসর কাল আমাদের দেশীয় সকল সভাই কিঞ্চিৎ নিস্তেজভাব ধারণ করিয়াছে। কোন প্রকার সাধারণের হিতকর কার্য্যে লোকের আর পুর্ব্বের ন্যায় উৎসাহ দৃষ্ট হইতেছে না। ডাক্তার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সংগীত বিদ্যালয়গুলি ক্রমে হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছে। লোকের অনুরাগ ও উৎসাহের অভাবই ইহার প্রধান কারণ। এবিষয়ে লোকের আর পূর্ব্বানুরূপ উৎসাহ নাই। বাবু নবগোপাল মিত্রের হিন্দুমেলাও নিস্প্রভ ও দুর্ব্বলভাব ধারণ করিয়াছে, এবারেও মেলার কার্য্য এক প্রকার হইয়াছিল। কিন্তু এদিকে লোকের আর পুর্ব্বের ন্যায় অনুরাগ দৃষ্ট হইতেছে না। রাজনীতি চর্চ্চার জন্য যে সভাগুলি আছেন, তাঁহারাও অর্দ্ধ তন্দ্রিতভাবে কার্য্য করিতেছেন। ভূমির রাজস্বসংক্রান্ত নূতন আইনটা না হইলে, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন সভাও বোধহয় এতদিনে বিশ্রাম সুখভোগে রত থাকিতেন। সামাজিক সভাগুলির ত কথা নাই। তাহারা একে একে আলস্য শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রাভিভূত হইয়াছেন। গৃহস্থের পরিজন সকলে কাজকর্ম্ম সারিয়া যে রূপ নিদ্রা যায়, ইহাদের কাজকর্ম্ম যেন সেইরূপ সমাধা হইয়া গিয়াছে। এ সময়ে যদি কেহ আসিয়া দেখেন, তাঁহার মনে হইবে, ইঁহাদের যেন ভাবিবার, বলিবার বা করিবার কিছুই নাই। বাস্তবিক কি তাহাই? ভারতবর্ষের দিগন্তব্যাপী দুর্দ্দশা এখনও অপণীত হয় নাই। শিক্ষার উন্নতি, কৃষি বাণিজ্যের উন্নতি, রাজনীতির উন্নতি, স্ত্রীজাতির উন্নতি, সামান্য লোকদিগের উন্নতি, সকলপ্রকার উন্নতিই এখন অবশিষ্ট রহিয়াছে। অবশিষ্ট কেন কোনটাই প্রকৃতপক্ষে আরম্ভ হয় নাই বলিলেও হয়।

লোকের মনের এ প্রকার নিরুৎসাহ ভাবের কারণ কি? দেশে যদি অন্নকষ্ট বা মহামারী উপস্থিত হয়, তাহা হইলে লোকে ধনে প্রাণে সারা হইয়া নির্জ্জীব হইয়া পড়ে। কোন প্রকার দেশহিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত হইবার উপযোগী উৎসাহ থাকে না।

কিন্তু দেশের বর্ত্তমান অবস্থাতে এ কথাও খাটিতেছে না। এই দুই বৎসর দেশের যেরূপ স্বচ্ছলের অবস্থা যাইতেছে, এরূপ অনেক দিন হয় নাই। সংক্রামক রোগ সকলের প্রকোপও যেন কিয়ৎপরিমাণে খর্ব্ব বোধ হইতেছে। তবে একথা অস্বীকার করা যায় না, যে লোকের অন্নকষ্ট নাই। সুতরাং দুর্ভাবনা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার ভার অনেকের পক্ষে ক্রমেই দুর্ব্বহভার স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এদিকে যেমন ব্যয়ের বৃদ্ধি হইতেছে, অপরদিকে তেমনি তদনুরূপ নূতন নূতন আয়ের দ্বার দেখা যাইতেছে না, সুতরাং ভদ্র অভদ্র অনেক পরিবারের পক্ষে দিনপাত করা ক্লেশকর ব্যাপার হইয়া উঠিতেছে। লোকে দেশহিতকর কার্য্যে উৎসাহিত হইবে, কি অন্ন চিন্তাতে তাহাদের উদরের অন্ন তণ্ডুলত্ব প্রাপ্ত হইতেছে। একথা যথার্থ; কিন্তু এই সকল অস্বচ্ছল ও অসুবিধা সত্ত্বে পূর্ব্ব কয়েক বৎসরে সকল দিকে যেমন লোকের অনুরাগ ও উৎসাহ লক্ষিত হইয়াছিল তাহা আর লক্ষ্য করা যাইতেছে না। ইহার কারণ কি?

ইহাতে এই প্রমাণ হইতেছে যে কিরূপে কাজ করিতে হয় এদেশের লোকে অদ্যপিও তাহা শিক্ষা করেন নাই। সেইজন্য আমাদের উৎসাহ স্থায়ী হয় না, ক্ষণকালের মধ্যে দেদীপ্যমান হইয়া দিগ্‌মণ্ডল আলোকিত করে এবং অচিরে নির্ব্বাণ হইয়া যায়। ইংরাজেরা যে ভাবে কার্য্য করেন, তাহার সহিত তুলনা করিলে আমাদের দোষগুণ আরও স্পষ্টরূপে লক্ষ্য করা যায়। ইংলণ্ডে বহুসংখ্যক পুরুষ ও রমণী নানা-প্রকার দেশহিতকর কার্য্যে রত আছেন। অধিকাংশ স্থলে তাঁহাদের নাম পর্য্যন্ত কেহ জানে না, তাঁহারা দৃঢ় বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া গোপনে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতেছেন। এক একজন ২০।২৫ বৎসর এইরূপে পরিশ্রম করেন। তাঁহাদের কার্য্যের দ্বারাই তাঁহাদের সভার শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। তাহাদিগের কার্য্য কেবল বাক্যে ও আড়ম্বরে পর্য্যবসিত হয় না। ইংরাজ জাতিরই স্বভাব এই যে, তাঁহারা প্রকৃত কাজ না দেখিলে আকৃষ্ট হন না, আমাদের প্রকৃতি যেন তদ্বিপরীত। আমরা যতদূর অনুভব করি তদপেক্ষা অধিক প্রকাশ করিয়া ফেলি, আবার যতদূর অনুভব করি তাহাও অধিককাল থাকে না। এই কারণে আমাদের কার্য্য অপেক্ষা মৌখিক আড়ম্বর অধিক হইয়া পড়ে। দেশীয় সভাগুলিকে এই সংক্রামক রোগে ধরিয়াছে। আমরা উপরে যে সকল উন্নতির উল্লেখ করিয়াছি তাহার এক-একটীতে কতগুলি লোক একাগ্র-চিত্তে ২০।৩০ বৎসর রত থাকিলে তবে কিয়ৎপরিমাণে উন্নতি লক্ষিত হইতে পারে, কিন্তু আমাদের সে সহিষ্ণুতা বোধ হয় অদ্যপি জন্মে নাই। দেশীয় কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ যদি প্রথমেই মহাড়ম্বর না করিয়া অজ্ঞাতভাবে ও গোপনে কার্য্যারম্ভ পূর্ব্বক ফলের দ্বারা লোককে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করেন তাহা হইলে ভাল হয়। সভাগুলি এইভাবে কার্য্য করিতে শিক্ষা করুন।

উদার ইংরাজ জাতির অনুদারতা। ২৫ ফাল্গুন ১২৮৭

ইংরাজ ভিন্ন ফরাসী জর্ম্মণ প্রভৃতি উচ্চতর সভ্যতাসম্পন্ন জাতি সকল আছেন বটে, কিন্তু ইংরাজের তুল্য উদারতা, স্বাধীনতা, রসজ্ঞতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা কাহারই প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। ইংরাজ জাতির উদারতা ও স্বাধনীতাপ্রিয়তা এত প্রবল, যে তাঁহারা কোন বিষয়ে বন্ধন ও পরাধীনতা ভালবাসেন না। তাঁহাদের স্বদেশীয় ও স্বজাতীয়ের কথা দূরে থাকুক তাঁহাদের অধীন প্রজাগণও যে মূর্খতা অজ্ঞানের চিরপরাধীন হইয়া থাকিবে, তাঁহারা তাহা ভালবাসেন না। এই নিমিত্ত তাঁহারা ভারতবাসীদিগের বিদ্যাশিক্ষার কেমন সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়াছেন। প্রবল লোকেরা দুর্ব্বলদিগকে যে অধীন করিয়া রাখিবে, ইংরাজেরা সে পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। ইহার নিমিত্তই পুলিশের ও আদালতের এবং আইনের উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। অন্য কথা কি? যে জমিদার ও প্রজার নিতান্ত বাধ্যবাধকতা সম্বন্ধ সেই জমিদারই প্রজাকে নিজ কাছারিতে ডাকিয়া লইয়া যাইতে সঙ্কুচিত হইয়া থাকেন। দাসত্বপ্রথা রহিত করিবার নিমিত্ত কোন জাতি ইংরাজের ন্যায় পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করেন নাই। যে জাতির উদারতা এইরূপ সর্ব্বতোমুখী সেই জাতির একটী বিষয়ে অনুদারতা দেখিয়া আমরা যার পর নাই বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়াছি। সেই অনুদারতা এই—স্বাধীনতার ন্যায় প্রিয় পদার্থ তাঁহাদিগের আর নাই। যদি কেহ তাঁহাদের দেশের স্বাধীনতা হরণে উদ্যত হয়, তাঁহাদের স্ত্রী বালক বৃদ্ধ পয্যন্ত সমরক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া সেই স্বাধীনতা হরণোদ্যত ব্যক্তির গর্ব্বচূর্ণ করিতে পরাঙ্মুখ হয় না। যে জাতি স্বাধীনতা এত ভালবাসেন, স্বাধীনতা যে জাতির দেহ, মন, শোণিত ও ধাতুর সহিত এক হইয়া গিয়াছে, সে জাতি যে সময়ে সময়ে অপরের স্বাধীনতা গ্রাসার্থ ব্যগ্র হন, এই বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। আমরা আপাততঃ আফগান ও বোয়ারের যুদ্ধ লক্ষ্য করিয়াই এ কথা বলিতেছি। লোকে বলে "গায় পড়ে ঝগড়া করে" আমরা উক্ত দুই স্থলে ইংরাজদিগের সেই ভাব দর্শন করিলাম। লর্ড বিকন্স ফিল্ডের মন্ত্রীত্বকালে এক রুশিয়া ছল করিয়া কাবুলের স্বাধীনতা হরণের চেষ্টা করা হইয়াছিল। ভাগ্যক্রমে লিবারাল দল বিপক্ষ হওয়াতে সে চেষ্টা সফল হইল না।

কাবুলের সিংহাসন আবদুল রহমানকে প্রদত্ত হইলেও এক কান্দাহার লইয়া সেই স্বাধীনতা হরণের বীজ রোপণের পুনরায় চেষ্টা হয়। অনেক কষ্টে বর্ত্তমান মন্ত্রিগণ সে চেষ্টার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন।

বোয়ারদিগের স্বাধীনতা হরণের চেষ্টা ইংরাজ জাতির অনুদারতার অপর উদাহরণ। যে জাতি স্বাধীনতাকে অমূল্য জ্ঞান করেন, সেই জাতি ধরিয়া বাঁধিয়া এক স্বাধীনতাপ্রিয় বীর জাতিকে পরাধীন করিবার চেষ্টা পাইতেছেন, ইহার পর বিস্ময়ের আর কি আছে? অধিকতর দুঃখের বিষয় এই, জীগীষাপরবশ পূর্ব্ব মন্ত্রীগণ যে কার্য্যের আরম্ভ করিয়া

গিয়াছেন, বর্ত্তমান উদারমতি মন্ত্রিগণ তাহার অনুসরণ করিতেছেন। বর্ত্তমান মন্ত্রীসম্প্রদায় যেমন উদারহৃদয়, তাঁহাদিগের কি এই উচিত নয় যে তাঁহারা বোয়ারদিগের স্বাধীনতা দান করিয়া তাহাদিগের বীরত্বের সমুচিত পুরস্কার করেন? বোয়ারেরা আমেরিকাবাসিদের ন্যায় যদি ইংরাজদিগকে পরাজয় করিয়া স্বাধীনতা লাভ করে, তাহা কি ইংরেজজাতির গৌরবের বিষয়? না, ইংরাজেরা আপন ইচ্ছায় তাহাদিগকে স্বাধীনতা দান করিলে তাহা গৌরবের বিষয় হয়। বোয়ারেরা ইংরাজদিগের নিকটে যে পরাস্ত হইবে, যে বিষয়ে কি সংশয় আছে? তাহারা হাজার সাহসী হউক, হাজার বীর পুরুষ হউক, ইংরাজদিগের কোষদণ্ডজ তেজের নিকটে তাহাদিগকে অবশ্য নত হইতে হইবে। তাহারা কোন ক্রমেই ব্রিটিশ সিংহের সমকক্ষ নয়। সামান্য শত্রুকে পরাভূত করিয়া ইংরাজ জাতির গৌরব নাই। হীনকে উন্নত করিয়া তুলাই তাঁহাদিগের গৌরবের বিষয়।

উপসংহারে আমরা এই অভিলাষ প্রকাশ করিতেছি বর্ত্তমান মন্ত্রীসম্প্রদায় আফগানস্থানে যে প্রকার ব্যবহার করিলেন, বোয়ারদিগের প্রতিও সেই প্রকার ব্যবহার করুন। বোয়ারদিগের হস্তে আপাততঃ পরাজয় হইয়াছে, সে অপমানের প্রতিশোধ করা হউক। তাহাদিগকে দুই একটী যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া স্বাধীনতা দান করা হউক। কান্দাহার পরিত্যাগ বিষয়ে ডিউক কেম্বি জ ও লর্ড নেপিয়ার প্রভৃতি অনেক বড় লোকে অমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। কতকগুলি স্বদেশহিতৈষী কান্দাহারকে ইংরাজ জাতির স্বহস্তে রাখিবার অনুরোধ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান মন্ত্রীসম্প্রদায় সমস্ত অন্যায় অনুরোধ পরিহার করিয়া কান্দাহার পরিত্যাগ করিয়া যেমন যশস্বী হইলেন, তেমনি বোয়ারদিগের স্বাধীনতা দান করিয়া যশোলাভ করুন। আমরা ইউরোপীয় সমাচার পাঠ করিয়া জানিতে পারিলাম, এই মার্চ্চমাসের শেষে কান্দাহার পরিত্যাগ করা হইবে, এখন অবধি তাহার আয়োজন হইতেছে।

দেশীয় শান্তিভঙ্গ। ৯ কার্ত্তিক ১২৮৮

পাঠক! অবগত আছেন, মধ্যে মধ্যে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে দাক্ষিণাত্যে পাঞ্জাবে হিন্দু মুসলমান জাতির পরস্পর দারুণ বিবাদ ঘটিতেছে। এই উভয় জাতিই বহুকাল অবধি ভারতবর্ষে বাস করিতেছে, তাহারা বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বটে, কিন্তু এক রাজার প্রজা ও এক দেশনিবাসী। অতএব তাহাদের এতাদৃশ বৈরভাবের উদয় হওয়া যার পর নাই আক্ষেপের বিষয়। দিন দিন কোথায় সকলে সভ্য হইবেন, এক দেশবাসী, এক দেশবাসী বলিয়া পরস্পরের প্রতি স্নেহ জন্মিবে, ধর্ম্মান্ধতা ত্যাগ করিয়া সকলেই পবিত্রভাবে পরস্পরের দুঃখমোচন করিবেন, পরস্পরের সাহায্য করিবেন, একপ্রাণ এক আত্মা হইয়া স্বদেশের উন্নতি করিবেন—না ক্রমশই বৈরভাব বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এই এক ভারতবর্ষে ধর্ম্মপথের সংখ্যা

করিয়া শেষ করা যায় না। কেবল হিন্দু ও মুসলমান বলিলেই ভারতবর্ষের সকল ধর্ম্মাবলম্বীর নাম করা হইল না। হিন্দুগণও অসংখ্য সম্প্রদায়ে বিভক্ত। তন্মধ্যে একপ্রকার সম্প্রদায়ের মত অন্য সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ বিপরীত। শাক্তের সঙ্গে বৈষ্ণবের মতের সামঞ্জস্য হয় না, বৌদ্ধের সঙ্গে সাধারণ হিন্দুসমাজের মতের মিল নাই। ব্রহ্মজ্ঞানীরা আবার আর এক সম্প্রদায়ের লোক। ইহাঁরা সকলেই যদি বিবাদ বিসম্বাদে প্রবৃত্ত হন, তবে ভারত উৎসন্ন যাইতে ত একদিনও লাগে না। ধর্ম্মকর্ম্মে সকলে আপন আপন বিশ্বাস মত কাজ করুন, কিন্তু সামাজিক কাজে একতা চাই। নতুবা নিজ নিজ উন্নতিও হইবে না। স্বদেশেরও উন্নতি হইবে না। স্পষ্ট বলিলে দোষী হইতে হয়, সে কারণ স্পষ্ট কথা কহিতে আমরা অনেকটা আশঙ্কা করিয়া থাকি। কিন্তু রাজার প্রজারা ও ভারতবর্ষের হিতসাধনের অনুরোধে আমরা কয়েকটী সত্য কথা না বলিলে ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। আমরা দেখিতেছি, আধুনিক রাজপুরুষেরাই অনেকস্থলে এদেশের ভিন্ন ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থানবাসিদের হৃদয়ে দারুণ বিদ্বেষভাবের বীজ রোপন করিয়া দিতেছেন। তাঁহারা অনবধানতাপ্রযুক্ত জাতীয় বৈর জন্মাইতেছেন। বিহার ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এই প্রকার ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে যে, সেখানে তদ্দেশবাসী ভিন্ন অন্য কেহ গবর্ণমেন্টের আফিসে কর্ম্ম পাইবেন না। বুঝিয়া দেখুন, এ আজ্ঞার পরিণাম ফল কখনই হিতকর হইতে পারে না। ইহা বঙ্গবাসীর ও তত্তৎস্থলের লোকের ন্যায় মনে কতদূর বিদ্বেষভাব জন্মাইবার কারণ হইয়াছে, তাহা বলিবার নহে। বলিতে কি, পরস্পর হিংসা ও শত্রুতা করিতে শিখিবার ইহা একটী প্রধান কারণ হইয়াছে। কালক্রমে ভারতবর্ষের সমস্ত জাতি পরস্পর পরস্পরের দুঃখে কাতর হইবে, পরস্পর পরস্পরকে স্নেহ মমতা করিবে সে আশা এককালে বিনিষ্ট হইতেছে। বিদ্যা করিয়া সভ্য ভব্য হইয়া কোথায় ভারতবর্ষবাসীরা একজাতি হইয়া একপ্রাণে একমনে এক সদনুষ্ঠানে উদ্যোগী হইয়া দীন হীন দুঃস্থ ভারতের কষ্ট মোচন করিবেন, না রাজপুরুষেরাই যত্নবান হইয়া সে আশালতা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিতেছেন। এ প্রকার নিয়ম প্রকাশ করা কাপুরুষতা মাত্র, তাহাতে সদ্বিবেচনার লেশমাত্র নাই। আবার এই নিয়ম পক্ষপাত ও অশেষবধি দোষেও পরিপূর্ণ। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের গবর্ণমেণ্ট অফিসে বাঙ্গালিরা কর্ম্ম পাইবেন না, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি ইউরেসিয়ান, ইংরাজ, ফিরিঙ্গী ও অন্যান্য জাতি পাইবেন কেন? দেশীয় খ্রীষ্টান বা পাইবেন কেন? এটী কি পক্ষপাত নয়? ভারতবর্ষ বহু বিস্তীর্ণ, সে কারণ কথাবার্ত্তার অনেক বৈসাদৃশ্য আছে। কথাবার্ত্তার বৈসাদৃশ্য দেখিয়া এক রাজার প্রজাদের পরস্পর ভিন্ন ভাব জন্মাইয়া দেওয়া কোনক্রমে ন্যায়ানুগত নহে। ভারতবর্ষবাসীগণ সকলেই এক রাজার প্রজা, অতএব তাহারা সকলে এক পরিবারের মত সুখেস্বচ্ছন্দে বাস করিবে, ইহাই প্রার্থনীয়। রাজার অধিকার মধ্যে সর্ব্বত্রই যাইতে পারিবে সর্ব্বত্রই কর্ম্মকাজ করিবে, ইহাই ন্যায়পরতা, সকলেই এই উপদেশ দিয়া থাকেন। বিশেষতঃ বাঙ্গালিরা কার্য্যোপলক্ষে কিম্বা অন্য

কোন কারণে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বাস করিতে পারেন তদ্ভিন্ন নানা স্থানের হিন্দুগণ কতকাল হইতে সিদ্ধতীর্থস্থানে বাস করিয়া আসিতেছেন। কাশী প্রয়াগ মথুরা বৃন্দাবন প্রভৃতি পুণ্যক্ষেত্রে অনেক বাঙ্গালী পাঁচ ছয় পুরুষ কাল বাস করিয়া আসিতেছে, বঙ্গদেশেও অনেক হিন্দুস্থানী আসিয়া কতপুরুষ বাস করিয়া রহিয়াছেন। এ প্রকার উপনিবেশের প্রথা চিরকাল চলিয়া আসিতেছে। উত্তরকালে আরও কত উপনিবেশ হইবে। কিন্তু তাঁহাদের সন্তান সন্ততিগণ কি গবর্ণমেণ্ট অফিসে কর্ম্ম পাইবেন না। এ নিয়মটী সত্বর রহিত করা একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। নতুবা দেশে দারুণ বিশৃঙ্খলা ঘটিবে এবং শান্তিরক্ষাও হইবে না। হিন্দুমুসলমানে সময়ে সময়ে যে বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহা কখন কখন লঘুচেতন নব্যতন্ত্রী রাজপুরুষগণের অনাস্থাদোষে ঘটিয়া থাকে। সম্প্রতি মুলতানে যে তুমুল কাণ্ডটী ঘটিয়া গিয়াছে, তত্রত্য ডেপুটী কমিশনর শ্রীযুক্ত রো সাহেব পুর্ব্বে কিঞ্চিৎ সতর্ক হইলে অবশ্যই তাহার নিবারণ হইতে পারিত। মুলতান নগরে সর্ব্বশুদ্ধ ৪২৫০০ হাজার হিন্দু এবং ১৫০০০ হাজার মুসলমান। হিন্দুরা প্রায় সকলেই পরম বৈষ্ণব। ঐ নগরে প্রহ্লাদপুরী নামে একটী দেবমন্দির আছে। হিন্দুরা তদধিষ্ঠাত্রী দেবতার উপাসক। গত ৪ঠা আশ্বিন একাদশী গিয়াছে। হিন্দুগণ সেদিন উপবাসী ছিল, মুসলমানেরা নগর মধ্যে গোমাংস আনিয়া চীৎকার পূর্ব্বক হাকিতে লাগিল "দুই পয়সা করিয়া সের।" ইহাতে হিন্দুগণ যৎপরনাস্তি মনঃপীড়া পায়। মুলতানের সর্ব্বত্র গোমাংস আনিবার রাজানুমতি ছিল না। নগরের বাহিরে একটী ফটক আছে, সেইদিকেই গোমাংস বিক্রীত হইত। ঐ দিকে হিন্দুরা কখন যাতায়াত করিত না। গত ১৬ই সেপ্টেম্বর মুসলমানেরা চতুর্দ্দিকে গোমাংস বিক্রয় করিবার অনুমতি প্রার্থনায় রো সাহেবের নিকট আবেদন করে। তৎকালে কমিশনর সাহেব মফঃস্বল ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। রো সাহেব মুসলমানদের আবেদন পত্র পাঠ করিয়া অগ্রপশ্চাৎ ভাবিলেন না, পরিণামে কি ঘটিবে তদীয় হৃদয়াকাশে একবারও সেভাবের উদয় হইল না, তিনি বড়বাজার চক প্রভৃতি সর্ব্বত্রই গোমাংস বিক্রয় করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন।

বঙ্গদেশে মুসলমানে ও হিন্দুতে যথেষ্ট প্রণয় আছে। তাহাদের ধর্ম্মমত এবং বিশ্বাস যেরূপ হউক, কিন্তু সকলেই একবাক্য হইয়া সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। এক ভারতবাসী বলিয়া পরস্পর পরস্পরের সহানুভূতি করিতে হয়, তাহা সকলেই শিক্ষা করিতেছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে এখনও সে বিশুদ্ধভাব প্রবর্ত্তিত হয় নাই। মুসলমানেরা রো সাহেবের অনুমতি পাইয়া আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। হাটে বাজারে হিন্দুদের সম্মুখে চীৎকার করিয়া গোমাংস বিক্রয় করিতে লাগিল। তাহাতে হিন্দুদের সঙ্গে ঘোর দাঙ্গা উপস্থিত হয়। হিন্দুগণ মুসলমানদের গৃহাদি ও মসজিদ নষ্ট ও দগ্ধ করিয়া দেয় এবং মুসলমানেরাও দোকান দেবালয় এবং গৃহাদি দগ্ধ করে। উভয় পক্ষের অনেক লোক আহতও হইয়াছিল। হিন্দুগণ রো সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া কর্ত্তব্যতা স্থির করিতে

চাহিয়াছিলেন। কিন্তু সাহেব বাহাদুর কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। অগত্যা তাঁহারা গবর্ণর জেনেরলকে এতদ্বিবরণ জ্ঞাত করিবার নিমিত্ত তারযোগে সংবাদ দিলেন। এদিকে উভয় পক্ষের বিবাদ আরও ভীষণ মূর্ত্তিধারণ করিল। পরিশেষে উপায়ন্তর না দেখিয়া পুলিশের ও সৈন্যাদির সাহায্যে গোলযোগের শান্তি করা হইল। পাঠক! দেখুন, রো সাহেবের অবিমৃষ্যকারিতা হেতু কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটিয়া গেল। তিনি বিচারপতি। এদেশের শান্তিরক্ষা করিবেন, প্রজার জাতি ধর্ম্ম মান সম্ভ্রম ধনৈশ্চয্য সকলি তাঁহার হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে। তিনি সকলের রক্ষাকর্ত্তা। এদেশের বিচারকার্য্যের গুরুতর ভার গ্রহণ করিয়া যদি দেশীয় আচার ব্যবহার জ্ঞাত না থাকেন, তবে কত দূর যে আক্ষেপের হয়, তাহা বলিবার নহে। বহুপূর্ব্ব হইতে যে নিয়ম চলিয়া আসিতেছিল, হঠ করিয়া তাহার নিষেধ করিলেন, ক্ষণকালের নিমিত্ত কোন চিন্তা করিলেন না। শেষ এই অগ্নিকাণ্ড জ্বলিয়া উঠিল—নির্ব্বাণ করা দায়। দেশের অনিষ্টে আমাদের অনিষ্ট, তাই আমাদের প্রার্থনা হিন্দু ও মুসলমানে ভবিষ্যতে আর যেন বিবাদ না ঘটে, রাজপুরুষগণ তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হউন। একবার নয়, এ প্রকার বিবাদ অনেকবার ঘটিয়া গেল। অতএব স্থানীয় রাজপুরুষগণ মধ্যবর্ত্তী হইয়া সত্বর উহার নিবারণ করুন। নতুবা এই প্রধূমিত বিদ্বেষানল উত্তরকালে প্রজ্বলিত হইয়া বিপরীত কাণ্ড ঘটাইতে পারে।

মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাদানে গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য ও আমাদের কর্ত্তব্য। ১ চৈত্র ১২৮৮

সর চারলস মেটকাফ ভারতে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান করিয়া যান, তদবধি এ পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে যে যে ঘটনা হইয়া গেল, সেগুলির পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে মুদ্রা-যন্ত্রের স্বাধীনতাদানের প্রয়োজন ও তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের তুল্য সুচতুর বুদ্ধিমান দুরদর্শী গবর্ণমেণ্ট আর নাই বলিলেই হয়। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাদানে যে কি ইষ্টলাভ হয়, অন্য সামান্য রাজার তাহা হৃদয়ঙ্গম হওয়া দূরে থাকুক, ফ্রান্স জার্ম্মণি প্রভৃতি উচ্চতম গবর্ণমেণ্টগুলিও তদ্বোধে সমর্থ নহেন। স্বাধীন মুদ্রাযন্ত্র শাসনকার্য্যের একটী প্রধান সহায়। সভ্য গবর্ণমেণ্ট হইলেই মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা দিতে হয়, তাই বলিয়া যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাদান করিয়াছেন তাহা নয়, এতদ্দানে তাঁহাদিগের একটী প্রধান স্বার্থসম্বন্ধ আছে। তাঁহারা মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা দান করিয়া ঐ উপায় দ্বারা অনায়াসে প্রজার হৃদ্গতভাব বুঝিতে পারিতেছেন। যে স্থলে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা জন্মিতেছে পুর্ব্বাহ্নে তাহার প্রতিকারের উপায় বিধান করিতেছেন। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা নিবন্ধন ভারতের উন্নতি হইবে, ভারতবাসির মনে স্বাধীনতা সঞ্চারিত হইয়া সাহসিকতা মনস্বিতা ও তেজস্বিতা প্রভৃতির বৃদ্ধি ও দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইবে, এই ভাবিয়া গবর্ণমেণ্ট ভারতে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাদান করেন

নাই। তাঁহাদের স্বার্থসাধনই মুখ্য উদ্দেশ্য, ভারতের শ্রীবৃদ্ধি আনুষঙ্গিক ফল। ভারতের শ্রীবৃদ্ধি মুখ্য উদ্দেশ্য হইলে কখন ঐ আইনের সৃষ্টি হইত না। যে সময়ে ঐ আইনের সৃষ্টি হয়, তখন ভারতে বিদ্রোহাদি কোন উপদ্রব ছিল না। রুষ কর্ত্তৃক ভারত আক্রমণের আতঙ্ক ছলমাত্র।

এস্থলে পাঠক! জিজ্ঞাসা করিবেন, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতারোধক ঐ আইন সৃষ্টি করিলেন কেন? তাহার সৃষ্টির কারণ এই, অধিকাংশ রাজপুরুষ এদেশীয়েব মুখে উচ্চকথা শুনিতে ভালবাসেন না। তাহার সৃষ্টির কারণ এই, অধিকাংশ রাজপুরুষ এদেশীয়েরা মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা ভোগ করিয়া রাজনীতি লইয়া তর্ক-বিতর্ক করুন, কিন্তু উগ্র ও তীব্রভাবে বাক প্রয়োগ করিতে পারিবেন না, যে কিছু বক্তব্য থাকে তাহা বিনীত ও নম্রভাবে নিবেদন করিবেন। এখন বোধ হয় পাঠক! বুঝিতে পারিলেন, তীব্রভাবে রাজনীতির পর্য্যালোচনা ঐ আইন সৃষ্টির প্রধান কারণ। তীব্রভাবে গবর্ণমেণ্টের রাজনীতির পর্য্যালোচনা হয় বলিয়া এদেশীয়দিগের প্রতিষ্ঠিত কি ইংরাজী পত্র কি দেশীয় ভাষার পত্র, কাহার উপরে রাজপুরুষেরা প্রীত ও প্রসন্ন নহেন। তাঁহাদের অনেকের মনে এই ধারণা আছে, এদেশীয় সমাচারপত্র সম্পাদকেরা প্রজাগণের মনে বিরাগ উৎপাদন করিয়া দিতেছেন। এই সংস্কারটী অনেকের হৃদয়ে দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হওয়াতে তাহারা এদেশীয় সমাচার পত্রের প্রতি বিশেষ বিরূপ।

ফলতঃ এক্ষণে বঙ্গবাসী কেবল বঙ্গবাসী কেন—অধিকাংশ ভারতবাসাই আর নিবিড় অজ্ঞতাতিমিরে নিমগ্ন নন। আপনাদের কর্ত্তব্য এক্ষণে অনেকেই সুন্দররূপ বুঝিয়াছেন। আমাদের কৃতবিদ্য ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিগণ যে মধ্যে মধ্যে সভা করিয়া বক্তৃতাদি দ্বারা রাজ-নীতির আলোচনা এবং ইংরাজরাজের কৃত নূতন নিয়মের গুণ দোষ বিচার করিয়া থাকেন, ইংরাজগণ তাহাতে সন্তুষ্ট নহেন। অদ্যাপি অনেকেরই আন্তরিক ইচ্ছা, ভারতবাসীরা এই উনবিংশ শতাব্দীতে সুসভ্য সুবিজ্ঞ ইংরাজ রাজত্বে সেই প্রাচীনকালের অসভ্য অর্ব্বাচীন নৃশংস মুসলমান অধিকারের ন্যায় গভীর অজ্ঞানতিমিরে আচ্ছন্ন থাকে। প্রজাগণ যাহাতে ধনেমানে জ্ঞানে সর্ব্ববিষয়ে ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিয়া মনুষ্য সমাজে সভ্য বিদ্বান ও বুদ্ধিমান জাতি বলিয়া বিখ্যাত হয়, গবর্ণমেণ্টের সে ইচ্ছা থাকিলেও প্রধান কর্ত্তার কতকগুলি পারিষদের দোষে সে অভীষ্ট সিদ্ধি হয় না। কিসে ভারতবাসী সুখসচ্ছন্দে কালহরণ করিবে এবং কিসে রাজ্যের সর্ব্বত্র সন্তোষ ও শান্তি বিরাজ করিবে, গবর্ণমেণ্টের এই আশা ও এচেষ্টা একান্ত বলবতী হইলেও তাহা কার্য্যকর হয় না। তিনি কোন একটী সদ্বিষয়ের অনুষ্ঠান করিবেন, চতুর্দ্দিক হইতে ইংরাজী সংবাদপত্র বা উচ্চ পদস্থ ইংরাজগণ খড়্গহস্ত হইয়া উঠেন। ইংরাজ বিদেশীয় রাজা, বিদেশীয়দিগের রাজা, বিদেশীদিগের সন্তোষ সাধন করিবার জন্য স্বদেশীয়দিগকে অসন্তুষ্ট করা তাঁহার পক্ষে সম্ভাবিত নহে। সুতরাং তাহাকে সেই সদনুষ্ঠান হইতে বিরত হইতে হয়। ভারতবাসী উচ্চশিক্ষা-লাভ করিয়া সভ্য ও জ্ঞানী হইয়া

গবর্ণমেন্টের কার্য্যের পর্য্যালোচনা করেন, ইহা প্রায় কোন ইংরাজের ইচ্ছা নয়। সে দিবস কলিকাতা টাউনহলের সভায় যে বক্তৃতা হইয়াছিল, সেই উপলক্ষে পাওনিয়র বাঙ্গালিদিগকে অনেক ভৎর্সনা করিয়াছেন। তিনি বলেন "যে মনুষ্যদিগকে দেশীয় রাজার অধীনে ক্রীতদাসের ন্যায় জীবনাতিপাত করিতে হইত, ইংরেজ গবর্ণমেন্টের অনুগ্রহে বাক্যের স্বাধীনতা পাইয়া আজ তাহারা সেই মহানুভব গবর্ণমেন্টের নিন্দা ঘোণষা করিয়া থাকে।"

ইংরাজ গবর্ণমেন্টের অনুগ্রহে আমরা নির্ভয়ে অসঙ্কুচিতচিত্তে মনোভাব প্রকাশ করিতে পারি সত্য, এবং সেজন্য ভাবতবাসী ব্রিটিশজাতির নিকট কঠিন কৃতজ্ঞতাজালে আবদ্ধ। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কেন যে আমাদিগকে এই অধিকার দান করিয়াছেন, যদ্যপি পাওনিওয়ের সুবিজ্ঞ সম্পাদক একবার বিবেচনা করিয়া দেখিতেন, তাহা হইলে আজ আমাদিগকে এই তিরস্কার সহিতে হইত না। ইংরাজ জাতি যারপর নাই চতুর, তাঁহার কঠিন রাজনীতির মর্ম্মভেদ করা সামান্য লোকের কার্য্য নয়। এই জটিল রাজনীতি অর্থাৎ চতুরালীর উপর এই প্রকাণ্ড ভাবতসাম্রাজ্য চলিতেছে। ৫০,০০০ হাজার ইংরাজ সৈন্য যে কেবল ২৫০০০০০০০ কোটী লোকের উপর চৌকি দিয়া থাকেন, তাহা নয়, তাহাদিগের তুল্য সুশিক্ষিত প্রায় সেইরূপ সুসজ্জিত ১৫০০০০ লক্ষ সিপাহির উপরও তাহাদিগের সতত সতর্ক দৃষ্টি আছে। ভাবতবর্ষের মধ্যে বঙ্গবাসীরাই ভীরু, নতুবা এই ভারতবর্ষ বীরপ্রসূ। পাঞ্জাবী রাজপুতের ন্যায় বীর জাতি ভূমণ্ডলে বিরল। কিন্তু এই একমুষ্টি ইংরাজ এই অসংখ্য বীরকে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছে। ইহার কারণ কি? ৫০০০০ সহস্র ইংরাজ ভারতবর্ষ রক্ষা করিতে সম্পূর্ণরূপে অসমর্থ এবং তাহারাও এই বীরজাতিদিগকে দমনে রাখিয়া রাজ্যের সর্ব্বত্র শান্তির বিস্তার করে নাই। কৌশলময় রাজনীতির গুণেই এই বিশাল সাম্রাজ্য শান্তিভোগ করিতেছে। প্রজাদিগকে বাক্যের স্বাধীনতা দান এক অদ্ভুত কুটিল কৌশল। ইহার সঙ্গে ইংরাজ গবর্ণমেন্টের বিষম স্বার্থ একসূত্রে আবদ্ধ রহিয়াছে। আমরা মন খুলিয়া মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারি, দেশীয় সংবাদপত্র কি ধনী কি প্রজা সকলেরই মনের কথা, তাহাদিগের আশা, তাহাদিগের অভাব এবং তাহাদিগের সুখ অসুখ প্রায় সমভাবে সর্ব্বদা গবর্ণমেন্টের কর্ণগোচর করিয়া থাকেন, গবর্ণমেণ্ট তদ্দ্বারা সতর্ক হইয়া রাজ্য করিতেছেন।

ইংরাজদিগের ইচ্ছা আমরা গবর্ণমেন্টের দোষগুণ বিচার না করিয়া সর্ব্বদা তাঁহার স্তোত্রপাঠ করি। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্ট এই স্বাধীনতা দান করিয়াছেন, তাহা হইলে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। আমাদিগের যখন যাহা অভাব হইতেছে, আমরা সুখে কি অসুখে আছি এবং যিনি যখন আমাদের উপর অত্যাচার বা উৎপীড়ন করিতেছেন আমরা সে সমস্তই নির্ভয়ে গবর্ণমেণ্টকে জানাইতেছি। গবর্ণমেণ্ট তদ্দ্বারা স্বদোষ সংশোধন এবং অত্যাচারীর দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন। কিন্তু আজ যদি আমাদিগের এই বাক্যের স্বাধীনতা অপহৃত হয়, আমরা নিরুদ্বেগে মনোভাব প্রকাশ করিতে পারিব না, আমাদের দুঃখ অভাব ও অত্যাচারীর উৎপীড়ন সমস্তই গোপন করিতে বাধ্য হইব। তখন সেই সন্তোষভাব

এই পঞ্চবিংশতি কোটী লোকের হৃদয়ে সংগৃহীত হইয়া অনবরত ঘূর্ণিত চালিত ও তরঙ্গিত হইতে থাকিবে। বিদেশীয় গবর্ণমেণ্ট এই অসংখ্য প্রজাবর্গের অবস্থা বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকিয়া সুচারুরূপে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে কখনই সমর্থ হইবেন না। প্রজা স্বাধীনভাবে রাজার কার্য্য পরম্পবায় পর্য্যালোচনা করিলে রাজাব বা রাজ্যের বিপদের সম্ভাবনা নাই ; কিন্তু প্রজা অসন্তুষ্ট হইয়া সেই অসন্তোষ হৃদয়মধ্যে নিহিত রাখিলে রাজার পদে পদে অনিষ্ট ঘটিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। যে রাজ্যের প্রজাবর্গ রাজার উপব অসন্তুষ্ট, সেই রাজাকে সর্ব্বদা শঙ্কিতভাবে দিন যাপন করিতে হয়। প্রজা অসন্তুষ্ট না হইলে রাজ্যে কখন রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হয় না। প্রজা অসন্তুষ্ট থাকাতেই ১৮৭১ সালের প্রুসীয় যুদ্ধে ফ্রান্স রাজ্যের পতন হয়। প্রজা সন্তুষ্ট থাকিলে বহিঃশত্রু কখন রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। প্রজার দুঃখের প্রতীকার হইলেই প্রজা সন্তুষ্ট, বাজা সেই দুঃখ জানিতে পারিলেই তাহার প্রতিবিধান করিতে সমর্থ হন। নতুবা সেই অসন্তোষ হৃদয়মধ্যে ঘূর্ণিত তরঙ্গিত ও চালিত হইয়া আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতেব ন্যায় পরিশেষে উড্ডীন হইয়া রাজ্য ধ্বংস করিয়া ফেলে। অতএব এই বিপদের প্রতিবন্ধক মহৌষধ স্বরূপ চতুর ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট প্রজাদিগকে বাক্যের স্বাধীনতা দিয়াছেন।

রাজনীতিজ্ঞ ইংবাজমাত্রেই এই স্বাধীনতাদানেব নিগূঢ় মর্ম্ম অবগত আছেন। তাঁহারা জানেন এই স্বাধীনতা প্রজার নিকট হইতে অপহরণ করিলে রাজ্যের মঙ্গল নাই। কন্সারবেটিব সম্প্রদায় অবিমৃষ্যকারিতার বশবর্ত্তী হইযা ৯ আইন বিধিবদ্ধ করিলে ভারতবাসী তীব্রনাদে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিল। তাই বলিয়া কি সেই মহা অনিষ্টকর ইংরেজ-জাতির কলঙ্কস্বরূপ আইনটী রহিত করা হইয়াছে ? তাহা নয়। আমরা যত কেন রোদন করি না, যত কেন চীৎকাব করি না, যত কেন আন্দোলন করি না, স্বার্থ না থাকিলে বা স্বার্থের বিঘ্ন ঘটিলে গবর্ণমেণ্ট কোন কাজ করেন না।

উদার সম্প্রদায় আইন মাত্রই উত্তমরূপে বুঝিযাছিলেন, কালে ইহাতে মহা অনিষ্ট ঘটিবে, এই গর্হিত বিধি বিধিবদ্ধ করিয়া লড লিটন যারপর নাই অবিমৃষ্যকারিতা প্রকাশ করিয়াছেন। তখন ক্ষমতা ছিল না, এক্ষণে ক্ষমতা পাইয়া তাঁহারা উক্ত আইন রহিত এবং ভারতবাসীকে পুনর্ব্বার পূর্ব্ব স্বাধীনতা প্রত্যর্পণ করিয়াছেন।

পাওনিয়র আর একস্থলে বলেন "বাঙ্গালীদিগকে উচ্চশিক্ষাদান করিয়া গবর্ণমেণ্ট জুনিয়স হ্যাম্পডেন প্রভৃতির ন্যায় রাজদ্রোহী করিয়া তুলিয়াছেন" বাঙ্গালীগণ বিদ্যাবলে এক্ষণে ন্যায় অন্যায় বিচার করিতে পারেন। সুতরাং গবর্ণমেণ্ট কোন অন্যায় কার্য্য করিলে তাঁহারা তাহার প্রতিবাদ এবং বিচার করিয়া থাকেন। বিদ্যা শিখিয়া বঙ্গবাসী সভ্য ও জ্ঞানী হইয়াছেন। তাঁহারা ইংরাজের দোষ ধরিয়া দেন এবং গুণের প্রশংসা করেন। বঙ্গবাসী-মাত্রেই ইংরাজের পক্ষপাতী। কিন্তু পঞ্জাবী প্রভৃতি উত্তর পশ্চিম প্রদেশস্থ অসভ্য মূর্খ জাতিরা কিরূপ ভয়ঙ্কর বিবেচনা করিয়া দেখিলে পাওনিয়র উচ্চশিক্ষার বিরুদ্ধে কোন কথা মুখে আনিতেন না। জিজ্ঞাসা করি, মূর্খ হইয়া বাঙ্গালীরা এক একজন সের আলি এবং

আমির খাঁ হয়, ইহা বাঞ্ছনীয়? শিক্ষিত হইতে না অশিক্ষিত হইতে বিদ্রোহের অধিক আশঙ্কা? কুমার সিং যে বিদ্রোহী হইয়াছিল, সে শিক্ষিত না অশিক্ষিত? আমরা শুনিয়াছি, নানা সাহেব অৰ্দ্ধশিক্ষিত। অৰ্দ্ধশিক্ষা বড় ভয়ঙ্কর পদার্থ, তাহা হইতে যে বিপদ না ঘটে, এমন বিপদ নাই। যাহারা সুশিক্ষিত হয়, তাহাদের অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা থাকে, তাহারা সহসা কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। ফলতঃ প্রজা সভ্য ও বিদ্বান হইলে রাজ্যের অমঙ্গল হয়, এরূপ বিবেচনা করা বিষম ভ্রম সন্দেহ নাই।

উপসংহারকালে আমাদের বক্তব্য এই ইংরাজেরা চটেন বলিয়া কি আমরা স্বাধীনভাবে সকল বিষয়ের গুণ দোষ বিচারে বিরত হইব? তাহা হইলে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা লাভে ফল কি? সকল বিষয়ের বিচার ধীর স্থির নম্র ও বিনীতভাবে করা কর্ত্তব্য। কেবল কতকগুলি কটুবাক্য প্রয়োগ না করিয়া যুক্তি দ্বারা প্রস্তাবিত বিষয়ের গুণ দোষ পরীক্ষা করিলে কোন কথা জন্মে না। বোধহয়, ভদ্র ইংরাজেরা ইহাতে বিরক্ত হন না। তবে যাঁহাদের মন উগ্র, শোণিত উষ্ণ, একটী দোষের কথা শুনিলে গাত্রে শেল বিদ্ধ হয়, তাঁহারা চটেন চটুন, তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। আমাদের গবর্ণমেণ্ট তাহাতে বিরক্ত হইবেন না। বিনীতরূপে স্বাধীনভাবে রাজনীতির পর্য্যালোচনার্থই গবর্ণমেণ্ট মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা দান করিয়াছেন।

সেদিন লর্ড রিপণ ভারত মিত্রের অধ্যক্ষের প্রদত্ত অভিনন্দন পত্রের প্রত্যুত্তরে গবর্ণমেণ্ট এদেশীয় সমাচারপত্রের অধ্যক্ষ ও সম্পাদকদিগকে বিশ্বাস করিয়া মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারা সে বিশ্বাস বিরুদ্ধ কার্য্য না করেন, এ আভাস প্রকাশ করিয়াছেন। কেবল যে বিদ্রোহসূচক প্রস্তাব লিখিলেই বিশ্বাস ভঙ্গ হইবে এরূপ অভিপ্রেত নয়, যে কারণে ৯ আইনের সৃষ্টি হইয়াছিল, সে কারণটী নিরাকৃত না হইলেও বিশ্বাস ভঙ্গ করা হইবে। সে কারণ কি? আমরা তাহা পুর্ব্বেই বলিয়াছি। তীব্র ও উগ্রভাবে রাজনীতির পর্য্যালোচনাই সেই কারণ। যেরূপে ৯ আইনের রহিত করা হইয়াছে, তদ্দারা আমাদের আর একটী শিক্ষাও হইতেছে। লিবারাল দল ইংলণ্ডীয় পার্লামেণ্টের অধিনায়কতাপদে অধিষ্ঠিত হইয়াই আইনটী রহিত করিবার অভিলাষ করেন। কিন্তু ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট প্রায় দুই বৎসরকাল অপেক্ষা করিলেন। এতদ্বারা ইহাই সকলকে জানাইয়া দেওয়া হইল, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের মত ব্যতিরেকে কেহ ইংলণ্ডে জানাইয়া কোন বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অনুগত থাকিয়া স্বাভীষ্ট সাধন করিতে হইবে।

মিউনিসিপাল সভা। ২০ ভাদ্র ১২৯৮। ৪২ সংখ্যা

চতুর্দ্দিকে মিউনিসিপাল সভার ধুম বাঁধিয়া গিয়াছে। আজ বালি উত্তর-

পাড়ায়, কাল ঢাকায়, পরশ্বঃ রাণীগঞ্জে ইত্যাদি নানাস্থানে মিউনিসিপাল সভা হইতেছে। লর্ড রিপণ বাহাদুর ক্ষেপার দল কি ক্ষেপাইয়াছেন ? হরা দৌড়িল তাহার পিছনে নরা দৌড়িল, দেখাদেখি রামাও দৌড়িল। ইহারা কেহ কি কিছু বুঝেন না? ইহারা কি বাস্তবিক ক্ষেপার দল? তাহা নয়। আমাদের মহোদার প্রকৃতি গবর্ণর জেনেরল ও লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর মহোদয়ের উদার ব্যবহার ও সদয় কার্য্য দেখিয়া সকলে আনন্দে সোন্মাদ ব্যবহার দ্বারা আমরা প্রধানরূপে দুটী বিষয় জানিতে পারিতেছি। প্রথম, পূর্ব্বগত রাজ পুরুষেরা স্ক্রু আঁটিয়া কাজ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা প্রজাকে এক দিনের জন্য বিশ্বাস করেন নাই। প্রজাকে মুঠার ভিতর রাখিয়া রাজ্য করিবেন এই দুর্নীতিপরায়ণ ছিলেন। প্রজারাও তাঁহাদের অধিকারে নিমেষকালের নিমিত্ত সুখী ও সন্তুষ্ট হন নাই। আমবা দেখিতেছি, প্রজার মন দিন দিন স্বাধীনতাপ্রিয় হইতেছে। সেই মনকে নিগডবদ্ধ করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলে সে কি আলানবদ্ধ হস্তির ন্যায় দারুণ কষ্ট অনুভব করে না? তাহাকে মুক্ত করিয়া দিলে কি সে আনন্দসাগরে নিমগ্ন হয় না? আমাদের মহানুভব গবর্ণর জেনরল সেই দৃঢবদ্ধ প্রজার মনকে বন্ধন মুক্ত করিয়া দিয়াছেন, আর কি আহ্লাদ ধরে? তাই তাঁহারা ক্ষেপিয়া উঠিয়াছেন, বাস্তবিক ক্ষেপা নন।

প্রজারা এমনি দৃঢবন্ধনে বদ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদের হাত পা নাডিবার যো ছিল না, পার্শ্বপরিবর্ত্তনের উপায় ছিল না। এ বন্ধনের স্বরূপটী কি, মিউনিসিপালিটী বিষয়টীর প্রসঙ্গ করিলেই পরিস্ফুট ও বিশদ হইয়া উঠিবে। মিউনিসিপালিটী পদার্থ কি? ইহা আর কিছু নয়, ইহা রূপান্তরিত পঞ্চায়েত-প্রথা। পঞ্চায়েত-প্রথা আর কিছু নয়, গ্রামের বা নগরের পাঁচ জনে মিলিয়া আপনাদের হিতার্থ যে যে কাজ করা কর্ত্তব্য, তাহা করা। ভারতের সকলস্থানেই পূর্ব্বে পঞ্চায়েত-প্রথা ছিল, ইংরাজদিগের এ দেশে অধিকার হইলে তাঁহারা পঞ্চায়েতকে দেশী সামগ্রী বলিয়া ইহার প্রতি উপেক্ষা করিলেন, ইহার গুণ গ্রহণ করিলেন না, ইহার আংশিক দোষ দর্শন করিয়া ইহার প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করিলেন, ইহা ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইল। আমরা প্রকৃতপ্রস্তাব পঞ্চায়েত দেখি নাই, তথাপি যা দেখিয়াছি, তাহাতে আমাদের এখন বেশ বোধ হইতেছে, এটা বড স্থখের ও হিতের সামগ্রী। আমরা দেখিয়াছি, প্রতিবেশী প্রতিবেশীতে এক হাত জায়গা লইয়া বিবাদ করিল, গালাগালি ও মারামারি করিল, গ্রামের পাঁচ জন প্রধান লোকে মধ্যবর্ত্তী হইয়া তাহার মীমাংসা করিয়া দিলেন। কাহার এক পয়সা ব্যয় হইল না নাকাল হইল না, কেবল পিঠের উপর দিয়া গেল। দুদিন পরে উভয়ের মিল হইল, এখন আদালত সেই পঞ্চায়েতের অধিকার হরণ করিয়াছেন, এখন এক হস্ত ভূমির নিমিত্ত পাঁচ শত টাকা ব্যয় হইতেছে, বাদী প্রতিবাদী উৎসন্ন যাইতেছে, নাকালের শেষ হইতেছে; চিরকালের নিমিত্ত প্রতিবাসিদিগের পরস্পর ঘোর শত্রুতা জন্মিতেছে। আদালতে গেলে যে কেন উৎসন্ন যাইতে হয়, নাকালের শেষ হয়, পাঠক! তবে তাহার দুই একটী

কারণ বলি শুনুন। আদালতের মশা মাছিটা পর্য্যন্ত পয়সার প্রয়াসী। বোধ হয় যেন আদালত মুখ ব্যাদান করিয়া রহিয়াছে, অর্থী প্রত্যর্থী গেলেই গিলিয়া ফেলিবে। বাদি প্রতিবাদির মাংসময় শরীর গ্রাস করে না বটে, কিন্তু অর্থময় শরীর সম্পূর্ণ গ্রাস করিয়া ফেলে। আদালতের নাম ধর্ম্মাধিকরণ, কিন্তু এমন অধর্ম্ম স্থান আর নাই। পিতামাতা সোহাগ করিয়া অঙ্গার প্রতিযোগী কৃষ্ণাবরণ পুত্রের নাম যেমন পুর্ণচন্দ্র রাখে, এ নামটীও সেইরূপ হইয়াছে। আদালতে কেবল অর্থহানি মানহানি ও সময়হানি নয়, অতি নীচ ভাবে পেয়াদা অবধি হাকিম পর্য্যন্ত সকলের খোসামোদ করিতে হয়। পেয়াদা সমন আনিলেন, তিনি বকসিস চাহিলেন, তাঁহার চিত্ত পরিতোষার্থ কিছু দিতে হইল, না দিলে তিনি রুষ্ট হইয়া রিপোর্ট দিলেন, সাক্ষী বাটীতে নাই, তোমার মকদ্দমা নষ্ট হইয়া গেল। যাঁহাদের হাতে মকদ্দমার কাগজ পত্র থাকে, তাহাদের যদি খোসামোদ ও পূজা না কর, শীঘ্র কাজ পাইবে না। সুতরাং খোসামোদ করিতে হয়। এত গেল সামান্য নাকাল, তাহার পর শুনুন। অর্থব্যয় করিয়া সাক্ষি প্রভৃতি লইয়া ধার্য্য দিনে গিয়া আদালতে উপস্থিত হইলে। তীর্থকাকের ন্যায় হাকিমের মুখ তাকাইয়া রহিলে, শ্রীমুখ তখন মকদ্দমায় ব্যস্ত, তাঁহার অবসর হইল না, তুমি সাক্ষিসমেত ফিরিয়া আসিলে। এইরূপ চারি পাঁচ দিন ফিরিয়া ফিরিয়া মকদ্দমা হইল। মকদ্দমার বিচার মাথামুণ্ড হইল। নিম্ন আদালত এক প্রকার হুকুম দিলেন, জজ আদালতে আপীল এক প্রকার হইল, শেষে হাইকোর্টে গিয়া অন্যরূপ হইল।···

পঞ্চায়েত উঠিয়া যাওয়াতে যে কেমন বিপদ ঘটিয়াছে, আমরা যে কেমন উৎপাতগ্রস্ত হইয়াছি পাঠক তাহা বুঝিতে পারিলেন। সেই মহোপকারী পঞ্চায়েত প্রথা আমাদের সমাজে পুনঃ প্রবিষ্ট হয়, ইহা কি প্রার্থনীয় নয়? সহস্রগুণে প্রার্থনীয়। পঞ্চায়েত প্রথা দেশের প্রয়োজন সম্ভূত, আমাদের অবস্থার অনুকূল, মহা বুদ্ধি প্রসূত। অতএব উহা লুপ্ত হইবার নহে। উহা ইংরাজ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া মিউনিসিপালিটীরূপে পুনরায় ভারতে অবতীর্ণ হইয়াছে। কিন্তু পঞ্চায়েত আমাদের দেশের বস্তু, সেই দেশীয় ভাবে এত দিন ইহা সমাজমধ্যে প্রবিষ্ট হয় নাই। এই নিমিত্ত ইহা হইতে আমাদের আশানুরূপ শ্রেয়োলাভ হয় নাই। এত দিন ইহার কার্য্য যেরূপে চলিয়া আসিয়াছে, তাহা দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হইত, এটী যেন গবর্ণমেণ্টের অর্থোপার্জ্জনের একটী উপায় স্বরূপ ছিল। মিউনিসিপাল টাক্স-গুলিকে বাব বলিয়া স্পষ্ট উপলব্ধি হইত। গবর্ণমেণ্ট মিউনিসিপাল আয়ের আট দশ আনা পুলিসের নামে গ্রাস করিতেন; দুই তিন আনা কর্ম্মচারীরা উদরসাৎ করিতেন, কোথায় দুই এক আনা, কোথায় দুই এক পাই, দেশের মঙ্গলার্থ ব্যয়িত হইত। আমাদের এই ক্ষুদ্র গ্রামে ৮ বৎসর হইল মিউনিসিপালিটী হইয়াছে,

আমরা বৎসর বৎসর ২০০ টাকা করিয়া ট্যাক্স দিয়াছি, মোটে যোল আনা শত শত টাকা দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু এই ৮ বৎসরের মধ্যে আমাদের গ্রামের মঙ্গলার্থ ৮১ টাকা মাত্র ব্যয় করা হইয়াছে! এতদিন এরূপ হওয়া অসঙ্গত হয় নাই কারণ যিনি চেয়ারম্যান, তিনি রাজকর্ম্মচারী, তিনি বিদেশীয়। তিনি আমাদের অবস্থা কিছুই জানিতেন না, আমাদের কি অভাব কি কষ্ট তাহার তত্ত্ব লইতেন না; আমাদের দুঃখে তাঁহার দুঃখ-জ্ঞান ছিল না। তিনি সকল বিষয়েই উদাসীন ছিলেন। কমিটির দিনে তিনি কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায়, মাটির মুবদের ন্যায় চৌকি জোডা করিয়া বসিয়া থাকিতেন, শেষে একটা নাম স্বাক্ষর করিযা চলিয়া যাইতেন। যাঁহারা ভাইস চেয়ারম্যান ও কমিশনর হইতেন, তাঁহারা কতকগুলি যে আড্ডা লইয়া কমিটিতে বসিতেন, সভাপতির চিত্তরঞ্জন করিয়া চলিয়া আসিতেন। স্নতরাং দেশের কিছুই মঙ্গল হইত না। মহানুভব লর্ড রিপণ বাহাদুর এই বিষময় মহা বৃক্ষের উৎপাটন করিয়া তথায় মঙ্গলময় বৃক্ষ বোপণ করিতেছেন, তাই দেশমধ্যে আনন্দ স্রোত প্রবাহিত, তাই ত হুলস্থুল পড়িয়াছে। লর্ড বিপণ বাহাদুরকে এবং লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর রিভর্স টমসন সাহেবকে হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছেন।

মিউনিসিপালিটী। ৩ আশ্বিন ১২৮৯। ৪৪ সংখ্যা

যে মিউনিসিপালিটীতে গ্রাম ও নগরের সৌষ্ঠব ও স্বাস্থ্যের উপায় বিধান নাই, সে মিউনিসিপালিটী মিউনিসিপালিটীই নয। লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে নানা প্রকাব রোগ আসিযা উপস্থিত হয। তন্নিবাবণের একমাত্র উপায় মিউনিসিপাল বন্দোবস্ত। ইহা বহুবার পরীক্ষিত হইয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে, অতএব এ বিষয় আর নূতন প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাওযা বিফল। দুঃখের বিষয় এই, অধিকাংশ মিউনিসিপালিটীতে স্বাস্থ্যের ও গ্রাম নগরাদির সৌষ্ঠবের সংবিধান নাই। স্নতবাং ম্যালেরিয়া সে সকল স্থানকে পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকে না। এতদিন মিউনিসিপাল কমিশনরদিগকে ম্যালেরিয়ার এই গাঢ প্রণয়ণের কথা জানাইলে তাঁহারা বলিতেন, আমরা কি করিব, আমাদের অপরাধ কি, পুলিসে মিউনিসিপাল আয়েব অধিকাংশ গ্রাস করিয়া ফেলে, আমরা কিরূপে নগব ও গ্রামবাসিদিগের স্বাস্থ্যের উপায় বিধান করিব। কমিশনরেরা যে কেমন কাজের লোক, বোধ হয়, এতদ্দ্বারা পাঠক তাহা বুঝিতে পারিতেছেন। যে ব্যক্তি বলে "আমি কি করি, আমার অপরাধ কি" তাহার তুল্য অপদার্থ দ্বিতীয় নাই। কমিশনরেরা যদি কাজেব লোক হইতেন, পুলিসের ব্যয় গ্রহণের প্রতিবাদ করিতেন। আমাদের গবর্ণমেণ্টের নিকটে যাঁহারা ন্যায়সঙ্গত যুক্তি প্রদর্শন করিয়া প্রতিবাদ করিতে পারেন, তাঁহারাই কৃতকার্য্য হন।

আমাদের বর্ত্তমান দয়ালু গবর্ণর জেনরল মিউনিসিপাল সম্বন্ধে স্বাধীনতা প্রদান করিতেছেন এবং গ্রাম ও নগরবাসিদিগকে আপনাদের চেয়ারম্যান, সহকারী চেয়ারম্যান ও কমিশনর নিযুক্ত করিতে বলিতেছেন, কিন্তু ওদিকে অনেকে এই ভয় প্রদর্শন করিতেছেন, বিদ্যালয় ও ডাক্তারখানার ব্যয় মিউনিসিপালিটীর স্কন্ধে নিক্ষিপ্ত হইবে। যদি বাস্তবিক তাহা হয়, ঈশপ যে লিখিয়াছেন "মৃগ ব্যাধের ভয়ে পলাইয়া বাঘের গর্ত্তে প্রবেশ করিল" তাহাই কার্য্যে ঘটিয়া উঠিবে, পুলিসের অপেক্ষা বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয়ের উদর বড়। মিউনিসিপাল সমুদায় আয় দিলেও সে প্রশস্ত উদর পুর্ণ হওয়া ভার হইবে। শত শত উষ্ট্র হস্তী কুম্ভকর্ণের উদরের এককোণে পড়িয়া থাকিত। বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয়ে যদি সমুদায় আয় খাইয়া ফেলে, তাহা হইলে গ্রাম নগরাদি যে অবস্থা, সেই অবস্থা থাকিবে। ম্যালেরিয়া এখন যেমন রাঙ্গা ভেরেণ্ডা ও কচুগাছে অধিষ্ঠান কবিয়া বিরাজ করিতেছে, তখনও তেমনি করিবে। পবনদেব এখন পুতিগন্ধ গাত্রে মর্দ্দন করিয়া ইতস্ততঃ বিচবণ করিতেছে, তখনও তেমনি পাইবে, যদি বাস্তবিক এরূপ শোচনীয় অবস্থা ঘটে, তাহা হইলে এদেশীয়দিগকে মিউনিসিপালিটী সম্বন্ধে স্বাধীনতা দিয়া কি ইষ্টলাভ হইবে? এখন প্রশ্ন এই, যদি মিউনিসিপাল আয় হইতে বিদ্যালয়ে ও চিকিৎসালয়ে টাকা দিতে হয়, গ্রামনগরাদির স্বাস্থ্যের ও সৌষ্ঠবের বিঘ্ন করিয়া কি দিতে হইবে? আমাদের ত এমন বোধ হয় না। যদি রাজপুরুষেবা বিশেষ বিবেচনা না করিয়া সে ব্যবস্থা করেন, তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেই তাঁহারা বুঝিবেন। স্বাস্থ্য ও সৌষ্ঠবেব উপায় বিধান করিয়া যদি অর্থ উদ্বৃত্ত হয়, বিদ্যালয়ে ও চিকিৎসালয়ে দিবার আপত্তি? গ্রামনগবাদিগকে স্বাস্থ্যকর করিয়া তুলিতে পারিলে তখন চিকিৎসালয়ে ব্যয় করিবার কি প্রয়োজন হইবে? মিউনিসিপাল আয় হইতে বিদ্যালয়ে টাকা দিবারও বিশেষ প্রয়োজন হইবে না। বিদ্যালয়ের বালক সকল যদি সুস্থ থাকে, নিত্য ঔষধ ও ডাক্তারের ব্যয় যদি না হয়, সুস্থ শরীরে থাকিয়া স্বল্প দিনের মধ্যে যদি অধিক লেখা পড়া শিখিতে পারে, বেতন বলিযা বিদ্যালয়ে কিছু অধিক দিতে কাতর হইবে না। তাহা হইলে বিদ্যালয়গুলি স্বপোষণক্ষম হইয়া উঠিবে। তখন আর বিদ্যালয়গুলি মিউনিসিপালিটীর গলগহ হইবে না।

আমরা শুনিয়া বড় দুঃখিত হইলাম, অনেক কাপুরুষ মহানুভব লর্ড রিপণ বাহাদুরের অভিপ্রেত সিদ্ধির বিঘ্ন জন্মাইবার চেষ্টা পাইতেছেন। তাহাদের সে চেষ্টা বিস্ময়করী নহে। যদি কোন ভীরু ব্যক্তিকে পর্বতে অধিরোহিত করিবার চেষ্টা করা হয়, শৈলশিখরে যে বহুমূল্য প্রস্তর পাওয়া যায়, সে যদি অনুমানের চক্ষে তাহা না দেখিয়া কেবল ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি দর্শন করে, তাহা বিস্ময়াবহ হয় না।...

এস্থলে আর একটী বিষয়ের প্রসঙ্গ করা আবশ্যক হইয়া উঠিল। বোধ হয়, পাঠকগণের স্মরণ হয়, আমরা পুর্ব্বে লিখিয়াছিলাম, মিউনিসিপালিটী আর কিছু নয়,

পঞ্চায়েতপ্রথা। পঞ্চায়েত প্রথাও আর কিছু নয়, পাঁচ জন মিলিয়া করা। পূর্ব্বে এই প্রথা থাকাতে অতি সুখের বিষয় ছিল। এখন সে প্রথা উঠিয়া যাওয়াতে লোকে কথায় কথায় আদালতে যায়, আদালতে গিয়া উৎসন্ন হইয়া থাকে। এস্থলে কেহ কেহ এই আপত্তির উত্থাপন করিয়া থাকেন, গবর্ণমেণ্ট আমাদের হস্তে মিউনিসিপালিটীর ভার দিয়া আদালতের কর্ত্তব্য কার্য্যের ভার সমর্পণ করিতেছেন না। এই অকিঞ্চিৎকর আপত্তির খণ্ডনার্থ আমরা বলি, যুগপৎ সমুদায় বিষয়ের ভারার্পণ না করিলে কি পঞ্চায়েত শব্দের অর্থ বিফল হইয়া যায়? গবর্ণমেণ্ট যে সে বিষয়ের ভারার্পণ করিবেন, দেশের পাঁচ জনে মিলিয়া সেই সেই কর্ম্ম করা কি সুখের নয়? আমাদের দেশের বিচার কার্য্যের ভার আমাদের হস্তে অর্পণ করা গবর্ণমেণ্টের অনভিপ্রেতও নহে। অনেক স্থলে ত ফৌজদারী বিচার কার্য্যের ভার অর্পিত হইয়াছে। দেওয়ানী বিচার কার্য্য অতি জটিল। তাহাতে আইনজ্ঞান, শাস্ত্রজ্ঞান, দেশাচারজ্ঞান প্রভৃতি অনেক বিষয়ের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কিন্তু তাহার সম্ভাব যদি মিউনিসিপাল কমিশনরগণ মধ্যে সম্ভাবিত হয়, এবং তাহাদের তাদৃশ বহু সময়ক্ষেপী বিচারকার্য্য সম্পাদন করিবার অবসর হয়, আমাদের গবর্ণমেণ্ট সে ভাবের সমর্পণেও অসম্মত হন না। মিউনিসিপাল কমিশনরেরা যদি রাগদ্বেষবিবর্জ্জিত হইয়া ন্যায় ও আইন অনুসারে যথাবিধি দেওয়ানী বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, তাহা অনেক বেতনভুক বিচার-পতির বিচার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হয়, সন্দেহ নাই। আপীলেরও এত স্রোত প্রবাহিত হয় না। কারণ, কমিশনরেরা দেশের লোক। তাঁহারা দেশের অবস্থা জানেন। বিবাদের প্রকৃত মূল তাহাদিগের অবিদিত থাকে না। সুতরাং তাঁহাদের কৃত বিচার যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে, তাহা আশ্চর্য্যের নহে।

বেতনভুক বিচারপতিদিগের কৃত বিচার কেমন বিড়ম্বনাময়, নিম্নলিখিত বাক্যগুলি দ্বারা তাহা সুন্দররূপে চিত্রিত হইবে। বোধ কর, একজন দেওয়ানী বিচারপতির নিকটে একটী মকদ্দমা উপস্থিত হইল। উভয় পক্ষই স্বাভিপ্রেত বিষয় সপ্রমাণ করিল। বিচারপতি হতবুদ্ধি হইয়া রহিলেন। নাবিক ঘোর রজনীতে তুফানে পড়িলে যেমন হাবুডুবু খায়, বিচারপতি তেমনি হাবুডুবু খাইলেন। উকীলেরা তাঁহাকে আরো চাপিয়া ধরিলেন। তিনি নিতান্ত বিভ্রান্ত হইয়া প্রকৃত বিষয়টী স্থির করিতে পারিলেন না। তবে যদি বিচারপতি বহুদর্শী বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ হন, তিনি নিজ বুদ্ধিবলে অনেকটা ঠিক করিতে পারেন. কিন্তু যাঁহারা সবে পরের মাথা কাটিয়া বিচার শিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহারা ত সকলেই অন্ধকার দেখেন, নিষ্পত্তিও অন্ধকারময় হয়। তাহাতেই ত আপীলের এত ঘটা।

বেতনভুক বিচারপতিদিগের বুদ্ধিরও বিষম বিপরীত গতি। একজন যে দলিলের যে অর্থ করিয়া যেরূপ নিষ্পত্তি করিলেন, আর একজন তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত

করিলেন। তৃতীয় ব্যক্তির নিকটে "মরারে তৃতীয়ঃ পন্থা:" হইয়া উঠিল। শীত, গ্রীষ্মে, ক্রোধ, লোভে, শুক্ল কৃষ্ণেই চির বিরোধ আছে। তদ্দর্শনে আমরা বিস্মিত হই না, কিন্তু সম্প্রতি বিচারে বিচারে ঘোর বিরোধ দেখিয়া আমরা হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছি। একখানি পাট্টায় জমির কমী বেশী সরত আছে; অমুক সনে জমি মাপিয়া তোমাকে বুঝাইয়া দিব লেখা আছে। জমিদার তদনুরূপ কার্য্য করিলেন। জমিদারে প্রজায় মকদ্দমা উপস্থিত হইল। বিচারপতি বলিলেন, জমিদার পাট্টার সরত মত কাজ করেন নাই। অতএব মকদ্দমা ডিসমিস হইল কিন্তু ঠিক সেইরূপ স্থলে অপর বিচারপতি তাহার খরচা দেখাইলেন না। এইরূপ প্রতিদিন শত শত বিচার বিরোধ উপস্থিত হইতেছে। অন্য প্রমাণ আর কি দেওয়া হইবে, এক মুল্লুক চাঁদের মকদ্দমা সমুদায় বিচার-চাঁদকে মলিন করিয়া দিয়াছে। এই মুল্লুক চাঁদ ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলে, সে আবার হাসিতে হাসিতে বাটীতে চলিয়া গেল। কিন্তু স্থানীয় লোকে বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিলে এরূপ ঘটনার সম্ভাবনা অল্প হয়।

কলিকাতা টাউন হলের রাক্ষসী সভা। ২২ ফাল্গুন ১২৮৯। ১৬ সংখ্যা

সভার রাক্ষসী বিশেষণ দেওয়াতে পাঠক কি এই ভাবিতেছেন কুম্ভকর্ণ অতিকায় প্রভৃতি যে সকল রাক্ষস নর বানর হয় হস্তি প্রভৃতিকে আস্ত গিলিয়া ফেলিত, এটী তাহাদিগের সভা আমরা এই কথা বলিতেছি। তাহা নয়। যে সকল ইউরোপীয় ন্যায় ও কর্ত্তব্যজ্ঞানকে আস্ত গিলিয়া ফেলেন, এটী তাঁহাদিগের সভা। এই নিমিত্ত আমরা ইহাকে রাক্ষসী সভা বলিলাম। অনরেবল ইলবর্ট সাহেব ফৌজদারী কার্য্যবিধির যে সংশোধন প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদার্থ এই সভার সৃষ্টি। আমার সভার রচনাকাণ্ডে একটা বড় কৌতুককর বিষয় দেখিলাম। কাকেরা ময়ূরের পক্ষ ধারণ করিয়া ময়ূরেরদলে প্রবেশ করিয়াছে। ইউরোপীয়েরাও এই সুযোগে চাঁদ ধরিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। তাঁহারাও ইংরাজের সহিত মিলিত হইয়া ভারতবিজেতা বলিয়া অভিমানে স্ফীত হইয়া উঠিয়াছেন। আমরা কৌতুক-কর গল্পে শুনিতাম "মোদের বিলাত।" ইউরোপীয়েরা উক্ত সভায় প্রবিষ্ট হইয়া আমাদিগকে সেইটী দেখাইলেন ইংলণ্ড তাঁহাদের জন্মভূমি হইল! তাঁহারা ভারতবিজেতা হইলেন! সুতরাং তাঁহাদেরও একটী প্রাচীন স্বত্বের অভিমান জন্মিল কিন্তু এ স্থলে আমাদের জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা জন্মিতেছে, এ স্বত্ব তাঁহাদিগকে কে দিল? তাঁহারা কিরূপে পাইলেন? এটী কি তাঁহাদিগের পৈতৃক স্বত্ব? পাঠক প্রথমে সভার প্রতিজ্ঞাটী শুনুন।

"ফৌজদারী আইনের সংশোধনার্থ যে পাণ্ডুলেখ্য করা হইয়াছে, সভার মতে ন্যায়ের

গৌরব রক্ষার্থ তাহা অনাবশ্যক। শাসনকার্য্যে এমন কোন সঙ্কট উপস্থিত হয় নাই যে এই আইন করিতে হয়। কোন বিশুদ্ধ যুক্তি অবলম্বন করিয়া এই আইনটী করা হইতেছে না, ইহাতে আইনকর্ত্তাদিগের বহুদশিতাও প্রকাশ পাইতেছে না। ব্রিটিশ প্রজারা যে স্বত্বকে বহুমূল্য জ্ঞান করেন, এবং বহুকাল হইতে যে স্বত্ব ভোগ করিয়া আসিতেছেন এই আইন তাহার উচ্ছেদ করিতেছে। এতদ্দ্বারা ব্রিটিশ প্রজাদিগের স্বাধীনতার উচ্ছেদ হইতেছে, কিন্তু এদেশীয়দিগের রক্ষার বিশেষ উপায় হইতেছে না। মফস্বলে যে সকল ইউরোপীয় স্ত্রী পুত্রাদি লইয়া আছে, তাহাদিগের মনে বিপদ ঘটিবার ও নির্ব্বিঘ্নে থাকিবার আশঙ্কা জন্মিবে। সুতরাং এই আইনে তাঁহাদিগকে মূলধনের বিনিয়োগে নিরুৎসাহিত করিবে। ১৮৫৭ অব্দের বিদ্রোহের পর অবধি পরস্পর জাতির মনে যে বিদ্বেষ ও ঈর্ষ্যাভাবের উদ্রেক হয় নাই, এই আইনে তাহা উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছেন।"

এই প্রতিজ্ঞায় যে বাক্যগুলি উপন্যস্ত হইয়াছে, তাহার কিছু সারবত্তা আছে কি না একৈকক্রমে বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক হইল। প্রথমে বলা হইয়াছে এই আইনে ন্যায়ের গৌরব রক্ষার কোন উপযোগিতা নাই। পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখুন, এই বাক্যটী কেমন অসার। ইলবার্ট সাহেব বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন ক্রমে ন্যায় সংস্থাপনই ফৌজদারী কার্য্যবিধির সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন। এক শ্রেণীর বিচারপতি এক শ্রেণীর লোকের বিচার করিতে পারিবেন তৎসমকক্ষ পদস্থ অপর বিচারপতি সে শ্রেণীর অপরাধের বিচার করিতে পারিবেন না ইহার তুল্য অন্যায় আর কি আছে? শেষোক্ত বিচারপতি-দিগকে যদি তুল্যরূপে সকল শ্রেণীর বিচারকার্য্য করিতে না দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে বিচারাসনে প্রতিষ্ঠিত করা কেন? তবে একপ্রকার বলা হইতেছে, তাঁহারা বিচারকার্য্যের অযোগ্য। যাঁহারা বিচারকার্য্যের অযোগ্য তাঁহাদিগের হস্তে কোন শ্রেণীর বিচারভার দেওয়া কি উচিত? আমাদের গবর্ণমেণ্ট তবে ত অন্যায়কারী। গবর্ণমেণ্ট সেই অন্যায়কারিতা-দোষের নিবারণার্থ এই উদ্যোগ করিয়াছেন। তাহা যদি হইল তাহা হইলে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে ন্যায় সংস্থাপনার্থই গবর্ণমেণ্ট চেষ্টা পাইতেছেন। তবে যে রাক্ষসী সভা বলিতেছেন, ন্যায়ের গৌরব রক্ষার্থ উক্ত আইনের পাণ্ডুলেখ্যের প্রয়োজন নাই তাহা কিরূপে সঙ্গত হইতেছে? উক্ত আইনটী বিধিবদ্ধ হইলে তবে একটী বৃহৎ অন্যায়ের নিবারণ হইবে। সে অন্যায়টী এই, শ্রেণীগত আইনের বিধান। এক শ্রেণীর নিমিত্ত একরূপ আইন অপর শ্রেণীর নিমিত্ত অপরবিধ আইন, ইহা কি উনবিংশ শতাব্দীতে এই উদার গবর্ণমেণ্টের অধিকারে শোভা পায়? ইহা যদি শোভা পায় তাহা হইলে যে জাতি উচ্চ শ্রেণীর নিমিত্ত এক প্রকার আইন অপর শ্রেণীর নিমিত্ত অপর প্রকার আইনের সৃষ্টি করিয়া রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, সেই জাতি এখন অসভ্য বলিয়া উপহসিত হন কেন?

দ্বিতীয়, সভা বলিয়াছেন আইনটী বিধিবদ্ধ হইলে এদেশীয়দিগের কোন উপকার নাই। কিন্তু আমরা দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, মহৎ উপকার আছে। এ দেশীয় বিচারপতির

নিকটে ইউরোপীয়দিগের অপরাধের বিচার হয় না বলিয়া মফস্বলে ইউরোপীয়েরা শৃগাল কুক্কুরের ন্যায় এদেশীয়দিগের প্রাণবধ করে। তাহার বিচার হয় না, দণ্ড হয় না, যেখানে বিচার হয়, সেখানে সাক্ষী প্রভৃতির সংযোগ করা দরিদ্র অভিযোগকারির পক্ষে বিষম দুর্ঘট হইয়া উঠে। সুতরাং হত ব্যক্তির বান্ধবগণ লৌকিক বিচারাসনের নিকট জানাইয়া নিরস্ত এবং দীর্ঘকাল মনোদুঃখে দগ্ধ হইতে থাকে। প্রস্তাবিত আইনটী বিধিবদ্ধ হইলে মফস্বলস্থ ইউরোপীয়দিগের উল্লিখিত অত্যাচারের বহুল পরিমাণে হ্রাস হইবে। এটী কি এ দেশীয়দিগের পক্ষে উপকার নয়?

তৃতীয়, সভা বলিয়াছেন শাসন সম্বন্ধে এমন কোন সঙ্কট উপস্থিত হয় নাই যে, এই আইনটী করিতে হয়। আমরা বলি, গবর্ণমেণ্ট সঙ্কটে পড়িয়া এই আইনটী করিতেছেন। প্রথম সঙ্কট এই, গবর্ণমেণ্ট আপনাদিগের সমদর্শিতা রক্ষা করিতে পারিতেছেন না। দ্বিতীয় সঙ্কট এই, মফস্বলে ইউরোপীয়দিগের অত্যাচার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে। তাঁহারা গবর্ণমেণ্টকে তুচ্ছ করিয়া আইন নিজ হস্তে লইয়া যথেচ্ছাক্রমে স্বাভীষ্ট সাধন করিতেছেন।

চতুর্থ, বলা হইয়াছে বিশুদ্ধ যুক্তি প্রস্তাবিত আইনটীর মূল নহে এবং উহা ভূয়োদর্শন-সম্ভূতও নহে। উপরে আমরা যে যে বাক্যের উল্লেখ করিলাম তদ্দ্বারাই প্রমাণ হইতেছে যে, ইহার মূলে বিলক্ষণ বিশুদ্ধ যুক্তি ও আইনকর্ত্তাদিগের বহুদর্শিতা আছে। সভা কাহাকে বিশুদ্ধ যুক্তি বলেন? ইউরোপীয়েরা এ দেশীয়দিগকে সর্ব্ব বিষয়ে বঞ্চিত রাখিয়া এবং পদদ্বারা দলিত করিয়া রাজত্ব করিবেন, এ দেশীয়রা উচ্চবাচ্য করিতে পারিবেন না, গবর্ণমেণ্টেও কিছু বলিতে পারিবেন না, ইহাই কি বিশুদ্ধ যুক্তি?

পঞ্চম, সভা যে স্বত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, আমরা পূর্ব্ব প্রস্তাবে তাহার খণ্ডন করিয়াছি। এদেশীয় বিচারপতির নিকটে ইউরোপীয় অপরাধীর বিচার হইবে না, এটী কোনরূপে স্বত্ব বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। এটা যদি স্বত্ব হইত তাহা হইলে প্রেসিডেন্সি সহরে এ দেশীয় বিচারপতির নিকটে ইউরোপীয় অপরাধীর বিচার হইত না। ইউরোপীয়দিগের যদি এটী স্বত্ব হয় তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি, এ দেশে বাস করিবার স্বত্ব আমাদিগেরই আছে, ইউরোপীয়েরা এ দেশে বাস করেন কেন? আমরা পুরুষানুক্রমে এ দেশে বাস করিতেছি। ইউরোপীয়েরা একশত পঁচিশ বৎসরের পূর্ব্বে এদেশে বাস করেন নাই। যদি এরূপ হইল তবে আমাদিগের স্বত্ব কি গুরুতর নয়?

ষষ্ঠ, সভা বলেন উক্ত আইন হইলে ইউরোপীয়দিগের স্বাধীনতার উচ্ছেদ হইবে। আমরা ত ইহার অর্থই বুঝিতে পারিলাম না। কি বিষয়ের আইন হইতেছে? অপরাধীর বিচারার্থ আইন। ইউরোপীয় হউক আর এ দেশীয় হউক, যে অপরাধী হয়, তাহার স্বাধীনতা কি? তাহাকে গবর্ণমেণ্টের আইনের অধীন হইয়া চলিতে হইবে। যখন আইনের অধীন হইতে হইল তখনই ত স্বাধীনতা নষ্ট হইল। সেই আইন যে কোন ব্যক্তি কার্য্যে পরিণত করুন তাহাতে স্বাধীনতার হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। ইউরোপীয় বিচারপতি

আইন কার্য্যে পরিণত করিলে যে ফল এ দেশীয় বিচারপতি করিলেও সেই ফল। তবে প্রস্তাবিত আইনটী বিধিবদ্ধ হইলে স্বাধীনতা নাশের শঙ্কা কি?

সপ্তম, এ দেশীয় বিচারপতির নিকটে ইউরোপীয় অপরাধীর বিচারের ব্যবস্থা হইলে ইউরোপীয়েরা মফস্বলে নিশ্চিন্ত ও নির্ব্বিঘ্ন হইয়া বাস করিতে পারিবেন না। সুতরাং তাঁহারা মূলধন বিনিয়োগে সাহসী হইবেন না। এটী বড় কৌতুকের কথা এ দেশীয় বিচারপতির নিকটে সেই ইউরোপীয় অপরাধীর বিচারের ভার অর্পিত হইবে, অমনি এদেশীয় বিচার-পতিরা আইন কানুনাদির পুস্তক সমুদায় জলে ফেলিয়া দিয়া এবং বিচার প্রণালী লঙ্ঘন করিয়া কেবল কি দুহাতে ইউরোপীয়দিগের দণ্ড দিতে থাকিবেন? যাঁহা্দিগের আইন কানুনের বশবর্ত্তী হইয়া চলাই প্রধান কর্ত্তব্য, তাঁহারা কি ইউরোপীয়ের বেলাই তাহার অনুষ্ঠান করিবেন না?

অষ্টম, সভা যে জাতীয় বিদ্বেষের কথা কহিয়াছেন, সেটীও তাঁহাদিগের ভ্রান্তি। আমরা বুঝিতেছি ঐ আইনটী বিধিবদ্ধ হইলে ক্রমে জাতীয় বিদ্বেষ তিরোহিত হইবে? এখন এ দেশীয়দিগের মনে সর্ব্বদা এই ভাবের উদয় হয়, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ইউরোপীয়দিগকে তাঁহাদিগের স্বজাতি বলিয়া এক প্রকার আইন করিয়াছেন আর এ দেশীয়দিগের নিমিত্ত আর এক প্রকার আইন করিয়াছেন। সুতরাং তন্মূলক ইউরোপীয়ের প্রতি এ দেশীয়ের মনে বিদ্বেষভাব জাগরুক হইয়া আছে। মানুষের স্বভাব এই, অন্যায় দেখিলে কেবল যে অন্যায়কর্ত্তার উপর রাগ হয় এরূপ নয় অন্যায়কর্ত্তা যাঁহার উপর অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন, তাহার উপরেও ক্ষোভ জন্মিয়া থাকে। কিন্তু প্রস্তাবিত আইনটী বিধিবদ্ধ হইলে এ ভাবের তিরোধান হইবে সন্দেহ নাই। আমাদিগের বিবেচনায় সভা বিপরীত বুঝিয়াছেন ও বিপরীত কহিতেছেন।

জে, জে, ফেনউইক ও ব্যারিষ্টার ব্রান্সন সাহেব এই সভার প্রধান বক্তা। তাঁহারা জ্বালায় বিমোহিত হইয়া যে কি কতকগুলো বকিয়াছেন তাহার গণনা করা, উত্তর দেওয়া ও তাহার খণ্ডন করা আমাদের—আমাদের কেন ভদ্র লোকের উচিত হইতেছে না। মানুষ যখন ক্রোধে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়, তখন তাহার বাচ্যাবাচ্য জ্ঞান থাকে না। প্রক্রান্ত বিষয়ের সহিত যে যে বিষয়ের কোন সংস্রব নাই, তাহাও বক্তাদিগের মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে। তাঁহারা হিন্দুদিগকে বিশেষত. বাঙ্গালীদিগকে মূর্খের ন্যায় কতকগুলি গালি দিয়াছেন। এদেশীয়দিগের প্রতি তাঁহাদিগের মনের কিরূপ ভাব উহাতে তাহা স্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে। প্রস্তাবটী ক্রমে দীর্ঘ হইয়া উঠিল। অতএব আমরা সেই দোষমূলক গালির উত্তরদানে বিরত হইয়া কেবল দুই একটী বিষয়ের প্রসঙ্গ করিয়া প্রস্তাবের উপসংহারে প্রবৃত্ত হইলাম। ফেনউইক সাহেব বাঙ্গালীদিগকে গালি দিবার অভিপ্রায়ে বলিয়াছেন "কাফ্রি আপনার শরীরের পরিবর্ত্ত করিতে পারে না এবং গুলবাঘ তাহার শরীরের চিহ্ন ঢাকিতে পারে না" কিন্তু আমরা বলি, পারে। এ দেশস্থ ইউরোপীয়রাই তাহার প্রমাণ।

যে সকল ইউরোপীয় ইউরোপখণ্ডে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাহাদিগের মনের উদারভাব ও ন্যায়পরতা সর্ব্বত্র প্রশংসিত হইয়াছে, সেই ইউরোপীয় ভারতবর্ষে পদার্পণ করিলে তাহার সমুদায় পবিবর্ত্ত হইয়া যায়। তাহাদের মনের সে উদারভাব থাকে না, সে ন্যায়পরতা থাকে না। তাহারা ওচা ইউরোপীয় হইয়া পড়ে। তবে যখন এই পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে, তখন এদেশীয় যে সকল ব্যক্তি বিচারাসনে অধিষ্ঠিত হন, তাঁহাদিগের মনের ভাব যে পরিবর্ত্ত হয় না, তাহা প্রামাণিক নহে। উচ্চশিক্ষায় তাঁহাদিগের মনকে উচ্চ করিয়া তুলে। পক্ষপাতাদি নীচ প্রবৃত্তি তখন তাঁহাদিগের মনে আর স্থান পায় না। আমাদিগের রাজপুরুষেরা পদে পদে তাহার প্রমাণ পাইতেছেন। বক্তারা যে তাহার প্রমাণ পান নাই তাহার কারণ এই, বোধ হয় চারি টাকা বেতন-ভোগী নীচ প্রকৃতি বাঙ্গালীদিগের সহিত তাঁহাদিগের পরিচয়। তাহাদিগের চরিত্র দেখিয়াই তাঁহারা উচ্চশ্রেণীর বাঙ্গালী চরিত্রের পরিণাম করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু আমরা অহঙ্কার করিয়া বলিতে পারি, উচ্চশ্রেণীর বাঙ্গালীর মধ্যে এরূপ অনেক লোক আছেন যে, বক্তাদিগের ন্যায় অনেক ইউরোপীয় তাঁহাদিগের নিকটে উচ্চমনস্কতা শিক্ষা করিতে পারেন। একজন বক্তা কহিয়াছেন, এদেশীয়দিগকে প্রশ্রয় দিলে ইহারা ক্রমে জজ, মাজিষ্ট্রেট, কমিশনর, লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর, গবর্ণর জেনেরল পদেরও আকাঙ্ক্ষী হইবেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি, ব্রিটিশ জাতির কল্যাণে, ব্রিটিশ জাতির শিক্ষা দান গুণে ও ব্রিটিশ জাতির মহত্ত্বগুণে যদি এদেশীয়েরা ঐ সকল পদ প্রাপ্ত হন, তাহা কি ব্রিটিশ জাতির অগৌরবের বিষয় ? সেটা যে কেমন গৌরবের বিষয় ২৮ এ ফেব্রুয়ারির কলিকাতা টাউন হলের রাক্ষসী সভার রাক্ষস বক্তারা কিরূপে বুঝিবেন ? ব্রিটিশ জাতি যদি ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করেন, এদেশীয়েরা যে ঐ সকল পদলাভ করিবেন তাহাতে সন্দেহ কি ? যে জাতিতে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, অর্জ্জুন প্রভৃতি মহাবীর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যে জাতিতে মনু, ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এদেশীয়েরা সেই জাতির বংশধর, এদেশীয়দিগের মূল ত অতি উচ্চতর। এদেশীয়েরা যে কালে ঐ সকল পদ লাভ করিবেন, সে বিষয়ে ত আমাদিগের সন্দেহ জন্মিতেছে না। রোমের যে প্লিবীয় দলের মূল পাওয়া ভার সেই বিজিত প্লিবীয় দল ক্রমে রোমের কন্সল ও ডিক্‌টেটর প্রভৃতি হইয়াছিলেন, তাহারা যদি তত উচ্চপদ পাইতে পারিল, উচ্চবংশজাত বাঙ্গালীরা কি তাহা পাইতে পারিবেন না ? যত দিন রোমে ন্যায়পরতার আদর ছিল ততদিন রোম উন্নতির উচ্চতর সোপানে অধিরূঢ় হইয়া প্রতিহতভাবে সর্ব্বত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই, এদেশীয়েরা স্থানে স্থানে এক একটী সভা করুন। কলিকাতায় একটী প্রধান সভা হউক, ঐ সকল সভা হইতে ইলবার্ট সাহেবের ফৌজদারী কার্য্যবিধির সংশোধন প্রস্তাব সম্বন্ধে এ দেশীয়দিগের অভিপ্রায় যে কি তাহা আমাদের গবর্ণমেণ্টের গোচর করা কর্ত্তব্য।

ভারতসভা ও স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন। ২৭ চৈত্র ১২৮৯। ২১ সংখ্যা

একতা ও অধ্যবসায় গুণে কি না হইতে পারে? ইটালি ও গ্রীশের অবস্থা কি ছিল, কি হইয়াছে? ভারতের ন্যায় ইহারাও এককালে গৌরবান্বিত ছিল, এবং বর্ত্তমান ভারতের ন্যায় ইহারাও এক সময়ে দুর্দ্দশাপন্ন ও দাসত্বরাহুগ্রস্ত হইয়াছিল। কিন্তু ইটালি ও গ্রীশ ত আবার ইটালি ও গ্রীশ হইতেছে, ভারত তবে পুনরায় ভারত হইবে না কেন?

পরাধীন হইলেই যে উন্নতির পথ একেবারে অবরুদ্ধ হয, তাহা হয় না। আমরা এক্ষণে যে প্রকার পরাধীন আছি, তাহা অনেক অংশে প্রার্থনীয় ও উন্নতির সোপান স্বরূপ, কেবল কি প্রকারে সেই সোপানে আরোহণ করিতে হয়, তাহাই জানা আবশ্যক।

এক্ষণে অনেক সুশিক্ষিত, অধ্যবসাযশীল লোক দেশেব মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়াছেন, অথচ দেশেব আশানুরূপ উন্নতি হইতেছে না কেন? এক্ষণে অনেক অজ্ঞানান্ধ দেশবাসিগণের পথ প্রদর্শক ও নেতা হইবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়াছেন, অথচ দেশের হীনাবস্থা মোচন হইতেছে না কেন, ইহার কাবণ দেশের সাধাবণ প্রজাবর্গেব নিতান্ত হীনাবস্থা। সত্য বটে দেশে নূতন বিদ্যার চর্চ্চা আরম্ভ হইযাছে, স্থানে স্থানে বিদ্যাভ্যাস করিতেছে? দ্বাবিংশতি কোটী মানবেব মধ্যে দশ, বিশ সহস্র লোক কিছু কিছু বিদ্যাভ্যাস কবিলে কি হইবে? সত্য বটে এক্ষণে কযেকখানি স্বাধীন চিন্তাশীল সংবাদপত্র প্রচাবিত হইয়া লোকেব মনে স্বাধীন চিন্তার স্রোত প্রবাহিত কবিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু দেশের সাধাবণ জ্ঞানান্ধতার সহিত তুলনা কবিযা দেখিলে তাঁহাদের যত্ন ঘোব তমসাচ্ছন্ন অমানিশায় খদ্যোত আলোকের ন্যায প্রতীয়মান হইবে। এক্ষণে জ্ঞানালোক যে প্রকার বিরল, ' সাধাবণ প্রজাবর্গেব যে প্রকাব হীনাবস্থা, তাহাতে কয়েকজন মাত্রের যত্নে সাধাবণের মানসিক অবস্থার উন্নতি হইতে পারে না। যাঁহাদের অর্থ আছে, তাঁহাদেব মধ্যেই জন কয়েকজন কানপ্রকারে দাসত্বোপযোগী কিছু কিছু বিদ্যো-পার্জ্জন কবিয়া কথঞ্চিৎ জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছেন। কিন্তু তদ্দারা সাধারণ প্রজাগণের আথিক, কি বৈজ্ঞানিক অবস্থার কি কোন উন্নতি হইতেছে? অখিল প্রকৃতিবর্গের যে হীনাবস্থা সেই হীনাবস্থাই রহিয়াছে, বরং অনেক বিষয়ে হীনতব হইয়াছে।

তেলা মাথাতেই অনেকে তেল দিয়' থাকেন। ধনীও আছে, তাঁহাদের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিবার নিমিত্ত স্থানে স্থানে সভা সংস্থাপিত হইযাছে বটে, কিন্তু কাঙ্গালের মা বাপ কেহই নাই। তাহাদের হইয়া দুটা কথা বলে, তাহাদের হীনাবস্থা মোচন জন্য কথঞ্চিৎমাত্রও যত্ন করে, এমত লোক কেহই নাই। ইহা সভ্যসোপানারোহী ব্রিটনীয় ভারতের একটি দুরপনেয় কলঙ্ক।

এই অভাব এই কলঙ্ক মোচন জন্য পরদুঃখকাতর, অনাথবন্ধু কয়েকজন সুশিক্ষিত

স্বদেশানুরাগী মাহাত্মা কলিকাতা মহানগরীতে ভারতসভা নামক এক মহাসভা সংস্থাপিত করিয়াছেন, সমুদায় ভারতবাসীকে তাঁহাদের সহকারী ও সহায় হইবার নিমিত্ত আহ্বান করিতেছেন।

ইহাঁরা জ্ঞানরূপ তুঙ্গশৃঙ্গে দণ্ডায়মান হইয়া উপত্যকাশায়ী, মোহভূতি সহোদরবর্গকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতেছেন কে কোথায় আছ ভ্রাতৃগণ! জাগরিত হও। ঐ দেখ ভারতমাতা অদূরে অতলসাগরে নিমগ্না হইতেছেন, সোণার প্রতিমা জলে ডুবিতেছেন। মাতা পরলোকগতা হইলে এই পৃথিবীতে আমাদিগকে আর আমার বলিবার কেহই থাকিবে না। মাতা সজলনয়নে, করুণস্বরে দক্ষিণহস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক পুত্রগণের সাহায্য প্রার্থনা কবিতেছেন। (?) বৈধব্যদশা প্রাপ্তহইয়া অবধি তিনি নিতান্ত কাতর আছেন, তাঁহার দুঃখের ও দুরবস্থার একশেষ হইতেছে। কিন্তু পাছে সন্তানগণ আপনাদিগকে মাতৃহীন মনে করিয়া বিষণ্ণ হয়. এই ভয়ে এই অবিশান্ত শোকাবেগ সম্বরণ করিয়াও বাহিরে প্রসন্নমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আছেন এবং যাঁহারা অক্ষম সন্তানগণের লালনপালনের ভার গ্রহণ করিতেছেন, প্রচুর রত্নাদি উপহার দিয়া যথাসাধ্য তাঁহাদের মনোরঞ্জন চেষ্টা করিতেছেন। কেবল এই কারণেই ভারতভূমি আজও রত্নপ্রসূ রহিয়াছেন, নতুবা এত দিন শ্মশান ও মরুভূমি হইয়া উঠিতেন। সন্তানগণ কালক্রমে উন্নত ও উপযুক্ত হইয়া আবার তাঁহার মুখ উজ্জ্বল করিবে, আবাব তিনি মানিনী ভারতমাতা হইবেন এই আশায় আজও বুক বান্ধিয়া অতুল ঐশ্বয্যের ভাব গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের সহানুভূতি ও কায্যপ্রণালী দর্শন করিয়া মাতার সাহস ও আশা দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতেছে।

অতএব ভ্রাতৃগণ! আইস আমরা সকলে আলস্য ও কাপুরুষোচিত নিশ্চেষ্টতা পরিত্যাগপূর্ব্বক মাতার দুঃখমোচনে ও গৌরববর্দ্ধনে যত্নবান হই। মাতার স্নেহ স্মরণ করিয়া তাঁহাকে অকালমৃত্যু হইতে রক্ষা করি। তাহা হইলে আমাদের ইহলোক ও পবলোক উভয়ত্রই মঙ্গল হইবে। যে গৃহে মাতা সর্ব্বদা চক্ষের জল ফেলেন, সে গৃহস্থের কথনই মঙ্গল হয় না। যদ্যপি জননীকে সুখী করিতে না পারিলাম যদ্যপি মাতার একধার দুগ্ধেরও পরিশোধ করিতে না পারিলাম, তাহা হইলে আমাদের জন্মগ্রহণ বৃথা, সকৃতজ্ঞ নবাধম, আমাদের জীবনে ধিক্। আমাদের আবার বিদ্যা বুদ্ধি গৌরব কি। আমরা কেবল দাসত্ব করিবার ও যদৃচ্ছাক্রমে পদে দলিত হইবার যোগ্য।

উক্ত স্বদেশহিতৈষী মহাত্মারা হৃদয়বিদারক করুণোদ্দীপক স্বরে আমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, প্রভৃতি সমুদায় ভারতবাসীকেই আহ্বান করিতেছেন। অধিকাংশ ভারতবাসী এই আহ্বানে জাগ্রৎ হইতেছেন, শুদ্ধ আমরাই কি নিশ্চেষ্ট ও উদাসীন থাকিব। বাঙ্গালিজাতি বাক্‌পটু, নিস্পৃহ, নির্ব্বীর্য্য একতাশূন্য ও পরস্পরের প্রতি অসূয়া পরতন্ত্র বলিয়া পৃথিবীময় যে লজ্জাকর দুর্নাম বিস্তৃত হইয়াছে, তাহা ক্ষালন করিবার এই উপযুক্ত সময়।

আমরা এক্ষণে যে স্বাধীনতাপ্রিয়, উন্নতিশীল, সুসভ্য ইংরাজজাতির শাসনাধীন রহিয়াছি, তাঁহারাও আকার ইঙ্গিতে ও আপনাদিগের কার্য্যপ্রণালীতে আমাদিগকে উন্নতির সোপান ও সুখের পথ প্রদর্শন করিতেছেন। ইহাঁদের স্বদেশ ও স্বজাতি বৎসলতা, কার্য্যদক্ষতা, একতা, নিরালস্যতা ও উদ্যমশীলতা প্রভৃতি গুণগ্রাম দর্শন করিলে বোধ হয় যেন ইহাঁরা প্রত্যেকেই এক এক ধবাধামের অধীশ্বর ও মানবজাতির অধিনায়ক হইবার জন্যই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ কবিয়াছেন।

জগদীশ্বর ইহাদিগকে গুণানুযায়ী ফলও প্রদান করিযাছেন। সমুদায় ভারতবর্ষের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে বিস্তৃতি ও অধিবাসীসংখ্যায় ইংলণ্ড ভারতের একটী সামান্য প্রদেশেবও সমান হয় কিনা। কিন্তু সাহস, উৎসাহ, একতা ও অধ্যবসায প্রভৃতি গুণগ্রামই শ্রেষ্ঠ, সংখ্যা ও বিস্তৃতি কোন কার্য্যকারক নহে। অধিবাসিদিগের পৌরুষগুণে ইংলণ্ডেব লোক, ইংলণ্ডেব ভাষা, ইংলণ্ডেব প্রতাপ, ইংলণ্ডেব ধর্ম্ম, ইংলণ্ডের জ্ঞানালোক সমুদায় পৃথিবী ব্যাপিযা রহিয়াছে।

স্বাধীনতাপ্রিয়তা ইংলণ্ডরূপ মহাবৃক্ষেব বীজ, একতা ও তাহাব মূল উৎসাহ ও উদ্যমশীলতা তাহাব বস, প্রজাতন্ত্রের সুখকর সামঞ্জস্য তাহাব স্কন্ধ, রণতরী তাহার সমৃদ্ধশালী পত্র, পুষ্প ও ফল, অসীম উন্নতিই তাহাব শোভা। আদৌ ক্ষুদ্র ও মরুভূমিতে সংস্থাপিত হইলেও রোপণকাবিগণের যত্ন ও অধ্যবসাযগুণে কালসহকাবে এই মহাবৃক্ষ ক্রমশঃ সমুদায় পৃথিবী ব্যাপিযাছে, স্থান পাইলে আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইত।

আবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উর্ব্বরক্ষেত্রে সংস্থাপিত ও পুর্ব্বপুরুষগণের বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রমে পবিবর্দ্ধিত তেজস্বান বৃক্ষ সকলও অযোগ্য উত্তরাধিকাবিগণেব অযত্ন, অনৈক্য, স্বার্থপরতা ও পবস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাব বশতঃ নিস্তেজ ও ম্রিয়মান হইয়া পডিয়াছে এবং এই নূতন বর্দ্ধনশীল বৃক্ষদ্বাবা সমাচ্ছাদিত ও পুষ্টিকর সূর্য্যকিবণে বঞ্চিত হইয়া ক্রমশঃ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে।

পাঠক ইলবার্ট সাহেবের প্রস্তাবের বিষয় কি বুঝেন? ১১ বৈশাখ ১২৯০

এটী কি বিধিবদ্ধ হইবে? আপনাবা যদি ইহাব বিধিবদ্ধ হইবার আশা করিয়া থাকেন, আপনাদিগরে দেখচি সাহস অধিক। কিন্তু যে দিন আমরা শুনিয়াছি এ বিষয়টী পার্লিয়ামেণ্ট-সভায় উপনীত হইয়া মীমাংসিত হইবে, সেইদিনই আমাদের আশালতা ছিন্নপ্রায় হইয়াছে। পার্লিয়ামেণ্ট সভায় অনেক মহাত্মা আছেন সত্য কিন্তু ঐ সভার যেরূপ কার্য্যপ্রণালী দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে আমাদের পুর্ণমনোরথ হইবার সম্ভাবনা অল্প। উক্ত মহাসভার সভ্যরা নিজ দেশের কোন একটি বিষয় লইয়া ঘোরতর বাদানুবাদ করেন, বাগবিতণ্ডা কবেন পবস্পর বিবাদ করেন সত্য

কিন্তু ভিন্ন দেশীয় কার্য্যের সময় পাণ্ডবেরা যেরূপ বলিয়াছিলেন গৃহবিবাদকালে "আমরা পাঁচভাই কৌরবেরা একশত ভাই, কিন্তু বাহিরের লোকের সহিত বিবাদের সময়ে আমরা একশত পাঁচ ভাই" উক্ত সভার সভ্যদিগের সেইরূপ গতি। বিদেশীয় কার্য্যকালে তাঁহারা প্রায় একমতই হন, যেদিকে তাহাদিগের স্বার্থ—সেই দিকেই সকলের মন ঝুঁকিয়া থাকে। তখন স্বার্থ পুনঃসর এবং ন্যায়, যুক্তি ও ধর্ম্ম চিন্তা পৃষ্ঠগামী হয়। বিদেশের সহিত কায্যকালে অধিকাংশ সভ্যের মদমোহমৎসরাদি প্রবল হইয়া উঠে, কথায় বলা হয় বটে ভারতবাসীরা আত্মসাদৃশ প্রজা ও সহোদর তুল্য, কিন্তু কার্য্যকালে এ সকল বাক্য কর্পূরের ন্যায় কোথায় উবিয়া যায়। পাছে ভারত-বাসীরা সিবিল সর্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভারতে জজ মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি হন এবং ভারতস্থ ইউরোপীয়দিগকে পাছে তাঁহাদিগের নিকটে বিচারার্থী হইতে হয়, এই ভয়ে যে জাতি সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষার বয়স কমাইয়া দিয়া এদেশীয়দিগের তৎপদে প্রবেশ পথে কণ্টকক্ষেপ করিয়াছেন, সেই জাতি কি সহজে উদারভাবে ইলবার্ট সাহেবের প্রস্তাব বিধিবদ্ধ করিবেন, পাঠকগণ কি এরূপ বিশ্বাস করেন? ব্রিটিশ জাতির অধিকাংশ লোক, যখন ভারতবাসীকে পর না ভাবিয়া আপনার ভাবিবেন, সে সময় আসিবার অনেক বিলম্ব আছে, সে ঔদার্য্য এখন অনেক দূরবর্ত্তী। পার্লিয়ামেণ্ট সভায় ইলবার্ট সাহেবের প্রস্তাব বিধিবদ্ধ হইবে না, আমরা এই যে আশঙ্কা করিতেছি, তাহার অনেক কারণ ঘটিয়াছে। প্রথম যে মহাত্মার যত্নে যাঁহার অধ্যবসায়ে ইলবার্ট সাহেবের প্রস্তাবের বিধিবদ্ধ হইবার সম্ভবনা আছে, রিউটর ইহার মধ্যেই ত তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া তৎপদে আর এক ব্যক্তিকে নিয়োজিত করিয়াছেন। লর্ড রিপণ বাহাদুর পদত্যাগের ইচ্ছা করেন নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা তাঁহাকে দেখিতে পারেন না, যাঁহারা তাহাকে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল পদে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চান না, যাঁহারা ভাবিতেছেন তিনি ভারতবর্ষে থাকিলে তাঁহাদিগের বিপদ ঘটিবে, তাঁহারা তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিবার চেষ্টায় আছেন। ব্রিটিশ চতুর কার্য্যনীতিও এরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, যে রাজপুরুষ ন্যায়ানুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করেন, যাঁহার ন্যায়ানুগামিতা হেতু স্থানীয় ইউরোপীয়েরা অসন্তুষ্ট হন, তাহাকে তৎক্ষণাৎ তথা হইতে স্থানান্তরিত করা হয়। একজন জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট নীলপ্রধান প্রদেশে ছিলেন। তিনি প্রজার সহিত নীলকরের মকর্দ্দমার সূক্ষ্ম বিচার করিতে লাগিলেন নীলকরদিগের অসুবিধা হইল ক্ষতি হইতে লাগিল, নীলকরেরা ঘোরতর চীৎকার আরম্ভ করিল। কর্ত্তারা সেই ঘোরতর চীৎকারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন এবং সেই ন্যায়কারী বিচারপতিকে তথা হইতে সরাইয়া দিলেন। এই নীতির অনুসারে আমাদের বর্ত্তমান গভর্ণর জেনারল বাহাদুরকে সরাইয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা হওয়া অসম্ভাবিত নয়। যদি বলেন রিপণ বাহাদুরের অনেক সপক্ষ লোক ইংলণ্ডে আছেন, সেদিন

ব্রাইট সাহেব গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টারের পদে অধিষ্ঠিত হইবার সময়ে ছাত্রদিগকে সম্বোধন করিয়া যে রূপে ভারত শাসন হওয়া উচিত, তাহার প্রসঙ্গ করিয়া রিপণ বাহাদুরের যথেষ্ঠ প্রশংসা করিয়াছিলেন। রিপণ বাহাদুর যে পথ অবলম্বন করিয়া ভারত শাসন করিতেছেন ইহাই ভারতবাসিদিগকে স্ববশে রাখিবার প্রকৃত পথ ব্রাইট সাহেব এ অভিপ্রায়ও প্রকাশ করিয়াছিলেন। এরূপ সৎ ও মহৎ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন ইংলণ্ডে এরূপ অনেক মহাত্মা আছেন, কথা অযথার্থ নয় কিন্তু কথায় বলে ঢাকের কাছে টিম টিমা ইঁহাদের বাক্যে ইংলণ্ডেও সেইরূপ, কার্য্যকালে বন্যাবেগের ন্যায় ইঁহাদের বাক্য কোথায় ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। দ্বিতীয় স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত ইলবার্ট সাহেবের প্রস্তাবের বিরোধী হইয়া প্রতিবাদ করিতেছেন। ঐ প্রস্তাবটি যাহাতে বিধিবদ্ধ না হয় অনেকে সে প্রার্থনাও করিয়াছেন। ইংরাজ জাতির নিকটে ন্যায়ের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের মান অধিক, অতএব ন্যায়ের অনুরোধে তাঁহাদিগের বাক্য যে উপেক্ষিত হইবে তাহা হৃদয়ঙ্গম হইতেছে না। তৃতীয় খৃষ্ট মিশনরিরা যথার্থ ধার্ম্মিক লোক, অন্যায়ের একান্ত বিরোধী, তাঁহাদিগের যত্নে নীলকরের অত্যাচার নিবারিত হইয়াছিল, লং সাহেব কারাগারে প্রবেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইলবার্ট সাহেবের প্রস্তাব হইতে যে অন্যায় হইতে চলিয়াছে, খ্রীষ্ট মিশনরিরা তাহার প্রতিবাদ করিতেছেন না, এটীও ইলবার্ট সাহেবের প্রস্তাব বিধিবদ্ধ না হইবার একটি কারণ। যদি বল ইলবার্ট সাহেবের প্রস্তাব রাজনীতিসংক্রান্ত বিষয় খ্রীষ্ট মিশনরিরা ধর্ম্ম বিষয় লইয়া আছেন, তাঁহারা এ বিষয়ে হাত দিবেন কেন? তদুত্তরে আমরা বলি নীলকরদিগের দৌরাত্ম্য নিবারণ ও রাজনীতিসংক্রান্ত বিষয়, তাঁহাতে তাহারা কিরূপে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন? ন্যায়ে ও ধর্ম্মে যেমন, তেমনি অন্যায়ে ও অধর্ম্মে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ধার্ম্মিক লোকের ধর্ম্মরক্ষা ও অধর্ম্মের নিবারণ করা যেমন ন্যায়রক্ষা ও অন্যায় নিবারণ করা তেমনি কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ইলবার্ট সাহেবের প্রস্তাব সম্বন্ধে ভারতস্থ ইউরোপীয়েরা যে অন্যায় করিতে বসিয়াছেন খ্রীষ্ট মিশনরিরা যদি তাহার নিবারণ চেষ্টা না পান তাহা হইলে তাঁহাদের ধার্ম্মিকতানামে কলঙ্ক স্পর্শি[illegible] সন্দেহ নাই। যাহা হউক খ্রীষ্ট মিশনরিরা যখন ইউরোপীয়ানদিগের অন্যায় চেষ্টা নিবারণের যত্ন না পাইয়া মৌনাবলম্বী হইয়া আছেন, তখন ইলবার্ট সাহেবের প্রস্তাব বিধিবদ্ধ হইবার বিষয়ে আমাদিগের বিষম সন্দেহ জন্মিতেছে।

বেঙ্গলী সমাচার পত্র সম্পাদকের দণ্ড। ২৫ বৈশাখ ১২৯০

আমরা অতিশয় দুঃখিত হইয়া পাঠকগণকে জানাইতেছি, কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতিরা গত ৫ই মে শনিবার বেঙ্গলী সমাচার পত্র সম্পাদক বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুই মাস কারাবাসের আদেশ দিয়াছেন। তাঁহার অপরাধ এই উক্ত

হাইকোর্টের অন্যতর বিচারপতি নরিস সাহেব একদা এক মকদ্দমায় এক শালগ্রাম শিলা আদালতে আনয়ন করান। তাহাতে ব্রাহ্ম পবলিক ওপিনিয়ন লেখকের হাইকোর্টের সহিত সংস্রব আছে। অতএব ব্রাহ্ম পবলিক ওপিনিয়নে যাহা লিখিত হয় তাহা সুরেন্দ্রবাবুর সত্য বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে, দৃঢবিশ্বাস জন্মিবার বিশিষ্ট কারণ ছিল। হিন্দু হইয়া বাদী প্রতিবাদী যে, আদালতে স্বইচ্ছায় শালগ্রাম শিলা আনয়ন করিবেন ইহা সম্ভাবিত নহে। কিন্তু বাস্তবিক ঘটনা জবর্দ্দস্তিতে শালগ্রাম শিলা আনয়ন করা হয় নাই। বাদী প্রতিবাদীর সম্মতিক্রমেই আনান হইয়াছিল। সুরেন্দ্রবাবু এই প্রকৃত বৃত্তান্তটি জানিতে পারেন নাই। তিনি ব্রাহ্ম পবলিক ওপিনিয়নের কথায় বিশ্বাস করিয়া এটী অতি গর্হিত কার্য্য বিবেচনা করিয়া উত্তরকালে এরূপ ঘটনা না হয় এই অভিপ্রায়ে নরিস সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া দুই একটি কথা লিখিয়াছিলেন, কথাও কিছু কটু হইয়াছিল। শালগ্রাম শিলা বাস্তবিক যদি জবর্দ্দস্তি করিয়া আনা হইত তাহা হইলে সেই বাক্য ততদূর দোষাবহ হইত না। কিন্তু বাস্তবিক ঘটনা অন্যরূপ হওয়াতে উহা দোষাবহ হইয়াছে। তাহাতে নরিস সাহেব কুপিত হইয়া সুরেন্দ্রবাবুর নামে অভিযোগ করেন। ৪ঠা মে ফুলবেঞ্চে বিচার হয়। সুরেন্দ্রবাবু আদালতকে অবজ্ঞা করিয়াছেন, এই স্থির করিয়া উক্ত দণ্ডের বিধান করিয়াছেন। ৪ঠা মে শুক্রবার সুরেন্দ্র-বাবুর বিচার উপস্থিত হয়। ঐ দিবস আদালতে তুমুল গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। ঐ দিবস মকর্দ্দমা দেখিবার নিমিত্ত বিস্তর লোক আদালতে উপস্থিত হয়। তন্মধ্যে সুরেন্দ্রবাবুর ভক্ত স্কুলের বালকই অধিক। ঐ বালকেরা এমনি গোলযোগ করে যে বিচারপতিদিগের বিচার করা ভার হইয়া উঠে। বিচারপতিরা কোলাহল থামাইবার আদেশ দেন। তন্মূলক শান্তিরক্ষকদিগের সহিত বালকদিগের মারামারি হইয়া গিয়াছে। তাহার যে কি ফল ফলিয়াছে অর্থাৎ সুরেন্দ্রবাবুর এই একটি মকর্দ্দমায় কয়টী মকর্দ্দমা যে প্রসব করিয়াছে, আগামী বারে তাহার বিস্তারিত বৃত্তান্ত লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

সম্পাদকীয় বিচার। ২৫ বৈশাখ ১২৯০

ইংলণ্ড রত্নাকর সদৃশ। সমুদ্রে যেমন মণিমুক্তাদি বহুমূল্য দ্রব্য আছে, তেমনি আবার হিংস্র নক্রাদি জলজন্তু থাকাতে ভয়ঙ্করও হইয়াছে। ইংলণ্ডে ভারতের ঘোর বিদ্বেষ্টার অসদ্ভাব নাই, মিত্রেরও অপ্রতুল নাই। ট্রণ্ট নামক এক মহাত্মা এতদুপলক্ষে লণ্ডন ডেলিনিউসের সম্পাদকের নিকট একখানি উদারতাপূর্ণ পত্র লিখিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাহার স্থূলমর্ম্ম প্রচারিত করিলাম। তিনি বলিয়াছেন : মহাশয়! আমি ভরসা করি ভারতবর্ষবাসী ইউরোপীয়দিগের অন্যায় চীৎকার লর্ড রিপণের বিজ্ঞতাপূর্ণ প্রস্তাবগুলির কোন বাধা জন্মাইতে পারিবে না। তাঁহারা কেবল স্বার্থপরতার বশবর্ত্তী হইয়াই

ইহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন। যখন কোন দেশীয় লোক গবর্ণমেণ্টের কোন উচ্চপদে নিযুক্ত হন তখনও তাঁহারা এইরূপ অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া থাকেন, "দেশীয় বিচারকগণ ফৌজদারী মকদ্দমায় ইউরোপীয়দিগের বিচার করিতে পারিবেন।" লর্ড রিপণের এই প্রস্তাবের কোনরূপ বিপদাশঙ্কা নাই, বরং বিচারকার্য্যের অনেক সুবিধা হইবে। এটা নতুন কথাও নহে ভারতবর্ষে যে নীতি মূলে বর্ত্তমান বিচারকার্য্য চলিতেছে, এবং যাহা অনেক দিন হইল শুভফল উৎপাদন করিয়া আসিতেছে, এটী সেই নীতির বিস্তৃতি মাত্র। দেশীয় ব্যারিষ্টারগণ ইউরোপীয়দিগের পক্ষ হইয়া আদালতে উপস্থিত হইয়া থাকেন। একটী উচ্চ আদালতে একজন মুসলমান আমার পক্ষে উকীল ছিলেন। দেশীয় বিচারকগণ এখনও ফৌজদারী ও দেওয়ানী উভয়রূপ মকদ্দমায় ইউরোপীয়দিগের বিচাব করিতেছেন, এ পর্য্যন্ত কেহ দেশীয় বিচারপতিগণের বিচারে কথনও কোনরূপ দোষারোপ করেন নাই। কিন্তু ইউরোপীয় বিচাবকগণ যে অনেক সময়ে ন্যায়বিচার ভুলিয়া জাতিগতস্বার্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার শত শত দৃষ্টান্ত বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রসিদ্ধ ফলার, মকদ্দমায় যিনি ভয়ানক অসঙ্গত বিচাব করিয়াছেন, তিনি একজন ইউরোপীয়, দেশীয় নহেন। যিনি ১৮৭৮ সনে একজন সাক্ষী দ্বারা মিথ্যা বলাইবার জন্য তাহার হস্তে জ্বলন্ত অঙ্গার রাখিয়াছিলেন, তিনি একজন ইউবোপীয়ান। বস্তুতঃ অনেক সময়ে ইউবোপীয়ের অপেক্ষা দেশীয় বিচারকের নিকট উপস্থিত হওয়া আসামীর পক্ষে সহস্র গুণে ভাল। বিলাতের অকর্ম্মণ্য ব্যারিষ্টারগণ নানারূপ যোগাড করিয়া ভাবতবর্ষের বিচারকের পদ প্রাপ্ত হন, কিন্তু দেশীয় লোকের পক্ষে তদ্রূপ পদ লাভ কেবল দক্ষতাব উপর নিভর করে, আমার মতে অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতবর্ষেও জাতি ধর্ম্ম, বর্ণ ও জন্মস্থান প্রভৃতি কাহাব উচ্চপদ প্রাপ্তির অন্তরায় হওয়া উচিত নহে। সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তিকেই নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য, তিনি হিন্দু, মুসলমান ইংরাজ কি পারসী তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত কবা কখনই সঙ্গত নহে। আমি যখন ভারতবর্ষে ছিলাম, তখন এই মতের পক্ষপাতী ি াম বলিয়া আমাকে সকলে "শুভ্রনিগার" বলিত। ভারতবর্ষে ইংরাজগণ দুই একটি উদার চবিত্র ইংরাজ ব্যতীত যে একটী স্বতন্ত্র জাতি হইয়া উঠিয়াছেন এবং তাহারা যে হিন্দুদিগের প্রত্যেক জাতি অপেক্ষা অধিক প্রতিহিংসাপর তৎসম্বন্ধে আমার হস্তে প্রমাণের অভাব নাই। বর্ত্তমান ঘটনাও আমার পক্ষ সমর্থন করিতেছে।

ইলবার্ট সাহেবের প্রস্তাবের প্রতিবাদের ফল। ৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৯০

কোন পণ্ডিত নিয়ম করিয়াছিলেন, যে তিনি ক্রোধের সময় কিছু কাজ করিবেন না। কারণ ক্রোধে মনুষ্যকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করে। ক্রোধের সময় যে কাজ

কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়, ক্রোধ শান্তি হইলেই সেই কার্য্যের জন্য অনুতাপ উপস্থিত হয়, ক্রোধের সময় যে উদ্দেশ্যে যে কার্য্য করা যায় অনেক সময় তাহার বিপরীত ফল ফলিয়া থাকে। দণ্ডবিধির আইন সংশোধনের পাণ্ডুলিপি দেখিয়াই এ দেশের ইংরাজগণ ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া যে সকল কার্য্য করিতেছেন তাহাতে এ দেশের অপকার না হইয়া প্রত্যুত উপকারই হইতেছে, সেই উপকারগুলি প্রদর্শন করাই বর্ত্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। ১ম, এই সামান্য বিষয় লইয়া ঘোরতর আন্দোলন করায় সভ্য জগৎ, বিশেষতঃ ইংলণ্ডবাসীগণ জানিতে পারিলেন যে ভারতীয় ইংরাজ কি চরিত্রের লোক। ভারতস্থ ইংরাজ ও এদেশীয় প্রজায় কেন যে পরস্পর সদ্ভাব হয় না, রাজ্ঞীরও আইনের সদভিপ্রায় সকল কেন কার্য্যে পরিণত হয় না, এই সকল বুঝাইবার জন্য এক্ষণে আর আমাদিগকে প্রয়াস পাইতে হইবে না। ২য়, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে বুঝিলেন যে যথার্থ রাজবিদ্রোহী কাহারা? পরাজিত ভারতবাসীরা না-জেতৃমানী ভারতস্থ ইংরাজেরা। এদেশীয় প্রজাগণ বিদ্রোহভাবাপন্ন, তাহাদিগকে কিছুমাত্র স্বাধীনতা দেওয়া উচিত নহে, তাহারা কেবল সঙ্গীনের ভয়েই স্থির হইয়া আছে, ইত্যাদি যে সকল মিথ্যা অপবাদ ভারতস্থ ইংরাজেরা পৃথিবীময় প্রচার করিতেন, বোধ হয় এখন হইতে তাহাতে আর কোন অনিষ্টসাধন করিতে পারিবে না। এদেশে গভর্ণর জেনারেলই রাজপ্রতিনিধি, তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তাঁহাকে ভয় করিয়া চলাই রাজভক্ত প্রজার কর্ত্তব্য। কিন্তু ইলবার্ট বিল লইয়া টাউনহলে যে প্রকার সভা হইয়াছিল এবং তাহাতে যে প্রকার বক্তৃতাদি হইয়াছিল, তাহাতে ভারতস্থ ইংরাজদিগের রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। বাঙ্গালীরা সে রূপ করিলে নিশ্চয়ই বিদ্রোহী বলিয়া দণ্ডিত হইতেন। তবে ইংরাজেরা যে বিদ্রোহী বলিয়া দণ্ডিত হইলেন না তাহার এই কারণ বোধ হয় এদেশে আসিলেই প্রত্যেক ইংরাজই রাজা হন, সুতরাং রাজার আবার রাজবিদ্রোহিতা কি? ৩য়—ইংলিসম্যান প্রভৃতি কতকগুলি ইংরাজী পত্রিকা সর্ব্বদাই এদেশীয় সংবাদপত্রকে বিদ্রোহদ্দীপক গাম্ভীর্য্যহীন প্রভৃতি বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন এবং এক্ষণেও করিতেছেন, কিন্তু এক্ষণে তাঁহারা নিজে যে কিরূপ আত্মপরিচয় দিতেছেন, তাহা নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিতেছেন। দেশীয় সংবাদপত্রের দোষোল্লেখ করিয়া কোন ইংরাজীপত্র সম্পাদক লিখিয়াছেন—গবর্ণমেণ্ট যদি এইসকল দেশীয় সংবাদপত্রের অচিরাৎ শাসন না করেন, তাহা হইলে ইংরাজ প্রজাগণ নিজেই (অর্থাৎ গবর্ণমেণ্টকে অপারক বা পক্ষপাতী বিবেচনা করিয়া) স্বয়ং আইন পরিচালনার ভার গ্রহণ করিবেন। ইহার অপেক্ষা বিদ্রোহী কাহাকে বলে? ইহাতে কি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে অবজ্ঞা করা হইতেছে না। অবাধে অবজ্ঞাপ্রদর্শন করিলে যদ্যপি গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতার হ্রাস হয় তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই সকল ইংরাজী সংবাদপত্র হইতে গবর্ণমেণ্টের ঘোরতর অনিষ্ট হইতেছে। এই সকল সংবাদপত্রের শাসন করা গবর্ণমেণ্টের অবশ্য কর্ত্তব্য। এদেশস্থ ইংরাজেরা সর্ব্বদাই অহঙ্কার করিয়া বলিয়া থাকেন যে তাঁহারাই ব্রিটিশ

গবর্ণমেণ্টের প্রধান সহায়, কিন্তু তাঁহারা যে কিরূপে ও যে জন্য সহায়, সেরূপে ও সেজন্য সকলেই গবর্ণমেণ্টের সহায় হইতে পারেন, গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বদাই তোমার মন যোগাইয়া চলুন, সমুদায় উচ্চ পদ ও উচ্চ ক্ষমতা তোমাকে প্রদান করুন, আইন সকল তোমার মনোমত হউক, গবর্ণমেণ্ট তোমার কাল্পনিক স্বত্বেও হস্তার্পণ করিতে সাহসী না হউন, তুমি যাহা ভাল বলিবে তাহাই ভাল বলুন, তুমি যাহা মন্দ বলিবে তাহাই মন্দ বলুন, অর্থাৎ তোমাকেই গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বময় কর্ত্তা বলিযা স্বীকার করুন তবেই তুমি গবর্ণমেণ্টের সহায়, তবেই তুমি বাজভক্ত। এরূপ হইলে কে না রাজভক্ত, কে না সহায় হইতে পারে। তোমরা যে সকল রাজপ্রসাদ ভোগ করিতেছ তাহার শতাংশের একাংশও দেশীয় লোকদিগকে প্রদান কর দেখিবে তাহারা কিরূপ সহায় কিরূপ রাজভক্ত হয়। ৪র্থ—ইংরাজী সংবাদপত্র সকল দেশীয সংবাদপত্রের প্রতি গবর্ণমেণ্টের ক্রোধোৎপাদন করিবার মানসে দেশীয় সংবাদপত্রে লিখিত প্রস্তাব সকলের সমুদায অংশের যথাবিধি অনুবাদ না করিযা অসার ও বিরক্তিকর অংশের অনুবাদ কবিযা গবর্ণমেণ্টকে প্রকৃত অভিপ্রায় বুঝিতে দিতেছেন না। কিন্তু এটী দেশীয় সংবাদপত্রের একটী পবম সৌভাগ্য। এতকাল তাঁহাদের অরণ্যে রোদন হইত, এক্ষণে তাঁহাদের কথা গবর্ণমেণ্টের এবং প্রত্যেক ইংরাজের কর্ণে উঠিতেছে। অনুবাদক ইংরাজ সম্পাদকগণের এই কাপুরুষত্বহেতু এ সময় দেশীয় সম্পাদকগণের সাবধান হইযা কায্য কবা উচিত, তাঁহাবা এই সময যেন নিন্দিত না হন। এই তাঁহাদের বিদ্যা, বুদ্ধি বিজ্ঞতা স্বদেশানুরাগিতা ও বাজভক্তি প্রভৃতি পরিচয় দিবার সময়। এ সময যুদ্ধক্ষেত্র হইতে হটিযা গেলে নিশ্চয় চিরকালের জন্য পরাজয়, ক্রোধান্ধ হইয়া অধিক অগ্রসর হইলেও মৃত্যু। ৫ম—ইলবার্ট্ বিল একটী সামান্য বিষয়, কিন্তু জিদ বজায় রাখিবার জন্য এ দেশীয ইংবাজগণ ইহাকে তুমুল কবিয়া তুলিয়াছেন, ইহাতেও ভারতের একটী মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে। ইংলণ্ডের লোকে পুর্ব্বে ভারতের কথায় কর্ণপাত করিতেন না। এক্ষণে ইংলণ্ডের মহাসভাতে এ বিষযের আন্দোলন হইতেছে। অপরাপর স্থানেও এবিষয লইযা বক্তৃতা ও বাদানুবাদ চলিতেছে। অনুমান করি এই উপলক্ষে ইংলণ্ডে ভারত সম্বন্ধে একটী প্রবল সাধারণ মত বদ্ধমূল হইয়া উঠিবে। সুতরাং ইলবার্ট বিল বিধিবদ্ধ হইলে ও ভাবতের জয না হইলেও, ভারতের জয়। ৬ষ্ঠ—আমরা সকল কায্যেই ইংরাজদের অনুকরণ কবি। কিন্তু আমবা এতদিন একটী বিষয়ে তাহাদের অনুকরণ করিতে শিখি নাই। ভাল বিযযেই হউক আর মন্দ বিষয়েই হউক, ন্যায়ানুগত হউক আর অন্যায় হউক, সকল বিষয়েরই যে আন্দোলন করিতে হয় ইংরাজেরা আজ আমাদিগকে নূতন শিখাইলেন। এই সকল কারণেই বলি, ক্রোধের সময় কোন কাজ করা ভাল নয়, ক্রোধের অবস্থায যে অনিষ্ট চেষ্টা করা হয়, তাহাতে অপর পক্ষের মহৎ অভিষ্ট লাভ হইয়া থাকে। গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষ ও ভারত শত্রু ইংরাজগণ যদ্যপি বুদ্ধিমান হন, তাহা হইলে তাঁহারা ইলবার্ট বিলের দোষ-গুণ ও তৎসম্বন্ধে আপনাদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিবেন।

এক্ষণে কেবল ধৃষ্টতা ও চপলতা প্রকাশ করিয়া লোকের নিকট উপহাসাস্পদ হইতেছেন এবং তাহাদিগের চরিত্র কলঙ্ক কালিমায দিন দিন অঙ্কিত হইতেছে। এই নিমিত্তই আমরা দুঃখিতচিত্তে এত কথা কহিলাম।

জাতীয় বিদ্বেষ। ৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৯০

উদারচেতা শ্রীযুক্ত ইলবার্ট সাহেব ফৌজদারী আইনের যে অংশটুকু ইংরাজ নামের কলঙ্ক স্বরূপ হইয়া আছে, যে অংশ ইংরাজ নামের গৌরব বিলুপ্ত করিতে বসিয়াছে, সম্প্রতি সেই অংশের কিযৎপরিমাণে সংশোধন করিতে উদ্যোগী। উত্তরকালে পক্ষপাত ও জাতীয় বিদ্বেষ যাহাতে বিদূরিত হয় ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত। কিন্তু এতদ্দেশীয় প্রায় যাবতীয় শ্বেতাঙ্গ এবং শ্বেতাঙ্গের ধামাধারী যাবতীয় কৃষ্ণবর্ণ ইউরেসিযান সে মতের বিরোধী। বিলাতেরও অনুদারনীতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই এই সকল লোকের নৃত্যে তাল ধরিতেছেন। এই বিল বিধিবদ্ধ হইলে ইংরাজ জাতির কলঙ্ক ক্ষালিত হইবে বটে কিন্তু ভারতবাসীদের আশু ঘোর বিপদ দেখিতে পাই। ইংরাজ এবং ইউরেসিয়ানরা এ দেশীয় লোকের উপর যে প্রকার অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছেন তাহাতে এ দেশীয়ের পথে বহির্গত হওয়া দুষ্কর হইবে। আমরা দেখিতেছি নীচপ্রকৃতি ইংরাজ এবং ইউরেসিয়ানগণ এ দেশীয় কোন ব্যক্তিকে দেখিলেই কেবল কলহ করিবার ছল খুঁজিয়া বেড়ায়। গাড়িতে, পথে, ঘাটে, যেখানে সেখানে কেবল বিবাদ বাধাইয়া থাকে এবং মারপিট ও দাঙ্গা হাঙ্গামা করে। কথায় কথায় এদেশীয়দিগকে গালি দেয। কিন্তু কি আশ্চর্য্য কেবল আমরা যে গালি খাই এমত নহে। এই মহাপুরুষেরা মহানুভব লর্ড রিপণকে এবং উদারচরিত্র ইলবার্ট সাহেবকে গালি দিয়া রসনার পবিত্রতা সাধন করেন, দুর্লভ মানবজন্মের সার্থকতা লাভ করেন। ব্রাহ্মণেরা দেবার্চ্চনায় বসিলে অগ্রে গঙ্গোদকে আচমন পূর্ব্বক প্রণব সহিত বিষ্ণু নাম স্মরণ করেন। এই সকল ধর্ম্মিক প্রবল পুরুষপুঙ্গবেরা (ইউরোপীয়রা ও ইউরেসিয়ানরা) গঙ্গা মানেন না, বিষ্ণুতে ভক্তি নাই, এত দিন তাহাদের আচমন পদ্ধতি ছিল না, এখন তাহার আবিষ্কার হইয়াছে, ঈষৎ মুদ্রিত নয়নে বাইবেল পড়িতে বসিবেন—ইলবার্ট রিপণকে গালি দেওয়া তাঁহার আচমন স্বরূপ হইবে, চামচে কাঁটা লইয়া খানায় বসিবেন—তখন ঐ আচমন। বিলের ভাগ্যে যাহাই হউক, দেখিতেছি ভারতবর্ষে উপকারটা অনেক হইল। বিল পাস হউক আর না হউক আমরা ক্ষুণ্ণ নই। ক্ষুণ্ণ হইলে উপায় কি? সজ্জনের হাতে পড়িয়াছিল, এই প্রস্তাব উত্থাপিত হইল। বিলাতের মহাসভার সভ্যদিগের যদ্যপি ক্ষমতা থাকে, তাঁহারা বিল পাস করিয়া দিবেন। কিন্তু আমাদের আশু মঙ্গল বিলক্ষণ হইয়াছে।

কত কালে কত যুগযুগান্তরে যে মঙ্গলের মুখ আমরা কত কষ্টে দেখিতে পাইতাম, আজ অনায়াসে আমাদের ভাগ্যে তাহাই ঘটিয়াছে। ভারতবর্ষের কি হিন্দু কি মুসলমান, কি পার্সি, কি অন্যান্য জাতি সকলেই একপ্রাণ একদেহ হইয়াছেন। আজ আমরা মুসলমানের পারসি শিখের ভাই পারসি শিখ, মুলসমানেরা আমাদের অন্তরঙ্গ পরম-আত্মীয়, আর আমাদের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই, আমাদের জাতায় জীবন জন্মিবে। আমরা সকলে এক ভারতবর্ষবাসী জাতীয়ত্বসূত্রে আবদ্ধ আছি, আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্যজ্ঞান এখন বেশ বুঝিয়াছি। ভাই! মহম্মদের পথাবলম্বী। তোমরা কাছা খোল, দাড়ী নাড, দণ্ডে দণ্ডে উঠবস কর আমাদের কোন আপত্তি নাই। আমরা মাথা চাঁচি টিকি রাখি—তোমাদেরই বা আপত্তি কি? কিন্তু মনটা যেন জলে জল মিশিয়া থাকে। আর গোবধ লইয়া, বাজাবাজি তাজিয়া লইয়া বিবোধ কবিও না। ভ্রাতৃবিরোধ ঘোর অনিষ্টের মূল। সংসার ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে।

পাঠক! দেখুন ফৌজদারী আইনের মর্ম্মানুসারে ভারতবাসী মাত্রেই একঘরে হইয়াছে। ইলবার্ট বিলের বিদ্বেষ্টারাও একদিকে আমাদিগকে ঠাসিয়া ধরিয়াছে। বাঙ্গালী উত্তরপশ্চিমবাসী, দাক্ষিণাত্য ও হিন্দু মুসলমানে কোন ভেদ নাই, সকলের প্রতিই বিষনয়ন হইতে অগ্নি-বৃষ্টি হইতেছে। এমন স্থলে উপায় কি? সুতরাং ভারতবাসী মাত্রেই এক্ষণে একপ্রাণ হইয়া আপনাদেব স্বার্থবক্ষা করিতেছেন। ইহা অপেক্ষা আহ্লাদের বিষয় আর কি হইতে পারে? এক্ষণে ভারতবাসীদের সব্বতোভাবে সাবধান হওয়া উচিত। তাঁহারা যেন কোন বিষয়ে অস্থির হইয়া না পড়েন। আমাদের পরম হিতৈষী লড রিপণকে যেন কোন বিষয়ে দোষের ভাগী না হইতে হয়। যৎকালে লর্ড রিপণ এ দেশে আগমন করেন ভারতেশ্বরী নির্ব্বন্ধ সহকারে তাঁহাকে ভারতের হিতসাধন করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। লর্ড রিপণ স্বয়ং সদাশয়, তিনি সেই আদেশানুসারে যথাসাধ্য কার্য্য করিতেছেন ভারতের মঙ্গল সাধনের বি·য়ে তাঁহার কিছুমাত্র ঔদাস্য নাই। ঈদৃশ ক্ষেত্রে ভারতবাসীগণ সম্পূর্ণ শান্তভাব অবলম্বন করুন, তাঁহাদের যেন রাজভক্তির ত্রুটি না হয়। ভারতবিদ্বেষ্টা সাহেবেরা ইউরেসিয়ানেরা যাহাই বলুক যাহাই করুক আমরা সহিষ্ণুচিত্তে সকলি সহিব, আমরা বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের গুণে গদগদ হইয়া আপনাদের সদগুণের পরিচয় দিব। পাঠক! বুঝিয়া দেখুন, সুরেন্দ্রবাবুর কারাবাস কেন ঘটিল? সেখানেও জাতীয়বিদ্বেষ বিদ্যমান রহিয়াছে। জজেরা আপনাদের যতই নির্দ্দোষিতা প্রতিপাদন করুন, নানা কারণ দর্শাইয়া তাঁহারা যতই কেন সাফাই করুন না কিন্তু লোকের মন হইতে এ বিশ্বাস কিছুতেই দূরীভূত হইবে না। আবার দেখুন, বয়ঃক্রমের একটা ভীষণ ওজর বিলাতে গিয়া সিভিলিয়ন হইবার পক্ষে দুর্ভেদ্য লৌহপ্রাকার স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাতে সাহেবদিগের কালিমাখা মনে আহ্লাদ আর ধরে না, 'আমোদে সব ঢলিয়া পড়িতেছেন কিন্তু যেখানে

মুস্‌কিল সেখানেই আশান—এদিকে আবার দেশীয় সিভিলিয়নে দেশ পরিপুর্ণ হইতে লাগিল। তাহাতেও মহাপুরুষদের অন্তঃকরণ জর জর হইতেছে। আমরা তাই বলিতেছি, আমাদের বন্ধুর সংখ্যা অল্প, শত্রুই পদে পদে। সম্প্রতি ভারতবর্ষময় একটা মহা আন্দোলন পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু সাবধান কেহ যেন সীমার বহির্ভূত হইয়া না পড়েন। একদিকে ব্রান্সন সাহেব হাতে নুড়া ধরিয়া অগ্নি জ্বালিয়া দিয়া গিয়াছেন, হাইকোর্টের জজেরা আবার তাহাতে কুলার বাতাস দিলেন—দেশীয় লোকের মন ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে। কিন্তু অন্তর পুড়িলে কি হয় আমাদের সময় মন্দ, তেমন কপালজোরও নাই। আমরা তামা মুচির ধারে বাস করিতেছি এখনি হিতেবিপরীত হইবে। আমাদের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু, মহাত্মা লর্ড রিপণের অঙ্গে কলঙ্ক পড়িবে। সাবধান দেখিও বক্তৃতায় কিংবা কোন প্রবন্ধে যেন চপলতা প্রকাশ না পায়। অবশ্য সত্যকথা বলিতে ক্ষতি নাই। না বলিলে ভীরুতা প্রকাশিত হয়। কিন্তু "ন ব্রুয়াৎ সত্যম্প্রিয়ম্।" আমরা হৃদয়ের ব্যথা প্রকাশ করিব, কিন্তু ক্ষিপ্ত হইব না। আমরা রাজপুরুষদের দোষ ব্যক্ত করিয়া দিব, কিন্তু যথার্থ দোষ হইলেও তাহাকে দোষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিব না,—মানবধর্ম্মসুলভ ভ্রম বলিব। দোষ বলিলে আমরা নিজে দোষী হইব, আদালতে দণ্ড পাইব। কোন পদার্থের প্রকৃত নাম ধরিয়া ডাকিবার আমাদের ক্ষমতা নাই, স্বাধীনতাও নাই। একটু একটু ওষ্ঠ দুটি দাবিয়া দাঁত টিপিয়া আড়ে আড়ে কথা কহিতে হইবে, নতুবা সর্ব্বনাশ। কোন দিন বিপদ ঘটিবে। সমাজ সংস্কারকেরা আমাদের উপদেশ গ্রহণ করুন। তাঁহারা বড একটা বাড়াবাড়ি করিবেন না।

এ দেশীয় ও ইউরোপীয় বিচারপতি। ১ শ্রাবণ ১২৯০

ইলবার্ট বিলের বিদ্বেষ্টারা যাহাই বলুন আমরা কিন্তু এ দেশীয় ও ইউরোপীয় বিচারপতিগণের গুণ দোষের বিষয় বিশেষরূপে দেখিতে ও জানিতে পারিতেছি। সম্প্রতি আমাদিগের গ্রামে মারপিট ঘটিত একটা মকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল। সেই মকদ্দমার প্রসঙ্গে একজন ইতর লোক একদিন বলিল আসামীদিগের দণ্ড হইবে, কারণ এ মকদ্দমা বাবু কালীচরণ ঘোষের নিকটে উপস্থিত হইয়াছে। এখন ইংরাজ হাকিমদিগকে বরং ফাঁকি দেওয়া যায় কিন্তু বাঙ্গালি হাকিমদিগকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। বাঙ্গালী হাকিমেরা বড় কড়াকড় করেন। যতক্ষণ ঠিক বিচার না হয় ততক্ষণ ছাড়েন না। ফলে তাহাই ঘটিয়াছে। আসামীরা প্রতারণা জাল বিস্তার করিয়া এড়াইবার নানা প্রকার চেষ্টা পাইয়াছিল কিন্তু অব্যাহতি পাইতে পারে নাই। তাহাদিগের দণ্ড হইয়াছে। ইউরোপীয় বিচারপতির নিকটে যে অবিচার হয় আমরা কয়েক বৎসর হইল তাহারও একটা প্রমাণ পাইয়াছিলাম। একদা এক

ব্যক্তি আলিপুরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট একটি মিথ্যা মকদ্দমা উপস্থিত করিয়া আর এক ব্যক্তিকে দণ্ড দেওয়াইয়াছিল। কিন্তু কালীচরণবাবুর নিকটে সে রূপ ঘটনা হইল না। না হইবার অনেক কারণ আছে। কালীচরণবাবু এ দেশীয় লোকের আচার ব্যবহার ও মনের ভাব বিলক্ষণ বুঝিতে পারেন। যে ব্যক্তি যে ভাবে কথা কয় এ দেশীয় বিচারপতিরা তাহা অনায়াসে বুঝিয়া লন। কিন্তু ইউরোপীয় বিচারপতিরা তাহা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। সুতরাং প্রকৃত বিচারের অন্যথা ঘটিয়া উঠে। যাঁহারা ইলবার্ট বিলের বিপক্ষতাচরণ করিতেছেন, পাঠক এতদ্বারা তাঁহাদিগের অভিপ্রায় বুঝিয়া লউন। তাঁহাদিগের অভিপ্রায় এই—এ দেশীয় ও ইউরোপীয়ের কোন বিবাদ ঘটিলে ইউরোপীয়ের দণ্ড না হয়। ইউরোপীয় বিচারপতির নিকটে বিচারের ব্যবস্থা থাকাতে সে সুবিধাটি বিলক্ষণ আছে। কিন্তু এ দেশীয় বিচারপতির নিকটে বিচারব্যবস্থা হইলে সে সুবিধা থাকিবার সম্ভাবনা নাই। এই নিমিত্তই ইউরোপীয়েরা ইলবার্ট বিল যাহাতে বিধিবদ্ধ না হয় তন্নিমিত্ত উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। এ দেশীয় বিচারপতিগণের অযোগ্যতা ও অপবিত্রতার আশঙ্কা করিবার অন্য কোন কারণ নাই। কারণ এই যে এ দেশীয়েরা কোন বিষয়ে প্রাধান্য লাভ করিতে না পারেন, ইউরোপীয়েরা এ দেশীয়দিগকে মুষ্টি মধ্যে রাখিয়া একাধিপত্য করেন এই তাঁহাদিগের ইচ্ছা। কেবল এ দেশীয় বিচারপতি বলিয়া নয়, এদেশের অধিকাংশ কর্ম্মচারী অধিকতর বিশ্বস্ত ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হইয়া স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন করেন আমরা উপরে যে মকদ্দমাটার প্রসঙ্গ করিলাম সোনারপুর থানার সব ইন্‌স্পেক্টরবাবু বিনোদলাল মুখোপাধ্যায়ের উপরে তাহার তদন্তের ভার হইয়াছিল। তিনি যেরূপ অপক্ষপাতী হইয়া ঘটনাস্থলে সূক্ষ্ম অনুসন্ধান করিয়াছিলেন তাহা একান্ত প্রীতিকর ও প্রশংসার বিষয়। এইরূপ কার্য্যদক্ষ সচ্চরিত্র বুদ্ধিমান লোক পুলিসে প্রবেশ করাতে দিন দিন পুলিসের গৌরব বৃদ্ধি হইতেছে।

সেণ্ট জেমস হলের বিরাট সভা। ১৫ শ্রাবণ ১২৯০

কলিকাতা টাউন হলের ন্যায় বিলাতের সেণ্ট জেমস্ হলে ইলবার্ট প্রতিবাদার্থ একটি বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। ভারতের হিতাকাঙ্ক্ষী বলিয়া যাঁহারা প্রসিদ্ধ তাঁহারা এই সভার অনুষ্ঠাতা। অতি কষ্টে অতি যত্নে ও কৌশলে যাঁহারা এদেশীয়দিগের নিকট সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, যাঁহারা প্রকৃতি পত্রাবৃত রাখিয়া যশের তরিতে আরোহণ করিয়া তর তর বেগে ভাসিয়া স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন, ইলবার্ট বিলের প্রবল আন্দোলনে তাঁহাদের প্রকৃতির পত্রাবরণ উড়িয়া গিয়াছে, তাঁহারা যে ভারতবিদ্বেষ্টা সেই ভারতবিদ্বেষ্টাই প্রকাশিত হইয়াছেন। শৃগাল রজকের নীলে পতিত হইয়া শ্বাপদরাজ বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল, স্বজাতির সহিত আলাপ মাত্র

করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধও হইয়াছিল, কিন্তু সময় উপস্থিত হইলে বনের অপরাপর শৃগাল যখন ডাকিয়া উঠিল তখন প্রকৃতি গুণে নিজেও ডাকিতে আরম্ভ করিল। তেমনি যিনি যাহা বলুন ও যিনি যতই সম্মান লাভ করুন, এই ইলবার্ট বিল অনেকের ভুল ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। এই প্রস্তাব যদি উপস্থিত না হইত তাহা হইলে ব্রান্সন ও ফেসউইক প্রভৃতি সাহেবেরা যে কিরূপ প্রকৃতির লোক তাহা কে বুঝিতে পারিত? লেথব্রিজ সাহেব ভারতের শত্রু কি মিত্র কে তাহার অনুসন্ধান লইত? সেণ্ট জেমস হলের সভায় লর্ড রিপণের প্রিয় সভাসদ সার আলেকজাণ্ডার আরবুথনট সভাপতির আসন পবিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভূতপূর্ব প্রেস কমিশনর লেথব্রিজ, ফরেণ সেক্রেটারি সিটনকার, আসামের চীফ কমিশনর কর্নাল কিটিং, বোম্বাইয়ের সিবিলিয়ান রজার্স, মান্দ্রাজের ভূতপুর্ব্ব এডভোকেটের জেনেরল মেন, বঙ্গদেশের ভূতপুর্ব্ব কমিশনর রেবরেণ্ড জে. ফলি, রেবিনিউ বোডের ভূতপুর্ব্ব সভ্য বকলণ্ড সাহেব, কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতর ব্যাবিষ্টার ও ডয়েল, মহীসুররাজের ভূতপুর্ব্ব শিক্ষক কর্নাল মেলেসন, আসামের ভূতপুর্ব্ব চীফ কমিশনর জেনেরল হপকিন্সন, বোম্বাই গেজেটের ভূতপুর্ব্ব সম্পাদক ম্যাকলিয়ান, ভাবতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার ভূতপুর্ব্ব সভ্য বুনেন স্মিথ ও সভাপতি সর্ব্বশুদ্ধ এই তের জন বক্তৃতা করেন। এতদ্ভিন্ন অনেকে সভার পুষ্টিবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। বক্তাদিগের মধ্যে আবার সিটনকাব মেন ও ম্যাকলিয়ান আসর জাঁকাইয়া ছিলেন। এই সভায় বিলের স্বপক্ষ দুই এক জন লোকও ছিলেন তাঁহাদিগের ইহার উপযোগিতা প্রতিপন্ন করিবাব ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সভাপতি তাহা করিতে দেন নাই। আমরা উপরে যে কয়েকজন বক্তার নাম উল্লেখ করিয়াছি, এদেশীয়দিগকে গালি দেওয়াই তাঁহাদিগের বক্তৃতার বিষয়। যুক্তি দ্বারা এই আইনের অনুপযোগিতা কেহ প্রমাণ করিতে পারেন নাই। সাধারণতঃ সকলেই বলিয়াছেন ভারতবাসীর সহিত আমাদিগের জেতৃবিজিতের সম্বন্ধ অতএব ভারতবাসীরা ইউরোপীয়ের বিচার করিতে সক্ষম নহেন, তাহা হইলে জেতৃজাতির সম্মান রক্ষা হয় না। বিশেষতঃ এতন্নিবন্ধন ভারতবর্ষ ইংরাজেব হস্তচ্যুত হইবে। অতএব গবর্ণমেণ্টকে সর্ব্বত্র ইংরাজের গৌরব প্রভুত্ব ও শ্রেষ্ঠতা চিরকাল অক্ষুন্ন রাখিতে হইবে। এতভিন্ন তাঁহারা আর যাহা কিছু বলিয়াছেন তাহা নূতন নহে, সমস্তই চর্ব্বিত চর্ব্বণ।

সভাপতি আরবুথনট বলেন, উক্ত বিল বিধিবদ্ধ হইলে দেশীয়দিগের সহিত ইংরাজদিগের ঘোরতর শত্রুভাব জন্মিবে। ইংরাজদিগের দেওয়ানী মকদ্দমার ভার যখন দেশীয় বিচারপতির উপর প্রদত্ত হইয়াছিল তখনও অনেকে এই ধুয়া ধরিয়াছিলেন। কিন্তু যখন তাঁহারা অপক্ষপাত বিচারে সকলকে মুগ্ধ করিলেন, তখন সে আশঙ্কা আপনা হইতে দূরগত হইল। সেইরূপ উপস্থিত বিষয়ে তাঁহারা যে আপত্তি করিয়াছেন দেশীয় বিচারপতিদিগের দ্বারা ইউরোপীয় অপরাধীর অপক্ষপাত বিচার সন্দর্শন করিলে সে

আশঙ্কাও দূরগত হইবে। তবে যাঁহারা এই আইন বিধিবদ্ধ হইলে ভারতবর্ষে ইউরোপীয়-দিগের মূলধন বিনিয়োগে ব্যাঘাত হইবে বলিয়াছিলেন, সিটনকার সাহেব তাঁহাদিগের সে আপত্তি খণ্ডন করিয়া দিয়াছেন। বোম্বাইয়ের সিবিলিয়ান রজার্স সাহেব বলেন, ইংরাজেরা শিক্ষিত মাতার নিকট বাল্যকাল হইতে যে সত্যপরায়ণতা ও সম্মান জ্ঞান শিক্ষা করেন, দেশীয়দিগের সেরূপ শিক্ষা হয় না। সুতরাং দেশীয় বিচারপতির হস্তে তাঁহাদিগের বিচার-ভার সমর্পিত হইলে তাহাদিগের সম্মান রক্ষা হইবে না। কিন্তু এ কথার যে কোন মূল্য আছে আমাদিগের ত এরূপ বোধ হয় না। এ দেশীয় রমণীগণ ইউরোপীয় রমণীদিগের ন্যায় শিক্ষিতা না হউন, কিন্তু তাঁহাবা পুত্রকন্যাগণকে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা দিতে কদাচ যত্নের ত্রুটি করেন না। মান্দ্রাজের ভূতপূর্ব্ব এডভোকেট জেনেবল মেন সাহেব যে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন, তাহার একস্থলে বলিয়াছেন ৫৭ অব্দের সিপাহীবিদ্রোহের ন্যায় যখন কোন বিদ্রোহঘটনা হইবে তখন গবর্ণমেণ্ট কিরূপে দেশীয় বিচারপতির হস্তে ইউরোপীয় অপরাধীর বিচারভার অর্পণ করিবেন। আমরা ত একথার তাৎপর্য্য কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। ভারতবর্ষে দিবারাত্রি কি বিদ্রোহই হইতেছে? যাঁহারা এই আইনের সংশোধন প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাঁহাবা ভাবতবাসীর আভ্যন্তরীণ অবস্থা ও ইংরাজের প্রতি তাঁহাদিগের কিরূপ অবিচলিত ভক্তি তাহাব কি প্রমাণ পান নাই? ভারতবাসী বিশ্বাসঘাতক নহে। মূর্খ লোকেব বুদ্ধিভ্রমে বরং অনিষ্ট ঘটনা হইতে পারে, কিন্তু শিক্ষিত লোকের দ্বারা তাহার আশঙ্কা কি? যাহারা বিচাবকার্য্য সম্পন্ন করিবেন, তাঁহারা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের গুণে বদ্ধ হইযাছেন। অতএব তাঁহাদিগের উপর অকারণ দোষারোপ কবিয়া বক্তা নিজেই লঘুচিত্ততার পরিচয় দিয়াছেন। বঙ্গদেশের কমিশনার রেবরেণ্ড ফলি বলিয়াছেন ভাবতের শিক্ষিত সম্প্রদায় এই বিলের বিরোধী। এগুলি সম্পূর্ণ অলীক কথা। আপনাদিগের স্বার্থরক্ষা সম্ভ্রান্ত ইংরাজেরাও যে কিরূপ মিথ্যা কথা কহিতে পারেন, আজ যদি দেশীয়দিগেব মেকলের সদৃশ কোন লোক থাকিতেন, তাহা হইলে উপরিউক্ত বক্তাদিগের গুণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন সন্দেহ নাই। কর্নেল মেলেসন বাঙ্গালীদিগের যথেষ্ট নিন্দাবাদ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ভারতবাসীরা এই বিল চাহেন না। কতকগুলি বাঙ্গালী বালক মিথ্যা এই গোলযোগ তুলিয়াছে। তিনি স্ববাক্য সমর্থনার্থ কাশীর বাবু হরিশচন্দ্রের একখানি পত্র প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে নাকি লিখিত আছে কেবল বাঙ্গালীবা এই আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছে, অতএব ইহা দমন করা উচিত। তিনি আরও বলেন বাঙ্গালীরা মুসলমানের ক্রীতদাস ছিল, ইংরাজ শাসনে তাহারা উন্নত হইয়াছে। এক্ষণে প্রত্যুপকারের স্বরূপ ইংরাজ রাজ্যের বিনাশচেষ্টা দেখিতেছি। মেলেসন পাগলের ন্যায় যে সকল কথা বলিয়াছেন এ স্থলে আমরা তাহার প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছুক নহি, তবে তিনি হরিশচন্দ্রের যে পত্রের উল্লেখ করিয়াছেন আমরা তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি না। আর

যদিই ইহা সত্য হয় তাহা হইলে বাবু হরিশ্চন্দ্রের কথা ভারতবর্ষীয় জাতিসমূহের কথা বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না।

এ দেশীয়দিগের রাজনীতি ঘটিত উন্নতি হইয়াছে কি না?। ২৭ কার্ত্তিক ১২৯০

এদেশীয়দিগের রাজনীতি ঘটিত উন্নতিলাভের বিচার প্রসঙ্গে এদেশীয়দিগের বাস্তবিক কোন বিষয়ে কোন প্রকার সারবতী উন্নতি লাভ হইয়াছে কিনা? এ প্রশ্নেরও উদয় হইতেছে। আমরা চতুর্দ্দিকে উন্নতি উন্নতি-শব্দ শুনিতেছি নানা প্রকার উন্নতির চিহ্নও দেখিতেছি তবে কেন আমাদিগের মনে এ প্রশ্ন উত্থিত হইতেছে? উন্নতি শব্দ আমাদিগের শ্রবণবিবরে প্রবিষ্ট হইতেছে এবং উন্নতি চিহ্ন নয়নগোচর হইতেছে সত্য, কিন্তু এ দেশে একটি প্রবাদবাক্য আছে যে "ঝুটার বাহার বড়।" এই সামান্য প্রবাদবাক্য অসামান্য ভাবে ও অর্থে পরিপুরিত। কৃত্রিম পদার্থের প্রভা অকৃত্রিম পদার্থের অপেক্ষা অধিক উজ্জ্বল। আমরা যে উন্নতির প্রভা দেখিতেছি এ সেই কৃত্রিম উন্নতির প্রভা। তাই আমাদের চোখ ঝলসিয়া যাইতেছে এবং উন্নতি উন্নতি এই শব্দে কর্ণকুহর বধির হইতেছে। কিন্তু বাস্তবিক সারবতী উন্নতি কোথায়? আমাদিগের সারবতী উন্নতি হইয়াছে কিনা, ইহার মীমাংসা করিবার পুর্ব্বে আমরা যে উন্নতি লাভ করিয়াছি, তাহার স্বরূপ কি বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। বৎসর বৎসর সহস্র সহস্র লোক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিলাভ করিতেছেন। এটী কি উন্নতির চিহ্ন নয়? উন্নতির চিহ্ন বটে আমরা স্বীকার করি, কিন্তু এটী পাকা উন্নতি নয়। বিদ্যাশিক্ষা নিবন্ধন এদেশের কি পাকা কাজ হইতেছে? যাঁহারা বিদ্যালয়ে শিক্ষিত হইতেছেন তাঁহাদিগের মধ্যে কতকগুলি লোকের জীবিকার কিছু কিছু সুবিধা হইতেছে এই মাত্র। তাঁহারা ইংরাজের দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া মাগ ছেলে নিয়া সুখে কালযাপন করিতেছেন এই মাত্র। আর এক উন্নতি এই রেলওয়েতে ভ্রমণ করিতেছেন, ট্রামওয়ে চড়িতেছেন ও ঘোড়ার গাড়িতেও অরোহণ করিতেছেন। বিলাতি কাপড় পরিতেছেন, বিলাতি সৌখীন দ্রব্য উপভোগ করিতেছেন। যাঁহারা ইংরাজী দৃষ্টান্তে মদিরা পান করিতে শিখিয়াছেন, তাঁহারা বিলাতী মদ্য পান করিয়া আত্মাকে চরিতার্থকরিতেছেন। কিন্তু ইহাতে দেশের পাকা উন্নতি কি? আজ যদি ইংরাজেরা এ দেশ পরিত্যাগ করিয়া যান, কাল সমুদায় বিষয়ের বিপর্য্যয় হইবে। বিষম বিপ্লব ঘটিয়া উঠিবে। কোথায় রহিবে বিলাতী মদ, কোথায় রহিবে বিলাতি কাপড়, কোথায় রহিবে বিলাতী সৌখীন দ্রব্যের উপভোগ, কোথায় যাইবে রেলওয়ে, কোথায় যাইবে ট্রামওয়ে, কোথায় যাইবে ঘোড়ার গাড়ী, এ সমুদায়ই ফক্কিকাকার হইবে। এ দেশীয়দিগের যে চিরকেলে দুর্দ্দশা সেই দুর্দ্দশাই ঘটিবে। ইহাঁদিগকে আবার সেই পুর্ব্ববৎ পরপদানত হইয়া উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতে হইবে, ইহাঁদিগের অদৃষ্টে এই শোচনীয় ঘটনা কত শতবার ঘটিবে।

ইহাঁরা যখন যে উন্নতি লাভ করেন এ দেশের কোন পাকা উন্নতি হয় না বলিয়া জলবুদ্বুদের ন্যায় উন্নতি ক্ষণে উত্থিত হয়, আবার ক্ষণে বিলীন হইয়া যায়। পাঠকগণ আপনারা বলুন দেখি, ভারতের বাস্তবিক কোন উন্নতি হইতেছে? আজ যদি ইংরাজেরা এ দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যান আপনারা কি আত্মরক্ষণে সমর্থ হইবেন? আপনারা এখন যে সকল বিলাতী সৌখীন দ্রব্য উপভোগ করিতেছেন তখন কি বাণিজ্যতরী লইয়া সেই সকল দ্রব্য বিলাত হইতে আনিতে পারিবেন? আপনারা স্বাধীন হইয়া যদি আত্মরক্ষা করিতে না পারিলেন তবে আর আপনাদের উন্নতি কি? এ উন্নতি ত ইন্দ্রজাল। ভৌতিক ব্যাপার, ছায়াবাজি। বৈদান্তিকেরা যেমন বলেন সংসার মায়াময় কিছুই নয়, রজ্জুতে যেমন সর্পের ভ্রম হয়, আত্মাতে তেমনই জগতের ভ্রম জন্মিতেছে। আমরা যে সকল পদার্থ দেখিতেছি, তাহা বাস্তবিক পদার্থ নয়, ভ্রমমাত্র। আমরাও বলি, আমরা যে ভারতের উন্নতি দেখিতেছি, তাহাও সেই ভ্রম মাত্র। স্বাধীনভাবে কার্য্যকালে এ উন্নতির সহিত দেখাসাক্ষাৎ হইবে না। রাজনীতি ঘটিত উন্নতি সংসারী ব্যক্তির যাবতীয় উন্নতির মূল, যখন আমাদের সেই রাজনীতি ঘটিত উন্নতি নাই, তখন আর আমাদের উন্নতি কোথায়? যে দেশের লোকেরা রাজনীতি ঘটিত উন্নতি করিতে পারে নাই, সে দেশেব বাস্তবিক উন্নতি হয় নাই। প্রাচীন ভারত, প্রাচীন বোম ও প্রাচীন গ্রীস ইহার দৃষ্টান্ত। প্রাচীন আর্য্যেরা যখন রাজত্ব লাভ করিয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে পারিয়াছিলেন তখনই ভারতের বাস্তবিক উন্নতির প্রভা সমধিক উজ্জ্বল হইয়াছিল। সেই প্রভা পরাধীনতা ধূলিধূসরিত হইলেও আজও মিট্‌ মিট্‌ করিতেছে। তখন মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ব্যবস্থাপকগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন ব্যাস্ বাল্মীকি প্রভৃতি মুনিগণ জন্ম লইয়া ভারতভূমিকে নানা সাজে সাজাইয়াছিলেন। তখন কালিদাস ও ভবভূতি প্রভৃতি কবিগণ কবিতারস পান করাইয়া ভারতকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন, তখন ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, ভীম, অর্জ্জুন প্রভৃতি মহাবীরগণ জন্মলাভ করিয়া ভারতভূমিকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। এখন সে রাজনৈতিক স্বাধীন উন্নতি নাই। সুতরাং এখন সে সমুদায় স্বপ্নতুল্য হইয়াছে। প্রাচীন রোমের দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখ, সেখানেও দেখিতে পাইবে, রাজনৈতিক উন্নতি রোমকদিগের তাৎকালিক একাধিপত্য লাভের মূল। যখন প্রাকৃত দল অভিজাত দলের তুল্য উন্নতি লাভের সমর্থ হয়, সেই সময়ই রোমের উন্নতির উচ্চসীমা। গ্রীস দেশেও যখন স্পার্টা ও এথেন্স প্রভৃতি রাজনৈতিক উন্নতির উচ্চতর সোপানে অধিরূঢ় ছিল, তখনই তাহারা অদ্বিতীয় বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। ভারতে আর্য্যদিগের রাজত্ব লোপের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক উন্নতির লোপ হইয়া গিয়াছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে অন্য প্রকার উন্নতি সকলও প্রলয় কুক্ষিগত হইয়াছে। স্বেচ্ছাচারী মুসলমানদিগের রাজত্বকালে হিন্দুদিগের সেই রাজনৈতিক উন্নতির নামগন্ধও ছিল না। ইংরাজ অধিকারেও

সেই উন্নতির বিডম্বনা মাত্র হইয়াছে। বাস্তবিক আমাদের রাজনৈতিক উন্নতি কোথায়? রাজ্যের কোন কার্য্যে কি স্বাধীনভাবে আমাদের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার আছে? রাজপুরুষেরা কি সন্ধি বিগ্রহাদি বিষয়ে আমাদিগের সহিত মন্ত্রণা করেন, সেই সেই বিষয়ে কি আমাদিগের মত গ্রহণ করিয়া থাকেন? অন্য কথা কি রাজ্যের আয় ব্যয় চিন্তাতেও কি রাজপুরুষেরা আমাদিগকে অধিকার দিয়াছেন? ইংরাজ অধিকারে আমরা যে কেমন রাজনৈতিক উন্নতি লাভ করিয়াছি তাহার অন্য প্রমাণ দিবার প্রয়োজন নাই, এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে আমরা যে অর্থ রাজস্ব বলিয়া রাজকোষে প্রদান করিয়া থাকি তাহারও ব্যয় বিষয়ে আমাদিগের বাঙনিষ্পত্তি করিবার অধিকার নাই। সেই অর্থ কি রূপে ব্যয় করিলে আমাদিগের মঙ্গল হয়, কি রূপে ব্যয় করিলে আমাদিগেব অনিষ্ট হয় সে কথা কহিবারও অধিকার নাই। রাজপুরুষেরা স্বেচ্ছাচারী হইয়া সেই অর্থের ব্যয়কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। তাঁহারা সে টাকা জলে ফেলিয়া দিন, লুটাইয়া দিন, আর দেশে লইয়া যাউন আমাদিগকে বোবা হইয়া দেখিতে হইবে, বধির হইয়া শুনিতে হইবে। ইংরাজ অধিকারে আমাদের যে রাজনৈতিক উন্নতি নাই এবং রাজপুরুষেরা যে সেই উন্নতি দানে ইচ্ছুক নহেন, তাহা লর্ড রিপণ বাহাদুরের স্বাধীন আত্ম-শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তন চেষ্টা দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে। রিপন বাহাদুরের ন্যায় যাঁহাদিগের চিত্ত একান্ত উন্নত, তাঁহারা এদেশীয়দিগকে রাজনীতি সম্বন্ধে উন্নত করিয়া তুলিবার চেষ্টা পাইতেছেন, কিন্তু যাঁহাদিগের চিত্ত অনুন্নত তাঁহারা মহাবিপক্ষ হইতেছেন। আমাদিগের যে রাজনীতি সংক্রান্ত উন্নতি নাই তাহার অপর প্রমাণ এই, ভারতের যে শাসনপ্রণালী আছে, তাহাতে ভাবতবাসিদিগের রাজনৈতিক উন্নতিলাভের সম্ভাবনা নাই। এই শাসনপ্রণালীর বিশেষরূপ পরিবর্ত্তন ব্যতিরেকে এদেশীয়দিগের রাজনৈতিক উন্নতি যে কোন কালে ঘটিবে তাঁহার সম্ভাবনা নাই। যে সমস্ত মহাপুরুষ রাজপুরুষ আমাদিগের উন্নতি সম্পাদনের চেষ্টা পাইতেছেন তাঁহারা অগ্রে বর্ত্তমান শাসনপ্রণালীর পরিবর্ত্তনের সঙ্কল্প ও স্বস্তিবাচন করুন। তাহার পর আমাদিগের উন্নতিব চেষ্টা করিবেন। শাসনপ্রণালীর পরিবর্তন একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। যে পুষ্করিণী দীর্ঘকাল একবিধ অবস্থায় থাকে, তাহা পানা দাম ও শৈবালাদি দ্বারা পরিপুরিত হইয়া উঠে, তাহার জল অপেয় হয়, তাহার ব্যবহার্য্যতা থাকে না। ভারতের শাসনপ্রণালী দীর্ঘকাল একভাবে চলিয়া আসিতেছে। তাহার অবয়ব পানা, দাম ও শৈবালাদির দ্বারা পরিপুরিত হইয়া উঠিয়াছে, উহার পঙ্কোদ্ধার না করিলে আর চলে না। ভারতের বর্ত্তমান শাসন প্রণালীর সংস্কার হইবার পুর্ব্বসূচনাও হইয়াছে। ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্ট সভায় ভারতের শাসনপ্রণালীর দোষগুণ লইয়া তর্ক বিতর্ক ও বাদানুবাদ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইংলণ্ডে যাঁহারা ভারতের কর্ত্তা আছেন তাঁহাদিগের ভারতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কর্ত্তৃত্ব করিবার ইচ্ছাও জন্মিয়াছে। কর্ত্তৃত্ব করিবার লোভ বড় লোভ। এ লোভ পরিত্যাগ করা বড় কঠিন।

মাংসল উদ্ধত যুবা বরং সুন্দরী স্ত্রীর লোভ পরিত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু যাহার হাতে প্রভুত্ব থাকে সে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কর্তৃত্ব করিবার লোভ পরিত্যাগ করিতে পারে না। ভারতের মফঃস্বলস্থ ইউরোপীয় কর্ম্মচারীরাই তাহার প্রধান প্রমাণ। আইন কানুনে পদাঘাত করিতে হয়, তাহাও তাঁহারা করিতে পারেন, কিন্তু একাধিপত্যের লোভ ত্যাগ করিতে পারেন না। অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে ভারতের শাসনপ্রণালীর সম্বন্ধে অচিরেই একটি মহান বিপ্লব উপস্থিত হইবে। নিম্নলিখিত প্রকারে সেই পরিবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। গবর্ণর জেনেরলের যে সভা আছে তাহা ইংলণ্ডে পার্লিয়ামেণ্ট সভার অনুকরণে বিরচিত হউক। তাহাতে মফস্বলবাসী কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি ইউরোপীয় সকলেরই প্রতিনিধি প্রেরিত হউক। প্রেরিত প্রতিনিধিগণ রাজনীতির পর্য্যালোচনা করিবেন। যে সকল প্রয়োজনীয় বিশেষ আইন বা কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, ঐ সভায় তাহার আন্দোলন হইবে, এবং রাজ্যের আয় ব্যয়েরও পর্য্যালোচনা হইবে। তাহা হইলেই এদেশীয়েরা ক্রমে রাজনীতি সম্বন্ধে উন্নতি লাভে সমর্থ হইবেন। আমরা পুর্ব্বে কহিয়াছি পুনবায কহিতেছি রাজনীতিঘটিত উন্নতি না হইলে কোন উন্নতি স্থায়ী হয় না। ঐ পরিবর্ত্তনের আরও একটী মহৎ লাভ হইবে। রাজ্যে প্রাদেশিক গবর্ণব ও লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর প্রভৃতির যে সকল সভার ও ব্যবস্থাপিক সভার আড়ম্বর আছে তাহা অন্তর্হিত হইবে, এবং ব্যয়েরও অনেক সংক্ষেপ হইযা আসিবে, স্বেচ্ছাচারিতও অস্তগত হইবে।

জমিদারদিগের সভা। ১১ অগ্রহায়ণ ১২৯০

১৭ই নবেম্বর কলিকাতা টাউন হলে জমিদারদিগের একটা সভা হইয়া গিয়াছে, এদেশীয় ও ইউরোপীয় অনেক জমিদার তথায় উপস্থিত ছিলেন। বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র এল. এল. ডি. সি. আই. ই. সভাপতির আ! ন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি উৎসাহদায়িনী অতি সুন্দর একটী বক্তৃতা কবিয়াছেন। খাজনা সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলেখ্যের বিষয়ে প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারীদিগের মত গ্রহণ করা হইয়াছিল। অধিকাংশ কর্ম্মচারী ঐ পাণ্ডুলেখ্যের বিরোধী মত প্রকাশ করিয়াছেন। গবণর জেনেবলের নিকটে এবং ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারির নিকটে আবেদন করা সভায স্থির করা হইয়াছে। আমরা দেখিতেছি, জমিদারেরা কিছু ভীত হইয়াছেন। ভীত হইবারও কথা বটে, তাঁহাদিগের চিরকেলে স্বত্ব ধ্বংস হইতে বসিয়াছে। এই পাণ্ডুলেখ্যটি যদি বিধিবদ্ধ হয়, প্রজারা জমিদার ও জমিদারেরা প্রজা হইয়া উঠিবে। কে জমিদার কে প্রজা চিনিয়া উঠা ভার হইবে। কিন্তু আমরা শঙ্কার তত কারণ দেখিতেছি না। ইলবার্ট বিল ও রেণ্টবিল দুটী উপস্থিত। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট একটী ছাড়িয়া আর একটী বিধিবদ্ধ করিতে পারিবেন না। ইলবার্ট বিল যদি

বিধিবদ্ধ না করেন, তাহা হইলে রেণ্টবিলও বিধিবদ্ধ করিতে পারিবেন না। ইলবার্ট বিল বিধিবদ্ধ করিবার বিষয়ে যেরূপ সৎ ও প্রবল হেতু আছে রেণ্টবিল সম্বন্ধে সেরূপ নাই। এদেশীয়েরা উপযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহারা এদেশীয়দিগের দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয়বিধ মকদ্দমার উত্তমরূপ বিচার করিতেছেন এবং ইউরোপীয়দিগের দেওয়ানী মকদ্দমারও সুবিচার করিতেছেন। তাঁহাদিগের বিচার করিবার ক্ষমতার সকলেই প্রশংসা করিয়া থাকেন। তাঁহারা আইনের সূক্ষ্মতত্ত্বও বুঝিতে পারেন। এমন উপযুক্ত বিচারপতিব হস্তে যদি ইউরোপীয়ের ফৌজদারী মকদ্দমাব বিচাবভার দেওয়া না হয়, তাহার পর অন্যায় ও পক্ষপাত আর নাই। না দিবার যুক্তি কি? এদেশীয়েরা যদি অযোগ্য হইতেন তাহা হইলে সঙ্গত যুক্তি থাকিত, অযোগ্য ব্যক্তির হস্তে কিরূপে গুরুতর বিচারভা‌র সমর্পণ করা যাইবে। যদি সে যুক্তি না রহিল, তবে আব যুক্তি কি? এদেশীযেরা ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী। এ যুক্তি সভ্য জাতির নিকটে কোনরূপে আদৃত হয় না। গোশেন সাহেবের লর্ড রিপণের পর ভাবতবর্ষেব গবর্ণব জেনেরল হইবার কথা হইতেছে। তিনি জাতিতে ইহুদি, ধর্ম্মেও ইহুদিধর্ম্মাবলম্বী। তিনি যদি কেবল এক যোগ্যতাবলে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল হইতে পারেন, তাঁহার জাতি ও ধর্ম্ম যদি প্রতিবন্ধকতাচরণ না করে, যোগ্য ভারতবাসীর জাতি ও ধর্ম্ম প্রতিবন্ধক হইবে কেন? যদি বল পরাজিত জাতি ভারতবর্ষীয়েরা জেতৃ-জাতীয় ইংরাজদিগের বিচারকার্য্যে অধিকারী নয় এ যুক্তিরও সভ্য সমাজে আদর নাই। রোমকেরা যখন অতিশয় সভ্য হয়, তখন পরাজিত জাতীয়েরা জেতৃজাতীয়দিগের সমকক্ষ হইয়া সমুদায় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিল। ভাবতেশ্বরী নিজ উদার ঘোষণাতেও রাজকার্য্যের ভার সমর্পণ বিষয়ে ইংরাজ ও এদেশীয়ের কোন ভেদ করিবেন না, এ কথা স্পষ্ট বলিয়াছেন। অতএব এখন যদি ইলবার্ট বিল বিধিবদ্ধ করা না হয়, তাহা হইলে যে কেবল পক্ষপাত হইবে তাহা নহে, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ দোষও ঘটিয়া উঠিবে। পক্ষান্তরে, রেণ্টবিল যদি বিধিবদ্ধ করা হয়, তাহা হইলে পক্ষপাত দোষ ঘটিবে। যাহাব যে ভূমিতে কোন পুরুষে স্বত্ব নাই, তাহাতে তাহার স্বত্ব জন্মাইয়া দেওয়া হইবে। আর যাহার যে ভূমিতে পৈতৃক স্বত্ব আছে, তাহাকে তাহা হইতে বঞ্চিত করা হইবে। অতএব রেণ্টবিল বিধিবদ্ধ করিলে কেবল পক্ষপাত নয়, যারপব নাই অন্যায় করা হইবে। অতএব আমবা দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যদি ইলবার্ট বিল বিধিবদ্ধ না করেন, রেণ্টবিলও বিধিবদ্ধ করিতে পারিবেন না। বিশেষতঃ রেণ্টবিল এখন যে অবস্থায় আছে, এ অবস্থাতেও বিধিবদ্ধ করা ন্যায়ানুগত হইবে না। এ অবস্থায় ইহাকে বিধিবদ্ধ করিতে গেলে, আমরা উপরে যে পক্ষপাত ও অন্যায় হইবার কথা বলিয়াছি, তাহাই ঘটিয়া উঠিবে। গবর্ণমেণ্ট মনে করিতেছেন, রেণ্টবিল বিধিবদ্ধ করিলে প্রজারা সুখস্বচ্ছন্দায়াসী হইবে। বাস্তবিক সে ঘটনা হইবার সম্ভাবনা নাই। কৃষকদিগের এখন যে অবস্থা আছে তাহার কিছু সচ্ছল হইলে তাহারা অধিকতর বিলাসী ও অব্যবস্থিত হইয়া উঠিবে। বৃথা ব্যয়ে

মত্ত হইবে। যদি তাহাদিগকে হস্তান্তর করিবার যোগ্য দখলীস্বত্ব দেওয়া হয় তাহা হইলে তাহারা সেই স্বত্ব হস্তান্তর করিয়া পৌত্র, পুত্র পৌত্রাদির বিবাহে ঘটা করিবে, তাহা হইলে তাহাদিগের যে অবস্থা মন্দ, সেই অবস্থাই থাকিবে। বস্তুতঃ বলপূর্ব্বক প্রজার নূতন স্বত্ব ঘটাইয়া দিলে তাহাদিগের বিশেষ উপকার হইবে না। জমিদারের অনিষ্ট করা হইবে, এবং প্রজার ও জমিদারে শক্রতা বৃদ্ধি হইয়া বিবাদের স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকিবে। আমাদিগের শেষ বক্তব্য এই, জমিদারেরা যেরূপ উদ্যোগ করিতেছেন সেইরূপ করুন, যেরূপ আন্দোলন করিতেছেন, যেরূপ তারস্বরে চীৎকার করিয়া আত্মমনোভাব রাজগোচর করিবার চেষ্টা করিতেছেন সেইরূপ করুন, নিরীহ ভালমানুষটী হইয়া মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিলে আমাদিগের রাজপুরুষগণের নিকটে নিস্তার থাকে না। যিনি চুপ করিয়া রহিলেন, আমাদিগের রাজপুরুষেরা তাঁহাকে সন্তুষ্ট বিবেচনা করিয়া স্থির করিলেন, তাহার কোন দুঃখ ও বিজ্ঞাপয়িতব্য নাই। অতএব জমিদারদিগের কর্ত্তব্য জমিদারেরা করুন, কিন্তু আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিতেছে ইলবার্ট বিল যে আকারে প্রস্তুত হইয়াছে তাহার পরিবর্ত্ত করিয়া যদি বিধিবদ্ধ করা হয়, রেণ্টবিল অপরিবর্ত্তিতভাবে বর্ত্তমান আকারে যে বিধিবদ্ধ হইবে, তাহা সম্ভাবিত নয়। যাহা হউক, জমিদারেরা যেন আন্দোলন-কার্য্যে কোন ক্রমে বিরত না হন। বালকদিগের রোদন যেমন বল, আমাদিগের রাজপুরুষগণের নিকটে আন্দোলন তেমনি নিরুপায়ের বল।

ইলবার্ট বিল পাস হইয়াছে—কাহার কি লাভ হইল? ১৫ মাঘ ১২৯০

২৫শে জানুয়ারী ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় ইলবার্ট বিল পাস হইয়া গিয়াছে। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত হইয়া দেশ দগ্ধ করিতেছিল, আপাততঃ তাহার শান্তি হইল। আপাততঃ এ কথা কহিলাম তাহার কারণ এই গিরিটা তখন অনুন্মূলিত রহিল, তখন ভবিষ্যতে যে ধাতু নিঃস্রব হইয়া দেশকে উদ্বেগিত করিবে না তাহার সম্ভাবনা নাই। এখন কাহার কি লাভ হইল, তাহার গণনা করিয়া দেখা উচিত। ইলবার্ট বিলের অভিনয়ক্ষেত্র ভারতবর্ষ। অতএব ভারতবাসীরা ইহাতে কি লাভবান হইলেন, সর্ব্বাগ্রে তাহারই গণনা করা কর্ত্তব্য। আমাদের দেশের লোকের অনেকের অসন্তোষ দেখিতে পাইতেছি বটে, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় ভারতবাসীর সম্পূর্ণ জয়লাভ হইয়াছে। পরাজিত জাতির কখনই সহসা সম্পূর্ণ শ্রেয়োলাভ হয় না। সভ্যজাতীয়ের অনেকের হৃদয়ে ন্যায়পরতা প্রবল বটে কিন্তু উহা এ রূপ প্রবল নয় যে জেতৃজাতীয় গর্ব্বকে সম্পূর্ণ খর্ব্ব করিয়া রাখিতে পারে। তবে একটু বিশেষ এই অন্যায়কারিতার নিন্দা ন্যায়পর ব্যক্তির হৃদয়ে অতিশয় আঘাত করে। প্রতিনিয়ত উত্তেজনা করিলে তাঁহারা তাহা সহ্য করিতে পারেন না। অবশেষে তাঁহাকে ন্যায়ের নিকটে মস্তক

নত করিতে হয়। এ দেশীয়ের নিকট ইউরোপীয় অপরাধীর ফৌজদারী মকদ্দমার বিচার-ব্যবস্থা ছিল না, তাহা হইল। প্রথম পথপাতিত করাই কঠিন। একবার পথ পাতিত হইলে ক্রমে তাহা প্রশস্ত হইয়া উঠে। স্রোতবাহিনী নদীর বাঁধ যদি এক স্থানে ভগ্ন হয়, স্রোতোবেগ ক্রমে সমুদায় বাঁধকে মুখে করিয়া লইয়া যায়। এ বাঁধ যে ভাঙ্গিল, ইহার আর সংস্কার করিবার সম্ভাবনা নাই। ভগ্ন বাঁধের মুখ উত্তরোত্তর প্রশস্তই হইতে থাকিবে। ইউরোপীয় অপরাধীর ফৌজদারী মকদ্দমার জুরি ব্যবস্থা হইল, এ দেশীয়ের বিচারকালে তাহা স্থান পাইল না। এ উদ্‌গ্রীব অন্যায় দ্বিতীয় লর্ড রিপন কি সহ্য করিতে পারিবেন? হয়, ইউরোপীয় অপরাধীর জুরীর বিচার উঠিয়া যাইবে, নতুবা এদেশীয়ের বিচারকালে জুরির ব্যবস্থা হইবে। অপর এ জুরি ব্যবস্থা যে অব্যাহত থাকিবে, সে বিষয়েও আমাদিগের ভীষণ সন্দেহ আছে। ইংরাজজাতির সকলেই ব্যবসায়ীর দল নহে। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেক উদারহৃদয় ধার্ম্মিক রাজনীতিজ্ঞ আছেন। জুরির ব্যবস্থা নিবন্ধন যদি সদ্বিচারের ব্যাঘাত হয়, তাদৃশ মহাপুরুষেরা কখনই উহার অনুমোদন করিবেন না। ইলবার্ট বিল এক্ষণে যে রূপে বিধিবদ্ধ হইল, যাঁহারা ভবিষ্যদর্শী, তাঁহারা স্থানে স্থানে সভা করিয়া লর্ড রিপণ বাহাদুরের নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন ও ধন্যবাদ প্রদান করেন। আমরা তাঁহাদিগকে আরো একটী কথা স্মরণ করাইয়া দিই—"বসিতে পাইলে ক্রমে শুতে পাওয়া যায়" এ বাক্যটীরও অর্থ যেন একবার চিন্তা করেন। প্রতিবাদকারী ইউরোপীয়দিগের কি লাভ হইল, এক্ষণে তাহার গণনা করা হউক। আমরা নূতন অবয়বে বিধিবদ্ধ ইলবার্ট বিলটীর যে ভাবার্থ বুঝিতেছি, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে, প্রতিবাদকারী ইউরোপীয়দিগের সম্পূর্ণ পরাজয় হইয়াছে। ফৌজদারী মকদ্দমা সম্বন্ধে এদেশীয় বিচারপতির নিকটে তাঁহারা মস্তক নত করিবেন না, তাঁহাদিগের এই দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞা ছিল, তাহা ভঙ্গ হইয়া গেল। পরাজয় আর কাহার নাম? তবে তাঁহাদিগের এই একটী লাভ, ভ্রান্তিময় অভিমান চরিতার্থ হইয়াছে। এদেশীয় বিচারপতির নিকটে তাঁহাদিগের একটী খেয়াল উঠিয়াছিল, তাঁহাদিগের প্রস্তাবিত জুরি ব্যবস্থাটি গবর্ণমেণ্টের স্বীকৃত হওয়াতে তাহা পূর্ণ হইল এই মাত্র। তাঁহারা সেই অভিমান লইয়া এখন চিত্তের পরিতৃপ্তি সাধন করুন। ফলতঃ এদেশীয়দিগের ন্যায় তাঁহাদিগের কোন সারবৎ অভীষ্ট লাভ হয় নাই। বস্তুগত্যা বিবেচনা করিতে গেলে স্পষ্ট বোধ হয় তাঁহাদিগের আবদেরে বালকের প্রমোদ মোদক লাভ হইয়াছে মাত্র। ইলবার্ট বিলটী বিধিবদ্ধ হওয়াতে সাধারণ্যে ইংরাজ জাতির মহা লাভ হইয়াছে। জেমস ষ্টিফেন সাহেব ইংলণ্ডেশ্বরীর ঘোষণা-পত্রের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহা যদি আমাদিগের পরম ধার্ম্মিক রিপণ বাহাদুরের অনুমোদিত হইত, তাহা হইলে ইংরাজ জাতিতে আর পদার্থ থাকিত না। তাঁহাদিগের অযশের ও অগৌরবের একশেষ এবং তাঁহাদিগের বাক্য তৃণতুল্য উপেক্ষিত হইত। প্রজার যারপর নাই বিরাগ জন্মিত। যে রাজা প্রজার বিরাগভাজন হন, তাঁহার রাজ্য কখন

স্থায়ী হয় না। ইতিহাস চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া ইহা সুন্দররূপে দেখাইয়া দিতেছে। কি কারণে, কেন রাজ্যের রাজত্ব গেল? কি কারণে সিরাজউদ্দৌলার রাজত্ব ইংরাজের হস্তগত হইল, যে দেশের প্রজারা শান্ত প্রকৃতি ও দৃঢ়তর রাজানুগত, সে দেশে রাষ্ট্রবিপ্লব কদাচিৎ ঘটনা, আমরা সেই স্থানেরই উদাহরণ প্রদর্শন করিলাম। আর যে দেশের প্রজারা উদ্ধত, রাজাকে দেবতা জ্ঞান না করিয়া সামান্য মানুষ জ্ঞান করে এবং যে দেশের রাজা প্রজার কোপে পতিত হইয়া নিহত হয়, সে দেশের কথা কি বলিব। ফলতঃ লর্ড রিপণ বাহাদুর ঐ একটী কার্য্য দ্বারা ভারত সাম্রাজ্যের চিরস্থায়িতা বিধান করিলেন। উপসংহারে আমরা লর্ড রিপণ বাহাদুরের সৌজন্যের উল্লেখে বিমুখ হইতে পারিলাম না। অনরেবল আমীর আলী তাঁহার গবর্ণমেণ্টের সবিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন। লর্ড বাহাদুর তাহার এরূপে প্রত্যুত্তর দান করিয়াছেন যে তিনি সে প্রশংসাবাদ স্বীকার করিয়া লন নাই। এস্থলে আমাদিগকে অতি ব্যথিত-হৃদয়ে একটী বিষয়ের উল্লেখ করিতে হইল। অনরেবল কৃষ্ণদাস পাল সভাস্থলে দেশের লোকের মনোভাবের স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন, তন্নিমিত্ত ইভান্স সাহেব তাঁহাকে ব্যঙ্গ করেন। যে সভা দেশের সদাচারের আদর্শ সেখানে এরূপ অভদ্র ব্যবহার যারপর নাই দুঃখের বিষয়। ইহার কিছু শাসন হওয়া উচিত ছিল।

স্বদেশী ও বিদেশীয় রাজার অধিকার। ১৮ আশ্বিন ১২৯১। ৪৬ সংখ্যা

বিদেশীয় রাজ্যের অধিকার হইলে প্রজারা পরাধীন হইয়া পড়ে। পরাধীনতার মহা অনিষ্টকর মারাত্মক নানাবিধ দোষ আছে। এই ইংরাজ অধিকারে সেই দোষগুলি পরিস্ফুট হইতেছে। যেমন দাসেরা পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে মন্দবুদ্ধি ও অলস হইয়া যায় তেমনি পরাধীন ব্যক্তিদিগেরও সন্তান সন্ততি কি শরীর মন সকল অংশেই বীর্য্যহীন হইয়া পড়ে। ভারতবাসীরা অল্পকালের পরাধীন নন। মুসলমান অধিকারে ইঁহাদের যে কিছু স্বাধীনতা ছিল, ইংরাজ অধিকারে তাহার বহুল ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। আমরা হাত পা নাড়িয়া কিছু করিতে চলিতে বা বলিতে চাই না। যেমন স্বাধীনতা হারাইয়া পরাধীন হইয়াছি, তেমনি পরাধীন হইয়া দুই চারি টাকা আনিতে পারিলেই আত্মাকে চরিতার্থ ও সুখিত জ্ঞান করিয়া থাকি। যাহার দুইশত টাকা মাহিয়ানা হইল, তিনি জগৎকে তৃণ দেখিতে লাগিলেন, বিষম বাবু হইয়া সমুদায়ই আত্মাতে পর্য্যবসিত হইল। তিনি আর স্বার্থ ছাড়া চলেন না, স্বার্থ ভিন্ন অন্য কথা শুনেন না, তাঁহার চিত্তবৃত্তি গ্রহণের ন্যায় স্বার্থকক্ষতে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতে থাকে। পরের কার্য্যে তাঁহার মন যায় না। সুতরাং তিনি দেশের শুভাশুভ চিন্তা করিবার অবসর পান না। যাঁহার মন অন্য দিকে যায় না, যাঁহার চিন্তা অন্য দিকে ধায় না, তিনি যে বুদ্ধির উদ্ভাবনী শক্তি বিনিযোগ করিয়া দেশের একটী মঙ্গলকর কাণ্ড করিয়া তুলিবেন, তাহার সম্ভাবনা কি?

আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা শিল্প ও বিজ্ঞান বিষয়ে যে কিছু উন্নতি করিয়াছেন সে সমুদায়ই ক্রমে লয় প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন আর তাহার চিহ্নমাত্র নাই। অন্য কথা কি, সেগুলি কোন গ্রন্থে বর্ণিত দেখিলে এখন কবি কল্পিত বলিয়া বোধ হয়।

পরাধীনতা যে উন্নতির প্রধান প্রতিবন্ধক এবং পরাধীনতা হইতে পুর্ব্ব উন্নতির যে লোপ হয়, তাহা ইংরাজ অধিকারে বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইতেছে। ইংরাজেরা এদেশীয়দিগকে নানা বিষয়ে শিক্ষাদান করিতেছেন বটে, কিন্তু ইহাদিগের উন্নতিলাভের পথ সুন্দররূপে পরিষ্কৃত করিয়া দিতেছেন না। প্রথমতঃ এ দেশীয়দিগের রাজনীতি সম্বন্ধে স্বাধীনতা নাই। এদেশীয়দিগকে মুষ্টিমধ্যে রাখিয়া শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান রাজনীতি। রাজনীতিঘটিত স্বাধীনতা সকল উন্নতির মূল। যখন সে স্বাধীনতা নাই, তখন সমুদায় উন্নতির পথই এক প্রকার বন্ধ হইয়া আছে। পরাধীনের উচ্চ করিয়া চীৎকার করিবার যো ও নাই। সে চীৎকারে রাজপুরুষদিগের সুখনিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যায়, তাঁহারা বিরক্ত হইয়া উঠেন। চীৎকারকারী আর যাহাতে চীৎকার করিতে না পারে, সেই চেষ্টা পাওয়া হয়, কিন্তু যে মূল হইতে সে চীৎকার উত্থিত হয়, তাহার উন্মূলন চেষ্টা পাওয়া হয় না। পরাধীন হইলে যে দুভাগ্য হয়, তাহাই তাহার কারণ।

পরাধীনতা হইলে দেশের শিল্প বিজ্ঞান বাণিজ্যাদি বিলুপ্ত হয়, মানুষ সকল অসার অপদার্থ হইয়া যায়, তাহাদিগের শৌর্য্য বীর্য্য বুদ্ধিস্ফুরণ প্রভৃতি অস্তগত হয়। এই নিমিত্তই পরকীয় রাজা দেশ জয় করিতে আইলে, দেশবাসীরা প্রাণপণ করিয়া স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করে। এই কারণে প্রাচীনকালে ইউরোপ ও আসিয়াখণ্ডে জনবিমর্দ্দনকারী বৃহৎ বৃহৎ যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, এখনও হইতেছে। দেশের পরাধীনতা হইলে এই দুর্দ্দশা হওয়া যখন নিশ্চিত তখন যে ভারতের প্রাচীন উন্নতিসূচক শিল্পাদি চিহ্ন বিলুপ্ত হইবে, তাহা বিস্ময়াবহ নহে। এখনও যে কিছু উন্নতিচিহ্ন আছে তাহাও ইউরোপের শিল্প বাণিজ্য প্রভাবে দিন দিন লোপ পাইতেছে, দেশীয় শিল্পীরাও দিন দিন অন্নহারা হইতেছে। যদি কোন রাজপুরুষ নিজ উদারতাগুণে তাহাতে ঠেকো দিবার চেষ্টা পান, তাহা থাকে না, সরিয়া পড়িয়া যায়। যাহা ছিল, তাহাই যখন বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে, তখন আর যে মহাভারতের রচনাকালের যন্ত্রাদি এদেশীয় কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত হইবে, তাহার সম্ভাবনা কি। দেশীয়-শিল্পের যে দিন দিন হ্রাস হইতেছে, নিম্নলিখিত বাক্যগুলির দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। ১৮৮২।৮৩-র স্বদেশীয় শাসনপ্রণালীর রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে:

"যে মলমলের নিমিত্ত ঢাকা এক সময়ে অতিশয় প্রসিদ্ধ ছিল, ইউরোপীয় প্রস্তুত বস্ত্রের সহিত তাহার প্রতিযোগিতা হওয়াতে তাহার উন্নতি হ্রাস হইতেছে ইত্যাদি।"

উক্ত রিপোর্টে বর্দ্ধমান বিভাগের বিষয়ে লিখিত হইয়াছে, "এখানকার তসর ব্যবসায়ের যদিও উন্নতি নাই, চীনদেশীয় রেসমি বস্ত্রের সহিত ভারতীয় বস্ত্র ব্যবসায়ের

প্রতিযোগিতা হইতেছে, তথাপি তসর ব্যবসায়ের পুনরায় উন্নতি হইবার সম্ভাবনা আছে। ইউরোপীয় বস্ত্রের সহিত প্রতিযোগিতা হওয়াতে সর্ব্বত্রই ভারতীয় বস্ত্রব্যবসায়ের হ্রাস হইতেছে” ইত্যাদি।

বিদেশীয় রাজার অধিকার অধিকারে দেশীয় শিল্পাদি সকল বস্তুরই এইরূপ দুরবস্থা ঘটিয়া থাকে। অতএব আজও যে মহাভারতের সময়ের যন্ত্রযুক্ত নৌকা নয়ন গোচর হইবে, তাহা সম্ভাবিত নহে।

শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষের পার্লিয়ামেণ্টের সভ্যপদ প্রার্থনা

১৭ অগ্রহায়ণ ১২৯১। ৩ সংখ্যা

প্রকৃতপক্ষে ধরিতে গেলে ইংলণ্ডের জনসভা অথবা হাউস অব কমন্সই ইংলণ্ডের শাসনকর্ত্তা। রাজা বা রাণী কেবল নামমাত্র রাজত্ব করিয়া থাকেন। দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রভুশক্তি বস্তুতঃ এই সভার হস্তেই ন্যস্ত। ইঁহারা যে শাসননীতির অনুমোদন না করেন, রাজা ও রাণী সে নীতির অনুসরণ করিতে অক্ষম। ইঁহারা যে নীতি অবলম্বন করিতে কৃতসংকল্প হয়েন, তাহার বাধা দেওয়াও রাজা রাণীর সাধ্যায়ত্ত নহে। রাজ্য সম্বন্ধীয় সর্ব্বপ্রকারের আয়ব্যয়াদির তত্ত্বাবধান করিবার ক্ষমতা এই সভার হস্তে। ইহাতে রাজা বা রাণীর যে সামান্য ক্ষমতা আছে তাহাও প্রায় স্বাধীনভাবে নিয়োজিত হইতে পায় না। কোন বিষয়ের জন্য অর্থের প্রয়োজন হইলেই রাজমন্ত্রীদিগকে এই সভার অনুগ্রহপ্রার্থী হইতে হয়।

এই সভা যে কেবল ইংলণ্ডেরই শাসনকর্ত্তা তাহা নহে। ইংলণ্ডের অধীনে যে সুবিস্তৃত সাম্রাজ্য আছে সেই সকল দেশ সমূহও এই সভা দ্বারা শাসিত হইয়া থাকে। এই পৃথিবীতে ইংলণ্ডের এই মহাসভার মত বড় এবং ক্ষমতাশালী ব্যবস্থাপকসভা আর নাই। ইংলণ্ড যেরূপ সভ্যজগতে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়া আছে, এই মহাসভাও সেইরূপ সভ্যসমাজে অতি গৌরবের স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। এই সভার সভ্যগণের পদ এবং সম্মানও সেইরূপ অতি উচ্চ। কোন ভারতবাসী এই সভার সভ্যপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে যে কেবল তাঁহার নিজেরই গৌরব বৃদ্ধি হইবে তাহা নহে। ইহাতে সমগ্র ভারতসমাজের গৌরব বৃদ্ধি হইবে। এইজন্যই আমরা শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষের পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশের সম্ভাবনা আছে শুনিয়া যারপর নাই সুখী হইয়াছি।

কিন্তু লালমোহন ঘোষ, কিম্বা অপর কোন ভারতবাসী ইংলণ্ডের মহাসভার সভ্য হইতে পারিলেই যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভারতের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থার কোন বিশেষ উন্নতি সংসাধিত হইবে, আমাদের সেরূপ ধারণা নাই। অতীত সাক্ষী ইতিহাস বারম্বার উচ্চৈঃস্বরে আমাদিগকে সে দুরাশা পোষণ করিতে বারণ করিতেছে। আজ কত কাল

হইল আয়র্লণ্ড স্বয়ং সভ্য মনোনীত করিয়া ইংলণ্ডের মহাসভায় প্রেরণ করিতেছে; এই সমুদায় আইরিস সভ্যের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে; তবু আয়ারলণ্ডের দুর্গতি ঘুচিল না কেন? আয়ারলণ্ডের সভ্যগণ বিদ্যা, বুদ্ধি, রাজনীতি কৌশল, সৎসাহস কোন্ বিষয়ে ইংরাজ সভ্যগণ অপেক্ষা হীন? তথাপি তাঁহারা এতকাল এরূপ শ্রমসহকারে এত যত্ন করিয়াও যখন আপনাদিগের মাতৃভূমির চক্ষুজল মুছাইতে পারিলেন না, তখন একজন দুইজন, বা দশজন ভারতীয় সভ্যের যত্ন ও চেষ্টা যে সফল হইবে সে আশা কেমন করিয়া করিব? আয়ারলণ্ডের সভ্যগণ স্বাধীন,—তত্রত্য করদাতৃগণ কর্ত্তৃক মনোনীত। তাঁহারা স্বদেশ-বাসীদিগের প্রতিনিধি, ভারতের যে কেহ পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য হইবেন, তাঁহাকে ইংরাজ করদাতাগণের অনুগ্রহের উপর সতত নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে, তাঁহাদিগের মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিয়া সতত চলিতে হইবে, নতুবা তাঁহার সভ্যপদ বজায় রাখা দুষ্কর হইয়া উঠিবে। এই অবস্থায় একজন, দুইজন, বা দশজন ভারতবাসী পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য হইলেই যে আমাদের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থার কোন বিশেষ উন্নতি সাধিত হইবে, এ কথা আমরা সহজে বিশ্বাস করিতে পারি না। এ আশা আমরা রাখি না।

কিন্তু ইহা দ্বারা সাক্ষাৎভাবে কোন বিশেষ মঙ্গল সাধিত না হইলেও, দূরতঃ অনেক উপকার হইবাব সম্ভাবনা। প্রথমতঃ আমাদিগের দেশের একজন শিক্ষিত ব্যক্তি পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় আপনার বিদ্যাবুদ্ধি এবং রাজনীতিকুশলতা দ্বারা বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিলে, ইংরাজ সাধারণের ভারতবাসীদিগের প্রতি সম্মান বৃদ্ধি পাইবে। তখন আর সহজে ভারতীয় ইংরাজগণ এদেশীয়দিগকে নিকৃষ্টতর শ্রেণীর লোক বলিয়া সর্ব্বপ্রকার উচ্চপদ হইতে বঞ্চিত রাখিবার যৌক্তিকতা প্রদর্শন করিতে পারিবেন না। যে ভারত ইংলণ্ডের মহাসভার একজন উপযুক্ত সভ্যের জন্ম দিতে পারিয়াছে, সেই ভারতে যে সামান্য রাজকর্ম্ম পরিচালনা করিবার লোক নাই, সভ্য জগৎ সহজে একথায় বিশ্বাস করিবে না, এবং অন্ততঃ লজ্জার খাতিরেও ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে উচ্চশ্রেণীর রাজকীয় কর্ম্ম দ্বার অল্পে অল্পে ভারতবাসীগণের নিকট উন্মুক্ত করিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ আজিও ইংরাজ সাধারণে ভারতের সকল অবস্থা অবগত নহেন। অনেকেই ভারত কিরূপে শাসিত হইতেছে, ইহার খবর রাখেন না। যাঁহারা রাখেন তাঁহারাও ভারতবাসীদিগকে এত হীন বলিয়া মনে করেন যে, এইরূপ শাসনে ইংলণ্ডের ভবিষ্য স্বার্থের মূল উচ্ছেদ হইতেছে একথা বিশ্বাস করেন না। আমাদিগের দেশের একজন উপযুক্ত লোক পার্লিয়ামেণ্ট সভায় প্রবেশ করিতে পারিলে, তিনি সর্ব্বপ্রথমে সর্ব্বদা ভারত শাসন সম্বন্ধীয় বিবিধ বিষয়সমূহ সভার সমক্ষে উপস্থিত করিতে পারিবেন। ইহাতে ইংলণ্ডের জনসাধারণ মধ্যে ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান বহুল পরিমাণে প্রচারিত হইবে। ইংলণ্ডবাসিগণ ভারতশাসনের সমুদায় তত্ত্ব অবগত হইলে, সেই শাসনের দ্বারা ইংলণ্ডের কি বিপদ ডাকিয়া আনা হইতেছে ইহা বুঝিতে পারিবেন। বুদ্ধিমান ইংরাজেরা

এ কথা বিলক্ষণ জানেন যে, ভারতীয় পঞ্চবিংশতি কোটি প্রাণীকে সুশাসন করাতে ভারতের যত না উপকার দর্শিবে ইংলণ্ডের তদপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা। তাঁহারা জানেন ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের হস্তচ্যুত হইলে ইংরাজজাতির অর্দ্ধেক আধিপত্য, ক্ষমতা এবং সৌভাগ্য বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। তাঁহারা ইহাও জানেন, একদিকে উদার শিক্ষায় কোন জাতির চক্ষু ফুটাইতে আরম্ভ করিয়া অপরদিকে তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকারের উচ্চ-রাজনৈতিক অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখা নিতান্ত অনুচিত কার্য্য। এরূপ আত্মঘাতি নীতি আর নাই। সুতরাং ভারতের প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারিলে তাঁহারা ভীত ও সন্ত্রস্ত হৃদয়ে ভারতবাসীকে উচ্চতর রাজনৈতিক অধিকার দান করিবার জন্য আন্দোলন করিবেন, এই আন্দোলন হইতে ভারতের বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা।

এই সকল কারণে শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষের পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশ করিবার কতকটা সম্ভাবনা আছে শুনিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। লালমোহন বাবু অতি উপযুক্ত লোক। তিনি পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশ করিতে পারিলে বিশেষ প্রতিপত্তিলাভ করিতে পারিবেন, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই। বস্তুতঃ তাঁহার বাগ্মিতায় মুগ্ধ হইয়াই গ্রীনউইচের লিবারেল কমিটী তাঁহাকে সেই স্থানের প্রতিনিধি মনোনীত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। অল্পদিন হইল লণ্ডনের নিকটে ব্লাক হেজ নামক স্থানে ফ্রানচাইজ বিল সম্বন্ধে লর্ড সভার আচরণের প্রতিবাদ করিবার জন্য প্রায় ত্রিশ সহস্র লোক একত্রিত হইয়াছিল। এই বিরাট সভায় বাবু লালমোহন ঘোষকে বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করা হয়। লালমোহন বাবুর সুদীর্ঘ এবং সুললিত সদ্যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা শ্রোতাদিগকে এত মোহিত করে যে, তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইলেও চারিদিক হইতে সকলে "আরো বলুন" "আরো বলুন" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল এবং তিনি আসন গ্রহণ করিলে পরও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সমবেত লোকমণ্ডলীর আনন্দ ও প্রশংসাসূচক করতালিধ্বনি নিবৃত্ত হয় নাই। এই বক্তৃতা শুনিয়া শ্রোতৃবর্গ এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাহার অল্পক্ষণ পরেই গ্রীণ-উইচের লিবারল কমিটী লালমোহন বাবুকে সেই স্থানের প্রতিনিধি মনোনীত করিবার চেষ্টা করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়েন।

লালমোহন বাবু পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশ করিতে পারিলে ভারতবর্ষের বিশেষতঃ বাঙ্গালার অতিশয় গৌরবের কথা হইবে, এইজন্য সকলেই লালমোহন বাবুর শুভ কামনা করিতেছেন। কিন্তু পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশ করা সহজ কথা নহে। অগ্রে রাশি রাশি অর্থব্যয় করিতে হয়, তারপর যদি সভ্য মনোনীত হইতে পারা যায়। লালমোহন বাবু এই অর্থ কোথায় পাইবেন? প্রত্যেক ভারতবাসীর এই বিষয়ে লালমোহন বাবুকে সাধ্যমত সাহায্য করিবার চেষ্টা করা উচিত। কলিকাতায় এই অর্থ সংগ্রহ করিবার অতি সত্বর একটা কমিটি করা আবশ্যক।

এই প্রবন্ধটী লেখা সাঙ্গ হইলে আমরা জানিতে পারিলাম যে ব্লাক হেজের বক্তৃতার

পর গ্রীণউইচের লিবারেল কমিটী বাবু লালমোহন ঘোষকে তাঁহাদের সেখানকার পাঁচশত লিবারেল করদাতৃগণের সমক্ষে একটী বক্তৃতা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া একখানি নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরণ করেন। লালমোহনবাবু 'নিমন্ত্রণ' পত্র গ্রহণ করিয়া একটী সুদীর্ঘ সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা অন্তে সকলে একবাক্যে লালমোহন বাবুকে তাঁহাদের নগরের প্রতিনিধির পদপ্রার্থীরূপে গ্রহণ করেন।

ব্যবস্থাপক সভা। ১৮ মাঘ ১২৯১। ১৩ সংখ্যা

ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক সভাগুলি যেরূপ প্রতিষ্ঠিত হয় আমরা গতবারে তাহার ইতিবৃত্তের বর্ণনা করিয়াছি। বর্ত্তমান শাসনব্যবস্থাগুলির সংস্কার যে একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টগুলি যেমন স্বেচ্ছানুসারী, ব্যবস্থাপক সভাগুলিও তাহার অনুরূপ। ঐ সকল ব্যবস্থাপক সভায় প্রজার মতামত গৃহীত ও আদৃত হয় না। সিলোনের ব্যবস্থাপক সভা হইতে যেমন প্রজার স্বত্ব রক্ষা হয় এবং ঐ সভার যেমন প্রাদেশিক আয়ব্যয় দর্শনেব অধিকার আছে, এখানকার ব্যবস্থাপক সভাগুলির সেরূপ অধিকার নাই, এখানকার ব্যবস্থাপক সভার সভ্যেরা ইচ্ছামত কাজ করিয়া থাকেন। সভ্যগণের ইচ্ছামত কাজ করিবারই কথা। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে মনোনীত ও নিয়োজিত করিয়া থাকেন। অধিকাংশ সভ্য গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী। রাজপুরুষে ···সভ্যের সংখ্যা সামান্য মাত্র। গবর্ণমেণ্ট-পক্ষ কর্ম্মচারীরা গবর্ণমেণ্ট পক্ষেরই সমর্থন করেন। যাঁহারা প্রজাপক্ষ সমর্থন করেন, তাঁহারা সংখ্যায় অল্প বলিয়া তাঁহাদের কথা প্রায় ভাসিয়া যায়।

এখন এরূপ ব্যবস্থাপক সভায় আর চলে না। এখন ব্যবস্থাপক সভামধ্যে যাহাতে প্রজাপক্ষ সভ্য অধিক হন, তাহার বিধান হওয়া আবশ্যক। লর্ড রিপণ বাহাদুর স্বাধীন আত্মশাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া সভ্য নির্ব্বাচনের যে নিয়ম করিয়া দেন, ব্যবস্থাপক সভাগুলিতেও সেই নিয়ম প্রবর্ত্তিত করা উচিত। প্রজারা দুই তৃতীয় অংশ এবং গবর্ণমেণ্ট এক-তৃতীয অংশ সভ্য মনোনীত করিবেন। এরূপ ব্যবস্থা হইলে আত্মশাসনপ্রণালীর উন্নতি হইবে। ব্যবস্থাপক সভাপদ লাভের আশায় অনেক ভাল লোকে আগ্রহসহকারে মিউনিসিপাল কমিশনর পদ গ্রহণ করিবেন। তাহাতে মিউনিসিপালিটীর উন্নতি হইবে; ওদিকে প্রাদেশিক শাসনকার্য্যও সুন্দররূপে সম্পন্ন হইবে। ব্যবস্থাপক সভায় প্রজাপক্ষ লোক অধিক হইলে তাঁহারা প্রজার স্বত্ব রক্ষার্থ যত্নবান হইয়া অনায়াসে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন। ব্যবস্থাপক সভ্য এইরূপে সংস্কৃত হইলে তাহার উপরে প্রাদেশিক আয়ব্যয় দর্শনের ভার অর্পিত হইলে দেশের নানা প্রকার মঙ্গল হইবে সন্দেহ নাই। যাঁহারা করদাতা, তাঁহারা যদি আপনাদিগের দত্ত করের ব্যয় দর্শন করিবার অধিকার পান, অর্থের

অপব্যয় হইবার সম্ভাবনা স্বল্প হইবে, কার্য্যও সুন্দররূপে সম্পন্ন হইতে পারিবে। আমাদের গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে সহজে যে এ অধিকার দিবেন আমাদিগের সে মনে হয় না। ইংলণ্ডে এবিষয়ের বিশেষরূপে সে চেষ্টা পাইতে হইবে। প্রস্তাবান্তরে তদ্বিষয়ের বিচার পাঠক দর্শন করিবেন। আমাদের আনন্দের বিষয় এই, বোম্বাই ও মাদ্রাজেও এ প্রস্তাব উত্থিত হইয়াছে। বঙ্গদেশেও এ বিষয়ের বিশেষ আন্দোলন হওয়া উচিত। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন সভা এ প্রস্তাবটী লর্ড ডফরিণ বাহাদুরের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন। তিনি একজন ভারতের মঙ্গলাভিলাষী দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞ। তিনি ভারতীয় প্রজাগণের উচ্চ আশার নিরোধ করিয়া রাজ্যের অনিষ্টসাধন করিবেন, আমাদের সে বোধ হয় না।

ভারতের রাজনীতিঘটিত সকল বিষয়েরই এখন বিলাতে আন্দোলন হওয়া আবশ্যক। ১৭ অগ্রহায়ণ ১২৯১। ৩ সংখ্যা

অনুরক্ত প্রজার রাজার প্রতি কর্ত্তব্য কি? অনুরক্ত প্রজার প্রতি রাজারই বা কর্ত্তব্য কি? ইহার নির্দ্ধারণ করিতে হইলে অনেকগুলি বিষয়ের অবতরণা করিতে হয়। সে সমস্ত বহু প্রবন্ধসাধ্য, অদ্য আমরা সংক্ষেপে এই মাত্র বলিতেছি। বিজিত বলিয়া ভারতবাসীর সহিত ইংরাজ জাতির যে ভিন্ন ভাব আছে, তাহা না থাকে এবং প্রজারা তাহাদিগকে জেতা বলিয়া যে ভিন্নভাবে দর্শন করেন, তাহাও না করেন। সে ভিন্নভাব দূর করিতে গেলে ভারতীয় গবর্ণমেণ্টকে সর্ব্বাগ্রে স্বেচ্ছাচারিতা পরিত্যাগ করিতে হইবে। প্রজারা এক্ষণে যে যে বিষয়ে বঞ্চিত আছেন, তাহাদিগকে তাহাতে প্রবেশাধিকার দিতে হইবে। প্রজারা রাজ্যের প্রধান অংশ বলিয়া পরিগণিত না হইলে শ্রেয়োলাভের সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে ভারতীয় প্রজারা রাজ্যের অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হয় না। পরিগণিত না হইবার অনেকগুলি প্রতিবন্ধক কারণ আছে। প্রথম প্রতিবন্ধক, ইংরাজজাতি ভারতীয় প্রজাকে বল দ্বারা শাসন করিবার নীতি আজিও পরিত্যাগ করেন নাই এবং শাসনকার্য্যে প্রজাকে কোন স্বাধীন অধিকার দেন নাই। এ নীতি দুর্নীতি। এ দুর্নীতি সত্ত্বে রাজনীতি সম্বন্ধে জেতা ও বিজিত উভয়ের একরূপতা সম্ভাবনা কম। এ দুর্নীতি দূর হইবার আবার প্রধান প্রতিবন্ধক এই ইংলণ্ডের প্রধান লোকেরা, পার্লিয়ামেণ্ট সভার সভ্যেরা ভারতের প্রকৃত অবস্থা জানেন না, ভারতবাসীর মনের ভাব ও অভাবাদি বুঝেন না। তাহাতে ইংরাজজাতি ভারতবাসীর মধ্যে সাগর ভূধরাদির ন্যায় বহু ব্যবধান হইয়া পড়িয়াছে। ইংলণ্ডবাসীরা ভারতের সে প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারেন না, তাহার প্রধান কারণ এই, ইলবার্ট বিলের আন্দোলনের সময় অবধি, বিলাতের টাইমস পত্রের কলিকাতাস্থ সংবাদদাতা প্রতিনিয়ত অলীক সংবাদ প্রেরণ করিয়া ইংলণ্ডবাসী জনগণকে ভারতবাসী প্রজাবর্গের বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বন করিবার নিমিত্ত প্রণোদিত করিতেছেন। তাহার প্রতিবিধান করিবার প্রকৃত

চেষ্টা ইতিপুর্ব্বে হয় নাই, এখনও হইতেছে না। বিলাতের সাধারণ মতে পারলিয়ামেণ্টের কার্য্যাদি পরিচালিত হইয়া থাকে। পারলিয়ামেণ্টের মতামতের দ্বারা আবার ভারতশাসন হয়। সুতরাং ভারতশাসন সম্বন্ধে সংস্কার করিবার প্রয়োজন হইলে একদিকে যেমন দেশীয় প্রজাগণের হৃদয়ে এই সংস্কারের ভাব বদ্ধমূল করিয়া দিয়া এদেশে রাজনৈতিক আন্দোলন তুলিয়া তৎপ্রতি গবর্ণমেণ্টের মন আকর্ষণ করিতে হইবে, সেইরূপ বিলাতেও এই সকল বিষয়ে ঘোরতর আন্দোলন করিয়া আদালতের লোকের মনে সেই সংস্কারের আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিতে হইবে। আমরা যে তাহার কোন চেষ্টা করিতেছি না, তাহাও নহে। শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষকে দুই তিন বার এই উদ্দেশ্যেই বিলাতে প্রেরণ করা হইয়াছে। তাঁহার ওজস্বিনী ও সারগর্ভ বক্তৃতাতে বিলাতবাসী জনগণের মনে ভারত সম্বন্ধে যে সদ্ভাব একেবারে উদ্রিক্ত হয় নাই, তাহাও নহে। লালমোহন বাবু, রাজা রামপাল সিং ও বিলাতের ভারত সংস্কারক সভার যত্নে ও চেষ্টায় ভারতের অনেক বৃত্তান্ত বিলাতে প্রচারিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু টাইমস পত্রেব কলিকাতাব সংবাদদাতার দোষে তাঁহাদের এই সাধু চেষ্টার যথোচিত ফল ফলিবার বিষম বিঘ্ন ঘটিয়াছে। টাইমস বিলাতের সর্ব্বপ্রধান পত্র। তাহাতে যে সংবাদ প্রকাশিত ও যে মতামত সমর্থিত হয়, তাহার দ্বারা বহুসংখ্যক বিলাতবাসীর মতামত সৃষ্ট ও পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এ অবস্থায় টাইমসের কলিকাতার সংবাদদাতা যে সকল অলীক সংবাদাদি প্রচার করিয়া ভারতবাসী জনগণের প্রতি ইংরাজসাধারণের বিদ্বেষভাব ও ঘৃণার উদ্রেক করিবার চেষ্টা পাইতেছে, তাহার প্রতিবিধান না করিতে পারিলে আমাদের অপরাপর সমুদায় সাধুচেষ্টা নিষ্ফল হইয়া যাইবে।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া অল্প দিন হইল বোম্বাই সমাজের নেতৃগণ তত্রত্য গবর্ণমেণ্ট কালেজের অধ্যক্ষ উদারচেতা মহামতি ওয়ার্ডসওয়ার্থ সাহেবের গৃহে এ বিষয়ে উপযুক্ত উপায় নির্দ্ধারণ করিবার জন্য একত্রিত হইয়া স্থির করেন যে, সপ্তাহে সপ্তাহে টাইমস পত্রের কলিকাতার সংবাদদাতা যেরূপ ভারতীয় সংবাদ তারযোগে তৎপত্র সম্পাদকগণের নিকটে প্রেরণ করেন, সেইরূপ এদেশীয়েরাও সময়ে সময়ে বিলাতের ডেইলি নিউস কিম্বা অপরাপর, কোন সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্রে ভারতীয় সংবাদাদি প্রেরণ করিবেন। টাইমস পত্রের কলিকাতার সংবাদদাতা যে ঘোর অনিষ্ট করিতেছেন, এই উপায় দ্বারা তাহার কতকটা নিবারণ হইতে পারিবে। কিন্তু এই কার্য্যে অর্থের প্রয়োজন। এক একটী সংবাদ তার-যোগে বিলাতে পাঠাইতে হইলে শতাধিক টাকা ব্যয় হইবে। তদর্থ বিশেষ মূলধন সংগ্রহ আবশ্যক। বোম্বাইবাসিগণ এই অর্থের সংগ্রহ করিতে যে অসমর্থ হইবেন কিম্বা সকলে যথাসাধ্য দান করিতে যে কুণ্ঠিত হইবেন এরূপ বোধ হয় না। বাঙ্গালা ও মান্দ্রাজ প্রভৃতি অন্য অন্য প্রদেশের লোকেরাও যে ইহাতে যোগ দিবেন না, তাহাও বোধ হয় না।

কলিকাতার জাতীয় ভাণ্ডারে প্রায় ৩০ সহস্র টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। ঐ টাকার মাসিক সুদ প্রায় একশত টাকা হইবে। এই সুদের টাকায় ঐ বিষয়ের অনেক সাহায্য

হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা প্রস্তাব করিতেছি, এই চেষ্টা করিয়াই ক্ষান্ত থাকিলে অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে না। পারলিয়ামেণ্ট মহাসভায় অন্য অন্য বিষয়ের সবিশেষ আন্দোলন শ্রেয়োলাভ হইবে না। ইংলণ্ডে ভারত সংস্কারক যে সভা আছে, তাহার সহিত যোগ করিয়া এদেশের প্রধান লোকেরা এ বিষয়ের সাধ্যানুসারী চেষ্টা করুন। আমরা প্রস্তাবান্তরে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সমাজের সংস্কারের যে প্রস্তাব করিয়াছি সেই প্রস্তাব বল, সিবিল সার্ব্বিস প্রস্তাব বল, আর এদেশীয় বিচারপতির নিকটে ইউরোপীয় অপরাধীর বিচারভার প্রদান প্রস্তাব বল, আর এদেশীয় প্রজায় ও ইউরোপীয় প্রজায় আইন ও ব্যবহারগত যে সকল দোষ আছে, তাহার উন্মূলন প্রস্তাবই বল পারলিযামেণ্টে কমিটী বসাইতে না পারিলে কোন প্রস্তাবই কার্য্যে পরিণত হইবে না।

বেঙ্গল ন্যাসনাল লীগ অর্থাৎ বাঙ্গালা দেশের জাতীয় সম্মিলন সমিতি

১৪ বৈশাখ ১২৯৩। ২৪ সংখ্যা

পাঠক। আজ আমবা এক নূতন প্রকার জাতীয় সম্মিলন সমিতির জন্মগ্রহণ-সমাচার লইযা আপনাদেব দ্বারে উপস্থিত হইতেছি। এই সমিতির নাম 'বেঙ্গল ন্যাসনাল লীগ', সমস্ত বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যার প্রতিনিধিস্বরূপে আপামব সাধারণের সহায়তা গ্রহণ করিয়া আমাদিগের রাজনৈতিক অভাবসকল দূরীভূত করিবেন, লীগ তাহারই জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আমরা এই সমাচার কয়েক সপ্তাহ হইল প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু এবিষয়ে আমাদেব যাহা বক্তব্য তাহা এতাবৎকাল প্রকাশ করি নাই। যখন দেখিলাম মহাবাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুব ইহাব সভাপতিত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, অনারেবল বাবু প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়. বাবু দুর্গাচবণ লা, মিঃ ডবলিউ সি. বেনার্জি প্রমুখ কলিকাতার গন্যমান্য সকল লোকেই ইহাব সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইযাছেন তখন যে সভার মূলে জীবনীশক্তি দেওযা হইয়াছে ইহা আমরা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলাম। যখন দেখিলাম কলিকাতায বহুদিন স্থাপিত ভারতসভা, ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান সভা, ভারত সম্মিলনী ইত্যাদি কোন নৈতিক সভাব উদ্দেশ্যেব সহিত ইহার বৈরিতা বা বৈপরিত্ব ঘটিতেছে না বরং এই সকল সভার এক এক জন সভ্য প্রতিনিধিস্বরূপে লীগে আসিয়া যোগদান করিতেছেন, তখন আর ইহার প্রযোজন ও কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে আমাদের কোন সন্দেহই রহিল না। ভারত গবর্ণমেণ্টের শাসনমধ্যে যাহাতে প্রতিনিধি ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয় তাহারই জন্য আয়োজন করা লীগের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই মাত্র প্রধান উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করিয়া লীগ বঙ্গবাসী সাধারণের সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছেন। প্রথমে ইহাতে কলিকাতার কৃতবিদ্য সম্প্রদায় ভিন্ন আর কেহ যোগ দেন নাই। কিন্তু লীগ বঙ্গের প্রত্যেক নগর, গ্রাম ও জনপদের প্রত্যেক গৃহস্থের নিকট সানুনয়ে প্রার্থনা

করিয়াছেন যে তাঁহারা যেন সকলে আসিয়া এই সভায় সাহায্য করেন ও ইহার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হন।

শনৈঃ শনৈঃ লীগের আয়তন বৃদ্ধি হইতেছে, শনৈঃ শনৈঃ দেশের লোক একটী একটী করিয়া লীগের বন্ধনে আবদ্ধ হইতেছে। বাবু সুরেন্দ্রনাথ ইহার একজন প্রধান উদ্যোগী হইয়া সাধারণকে উৎসাহিত করিতেছেন। লীগের মহদুদ্দেশ্য সুদৃঢ়বন্ধনী ও উদ্যমশীলতা দেখিয়া সকলেরই মনে আশার সঞ্চার হইতেছে! কিন্তু বাঙ্গালীর উৎসাহ কয় দিনের? জাতীয় ধনভাণ্ডারের জন্য সুরেন্দ্র বাবু দেশে বিদেশে দান সংগ্রহিত হইল—সমগ্র বাঙ্গালা দেশটা যেন একবার তড়িতের তেজে জ্বলিয়া উঠিল, এক বৎসর পরে সে জ্বলন্ত উৎসাহ বংশ-পত্রের অনলের ন্যায় একেবারেই নিবিয়া গেল—আমাদের ভয় হয় পাছে লীগেরও অবশেষে এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটে।

আশার সঙ্গে সঙ্গে ভয় মানবপ্রকৃতির ধর্ম্ম। লোকে যেমন নবজাত পুত্রের মুখ দেখিয়া আশা করে বার্দ্ধক্যে পুত্র তাহার জীবনরক্ষায় উপায় হইবে, সঙ্গে সঙ্গে তেমনি আবার তাহার মনে ভয়ের সঞ্চার হয় পাছে যমদণ্ডে তাহার আশাদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়ে। লীগের সূতিকাগৃহে পুরোহিত বেশে রাজা যতীন্দ্রমোহন ও বাবু সুরেন্দ্রনাথ আসিয়া যখন শিশুর পরমায়ু বৃদ্ধি করিবার জন্য, উপদেবতা তাড়াইবার জন্য, যাগযজ্ঞ করিতেছেন তখন শিশুব মুখ দেখিয়া আমাদের মনে আশা ও আনন্দের সঞ্চাব হইতেছে। কিন্তু অলক্ষিতভাবে সেই আশার অন্তরালস্থিত অস্ফুট অন্যচ্ছস্বর আশঙ্কার কথা শুনিয়া আবার মনে হইতেছে হয়ত বিবাদব্যাধি ও অনৈক্যবিকারে লীগশিশুর মৃত্যু হয়, যমদণ্ডের ভীষণাঘাতে বঙ্গবাসীর আশাদণ্ড ভগ্নদশা প্রাপ্ত হয়।

দুই একটী অনৈসর্গিক কারণে আমাদের এই স্বাভাবিক ভয়ের আরও একটু বৃদ্ধি হইয়াছে।

প্রথম। অগ্রেই লীগের জন্য সাধারণের নিকট ভিক্ষা। আমরা আমাদের সহযোগী "সুরভি ও পতাকা"র সহিত একমত হইয়া বলিতে পারি না যে এই সমিতির রক্ষার নিমিত্ত আদৌ ভিক্ষার প্রয়োজন নাই। সহযোগী মিরাবের মতে মত দিয়াও ব্যবস্থা দিতে পারি না যে যদি বাঙ্গালীর বিবাহকার্য্যে ১০০ টাকা খরচ হয় তবে লীগের জন্য তাহা হইতে ৫টী টাকা কাটিয়া রাখা কর্ত্তব্য। আমরা বলি সভার জন্য প্রথমেই দন্তে তৃণ করিয়া লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিলে বিশেষ ফল ফলিবে না। সাধারণে এখন লীগের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছুই বুঝে নাই, লীগের স্থায়ীত্ব সম্বন্ধে এখনও ভালরূপ বিশ্বাস করে নাই। বরং জাতীয় ধনভাণ্ডারের পরিণাম দেখিয়া লোকের মনে একটা অভক্তি জন্মিয়া আছে। এমত অবস্থায় সাধারণের নিকট হাত পাতিতে গেলে প্রায়ই রিক্তহস্তে ফিরিতে হইবে। লীগের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ সকলেই সঙ্গতিসম্পন্ন। মহারাজ যতীন্দ্রমোহন, জমিদার প্যারীমোহন, বাবু দুর্গাচরণ প্রভৃতি অগ্রণীগণ সকলেই ইচ্ছা করিলে চিরকাল নিজ ব্যয়ে এরূপ সমিতি

রাখিতে পারেন, তাঁহারা যদি আরও কিয়দ্দিনধরিয়া ইহার রক্ষার্থ ব্যয় সঙ্কুলান করেন, তাহা হইলে সভা শীঘ্রই সাধারণের পরিচিত হইবে, সাধারণেও সভার নিকট উপকৃত হইয়া স্বেচ্ছায় দান করিতে প্রস্তুত হইবে। প্রথমে নিজের অর্থ ব্যয় করিয়া দেশকে সভার কার্য্য দেখান চাই। কার্য্য দেখিয়া লোকে যখন স্বেচ্ছায় দান করিতে চাহিবে. তখন আমাদের মহারাজ কি প্রবলপ্রতাপ জমিদার পুত্র ভিক্ষা করিতে গিয়া কখনই প্রত্যাখ্যাত হইবেন না। নচেৎ প্রথম হইতেই বিবাহোপলক্ষে লীগের জন্য বাব ধরিতে গেলে লোকে তাহা কখনই শুনিবে না লীগের জীবন অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইবে।

দ্বিতীয়। লীগের জন্মোপলক্ষে জাতীয় ফণ্ডের অন্তর্জলী করিবার চেষ্টা। আমরা ইহার সম্পূর্ণ প্রতিবাদী। সুরেন্দ্র বাবুর মত কি তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। তিনি যে ইহাতে সম্মতি প্রদান করিবেন তাহাও আমাদের বিশ্বাস হয় না। সম্মতি প্রদান করিলেও তাঁহার সৎকার্য্য করা হইবে না। লোকের নিকট সে সকল উদ্দেশ্যে ধন ভাণ্ডারের ধন সংগ্রহ করা হইয়াছে লীগ তাহার একটী মাত্র কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিবেন— দেশের লোকে উৎপীড়িত হইলে জাতীয় ধনভাণ্ডার সেই উৎপীড়ন নিবারণ করিতে যত্নবান হইবেন। লীগ সেই উৎপীড়নের মূল কারণ যাহাতে অপনোদিত হয় তাহারই চেষ্টা করিবেন। লীগের উদ্দেশ্য সাধন করা, সময়সাপেক্ষ, সুরেন্দ্র বাবুর ধনভাণ্ডারের উদ্দেশ্য আশুই সাধিত হইতে পারে। এরূপ আশু প্রতিকারক সভার উচ্ছেদ সাধন করিয়া সংগৃহীত অর্থ লীগের ও সরঞ্জামীতে ব্যয় করা আমাদের দেশের লোকের কখনই অভিমত হইবে না। দেশের লোকের অজ্ঞাতে ও অনভিমতে তাহাদের অর্থ লইয়া যথেচ্ছ ব্যবহার করিলে লীগ ও সুরেন্দ্র বাবু সাধারণের অপ্রীতিভাজন হইবেন। লীগও তাঁহাদের মুখাপেক্ষা করিতেছেন, প্রথমেই তাঁহাদের অপ্রীতিকর কার্য্য করিয়া কখনই অধিক দিন স্থায়ী হইতে পারিবেন না। আমরা বলি লীগের সরঞ্জামীতে ভাণ্ডারের ধন অপব্যয় না করিয়া প্রথমে ধন ভাণ্ডারের উদ্দেশ্যগুলি লীগের উদ্দেশ্যমধ্যে পরিগণিত করা হউক। তারপর যাঁহারা কষ্টে-শ্রেষ্টে এই ধনাগারে অর্থ দিয়াছেন তাঁহাদের মতামত জিজ্ঞাসা করা হউক। সকলেরই যদি অভিমত হয় তবে পরে এই দুইটী সভা একত্র করিলে চলিতে পারে। নচেৎ স্বেচ্ছায় একটী মহাসভার মাথা খাইয়া লীগ আত্মগোপন করিতে গেলে শীঘ্রই বিনষ্ট হইবেন।

লীগ আমাদের এই দুইটী ভয়ের কারণ নিরাকৃত করিয়া আরও দুই একটী কথা শুনুন।

১। কলিকাতাতেই কেবল একটী মাত্র বৃহতী সভা সংগঠন করিলে লীগ সমগ্র দেশের প্রতিনিধি হইতে পারিবেন না। প্রত্যেক ডিষ্ট্রীক্টে যাহাতে একটী করিয়া শাখা লীগ সংগঠিত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। সেই ডিষ্ট্রীক্টের মধ্যে যতগুলি মিউনিসিপালিটী আছে লীগ তাহার প্রত্যেকটীর কমিসনরগণকে স্ব স্ব মিউনিসিপালিটী মধ্যে একটী প্রশাখা লীগ গঠিত করিবার জন্য অনুরোধ করুন। যে সকল গ্রাম বা পল্লী মধ্যে মিউনিসিপালিটীর অধিকার নাই তাহাদের পঞ্চায়েত সভায় এইরূপ অনুরোধ পত্র

প্রেরণ করা হউক। এইরূপ প্রশাখা সভা হইতে ডিষ্ট্রীক্ট শাখা সভায় এবং তথা হইতে কলিকাতার লীগে প্রতিনিধিগণ প্রেরিত হউন। তদ্ভিন্ন মফস্বল হইতে কৃতবিদ্য ও উপযুক্ত লোক বাছিয়া লীগের সভ্যশ্রেণীভুক্ত করা হউক। এইরূপ করিলে সুদূর সুন্দরবন হইতে রাজসাহীর উত্তর সীমা পর্য্যন্ত, বুড়ী গঙ্গার তীর হইতে বুদ্ধগয়ার মন্দির পর্য্যন্ত, মণিপুরের সীমা হইতে জগন্নাথের তীর্থ পর্য্যন্ত ধনী, দরিদ্র, বিদ্বান, মূর্খ, জমিদার ও কৃষক সকলেরই কথা কলিকাতার লীগ শুনিতে পাইবেন। সকলেরই মতামত লইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন, নচেৎ লীগে কেবল ইংলিস ম্যানের "বাবু আন্দোলন" হইবে মাত্র।

শুদ্ধ বাঙ্গালা বেহার উড়িষ্যা এতবড একটা কার্য্য করিলেও বল পাওয়া যাইবে না। উত্তরপশ্চিমে এলাহাবাদের পঞ্জাবের লাহোরে, বোম্বাই ও মান্দ্রাজে, এই সমাচার প্রেরণ করিয়া যাহাতে তত্তৎ স্থানে এইরূপ এক একটী স্বতন্ত্র প্রতিনিধি লীগ স্থাপিত হয়, তজ্জন্য অনুরোধ করা আবশ্যক। আমাদের প্রত্যেক কার্য্যেই এই সকল দেশের সহানুভূতি না চাহিলে চলিবে না। যদি হিন্দুব জাতীয় জীবন গঠিত করিবার আবশ্যক হয় তবে উদারচরিত মহাবাষ্ট্রী সভ্য ভাষা পঞ্জাবি, পবিত্র মন বারাণসী ও উন্নতিশীল মান্দ্রাজীকে সকল কার্য্যেই নিমন্ত্রণ করিতে হইবে। সকলেবই একতান ক্রন্দন শ্রুত হইলে অবশ্যই ইংরাজ আমাদেব কথায কর্ণপাত করিবেন। নবীন লীগ আমাদের কথায় কর্ণপাত করিবেন। নবীন লীগ আমাদেব বড আশার সামগ্রী ভগবান ইহাকে দীর্ঘজীবী করিয়া দেশের মঙ্গলে নিযুক্ত করুন।

সাম্যনীতির শাসনপ্রণালীই হিন্দুর উপযোগী। ১ আষাঢ ১২৯৩। ৩১ সংখ্যা

ইতিহাসবেত্তা ডাক্তাব হণ্টার সেদিন সিমলায় বক্তৃতা দিবার সময় বলিয়াছেন বিজাতীয় শাসনেব একমাত্র উচ্চনীতিই সাম্যনীতি। আকবর এই সাম্যনীতি অবলম্বন করিয়া মোগলসাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, আরঙ্গীব এই সামান্যনীতির মুলোৎপাটন করিয়া মোগলসাম্রাজ্য উৎসন্নে দিয়া গিয়াছেন, হিন্দু মুসলমান আকবরের রাজ্যে সমান অধিকার পাইয়া মোগলরাজ্যের দাস হইয়াছিলেন, মোগলরাজ্যেব জন্য প্রাণ পর্য্যন্তও বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, ম্লেচ্ছ বলিয়া হিন্দু এতদিন যে মুসলমানকে ঘৃণা করিতেন, অত্যাচারী ইসলামের হস্ত ধনপ্রাণে বিনষ্ট হইযা যে মুসলমানের উপর তাহার জাতিক্রোধ জন্মিযাছিল ধর্ম্মহন্তা দেবদ্বেষ্টা যে যবনকে হিন্দু রাক্ষস বলিয়া ঘৃণা করিতেন, আকবরের সাম্যনীতির গুণে সেই যবনের জন্য হিন্দু পাঠানের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন এমন কি মোগলের বিরুদ্ধাচারী হিন্দুর সহিতও বিবাদ করিতে ত্রুটী করিলেন না। ক্রমে মোগল এতই হিন্দুর আরাধ্য হইয়া উঠিল যে হিন্দু রাজা মুসলমান সম্রাটের পরিবারে স্বীয় কন্যার বিবাহ দিতেও ত্রুটী করিলেন না। আকবরের প্রবল প্রতাপ হিন্দু শ্রদ্ধার বল পাইয়া আরও প্রতাপান্বিত

হইয়া উঠিল। তখন মোগলের সে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে শত্রুগণ ভীত হইত। সুখের সাম্রাজ্যে প্রজাগুণ সুখ স্বচ্ছন্দে বাস করিত, রাজভক্তির লৌহ বর্ম্ম পরিধান করিয়া হিন্দু ও মুসলমান সৈন্য মোগলের জন্য দিগ্‌বিদিক পরাজয় করিয়া আসিত। এই না রাজ্য শাসনের উচ্চনীতি? এই না রাজার প্রকৃত গৌরব, প্রকৃত সাহসিকতা? প্রজার হৃদয়ের উপর যে রাজ্য বিস্তৃত বহিঃশত্রু গৃহশত্রু কোন শত্রুতেই সে রাজ্যের সূচ্যগ্র পর্য্যন্ত বিনষ্ট করিতে পারে না। আকবর জানিতেন হিন্দুই হিন্দুস্থানের বল। হিন্দুর কৃতজ্ঞতাই রাজ্যরক্ষার ব্রহ্মাস্ত্র, আকবর জানিতেন হিন্দু বিমুখ হইলে মোগলসাম্রাজ্যের কুশল নাই, মুসলমানের নিস্তার নাই, আকবর জানিতেন যদি বিদ্যাশিক্ষা নীতিশিক্ষা, ও ধর্ম্মশিক্ষা লাভ করিতে হয়, তবে হিন্দু না হইলে চলিবে না, যদি রাজনীতির সৌষ্টব সম্পাদন করিতে হয়, হিন্দুই তাহার পরম সহায়, অন্ধবিশ্বাসে প্রভুর অনুসরণ করিবে, অসময়ে প্রভুর জন্য প্রাণ দিবে, এমন ভৃত্য নিযুক্ত করিতে হয় তবে হিন্দুই তাহার উপযুক্ত পাত্র। যদি প্রকৃত বন্ধুর ন্যায় সম্রাটের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া রাজ্যরক্ষার জন্য সমরাঙ্গনে বিন্দু বিন্দু রক্ত দান করিতে এরূপ মিত্ররাজার আবশ্যক হয় তবে হিন্দু রাজাই সেই যথার্থ বন্ধু। এমন বন্ধুকে পরিত্যাগ করা কি বুদ্ধিমান রাজনীতিজ্ঞের কার্য্য? এমন সরলহৃদয় প্রজার উপর অবিশ্বাস করা কি ধর্ম্মাত্মার কর্ত্তব্য? আকবর হিন্দুর সাহায্যে মোগল সাম্রাজ্যের উচ্চ হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিলেন উচ্চ হইতে উচ্চতর প্রদেশে মোগলের গৌরবধ্বজা উড্ডিয়ান করিলেন, হিন্দুর চিরস্মরণীয় আরাধ্য দেবতা হইয়া দিল্লীশ্বরোবা উপাধি পাইলেন।

আকবর সাম্যনীতির প্রচার করিয়া মোগলের অক্ষয় কীর্ত্তি ভারত বক্ষে স্থাপিত করিয়া গেলেন তাঁহার পুত্র পর্য্যন্তও তাঁহার যশে যশস্বী হইয়া হিন্দুর দক্ষিণ হস্ত প্রাপ্ত হইলেন। সেলিমের কারাবাসের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুর সত্বাধিকার কারাগারে আবদ্ধ হইল, আরঙ্গজীবের বিদ্বেষপূর্ণ ক্রূর ব্যবহারে হিন্দু মুসলমান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল, সাম্যনীতির সমূলোৎপাটনে দেশের ি ের অশান্তি ও অরাজকতা পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল. ত্রিপুণ্ড্রক মহারাষ্ট্রী তখন অস্ত্র ধরিয়া স্বাধীন হইলেন, রাজপুত তখন বিদ্রোহের বহ্নি চতুর্দ্দিকে ছড়াইতে লাগিলেন, দক্ষিণ ভারতে হিন্দু মুসলমান এক একটী স্বতন্ত্র সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া মোগলসাম্রাজ্যকে নিতান্ত হীনবল করিয়া ফেলিলেন। বঙ্গদেশ তখন স্বাধীন, উড়িষ্যা, আসাম, ত্রিপুরা স্বাতন্ত্র্যাবলম্বী। অংশে অংশে, খণ্ডে খণ্ডে বিপুল মোগলসাম্রাজ্যের অঙ্গচ্ছেদ করিয়া হিন্দু মুসলমান মোগল পাঠান, সকলেই স্বীয় স্বীয় রাজদণ্ড ধারণ করিয়া এক একটী নূতন সাম্রাজ্যের স্থাপন করিল, মোগলের বিস্তীর্ণ ভারতরাজ্য এক সাম্যনীতির অভাবে শতধা বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল।

জীতের যদি বিজেতার উপর ভক্তি শ্রদ্ধা না থাকে কতদিন তরবারির অগ্রে তাহাদিগকে শাসন করিয়া রাখা যাইবে? কতদিন প্রজার উপর অবিশ্বাস করিয়া রাজা রাজ্য করিতে পারিবেন রাজা যতই বুদ্ধিমান ও বলবান হউন না প্রজাকে কঠোর শাসনে চাপিয়া

রাখিতে কখনই তিনি অধিক দিন সমর্থ হইবেন না। স্বভাবের নিয়ম এই, প্রকৃতির বিধান এই, পাশব বলে বুদ্ধিজীবী অনুভব শক্তিশালী মনুষ্যকে কখনই দমন করিয়া রাখা যায় না। হিন্দুর পক্ষে এই বিধান যতদূর কার্য্যকরী আর কোন জাতির পক্ষে সেরূপ নহে। হিঁন্দুরা যেমন স্নেহে বশীভূত হন পৃথিবীর এমন কোন জাতি নাই সে স্নেহে সেরূপ বশীভূত হইতে পারে। দয়া দাক্ষিণ্য স্নেহ প্রীতিই হিন্দুর বশীকরণাস্ত্র, ধর্ম্মই হিন্দুর উপযুক্ত শাসনদণ্ড। পাশব বলে একদিন আমেরিকাকে বশে আনা সম্ভব হয়, রুষের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ খর্ব্ব করা সম্ভব হয় কিন্তু পাশব বলে হিন্দুর উন্নতশির অবনত করিতে গেলে মহান বিপত্তি ঘটিয়া উঠে। প্রজার প্রীতিই যে জাতীর রাজনীতি, ভীতির কাছে সে কি কখনও মস্তক অবনত করে? উর্দ্ধে দৃষ্টি না রাখিয়া কি তাহার শাসনকার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে? যে রাজনীতি সুনীতি ও ধর্ম্মনীতিসঙ্গত নহে তাহা এককালে অধার্ম্মিকের শাসননীতি হওয়া সম্ভব। কিন্তু ধর্ম্মই যাহার জীবন, সুনীতিই যাহার জীবনোপায়, কঠোর নীতি অবলম্বন করিয়া কখনই তাহাকে বশে আনা যায় না। একটী স্নেহের কথা বলিলে যে হিন্দু গোলাম হইতে পারে, তাহার উপর তরবারির শাসন বিস্তার করা রাজার কখনই কর্ত্তব্য নহে।

ব্রিটীস গবর্ণমেণ্ট যদি ইতিহাস হইতে নীতি গ্রহণ করেন তবে কখনই হিন্দুর অপ্রীতিভাজন হইবেন না। স্বার্থনীতির বশবর্ত্তী হইয়া হিন্দুকে যদি উৎপীড়িত করেন ইতিহাসে সাম্যনীতিরই অধিক গৌরব বৃদ্ধি হইবে। মুসলমান একদিন হিন্দুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সাম্যনীতির প্রচার করিয়াছিলেন, মোগলের কি তাহাতে ক্ষতি হইয়াছিল? ইংরাজ কিন্তু ক্ষতির ভয়ে হিন্দুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেছেন না। আমরা কি ইংরাজকে রাজভক্তি দেখাইতে ক্রটী করিয়াছি? তিল পরিমাণ উপকার পাইলে হিন্দু কি ইংরাজকে তাল পরিমাণ কৃতজ্ঞতার উপহার দেয় না? তথাপি এ কঠোরনীতি কিসের জন্য, হিন্দুর প্রতি এ অবিশ্বাস কিসের জন্য? মুসলমান যাহাতে সাহস করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন ইংরাজ তাহাতে পরাঙ্মুখ হইয়া ভীরুতা প্রকাশ করেন কেন? একশত উনত্রিংশ বৎসর শাসনের পরও ইংরাজ যে হিন্দুকে চিনিতে পারিলেন না ইহাই আমাদের আক্ষেপের বিষয়! ডফরিণের গবর্ণমেণ্টে আমাদের অনেক অভাব অনেক অত্যাচার ঘটিয়াছে। এই সাম্যনীতির অভাবই তাহার মূল কারণ। ডফরিণ ইতিহাসের উপদেশ পাইয়া এখন হইতে হিন্দুকে চিনিতে শিখুন। হিন্দুকে চিনিতে পারিলে পরে এই সাম্যনীতিই তাঁহার হিন্দুশাসনের মূল নীতি হইবে।

আবার প্লীহা ফাটা। ১ আষাঢ় ১২৯৩। ৩১ সংখ্যা

কুক্কুট হত্যার ন্যায় কুলিহত্যাও চা-কর সাহেবদের অভ্যস্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নরহত্যা করিতে পাষণ্ডদিগের প্রাণে একটু আঘাত লাগে না। ইংরাজ বিচারকও আবার

এমনি মহত্ত্ববান যে স্বজাতি বলিয়া তাঁহারা হত্যাকাণ্ডে অপরাধীকেও নিষ্কৃতি দিয়া থাকেন। পাঠক কি কখন কুলিহত্যার জন্য কোন সাহেবকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিতে দেখিয়াছেন? অথচ ইংরাজের এই কুলিহত্যার কথা শুনিতে শুনিতে আপনাদের ত কর্ণ বধির হইয়া যাইতেছে। আসামপ্রদেশ কুলির বধ্যভূমি, চা-কর ও নীলকর সাহেব বাহাদুর সেই বধ্যভূমির জহ্লাদ। অনবরতই কুলির প্রাণ সেই আসামের বধ্যভূমিতে প্লীহা ফাটিয়া বাহির হইতেছে। কুলি একটু রূঢ় কথা কহিলে, মনিব গরম হইয়া অমনি তাহার বুকে জুতার সহিত লাথির প্রহারে তাহার অনাবশ্যকীয় ঘৃণ্য জীবন বাহির করিয়া ফেলেন, কুলি ঘরে যাইবার প্রস্তাব করিলে মনিবের দোদুল্যমান চাবুক পৃষ্ঠের উপর পঞ্চাশ বার পতিত হইয়া দরিদ্রকে ইহজগতের পরপারে রাখিয়া সে কুলির রমণী লইয়া সাহেব বিহার করিতে লাগিল। কালানিগার যদি আপত্তি করিতে আসে দোনলা বন্দুকের একটা শব্দ শুনিয়া অমনি তাহার প্লীহা ফাটিয়া যায়।

এই প্লীহা ফাটিবার ব্যাপার কিছুদিন বন্ধ ছিল। সাহেবজীদের অনুগ্রহ! কিন্তু অধিক দিন এতনুগ্রহ দেখাইতে গেলে বংশগত স্বভাবের বিরুদ্ধকার্য্য করা হয়; সুতরাং আবার প্লীহাফাটা আরম্ভ হইয়াছে। এবারকার মহাবীর মিঃ হেন্‌রি, প্লীহাফাটা হতভাগ্য লালা মাটুন। হেন্‌রি বলেন লালা মাটুনের এগ্রিমেণ্ট ফুরাইয়া গেলে সে আবার সস্ত্রীক চাকরি চায়। চাকরিতে নিযুক্ত হইয়া কিছুদিনের পর তাহারা আবার কার্য্যত্যাগ করিবার প্রস্তাব করে। সাহেব হেনরি ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া হস্তদ্বারা কুলির গণ্ডদেশে আঘাত করেন। কুলি সেই আঘাতে পড়িয়া গিয়া প্রাণত্যাগ করে। অকুস্থানটা আসাম প্রদেশে ইন্দ্রগ্রামের চা বাগান। এই ঘটনার পরই আসামের ডেপুটী কমিশনার কেনেডি সাহেবের নিকট ইহার বিচার হয়। কেনেডি সাহেব দুই ঘণ্টার মধ্যে একটী খুনি মকদ্দমার বিচার করিয়া সামান্য অপরাধে হেনরির ১০০ শত টাকা জরিমানা করেন। মকদ্দমা তারপর হাইকোর্টে যায়। হাইকোর্টে বিচারপতিগণ ডেপুটী কমিশনারের বিচারকার্য্য আইনসঙ্গত হয় নাই বলিয়া মকদ্দমা সেসনগৃহ চা কর সাহেবে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। পাঁচজন জুরি বসিয়া বিচার আরম্ভ করে। জুরিরা স্থির করিলেন লালা মাটুনের মৃত্যু হইয়াছে। হেনরি তাহাকে আঘাত করিবার কিয়ৎক্ষণ পরে মাটুন মূর্চ্ছা যায়। সেই মূর্চ্ছাতেই তাহার প্রাণ বিয়োগ হয়। ডাক্তারেরা বলিলেন প্লীহা ফাটিয়া মাটুনের মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু কোন্ আঘাতে যে তাহার প্লীহা ফাটিয়াছে একথা বলিতে তাঁহারা প্রস্তুত নহেন। জুরি ও জজ বাহাদুর একে খৃস্টিব বৃহস্পতি, তাহাতে আবার স্বজাতি প্রেম তাঁহাদের হৃদয়ে উদ্বেলিত, স্বজাতীয় সহচরগণ চতুঃপার্শ্বে ঘেরিয়া বসিয়া আছে। কাযেই তাঁহাদের একটা সূক্ষ্ম বিচার করিতে হইল। লালা মাটুনের প্লীহারোগ ছিল, সে হেনরির হস্তে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে। ক্রোধেই সে অচৈতন্য হইয়া ভূমিতে পড়িয়া যায়, সেই ক্রোধের বেগেই তাহার প্লীহা ফাটিয়া

প্রাণ বাহির হয়। হেনরির প্রহার অথবা ভূমিতে পড়িয়া যাইবার কারণে তাহার জীবন বহির্গত হয় নাই। হেনরি হত্যাপরাধে কোনমতেই অপরাধী হইতে পারেন না। সুতরাং ডেপুটী কমিশনার যে বিচার করিয়াছেন তাহা নিতান্ত অন্যায় হইয়াছে।

জুরিদের এই সুন্দর বিচারে হেনরি অব্যাহতি পাইবেন। ইহার উপর আবার ইংলিস ম্যানের জনৈক সংবাদদাতা বলেন ডেপুটী কমিশনার হেনরির তুই একজন সাক্ষী গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে যে মিছামিছি খরচান্ত করাইয়াছেন ইহার জন্য ও মকদ্দমা সম্ভূত আন্তরিক পীড়ার কারণ তাঁহার যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা কমিশনার কিম্বা ডেপুটী কমিশনরের নিকট আদায় করিবার উপায় নাই। পত্রপ্রেরক আশা করেন ইঁহারা উভয়েই দয়া করিয়া হেনরির ক্ষতি পুরণ করিবেন।

সেসন আদালতে এমন সুন্দর বিচার হইতে আমরা কখনও দেখি নাই। কোন আদালতের কোন কোন মকদ্দমায় হেতুবাদের আইন এরূপে পদদলিত হইতেও কখন দেখা যায় নাই। কারণ কি? কুলির প্রাণের উপর তাচ্ছিল্ল, ঈশ্বরের আসনে বসিয়া নরহত্যার প্রশ্রয়, আর পক্ষপাতের পক্ষাবলম্বন! এতও কি ধর্ম্মে সয়? অতি অসভ্য মূর্খ জাতিও কোন দেশ অধিকার করিলে তথাকার অধিবাসীবর্গের উপর স্বজাতি দ্বারা এত উৎপাত, এত অত্যাচার, এত রক্তপাত, সহ্য করিতে পারে না। ধিক্ ইংরাজের স্বজাতি প্রেমে! তুই বেলা কাটনা কাটিয়াও ইংলণ্ডে যাহাদের পরিবারবর্গের আহার জুটিত না, ফারমের বড় সাহেব হইয়া আজ তাহারা কিনা নরহত্যা করিয়া খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে কালি ঢালিয়া দিতেছেন, আর তাঁহাদের বিচারপতিরাও এই পৈশাচিক কাণ্ডের প্রশ্রয় দিয়া সমগ্র জগতে হৃদয়হীনতার জলন্ত দৃষ্টান্ত রাখিয়া যাইতেছেন। আজ যদি বিলাতে এইরূপ একটী নরহত্যা রাজদ্বারে উপেক্ষিত হইত, তিনশত ওয়াট টাইলার উদ্ভূত হইয়া তাহার প্রতিবিধানে যত্নবান হইত। ভারতে ইংরাজের সে ভয় নাই, সুতরাং পিশাচের সম্মুখে নরহত্যার দ্বার নিয়তই উদ্ঘাটিত। এখানে আবার হত্যাকারীকে সহচরবর্গ সাহায্য করে, পক্ষপাত করিয়া বিচার করিতে বিচারপতির কিঞ্চিন্মাত্রও ক্রটি হইলে তাহার নিকট ক্ষতিপুরণের প্রত্যাশা করে। উপায় থাকিলে বিচারপতির বিরুদ্ধে ক্ষতিপুরণের অভিযোগ উপস্থিত করিতেও ক্রটী করে না।

হাইকোর্ট কি এই ভীষণ অত্যাচারের প্রতিবধান করিতে অগ্রসর হইবেন না? যদি দরিদ্র কুলি পত্নী, অথবা তাহার সাহায্যকারী কোন ব্যক্তির ব্যয় করিয়া মকদ্দমা চালাইবার ক্ষমতা না থাকে, হাইকোর্ট কি স্বয়ং মকদ্দমাটী হস্তে লইয়া বিচারকের উপযুক্ত কার্য্যের পরিচয় দিবেন না? সার কোমার প্রিথিবামের আমরা অনেক আশা করিয়া থাকি, তিনি যদি এই ভয়ানক অত্যাচারের প্রতিবিধানে হস্তক্ষেপ না করেন তবে জানিব নিতান্তই আমাদের অদৃষ্টের দোষ।

প্রজাসমিতি বালকের ক্রীড়া নহে। ২২ আষাঢ় ১২৯৩। ৩৪ সংখ্যা

রোমের ইতিহাস পাঠ করিয়া দেখিলে পেট্রিসিয়ান ও প্লিবীয়ানদিগের ইতিহাসের কথা মনে পড়ে। পেট্রিসিয়ানেরা উচ্চবংশীয়। তাঁহারা রাজ্যের যে সমস্ত উচ্চপদ তাহাই অধিকার করিতেন। প্লিবীয়ানেরা নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারি—শ্রেণীভুক্ত হইয়া চিরকালই অতিবাহিত করিতেন। হাজার লেখা পড়া শিখিলেও পেট্রিসিয়ানদের পদ কখনই প্লিবীয়ানের প্রাপ্য হইত না। পেট্রিসিয়ানের তোষামোদ করিয়া তাঁহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন। অবশিষ্ট সমগ্র প্লিবীয়ান উপযুক্ত হই:লও রাজার প্রসাদলাভ করিতে পারিতেন না। ক্রমে ইতরকর্ম্মে শিক্ষিত প্লিবীয়ানদের ঘৃণা জন্মিল। রাজপ্রসাদ লাভ করিয়া পেট্রিসিয়ানের ন্যায় মান্যগণ্য হইবার ইচ্ছা তাঁহাদের অন্তঃকরণে বলবতী হইল। পেট্রিসিয়ান ইচ্ছাপুর্ব্বক অত্যাচার করিলে অব্যাহতি পাইতেন, আইনের কড়াকড়ি কেবল প্লিবীয়ানদের উপরই চলিত। শাসনকার্য্যে পেট্রিসিয়ানের সম্পুর্ণ হস্ত, প্লিবীয়ানের কথা কহিবারও ক্ষমতা ছিল না। এগুলি ক্রমে শিক্ষাপ্রাপ্ত প্লিবীয়ানের অসহ্য হইয়া উঠিল। প্লিবীয়ানদের সহিত সমবস্থ ও সমান অধিকারী হইবার অভিলাষ শিক্ষার বল স্বতই বৰ্দ্ধিত হইয়া উঠিল। ইচ্ছা হইতেই চেষ্টা। এরূপ চেষ্টার প্রারম্ভ বড়ই ক্লেশদায়ক। স্থতরাং অতিকষ্টে প্লিবীয়ানদিগকে এই পার্থক্য নিবারণে যত্নবান হইল। ক্রমে অত্যাচার, অত্যাচারের সঙ্গে সঙ্গেই আবার আন্দোলন—প্লিবীয়ান স্থানে স্থানে দেশস্থগণকে একত্র করিয়া বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের অভাবের কথা অধিকারের কথা, পেট্রিসিয়ানের সহিত তাঁহাদের অন্যায় পার্থক্যের কথা গ্রামে গামে ঘোষণা করিতে লাগিলেন, পেট্রিসিয়ান রাজ্যের সকল প্রকার কর দিবে না, প্লিবীয়ানের জন্য নিত্য নূতন করের সৃষ্টি হইবে, প্লিবীয়ান শিক্ষিত হইয়াও সমাজমধ্যে উন্নত হইবে না। পেট্রিসিয়ান রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া রাজ্য শাসন করিবেন—এই অকারণ পার্থক্য, অন্যায় প্রভেদ কতদিন আর রোমরাজ্যে চলিবে? শিক্ষিতের সহিত অশিক্ষিত, ধনীর সহিত দরিদ্র, নানা স্থানে সমবেত হইয়া কেবল এই আন্দোলনেই মাতিয়া উঠিল। আমরা শিক্ষিত হইব, উপযুক্ত হইব অথচ কেন উচ্চপদ পাইব না। পেট্রিসিয়ানের ন্যায় আমরাও প্রজা, কেন আমরা অধিক কর দিতে বাধ্য হইব? কেনই বা পেট্রিসিয়ানের অপরাধ প্লিবীয়ানের সহিত সামান্যরূপে দণ্ডিত হইব না। এই রবে ইতর সম্প্রদায়ের মধ্যে ভয়ানক আন্দোলন উঠিল। আন্দোলনের উপর অত্যাচার, তাহার উপর আবার আন্দোলন। এইরূপে পেট্রিসিয়ানের হস্তে অত্যাচারের উপর অত্যাচার সহ্য করিয়াও প্লিবীয়ান আন্দোলন করিতে ক্ষান্ত হইল না। ক্রমাগত আন্দোলনের পরিণামে পেট্রিসিয়ান প্লিবীয়ানকে আদর করিতে শিখলেন, প্লিবীয়ান অনেক সত্ত্বাধিকার প্রাপ্ত হইলেন—পার্থক্য দূর

হইল, রোমরাজ্যের বল সদৃঢ় হইল, প্রজার হৃদয়ের উপর সমগ্র রোমের আধিপত্য স্থাপিত হইল।

প্লিবীয়ান রাজার সে আন্দোলন কখনই বালকের ক্রীড়া নহে। তথাপি, এই সকল আন্দোলন কেবল কয়েকজন শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের ভিতরেই উত্তেজিত হইয়াছিল। বাঙ্গলায়ও সেই ব্যাপার উপস্থিত। কেবল প্রভেদ এইমাত্র যে ইহাতে বিদ্রোহের দুর্গন্ধ নাই বরং আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে রাজভক্তির স্রোত প্রবাহিত। এই আন্দোলনের উপর পদস্থ কর্ম্মচারিগণের কিঞ্চিৎ ঈর্ষাদৃষ্টিও পতিত হইয়াছে। অল্পে অল্পে অত্যাচারেরও আভাষ পাওয়া যাইতেছে। প্লিবীয়ানদিগের আন্দোলন যদি ছেলেখেলা না হয়, বাঙ্গলায় এই দেশব্যাপী আন্দোলন কখনই ছেলেখেলা নহে। গবর্ণমেণ্ট ইহাতে রুষ্ট হউন আর তুষ্টই হউন, কালে যে এই সকল সমিতি হইতে আমাদের সমূহমঙ্গল সাধিত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ মাত্রই নাই। সিভিলিয়ান ভ্রুকুটী করিতে পারেন এংলো ইণ্ডিয়ান ঘৃণায় কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে পারেন, মাজিষ্ট্রেট সমিতিতে উপস্থিত হইয়া গবর্ণরীস্বরে প্রজাসমিতিতে তিরস্বার ও বিদ্রূপ করিতে পারেন। কিন্তু এই প্রজাসমিতি হইতে ভারতের ভাবী মঙ্গল অনিবার্য্য।

ইতিহাস হইতে যদি কোন সত্য গ্রহণ করা যায় তবে এইটাই সারসত্য যে প্রজার বল রাজ্যের মহাবল। প্রজার মনস্তুষ্টি রাজ্য রক্ষার প্রধান উপায়, প্রজার মতে রাজ্য শাসন শান্তিরক্ষার একমাত্র অবলম্বন। রাজা যদি প্রজাকে অবহেলা করেন, প্রজার সমবেত চেষ্টায়, কালে তাহার প্রতিবিধান হয়। সুতরাং সে চেষ্টা কখনই বালকের ক্রীড়া হইতে পারে না। ভারতবাসী গবর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণ প্রসাদ চায়, মহারাণীর আশ্বাস-বাক্য বিশ্বাস করিয়া ইংরাজ প্রজার সহিত সমান অধিকার চায়, ভারত গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক সভা অধিকাংশই বিদেশীয় সভ্য কর্ত্তৃক সংগঠিত। ভারতের প্রজা দেশীয় সভ্য দ্বারা সে সভার সংস্কার সাধন করিতে চায়; ভারতের শত্রু চতুর্দ্দিকে ঘেরিয়া আছে, ভারতবাসী স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত সৈন্যের শ্রেণীতে প্রবৃষ্ট হইয়া বহিঃশত্রু দমন করিতে চায়। ভারতবাসী উপযুক্ত ও শিক্ষিত হইতেছেন, ইংরাজের শাস্ত্র, ইংরাজের ব্যবহার, ইংরাজের ভাষায় পাণ্ডিত্য লাভ করিতেছেন, ইংরাজের নিকট স্বাধীনতা ও সাবলম্বন শিক্ষা করিতেছেন,—সুতরাং ইংরাজ প্রজার সহিত সমাজ অধিকার পাইয়া রাজার মঙ্গল, রাজ্যের মঙ্গল ও প্রজাবর্গের মঙ্গলের জন্য আত্মশাসন অবলম্বন করিতে চায়। ইংরাজ কর্ম্মবীরের যথেচ্ছাচারে আর যাহাতে তাঁহাকে উৎপীড়িত হইতে না হয়, ইংরাজরাজ্যে আর যাহাতে শ্বেতকৃষ্ণাঙ্গের প্রভেদ না থাকে, কলঙ্কিত পার্থক্যনীতি আর যাহাতে ভারত শাসনের মূল-দেশে বর্ত্তমান না থাকে, ভারতের প্লিবীয়ানগণ আজ তাহারই জন্য ঘোর আন্দোলন তুলিয়াছেন। একি বালকের ক্রীড়া? ১০/২০ সহস্রলোকে সমবেত হইয়া কি ছেলে-খেলা করিতে আসে? ইতিহাসের সত্যগ্রহণ করিলে বুঝা যাইবে প্রজাসমিতি বৃথা

আড়ম্বর করিতেছেন না, অনর্থক মাথা বকাইবার জন্য সময় করিতেছেন না, দুইচারি জন পার্ণের পক্ষ সাবলম্বনবাদী শিক্ষিত বাঙ্গালীর প্ররোচনায় হুজুকে মাতিয়া ইংলণ্ডের প্রজার অনুকরণ করিতেছেন না, কিন্তু ভারতের ভবিষ্যৎ আকাশ মেঘনির্ম্মুক্ত করিয়া দিতেছেন ভারতে ইংরাজ রাজ্যের সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করিয়া দিতেছেন ইংরাজের মহিমা সমগ্র সভ্যসমাজে, সভ্যজাতি ও সভ্য রাজ্যের মধ্যে ভেরিরবে প্রচার করিবার উপায় দেখিতেছেন। ইংরাজ। প্রজাসমিতি তোমারই কীর্ত্তি তোমারই সুশাসনের জয়ঢক্কা।।

কুলি পীড়ন। ১১ শ্রাবণ ১২৯৩। ৩৭ সংখ্যা

আসাম গেজেটে ১৮৮৫ অব্দের এমিগ্রেসন রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছে যে ১৮৮২ হইতে ১৮৮৫ অব্দ পর্য্যন্ত চারি বৎসর ৭০৮৪২ জন কুলি ধুবড়ির কুলি ডিপো হইতে আসামের চা বাগানে ও কয়লার খনিতে প্রেরিত হইয়াছে! ইহাদের মধ্যে অনেকে পথিমধ্যে দারুণ ক্লেশ ও অত্যাচার ভোগ করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। অবশিষ্ট ব্যক্তিগণ কোনক্রমে প্রাণ বাঁচাইয়া চা ক্ষেতে বা কয়লার খনিতে উপস্থিত হয়। তাহারা যে কত যন্ত্রণায় সাহেবদিগের হস্তে জীবন ত্যাগ করে কে তাহার অনুসন্ধান লয়? ক্ষমতাপ্রাপ্ত ডেপুটী কমিশনার ও আশিষ্টাণ্ট কমিশনারগণ প্রতিবর্ষে চা বাগানের অবতারদিগের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে আগমন করেন বটে কিন্তু মহাপ্রভুদিগের নৃশংস পাশব ব্যবহারের গূঢ় কথা কি বাহির করেন? ইঁহারা যে ক্ষেত্রে পদার্পণ করেন সেইখানে স্বজাতীয়দিগের সাদর সম্ভাষণে বিবিধ সুখসেবা পান ভোজনে দরিদ্রের দুঃখ ও পীড়িতের অত্যাচার ভুলিয়া গিয়া স্বজাতি প্রেমের প্রবল স্রোতে মনুষ্যত্ব ভাষাইয়া দেন।

ধুবড়ীর ডেপুটী কমিশনর সত্যের মস্তকে পদাঘাত করিতে না পারিয়া এমিগ্রেসন রিপোর্টে এইমাত্র প্রকাশ কারয়াছেন যে ১৮৮৪ অব্দে ১৩০ জন এবং ১৮৮৫ অব্দে ৩৫ জন কুলি প্রাণত্যাগ করিয়াছে। তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়া ডেপুটী সাহেব বলেন যে পথিমধ্যে উত্তমরূপ আহার ও যত্নের অভাবেই এইরূপ অপমৃত্যু ঘটিয়াছে। আমরা বিশেষরূপে অবগত আছি কুলিদিগকে জাহাজে করিয়া আনিবার সময় সংকীর্ণস্থানে মেষপালের ন্যায় ঠাসিয়া আনা হয় তাহাদের পেট ভরিয়া আহার দেওয়া হয় না। আবার পুরুষদিগের সহিত যে সকল স্ত্রীলোক থাকে তাহাদিগের উপর সাহেব মহাপ্রভু হইতে খালাসি কর্ত্তাগণ পর্য্যন্ত পাশব অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। সমস্ত রাত্রি উহাদিগের শান্তি নাই। গণ্ডগোলে কুলিদিগের নিদ্রা নাই ও যাত্রিদিগেরও কষ্টের অবধি থাকে না। দরিদ্রের অদৃষ্টে যে রক্ষক সেই যখন ভক্ষক হইয়া উঠেন তখন ইহাদিগের আর শান্তি কোথায়?

কুলিদিগের জন্যে যে আইনটী আছে তাহার ন্যায় উৎপীড়ক আইন বুঝি আর

ত্রিজগতে নাই। এই যে প্রণালীতে কুলিসংগ্রহ করা হয় তাহা মুসলমান রাজ্যের দাস সংগ্রহ প্রণালী। প্রলোভন দেখাইয়া কুলি জুটাইবার জন্য চাকর সাহেবেরা স্থানে স্থানে দালাল নিযুক্ত করিয়া রাখেন। নিরক্ষর দরিদ্র লোক দালালদিগের প্ররোচনায় উত্তম পান ভোজন ও অশন বসনের প্রলোভন পাইয়া উহাদিগের হস্তে আত্মসমর্পণ করে। দালালগণ প্রভুর সম্মুখে শিকার ধরিয়া দিয়া তাহাদিগকে এগ্রিমেণ্টের নামে দুর্ভেদ্য নাগপাশে আবদ্ধ করে। মূর্খ কুলি বুঝিতে পারে না যে এই দাসখতে স্বাক্ষর করিয়া তাহার ইহজীবন বিক্রীত হইবে, স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইবে, দারুণ যন্ত্রণায় প্রাণ পর্য্যন্তও বিসর্জ্জন দিতে হইবে।

একবার সংগ্রাহকদিগের চক্রে পড়িলে যে কুলির জাতি ধর্ম্ম ইহকাল পরকাল সকলেরই দক্ষিণান্ত করিতে হয়। পুরুষ, রমণী, বালক বালিকা কেহই আর যমদণ্ড কি নরকবহ্নি হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয় না।

গবর্ণমেণ্ট এই সকল অত্যাচারের দিকে আর দৃষ্টিপাত করেন না, বরং আইন ব্যবস্থায় চা-কর সাহেবদিগকে এইরূপ দুর্ব্ব্যবহার করিতে প্রশ্রয় দেন। বঙ্গবাসী ও আসামবাসী তোমরা কি এই কুলি আইনটীর সংহার করিয়া চা-কর সাহেবদিগের দর্পচুর্ণ করিতে পার না? দরিদ্রের যে সব যায়, দেশের যে সর্ব্বনাশ হয়। এত আইনকানুন লইয়া তোমাদের আলোচনা, আর যে আইনে লোকের ধন, প্রাণ, ধর্ম্ম একেবারে বিনষ্ট হইতেছে সে আইনের সংশোধন করিতে তোমাদের কি প্রবৃত্তি জন্মে না?

"ভারতসভা ভারতভূমির কয়টী অশ্রু মোচন করিয়াছেন?" ১ ভাদ্র ১২৯৩। ৪০ সংখ্যা

একদল সংবাদপত্রের লেখক আছেন, তাঁহারা উন্নতির নামে চটা, আন্দোলনের নামে খড়্গহস্ত। কোন একটা নূতন বিষয়ের আন্দোলন উঠিলেই অমনি তাঁহাদের শিরে বাজ পড়ে, অমনি তাঁহারা "হা ভারত!" "হা আর্য্য" "সমাজ গেল জাতি গেল" বলিয়া চিৎকার করিতে আরম্ভ করেন। সভা করিয়া কি হইবে বক্তৃতা দিয়া নিসান উড়াইলে কি হইবে—কার্য্য কর কার্য্য কর—অথচ কার্য্যের মধ্যে তাঁহাদের কেবল মসী পেষণ মাত্র সার। এইরূপে পাঠক ভুলান চটক্ দেখাইয়া ইঁহারা মনে করেন আমরা কত বড়ই না বিজ্ঞ হইয়াছি কতই না দেশের উপকার করিতেছি। এই সকল অকাল পরিপক্ক বালকগণের জানা উচিত আন্দোলনই সমাজের বল, রাজনীতি সংস্করণের উপায়, প্রজাপীড়ক রাজকর্ম্মচারীর রুচি সংশোধনের হেতু এবং আমাদের ন্যায় পদদলিত প্রজাবর্গের শিরোন্নয়নের একমাত্র সহায়। হিন্দু রাজত্বের পুর্ব্বাপর ইতিহাস পাঠ করিয়া দেখিলে বুঝা যায় এই আন্দোলনের বলেই ক্রমে ক্রমে হিন্দু সমাজ সংস্কৃত হইয়া আসিয়াছিল, হিন্দু রাজত্বে প্রজাপীড়ন নিবারিত হইয়াছিল। কেবল ভারতে কেন,

রোম, গ্রীস, ইংলণ্ড কোথায় না আন্দোলনের প্রতাপ অনুভূত হইয়াছে? এক আন্দোলনের অমিত পরাক্রমে রাজার রাজ্য গিয়াছে, পোপের পোপত্ব বিনষ্ট হইয়াছে, দুর্ব্বল জাতি প্রবল হইয়াছে, প্রপীড়িত প্রজাবর্গ বাযুর ন্যায় স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। ধর্ম্ম সংস্কার, সমাজ সংস্কার, রাজ্য সংস্কার, সকলই এক আন্দোলনের বলে সাধিত হইয়াছে। অথচ এই আন্দোলনটা কি? ইহা কেবল বক্তৃতা দেওয়া, নিশান উড়ান ও লোক সংগ্রহের আরও কয়েকটী আড়ম্বর মাত্র। ব্রুটাস ও সিজারকে জান? এই দুইজনকে লইয়া রোমে যে আন্দোলন হয় তাহা কেবল বক্তৃতা করিয়া। ব্রুটাসও এণ্টোনিয়সের বক্তৃতা পাঠ করিয়াছে? উহাতে সমগ্র রোমবাসীর হৃদয়ের উপর কার্য্য করিয়াছিল। ফরাসীর ইতিহাস যে একটী আন্দোলনের গ্রন্থী তাহাও এই বক্তৃতা আর নিসান উড়ানর সূত্রে গ্রথিত।

বক্তৃতা করিয়া নিসান উড়াইয়া ভারতসভা সেদিন সহস্র লোকের সমান সম্মিলনে উৎসাহের গীত গাহিতে গাহিতে টাউন হল হইতে আসিতেছিলেন। সে দৃশ্যে কোন সহযোগীর চক্ষে শূল বিঁধিয়াছে। সুনব্য সহযোগী এঁচোড়ে পাকা বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়া তাই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন "ভারতসভা ভারতজননীর দরবিগলিত ধারা কয়টী অশ্রু মুছিয়াছিলেন? অল্পবুদ্ধি পাঠকের নিকট এই সকল জেঠা কথার বড আদর, কিন্তু যাঁহার একটুও বুদ্ধিচক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে, একবারও যিনি পৃথিবীর ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা উল্টাইয়াছেন তিনি বলিবেন যদি কেহ জননীর অশ্রু মুছাইবার নিমিত্ত হস্তত্তোলন করিয়া থাকেন তবে সে এই ভাবতসভা ও ভারতসভার স্বদেশবৎসল সভ্যশ্রেণী। যাঁহারা ভিতরের সমাচার অবগত হইয়াছেন তাঁহারা বলিবেন এ জেঠামোর কারণ কেবল সুরেন্দ্রবাবুর উপর সম্পাদকের বিষদৃষ্টি। আবার যাঁহারা সংবাদপত্র পাঠ করিয়া লেখকের অভিসন্ধি বুঝিতে পারেন, তাঁহারা বলিবেন এ কেবল পাঠক ভুলাইয়া সার গড়িবার উপায়। যে কারণেই হউক আমরা এরূপ মর্ম্মশূন্য জেঠার কথায় বডই বিসম্বাদী। ইহাতে পাঠকের প্রবৃত্তি কলুষিত হয়, যুবকের উদ্যম ভঙ্গ হয়, আর কতকগুলি নিষ্কর্ম্মা অনুদ্যোগী রক্ষণশীলের স্পর্দ্ধা বৃদ্ধি হয়।

লেখক বলিতেছেন ভারতসভা লালমোহনকে বিলাতে পাঠাইয়া দেশের কি উপকার করিয়াছেন। লালমোহন যদি আজ কৃতকার্য্য হইতেন, আজ যদি তিনি মহাসভায় বসিবার স্থান পাইতেন সহযোগীর মুখে এ কথাটা শুনা যাইত না। লালমোহন কি করিয়াছেন? এ জিজ্ঞাসায় কৃতঘ্নতা প্রকাশ করা হয়, আমরা জিজ্ঞাসা করি লালমোহন কি না করিয়াছেন? জিত বিজেতার পার্থক্য নিবারণের চেষ্টা কি সামান্য কর্ম্ম? ইংলণ্ডবাসীর অজ্ঞাতে কয়েকজন ক্ষমতাপ্রিয় এংলো-ইণ্ডিয়ানের হস্তে আমরা যে উৎপীড়িত হইয়াছি তাহার বিষয় ইংলণ্ডে জ্ঞাপন করা, ভারতের উপর ভারতবাসীর সহানুভূতি লাভ করা, ভারতবাসীকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রদান করিবার জন্য

অনবরত চেষ্টা করা এসকল কি সামান্য কর্ম্ম? ভারতের ভবিষ্য মঙ্গলের শান্তিঘট স্থাপন করিবার জন্য বর্ত্তমানকালে আর কি করা সম্ভব হয়। আমরা আবার জিজ্ঞাসা করি ভারত-সভাই বা কি করিয়াছেন?—এই লালমোহনকে বিলাতে প্রেরণ তাঁহাদের একটী প্রধান কীর্ত্তি। লালমোহন ভারতবাসীর স্বাধীনতার দূত। এই পদের সৃষ্টি করিয়া ভারতসভা ভারতভূমির যত উপকার করিয়াছেন, কেবল ব্রাহ্মের উপর গালিবর্ষণ করিয়া বিলাত ফেরতকে সমাজচ্যুত করিবার প্রবৃত্তি দিয়া, ইংরাজী শিক্ষিত যুবকের উপর খড়্গহস্ত হইয়া, আর বিনা অপরাধে সঞ্জীবনীর পত্রপ্রেরকের নামে অপবাদ ঘোষণা করিয়া সহযোগী তাহার অপেক্ষা অধিক কিছু করিতে পারিয়াছেন কি? ভারতসভা ভারতরাজ্যের মঙ্গল ভেরী। এই ভেরীর শব্দে ভারতবাসী জাগরিত হয়, দিকদিগন্তরে উৎসাহের বাণী বিঘোষিত হয়—বঙ্গদেশের গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, শিক্ষিত সম্প্রদায় দেশহিতৈষণার তাড়িত তেজে জ্বলিয়া উঠে। বঙ্গদেশ হইতে বেহার, বেহার হইতে উত্তর পশ্চিম পাঞ্জাব ও বোম্বাই, মধ্যদেশ বিদীর্ণ করিয়া মান্দ্রাজ ও দক্ষিণ ভারত, মঙ্গল ভেরীর জয় নিনাদে আলস্য ছাড়িয়া দণ্ডায়মান হয়, হিমালয় হইতে কুমারিকা সেই শব্দে প্রতিধ্বনিত হয়।

আবার বলিতে চাও ভারতসভা কি করিতেছে? স্বায়ত্বশাসন কাহার চেষ্টায়? শৈলবিহারের সমস্যা ভেদ কাহার চেষ্টায়? সিভিল সার্ভিসের বয়ক্রম নির্ণয়, গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে দেশীয় নিয়োগ, ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধি ব্যবস্থা—এ সকল বিষয়ের আন্দোলন কাহার চেষ্টায়? যে দশ বৎসর এই সভা স্থাপিত হইয়াছে সেই দশ বৎসরের ভিতরেই ভারতবর্ষ ভয়ানক আন্দোলনে মাতিয়া উঠিয়াছে। সহযোগী যখন মাতৃগর্ভে তখন হইতে এই ভারতসভা কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। এখন যে সহযোগী ইংরাজ গভর্ণমেণ্টকে দুইটা কড়া কথা বলিয়া সুখী হইতেছেন, সে স্বাধীনতাটুকুও এই সভার কতকগুলি সভ্যের আন্দোলনের ফল। তুমি আমি কেবল লিখিয়া মরি, কার্য্যের কোন ধার ধারি না। যদি কার্য্যের দৃষ্টান্ত দেখিতে চাও তবে ঐ নিসানতোলা ভারতসভার দিকে চাহিয়া দেখ। কেবল পাকাম কথায় বিজ্ঞতা প্রকাশ হয় না, যদি বিজ্ঞতালাভ করিতে চাও চট্ করিয়া কলম ঘুরাইয়া বসিও না। দেখ, চিন্তা কর, আর সন্দিহানযুক্ত হইয়া গুরুজনদিগকে জিজ্ঞাসা কর। তবে না উপদেশ দিবার অধিকার জন্মিবে? সম্পাদকের কার্য্যভার বড় গুরুতর ভার। ইহাতে মানাপমানের দিকে দৃষ্টি করিলে চলিবে না, শত্রুর নিন্দা ও মিত্রের সম্ভাষণ করিলে চলিবে না, অর্থের লালসায় কতকগুলি লোকের রুচিকর সামগ্রী যোগাইলে চলিবে না। ধীরভাবে স্থিরভাবে যিনি দেশের লোককে তাহাদের অভাব বুঝাইয়া দিতে পারেন, সভ্য বোধে সৎসাহসে ভর করিয়া গবর্ণমেণ্টের অন্যায় কার্য্যগুলি দেখাইয়া দিতে পারেন, দেশের কর্ত্তব্য, সমাজের কর্ত্তব্য, রাজার কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দেশের বাস্তবিক উপকার করিতে পারেন, তিনিই সংবাদপত্রিকার সম্পাদক পদের যোগ্য।

বাবু লালমোহন ঘোষের স্বদেশ আগমন। ৫ আশ্বিন ১২৯৩। ৪৪ সংখ্যা

বাবু লালমোহন ঘোষ অকৃতকার্য্য হইয়া ঘরে আসিতেছেন। এখন তিনি আমাদের তিরস্কার না পুরস্কারের পাত্র? লালমোহন খ্যাতি লাভ করিবার জন্য বিলাতে যান নাই, স্বীয় বাক্‌পটুতার পরিচয় দিবার জন্য মহাসভার সভ্য হইবার প্রয়াস পান নাই, ভারতের উন্নতিকল্পে প্রাণপণ করিয়া তিনি বিলাতবাসী হইয়াছিলেন, ভারতবাসীর মঙ্গলসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া তিনি স্ত্রী পুত্র পরিবারের স্নেহমমতা কয়েক বৎসরের জন্য বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। তারপর উপর্য্যুপরি দুইবার সভ্য নির্ব্বাচনের সময় বাবু লালমোহন ঘোষ স্বীয় উদারতা, বচনকুশলতা, সাহসিকতা ও স্বাধীন চিন্তার গুণে অনেক লোকের প্রীতিভাজন হইয়াছেন। যে ইংলণ্ডবাসী পুর্ব্বে ভারতের নাম মাত্রও জানিতেন না, তাঁহারা লালমোহনের নিকট ভারতের পরিচয় পাইয়াছেন। এখনকার পাইওনিয়ার ও বিলাতের টাইমস পত্রিকার সংবাদদাতার গরল ভাষায় যাঁহারা ভারতের প্রতি বিরূপ হইয়াছিলেন তাঁহারা লালমোহনের মুখে প্রকৃত অবস্থা অবগত হইয়া আমাদের বন্ধু হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। লালমোহনের সহৃদয়তাগুণে সকলেই মোহিত হইয়াছেন তাঁহার স্বমতাবলম্বী অথবা ভিন্নমতাবলম্বী উদারনৈতিক কি রক্ষণশীল, কোন সম্প্রদায়ভুক্ত কোন ব্যক্তিই লালমোহকে বাঙ্গালী বলিয়া ঘৃণা করিতে পারেন নাই। ভারতবাসীর উপর ইংলণ্ডবাসীর দয়ামায়া লালমোহন হইতেই বাড়িয়াছে। লোকে তাঁহার এত অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছে যে ভারতে আসিবেন শুনিয়া ভেটফোর্ট বাসিগণ তাঁহার জন্য একখানি অভিনন্দনপত্র প্রস্তত করিতেছেন। গত কয়েকদিন আন্দোলন হইতেছে, বাবু লালমোহন ঘোষই তাহার মূল কারণ। লালমোহন যে উদ্দেশে বিলাতে গিয়াছিলেন হাতে হাতে তাহার ফল মিলে নাই বটে, কিন্তু একেবারেই যে তাহার সাধন হয় নাই, একথা বলা যায় না। তিনি মহাসভার সভ্য হইতে পারেন নাই বটে, কিন্তু ভারতের সহিত ইংলণ্ডের ঘনিষ্টতা যথেষ্ট বৃদ্ধি করিয়াছেন। পুনরায় নির্ব্বাচনের সময় তাঁহার নির্ব্বাচনস্থ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। এবারও যদি তিনি কৃতকার্য্য হন, অথবা তাঁহার জীবনেও যদি মহাসভার সভ্য হইবার সৌভাগ্য না ঘটে তথাপি তিনি ইংলণ্ডে গিয়া এমন উপায় করিয়া আসিয়াছেন, যে কালে ভারতবাসী ইংরাজের ন্যায় সমান অধিকার পাইয়া নির্ব্বিবাদে নিরাপত্তে মহাসভার আসন পাইতে পারিবেন।

যিনি এতবড় কাজ করিয়া আসিতেছেন, তিনি কি আমাদের তিরস্কারের পাত্র? বঙ্গবাসী যদি তাঁহাকে এই মহাকার্য্যের সূচনার জন্য অন্তরের সহিত ধন্যবাদ না দেন, তবে বাস্তবিকই কৃতঘ্নতা প্রদর্শন করা হয়।

অনেকে বলিতে পারেন লালমোহনের ক্রটী হয় নাই। কিন্তু যে ভারতসভা তাঁহাকে বিলাতে প্রেরণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের জানা উচিত ছিল, যে ইংরাজের দেশে

বাঙ্গালীর পক্ষে মহাসভার সভ্য হইবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। এই বিড়ম্বনায় অনর্থক অর্থ শ্রাদ্ধ করা ভারতসভার উচিত হয় নাই। সহজে লোকের এইরূপই বোধ হইতে পারে, কিন্তু যাঁহারা ইংলণ্ডের গত নির্ব্বাচনের ইতিহাস মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা এই সাধু উদ্যমের জন্য ভারতসভার সুখ্যাতি ভিন্ন অখ্যাতি করিতে পারিবেন না। বাঙ্গালী ইংরাজের রাজসভার সদস্য হইতে পারেন এইরূপ যাঁহাদের বিশ্বাস, আমরা আজ তাঁহাদিগকে লালমোহনের অকৃতকার্য্য হইবার কয়েকটী কারণ বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

প্রথম—আইরিস প্রশ্নের আন্দোলন ও গ্লাড্‌ষ্টোনের বল ক্ষয়। আয়র্লাণ্ডের স্বাধীনতা বিষয়ক এই যে একটা মহাপ্রশ্ন পারলিয়ামেণ্টে উত্থিত হয়, ইহাতে উদারনৈতিক সম্প্রদায়ভুক্ত অনেকেই গ্লাড্‌ষ্টোনের পক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। লালমোহন কর্ত্তব্য বোধে প্রথম হইতেই গ্লাড্‌ষ্টোনের পক্ষাবলম্বন করিয়াছেলেন। এই অপরাধে অনেক উদারনৈতিক সম্প্রদায়ভুক্ত ভোটার, যাঁহারা গত বৎসর নভেম্বর মাসের নির্ব্বাচনের সময় লালমোহনের হইয়া ভোট দিয়াছিলেন, তাঁহারা ইচ্ছা সত্ত্বেও এবার তাঁহাকে ভোট দিতে পারিলেন না। এই হিসাবে ২৫২ জন লিবারেল লালমোহনকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। অনেকে কেবল হোমরুল সম্বন্ধে লালমোহনের সহিত অনৈক্য হওয়ায় কোন সভ্যের জন্য ভোট না দিয়া ঘরে বসিয়া রহিলেন। ইঁহাদের সংখ্যা ২০০। এইরূপে হোমরুল প্রশ্নের জন্য লালমোহন ৪৫২ জন লোকের ভোট পাইতে পারেন নাই।

দ্বিতীয়—ভোট দিবার স্থানে ভোটিং অফিসার কতকগুলি ভোটের কাগজ ষ্ট্যাম্প করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এইরূপ ভোটের সংখ্যা ১০০টী।

গত নবেম্বর মাসে যে সকল ব্যক্তি লালমোহনের পক্ষ ভোট দিবার পর স্থানান্তরে চলিয়া গিয়াছেন অথবা ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যা ২৭৩।

এই তিনটী প্রধান কারণে লালমোহন যে সকল ভোট হারাইয়াছেন তাহাদের সমষ্টি করিতে গেলে ৮২৫টা ভোট হয়। লালমোহন যদি এই ৮২৫টী পাইতেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই এবার তাঁহাকে সভ্যপদে মনোনীত করা হইত। তাঁহার অকৃতকার্য্য হইবার আরও কয়েকটী কারণ আছে। ইংলণ্ডে ভোটকেন্দ্র যে কয়টী বিভাগে বিভক্ত ভেটফোর্ড তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। এই সর্ব্বপ্রধান বিভাগটী মিঃ এলভিন নাম এক ব্যক্তির জমিদারী। অনেকেই এলভিনের প্রজা ও খাতক। যেখানে টাকার শ্রাদ্ধ করিয়া ভোট সংগ্রহ করিতে হয়, সেখানে এলিভিন ইঙ্গিতমাত্রেই শত শত প্রজার ভোট পাইতে পারেন। এলিভিন নিজে একজন টোরি সম্প্রদায়ভুক্ত এবং হোমরুলের প্রবল শত্রু। মাস কয়েক ধরিয়া তিনি প্রজামহলে ভ্রমণ করিয়া ঢাক বাজাইতে লাগিলেন "হোমরুলে সর্ব্বনাশ হয়, ইংলণ্ডের রাজত্ব বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, গ্লাড্‌ষ্টোন সম্প্রদায় সর্ব্বনাশ করে।" এই ঢক্কা ধ্বনিতে অনেকের মনে সন্দেহ জন্মিল, অনেক নিরক্ষর কৃষক হাঁ করিয়া ভূস্বামীর মুখের দিকে

বিস্ময়নেত্রে তাকাইয়া রহিল, এবং অবশেষে স্থূল বুদ্ধিতে হোমরুলের প্রতিবাদী হইয়া এলভিনের পক্ষে ভোট দিল। অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি জমিদারকে চটাইবার ভয়ে স্বীয় মতের বিরুদ্ধে এলভিনের পক্ষাবলম্বন করিল। যাহারা লালমোহনের গুণে মোহিত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যেও অনেকে দুঃখিত চিত্তে লালমোহনকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। ডেটফোর্ডবাসী কৃষক, ব্যবসায়ী, শ্রমজীবী, ব্যবহারজীবী সকল লোকেই লাল-মোহনকে দেবতা বলিয়া শ্রদ্ধা করিতে, দেশের মঙ্গলের জন্য, হোলরুল যুদ্ধে সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিবার জন্য, বিদেশ হইতে ভগবান লালমোহনকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করিয়াছেন এইরূপ তাহাদের বিশ্বাস ছিল। এক জমিদারেবর ভয়ে অনেকের কর্ত্তব্যশীলতার ব্যাঘাত জন্মিয়া গেল, স্বাধীন প্রবৃত্তির দ্বারবদ্ধ হইল, ভারতের ভাবী কল্যাণে এলভিনের প্রজাবর্গের কর্ত্তব্যবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বহুদূরে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। আজও ডেট্‌ফোর্ড-বাসী সেজন্য অনুতাপ করিয়া থাকে, আজ কর্ত্তব্যের অনুবর্ত্তী হইয়া ভাবী নির্ব্বাচনের সময় নির্ভীকচিত্তে লালমোহনের পক্ষাবলম্বন করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকে একজাতিবৈষম্যই যদি লালমোহনের অকৃতকার্য্য হইবার কারণ হইত তবে লালমোহন কখনই ডেট্‌ফোডবাসীর উপাস্য হইতে পারিতেন না। একবিভাগের মধ্যে তিন সহস্রের অধিক লোকে একমত হইয়া লালমোহনের পক্ষপাতী হইত না। আমরা শুনিয়াছি ভোটিং অফিসে কৃতকার্য্য হইয়া এলভিন যখন বাহির হইয়া যান, কয়েক শত মাত্র লোক তাঁহার পশ্চাতে কেবল সম্মান রক্ষার জন্যই নীরবে অনুসরণ করিতেছিল। অকৃতকার্য্য হইয়া লালমোহন যখন বহির্গত হইয়া আসেন, তখন সহস্র সহস্র লোক পশ্চাতে জয়ধ্বনি করিতে করিতে পরাজিত বীরের ন্যায় লালমোহনের অনুগমন করিয়াছিল। জাতি-বৈষম্যের ফল কখনই এরূপ সন্তোষপ্রদ হইতে পারে না, জাতিবৈষম্য বর্ত্তমান থাকিলে কখনই সমগ্র ডেট্‌ফোর্ডবাসী গৃহগমনকালে লালমোহনকে অভিনন্দন পত্র দিবার জন্য ব্যস্ত হইত না। আমাদের কোন বন্ধু লিখিয়াছেন জাতিবৈষম্যের কারণ লালমোহন একটা ভোটও হারান নাই।

আমরা লালমোহনের অকৃতকার্য্য হইবার কারণ এক একটী করিয়া সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিলাম। এখন জিজ্ঞাসা করি লালমোহন আমাদের নিকট অবিমৃষ্যকারী বলিয়া নিন্দিত হইবেন অথবা সদ্বিবেচনা ও উদ্যমশীলতার জন্য বঙ্গবাসীর পূজার পাত্র হইবেন? আমরা অনেকবার বলিয়াছি লালমোহন ভারতবাসীর স্বাধীনতার দূত, ভারতসভা ভারতের কল্যাণের শান্তিপূর্ণ মঙ্গলঘট। যদি কখনও ভবিষ্যতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা পাইয়া ভারতবাসী কৃতার্থ হইতে পারেন লালমোহন ও ভারতসভা তাহার মূলীভূত। যদি কখনও আমরা স্বীয় সত্বাধিকার লাভ করিয়া ইংরাজের সহিত সমকক্ষ হইতে পারি, এংলো ইণ্ডিয়ানের দারুণ অত্যাচার, আবর্জ্জনার ন্যায় দুই হস্তে তফাত করিয়া দিবার শক্তি পাইতে পারি, লালমোহন ও ভারতসভা সেই শক্তির সঞ্জীবনী। কখনও যদি মহারাজ্ঞীর প্রতিজ্ঞাবাক্য

পূর্ণ হয়, স্বার্থপর শত্রুবর্গের বিষদন্ত ভগ্ন হয়, কখনও যদি আপনার ধন আপনি বুঝিয়া লইতে পারি, আপনার শাসন আপনি চালাইতে পারি; অপত্য নির্ব্বিশেষে মহারাজ্ঞীর মহাসাম্রাজ্য ভারতরাজ্যের জন্য মহামতি ইংরাজ জাতীয় গৌরবের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, মনুষ্যত্বের জন্য ইংরাজের পূর্ণ বিশ্বাস লাভ করিতে পারি,—আবার বলি কখনও যদি ভারতের বহিঃশত্রু নিবারণ করিবার জন্য ইংরাজের একটী কেশ পর্য্যন্তও বিপন্ন হইতে না দিয়া প্রাপ্ত সময়ে বক্ষ দিয়া ভারতের মস্তকে ইংরাজের গৌরবধ্বজা উড্ডীন রাখিতে পারি—তবে লালমোহনই তাহার বল, ভারতসভাই তাহার উদ্দীপনা।

এহেন লালমোহন ঘরে আসিতেছেন। ভারতবাসী বিপন্ন না হইয়া আনন্দিত হউন, বাহুপ্রসারণ করিয়া দূতকে আলিঙ্গন করুন—আর কি করিবেন? লালমোহনের আর অর্থ নাই, ভারতসভার আর সম্বল নাই। দরিদ্রের কুটির হইতে এক এক মুষ্টি সহায়তা আসুন আবার আমরা লালমোহকে বিলাতে রাখিবার ব্যয় সংগ্রহ করিয়াছি। ট্যাক্সের উপর ট্যাক্স দিয়া আমাদেরও ধানের গোলা শূন্য হইয়াছে। এক সন্ধ্যায় অর্দ্ধভোজনে আমরা ত দিনে দিনে শীর্ণকায় হইয়া যাইতেছি—আসুন অনাহারে মরিব, তথাপি এক এক মুষ্টি সহায়তা করিয়া ভারতের ভবিষ্যৎ বংশাবলির মঙ্গলের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া যাইব। শুভক্ষণেই ভারতসভা শিরোন্নয়ন করিয়াছেন। শুভক্ষণেই লালমোহন জন্মগ্রহণ করিয়া স্বাধীনতার জয়ভেরী বাজাইতে শিখিয়াছেন এমন সময়ে যদি যোগ না দাও, বঙ্গবাসী! তুমি হৃদয়হীন। এমন সময়ে যদি সহায়তা না কর বঙ্গবাসী! তুমি স্বার্থপর। এমন উপযুক্ত সময়ে আবার যদি লালমোহনকে ইংরাজধামে পাঠাইয়া না দাও, তবে বঙ্গবাসী তুমি বুদ্ধিহীন। রাজা, প্রজা, কৃষি, ব্যবসায়ী, ধনীদরিদ্র, হিন্দু, মুসলমান সকলেকেই আজ আমরা অনুরোধ করিতেছি উপযুক্ত সময়ে অগ্রসর হউন। একবার সময় বহিয়া গেলে প্রাণ দিলেও আর ফিরিয়া পাইব না।

জাতীয় কন্‌গ্রেস। ৬ পৌষ ১২৯৩। ৪ সংখ্যা

পৃথিবীর এক একটী দেশে এক একটী জাতির নিবাস। প্রত্যেক জাতিরই অভীজাত্ব আছে, জাতীয় বল আছে, জাতীয় সমাজ আছে। ভারতবর্ষে অসংখ্য জাতির বাস, অসংখ্য বর্ণ, অসংখ্য ধর্ম্ম, অসংখ্য ব্যবহার সম্পন্ন, ভিন্নভাষী স্বতন্ত্র রুচি, ভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি সম্প্রদায়ে ভারতবর্ষ পরিপূর্ণ। সুতরাং এখানে বহুদিন হইতে জাতীয়তার কথা শুনা যায় নাই। মান্দ্রাজী, দ্রাবিড়ী, বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, পঞ্জাবী, মহারাষ্ট্রী কাহার ভাষা কে বুঝিতে পারে? কাহার সমাজ-বন্ধনী অন্য সম্প্রদায়ের সমতুল্য? কাহার আচার ব্যবহার অন্যের সহিত সমান? বহুদিন হইতে এই সকল জাতি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া আত্মবিচ্ছেদ পূর্ব্বক স্বাতন্ত্র্যভাবে বাস করিতেছে। এই স্বাতন্ত্র্য

অবলম্বনের জন্যই ভারতবর্ষ বার বার শত্রুহস্তে পতিত হইয়া বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। ২০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে এমন কোন কার্য্যই সম্পন্ন হইতে পারে নাই তাহাতে এই সকল স্বতন্ত্র্যাবলম্বী ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াও একত্র মিলিত হইয়াছিল। বাবু কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়া ভারতবর্ষীয় ভিন্ন ভিন্ন সমাজের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করেন। বাবু কেশবচন্দ্রের চেষ্টায় বোম্বাই, মান্দ্রাজ ও উত্তর পশ্চিমবাসী শিক্ষিত সম্প্রদায় ধর্ম্মের সাধারণ উপায় দ্বারা জাতীয়তার বীজমন্ত্র অজ্ঞাতসারে এই সকল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কর্ণে প্রদান করিয়া আইসেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ আমাদের এই একটী বিশেষ উপকার করিয়াছেন যে, আমরা আর ভারতের অপেক্ষাকৃত বলবান জাতি্‌র চক্ষে ভীরু বলিয়া ঘৃণিত হই না। এক ব্রাহ্মসমাজের অনুগ্রহেই বোম্বাই, মান্দ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, দক্ষিণবিভাগ এমন কি সিলোনবাসী পর্য্যন্তও বাঙ্গালীর সহিত আনুগত্য করিতেছেন। ইংরাজি ভাষায় লিখিত দেশীয় সম্বাদপত্রও জাতীয়তা স্থাপনের সহায় হইয়াছেন। কাশীর আর্য্যসমাজ এই জাতীয়তা সাধনের তৃতীয় কারণ। আর্য্যসমাজ পবিত্র সনাতন ধর্ম্মপ্রচার করিয়া বঙ্গ, বিহার এবং উত্তর পশ্চিমের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া যেন দুই দিক হইতে দুইটী সম্প্রদাযকে একত্র আনিয়া উভয়ের চরণে জাতীয়তার শৃঙ্খল পবাইয়া আবদ্ধ করিতেছেন। দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে মুঙ্গেরে যখন সনাতনধর্ম্ম রক্ষিণী সভা নামে এই প্রকাণ্ড আর্য্য সমাজের প্রথম জন্ম হয়, তখন আমরা একখানি বিজ্ঞাপন দেখিযাছি। বিজ্ঞাপনখানির এক পৃষ্ঠে বঙ্গভাষায এবং অপর পৃষ্ঠে হিন্দী ভাষায় বিবৃত ছিল যে, বঙ্গ বিহার ও উত্তর-পশ্চিম এক আর্য্যধর্ম্মের পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ করিযা এই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে একতা স্থাপন, পরম্পব আনুগত্য বৃদ্ধি এবং এক জাতীয়তা সম্পাদন কবাই ঐ সভাব উদ্দেশ্য। সভার সাধু উদ্দেশ্য। সভার সাধু উদ্দেশ্য সফলও হইয়াছে। ভগবান ক্ষুদ্র সভাকে প্রকাণ্ড সমাজে পরিণত করিয়াছেন। আয্য সমাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশে ও সমগ্র আয্যাবর্ত্তে কল্যাণের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে।

জাতীয় সংগঠনের আর একটী কারণ ইংরাজি শিক্ষা। ইংরাজি ভাষার সাহায্য ভিন্ন, ভিন্নভাষী সম্প্রদায়সমূহ পরস্পরের মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারিতেছেন। যে, সে ভাষা না জানে তাহার সে ভাষা শুনিলে বিরক্তি জন্মে। কাজেই তদ্ভাষী সম্প্রদায় বা জাতির সহিত তাঁহার সহানুভূতি থাকিতে পারে না। বাঙ্গালী এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের সেই জন্যই বহুদিন হইতে আনুগত্য হইতে পারে নাই। এক ইংরাজি ভাষায় এই আনুগত্য সম্পাদন করিয়াছে।

আর একটী প্রধান কারণে ভারতবর্ষের সমগ্র অধিবাসী তিল তিল করিয়া সাম্যভূমির সমতল ক্ষেত্রে উপনীত হইতেছেন। সেটী সকল সম্প্রদায়ের একই প্রকার অভাব। ইংরাজ গবর্ণমেন্টের বর্ত্তমান শাসনে বাঙ্গালী যাহা চায়, মান্দ্রাজীরও তাহাই প্রার্থনা। বোম্বাই যাহা চায়, বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানীর তাহাই ভিক্ষা। কার্য্যেই এই কয়টী প্রধান সম্প্রদায়

পরস্পর বাহু বেষ্টন করিয়া একত্র হইতেছেন। রাজকার্য্যে ভারতবাসীর নিয়োগ, সিবিল সার্ভিস, দেশীয় রাজার প্রতি ইংরাজের কর্ত্তব্য, ব্রহ্মবিজয়, আফগান বিভ্রাট, ইন্‌কম্ ট্যাক্স, ব্যয় সংক্ষেপ, এই সকল গুরুতর প্রশ্নে সকল সম্প্রদায়ের সমান সম্বন্ধ,সকলেই এই সকল বিষয়ে একমত হইয়া থাকেন। ভারত গবর্ণমেণ্টের সুশাসন এবং ইংরাজ জাতির গৌরববৃদ্ধির দিকে সকলেরই সমান দৃষ্টি, শিক্ষা ও স্বাধীনতা পাইয়া স্বাধীনতার আকর ইংরাজের রাজ্যে ক্রীতদাসের ন্যায় বিজেতৃবর্গের তরবারির নিম্নে বসিয়া থাকিতে কাহারও প্রবৃত্তি নাই। তাই জাতীয়তার প্রয়োজন, তাই জাতীয় সম্মিলনের প্রয়োজন, তাই একবার ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে সমস্বরে আত্মনিবেদন করিবার জন্য সমগ্র ভারতবাসীর সম্মিলনের প্রয়োজন হইয়াছে।

তাই ঘোষণা হইয়াছে আগামী জানুয়ারী মাসে কলিকাতা নগরীতে একটি মহা-সম্মিলনী সমাহূত হইবে। ভাবতবর্ষের প্রত্যেক উপদেশ, প্রত্যেক বিভাগ এবং প্রত্যেক নগরী হইতে প্রজাবর্গের প্রতিনিধিগণ সমবেত হইবেন। দুই মাস পুর্ব্ব হইতে ভারতবর্ষের প্রত্যেক স্থানে তাহার আযোজন পডিয়া গিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট দেশীয় সম্বাদপত্রকে দেশের প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করেন না। লর্ড ডফরিণ বলেন আমরা সাধারণের অভিমত ব্যক্ত করিতে পারি না। এই মহাসম্মিলনীর জন্য প্রত্যেক সম্প্রদায় হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট এই সম্মিলনীর মতামত জানিয়া বুঝিতে পাবিবেন দেশীয় সম্বাদপত্র দেশীয় লোকেব অভিমত ব্যক্ত করে কিনা। বোম্বাই নগরে প্রথমে এই জাতীয় সম্মিলনী আহূত হয়। বডলাট এই বোম্বাই সম্মিলনীকে প্রতিনিধি-সম্মিলনী বলিয়া অস্বীকার করিতে পারেন নাই। ঠিক বোম্বাইয়ের ন্যায় কলিকাতা নগরীতে মহা-সম্মিলনী সমাহূত হইতেছে। বোম্বাই সম্মিলীর সংগঠন দেখিয়া ভারতবাসীর প্রধান শত্রুপক্ষও ইহাকে প্রকৃত প্রতিনিধি সম্মিলনী বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই? যাঁহারা নিতান্ত শত্রুপক্ষ তাঁহারা সম্মিলনীর আর কোন অপরাধ না দেখিয়া বলিয়াছেন, উহাতে মুসলমান সম্প্রদায়ের উপযুক্ত প্রতিনিধিগণ উপস্থিত হন নাই। আমরা জানি এই সম্মিলনীতে মুসলমানের প্রত্যেক সম্প্রদায় হইতে এক একজন প্রতিনিধি সমাগত হইয়াছিলেন। একজন মুসলমান এই সম্মিলনীর একজন প্রধান উদ্যোগী হইয়াছিলেন।

গবর্ণমেণ্ট হিন্দু মুসলমানের বিবাদ বৃদ্ধি করিবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিতেছেন। তোষামোদকারী এংলো ইণ্ডিয়ানগণ এই বিবাদের উপর বাতাস দিতেছেন। মুসলমান সম্প্রদায় ইহাতে ভুলিয়া না যান, ইহাই আমাদের প্রার্থনীয়। ভারতবর্ষের হিন্দু এক হস্ত, মুসলমান আর এক হস্ত। দুই হস্তে কার্য্য না করিলে ভারতবর্ষের মঙ্গল সাধিত হইবে না। মুসলমান সম্প্রদায় সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতা পরিত্যাগ করিয়া হিন্দু ভ্রাতার সহিত মিলিত হউন। উভয়েরই মঙ্গলের জন্য উভয়েরই এই জাতীয় সম্মিলনীর সাম্যভূমিতে সমবেত হওয়া কর্ত্তব্য। পরস্পরে ঘৃণা বিদ্বেষ ভুলিয়া গিয়া হিন্দু মুসলমান

বন্ধুভাবে জাতীয় সভায় উপনীত হউন। ধর্ম্মের বিভিন্নতায় জাতীয়তা নষ্ট হয় না॥ ভারতবর্ষের হিন্দু মুসলমান হইয়াও এক জাতি, এক রক্ত এবং এক প্রকৃতি। উভয়েরই অভাব একই প্রকার। যদি অভাব নিবারণ ভারতবাসীর উদ্দেশ্য হয়, তবে হিন্দু হউন, মুসলমান হউন, শিখ হউন, পার্সি হউন, খ্রীষ্টান হউন, সকল ধর্ম্মাক্রান্ত লোকে এই জাতীয় সম্মিলনীতে সম্মত হউন। যে দিন এই শুভদিন আসিবে, সেই দিন হইতেই ভারতবাসীর ভাগ্যে সুখের সূর্য্য উদিত হইবে।

জাতীয় কন্‌গ্রেস। ২০ পৌষ ১২৯৩। ৬ সংখ্যা

গত সপ্তাহে কলিকাতায় যে ঘটনা ঘটিয়াছে বংশপরম্পরায় ইতিহাস তাহার সাক্ষ প্রদান করিবে। হস্তিনায় রাজসূয়, অযোধ্যায় অশ্বমেধ, বিক্রমাদিত্যের বিক্রম সভা, আকবরের দিগবিজয় সমিতি, কোনকালে কখনও যাহা ভারতের অদৃষ্টে ঘটে নাই, কখনও যাহা ইতিহাসের পত্রে লিপিবদ্ধ হয় নাই, চিত্রকরের চিত্রে অঙ্কিত হয় নাই, কবির কল্পনায় উদিত হয় নাই, গত সপ্তাহের প্রথম তিন দিবসে তাহা সমগ্র ভারতবাসীর প্রত্যক্ষ-গোচর হইয়াছে। বোম্বাইয়ের কনগ্রেস সভায় এই আশ্চর্য্য ঘটনার আভাসমাত্র পাওয়া গিয়াছিল। জাতীয় সভার সৃষ্টি দিবসে বোম্বাই নগরে সহস্র সহস্র লোকের সমাগম হইয়াছিল বটে; কিন্তু জাতীয় সভার দ্বিতীয় বৎসরে কলিকাতার মহানগরীতে যে অপূর্ব্ব দৃশ্য ভারতবাসীর দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, বোম্বাই সভা স্বপ্নেও তাহা কল্পনা করিতে পারেন নাই। ভারতবাসী যাহা স্বপ্ন বলিয়া ভাবিয়া ছিলেন, গত ২৬ শে ডিসেম্বরের রাত্রি প্রভাত হইলে চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন সে স্বপ্ন নহে প্রকৃত ঘটনা। কলিকাতার রাজপথ ভারতবর্ষের সমগ্র জাতিতে পরিপূর্ণ, ঘোর কলরবে দিগদিগন্তর প্রকম্পিত; লক্ষ লক্ষ ধনী মানী দীন দরিদ্র, রাজা প্রজায় রাজপথ অবরুদ্ধ করিয়া চলিয়াছেন, শকটে শকটে কলিকাতার বক্ষ প্রতিধ্বনিত হইতেছে, আশায় উৎসাহে উৎফুল্ল নেত্রে উর্দ্ধমুখে, প্রাণের আবেগে ভারতবাসী লক্ষ লক্ষ প্রজা কোন্ ঐশীবলে বলীয়ান হইয়া এক যোগে, এক পন্থার পথিক হইয়া যেন কোন অপূর্ব্ব জগতে গমন করিতেছেন। পশ্চাতে কেহ ফিরিয়া দেখেন না, সম্মুখে কেহ কার্য্যান্তরে মনোনিবেশ করেন না—এক লক্ষ্য এক উদ্দেশ্য অবলম্বন করিয়া হিন্দু মুসলমান শীখ খৃষ্টান মাদ্রাজী মহারাষ্ট্রী পার্সী পাঞ্জাবী সকল জাতির প্রতিনিধিগণ বাঙ্গালীর সহিত মিলিত হইয়া জাতীয়সভায় গমন করিতেছেন। ২৭ ডিসেম্বর সোমবার আমরা জাতীয়সভায় যে চিত্র প্রদর্শন করিযাছি তাহা ইহজন্মে ভুলিতে পারিব না। সভা ভবনে ভিন্ন ভাষী, ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী সহস্র লোকের উৎফুল্লনয়ন নিরীক্ষণ করিয়া কাহার হৃদয়ের আনন্দের উৎস উৎসাহিত না হয়। আমরা দেখিলাম বঙ্গদেশ ও

ভারতবর্ষের মধ্যে বৃহত্তম গৃহের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত অনবরতই লোকের প্রবাহ। বৃদ্ধের পক্ককেশ যুবকের সুন্দর চিকুর কেশদাম, প্রৌঢ়ের গম্ভীর বদন, সকলই একত্র সমাগত, সকলের গাম্ভীর্য্য বুঝিয়া যুবকেরও প্রৌঢ়তা জন্মিয়াছে, বৃদ্ধের শুষ্ক দেহ জরাজীর্ণরত বিষম অঙ্গ যেন কোন মৃত সঞ্জীবনীর প্রত্যক্ষ বলে বলীয়ান হইয়াছে। এখানে ভারতবর্ষের শিক্ষিতমণ্ডলী ও ধনী দেশহিতৈষীমণ্ডলী এক ক্ষেত্রে একই আসনে উপবেশ করিয়া জাতীয় অভাবের জাতীয় বক্তব্যের আলোচনা করিতে সমাগত হইয়াছেন বাঙ্গালী আর মহারাষ্ট্রীয় ঘৃণ্য নহেন, মুসলমান আর হিন্দুর অস্পৃশ্য নহেন পার্সীরা আর ভারতবাসীর বিদ্বেষী নহেন, হিন্দু মুসলমানের জাতি বৈরতা এইখানেই যেন অবসান হইয়াছে, ভারতবর্ষের ছত্রিশ কোটী জাতির ছত্রিশ কোটী বিভাগ এই খানেই যেন সাধারণেই একত্রে পরিণত হইয়াছে এক জাতীয় হিন্দু ভীরু হইয়া অন্তরালে রহিলেন এক সম্প্রদায়ভুক্ত মুষ্টিমেয় মুসলমানমণ্ডলী অন্যায় আপত্তি উত্থাপন করিয়া যবনিকার পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন—কিন্তু এই ছত্রিশ কোটী জাতীয় সম্মিলনীর অলৌকিকতা সন্দর্শন করিয়া সকলকেই লজ্জিত হইয়া অনুতাপ করিতে হইল।

ঢক্কা বাজিল সভাকার্য্যের আরম্ভ হইল, সর্ব্ববাদীর সম্মতিক্রমে পার্সী জাতির শিরোমণি মিঃ দাদাভাই নাওরাজী জাতীয়সমিতির সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। দাদাভাইয়ের মার্জ্জিত রুচি গভীর গবেষণা অপার রাজভক্তি কাহার অবিদিত আছে? এই মহাত্মা জাতীয় সভার উচ্চতম আসন গ্রহণ করিয়া প্রথমেই রাজভক্তির চুড়ান্তভাব প্রকাশ করিলেন। মহারাজ্ঞীর অর্দ্ধশতাব্দী কালের উৎসব ক্রিয়া সমাধান করিবার জন্য প্রথমেই তিনি জাতীয় সমিতির সম্মতি গ্রহণ করিলেন। দাদাভাইয়ের রাজভক্তির একাংশ লর্ড ডফরিণ এবং প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণও লাভ করিলেন দাদাভাইয়ের পর ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল আমাদের লক্ষ্যপথে উপস্থিত হন। সুক্ষ্মদর্শী বিদ্যাবিশারদ রাজেন্দ্রলালকে দেখিয়া কাহার না মনে আশার উদ্রেক হয়? এই সর্ব্বদর্শী মহাত্মা কলিকাতার ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান প্রৌঢ সমিতির প্রতিনিধি হইয়া জাতীয় সমিতিতে সাধারণের অভাব অবগত করিলেন। রাজেন্দ্রলালের পর জরাগ্রস্ত স্থবির ভূস্বামী অন্ধ জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় আমাদের দৃষ্টিপথে উদয় হন। জয়কৃষ্ণের শেষদশায় স্বদেশের প্রতি এতদূর উপচিকীর্ষা অতীব বিস্ময়কর ব্যাপার। তাঁহার জলন্ত উৎসাহবাক্য যুবকেরও প্রাণমোহিনী উৎসাহদায়িনী। বৃদ্ধ জয়কৃষ্ণের পর নবাব রেজা আলি খাঁ বাহাদুর উৎসুকভাবে দণ্ডায়মান হইয়া উত্তর পশ্চিমের মুসলমান সম্প্রদায়ের অভিমত জ্ঞাপন করেন, আমীর আলি খাঁর অনুবর্ত্তক হইয়া যে সকল মুসলমান জাতীয় কনগ্রেসে যোগদান করেন নাই নবাব রেজা আলি তাঁহাদের নিন্দা করিয়া বলিলেন ভারতবর্ষের মুসলমান সম্প্রদায় মধ্যে কেবল এই কয়েকজন লোক ভিন্ন কনগ্রেস সভায় কাহারও বিরূপ দৃষ্টি দেন নাই। বোম্বাইয়ের ভূত সেরিফ রহিমত উল্লা মেহমেদ সেয়ালী তাঁহার মতের সমর্থন করিয়া বোম্বাইবাসী মুসলমান সম্প্রদায়ের

সহানুভূতি প্রকাশ করেন। মুসলমান প্রতিনিধিগণ সভার দেহের অস্থিমজ্জা স্বরূপ হইয়া সভাকার্য্যের সহায় আছেন। কে বলিবে জাতীয় কনগ্রেস কেবল হিন্দুসমিতি মাত্র! মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর সভার একজন প্রধান সদস্য স্বরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন।

কনগ্রেসের সকল সকল সভ্যই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিলেন যে, ভারতবাসী ইংরাজকে রাজ্য দিয়া সুখী হইয়াছেন। ইংরাজ তাঁহাদের চিরদিনের রাজা হইয়া তাঁহাদিগকে উন্নতির পথে চালনা করেন ইহাই ভারতবাসীর অভিপ্রেত। ইংরাজ ভারতবাসীর যে উপকার করিয়াছেন কেহ তাহা বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। ভারতবাসী সম্পূর্ণ রাজভক্ত, মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁহাদের আরাধ্য দেবতা, ভারতেশ্বরীর রাজত্ব রক্ষা করিবার জন্য তাঁহারা প্রাণ দিতেও পরাঙ্মুখ নহেন। মহারাজ্ঞী উদারভাবে ১৮৫৮ সালে যে স্বত্বাধিকার প্রদান করিয়াছেন, তাহাতেও আমরা বুঝিয়াছি ইংরাজ শাসনকার্য্যের জন্য বিলক্ষণ উপযুক্ত। মহারাজ্ঞীর প্রতিজ্ঞাবাক্য মহাসভায় দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। ভারতবাসী দরিদ্র। এই দরিদ্র জাতির দারিদ্র্যের কারণ গবর্ণমেণ্ট বুঝিতে পারিতেছেন, তথাপি তাহার নিবারণ হইতেছে না। জীত বিজেতার সমান অধিকার প্রদান করিতেও গবর্ণমেণ্ট এখন যে কুণ্ঠিত নহে ইহা সামান্য আনন্দের বিষয় নহে। সভাপতি এই কতকগুলি মন্তব্য প্রকাশ করিয়া প্রথম দিবসের মত কার্য্য সমাধা করেন। সভার কার্য্য এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিবসের বিবরণী আমরা আগামী বারে পাঠকগণকে অবগত করিব।

সম্পাদকীয়। ২৭ পৌষ ১২৯৩। ৭ সংখ্যা

রাজনৈতিক জীবনে নিত্য নিত্য নূতন মতের সৃষ্টি হইতেছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন মতেই শাসনকর্ত্তাকে অভ্রান্ত বলিতে পারেন নাই। বঙ্গদেশের ব্যারিষ্টার আমীর আলি পাঠকবর্গের নিকট অপরিচিত নহেন ইনি সম্প্রতি এক নূতন মতের আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ইংরাজ শাসনকর্ত্তাকে অভ্রান্ত বলিয়া প্রকাশ করা। আমীর আলি সাহেব কতকগুলি শিষ্য সেবক সংগ্রহ করিয়া একটা সভা করিয়াছেন। উক্ত সভার সভ্যদিগের স্বাধীনমত যাহাই হউক তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের ক্রিয়াকলাপ বেদ কোরাণের সমান অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য। সম্প্রতি টাউন হল সভায় জাতীয় সমিতির যে অধিবেশন হইয়া গেল আমীর আলি সাহেব মুসলমানের বিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া তাহাতে যোগদিতে অস্বীকার করিয়াছেন। ব্যারিষ্টার সাহেব কলিকাতায় মুসলমান সমিতির প্রতিনিধিস্বরূপে কনগ্রেস সভায় পত্র লিখেন যে তিনটি কারণে তাঁহার সম্প্রদায় কনগ্রেস সভায় যোগ দিতে পারেন না। প্রথম, সিভিল সার্ভিস প্রশ্ন জাতীয়সভার একটি আলোচ্য বিষয়। এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য গবর্ণমেণ্ট পাবলিক সার্ভিস কমিশন বসাইয়াছেন। সুতরাং ইহার আলোচনার আর আবশ্যক নাই। ২য়, ভারত শাসন

সম্বন্ধে আন্দোলনকরা সভার অন্যতর আলোচ্য বিষয়, ইংলণ্ডে অনুসন্ধান সমিতি স্থাপিত হইয়া এই উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ করিবার কল্পনা হইতেছে। সুতরাং ইহার আন্দোলন করার আর আমাদের প্রয়োজন নাই। ৩য়, গবর্ণমেণ্টের প্রতি অবিশ্বাস করা কর্ত্তব্যপালনের ব্যাঘাত জন্মিবে। পত্রখানির নিম্নে আবদুল সালেমের স্বাক্ষর আছে। আবদুল সালেমের এই পত্র প্রকাশিত হইবার পর ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় লিখিয়াছেন যে স্বাক্ষর তাঁহার নিজের নহে। তিনি এরূপ পত্র লিখিবার বিষয় জ্ঞাত নহেন। আবদুল সালেম স্বাধীনচেতা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, আমীর আলির সহিত তাঁহার কোন বাধ্যবাধকতা নাই। তিনি স্বচ্ছন্দে নিজের স্বাধীনমত প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু যাঁহাদের সহিত ব্যারিষ্টার সাহেবের কোনও প্রকার সম্বন্ধ আছে তাঁহাদের পক্ষে স্বাধীনমত প্রকাশ করা সহজ কথা নহে। মুসলমান সমিতির সভ্যগণকে নিজের ইচ্ছায় আমীর আলির মতের সমর্থন করিয়াছেন, আমাদের তাহা বোধ হয় না, যাহাই হউক পত্রখানি যখন মুসলমান প্রতিনিধি সভার নামে প্রেরিত, তখন কলিকাতার মুসলমান সমিতি আমাদের বিচারস্থানীয়। কলিকাতার মুসলমান সমিতির সভ্যগণকে একটী সম্প্রদায় বলা যাইতে পারে না। কেন না অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই ইহার সভ্য। ইহারা প্রকাশ্যভাবে কনগ্রেস সভার বিরোধী হইয়া কেবল যে হিন্দু জাতির বিরাগভাজন হইয়াছেন তাহা নহে, ভারতবর্ষের সমগ্র মুসলমান জাতি তাঁহাদের এই ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। অসন্তোষের কারণ এই যে, আমীর আলির শিষ্যবর্গ কিছু অধিক রাজভক্ত বলিয়া ভারতবাসী সাধারণ হইতে আপনাদিগকে বিশিষ্ট করিতেছেন, যেন মুসলমান সমিতির সভ্যগণ ভিন্ন ভারতবাসী মাত্রই রাজদ্রোহী, রাজার প্রতিবাদী। আমাদের ন্যায় রাজভক্ত জাতিকে রাজদ্রোহী বলিতে অনেকের অভ্যাস জন্মিয়াছে। আমীর আলি ও তাঁহার শিষ্যবর্গকে সেই নিন্দুক সম্প্রদায়েব অন্তর্ভুক্ত করিতে আমাদের বিশেষ কোন আপত্তি নাই। কিন্তু ইহারা যে রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া অপ্রকাশ্যে রাজার শত্রুতাসাধন করিতেছেন তাহার বিষয় চিন্তা করিলে বড়ই দুঃখিত হইতে হয়। মনুষ্য কখনই অভ্রান্ত হইতে পারে না। লর্ড ডফরিণ যাহা করিতেছেন, ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট যাহা করিতেছেন, তাহা অভ্রান্ত বলা আর ইংরাজকে ঈশ্বরত্ব দেওয়া সমান কথা। আমীর আলি সাহেব ইংরাজকে ঈশ্বরত্ব দিয়া রাজা এবং রাজ্য উভয়েরই শত্রুতা সাধন করিতেছেন। আমরা জানি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অনেক দোষ আছে। তাহা যদি সংশোধন না হয়, ইংরাজ ও ভারতবাসী উভয়েরই সর্ব্বনাশ। গবর্ণমেণ্টকে সে দোষগুলি দেখাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্ট নিজে যদি সংশোধনে মনোনিবেশ করেন, প্রজার তাহাতে সহায়তা করা কর্ত্তব্য। কংগ্রেস সভা প্রজার প্রতিনিধিস্বরূপে রাজার শাসনকার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন, যে সকল দোষ গবর্ণমেণ্টের দোষ বলিয়া অনুভূত হয় নাই, তাহা স্পষ্টাক্ষরে দেখাইয়া দিয়াছেন। অথচ সেই মহাসভার ভিতরে অসন্তোষের একটি বিশ্বাসও পতিত হয় নাই, রাজদ্রোহিতার

কথা একটীবারও উচ্চারিত হয় নাই, প্রত্যুত: সমগ্র ভারতবাসীর রাজভক্তির সম্পূর্ণ নিদর্শন জাতীয় প্রতিনিধি সভার সভ্যমণ্ডলীর প্রত্যেক কথায় প্রত্যেক ব্যবহারে সম্যক প্রদর্শিত হইয়াছে।

আমরা আমীর আলি সাহেবকে "এক ঘরে" করিয়া রাখিতে চাই না। তাঁহার ও তাঁহার শিষ্যবর্গের বিরুদ্ধভাবে জাতীয় সভার প্রতিনিধিত্বে কোন প্রকার ক্ষতি জন্মে নাই। যেরূপ দেখা গিয়াছে আমীর আলি ও মুসলমান সমিতি কোন মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হইতে পারেন না। আমীর আলি সাহেব বরং আবতুল সালেমের আত্মপ্রকাশে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। সেজন্য আমরা বড়ই দুঃখিত আছি। আমরা আমীর আলিকে এখনও কোন জাতীয় সভার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইতে দেখিলে সুখী হইব।

জাতীয় কন্‌গ্রেস। ২৭ পৌষ ১২৯৩। ৭ সংখ্যা

পাঠক! ভারতবর্ষের মানচিত্রখানি একবার চক্ষের সম্মুখে ধারণ করুন। কোথায় কোন্ দেশ, কোথায় কোন্ জাতি, কোথায় কোন্ সম্প্রদায় স্বতন্ত্রভাবে, বিচ্ছিন্নভাবে, পরস্পরেব অপরিজ্ঞাত সম্পর্কশূন্য বৈদেশিকভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, একবার তাহা মানবের অবলোকন করুন। কাহারও সহিত কাহারও বিবাহ বন্ধন নাই, কাহারও সহিত কাহারও ব্যবহারের সামঞ্জস্য নাই, কাহার সহিত কাহারও ধর্ম্মমতের ঐক্য নাই, কাহারও সহিত কাহারও ভাষার সন্ধি নাই। বেশভুষায় কেহ কাহারও সমান নহে, লোকাচারে কেহ কাহারও অনুরূপ নহে। ভাষার ঐক্য নাই, রুচির ঐক্য নাই, সমাজের ঐক্য নাই অথচ এই সকল ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোক কলিকাতার জাতীয় সভার একাসনে সমাসীন। মানচিত্র হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া মাত্র একবার কলিকাতার টাউন হল গৃহে অবলোকন করুন, এই একটী মাত্র গৃহের মধ্যে ভা তবর্ষের মানচিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে। কার লোক কোথায় আসিয়া একত্রে একজাতিত্বে পরিণত হইতে চায়। ব্যাপার কি অসম্ভব? ভারতবর্ষে বাঙ্গালী মহারাষ্ট্রী শিখ, মাদ্রাজা হিন্দু মুসলমান যত সম্প্রদায় বর্ত্তমান আছে, তাঁহাদের পুর্ব্বপুরুষ একই বংশীয়। অনাবৃত মস্তক বাঙ্গালী, শিরস্ত্রাণধারী বর্গী, বেদোপাসক হিন্দু, কোরাণের পন্থী ইসলাম, ইঁহারা একই পিতামাতার পুত্র, জননীর একই গর্ভে জীবনপ্রাপ্ত, একই স্তন্যে প্রতিপালিত। জনকের জননীর মৃত্যুর পরে ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিচ্ছেদ হইয়াছে, বিবাদ হইয়াছে বিভিন্ন হইয়াছে, মুখদর্শন রহিত হইয়াছে, একজন, অন্যজনের সহিত চিহ্নিত করিয়া স্বত্বাধিকার বিভাগ লইয়াছে। জনক জননীর মৃত্যুর পর একজন তৃতীয় ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাদের লালন পালনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, জনক জননী সন্তানদিগের অভাব বুঝিতেন, প্রয়োজন বুঝিতেন, নূতন অভিভাবক সহজে তাহা বুঝিতে পারেন না। শাসন পালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য

সকল ভ্রাতারই সমান নিয়মের প্রয়োজন। একই বিধিব্যবস্থার প্রয়োজন বলিয়া সকলকে একত্র হইতে হইয়াছে। জাতীয়তা কোথায় যায়? সকলের যখন একই প্রকার অনুগ্রহ নিগ্রহের ফল ভোগ করিতে হইয়াছে, তখন সকল ভ্রাতায় একাধারে সমবেত না হইলে আর উপায় কি? এই যে সাধারণের একই প্রকার অভাব নিবারণের চেষ্টা ইহারই নাম জাতীয়তা। সম্প্রদায় সকলের একীকরণের জাতি সংগঠন হয় না। এরূপ একীকরণ, অসম্ভব কাণ্ড, কিন্তু ব্যক্তিগত একীকরণ অপেক্ষাকৃত সুন্দর। এই উপায়েই ভারতবর্ষের অগণ্যজাতি একত্র হইয়া সাধারণের জাতীয়তা সম্পাদনে চেষ্টা করিতেছেন। ইহাতে ধর্ম্মের ভিন্নতা, অথবা ভাষার ভিন্নতা বিবেচনা করিবার প্রয়োজন নাই, কেবল এই মাত্র দেখিলেই যথেষ্ট হইবে যে রাজনৈতিক জগতে সাধারণের একই প্রকার অভাব। ভারতবর্ষের তেত্রিশ কোটি জাতি সেই অভাব বুঝিতে পারিয়াছেন, সেইজন্যই কনগ্রেস সভার অবতারণা।

ভারতবাসী সাধারণের এক জাতিত্বের বিষয় আরও একটু বিবেচনা করিয়া দেখা যাক। রুষ ছাড়িয়া দিলে ইউরোপে যতগুলি খণ্ডরাজ্য অবশিষ্ট থাকে তাহা একত্র করিলে ভারতবর্ষের সমান হয়। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডরাজ্য ভিন্ন ভিন্ন রাজার অধীন। ইহাদের স্বতন্ত্র রাজার অধীনে বাস এবং স্বতন্ত্র ভাষা ও স্বতন্ত্র নীতিতে পরস্পর বিচ্ছিন্ন। এই সকল জাতি একদিন ভিয়েনায় জাতীয় কনগ্রেসে একত্র হইয়া যদি এক জাতিত্বে পরিণত হইতে চান, তবে এক রাজার অধীন থাকিয়া ভারতবাসী তাহাতে কৃতকার্য্য না হইবেন কেন? আমবা বুঝিয়াছি যে অভাবে ভিযেনায় জাতীয় কনগ্রেস আহূত হয়, আমাব অভাব তাহা অপেক্ষা গুরুতর। ভিয়নার কনগ্রেস অপেক্ষা কলিকাতার কনগ্রেসের মূল্য ও প্রয়োজন অধিক। ভিয়েনায় স্বাধীন প্রদেশের স্বাধীনচেতা সমগ্র ব্যক্তিবর্গ ইউরোপের মঙ্গলের জন্য সমবেত হইয়াছিলেন, কলিকাতায় ভিন্নভাষী ভিন্ন রুচি সম্প্রদায় সমূহ একই রাজার অধীন হইয়া সমগ্র ভাবতবাসীর মঙ্গলের জন্য সমাহৃত হইয়াছিলেন। কতকগুলি পরাক্রান্ত স্বাধীন জাতি একত্র হইয়া রাজনৈতিক অভিপ্রায়ের সামঞ্জস্য করিয়া লইবেন ইহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এঙ্গলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় বলিতে পারেন হিন্দু মুসলমানের সম্মিলন অসম্ভব, কেন না এই উভয় জাতির ভিতরে বিবাদ বাধাইয়া তাঁহাদের নিজের স্বার্থসিদ্ধি হইতে পারে। তোষামোদ প্রিয় "আপকি ওয়াস্তি" সম্প্রদায় কনগ্রেসের উপরে বিমুখ হইয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট আপাতঃ মধুর পরিণাম সরল চাটুকারোক্তি প্রয়োগ করিতে পারেন, কিন্তু জাতীয়সভার জাতীয়তার যে অমরবীজ নিহিত হইল, তাহার বিনাশসাধন করিবার শক্তি তাঁহাদের নাই। ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিবাদের পর আবার যখন উভয়েই বুঝিতে পারেন যে কতকগুলি বিবাদান্বেষী কুটিল স্বভাব লোকেই তাঁহাদের সর্ব্বনাশ করিতেছে। তখন তাঁহাবা যে গাঢ় সম্মিলনে মিলিত হন কোন শত্রু শত্রুতা করিয়া সে বন্ধন ছিন্ন করিতে পারেন না। হিন্দু মুসলমান জাতীয় সভার সেই সম্মিলনে

মিলিত হইয়াছেন, ভ্রাতায় ভ্রাতায় হাত ধরিয়া উভয়ের মঙ্গলচিন্তা করিতে বসিয়াছেন। যবন ও কাফের শব্দ কাহারও মুখে উচ্চারিত হয় না, বিদ্বেষ ও শত্রুতার ভাব কাহারও অন্তঃকরণে স্থান পায় না, সকলেরই একই অভাব, সকলেরই একই উদ্দেশ্য, সকলেরই মনে রাজভক্তির সমান আবেগ। কে বলিবে বহু দিনের বিরোধপরায়ণ এই দুই জাতির একত্র একজাতিত্বে পরিণতি হইবার বিলম্ব কত? আমাদের ভাগ্যে এই শুভ সন্দর্শন না ঘটিতে পারে। হিন্দু মুসলমান এক জাতি এক পিতা-মাতার পুত্র বলিয়া গৌরব করিবেন, সেদিন আমরা দেখিবার জন্য বাঁচিয়া থাকিতে নাও পারি, কিন্তু সে দিন যে আসিবে, সাধারণ স্বত্ব সাধারণ অধিকার রক্ষা করিবার জন্য আবার যে তাঁহারা এক মহান আর্য্যজাতির সম্মান রক্ষা কবিবেন তাহাও আমরা বিশ্বাস করিয়া মরিতে পারি।

সেদিনকার টাউন হল সভার জাতীয় সমিতির যে প্রাথমিক সম্মিলন হয়, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল তাহাতে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া হিন্দু মুসলমানের সম্মিলন করিয়া দিয়াছেন, একের হস্ত ধরিয়া অন্যের হস্তে বন্ধন করিয়া দিয়াছেন, একের প্রাণ লইয়া অপরের প্রাণে ঢালিয়া দিয়াছেন, বাহু প্রসারণ করিয়া দুই দিক হইতে হিন্দু মুসলমান দুই ভ্রাতাকে একত্রে আলিঙ্গন করিয়া ফেলিয়াছেন। হিন্দু হিন্দু রহিলেন, মুসলমান মুসলমান রহিলেন অথচ রাজেন্দ্রলাল উভয়েই একই বংশ একই শাসন, একই অভাবের দোহাই দিয়া উভয়েই চরণে জাতীয়তার শৃঙ্খল পরাইয়া দিলেন, মহানহৃদয় রাজেন্দ্রলালের সেদিনকার কাণ্ড দেখিল কে? সমগ্র ভারতের অধিবাসী করতালির উপর করতালি দিয়া এই সম্মিলনের সহানুভূতিসূচক আনন্দধ্বনি প্রতিগণিত করিল কে? সমগ্র ভারতের অধিবাসী সাক্ষী রহিল কে? ব্রিটীস গবর্ণমেণ্ট ও ব্রিটীস জাতি। ভারতের অদৃষ্টে সেইদিন এক সুখের দিন প্রভাত হইয়াছে। ভারতবাসীর প্রাণে সেই দিন এক নূতন শক্তির আবির্ভাব হইয়াছে। জাতীয় কন্‌গ্রেসের প্রাথমিক সভার জাতীয়জীবন আরম্ভ হইয়াছে। ঈর্ষায় যাহার বুক পুড়িয়া যায় বি-েষে যাহাব প্রাণ জ্বলিয়া যায়, এ দৃশ্য তাহার সহ্য হইবে না, তাঁহারা কয়দিনের নিমিত্ত চক্ষু বুজাইয়া থাকিতে পারেন, এ দৃশ্য দেখিলে যাহার চক্ষে জল আইসে, যাঁহার হৃদয় স্ফীত হয় তাঁহার আজ সুপ্রভাত।

সম্পাদকীয়। ১২ মাঘ ১২৯৩। ৯ সংখ্যা

পাঠক জ্ঞাত আছেন, গত কন্‌গ্রেস সভায় সহানুভূতিহীনতা দেখাইয়া কলিকাতার মুসলমান সমিতি কন্‌গ্রেসকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট আবদুল সালেমের নাম স্বাক্ষরিত ছিল। আবদুল সালেম ষ্টেটসম্যান পত্রিকার একখানি পত্র প্রকাশ করিয়াছেন যে ঐ স্বাক্ষর তাঁহার নহে। এই বিষয় লইয়া কয়েকদিন আন্দোলনের পরেই ছোটলাট তাঁহাকে একটী অস্বাস্থ্যকর কদর্য্যস্থানে বদলী করিয়া দিয়াছেন। কার্য্যটীতে

ঠিক প্রকাশ পাইতেছে যে, ছোটলাট তাঁহার কোন কোন পৃষ্ঠচরের অনুরোধপরতন্ত্র হইয়া আবদুল সালেমকে তাঁহার স্বাধীন মতিত্বের পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন। ছোটলাট নিজেই জাতীয় সমিতির বিরোধী হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। সাধারণ হিতকর জাতীয়কার্য্যে তাঁহারা জাতীয় জীবনের উন্নতি দেখিতে ভালবাসেন না, ছোটলাটও ভারতবাসীর শিরোন্নয়ন দেখিতে পারেন না। স্বজাতি এবং রাজার মন রক্ষা করিতে না পারিয়া সালেম উভয়েরই কোপনয়নে পড়িয়াছেন। ছোটলাট ও মুসলমান সভার হস্তে এই স্বাধীন মতাবলম্বী উন্নতমতা ব্যক্তির অদৃষ্টে আরও যে কি আছে তাহা বলা যায় না। ছোটলাট বিদায়কালে ভাল মরণকামড়ই কামড়াইয়া যাইতেছেন। ইঁহারই জন্য আবার শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটী এবং শ্রীরামপুর নিবাসী এক সম্প্রদায়ের লোক ব্যস্ত হইয়া একটী টমসন হল নির্ম্মাণ করিতেছেন, বাবুরা কি মুসলমান সমিতিতে যোগ দিতে পারেন না?

জাতীয় কন্‌গ্রেস ও দেশীয় সম্বাদপত্র। ১২ মাঘ ১২৯৩। ৯ সংখ্যা

ভারতসভার দশম সাম্বৎসরিক উৎসবের সময় এক সম্প্রদায়ের সম্বাদপত্রের লেখক সভার উপর নানাপ্রকার ব্যঙ্গোক্তি করিয়া অশিক্ষিত বিপনীকার এবং বর্ণমালার বর্ণপরিচিত বিজ্ঞ মান্য বালকদিগের নিকট বিলক্ষণ প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। এই সম্প্রদায় সম্বাদপত্র লেখকগণ গত কন্‌গেস সভার আন্দোলন লইয়া বড়ই লম্ফঝম্প আরম্ভ করিয়াছেন। সামান্য একটী সভা কিম্বা সম্প্রদায়ের উপর বিদ্রূপ করিলে কেহ তাহা গ্রাহ্য না করিতে পারেন, কিন্তু যেখানে জাতীয় প্রশ্নের মীমাংসা, জাতীর অভাবের আন্দোলন, জাতীয় উত্থানের বলাহরণ, সেখানে এই সকল বালকের কথা নিতান্ত অগ্রাহ্য করিলেও চলে না। তাহার কারণ ভারতবাসীর পশ্চাতে ভারতশত্রু এংলো ইণ্ডিয়ান সম্বাদপত্র। এই সকল স্বজাতিনিন্দুক বিজ্ঞ মান্য বালকের কথা শুনিলে এংলো ইণ্ডিয়ান সম্বাদপত্র নাচিয়া উঠিবেন না। যে সকল ইংরাজ বাস্তবিক ভারতবাসীর মঙ্গলপ্রার্থী তাঁহাদের মনেও সন্দেহের উদয় হইবে, গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং জাতীয় অভাব স্থির করিতে না পারিয়া পদে পদে ভ্রমে পতিত হইবেন। যাঁহারা এতগুলি অনর্থের উৎপত্তি করেন, তাঁহারা দেশের কণ্টক, জাতির শত্রু, উন্নতির কোরকে কাঁটা। যাঁহারা বাস্তবিক দেশের হিতচিকীর্ষু তাঁহাদের এখন কর্ত্তব্য এই সকল স্বজাতিদ্বেষ্টা বিজ্ঞ মান্য বালকদিগকে শিক্ষা প্রদান করা। কন্‌গ্রেস সভার কার্য্যাদি সম্বন্ধে সমালোচনা করা ইহাদের উদ্দেশ্য নহে। দোষগুণের বিচার করিয়া উপদেশ লাভ করিয়া অথবা শান্তভাবে নিজের মত জ্ঞাপন করিবার জন্য ইহারা লেখনী ধারণ করেন না—কিসে শিক্ষিত সমাজকে অপদস্থ করিবেন, কিসে অশিক্ষিতের সমাজে বাহবা লইবেন, কিসে দোকানদারদিগের হাস্য পরিহাসের কারণ হইবেন, আর কিসে উন্নতিরোধক রক্ষণশীল সপ্রদায়ের মুখপাত্র হইয়া বাল্যকালে বিজ্ঞের আসন গ্রহণ করিবেন

ইহাই তাঁহাদের অভিপ্রেত। আর একটী অভিপ্রায় অর্থ। কন্‌গ্রেস কি অশিক্ষিত সমাজ তাহা বুঝে না, কন্‌গ্রেসের জাতীয় সমিতির প্রয়োজন কি, যাহারা রতি মাসার হিসাব করিয়া দিন কাটায়, তাহার মস্তিষ্কে তাহা উদয় হয় না। এই সকল নিরক্ষর সম্প্রদায়কে যদি বুঝাইয়া দেওয়া যায়, তবে তাহারা বুঝিতে পারে কিন্তু বুঝাইয়া দিবার পূর্ব্বে বড় বড় সহরের সম্বাদপত্র যদি তাহাদের অনুরূপভাবের প্রচার করেন, তাহার উপর রঙ্গরস দিয়া পরিপক্ক করে, তবে সেই সকল সম্বাদপত্রের উপর তাহাদের বড়ই শ্রদ্ধাভক্তি জন্মিয়া যায়। সময় হরণ করিবার জন্য তাহারা উহাদের গ্রাহক হয়, লাট বাহাদুরও ইংলণ্ডের কথার আন্দোলন পাঠ করিয়া মনে করে তাহারা এক একজন দিগ্বজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নিজের উপর দিগ্বজত্ব দিয়া তাহারা তাহাদের শিক্ষক সম্বাদপত্রের লেখকদিগের উপর সর্ব্বজ্ঞত্ব আরোপ করে, সংবাদপত্রেরও পসার জমিয়া যায়। এই জাতির সম্বাদপত্র বঙ্গদেশের অশিক্ষিত সমাজের সর্ব্বনাশ করিতেছে। কন্‌গ্রেস সভা সম্বন্ধে ইহাদের সর্ব্বজ্ঞতা ও দাম্ভিকতা দেখিয়া আমরা অবাক হইয়াছি। ইহাদের কোন্‌টীর এতদূর সাহস যে তাঁহারা কেবল কন্‌গ্রেস সভা যে ভারতবাসীব মহা অনিষ্ট সাধন করিয়াছে, তাহাই ইহাদের প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা। বালক বয়সে এত বুদ্ধি দেখিয়া আমাদের ভয় হয়, পাছে ইহাদের প্রকাশিত সম্বাদপত্রাখ্য ব্যবসায় বৃত্তির অকাল মরণে আমাদিগকে ক্ষুব্ধ হইতে হয়। আমরা ইহাঁদের কোন কথা প্রতিবাদের যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করি না। ইহাঁদের নিজের কোনও মত নাই। কন্‌গ্রেস সভার দোষগুণ সমালোচনা করিবার শক্তিও তাঁহাদের জন্মায় নাই। আমাদের কোন কোনও সুবিজ্ঞ সহযোগী জাতীয় সভায় প্রস্তাবগুলির উপর যে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন বালকগণ তাহাই অবলম্বন করিয়া টিপ্পনী দ্বারা আপনাদিগের শিক্ষাভাব প্রকাশ করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রস্তাবে আমরা বালকদিগকে কয়েকটী সৎপরামর্শ দিয়াই ক্ষান্ত হইব। তাঁহাদের ধৃষ্টতা অমার্জ্জনীয় হইলেও এখনও সুশিক্ষা লাভ করিয়া রুচিমার্জ্জন করিবার জন্য সমাজ তাঁহাদিগকে সময় দিতে পারেন। কেবল আমাদের কয়েকজন সুবিজ্ঞ সহযোগী কন্‌গ্রেসের মন্তব্য সম্বন্ধে যে সকল আপত্তিব উত্থাপনা করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধেই আমাদের কতকগুলি বক্তব্য আছে।

আমাদের সুবিজ্ঞ সহযোগী হিন্দু পেট্রিয়ট লিখিয়াছেন কনগ্রেস সভার চতুর্থ প্রস্তাবটী সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। ইহাতে একটী নূতন ব্যবস্থার বিষয় বিবৃত হইয়াছে। উহার নিয়মপ্রণালী অল্পসংখ্যক লোক কর্ত্তৃক অতি অল্প সময়ের মধ্যে ব্যস্তসমস্তভাবে গঠন করা হইয়াছে। উহার ভাষাও অস্পষ্ট, এজন্য সভাস্থলে উহাতে অনেকের মতদ্বৈধ হইয়াছিল। এই সকল ব্যবস্থার উপর অনেকের তীব্র সমালোচনা বাহির হওয়া সম্ভব।

সহযোগীর এই কথায় আমাদিগকে কন্‌গ্রেস সভায় চতুর্থ প্রস্তাবের একটু সামান্য ইতিহাস লিখিতে হয়। ১৮৮৫ সালে বোম্বাই নগরে যখন এই সভার প্রথম অধিবেশন হয়, তখন এই ৪র্থ প্রস্তাবের উত্থাপনা হইয়াছিল। পাঠক গতবারে সোমপ্রকাশ পাঠ

করিয়া দেখিয়াছেন ৪র্থ প্রস্তাবটী ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধি সভ্যগণ এই প্রশ্ন লইয়া অনেক আন্দোলন করিয়াছিলেন। কিরূপ প্রণালী মতে প্রতিনিধি ব্যবস্থা চালাইতে পারা যাইবে উক্ত সভায় তাহারও একটা পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত হইয়া ১৮৮৬ সালের কন্‌গ্রেস সভায় সমালোচনার জন্য রাখা হয়। সভ্যগণ যে তর্কের উদ্ভাবন করিয়া প্রস্তাবিত নিয়মাদির সমালোচনা করেন, তাহাও সাধারণ সম্বাদপত্রে প্রকাশিত হয়। অধিকন্তু এই সকল তর্কবিতর্ক ও সমালোচনার এক একটী বিবরণ প্রত্যেক বিভাগের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের নিকটে প্রেরণ করা হইয়াছে। তাঁহারা এতৎসম্বন্ধে সাধারণ শিক্ষিত সমাজের মতামত জ্ঞাত হইয়া স্ব স্ব মন্তব্য লিখিয়া পাঠান। বোম্বাই সভার অধিবেশনের ৩/৪ মাস পরে ইংরাজিতে "বৃদ্ধের আশা" নামক পুস্তকের পরিশিষ্ট স্বরূপ উল্লিখিত পাণ্ডুলেখ্যের সাধারণ বিবরণ পুস্তককারে মুদ্রিত করিয়া ভারতবর্ষের প্রত্যেক শিক্ষিত সমাজে প্রেরণ করা হয়। ১ লক্ষ ইংরাজি প্রতিলিপি এবং ৯০ হাজার অনুবাদগ্রন্থ ভারতবর্ষের প্রত্যেক নগরে, প্রত্যেক শিক্ষিত সমাজে বিতরণ করা হয়। বিলাতেও কচডন ক্লব হইতে এই পুস্তকের বহু সংখ্যক প্রতিলিপি চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের নানাদিক্ দেশ হইতে কৃতবিদ্য ব্যক্তিবর্গ এই পাণ্ডুলেখ্যের উপর স্ব স্ব মন্তব্য প্রকাশ করিয়া রাশি রাশি পত্র লিখিয়াছিলেন। বিলাত হইতেও ভারতহিতৈষী মহাত্মাগণ পরামর্শ দিয়া কন্‌গ্রেস সভাকে সাহায্য করিয়াছে।

এক বৎসর ধরিয়া এই প্রস্তাব সম্বন্ধীয় নিয়মাদির পর্য্যালোচনা হয়, সেদিন কনগ্রেস সভায় উপস্থিত হইবার জন্য যে সকল বিদেশী সভ্য কলিকাতায় সমাগত হন তাঁহারা স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সভা করিয়া নির্দ্দিষ্ট প্রশ্নের আলোচনা করেন। ইহার পর বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বাবু আনন্দমোহন বসু ১০০ প্রতিনিধি সভ্য লইয়া একটী মন্ত্রণা সভা করেন। এই সভার প্রস্তাবিত পাণ্ডুলেখ্য লইয়া যে তর্কবিতর্ক হইবার কথা সহযোগী লিখিয়াছেন তাহাও প্রকৃত নহে। সহযোগী যে সম্বাদের উপর নির্ভর করিয়া এরূপ কথা লিখিয়াছেন তাহাও অপ্রকৃত। সভাস্থলে পাণ্ডুলেখ্য সম্বন্ধে কেবল ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল কিঞ্চিৎ আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত আর সকল সভ্যই একমত হইয়া পাণ্ডুলেখ্যে সম্মতি প্রদান করিয়াছিলেন। পরিশেষে ডাক্তার রাজেন্দ্রলালকে কয়েকটী বিষয় বুঝাইয়া দেওয়ায় তিনিও পাণ্ডুলেখ্যে সম্মতি দিয়াছেন। অনেক কৃতবিদ্য রাজনীতজ্ঞ ইংরাজ সভাকে সাহায্য করিয়াছেন। স্বয়ং বড়লাট প্রস্তাবিত পাণ্ডুলেখ্যের কোন কোনও নিয়ম নিজেই উদ্ভাবন করিয়া দিয়াছেন। এই সকল ঘটনার উপর সহযোগী যদি বলিতে চান যে, ব্যবস্থাপক সভার গঠন ব্যবস্থাগুলি অতি অল্প সময়ে অল্প সংখ্যক লোক কর্ত্তৃক আপত্তির ভিতরে ব্যস্তসমস্তভাবে সংগঠিত হইয়াছে, তবে আর আমরা সম্বাদপত্রের লেখকসমাজের কাহার বিবরণ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি।

সহযোগীর আর একটী আপত্তি এই যে ব্যবস্থাপক সভার নিয়মাদি সংগঠন

করিয়া দেওয়া নিতান্ত ভ্রমের কার্য্য হইয়াছে। কেবল আমাদের অভাব কি, সভার প্রধান কর্ত্তব্য কেবল তাহাই গবর্ণমেণ্ট গোচর করা। নিয়মাদি সংগঠন করিবার কোনও অধিকার নাই।

কনগ্রেস সভা যে সকল রাজনীতিবিদ্ ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা একবাক্যে উপদেশ দিয়াছেন জাতীয় কনগ্রেস কোন বিশেষ অভাবের উল্লেখ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন না। কি প্রণালী অবলম্বন করিলে গবর্ণমেণ্ট সেই অভাবের মোচন করিতে পারেন তৎসম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধি ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করা ভারতবাসীর অভিপ্রেত। সেই অভিপ্রায়ের অনুরূপ কার্য্য করিতে হইলে গবর্ণমেণ্টকে অনেক পরিশ্রম ও ক্লেশস্বীকার করিয়া জাতীয় মতের অনুসন্ধান করিতে হইবে। কিরূপ প্রণালী অনুসারে প্রতিনিধি ব্যবস্থা প্রচলিত করিলে ভারতবাসীর বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী হইবে, গবর্ণমেণ্টকে অগ্রে তাহার স্থির করা চাই। গবর্ণমেণ্টকে সে অনুসন্ধান কার্য্যে সহায় করা কি ভারতবাসীর কর্ত্তব্য নহে? আমরা যদি কেবল আমাদের অভাব জানাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকি এবং সেই অভাব নিবারণের জন্য কোনও প্রকার চেষ্টা না করি, গবর্ণমেণ্টের নিকট কেবল আত্মনিবেদন করিয়া কখনই আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারিব না। গবর্ণমেণ্ট যদি আমাদের স্বজাতীয় হইতেন, আমাদের কতকটা নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলেও ক্ষতি ছিল না। বৈদেশিক রাজার নিকটে কেবল প্রার্থনা করিলেই চলিবে না। কিসে গবর্ণমেণ্ট সেই প্রার্থনা গ্রাহ্য করিতে পারেন, কিসে আমাদের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার উপায় হয়, গবর্ণমেণ্টকে তাহা দেখাইয়া না দিলে আমাদের কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা কোথায়? আমাদের অবস্থানুরূপ নিয়ম-প্রণালী গঠন করিয়া দিবার শক্তিও জন্মিয়াছে—৩০ বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট যে ভারতবর্ষ শাসন করিয়াছেন এখন আর সে ভারতবর্ষ নাই। আমাদের কোন কোন সহযোগী কনগ্রেস সভাকে বালকের ক্রীড়া বলিয়া উপহাস করিতে পারেন কিন্তু আমাদের বিবেচনা হয় সেই বালকের ক্রীড়ার কার্য্যকারিকা আছে, বিজ্ঞতার পরিচয় আছে, জাতীয় জীবনের স্ফূর্ত্তি আছে। এরূপ অবস্থায় ব্যবস্থাপক সভার নিয়মপ্রণালী গঠন করিবার অধিকার আমরা যে এখনও প্রাপ্ত হই নাই, এ কথা বলিলে নিতান্ত অনভিজ্ঞতার পরিচয় পায়। বঙ্গবাসীর ন্যায় সম্বাদপত্রের এরূপ অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করা সম্ভব। হিন্দুপেট্রিয়টের ন্যায় দূরদর্শী সুবিজ্ঞ সম্বাদপত্রে এরূপ ভাবের সমাবেশ দেখিলে আমাদিগকে দুঃখিত হইতে হয়।

হিন্দুপেট্রিয়ট কনগ্রেস সভায় বিরোধী নহেন। জাতীয় সভার মহাসম্মিলনে আমাদের হৃদয়ে যে গৌরবের ভাব উদয় করিয়া দিয়াছে, হিন্দুপেট্রিয়ট তাহা বিলক্ষণ উপলব্ধি করিয়াছেন। সহযোগী সরলভাবে কনগ্রেস সভার যে সকল ক্রটী দেখাইয়া দিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, তৎসম্বন্ধে তাঁহার ভ্রম লইয়া কয়েকখানি সম্বাদপত্রের বড় বড় স্তম্ভ ছাই

দিয়া পূরণ করিবার সুবিধা পাইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে একখানি সম্বাদপত্রের লেখক জনৈক বিলাত প্রত্যাগত যুবক। ইনি স্বয়ং কনগ্রেস সভার একজন সভ্য ছিলেন কিন্তু ৪র্থ প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য যে কমিটি নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহার সভ্যপদের সম্মান না পাইয়া বোধ হয় ইহার অসন্তোষ জন্মিয়া থাকিবে। নেসন সম্পাদক সেইজন্য কয়েকটী অসার আপত্তি উত্থাপন করিয়া কতকগুলি কাণ্ডজ্ঞান রহিত মনুষ্যত্বহীন "হামবড়া" ব্যবসায়ী সম্বাদপত্রের প্রশ্রয় দিয়াছেন। নেসন যে যুক্তিমার্গ ধরিয়া দাদাভাই নাওরোজী ও ডাক্তার রাজেন্দ্রলালকে উপদেশ দিতে সাহস করিয়াছেন এই সকল অসার সম্বাদপত্র সেই যুক্তির চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিয়া ইংরাজি শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের উপর ক্রূরস্বভাবসুলভ ঈর্ষাবৃত্তি চরিতার্থ করিয়াছেন।

ইহারা বলেন দেশের চারিদিকেই যখন দারিদ্র্য, অন্নাভাবে যখন লোকের প্রাণ যায়, তখন কনগ্রেস সভার প্রতিনিধিব্যবস্থা লইয়া আমাদের কোন উপকার দর্শিতে পারে না এই "বুড়ামী" কথাটা বালকের মুখে শুনায় ভাল, যাহারা "পয়সা পয়সা" করিয়া ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়া বেড়ায়, লোকের তোষামোদ, অসভ্যের আশ্রয় গ্রহণ, পরনিন্দা ও পরকুৎসা করিয়া দিনাতিপাত করে "এঁচোড়ে পাকিয়া" কয়েক বৎসরের মধ্যে যাঁহাদের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়াছে, বঙ্গীয় সম্বাদপত্রের নামে যাহারা কলঙ্ক ঢালিয়াছে, তাহাদের মুখে এই সকল কথা শুনায় ভাল। শাসনকার্য্যে প্রতিনিধিব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিলে যে দেশের দারিদ্র্য নিবারণ হয়, বালকগণ তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। আমরা জিজ্ঞাসা করি, দেশের দারিদ্র্য নিবারণ এবং রাজ্যের সুশাসন একত্রে সম্পন্ন করিতে হইলে কনগ্রেস সভা আর কি প্রস্তাব করিতে পারেন। কনগ্রেস সভ্যগণ যদি সহস্র সহস্র মুদ্রা দান করিতেন তাহা হইলেই কি দেশের দারিদ্র্য নিবারণ হইত? কনগ্রেস সভা স্থির করিয়াছেন শাসনকার্য্যে প্রতিনিধিব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিলেও দেশের দারিদ্র্য নিবারণ করিতে পারা যায়। কেবল দারিদ্র্য নিবারণই যে প্রতিনিধিরব্যবস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য কনগ্রেস তাহা বলেন নাই। প্রতিনিধি-ব্যবস্থায় কিরূপে যে দেশের দারিদ্র্য নিবারণ হইতে পারে আমরা তাহা নেসন সম্পাদক এবং তাহার অনুবর্ত্তক বালকগণকে বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

সংসারের মধ্যে যে ব্যক্তি উপার্জ্জন করেন তাঁহার হস্তে যদি ব্যয়ভার পড়ে, তবে তিনি পরিমিতরূপে ব্যয় করিয়া অঋণী ও ধনী হইতে পারেন। উপার্জ্জনের ভার যদি একজনের হস্তে এবং ব্যয়ের ভার অন্যের হস্তে থাকে, তবে প্রায়ই অর্জ্জনক্ষম গৃহস্বামীকে দরিদ্র ও ঋণগ্রস্ত হইতে হয়। যাঁহারা ইংরাজ রাজ্যে করদাতা প্রজা তাঁহাদের হস্তে যদি রাজ্যশাসনের ব্যয়ভার পড়ে গবর্ণমেণ্টকে আর ঋণগ্রস্ত হইতে হয় না। গবর্ণমেণ্ট ঋণগ্রস্ত না হইলে দরিদ্র প্রজাকে আর করভারে প্রপীড়িত হইতে হয় না। শাসনকার্য্যে করদাতাগণের অধিকার থাকিলে গবর্ণমেণ্ট আয়ব্যয়ের যে বার্ষিক বাজেট প্রস্তুত করিবেন তাহাতেও প্রজার কথা কহিবার অধিকার থাকে। রাজ্যের অনুচিত ব্যয় অনেক আছে,

তাহাও হ্রাস করিলে গবর্ণমেণ্ট অনেক স্বচ্ছল হন। এইরূপে যদি গবর্ণমেণ্টের ঋণের দায় চুকিয়া যায়, শাসনব্যয়ের সংক্ষেপ হইয়া পড়ে করভারযুক্ত প্রজাগণের দারিদ্র্য নিবারণ না হইবে কেন? অধিকন্তু গবর্ণমেণ্টও অঋণী এবং ধনী হইয়া প্রজাগণের অবস্থার উন্নতি করিবার উপায় দেখিবেন কেন না? শাসনকার্য্যে প্রতিনিধিব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিলে দেশের লোকের দারিদ্র্য নিবারণ হয় কেন বালকগণ এখন কি তাহা বুঝিতে পারিলে? কনগ্রেস সভা যে দেশের দারিদ্র্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে যিনি সন্দেহ করেন, আমরা তাঁহাকে বলিব, তাঁহারা জাতীয় সভার কার্য্যবিবরণী মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিয়া দেখেন নাই।

নেসন সম্পাদক কনগ্রেস সভার আর একটী দোষের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন ভারতশাসনের জন্য কমন্স সভায় একটী স্বতন্ত্র কমিটি সংগঠিত করিবার প্রস্তাবটী নিতান্ত আপত্তিজনক। কনগ্রেস সভা এরূপ কোন প্রস্তাব করেন নাই যে এখন ভারত-শাসনের ভার যেমন কমন্স সভার হস্তে আছে সেইরূপ না রাখিয়া কেবল ঐ সভার কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট, সভ্যের গঠিত স্বতন্ত্র একটী সভার হস্তে ঐ ভার ন্যস্ত করাই কনগ্রেসের অভিপ্রেত! এখন মহাসভা ভারত সাম্রাজ্যের প্রকৃত সম্রাট, সেই কর্ত্তৃত্ব যদি ভারতানভিজ্ঞ সকল সভ্যের হস্তে থাকে, তাহা হইলে শাসনকার্য্যে অনেক বিঘ্ন উপস্থিত হয়। যাঁহারা ভারতবর্ষের শাসনকার্য্য চালাইয়া গিয়াছেন অথবা ভারত সম্বন্ধে নানা প্রকারে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, গভর্ণর জেনেরলের বিচারের উপরে তাঁহাদিগকে আপীল আদালত স্বরূপে স্থাপন করিলে শাসনকার্য্য সুশৃঙ্খলায় চলিতে পারে। নেসন সম্পাদক আপত্তিকৃত প্রস্তাবের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়াই ইহাতে বিপদের সম্ভাবনা করিয়াছেন।

সহযোগীর আর একটী আপত্তিকর উত্তর দিলেই কনগ্রেস সভার ত্রিদোষ কাটিয়া যায়। নেসন বলেন কনগ্রেস সভা সিভিলসার্ভিসে ভারতবাসীর নিয়োগ সম্বন্ধে প্রস্তাব করিয়াছেন যে, যে বিভাগে সিভিল সার্ভাণ্টের প্রয়োজন হইবে, সেই বিভাগের অধিবাসিগণকে সেই কার্য্যে নিযুক্ত করিতে হইবে। এই প্রস্তাবটী নিতান্ত অযুক্তি যুক্ত। নেসনের এই আপত্তিতে আমরা একটু ঈর্ষার ভাব দেখিতে পাই। ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গালী ও মহারাষ্ট্রী জাতিই সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান এবং পারদর্শী। যদি জাতি ও সম্প্রদায় বিশেষের পার্থক্য না রাখিয়া সিভিল সার্ভিস কার্য্যে উপযুক্ত ব্যক্তির নিয়োগপদ্ধতি অবলম্বন করা যায় তবে বাঙ্গালী এবং মহারাষ্ট্রী জাতিই সিভিল সার্ভিসের পদগুলি একচেটিয়া করিয়া বসিবেন। হয়ত বিলাত প্রত্যাগত নেসন সম্পাদকের তাহাতে বিশেষ সুবিধা ঘটিতে পারে। কিন্তু জাতীয় সভা ব্যক্তি বিশেষ বা জাতি বিশেষের সুবিধার উপর দৃষ্টিপাত করেন নাই। সকল জাতীর লোকে সরকারীকার্য্যে সমান অধিকার লাভ করেন জাতীয় সমিতির উদ্দেশ্য অপেক্ষাকৃত অপারদর্শী অনুন্নত জাতি যাহাতে শিক্ষা পাইয়া উন্নত হন, ইহাও উক্ত প্রস্তাবের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। সকল জাতির অভাব এবং শাসন সম্বন্ধে সাধারণের

অভিমত গবর্ণমেণ্টের নিকট সমানভাবে অভিব্যক্ত হয় ইহাই উক্ত প্রস্তাবের তৃতীয় উদ্দেশ্য। ভারতবর্ষের যে সকল লোক রাজনীতির তল পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিয়া অভিজ্ঞ হইয়াছেন; ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আকাশের যাহারা উজ্জ্বল তারকা, তাঁহারা বাঙ্‌নিস্পত্তি না করিয়া এই সাধুপ্রস্তাবে সম্মতি দিয়াছেন। দাদাভাই নাওরোজী সত্রামানিয়া আয়ার, প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, নবাব রেজা আলি, লালা কানাইলাল, রেজর সাহেব, গঙ্গাধর, রহিমত উল্লা সেয়ানী, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে প্রস্তাবে একমত হইয়া সম্মতি দিয়াছেন, তাহা কি ভারতবাসীর জাতীয় মত নহে? সহযোগীর নিজের কোন স্বার্থোদ্দেশ্য না থাকিলেও এসম্বন্ধেই তাঁহার বিবেচনাশক্তির কিছু অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রস্তাবটীর অযৌক্তিকতা সম্বন্ধে এখনও যদি তাঁহার সন্দেহ থাকে, তবে তিনি নিজের সহিত এই সকল কৃতবিদ্য রাজনীতির স্তম্ভস্বরূপ মহাত্মগণের প্রভেদ চিন্তা করুন, ইহাদের নিকট উপদেশ লইয়া বিজ্ঞতা লাভ করুন এবং ভবিষ্যতে জাতীয় সমিতির প্রস্তাবের উপর সমালোচনা করিবার শক্তি সংগ্রহ করুন।

আপত্তিপ্রিয় বালক সম্পাদকগণের আরও কয়েকটা আপত্তি আছে। সেগুলি নিতান্ত হাস্যকর। কেহ বলিয়াছেন জাতীয় সভায় জাতীয় ভাষার আলোচনা করা কর্ত্তব্য ছিল। এই আপত্তির অসম্ভবতাই ইহার যথেষ্ট উত্তর। বালক! ভারতবাসীর সাধারণ জাতীয় ভাষা কি? বাঙ্গলা, উর্দ্দু, হিন্দী, মহারাষ্ট্রী, পার্সী, পাঞ্জাবী, নাগপুরী, মান্দ্রাজী, এই সকল ভাষায় কথা কহিলে কেহ কি কাহারও কথা বুঝিতে পারেন? ইংরাজেরা যাহাকে "লিঙ্গোয়া ফাঙ্কা" বলেন এমন সাধারণ জাতীয় ভাষা অগ্রে ভাবতবর্ষে প্রবর্ত্তিত হউক, তারপর ইংরাজি ছাড়িয়া জাতীয় সভার সভ্যগণ সেই ভাষায় কথোপকথন করিতে পারিবেন। সম্পাদকগণ বাঙ্গলা ভাষায় সম্বাদপত্র না চালাইয়া যদি এমন একটী সাধারণ ভাষার সৃষ্টি করিয়া সেই ভাষায় সম্বাদপত্র প্রকাশ করেন, তবে বুঝিতে পারি কেরামত আছে। নচেৎ এ আপত্তিপ্রিয়তা প্রকাশ করিয়া উপহাসাস্পদ হইবার প্রয়োজন কি? আমরা ইংরাজি বাজনীতি অনুবর্ত্তন করিতেছি, ইংরাজী রাজ্যশাসন ব্যবস্থার অনুকরণ করিতেছি, ইংরাজের সহিত স্বাতন্ত্র্য এবং প্রজাতন্ত্রের আপোষ করিবার চেষ্টা করিতেছি—ইংরাজি ছাড়িয়া আর কোন্ ভাষার সাহায্যে এই সকল উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে? আমরা এই বিজ্ঞ মান্য সম্পাদকগণকে বলি—ধর্ম্মের কথায় পক্ক পিতামহত্ব প্রকাশ করিতে সকলেরই শক্তি আছে, ব্রাহ্ম ও হিন্দুধর্ম্মের বিবাদ লইয়া হেলায় দুই কথা বলিয়া লইতে সকলেই পারে, কিন্তু গভীর রাজনীতির সাগরে প্রবেশ করিয়া রত্নাহরণ করিতে যাওয়া সহজসাধ্য নহে। সে চেষ্টায় যদি প্রবৃত্তি থাকে আপনাকে একটু "কম নজরে" দেখিতে হইবে, পরের নিকটও উপদেশ লইয়া জ্ঞানলাভ করিতে হইবে।

একদিকে এংলো ইণ্ডিয়ান সম্বাদপত্র যেমন কনগ্রেস সভাকে কেবল হিন্দুসভা বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন, অন্যদিকে এই বালক সম্পাদক কনগ্রেস সভায় হিন্দুর প্রতিনিধি প্রবেশ

করিতে পারেন নাই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন। প্রকারান্তরে বলা হইল সুরেন্দ্রনাথ হিন্দুর প্রতিনিধি নহেন। প্যারীমোহন হিন্দুর অভাব অবগত হইতে পারেন নাই, গুরুপ্রসাদ সেন, প্রাণনাথ শাস্ত্রী, কাশীপ্রসাদ, লালা কানাইলাল, ইঁহারা কেহই হিন্দু নহে। বোধ হয় গুরুমহাশয় শশধর তর্কচুডামণিকে যদি সভ্যের আসন দেওয়া হইত, তবে ইঁহাদের এই আপত্তিটার কারণ থাকিত না। আপত্তি করিতে হইলে যদি এইরূপ আপত্তিই করিতে হয়, তবে আর ভাষার অগৌরব ও সম্বাদপত্রের অপমান কিসে হয়, কাহাকেও তাহা অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে হইবে না।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মশক মক্ষিকা যেমন যোগাসীন ব্যক্তির যোগকার্য্যের ব্যাঘাত করিতে পারে না, মাকড়সার তন্তু হস্তীর পদে বেষ্টন করিলে যেমন তাহার গতিরোধ করিতে পারে না, এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্ঞাতিশত্রু, বঙ্গভাষার শত্রু, সম্বাদপত্রের বিরক্তিকর আপত্তিকর কথায়, ঈর্ষাপূর্ণ অভদ্র ভাষায়, অহিফেণসেবীর ন্যায় অযুক্তিযুক্ত পরুষ বাক্যে, জাতীয় জীবনপ্রাপ্ত জাতীয় সমিতির কোন অনিষ্টই সাধন করিতে পারিবে না।

সোমপ্রকাশ

শিক্ষা

রচনা-সংকলন

শিক্ষা

বালিকা বিদ্যালয়। ১৭ শ্রাবণ ১২৬৬। ৩৮ সংখ্যা

সম্পাদকীয়

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাঙ্গলা দেশের ভূতপুর্ব্ব লেফ্‌টেনণ্ট গবর্ণর হেলিডে সাহেবের অনুমতি লইয়া বর্দ্ধমান, হুগলী প্রভৃতি কতিপয় স্থানে কয়েকটী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। হেলিডে সাহেব অগ্রে এ বিষয়ে সুপ্রিম গবর্ণমেণ্টের মত জিজ্ঞাসা করেন নাই। এই হেতু উক্ত বিদ্যালয় সকলের নিয়োজিত লোকদিগের বেতন দান কাল উপস্থিত হইলে তুমুল গোলযোগ উপস্থিত হয়। সুপ্রিম গবর্ণমেণ্টেরও ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষের মত-গ্রহণ নিরপেক্ষ হইয়া নূতন বিষয়ে ব্যয়দানের ক্ষমতা নাই। সুতরাং তাঁহারাও বালিকা বিদ্যালয়ের স্থায়িতা বিষয়ে মতপ্রদান করিতে পারিলেন না। কিন্তু তাঁহারা তৎকালে বিদ্যালয়ে সকলের নিয়োজিত লোকদিগের কয়েক মাসের বেতন দিবেন স্বীকার করিলেন এবং ইহাও স্বীকার করিলেন ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষ বালিকা বিদ্যালয় বিষয়ে যাহাতে মাসিক সহস্র মুদ্রা ব্যয় দান করেন, তাঁহারা সে চেষ্টা করিবেন।··· এক্ষণে শুনিতে পাওয়া যাইতেছে ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষ অর্থের অসঙ্গতি বলিয়া মাসিক সহস্র মুদ্রা ব্যয়দান প্রস্তাব গ্রাহ্য করেন নাই।··· ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে মাসিক সহস্র মুদ্রা দান অতি সামান্য কথা। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অনেক কষ্টে সেই সামান্য বিষয়ে অত্রত্য সুপ্রিম গবর্ণমেণ্টের যদিও মত করিলেন কিন্তু ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষ তদ্বিষয়ে অনুমোদন করিলেন না।···

বঙ্গদেশীয় অঙ্গনাগণ অতিশয় হতভাগ্য। কতকালে ইহাদিগের অদৃষ্টপ্রসন্ন হইবে বলিতে পারা যায় না। আমাদিগের রাজপুরুষেরা এত যে সভ্য তাঁহারাও তাঁহাদিগের প্রতি প্রসন্নরূপ নহেন। যে সময়ে অত্রত্য সুপ্রিম গবর্ণমেণ্ট বালিকা বিদ্যালয়ের নিমিত্ত ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে অনুরোধ করিয়া পাঠান, তৎকালে আমাদিগের এই বোধ হইয়াছিল। (এ বিষয় তাঁহাদিগের এই বোধ হইয়াছিল), এ বিষয় তাঁহাদিগের কর্ণগোচর হইবামাত্র সম্মতি প্রদান করিবেন, কিন্তু বঙ্গদেশীয় রমণীগণের অদৃষ্টদোষে তাহা ঘটিল না। তাঁহারাও করুণাশূন্য হইলেন।

বালিকাবিদ্যালয়ে ব্যয়দান অস্বীকার করাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, বঙ্গদেশীয় স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ে ইংলণ্ডীয় রাজপুরুষদিগের উপেক্ষা আছে। যত্ন থাকিলে তাঁহারা অর্থের অসঙ্গতিরূপ কারণ প্রদর্শন করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতেন না। যে কার্য্য তাঁহাদিগের মতস্থ হয়, কই তাঁহারা ত অর্থের অসঙ্গতির কথা তুলিয়া তাহা হইতে বিরত হন না। নৈনিতালে এক মিসনরি স্কুল স্থাপনার্থ তাঁহারা ১৫০০ টাকা দান করিয়াছেন

এবং আমেরিকান মেথডিষ্ট চর্চ্চ মিশন স্কুলে মাসে মাসে ৫০ টাকা দিবেন অঙ্গীকার করিয়াছেন। কিছুদিন হইল কোম্পানির যে সকল ইউরোপীয় সৈন্য বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে এই আদেশ করিয়াছেন তাহারা কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যদি ইউরোপগমনার্থী হয়, গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের পাথেয়ব্যয় দিবেন। অত্রত্য গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয় সকলে বাইবল পাঠনার যে প্রস্তাব হইতেছে, তাহা যদি রাজপুরুষদিগের অভিমত ও পরিগৃহীত হয়, তদ্বিষয়ে যে ব্যয় লাগিবে, বোধহয় রাজপুরুষেরা গবর্ণমেণ্ট ঋণগ্রস্ত বলিয়া আপত্তি উত্থাপন করিয়া তদ্দানে বৈমুখ্য প্রদর্শন করিবেন না।

গবর্ণমেণ্ট ঋণগ্রস্ত হইয়াছেন, ঋণগ্রস্তের ব্যয় সংক্ষেপ করাই কর্ত্তব্য, অতিরিক্ত ব্যয় করা পরামর্শসিদ্ধ হয় না। অতএব ইংলণ্ডীয় রাজপুরুষেরা অর্থের অসঙ্গতিরূপ যে কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অসঙ্গত ও অগ্রাহ্য নহে। তন্নিমিত্ত তাঁহারা দূষণীয় হইতে পারেন না, একথা যথার্থ বটে, কিন্তু বিষয়ভেদে ব্যবস্থা ভেদ হয়। আবশ্যক ব্যয় স্থলে এ নিয়ম খাটে না। রাজপুরুষেরা অর্থহেতু ক্লিশ্যমান হইয়াও মাজিষ্ট্রেট জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির সংখ্যাবৃদ্ধি করিতেছেন কেন? প্রজাগণের সুখস্বচ্ছন্দতা সম্পাদনই তাহার উদ্দেশ্য। দস্যুতস্করাদি ভয় নিবারণ দ্বারা প্রজার সুখসচ্ছন্দতা সম্পাদন চেষ্টা, সেরূপ বিদ্যাদান দ্বারা প্রজার দুরবস্থা দূরীকরণ চেষ্টাও তেমনি আবশ্যক। পুরুষে বিদ্যা শিখিলেই দেশের অভীপ্সিত উন্নতিলাভ হয় না। স্ত্রীজাতির বিদ্যাশিক্ষার সবিশেষ আবশ্যকতা আছে। আমাদিগের দেশের স্ত্রীগণ মূর্খ, এই হেতু পুরুষদিগের বিদ্যাশিক্ষার সম্যক ফলোপধায়কতা দৃষ্ট হইতেছে না। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, এতদ্দেশের যুবক সম্প্রদায়ের অনেকের অন্তঃকরণ শিক্ষাগুণে ভ্রমপ্রমাদশূন্য হইয়াছে কিন্তু পরিবারদিগের অনুরোধে তাঁহাদিগকে নিতান্ত ভ্রান্তের ন্যায় অনেক কর্ম্ম করিতে হয়। এরূপ হওয়া অনৈসর্গিক নহে। যাহাদিগের সংসর্গে সদা বাস করিতে হয় তাহাদিগের অনুরোধ পরিহার করা বড় কঠিন। ফলতঃ রাজপুরুষেরা যে উদ্দেশ্যে বঙ্গদেশীয় পুরুষদিগের শিক্ষাদান করিতেছেন, যাবৎ স্ত্রীশিক্ষার বিশিষ্ট উপায় করিয়া না দিবেন, তাবৎ সম্যকরূপে সে উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারিবেন না।

অত্রত্য সুপ্রিম গবর্ণমেণ্ট বালিকা বিদ্যালয়ের নিমিত্ত ইংলণ্ডীয় রাজপুরুষদিগের নিকটে যে অর্থ প্রার্থনা করিতেছেন, তাহা অধিক নহে। স্বতন্ত্র ফণ্ড হইতে সেই অর্থদান যদি নিতান্ত কষ্টসাধ্য বোধ হইয়া থাকে, কর্তৃপক্ষ ব্যয়সংক্ষেপের চেষ্টা করিলেন না কেন? তাহা হইলেও তাঁহারা অনায়াসে এই সহস্র মুদ্রা দান করিতে পারিতেন। আমরা রাজপুরুষদিগকে অন্য ডিপার্টমেণ্ট হইতে ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া বালিকা বিদ্যালয় বিষয়ে টাকা দিতে কহিতেছি না। শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য্যে তাঁহারা যে ব্যয়দান নিয়ম করিয়া দিয়াছেন, তাহার অনেক অপব্যয় হইতেছে। বিশিষ্টরূপে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেই সেই অপব্যয় ধরা পড়িয়া অনেক টাকা উদ্বৃত্ত হইতে পারে। সেই উদ্বৃত্ত টাকা হইতে কিঞ্চিৎ দিলেই

অনায়াসে বালিকা বিদ্যালয়ের সঙ্কল্পিত ব্যয়নির্ব্বাহ হয় এবং বালিকা বিদ্যালয় স্থাপয়িতাদিগেরও মুখ উজ্জ্বল হয়।

হেলিডে সাহেব অগ্রে উপস্থিত কর্ত্তৃপক্ষের মত গ্রহণ না করিয়া কিরূপে এরূপ বিষয়ে মত প্রদান করিলেন এবং বিদ্যাসাগর বিষয়কর্ম্মে দক্ষ হইয়াও সবিশেষ না জানিয়া শুনিয়া কিরূপেই বা এরূপ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলেন, অনেকে একথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। আমরা যতদূর জানি, তাহাতে এই উত্তর দিতে পারি, হেলিডে সাহেবের কাজের গতি এইরূপই ছিল। তিনি অগ্রে ভাবিয়াচিন্তিয়া প্রায় কোন কর্ম্ম করিতেছেন না। তাঁহার যখন যেমন, তখন তেমন ছিল। বিদ্যাসাগর তাঁহার নিকটে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তিনি অনুমতি দিলেন। বোধ হয়, তৎকালে তিনি এই বিবেচনা করিয়াছিলেন আমি হেলিডে সাহেব, বাঙ্গালাদেশের লেফটেনণ্ট গবর্ণর, ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষ আমার বিদ্যাবুদ্ধি দেখিয়া আমার নিমিত্তই এই পদ নূতন স্থাপন করিয়াছেন, আমি এত বড লোক হইয়া যদি বিদ্যাসাগরের কৃত প্রস্তাবে অনুমতি না দি, তাহা হইলে আমার মান থাকে কই, বিদ্যাসাগরই বা কি মনে করিবেন। মনোমধ্যে এইরূপ অভিমানের উদয় হওয়াতে তিনি তৎক্ষণাৎ অনুমতি দিয়া ফেলিলেন। স্বদেশের হিতানুষ্ঠান প্রসঙ্গ হইলে বিদ্যাসাগরেরও কিছু জ্ঞানগম্য থাকে না। রীতিমত কাজ হইল কি না, তিনিও তাহা বিবেচনা করিলেন না। তাডাতাড়ি কয়েকটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বসিলেন। বোধ হয় এমন স্থলে কাহারও সংশয় জন্মে না। লেফ্‌টেনণ্ট গবর্ণর যখন আদেশ করিতেছেন, তখন তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইবার সম্ভাবনা কি? যাহা হউক, বিদ্যাসাগরের মনে এতদিন এই আশা ছিল, ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষ তাহার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের স্থায়িতাসম্পাদনের সদুপায় করিয়া দিবেন। এক্ষণে সে আশা উন্মূলিত হইল। তিনি এই সমাচার শুনিয়া অতিশয় ক্ষুব্ধ হইবেন সন্দেহ নাই।

কলিকাতা সংস্কৃত কালেজ। ৮ কার্ত্তিক ১২৬৬। ৪৮ সংখ্যা

এতদিনের পর সংস্কৃত কালেজ যে নদে হইয়া উঠিবে তাহার লক্ষণ হইয়াছে। অপবিত্র ইংরাজী ভাষা স্পর্শে সংস্কৃত কালেজের যে অশুচিতা দোষ জন্মিয়াছিল, এতদিনের পর তাহা শোধিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। আমরা কয়েকবার সংস্কৃত কালেজের বিষয় লিখিয়াছি, বোধ হয়, পাঠকগণের স্মরণ আছে। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার পর অবধি সংস্কৃত কালেজ লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। আমরা এই গোলের বিষয় কতক কতক পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, এক্ষণে শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, বাঙ্গালাদেশের বর্ত্তমান লেফ্‌টেনণ্ট গবর্ণর গ্রাণ্ট সাহেবের

নিকটে দুইখান দরখাস্ত পড়িয়াছে। একের উদ্দেশ্য এই, সংস্কৃত কালেজে অধিক পরিমাণে সংস্কৃত ও ইংরাজী উভয় ভাষারই আলোচনা হয়, অপরের উদ্দেশ্য, ইংরাজী উঠিয়া গিয়া কেবল সংস্কৃতের অনুশীলন হয়। যে দুই দল আবেদন করিয়াছেন তাঁহারা এতদ্দেশীয় লোক, দুই চারিজন করিয়া প্রধান লোক দুইদলেরই অধিনায়ক হইয়াছেন।

উভয় দলের ঈদৃশ পরস্পর বিসম্বাদী আবেদনের উদ্দেশ্য কি, তাঁহারা আবেদন মধ্যে কি কি যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না। তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য যেরূপ হউক, তাঁহাদিগের প্রদর্শিত যুক্তি যেরূপ হউক, উভয় আবেদনই যে সঙ্গত ও যুক্তিসিদ্ধ হইয়াছে, ইহা কোনরূপেই নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া সমুদায় বিষয়েরই শক্তির বলাবল চিন্তা করিতে হয়। এ নিয়মের অনুসারে বিবেচনা করিতে গেলে যাঁহারা সংস্কৃত কালেজে কেবল সংস্কৃত পাঠনা প্রস্তাব করিতেছেন, তাঁহাদিগের কৃত প্রস্তাব সমধিক হৃদ্য বলিয়া রাজপুরুষদিগের পরিগৃহীত হইবে, এরূপ বোধ হইতেছে না। এখন যেরূপ কাল পড়িয়াছে, তাহাতে স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে প্রায় তাবৎ লোকেরই সংস্কৃতের প্রতি নিতান্ত অনাদর হইয়া উঠিয়াছে। সন্তান সংস্কৃতশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়া বেদবেদান্তাদির অনুশীলনে সমর্থ ও মুমুক্ষু হইবে, একথা মনে করিয়া আর কেহ পুত্রকে সংস্কৃত কালেজে দেন না। বালকদিগেরও যেরূপ ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্দ্বারাও স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, নিরবিচ্ছিন্ন সংস্কৃত পাঠে তাহাদিগের প্রবৃত্তি নাই। অতএব যাঁহারা সংস্কৃত কালেজে শুদ্ধ সংস্কৃত পাঠনার প্রস্তাব করিতেছেন, বোধ হয়, তাঁহাদিগের মনোগত কথা এই, কালেজ উঠিয়া যাউক। ঐ কালেজে দিনকত কাল ইংরাজী পাঠ প্রতিষিদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে কালেজের যে দুরবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। অনেকে তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। সংস্কৃত কালেজে ইংরাজী বন্ধ করিয়া দিলে যে কালেজ উঠিয়া যাইবে, তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সংশয় নাই। একবার এ বিষয়ের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

সংস্কৃত কালেজে ইংরাজী রহিত হইলেও সকলে সন্তানদিগকে পড়িতে দিবেন, ছাত্র কমিয়া যাইবে না, একথা যদি স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তথাপি এখনকার কালেজে বালকদিগকে কেবল সংস্কৃত শাস্ত্রে শিক্ষা দেওয়া বিধেয় হইতেছে না। নিরবিচ্ছিন্ন সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়া শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্যলাভে অধিকারী হইবার সম্ভাবনা নাই। সংস্কৃত অতি প্রাচীন ভাষা। এতৎপাঠে শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্যলাভের সম্ভাবনা করাও ন্যায়ানুগত হইতে পারে না। এদেশে প্রাচীনকালের লোকেরা পদ ও পদার্থ ঘটিত যে সকল আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছেন, সংস্কৃতশাস্ত্রে তৎসমুদায় সমাবেশিত হইয়াছে। প্রাচীনকালের লোকদিগের আবিষ্কৃত বিষয় সকল বিশুদ্ধ নহে, তাহা নিতান্ত ভ্রান্তি সঙ্কুল। প্রথমেই একবারে, আবিষ্কৃত বিষয়ের বিশুদ্ধতা হওয়া দুরূহ। উত্তরোত্তর বিশুদ্ধতা জন্মিয়া থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদিগের দেশে উত্তরোত্তর বিশুদ্ধতালাভ

না হইয়া প্রত্যুত ভ্রান্তিরই অধিকতর বৃদ্ধি হইয়াছে। এই হেতুবশতই আমরা সংস্কৃত দর্শনাদি শাস্ত্র অধিকতর ভ্রান্তিজালে আচ্ছন্ন দেখিতে পাইতেছি। আজিও কি শুদ্ধ সংস্কৃত শাস্ত্রের পাঠনায় প্রবর্ত্তিত করিয়া বালকদিগের মন ভ্রান্তিজালে আচ্ছন্ন করিয়া রাখা উচিত?

সংস্কৃত কালেজের বিপক্ষ লোকেরা বলিতে পারেন, সংস্কৃতশাস্ত্র যদি ভ্রান্তি-সঙ্কুল হইল তবে তৎপাঠনার প্রয়োজন কি? কালেজ উঠাইয়া দেওয়াই উচিত। ইহার উত্তর এই, শুদ্ধ সংস্কৃত পাঠ তাদৃশ উপকারক নহে যথার্থ বটে, কিন্তু ইংরাজী সহচর হইলে এতৎপাঠে মহোপকার লাভ হইয়া থাকে।

বিদ্যা শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া যদি অবান্তর ফলের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তথাপি এদেশে আর পূর্ব্বের ন্যায় সংস্কৃত পাঠের উপযোগিতা দৃষ্ট হইবে না। আমরা পুনরায় কহিতেছি, এখন প্রায় সকল লোকই সংস্কৃতে হতাদর হইয়াছেন। আজিও সংস্কৃতের যে কিছু প্রাদুর্ভাব আছে, ইংরাজীর অধিকতর অনুশীলন আরম্ভ হইলে তাহাও থাকিবে না। এখন আমাদিগের দেশীয় ভাষার উন্নতি সাধনার্থ উভয় সঙ্কলন করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় সমাবেশিত করিলে বাঙ্গালা ভাষা স্বল্পকাল মধ্যে এক অপূর্ব্ব ভাষা হইয়া উঠিবে। ইংরাজী ভাষায় এরূপ অনেক শব্দ ও অনেক ভাব আছে, তাহা বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ অথবা ব্যক্ত করা অতিশয় দুরূহ। তাহা অনুবাদ অথবা ব্যক্ত করিতে গেলে সংস্কৃতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়।

কতকগুলি গল্পের ও কাব্যের বহি সংগৃহীত হইলে যে বাঙ্গালা ভাষা পূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হইবে এরূপ বিবেচনা করা উচিত নয়। দর্শন বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রের বাহুল্যরূপে বাঙ্গালায় সমাবেশ করিতে হইবে। ভ্রান্তিময় হউক, সংস্কৃত শাস্ত্রে অনেক বিষয়ের কিছু কিছু আছে। সেই সকল বিষয়ের সংগ্রহকালে সংস্কৃত হইতে অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। এ উদ্দেশ্য সাধনার্থ একটি স্বতন্ত্র সংস্কৃত কালেজ রাখা আবশ্যক এবং তথায় যাহাতে সংস্কৃত ও ইংরাজী উভয়েরই বাহুল্যরূপে চর্চ্চা হয়, সে চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু যেখানে বালকগণ কেবল ইংরাজী শিক্ষা করিব বলিয়া পড়িতে যায়, সেখানে এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই।

এস্থলে সংস্কৃত কালেজের বর্ত্তমান অবস্থার কোন কথার উল্লেখ করিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সংস্কৃত কালেজে যাহাতে ইংরাজী ও সংস্কৃত উভয় ভাষারই বাহুল্যরূপে চর্চ্চা হয়, ইদানীন্তন অধ্যক্ষ কাউএল সাহেবের তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ যত্ন আছে। তিনি ইংরাজী ভাষায় কৃতবিদ্য, সংস্কৃতেও অনভিজ্ঞ নহেন। উভয় ভাষার গুণ ও শিক্ষার আবশ্যকতা তাঁহার অবিদিত নাই। অতএব তিনি যে ঐ উভয় ভাষার বাহুল্যরূপে অনুশীলন চেষ্টা করিবেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

যাঁহারা সংস্কৃত কালেজ হইতে ইংরাজী উঠাইয়া দিবার প্রার্থনায় আবেদন

করিয়াছেন, তাঁহারা এরূপ করিলেন কেন? এই কারণের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। তাঁহারা সংস্কৃত বিষয়ে অনভিজ্ঞ, এবং সংস্কৃত কালেজের পূর্ব্বাপর অবস্থা অবগত নহেন, এই বলিয়া এতাদৃশ অসঙ্গত আবেদন করিয়াছেন, একথা বলা সঙ্গত হইতে পারে না। তাঁহারা সংস্কৃতজ্ঞ না হউন, সংস্কৃত কালেজের আদ্যোপান্ত যাবতীয় বৃত্তান্ত অবগত আছেন, তাঁহারা বহুদর্শী লোক। সংস্কৃত কালেজ উঠিয়া যায়, এই তাঁহাদিগের মনোগত অভিপ্রায়, ইহাই বা কিরূপে সম্ভাবিতে পারে? তাঁহারা বাঙ্গালা দেশের হিতৈষী বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব তাঁহারা সেই বাঙ্গালা দেশের শ্রীবৃদ্ধির মূল সংস্কৃতচর্চ্চা বিলুপ্ত করিয়া দেশের মহানিষ্ট সাধন করিবেন, কোন রূপেই এরূপ বোধ হয় না। যদি বলেন পল্লীগ্রামে সংস্কৃতচর্চ্চা হইতেছে, কালেজের আর প্রয়োজন নাই। একথা বলা বিবেচনাসিদ্ধ হইতে পারে না। পল্লীগ্রামে প্রায় সংস্কৃত চর্চ্চা উঠিয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ শুদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ হইতে বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি লাভের সম্ভাবনা নাই।

আমরা শুনিয়াছি তাঁহারা যে আবেদন করেন, তাহা প্রথম নহে। প্রাথমিক আবেদনকারীরা কি তাঁহাদিগের মত গ্রহণ করেন নাই? সেই অভিমানে কি তাঁহারা সংস্কৃত কালেজ উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া বাঙ্গালা দেশের অনিষ্টসাধনে উদ্যত হইয়াছেন? লোক অভিমানে শরীর পরিত্যাগ করে। তাঁহারা বুদ্ধিমান লোক, তাঁহারা সেইরূপ না করিয়া সংস্কৃত কালেজকে কলেবর পরিত্যাগ করাইতে উদ্যত হইয়াছেন। কিন্তু আমরা এ অনুমানও সৎ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। তাঁহারা উদারাশয় বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহার উদারাশয় হইয়া এরূপ নীচাশয়ের কর্ম্ম করিবেন কেন? এ ব্যাপার কেবল বাঙ্গলা দেশের দুর্ভাগ্যবশতই ঘটিয়াছে। যাহা হউক, রাজপুরুষেরা যদি এ সময়ে কালেজ উঠাইয়া দেন উক্ত আবেদনকারীরা চিরদুর্নামভাগী হইবেন, তাঁহাদিগের আবেদনে এতন্মাত্র ফললাভ হইবে। সংস্কৃত কালেজের শ্রীবৃদ্ধি বিষয়ে একবাক্য হইয়া আন্তরিক যত্ন করা আমাদিগের দেশের যাবতীয় লোকের কর্ত্তব্যকর্ম্ম, তাহা না করিয়া দলাদলি করিয়া ইহার উন্মূলন চেষ্টা করা হইতেছে; অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয়।

অন্য অন্য কালেজেও বি. এ. উপাধিলাভের পরীক্ষাগ্রহণরীতি প্রবর্ত্তিত করা উচিত। ২৪ অগ্রহায়ণ ১২৬৯। ৪ সংখ্যা

সম্প্রতি ১৮৬০।৬১ অব্দের এডুকেশন রিপোর্ট প্রচারিত হইয়াছে। পাঠকগণ ইহার স্থূল মর্ম্ম প্রস্তাবান্তরে দর্শন করিবেন। ইহা আটকিন্সন সাহেবের দ্বিতীয় বর্ষের কার্য্যের বিবরণ। এই দুই বৎসরের মধ্যে আমরা তাঁহার নিকটে অনেকবিধ ইষ্ট ফল-লাভের প্রত্যাশা করিয়াছিলাম। কিন্তু অনেক বিষয়ে পূর্ণ মনোরথ হইতে পারি নাই।

তবে তাঁহার বিষয়ে এককালে হতাশ হওয়াও হয় নাই। বোধ হয়, তিনি দীর্ঘকাল আর আমাদিগকে ক্ষোভ প্রকাশের অবসর প্রদান করিবেন না। অদ্য আমরা এই প্রসঙ্গে তাঁহাকে দুই একটী সৎপরামর্শদানে প্রবৃত্ত হইলাম।

বঙ্গদেশে যত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হউক, যে পর্য্যন্ত এতদ্দেশীয় বিদ্যার্থিগণের মনে বিজ্ঞান, নীতি, ধর্ম্মনীতি, পদার্থবিদ্যা ও বার্ত্তাশাস্ত্র প্রভৃতি দৃঢতর রূপে বদ্ধমূল না হইবে, সে পর্য্যন্ত প্রকৃত কল্যাণলাভ সম্ভাবনা নাই। সামান্য লেখা পড়া শিখিয়া বিশেষ ইষ্টলাভ সম্ভাবিত নহে, বরং তাহা অনিষ্টেরই হেতু হয়। একজন সংস্কৃত কবি লিখিয়াছেন—

অজ্ঞঃ সুখমারাধ্যঃ
সুখতরমারধ্যতে বিশেষজ্ঞঃ
জ্ঞানলবদুর্ব্বিদগ্ধং
ব্রহ্মাপি নরং ন রঞ্জয়তি।

মুর্খকে অনায়াসে সন্তুষ্ট করা যায় ; বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির সন্তোষসাধন অত্যন্ত সহজ কর্ম্ম ; কিন্তু যে ব্যক্তি যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞানে, ব্রহ্মাও তাহার মনোরঞ্জন করিতে পারেন না।

পোপও একস্থানে এই ভাবে লিখিয়াছেন : অল্পজ্ঞান অনর্থের কারণ, পেবিরিয়ান নিঝর জল পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পান না করিলে উন্মাদ জন্মে।

ফলতঃ অল্পজ্ঞ ব্যক্তিরাই ভারতবর্ষের উন্নতিলাভের প্রধান অন্তরায় হইয়াছে। ভারতবর্ষবাসী অধিকাংশ লোকের অল্পজ্ঞতা নিবন্ধন যে অনিষ্ট ঘটিতেছে, আমরা অনুক্ষণ তাহা অনুভব করিতেছি। তবে অল্পজ্ঞ হইতে এতদিন গবর্ণমেণ্টের কিছু উপকার লাভ ছিল বটে। কেরাণীগিরি প্রভৃতি কয়েকটি কর্ম্ম অনায়াসে চলিয়া যাইতেছিল। কিন্তু এক্ষণে মুদ্রাযন্ত্রের সমধিক প্রাদুর্ভাব হওয়াতে সে উপকারেরও ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিতেছে।

এক্ষণে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য এ দেশে বিজ্ঞান শাস্ত্রাদির সমধিক প্রাদুর্ভাব হইবার উপায় কি ? প্রথমতঃ এতদ্দেশীয়দিগের যত্ন, অর্থ সাহায্যদান, এবং গবর্ণমেণ্টের আনুকূল্য। যাঁহারা বঙ্গদেশকে উত্তমরূপে জানেন, তাঁহারা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন, এদেশীয়েরা আজিও এতাদৃশ ক্ষমতাপন্ন হয় নাই যে এবম্বিধ বৃহৎকার্য্যে হস্তার্পণ করিয়া সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইয়া উঠেন। গত ৩০ বৎসরের মধ্যে অনেক বিপর্য্যয় হইয়াছে, একথা আমরা অস্বীকার করি না। গবর্ণমেণ্ট অনেককে সুশিক্ষিত করিয়াছেন, অনেকে গবর্ণমেণ্টের প্রসাদে বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রে সবিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়াছেন। ভারতবর্ষকে অজ্ঞানান্ধকার হইতে উদ্ধার করিবার অনেকের ইচ্ছা ও চেষ্টা জন্মিয়াছে। অনেকে সেই চেষ্টানুরূপ কার্য্যও আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু যাঁহাদিগের সাহায্য দ্বারা সবিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা আছে, সেই চেষ্টাকারিদিগের মধ্যে তাদৃশ ধনী লোকের সংখ্যা অতি অল্প। ইদানীন্তন ধনীদিগের অনেকে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকে একটি আসবাবের

মধ্যে বোধ করেন। ফলতঃ এদেশীয়েরা আজিও বহুব্যয়াসাধ্য বিজ্ঞান শাস্ত্রাদির অনুশীলনার্থ বিদ্যালয়াদি প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হন নাই। গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত তাদৃশ বিদ্যালয়ের সংখ্যাও অধিক নয়। যে দুই একটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, স্বল্পকাল মধ্যে আশাধিক ফললাভও হইয়াছে। এই সময় আমাদিগের বিজ্ঞতম ইয়ঙ সাহেবের কথা স্মৃতিপথে উদিত হইল। ইয়ঙ সাহেব তিন বৎসর পুর্ব্বে সাউথ কালিঙ্গা ষ্ট্রিটে বসিয়া লিখিয়াছিলেন, গবর্ণমেণ্ট যদি এক্ষণে শিক্ষাদান কার্য্যে পরাঙ্মুখ হন, ক্ষতি হইবে না, বাঙ্গালিরা এক্ষণে বিদ্যার রসজ্ঞ হইয়াছেন এবং তাহার ফলোপধায়িতা বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা এক্ষণে অন্য সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া স্বয়ং শিক্ষাকার্য্যে দীক্ষিত হইতে পারিবেন। বোধ হয় ইয়ঙ সাহেব ভ্রমেও কখন চৌরঙ্গির সীমা অতিক্রম করিয়া সীমালঙ্ঘন দোষে দূষিত হন নাই। এদেশে বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রের সমধিক অনুশীলন না হওয়াতে এ দেশের কত অনিষ্ট ও গবর্ণমেণ্টের কত ক্ষতি হইতেছে, যাঁহারা মফস্বল পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিয়াছেন। আমরা বাহুল্যরূপে যে যে বিষয়ের শিক্ষাদান প্রস্তাব করিতেছি, কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কালেজ কেবল এক তদুপযোগী আছে। গবর্ণমেণ্টের অর্থের অসঙ্গতি নিবন্ধন হউক, অথবা শিক্ষাকার্য্যের কর্ম্মচারিদিগের অসাবধানতা বশত হউক, আর যে কয়েকটি মফস্বল বিদ্যালয় প্রেসিডেন্সি কালেজের সমকক্ষতা লাভার্থ উদ্যত হইয়াছিল, তাহাদিগের উদয়পথ রুদ্ধ করা হইয়াছে। পাছে রসাল বঙ্গদেশের মৃত্তিকাতে সেইগুলি পুনরঙ্কুরিত হইয়া বর্দ্ধিত হয়, এই শঙ্কায় ডাইরেক্টর সাহেব প্রতি বৎসরই তাহার মূলে এক এক দারুণ আঘাত করিয়া থাকেন। আক্ষেপ রাখিবার স্থান নাই। মফস্বলের ঐ কালেজগুলি একদা প্রেসিডেন্সি কালেজের প্রসূতি হিন্দু কালেজকে স্পর্দ্ধা করিয়া এই বলিয়া উত্তেজনা করিয়াছিল, ভগিনি! হয় তুমি অগ্রবর্ত্তি হও নতুবা আমাদিগকে পথ ছাড়িয়া দাও। ১৮৫০ অব্দ অবধি করিয়া ১৮৫৪ অব্দ পর্য্যন্ত হিন্দু, ঢাকা, কৃষ্ণনগর ও হুগলী কালেজের যে রূপ অবস্থা ছিল, একবার দর্শন করুন।

১৮৫০ অব্দে ৯ জন প্রথম শ্রেণীর ছাত্রবৃত্তি পান, তন্মধ্যে ঢাকার ৪ জন, কৃষ্ণনগরের ২ জন, হুগলীর একজন এবং হিন্দুকালেজের ২ জন। ১৮৫১ অব্দে ১৫ জনের মধ্যে ঢাকার ২ জন হুগলীর ৫ জন, কৃষ্ণনগরের ৪ জন এবং হিন্দু কালেজের ৪ জন ছাত্রবৃত্তি পাইয়াছলেন। ১৮৫২ অব্দে দশজনের মধ্যে ঢাকার ২ জন, কৃষ্ণনগরের ২ জন হুগলীর ৪ জন এবং হিন্দু কালেজের ১ জন পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ১৮৫৩,৫৪ অব্দে ঢাকার ১ জন, হুগলীর ৪ জন, এবং কলিকাতার ৭ জন সর্ব্বশুদ্ধ ১৪ জন ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হন।

এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে, মফস্বলের কালেজগুলি কোন অংশে হিন্দু কালেজের নিকৃষ্ট ছিল না। তবে ঐ সকল বিদ্যালয় এক্ষণে হীনদশাগ্রস্ত হইল কেন? গবর্ণমেণ্টের

অবস্থা ও কৃপণতা কি ইহার কারণ নহে? গবর্ণমেণ্ট যেন এতদিন অর্থের অসঙ্গতিরূপ কারণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এখন সে পথও রুদ্ধ হইয়াছে।

১৮৬০।৬১ অব্দে এই বঙ্গদেশে গবর্ণমেণ্টের ১৩ কোটি টাকা লাভ হইয়াছে, তন্মধ্যে শিক্ষাকার্য্যে কেবল ৮ লক্ষ মাত্র ব্যয়িত হইয়াছে। হিসাব করিয়া দেখিলে প্রতি ব্যক্তিতে ৷৷৵০ দশ আনা পড়ে না। ইংলণ্ডের লোকেরা এত যে সভ্য, সেখানেও গবর্ণমেণ্টকে প্রতি ছাত্রে ১৸০ দিতে হয়। বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট শিক্ষা বিষয়ে এত কৃপণতা করিতেছেন কেন? আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। প্রজারা বিদ্বান হইলে গবর্ণমেণ্ট কি তাহাতে লাভজ্ঞান করেন না? এক্ষণে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদ্যালয় হইয়াছে। তাহাতে শিক্ষা করিয়া অনেক ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতেছে কিন্তু তাহাদিগের সেই পরীক্ষা দান মাত্র সার হইতেছে। তাহারা প্রেসিডেন্সি কালেজে অধ্যয়ন করিতে সমর্থ হয় না। কলিকাতায় অবস্থিতি করিয়া কলিকাতার যাবতীয় ব্যয়নির্ব্বাহ করিয়া প্রেসিডেন্সি কালেজে অধ্যয়ন করা অনেকের পক্ষে সহজ নহে। যদি মফস্বলে ঐরূপ কালেজ থাকিত অনায়াসেই তাহারা সেই সকল কালেজে অধ্যয়ন করিয়া বি. এ. উপাধির পরীক্ষাদানে সমর্থ হইত। অতএব অদ্য আমাদিগের অনুরোধ এই, যাহাতে ঢাকা কৃষ্ণনগর হুগলী ও বহরমপুর প্রভৃতি স্থানে বি.এ. উপাধি পরীক্ষাদান প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়, ডাইরেক্টর সাহেব তদ্বিষয়ে যত্নবান হন। অদ্য আমাদিগের বক্তব্য শেষ রহিল, আগামীবারে আমরা পুনরায় এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিব।

কলিকাতা সংস্কৃত কালেজ। ২৯ পৌষ ১২৬৯

সম্পাদকীয়

অদ্য এই কালেজ সম্বন্ধে আমাদিগের কয়েকটী বক্তব্য উপস্থিত হইয়াছে। এ কালেজ ১৮২৪ খৃঃ অব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। দিন দিন ইহার অদ্ভুত উন্নতি নয়নগোচর হইতেছে। ইহার পূর্ব্বতন অবস্থার এত পরিবর্ত্ত হইয়াছে যে ইহাকে আর সে কালেজ বলিয়া বোধ হয় না। ঊনবিংশ শতাব্দীয় শ্রীবৃদ্ধির দ্বার সর্ব্বত্র উদ্ঘাটিত যথার্থ বটে, কিন্তু ইহার উন্নতিলাভ বিষয়ে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নিকটে সর্ব্বতোভাবে ঋণী হইয়াছে। বিদ্যাসাগরের অধ্যক্ষতাভার গ্রহণের পর অবধিই ইহার ইদানীন্তন উন্নতির সোপান সংঘটিত হয়। ১৮৫১-৫২ অব্দে তিনি নূতন প্রণালী প্রবর্ত্তিত করেন। তাহার মনোহর ফল আজি আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইতেছে। এই বর্ষে এই কালেজের ৯ জন ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় এবং ৩ জন এল. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বিদ্যাসাগর প্রণীত প্রণালী অনুসৃত না হইলে আজি আমরা কোনরূপেই ঈদৃশ ফল দর্শনে সমর্থ হইতাম না, একথা বলিলে বোধহয় কেহ আমাদিগকে অত্যুক্তবাদী বলিয়া দূষিতে

পারেন না। এস্থলে বর্ত্তমান অধ্যক্ষ কার্ডএল সাহেব, অধ্যাপক ও শিক্ষকগণ বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারিকে প্রশংসা না করিয়া মৌনাবলম্বন সহজ হইতেছে না। বিদ্যাসাগর যে বৃক্ষ রোপণ করিয়া গিয়াছেন, ইঁহারা যত্নবারি সেক করিয়া তাহা এরূপ বর্দ্ধিত করিয়া তুলিয়াছেন।

ইহার পরিবর্ত্তের বিষয় সহজে পাঠকগণের হৃদয়াঙ্গম করিয়া দিবার নিমিত্ত আমরা আর একটী বিষয়ের প্রসঙ্গ করিতেছি। পূর্ব্বে এই কালেজে মাসিক ৫ ও ৮ টাকা বৃত্তি দিয়াও ছাত্র পাওয়া সহজ ছিল না, এক্ষণে ছাত্রেরা ১ টাকা করিয়া মাসিক বেতন দিয়া অধ্যয়ন করিতেছেন। সম্প্রতি আবার প্রস্তাব হইয়াছে ২ টাকা করিয়া ছাত্রদিগকে বেতন দিতে হইবে। এবিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য এই, এই কালেজে অনেক দরিদ্র সন্তান অধ্যয়ন করিয়া সুশিক্ষালাভ করিতেছিলেন, দুই টাকা দিবার নিয়ম হইলে তাঁহাদিগের অনেকের সুশিক্ষাপথ রুদ্ধ হইবে। আমরা বিশেষরূপে জানি এক্ষণকার ১ টাকা বেতনই অনেকে বহুকষ্টে দিয়া থাকেন। যাহা হউক যদি একান্তই ছাত্রদের বেতন বৃদ্ধিকরা অবধারিত হইয়া থাকে, সাধারণ্যে এ বিধি না লইয়া যাহারা প্রথম প্রবিষ্ট হইবে, তাহাদিগের বিষয়েই যেন হয়। অন্যথা ৪।৫ বৎসর অধ্যয়ন করিয়া যে সকল ছাত্রের সংস্কৃতে অধিকারী হইবার উপক্রম হইয়াছে, তাহাদিগের অনেকের মহাক্ষতি হইবে।

যে কারণে ছাত্রদের বেতনবৃদ্ধির প্রস্তাব হইয়াছে, তাহাও এস্থলে পাঠকগণের গোচর করা অপ্রাসঙ্গিক হইতেছে না। অল্পদিন হইল কাউএল সাহেব অধ্যাপক ও শিক্ষকদিগের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিবার অনুরোধ করিয়াছেন, তন্মূল হইতেই ছাত্রদিগের বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব উত্থিত হইয়াছে। দরিদ্র সন্তানদিগের শিক্ষাপথ রুদ্ধ না করিয়া কি অধ্যাপক শিক্ষকদিগের বেতনবৃদ্ধির উপায়ান্তর নাই? গবর্ণমেণ্ট এবারে শিক্ষা সম্বন্ধে যে অধিক টাকা দিযাছেন, সংস্কৃত কালেজ কি তাহার অংশগ্রাহী হইবার যোগ্য-পাত্র নহেন?

এই সংস্কৃত কালেজের প্রতি গবর্ণমেণ্টের একটী বিষয়ে অতিশয় অনাস্থা আছে। তাহা আমাদিগের স্মৃতিপথে উদিত হইয়া অতিশয় হৃদয়ক্ষোভ জন্মাইয়া দিতেছে। রাজপুরুষেরা এই বিদ্যালয়কে সামান্যদৃষ্টিতে দর্শন করেন না, "কালেজ ও প্রফেসর" ইত্যাদি উপাধি দ্বারাই তাহা প্রতীয়মান হইয়াছে। তদ্ভিন্ন সংস্কৃতজ্ঞ রাজপুরুষেরা অত্রত্য অধ্যাপক ও ছাত্রদিগের যথোচিত সম্মাননা করিয়া থাকেন, তাহাও আমরা অহরহঃ দেখিতে পাই। কিন্তু অধ্যাপকদিগের যে বেতন নিরূপিত আছে, তদ্দ্বারা যদি কেহ ইহার পরিচয় গ্রহণ করেন, সামান্য স্কুল অপেক্ষাও ইহাকে নিকৃষ্ট জ্ঞান করিবেন। অনেক মফস্বল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বেতন ১৫০ টাকা; কিন্তু এখানকার যিনি সর্ব্বপ্রধান ও মহামহোপাধ্যায় তাঁহার বেতন ৯০ টাকা মাত্র! ইনকমটাক্সের কল্যাণে

তিনি তাহার সকলও বাজকোষ হইতে সংগ্রহ করিতে পাবেন না। এতদিন যা হইয়াছে তা হইয়াছে, এই অবিবেচনার কার্য্যটী এখন আর সহ্য হইতেছে না। আরো অন্যায় দেখুন, কলিকাতা মাদবসা কালেজের অধ্যাপকেরা সংস্কৃত কালেজের অধ্যাপকের ত্রিগুণ চতুর্গুণ বেতন পাইয়া থাকেন। গবর্ণমেণ্টেব মাদরসা কালেজের সহিত যেরূপ সম্বন্ধ সংস্কৃত কালেজের সহিতও সেইরূপ, তবে এত ইতব বিশেষ কেন? অনেকে যেরূপ মনে করেন, সংস্কৃত ভাষা গৃহ পরিত্যক্ত জঞ্জালের ন্যায় অনুপযোগি ও অকিঞ্চিৎকর, বাস্তবিক তাহা নহে। বাঙ্গালা দেশের উন্নতি যে বাঙ্গলা ভাষাব উন্নতি সাপেক্ষ, সংস্কৃত তাহার প্রস্থতি। সংস্কৃত ভাষার লালন-পালনেই বাঙ্গলা ভাষা দিন দিন পরিপুষ্ট ও বর্দ্ধনশীল হইতেছে। এই কালেজেব সংস্কৃত ডিপার্টমেণ্ট বেতন বিষয়ে এমনি হতভাগ্য যে ইহার অন্তর্নিবিষ্ট ইংরাজী ডিপার্টমেণ্টব সহিত প্রতিযোগিতা করিতেও সমর্থ নহে। সম্প্রতি তত্রত্য অধ্যাপক ও শিক্ষকদিগের বেতনবৃদ্ধিব প্রস্তাব হইয়াছে, শুনা গেল, তাহাতেও উল্লিখিত বিসদৃশভাব অলক্ষিত হইতেছে না। ইংরাজী শিক্ষকদিগেব ৫০।২৫।২০ প্রভৃতি টাকা বাডাইবাব অনুবোধ করা হইযাছে, কিন্তু সংস্কৃত অধ্যাপকদিগেব অদৃষ্ট দশ ছাডিযা উঠিতে পাবে নাই। আমাদিগের বিজ্ঞ অপক্ষপাতী, যথার্থদর্শী অধ্যক্ষ এইগুলি বিবেচনা করিযা ইহাব প্রতিবিধান চেষ্টা কবেন এই আমাদিগের অনুবোধ।

এতদ্দেশীয় ভাষার একটী সাধারণ পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা

২৫ ফাল্গুন ১২৭০। ১৭ সংখ্যা

এতদ্দেশীয সমাচাবপত্র প্রভৃতিব তাৎপর্য্য গবণমেণ্টের গোচব কবিবাব নিমিত্ত যে এক ব্যক্তিব প্রতি ভারাপণ করা হইযাছে, সেটা উত্তম কায্যই হইযাছে। সে দিবস ভারতবর্ষীয ব্যবস্থাপক সভাব অন্যতব সভ্য অনবেবল মেইন সাহেব ব্যবস্থাপক সভায় এতদ্দেশীয বাস্তা ও সেতুসমূহেব মাসুল সংগ্রহে, বিল অর্পণ কবিবার সময বলিযাছিলেন, তিনি মফস্বলেব অবস্থা ও সমাজেব কোন বৃত্তান্তই অবগত নহেন। অথচ তাঁহার হস্তে একটী বৃহৎ বাজ্যেব ব্যবস্থাপন কায্যভাব সমর্পিত আছে। এরূপ ব্যবস্থাপক নিয়োগ কেবল অনিষ্টকর নয়, উপহাসকর সন্দেহ নাই। ফলতঃ যাঁহাদিগের হস্তে ব্যবস্থাপনভার সমর্পিত থাকে, মফস্বলেব অবস্থাজ্ঞান তাঁহাদিগেব নিত্য আবশ্যক। সেই অবস্থাজ্ঞানেব প্রধান উপায় সমাচাবপত্র। যখন ব্যবস্থাপকগণ দেশীয ভাষায সেই সেই পত্রেব মর্ম্মবোধে অসমর্থ, তখন তাহার মর্ম্ম বুঝাইয়া দিতে পারেন, এরূপ লোক নিযুক্ত করা যুক্তিসিদ্ধ সন্দেহ কি?

গবর্ণমেণ্টের অনুবাদক রবিন্সন সাহেবের প্রতি এই ভাব সমর্পিত হইয়াছে, আমরা পুর্ব্বে একথা পাঠকবর্গের গোচব কবিয়াছি, এবং তাঁহার প্রতি আইন অনুবাদের ভারও

আছে। সুতরাং তাঁহার দ্বারা একার্য্য সুন্দররূপে নির্ব্বাহ হওয়া দুরূহ ; অতএব স্বতন্ত্র একজন নিয়োজিত হন, তৎকালে এতদ্বিষয়েরও প্রস্তাব করা হইয়াছিল। যাহা হউক, এ বিষয়ের উল্লেখ করা অদ্যকার প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। অদ্যতনীয় প্রস্তাবের উদ্দেশ্য এই, গবর্ণমেণ্ট যেমন সমাচারপত্রের উদ্দেশ্য অবগত হইবার নিমিত্ত লোক নিয়োজিত করিয়াছেন, সেইরূপ এদেশীয় ভাষার একটী সাধারণ পুস্তকালয়ও প্রতিষ্ঠা করেন। গবর্ণমেণ্টের অনুবাদকেরা সেই সকল পুস্তকের মর্ম্ম গবর্ণমেণ্টের গোচর করিবেন।

উল্লিখিত পুস্তকালয় সংস্থাপন দ্বারা ত্রিবিধ উপকার লাভ সম্ভাবনা আছে। প্রথম গবর্ণমেণ্ট এতদ্দেশীয়দিগের মনোগত অভিপ্রায়, সমাজের অবস্থা ও উন্নতি এবং বিদ্যাবৃদ্ধির বিষয় অনায়াসে জানিতে ও তদনুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারিবেন। দ্বিতীয়, মধ্যে মধ্যে অনেক অশ্লীল ও জঘন্য পুস্তকও প্রণীত ও প্রচারিত হইয়া থাকে। তৎপাঠে দেশের ধর্ম্মনীতির উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক, অন্য অন্য উন্নতিরও মহান্ প্রতিবন্ধক হইয়া উঠে। কিন্তু গ্রন্থকারেরা যদি জানিতে পারেন, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইয়া দণ্ডবিধি অনুসারে তাঁহাদিগের দণ্ডবিধান করিবেন, তাহা হইলে কখন তাদৃশ অসৎ গ্রন্থ প্রণয়নে তাঁহাদিগের প্রবৃত্তি জন্মিবে না। তৃতীয়, এদেশীয়দিগের সাহিত্যাদি বিষয়ে কতদূর উন্নতি হইয়াছে, গবর্ণমেণ্টের তাহা জানিবার উপায় নাই। রেবরেণ্ড লঙ সাহেব একবার এদেশীয় মুদ্রাযন্ত্র হইতে কত পুস্তক প্রচারিত হইয়াছে, তাহার একটা তালিকা করিয়াছিলেন, তাহাও সম্পূর্ণ হয় নাই। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের যদি একটী স্বতন্ত্র পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠিত থাকিত, অন্ততঃ সকল গ্রন্থের দুই খণ্ড সেই পুস্তকালয়ে সংগৃহীত হইত, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট এদেশীয়দিগের বিদ্যাবিষয়ক উন্নতি অনায়াসে জানিতে পারিতেন সন্দেহ নাই। আমরা যেরূপ পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিতেছি, সেই ফ্রান্সে ডিপো লিগাল ও ইংলণ্ডে ব্রিটিশ মিউজিয়ম পুস্তকালয় আছে। অনেক প্রধান লোকেও ইহার আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। স্পেক্টেটর প্রভৃতি সমাচারপত্রেও ইহার আন্দোলন হইয়াছে। বিয়েনায় "ইণ্টারন্যাশনাল কন্‌গ্রেস" সভায় উইণ্টার জোন্স একবার এতদ্বিষয়ক একটী বক্তৃতা করেন। ফলতঃ আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট যেরূপ বিদ্যানুরাগী, এ কার্য্যটী তাহার অনুরূপ হইবে সন্দেহ নাই।

শিক্ষকগণের বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব। ১৬ চৈত্র ১২৭০। ২০ সংখ্যা

যাবতীয় উন্নতির মূল শিক্ষা, তদ্বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের উপেক্ষা দৃষ্ট হইলে যেমন আত্যন্তিক ক্ষোভের হয়, যত্ন দৃষ্ট হইলে তেমনি আহ্লাদের হইয়া থাকে। শিক্ষা-সংক্রান্ত কার্য্যের প্রধান অধ্যক্ষ আটকিন্সন সাহেব সম্প্রতি একটী আহ্লাদের বিষয় কাজ করিয়াছেন। শুনা গেল, তিনি গবর্ণমেণ্টের অন্য অন্য অফিসের কর্ম্মচারিদিগের ন্যায় শিক্ষক ও অধ্যাপকদিগের

শ্রেণী বিভাগ করিয়া বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব করিয়াছেন। কয়েক বৎসর কাল শিক্ষকদিগের প্রতি অনাস্থা করা হইতেছে। সুতরাং ক্রমশঃ যাবতীয় উপযুক্ত ও কার্য্যদক্ষ শিক্ষক অন্য অন্য কার্য্যালয়ে প্রবেশ করিতেছেন। বোধ হয়, ডিরেক্টর ভ্রান্তিবশতঃ ভাবিয়াছিলেন, প্রতি বৎসর যে সকল ব্যক্তি বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছেন, তাঁহাদিগের দ্বারা এ অভাব দূর করিবেন। দিন দিন তাঁহার সে ভ্রম দূর হইতেছে। বি. এ. উপাধি ধরিয়া যাবৎ উড়িতে না পারেন, তাবৎ এডুকেশন ডিপার্টমেণ্টে পড়িয়া থাকেন, পথ পাইলে আর ক্ষণকাল এখানে থাকেন না, কি আশাতেই বা থাকিবেন? শিক্ষকদিগের অদৃষ্টে সচরাচর ১৫০ টাকার অধিক ঘটে না, জেলাস্কুলের প্রধান শিক্ষকের বেতন ১৫০ টাকা মাত্র। যাঁহারা অনেক ব্যয় ও কষ্ট স্বীকার করিয়া লেখা পড়া শিখিয়াছেন, তাঁহারা কি কখন ইহাতে সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন? সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, বি. এ. উপাধিধারিরা সহজে শিক্ষকতা পদ গ্রহণ করিতে চাহেন না, যাঁহারা গ্রহণ করেন, তাঁহারা যত দিন আইনের পরীক্ষা দিতে না পারেন, তত দিন কেবল বাসা খরচের সংগ্রহার্থ শিক্ষকতা করেন। কিন্তু সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন তাহাদের বি. এল. প্রশংসাপত্র লাভ, অমনি পদত্যাগ, উভয়ই প্রায় এককালে ঘটিয়া থাকে। যাহারা অল্পদিনের নিমিত্ত তৎপদ স্বীকার করেন, তাহাদিগের হইতে সুন্দররূপে কার্য্যনির্ব্বাহের সম্ভাবনা অল্প। শিক্ষাকার্য্যের ব্যাঘাত হইতেছে। আর্টকিন্সন সাহেব এই অনিষ্ট দূর করিবার অভিপ্রায়ে এই প্রস্তাব করিয়াছেন যে, শিক্ষকদিগের প্রশংসাপত্রের অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী বিভাগ করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা ৫০ টাকার ন্যূন বেতন পান, তাহারা প্রশংসাপত্রের নির্দ্ধারিত উর্দ্ধসংখ্য বেতন যত দিন না পাইবেন, ততদিন তাহাদিগের প্রতি বৎসর ১০ টাকা করিয়া বেতন বৃদ্ধি হইবে। ৫০ টাকার উর্দ্ধ বেতন ভোগিদিগের বার্ষিক ২০ টাকা বৃদ্ধি হইবে। প্রশংসাপত্রের নিরূপিত বেতনের শেষ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইলে যাঁহারা উচ্চতর শ্রেণীর পরীক্ষা না দিবেন, তাঁহাদিগের আর বেতন বৃদ্ধি হইবে না। এই প্রকারে ৩০০ টাকার পর্য্যন্ত বেতন বৃদ্ধি হইবে। আর্টকিন্সন সাহেব আর নূতন লোক আনিবার অভিলাষী নহেন। যাহারা এই ডিপার্টমেণ্টে আছেন, তাহাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিয়া এই ডিপার্টমেণ্টে স্থির করিয়া রাখাই তাঁহার অভিপ্রেত হইয়াছে। যাঁহারা সচারুরূপে কার্য্য সম্পাদন করিয়া আপনাদিগের উপরিস্থ কর্ত্তৃপক্ষের চিত্তসন্তোষ বিধান করিতে পারিবেন, তাঁহাদিগেরই যে বেতন বৃদ্ধি হইবে, এ কথা বলা বাহুল্য।...

কৃতবিদ্য লোকেরা এডুকেশন ডিপার্টমেণ্টে থাকেন, এই আমাদিগের একান্ত ইচ্ছা। কিন্তু এক্ষণে যেরূপ বেতন ও পদবৃদ্ধির নিয়ম আছে, তাহাতে কৃতবিদ্য-দিগকে এক প্রকার তাড়ান হইয়াছে। অন্য অন্য কর্ম্মচারির সহিত শিক্ষকদিগের অনেক বৈলক্ষণ্য আছে। ইহারা যে প্রকার পরিশ্রম করেন, তাহাতে ইঁহাদিগের শরীরের যেরূপ অপকার হইবার সম্ভাবনা আছে, অন্য অন্য কর্ম্মচারির সেরূপ নাই। অপর

অনেক শিক্ষক ও পণ্ডিত যেরূপ ১৫। ২০। ৩০ বেতন পাইয়া থাকেন, এক্ষণকার কালে তদ্দ্বারা কি কোন ভদ্রলোকের চলিতে পারে? এখন সর্দ্দার মুটেরাও মাসে ১৫।২০ টাকা উপার্জ্জন করিয়া থাকে। ছাত্রগণের নিকটে শিক্ষকদিগের মানসম্ভ্রম থাকাও অতিশয় আবশ্যক। বেতন ন্যূন হইলে সেই মান সম্ভ্রমের অনুরোধেও শিক্ষকদিগের বেতন বৃদ্ধি করা আবশ্যক।

শিক্ষকদিগের বেতন বৃদ্ধি। ৮ আষাঢ় ১২৭১। ৩২ সংখ্যা

কিছুদিন অতীত হইল আমরা পাঠকবর্গের গোচর করিয়াছিলাম, আটকিন্সন সাহেব শিক্ষকদিগের শ্রেণীবদ্ধ করিয়া বেতন বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত তৎ-সংক্রান্ত কোন কাগজপত্র প্রকাশ হয় নাই, তাহাতে অনেকে এ প্রস্তাবের প্রতি সন্দিহান হইয়াছেন, কিন্তু যে কারণে এ প্রস্তাব করা হইয়াছে, এবং আমরা যত দূর ইহা জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে ইহা সন্দেহের বিষয় নহে, ক্রমে তাহা উল্লিখিত হইতেছে।

পাঠকগণের সংশয় দূর করাই অদ্য আমাদিগের এ বিষয়ে পুনরায় হস্তক্ষেপ করার উদ্দেশ্য। কয়েক বৎসরাবধি দেখা যাইতেছে, ইউরোপ হইতে প্রধানকল্প কৃতবিদ্য লোকেরা এদেশের শিক্ষাকার্য্যে নিয়োজিত হইয়া আসিতে অসম্মত নহেন। এক্ষণে যে সকল ইউরোপীয় কালেজ ও প্রধান প্রধান বিদ্যালয়ে অধ্যাপক ও শিক্ষকতা পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাঁহারা মধ্যবিত্ত লোক মাত্র। উপযুক্ত লোকের অভাবে হাণ্ড সাহেব বহরমপুর ও ব্রেণাণ্ড সাহেব ঢাকা কালেজের অধ্যক্ষতা পদপ্রাপ্ত হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট এ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে উদাসীন ছিলেন। গত বৎসর পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট লাহোরের কালেজের জন্য কয়েকজন শিক্ষকের নিমিত্ত কেম্ব্রিজ ও অক্সফোর্ডে লিখিয়া পাঠান। কিন্তু তত্রত্য কর্ত্তৃপক্ষ বলেন, কৃতবিদ্যগণ ভারতবর্ষে যাইতে সম্মত নহেন। যাঁহারা শিক্ষাকার্য্যে নিয়োজিত হন, তাঁহাদিগের বেতন অতি অল্প তাঁহাদিগের উন্নতিলাভেরও সবিশেষ সম্ভাবনা নাই। এতদূর আসিয়া একবিধ বেতনে জীবন ক্ষেপণ করিতে কাহার বা ইচ্ছা হইবে? আটকিন্সন সাহেব প্রেসিডেন্সি কালেজের জন্য লিখিয়া ঐ প্রকার উত্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাতেই ডিরেক্টর এবং গবর্ণমেণ্টের চৈতন্য হইয়াছে। কেবল ইউরোপীয় শিক্ষক বলিয়া নন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতবিদ্য ছাত্রগণ অন্য উপায় থাকিতে কোনরূপে শিক্ষক পদ স্বীকার করেন না। যে সমস্ত পুরাতন ও উপযুক্ত শিক্ষক ছিলেন, তাহারাও ক্রমশঃ অন্য চেষ্টা পাইয়া অবসৃত হইতেছেন। এই শোচনীয় কারণের দূরীকরণ নিমিত্ত আটকিন্সন সাহেব বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব করিয়াছেন। সর চারলস উডও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় জানিবার অভিপ্রায়ে ইংলণ্ড হইতে ঐ প্রকার প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ সর চারলস উডের পত্র এবং আটকিন্সন

সাহেবের কৃত প্রস্তাব ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অফিসে পহুঁছিবার পূর্ব্বে গবর্ণর জেনরল সিমলার শৃঙ্গে উপবিষ্ট হইয়াছেন। এই কাগজপত্রগুলি তাঁহার নিটে প্রেরিত হইয়াছে, তিনি আজিও ইহার মীমাংসা করিবার অবসর প্রাপ্ত হন নাই।

এই প্রস্তাব গ্রাহ্য হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। যখন কেরাণীদিগের শ্রেণী বন্ধন হইয়াছে, এবং গবর্ণমেণ্ট কৃতবিদ্য ও উপযুক্ত কেরাণী পাইবার আশায় অধিকতর বেতন-দান স্বীকার করিয়াছেন, তখন যে ব্যক্তিদিগের উপবে সেই কৃতবিদ্য লোক প্রস্তুত করিবার ভার সমর্পিত হয়, তাঁহাদিগের বেতন বৃদ্ধি করা যে অবশ্য কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সংশয় নাই। তবে ভারতবর্ষে শিক্ষক ও চিকিৎসকদিগের বেতন বৃদ্ধি করিবার প্রথা নাই, এই এক কথা হইতেছে। কিন্তু যাহাতে গবর্ণমেণ্টেব এই রোগটিব প্রতীকার হয়, তদ্বিষয়ে সাধাবণের যত্নবান হওয়া উচিত।

বাঙ্গালাভাষার উন্নতি প্রস্তাব। ১২ ভাদ্র ১২৭১। ৪৩ সংখ্যা

বহুকাল অতীত হইল, বাঙ্গালাদেশের ও বাঙ্গালাভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু আজিও বাঙ্গালাভাষার সম্যক্ উন্নতি বহুদূরে আছে। প্রয়োজন-জ্ঞানবিরহই ইহার কারণ। প্রয়োজন জ্ঞান আবিষ্ক্রিয়া ও উন্নতি উভয়ের প্রসূতি। পুর্ব্বে এদেশে সংস্কৃত ভাষার একাধিপত্য ছিল। সংস্কৃত জ্ঞান ঐহিক ও পারত্রিক উভয়বিধ মঙ্গলের কারণ বলিয়া সংস্কার থাকাতে লোকে তাহাতেই সবিশেষ আগ্রহসহকাবে প্রবৃত্ত হইতেন। শাস্ত্রানুসারে যাহাদিগের সংস্কৃতে অধিকার ছিল না, তাঁহাবাই কেবল বাঙ্গালাভাষার অনুশীলন করিতেন, তাহাও অতি সামান্যরূপ। কথঞ্চিৎ বিষয়কর্ম্ম সম্পাদনের উপযোগিনী শিক্ষা হইলেই তাঁহারা পর্য্যাপ্ত জ্ঞান করিতেন। মুসলমানদিগেব অধিকার সময়ে রাজভাষা শিক্ষা অর্থকরী বলিয়া অনেকে পারস্যভাষাব অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন। এক্ষণে ইংরাজীভাষা সমুদায়কে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। লোকে দেখিতে পাইতেছেন, ইংরাজী শিখিলে উচ্চপদ মানসম্ভ্রম ও সুখসৌভাগ্যের বৃদ্ধি হয়, সুতরাং সেই দিকে সকলে ধাবমান হইয়াছেন। সাধারণ লোকের এইরূপ স্বভাব দেখিতে পাওয়া যায়, আপাতফল দেখিয়াই কার্য্য কবিয়া থাকেন। পরিণামদর্শির সংখ্যা অতি অল্প। ভাষার উন্নতি ব্যতিরেকে কখন কোন জাতিব উন্নতি হয় না। ভাষার উন্নতিই মানুষের শরীর, মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের উন্নতির মূল। ভাষার উন্নতি ব্যতিরেকে ধর্ম্ম, ধর্ম্মনীতি, স্বদেশানুরাগ প্রভৃতি কোন গুণই বিশুদ্ধি লাভ করিতে পারে না। ভাষার যে এত গুণ আছে, সাধারণ লোকে তাহা বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা আপাতফল দর্শনে মোহিত হন। মোহিত হইয়াই অনেকে বাঙ্গালা-ভাষায় একান্ত উপেক্ষা করিয়া স্ব স্ব সন্তানদিগকে এককালে ইংরাজীতে হাতেখড়ি দিয়া থাকেন। এটী বাঙ্গালাদেশের অদৃষ্টের সামান্য বিড়ম্বনা নয়। এই বিড়ম্বনা দোষেই

আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, অনেকে বাঙ্গালাভাষার প্রতি নিতান্ত অনুরাগ শূন্য হন। অধিক কি, তাঁহারা সেই শৈশবকালের অভ্যাসদোষে বাঙ্গালাদেশের যাবতীয় বিষয়েরই বিদ্বেষী হইয়া এককালে আস্তসাহেব হইয়া উঠেন। অধিকতর দুঃখের বিষয় এই, তাঁহারা সাহেবদিগের গুণগুলি অধিকার করিতে পারেন না, দোষগুলি একচেটিয়া করিয়া লন! পিতামাতা শেষে পরিতাপিত হন। কিন্তু তখন অসময়, তখন প্রতীকারের অপরিণামদর্শন ও অতিলোভ দোষেই এই অনিষ্টের ঘটনা হয়। আজি আমরা এতন্নিবারণের একটী উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছি, গবর্ণমেণ্ট ও কৃতবিদ্যদিগের এ বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান হওয়া উচিত।

কি সাহায্যকৃত বিদ্যালয়, কি গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয় সকল স্থানের নিমিত্তই গবর্ণমেণ্ট এই নিয়ম করুন যে বালক ১২ বৎসর বয়স পর্যন্ত কোন বিদ্যালয়ে বাঙ্গালা শিক্ষা না করিবে, তাহাকে ইংরাজী স্কুলে প্রবেশিত করা হইবে না। এক্ষণে বাঙ্গালা প্রবেশিকা পরীক্ষার্থ যে সমস্ত পুস্তক নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার কতক কমাইয়া দিয়া পাঠ্যপুস্তক নির্ণয় করিয়া দিলেই চলিবে। এই নিয়ম হইলে বালকেরা যদি ১২ বৎসর পর্য্যন্ত বাঙ্গালা শিক্ষা করে, তাহার প্রতি মায়া ও অনুরাগ জন্মিবে সন্দেহ নাই। বয়োবৃদ্ধি সহকারে সেই অনুরাগের হ্রাস না হইয়া যে উত্তরোত্তর তাহার বৃদ্ধি হইবে, মানুষের স্বভাব দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হইতেছে। শৈশবকালে যে বিষয়ের সহিত অধিকতর ঘনিষ্টতা হয়, তাহার প্রতি দৃঢ়তর মমতা জন্মে। সে মমতা সহজে বিস্মৃত হওয়া যায় না।

এই নিয়ম হইলে আরো দুটী মহৎ ইষ্টলাভ হইবে, দ্বিতীয়, অল্পে অধিক ও উৎকৃষ্ট শিক্ষা হইতে পারিবে। পঞ্চমবর্ষবয়স্ক বাঙ্গালি শিশুকে ইংরাজী শিখিতে দিলে বিদেশীয় ভাষা বলিয়া তাহার শিখিতে যেরূপ কষ্ট হয়, বাঙ্গালা শিক্ষায় মাতৃভাষা বলিয়া তাহার অর্দ্ধেক কষ্ট হওয়া সম্ভাবিত নহে। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, যে সকল বালক বাঙ্গালা বিদ্যালয় হইতে ভাল করিয়া বাঙ্গালা শিখিয়া আইসে, তাহারা ইংরাজী অথবা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে অন্য অন্য বালকদিগকে অনেক পশ্চাতে নিক্ষেপ করে। পশ্চাতে ফেলিবার বিশিষ্ট কারণও আছে। যাহাকে প্রকৃত বিদ্যা বলে, যে ভাষায় শিক্ষা কর, তাহা সর্ব্বত্র সমান। অঙ্ক, ভূগোল ও পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি যে ভাষায় শিক্ষা করা যাইবে, সকলেতেই সমান ফলোপধায়িনী হইবে। যাহারা বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে ঐগুলি শিখিয়া আইসে, তাহাদিগের আর ঐ সকল নূতন শিখিতে হয় না। তাহাদিগের কেবল ভাষা মুখস্ত করিতে পারিলেই হইল। পক্ষান্তরে, যাহাদিগকে ঐ সকল বিষয় ও ভাষা-উভয় শিক্ষা করিতে হয়, তাহারা উহাদিগের তুল্যকক্ষ হইবে তাহা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে।

উপসংহারকালে আমরা ইনস্পেক্টর ও এদেশীয় কৃতবিদ্যদিগকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা এ বিষয়ে বিশিষ্টরূপে যত্নশীল হউন। এ বিষয়ের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ভার তাঁহাদিগের হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে।

কলিকাতা মেডিকাল কালেজ ও তাহার উত্তীর্ণ ছাত্রগণ। ২১ ভাদ্র ১২৭১। ৪৩ সংখ্যা

বহুকাল হইল, কলিকাতায মেডিকাল কালেজ হইয়াছে, কিন্তু যদি কেহ এরূপ জিজ্ঞাসা করেন, ইহা দ্বারা কি অভীষ্টফল লাভ হইয়াছে? এতদুত্তরে অনেকে বলিবেন "কেন? বহু সংখ্যক ছাত্র উত্তমরূপে চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা করিয়া গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে স্বয়ং স্বাধীন হইয়া চিকিৎসা করিয়া স্বদেশবাসীদিগের বিস্তর উপকার করিতেছেন। পূর্ব্বে অজ্ঞ কবিরাজেরা নিদানের কয়েক পত্র উলটাইয়া চিকিৎসা করিতেন, শরীরতত্ত্ব, ব্যবচ্ছেদবিদ্যা প্রভৃতির সহিত তাঁহাদিগের সন্দর্শন ছিল না, মেডিকাল কালেজের ছাত্রগণ এ সমুদায় শিক্ষা করিয়াছেন" এই উত্তর অনেকাংশে প্রীতিকর সন্দেহ নাই। মেডিকাল কালেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণের নিকটে সর্ব্বসাধারণে চিকিৎসা বিষয়ে ঋণী আছেন, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন কিন্তু আর একটী প্রশ্ন হইতেছে, এই সকল ব্যক্তির নিকটে বিজ্ঞান কতদূর ঋণী হইয়াছেন? মেডিকাল কালেজের কোন ছাত্র এ পর্য্যন্ত কোন নূতন ঔষধ প্রকাশ, বিজ্ঞানের কোন নূতন নিয়ম স্থাপন অথবা কোন নূতন আবিষ্ক্রিয়া করিতে সমর্থ হইয়াছেন? এ পর্য্যন্ত কালেজের ছাত্রগণ এই ভাবিয়া আসিতেছেন, নির্দ্দিষ্ট পুস্তকগুলি পাঠ করিয়া প্রশংসাপত্র পাইয়া চিকিৎসা আরম্ভ করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে পারিলেই চিকিৎসকের শ্রম ও জীবন সার্থক হইল। বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়াই তাঁহারা কেবল "দর্শনী টাকার" দিকেই দৃষ্টিপাত করেন। শিক্ষার শেষ প্রায় সেই অবধি হয়; যাঁহাদিগের পাঠের অভ্যাস আছে তাঁহারাও কেবল ইউরোপের প্রধান প্রধান জীবিত গ্রন্থকার ও চিকিৎসকদিগের কার্য্যবিবরণ ও অভিপ্রায়গুলি পাঠ করেন এই মাত্র। তাঁহারা নিজে চিকিৎসক, চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতিসাধন করা তাঁহাদিগের প্রধান কর্ত্তব্য-কর্ম্ম। দেশের যাবতীয় উদ্ভিজ্জ দর্শন ও সেই সকলের দ্বারা ঔষধের কতদূর শ্রীবৃদ্ধি-সাধন হইতে পারে, এই সকল চেষ্টা করা যে তাঁহাদিগের কর্ত্তব্যকর্ম্ম, তাহা তাঁহাদিগকে বলিয়া দিতে হয় না, কিন্তু কার্য্য কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। ইউরোপীয় ডাক্তরেরা আমাদিগের নিদানশাস্ত্র ও উদ্ভিজ্জসংক্রান্ত গ্রন্থ জানিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়াছেন, কিন্তু মেডিকাল কালেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণ নিশ্চিন্ত হইয়া আছেন। ইহা কি নিন্দার বিষয় নহে? এ পর্য্যন্ত কয় জন ছাত্র নিদান পাঠ করিয়াছেন? কয়জন পূর্ব্বতন চিকিৎসা-প্রণালী অবগত হইয়া দ্রব্য সকলের পরীক্ষা এবং রসায়ন বিদ্যাবলে যে সমুদায় দ্বারা চিকিৎসাকার্য্যের আনুকূল্য করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন? সমুদায় ভারতবর্ষের মধ্যে কেবল মান্দ্রাজে এক একখানি চিকিৎসাসংক্রান্ত গ্রন্থ মধ্যে মধ্যে বাহির হয়। কয়জন এতদ্দেশীয় সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন তাহাতে লিখিয়া থাকেন? কোন্ বিষয়ে না ইঁহারা ইউরোপীয় চিকিৎসকদিগের উপর নির্ভর করেন? মেডিকাল কালেজ নূতন হয় নাই যে "আমরা এই প্রথম আরম্ভ করিয়াছি মাত্র" এই আলস্য ভূষিত উত্তরদান দ্বারা আমাদিগের তৃপ্তি সম্পাদন

করিবেন। তাঁহারা যদি যথার্থ চিকিৎসকের যশঃপ্রার্থী হন, তাহা হইলে যাহাতে আপনাদিগের দেশের বিজ্ঞানের উন্নতি হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান হউন।

এস্থলে আর একটী কথার উল্লেখ করা নিতান্ত আবশ্যক হইতেছে। উক্ত ছাত্রগণ আমাদিগের কথায় অন্যায় ক্রোধ অথবা অভিমান না করিয়া স্থিরচিত্তে আমাদিগের বাক্যের উদ্দেশ্যটী গ্রহণ করেন, এই আমাদিগের প্রাথমিক অনুরোধ। সর্ব্বসাধারণের এই একটী সংস্কার জন্মিয়াছে, ডাক্তর মাত্রেই মাতাল হইয়া থাকেন, এই সংস্কার অমূলকও নহে। আমরা বিলক্ষণ জানি ২।৪ জন ব্যতিবেকে প্রায় সকলেই এই দোষে দূষিত। সেদিন একজন এই দোষে প্রাণ হারাইয়াছেন। মাতাল হইলে চরিত্রদোষেরও বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। চিকিৎসক, শিক্ষক ও ধর্ম্মযাজক ইহাদিগের চরিত্রদোষ অত্যন্ত অনিষ্টকর। ইহাঁদিগের উপরে লোকের অত্যন্ত বিশ্বাস আবশ্যক হয়। কিন্তু মাতাল ও দূষিত চরিত্র হইলে সে বিশ্বাসের সম্ভাবনা কি?

এদেশীয় শিক্ষকেরাই কি এত অপরাধী। ৬ বৈশাখ ১২৭২। ২২ সংখ্যা

আমারা গত বৎসর লিখিয়াছিলাম, শিক্ষকদিগের কেরাণীদিগের ন্যায় শ্রেণীবন্ধন ও প্রতি বৎসর পর্য্যায়ক্রমে বেতন বৃদ্ধি হইবে, এইরূপ একটী প্রস্তাব হইতেছে। যিনি আমাদিগকে সংবাদ দেন, বিদেশীয় অথবা ইউরোপীয় শিক্ষকের বিষয়ে নিয়ম হইতেছে, তাহা বিশেষ করিয়া বলেন নাই, আমাদিগেরও ঐ বাক্যে সংশয় জন্মে নাই। সংশয় জন্মিবারও কোন কারণ তৎকালে আমাদিগের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই, প্রত্যুত ইহার অনুকূল কারণই তৎকালে আমাদিগের বুদ্ধিপথে উপস্থিত হইয়াছিল। এদেশীয় মুন্সেফদিগের ন্যায় এদেশীয় শিক্ষকেরা পর্য্যাপ্ত বেতন পান না। অথচ তাঁহাদিগের খাটুনী ও পরিশ্রমের ত্রুটি নাই। ইহা কি বেতন বৃদ্ধির শ্রেণীবিভাগ না থাকিলে ভাল শিক্ষক পাওয়া যায় না, ইউরোপীয় শিক্ষকের বিষয়ে এ কারণ যেমন বলবান্ এদেশীয় অন্যত্র সুবিধা হইলে কেহ শিক্ষকতা স্বীকারে সম্মত হন না। বিশেষতঃ কি এদেশীয় কি বিদেশীয় শিক্ষকরূপে উভয়ই সমান। তুল্য পদাবলম্বী ব্যক্তিদিগের প্রতি সপক্ষপাত ব্যবহার করিয়া শিক্ষাসমাজ হইতে পক্ষপাতিতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইবে, আমরা ভ্রমেও এরূপ মনে করি নাই। যাহা হউক, আমরা এক্ষণে শুনিয়া চমৎকৃত হইলাম, আটকিন্সন সাহেব শিক্ষকদিগের বেতন বৃদ্ধি করিবার যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহা এতদ্দেশীয় কোন শিক্ষক দুই বৎসর পুর্ব্বে ৩০০ টাকার অধিক বেতন পান নাই। এক্ষণেও দুই ব্যক্তি মাত্র ৪০০ টাকা পাইয়া থাকেন। আটকিন্সন সাহেবের প্রস্তাবানুসারে গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন যে সকল অধ্যাপক ৫০০ টাকার অধিক বেতন পান তাঁহাদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইবে। তৃতীয় শ্রেণীর উচ্চতম বেতন ৭০০ টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণীর উচ্চতম বেতন ১০০০ টাকা, ও প্রথম

শ্রেণীর ১৫০০ টাকা স্থির হইয়াছে। তৃতীয় শ্রেণীর অধ্যাপকদিগের প্রতি বৎসর ৫০ টাকা করিয়া বেতন বৃদ্ধি হইবে। গুণ প্রদর্শন করিতে পারিলে তাঁহারা ক্রমশ উচ্চ শ্রেণীভুক্ত হইবেন। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ অধ্যাপকগণ প্রতি বৎসব এক শত টাকা করিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবেন। ১৫০০ টাকা আপাততঃ শেষ সীমা হইল, গুণ প্রদর্শন করিলে ইনস্পেক্টবদিগেরও বেতন বৃদ্ধি হইবে। আমবা কায়মনোবাক্যে এই নিয়মের অনুমোদন করিতেছি। বেতন অল্প ওদিকে যাবতীয় ব্যবহার্য্যদ্রব্য দুর্ম্মূল্য হওয়াতে ইংলণ্ড হইতে উপযুক্ত লোক অধ্যাপক পদ স্বীকাব করিয়া এখানে আসিতে চাঁহেন না। আমাদিগের যে এ প্রকার লোকেব অতিশয় প্রয়োজন, তাহা সকলেই স্বীকাব করিবেন। যাহাতে ইঁহাবা এদেশে আগমন করেন, সে উপায় করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু নিম্নস্থ শিক্ষকগণ কি দোষ করিলেন, এই সকল পদে প্রায় এদেশীয়েরাই নিযুক্ত আছেন। নিম্ন শ্রেণীব শিক্ষকদিগকে যে হনুমন্ত খাটুনি খাটিতে হয, তাহা কেনা জানেন? ইঁহাদিগেব নিকটেই শিক্ষাবিভাগ অধিকতব ঋণী। এ বিভাগে এই দলের লোকই অধিক। গবর্ণমেণ্টেব যাবতীয় আফিসেব কেবাণীদিগেব প্রতিবৎসব বেতন বৃদ্ধি হইতে চলিল। কেরাণীদিগের অনেক সিসিবোকে আলেকজাণ্ডাবেব পিতা ও বাবর সাহেবকে দোস্ত মহম্মদ খাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া স্থির কবিয়া রাখিয়াছেন। তাহাবা বৰ্দ্ধিত বেতনেব পাত্র হইলেন: আর শিক্ষকদিগেব শিবঃপীড়া, ক্ষযকাশ ও অকালবার্দ্ধক্য পুরস্কাব হইল। ইঁহাদিগেব সচবাচব বেতন ২০।২৫।৫০।১০০।১৫০ টাকা। যাঁহাব বড ভাগ্য প্রসন্ন, তিনিই কেবল অন্তস্পলেব কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ৩০০ টাকা পান। খাদ্যদ্রব্য দুর্ম্মূল্য হইযাছে বলিয়া কেবাণীদিগের বেতন বৃদ্ধি হইতেছে। শিক্ষকদিগের বিষযে কি দ্রব্যেব দুর্ম্মূল্যতা নাই? গবর্ণমেণ্ট কি মনে করেন শিক্ষকেবা অল্প পযসায অধিক দ্রব্য পাইযা থাকেন?

গবর্ণমেণ্টেব এ কার্য্যটী অতিশয অনিষ্টেব মূল হইবে। সব চার্লস্ ট্রিবিলিযান যে আয়ব্যয বৃত্তান্ত বর্ণন করিযাছেন, তদ্দ্বারা জানা যাইতেছে ১৮৬৪।৬৫ অব্দে শিক্ষাকার্য্যে ৫৮ লক্ষ টাকা দেওয়া হয, তাহাব সমুদায ব্যয হয নাই। এবাব ৬২ লক্ষ টাকা দেওয়া হইযাছে। উপায থাকিতে কি জন্য শিক্ষকদিগের বেতন বৃদ্ধি হইবে না আমরা তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। এক্ষণে বিশ্ববিদ্যালযেব পরীক্ষোত্তীর্ণ প্রায যাবতীয ছাত্র আইন ও অন্য অন্য ব্যবসায অবলম্বন করিতেছেন। যাহাদিগেব কোন উপায নাই এবং টাকা না হইলে অন্ন হয না, তাঁহারাও সুযোগ পাইলে এই অকৃতজ্ঞ বিভাগ পবিত্যাগ করিয়া যান। বিদ্যাশিক্ষাব উপর আমাদিগেব দেশেব মঙ্গল নির্ভর করিতেছে। কিন্তু শিক্ষকদিগের প্রতি এ প্রকাব অসদ্ব্যবহার করা হয, তাহা হইলে এ মঙ্গলেব আশা ফলহীন হইবে। আমরা অবগত হইলাম প্রেসিডেন্সি কালেজেব অধ্যক্ষ হিন্দু ও কলুটোলা স্কুলেব শিক্ষকদিগের বেতন বৃদ্ধি করিবার চেষ্টায় আছেন। এটী উচিত চেষ্টাই হইতেছে। এই দুই বিদ্যালয়ের বেতন বৃদ্ধি হইলেই যে যথেষ্ট হইল, আমরা এরূপ মনে করি না

মফস্বলেব প্রধান ও নিম্নস্থ শিক্ষকগণ ও ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টরদিগের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করা উচিত।

স্ত্রীবিদ্যাশিক্ষা। ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৭১। ২৭ সংখ্যা

স্ত্রীশিক্ষার বান্ধবগণ সর্ব্বদা আমাদিগকে এ বিষযে স্বদেশীয়দিগের চিত্তকে আকর্ষণ কবিবার নিমিত্ত অনুরোধ কবিযা থাকেন। সেই অনুবোধবশবর্ত্তী হইয়া অদ্য এ বিষয়ে আমাদিগকে হস্তক্ষেপ কবিতে হইতেছে। এ দেশেব অবলাগণ বিদ্যাশিক্ষা করিলে যে যে বিষয়ের উন্নতি হয় এবং তাহাব অভাবে যে কত অপকাব হইতেছে তাহা একাল পর্য্যন্ত অনেকে বর্ণন করিতে ত্রুটি করেন নাই। অতএব ঐ পুবাতন বিষয়েব আন্দোলন করা বিফল। তবে এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে বলীরাজা একশত মূর্খ লইয়া স্বর্গ গমন কষ্টকব বিবেচনা কবিযাছিলেন। আমবা স্ত্রী কন্যা প্রভৃতি সহস্র সহস্র মূর্খ বেষ্টিত হইযা যে এই মর্ত্ত্যলোকে সুখী হইব ইহা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। ইহার কিছুদিন পুর্ব্বে স্ত্রীগণেব বিদ্যাশিক্ষা দূব থাকুক, তাহাব নামোল্লেখ কবিলেও নিস্তাব থাকিত না। এক্ষণে তাহাব বহু বিপর্য্যয় হইযাছে।

স্ত্রীগণের বিদ্যা শিক্ষাব নিমিত্ত এখন অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি যত্ন পাইতেছেন, কিন্তু যে কয়েকটী প্রতিবন্ধক থাকাতে তাহাবা আশানুরূপ ফললাভে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।

১। এদেশের পুরুষেরা অদ্যাপিও ভাল কবিযা লেখা পড়া শিখিতে পারেন নাই। সুতবাং যাহারা এদেশীয় অবলাগণেব হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা ও তাহাবা যখন স্বযং শিক্ষিত হইতে পাবিলেন না, তখন অন্যকে কেমন কবিযা শিক্ষিত কবিবেন?

২। বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকাতে বালিকাবা অধিকদিন বিদ্যালযে থাকিয়া শিক্ষা পায় না। সুতবাং অল্পবিদ্যা সবিশেষ ফলোপধায়িনী হয না।

৩। অল্প বেতনেব লোকদ্বারা শিক্ষাকার্য্য সুন্দবরূপে সম্পন্ন হয় না, দুর্ভাগা বালিকাগণেব অদৃষ্টে প্রায তাহাই ঘটিযা উঠে। ইহা সামান্য প্রতিবন্ধক নয।

৪। অল্পমাত্র শিখিতে ২ বালিকাদিগকে শ্বশুবালযে গমন করিতে হয়। সেখানে গিয়া গৃহকার্য্যে এমনি ব্যাপৃত হইতে হয যে পুর্ব্বে যে কিছু শিক্ষালাভ হয তাহা বিস্মৃতিসাগরে মগ্ন হইয়া যায়। বিশেষতঃ এদেশে জাত্যভিমান ও বিবাহ প্রণালীগত দোষ থাকাতে প্রায় অনেকেই উপযুক্ত পাত্রেব হস্তগত হয় না, সুতরাং তৎকালে আলোচনার অভাবে তাহার বিবাহের পুর্ব্বে যে যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা হয়, তাহা বৃথা হইয়া যায়।

৫। অনেকে ইউরোপীয় স্ত্রীগণকে বিদ্যাবতী দেখিয়া এদেশীয় স্ত্রীগণের প্রতি ঘৃণা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহাদিগের ইহা মনে করা উচিত ইউরোপে আমাদিগের দেশের

ন্যায় প্রত্যেক বাটীতে পাকশাকের ব্যাপার নাই। তথাকার লোক প্রায় সকলেই হোটেল হইতে খাদ্য আনাইয়া আহার করে। সমাজের গুণে অনেক বিষয়ে সুবিধা আছে। এখানে সে সকল সুবিধা নাই, জাত্যভিমান প্রবল থাকাতে সে সকল সুবিধা হইবারও অনেক বিলম্ব আছে।

এক্ষণে যাঁহারা বালিকাদিগকে লেখা পড়া শিখাইবার চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা সমবেত হইয়া ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বোক্ত কয়েকটী প্রতিবন্ধকের উন্মূলনের উপায় অনুসন্ধান করুন।

মিস্ কার্পেন্টর। ১৯ অগ্রহায়ণ ১২৭৩

১

এস এস বিদেশিনী! বহুদিন তরে
রয়েছি আমরা তব আশাপথ চেয়ে,
কি বলিব!! মনোগত জানাব কি বলে
আনন্দে অধীর বঙ্গ আজি দেখা পেয়ে।

২

তরিয়া অপার সিন্ধু, ছাড়িয়া ভবন
সুখের জনমভূমি করি পরিহার,
এ বিদেশে একাকিনী কিসের কারণ?
কিবা আছে দয়াবতি! হৃদয়ে তোমার?

৩

"অভাগিনী বঙ্গবালা অজ্ঞান আঁধারে
কারাগারে নিরুপায় জীবন হারায়!!'
শুনে কি স্নেহের ভরে সাগরের পারে
আসিয়াছ বঙ্গ সখি! উদ্ধারিতে তায়?

৪

ভগিনীর দুঃখ শুনে কাঁদিছে হৃদয়?
এসেছ মুছিতে তার নয়নের জল?
ঠেলেছ চরণে সুখ হেলিয়াছ ভয়
এসেছ সকল ফেলে হইয়া পাগল?

৫

বল না তোমারে সুখে কিবা উপহার
দিবে আজি গুণবতি! বঙ্গবাসি জন?
ভক্তিগুণে প্রীতিপুষ্পে গাঁথিয়াছি হার
বিমল হৃদয়ে কর হৃদয়ে ধারণ।

৬

ভাই বন্ধু হতে তুমি লইয়া বিদায়
আসিয়াছ আমাদের হিতের কারণ,
আপন হৃদয়ে বঙ্গ রাখিবে তোমায়
"দিদি" বলে ডাকিবেক বঙ্গবালাগণ।

১৮৬৬ }
২৭এ নবেম্বর } ভবানীপুর

যদি কোন মহোদয় এই কয় পংক্তি ইংরাজী পদ্যে অনুবাদ করিয়া কোন প্রকাশ্য পত্রিকাতে প্রকাশ করেন তাহা হইলে উপকৃত হইব।

স্ত্রীনর্ম্মাল বিদ্যালয়। ৩ পৌষ ১২৭৩

চিঠি

যাহারা সমাজের উৎকর্ষ সাধন করিতে যান, তাঁহাদিগের ভাব অতি গুরুতর, অবিচলিতচিত্ততা বুদ্ধিরস্থিরতা এবং দেশ ও দেশের অবস্থার স্বরূপজ্ঞান একান্ত আবশ্যক। সংস্করণচেষ্টা নিষ্ফল হইলে যে অনিষ্ট নিবারণের কল্পনা হয়, তাহার আরও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। পুর্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়া অধিকতর ঔৎসুক্য প্রদর্শন সমাজ-সংস্কারকারির অকৃতার্থতার প্রধান কারণ। ফরাসী বিপ্লবকারিরা উচ্চতম শ্রেণীর হস্ত হইতে সমুদায় লোকের হস্তে দেশ শাসনের ক্ষমতা দিবার চেষ্টা পান। বুঝিয়া চলিলে এ উদ্দেশ্য সাধিত হইত কিন্তু আত্যন্তিক ঔৎসুক্য নিবন্ধন তাঁহারা অকৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন আমাদিগের বর্ত্তমান সমাজ সংস্কারকারিরা এই দোষে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না।

মিস্ মেরি কার্পেণ্টর এতদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের অবস্থার উৎকর্ষ সাধনার্থ বৃদ্ধ বয়সে এদেশে আগমন করিয়াছেন। তাহার চেষ্টা অতি প্রশংসনীয় এবং আমরা স্বদেশীয়দিগের প্রতিনিধিস্বরূপ তাঁহাকে অকৃত্রিম ধন্যবাদ দিতেছি। মিস্ কার্পেণ্টরের সম্মানার্থ সম্প্রতি কয়েকটি সভা হয়। ইহার অনেকগুলিতে ভোজ হয় এবং এতদ্দেশীয় কয়েকজন যুবক ব্রাহ্ম সস্ত্রীক হইয়া অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। সেদিন কলিকাতার ব্রাহ্ম সমাজ বাটীতে মিস কার্পেণ্টর আগমন করেন। ততকালে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাবু কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি কয়েকজন ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। তথায় এই প্রস্তাব হয়, এতদেশীয় স্ত্রীশিক্ষক প্রস্তুত করিবার জন্য নর্ম্মাল বিদ্যালয় করা আবশ্যক এবং তদর্থ গবর্ণমেণ্টের নিকটে আবেদন করা উচিত, এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ এক কমিটী নিযুক্ত করা হয়, বিদ্যাসাগর তন্মধ্যে একজন ছিলেন। তথায় এই প্রস্তাব হয়, আমরা যখন প্রথমতঃ এই

প্রস্তাব শ্রবণ করি, তখন আশ্চর্য্য বোধ করিয়াছিলাম। কাহার দ্বারা এ প্রস্তাব হইয়াছে? দেশের কি ইহা অনুমোদনীয়? বর্ত্তমান অবস্থায় কি ইহা সঙ্গত? এতদনুসারে কি কাজ হইতে পারে? আমরা আপনাআপনি এই প্রশ্ন করিলাম, কিন্তু ইহার তুষ্টিকর উত্তর প্রাপ্ত হইলাম না। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্ত্রীশিক্ষার একজন প্রধান উদ্যোগী। বঙ্গদেশে তাঁহার ন্যায় কেহই এবিষয়ে অধিক কাজ করিতে পারেন না। তিনি হঠাৎ এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন, শুনিয়া আমরা আরও আশ্চর্য্যবোধ করিয়াছিলাম। কিন্তু গত সোমবারের হিন্দু পেট্রিয়টে বিদ্যাসাগরের এক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে লিখিত হইয়াছে তিনি প্রস্তাবিত প্রস্তাবে লিপ্ত থাকিতে সম্মত নহেন। এটি বুদ্ধির কাজ হইয়াছে, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

মিস্ কার্পেণ্টর বঙ্গদেশের বালিকাবিদ্যালয়ের অবস্থা দর্শন করিয়া সন্তুষ্ট হন নাই। অসন্তোষের প্রধান কারণ এই প্রায় যাবতীয় বিদ্যালয়ে স্ত্রীশিক্ষকের স্থলে তিনি পুরুষ শিক্ষক দেখিয়াছেন। স্ত্রীলোকদিগের মনের গতি পুরুষে সম্যকরূপে বুঝিতে পারেন না, এবং স্ত্রীশিক্ষকের দ্বারা বালিকাদিগের যে প্রকার শিক্ষা হইবার সম্ভাবনা আছে, পুরুষের দ্বারা তাহা নাই। কিন্তু এস্থলে আমরা মূল নিয়ম মাত্রের উল্লেখ করিলাম। এক্ষণে দেখা উচিত এদেশের যে অবস্থা তাহাতে স্ত্রীশিক্ষক অথবা পুরুষশিক্ষকের দ্বারা অধিক কাজ হয়? দ্বিতীয়তঃ স্ত্রীশিক্ষকের কার্য্যারম্ভের কাল আসিয়াছে কিনা? এবং নর্ম্মাল বিদ্যালয় স্থাপিত করা দূর সাধ্যায়ত্ত ও সঙ্গত? শিক্ষকের যে প্রকার বিদ্যা সংস্বভাব ও শিক্ষা দিবার পটুতা আবশ্যক তাঁহার প্রতি ছাত্রের ভয় ও ভক্তিও সেইরূপ আবশ্যক। ইহা না হইলে শিক্ষকের অন্য সকল গুণ বৃথা হয়। তরুণবয়স্ক ছাত্রগণ কেবল স্নেহে বশীভূত হয় না, মূল নিয়ম প্রিয়ব্যক্তিরা যাহা বলুন, কার্য্যতঃ যাঁহারা শিক্ষকতা করিতেছেন, তাহারা বলিবেন ভয় একান্ত আবশ্যক। ভয় হইতে ক্রমশঃ শ্রদ্ধা ও শ্রদ্ধা হইতে স্নেহ হয়। আমরা যে এ স্থলে প্রহারের ভয়ের উল্লেখ করিতেছি না, তাহা বলা বাহুল্য, আমাদিগের স্ত্রীলোকদিগের পরস্পরের প্রতি ব্যবহার কিরূপ? পুরুষের যে প্রকার গুরুর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের রীতি আছে, স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে তাহা দেখা যায় না, বিংশতি বৎসরের যুবক কখন ৬০ বৎসরের বৃদ্ধের সহিত একত্র ক্রীড়া অথবা হাস্য কৌতুক করে না, কিন্তু এ প্রভেদ আমাদিগের স্ত্রীলোকের মধ্যে নাই। দশম বর্ষীয় বালিকার বৃদ্ধার সহিত কোন গুরু সম্বন্ধ নিবন্ধন সম্মানের প্রভেদ থাকে না। নানা বয়সের স্ত্রীলোকেরা একস্থলে সমবেত হইয়া সংসার ও স্বামী সংক্রান্ত কথোপকথন করেন। সকলেরই সহিত এ বিষয়ে সখীভাব। এজন্য পুরুষে পিতাকে দেখিয়া যে প্রকার ভয় করেন, স্ত্রীলোকেরা মাতা-শ্বশ্রূকে দেখিয়া তাহা করেন না। এটি ভাল নয় বটে, কিন্তু যখন আছে, তখন ইহার অপলাপ করা উচিত নয়। এজন্য যতদিন অন্তঃপুরমধ্যে শিক্ষানিবন্ধন সম্মান প্রদর্শন না হইতেছে ততদিন স্ত্রীশিক্ষক দ্বারা কাজ হইবে না।

আমরা অনেক স্থলে স্ত্রীশিক্ষক প্রণালী দর্শন করিয়াছি, বালিকারা শিক্ষয়িত্রীর গাত্রে উঠিয়াছে, গালি দিয়াছে এবং তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়াছে, শিক্ষা সুতরাং ভাল হয় নাই এবং পরিশেষে "পণ্ডিতে"র আশ্রয় প্রয়োজন হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত আপত্তি সামান্য নহে। ইহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিলেও জিজ্ঞাসা হইতেছে নর্ম্মাল বিদ্যালয়ে কাহারা শিক্ষা করিবেন? এদেশীয় বিধবাগণ? আমরা বলিতেছি এ শিক্ষকের সংখ্যা অতি অল্প হইবে। উচ্চজাতির প্রায় কোন বিধবা আসিবেন না, ঢাকায় একটি নর্ম্মাল বিদ্যালয় হইয়াছে, কিন্তু তথায় প্রায় বৈষ্ণবীর সংখ্যা অধিক। আমরা ইঁহাদিগের অবমাননা করিতেছি না, কিন্তু বলিতেছি, বৈষ্ণবীদিগের উপরে সর্ব্বসাধারণের ভক্তি অতি অল্প। এ অভক্তির বিশেষ কারণ আছে, এবং লোকে এ শ্রেণীর শিক্ষকের নিকটে যদি কন্যাগণকে না পাঠান, তাহা হইলে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। যাঁহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া গৃহের অলঙ্কার স্বামীর সুখ ও সন্তানগণের চরিত্রের আদর্শ হইবে, তাহাদিগের শিক্ষকতা এ শ্রেণীর স্ত্রীলোকের কাজ নহে। বর্ত্তমান প্রস্তাবের অনুমোদন কারিদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, এদেশীয় খৃষ্টানদিগের স্ত্রীলোকরা অনায়াসে নূতন নর্ম্মাল বিদ্যালয়ে পাঠ করিয়া শিক্ষকতা করিতে পারিবেন। বৈষ্ণবী-দিগের প্রতি চরিত্রঘটিত যে আপত্তি আছে, এদেশীয় খৃষ্টিয়ান স্ত্রীগণের প্রতি তাহা নাই। যদি কোন শ্রেণী সাধারণ্যে ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে বিশুদ্ধস্বভাব হন তাহা হইলে সেই প্রশংসা এদেশীয় খৃষ্টিয়ানদিগের আছে, যে পরিমাণে অধিকাংশ ফিরিঙ্গি দুশ্চরিত্র ও অধার্ম্মিক, সেই পরিমাণে এদেশীয় খৃষ্টিয়ানগণ সুস্বভাব সম্পন্ন। তথাপি ধর্ম্ম সম্বন্ধে এদেশীয় খৃষ্টিয়ান শিক্ষয়ত্রীগণ আমাদিগের অন্তঃপুরে অথবা বালিকা বিদ্যালয়ে গৃহীত হইবেন না। খৃষ্টিয়ানদিগের অনেকের অদ্যাপিও বুঝিতেছেন, যে ধর্ম্মপরিবর্ত্ত হইলে জাতিপরিবর্ত্ত হয় না। এজন্য কৃতবিদ্যমণ্ডলী তাঁহাদিগের শিক্ষকতা গ্রহণ করিতে অসম্মত নন। প্রাচীন-তন্ত্র অবশ্যই ধর্ম্ম লইয়া ঘোরতর আপত্তি করিবেন। এই কারণে আমরা বলিতেছি প্রস্তাবিত নর্ম্মাল বিদ্যালয় কোন কাজের হইবে না। নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছাত্রের সংখ্যা অধিক হইতে পারে, কিন্তু এই সকল শিক্ষক যদি সাধারণ্যে গৃহীত না হন? অতএব ব্রাহ্মসমাজের কয়েকজন সভ্য যদি তথাপি আবেদন করেন, গবর্ণমেণ্ট যে তাহা অগ্রাহ্য করিবেন, ইহা পূর্ব্বেই দেখা যাইতেছে, এবং ইহাতে অল্প লোকেই আশ্চর্য্য বোধ করিবেন।

স্ত্রীনর্ম্মাল বিদ্যালয়। ৩ পৌষ ১২৭৩

সম্পাদকীয়

মিস্ কার্পেণ্টরের কৃত স্ত্রীনর্ম্মাল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব লইয়া কৃতবিদ্যদলে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। কেহ কহিতেছেন, আজিও এদেশে স্ত্রীনর্ম্মাল

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় হয় নাই। কেহ কহিতেছেন, শিক্ষয়িত্রী হইবার উদ্দেশ্যে তথায় ভদ্রলোকের স্ত্রীকন্যাদি অধ্যয়ন করিতে যাইবেন না। কেহ কহিতেছেন, এদেশীয় খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী স্ত্রী অথবা অন্যজাতীয় স্ত্রী নর্ম্মাল বিদ্যালয়ে শিক্ষিত হইলে এদেশের ভদ্রলোকেরা তাঁহাদিগের নিকটে বালিকাদিগকে শিক্ষার্থ পাঠাইয়া দিবেন না, আমরা এতৎসংক্রান্ত একখানি পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা স্থানান্তরে প্রকটিত হইল। পত্রপ্রেরক বলেন, এখনও সময় হয় নাই, এবং ভদ্র কুলাঙ্গনারা তথায় অধ্যয়ন করিতে যাইবেন না। সময় হয় নাই, এ আপত্তি অকিঞ্চিৎকর, কোন বিষয়ের নূতন অনুষ্ঠান হইলে সচরাচর এই প্রকার আপত্তি হইয়া থাকে। ইংলণ্ডে যখন রেলওয়েণ প্রথম সৃষ্টি হয়, তৎকালে পার্লিয়ামেণ্টে এই বিষয় লইয়া বাদবিতণ্ডা হইয়াছিল। অনেকে এটী অসাধ্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। যাঁহারা সাধ্য বিবেচনা করেন, তাঁহারাও নানা প্রকার আশঙ্কা করিয়াছিলেন। শেষে সেই রেলওয়ে হইল, ক্রমে ক্রমে ইহা সর্ব্বদেশব্যাপী হইয়া উঠিল, এখন কেনা উহার উপকারভোগী হইয়াছেন? অগ্রে স্ত্রীনর্ম্মাল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখ, সময় হইয়াছে কি না তাহার পর বুঝা যাইবে। আমরা যখন দেখিতেছি, ভদ্রকুলাঙ্গনারা ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বিনী হইয়া সাহেব ও বিবিদিগের সহিত একত্র পান ভোজনাদি করিতেছেন, তখন যে তাঁহারা স্ত্রীনর্ম্মাল বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে যাইবেন না, কিরূপে এরূপ সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত হয়? ইউরোপীয়দিগের সহিত পান ভোজনাদির ন্যায় কি ইহা হিন্দু শাস্ত্রের নিষিদ্ধ, বিধবাবিবাহের ন্যায় এটা কি দুষ্কর-কার্য্য? আমাদিগের যেরূপ অন্তঃপুর প্রণালী আছে, সেই প্রকার কিঞ্চিত নিভৃত করিয়া স্ত্রীনর্ম্মাল বিদ্যালয়ের কার্য্যারম্ভ করিলেই অভীষ্টসিদ্ধি হইবে।

যতদিন স্ত্রীশিক্ষকের নিকটে স্ত্রীলোকের শিক্ষাপ্রথা প্রবর্ত্তিত না হইবে, ততদিন এদেশে স্ত্রীশিক্ষা ফলোপধায়িনী হইবে না। এখনকার বালিকাবিদ্যালয়গুলি কি ছেলেখেলা নয়? তথায় কি ভালরূপে লেখাপড়া হইতেছে? ভাল লেখাপড়া হইবার সম্ভাবনাই বা কি? বালিকাদিগের ৯।১০ বৎসরে বিবাহ হয়। বিবাহের পর প্রায় কেহ বিদ্যালয়ে যায় না। এই সময়ের মধ্যে কত শিক্ষা হইতে পারে? কিন্তু স্ত্রীনর্ম্মাল বিদ্যালয় হইয়া যদি স্ত্রীশিক্ষক পাওয়া যায়, বালিকারা বিবাহের পরও অনেক দিন পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে যাইতে পারে, তাহাতে আপত্তি হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

এদেশের ভদ্রলোকেরা ব্রাহ্মিকা অথবা এদেশীয় খৃষ্টধর্ম্মবলম্বীনিদিগের নিকটে কন্যাগণকে শিক্ষার্থ পাঠাইবেন না, এ আপত্তিও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। শিক্ষক যে ধর্ম্মাবলম্বী হউন, তাহাতে ক্ষতি কি? শিক্ষক অধ্যাপনাকালে ধর্ম্মপদেশ দিবেন না, এই মাত্র নিষেধ থাকিলেই হইল। এক্ষণে কি ইউরোপীয় রমণীরা ভদ্রলোকদিগের অন্তঃপুরে গিয়া শিক্ষাদান করিতেছেন না? এদেশীয়েরা কি ইঁহাদের স্থানেই অধ্যয়নার্থ ব্যগ্র হন না? বালিকারা স্ত্রীশিক্ষককে ভয় ও ভক্তি করেন না বলিয়া পত্রপ্রেরক যে আপত্তি

করিয়াছেন, তাহাও আমরা যুক্তিসহ জ্ঞান করিতেছি না। এখানে ভাল স্ত্রীশিক্ষক নাই, শিক্ষাদানের প্রণালীও ভাল নয়, তাহাতেই পত্র প্রেরক স্ত্রীশিক্ষকের প্রতি বালিকাদিগের ভয় ও ভক্তি দেখিতে পান না, কিন্তু যখন ভাল স্ত্রীশিক্ষক পাওয়া যাইবে এবং শিক্ষাদান প্রণালীর দোষ সংশোধন হইবে তখন পত্র প্রেরক দেখিতে পাইবেন যে বালিকারা স্ত্রীশিক্ষককে ভয় ও ভক্তি করিতেছে।

মিস মেরি কার্পেণ্টরের প্রতি ইংলিসম্যানের অন্যায় অনুযোগ। ১০ পৌষ ১২৭৩

মহচ্চরিত্রা মিস্ কার্পেণ্টর ভারতবর্ষ হইতে স্বদেশ প্রতিগমন কালে সর সিসিল বীডনকে এক পত্র লেখেন। তাহাতে বলিয়াছেন "হিন্দুবালিকারা উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে সর্ব্ব বিষয়ে ইংরাজ রমণীদিগের তুল্য এবং কোন কোন বিষয়ে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট হইতে পারেন, ইহা আমার সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, ইংলিসম্যান একথা সহ্য করিতে পারিবেন কেন? তিনি মিস্ কার্পেণ্টরকে নির্ব্বোধ বলিয়া এক প্রস্তাব লিখিয়াছেন। তিনি বলেন ইংলণ্ডীয়দিগের উদারতা দৌরবীক্ষণিক, তাঁহারা নিকটে গুণ দেখিতে পান না, দূরের গুণকে বৃহৎ করিয়া দেখেন। কিন্তু তিনি আবার বলেন যে মিস্ কার্পেণ্টর সে শ্রেণীর লোক নন, ইনি স্বদেশীয় স্ত্রীগণের সহিত বিলক্ষণ পরিচিত এবং তাহাদিগের যথেষ্ট উপকার সাধন করিয়াছেন। তবে মিস্ কার্পেণ্টর কি জন্য এরূপ উক্তি করিলেন? আপাততঃ তাঁহার বাক্য যেন কিছু অসংলগ্ন বলিয়া বোধ হয়। কেন না তিনি দুই দিনের মধ্যে এদেশীয়দিগের প্রকৃতি কিরূপে অবধারণ করিলেন। কিন্তু জ্ঞানী ও বহুদর্শিলোক একবার কটাক্ষপাত করিয়া সে বিষয়ে বুঝিতে পারেন, স্থূল-বুদ্ধি ব্যক্তি বহুদিনেও তাহা হৃদ্গত করিতে পারে না। বস্তুতঃ হিন্দুরমণীরা কিছুমাত্র শিক্ষালাভ না করিয়া এবং শত সহস্র কুসংস্কার শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিয়াও যেরূপ বুদ্ধিমত্তা ও সদ্বিবেচকতা প্রকাশ করেন তাহা দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। আমরা আরও দেখিতেছি তাহাদের শিক্ষার জন্য অল্প যত্ন করিলে আশাতীত ফললাভ করা যায়। এ সকলই আমাদের প্রত্যক্ষ, এক মূর্খা হিন্দুস্ত্রীকে যে সকল সদ্‌গুণে বিভূষিত দেখা যায় এবং সে পরিবারের সুখ সাধনের যেরূপ উপযোগিনী, ইংরাজ রমণী অধিক সভ্য হউন, কিন্তু এ সকল নৈসর্গিক গুণে যে বড় শ্রেষ্ঠ হইবেন তাহা আমরা বলিতে পারি না। মনক্রিফ এবং তাঁহার সহোদর দুই এক জন ইংরাজ ভিন্ন সকলেই ত হিন্দু-মহিলাদিগের প্রকৃতি ও ব্যবহার দেখিয়া যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন, এখন ইহার উপর যদি সুশিক্ষালাভ হয় তাহা হইলে হিন্দুরমণীরা যে কতদূর উৎকৃষ্ট হইতে পারে বলিবার নহে। আমরা ইতিমধ্যে দুই একটি সদ্‌গুণসম্পন্না সুশিক্ষিতা কামিনীর দৃষ্টান্ত দেখিয়া যথেষ্ট পরিতোষলাভ করিতেছি, এখনও উন্নতির আভাসমাত্র পাইয়াছি, অতএব

মিস্ কার্পেণ্টরের বাক্য যে অযৌক্তিক তাহা কি প্রকারে সপ্রমাণ হইল ? ইংলিসম্যান উপসংহারস্থলে লিখিয়াছেন। যে চিত্র ব্যাঘ্রের শরীর নিরঙ্কিত হইতে পারে, কিন্তু হিন্দু রমণীরা ইংরাজ স্ত্রীদিগের সমকক্ষ বা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হওয়া সুদূর পরাহত। একথাটিও তাঁহার না বলিলে নয় যে হিন্দুদিগের প্রতি তাঁহার কোন প্রকার কুসংস্কার বা বিদ্বেষ-ভাব নাই, তাহার সংশয়ই তাঁহার মনের ভাব প্রকাশ করিতেছে, যাহা হউক স্বজাতীয়ের প্রতি স্নেহ মনুষ্যের স্বাভাবিক, তজ্জন্য আমাদিগের সুযোগ্য সহযোগীকে আমরা দুষিতে পারি না, কিন্তু এদেশীয় রমণীদিগের বর্ত্তমান হীনাবস্থা দেখিয়া তিনি যেন এরূপ সংস্কার পরায়ণ না হন যে তাহাদের প্রকৃতিগত অপরিবর্ত্তনীয় দোষ আছে, তাঁহাদের উদ্ধারের পথ নাই এবং সুশিক্ষা দ্বারা তাঁহারা ইংলণ্ডীয় মহিলাদিগের সতুল্য হইতে পারেন না।

কার্পেণ্টরের উত্তরপাড়া বালিকাবিদ্যালয় দর্শন। ২৪ পৌষ ১২৭৩

চিঠি

মহাশয়। অনুগ্রহ করিয়া নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি আপনার জগদ্দল পত্রিকা পার্শ্বে স্থান দান করিয়া বাধিত করিবেন।

১৪ই ডিসেম্বর আনুমানিক ১১ ঘটিকার সময়ে মিস্ মেরি কার্পেণ্টর শ্রীযুক্ত আটকিন্সন, উড্রো এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয়গণ উত্তরপাড়াস্থ বালিকা বিদ্যালয় দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। বালিকাগণের বিদ্যোন্নতি, বুদ্ধিপ্রাখর্য্য এবং অন্তঃপুরস্থিত রমণীগণের শিল্পনৈপুণ্য দর্শনে দর্শকগণ অপরিসীম পরিতোষপ্রাপ্ত হয়েন। পরীক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হইলে, মিস্ মেরি কার্পেণ্টর উল্লিখিত মহানুভব কতিপয় সমভিব্যাহারে শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে গমন করেন। তথায় তিনি যথাবিহিত অতিথি সৎকার করিলেন। মিস্ মেরি কার্পেণ্টার অন্তঃপুরস্থ কামিনীগণের সহিত সাক্ষাৎকার লালসায় তাঁহাদিগের সন্নিধানে গমন করিয়া দেখিলেন, তাঁহারা একত্রিভূত হইয়া আগ্রহাতিশয় সহকারে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। অন্তঃপুরে যাইবার সময় মিস্ কার্পেণ্টার বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীকে সমভিব্যাহারে লইয়া যান। তাঁহাদিগের গমনমাত্র, স্ত্রীলোকদিগের কলেবরে আনন্দলক্ষণ স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতে লাগিল। কিন্তু স্বয়ং বাঙ্গলাভাষা জানেন না বলিয়া তিনি যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন। ফলত বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী দ্বারা এই অভাব পরিপুরণ হইল। মিস্ কার্পেণ্টর নিম্নলিখিতরূপে সম্যহৃত স্ত্রীলোকগণকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন "অয়ি সুন্দরীগণ! আমি তোমাদিগের বিষয় যাহা শ্রবণ করিয়াছি, তাহা সত্য কি না স্বচক্ষে দর্শনাভিপ্রায়ে বহুদূরস্থিত বিলাত হইতে আগমন করিয়াছি। এক্ষণে আমার সন্দেহ দূরীকৃত হইল, এবং তোমাদিগের বুদ্ধির তীক্ষ্নতা ও সদ্ব্যবহার অবলোকন করিয়া পরমাহ্লাদিত হইলাম।

তোমরাও কি আমাকে দেখিয়া তদ্রূপ সন্তোষপ্রাপ্ত হইয়াছ?" এতৎ শ্রবণে কামিনীগণ আহ্লাদ প্রকাশ করিলে পর, মিস্ কার্পেণ্টর একে একে সকলকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করিলেন এবং স্নেহময়ী জননীর ন্যায় সম্মুখস্থিত শিশুগণকেও ক্রোড়ে লইয়া তাহাদের বদন চুম্বন করিতে ক্ষান্ত হয়েন নাই। উদ্বাহ সূত্রে বন্ধন না থাকায় তাঁহার সন্তানসন্ততি হয় নাই। তিনি তজ্জন্য এক দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বাঙ্গালাভাষায় এবং ভারতবর্ষীয় রমণীগণ ইংরাজিভাষায় অজ্ঞ বলিয়া পুনর্ব্বারর্ণার্থ তিনি স্ত্রীনর্ম্মাল বিদ্যালয় সংস্থাপনের জন্য গবর্ণমেণ্টে প্রস্তাব করিয়াছেন। কামিনীগণ মিস্ কার্পেণ্টরকে তাঁহাদিগের হিতসাধনে একান্ত যত্নবতী দেখিয়া সুমধুরস্বরে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার বাক্য অনুমোদন করিয়া কহিলেন যে মহিলাগণের নীতিসম্বন্ধীয়, সামাজিক উৎকর্ষ সাধনার্থ তিনি যে সকল সঙ্কল্প করিয়াছেন তাহা যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয়, তদ্বিষয়ে যত্ন করিতে তাঁহারা ত্রুটি করিবেন না। মিস্ কার্পেণ্টর অকপট হৃদয়ে তাঁহাদিগের প্রশংসা করিয়া কহিলেন, হে ধর্ম্মপরায়ণা ভগিনীগণ! বিলাতে তোমাদিগের বিষয় যাহা শ্রবণ করিয়াছিলাম তাহার সম্পূর্ণতা অলীকতা বিষয়ে কিঞ্চিৎমাত্র সংশয় রহিল না। যে সমুদায় গুণ থাকিলে স্ত্রীজাতি জনসমাজে আদরণীয় হয়, সে সকলই তোমাদিগের আছে। তিনি আরও কহিলেন যে গৃহে, (বিলাতে) প্রতিগমন করিয়া এদেশস্থ স্ত্রীলোকদিগের আচারব্যবহার বিদ্যাবুদ্ধি ও সতীত্বের বিষয়ে পরিচয় পাইয়া যে অপরিসীম সন্তোষলাভ করিয়াছেন তাহা সাধারণ্যে ব্যক্ত করিবেন। এই সমস্ত কথোপকথনের পর মিস্ কার্পেণ্টর এবং তাঁহার সমভিব্যাহারী মহোদয়েরা গ্রামস্থ অন্যান্য বঙ্গ ও ইংরাজি বিদ্যালয় পরীক্ষা করণার্থ গমনোদ্যোযোগী হইলেন। কিন্তু দৈববিড়ম্বনা কে খণ্ডন করিতে পারে? পথিমধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বগীখানি উলটাইয়া পড়িল। সুতরাং বিদ্যাসাগর মহাশয় নিম্নে পতিত হইলেন। আটকিন্সন ও উড্রো সাহেব এবং এদেশীয় ভদ্রলোক বিদ্যাসাগর মহাশয়কে উত্তোলন করিয়া যথোচিত শুশ্রূষা করিলেন। যেরূপ পৌর্ণমাসী সুধাকর নীরদজালে বেষ্টিত হইলে আলোকমালা তিমিরাচ্ছন্ন হয়, তদ্রূপ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিপদরূপ অন্ধকার আমোদ-প্রমোদ রূপ আলোকে বিনিষ্ট করিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় ব্যতীত অপর সকলেই ইংরাজি বিদ্যালয় প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া যৎপরোনাস্তি সন্তোষলাভ করিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। দেশহিতৈষী বিদ্যাসাগর মহাশয় বিপদজাল হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন? শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলাম। ঈশ্বর করুন মিস্ কার্পেণ্টর দীর্ঘজীবী হইয়া এদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে যত্নবতী থাকেন এবং তাঁহার শ্বেতাঙ্গী ভগিনীরা এই মহৎ কার্য্যের অনুকরণ করিয়া তাঁহার ন্যায় অসীম যশোভাজন হইতে চেষ্টা করুন।

বেথুন সোসাইটি ও ডাক্তর ডফ। ১৩ মাঘ ১২৭৩। ১১ সংখ্যা

সম্পাদকীয়

বেথুন সোসাইটী এতদ্দেশীয় কৃতবিদ্যদিগের মানসিক বৃত্তিসঞ্চালন ও তর্কশক্তির উন্নতির মূল ভিত্তিস্বরূপ। ডাক্তর মাউএটের দ্বারা উহা সংস্থাপিত হয়। এদেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রধান উদ্যোগী মহাত্মার নাম চিরস্মরণীয় করা এবং এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয়দিগের পরস্পর অধিক ঘনিষ্ঠতা করা এই সভার অন্যতর উদ্দেশ্য। প্রায় দুই বৎসরকাল এই সভার বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল, কিন্তু ক্রমশঃ সভ্যদিগের ঔদাসীন্যে ও ডাক্তর মাউএট সভাপতির পদ পরিত্যাগ করাতে ইহার হ্রাস হইয়া আইসে। সভার এরূপ অবস্থা দেখিয়া কতকগুলি সভ্য ডাক্তর ডফকে সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। ডাক্তর ডফও তাঁহাদিগের অনুরোধ রক্ষা করেন। তিনি এই অভিনন্দনের উত্তরে এক স্থানে বলিয়াছেন, "কলিকাতাস্থ বেথুন সোসাইটী অচিরকালে লণ্ডনের রয়াল সোসাইটী ও পারিসের ইনষ্টিটিউটের ন্যায় সাহিত্য ও বিজ্ঞানের উন্নতিস্থান হইবে, এরূপ আশা করা যাইতেছে" এরূপ স্থলে বেথুন সোসাইটীর ইতিহাস দেশের ইতিহাসের অন্তর্গত হইতেছে, অতএব তদ্বিষয়ে আমাদিগের কিছু বলা অবিধেয় হইতেছে না।

ডাক্তর ডফ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াই এককালে সমুদায় নিয়ম পরিবর্ত্তন করিতে চাহিয়াছিলেন, ইহাতে কয়েকজন সভ্য আপত্তি উপস্থিত করেন। এই উপলক্ষে তাহার সহিত আমেরিকার মিসনারি ডাক্তর ডালের বিবাদ হয় এবং তিনি একদিন শিশুবৎ ক্রোধান্ধ হইয়া সভাপতির আসন ত্যাগ করেন। গোঁড়ামী করা ডাক্তর ডফের একটী প্রধান দোষ। বেথুন সোসাইটী এই দোষের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু সুখের বিষয় এই উড্রো সাহেব প্রভৃতি কয়েকজন ভদ্রলোকের অনুরোধে ডফ সাহেব পুনরায় সভাপতি হইতে সম্মত হন। এই সময় অবধি সভার উন্নতি হইতে লাগিল। তিনি দেখিলেন, এই সভায় নানাপ্রকার ব্যবসায়ী লোক আছেন। সুতরাং কেবল সাহিত্য অথবা বিজ্ঞানশাস্ত্র সকলের তুষ্টিসাধন করিতে পারে না, অনেক সভ্য মনোমত বিষয়ের আলোচনা করিতে না পাইয়াই সভা ত্যাগ করিয়াছিলেন। ডাক্তর ডফ এই অনিষ্ট নিবারণার্থ এক নূতন উপায় অবলম্বন করিলেন। তিনি সভাকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিভাগে বিভক্ত করিয়া প্রতি অংশের এক একজন সহকারী সভাপতি ও সম্পাদক নিযুক্ত করিলেন। তদনুসারে ৬টী বিভাগ হইল, সাধারণ শিক্ষা, সাহিত্য ও দর্শন, বিজ্ঞান ও শিল্প, চিকিৎসা ও স্থান পরিষ্কার সংক্রান্ত কার্য্য, সামাজিক বিজ্ঞান এবং এতদ্দেশীয় স্ত্রীশিক্ষা; এই কয়েকটী বিভাগ প্রধান সভাপতির অধীনস্থ হইল। সভ্যেরা পরস্পরের সহায়তারকার্য্য করাতে অভূতপূর্ব্ব উপকার সাধিত হইয়াছে। সভা অভিনন্দনের একস্থানে গর্ব্ব সহকারে বলিয়াছেন "মহাশয়! সভার যে প্রকার উন্নতি করিয়াছেন, তাহা সভার

গত বাৎসরিক কার্য্যবিবরণ পুস্তকে (যাহা মহাশয় অনেক পরিশ্রম ও সময় নষ্ট করিয়া প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতে) প্রকাশিত হইবে।" ডাক্তর ডফের অনুরোধে ও সভার বর্ত্তমান শ্রীবৃদ্ধি দর্শনে উৎসাহিত হইয়া ই. বি. কাউএল, ডাক্তর চিবর্স, কলিকাতার লার্ড বিশপ প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত লোকেরা উপদেশ প্রদান করেন। ফলতঃ ডাক্তর ডফের সভাপতিত্ব সময়ে অনেক উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

কোন বিদেশীয় অজ্ঞ ব্যক্তি কেবল সভার হ্রাস ও উন্নতির অবস্থা দেখিয়া এই অনুমান করিতে পারেন যে, যে সকল ব্যক্তি বিদ্যা, ধন ও সামাজিক ক্ষমতা একাধারে ধারণ করিতে সমর্থ হন, তাঁহাদিগের ব্যতিরেকে আর কাহারও দ্বারা এরূপ মহান্ পরিবর্ত্তন হইতে পারে? কিন্তু যখন তিনি শুনিবেন, একজন দরিদ্র বৃদ্ধ মিসনরি এই কাজ করিয়াছেন, তখন অবশ্যই বিস্ময়ান্বিত হইবেন সন্দেহ নাই। সভা তাঁহার কার্য্য দর্শন করিয়া কৃতজ্ঞতায় আর্দ্র হইয়া কহিয়াছেন "ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ ইতিহাসবেত্তা যখন এদেশের লক্ষ লক্ষ লোকের বিদ্যাশিক্ষা ও সভ্যতার উন্নতির সমালোচন করিবেন, তখন যদি তিনি মহাশয়ের পরিশ্রম ও তাহার উপাদেয় ফলের বিষয় লিখিতে ত্রুটি করেন, তাহা হইলে তাঁহার ইতিহাস অঙ্গহীন হইবে।"

ডাক্তর ডফ অভিনন্দনপত্র শ্রবণ করিয়া যে উত্তর দান করিয়াছেন, তাহা তদুপযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু অতিশয় দীর্ঘ হওয়াতে আমরা সমুদায় গ্রহণ করিতে পারিলাম না। অভিনন্দন দাতৃগণ, ডফ সাহেবকেই বেথুন সোসাইটি সভার উন্নতির একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, কিন্তু তিনি আপনার বিনয়নম্রতা নিমিত্ত স্ববক্তব্য ব্যক্ত করিবার কালে বলেন, সভা, সভাপতি ও সম্পাদকদিগের যত্ন না থাকিলে সভার এরূপ উন্নতি হইত না। সভা বলিয়াছেন, তাঁহার দ্বারাই এদেশের অধিকাংশ বিদ্যাশিক্ষার উন্নতি হইয়াছে। ডাক্তর ডফ তাহার এই উত্তর দান করেন "যখন আমি প্রথমে এদেশের বিদ্যাশিক্ষার উন্নতির চেষ্টা করি, তখন একজন যুবক সিবিলিয়ানের সহায়তা না পাইলে কোন ক্রমে কৃতকার্য্য হইতে পারিতাম না। অনেক গবর্ণর জেনেরল এতদ্দেশীয়দিগের ধর্ম্ম ও সংস্কারের পক্ষপাতী হইয়া এদেশে কেবল পারসী ও সংস্কৃত প্রভৃতির শিক্ষায় যত্ন প্রকাশ করেন। তাঁহারা যে কেবল সেই কুসংস্কারের প্রশ্রয় দিয়াছিলেন এমন নহে, অনেক স্থলে তাঁহারা স্বয়ং তাহার সহায়তাও করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের সৌভাগ্যক্রমে লার্ড বেণ্টিঙ্ক প্রধান শাসনকর্তৃত্ব পদে নিয়োজিত হইলে আমিও পূর্ব্বোক্ত যুবক সিবিলিয়ান বেণ্টিঙ্কের আশ্বাসে উৎসাহান্বিত হই। ঐ যুবক সিবিলিয়ান হঠাৎ দিল্লী হইতে কলিকাতায় আগমন করিলেন। এখানেও তিনি সমুদ্রের প্রবল বাত্যার ন্যায় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা দ্বারা যাবতীয় কুপ্রথা আলোড়ন আরম্ভ করিলেন।...অনেক গবর্ণর জেনেরল এই যুবককে অনাদর করিয়াছিলেন। কিন্তু লার্ড বেণ্টিঙ্ক এদেশের কুপ্রথাগুলির উন্মূলন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। তিনি পরিশেষে যে সকল কার্য্য করেন, ঐ যুবক সিবিলিয়ানের পরামর্শে তাহার অধিকাংশই নির্ব্বাপিত হয়।

এই সিবিলিয়ান এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছেন, তথাপি তিনি অতুল ঐশ্বর্য্য, পৃথিবীব্যাপী যশঃ ও স্বদেশে বাসজনিত সুখ পরিত্যাগ করিয়াও এই বৃদ্ধ বয়সে এদেশের মঙ্গল নিমিত্ত ভারতবর্ষে অবস্থিতি করিতেছেন। ইহাঁর ভারতবর্ষের প্রতি অনুরাগ সমানই রহিয়াছে। এই ব্যক্তি সর চারলস ট্রিবিলিয়ান। ইহাঁরই যত্নে সহমরণ প্রভৃতি উঠিয়া যায়।

সর চারলস ট্রিবিলিয়ান গ্রাম্প্রিয়ান পর্ব্বতবাসী এক দরিদ্র মিসনরির নিকটে কিন্তু এই উন্নতির সূত্র প্রাপ্ত হন। ডাক্তর ডফ স্বীয় সৌজন্যগুণে এই প্রশংসা লইতে চাহেন নাই বটে, কিন্তু সাধারণে তাঁহাকে তাহা প্রদান করিয়াছেন। বৃদ্ধ মিসনরি শেষে বিদায় লইবার সময়ে সভ্যদিগকে দৃঢ়তর যত্ন ও অধ্যবসায় অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষের উন্নতিসাধন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। "আমাদিগের কৃতবিদ্য মণ্ডলীর অনেকে ভাবেন বিদ্যালয়ের উপাধি প্রাপ্ত হইলে ও কতকগুলি পুস্তক পাঠ করিলেই মানবজন্ম সার্থক হইল? কিন্তু ডফ বলেন, এসকল লোক পুস্তকের কীট মাত্র। বস্তুতঃ বিদ্যা শিখিয়া তাহার যথোচিত কাজ করিতে না পারিলে তাহা বিফল হয়, একথাটি যেন আমাদিগের নূতন গর্ব্বিতচিত্ত বি. এ. এবং এম. এ. দিগের স্মরণ থাকে।"

স্ত্রীশিক্ষা। ২ বৈশাখ ১২৭৫। ২২ সংখ্যা

সম্পাদকীয়

আমরা ১৮৬৬-৬৭ অব্দের শিক্ষা সংক্রান্ত রিপোর্টের যে মর্ম্ম সংগ্রহ করিয়া পাঠকগণের গোচর করিয়াছি তাহাতে বালকদিগের শিক্ষার উন্নতির বিষয় তাঁহাদিগের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। তাহাতে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়টী অনুল্লিখিত আছে, অদ্য তদুল্লেখে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে, এক্ষণে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য উভয়বিধ স্ত্রীবিদ্যালয় সমুদায়ে ২৮১ টী হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা গত এগার মাসে ৬৪টী বিদ্যালয় বৃদ্ধি হইয়াছে, পূর্ব্বে পাঠার্থিনীর সংখ্যা ৫৫৫৯ ছিল গত এগার মাসে ৬৫৩১ হইয়াছে।

বিদ্যালয় ও পাঠার্থিনীর সংখ্যা যেরূপ হউক, স্ত্রীশিক্ষা যে সামান্যরূপ হইতেছে, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। শীঘ্র ইহার উন্নতি হয়, তাহারও সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। অনেকগুলিন মহান অন্তরায় আছে। প্রথম, স্বার্থলাভ জ্ঞান, দ্বিতীয় অবশ্যকর্ত্তব্যতা জ্ঞান। স্ত্রীশিক্ষাবিষয় বহুল পরিমাণে এদেশীয়দিগের ইহার অন্যতর কোন জ্ঞানই জন্মে নাই। সাধারণ্যে এদেশীয়দিগের সংস্কার এই, স্ত্রীলোকদিগকে শিখাইলে কি হইবে? তাঁহারা কিছু অর্থ উপার্জ্জন করিতে যাইবেন না। স্ত্রীলোকেরা শিক্ষিত হইলে যে সংসার সুখময় হয়, সে জ্ঞান সাধারণের নাই। যাঁহাদিগের ঐ জ্ঞান জন্মিয়াছে, তাঁহাদের সংখ্যা অধিক নয়, বোধ কর এক গ্রামের ভিতরে দুই ব্যক্তির ঐ জ্ঞান জন্মিয়াছে, তাঁহারা স্ত্রীবিদ্যালয়ের

উদ্‌যোগ করিলেন ; কিন্তু গ্রামের আর কেহই অর্থদ্বারা ইহার সাহায্য করিলেন না। সুতরাং উদ্‌যোগকারীরা কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। প্রায় যাবতীয় পল্লীগ্রামেরই সচরাচর এই অবস্থা লক্ষিত হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়, এদেশের অধিকাংশ স্ত্রীলোক গৃহকর্ম্মসম্পাদন করিয়া থাকেন। লেখাপড়ার চর্চ্চা করিতে গেলে অধিকতর অবসরের প্রয়োজন হয়, কিন্তু এদেশের অধিকাংশ পুরুষের এরূপ অবস্থা নয় যে তাঁহারা স্ত্রীলোকদিগকে পর্য্যাপ্ত অবসর দিয়া তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য কাযদ্বারা সম্পাদন করিয়া লন।

তৃতীয়, এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগেব অল্প বয়সে বিবাহ হয়, সন্তান জন্মে, সুতরাং তাঁহারা অল্প বয়সে সংসারী হইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন, পড়াশুনার অবসর পান না। এদেশ যেরূপ উষ্ণ এবং এদেশে অল্প বয়সে যেরূপ ইন্দ্রিয়াদির উন্মেষ হয়, তাহাতে অল্প বয়সে স্ত্রালোকদিগের বিবাহ না দিলে অনেক অনর্থ উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা।

উল্লিখিত অন্তরায়গুলি অতিক্রম করিয়া কৃতার্থতালাভ সহজ ব্যাপার নহে। উপরে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, পুরুষের শিক্ষা ও অবস্থার উপরেই স্ত্রাশিক্ষায় সিদ্ধিলাভ সমধিক নিভর করিতেছে। আমরা বহুবার প্রতিপন্ন করিয়াছি আজিও অধিকাংশ পুরুষ সুশিক্ষিত ও উৎকৃষ্ট অবস্থা সম্পন্ন হন নাই। প্রবেশিকা পরীক্ষাতেই অধিকাংশ লোকের শিক্ষাকার্য্যে পয্যবসিত হয়। সুতরাং তাদৃশ ব্যক্তিদিগের হইতে কোন মহৎ ও বৃহৎ কায্য সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ে কৃতকায্য হইবার বাসনা জন্মিলে অগ্রে অধিকাংশ পুরুষকে সুশিক্ষিত করিয়া উৎকৃষ্ট অবস্থাসম্পন্ন করিয়া তুলাই কর্ত্তব্য। এই কায্যটি করিতে গেলে আর কতকগুলি নূতন ছাত্রবৃত্তি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ম মধ্যে বহুল পরিমাণে সাহিত্যচর্চ্চার উপায় বিধান করিতে হয়। অপর এক্ষণে যে স্ত্রীশিক্ষা হইতেছে, সেটা নামমাত্র শিক্ষা। শৈশবকালে পিত্রালয়ে বালিকাদিগের যে যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা হয়, শ্বশুরালয়ে গমন করিয়া সে সমুদায় বিস্মৃত হইতে হয়। তখন একমাত্র গৃহকর্ম্ম তাহাদিগের সমুদায় সময় ও চিত্তকে গ্রাস করিয়া ফেলে। এই সকল কারণে এখন যে শিক্ষা হইতেছে, তদ্দ্বারা শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে না। সমাজ মাত্রেই বালক ও বালিকাদিগের এক এক প্রকার শিক্ষাবিধি আছে। যে শিক্ষা দ্বারা অন্তঃকরণ প্রশস্ত, আশায় উদাব এবং দ্বেষ হিংসাদি অসৎ প্রবৃত্তি সকল দুরীভূত হয় সেই শিক্ষাই শিক্ষা। অধিক বয়স পর্য্যন্ত শিক্ষা না হইলে এ সকল গুণ জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। অধিক বয়স পয্যন্ত শিক্ষা পুংশিক্ষাদ্বারা সম্পাদিত হওয়া সম্ভাবিত নহে, স্ত্রীশিক্ষয়িত্রীর একান্ত প্রয়োজন। এক্ষণে স্থানে স্থানে যে স্ত্রীনর্ম্মাল বিদ্যালয় দৃষ্ট হয়, তাহা কার্য্যোপযোগী নহে। যে স্থলে ভদ্র স্ত্রীরা গিয়া অধ্যয়ন করেন, এরূপ একটী স্ত্রীনর্ম্মাল বিদ্যালয় আবশ্যক। তাহা করিতে গেলে স্ত্রীলোকদিগের গমনাগমনের ব্যয় এবং তাঁহাদিগের প্রলোভনার্থ উচ্চতর বৃত্তিবিধান আবশ্যক করে।

যাবৎ এগুলি না হইতেছে, তাবৎ স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে যে ব্যয় হইতেছে, তাহা বিফল হইতেছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমরা সচরাচর দেখিতে পাইতেছি, এক স্থানে একটী বিদ্যালয় বসিল, কিছু দিন পরে তাহা উঠিয়া গেল, আবার আর এক স্থলে বসিল। কিন্তু কোন স্থানের কোন বিদ্যালয়ে প্রায় সুন্দররূপে শিক্ষা হইতেছে না। যখন এরূপ হইতেছে, তখন এ বিষয়ে যে ব্যয় হইতেছে, তাহা কি বিফল হইতেছে না?

ইংরাজী শিক্ষার অনিষ্টকারিতা। ৬ শ্রাবণ ১২৭৫। ৩৭ সংখ্যা

সম্পাদকীয়

পাঠকগণ উপরের লিখিত কয়েকটি অক্ষর পাঠ করিয়া আপাততঃ চমৎকৃত হইবেন সন্দেহ নাই। ইংরাজী শিক্ষা আমাদিগের দেশের যাবতীয় ইষ্টের মূল। আমরা যে মানুষের মত হইয়াছি, আমরা যে তেজস্বিতা, মনস্বিতা সত্যনিষ্ঠা ও কার্য্যদক্ষতা প্রভৃতি সদগুণ অর্জ্জন করিয়াছি এবং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বোধে সমর্থ হইয়াছি, সে সমুদায়ই ইংরাজী প্রসাদলব্ধ। যে ইংরাজী হইতে এদেশের এত ইষ্ট হইয়াছে, আমরা তাহাকে অনিষ্টকারিণী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি এ বাক্য কাহার বিস্ময় উৎপাদ না করিবে? কিন্তু ইহার একটী গূঢ় তাৎপর্য্য আছে, এরূপ একটী বিশেষ কারণ আছে এবং আমাদিগের বাক্যের অধিকারিভেদ আছে।

ইংরাজী শিক্ষা দুটী দলের পক্ষে অনিষ্টকারিণী হইয়া উঠিয়াছে। প্রথম যে সকল ইংরাজ মনে করেন, ভারতবর্ষ তাঁহাদিগের ভোগার্থ সৃষ্ট হইয়াছে, তাঁহারা ভারতে আসিয়া প্রভুম্মান ভোগী হইবেন, আর ভারতবাসীরা তাঁহাদিগের ভৃত্যের ন্যায় অনুগত হইয়া থাকিবেন, তাঁহারা সহস্র অন্যায় ও অত্যাচার করুন, ভারতবাসীরা দ্বিরুক্তি না করিয়া ভৃত্যের ন্যায় তাহা সহ্য করিবেন, পদই বল, অর্থই বল, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া যাহা দিবেন, ভারতবাসীরা সন্তুষ্টচিত্তে মহাভাগ্য জ্ঞান করিয়া তাহা ভোগ করিবেন, পদ কানা হউক, কুঁজা হউক ইহ বা তাহাতে অসন্তোষ বা অন্য কোন প্রকার উচ্চবাচ্য করিতে পারিবেন না, ইংরাজী শিক্ষা সেই গর্ব্বিত ইংরাজদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবার বিষয়ে ব্যাঘাত জন্মাইয়াছে। যাঁহারা ইংরাজী শিখিতেছেন, তাহাদিগেরই মন অন্যপ্রকার হইয়া উঠিতেছে। তাঁহারা ইংরাজদিগের দোষগুণ দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছেন, ইংরাজেরা কি পদার্থ বুঝিতে পারিতেছেন, তাঁহারা দেবতার ন্যায় আমাদিগের আরাধ্য কিনা তাহা বুঝিতেছেন, অণুমাত্র দোষ দর্শন করিলেই স্পষ্টাক্ষরে তাহা ব্যক্ত করিতে সাহসী হইতেছেন, সর্ব্বতোভাবে সমকক্ষের ন্যায় ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তুল্যসম্মান ও তুল্যপদ লইয়া বিবাদ করিতেছেন এবং বিদ্যাবুদ্ধিতে অনেককে অতিক্রম করিয়াছেন, যে রাজপুরুষদিগকে শঙ্কিত হইতে হইয়াছে এবং

তাঁহাদিগের বিদ্যাবুদ্ধির গতিরোধ করিবার নিমিত্ত অবৈধ উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছে। উল্লিখিত অভিমানমত্ত অনুদারচিত্ত ইংরাজদিগের কি এ সকল সহ্য হয়? মহাপুরুষেরা নব্যসম্প্রদায়ের উপরে এত বিরক্ত হইয়াছেন যে নব্যসম্প্রদায় যদি এককালে উৎসন্ন হয়, যে স্থানে নব্য সম্প্রদায় বাস করে, সেটী যদি দহ পড়িয়া যায়, তাঁহারা অন্তরের সহিত আহ্লাদিত হন। এখন পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন ইংরাজী শিক্ষা কি এই অনিষ্টের কারণ হয় নাই? উক্ত মহাত্মারা কি ইহাতে অনিষ্টজ্ঞান করিতেছেন না? গবর্ণমেণ্ট হইতেই এই অনর্থ আপাতত হইয়াছে, এই ভাবিয়া কি তাঁহারা সময়ে সময়ে গবর্ণমেণ্টের প্রতি দৃষ্টিবিক্ষেপ করিতেছেন না? সে দিন একজন উদারাশয় সমাচার সম্পাদন মনোভাব মনে রাখিতে না পারিয়া স্পষ্টাক্ষরেই কহিয়াছেন, বঙ্গদেশ ও বোম্বাইয়ের নব্যসম্প্রদায় না থাকিলেই ভাল হয়। এটী কি সামান্য আক্রোশ ও ক্ষোভের কথা। এদেশীয়দিগের ইংরাজী শিক্ষাই কি ঐ মহাপুরুষদিগের এই মনোদুঃখের মূল নয়?

দ্বিতীয়, ইংরাজী শিক্ষা অলব্ধমনোরথ কৃতবিদ্যের পক্ষে বিষম অনিষ্টকারিণী হইয়াছে। রাজনীতি ও সমাজ উভয় সম্বন্ধেই তাঁহারা অসুখিত হইয়াছেন। তাঁহারা যেরূপ যোগ্যতালাভ করিয়াছেন, সেরূপ পদ লাভ হইতেছে না। যেরূপ শিক্ষা হইয়াছে, সেরূপ কার্য্য দেখিতে পাইতেছেন না। যাঁহাদিগের নিকটে এই শিক্ষা হইল যে, পক্ষপাত করা বড় দোষ, তাঁহারাই নিজে পক্ষপাত করিতেছেন, জ্ঞাতি ভাই বলিয়া সকল কাজেই টানিতেছেন এবং স্বজাতীয় ও স্বদেশীয়ের অনুরোধে ন্যায়, যুক্তি ও আইনের বিরুদ্ধে ব্যবহারেও পরাঙ্মুখ হইতেছেন না। কৃতবিদ্যদিগের আর একটী বিশেষ অসন্তোষের কারণ এই, তাঁহারা দেখিতে পান, ইংরাজেরা ধর্ম্মনীতি ধর্ম্মনীতি করিয়া বেড়ান; কিন্তু অনেক কাজেই সেই ধর্ম্মনীতিতে জলাঞ্জলি দেওয়া হয়। অনেক সময়ে সেই ধর্ম্মনীতি মৌখিক বাক্য ও তর্কেই পর্য্যবসিত হয়। কোন ইংরাজ তাহা লইয়া মহা ধুমধাম পড়ে। তর্কের স্রোতে পার্লিয়ামেণ্ট সভা উচ্ছলিত হইয়া উঠে, শেষে সমুদায় নির্ব্বাণ হইয়া যায়। যে গর্হিত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইল, তাহা আজিও হইল, কালিও হইল, তাহার আর প্রতিবিধান হইল না। হেষ্টিংসের বিচার লইয়া কত দীর্ঘপ্রস্থ গ্রন্থ হইয়া গেল, কত ধুমধাম হইল, পরিণামেই বা কি হইল। লার্ড ডালহাউসি নাগপুর প্রভৃতি রাজ্যে রাজনীতির নামে কি অত্যাচার না করিলেন? ভারতবর্ষে বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দিলেন, তাহার কি হইল? গবর্ণরেরই বা কি হইল? তাঁহাকে অভিনন্দন দিবার আবার কত উদ্যোগ দেখা গেল। তাঁহাকে নূতন কর্ম্ম দিবার চেষ্টারও ত্রুটি নাই! এসকল দেখিয়া দেশীয় কৃতবিদ্যদিগের মনে কিরূপ ভাবের উদয় হইতেছে? তাঁহারদিগের হৃদয় কি রোষাগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে না? ইংরাজী শিক্ষা কি এই অনিষ্টের কারণ নয়? ইঁহারা যদি ইংরাজী না শিখিতেন, রাজপুরুষেরা

অনুগ্রহ করিয়া যাহা দিতেন, তাহাই কি ইঁহারা ভাগ্য করিয়া মানিতেন না? রাজপুরুষেরা ন্যায় করুন অন্যায় করুন, ইঁহারা কি তাহার অনুসন্ধান করিতেন?

সমাজসম্বন্ধেও কৃতবিদ্যদিগের বিষম সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। উপধর্ম্ম দূষিত হিন্দুসমাজের নানা দোষ ইঁহাদিগের নয়নপথে উপনীত হইতেছে। ইঁহারা সেগুলির নিকটে মস্তক নত করিতে পারিতেছেন না। সমাজসম্বন্ধে কর্ত্তব্যের ব্যাঘাতভয়ে সমাজ পরিত্যাগ করিতেও পারিতেছেন না। এরূপ অবস্থা কি ক্লেশকর নয়? ইংরাজী শিক্ষা কি এই অসুখের কারণ নয়? ইঁহারা যদি ইংরাজী না শিখিতেন, সেই বাল্যবিবাহ, সেই বহুবিবাহ, সেই কৌলীন্য কি ইঁহাদিগের প্রীতি উৎপাদন করিত না? অশিক্ষিত ব্যক্তিরা ঐ সকলে যেরূপ অকৃত্রিম আনন্দ লাভ করিতেছেন, ইঁহারাও কি সেইরূপ করিতেন না? এক ইংরাজী শিখিয়া ইঁহাদিগের তাঁতিকুল বৈষ্ণবকুল সব গেল। রাজপুরুষেরাও ইঁহাদিগের মনোরথ পূর্ণ করিলেন না, সমাজে থাকিয়াও সুখী হইলেন না।

অন্তঃপুর শিক্ষাপ্রণালী। ৬ আশ্বিন ১২৭৫। ৪৬ সংখ্যা

সম্পাদকীয়

এদেশে যে সমস্ত বিষয়ের উন্নতি এক্ষণে নয়নগোচর হইতেছে, মিসনরিরা তাহার অধিকাংশের সুত্রপাত করিয়াছেন। বঙ্গদেশের অন্তঃপুরের স্ত্রীগণ আজিকালি যে শিক্ষানুরাগী হইয়াছেন, মিসনরিদিগের যত্নই তাহার প্রথম কারণ। আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই, কয়েকজন খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী রমণী এদেশের অন্তঃপুরস্থিত স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার নিমিত্ত কয়েক বৎসরকাল বিলক্ষণ পরিশ্রম করিতেছেন। তার কি ফল ফলিল, বোধ হয় পাঠকগণ তদ্‌বৃত্তান্ত অবগত হইবার নিমিত্ত একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইবেন সন্দেহ নাই। মৃত বিবি মলেন্স প্রথমতঃ আমাদিগের বর্ত্তমান অন্তঃপুরশিক্ষাপ্রণালীর উদ্ভাবন করেন। তাঁহার পর বিবি মরে নাম্নী এক গুণবতী মিসনরিপত্নী এই প্রণালীর অনুসরণে প্রবৃত্ত হন। বিবি মরে কতগুলি ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় খৃষ্টীয়ান শিক্ষয়িত্রীকে স্থানে স্থানে প্রেরণ করেন; তাঁহারা লিখনপঠন ও সুচির কাজের শিক্ষা দিতেন। বিবি মরে সকলের তত্ত্বাবধান করিতেন। ঐ গুণবতী রমণী ইংলণ্ডে গমন করিলে পর তাঁহার বিদ্যালয় সকল মিস ব্রিটনের হস্তে পতিত হয়। ইনি আমেরিকাবাসিনী। ডাক্তর জারবোর সাহায্যে তিনি অন্তঃপুরের শিক্ষাকার্য্যের ভার গ্রহণ করেন। তাঁহার অধীনে ১৭ জন ইউরোপীয় এবং ১৩ জন এতদ্দেশীয় শিক্ষয়িত্রী আছেন। তাঁহার প্রযত্নে স্থানে স্থানে বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। মিস ব্রিটন এদেশের স্ত্রীলোকদিগের স্বভাব ও অভাব প্রকৃতরূপে অবগত আছেন। অনেক ইউরোপীয়, অন্য কি বিচারপতি

ফিরার পর্য্যন্ত আমাদিগকে এই বলিয়া ভর্ৎসনা করেন যে, এদেশের পুরুষেরা এত কৃতবিদ্য হইয়াও স্ত্রীলোকদিগকে সর্ব্বসাধারণের সম্মুখে বাহির হইতে দেন না, কিন্তু মিস ব্রিটনই আমাদিগের এরূপ ব্যবহারের কিঞ্চিৎ মর্ম্ম অবগত হইয়াছেন। তিনি বলেন, সহসা ওরূপ হওয়া সাধ্যায়ত্ত নয়। তাঁহার মত এই, এক্ষণে যে সকল বালিকা জন্মগ্রহণ করিতেছে, তাহাদিগকে ক্রমশঃ শিক্ষা দিয়া প্রাচীনকালের হিন্দু সমাজের ন্যায় স্বাধীনতা প্রদান করিতে হইবে যাঁহারা পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় দীর্ঘকাল অন্তঃপুরে রুদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে সহসা স্বাধীনতা প্রদান করিলে অনিষ্টফল উৎপন্ন হইবে। এ বিষয়ে তাঁহার সহিত মিস্ কার্পেণ্টরের মতভেদ হয়, কিন্তু যাঁহারা এদেশীয় বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মনের ভাব জানেন, তাঁহারা মিস্ ব্রিটনের বাক্যকেই প্রমাণিক বলিয়া আদর করিবেন সন্দেহ নাই। মিস্ ব্রিটন এই প্রকার সংস্কারের বশবর্ত্তী হওয়াতে তাঁহার প্রবর্ত্তিত শিক্ষাপ্রণালীও তদনুরূপ হইয়াছে। যাঁহারা শিক্ষা করিবার অভিলাষী হন, তাহাদিগের বাটীতে এক একজন এতদ্দেশীয় খৃষ্টীয়ান শিক্ষয়িত্রী প্রেরিত হইয়া থাকেন। আপাততঃ, সামান্য সাহিত্য পুস্তক, অঙ্ক ও বিদ্যাসাগরের বঙ্গদেশীয় ইতিহাস পাঠ করান হয়। ছাত্রীগণ সূচির কাজও শিক্ষা করেন। প্রতি সপ্তাহে একজন ইউরোপীয় শিক্ষয়িত্রী ছাত্রদিগের উন্নতির পরীক্ষা করেন। মিস্ ব্রিটন নিজে মধ্যে মধ্যে গিয়া সকল বিষয় স্বচক্ষে দর্শন করিয়া থাকেন। ছাত্রীরা প্রায় ২ টাকার অধিক বেতন দেন না। যেখানে ইংরাজী শিক্ষা হয়, তথায় ৪ টাকাই উর্দ্ধসংখ্যা বেতন। বিধবাদিগের নিকটে এক পয়সাও লওয়া হয় না, বরং অনেকে মিস্ ব্রিটনের নিকটে সাহায্য পান। তিনি বিধবাদিগকে নিজের বাটীতে আসিয়া সঙ্গীত ও অন্য অন্য বিষয় শিক্ষা দিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এই প্রকারে প্রায় ৮০০ শত এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোক ও বালিকা মিস্ ব্রিটনের যত্নে শিক্ষালাভ করিতেছে। গবর্ণমেণ্ট প্রতিছাত্রীতে এক টাকা সাহায্য দান করেন। আমেরিকার মিসনরিরা মাসিক ১২০০ টাকা দিয়া থাকেন, কিন্তু যে ব্যয় হয়, তাহাতে শিক্ষয়িত্রী ও মিস্ ব্রিটনকে নিজে অতি সামান্য অবস্থায় অবস্থান করিয়া কালহরণ করিতে হয়। যিনি লর্ড্ সাহেবকে নিজের বাটীতে গমন করিলে দেখিবেন, মিসনরিদিগের ন্যায় তাঁহাদিগের স্ত্রীগণও অতি সামান্য আহার ও পরিচ্ছদ পাইয়া জগতের হিতসাধন করিতেছেন।

মিস্ ব্রিটনের বিদ্যালয় সকলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছাত্রী আছেন। ডাক্তর রবসনের স্ত্রী প্রায় ১৫০ স্ত্রীলোক ও বালিকাকে শিক্ষা দিতেছেন, কিন্তু বিবি রবসনের শিক্ষয়িত্রীগণ ইউরোপীয় বলিয়া অনেকে উচ্চ বেতনের ভয়ে তাঁহাদিগকে লইয়া যাইতে পারেন না। ডাক্তার রবসন নিজে অনেক সাহায্য করেন। ডাক্তার রবসন একজন মিসনরি ইহা বলিলেই তাঁহার পর্য্যাপ্ত পরিচয় হয়। তিনি এদেশকে এত ভালবাসেন যে, তাঁহাকে একজন বাঙ্গালী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাহা হউক, আমরা বিবি

রবসনকে পরামর্শ দিতেছি, তিনি কতগুলি এতদ্দেশীয় শিক্ষয়িত্রী রাখুন, অন্যথা সম্যকরূপে কৃতার্থলাভ করিতে পারিবেন না।

তৃতীয় মিসন মৃজাপুরের মিস্ নিকলসনের অধীনস্থ। এই মিসনে বিস্তর এতদ্দেশীয় শিক্ষয়িত্রী আছেন। উঁহাদিগের সুশিক্ষা ও সচ্চরিত্রতা নিবন্ধন অনেক উপকার হইতেছে। বিবি লুইস নিজের ব্যয়ে প্রায় ১৫০ ছাত্রীকে শিক্ষা দিতেছেন।

এই প্রকারে বিনা আড়ম্বরে কতগুলি খৃষ্টীয়ান স্ত্রীলোক আমাদিগের অন্তঃপুরের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিতেছেন। আপাততঃ এতৎসম্বন্ধে আমাদিগের কিঞ্চিৎ বক্তব্য উপস্থিত হইল। বিবি রবসন ভিন্ন আর সকল শিক্ষয়িত্রীই খৃষ্টধর্ম্ম পুস্তক পাঠ করা শিক্ষার একটী প্রধান অঙ্গ বলিয়া জ্ঞান করেন এবং মিস্ ব্রিটন প্রভৃতি নিজেই বলেন, খৃষ্টীয়ান করাই তাঁহাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য। তাঁহাদের স্বধর্ম্মের প্রতি যে এত ভক্তি তন্নিমিত্ত তাঁহারা প্রশংসনীয় হইবেক, সন্দেহ নাই ; কিন্তু এতন্নিবন্ধন তাঁহাদিগের শিক্ষাদান কার্য্যটী সম্পূর্ণ ফলোপধায়ী হইতেছে না। তাঁহারা ধর্ম্মবোধে আদম ও ইব প্রভৃতি উপাখ্যানের যে শিক্ষা দেন, বাটীর পুরুষেরা তাহা সামান্য গল্প এই কথা বলিয়া দিয়া তাহাতে স্ত্রীলোকদিগের অশ্রদ্ধা জন্মাইয়া দিয়া থাকেন। পরস্পরের সংস্কার ও অভ্যাসের বিষয় বিবেচনা করিলে এরূপ হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। খৃষ্টীয় ধর্ম্মকে সত্য বলিয়া তদনুরূপ-সংস্কার জন্মাইয়া দিবার যেমন চেষ্টা করিতেছেন, হিন্দু স্বামীও তেমনি আপন স্ত্রীকে তাহার বিপরীত বুঝাইয়া দেন। যখন এদেশীয়েরা স্ব স্ব পুত্রদিগের বাইবল শিক্ষাদানে সম্মত নহেন, তখন যে স্ত্রীলোকেরা তাহা পাঠ করিবেন তাহা কাহার অভিপ্রেত হইতে পারে? আমরা এ স্থলে মিস্ ব্রিটন প্রভৃতিকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, যদি একজন স্ত্রীলোক খৃষ্টীয়ান হইয়া মেইন সাহেবের আইন অনুসারে জেলার জজের নিকটে আবেদন করিয়া স্বামীকে সমন দিয়া বলেন, "হয় ছয় মাসের মধ্যে আপনি আমার সহবাস করিতে আসুন, নচেৎ আমি বিবাহ ভঙ্গের নালিশ করিয়া পত্যন্তর গ্রহণ করিব," তখন সমাজের কি ভাব হইবে? যে দিন এইরূপ একটী দৃষ্টান্ত ঘটিবে, সেই দিনই কি অন্তঃপুর মিসনের শেষ হইবে না? অতএব বিবি রবসন বাইবল পাঠ করা আর না করা স্বেচ্ছাধীন এই যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন তাহাই সকলের অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। অবস্থা বুঝিয়া সকল কাজ করাই উচিত। কেবল অন্তঃপুর প্রণালী বলিয়া কেন? ডাক্তর মাকলিয়ড যে পরামর্শ দিয়াছেন, তাহা মিসনরি বান্ধবগণের অবলম্বন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। শিক্ষা দাও এবং কুসংস্কার দূর কর, নেত্র রোগ শান্তি হইলে লোক কোন্‌টী স্বর্ণ আর কোন্‌টী গিল্‌টি করা পিত্তল তাহা আপনারা বাছিয়া লইবেন। মিসনারিরা যদি এ দেশের কুসংস্কার দূর করিতে পারেন্ কি উপকার করা না হইল?

স্ত্রীনর্ম্মাল বিত্থালয়। ৫ ফাল্গুন ১২৭৫। ১৪ সংখ্যা

সম্পাদকীয

গবর্ণমেণ্ট একটী সবিশেষ প্রার্থনায় ও প্রশংসনীয় সদনুষ্ঠান করিযাছেন। এ দেশের স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার যে সমস্ত বিঘ্ন আছে, উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীর অভাব তন্মধ্যে প্রধান। মিস্ কার্পেণ্টর ভারতবর্ষে আসিযা এই অভাবের নিরাকরণার্থ সবিশেষ যত্নবতী হন। এক্ষণে অধিকাংশ স্ত্রীবিত্থালয়ের শিক্ষকতাকার্য্য পণ্ডিতদিগের দ্বাবা সম্পাদিত হইতেছে। যেখানে অন্তঃপুর মিসন আছে, সেখানে খৃষ্টীয়ান শিক্ষয়িত্রী মিলে, কিন্তু ইহাতে সম্পূর্ণ ফললাভের সম্ভাবনা না থাকাতে মিস্ কার্পেণ্টর কয়েকটী স্ত্রীনর্ম্মাল বিত্থালয় স্থাপন করিবার প্রস্তাব করেন। সর সিসিল বীডন এ বিষয়ে প্রধান প্রধান লোকের মত জিজ্ঞাসা করেন; তাহাতে বহু মতামত ও নানা আপত্তি হয। সর জন লবেন্স স্থানীয় ফণ্ডের আপত্তি করিয়া বলেন, লোকে যদি সাহায্য কবেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সাহায্য করিতে পারেন, কিন্তু মিস্ কার্পেণ্টর কেবল গবর্ণর জেনেরলেব অনুগৃহের উপরে নির্ভর না করিয়া ইংলণ্ডে গমন করেন বিত্থাশিক্ষাবিষয়ে সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোটের অতিশয় উৎসাহ ছিল। তিনি এ বিষয়ে হস্তার্পণ করিলেন। কলিকাতা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজে এক একটী নর্ম্মাল বিত্থালয় করিবাব নিমিত্ত প্রত্যেক স্থানে মাসিক ১০০০ টাকা দিবার আজ্ঞা হইল। নানা জনের নানা আপত্তিনিবন্ধন আপাততঃ পাঁচবৎসর কাল পরীক্ষা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত এই বিত্থালয় হইতেছে। কলিকাতার বেথুন বিত্থালযে এই কার্য্য আবম্ভ করিবার আজ্ঞা হইয়াছে। এ বিষয় লইয়া যে মতভেদ হইবে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, কিন্তু আমাদিগের স্ত্রীলোকদিগকে যে উচ্চতব শিক্ষা দেওয়া উচিত সে বিষয়ে মতভেদ নাই। তবে প্রশ্ন এই হইতেছে, হিন্দু শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করিবার সময় আসিয়াছে কি না? আমরা ইহার আন্দোলন প্রারম্ভকালেই কহিযাছি সে সময উপনীত হইয়াছে। অন্ততঃ ইহার পরীক্ষা করা উচিত। গবর্ণমেণ্ট সেই পবীক্ষামাত্র কবিতেছেন। এক্ষণে আমাদিগের স্ত্রীলোকেরা সাধারণ্যে শিক্ষা পাইতেছেন, যে শিক্ষা পাইতেছেন তাহাও সামান্ত মাত্র। তাঁহারা সূচীর কাজ শিক্ষা ও কয়েকখানি সামান্ত পুস্তকমাত্র পাঠ কবেন। কোন স্ত্রীলোক এ পর্য্যন্ত যথার্থ কৃতবিত্থ হন নাই। সাহিত্য ও ইতিহাস লইয়া তর্ক করা যায, এমত এক জন স্ত্রীলোকও এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে দর্শন দেন নাই, কৃতবিত্থ পুরুষ মাত্রেই এই দুঃখ অনুভব করিতেছেন। যেমন স্ত্রীবিনা সংসার বৃথা, সেই প্রকার নিজে কৃতবিত্থ হইয়া অজ্ঞ স্ত্রীর সহবাস করাও কষ্টকর। আমাদিগের স্ত্রীলোকেরা সকল বিষয় বুঝিয়া উৎসাহ না দিলে আমরা যথার্থ মহত্ত্বলাভে সমর্থ হইব না। "আমার স্বামী প্রধান মন্ত্রী না হইলে আর মহাসভার বাটীতে আসিব না" ডিসরিলি সাহেব প্রথমবার বক্তৃতা করিয়া অকৃতার্থ ও লজ্জিত হইলে বিবি ডিসরেলি এই পণ করিয়াছিলেন। এই স্ত্রীলোকের সেই প্রতিজ্ঞা ও

তন্নিবন্ধন উৎসাহের জন্য ডিসরেলির এত মহত্ত্বলাভ হইয়াছে। আমাদিগের স্ত্রীলোকগণকে কি বিবি ডিসরেলির সদৃশ উচ্চমান করিবার চেষ্টা পাওয়া উচিত নহে? বৃথা প্রতিবন্ধক আচরণ করা কি উচিত? যখন এই সদনুষ্ঠানের আরম্ভ করিবে তখনই এই প্রকার প্রতিবন্ধকতা হইবে।

এস্থলে আমরা অতিশয় সতর্ক হইয়া কাজ করিবার অনুরোধ করিতেছি। মিস্ কার্পেণ্টর শিক্ষয়িত্রীদিগকে বিদ্যালয়ের মধ্যে রাখিবার যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা আপাততঃ ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। যে সকল স্ত্রীলোক নর্ম্মাল বিদ্যালয়ে আসিবেন, তাঁহাদিগকে আবৃত শকটে আনয়ন করা কর্ত্তব্য। বিদ্যালয়ে যে সে পুরুষদর্শক যাইতে পারিবেন না। যে সমস্ত স্ত্রীলোক নর্ম্মাল বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থ আসিবেন, তাহাদিগের লোভ ও উৎসাহ জন্মে এরূপ অর্থদানের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

বঙ্গদেশের শ্রমজীবী ও কৃষক প্রভৃতির বিদ্যাশিক্ষা। ১২ ফাল্গুন ১২৭৫। ১৫ সংখ্যা

যতপ্রকার দোষ আছে, তাহার মধ্যে বায়ুরোগ অধিকতর শোচনীয়। কারণ ইহাতে মানুষকে জ্ঞানশূন্য করিয়া ফেলে। পীড়িত অবস্থায় মানুষ জ্ঞানশূন্য হইলে যখন অধিকতর শোকের পাত্র হয়, সুস্থ অবস্থায় যাহারা জ্ঞানশূন্য, তাহাদিগকে দেখিয়া হৃদয়ে যে অত্যন্তিক শোকসঞ্চার হইবে, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। বঙ্গদেশের শ্রমজীবী ও কৃষকেরা এই প্রকৃতিস্থ জ্ঞানশূন্য জীব। মানুষ কেন সৃষ্ট হইয়াছে, জন্মিয়া মানুষের কি কি করিতে হয়, তাহারা তাহার কিছুই জানে না। যে উপায় দ্বারা তাহাদিগের সে সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ হইবার সম্ভাবনা আছে, যে উপায় তাহাদিগের হস্তগত করিয়া দেওয়া যে একান্ত আবশ্যক, সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই তাহা স্বীকার করিবেন সে। উপায় লেখা পড়াজ্ঞান। শ্রমজীবী ও কৃষকেরা লেখাপড়া শিক্ষা করুক, এ বিষয়ে কাহার বিপ্রতিপত্তি নাই; কেবল উহার প্রকারপ্রণালী তৎসাধনোপযোগী অর্থাগমের বিষয়েই মতভেদ হইতেছে। তাহারা গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় যে শিক্ষা পাইতেছে, তাহাই পর্য্যাপ্ত, কেহ তাহাতে সন্তুষ্ট নহেন। অর্থাগমের বিষয়েও ঐ প্রকার মতভেদ লক্ষিত হইতেছে। কেহ কহিতেছেন, শিক্ষাকর হউক, কেহ তাহাতে অমত করিতেছেন। এই প্রকার মতামত হইতেছে, কিন্তু তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক লেখাপড়া শিখান হউক, এ প্রস্তাব এ পর্য্যন্ত কেহ করেন নাই। কেবল এক রেবরেণ্ড লালবিহারী দে মরারির ন্যায় এই তৃতীয় পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি এই উদ্দেশ্যে ১৮৬৮ অব্দের ডিসেম্বর মাসে বেথুন সোসাইটীতে একটী প্রস্তাব পাঠ করেন। উহা এক্ষণে মুদ্রিত হইয়া পুস্তকাকারে প্রচারিত হইয়াছে। ঐ পুস্তকখানিই আজি আমাদিগের এ প্রস্তাবের অবতারণার মূল।

রেবরেণ্ড লালবিহারি দে প্রথমে শ্রমজীবী ও কৃষকদিগের শিক্ষাদানের আবশ্যকতা

প্রতিপাদন করিয়া তাহাদিগের শিক্ষার্থ কতগুলি বিত্থালয় আবশ্যক ও কি উপায়ে তাহার ব্যয় সংস্থান হইবে, ইহার বিচার করিয়াছেন। তিনি অনুমান করেন, বাঙ্গলাদেশে ৪০০০০০০০ লোকের বসতি, প্রতি ১০০০ লোকের নিমিত্ত এক একটী বিত্থালয় আবশ্যক। এ নিয়মে ৪০০০০ বিত্থালয় করা কর্ত্তব্য প্রত্যেক বিত্থালয়ের মাসিক ব্যয় ১০ টাকার হিসাবে ধরিলে ৪৮ লক্ষ টাকা হয়, তত্ত্বাবধানের ব্যয় ৩ লক্ষ, ৮০টী নর্ম্মাল স্কুলে ৩ লক্ষ, ৮০টী প্রাইমারী হাইস্কুলে ৩ লক্ষ এবং গৃহ সংস্কারাদির নিমিত্ত ৩ লক্ষ সমুদায়ে ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয়। তিনি ৬০ টাকার আয়ের যে ফর্দ্দ দিয়াছেন, তাহা এই :—

লবণের উপরে টাক্স	২২	লক্ষ
জমিদারের নিকটে	৭	„
গবর্ণমেণ্ট	২১	„
স্কুলিং ফী	১০	„
মোট	৬০	লক্ষ

রেবরেণ্ড লালবিহারী দে শ্রমজীবী ও কৃষকদিগের বিত্থাশিক্ষার্থ ব্যয়ের যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা করিয়া তদনুরূপ অভীষ্ট ফললাভ হইবার সম্ভাবনা আছে কি না, এ বিষয়ের বিবেচনা করিবার অগ্রে তিনি যে আয়ের ফর্দ্দ দিয়াছেন, তাহা সংগ্রহ সাধ্যায়ত্ত কিনা এবং তিনি যে রীতিতে উহাদিগের শিক্ষাদান প্রসঙ্গ করিয়াছেন, সেটী আদরণীয় কিনা, তদ্বিবেচনা কর্ত্তব্য। তিনি বলেন, সকলকেই বিত্থালয়ে গিয়া শিক্ষা করিতে হইবে, এই প্রকার একটী আইন করিতে হইবে, যে বিত্থালয়ে না যাইবে, সে দণ্ডনীয় হইবে। শিক্ষাদানকে বলপ্রয়োজ্য করিবার প্রস্তাবটী কলসপূর্ণ দুগ্ধে বিন্দুমাত্র গোমুত্র প্রদান তুল্য হইয়াছে। কৃষকদিগকে যদি বলপুর্ব্বক বিত্থাশিক্ষাকার্য্য প্রবর্ত্তিত করা এবং তাহাদিগের নিকট হইতে বলপুর্ব্বক স্কুলিং ফী আদায় করা হয়, তাহাদিগের শিক্ষার প্রতি বিদ্বেষ জন্মিবে। প্রসিয়ার ন্যায় বলপুর্ব্বক বিত্থাদানস্থান বঙ্গদেশ নয়। এখানে শিক্ষাকার্য্য বরাবর ঐচ্ছিক হইয়া আসিয়াছে। অর্থব্যয় করিয়া বিত্থাশিক্ষা করা এদেশের অভ্যস্ত নহে। অধ্যাপকেরা ছাত্রদিগের আহারব্যয় দিয়া চিরকাল অধ্যাপনাকার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিয়াছেন। এদেশ চিরপরাধীনতার শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া আসিয়াছে, অতএব এদেশীয়দিগকে বলপুর্ব্বক শিক্ষাদানকার্য্যে প্রবর্ত্তিত করা অসঙ্গত হইতেছে না, রেবরেণ্ড লালবিহারী এই যে যুক্তি প্রদান করিয়াছেন, এটী নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। এদেশীয়দিগের রাজনীতি সংক্রান্ত চিরপরাধীনতাই ছিল, কিন্তু শিক্ষাসম্বন্ধে কোন কালে সে অধীনতা ছিল না। বিশেষতঃ এদেশীয়দিগের রাজনীতি সংক্রান্ত চিরপরাধীনতাই ছিল ; কিন্তু রেবরেণ্ড লালবিহারী যে প্রস্তাব করিতেছেন, তাহাতে ইহাদিগের যে বিষয়ে চিরকালের স্বাতন্ত্র্য ছিল, তাহাও বিলুপ্ত হইতে চলিল।

প্রস্তাবলেখক আয়ের যে পন্থা উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহাও রুচিকর ও সুসাধ্য হইতেছে না। লবণের টাক্স বৃদ্ধি করিতে গেলে দরিদ্রদিগেরই কষ্ট বৃদ্ধি হইবে। যে সকল দ্রব্যের উৎপত্তি পার্জ্জন্যদেবের অনুগ্রহাপেক্ষী, সময়ে তাহা মহার্ঘ্য ও সুলভ হয়, দরিদ্রদিগকে অগত্যা সময়ে সময়ে মহার্ঘ্য দ্রব্য ক্রয় জন্য কষ্টভোগ করিতে হয়; কিন্তু যে যে দ্রব্যের উৎপত্তি বিষয়ে দৈবের আনুকুল্য অপেক্ষণীয় নয়, তাহাও যদি অন্যান্য দ্রব্যের ন্যায় দুর্ম্মূল্য হয় তাহা নিতান্ত কষ্টকর হইবে সন্দেহ নাই। এ নিমিত্ত জমিদারদিগের নিকট হইতে করগ্রহণ যে বিধেয় নয়, আমরা কয়েকবার তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছি. তাঁহারা যে অর্থ দিবেন, তাহা প্রকারান্তর করিয়া কৃষকদিগের নিকট হইতেই আদায় করিয়া লইবেন। প্রতি কার্য্যে যদি তাঁহাদিগের নিকট হইতে নূতন নূতন করগ্রহণ করা হয়, তাহাদিগের সহিত যে স্থায়ী বন্দোবস্ত করা হইয়াছে, তাহার অন্বর্থতা থাকে না।

তবে কি শ্রমজীবী ও কৃষকদিগের শিক্ষার কোন উপায় করা হইবে না? ইহার উত্তরদানস্থলে আমাদিগের বক্তব্য এই, একটী সহজ উপায় আছে, সে উপায় গুরুট্রেনিং বিদ্যালয় ও তাহার অধীনস্থ পাঠশালাগুলি। ঐগুলি কেবল শ্রমজীবী ও কৃষকদিগের শিক্ষাদানকার্য্যে বিশেষরূপে বিনিয়োজিত করা হউক। ইহাতে আরও একটী বিশিষ্ট উপকার লাভ হইবে। এক্ষণে ঐ সকল পাঠশালায় উচ্চ শ্রেণী ও মধ্যম শ্রেণীর বালকেরাও অধ্যয়ন করিতেছে, কিন্তু যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, প্রতীয়মান হইবে, পাঠশালাগুলি দ্বারা ঐ ঐ শ্রেণীর উচ্চশিক্ষার প্রতিবন্ধকতা জন্মিতেছে। সে প্রতিবন্ধকতা অতিক্রান্ত হইবে এবং যে গুরুপাঠশালারূপ কার্য্যটী আরম্ভ হইয়াছে, তাহার ব্যয়ও বিফল হইবে না। এক্ষণে প্রথম ও মধ্যম শ্রেণীর উভয়প্রকার শিক্ষালাভের ইচ্ছা জন্মিয়াছে। সে ইচ্ছা গবর্ণমেণ্টের সাহায্যবলে ক্রমেই পূর্ণ করিয়া লইবেন। আরব্ধ গুরুপাঠশালার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কৃষক ও শ্রমজীবীদিগের নিমিত্ত মার্জ্জিত ও পরিবর্দ্ধিত করা হউক এবং যাহাতে তাহারা সচ্ছল হয়, তাহাদিগের সহিত ভূমির স্থায়ীবন্দোবস্ত করিয়া তাহা করা হউক। সচ্ছল হইলে ঔৎসুক্য সহকারে তাহারা স্বতই শিক্ষাদানকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। উহাদিগের শিক্ষার ব্যয় দানের ভারগ্রহণ গবর্ণমেণ্টের যে অবশ্য কর্ত্তব্য, প্রস্তাব লেখক তাহা সুন্দররূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তন্নিমিত্ত তিনি আমাদিগের অকপট ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। বঙ্গদেশে যে আয় হইতেছে, বঙ্গবাসীদিগের শিক্ষার্থ যে ব্যয় দেওয়া হইতেছে, তাহা কোনরূপে তাহার অনুরূপ নহে। আজিও গবর্ণমেণ্টের অনেক কর্ত্তব্য অবশিষ্ট আছে। এদেশীয়দিগকে বিদ্যা শিখান উচিত কিনা, এই প্রশ্নের মীমাংসার পর যখন গবর্ণমেণ্ট বঙ্গদেশে প্রথম বিদ্যালয়ের দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন, তখন কি টাকা কোথায় পাওয়া যাইবে, এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল? তবে এখন কেন এ প্রশ্ন উত্থিত হইতেছে? ব্যয়ের অনটন হইলে পরোক্ষ কর দ্বারা তাহা পরিপুরিত হইয়া আসিবে। অপরোক্ষ কর এদেশীয়দিগের একান্ত বিদিষ্ট।

বিজ্ঞান ও বিশ্ববিদ্যালয়। ১০ চৈত্র ১২৭৫। ১৯ সংখ্যা

ইউরোপখণ্ডের অন্য অন্য প্রদেশের লোকেরা ইংলণ্ডের শিল্পীদিগের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ, ইহার কারণ কি? ১৮৬৭ অব্দে তাহার অনুসন্ধান হয়। তাহাতে প্রকাশ পাইল, ফ্রান্স প্রভৃতির অতি সামান্য বিদ্যালয়েও বিজ্ঞানের সমধিক চর্চ্চা আছে। ভারতবর্ষে প্রকৃত বিজ্ঞানের অনুশীলন নাই বলিলে হয়। রুডকি কালেজ ও মেডিকাল কালেজ সমূহে যে কিছু আছে এইমাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ কৃতবিদ্য ছাত্রকে একটী পুষ্প প্রদর্শন করিয়া তাহার জাতি জিজ্ঞাসা করিলে উর্দ্ধনয়ন হইয়া থাকেন। আসিয়াটিক সোসাইটী বিজ্ঞানের এই শোচনীয় দশা দর্শন করিয়া প্রস্তাব করিয়াছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে যাহাতে বিজ্ঞানের সমধিক চর্চ্চা হয়, তাহা করা কর্ত্তব্য। তাঁহারা প্রবেশিকা-শ্রেণী হইতে ইহার আরম্ভ করিতে বলেন; কিন্তু আমরা দুঃখিত হইলাম, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া, সে সময় অদ্যাপি আইসে নাই এইমাত্র উত্তর দান করিয়াছেন। শিখিবার সময় আইসে নাই, চমৎকার কথা! আরম্ভ না করিলে সে সময় কখনই হইবে না। কোন ব্যক্তি এককালে প্রধান সেনাপতি হইতে পারেন? মেডিকাল-কালেজে কি এই শিক্ষা হইতেছে না। অন্য অন্য বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা শিখিতে না পারিবেন কেন? আমরা বিজ্ঞান ও শিল্পে যে এত নিকৃষ্ট রহিয়াছি শিক্ষাবিভাগ কি তাহার প্রধান কারণ নহে? মানসিক বিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতিতে আমাদিগের কৃতবিদ্যগণ দক্ষতা প্রদর্শন করিতেছেন বটে; কিন্তু যাহাতে প্রগাঢ় মনোযোগ হয়, যাহাতে প্রকৃতির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা জন্মে, আমাদিগের সেই শিক্ষার অতিশয় প্রয়োজন। বিজ্ঞান আমাদিগের নিকটে ঋণী নহে, আমাদিগের শিল্পশিক্ষা নাই বলিলে হয়। অতএব সোসাইটীর প্রস্তাবানুসারে কাজ করা অতিশয় আবশ্যক হইয়াছে। সর্ব্বত্রই প্রকৃত বিজ্ঞান-শিক্ষার আরম্ভ করিয়া দেওয়া উচিত। বাঙ্গালা বিদ্যালয়েও ইঁহার অনুশীলন আবশ্যক। ইহার অনুশীলন আরম্ভ হইলে কয়েক বৎসরকাল অল্পতর মাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া ছাত্র বহির্গত হইবেন সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহাতে ক্ষতি কি? ক্রমে বিজ্ঞানবিদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে। অনেকগুলি অৰ্দ্ধশিক্ষিতের অপেক্ষা অল্পসংখ্যক শিক্ষিত ছাত্র দর্শন কি প্রার্থনীয় নহে? এ প্রকার শিক্ষা দিলে কয়েক বৎসরের মধ্যে আমাদিগের শিল্পের অভূতপূর্ব্ব উন্নতি হইতে থাকিবে সন্দেহ নাই।

বিজ্ঞানের অনুশীলন। ২৭ বৈশাখ ১২৭৭

সম্পাদকীয়

কয়েক সপ্তাহ অবধি প্রেসিডেন্সি কালেজের সহকারী অধ্যাপক বাবু রাজকৃষ্ণ মিত্র বিজ্ঞান সংক্রান্ত নানা বিষয়ের উপদেশ দিতেছেন। কিন্তু আমরা দুঃখিত হইলাম, অতি

অল্প সংখ্য কৃতবিদ্য এই উপদেশ শ্রবণ করিতে গমন করেন। বিচারপতি ফিয়ার সাহেব প্রথমাবধি নিজে উপস্থিত থাকিয়াও কৃতবিদ্যদিগকে উত্তেজিত করিতে পারেন নাই। আমাদিগের প্রকৃত উন্নতি হইতেছে কিনা? ইহাতে আমাদিগকে সন্দিহান করিতেছে। পরীক্ষাদানার্থ বিদ্যালয়ে যতটুকু শিক্ষা করা আবশ্যক, কোন দেশের লোকে তদ্বিষয়ে বাঙ্গালী ছাত্রদিগের অপেক্ষা প্রাধান্য প্রদর্শনে সমর্থ নহে, কিন্তু আমরা প্রগাঢ় শোকসহকারে আমাদিগের মধ্যে অল্প লোকেই বিদ্যার্থ বিদ্যা শিক্ষা করিয়া থাকেন। কেবল পরীক্ষায় বিদ্যা কণ্ঠস্থ করা যদি যথার্থ উন্নতি হয়, তাহা আমাদিগের অনেক হইয়াছে। কিন্তু উদ্ভাবনী শক্তি প্রদর্শন করিয়া বিজ্ঞান ক্ষেত্রে নূতন খনির আবিষ্কার এবং তদ্দ্বারা স্বদেশ ও পৃথিবীর উপকার সাধন করা যদি উন্নতির প্রকৃত অর্থ হয় তাহা হইলে আমাদিগের তাহার কিছুই হয় নাই।

আলীগড় ও বেহারের বিজ্ঞান সভার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। এগুলি শরতের মেঘ সদৃশ, আরম্ভকালে কত তর্জ্জন গর্জ্জন হইল কিন্তু বিন্দুপাত মাত্র হইল না। বিজ্ঞান দূরে থাকুক সাহিত্য সম্বন্ধেও উদ্ভাবনী শক্তি প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না। কলিকাতার মুসলমান সাহিত্য সমাজ মহা আড়ম্বরে বঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিলেন কিন্তু শেষ ফল কি হইল? ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয় সভা যে সকল নূতন প্রবন্ধ বাহির করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন তাহার কিছুই হইল না। বৎসরান্তে সভার বুদ্ধিমান সম্পাদক টৌনহলে এক সামাজিক মজলিস করিয়া আপনার মাহাত্ম্য প্রকাশ করেন এইমাত্র। এই প্রকার আমাদিগের অধিকাংশ সভা ব্যক্তিবিশেষের সম্ভ্রম বর্দ্ধনে পরিণত হইয়াছে, কার্য্য কিছুই হইতেছে না। বাবু রাজকৃষ্ণ মিত্র যে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা পরিত্যাগ করা অনুচিত। যতদিন এতদ্দেশীয়েরা বিজ্ঞানানুশীলনে যত্নবান না হইবেন ততদিন প্রকৃত মঙ্গললাভের সম্ভাবনা নাই। নিজের আবিষ্কার গুণেই ইউরোপ ও আমেরিকা এ দেশের অপেক্ষা শত প্রধান হইয়াছে। বর্ত্তমান সভ্যতা বিজ্ঞানের উপরে বহুলরূপে নির্ভর করিতেছে। যদি বিজ্ঞান শাস্ত্রের অনুশীলন অধিক পরিমাণে না হইত, তাহা হইলে ইউরোপের বর্ত্তমান সভ্যতা উন্নতি নয়নগোচর হইত না।

আমরা আহ্লাদিত হইয়া এস্থলে প্রকাশ করিতেছি, সেণ্ট জেবিয়র কালেজের ফাদার লাফণ্ট উক্ত কালেজে বিজ্ঞানের উপদেশ দিবার মানস করিয়াছেন। এক্ষণে ৮০ জন মাত্র তথায় গমন করিতে পারিবেন। সকলের এক টাকা করিয়া ফী দিতে হইবে। যাঁহারা বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে পারেন নাই, তাঁহাদিগের উপকারার্থ উপদেশ দেওয়া হইবে। এস্থলে আমাদিগের দুটী বক্তব্য উপস্থিত হইতেছে। প্রথম, উপদেশের স্থান নগরের মধ্যস্থলে করা উচিত। দ্বিতীয়, যাহাতে এতদ্দেশীয়েরা বিজ্ঞানকে ভাল বলিয়া তাহার অনুশীলনে অনুরক্ত হন, এরূপ প্রণালী অবলম্বন করিয়া উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য। তন্নিমিত্ত আমরা প্রস্তাব করিতেছি মধ্যে মধ্যে বিজ্ঞান সংক্রান্ত কোন জটিল বিষয়ের

মীমাংসার্থ কৃতবিদ্যদিগকে আহ্বান করা উচিত। তাহা হইলে তাঁহারা বুদ্ধি খাটাইতে শিখিবেন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ও উচ্চতর শিক্ষা। ১০ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৭

একশত বৎসরের অধিক হইল ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছে। ইংরাজেরা যখন প্রথম ভারতবর্ষ অধিকার করেন তখন ইহার যেরূপ অবস্থা ছিল তাহার সহিত ইহার বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিলে বহু বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয়। এই সুদীর্ঘ-কাল মধ্যে ভারতবর্ষে যে সমস্ত পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং যদ্দারা ভারতবাসীরা অনির্ব্বচনীয় সুখস্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতেছেন, ইংরাজদিগের উদার শাসন প্রণালীই উহার প্রসূতিস্বরূপ।...মুসলমানদিগের রাজত্বকালে প্রজাদিগকে যে সমস্ত অত্যাচার ও পীড়া সহ্য করিতে হইয়াছিল, এক্ষণে ঐ সকল অত্যাচারের কথা শুনিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। সিরাজউদ্দৌলার রাজত্বকাল স্মরণ হইলে শরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। সে সম্বন্ধে ব্রিটিশ রাজ্যকে "রাম রাজ্য" বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। অত্যাচারের কথা দূরে থাকুক এক্ষণে কেহ কাহাকে একটী উচ্চ কথা বলিতে সমর্থ হয় না। প্রজাগণ নিশঙ্কচিত্তে ও পরম সুখে ব্রিটিশ রাজ্যে বাস করিতেছেন। এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে ভারতবর্ষের সৌভাগ্যসূর্য্য ক্রমশঃ উদয় হইতেছে।

যতদিন ভারতবর্ষে ইংরাজগণ রাজত্ব করিতেছেন এই কালের মধ্যে ইহার যে কত উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আমরা এক্ষণে যে সমস্ত উন্নতিলাভ করিয়াছি, তাহা কেবল ভারতেশ্বরীর উদার শাসনপ্রণালীর গুণ এবং তন্নিমিত্ত আমরা ইংরাজি শিক্ষার নিকটে ঋণী। প্রজাগণ শিক্ষিত না হইলে রাজা যে কখন সুখে রাজত্ব করিতে পারেন না, ইংরাজেরা এটী বিলক্ষণরূপে জানিয়া আমাদিগের বিদ্যা শিক্ষার্থ এত যত্নবান হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সে যত্ন বৃথাও হয় নাই। ইংরাজি শিক্ষা আমাদের সমাজে প্রচলিত করিবার নিমিত্ত প্রথমে তাহাদিগকে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ স্বীকার ও অর্থব্যয় করিতে হইয়াছিল। তখন আমাদের সমাজের আর এক প্রকার ভাব ছিল।

তখন নানা প্রকার কৌশল ও প্রলোভন দিয়া লোককে শিক্ষা দিতে হইয়াছিল। এত করিয়াও রাজপুরুষগণ ভারতবর্ষে ইংরাজি শিক্ষা প্রচলিত করিয়াছেন। এক্ষণে উহা যথার্থ উন্নতি সোপানে আরূঢ় হইয়াছে। ভারতবর্ষীয়গণ উহার যথার্থ স্বাদ গ্রহণ করিয়াছেন। এখন আর রাজপুরুষগণকে যত্ন করিয়া শিক্ষা দিতে হয় না। ইহারা নিজেই আগ্রহ সহকারে উহা শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এমন কি রাজপুরুষেরা উহার প্রতিবন্ধকতাচরণ করিলেও ইহার প্রতি নিবৃত্ত হন না। যে উদ্দেশে ইংরাজী শিক্ষা আমাদিগের সমাজে প্রচলিত করা হয় অধিকাংশে ঐ উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে।

যে সকল উদার ও প্রশস্তহৃদয় রাজনীতিজ্ঞেরা ভারতবর্ষে ইংরাজী শিক্ষা প্রচারে ব্যবস্থা করিয়া ছিলেন, তাঁহারা অপরিণামদর্শী বা যথার্থ রাজনীতি বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিলেন না। প্রজাগণ শিক্ষিত না হইলে রাজার রাজ্য করা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র এটী তাঁহারা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সে আশালতাও ফল পুষ্পে সুশোভিত হইতেছিল। এক্ষণে আর সে কাল নাই। সেরূপ উদারচেতা লোক নাই এবং সে রাজনীতিও নাই, এখন আবার সমুদায় বিষয়ের পরিবর্ত্তন হইতে চলিল। এই সকল পরিবর্ত্তন এক্ষণকার বর্ত্তমান রাজপুরুষগণের সংকীর্ণহৃদয়তা ও যথার্থ রাজনীতি বিষয়ে অনভিজ্ঞতা হইতেই উদ্ভূত। প্রজারা এতকাল যে সকল স্বত্ব ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন, ইঁহারা এক্ষণে সেই সকল স্বত্ব লোপের চেষ্টায় আছেন ইঁহারা ভাবেন প্রজাদিগের যতই পশুবৎ শাসন করা যাইবে, যতই ইহাদের প্রতি অনুদার ব্যবহার করা যাইবে, ততই তাঁহারা ভারতবর্ষবাসীদিগের উপরে সুখে রাজত্ব করিতে পারিবেন অন্যথা ইহাদিগের প্রতি উদার ব্যবহার করিলে বা ইহাদিগকে উন্নতি করিয়া শাসন করিতে গেলে তাঁহাদিগের সুখে রাজত্ব করা যাইবে না।

তাঁহাদিগের এই রাজনীতি যারপর নাই অনুদার ও কুসংস্কার-সমষ্টি। সম্প্রতি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট উচ্চতর শিক্ষা সম্বন্ধে যে রাজনীতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাই আমাদিগের অদ্যকার এই প্রস্তাব অবতারণার মূল। ভারতবর্ষে উচ্চতর শিক্ষা প্রচলিত থাকিলে পরিণামে ইংরাজ রাজত্ব বিপদাপন্ন হইবে বর্ত্তমান রাজপুরুষগণ এই আশঙ্কা করিয়া যাহাতে শীঘ্র ইহার লোপ হয় তদ্বিষয়ে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। ভারতবর্ষবাসীরা শিক্ষিত হইলে ক্রমে তাঁহাদিগের ক্ষমতার হ্রাস হইবে, ইহারা তাঁহাদিগকে রাজ্যচ্যুত করিবেন এরূপ মনে করা নিতান্ত ভ্রমের কার্য্য। প্রজাগণকে শিক্ষিত না করিলে রাজা কখনই সুখী হইতে পারে না। অশিক্ষিত প্রজা হইলে রাজা যে নিশ্চিন্ত হইবেন তাঁহার কোন বিপদ আপদের ভয় থাকিবে না ইহার অর্থ কি? অশিক্ষিত লোকে কি যুদ্ধ করিতে অক্ষম? তাহা হইলে সাঁওতালেরা কখনই যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইত না। পৃথিবীর মধ্যে রোমকদিগের ন্যায় বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন ও সভ্যজাতি আর ছিল না? গলেরা যারপর নাই অসভ্য ও অশিক্ষিত ছিল কিন্তু সেই রোমকেরা কিরূপে গলদিগের দ্বারা পরাজিত হইল, গলেরা অশিক্ষিত বলিয়া কি যুদ্ধ করিতে অসমর্থ হইয়াছিল বরং শিক্ষিত শত্রুও ভাল তথাপি অশিক্ষিত মিত্র কিছু নহে। সিপাহীদিগের বিদ্রোহকালে যে সকল হৃদয়বিদারক ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, তাহারা শিক্ষিত হইলে কি সেইরূপ নৃশংস আচরণ করিতে সমর্থ হইত, তাহারা বিজিত হইলে ইংরাজেরা কি তাহাদিগের প্রতি সেইরূপ অমানুষিক ব্যবহার করিতেন? অশিক্ষিত মিত্র হইতে যেরূপ অপকার সম্ভাবনা, শিক্ষিত শত্রু হইতে সেইরূপ অপকারের সম্ভাবনা অল্প। ইহার দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে প্রজাদিগকে মূর্খ রাখিয়া বা তাহাদিগকে সামান্যমাত্র বিদ্যাদান করিয়া

রাজত্ব করা যারপর নাই বিড়ম্বনা। ইহার দ্বারা অনিষ্ট বিনা ইষ্টলাভের সম্ভাবনা নাই। এতদুপলক্ষে আমাদিগের একটি গল্প মনে পড়িয়া গেল এস্থলে উহার অবতারণা অপ্রাসঙ্গিক হইতেছে না। একজন ধনী তাঁহার পুত্রকে ইংরাজি লেখাপড়া শিখিতে দিতেন না তাহার কারণ এই যে ইংরাজি শিক্ষা করিয়া পুত্র পরিণামে সন্ধ্যাআহ্নিক পরিত্যাগ করিবে এই নিমিত্তই তিনি তাহাকে শিক্ষা দেন নাই। পরিশেষে সেই পুত্র তাঁহার পক্ষে বিষম কষ্টের হইয়া উঠিল। মূর্খ হইলে মানুষের যে যে দোষ ঘটিয়া থাকে তাহার সে সমুদায়ই ঘটিয়াছিল। সেই পুত্রেব নিমিত্ত তাঁহাকে যে কতই কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। তখন তাহাকে পূর্ব্ব সংস্কারের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইয়াছিল। পুত্রকে অশিক্ষিত করিয়া রাখিবার ফল তখন তিনি বিলক্ষণরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

আমাদিগের বর্ত্তমান রাজপুরুষগণও সেইরূপ সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন পরিণামে যে ফলও সেইরূপ হইবে তাহারই বা আশ্চর্য্য কি? প্রজারা শিক্ষিত হইলে রাজার কোন বিপদ উপস্থিত হইলে সেটি তাহারা সাধারণ বিপদ জ্ঞান করিবে। রাজার সহিত তাঁহাদিগের সমদুঃখসুখতা জন্মিবে। রাজার কোন বিষয়ে ভ্রম দর্শন করিলে তাহারা সে ভ্রম দেখাইয়া দিতে পারিবে। রাজা তাহাদিগের নিকট হইতে সময়ে সময়ে বহুতর সাহায্যলাভ করিতে পারেন। যথায় রাজা ও প্রজা উভয়ের এই প্রকার ভাব তথায় কোন বিশৃঙ্খলাই স্থানপ্রাপ্ত হয় না, সে রাজ্য যথার্থ সুখের স্থান হইয়া উঠে। আর যেখানে বিজিতের মধ্যে পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস কৃতজ্ঞতাস্বীকার ও সমদুঃখসুখতা নাই সেখানে সর্ব্বদাই বিপদাশঙ্কা, সে অবস্থাতে কেহই সুখী হইতে পারে না। আমরা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি কি নিমিত্ত কৃতজ্ঞ আছি, তাঁহাদিগের প্রদত্ত শিক্ষাই সেই কৃতজ্ঞতার কারণ নহে, সামান্য ধনপ্রাণ রক্ষার নিমিত্ত রাজা কখনই প্রজার যথার্থ কৃতজ্ঞতাভাজন হইতে পারেন না। আমরা যে নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের কৃতজ্ঞ হইয়া আছি, এক্ষণে উচ্চতর শিক্ষা বন্ধ হইলে তাঁহারা ভবিষ্যদ্বংশীদিগের নিকটে কোন্ বিষয়ের জন্য কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন?

ভারতবর্ষীয়দিগের উন্নতি এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের চক্ষুশূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পাঞ্জাবী মন্ত্রীগণ লাড মেয়কে প্রবৃত্ত দিয়া যাহাতে উচ্চতরশিক্ষা বন্ধ হয় তদ্বিষয়ে বদ্ধপরিকর হইয়া লাগিয়াছেন। এবিষয়ে কেবল লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর গ্রে সাহেব শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর আমাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন কিন্তু তাঁহারাই বা কি করিবেন, কে তাঁহাদের বাক্যে কর্ণপাত করেন। যাহা হউক তাঁহারা স্ব স্ব কর্ত্তব্যের প্রতি মনোযোগী হইয়া আমাদের যথার্থ কৃতজ্ঞভাজন হইয়াছেন। গ্রে সাহেব শিক্ষা সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের সহিত যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না বলিয়া তিনি ভগ্নান্তঃকরণে ১৮৭০ অব্দের শেষে পদত্যাগ করিতেছেন। ইহা অপেক্ষা

দুঃখের বিষয় আর কি আছে। গবর্ণমেণ্ট কি বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, কেহই তাঁহাদিগের সেই ভ্রম বুঝাইয়া দিতে সমর্থ হইতেছে না। তাঁহারা নিজে যাহা বুঝিয়াছেন তাহাই ন্যায় ও যুক্তি বিজৃম্ভিত। আর দেশ শুদ্ধ লোকে যাহা বলিবে তাহা ভ্রমপূর্ণ অযুক্তিযুক্ত, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি আছে?

উপসংহারকালে আমরা গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা এই দূষিত রাজনীতিকে পরিত্যাগ করুন। তাঁহারা কি মনে করিয়াছেন আমাদিগকে অনভিজ্ঞ রাখিলেই চিরকাল ভারতবর্ষ নির্ব্বিবাদে শাসন করিতে পারিবেন। পৃথিবীর মধ্যে কোন রাজাই এরূপ ঘৃণিত রাজনীতি অবলম্বন করিয়া শাসন করেন নাই। সকল রাজ্যেরই নাশ আছে, সময়ে যে ব্রিটিশ রাজ্য নাশপ্রাপ্ত হইবে না, তাহারই বা প্রমাণ কি? এক্ষণ হইতে শিক্ষা বন্ধ হইলে ভারতবর্ষে আর একজনও উপযুক্ত লোক পাওয়া যাইবে না। এক শত বৎসর পরে ইতিহাস লেখকগণ কি এই লিখিয়াছেন যে লর্ড মেয়ের অভূত-পূর্ব্ব ও ভ্রমপূর্ণ রাজনীতি নিবন্ধন ভারতবর্ষে এ পর্য্যন্ত একজন উপযুক্ত ও বিদ্বান লোক জন্মগ্রহণ করেন নাই, তখন লার্ড মেয় তৎকালবাসীদিগের নিকটে কিরূপ লোক বলিয়া পরিচিত হইবেন। লার্ড মেয় যথাকালে ভারতবর্ষে আগমন করেন তখন আমরা তাঁহাকে একজন উপযুক্ত ও রাজনীতিজ্ঞ ও আমাদিগের যথার্থ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু আমরা সে বিষয়ে ভ্রমে পতিত হইয়াছিলাম। তিনি শিক্ষা সম্বন্ধে যেরূপ আমাদের বিপক্ষে লাগিয়াছেন তাহাতে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা অল্প এতএব তিনি যে এ বিষয়ে মত পরিবর্ত্তন করেন এই আমাদিগের ইচ্ছা।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাসংক্রান্ত রাজনীতি। ১০ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৭

সম্পাদকীয়

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা সংক্রান্ত রাজনীতির প্রতিবাদ করা একান্ত আবশ্যক হইতেছে। কেবল সংবাদপত্র সম্পাদকদিগের চেষ্টায় ইষ্টলাভ সম্ভাবনা নাই। লার্ড মেয়র মতি পরিবর্ত্ত হইবে, এ আশা করা বিফল। লার্ড আর্গাইলের ত কথাই নাই। মহাসভা ও ইংলণ্ডে সর্ব্বসাধারণের নিকট আবেদন করিতে হইবে। যে দিবস কেশবচন্দ্র সেন মার্টিনোর চাপেলে বলেন, ইংলণ্ড বিদ্যাদান করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা আমাদিগের অধিক উপকার করিয়াছেন, সেদিন সকল ইংরাজই একবাক্যে এই কথা যথার্থ্য স্বীকার করিয়াছেন। ইহার তুল্য অস্বার্থপরতা উদারতা ও হিতৈষিতার কার্য্য দ্বিতীয় লক্ষিত হয় না। এই নিমিত্তই আমরা এত কৃতজ্ঞ। এই কারণেই যাবতীয় কৃতবিদ্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের এত গোঁড়া হইয়াছেন। রাজনীতি সম্বন্ধে কৃতবিদ্য ও অকৃতবিদ্য ভারতবর্ষীয়ের বাদানুবাদ উপস্থিত হইলে কৃতবিদ্যেরা যে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ সমর্থন করেন, এ কথা কোন ব্যক্তি

না জানেন? তথাপি লার্ড মেয়ের গবর্ণমেণ্ট এই সকল লোককে শত্রুজ্ঞান করিয়া ইংরাজী শিক্ষা এককালে বন্ধ করিবার চেষ্টায় আছেন। লার্ড লরেন্সের উচ্চশিক্ষা বন্ধ করিবার সম্পূর্ণ ইচ্ছা ছিল। বর্ত্তমান গবর্ণর জেনেরলেরও এই মত।·· দেশীয় ভাষা ভিন্ন অন্য ভাষায় শিক্ষা দেওয়া না হয়, তিনি এই প্রস্তাব করিয়াছেন। আমরা যদি ইহার গূঢ় বৃত্তান্তটি ইংলণ্ডস্থ সর্ব্বসাধারণের গোচর না করি, তাঁহারা লার্ড মেয়ের রাজনীতি অনুমোদন করিতে পারেন। তাঁহারা এরূপ ভাবিবেন জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি সাধনচেষ্টা উদারতার-কার্য্য সন্দেহ নাই। তাঁহারা কুম্ভের উপরিভাগের অমৃত ভাগ দর্শন করিয়া সন্তুষ্ট হইবেন, কিন্তু কুম্ভের মধ্যে যে কালকূট বিষ আছে তাহা দেখিতে পাইবেন না। আমরা বারম্বার বলিয়াছি, পুনর্ব্বার বলিতেছি আমাদিগের বর্ত্তমান উন্নতি বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের চক্ষে অতিশয় উদ্বেগকর হইয়াছে। আমাদিগকে পশুবৎ করিয়া রাখিয়া শাসন করা তাঁহাদিগের অভীষ্ট। পারিস ও বঙ্গদেশে ধূর্ত্ততা যেমন ধরা পড়ে আর কোথাও এমন ধরা পড়ে না। এই দুই স্থানে অসারলোকের প্রশংসা পাবার যো নাই। কেবল বাক্যে হয় না, কার্য্যে সারবত্তা প্রদর্শন করিতে হয়। বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট তাহা করিতে পারিতেছেন না। আপনাদিগের ভ্রম সংশোধনের চেষ্টা হইল না, যে ক্ষমতার গুণে সর্ব্বসাধারণে সেই ভ্রম প্রদর্শন করেন সেই ক্ষমতার মূলে আঘাত করা হইতেছে। এতদপেক্ষা অনুদারতা আর কি আছে? আমরা কি এই জঘন্য রাজনীতি দর্শন করিয়াও চুপ করিয়া থাকিব? আমাদিগের কি পুনরুজ্জীবিত সভ্যতাতরু বিনষ্ট হইবে? আমাদিগের শাসনকর্ত্তৃগণের কার্য্যে নিষেধ করিবার ক্ষমতা নাই, কিন্তু এক ক্ষমতা আছে, আমরা শাসনকর্ত্তাদিগের অবিমৃষ্যকারতার প্রতিবাদ করিতে পারি। প্রতিবাদ করিলে ইংলণ্ডের লোকেরা তন্নিবারণ চেষ্টা করিবেন সন্দেহ নাই। ইহা না করিলে তাঁহারা কোন্ মুখে ইউরোপের অন্যান্য গবর্ণমেণ্টের নিকট আপনাদিগকে উদার বলিয়া পরিচয় দিবেন? কোন্ গুণে তাঁহারা রুশীয়াকে পোল্যাণ্ডের প্রতি সদ্বিচার করিতে বলিবেন? অতএব আমরা প্রস্তাব করিতেছি প্রতি নগরে প্রতি গ্রামে এক এক সভা হইয়া প্রতিবাদ প্রেরিত হউক। আমরা অবগত হইলাম ভারতবর্ষীয় সভা কলিকাতার সর্ব্বসাধারণকে আহ্বান করিয়া আবেদন করিবেন। ভারতবর্ষীয় সভার সাহায্য করা সকলেরই কর্ত্তব্য। আমরা কৃতবিদ্য মাত্রকে এ বিষয় অনুরোধ করিতেছি। তাঁহাদিগের চেষ্টার উপরে ভারতবর্ষের সভ্যতা নির্ভর করিতেছে। আমরা যদি কৃতকার্য্য হই উন্নতির স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকিবে। আর যদি লার্ড মেয়ের রাজনীতি ইংলণ্ডের অনুমোদিত হয় তাহা হইলে এই উন্নতি এককালে রুদ্ধ হইবে। ইহার তুল্য বিপদ এদেশের আর নাই। অতএব এসময়ে এতন্নিবারণের চেষ্টা না করিলে মাতৃভূমির নিকটে নিতান্ত অকৃতজ্ঞ হইতে হইবে সন্দেহ নাই।

দেশীয় ভাষায় উচ্চশিক্ষা হইবার সম্ভাবনা আছে কি না? ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৭

লর্ড মেয যে গবর্ণমেণ্টের শীর্ষস্থানে ধ্রুব নক্ষত্রের ন্যায় শোভা পাইতেছেন, সেই গবর্ণমেণ্টের মত এই যে দেশীয় ভাষায় বিদ্যাশিক্ষা দিয়া এদেশীয়দিগকে উচ্চতম শিক্ষাগুণ সম্পন্ন করিয়া তুলিবেন। এই মতটাকে যে কিরূপে ভ্রমাত্মক বলিয়া আমরা আদর করিব তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। স্বার্থজ্ঞান ব্যতিরেকে কোন বিষয়েই কাহার অভিনিবেশ প্রবৃত্তি হয না। সানুরাগ প্রবৃত্তি ব্যতিরেকেও কোন বিষয়ের শ্রীবৃদ্ধিলাভ সম্ভাবিত নহে। ধর্ম্ম যে এমন আদরণীয় পদার্থ, স্বর্গমোক্ষাদির লাভের লোভ না থাকিলে তাহাতেও মানুষের প্রবৃত্তি হওয়া দুর্ঘট হয। যাহাতে প্রোৎসাহন ও অর্থলাভের সম্ভাবনা আছে, তাহার শীঘ্রতর উন্নতি নয়নগোচর হইয়া থাকে। যাহাতে তাহা নাই, তাহার উন্নতি নাই। এই অন্বয ব্যতিরেকে কি ধর্ম্ম সংস্কৃত ভাষার প্রতি পরিস্ফুটরূপে লক্ষিত হইতেছে। এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় সংস্কৃত ভাষার উৎসাহদাতা লোক নাই, এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় সংস্কৃত ব্যবসায়িদিগের অর্থলাভ হয় না, সুতরাং সংস্কৃতের দুর্দ্দশা ঘটিযাছে. যে সংস্কৃত ভাষার প্রতি এদেশের লোকের অচলা ভক্তি তাহারই যখন উৎসাহবিরহে নিতান্ত হীনদশা ঘটিল তখন অলব্ধপ্রতিষ্ঠ দেশীয ভাষায যে উচ্চতর বিদ্যালাভ হইবে, তাহার সম্ভাবনা কি? দেশীয ভাষা রাজভাষা নয়, দেশীয ভাষায রাজকার্য্য নির্ব্বাহ হয না। সুতরাং ইহাতে অর্থাগম হইবার সম্ভাবনা অল্প। যাহাতে অর্থাগমের সম্ভাবনা থাকে, লোকে কি সেইদিকেই উর্দ্ধশ্বাসে ধাবমান হয না? বিদ্যা শিখিব বলিয়া কয়জন বিদ্যা শিখিতে যায। অধিকাংশ লোকেই বিদ্যাকে অর্থাগমের দ্বার বলিয়া বিবেচনা করেন। যে বিদ্যা অর্থকরী না হইল, সংসারী ব্যক্তির তদর্জ্জনে প্রবৃত্তি জন্মিবার সম্ভাবনা অল্প।

এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীযমান হইতেছে দেশীয ভাষায এদেশীয়দিগকে পাণ্ডিত করিয়া তুলিবার মত আর মূর্খ অথবা কিঞ্চিদজ্ঞ করিয়া রাখিবার মত উভয তুল্য। কিঞ্চিদজ্ঞতা অপেক্ষা মূর্খতা বরং ভাল। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কি এতদিনের পর এই স্থির করিলেন, এদেশীয়দিগকে কিছু কিছু লেখাপড়া শিখাইয়া এদেশের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিবেন? উল্লিখিত মতটি এদেশীয়দিগের দুর্ভাগ্য নিবন্ধনেই হইযাছে। আমরা বড় আশা করিয়াছিলাম, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধিকারে দেশে সাধারণ লোকের জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত হইয়া সকলেই সুখী হইবে এবং গবর্ণমেণ্টও সুখিত হইবে। সে আশা এককালে উন্মূলিত হইল।

শিক্ষা সংক্রান্ত রাজনীতির প্রতিবাদ। ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৭

সম্পাদকীয

ভারতবর্ষ সভা বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা সংক্রান্ত রাজনীতির বিরুদ্ধে আবেদন করিবার নিমিত্ত আগামী ২রা জুলাই শনিবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময়ে

টৌনহালে সভা হইবে। আমরা যা ইচ্ছা করিয়াছিলাম, সভা তাহাই করিলেন। বিলম্বে দিন স্থির করাতে মফস্বল হইতে অনেকে আসিতে পারিবেন। দেশের লোকে যে প্রকার বিরক্ত হইয়াছেন, তাহাতে অনেক স্থান হইতে প্রতিনিধি আসিবার সম্ভাবনা। তাঁহারা যথেষ্ট সময় পাইলেন। বঙ্গদেশ বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তা ও তাঁহার মন্ত্রীদিগের বিষনয়নে পতিত হইয়াছেন। এখানকার উন্নতি তাঁহাদিগের চক্ষুশূল হইয়াছে। এখন নিম্নশ্রেণীর শিক্ষার ভাগও দূরগত হইয়াছে। এবার পাঠশালাসমূহেও আর নূতন আনুকূল্য দেওয়া হইবে না। ইহাতে উর্দ্ধসংখ্যা এক লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হইত। লার্ড মেয়ো নিজে মৃগয়া সিমোলা বাস ভোজনৃত্য প্রভৃতির ব্যয় সংক্ষেপ করা আবশ্যক জ্ঞান করেন না! যত রোষ বঙ্গদেশের শিক্ষার প্রতি। লার্ড আর্গাইল তাঁহার কার্য্যের অনুমোদনকারী। পৃথিবীর দুর্ভাগ্য-নিবন্ধন এই ব্যক্তি ভারতবর্ষীয় সেক্রেটরী হইয়াছেন, যাহারা লার্ড মেয়ের রাজনীতির সহায়তা করেন তাঁহারাও বলেন, আর্গাইলের ন্যায় একগুঁয়ে লোক আর নাই। তাঁহার নিকটে আবেদন করা অরণ্যে রোদন করার সমান। কমন্স বাটীতে আবেদন না করিলে ইষ্টলাভের সম্ভাবনা নাই। মহাসভার প্রতিনিধিদিগের সকলে কিছু মন্দলোক নহেন। ইংলণ্ডে ভারতবর্ষের অনেক বন্ধু আছেন। ইঁহারা কদাচ আমাদিগের পক্ষ সমর্থনে বৈমুখ্য প্রদর্শন করিবেন না। বাবু কেশবচন্দ্র সেন ইংলণ্ডে অতিশয় প্রতিপত্তি-লাভ করিয়াছেন। এ বিষয়ের হিত চেষ্টা যদি তাহার অধর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান না হয় তাহা হইলে অনেক কাজ হইতে পারিবে। তিনি ইংলণ্ডের লোকদিগকে বুঝাইয়া বলিতে পারিবেন, বিদ্যাদানই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি আমাদিগের কৃতজ্ঞতার একমাত্র বন্ধন। ভারতবর্ষের যে কিছু শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে এই বিদ্যাই সে সমুদায়ের মূল। এই বিদ্যাকেই কেবল আমরা আমাদিগের বলিয়া অভিমান করিতে পারি। আর যে কিছু উন্নতি দৃষ্ট হয় তাহাতে আমাদিগের আত্মীয়তা জ্ঞান অল্প। বাণিজ্যপ্রণালী ভারতবর্ষের নহে, ইংলণ্ডের লাভ লক্ষ্য করিয়াই ইহা স্থির করা হইয়াছে। রেলওয়ে প্রভৃতিরও সৈন্য গমনাগমনের সুবিধা ও বাণিজ্যের উন্নতি প্রধান লক্ষ্য। এক্ষণে প্রক্রান্ত বিষয়ে বক্তব্য এই যে, এই যাঁহারা সভায় আগমন করিবেন, তাঁহারা যেন অর্থ দ্বারা এ বিষয়ে বিশিষ্টরূপ সাহায্যদান করেন। এ বিষয়ের অনুষ্ঠান ব্যক্তি শ্রেণী অথবা সম্প্রদায় বিশেষের নিমিত্ত হইতেছে না। সমুদায় ভারতবর্ষের মঙ্গলার্থ হইতেছে। বোম্বাই, মান্দ্রাজ, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও পঞ্জাবের প্রধান প্রধান লোকদিগেরও সাহায্যদান উচিত। তাঁহারা জানিবেন অদ্য বঙ্গদেশের ভাগ্যে যে ব্যবস্থা হইল কল্য তাঁহাদিগের ভাগ্যেও তাহা হইবে। এ সময়ে চেষ্টা না পাইলে উচ্চশিক্ষার পথ এককালে রুদ্ধ হইয়া যাইবে।

গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা সংক্রান্ত রাজনীতির প্রতিবাদার্থ সভা। ৭ আষাঢ় ১২৭৭

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এদেশীয়দিগের উদার বিদ্যাদানের বিরোধী হইয়াছেন। ইহাতে এদেশের যাবতীয় লোকে যারপরনাই ক্ষুভিত দুঃখিত ও চঞ্চলিত চিত্ত হইয়া উঠিয়াছেন। আমরা চতুর্দ্দিক হইতে সমাচার পাইতেছি, স্থানে স্থানে গবর্ণমেণ্টের উল্লিখিত গর্হিত রাজনীতির প্রতিবাদার্থ সভা হইতেছে। ইনকমটাক্স প্রভৃতির প্রতিবাদার্থ যে সমস্ত সভা হয়, এ সভাগুলি তাহার অপেক্ষা সহস্রগুণে আমাদিগের অধিকতর আহ্লাদকর। অর্থের অসঙ্গতি হেতু করিয়া ইনকমটাক্স করা হইয়াছে। সচ্ছল হইলেই উহা রহিত করা হইবে, এ আশা আছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এদেশীয়দিগের উদার শিক্ষাদান বন্ধ করিতে যে উদ্যত হইয়াছেন, তাহার হেতু ও ধাতুব নহে। গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে শোচনীয় কুসংস্কারগ্রস্ত হইয়াছেন। এ কুসংস্কার বদ্ধমূল হইলে ইহার পর উহার উন্মূলন সম্ভাবনা থাকিবে না। তাঁহারা ভাবিতেছেন, এতদ্দেশীয়দিগকে যত ভাল করিয়া লেখাপড়া শিখাইতেছেন, ততই তাঁহাদিগের বিপত্তি ঘটিবার সম্ভাবনা হইতেছে ইহাব তুল্য কুসংস্কার আর নাই। বিদ্রোহানুরাগিতা প্রভৃতি কুক্রিয়া উদার বিদ্যাশিক্ষার ফল নহে। বিদ্যা তেজঃপদার্থ ও কুক্রিয়া অন্ধকার তুল্য। উভয়েব সমানাধিকবণ্য সম্ভাবিত নয়। মহাপণ্ড চাণক্য বেকন প্রভৃতি ইহাই প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন, বরং "পণ্ডিত শত্রুত্বং নচ মূর্খেন মিত্রতা।" পণ্ডিতের শত্রুত্ব ভাল, কিন্তু মূর্খের সহিত মিত্রতা কিছু নয়। উহার তাৎপর্য্য কি? পণ্ডিত হইলে মানুষেব হিতাহিত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান হয়। কাহার সহিত শত্রুতা জন্মিলেও বিদ্বান ব্যক্তি বৈরসাধনার্থ অকর্ত্তব্য কার্য্যেব অনুষ্ঠানে প্রাণান্তেও প্রবৃত্তিবিধান করেন না। পক্ষান্তবে মূর্খের সহিত বন্ধুত্ব থাকিলেও স্বার্থানুরোধে সে অনায়াসে মিত্রের সর্ব্বনাশ করিতে পারে। পণ্ডিত ও মূর্খ প্রজায় প্রভেদ এই, পণ্ডিতেরা গবর্ণমেণ্টের অবিমৃষ্যকারিতা নিবন্ধন আপনাদিগের কষ্ট উপস্থিত হইলে গবর্ণমেণ্টের সহিত বাগযুদ্ধ করিয়া তাহার প্রতিকাব চেষ্টা করেন, আব মূর্খেরা মৌনাবলম্বী থাকিয়া অস্ত্রযুদ্ধ দ্বারা তাহার উপশম চেষ্টা পায়।

অপর, গবর্ণমেণ্ট উদার শিক্ষা বন্ধ করিয়া সামান্য শিক্ষাদান করিয়া আপনাদিগের বিদ্যাদাতা নামক্রয় করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। এটীও তাঁহাদিগের কুসংস্কারান্তরের বিজৃম্ভন মাত্র। প্রজারা অল্পজ্ঞ হইলে কেবল যে তাহারাই পরস্পর অসুখী হইবে এরূপ নয়, গবর্ণমেণ্টকেও যাবপরনাই অসুখিত করিয়া তুলিবে। অল্পজ্ঞ হইতেই অধিকাংশ কুক্রিয়া প্রাদুর্ভূত হয়। গবর্ণমেণ্ট যদি অল্প শিক্ষা দিয়া অত্রত্য লোকদিগকে অল্পজ্ঞ করিয়া তুলেন, এই ভারতবর্ষ অদ্ভুত ভারতবর্ষ হইয়া উঠিবে।

শিক্ষা সংক্রান্ত রাজনীতি। ১৪ আষাঢ় ১২৭৭

সম্পাদকীয়

আমরা সংবাদ পাইতেছি গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাসংক্রান্ত রাজনীতির প্রতিবাদ করিবার নিমিত্ত অনেকে কলিকাতায় আসিবার মানস করিয়াছেন। কৃতবিদ্যমাত্রেরই প্রতিবাদ চেষ্টা করা উচিত। কলিকাতায় সভা হইবার পুর্ব্বে মফস্বলের স্থানে স্থানে সভা করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে দেশের সমুদায় লোক যে প্রতিবাদী তাহা স্বপ্রমাণ হইবে। ইহা না করিলে আমাদিগের শত্রুগণ ইংলণ্ডের লোকদিগকে বলিবেন রাজধানীর কয়েক ব্যক্তি মাত্র প্রতিবাদ করিয়াছে, কিন্তু দেশের আর সকল লোক গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবিত রাজনীতিতে অসন্তুষ্ট নহেন।

আমরা সকলকে পরামর্শ দিতেছি যেন বৃথা বাগাডাম্বর ও গবর্ণমেণ্টের প্রতি কটূবাক্য প্রয়োগ করা না হয়। ইহাতে কাজ হয় না। যথোচিত সম্মানসহকারে আপনাদিগের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা পাওয়াই কর্ত্তব্য। ব্যক্তি বিশেষকেও গালি দেওয়া বিধেয় নয়। আমরা আরও সকলকে অনুরোধ করিতেছি যেখানে যেখানে সভা হইবে তত্তৎ স্থানের কার্য্যবিবরণ অবিলম্বে ভারতবর্ষীয় সভায় যেন প্রেরিত হয়।

সংবাদ আসিয়াছে লার্ড আর্গাইল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভঙ্গ করিয়া শিক্ষার নামে ভূমির উপরে কর করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। কেবল জমিদার নহেন, যে ব্যক্তির কোন প্রকারে ভূমির সহিত সংস্রব আছে তাহাকে "শিক্ষা কর" দিয়া বিলক্ষণ শিক্ষা পাইতে হইবে। বর্ত্তমান সময় আমাদিগের অতিশয় দুর্ভাগ্যের সময় সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সহিত সাম্রাজের সভ্যতম প্রদেশের মতভেদ হওয়া আত্যন্তিক ক্ষোভের বিষয়। কিন্তু ঘটনার উপরে কাহারও ক্ষমতা নাই। পৃথিবীর কোন শাসনকর্ত্তা উদারপ্রণালী স্বেচ্ছাপুর্ব্বক স্থাপন করেন নাই। সর্ব্বত্রই প্রজাগণ শাসনকর্ত্তার নিকট হইতে বলপুর্ব্বক স্বত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদিগের দেশেও সেই স্বাভাবিক নিয়মানুসারে কাজ করিবার সময় আসিয়াছে। অতএব কিছুদিন দেশের বর্দ্ধনশীল সভ্যতার সহিত গবর্ণমেণ্টের অনুদারতার বিরোধ সম্ভাবনা হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহাতে অমঙ্গল সম্ভাবনা নাই। শেষ ফল সভ্যতার জয়-লাভ এবং উভয় পক্ষে পরস্পরকে অধিক সম্মান করিতে শিখিবে। এই কারণেই আমরা স্বদেশীয়দিগকে বদ্ধপরিকর হইয়া রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইতে অনুরোধ করিতেছি। আমরা শুনিতে পাইতেছি, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট প্রস্তাব করিয়াছেন, বঙ্গদেশের শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টরেরও ইনস্পেক্টরের পদ উঠাইয়া দিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অধীন একজন ইনস্পেক্টর-জেনরল রাখা হইবে। ইহার সহিত বঙ্গদেশী গবর্ণমেণ্টের কোনপ্রকার সংস্রব থাকিবে না। মফস্বলের যাবতীয় কলেজ উঠিয়া গিয়া

হাইস্কুল হইবে। প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদের বেতন ২০৲ টাকা হইবে। অন্য অন্য বিদ্যালয়ের বেতন বৃদ্ধি হইবে এবং অধিকাংশ জেলা স্কুলের লোপ করা হইবে। যেমন বাজার পড়িয়াছে, তাহাতে লাড আর্গাইলের নিকটে এই সকল প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইবে, এরূপ বোধ হয় না। কারণ তিনি এতদ্দেশীয়দিগের সভ্যতাকে সাম্রাজ্যের বিপদের কারণ জ্ঞান করিয়া থাকেন। লাড আর্গাইল ইংরাজী সংবাদ পত্রও বড় পাঠ করেন না। তিনি যখন কোন কার্য্য করেন, তৎকালে সংবাদ-পত্রের রিপোর্টারেরা বহিষ্কৃত হন। যখন স্বদেশীয়দিগের প্রতি এই ভাব তখন আমরা দরিদ্র বাঙ্গালা আমাদিগের প্রতি কিরূপ ভাবের উদয় হইবে, তাহা সহজেই অনুমানিত হইতেছে। এই কারণেই আমরা বলিতেছি আমাদিগের অবস্থা ইংলণ্ডের লোকের গোচর করা একান্ত কর্ত্তব্য। তাহা করিলে তাঁহারা কোন ক্রমেই এই রাজনীতির অনুসারে কাজ করিতে দিবেন না। তাহারা ইউরোপ ও আমেরিকার নিকটে, সভ্যতার শত্রু বলিয়া পরিচিত হইতে লজ্জা জ্ঞান করিবেন সন্দেহ নাই। আমরা তন্নিমিত্ত প্রস্তাব করিতেছি ২ জুলাইয়ের যে সভা হইবার কথা আছে তাহা না হইয়া আর কিছুদিন বিলম্ব করা কর্ত্তব্য। অপর, যে সময়ে আমাদিগের আবেদন ইংলণ্ডে উপনীত হইবে, তখন মহাসভা ভঙ্গ হইবে। জুড়াইয়া গেলে কাজ হওয়া কঠিন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাসংক্রান্ত রাজনীতির প্রতিবাদকারিণী সভা

২৮ আষাঢ় ১২৭৭

আমরা গতবারে এই সভার সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্তমাত্র পাঠকগণের নিকট গোচর করিয়াছিলাম, এই হেতু পুনরায় ঐ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা হইতেছে। বেলা ঠিক ৩ টার সময়ে টৌনহালে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। বাবু রমানাথ ঠাকুর সকলের সম্মতিক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া সভার উদ্দেশ্য বর্ণনা করিলে পর মফস্বলের কয়েক-জন প্রতিনিধি আপন আপন মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। অনন্তর সভাপতির মতানুসারে রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর এই প্রস্তাব করিলেন: এই সভার মত এই, যে লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিক যে শিক্ষা প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া যান এবং তাঁহার পর পর গবর্ণর-জেনেরলেরা যাহাতে উৎসাহ দান করেন, তদ্দ্বারা অর্থাৎ ইংরাজি শিক্ষা দ্বারা এদেশের সমাজ ধর্ম্মনীতি ও বুদ্ধি সম্বন্ধে অনেক উপকার হইয়াছে। এক্ষণে ইংরাজি কালেজ ও বিদ্যালয়ের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টে যে সাহায্য দিতেছেন, তাহা রহিত ও ন্যূন করিলে তাহা এদেশের দুর্ভাগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। অনন্তর তিনি এক দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া নিজ প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন। আমরা দুঃখিত

হইতেছি বক্তাদিগের বক্তৃতাগুলি অবিকল অনুবাদ করিয়া দিতে পারিলাম না। সোমপ্রকাশে তত স্থান নাই! রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ বলিলেন, শিক্ষার নিমিত্ত সাধারণ ধনাগার হইতে সকল দেশে ব্যয় করা হয়। ভারতবর্ষ একমাত্র উদাহরণ নহে। নিম্নশ্রেণীর শিক্ষা দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য, কিন্তু উচ্চতর ইংরাজি শিক্ষা বন্ধ করিয়া দেওয়া বিধেয় নহে। কেবল বাংলায় শিক্ষা দেওয়া সাধ্যায়ত্ত নহে। কারণ বঙ্গ-ভাষার প্রয়োজনানুরূপ গ্রন্থ নাই। আর গবর্ণমেণ্ট যে শিক্ষা দিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, সে শিক্ষা শিক্ষাই নহে। সামান্য লিখন পঠন ও অঙ্ক শিক্ষায় কি ইষ্টলাভ হইবে, ইংরাজি শিক্ষাদানে দেশবাসী ও গবর্ণমেণ্ট উভয়েরই মঙ্গল। এদেশীয়েরা সুশিক্ষিত হইলে শাসনকার্য্যে ব্যয় অনেক অল্প হইবে। যে টাকায় এদেশীয় কর্ম্মচারীগণ কাজ করেন, সেই প্রকার গুণ বিশিষ্ট ইউরোপীয় কর্ম্মচারি আনিতে অনেক ব্যয় পড়িবে।

বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র এক তীব্রতর বক্তৃতা করিযা এ প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়া বলিলেন, ইংরাজি শিক্ষা ভিন্ন এদেশেব কুসংস্কার দূব হইবার সম্ভাবনা নাই। এই নিমিত্ত রাজা বামমোহন রায় ইংরাজি শিক্ষার্থ আবেদন কবেন। এই নিমিত্ত লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিক ও মেকলে বর্ত্তমান প্রণালী স্থাপনার্থে যত্নবান হন। গবর্ণমেণ্ট বলেন আমরা বিনাব্যয়ে শিক্ষা পাইতেছি। একথা অমূলক। কাহার টাকায় আমাদিগেব শিক্ষা হইতেছে? তাহা কি আমরা কর স্বরূপ দিতেছি না? আর আমাদিগের নিমিত্ত অধিক ব্যয় হয় একথাও সম্পূর্ণ অলীক। অক্সফোর্ডে এক্ষণে উপদেশ শ্রবণের ব্যয় ৩৫ টাকা মাত্র হইয়াছে, কিন্তু বাঙ্গালী ছাত্রেবা ১৪ টাকা প্রদান করেন। ইটালি ও ফ্রান্সের গবর্ণমেণ্ট অপেক্ষা অধিক টাকা ব্যয করেন। বঙ্গদেশের শিক্ষার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট ৭ লক্ষ টাকা মাত্র ব্যয় দেন। যেখানে ১৮ কোটী টাকা আয়, সেখানে ইহা কি যথেষ্ট ব্যয়? জাতীয় ভাষা উত্তম বটে, কিন্তু ইউরোপীয় ভাষার দ্বারা অলঙ্কৃত করিবার পূর্ব্বে ইহাতে শিক্ষা হইতে পাবে না। জাতীয় ভাষা যাহা হইবে তৎপ্রতি আসক্ত থাকা যথার্থ দেশ-হিতৈষির কাজ নহে। যাহা যে ভাষায় ভাল তাহা গ্রহণ করাই যথার্থ কর্ত্তব্যকর্ম্ম।

বাবু কালীমোহন দাস এই প্রকার তীব্রতা সহকারে বক্তৃতা করেন। তিনি বলিলেন রাজস্ব বিভাগে অজ্ঞতা নিবন্ধন বর্ত্তমান গোলযোগ হইতেছে। আমাদিগের শিক্ষার নিমিত্ত যৎসামান্য ব্যয় হয়। অন্য অন্য অপব্যয় ধরিলে এ ব্যয় ব্যয়ই নহে। এক্ষণ পর্য্যন্ত যথেষ্ট শিক্ষা হয় নাই। ইহার মধ্যে ইংরাজি শিক্ষা বন্ধ করা অতিশয় অন্যায়। গবর্ণমেণ্টের রাজনীতির যে উদ্দেশ্য থাকুক না কেন, কার্য্যতঃ দেশকে মূর্খ করা হইতেছে। বাঙ্গালীদিগকেও বিদ্রোহী বলা অতিশয় অন্যায়। আমাদিগের সে ইচ্ছাও নাই, শক্তিও নাই। রাজভক্তি আমাদিগের ধর্ম্মের এক অঙ্গ। এমতস্থলে কাল্পনিক ভয়ে সভ্যতার প্রতি আক্রমণ করিয়া গবর্ণমেণ্ট ভাল কাজ করিতেছেন না।

দ্বিতীয় প্রস্তাব একবাক্যে গ্রাহ্য হইলে পর রাজা সত্যানন্দ ঘোষাল প্রস্তাব করিলেন, সভা ইংরাজি শিক্ষার দৃঢ় অনুমোদন করিতেছে বটে কিন্তু দেশীয় ভাষায় যাহাতে শিক্ষা হয় তাহা তাঁহাদিগের অনভিমত নহে। তবে সভার মত এই হইতেছে দেশীয় ভাষা শিক্ষার মূল স্থাপন প্রথমতঃ ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞানের উপরে করিতে হইবে। রাজা সংক্ষেপে বলিলেন ইংরাজি শিক্ষা বন্ধ করা আমাদিগের ন্যায় প্রজ্ঞাবৎসল গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য নহে।

বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র বলিলেন, ইংরাজি দ্বারা বিস্তর উপকার হইতেছে। বর্ত্তমান রাজনীতি অনুসারে কাজ হইলে অনিষ্ট হইবে।

বাবু চন্দ্রনাথ বসু এম. এ. বলিলেন গবর্ণমেণ্ট অন্যায় কাজ করিতেছেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের প্রতিনির্ধিস্বরূপ সভার কার্য্যের অনুমোদন করিতেছেন।

২৪ পরগণা জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ব্রডলি সাহেব বলিলেন, অন্ততঃ একজন ইংরাজ এই সভার প্রতি সমদুঃখসুখতা প্রকাশ করিতেছেন। উচ্চতর শিক্ষা নিবন্ধন আমরা উপযুক্ত ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও সদ্বক্তা উকিল পাইতেছি, এ লাভ সামান্য নহে। আমি ইউরোপের যাবতীয় দেশ ভ্রমণ করিয়াছি। বঙ্গদেশে যে মত ইংরাজীর আদর এমত কুত্রাপি নাই। গবর্ণমেণ্টের উচ্চতর শিক্ষা বন্ধ করিবার মানস ভাল নহে ; কারণ ব্রডলি সাহেবকে শ্রোতৃগণ বারম্বার প্রশংসা করিয়াছিলেন।

বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রস্তাব করিলেন যখন উচ্চতর উদার ইংরাজি শিক্ষাপ্রণালী দ্বারা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আপনাদিগের কর্ত্তব্য সাধন করিতেছেন, তখন তাঁহাদিগের উপকার আছে। ইহাতে শাসনের ব্যয় কম ও বাণিজ্য বৃদ্ধি হয়। গবর্ণমেণ্টের আইন সকলশ্রেণীর লোকেরা বুঝিতে পারেন এবং শাসনকর্ত্তাদিগের সহিত প্রজাগণের সমদুঃখসুখতার বন্ধন দৃঢ়তর হয়। বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় পীড়িত ছিলেন, তিনি প্রায় অন্ধ হইয়াছেন। তথাপি জাতি সাধারণ অমঙ্গলের প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, বিদ্রোহের সময়ে যদি একশত এতদ্দেশীয় কৃতবিদ্য অফিসর সেনাদলে থাকিতেন, তাহা হইলে বিপ্লবত্ত অকারণ রক্তপাত হইত না। সেকেলে হাওলদার প্রভৃতি ভাষা জানিতেন, তথাপি তাঁহারা কুসংস্কারহীন হইতে পারেন নাই। ইংরাজি শিক্ষা বন্ধ করিলে গবর্ণমেণ্ট উপযুক্ত কর্ম্মচারী কোথায় পাইবেন।

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়া বলিলেন, আমাদিগের শত্রুগণ ভাবিতে পারেন যে ভারতবর্ষীয় সভার কুহকে পড়িয়া আমি আসিয়াছি, কিন্তু তাহা নহে। আমি কৃষকপুত্র। দেশের যথার্থ অমঙ্গল দেখিয়া আসিয়াছি। কোন চিকিৎসক একজন পক্ষাঘাতাক্রান্ত রোগীকে চিকিৎসা করিতেছেন। রোগীর যেই সামান্য চৈতন্য হইল, অমনি ফি পাইলাম, অথবা পাইলাম না বলিয়া তাহাকে ত্যাগ করাতে যে দোষ, বঙ্গদেশের সামান্য শিক্ষা দেখিয়া শিক্ষাকার্য্য বন্ধ করাতে তাদৃশ

দোষ হইতেছে। মৌলভী মহম্মদ ইউসুফ এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিতেন, কিন্তু তিনি অনুপস্থিত থাকাতে বাবু যদুনাথ ঘোষ একটি যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা ইহার সহায়তা করিলেন। তিনি বলিলেন একখণ্ড ভূমি অনেক কষ্টে কর্ষিত হইয়াছে, বীজ বপন করা হইল, চারা কতক বড হইয়াছে এমত সময়ে সেই ক্ষেত্রকে অমনি ফেলিয়া এক বনপূর্ণ স্থান পরিষ্কৃত করিবার চেষ্টা যেমন নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ, উচ্চতর শিক্ষা বন্ধ সেই প্রকার হইতেছে। উচ্চতর শিক্ষার সহিত দেশীয় ভাষায় শিক্ষা দেওয়া উচিত। সকলে এক বাক্য হইয়া তৃতীয় প্রস্তাবটী গ্রাহ্য করিলেন।

বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল চতুর্থ প্রস্তাব করিলেন, কোন সভ্যদেশে কেবল ছাত্রদের বেতনে বড বড বিদ্যালয় চলে না। সকল দেশের গবর্ণমেণ্ট বিদ্যাদান করা কর্ত্তব্য জ্ঞান করেন, ভারতবর্ষে আরও ইহা করা উচিত। অন্য অন্য দেশ অপেক্ষা এখানকার ছাত্রগণ দারিদ্র। উপযুক্ত ইউরোপীয় অধ্যাপক রাখাতে ব্যয় অধিক হয়, অথচ ইঁহাদিগকে না রাখিলে নয়। অন্য অন্য দেশ অপেক্ষা বঙ্গদেশে সামান্য ব্যয়। পূর্ব্বতন রাজারা বরাবর শিক্ষার নিমিত্ত ব্যয় করিয়াছেন। ইংলণ্ডের রাজগণও ইহা করিয়াছিলেন।

বাবু আনন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঐ প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়া বলিলেন কেবল লাভের জন্য আমরা বিদ্যা শিক্ষা করি একথা মিথ্যা। এক্ষণে আমাদিগের স্বাধীন হইয়া কাজ করিবার ক্ষমতা নাই। এখন ইংরাজি শিক্ষা বন্ধ করিলে·· ন্যায় হইয়া উঠিবে।

বাবু বিপ্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্তাবের পোষকতা করিয়া বলিলেন, বঙ্গদেশে ৪০ লক্ষ বালক আছে। ইহাদিগের মধ্যে ১,৬১৬৭৪ জন মাত্র শিক্ষা করে। এই সংখ্যার মধ্যে ৪৫৬৮ জন বাঙ্গলা বিদ্যালয়ে আছে, দেশে ইংরাজি শিক্ষা বেশি হয় নাই, ইহাই তাহার প্রমাণ। এখানে ৭ লক্ষ মাত্র ব্যয় হয়। নিম্ন শ্রেণীকে শিক্ষা দেওয়া উচিত, কিন্তু কদাচ উচ্চতর শিক্ষা বন্ধ করা উচিত নহে।

বাবু দেবেন্দ্র মল্লিকের প্রস্তাবেও শ্রীগোপাল পাল চৌধুরীর পোষকতায় লার্ড-আর্গাইলের নিকটে এক আবেদন প্রেরণ করা স্থির হইল।

বাবু বিপ্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলেন জনরব উঠিয়াছে লার্ড আর্গাইল ভারত-বর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের রাজনীতির অনুমোদন করিয়াছেন। এমত অবস্থায় তাঁহার নিকটে আবেদন করা বৃথা। হাউস অব কমন্সে আবেদন করা উচিত। আর একজন প্রতিনিধিকে ইংলণ্ডে পাঠান কর্ত্তব্য। সর চারলস ট্রিবিলিয়ানকে অনুরোধ করিলে তিনিও আমাদিগের পক্ষ অবলম্বন করিবেন। বাবু কৃষ্ণদাস পাল বলিলেন আবেদন যাইবার পূর্ব্বে মহাসভা ভঙ্গ হইবে।

বাবু বিপ্রদাস বলিলেন, আরও ভাল। ইংলণ্ডীয় লোকদিগের মন আর্দ্র করিবার সময় পাইবেন। আমি সে প্রস্তাব করিলাম তাহার পরিবর্ত্ত করা উচিত কি না এ ভার ভারতবর্ষীয় সভার উপরে রহিল।

বাবু কালীমোহন দাস অনুমোদন করাতে প্রস্তাব গ্রাহ্য হইল।

মফস্বল হইতে যে সকল প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে ও সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল। সন্ধ্যাকালে সভা ভঙ্গ হয়। এ পর্যান্ত বৃহৎ দালানে, সিঁড়িতে ও নীচে স্থান হয় নাই। কয়েকজন ইউরোপীয় সভাস্থলে ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা কোন কথা বলেন নাই।

মিসনরিগণ ও এদেশের ইংরাজি শিক্ষা। ৬ শ্রাবণ ১২৭৭

জুলিয়স সিজর মৃত্যুকালে কহিয়াছিলেন "ব্রুটস তুমিও হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত আছ," আমরাও তেমনি বলিতেছি মিসনরিগণ। তোমরাও আমাদের উচ্চতর ইংরাজি শিক্ষার পথ বন্ধ করিবার চেষ্টায় আছ, কি লজ্জা। কি ক্ষোভ। মিসনরিগণ। তোমরা না এদেশের অবস্থা বিশেষরূপে জান বলিয়া অভিমান কর? এখন যদি গবর্ণমেণ্ট নিজের কলেজগুলি তুলিয়া দেন, এদেশের লোকেরা এখন যে প্রকার বিদ্বান হইতেছেন, তখন কি সেইরূপ হইতে পারিবেন? গবর্ণমেণ্ট কলেজের ছাত্রদের বেতনের আত্যন্তিক বৃদ্ধি করিলে মধ্যশ্রেণীর কয়জন বালক তথায় অধ্যয়ন করিতে সমর্থ হইবে? গবর্ণমেণ্ট কালেজে অধ্যয়ন করিয়া যাহারা সবিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছেন, কয়জন ভাগ্যবন্ত লোকের সন্তান তন্মধ্যে আছেন, মিসনরিগণ তোমরা কি তাহা জান না? জান না এ কথাই বা কিরূপে বলি। তোমরা লার্ড আর্গাইলকে যে আবেদনপত্র প্রেরণ করিতেছ, তাহার সপ্তম পরিচ্ছেদে দৃষ্টি হইল, তোমরা এই বাক্যের যথার্থ স্বীকার করিয়াছ কিন্তু স্বভিপ্রায়সিদ্ধির ব্যাঘাত সম্ভাবনায় স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিতে সাহসী হও নাই। তোমাদিগের আবেদনের ভাবে বোধ হইতেছে, তোমাদিগের মত এই ভাবে মধ্যমশ্রেণীর লোকের সন্তানদিগের অপেক্ষাও ইতরশ্রেণীর সন্তানদিগকে লেখাপড়া শিখান অধিকতর আবশ্যক। এইহেতু তোমরা প্রথমোক্তদিগের শিক্ষার ব্যয় হরণ করিয়াও শেষোক্তদিগের বিদ্যাশিক্ষার ব্যয় দিবার অনুরোধ করিয়াছ। তোমাদিগের অসৎ অভিসন্ধি যদি ইহার অন্তর্নিহিত গূঢ় না থাকে, তোমাদিগের বিষম ভ্রম জন্মিয়াছে। মধ্যমশ্রেণীর লোকে মূর্খ ও ইতরশ্রেণীর লোকের সামান্য জ্ঞান হইলে দেশের কি ইষ্টলাভ হইবে? দেশের ঈদৃশ অবস্থা অতি শোচনীয়। মধ্যমশ্রেণীর লোক হইতেই দেশের যে কিছু ইষ্টলাভ সম্ভাবনা আছে। মধ্যমশ্রেণীর সন্তানেরাই কেবল গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ের নয়, ভারতবর্ষের গৌরব স্বরূপ। ইতরশ্রেণীর লোকেরা মূর্খ থাকুক, আমরা একথা বলি না। তাহাদিগের বিদ্যাশিক্ষা হউক, কিন্তু মধ্যমশ্রেণীকে অশিক্ষিত অথবা সামান্য শিক্ষিত রাখিবার আবশ্যকতা নাই।

মিসনরিদিগের আবেদনখানি একান্ত অসাময়িক ও অপ্রীতিকর হইয়াছে। এদিকে

ভারতবর্ষীয় সভা দেশের অনিষ্ট দর্শন করিয়া তাহার প্রতিকারার্থ ইংলণ্ডে আবেদন করিতেছেন, ওদিকে মিসনরিরা যাহাতে সেই অনিষ্টটি হয় সেই চেষ্টা পাইতেছেন। এটি মিসনরিদিগের সদৃশ কাজ হয় নাই। আমাদিগের দেশে সপত্নীদ্বয়ে যেরূপ ব্যবহার করে, এটি ঠিক সেইরূপ হইয়াছে। মিসনরিদিগের উল্লিখিত আবেদন করা যদি প্রয়োজন হইল, এসময়ে না করিলেই ভাল হইত। এতৎসংক্রান্ত যে দুটি প্রস্তাব আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা এইস্থলেই গৃহীত হইল।

২রা জুলাইয়ের সাধারণ সভার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিবার নিমিত্ত কলিকাতার মিসনরিগণ লার্ড আর্গাইলের নিকটে এক আবেদন করিয়াছেন। মিসনরিগণ বঙ্গদেশের সভ্যতার আক্রমণকারিদিগের দলে মিশ্রিত না হইলে ভাল হইত। লার্ড লরেন্স ও লার্ড মেয়র গবর্ণমেণ্ট ইংরাজি শিক্ষায় সাহায্য বন্ধ করিবার নিমিত্ত যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন মিসনরিগণ কি তাহা যথার্থ বিশ্বাস করেন। সাংসারিক মহত্ত্বলাভের আশায় বিদ্যাভাস করেন না এমত লোক পৃথিবীতে কতজন আছেন। মিসনরিগণ এদলস্থ নহেন বটে, কিন্তু ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আপনারা স্বীকার করেন সাংসারিক উন্নতির নিমিত্ত ইংরাজি শিক্ষা ভাল। মিসনরিগণ অবশ্যই স্বীকার করিবেন বর্ত্তমান বঙ্গ ভাষায় এমত কোন পুস্তক নাই যাহাতে বৃত্তি "বিকশিত বা অর্জ্জিত" হইতে পারে, যাহাতে উপধর্ম্ম ও কুসংস্কার প্রভৃতি তিরোহিত হয়। ডল সাহেবের ন্যায় দুই একজন ছেলেধরা থাকিতে পারেন, কিন্তু অধিকাংশ মিসনরি কি স্বীকার করেন না অজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে খ্রীষ্টিয়ান করা আর না করা সমান। বঙ্গভাষায় সামান্য বিদ্যাদানে কি খ্রীষ্টানের সংখ্যা অধিক হইবে। আমরা "না" বলিতেছি। তাহা হইলেও তাহাতে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের গৌরব আছে কি? কেবল কতকগুলি মূর্খ লোকমাত্র খ্রীষ্টীয়ান করিলে মিসনরিগণ কি ভ্রমহেতু ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাসংক্রান্ত রাজনীতির সহায়তা করিতেছেন না। তাঁহারা অবশ্যই দেশবাসীদিগের নিকটে কপট বন্ধু বলিয়া পরিচিত হইতে চাহেন না, তাঁহারা এ পর্য্যন্ত আমাদিগের সহিত কোন কুব্যবহার করেন নাই। কিন্তু বর্ত্তমান তর্কে আমাদিগের দেশের সর্ব্বপ্রধান স্বার্থকে স্পর্শ করিতেছে। লঙ সাহেবকে সাক্ষী যদি মানা হয়, তিনি ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার ন্যায় বলিতে পারিবেন ২রা জুলাইয়ের সভা দেশের সাধারণ মত প্রকাশ করেন নাই। তিনি ত দেশের ভাষণ, দেশের আচার, দেশের ব্যবহার ও দেশের মনোগত অভিপ্রায় অবগত আছেন, তিনি কি বলিতে পারিবেন ইংরাজি শিক্ষা এক্ষণে স্বাধীনরূপে চলিতেছে। ভারবর্ষস্থিত ইউরোপীয় কর্ম্মচারীদিগের আত্মার শুদ্ধির নিমিত্ত বার্ষিক ১৬ লক্ষ টাকা খ্রীষ্টীয় গিরজাতে ব্যয় করা হয়। আমরা যেমন ইংরাজি শিক্ষা এত লাভকর জ্ঞান করি যে ইহা বিনা সাহায্যে চালাইতে সমর্থ। ইউরোপীয় কর্ম্মচারীগণ সভ্য, কৃতবিদ্য এবং যথেষ্ট বেতন পান। তাঁহারা অবশ্যই জানেন ধর্ম্ম পৃথিবীর সার পদার্থ। তথাপি তাঁহাদিগকে কি নিমিত্ত স্বাধীন হইয়া আপন আপন

উপাসনায় ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে বলা হয় না? ইহা অপেক্ষা বঙ্গদেশের ইংরাজি শিক্ষার নিমিত্ত ৭ লক্ষ টাকা কি অনাবশ্যক ব্যয়। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট "রাজনীতির অনুরোধে" ইংরাজি শিক্ষা উঠাইতেছেন, মিসনরিগণ কি অনুরোধে তাঁহাদিগের পক্ষ অবলম্বন করিলেন, তাঁহাদিগেরও কি সংস্কার দাঁড়াইয়াছে উচ্চতর ইংরাজি শিক্ষা বিদ্রোহের কারণ হইবে, তাহাই বা কি প্রকারে হইবে। তাহা হইলে তাঁহারা আপনাদিগের ইংরাজি বিদ্যালয়গুলি পূর্ব্বে উঠাইয়া দিয়া দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেন।

যে উদ্দেশ্যেই হউক আমরা বলিতেছি ইংরাজী শিক্ষা করিলে মেয়াদ অথবা ফাঁসী হইবে এমত বিধি না করিলে আর তাহা বন্ধ হইবে না, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কি সাধ্য যে এক জাতীয় মানসিক খর্ব্বতা সাধন করিতে সমর্থ হন, ইংলণ্ডের লোকেরাও যদি তাঁহাদের কুতর্কে বিমোহিত হন, আমাদিগের কণ্টক ব্যাঘাত হইবে। কিন্তু মিসনারিগণ দেশের বন্ধু হইয়া শত্রুর ন্যায় কাজ করিলেন এই আক্ষেপের বিষয় হইতেছে। তাঁহাদিগের অবশ্যই "রাজনীতির অনুরোধ নাই"। আমাদিগের আশঙ্কা হইতেছে তাহারা ভ্রমে পতিত হইয়া আমাদিগের অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহারা আমাদিগের যে উপকার করিয়াছেন তন্নিমিত্ত আমরা কৃতজ্ঞ রহিলাম কিন্তু তাহাদিগের সরলতার প্রতি যে সন্দেহ জন্মিল তাহা আমরা অতিশয় দুঃখসহকারে প্রকাশ করিতে বাধিত হইলাম।

মিসনরিগণ প্রায়সই পরহিতৈষী ও হিতানুষ্ঠানাপ্রিয় হইয়া থাকেন। নিতান্ত গোঁড়া হিন্দু ব্যতীত সকলেই এটি একবাক্যে স্বীকার করিবেন। কিন্তু ইহাদিগের এতদ্রূপ সদাশয়তার সহিত বিজাতীয় ধর্ম্মান্ধতা সংশ্লিষ্ট থাকাতে ইহাদের কার্য্যকলাপ প্রায়ই বিরক্তি ও যন্ত্রণার কারণ হইয়া উঠে ধর্ম্মান্ধতা নিবন্ধন ইহারা ন্যায় অন্যায় বিবেচনা বিমুখ হইতেও কুণ্ঠিত হন না। সম্প্রতি ইহার একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে। আমরা গতবারে উল্লেখ করিয়াছিলাম মিসনরিগণ উচ্চতর ইংরাজী শিক্ষার ও কুলপক্ষ অবলম্বন করিয়া উক্ত স্বর লাটসাহেবের নিকট আবেদন করিতেছেন তাহাদের একখানি পত্রলিপি আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে, অতএব এতৎসম্বন্ধীয় কিছু বর্ণন করাই অদ্যকার প্রস্তাব অবতারণার উদ্দেশ্য।

আবেদনকারী মিসনরিগণ বলেন কি শ্রেণীর লোকদিগকে শিক্ষা দেওয়া গবর্ণমেণ্টের একান্ত কর্ত্তব্য। উচ্চতর শিক্ষা ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া এই শ্রেণীর শিক্ষা বহুলপ্রচার করা উচিত। এতন্নিবন্ধন তাহারা প্রস্তাব করিয়াছেন কতক কালেজ ও জেলা স্কুলের দান রহিত করিয়া সাহায্যকৃত স্কুলের সংখ্যা বর্দ্ধিত করা হউক, প্রেসিডেন্সি কালেজের ছাত্রের বেতন বর্দ্ধিত করা হউক এবং যে স্কলারসিপ আছে তাহা উঠাইয়া দেওয়ায় বর্ত্তমান নিয়মানুসারে ছাত্রবৃত্তিধারীরা অপেক্ষাকৃত অল্পবেতনে প্রেসিডেন্সি কালেজে অধ্যয়ন করিতে পারেন। আবেদনকারিগণের সকল যুক্তি যে নিতান্ত শূন্যগর্ভ ও মতিশূন্যতার

পরিচায়ক সহজেই প্রতীত হইতেছে। আমরা নিম্নশ্রেণীস্থ লোকদিগের শিক্ষার বিরোধী নহি। নিম্নশ্রেণীর শিক্ষা চলিতে থাকুক, কিন্তু উচ্চশিক্ষার মস্তকে আঘাত করিয়া স্রোত রুদ্ধ করা উচিত নহে। জেলাগুলির উচ্ছেদ সাধন করা কি বর্ত্তমান সময়ে উচিত এক্ষণে কি ইংরাজি শিক্ষা আশানুরূপ বহুল প্রচার হইয়াছে? মিসনারিগণ স্ববাক্য সমর্থনার্থ ১৮৫৩ অব্দের শিক্ষা সংক্রান্ত রিপোর্ট খুলিয়া বলিয়াছেন যে ডিরেক্টর এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইংরাজি শিক্ষা বহুল প্রচার ও ইহার উপকারিতা দেশীয় লোকদিগের উপলব্ধ হইলে গবর্ণমেণ্ট ইহার সাহায্যদান হইতে অবসৃত হইবেন। এক্ষণে যথার্থই সময় উপস্থিত হইয়াছে, অতএব গবর্ণমেণ্ট কেন আর ইহার সাহায্য করিবেন? চমৎকার যুক্তি!! কি মস্তিষ্কের প্রগাঢ়ম্বনা!!! এই সল্প সময়ের মধ্যেই কি ইংরাজি শিক্ষার বহুল প্রচার হইয়াছে, আবেদনকারিগণ কি দেশের অবস্থা বিশেষরূপে অবগত আছেন? তাঁহাদিগের এরূপ অজ্ঞতা ক্ষোভ ভ্রান্তি প্রদর্শন কি উপহাসকর নহে? এক্ষণে বঙ্গদেশে ১,৬২,৬৭৪ বালক আছে। তাহার মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক ছাত্রই ইংরাজি শিক্ষা করিয়া থাকেন। পঠনীয় বয়ঃপ্রাপ্ত বালকের সংখ্যা ৪ লক্ষ ধরিলে অর্দ্ধাংশ মাত্র উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে উপবিষ্ট হন। এক্ষণেও অনেকে কুসংস্কারবশতঃ স্ব স্ব সন্তানদিগকে ইংরাজি শিক্ষা হইতে উদাসান হইয়াছেন। এক্ষণেও বঙ্গদেশের প্রায় অর্দ্ধবালক ইংরাজি শিক্ষার বিন্দু বিসর্গও অবগত নহে। ইহার মধ্যেই এই শিক্ষার পথ কণ্টকাকীর্ণ করা কি উচিত? ইংরাজি শিক্ষার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট বঙ্গদেশে টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন, এই প্রদেশটিতে বার্ষিক ১৫ কোটী টাকারও অধিক রাজস্ব গৃহীত হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে গবর্ণমেণ্ট শিক্ষার নিমিত্ত ১৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। ইহার মধ্যে ৭,২৫,৯৮৮ টাকা মাত্র ইংরাজি নিমিত্ত করিতে হয়। যে দেশ হইতে বৎসরে ১৫ কোটী টাকার অধিক রাজস্ব উৎপন্ন হয়, সেই দেশের নিমিত্ত কিঞ্চিদধিক ৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করা কি অন্যায়? এই সামান্য দানও কি আবেদনকারিগণের চক্ষুঃশূল হইল? প্রেসিডেন্সি কালেজের স্কলাসিপের সংখ্যা রহিত করিয়া ছাত্রদের বেতন বৰ্দ্ধিত করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। এটি কি বালকত্ব প্রদর্শন নহে? প্রেসিডেন্সি কালেজে ধনিলোকের কয়জন বালক আছে? শতকরার মধ্যে ৩।৪ জন পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। যে ধনী সন্তান হিন্দু কি হেয়ার স্কুলে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন, তাহারা প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াই অবসৃত হন। আমরা ভূয়োদর্শন বলে বলিতে পারি, মধ্যবিত্তশ্রেণীর বালকই প্রেসিডেন্সি কালেজে অধিক, ছাত্রবৃত্তিই ইহাদিগের একমাত্র অবলম্বন। দূরদেশ হইতে আসিয়া কেবল ছাত্রবৃত্তি বলেই ইহারা প্রেসিডেন্সি কালেজে অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। অতএব ইহা বন্ধ করিলে ইহাদিগের কি ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ অবরুদ্ধ হইবে না? ইংরাজি শিক্ষা কি মিসনরিগণের নিতান্ত শূলস্বরূপ হইয়াছে? হাইকোর্টের একজন সুযোগ্য বিচারপতি (মার্কবি) ২৩শে মে ডিরেক্টরের নিকট যে পত্র লেখেন তদ্দ্বারা কি ইহার মহোপকারিতা পরিস্ফুট

হইতেছে না? আমরা আগ্রহসহকারে অনুরোধ করিতেছি প্রতিবাদকারিগণ জার্ম্মানি ফ্রান্স ইটালি প্রভৃতির সহিত বঙ্গদেশের শিক্ষাব্যয়ের তুলনা করুন, বুঝিতে পারিবেন, গবর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে কেমন দাতৃত্ব প্রদর্শন করিতেছেন।

সাহায্যকৃত কালেজে অর্থাৎ মিসনারি বিদ্যালয়ে অধিক সংখ্যক ছাত্রবৃত্তিধারী বালক প্রবৃষ্ট হয় না বলিয়া মিসনরি প্রতিবাদকারিগণের মনস্তাপ জন্মিয়াছে। এতন্নিবন্ধন তাঁহারা প্রেসিডেন্সি কালেজের বৃত্তির লোপ করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। কি ভয়ঙ্কর স্বার্থপরতা!! কি পরশ্রীকাতরতা!!! মিসনরিগণ! তোমাদের এইরূপ স্বার্থনিবন্ধন চিরস্মরণীয় মিসনরি নাম যে কলঙ্কিত হইতেছে বুঝিতে পারিতেছ না।

প্রতিবাদকারিগণের মধ্যে অনেকেই কালেজের অধ্যাপক। দুইজন বাঙ্গালী খ্রীষ্টান, ইহার মধ্যে দৃষ্ট হইয়াছে। অধ্যাপকদিগেব পল্লীগ্রাম বিষয়ে অনভিজ্ঞতা। অতএব তাঁহাদিগের এতদ্বিষয়ক অভিমত যে নিতান্ত সারশূন্য হইবে তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। বাঙ্গালী দুইটি ধর্ম্মান্ধতা নিবন্ধন এইরূপ বহির্গত ব্যাপারে পুষ্টকপুরকত্ব অবলম্বন করিয়াছেন সন্দেহ নাই। আমরা জেমস লঙের নাম প্রতিবাদের মধ্যে দেখিয়া নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছি। যিনি বাঙ্গালীগণের পরম সুহৃদ, যিনি ইহাদিগেব নিমিত্ত কারাগারে ক্লেশ ভোগ করিতেও সঙ্কুচিত হন নাই তাঁহার এইরূপ বিগর্হিত-ব্যাপারে প্রস্তাব অবলম্বন কি উচিত হইয়াছে, এতদ্দ্বারা তাহার নামে কি কালিমা পড়িবে না? এতদ্দ্বারা কি তাঁহার নামে বাঙ্গালীগণের মন উষ্ণ হইবে না। তিনি কি বিচারপতি মার্কবি ও আসিসটণ্ট মাজিষ্ট্রেট সুদক্ষ সিবলিয়ান ব্রডলির যুক্তিগত বাক্যগুলি বিস্মৃত হইলেন? লঙ সাহেব কেবল ধর্ম্মের নিমিত্ত এইরূপ কাজ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। উচ্চতর ইংরাজি শিক্ষা নিবন্ধন বিজ্ঞানের সমধিক চর্চ্চা হওয়াতেই অনেকেই খ্রীষ্ট ধর্ম্মে বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন। এক্ষণে উক্ত শিক্ষার মূলচ্ছেদ করিলে অধিবাসীগণ অদ্ধশিক্ষিত হইবে, এবং প্রজ্ঞার অপরিপক্কতা নিবন্ধন ইহাদিগের প্রলোভনে পতিত হইয়া খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বন করিবে। মিসনরিগণ লোকের হিতাহিত বোধের প্রতি তত দৃক্ষেপ করেন না? কোন রূপে নিজদল পুষ্ট করাই ইহাদিগেব উদ্দেশ্য।

অল্পদিন হইল ইহারা আসাম পর্ব্বতবাসী ৬ জন অসভ্য জাতিকে খ্রীষ্ট ধর্ম্মাক্রান্ত করিয়াছেন। ধর্ম্মের যখন এইরূপ পরিণাম তখন, ইহারা কালক্রমে শৃগালদিগকে খ্রীষ্টীয়ান করিবেন না বিশ্বাস কি?

নিম্ন শ্রেণীর বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে কয়েকটী প্রশ্ন। ২৫ পৌষ ১২৭৮। ৮ সংখ্যা

আজিকালি অনেকে এদেশের নিম্ন শ্রেণীর বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়াছেন। শিক্ষাবিষয়ক ব্যয় কুলাইতেছে না বলিয়া গবর্নমেণ্ট শিক্ষাসংক্রান্ত স্বতন্ত্র কর গ্রহণে উদ্যত হইয়াছেন। সাপ্তাহিক সংবাদ লিখিয়াছেন, নিম্ন শ্রেণী বিদ্যা শিক্ষা করিলে

জমিদারেরা আর অত্যাচার করিতে পারিবেন না। তাহারা আপনাদিগের বিষয় আপনা বুঝিয়া লইতে পারিবে। সম্পাদক একটী দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, সুশিক্ষিত ভদ্রলোকদিগের নিকটে জমিদারেরা এদিক ওদিক করিতে পারেন না। কেবল এইমাত্র নয়, নিম্নশ্রেণীর অনেকের অতি শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিলে সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেরই হৃদয়ে দয়ার উদয় হয়। বিদ্যা শিক্ষা ভিন্ন অন্য কাহারই অবস্থা সংশোধন করিবার ক্ষমতা নাই। অতএব নিম্ন শ্রেণীর বিদ্যা শিক্ষার উপায় বিধান যে একান্ত আবশ্যক সে বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। গবর্ণমেণ্ট যে এ বিষয়ে যত্নবান হইয়াছেন তদর্থ কে না তাঁহাদিগের প্রশংসা করিবেন? কিন্তু এতৎসম্বন্ধে কয়েকটী প্রশ্ন উপস্থিত হইতেছে। অগ্রে তাহার সমাধান আবশ্যক। প্রথম প্রশ্ন এই, নিম্ন শ্রেণী বিদ্যা শিক্ষায় অনুরক্ত ও প্রবৃত্ত হইবে কি না? আমরা এ প্রশ্ন করিতেছি তাহার কারণ এই, কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিতেছেন, হে কুন্তীপুত্র! তুমি দরিদ্রদিগকে ধন দাও, ধনবানকে ধন দিও না, পীড়িত ব্যক্তিরই ঔষধ আবশ্যক, যাহার পীড়া নাই, তাহার ঔষধে প্রয়োজন নাই। (১) ক্ষুধার্ত্তে অন্নদান শীতার্ত্তে বস্ত্রদান এ প্রসিদ্ধ প্রবাদও আছে। এ সকল বাক্যের তাৎপর্য্য এই, যে বিষয়ে যাহার প্রয়োজন আছে, তাহাকে সেই বিষয় দান করিলে সে ব্যগ্রতা সহকারে তাহা গ্রহণ করে, তাহা পাইয়া তাহারও বিশেষ ইষ্টলাভ বোধ হয় তদ্দর্শনে দানকর্ত্তারও মনে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ জন্মে। নিম্ন শ্রেণীর বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে ঐরূপ কোন প্রয়োজন বোধ হইয়াছে কি না? স্বার্থবোধ ব্যতিরেকে কোন বিষয়ে কাহারই সানুরাগ প্রবৃত্তি জন্মে না, বিশেষতঃ বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে। লেখাপড়া শিখিলে জ্ঞানোদয় হইবে, সেই পরম লাভ, এ মনে করিয়া অল্পলোকে বিদ্যাশিক্ষায় প্রবৃত্ত হয়। বালকদিগের কোন ক্রমেই এ জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। নিম্ন শ্রেণীর কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য বিবেচনা ও তাহার অবধারণা বিষয়ে বালকদিগের তুল্য স্বার্থবোধ না হইলে যে বিদ্যাশিক্ষায় প্রবৃত্তি জন্মে না, তাহারও উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আছে। কোন ইংরাজী বিদ্যালয়েরই দ্বার মুসলমানদিগের পক্ষে রুদ্ধ নয়। তাহাদিগের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টেরও সবিশেষ যত্ন আছে, কিন্তু তাহাদিগের কিছু হইতেছে না কেন? না হইবার কারণ এই ইংরাজী শিক্ষা বিষয়ে তাহাদিগের স্বার্থবোধ হয় নাই। হিন্দুদিগের ইংরাজী শিক্ষা বিষয়ে স্বার্থজ্ঞান হইয়াছে তাহাতেই তাহাদিগের এত সানুরাগ প্রবৃত্তি দৃষ্ট হইতেছে। হিন্দুদিগের স্ত্রী-শিক্ষার উন্নতি হইতেছে না কেন এটীও অপর উদাহরণ। আজিও এ বিষয়ে হিন্দুদিগের স্বার্থবোধ হয় নাই।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই, নিম্নশ্রেণীর যদি লেখা পড়ায় স্বার্থবোধ না হইল তাহাদিগের বিদ্যা শিক্ষার্থ যে ব্যয় হইবে, তাহা ব্যর্থ হইবে কিনা। পরিণামে এটী আড়ম্বরসার হইয়া দাঁড়াইবে কি না।

তৃতীয় অল্প শিক্ষায় অবস্থার উৎকর্ষ সাধন চরিত্রদোষ সংশোধনের সম্ভাবনা নাই। গবর্ণমেণ্ট নিম্নশ্রেণীর ঐ উভয় বিষয়ের উপযোগী শিক্ষাদানের উপায় বিধানে সমর্থ হইবেন কিনা?

চতুর্থ, এক্ষণে দেখিতে পাওয়া যায়, নিম্নশ্রেণীর দুই চারিজন কিছু কিছু লেখা পড়া শিখিয়াছে, তাহারা কবচ প্রভৃতি জাল করিয়া জমিদারদিগের সঙ্গে সময়ে সময়ে নানা প্রকার বিবাদ উপস্থিত করিয়া থাকে। গবর্ণমেন্ট নিম্নশ্রেণীর যে শিক্ষাদান চেষ্টা পাইতেছেন, তাহা যদি উদাররূপে সম্পন্ন না হয়, ঐরূপ গোট আখরিয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে। তখন জমিদারদিগের সহিত নিত্য বিরোধ উপস্থিত হইয়া গবর্ণমেন্টকে বিব্রত হইতে হইবে কিনা?

ভারতবর্ষ ও উচ্চশিক্ষা। ১৫ ফাল্গুন ১২৭৮। ১৫ সংখ্যা

এক্ষণে যাঁহারা ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তা হইতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই উচ্চ-শিক্ষার প্রাতকূলবাদী। তাঁহারা বলেন, ভারতবর্ষীয়দিগকে যে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে তাহাই পর্য্যাপ্ত, আর অধিক শিক্ষা দিবার প্রয়োজন নাই, ভারতবর্ষ এক্ষণে বিলক্ষণ উন্নত হইয়া উঠিয়াছে। এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা নানারূপে উচ্চশিক্ষার প্রতি-কূলতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু এ সংস্কারটী নিতান্ত ভ্রমাত্মক। তাঁহারা বস্তুর স্বরূপ অবগত নহেন বলিয়াই এই সংস্কার তাঁহাদের হৃদয়ে লব্ধপ্রবেশ হইয়াছে। তাঁহারা যদি ভারতবর্ষের অভ্যন্তরের তাবৎ বিষয় উত্তমরূপে জানিতেন, কখনই তাহাদের এ সংস্কার জন্মিত না। বস্তুর স্বরূপ না জানিয়া কোন কাজ করা নিতান্ত অনুচিত। আমাদিগের বর্ত্তমান লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর কাম্বেল সাহেব বেলবেডিয়ারের সিংহাসন গ্রহণ করা অবধি যত কাজ করিয়াছেন, তাহার অনেকটীতেই প্রজাগণ অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছে। ইহার কারণ এই, তিনি এদেশের রীতিনীতি ও অবস্থাদির বিষয় সম্যক অবগত নহেন, এমন কি তিনি এদেশের ভাষাও জানেন না, এমন অবস্থায় তাহার কার্য্যাদিতে প্রজাগণের যে অসন্তোষ জন্মিবে, তাহা বিস্ময়াবহ নহে। কাম্বেল সাহেবও উচ্চশিক্ষার একজন প্রধান শত্রু। যাহাতে এদেশে উচ্চশিক্ষা এককালে বন্ধ হয় নিয়মিতকাল তিনি তাহার চেষ্টায় আছেন। যাহারা উচ্চশিক্ষার প্রতিকূলতাচরণ করেন, তাঁহাদের একবার ভারতবর্ষের অভ্যন্তরস্থ বিষয়গুলি অভিনিবেশপূর্ব্বক দর্শন করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলেই তাহারা বুঝিতে পারিবেন, ভারতবর্ষীয়দিগকে আর অধিক শিক্ষা দিবার আবশ্যকতা আছে কি না। সম্প্রতি যে লোক সংখ্যা হইয়া গিয়াছে তাহার বিষয় পর্য্যালোচনা করিলেই তাহাদের বিপরীত সংস্কার অপনীত হইবে। যে দিবস লোক সংখ্যা গ্রহণ করা হয়, সেই দিবস রাত্রিতে অধিকাংশ লোক সমস্ত রাত্রি দীপ জ্বালাইয়া বসিয়াছিলেন। এরূপ করিবার কারণ এই, তাহাদের সংস্কার জন্মিয়াছিল, রাত্রিতে মাজিষ্ট্রেট সাহেব আসিয়া গৃহস্বামীকে একবার মাত্র ডাকিবেন, তাহাতে উত্তর না দিলে ৫০ টাকা জরিমানা হইবে। আমরা যে সকল লোকের কথা কহিতেছি, ইহারা কলিকাতার ৫।৬ ক্রোশ দূরে বাস করে। অধিক কথা

কি একজন শিক্ষিত (ইংরাজী ভাষানভিজ্ঞ) ভদ্রলোককে আর এক ব্যক্তি কিরূপে লোক সংখ্যা হইবে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, সংখ্যাকারীরা আসিয়া গৃহস্থের বাটীর যাবতীয় স্ত্রী পুরুষকে দাঁড় করাইয়া একে একে গণিয়া যাইবে। সম্প্রতি ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরলের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া এক ব্যক্তি হাস্য করিয়া বলিল, গবর্ণর জেনেরল একজন সামান্য হত্যাকারীর হস্তে হত হইয়াছেন, এ সংবাদ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। এ সংবাদে ঐ ব্যক্তি কোন মতেই বিশ্বাস করিল না। এই সকল লোকের সংস্কার এই, গবর্ণর জেনেরল কখন গৃহের বাহিরে যান না। গৃহে থাকিয়া প্রহরী বেষ্টিত হইয়া সমুদায় কার্য্য করিয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন গবর্ণর জেনেরলকে হত্যা করে মানুষের সাধ্য এরূপ নয়। এক্ষণে পাঠকগণ দেখুন, ভারতবর্ষ কত উন্নত হইয়াছে। যে দেশের লোকের আজিও এইরূপ সংস্কার রহিয়াছে, তথায় উচ্চশিক্ষা বন্ধ করা কতদূর যুক্তি ও ন্যায়সঙ্গত কার্য্য তাহা বুদ্ধিমান ও বিবেচক ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারেন। যাহারা উচ্চশিক্ষার দ্বেষী তাহারা এই সকল বিষয় দর্শন করিলে ভারতবর্ষে উচ্চশিক্ষার আবশ্যকতা নাই বলিয়া তাহাদের যে সংস্কার আছে তাহার অপনয়ন হইবে সন্দেহ নাই।

বিজ্ঞানশাস্ত্রের অনুশীলন। ২৯ ফাল্গুন ১২৭৮। ১৬ সংখ্যা

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয় সভা যাহাতে পদার্থ-বিদ্যার সমধিক অনুশীলন হয়, তদ্বিষয়ে অধিকতর যত্নবতী হইয়াছেন। কেবল প্রধান প্রধান কালেজের নয়, জেলা বিদ্যালয় এবং যে যে স্কুলে প্রবেশিকা পরীক্ষা পুস্তক পর্য্যন্ত পঠিত হয় সে স্থানেও পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হইবে। এই কার্য্যানুষ্ঠান নিবন্ধন বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট ও বিশ্ববিদ্যালয় সভা আমাদিগের যথার্থ কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন। মেডিকাল ও ইঞ্জিনিয়ারিঙ কালেজ ভিন্ন আর কোন বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের গন্ধ মাত্র নাই, চিন্তাশীল লোকমাত্রেই এ নিমিত্ত আক্ষেপ করিয়া থাকেন। প্রথমে যখন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তখন পদার্থবিদ্যা শিক্ষা দিবার নিয়ম হয়। প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে হইলে উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব প্রাণি-বৃত্তান্ত প্রভৃতি শিক্ষা করিতে হইত, কালেজ সমূহে রসায়ন প্রভৃতির উপদেশ দেওয়া হইত। কিন্তু এক্ষণে সমুদায়ই সে বন্ধ হইয়াছে। মিশনরিরা এই অনিষ্টের মূল। বিজ্ঞানের শিক্ষাদানে অনেক ব্যয় আছে। অল্প বেতনে শিক্ষক পাওয়া যায় না। বৈজ্ঞানিক যন্ত্র সকল ক্রয় করিতেও অনেক ব্যয় পড়ে। মূল বিজ্ঞান শাস্ত্রের কথা দূরে থাকুক, যখন কেবল উহার শাখাগুলির শিক্ষা দিবার নিয়ম ছিল, তখন ফ্রি চর্চ্চ প্রভৃতি বিদ্যালয় হইতে অত্যল্প মাত্র ছাত্র বহির্গত হইতেন। ডাক্তার ডফের চেষ্টা ছিল, গবর্ণমেণ্টের কালেজ সমূহ উঠিয়া গিয়া শিক্ষার ভার মিশনরিদিগের হস্তে পতিত হয়। সুতরাং যাহাতে গবর্ণমেণ্টের বিদ্যালয় হইতে অধিকসংখ্যা ছাত্র উত্তীর্ণ হইতে না পায়,

তদ্বিষয়ে তিনি যত্নবান হন। সেই কারণে যেমন সাহিত্য ইতিহাস ও অঙ্কের পরিমাণ কমিয়াছে, তেমনি বিজ্ঞানের অনুশীলনের লোপ হইয়াছে। মিশনরিরা বুঝিতে পারিয়াছেন, মিশনরি বিদ্যালয় হইতে বিস্তর উপকার হইয়াছে ও হইতেছে সত্য, কিন্তু ঐ সকল বিদ্যালয় গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ের তুল্য নহে। সর্ব্বসাধারণে উন্নতির যে আশা করেন, মিশনরি হইতে তাহা চরিতার্থ হইবার সম্ভাবনা নাই। যাহা হউক, পদার্থবিদ্যার অনুশীলন বন্ধ করা যে নিতান্ত ভ্রম হইয়াছিল, এক্ষণে সর্ব্বসাধারণে ও গবর্ণমেণ্ট একবাক্যে তাহা স্বীকার করিতেছেন। আমাদিগের কৃতবিদ্যগণ বিজ্ঞান বিষয়ে বড পটু নহেন। বিজ্ঞানের প্রতি তাঁহাদিগের অনুরাগ এত অল্প যে, দুই বৎসরাবধি ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার একটী বিজ্ঞানসভার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছেন, আজিও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। বিজ্ঞানের অনুশীলন ভিন্ন প্রকৃত উন্নতি হয় না।

এক্ষণে এতদ্দেশীয় যুবকগণের প্রতি আমাদিগের বক্তব্য এই, কেবল গৃহে বসিয়া পুস্তক-পাঠ ও গৃহপার্শ্বস্থিত উদ্যানে পরীক্ষা করিলেই চলিতে পারে। বিজ্ঞানের উন্নতি করিতে হইলে নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে হয়, পর্ব্বতে আরোহণ ও সমুদ্রপারে গমন প্রভৃতি দুঃসাহসিক কার্য্য ও নানা ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়। আলস্য পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগকে এই সকল কার্য্য করিতে হইবে। ইউরোপের "অধিকাংশ ছাত্র আল্‌প প্রভৃতি দুরারোহ পর্ব্বত আরোহণ কবিয়া নিজ পরীক্ষা করিয়া বিজ্ঞান শিক্ষা করেন। আমাদিগের ভারতভূমি স্বর্ণগভা। যাহার অনুসন্ধান কর তাহাই পাওয়া যায়। কেবল চেষ্টার অপেক্ষা মাত্র। এ সকল কায্য করিতে হইলে সাহস ও সহিষ্ণুতার প্রয়োজন। এদেশে ব্যায়ামের অনুশীলন আরম্ভ হইয়াছে। ক্রমে ইহার উন্নতি হইবে সন্দেহ নাই। অশ্বারোহণ, সন্তরণ, নৌচালন ও মৃগয়াদি পুরুষত্বের প্রধান লক্ষণ। যে সকল ক্রীড়াতে সাহস ও বলের প্রয়োজন, স্বদেশীয়গণ তাহা শিক্ষা করুন। তাহা হইলে বিদেশীয়েরা আর আমাদিগকে ভীরুস্বভাব বলিয়া বিদ্রূপ করিতে পারিবেন না। বিজ্ঞানেব উন্নতির সহিত সাহস ও শারীরিক বলেব যে নিকট সম্বন্ধ আছে, এটা বুঝিয়া সকলে কাজ করেন ইহাই আমাদিগের প্রার্থনীয়।

উচ্চশিক্ষাদানের আবশ্যকতা। ৪ বৈশাখ ১২৭৯। ২১ সংখ্যা

আমরা "চৌদ্দ বৎসর এই শীর্ষক দিয়া যে একটী প্রস্তাব লিখিয়াছিলাম, আমাদিগের বহুমানিত একজন মিশনরি তাহার প্রতিবাদ করিয়া একখানি পত্র লিখিয়াছেন। পত্রখানি ইংরাজীতে লিখিত বলিয়া আমরা তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতে পারিলাম না। তিনি বলেন, লার্ড ডেলহাউসির লোভান্ধতানিবন্ধন কোম্পানির রাজত্ব গিয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহা হইতে দেশের মহোপকারক রেলওয়ে প্রভৃতি কয়েকটী মহৎকার্য্য সম্পাদিত

হইয়াছে। ডেলহাউসি হইতে এদেশের একটীও ইষ্ট হয় নাই, আমরা একথা বলি না। তিনি এদেশের যে ইষ্ট ও অনিষ্ট করিয়াছেন, যদি তুলাদণ্ডে উভয়ের পরিমাণ করা যায়, অনিষ্ট বহুগুণ গুরুভার হইয়া উঠিবে সন্দেহ নাই। মানুষের স্বভাব এই, যে ব্যক্তি অত্যাচারী হয়, তাহার কৃত সৎক্রিয়ার কেহ আদর করে না। ডাকাইত বিশ্বম্ভরবাবু অনেককে অনেক দান করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কোন্ ব্যক্তি তাঁহার সে দানের আদর করেন?

আমরা লিখিয়াছিলাম, বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট উচ্চশিক্ষার প্রতিদ্বন্দ্বী। পত্রপ্রেরক মিশনরি মহোদয় ইহার এই উত্তর দিয়াছেন, এদেশের উচ্চশিক্ষার বিধি প্রবর্ত্তিত হওয়াতে কতকগুলি পরভাগ্যোপজীবী কামার কুমার ছুতার দোকানদারের সন্তানেরা বি. এ., এম. এ. উপাধি লাভ করিয়াছে। তাহাদিগের সে উপাধিলাভে দেশের মঙ্গল কি? তাহাদিগের নিজ জীবিকা অর্জ্জনের ইচ্ছা ও দেশের হিত করিবার চেষ্টা নাই। বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিষয়িনী নীতি এই যাহারা উচ্চশিক্ষার ব্যয়দানে সমর্থ তাহাদিগকেই সেই শিক্ষা দেওয়া হইবে। ইউরোপখণ্ডেরও শিক্ষাবিষয়িনী নীতি এই প্রকার। ইহার উত্তরে আমাদিগের বক্তব্য এই, পত্রপ্রেরক এদেশে বহুকাল বাস করিতেছেন বটে; কিন্তু আজিও এদেশের অবস্থা উত্তমরূপে জানিতে পারেন নাই। ইউরোপখণ্ডের লোকের বিদ্যাশিক্ষার বিষয়ে যেরূপ অনুরাগ জন্মিয়াছে, বিদ্যাশিক্ষা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া যেরূপ জ্ঞান জন্মিয়াছে, এদেশের লোকের কি সে প্রকার হইয়াছে? যে কিছু অনুরাগ দৃষ্ট হইতেছে, গবর্ণমেণ্ট উৎসাহ দিতেছেন বলিয়াই হইতেছে। আজ যদি গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়গুলি উঠাইয়া দেন, এবং সাহায্যদান বন্ধ করেন, কল্য সেই অনুরাগ নির্ব্বাণপ্রায় দৃষ্ট হইবে। বিশেষতঃ এদেশের সামাজিক অবস্থা ইউরোপখণ্ডের ন্যায় নয়। এদেশের সামাজিক অবস্থা ইংরাজী শিক্ষার পক্ষপাতিনী নহে। দ্বিতীয়, এ দেশে যত লোক বি. এ এম. এ. হইয়াছেন, পত্রপ্রেরক যদি তাহাদিগের তালিকা আনাইয়া দেখেন, কামার কুমার অতি অল্প দেখিতে পাইবেন। দেখিতে পাইবেন দরিদ্র ব্রাহ্মণ কায়স্থ সন্তানেরাই বহুল পরিমাণে বি. এ. এম. এ. হইয়াছেন। এদেশের যে কিছু সদনুষ্ঠান হইয়াছে হইতেছে হইবে, তাঁহাদিগের হইতেই হইয়াছে হইতেছে হইবে। তাঁহারা সকল বিষয়েই মূল প্রস্তাবকর্ত্তা ও আদি অনুষ্ঠানকর্ত্তা, ভাগ্যবন্তেরা তাঁহাদিগের সহায় হন এইমাত্র। তাঁহাদিগের হইতেই এদেশের উন্নতি হইবে, এই আশা আছে। আজ যদি তাঁহাদিগের উচ্চশিক্ষা পথ বন্ধ হয়, দেশ অন্ধ হইবে সন্দেহ নাই। আমাদিগের স্পষ্টই বোধ হইতেছে, মিশনারি মহোদয় এ বৃত্তান্তটী জানেন না যে, এদেশে যাহারা অনায়াসে উচ্চশিক্ষার ব্যয় দিতে পারেন, তাঁহারা প্রায় ওদিকে যান না। এদেশের ভাগ্যবন্তেরা অল্পেই বিলাসী হইয়া পড়েন, অল্পেই তাঁহাদিগের শ্রমশক্তি বিনষ্ট হইয়া যায়, অসচ্চরিত্র লোকেরা আসিয়া পার্শ্বচর হয়। অসৎ আলাপে, অসৎ আমোদে সময় অতিবাহিত হয়। পড়াশুনার সময় হয় না। দরিদ্র ভদ্র সন্তানেরাই উচ্চশিক্ষা লাভার্থ যত্নবান, তাঁহাদিগের অবস্থা উত্তেজক এবং অধ্যবসায়

উত্তরসাধক। বড় হইব, বড় কাজ করিব, তাঁহাদিগেরই এই ইচ্ছা আছে। যাঁহাদিগের ইচ্ছা এই প্রকার, তাঁহাদিগের হইতেই কি দেশের উন্নতিভাব লাভের সম্ভাবনা নয়? যদি গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের উচ্চশিক্ষার পথ বন্ধ করেন, তাহা হইলে কি প্রকারান্তরে দেশের উন্নতির পথ রুদ্ধ করা হইল না। বিলাসী ভাগ্যবন্তেরা উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া দেশের উন্নতিসাধন করিবেন, আমাদিগের সে আশা নাই। ইংলণ্ডেশ্বরীর গবর্ণমেণ্টের এই কি বিজ্ঞোচিত কার্য্য? কৌশলে এদেশের উন্নতির পথ রুদ্ধ করা কি সেই বিজ্ঞতা? আমরা এখনি মিশনারি মহোদয়কে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া যাইতেছিলাম, তিনি মন খুলিয়া বলুন দেখি, তিনি যাহাদিগকে ভিক্ষুক দল বলিয়া ঘৃণা করিতেছেন, তাঁহাদিগের উন্নতিলাভই কি বাঞ্ছনীয় নয়?

মিশনারি মহোদয় আক্ষেপ করিয়াছেন, তিনি প্রজাদিগের হিতার্থ নিজ অর্থ-ব্যয় ও পরিশ্রম করিয়া সুতা কাটিবার উত্তম যন্ত্র ও উত্তম হল প্রভৃতি আনয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রজাদিগের ঔদাসীন্য উপেক্ষা ও ঈর্ষানিবন্ধন কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এ লেখায় তাৎপর্য্য এই, গবর্ণমেণ্ট প্রজাদিগকে এ সকল বিষয়ে শিক্ষা দিবার চেষ্টা পাইলে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। ইহার উত্তরে আমাদিগের বক্তব্য এই, আমরা অনুমান করিতেছি, মিশনরি মহোদয় উৎকৃষ্ট হলাদি আনয়ন করিয়া তাহার প্রচলন চেষ্টা পাইয়া অকৃতার্থ হইয়াছেন, তাহার কারণ এই, তিনি প্রজাদিগকে লাভ দেখাইতে পারেন নাই। প্রজারা পুরুষ পরম্পরা যে হলচালন প্রণালী অবলম্বন করিয়া যে লাভ করিয়া আসিতেছে, তদপেক্ষা অল্প ব্যয়ে অল্প শ্রমে অধিক লাভ দেখিতে না পাইলে তাহাদিগের প্রবৃত্তি জন্মিবার সম্ভাবনা কি? লাভ দেখিলে কে না তাহাতে প্রবৃত্ত হয়? আপাততঃ লাভ না হইলেও পরিণামে অধিক লাভ হইবে, এ বিবেচনা করিয়া অন্যান্য লোকের কোন বিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। লাভ দেখাও তাহারা অবশ্যই সে কাজ করিবে।

গবর্ণমেণ্ট এদেশীয়দিগকে নাবিকবিদ্যা শিখাইবার চেষ্টা পাইলে জাতি যাইবার ভয়ে কেহ তাহাতে অগ্রসর হইবে না, মিশনরি মহোদয় এই যে আশঙ্কা করিয়াছেন, সেটী অকিঞ্চিৎকর। নাবিকবিদ্যা শিখিয়া বাণিজ্যাদির নিমিত্ত দেশান্তর যাইবার বাধা নাই। পূর্ব্বে বৈশ্যেরা এই কার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন। অনেক গ্রন্থেই সমুদ্রে বাণিজ্য করিবার সংবাদ শুনিতে পাওয়া যায়।

আমরা গবর্ণমেণ্টকে ব্যয় সংক্ষেপ করিবার অনুরোধ করিয়াছিলাম, তাহাতে মিশনরি মহোদয় লিখিয়াছেন, পূর্ব্বে এই সোমপ্রকাশে শিক্ষকদিগের বেতন বৃদ্ধির নিমিত্ত অনুরোধ করা হইয়াছিল, এখন গবর্ণমেণ্টের ব্যয় বাড়িয়া গিয়াছে, অতএব এখন ব্যয় সংক্ষেপের উপদেশ দেওয়া অসাময়িক হইতেছে। এস্থলে বক্তব্য এই, এ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলাম, এখন তাহার অন্যথা হয় নাই।

শিক্ষকদিগের কার্য্য যে প্রকার কষ্টকর ও শ্রমসাধ্য, তাহাতে তাঁহারা যে বেতন পান, তাহা পর্য্যাপ্ত নহে। তাঁহাদিগকে অধিক বেতন দেওয়া একান্ত আবশ্যক। বেতন কর্ত্তন করিয়া ব্যয় সংক্ষেপ করিবার স্থল আছে। যে সমস্ত ইউরোপীয় শিক্ষক ও ইনস্পেক্টর কালেজ প্রভৃতিতে অপর্য্যাপ্ত বেতন পাইতেছেন, তাঁহাদিগের বেতন কর্ত্তন করিলে কি গবর্ণমেণ্ট লাভবান হইতে পারেন না? শিক্ষা বিভাগেই ব্যয় সংক্ষেপ করিতে হইবে এরূপ নিয়ম নয়, সমস্ত বিভাগ অজস্র অপরিমিত অর্থ গ্রাস করিতেছে, সেই পাবলিক ওয়ার্ক বিভাগ প্রভৃতির অপব্যয় বন্ধ করিলে কি গবর্ণমেণ্টের অর্থের সঙ্গতি হয় না?

অনেকে লেখাপড়া শিখিয়া কেবল শিক্ষকতা ও কেরাণীগিরি করিতে যান, অন্য দিকে যান না, মিশনরি মহোদয় এই যে কথা কহিয়াছেন, তাহাতে আমাদিগের উত্তর এই, আমরা বিলক্ষণ জানি, যাঁহারা ভাল লেখাপড়া শিখিয়াছেন, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে শিক্ষকতা ও কেরাণীগিরি কাজে যান না। নিতান্ত কোন উপায় না পাইলেই যান; কিন্তু সর্ব্বদা স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জনের উপায় অন্বেষণ করিতে থাকেন। সেই উপায় হস্তগত হইলে তদ্দণ্ডে শিক্ষকতা ও কেরাণীগিরি পরিত্যাগ করেন। উচ্চশিক্ষা-হওয়া লোকের যত স্বাধীনতার ইচ্ছা বলবতী হইবে, মিশনরি মহোদয় দেখিবেন, ততই শিক্ষক দুর্লভ হইয়া পড়িবেন।

মিশনরি মহোদয় উপসংহারকালে এদেশের সুশিক্ষিতদিগকে যে কয়টী উপদেশ দিয়াছেন, তদ্দ্বারাও এদেশীয়দিগকে শিক্ষাদানের আবশ্যকতা সপ্রমাণ হইতেছে। মিশনরি মহোদয় বলেন, এদেশের সুশিক্ষিত লোকেরা বিনাবেতনে গবর্ণমেণ্টের কার্য্য করুন, এবং যে সকল লোকে অন্যায় করিয়া প্রজার অর্থ গ্রহণ চেষ্টা পায়, তাহাদিগের হস্ত রোধ করুন। এ বিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য এই, আমরা দেখিতে পাইতেছি যত সুশিক্ষার প্রাদুর্ভাব হইতেছে, অন্যায় ও অত্যাচার নিবারণের চেষ্টা বাড়িতেছে। পূর্ব্বে গ্রামের লোকে কাহার প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার করিলে কেহ কোন কথা কহিতেন না, কিন্তু এখন সুশিক্ষিত মাত্রেই অত্যাচারীর দ্বেষ্টা হইয়া দুর্ব্বলের পক্ষ অবলম্বন করেন। যাঁহাদিগের অবসর আছে, তাদৃশ সুশিক্ষিতেরা বিনা বেতনে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম করিতে বিমুখ নহেন। তবে সকল সময়ে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের উপর কার্য্যভার দেন না, সেটী তাহাদিগের দোষ নয়।

কলিকাতা সংস্কৃত কালেজ। ১১ বৈশাখ ১২৭৯। ২৩ সংখ্যা

বাজারে বিষম জনরব উঠিয়াছে, কলিকাতা সংস্কৃত কালেজ আর টেঁকে না। জনশ্রুতি প্রায় অমূলক হয় না। সম্প্রতি লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর কাম্বেল সাহেবের যে একটি আজ্ঞা ইংলিশমান সংবাদপত্রে প্রচারিত হয়, তাহাই ঐ জনরবের মূল। সংস্কৃত

স্কুল ডিপার্টমেণ্ট নামে যে বিভাগ আছে, লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর তাহার ছাত্রগণকে প্রতিবেশবাসী বিদ্যালয়ে পাঠাইবার অনুরোধ করিয়াছেন। ইহাতে যদি অসুবিধা বোধ হয়, আর সংস্কৃত কালেজের স্কুল বিভাগটী একান্ত রাখিতে হয়, এরূপ করিয়া ব্যবস্থা করিতে হইবে যে উহার আয় হইতে উহার সমুদায় ব্যয় নির্ব্বাহ হয়। এই আজ্ঞার অনুরূপ যদি কার্য্য হয়, আমরা নিশ্চিত করিয়া কহিতে পারি সংস্কৃত কলেজ উঠিয়া যাইবে। পাঠকগণ সংস্কৃত কালেজের আদ্যকালের ইতিহাস যদি অবগত হন, তাঁহাদিগেরও এই সিদ্ধান্ত হইবে সন্দেহ নাই।

এই পাঠশালার প্রতিষ্ঠার পর অধ্যক্ষেরা দেখিলেন, এক প্রাণীও পাঠার্থী হইয়া আগমন করিল না। তখন তাঁহারা মাসিক ৫ টাকা ও ৮ টাকা বৃত্তিবিধান করিয়া দিলেন। অর্থলোভে আকৃষ্ট হইয়া ক্রমে ছাত্র আসিতে লাগিল। এস্থলে পাঠকগণ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, তৎকালে সংস্কৃত বিদ্যার্থির অপ্রতুল ছিল না, তবে গবর্ণমেণ্টকে টাকা দিয়া ছাত্র করিতে হইল কেন? টাকা দিয়া ছাত্র আনিবার কারণ এই, তৎকালে অসংখ্য চতুষ্পাঠী ছিল, অনেকে অধ্যাপনা কার্য্য সম্পাদন করিতেন, সংস্কৃত বিদ্যার্থীরা সেই সেই চতুষ্পাঠীতে গিয়া অধ্যয়নলালসা চরিতার্থ করিতেন। বেতনভুক হইয়া অধ্যয়ন করিলে পাপ জন্মে, তৎকালে এই সংস্কারের সবিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল। কেবল পাপশঙ্কা নয়, যাঁহারা গবর্ণমেণ্ট পাঠশালায় পড়িতে আসিতেন, তাঁহারা নিন্দিত হইতেন। কাল সহকারে ক্রমে লোকের লোকনিন্দাভয় ও পাপ-ভয় কমিয়া আসিল। ক্রমে অর্থলোভে গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ে ছাত্র বৃদ্ধি হইতে লাগিল, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের যে প্রকার অভীষ্ট, মাসিক বৃত্তি দিয়াও সে প্রকার ছাত্র সংগ্রহ হইল না। ওদিকে ক্রমে ইংরাজী শিক্ষায় লোকের অনুরাগ জন্মিতে লাগিল। তদানীন্তন অধ্যক্ষেরা এই বিবেচনা করিলেন, যদি সংস্কৃত পাঠশালায় ইংরাজী শিক্ষা প্রবেশিত হয়, ছাত্র বাড়িতে পারে। তাহাই করা হইল। মধ্যে একজন অধ্যক্ষের কোপে পড়িয়া ইংরাজী পাঠ বন্ধ হইল, ছাত্রও কমিয়া গেল। কিছু দিন পরে পুনরায় ইংরাজী শিক্ষা প্রবেশিত হইল, ছাত্রেরও সংখ্যা বৃদ্ধি হইল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অধ্যক্ষ হইয়া যে সময়ে অধিক পরিমাণে ইংরাজী পাঠনার ব্যবস্থা করেন, সেই সময়েই সংস্কৃত কালেজের সবিশেষ উন্নতি দৃষ্ট হয়।

এই বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া বোধ হয়, পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, সংস্কৃত পাঠশালার ছাত্রবৃদ্ধির নিমিত্ত বরাবরই প্রলোভন প্রদর্শন করিতে হইয়াছিল। প্রথমে অর্থের, তাহার পর ইংরাজী শিক্ষার প্রলোভন দেওয়া হয়। যাঁহারা প্রলোভন দিয়া ছাত্র সংগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহারা যে অন্যায় করিয়াছেন, আমরা এ কথা বলিতে পারি না। কারণ প্রলোভন প্রদর্শন ব্যতিরেকে এখানে ছাত্রের আগমন সম্ভাবনা নাই। যাঁহারা কেবল সংস্কৃত পড়িবার বাসনা করেন, তাহাদিগের অধ্যয়ন করিবার অনেক স্থান আছে, তাঁহাদিগের

এখানে আসিবার কোন স্বার্থ নাই। বিশেষতঃ চতুষ্পাঠীতে পড়িতে গেলে কিছুমাত্র ব্যয় লাগে না। পক্ষান্তরে কলিকাতায় থাকিয়া কালেজে পড়িতে গেলে বিস্তর ব্যয় হয়। বিশেষ স্বার্থ সম্বন্ধ ব্যতিরেকে এ ব্যয় স্বীকারে লোকের প্রবৃত্তি জন্মিবে কেন? যাঁহারা কেবল সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন, তাঁহাদিগের অধিকাংশই দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত লোকের সন্তান। বিদ্যাশিক্ষার্থ অধিক ব্যয় করেন, তাঁহাদিগের এরূপ সামর্থ্য নাই। দ্বিতীয়, যাঁহাদিগের কেবল ইংরাজী পড়িবার বাসনা, তাঁহারা অন্য অন্য স্কুলে যান, সংস্কৃত কালেজে প্রবেশ করেন না। যাঁহাদিগের অধিক ব্যয় করিবার ক্ষমতা নাই, এবং ইংরাজী ও সংস্কৃত উভয় পড়িবার ইচ্ছা আছে, তাঁহারাই সংস্কৃত পাঠশালায় প'ড়তে আইসেন।

এখন পাঠকগণ ক্ষণকাল ভাবিয়া দেখুন, ইংরাজী সংস্কৃত ও অল্প বেতন এই তিনের একটীর ব্যতিক্রম ঘটিলে সংস্কৃত পাঠশালা থাকিতে পারে কি না? উপরে বলা হইয়াছে এখানে কেবল সংস্কৃত পাঠনা রীতি প্রবর্ত্তিত হইলে নিরবচ্ছিন্ন সংস্কৃত পাঠার্থিরা আসিবেন না। তাঁহাদিগের পড়িবার অনেক স্থান আছে। বেতন অধিক হইলেও ছাত্র জুটিবে না। উপরে বলা হইয়াছে যাঁহারা সংস্কৃত কালেজে অধ্যয়নের বাসনা করেন, তাঁহারা ভাগ্যবান লোকের সন্তান নহেন, তাঁহাদিগের অধিক বেতন দিবার ক্ষমতা নাই। ফল কথা এই, এ কালেজটী যে ভাবে চলিতেছে, ইহার অন্যথা করিয়া অন্য প্রকার বন্দোবস্ত করিলে ইহা কোনক্রমেই স্থায়ী হইবে না। এখানে ছাত্রদিগের নিকট হইতে অল্প বেতন গ্রহণের নিয়ম রাখিয়া যদি ইংরাজী চর্চ্চার বাহুল্য করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলেই ইহা স্থায়ী হইবে। অন্যথা নয়।

লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর কাম্বেল সাহেবের যে একটী ভ্রম আছে, এস্থলে তাহার ভঞ্জনচেষ্টা আবশ্যক হইল। তিনি মনে করেন, সংস্কৃত কালেজে ছাত্রের নিকট হইতে অল্প বেতন গ্রহণের নিয়ম থাকাতে ধনি সন্তানেরা অল্পবেতনে শিক্ষা লাভ করিতেছে, গবর্ণমেণ্ট ঠকিতেছেন। এটা তাঁহার বিষম ভ্রম, কেন আমরা একথা কহিতেছি, সংস্কৃত পাঠশালা ও অন্য অন্য স্কুলের ছাত্রসংখ্যা দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। কোন গণনীয় বিদ্যালয়ে এত অল্প ছাত্র নাই। ভাগ্যবান ব্যক্তিরা এখানে ছেলে পাঠান না। তবে যে দুই চারি ভাগ্যবান ব্যক্তির সংস্কৃতে গাঢ়তর অনুরাগ আছে, তাঁহারাই এখানে সন্তানদিগকে পাঠাইয়া দেন। এখানে বেতন অল্প আছে, কিছু লাভ হইল, গবর্ণমেণ্টকে ঠকান হইল, তাঁহাদিগের এ অভিসন্ধি নয়। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের মনের ভাব ভাল নয় বলিয়াই তিনি এইরূপ ভাবিয়া থাকেন।

এক্ষণে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরকে আমাদিগের অনুরোধ এই, তিনি সংস্কৃত জানেন না, দেশের লোকের মনের ভাব বুঝেন না, এদেশের অবস্থাও জানেন না। এ অবস্থায় তাঁহার এতদিনের সংস্কৃত পাঠশালাটী হঠাৎ উঠাইয়া দেওয়া অত্যন্ত অন্যায়। যে বিষয় জানা নাই শুনা নাই তাহাতে মত চালাইতে গেলে প্রায়ই অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে।

উপসংহার কালে বক্তব্য এই, যদি লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর কাহার অনুরোধ না শুনেন, সংস্কৃত কালেজটী যেরূপে হউক, উঠাইয়া দিবেন একান্ত পণ করিয়া থাকেন, কি উদ্দেশে সংস্কৃত কালেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইল গবর্ণমেণ্ট অবাধে ইহার ব্যয় যোগাইলেন কেন? প্রলোভন দেখাইয়া বরাবর ছাত্র সংগ্রহ চেষ্টা করিবার কারণ কি? লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর কি বুঝিয়াই বা উঠাইয়া দিতেছেন? এগুলি যেন তিনি সাধারণের গোচর করেন। তাহা হইলেও সাধারণে চিত্তকে প্রবোধ দিতে পারিবেন।

সংস্কৃত কালেজের উপযোগিতা। ১৮ বৈশাখ ১২৭৯। ১৪ সংখ্যা

যাঁহারা প্রথমে এই কালেজটীর প্রতিষ্ঠা করেন, সংস্কৃত উৎসাহদানই তাঁহাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এক্ষণে ঐ প্রয়োজন আর একটী প্রয়োজনে পরিণত হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রয়োজনটী অতি গুরুতর। তদ্দ্বারা সংস্কৃত কালেজের অধিকতর উপযোগিতা সপ্রমাণ হইতেছে। দিন দিন ইংরাজীর যেরূপ প্রাদুর্ভাব হইতেছে, সংস্কৃতেরও তেমনি চর্চ্চার হ্রাস হইতেছে। ইংরাজীর প্রাদুর্ভাবে সংস্কৃতের চর্চ্চা হ্রাস হইবার কারণ এই, ব্রাহ্মণেরাই সংস্কৃতের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা কার্য্য করিয়া থাকেন। যাজন ও প্রতিগ্রহ ব্রাহ্মণের জীবিকা। এক্ষণে সেই জীবিকার বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মিয়াছে। যাঁহারা ইংরাজী লেখাপড়া করিতেছেন, তাঁহাদিগের ক্রিয়াকাণ্ডে অনাস্থা জন্মিতেছে। তাঁহারা আর পূর্ব্বের ন্যায় নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কর্ম্ম করিতেছেন না। সুতরাং ব্রাহ্মণদিগের জীবনোপায় বন্ধ হইয়া আসিতেছে। দিন দিন তাঁহারা ভগ্নোৎসাহ হইতেছেন। উৎসাহ না থাকাতে তাঁহাদিগের সংস্কৃতের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা প্রবৃত্তি কমিয়া যাইতেছে। এইরূপে ইংরাজীর প্রভাবে অন্য অন্য স্থানে সংস্কৃত পাঠনার যত ব্যতিক্রম ঘটিতেছে, ততই সংস্কৃত কালেজের উপযোগিতা বৃদ্ধি হইতেছে। অতএব যে কোন রূপে হউক, গবর্ণমেণ্টকে এ কালেজটী রক্ষা করিতে হইবে। তাহা যদি না করেন, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সাক্ষাৎ ও পরম্পরা সম্বন্ধে সংস্কৃতের লোপ করিয়া এদেশের মহৎ অনিষ্ট করিবেন, অনেকের এই সংস্কার জন্মিবে। সংস্কৃতই এদেশীয়দিগের বিদ্যাবুদ্ধি প্রভৃতির পরিচয় পাইবার উপায়, সংস্কৃতই এদেশীয়দিগের কীর্ত্তিস্তম্ভ। অধীনস্থ দেশের কীর্ত্তিস্তম্ভ রক্ষা করা গবর্ণমেণ্ট মাত্রেরই কর্ত্তব্য। একমাত্র সংস্কৃত কালেজই এক্ষণে সেই কীর্ত্তিস্তম্ভ রক্ষার উপায়ভূত হইয়াছে। এতদ্দ্বারাও সংস্কৃত কালেজের উপযোগিতা বিলক্ষণ প্রতিপাদিত হইতেছে। সংস্কৃত কালেজ ভিন্ন অধিক পরিমাণে সংস্কৃত শিখিবার অপর স্থান নাই।

সংস্কৃত কালেজের অপর উপযোগিতা এই, এখানে ইংরাজী ও সংস্কৃত উভয়ের পাঠনা হইয়া থাকে। উভয় পাঠে কেবল যে বহুদর্শিতা লাভ ও বহুতত্ত্ব জ্ঞান হয় এরূপ নয়, উভয়ের সার সঙ্কর্ষণ করিয়া জগতেরও উপকার করিবার সামর্থ জন্মে।

বাঙ্গলা ভাষার উন্নতি হউক, রাজপুরুষদিগের যদি এটী মনোগত হয়, সংস্কৃতের আশ্রয় গ্রহণ একান্ত কর্ত্তব্য। সংস্কৃত জ্ঞান ব্যতিরেকে বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই। আমরা সচরাচর দেখিতেছি, সংস্কৃত ভাষায় যাঁহাদিগের ব্যুৎপত্তি নাই, তাঁহাদিগের বাঙ্গালা লেখা অতি কর্কশ হয়। প্রসাদগুণের সহিত প্রায় দেখাসাক্ষাৎ থাকে না। কোন্ স্থানে কিরূপ শব্দ প্রয়োগ করিতে হয়, তাঁহারা প্রায় জানেন না, "শব পোড়ান, মড়া দাহ" সচরাচর এই প্রকার শব্দেরই প্রয়োগ করিয়া থাকেন। অধিক কথা কি তাঁহাদিগের লিখিত বাঙ্গালা রীতিমত বাঙ্গলা হয় না।

কাল্‌কাতা সংস্কৃত কালেজটী উঠিয়া গেল বলিয়া বাজারে যে জনরব উঠিয়াছে, তাহাই আমাদিগের এ প্রস্তাব উপস্থিত করিবার কারণ। কালেজ উঠিয়া যাইবে বাজারের লোক বলেন বটে ; কিন্তু আমরা ইহার কোন কারণ দেখিতেছি না। উল্লিখিত উপযোগিতা সত্ত্বে কালেজটী উঠাইয়া দেওয়া কোন ক্রমেই ন্যায়ানুগত হয় না। বিশেষতঃ আমরা শুনিয়াছি, সংস্কৃত ভাষার আলোচনা ও তাহার রক্ষার্থ মহাসভা কতকগুলি টাকা দিয়াছেন। অত্রত্য গবর্ণমেণ্টর সেই দত্ত টাকার উপরে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই।

বঙ্গদেশে উচ্চশিক্ষার আতঙ্ক। ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৯। ২৮ সংখ্যা

আজিকালি বঙ্গদেশের কতকগুলি বিকৃতবুদ্ধি ইউরোপীয়ের উচ্চশিক্ষার আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহারা বলেন, বাঙ্গালিরা যত অধিক লেখাপড়া শিখিবেন, ততই অনিষ্ট ঘটিবে। ভ্রান্তিমূলক এই কুসংস্কার নিবন্ধন বাঙ্গালিদিগের শিক্ষাপথ রুদ্ধ করিবার চেষ্টাও চলিয়াছে। মানুষ অধিক লেখাপড়া শিখিলে জগতের অনিষ্ট হয়, বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদিগের এ মত নয়। অলোকসামান্য বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন লার্ড বেকন পোপ প্রভৃতি অল্পজ্ঞতারই নিন্দা করিয়া গিয়াছেন। বিদ্যাবৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের এই সিদ্ধান্ত আনুমানিক নহে। দৈনন্দিন ঘটনাতেও ইহা প্রত্যক্ষ হইতেছে। যাঁহারা অধিক লেখাপড়া জানেন, তাঁহারা প্রায় শান্তিপ্রিয় হইয়া উঠেন। ইংলণ্ডের বর্ত্তমান প্রসিদ্ধ বিদ্বান ব্যক্তিরাই ইহার প্রমাণ। অধিক লেখাপড়া শিখিলে জগতের অনিষ্ট হয়, এটা সিদ্ধান্তবাক্য হইলে ইংলণ্ডে এতদিন লেখাপড়ার চর্চ্চা বন্ধ হইয়া যাইত সন্দেহ নাই। অধিক লেখাপড়া শিখিলে লোক যে শান্তিপ্রিয় হয়, আমাদিগের দেশের মুনিঋষিরা তাহার উদাহরণ। "নমন্তি গুণিনোজনাঃ" এটী এদেশেপ্রবাদ বাক্য হইয়া উঠিয়াছে। এ বিচার এখন থাকুক, উল্লিখিত মহামতি ইউরোপীয়দিগের অলক্ষ্য আতঙ্ক দেখিয়া আমাদিগের অন্তকরণ একান্ত কৌতুহলাক্রান্ত হইয়াছে। এদেশে উচ্চশিক্ষা কৈ? যাহাকে কথঞ্চিৎ উচ্চশিক্ষা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, তাহাই বা কয় জনের আছে? ১৮৭০।৭১ অব্দের বঙ্গদেশের শিক্ষাসংক্রান্ত রিপোর্ট তাহা কহিয়া দিতেছে। ১০৯৯ জন প্রবেশিকা পরীক্ষায়, ২৩৩ জন

প্রথম পরীক্ষায় এবং বি. এ. পরীক্ষায় ৮৪ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন। রাজপুরুষেরা প্রবেশিকা পরীক্ষায় উচ্চশিক্ষা নাম দিয়াছেন বটে : কিন্তু যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, প্রতীয়মান হইবে ঐ সংজ্ঞাদান বিড়ম্বনা মাত্র। প্রবেশিকা শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থই তাহা প্রতিপন্ন করিয়া দিতেছে। লেখাপড়া শিক্ষার প্রবেশকে উচ্চশিক্ষা শব্দ দ্বারা কি সঙ্গত হয়? আমরা উপরে প্রবেশিকা প্রথম ও বি. এ. পরীক্ষোত্তীর্ণের যে ফর্দ্দটী দিলাম পাঠকগণ একবার তাহার বিষয় বিবেচনা করুন। শিক্ষাপর্ব্বে প্রবিষ্টের সংখ্যাই অধিক দেখিতে পাইবেন। তাহার পর প্রথম পরীক্ষায় ২৩৩, তাহার পর বি. এ. পরীক্ষায় ৮৪ জন মাত্র। পাঠকগণ প্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণদিগকে কৃতবিদ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইলে বি. এ. পরীক্ষোত্তীর্ণদিগকেই কথঞ্চিৎ নির্দ্দেশ করা যায়। সে কয় জন? বঙ্গদেশের ১৮ কোটি লোকের মধ্যে ৮৪ জন মাত্র। এই তুচ্ছ সংখ্যা দেখিয়াই ইউরোপীয়দিগের এত আতঙ্ক? যে প্রণালীতে অধ্যয়ন করিলে বাস্তবিক কৃতবিদ্য হওয়া যায়, এদেশে আজিও সে প্রণালী প্রবর্ত্তিত হয় নাই। সবে তাহার সূত্রপাত হইতেছে, ইহার মধ্যে তাহা বন্ধ করিবার চেষ্টা হইল। ইহা সামান্য বিস্ময়াবহ নহে।

আমরা স্পষ্টাক্ষরে কহিতেছি, বঙ্গদেশে কৃতবিদ্যের সংখ্যা অধিক হইলেও তাহাদিগের হইতে রাজ্যের অনিষ্ট নাই। বাঙ্গালিরা স্বভাবতঃ শান্তিপ্রিয়, লেখাপড়া শিখিলে সেই শান্তিপ্রিয়তার সবিশেষ বৃদ্ধি হয়। বিশেষতঃ কিসে ইষ্ট কিসে অনিষ্ট উত্তরকাল চিন্তা করিয়া সে বিবেচনা করিবার ক্ষমতা জন্মে। তবে তাহারা গবর্ণমেণ্টের কার্য্যপ্রণালীর দোষ দেখিলেই তাহার উল্লেখ করেন, ইহা দেখিয়া অনেকে মনে করেন, তাঁহারা লোক ভাল নহেন। যাঁহারা এ প্রকার বিবেচনা করেন, তাঁহাদিগের বুঝিবার ভুল। তাঁহাদিগের যদি বাস্তবিক অনিষ্ট করিবার ইচ্ছা থাকিত, তাঁহারা কখন মুখে বলিতেন না মনের ভাব গোপনে রাখিয়া কার্য্যে প্রকাশ করিতেন। গবর্ণমেণ্টের অনিষ্ট হয়, তাঁহাদিগের অভিপ্রেত নহে। যে যে দোষ আছে, তাহা সংশোধন করিয়া গবর্ণমেণ্ট প্রজার অনুরাগভাজন হইয়া বদ্ধমূল হন, ইহাই তাঁহাদিগের অভীষ্ট। এই নিমিত্ত তাঁহার দোষের উল্লেখ করিয়া সর্ব্বদা গবর্ণমেণ্টের কার্য্যপ্রণালীর দোষ সংশোধন চেষ্টা পাইয়া থাকেন। যাঁহাদিগের বুদ্ধি বিরুদ্ধ তাঁহারাই ইহাকে বিরুদ্ধ জ্ঞান করেন।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় ১১ শত এবং বি. এ. পরীক্ষায় ৮৪ জন মাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন, এতদ্দ্বারা এদেশের অবস্থারও পরিচয় হইতেছে। এদেশীয়েরা অতি সামান্য অশনবসনে পরিতৃপ্ত হইয়া কাল যাপন করেন। ইহাদিগের খাদ্য অন্ন, তাহা সহজে এদেশে উৎপন্ন হয়। জীবিকা সুলভ বলিয়াই এদেশের অধিকাংশ লোক দুস্থ। অধিক ব্যয় করিয়া যে বি. এ. এম. এ. প্রভৃতির পাঠ্য পুস্তক অধ্যয়ন করেন, অধিকাংশেরই সে ক্ষমতা নাই। গবর্ণমেণ্টের কালেজ ও ছাত্রবৃত্তি না থাকিলে যে অল্পসংখ্যক ব্যক্তিকে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ দেখিতেছি, তাহাও দেখিতে পাইতাম না। এদেশের এই শোচনীয় অবস্থা জানেন

না বলিয়া সময়ে সময়ে কোন কোন রাজপুরুষ এদেশীয়দিগের শিক্ষাপথ বন্ধ করিবার ইচ্ছা ও চেষ্টা পান। যাহা হউক, অতিশয় দুঃখ ও ক্ষোভের বিষয় এই, বঙ্গদেশের এই শোচনীয় শিক্ষার অবস্থা সকলে অবগত নহেন। যাঁহারা জানেন, তাঁহাদিগের কথা সকল সময়ে রক্ষা হয় না। ইংলণ্ডের লোকেরা যদি এ অবস্থা জানিতে পারিতেন, ভারতবর্ষদ্বেষী স্বার্থপর ইউরোপীয়েরা এদেশীয়দিগের অনিষ্টচেষ্টা করিয়া কখন কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না।

বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর একটী অঙ্গবৈকল্য। ১০ পৌষ ১২৭৯। ৬ সংখ্যা

পঞ্চতন্ত্রকার পণ্ডিত মূর্খের একটী গল্প লিখিয়া গিয়াছেন। কেবল লেখাপড়া শিখিলেই মূর্খতা দূর হয় না, ইহা প্রতিপন্ন করাই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। বাস্তবিকও যাবৎ বুদ্ধির চতুরস্রতা সম্পাদন, লোক মর্য্যাদা ও লোকব্যবহারজ্ঞতাদি গুণের লেখাপড়ার সহিত যোগ না হয়, তাবৎ শিক্ষা সাঙ্গ হইল এ কথা বলা যায় না। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, যাঁহারা উপাধি লাভ করিয়া বিদ্যালয় হইতে বহির্গত হন, তাঁহাদিগের অধিকাংশের মূর্খতা দূর হইবার অনেক বাকী থাকে। তাঁহারা লোক ব্যবহারাদির কিছুই জানেন না, তাঁহাদিগের মন মত্তমাতঙ্গের ন্যায় উন্মত্তভাব প্রাপ্ত হয। তাঁহাদিগের নিকটে পূজ্যব্যক্তির পূজা নাই, নমস্য ব্যক্তির নমস্কার নাই, অধিক কি অনেকের যথোচিত ভদ্রতাশিক্ষাও হয় না। কিরূপে লোকের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে হয়, কিরূপে চিঠিপত্র লিখিতে হয়, তাহাও অনেকে জানেন না। তাঁহারা ইংরাজী শিক্ষা করেন, ইংরাজী গ্রন্থে স্বাধীনতা ও তেজস্বিতার কথা সর্ব্বদা শুনিয়া থাকেন, কার্য্যেও সদা সেই স্বাধীনতা ও তেজস্বিতা প্রকাশে উদ্যত হন। কিন্তু লোকব্যবহারাদি জ্ঞান না থাকাতে সেই স্বাধীনতা ও তেজস্বিতা প্রকাশ বিড়ম্বনা হইয়া উঠে। যাঁহারা যথার্থ তেজস্বী পুরুষ, তাঁহারা দেশকাল ভেদে তেজঃপ্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদিগের বিদ্যালয়বহির্গত যুবকদিগের তেজঃপ্রকাশের স্থান নাই কাল নাই। তাহাতে তাঁহাদিগের তেজঃপ্রকাশে ইষ্ট না হইয়া সচরাচর অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। অধিক কি, তাঁহাদিগের মাতাপিতা প্রভৃতি গুরুজনেরাও তাঁহাদিগের তেজঃপ্রকাশের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান না। আমাদিগের কোন কোন প্রধান রাজপুরুষ তাহাদিগের এই দুর্ব্ব্যবহার দর্শন করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন যে এদেশে ইংরাজী শিক্ষার উপাদেয় ফল হইতেছে না, বিপরীত ফলই ফলিতেছে। এই কারণে তাঁহাদিগের কোনক্রমে এ ইচ্ছা নাই যে এদেশে ইংরাজী শিক্ষা হয়। কিন্তু সে সকল রাজপুরুষ কি কারণে যে এরূপ ঘটিতেছে সেটী বিবেচনা করেন না, সুতরাং তাঁহাদিগের কৃতসিদ্ধান্ত সৎসিদ্ধান্ত বলিয়া সপ্রমাণ হইতেছে না। বিদ্যালয়বহির্গত যুবকদিগের যে উল্লিখিত

দুর্ব্যবহার হয়, ইংরাজী শিক্ষা তাহাব কাবণ নয, আমাদিগেব বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর একটী অঙ্গ বৈকল্যই তাহার কারণ। অন্য অন্য দেশে আছে, যুবকেবা বিদ্যালয় হইতে বহির্গত হইয়া নানা দেশে পয্যটন কবেন, ভিন্ন ভিন্ন দেশের ব্যবহার দর্শন করেন, তাহার পর বিষয়কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। এদেশে সে প্রথা নাই, তাহাতেই এতদ্দেশীয়দিগের শিক্ষাকায্য সম্পূর্ণ হইতেছে না। তাহাতেই যুবকদিগেব উল্লিখিত ব্যবহার দৃষ্ট হয়। তাহাতেই কতকগুলি প্রধান রাজপুরুষেব এই কুসংস্কাব জন্মিযাছে যে এদেশে ইংরাজী শিক্ষা দিয়া উত্তম ফললাভ হইবে না। উল্লিখিত যুবকদিগের দুর্ব্যবহারের ন্যায় রাজপুরুষদিগের এ প্রকার সংস্কারও আমাদিগেব হৃদযে শল্যস্বরূপ হইয়া আছে।

অতএব আমবা প্রস্তাব কবিতেছি, গবণমেণ্ট এই নিয়ম করুন, উপাধি লাভেব পর বিদ্যালয় হইতে বহির্গত হইয়া যুবকদিগকে অন্ততঃ দুই বৎসব কাল নানা দেশ ভ্রমণ, ভিন্ন ভিন্ন দেশেব আচারব্যবহার দর্শন ও ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যালযের কায্য পয্যবেক্ষণ করিয়া বহুজ্ঞতা লাভ করিতে হইবে। যিনি তাহা না কবিবেন, তিনি কর্ম্ম পাইবেন না। এ নিযম হইলে যুবকদিগেব উদ্ধত ব্যবহার দূবগত হইবে, রাজপুরুষদিগেরও ইংরাজী শিক্ষা দান বিষয়ে কুসংস্কাবের সহিত ঔদাসীন্য অন্তর্হিত হইবে। বঙ্গদেশেই ইংরাজী শিক্ষার প্রাচুর্য্য হইযাছে। এইখানেই যুবকদিগের উল্লিখিত অনুচিত ব্যবহাব সচরাচব নযনগোচর হইয়া থাকে। অতএব আমাদিগেব লেপ্টেনণ্ট গবণব মহোদয ক্যাম্বেল সাহেবের কর্ত্তব্য প্রস্তাবিত নিয়মটী অগ্রে বঙ্গদেশে প্রবর্ত্তিত কবেন। তাহা হইলে আর বঙ্গদেশীয শিক্ষিত যুবকদিগের অসঙ্গত আচবণ দেখিয়া আমাদিগকে অসুখিত হইতে হইবে না, রাজপুরুষদিগের সহিত আর ইংরাজী শিক্ষা লইয়া লড়াই কারতেও হইবে না। লেপ্টেনণ্ট গবণর বাঙ্গালিদিগকে কাজের লোক করিয়া তুলিবার চেষ্টা পাইতেছেন ঐ নিয়মটী প্রবর্ত্তিত হইলে দেখিবেন, তাঁহারা কেমন কাজের লোক হন।

মুসলমানদিগের বিদ্যাশিক্ষা। ১০ আষাঢ় ১২৮০। ৩২ সংখ্যা

মুসলমানদিগের কেমন বিদ্যাশিক্ষা হইতেছে লার্ড মেওর অধিকার কালে ইহা জানিবার ইচ্ছা ও ভিন্ন ভিন্ন গবর্ণমেণ্টের প্রতি তাহা জানাইবার আদেশ দেওয়া হয। গবর্ণমেণ্ট সকল সম্প্রতি লিখিয়া পাঠাইযাছেন, সামান্য শিক্ষা অন্য অন্য শ্রেণীর যেরূপ হইতেছে, মুসলমানদিগেবও সেইরূপ হইতেছে, কিন্তু উচ্চশিক্ষা অন্য অন্য শ্রেণীব ন্যায় হইতেছে না। গবর্ণর জেনেরল সম্প্রতি এতৎপ্রসঙ্গে স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত কবিযা একটী প্রস্তাব লিখিয়াছেন। আমরা উহা পাঠ কবিয়া আনন্দিত হইলাম। আমাদিগের আনন্দের কারণ এই যে ইহাতে তাঁহার রাজনীতিজ্ঞতাব সবিশেষ পরিচয় হইয়াছে। মুসলমানদিগেব শিক্ষার যাহাতে সদুপায় বিধান হয়, লার্ড নর্থব্রুক তদর্থ অধিকতব যত্ন প্রকাশ করিয়াছেন।

উহাদিগের নিমিত্ত কেবল স্বতন্ত্র শিক্ষাপ্রণালী নয়, স্বতন্ত্র পুস্তকাদি প্রণয়নের আজ্ঞা দানেও তিনি উদাসীন হন নাই। রাজ্যের একটী প্রধান শ্রেণী মূর্খ হইয়া থাকে, এটী সভ্য গবর্ণণ্টের অতিশয় লজ্জার বিষয়। যে বাজ্যে অধিকসংখ্য প্রজা মূর্খ, সে রাজত্ব সুখের নয়। অতএব লার্ড নর্থব্রুকের চেষ্টা সাধীয়সী সন্দেহ নাই। কিন্তু শিক্ষা প্রণালীর দোষে মুসলমানদিগের শিক্ষা হইতেছে না বলিযা তিনি যে সিদ্ধান্ত করিযাছেন, এটী আমাদিগের প্রীতিকর হইতেছে না। বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর দোষ প্রকৃত কারণ নহে। মুসলমানেরা ভালরূপ লেখাপড়া শিখেন, তাঁহাদিগের এই ইচ্ছা নাই। তাহাই প্রকৃত কাবণ।

হিন্দুবা উচ্চ ও উদার, শিক্ষার জন্য এত ব্যগ্র, মুসলমানেরা ব্যগ্র নন, গবর্ণমেণ্ট কি তাহার কারণ আমাদিগের নিকটে জানিতে চান? হিন্দুদিগেব উচ্চ শ্রেণী যে কোন কার্য্য করিতে সম্মত হন না। তাহাতে তাঁহাদিগের কেবল অপমান ও লজ্জা নয় জাত্যাংশেও খাট হইতে হয়। সুতরাং উচ্চশ্রেণীর একমাত্র বিদ্যাভ্যাসই জীবনোপায। অনন্যোপায় হইয়া ইঁহারা প্রাণপণে বিদ্যা শিক্ষা কবেন। প্রাচীন আর্য্যেরা যে শ্রেণীবিভাগ কবিয়া গিয়াছিলেন, আজিও তাহার উপাদেয় ফল ফলিতেছে। মুসলমানদিগেব কিন্তু এরূপ নাই। তাঁহাদিগের জীবিকার শত দ্বাব উদ্ঘাটিত আছে। তাহারা অতিশয় বিলাস-পরায়ণ। অল্প বয়সে সৌখীন ও বিষয়াসক্ত হইয়া পডেন। সুতরাং পডাশুনার চর্চ্চা বাল্যকালের সঙ্গে সঙ্গে দূরে প্রস্থান কবে। যৌবনে আব তাঁহাদিগেব লেখাপডায অনুরাগ থাকে না। কিরূপে অর্থ উপার্জ্জন কবিবেন, সেই চেষ্টাতেই ব্যতিব্যস্ত হন। বিদ্যাশিক্ষার মুখ্য সময়েই বিষযকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইযা থাকেন। এই কাবণে গবণমেণ্ট দেখিতে পাইতেছেন, তাঁহাবা সামান্যরূপ লেখা পডা করিতে পাবেন না। অনেকে বলেন ইংরাজী শিক্ষার প্রতি তাঁহাদিগের আত্যন্তিক বিদ্বেষ আছে, তাহাই তাঁহাদিগের উচ্চশিক্ষার প্রধান প্রতিবন্ধক। কিন্তু আমবা উহাকে প্রতিবন্ধক বলি না। হিন্দু জাতির উচ্চশ্রেণীর ন্যায় যদি তাঁহাদিগেবও জীবিকাব কষ্ট হইত, ইংবাজীব প্রতি বিদ্বেষ লঙ্কা পার হইযা যাইত সন্দেহ নাই। কুসংস্কাব ও বিদ্বেষ দূব কবিবাব অমন ঔষধ আর নাই। বিলাসিতা থাকিতে মুসলমানদিগেব যে গবণমেণ্টের বাঞ্ছানুরূপ শিক্ষালাভ হয, আমাদিগের এমন বোধ হয় না। এক বিলাসিতাই মুসলমানদিগেব যার পর নাই শত্রুতা করিতেছে। এই বিলাসিতা তাহাদিগের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির পথ রোধ করিযা রাখিয়াছে। এই বিলাসিতাই তাহাদিগকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছে।

শিক্ষাদান বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের ধর্ম্ম সম্বন্ধে নিরপেক্ষতা

১৪ শ্রাবণ ১২৮০। ৩৭ সংখ্যা

সংপ্রতি এদেশীয়দিগের শিক্ষার প্রণালী বিষয়ক আন্দোলন পুনরুত্থিত হওয়াতে

সংবাদপত্র সম্পাদকেরা এই প্রশ্নের পুনর্ব্বিচার আরম্ভ করিয়াছেন। এ বিষয়ের মীমাংসা করিতে যাঁহারা অগ্রসর হইয়াছেন তাঁহারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। ১ম মিশনারিগণ, "ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া" যাঁহাদিগের মুখস্বরূপ। ইহাঁদিগের মতে গবর্ণমেণ্ট উচ্চশিক্ষার জন্য এত ব্যয স্বীকার না করিয়া যদি মিশনারিদিগের হস্তে সে ভার অর্পণ করেন তাহা হইলে ভাল হয। দ্বিতীয় শ্রেণী ব্রাহ্মগণ, "মিরার" যাঁহাদেব মুখস্বরূপ। ইহাঁদের মতে গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান সময়ে যে প্রকার উচ্চশিক্ষা দিতেছেন, তাহাতে দেশেব একটী প্রধান অমঙ্গল হইতেছে, ঐ প্রণালীতে যাহাঁরা শিক্ষিত হইতেছেন, তাহাদেব অনেকেই চরিত্র ও নীতি বর্জ্জিত হইয়া বিদ্যালয হইতে বহির্গত হইতেছেন। সুতরাং যদিও বিশেষ কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মেব পোষকতা কবা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে প্রকৃষ্ট রাজনীতির বিরুদ্ধকার্য্য হয, কিন্তু ছাত্রদিগের ধর্ম্মনীতি যাহাতে পবিষ্কৃত ও উন্নত হয় সেরূপ শিক্ষা দেওয়া উচিত। ছাত্রগণ যাহাতে শিক্ষা ও বযসেব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আপনাদিগকে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের জন্য ঈশ্ববেব নিকট দাযী বলিযা মনে কবিতে পাবেন, এরূপ পাঠনার উপায় অবলম্বন করা বিধেয। ৩য় শ্রেণাস্থ লোকেরা (ইংলিসমান ইহাঁদের মত প্রকাশ করেন) বলিয়া থাকেন, গবর্ণমেণ্টের এবিষয়ে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন হওযা আবশ্যক। গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত শিক্ষার মধ্যে এমন কিছু থাকা যুক্তিযুক্ত নয যাহাতে নাস্তিকদিগেরও আপত্তি হইতে পারে। তাঁহাদের বিবেচনায ঈশ্ববেব নিকট দাযী এরূপ কথা বলিতে গেলেও ধর্ম্ম বিশেষেব পোষকতা কবা হয, কেবল মাত্র জ্ঞান শিক্ষা গবণমেণ্টেব শিক্ষার উদ্দেশ্য হওযা উচিত।

আমরা ইহাব কোনটীর সহিত সম্পূর্ণরূপে ঐক্যমত অবলম্বন করিতে পারি না। মিশনারি মহাশযদিগের ত কথাই নাই। তাহারা যাহাই বলুন শিক্ষা সম্বন্ধে খ্রীষ্টীয ধর্ম্মের পোষকতা কবা গবণমেণ্টেব পক্ষে যেরূপ মহাভ্রমের কার্য্য হইবে এমন আব কিছুই নহে। আবার মিবার ইদানীন্তন বিশ্ববিদ্যালযেব উত্তীর্ণ যুবকদিগকে যে প্রকার ধর্ম্মনীতি শূন্য মনে করেন আমবা ততদূর কবি না। কিন্তু তাঁহাবা যেরূপ উচ্চশিক্ষা পান, ততদূর চবিত্রের স্থিরতা ও বিশুদ্ধতা যে সকল সময দেখা যায না তাহাও সত্য এবং মিবার যেগুলিকে সর্ব্ববাদিসম্মত ও মূল সত্য বলিযা নির্দ্দেশ কবিয়াছেন তাহাতেও যে অনেকের আপত্তি হইতে পারে, ইংলিসমানেব একথাও অসঙ্গত নয়। কিন্তু তাহা বলিয়া শিক্ষার একটী প্রধান উদ্দেশ্য যে চরিত্র গঠন ও ধর্ম্মনীতির বিশুদ্ধতা সে বিষয়ে অনবহিত হওযা বিধেয় নহে। বিবাদাস্পদ প্রশ্নগুলির পবিহাব কবিযাও ধর্ম্মনীতিরও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বিষয় শিক্ষা দেওযা যাইতে পারে আমবা ঐরূপ মনে করি। তবে ধর্ম্ম বিশেষের পক্ষাবলম্বন না করিয়া উদারভাবে ধর্ম্মনীতির আলোচনা করে এ প্রকার গ্রন্থের সংখ্যা অতি অল্প। এরূপ স্থলে তদুপযোগী গ্রন্থ নির্দ্ধারণ করাই দুষ্কর। কিন্তু তথাপি যাহাতে ছাত্রদিগের সত্যের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা জন্মে, চরিত্রের সাধুতার প্রতি

দৃষ্টি পড়ে এবং উপযুক্তরূপে জীবনের সকল কার্য্য করিবার জন্য একটী আন্তরিক আগ্রহ উপস্থিত হয় তাহার সদুপায় বিধান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তদুপযোগী গ্রন্থ সকল বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হউক এবং শিক্ষকেরা এবিষয়ে একটু বিশেষ মনোযোগী হউন।

ইংরাজী শিক্ষায় ভারতবর্ষের প্রকৃত উপকার কি হইল? ১২ জ্যৈষ্ঠ ১২৮১। ২৭ সংখ্যা

এদেশে ইংরাজ রাজত্ব, ইংরাজী সংসর্গ ও ইংরাজী শিক্ষার প্রাদুর্ভাব হওয়াতে অবস্থার পরিবর্ত্ত হইয়া গিয়াছে। এখন তাঁহারা বিলক্ষণ বিলাসী ও সংসার সুখের রসাস্বাদে একান্ত অধিকারী হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা স্বাধীনভাবে অচিরলব্ধ এই সুখের উপভোগে যে চিরসমর্থ হইবেন, তাহার সম্ভাবনা দেখিতেছি না। তাঁহারা ইংরাজ রাজত্বের গুণে এই সুখের অধিকারী হইয়াছেন, যদি আজি এই রাজত্ব ইংরাজদিগের হস্ত পরিভ্রষ্ট হইয়া কোন অসভ্যের হস্তগত হয় তাঁহাদিগকে পুনর্মূষিক হইতে হইবে সন্দেহ নাই। তাঁহারা অন্যের সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া আপনারা আপনাদিগের দেশের উন্নতি-সাধন করিয়া সংসার সুখের উপভোগে সমর্থ হইবেন, তাঁহাদিগের এমন কি ক্ষমতা জন্মিয়াছে? তাঁহারা কি নাবিকবিদ্যায় পটু হইয়াছেন? তাঁহারা স্বয়ং জাহাজ চালাইয়া নানদেশে বাণিজ্য করিয়া স্বদেশের কি উন্নতি সাধন করিতে পারিবেন? মাঞ্চেষ্টর হইতে যদি বস্ত্রের আমদানী বন্ধ হইয়া যায়, তাঁহারা কি নিজ দেশে কল করিয়া এক্ষণকার ন্যায় সুন্দর ও সুলভমূল্য বস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারিবেন? বিলাতী কাগজের আমদানী বন্ধ হইলে তাঁহারা কি কাগজের কল করিয়া আপনাদিগের কৃত গ্রন্থাদি প্রচারে শক্ত হইবেন? তাঁহারা কি বিজ্ঞান শাস্ত্রের বলে পদার্থবিদ্যার অনুশীলন দ্বারা নূতন নূতন বিষয়ের আবিষ্ক্রিয়া করিতে পারিবেন? কোন্ বিষয়ে তাঁহাদিগের ক্ষমতা জন্মিয়াছে? ক্ষমতার মধ্যে তাঁহারা চাকুরী করতে পারেন এইমাত্র। চাকুরে দল অপদার্থ দল বলিলে হয়। সভ্যতম ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অনেক কাজ, তাই সকলের জুটিতেছে না, অন্য গবর্ণমেণ্টে অধিক চাকুরী জুটিবার সম্ভাবনা কি?

এদেশীয়দিগের এ প্রকার অপদার্থতার দুটী কারণ আছে। প্রথম, বর্ত্তমান ইংরাজী শিক্ষাপ্রণালীর দোষ। দ্বিতীয় এদেশীয়দিগের অপরিণামদর্শিতা ও অনুৎসাহ। বর্ত্তমান প্রণালীর অনুসারে সকল বিষয়েই কিছু শিক্ষা দেওয়া হয়। বিজ্ঞানাদি এক একটী মহোপকারক বিশেষ বিষয়ে পরিপক্বতা জন্মে না। সুতরাং তাঁহারা কাজের লোক হন না। এ প্রণালীর কতক কতক পরিবর্ত্ত করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে এদেশে অধ্যয়নের এই রীতি ছিল, যাহার যেমন রুচি সে বাল্যাবধি সেই শাস্ত্রের অধ্যয়ন প্রবৃত্ত হইত। যে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিত, পঠদ্দশায় সে অন্য শাস্ত্রের আলোচনা করিত না। সুতরাং সে শাস্ত্রে তাহার বিলক্ষণ পারদর্শিতা জন্মিত। "একা বিদ্যা সুশিক্ষিতা" এদেশের একটী প্রসিদ্ধ বাক্য। নৈয়ায়িক-

দিগের ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে এমনি অনভিজ্ঞতা ছিল যে তাঁহারা দুই চারিটী সংস্কৃত শব্দ শুদ্ধ করিয়া উচ্চারণ করিতে পারিতেন না,·· কতকগুলি ছাত্র বাল্য অবধি কেবল বিজ্ঞানশাস্ত্রের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হউন, কতকগুলি কেবল নাবিকবিদ্যা শিক্ষা করুন, কতকগুলি কেবল ভূগর্ভের অনুসন্ধান করিতে থাকুন, গবর্ণমেণ্ট ইহাদিগেরই ছাত্রবৃত্তি দিবার ব্যবস্থা করুন। ইহারা এক এক বিষয়ে পরিপক্ক হইয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে ইহাদিগের কলকৌশলাদি রচনার্থ যে ব্যয় আবশ্যক হইবে, দেশীয় লোকেরা চাঁদা করিয়া তাহা প্রদান করুন। তাহাতে কেবল যে দেশের উন্নতিরূপ লাভ হইবে এরূপ নয়, তাঁহারা নিজেও বিলক্ষণ লাভবান হইবেন। সেই কল প্রভৃতি দ্বারা যে অর্থাগম হইবে তাঁহারা সকলে বিভাগ করিয়া লইবেন। ইহাতে আর একটী এই লাভ হইবে, তাহাদিগের সম্ভূয় সমুত্থান প্রবৃত্তি বলবতী হইয়া উঠিবে। ঐরূপ এক এক মহোপকারক বিষয়ে এক দলকে সুশিক্ষিত না করিয়া কেবল পাঁচ ফুলে সাজি করিয়া চাকুরে দল প্রস্তুত করিলে ভারতবর্ষের প্রকৃত উপকারের কি সম্ভাবনা আছে ?

গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগের বেতনবৃদ্ধির ক্রম। ১৫ মাঘ ১২৮৫। ১১ সংখ্যা

অনেক দিন অবধি শিক্ষকগণের বেতনবৃদ্ধির ক্রম নির্দ্দেশের প্রস্তাব হইয়া আসিতেছে। ১৮৭৬ অব্দে শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর দশটী শ্রেণী বিভাগ করিয়া বেতন বৃদ্ধির ক্রম নির্দ্ধারণের প্রস্তাব করেন। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের অতিরিক্ত দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় হইবার কথা হয়। কিন্তু তৎকালে সংক্ষেপের অনুরোধে এ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয় নাই। ১৮৭৭ অব্দে পুনরায় ঐ বিষয়ের প্রস্তাব করা হয়। বর্ত্তমান ডিরেক্টর ক্রপ্ট সাহেব আটটী বিভাগ করেন। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর ইডেন সাহেব তাহা মঞ্জুর করিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমোদনার্থ প্রেরণ করেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট অষ্টম বিভাগটীকে পরিত্যাগ করেন। এক্ষণে সাতটী বিভাগের বেতন বৃদ্ধির ক্রম নির্দ্ধারিত হইয়া ষ্টেট সেক্রেটারির অনুমোদিত হইয়া আসিয়াছে। ক্রপ্ট সাহেব ৩০ হইতে ৫০ টাকার যে গ্রেড করিয়াছিলেন, তাহা অষ্টম, তাহাই পরিত্যক্ত।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যে বিবেচনায় এই সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীর বিভাগটীকে পরিত্যাগ করুন, কিন্তু এটী পরিত্যাগ করা উচিত হয় নাই। এই শ্রেণীর শিক্ষকের ভাগই অধিক, উহাদিগের বেতন যৎসামান্য, তাহাতে অতিকষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হয়, উহাদিগের উন্নত পদ পাইবারও সমধিক সম্ভাবনা নাই। ১৮৭৮ অব্দের ১লা আগষ্ট হইতে ইহার কার্য্যারম্ভ হইবে, স্থির হইয়াছে। এবার যা হইবার হইল, বারান্তরে এই হতভাগ্যদিগের প্রতি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের যেন কিঞ্চিৎ কৃপাদৃষ্টি হয়। ইঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর কৃপাপাত্র। ডিরেক্টর ক্রপ্ট সাহেব ও লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর ইডেন সাহেব

উক্ত নিম্নশ্রেণীর শিক্ষকদিগের দুরবস্থার বিষয় বিশেষরূপে জানেন, তাই তাঁহারা উহাদিগকে গ্রেডভুক্ত করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কেবল উহাদিগের গ্রহবৈগুণ্যেই ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বাম হইলেন।

আর একটী দুঃখের বিষয় এই গ্রেডভুক্ত নিম্নশ্রেণীর শিক্ষকের নাম গেজেটে প্রকাশ হইবে না। এ ব্যবস্থাটীও ভাল হয় নাই। গেজেটে নাম প্রকাশ হইলে উহাদিগের উৎসাহ দ্বিগুণতর বৰ্দ্ধিত হইত। গবর্ণমেণ্টের যে পরিমাণে কাগজ কালী ও মুদ্রণ ব্যয় পড়িত, তাহার অপেক্ষা বহুগুণ অধিক ফললাভ হইত সন্দেহ নাই। রায় বাহাদুর ও রাজা বাহাদুর প্রভৃতি লিখিয়া যে এক একখানি কাগজ বিতরণ করা হয়, তাহাতে কত কাজ হয়, রাজপুরুষেরা কি তাহা জানেন না ?

এস্থলে আমাদিগের আর একটী বক্তব্য এই, সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগের উৎসাহ বৰ্দ্ধনের কোন একটী উপায় করা ইডেন সাহেবের কৰ্ত্তব্য। তাহাদিগের মধ্যে যে এক পেন্সন পাইবার ব্যবস্থা হয়, তাহাও রহিত করা হইয়াছে। যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, স্পষ্ট দৃষ্ট হইবে, সাহায্যকৃত বিদ্যালয়গুলি অধিকাংশ লোকের লেখাপড়া শিখিবার প্রধান উপায়। যাহাদিগের মূল অবলম্বন, তাহারা যে উপেক্ষিত থাকে, সেটী বিধেয় হয় না···এখন শিক্ষাবিভাগের যে অবস্থা হইতে চলিল, ইহাতে অনেক ভাল ভাল লোক আকৃষ্ট হইয়া এই বিভাগে প্রবিষ্ট হইবেন। এতদিন কেহ নিতান্ত নিরুপায় না হইলে এ বিভাগে প্রবেশ করিতেন না, প্রবেশ করিয়া কেবল সুযোগ অন্বেষণ করিতেন, একটু পথ পাইলেই সেই দিকেই ধাবমান হইতেন। এখন আর এ ব্যতিক্রম ঘটিবে না, এখন ভাল লোক ইহাতে প্রবেশ করিবেন। অতএব উত্তরোত্তর এ বিভাগ যে ক্রমশঃ সৌভাগ্য সম্পন্ন হইবে, সে বিষয়ে সংশয় নাই।

যে প্রকার শ্রেণীবিভাগের প্রস্তাব করা হইয়াছে ও যাহা মঞ্জুর হইয়া আসিয়াছে, তাহা এই :

' জন	৪০০	হইতে	৫০০	সমুদায়	ব্যয়	২৮০০
১০	,,	৩০০	,,	৪০০	,,	,,	৩৬৬৬
২৫	,,	২০০	,,	৩০০	,,	,	৬৬৬৬
৪০	,,	১৫০	,,	২০০	,,	,,	৭৩৩৩
৬০	,,	১০০	,,	১৫০	,,	,,	৮০০০
৭৫	,,	৭৫	,,	৮০	,,	,,	৭৩৩১
১০০	,,	৫০	,,	৭৫	,,	,,	৬৮৭৫

বার্ষিক সমুদয়ে ৩৭৭৫২ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে।

মুসলমান ও ফিরিঙ্গিগণের শিক্ষা। ১৯ আশ্বিন ১২৮৬। ২৫ সংখ্যা

আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম এতদিনের পর মুসলমানদিগের চৈতন্য হইয়াছে। যখন সর্ব্বসাধারণের শিক্ষার জন্য স্কুল কলেজ প্রভৃতি খোলা হইল তখন তাঁহারা ঘৃণাপূর্ব্বক দূরে রহিলেন, ইংরাজদিগের ভাষা শিখিব না, হিন্দুবালকদিগের সহিত একত্র বসিব না বলিয়া নিজ নিজ সন্তানদিগকে ঐ সকল স্কুল কলেজ প্রভৃতিতে প্রেরণ করিলেন না। বৎসরের পর বৎসর যাইতে লাগিল, শিক্ষার গুণে হিন্দুযুবকগণ সুশিক্ষিত ও উন্নত হইতে লাগিল, আইন, আদালত, চিকিৎসা প্রভৃতি সকল বিভাগে তাহারা প্রবেশাধিকাব লাভ করিল; পরিশ্রমগুণে অর্থোপার্জ্জন করিয়া তাহারা ধনমানে উন্নত হইতে লাগিল ওদিকে মুসলমানগণ, শিক্ষাভাবে পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের অর্থাগমের দ্বার সকল রুদ্ধ হইল বটে কিন্তু তাঁহাদের ভোগ ও বিলাস সুখের বাসনা তদনুসারে হ্রাস হইল না; সুতরাং দিন দিন দারিদ্র্যের বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

এইরূপে অল্পদিনের মধ্যে হয় মুসলমানদিগেব সামাজিক ও মানসিক অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এতদিনের পর যে মুসলমানদিগের মোহনিদ্রা ভাঙ্গিতেছে ইহাও সুখের বিষয়। কলিকাতাঁব অনেকগুলি সম্রান্ত মুসলমান সম্প্রতি মুসলমান যুবকদিগের শিক্ষাব নিমিত্ত একটি কালেজ খুলিবার জন্য গবর্ণমেণ্টেব নিকট আবেদন করিয়াছেন। তাঁহাদের ইচ্ছা প্রেসিডেন্সি কালেজের ন্যায় মুসলমানদিগের উচ্চশিক্ষার নিমিত্ত একটী কলেজ খোলা হয়, এবং গবর্ণমেণ্ট ঐ ব্যয়ভার বহন করেন। গবর্ণমেণ্ট যখন আমাদের সন্তানগণের শিক্ষার জন্য এত অর্থ ব্যয় করিতেছেন তখন আমরা কোন্ মুখে এ প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে বলিব। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যখন তাঁহাদের শিক্ষাস্থানে জাতিবর্ণ বিচার করেন না, তখন আবার কোন যুক্তিতে নূতন কালেজ স্থাপন বিষয়ে সাহায্য করিবেন? গবর্ণমেণ্ট মুসলমানদিগকে বলিবেন, তোমরা প্রেসিডেন্সি কালেজে তোমাদের যুবকদিগকে প্রেরণ কর না কেন? যদি বল হিন্দু বালকদিগের সহিত আমাদের বালকদিগকে মিশিতে দিব না, তবে আপনাদেব কুসংস্কার ও জাতিবৈরের ফল আপনারা ভোগ কর।

বিশেষতঃ নিরবচ্ছিন্ন মুসলমানদিগের জন্যই যদি একটী কালেজ খোলা হয় তাহা চলিবার আশা কি? বর্ষে বর্ষে প্রবেশিকা পরীক্ষায় যে সকল ছাত্র উত্তীর্ণ হয় তাহাদের মধ্যে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা কত? যদি কালেজ খোলা যায় তাহা হইলে ছাত্র কোথায় পাওয়া যাইবে? একে গবর্ণমেণ্ট এইরূপ কালেজ খুলিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইতেছে বলিয়া মফস্বলের কালেজগুলি তুলিয়া দিবার চেষ্টায় আছেন, এখন আবার নূতন কালেজ খুলিয়া অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া কর্ত্তব্য কিনা একবার বিবেচনা করা উচিত।

মুসলমানগণ যদি উচ্চশিক্ষার জন্য বাস্তবিক ব্যগ্র হইয়া থাকেন এবং কালেজ চলিবার উপযুক্ত ছাত্র পাওয়া সম্ভব মনে করেন, তাহা হইলে আপনাদের ব্যয়ে ও আপনাদের চেষ্টাতে একটী কালেজ খুলুন না কেন? কলিকাতাতে মিশনরিগণ যদি কালেজ খুলিয়া চালাইতে পারিতেছেন, পণ্ডিতবর বিদ্যাসাগর একটী স্বতন্ত্র কালেজ খুলিয়া চালাইতে পারিতেছেন, মুসলমানগণ একত্র হইয়া কি একটী কালেজ চালাইতে পারেন না? যদি চলিবার পক্ষে কোন সন্দেহ থাকে, কিম্বা ক্ষতিগ্রস্ত হইবার ভয় থাকে, সে ক্ষতি গবর্ণমেণ্টের স্কন্ধে চাপাইবার চেষ্টা করা কি যুক্তিসঙ্গত কার্য্য? গবর্ণমেণ্ট যদি মুসলমানদিগের বিশেষ প্রার্থনা পুর্ণ করিবার জন্য ক্ষতিস্বীকার করেন, খ্রীষ্টানদিগের জন্য কেন একটী স্বতন্ত্র কালেজ খুলিবেন না? ফিরিঙ্গিদিগের জন্য কেন একটী স্বতন্ত্র কালেজ খুলিবেন না? আবশ্যকমত কিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য করা গবর্ণমেণ্টের নিয়ম বিহির্ভূত নয় কিন্তু এক এক সম্প্রদায়ের বিশেষ ইচ্ছা পুর্ণ করিবার জন্য সমগ্র ব্যয়ভার গ্রহণ করিলে নিয়মবিরুদ্ধ কর্ম্ম করা হইবে।

ফিরিঙ্গিগণের শিক্ষা দিবার জন্য যে চেষ্টা হইতেছে সে সম্বন্ধেও আমাদের এই বক্তব্য। ফিরিঙ্গিদিগের অবস্থা আরও শোচনীয়। সামাজিক মানসিক ও নৈতিক সকল অংশেই ইহারা হীন। ইংরাজদিগের সহিত মিশিতে গেলে ইংরাজেরা ইহাদিগকে ঘৃণা করে। হিন্দুদিগের প্রতিও ইহাদের নিজের বিজাতীয় ঘৃণা। সুতরাং এদেশে জন্মগ্রহণ এবং এদেশে বাস করিয়াও ইহারা এক সম্প্রদায় দ্বীপান্তরিত লোকের ন্যায় বাস করিতেছে। ইউরোপীয় রক্ত হয়ত দুই চারি বিন্দু শরীরে আছে, তাহাও হোমিওপেথির অষ্টম নবম ডাইলিউশন হইবে, এই অহঙ্কারে আর বাঁচেন না। নিজেরা ধর্ম্মনীতি অংশে অত্যন্ত হেয় অথচ এদেশীয়দিগের প্রতি হীন বলিয়া যথেষ্ট ঘৃণা আছে। ইহাদের আয় এদেশীয়দিগের ন্যায়, চালচলন ইংরাজদিগের ন্যায়, সুতরাং দরিদ্রতা ইহাদের কৌলিক রোগস্বরূপ। বিবাহের পর পুরুষেব পক্ষে স্ত্রী ত্যাগ ও রমণীর পক্ষে ব্যভিচারিণী হওয়া ইহাদের মধ্যে প্রথার স্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে। যাহাদের এইরূপ অবস্থা তাহারা যে কৃপাপাত্র তাহাতে আর সন্দেহ কি।' কিন্তু ইহারা যে হীনাবস্থায় রহিয়াছেন সে কাহার দোষে? অস্বাভাবিক গর্ব্বের জন্য যদি কেহ ক্লেশ পায় কে তাহা নিবারণ করিতে পারে? তাহাদের রোগ দেবের অসাধ্য। কর্ত্তৃপক্ষ কয়েক বৎসরাবধি ইহাদের অবস্থার উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। আর্চডিকন বেলি কয়েক বৎসর ইহাদের অবস্থার বিষয় অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছেন। ইহাদের জন্য ওয়ার্কশপ্ খোলা হইয়াছে ইহাদিগকে প্রায় সকল আপীষে প্রবিষ্ট করিবার চেষ্টা হইতেছে। আর্চডিকন বেলি একথাও বলিয়াছেন ইহাদের অনেকে অতিশয় দরিদ্র, সুতরাং অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন ভিন্ন ইহাদের সন্তানদিগের শিক্ষার উপায় দেখা যায় না। তিনি গবর্ণমেণ্টকে এই ব্যয় বহন করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। মুসলমানদিগের জন্য স্বতন্ত্র কালেজ স্থাপন বিষয়ে

যে আপত্তি এ বিষয়ে ও আমাদের সেই আপত্তি। এক এক দল লোক নিজ দোষে কষ্ট পাইবে এবং গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেকের উপায় বিধানার্থ অগ্রসর হইবেন, এই রূপে গবর্ণমেণ্ট কতদিন চলিবেন। এরূপ নির্ব্বোধ ও কুসংস্কারপন্ন ব্যক্তিদিগের ক্লেশ পাওয়াই উচিত।

স্ত্রীশিক্ষার কয়েকটী প্রতিবন্ধক। ২০ পৌষ ১২৮৭

কানপুরস্থ আমাদের আত্মীয়ের একটী কন্যা তথায় যে সকল বাঙ্গালী বালিকা ও রমণীগণ আছেন, তাঁহাদিগের বিদ্যাশিক্ষা হইতেছে না বলিয়া আক্ষেপ করিয়া একখানি পত্র লিখিয়াছেন। তাঁহার উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ আমরা সেই পত্রখানি নিম্নে প্রকাশ করিলাম। তিনি বলেন কানপুরে যে সকল বাঙ্গালী আছেন, তাঁহাদের স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে যত্ন নাই। কিন্তু বঙ্গদেশে উত্তমরূপে স্ত্রীশিক্ষা হইতেছে। তিনি দূরে আছেন। তিনি বঙ্গদেশের অবস্থা বিশেষরূপ অবগত আছেন। অতএব তাঁহার এ প্রকার সংস্কার হওয়া অনৈসর্গিক নয়। আমরা বঙ্গদেশে আছি, বঙ্গদেশের স্ত্রীশিক্ষার অবস্থা দর্শন করিতেছি কিন্তু যাহাকে প্রকৃত শিক্ষা বলে, যাহার বলে হৃদয় মার্জ্জিত হয়, যাহার বলে হৃদয়ে ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান জন্মে সে শিক্ষা কোথায়। সে শিক্ষা জন্মিলে বঙ্গবাসীরা অতুল সাংসারিক ও পারিবারিক সুখভোগে অধিকারী হইতেন।

আমরা স্ত্রীশিক্ষার কয়েকটী প্রতিবন্ধক দেখিতেছি। প্রথম, বাল্যবিবাহ। এই বাল্যবিবাহ নিবন্ধন পিতৃগৃহে থাকিয়া স্ত্রীগণের নিয়মিত শিক্ষা লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। শাস্ত্রে আছে—

অষ্টবর্ষা ভবেৎ গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী।
দশমে কন্যাকা প্রোক্তা অতঊর্দ্ধং রজস্বলা॥

অষ্টবর্ষবয়স্ক কন্যাকে গৌরী, নবমবর্ষীয়াকে রোহিণী ও দশম বর্ষীয়াকে কন্যা বলে। তাহার পর রজস্বলা হয়।

অনেকে অষ্টমবর্ষেই কন্যাকে বিবাহ দেন। যিনি বড় ধৈর্য্যশালী, তিনি দশম বর্ষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারেন। তাহার পর কন্যার বিবাহার্থ একান্ত অধীর হইয়া পড়েন। দশম বর্ষে কন্যার বিবাহ হইল। সেই বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে কন্যার বিদ্যালয়ে গমন বন্ধ হইয়া গেল। এ অবস্থায় রীতিমত শিক্ষালাভের সম্ভাবনা কি?

পিতৃগৃহে শিক্ষা আরম্ভ করিয়া স্বামীগৃহে গিয়া যদি তাহার অনুশীলন করিতে পান, সেই শিক্ষা ক্রমে সর্ব্বাবয়ব পুষ্ট হইয়া উঠে। কিন্তু স্বামীগৃহে সেই শিখার সর্ব্বাবয়ব পুষ্টিলাভের বহুল বিঘ্ন আছে। বাল্যবিবাহ নিবন্ধন পুরুষেরা কৃতকর্ম্ম হইয়া প্রায়ই পরিণয়কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। সুতরাং যাবৎ পিতামাতা জীবিত থাকেন, তাবৎ তাঁহাদিগকে তাঁহাদেরই মন্ত্রের অধীন ও অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতে হয়। তাঁহারা যে

স্বাধীনভাবে ইচ্ছামত আপন আপন স্ত্রীশিক্ষা কার্য্যের বন্দোবস্ত করিবে সে পথ থাকে না। অনেকেরেই শিক্ষা এই কারণে বন্ধ হইয়া যায়; সুতরাং তাঁহারা পিতৃগৃহে যে যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষালাভ করিয়া আইসেন আলোচনার অভাবে ক্রমে তাহা বিস্মৃত, অনেকের আবার অবস্থা একান্ত মন্দ। সুতরাং তাঁহাদের স্ত্রীগণ সাংসারিক কার্য্যনির্ব্বাহ করিয়া এরূপ অবসর পায় না যে অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিতে পারে। অবস্থা মন্দ হইবারও কারণ এই পুরুষেরা উপার্জ্জনক্ষম ও কাজের লোক হইয়া বিবাহ করে না। সুতরাং তাহাদের স্ত্রীগণ সুখস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে থাকিতে পায় না। মন সুখিত ও অবসর যদি না রহিল, পাঠে প্রবৃত্তি জন্মিবার ও অধ্যয়নকার্য্য নির্ব্বাহ করিবার সম্ভাবনা কোথায়?

সাধারণ্যে হিন্দুসমাজের সকলে স্ত্রীশিক্ষার উপযোগিতা বুঝিতে পারেন না, অধিকাংশ লোকে স্ত্রীশিক্ষা হইতে অনিষ্টের আশঙ্কা করিয়া থাকেন। সুতরাং যাহাদের অবস্থা ভাল যাহাদের স্ত্রীগণের অবসর থাকে তাহারও স্ব স্ব কলত্র ও কন্যাদিগকে অধ্যয়ন কার্য্য বিনিয়োজিত করে না। এইরূপ নানাকারণে ভারতে স্ত্রীশিক্ষার বিঘ্ন ঘটিতেছে। অনেক বলেন বঙ্গদেশের স্ত্রীগণের সুশিক্ষা হইতেছে কিন্তু আমরা বুঝিতেছি সেটি জনরব মাত্র। অনেক ইউরোপীয় ভ্রমে পতিত হইয়া মনে করিয়া থাকেন বঙ্গদেশে সুন্দর স্ত্রীশিক্ষা হইতেছে। সে দিন সার রিচাড টেম্পল বক্তৃতাকালে এ কথার উল্লেখ করিয়াছিলেন। অন্য অন্য ইউরোপীয়েরাও সময়ে সময়ে এই বিষয়ের প্রসঙ্গ করিয়া বঙ্গদেশের প্রশংসা করেন। কিন্তু আমাদিগের এটী ভৌতিককাণ্ড বলিয়া বোধ হয়। যেগুলি স্ত্রীশিক্ষার বিঘ্ন, আমরা যাহার কতকগুলি উল্লেখ করিলাম, যাবৎ সেই বিঘ্নগুলি তিরোহিত না হইবে তাবৎ ভারতীয় রমণীগণের রীতিমত শিক্ষালাভের সম্ভাবনা নাই। পুরুষেরা যদি কৃতকর্ম্মী ও উপার্জ্জনক্ষম হইয়া বিবাহ করিতে আরম্ভ করেন এবং তাঁহাদের হৃদয়ের কুসংস্কার দূরীভূত হয় তাহা হইলে শীঘ্র স্ত্রীশিক্ষা পূর্ব্ববায়ুচালিত মেঘমালার ন্যায় ভারত গগনকে পরিব্যাপ্ত করিয়া তুলে। আমরা যে পত্রের প্রসঙ্গে একথাগুলি বলিলাম তাহা এই—

"সর্ব্বস্রজন কর্ত্তা পরমেশ্বর নরনারীকে সমান মানসিকবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন এবং তজ্জন্য উভয়েই বিদ্যাবুদ্ধি লাভ করিতে সক্ষম কিন্তু এদেশীয় স্ত্রীগণ, শিক্ষাভাবে তাঁহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত না হওয়াতে নিতান্ত হীনাবস্থায় রহিয়াছেন। যদি উঁহাদিগকে উত্তমরূপে শিক্ষা প্রদান করা যায় তাহা হইলে তাঁহারা কোন ক্রমেই পুরুষগণ অপেক্ষা ন্যূন নহেন ইহা বিবেচনা করিয়া বঙ্গদেশে অনেকেই স্ত্রীশিক্ষার নিমিত্ত সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছেন এবং তাঁহাদিগের যত্ন সফল হইতেছে, কিন্তু উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় বাঙ্গালীদিগের তাদৃত অবস্থা না থাকায় এ প্রদেশীয় বালিকাগণের কিছুমাত্র বিদ্যাশিক্ষা হয় না। কেবল জানানা মিসনের অনুগ্রহে অক্ষরপরিচয় হইয়া উপন্যাস ও নাটকাদি পঠনের শক্তি জন্মে। কিন্তু বিদ্যাশিক্ষার ফললাভ হয় না। এই সকল কেবল অভিভাবক-

দিগের অযত্নের ও উত্তম শিক্ষকের অভাবের ফল। যদি অভিভাবকগণ স্বীয় স্বীয় বালিকাগণের শিক্ষায় যত্নবান হইয়া পরস্পর সাহায্যপ্রদান পুর্ব্বক সুশিক্ষক নিযুক্ত করিয়া বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন, তাহা হইলে অনায়াসে শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। এস্থানে ন্যূনাধিক প্রায় ২০০ শত বাঙ্গালী বসতি করেন। ইঁহারা সকলে উৎসাহী হইলে একটী বালিকাবিদ্যালয়ের ব্যয়নির্ব্বাহ হওয়া কোন ক্রমেই কঠিন হয় না। অতএব ভদ্র মহাশয়গণের সমীপে প্রার্থনা এ বিষয়ে কথঞ্চিৎ মনোযোগ করিলে সাধারণের যথেষ্ট উপকার হইবে। এখানে কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সাহায্যে বালকগণের বঙ্গভাষা শিক্ষার জন্য একটী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে এবং তাহার কার্য্যও সুচারুরূপে সম্পাদন হইতেছে কিন্তু ইহা কি দুঃখের বিষয় নহে যে বালিকাদিগের শিক্ষার নিমিত্ত কেহই চেষ্টিত নহেন।

এতদ্দেশীয় স্ত্রীগণের যেরূপ অবস্থা তজ্জন্য তাহাদিগকে বাল্যাবস্থায় শিক্ষা দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। কেন না দশম বর্ষ উত্তীর্ণ হইলেই তাহাদের বিবাহ হয় তদবধি তাহারা গৃহিণী হইয়া গৃহধর্ম্মে নিযুক্ত হয় এবং তৎকালে তাহাদের সুবিধা ও অবকাশ দুইয়ের সম্পুর্ণরূপে অভাব হইয়া উঠে। স্থানীয় অনেক স্বদেশানুরাগী মহোদয়গণ বিদ্যাচর্চ্চা ও জ্ঞানোন্নতির নিমিত্ত সভা সংস্থাপন ও পুস্তকাদি সংগ্রহ প্রভৃতি সদনুষ্ঠান দ্বারা দেশের হিত চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু যে পর্য্যন্ত নগরে নগরে ও গ্রামে গ্রামে স্ত্রীবিদ্যার উন্নতি না হইল তাবৎ দেশে উন্নতির আশা কোথায়? যদি উক্ত মহাশয়গণ যথার্থ দেশের হিতাকাঙ্ক্ষী হন, তবে স্থানীয় অভাবটী পুর্ণ করিয়া বঙ্গবালাদিগের দুঃখ দূর করিতে যত্নবান হউন, ইহাই একান্ত মনে প্রার্থনা।"

নিম্নশ্রেণীর লোকের বিদ্যাশিক্ষা। ১৬ শ্রাবণ ১২৮৯। ৩৭ সংখ্যা

আমাদের যতদূর পর্য্যন্ত প্রাচীন ইতিহাস হস্তগত হইয়া থাকে, তদ্দৃষ্টে নিঃসন্দিগ্ধ রূপে প্রতিপন্ন হয় ধর্ম্মনীতিশিক্ষা এবং বিদ্যাবিস্তার পক্ষে আর্য্যেরা চিরকাল অনুদারনীতির বশবর্ত্তী হইয়াছিলেন। তাঁহারা মানসিক ও সামাজিক বহুবিধ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, সর্ব্বত্র পুজ্য ও অনুকরণ স্থানীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু আপামর সাধারণ সকলেই সুশিক্ষিত ও ধর্ম্মশাস্ত্রে বুৎপন্ন হয় এটী তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য ভিন্ন অন্যান্য যাবতীয় লোক চিরকাল অজ্ঞানান্ধকারে অন্ধ হইয়া থাকিত। কি রাজা কি সমাজে অগ্রণী ব্রাহ্মণেরা শূদ্রজাতির অবস্থা উন্নত করিতে কখন যত্নবান্ হন নাই। এটী তাঁহাদের অতিশয় স্বার্থপরতার লক্ষণ। পাছে ইতর লোকের চক্ষু প্রস্ফুটিত হইলে তাহারা ব্রাহ্মণাদি উপরিতন উৎকৃষ্টবর্ণের লোকের অসম্মান করে, সে কারণ নীচজাতিকে কখন বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া হয় নাই।

নীচজাতিকে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে, তাহাদের জ্ঞানচক্ষু ফুটাইয়া দিতে

হইবে, এ প্রবৃত্তি ইংরাজিশিক্ষা হইতে জন্মিয়াছে। এটী পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের একটী উৎকৃষ্ট ফল। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক শিক্ষাবিস্তার সাধিত হইবার পুর্ব্বে এদেশে গুরুমহাশয়ের পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছিল এবং তথায় ইতর ও ভদ্র সকলেই বিদ্যাশিক্ষা করিত। কিন্তু তদ্রূপ শিক্ষাদানে বিশেষ কোন ফলোদয় হইত না, কারণ সংস্কৃতই ভারতবর্ষের উচ্চ অঙ্গের শাস্ত্র। নীতি ও দর্শন প্রভৃতি উচ্চতর বিষয় সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। কিন্তু ইতর জাতি সে ভাষা শিক্ষায় বঞ্চিত ছিল, সুতরাং তাহারা সম্যকরূপে জ্ঞানলাভ করিতে পাইত না। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে বিদ্যাবিস্তার করিবার মানসে অনেক যত্ন করিতেছেন, কিন্তু কিছুতেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপায় দেখা যাইতেছে না। ইতর লোকদিগকে কিরূপে যে শিক্ষিত করা যাইবে, এইটী কঠিন সমস্যা হইয়াছে। আমরা দেখিতেছি একমাত্র দরিদ্রতাই এই বিদ্যা বিস্তারের পথ অবরুদ্ধ করিতেছে। অজ্ঞ ইতর লোকেরা প্রথমে বিদ্যাশিক্ষার সাক্ষাৎফল দেখিতে অভিলাষ করে। তাদৃশ লোক যত্ন করিলেও প্রথমে যৎসামান্য বিদ্যাশিক্ষা করিতে সক্ষম হয়, কিন্তু সামান্য বিদ্যার ফল তাহাদের হস্তগত করিয়া দেওয়া দুষ্কর। সুতরাং অজ্ঞলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষায় রুচি হয় না। দ্বিতীয় প্রতিবন্ধ, নিম্নশ্রেণীর লোকদিগেব দুরবস্থা। দরিদ্র লোকেরা আপনাদের সন্তানকে পাঠশালায় বিদ্যাধ্যয়ন করাইতে দিলে মাসিক এক আনা কিম্বা দেড আনা বেতন লাগিবে। ইহা তাহাদের পক্ষে কষ্টকর হইয়া থাকে। যদ্যপি বিদ্যাশিক্ষার আশু কোন ফল দৃষ্ট হইত, অবশ্য তাহারা ক্লেশ স্বীকার করিয়াও সে ব্যয় দিতে অনিচ্ছু হইত না। কিন্তু আশু ফলোদয়ের সম্ভাবনা নাই, সুতরাং এ ব্যয় তাহারা ক্ষতিজনক জ্ঞান করে। তদ্ভিন্ন শ্রমজীবীদিগের সন্তানের বিদ্যালয়ে বদ্ধ থাকাই গৃহস্থের পক্ষে ক্ষতিকর। বালকেরা পঞ্চম কিম্বা ষষ্ঠবর্ষবয়ঃক্রম উত্তীর্ণ হইলেই গরু চরাইতে আরম্ভ করে। ইহারা বিদ্যালয়ে বদ্ধ থাকিলে তাহাদের পিতামাতা গোরক্ষার নিমিত্ত রাখাল নিযুক্ত করিতে পারে না,—তাহাদের অবস্থা হীন, গোপালের বেতন দিবার সঙ্গতি নাই। এই সমস্ত অসুবিধা দর্শনে নৈশবিদ্যালয় স্থাপিত হইল কিন্তু মাঠে মাঠে সমস্ত দিন পশুর সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া শরীর মন ক্লান্ত হইয়া পডে। রাত্রিতে শয়ন করিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতেই ইচ্ছা হয়, অতএব তখন বিদ্যাশিক্ষায় মনঃসংযোগ করা সহজ নহে। অধিকন্তু যেখানে এত অসুবিধা, সে স্থলে বিদ্যাবিস্তার পক্ষে একটু বিশেষ যত্ন করা ও কিছু অধিক অর্থ ব্যয় করা চাই। কিন্তু তাহার কিছুই হইতেছে না। যজ্ঞোপবীত হইলে ব্রহ্মচারীকে আচার্য্যগৃহে গিয়া বেদাধ্যয়ন করিতে হয়, এখন নামে কেবল সেই নিয়মটী প্রতিপালিত হইয়া থাকে। নূতন ব্রহ্মচারী কেবল সপ্তপদ অগ্রসর হন, অমনি জননী আসিয়া ধরিয়া লইয়া যান। নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের মধ্যেও সেইরূপ একটা সখের ঢেউ উঠিয়াছে। নামে এক হিন্দু নিয়ম প্রতিপালিত হয় কিন্তু যত্ন ও ব্যয় করিবার সময় রাজনীতি তাহাকে ফিরাইয়া লন, আর হইতে দেন না।

সামান্য অজ্ঞলোকদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া সহজ ব্যাপার নহে। প্রথমতঃ তাহাদিগের মনকে নত করাই দুরূহ। এখনও এতদ্দেশীয় সমস্ত লোকের দৃঢ় সংস্কার আছে যে, বিদ্যাশিক্ষা করিলেই এক-একটী চাকরী করিতে হইবে। ইতর লোককে বিদ্যাশিক্ষা করাইতে হইলে অগ্রে সে সংস্কার দূরীভূত করা চাই। অতএব হাতেখড়ীর সময়ে এই উপদেশ ত এক গুরুতর শিক্ষা। যাবৎ মন কিঞ্চিৎ নম্র করিতে না পারিবেন, তৎকাল পর্য্যন্ত স্বয়ং বৃহস্পতি কিংবা শুক্র আসিলেও কাহাকে একটী বর্ণ শিখাইতে সমর্থ হইবে না। তবে ভাবিয়া দেখুন, এমন উপদেশ দিবার যোগ্য পাত্র কে? সামান্য গুরুমহাশয় কি লোকের চিত্তাকর্ষক করিতে পারেন?—না মূঢ় লোকের শ্রদ্ধাস্পদ হইতে পারেন? ঈদৃশ কঠিন ক্ষেত্রে সদ্‌গুরুই আবশ্যক। সামান্য লোকদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দিবার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ শিক্ষিত উপদেষ্টা নিযুক্ত করা চাই। কৃষক প্রভৃতি শ্রমজীবীদিগের পক্ষে সম্প্রতি রাত্রিই উপযুক্ত সময়। দিবসের পরিশ্রমের পর তাহারা ক্লান্ত হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু এ অসুবিধাটী উপেক্ষা করিতে হইবে। অন্যান্য সাধারণ লোকের অবকাশ নাই, দিবাভাগে অবসর করিয়া লইতে হইলে কেহই ক্ষতি স্বীকার করিতে পারিবে না।

এক্ষণে কিছু কিছু বিদ্যাশিক্ষার ফল না দেখাইতে পারিলে, বিদ্যাধ্যয়নে কাহারও অনুরাগ জন্মিবে না। তাহার উপায় কি? যে কোন প্রকারে হউক ইহার কিছু কিছু ফল দেখাইতে হইবে। আজকাল ভারতবর্ষের এতাদৃশ দুরবস্থা ঘটিয়াছে, যিনি সংসারের স্থষ্টিকর্ত্তা এবং পালনকর্ত্তা, এ বিষয়ে তাঁহাকেও ভাবিত হইয়া পড়িতে হয়। তিনিও বিদ্যাশিক্ষার আশু ফল কি দেখাইবেন, তাহা স্থির করিতে অক্ষম। বিদ্যাশিক্ষার আশু ফল কি? ইতর লোকেরা জ্ঞানলাভ বুঝিবে না, তাহারা ধনোপার্জ্জন চায়। বিদ্যালাভে যদ্যপি সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়, তবেই কিছু দিন লেখাপড়া করিতে লোকের ইচ্ছা হইবে। আমরা তাই বলিতেছি, ইহার কোন একটী উপায় স্থির করা আবশ্যক। নিম্নশ্রেণীর যে সকল লোক কিছু কিছু বিদ্যাধ্যয়ন করিতে পারিবে, তাহাদিগকে গবর্ণমেণ্ট ক্রমশঃ রেলওয়ের ব্যয় সাশ্রয় করিতে হইবে এবং সামান্য লোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার উৎসাহ বৃদ্ধি হইতে পারিবে। তদ্ব্যতিরিক্ত কৃষক এবং নিম্নশ্রেণীর অন্যান্য ব্যক্তিকে কৃষিকার্য্যের নানাবিধ নিয়ম এবং স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় শিখাইলে তাহারা বিদ্যাধ্যয়নের অনেকটা ফল বুঝিতে সমর্থ হইবে।

এক্ষণে বঙ্গদেশের প্রায় সকল পল্লীতে ফৌজদারী পঞ্চায়ত নিযুক্ত হইতে চলিল। ঐ পঞ্চায়তের সভ্যগণ যদ্যপি কিঞ্চিৎ মনোযোগী হইয়া ইতর লোকের বিদ্যাশিক্ষার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন তাহা হইলে বিশেষ ফলোদয়ের সম্ভাবনা। তাঁহারা গ্রামস্থ সমস্ত লোককে নৈশবিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে সক্ষম হইবেন। অল্প অল্প শিক্ষালাভ করিতে করিতে যদ্যপি সামান্য লোকে ক্রমে স্ব স্ব ব্যবসায়ের উন্নতি করিতে পারে, তাহা হইলে সেই দৃষ্টান্ত অনুসারে সকলেই চলিবে।

এদেশীয় সমস্ত লোকে চাকরী করাই বিদ্যা শিক্ষার পুরস্কার বলিয়া জানে, তাহার

কারণ কি? ইহার হেতু নির্দ্দেশ করা নিতান্ত সুগম। ইউরোপের কৃতবিদ্য পুরুষেরা বিদ্যাধ্যয়ন করিয়া তাহার যথোপযুক্ত ফললাভ করিয়া থাকেন। যিনি যে প্রকার ব্যবসায়ে প্রবেশ করুন না বিদ্যাই তাঁহার সর্ব্বথা সহচরি এবং জীবিকা নির্ব্বাহের একমাত্র অনুকারিণী। ইউরোপের প্রায় যাবতীয় কার্য্য বিজ্ঞানুকূল্যে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু ভারতবর্ষের তদ্রূপ অবস্থা নহে, এখানকার নিম্নশ্রেণীস্থ কৃষকেরা পুর্ব্বতন সংস্কার অনুসারে কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ করে কিন্তু জ্ঞানের বলে কৃষিকর্ম্মের যে কতদূর পর্য্যন্ত উৎকর্ষ সাধন হইতে পারে, স্বপ্নযোগেও এই চিন্তা তাহাদের হৃদয়ে উদিত হয় না, এদিকে যৎসামান্য বাণিজ্য প্রচলিত আছে তাহাতেও অধিক বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োজন নাই। সুতরাং বিদ্যাশিক্ষার সাক্ষাৎ ফল দেখাইতে না পাবিলে ইতর লোকদিগকে বিদ্যাশিক্ষায় প্রবৃত্ত করা সুকঠিন হইয়া উঠিবে।

স্ত্রীশিক্ষা। ৩০ শ্রাবণ ১২৮৯। ৩৯ সংখ্যা

স্ত্রীলোক শিক্ষিত হইয়া সমাজের কার্য্যোপযোগী হন ইহার পব আর সুখের বিষয় কি আছে। দাস্যবৃত্তি করিবার জন্য স্ত্রীলোকের জন্ম নয়। অন্ন সিদ্ধকরা, গৃহ মার্জ্জন, গোয়াল পাডা, ভ্রাতৃবিচ্ছেদ উপস্থিত করা ও কোমব বাঁধিয়া ঝগডা করার জন্য ঈশ্বর তাহাদিগের সৃষ্টি করেন নাই। স্ত্রীপুরুষের কাজ প্রায় একই প্রকার, কিন্তু পুরুষ আত্মম্ভরিতা ও বলিষ্ঠতা নিবন্ধন তাহাদিগের উপর একাধিপত্য স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে অবোধ পশু সদৃশ করিয়া রাখিয়াছেন। অন্যত্র স্ত্রীলোকের তবু কথঞ্চিৎ স্বাধীনতাবিহীন রমণী পৃথিবীর আর কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। এখন সেই মূর্খ ও দুর্দ্দান্ত যবন সম্রাটের অধীনতা হইতে ভারত মুক্ত হইয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণে লোকেব মনের অন্ধকাব দূরগত হইতেছে। আপনাদিগের ন্যায় স্ত্রীগণকে শিক্ষিত করা কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইতেছে বটে, কিন্তু স্ত্রীলোক শিক্ষিত হইয়া সমাজের কি কি কার্য্য করিবে তাহা আজিও স্থিরীকৃত হয় নাই। অনেকের মনের ভাব স্ত্রীলোক বিদ্যা শিক্ষা করিয়া গৃহ কর্ম্ম পরিত্যাগ পুর্ব্বক দিব্য সভ্যভব্য হইয়া ছবিখানির ন্যায় চেয়ারে বসিয়া খবরের কাগজ পড়িবে, স্বামীর সহিত রসালাপ করিবে, স্বাধীনভাবে একত্রে বেডাইবে, তাহা হইলেই স্ত্রীশিক্ষার চরম ফল ফলিল। ফলতঃ সাহেবী ধরণটী আপনাদিগের মধ্যে চালাইবার চেষ্টাই যাঁহাদিগের স্ত্রীশিক্ষার প্রতি পক্ষপাতিতার কারণ আমরা তাঁহাদিগের সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে চাহি না। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে ভারতবর্ষস্থ সাহেবদিগকে লক্ষ্য করিয়া কাজ করিলে স্ত্রীশিক্ষা-নিবন্ধন সুফল না ফলিয়া, কুফলই ফলিবে। তাহার কারণ ভারতবর্ষস্থ ইংরাজেরা ঘোর বিলাসী।

পৃথিবীতে যে কোন নূতন আবিষ্ক্রিয়া হইয়াছে দরিদ্র ব্যক্তিই তাহার মূলে। অভাবই বুদ্ধি যোগাইবার একমাত্র উপায়, যাহার অভাব নাই তাহার উদ্ভাবনী-শক্তি

নাই। এই কারণেই ইংলণ্ডস্থ সাহেবদিগের সদৃষ্টান্তের অনুকরণ করিতে পরামর্শ দিই। এই স্ত্রীশিক্ষার বিষয়ে এখন তথায় ঘোরতর আন্দোলন চলিতেছে। এখানকার ইংরাজদিগের অপেক্ষা তথাকার সাহেবদিগের অভাব অধিক। সুতরাং তাঁহারা স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষার সহিত অর্থোপার্জ্জনেরও নানা উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন। স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার সহিত ধনোপার্জ্জন হয় অথচ সমাজের কল্যাণ সাধিত হইতে পারে এরূপ উপায়ের উদ্ভাবন করিবার জন্য বিলাতে আজ ২০ বৎসর যাবৎ একটী সভা প্রতিষ্ঠিত আছে। অনেক বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ লোক ইহার সভ্য আছেন স্বয়ং ইংলণ্ডেশ্বরী ও তাঁহার বংশের অনেকেই এই সভার প্রধান হিতৈষী। এই সভা কর্ত্তৃক স্থাপিত পাঁচটী বাসবাটী আছে। পাঠার্থী যুবতীরা তাহাতে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। এই সকল রমণী ৩টী কলেজিয়েট স্কুলে সন্ধ্যার পর বিদ্যালাভ করিয়া থাকেন, ইঁহাদিগকে অধিক পরিমাণে পারিভাষিক শিক্ষা দিবার নিমিত্ত মাসিকপত্রে ভাল প্রস্তাবের অবতারণা করা হয়। ইংলণ্ডের দশ লক্ষেরও অধিক রমণী ইহার উপকারিতা বুঝিতে পারিয়া নিয়ত গৃহকর্ম্মে নিরত থাকিতে অসম্মত হইয়াছেন। তাঁহারা আপনাদিগের জীবিকোপায় আপনারাই করিয়া লইতে অভিলাষী। তথাকার লোক বালিকাদিগকে শিল্প ও পারিভাষিক শিক্ষা দিবার নিমিত্ত অধিকতর যত্নবান হইতেছে! সূচিকর্ম্ম ও শিক্ষয়িত্রীর কর্ম্ম ব্যতীত নিম্নলিখিত কার্য্যে ইংলণ্ডীয় রমণীগণ প্রবেশ করিতেছেন। যথা :

চীনের বাসনে নক্সাদি করা, পশম বা রেশমের বুনান, কাষ্ঠ সকল ভাস্করকার্য্যের উপযোগী করিয়া দেওয়া, ভাস্করকার্য্য, অট্টালিকা প্রভৃতির নক্সা করা, রসায়ণ ও ঔষধ বিক্রয়, ধাত্রীর কার্য্য, বুককিপিং সর্টহ্যাণ্ড লেখা, লিথগ্রাফি লেখা, টেলিগ্রাফ, প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করা, মুদ্রণ কার্য্য, চুল প্রস্তুত করা, জহরাদি রক্ষা করিবার বাক্স, সেলাইয়ের কল, ঘরের সরঞ্জাম প্রস্তুত, ষ্টেষণারীর কাজ, লেস পরিষ্কার প্রভৃতি আর কয়েকটী কার্য্য করিয়া থাকেন, রমণীগণ এই সকল কাজ শিখিলে ভাল ভাল কর্ম্ম পান। বাঙ্গালোরের একটী ভদ্রমহিলা ইউরোপ হইতে এই সকল শিল্পকার্য্য শিখিয়া আসিয়াছেন। তিনি এরূপ চিত্র করিতে পারেন যে দেখিলে নয়ন প্রীত হয়। এই সভার যত্নে এক্ষণে মান্দ্রাজের বালিকা বিদ্যালয় সমূহে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। কিন্তু ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থান এ সুখে বঞ্চিত কেন? আপনাদিগের কাজ আপনারা না করিলে কোন কালেই আমাদের উন্নতি হইবে না। ইংলণ্ডের ন্যায় অস্মদ্দেশীয় বালিকাগণকে পারিভাষিক বিদ্যার সহিত শিল্পবিদ্যা শিক্ষা দেওয়াই উচিত। ইহাতে স্ত্রীলোকেরা জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হইবে এবং স্বাধীন ব্যবসায় দ্বারা বিলক্ষণ দশটাকা উপার্জ্জনও করিতে পারিবে। এখানে অন্য কর্ম্ম ভাল চলুক না চলুক কিন্তু ভাস্করের কার্য্য, নক্সা করা ও রসায়ণ কার্য্য যে উত্তমরূপে চলিবে তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। এখন ভাস্কর কার্য্যের প্রয়োজন হইলে ইংলণ্ড ব্যতীত সম্পন্ন হওয়া ভার। এখানে গবর্ণমেণ্টের নিয়োজিত লোকেই নক্সাদি প্রস্তুত করিয়া

থাকে। কিন্তু ভাল নক্সা করিবার লোক এদেশে অতি অল্প, এই কারণে অস্মদ্দেশীয় ১৩৪টী ফর্মে বিলাতের শিক্ষিত রমণী নক্সা প্রস্তুত করিবার জন্য নিযুক্ত আছেন। এদেশীয় রমণীগণ যদি এ কার্য্যে পারদর্শিতা লাভ করিতে পারেন তাহা হইলে বিলাত হইতে আর কাহাকেও নক্সা প্রস্তুত করিবার জন্য আনিবার আবশ্যক হয় না। ঐরূপ এদেশীয় স্ত্রীলোকে যদি রসায়ণ করিতে শিখেন তাহা হইলে তাঁহারা যেমন লাভবান হইতে পারেন তেমনি দেশের অর্থ দেশে থাকিয়া যায়, ভারতবর্ষের এখন যেরূপ দুরবস্থা তাহাতে আর কিছুদিন পরে স্ত্রীপুরুষে অর্থোপার্জ্জন করিতে না পারিলে উদরান্ন সংগ্রহ হইবে না। অতএব স্ত্রীশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এই সকল শিক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক।

খ্রীষ্টমিশনরি দ্বারা হিন্দু অন্তঃপুরবাসি নরনারীগণের শিক্ষাদান

১৭ বৈশাখ ১২৯১। ২৪ সংখ্যা

হিন্দুর মনে হিন্দুধর্ম্ম বন্ধনের যে কেমন শ্লথভাব হইয়াছে, খ্রীষ্ট মিশনরি দ্বারা হিন্দুর অন্তঃপুর নারীগণের শিক্ষাদানপ্রথা দ্বারা তাহা সুন্দররূপে সপ্রমাণ হইতেছে। স্ত্রীগণ সমাজের প্রধান অঙ্গ। হিন্দু সমাজের প্রধান অঙ্গ সেই রমণীগণকে হিন্দুউপকরণ দ্বারা গড়িতে ও হিন্দুধর্ম্ম রসায়ণ দ্বাবা মাজ্জিত করিতে হইবে। তবে হিন্দু সমাজ উন্নতিলাভ করিবে। বৃক্ষবিশেষ দেশবিশেষের জল ও মৃত্তিকার গুণে অজ্জিত ও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সকল দেশে সকল প্রকার বৃক্ষ জন্মে না, যদি কথঞ্চিৎ জন্মে, তাহার উপযোগী জল ও মৃত্তিকা লাভ না হইলে তাহার বৃদ্ধি হয় না। হিন্দুসমাজও সেইরূপ যে জল ও মৃত্তিকায় জন্মিয়াছে, তাহার বৃদ্ধির উপযোগী উপকরণ সামগ্রী চাই। তাহা না মিলিলেই বিশুষ্ক ও বিশীর্ণ হইয়া যাইবে। হিন্দুসমাজের পুরিপুষ্টির নিমিত্ত খ্রীষ্ট মিশনরির দ্বারা অন্তঃপুর শিক্ষারূপ অনুপযোগী উপকরণের সমাবেশ হওয়াতে সমাজে উন্নতি না হইয়া অবনতিই হইতেছে। খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করা খ্রীষ্টমিশনরিদিগের অন্তঃপুর শিক্ষাদানের যে মুখ্য উদ্দেশ্য, তাহা তাঁহারা স্পষ্টই বলিয়া থাকেন, তথাপি হিন্দুদিগের চৈতন্য নাই। তাঁহারা যত্ন সহকারে খ্রীষ্টমিশনরি রমণীদিগকে অন্তঃপুরে লইয়া আপনাদিগের কন্যা কলত্রাদির শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

এই দূষিত অন্তঃপুর শিক্ষা দিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়াতে যে কয়েকটী বিষময় ফল ফলিয়াছে, তদ্দ্বারা তাহার পরিণাম অনুমিত হইতেছে। মিশনারিগণ অন্তঃপুরে আপনাদিগের রমণীগণকে প্রেরণ করিয়া খ্রীষ্টীয়ধর্ম্ম প্রচারের সদুপায় করিয়াছেন, কতকগুলি কুলবধূ ও কুলকন্যাকেও গৃহ হইতে লইয়া গিয়া আপনাদের দলে নিবিষ্ট করিয়াছেন। তাঁহারা ইহাতেও সন্তুষ্ট নহেন, সমুদয় হিন্দুসমাজ যীশুমন্ত্রে দীক্ষিত হন, ইহাই তাঁহাদিগের মুখ্য অভিপ্রায়। এই অভিপ্রায় সাধন জন্য তাঁহারা বিবিধ উপায় চিন্তা করিতেছেন;

কিন্তু অভিলাষ পুর্ণ হইতেছে না বলিয়া তাঁহাদিগের অত্যন্ত ক্ষোভ জন্মিতেছে। তাঁহাদিগের ক্ষোভ হওয়া আশ্চর্য্যের নয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, তাঁহারা যে উদ্দেশ্যে এতদ্দেশে অন্তঃপুর শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন তাহা এতদ্দেশীয় লোকেরা বুঝিয়াও বুঝেন না। তাঁহাদিগের পরিবারবর্গকে মিশনরি দলভুক্ত করাই কি তাঁহাদিগের অভিপ্রেত? যদি সে অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে বর্ত্তমানে যে প্রণালী-ক্রমে মিশনারি শিক্ষা অন্তঃপুরে প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে, তাহা হইলে ক্ষতি নাই। কিন্তু হিন্দু অন্তঃপুর কি গারো শৈল? আমরা দেখিতেছি এক্ষণে অধিকাংশ ভদ্র হিন্দুর বাটীতে মিশনারি রমণীগণ গমনাগমন করিয়া থাকেন, অন্তঃপুর শিক্ষাদান ইঁহাদিগের উদ্দেশ্য অথবা হিন্দু পরিবারদিগকে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করা অভিপ্রেত, এ বিচার না করিয়া যাঁহারা অন্তঃপুর শিক্ষার পক্ষপাতী আমরা তাঁহাদিগকে·· খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার যাঁহাদের অভিমত, তাঁহারা হিন্দুসমাজের কেহই নহেন। তাঁহাদিগের অভিমত 'অনুসারে হিন্দু পরিবার মধ্যে এ প্রকার শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইতে দেওয়ার যুক্তি ও ন্যায়সঙ্গত নহে। এইরূপ অন্যায় প্রথার প্রতিপোষক হইয়া কোন কোন হিন্দুপরিবারকে অনুতাপের ভাগী হইতে হইয়াছে, পরেও যে হইবে না তাহারও প্রমাণ নাই। খ্রীষ্টীয় মিশনরিদিগকে অন্তঃপুরে স্থানদান করিলেই বিষময় ফল উৎপন্ন হয়, ইহা আমরা অনেক স্থানে প্রত্যক্ষ করিতেছি। মিশনরিগণ অন্তঃপুরে কি কেবল সাধারণ শিক্ষাই প্রদান করেন? না, বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের ধর্ম্মমূলক গ্রন্থাদি পাঠ করাইয়া থাকেন? কোন হিন্দু কি বাইবল শিক্ষার প্রতিরোধ করেন? তাহা প্রতিরুদ্ধ না হইলে, কোমলমতি রমণীগণ খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত না হইবেন কেন? মিশনরিগণ যদি হিন্দু পরিবারদিগকে খ্রীষ্টধর্ম্মে ভজাইতে না পারেন, তাঁহাদিগের অন্তঃপুর শিক্ষাদানে প্রবৃত্তি জন্মিবে কেন? কোন কোন গৃহস্থ পরিবারে খ্রীষ্টান হইয়া গিয়াছেন, তথাপি হিন্দুদিগের চক্ষু ফুটে না অথচ আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।

আমরা স্ত্রীশিক্ষার প্রতিরোধী নহি। আমাদিগের কুলকন্যাগণ সংসারের মধ্যে বিদ্যাভ্যাস করেন, ইহা সুখের কথা, তাঁহারা বিদ্যাবতী হইয়া আপন আপন সন্তানগণকে সুনিয়মে পালন করিবেন, বিদ্যাশিক্ষার সৎ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবেন, সন্তানেরা সেই দৃষ্টান্তের অনুগামী হইবে, বিদ্যাবতীগণের গুণে দিন দিন হিন্দু সংসার উজ্জ্বল হইবে ইহা সুখের বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু বর্ত্তমান অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা প্রণালীর দ্বারা কি সেই শিক্ষালাভ হইতেছে? এরূপ শিক্ষাপ্রণালীতে কি হিন্দু সমাজ ও হিন্দু ধর্ম্মের বিপরীত-কার্য্য হইতেছে না? শিক্ষা কমিশন অন্তঃপুর শিক্ষাপ্রণালীর উন্নতি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, দুঃখের বিষয় এই যে হিন্দু অন্তঃপুরে মিশনারি শিক্ষার দোষগুণের বিষয় কিছুমাত্র চিন্তা করিয়া দেখেন নাই। মিশনরি শিক্ষাতে যে হিন্দু সমাজের অনিষ্ট হইতেছে, তাহা প্রণিধান করিয়া দেখিলে অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। গণেশসুন্দরী

প্রভৃতির দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা স্পষ্ট সপ্রমাণ হইয়াছে। বঙ্গ মহিলাদিগের শিক্ষার নিমিত্ত যাঁহারা উৎসাহ প্রকাশ করেন, তাঁহারা স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে হিন্দু সমুচিত কোন বিশেষ প্রণালী অবলম্বন করুন, সে প্রণালী মধ্যে মিশনরি গন্ধ থাকিলেই অনিষ্ট ঘটিবে। স্বদেশীয় স্ত্রীলোকদিগেব শিক্ষাদানের ভার বিজাতীয় লোকের হস্তে প্রদান না করিয়া আপনাদিগের সে ভার গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। বিজাতীয় নীতি ও বিজাতীয় সংস্কার স্ত্রীলোকের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইলে মহা অমঙ্গল ঘটিবারই সম্ভাবনা। স্ত্রীলোকের মনের স্বাধীনতা রক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক, কিন্তু তাহাদিগকে বিজাতীয় শিক্ষাদানের বশবর্ত্তী করিয়া দিলে তাহাদিগের মনের সে স্বাধীনভাব থাকা দুর্ঘট হইবে। তাহারা বিজাতীয় ধর্ম্ম ও বিজাতীয় সংস্কারের অধীন হইয়া পড়িবে। হিন্দু-সংসারে এ প্রকার বিকৃত সংঘটন হইতে দেওয়া কোন দেশহিতৈষী ব্যক্তির উচিত নহে। প্রায় ৩০ বৎসর হইল, এইরূপ অন্তঃপুর শিক্ষাপ্রণালী এতদ্দেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কতগুলি কুলবধূ ও কুলকন্যা জাতীয় ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া মিশনরিদলে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তাহা কে গণনা করিয়া দেখিয়াছেন? হিন্দু পরিবারের মধ্যে এরূপ ঘটিবার মূল কারণ, খ্রীষ্ট মিশনরিদিগের অন্তঃপুর শিক্ষাদান। যে ঘটনাসূত্রে অন্তঃপুর শিক্ষার সূত্রপাত হয়, তাহার বৃত্তান্ত নিম্নে বিবৃত হইল, পাঠকবর্গ দেখিবেন যে ইহা কিরূপ শোচনীয়!…

মিশনরিরা হিন্দুদিগকে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার নানা উপায় অবলম্বনের চেষ্টা পাইয়া থাকেন। এদেশে কৃষ্ণ লইয়া কথকতা হয়। মিশনবিরা দিনকতক সেই পথের পথিক হইলেন। শুনিতে পাই মিশনরিরা বৈষ্ণবদিগের ন্যায় খোল করতাল বাজাইয়া থাকেন। এখন একটী নূতন উপায় অবলম্বন করা হইতেছে। খ্রীষ্টান চিকিৎসক দ্বারা হিন্দু পরিবারে চিকিৎসা করাইবার চেষ্টা হইতেছে। তাহাতে অধিক কাজ হইবে, মিশনরিদিগের এই আশা। তাঁহারা এদেশীয়দিগকে স্বধর্ম্মে লইয়া যাইবার আশা করিতেছেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই এদেশীয়দিগের এমন আশা নাই যে আপন পরিবারদিগকে আপন ধর্ম্মে ও আপন সমাজ মধ্যে রক্ষা করেন।

কলিকাতা নর্ম্মাল বিদ্যালয়। ২১ মাঘ ১২৯১। ১২ সংখ্যা

আমরা শুনিয়া যার পর নাই দুঃখিত হইলাম যে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট কলিকাতার নর্ম্মাল বিদ্যালয়টী তুলিয়া দিবার মানস করিয়াছেন। আজ দশ বৎসর হইল একবার এইরূপ একটী প্রস্তাব গবর্ণমেণ্টের সমক্ষে উপস্থিত হয় এবং তখনই এই উপযোগী বিদ্যালয়টী তুলিয়া দেওয়া স্থিরীকৃত হইয়াছিল, কিন্তু নানা কারণে তখন এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই। আমরা আশা করি, এবারেও তাহা কার্য্যে পরিণত করা হইবে না।

কলিকাতা নর্ম্মাল বিদ্যালয়ে শিক্ষিত বহুসংখ্যক পণ্ডিত বর্ত্তমান সময়ে দেশের নানা স্থানে বাঙ্গালা বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন। ইঁহাদের দ্বারা বাঙ্গালা বিদ্যালয় সমূহের ও নিম্নতর শিক্ষাকার্য্যের যে কিরূপ উন্নতি সংসাধিত হইতেছে, তাহা, অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই সবিশেষ অবগত আছেন। এই বিদ্যালয়টী তুলিয়া দিলে বাঙ্গালা বিদ্যালয়সমূহের নিযুক্ত শিক্ষক খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর হইবে। সত্য বটে, কলিকাতা ভিন্ন ঢাকা, হুগলী প্রভৃতি স্থানে আরো দুই চারিটি নর্ম্মাল বিদ্যালয় মফঃস্বলে আছে, কিন্তু কলিকাতার নর্ম্মাল বিদ্যালয়টী এ সমুদায় মফঃস্বলের বিদ্যালযেব আদর্শস্থল। এই আদর্শ হইতে বঞ্চিত হইলে ঐ সকল মফঃস্বলস্থ নর্ম্মাল বিদ্যালয়েরও বিশেষ ক্ষতি হইবে। ইহা নিশ্চিত।

শিখিলেই কি সকলে শিক্ষা দিতে পারেন? এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা স্বয়ং সুশিক্ষিত হইয়া বহু বিদ্যার আধাব হইযাছেন, কিন্তু তাহারা আপন আপন হৃদয়দ্বার খুলিয়া অপরকে হৃদয়ের ভাব বুঝাইতে পাবেন না। অধ্যাপনা কায্য সাধারণে যত সহজ মনে করেন, তত সহজ নহে। এই কায্য সম্পাদনের জন্য বিদ্যালয়ের সৃষ্টি। কলিকাতার নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের মত এমন উৎকৃষ্ট নর্ম্মাল বিদ্যালয় আর এদেশে নাই। এ বিদ্যালয়টী উঠিয়া গেলে নিম্নতব শিক্ষাকায্যের বিশেষ অনিষ্ট হইবে সন্দেহ নাই।

কলিকাতা রাজধানী। এখানে অধ্যয়ন করিয়া যে শিক্ষালাভ হয়, মফঃস্বলস্থ স্কুল ও কালেজে পড়িয়া সে শিক্ষা লাভ কবা দুষ্কর। আমবা জানি কলিকাতার বড় বড় কালেজের ছাত্রগণ সাধারণতঃ শিক্ষাসম্বন্ধে মফঃস্বলস্থ কালেজসমূহে ছাত্রগণ অপেক্ষা অনেক উন্নত। কলিকাতার শিক্ষিত একজন বি. এ. উপাধিধারী যুবক ও কটকের বা ঢাকার বা বহরমপুরের শিক্ষিত একজন বি. এ. উপাধিধারীতে সর্ব্বাংশে সৌসাদৃশ্য হয় না। কলিকাতায় দিন রাত্রি বিদ্যাচর্চ্চার বায়ু বহিতেছে। এই বায়ুতে বাস করিলে ঐ বায়ু শরীরে প্রবিষ্ট হয়। বিশেষ যত্ন বা চেষ্টা না করিযাও অনেকে সহজে উন্নত হইতে পারেন। এঃ জন্যই মফঃস্বলের নানা স্থান হইতে অনেক যুবক নিকটে নর্ম্মাল বিদ্যালয় থাকিতেও বহুব্যয় ও কষ্ট স্বীকার করিয়া কলিকাতাব নর্ম্মাল বিদ্যালযে পড়িতে আসিয়া থাকেন। ইহাব দ্বাবা এদেশে নিম্নতর শিক্ষার যে উন্নতি সাধিত হইতেছে, কলিকাতা নর্ম্মাল বিদ্যালয়টী উঠিয়া গেলে তাহার বিশেষ ব্যাঘাত হইবে।

গবর্ণমেণ্ট কেন যে এ বিদ্যালয়টী তুলিয়া দিতে চাহিতেছেন, আমরা তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। ব্যয় সংক্ষেপই যদি একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে, বিদ্যালয়টী তুলিয়া দিয়া যে লাভ করা হইবে, সাধারণের ক্ষতি তাহার অপেক্ষা বহুগুণে অধিক হইবে। এ ক্ষতি সামান্য বিষয়ক ক্ষতি নয়। নিম্নশ্রেণীর ভালরূপ শিক্ষা না হইলে দেশের বর্ব্বরতা দূর হইবে না। কলিকাতার নর্ম্মাল বিদ্যালয়টী উঠিয়া গেলে সেই বর্ব্বরতা দূর হইবার প্রধান উপায়টী

হস্ত পরিভ্রষ্ট হইয়া যাইবে। অতএব আমাদের ইচ্ছা ও অনুরোধ এই, লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বাহাদুর এই বিষয়গুলি ভালরূপে বিবেচনা করিয়া কর্ত্তব্য অবধারণ করেন।

শিক্ষা বিড়ম্বনা। ১৯ আশ্বিন ১২৯৩। ৪৬ সংখ্যা

সচরাচর শুনিতে পাওয়া যায় "অমুক লোকটা লেখাপড়া শিখিয়া এমন কাযা করিল এই আশ্চর্য্যের বিষয়।" শিক্ষিত ব্যক্তি কোন একটা অন্যায় কার্য্য করিলে সকলেই এই কথা বলিয়া বিস্মিত হইয়া থাকেন। যদি পাঁচ মিনিটকাল আমাদের দেশের শিক্ষা প্রণালীর বিষয় চিন্তা করা যায় তাহা হইলেই বোধ হইবে আমাদের এরূপ বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। বালকেরা বিদ্যালয়ে বর্ণমালা শিক্ষা করিয়া একখানি ক্ষুদ্র সাহিত্যগ্রন্থ পাঠ করে। তারপর একটু ইংরাজী ইতিহাস, একটু ভূগোল। ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে একটু ইংরাজী ব্যাকরণ, জ্যামিতি, অঙ্ক, গ্রীস রোম অথবা ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, এবং সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজ গ্রন্থকর্ত্তাদিগের লিখিত কতকগুলি বিষয় হইতে সামান্য এক একটী খণ্ডসাহিত্য পাঠ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে। সেখানেও এই সকল সামান্য শিক্ষার স্বল্প বিস্তার মাত্র হয়। তারপর একটু বিজ্ঞান, এক আধখানি সংস্কৃত কাব্য, সেক্সপিয়রের একটী নাটকের গর্ভাঙ্ক, মিল্টনের কবিতার দুইচারি ছত্র, বর্কের একটী বক্তৃতা, এবং বেকনের দুই পাঁচটী জ্ঞানের কথা অভ্যাস করিলেই আমাদের উচ্চ শিক্ষা সমাপন হয়, ছাত্র বি. এ. এম. এ. উপাধি প্রাপ্ত হইয়া দেশের ভিতরে একজন শিক্ষিত লোক বলিয়া পরিচিত হন। এইরূপ শিক্ষিত লোকের গুণ কি? ইহারা রঘুবংশ ও শকুন্তলার কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধ লিখিতে পারেন, বর্কের কয়েকটী কথা কণ্ঠস্থ করিয়া রাজনীতিজ্ঞতা প্রকাশ করেন, এবং ইংরাজী সাহিত্যের এক কোণ হইতে এক আধটী পরমাণু খসাইয়া লইয়া মনে করেন আমরা কত বড়ই না লোক হইয়াছি। বাস্তবিক এরূপ শিক্ষায়—গুণের মধ্যে অহঙ্কার ভিন্ন আর কিছুই উৎপন্ন হইতে পারে না। আমরা এরূপ শিক্ষাকে শিক্ষা নামে অভিহিত করিতে পারি না। ইহাকে বরং শিক্ষা বিভ্রাট বলা যায়। যে শিক্ষায় লোকের চরিত্রের গঠন না হয়, যাহাতে মানবের হৃদয়ের নীতি ও ধর্ম্মের বিকাশ না হয় সে ত বৃথাশিক্ষা—কুশিক্ষা। এরূপ ফলে লোকের কখনও কর্ত্তব্য জ্ঞান জন্মাইতে পারে না। সুতরাং মূর্খের পক্ষে যে কুকার্য্য সম্ভব, আধুনিক শিক্ষাভিমানীর পক্ষে তাহা কখনই অসম্ভব হইতে পারে না।

প্রথম—খণ্ডশিক্ষা। কেহ যদি ইচ্ছা করেন আমি সাহিত্য এবং ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করিব বিশ্ববিদ্যালয়ে, তিনি তাহাতে সক্ষম নহেন। কেহ যদি বলেন বিজ্ঞান শিখিব গ্যানো পর্য্যন্ত তাঁহার সীমা, কেহ যদি ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে চান

ইংরাজি দুই চারিখানি ন্যায় পুস্তক শিখিলেই তাঁহার শিক্ষার সমাপ্তি হয়। যদি কেহ ইতিহাস শিখিতে চান কয়েকখানি নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থ তাঁহার শিক্ষাভিলাষকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। আবার কেহ যদি দর্শনশিক্ষার অনুসন্ধান করেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে ডাক্তার ডফ জার্ডিন ও হেষ্টি সাহেবের সহিত কর্ম্মনাশার পারে রাখিয়া আসিবেন।

দ্বিতীয়—বহু বিষয়ের একত্র শিক্ষা। একাধারে বহু বিষয় থাকিতে পারে না। আলোচনার ভার পড়িল তাহা কখনও একটী স্বতন্ত্র বিষয়ের ভার বহন করতে পারে না। যদি দুইটী বিষয়ই উপর্য্যুপরি চাপাইয়া দেওয়া যায়, দুইটীরই কিয়দংশ বিচ্যুত হইয়া পড়িয়া যাইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রণালী অনুসারে ছাত্রের বুদ্ধিবৃত্তির ও স্মৃতিশক্তির উপর অনেকগুলি স্বতন্ত্র ভার পড়ে। সুতরাং সকলগুলিরই শ্রেষ্ঠাংশ বিচ্যুত হইয়া কেবল অবসরাংশ মাত্রই অবশিষ্ট থাকে। এইরূপে সকল বিষয়ের অম্লচাখা অসার জ্ঞান লাভ করিয়া ছাত্র সম্প্রদায় বৃক্ষের বিষ্ঠা হইয়া দাঁড়ায়।

তৃতীয়—উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব! শিক্ষক বেতনভোগী। তিনি গবর্ণমেণ্ট অথবা অধ্যক্ষের নিকট বেতন খান বলিয়া ছাত্রগণকে শিক্ষা দেন। বেতন যদি তাঁহার মনের মত প্রচুর না হইল, যদি তাঁহার বেতন পাইতে বিলম্ব হইল, যদি কোন অবহেলার জন্য তিনি দণ্ডিত হইলেন, তবে তাঁহার ছাত্রগণকে শিক্ষা দিবার প্রবৃত্তি কিঞ্চিৎ কমিয়া আসিল। পুত্রভাবে যাঁহারা ছাত্রগণকে শিক্ষা দিতে না পারেন তাঁহারা শিক্ষকের…। সুতরাং তাঁহার নিকট সুশিক্ষা লাভ করাও দুষ্কর।

জ্ঞান লাভের চতুর্থ অন্তরাল—নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষার অভাব। সাধারণতঃ বিদ্যালয় সমুহে ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষার নামমাত্রও উচ্চারিত হয় না। ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের সংস্থাপিত বিদ্যালয়ে নীতিশিক্ষার কিঞ্চিৎ আড়ম্বর আছে, খ্রীষ্টান মিসনরি বিদ্যালয়েও বাইবল পড়ান হয়, কিন্তু হিন্দুর গৌরব সংস্কৃত কালেজে হিন্দুধর্ম্মের বিশেষ আলোচনা হয় না। কেবল কয়েকখানি ব্যাকরণ, কাব্য, ন্যায় ও স্মৃতি পুস্তক পাঠ করিয়াই সংস্কৃত কালেজের সংস্কৃত বিদ্যার সমাপ্তি হয়। সংস্কৃত শাস্ত্রের সামান্য অধ্যাপনায় সংস্কৃত কালেজে হিন্দুধর্ম্মের যাহা শিক্ষা হয় অন্যান্য বিদ্যালয়ে তাহার গন্ধ পর্য্যন্তও নাই। প্রেসিডেন্সি কালেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ছাত্রেরা প্রায়ই নাস্তিক হইয়া বাহির হন। নীতি ও ধর্ম্মের যেখানে এত অসদ্ভাব, ছাত্র সম্প্রদায় সেখানে কখনই সচ্চরিত্র হইয়া বাহির হইতে পারেন না। হিন্দুরা কেবল অর্থের জন্য বিদ্যা শিক্ষা করিতেন না, প্রকৃত জ্ঞানলাভই তাঁহাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল। সেই জন্য হিন্দুশাস্ত্রের পরতে পরতে ধর্ম্ম ও সুনীতি ওতঃপ্রোতভাবে বর্ত্তমান। হিন্দুর বিজ্ঞানে ধর্ম্ম, চিকিৎসা শাস্ত্রে ধর্ম্ম, দর্শনে ধর্ম্ম, ইতিহাসে ধর্ম্ম, ব্যাকরণে পর্য্যন্তও ধর্ম্ম। আমাদের স্বর্গীয় গুরুদেব একবার আমাদিগকে ব্যাকরণ শিক্ষার সময় "অস্মদ্" শব্দের রূপ করিয়া এইরূপে উহার আধ্যাত্ম্য ব্যাখ্যা করেন। "অস্মদ" শব্দের প্রথমার একবচনে "অহং"—আমি একাকী জগতে আসিলাম। দ্বিবচনে আবাম্—

বিবাহ করিলাম। বহুবচনে বয়ম্—পুত্র কন্যায় পরিবার সম্পন্ন হইলাম। তারপর দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী ও ষষ্ঠিতে আদান প্রদান, সাহায্য ও সম্বন্ধে এক জগৎ সৃষ্টি হইল। গুরুদেব দেখাইয়া দিলেন অহং এই জগৎময়, জগৎ অহংময়। এমন করিয়া সকল শাস্ত্র হইতে ধর্ম্ম সঙ্কলন দ্বারা ছাত্রগণকে আজ কোন্ বিদ্যালয়ের কোন্ শিক্ষক শিক্ষা দিয়া থাকেন? আধুনিক শিক্ষাপ্রণালী হইতে ধর্ম্ম ও সুনীতি এককালে তিরোহিত হইয়াছে। অভিভাবকেরা ছাত্রগণের ধর্ম্মশিক্ষার দিকে দৃষ্টিপাত করেন না। যে কোন উপায়ে দুই অক্ষর ইংরাজি শিখিয়া যদি তাহারা ইংরাজের চাকুরী করিতে পারেন, কেরানিগিরি ওকালতি, মাষ্টারি, ইঞ্জিনিয়ারী, অধিকন্তু হাকিমী করিয়া যদি তাঁহারা দুই দশ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারেন, তবে আর তাঁহারা ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার করিতে চান না। ছাত্রগণও ধর্ম্মশূন্য শিক্ষা পাইয়া সচরাচর কর্ত্তব্যহীন নাস্তিক ও উন্মার্গগামী হইয়া সাধারণের চক্ষে বিস্ময়ের খেলা খেলিতে থাকেন। ধর্ম্মশূন্য যে শিক্ষা তাহা বাজীকরের ভেল্কি শিক্ষা। যাদুকর প্রচ্ছন্ন বিদ্যার আলোচনা করিয়া যেমন লোকের চক্ষে ধূলি দিয়া অর্থোপার্জ্জন করে—শিক্ষিতাভিমানী বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ ছাত্র তেমনি অর্থকরী বিদ্যা শিখিয়া সাধারণের নিকট স্বীয় সাধুশীলতার বিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়া অর্থাগমের উপায় দেখিতে থাকেন। বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় নীতিশূন্য হইয়াছে। ছাত্রের চরিত্র আর সুগঠিত হইতে পায় না। কাজেই লোকে যখন শিক্ষিত যুবককে কর্ত্তব্যকার্য্যের ব্যতিক্রম করিতে দেখে তখনই বিস্মিত হইয়া বলে এ লোকটী না লেখাপড়া শিখিয়াছে? এ লেখাপড়ার মুখে ছাই। ছাত্রগণের নীতি যদি চালনাভাবে ভিত্তিহীন হইল, চরিত্র যদি গঠনাভাবে উচ্ছৃঙ্খল হইল, ধর্ম্ম যদি আলোচনার অভাবে হৃদয়ের আসন পরিত্যাগ করিয়া গেল, তবে ধর্ম্মগতপ্রাণ ভারতমাতা কোন্ আশায় আর তাঁহাদের মুখ চাহিয়া জীবিত থাকিবেন? আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ম্মালোচনার অভাব দেখিয়া বড়ই ব্যথিত হইয়াছি। বিলাতের গবর্ণমেণ্টে ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটী স্বতন্ত্র বিভাগ আছে। ছাত্র ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট এই বিভাগে পুরোহিতের চাকুরী পাইয়া থাকেন। এখানেও ধর্ম্মের জন্য আমরা গবর্ণমেণ্টকে কর দিয়া থাকি। গবর্ণমেণ্ট সেই অর্থ আমাদের ধর্ম্মালোচনায় ব্যয় না করিয়া খ্রীষ্টান যাজকের উদরপূরণ করিয়া থাকেন। প্রধান প্রধান কালেজগুলিতে সেই অর্থে যদি হিন্দুর জন্য হিন্দু ধর্ম্মপ্রচারক, মুসলমানের জন্য ইসলাম ধর্ম্মের অধ্যাপক নিযুক্ত হইত, তবে না আমাদের নিকট কর আদায় সার্থক হইত? গবর্ণমেণ্ট কিন্তু তাহা করিবেন না—হিন্দুর হিন্দুয়ানী মুসলমানের ইসলামি অন্ততঃ ঈশ্বর ও পরকালের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কয়েকটী সাধারণ ধর্ম্মবিশ্বাস, পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃস্নেহ, দয়াদাক্ষিণ্য, সত্যপ্রিয়তা, ন্যায়পরতা, পরোপকার প্রভৃতি মূল ধর্ম্মনীতির কয়েকটী প্রধান সূত্র ছাত্রের হৃদয় হইতে অল্পে অল্পে লুপ্ত হইয়া যাইবে। মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন যতদিন জীবিত

ছিলেন ছাত্রগণের চরিত্রের উপর তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত ছিল। প্রতি শনিবার তিনি কলকাতায় ছাত্র সম্প্রদায়কে নীতি ও সাধারণ উপদেশ দিবার জন্য আলবার্ট কালেজে উপস্থিত হইতেন। একদিকে প্রেসিডেন্সি কালেজের নাস্তিকতা অপরদিকে কেশবচন্দ্র সেনের জলন্ত ধর্ম্মোপদেশে ছাত্রসম্প্রদায় কেশবের জীবদ্দশায় সহসা বিপথে পদার্পণ করিতে সমর্থ হন নাই। সেদিন গিয়াছে। কেশবের সঙ্গে সঙ্গে বালকগণের ধর্ম্ম প্রবৃত্তি অন্তর্হিত হইয়াছে। এখন বিলাতের যুবতী সম্প্রদায় লইয়া যেমন একটা কলরব উঠিয়াছিল, কলিকাতায় যুবক সম্প্রদায় লইয়া অল্পে অল্পে সেইরূপ কলরব উঠিতেছে। এখন হইতে ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা চরিত্র সংগঠনের উপায় যদি না করা হয়, বালকগণের পরিণাম রক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ম্ম ও নীতির আন্দোলন না হয়, বাঙ্গালীর ভবিষ্যসমাজ নিশ্চয়ই অধঃপতিত হইবে।

উপযুক্ত সময়েই মান্দ্রাজের একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত মান্দ্রাজে একটী বৈদিক বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়াছেন। এই বিদ্যালয়ে বেদ, উপনিষদ পুরাণাদির অধ্যাপনা হইয়া থাকে। শাস্ত্র শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রগণের চরিত্র সংগঠিত ও ধর্ম্মমত পরিপুষ্ট হইয়া আসে। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে এইরূপ বৈদিক বিদ্যালয়ের স্থাপনা হইয়াছে। কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের সুনীতি সঞ্চারিণী সভা উত্তরপশ্চিমের স্থানে স্থানে বিশেষ উপকার সাধন করিতেছে। আর্য্যসভার অন্তর্গত অনেকগুলি সংস্কৃত পাঠশালাতেও বৈদিক ধর্ম্ম ও বৈদিক উপদেশ শিক্ষা হইয়া থাকে। অভাব কেবল বঙ্গদেশে। কলিকাতার "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ" ছাত্রগণের স্বভাব সংস্করণকার্য্যে সহায়তা করিতেছেন বটে, কিন্তু আরও ধর্ম্মালোচনার আবশ্যক, আরও সুনীতি বিস্তারের প্রয়োজন। পণ্ডিতমণ্ডলী কি নিস্তেজ হইয়াছেন? বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি ধর্ম্ম শিক্ষার অনুপ্রবেশ না হয়, কলিকাতায় কি এখন বৈদিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে পারে না? আমরা ছাত্র সম্প্রদায়ের কার্য্য-কলাপ দেখিয়া ভীত হইয়াছি। লোকেও দিন দিন তাহাদের স্বভাবচরিত্রে বিস্মিত হইতেছেন। সংস্কারের যদি উপায় না হয় তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের এ উচ্চশিক্ষার বিডম্বনায় আমাদের প্রয়োজন কি?

ইংরাজীশিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়। ১৬ কার্ত্তিক ১২৯৩। ৫০ সংখ্যা

জয় মিত্রের ন্যায় ইংরাজী শিক্ষিত যুবক ধরা পড়িয়াছে। ইংরাজীতে কথা কওয়া, ইংরাজীতে পত্র লেখা, ইংরাজী চাল, ইংরাজী চলন, ইংরাজী পোষাক এই সকল অপরাধের জন্য ইংরাজী শিক্ষিত যুবকগণ আজ নরকস্থ হইতে বসিয়াছেন। এক দল লোকে একেবারে এই যুবক সম্প্রদায়কে হেয় জ্ঞান করিয়া তাহাদের ম্লেচ্ছ সম্প্রদায়ভুক্ত করিবার উদ্যোগ করিয়াছেন। অমুক যুবক চুরট খায় সে জমার বার, অমুক সিঁতাকাটে

সে মনুষ্য নামের অযোগ্য, অমুক বাঙ্গালা কথা বলিতে বলিতে ইংরাজী বলিয়া ফেলে, তাহাকে জাহান্নমে দেওয়া হউক। বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিগণ সে সকল অপরাধ করিবার অনুমতি পাইলে বড়ই আনন্দের সহিত করিতে যান, তাঁহারা যে সকল অপরাধ গোপনে করিয়া প্রীতিলাভ করেন। যুবকগণ প্রকাশ্যভাবে সেই সকল অপরাধে অপরাধী হইয়া ধরা পড়িয়াছেন। আমরা যুবকদিগের এই সকল অপরাধের প্রশ্রয় দিই না। যাহাতে জাতীয়তার সামান্য মাত্রও ত্রুটী হয় আমরা তাহার পক্ষপাতী নহি। কিন্তু এই বিজাতীয় অনুকরণের জন্য যুবকদিগকে যেরূপ হেয়জ্ঞান করিয়া লাঞ্ছনা দেওয়া হয় আমরা তাহার বড় একটা অনুমোদন করিতে পারি না। দেখিতে গেলে যুবকদলের এই সকল অপরাধ অভিভাবকদিগের দোষেই জন্মিয়া থাকে। বালক মাতৃভাষায় বর্ণমালা সমাপ্তি করিবার পূর্ব্বে অভিভাবক তাহাকে ইংরাজী বিদ্যালয়ে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। সেখানে ইংরাজী ভাষার আলোচনা, ইংরাজী শাস্ত্রের জ্ঞান, ইংরাজী ইতিহাসের কথাবার্ত্তা। বালক যখন যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া সন্ধ্যাআহ্নিক আরম্ভ করিতে যাইবে, তখন মিসনরি বিদ্যালয়ে তাহাকে যিশুখৃষ্টের দশটি আজ্ঞা কণ্ঠস্থ করিতে হইতেছে। যখন সে ভাগবতের একটী শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনে নাই তখন তাহাকে মথী লিখিত সুসমাচারের পরীক্ষা দিতে হইতেছে। ইংরাজী সাহিত্য, ইংরাজী ইতিহাস, ইংরাজী দর্শন শিখিবার জন্য ক্রমে তাঁহাদের ইংরাজের নিকট যাইতে হইতেছে। এইরূপে কথা ফুটিতে আরম্ভ করিলেই বালক একেবারে পরের ভাষা, পরের আচারব্যবহার, পরের ধর্ম্ম লইয়া আলোচনা করিয়া থাকে। সুতরাং পরের অনুকরণ করিতে যত বালকের অনুকরণের আদর্শ এমন আর কেহই নহে। সুকুমার বয়স হইতে শিশু যাহার আলোচনা করে অলক্ষিত ভাবে তাহার রুচি অভ্যাস ও প্রবৃত্তির উপর তাহাই প্রবলবেগে কার্য্য করিতে থাকে। ক্রমেই বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে বিজাতীয় প্রবৃত্তি ও ভাব সমূহ পরিপুষ্ট হয়। অভিভাবক প্রথম হইতেই বালককে অর্থকরী বিদ্যা শিখাইতে গিয়া কয়েক বৎসর পরেই দেখেন বালক অর্থকরী বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি বিজাতীয় চালচলন অভ্যাস করিয়াছে। ভিন্ন দেশীয় রুচি প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়াছে। যদি বাল্যকালে জাতীয় শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইয়া পরে ইংরাজী শিখিতে দেওয়া হয় তবে কাহাকেও এ সকল বিলাতি চালচলনের বড় একটা অনুকরণ করিতে দেখা যায় না। অর্থের লোভে দুগ্ধপোষ্য শিশুদিগকে ইংরাজী শিখিতে দিয়াই এই অনর্থের উৎপত্তি হইয়াছে।

অভিভাবকের দোষেই বালকের দোষ তজ্জন্য তাহাকে সর্ব্বদা অঙ্গুলির অগ্রে রাখা কর্ত্তব্য নহে। এই যুবকদিগের উপর আমাদের ভবিষ্যসমাজ নির্ভর করে। ইংরাজী চালচলনের জন্য ইহাদের উপর একবারে চটিয়া গেলে কায চলিবে না মঙ্গলও হইবে না। অষ্টপ্রহর টিটকারী দিয়া ইহাদিগকে উত্যক্ত করিলে ইহারা কখনই বিজাতীয়তা পরিত্যাগ করিয়া জাতীয়তা রক্ষার জন্য যত্নবান হইবে না, বরং যাহারা শিক্ষিত ও

বুদ্ধিমান উত্যক্ত হইলে তাহারা স্বমত সমর্থনের জন্য চেষ্টা করিবে, স্বজাতি ও সমাজের উপর দ্বেষ্টা হইবে, ভবিষ্য সমাজের আশা একেবারেই চুলাব দ্বারে চলিয়া যাইবে। ইহাদের সহিত বয়োবৃদ্ধগণের এখন সম্ভাব রক্ষা কবা কর্ত্তব্য হইয়াছে। বৃদ্ধ যদি একদিকে টানিয়া ধরেন, আর যুবক যদি বিপরীত দিকে বল প্রয়োগ করেন, উভয় সম্প্রদায়ের সম্ভাব বন্ধনী ছিঁড়িয়া যাইবে। যুবক বৃদ্ধের উপদেশে বঞ্চিত হইবেন, বৃদ্ধও ভবিষ্য সমাজের মাথা খাইয়া চলিয়া যাইবেন। এখন দুই পক্ষকেই কিছু নবম হইতে হইবে। বন্ধুভাবে মিষ্ট কথায় সদুপদেশ দিয়া যুবককে সমাজেব দিকে আকর্ষণ করিতে হইবে। যুবকদিগকেও বিজাতিপ্রিয়তা ত্যাগ করিয়া বৃদ্ধকে উপযুক্ত সম্মান দিতে হইবে। যে সকল অভিভাবক ইংবাজী শিক্ষিত যুবকের উপর খড়্গহস্ত, তাঁহাদেব বিবেচনা করা উচিত যে তাঁহারাই যুবকদিগের অপরাধেব মূল। যদি তাঁহাবা অর্থের লোভ পরিত্যাগ করিয়া বালককে প্রথম হইতে আর্য্যশাস্ত্র ও আর্য্যধর্ম্মের শিক্ষা দিতে পারিতেন, তাহা হইলে যুবক ও বৃদ্ধের ভিতর আজ এতদূব রুচিগত প্রভেদ দৃষ্ট হইত না। "নাও ছাড়িয়া এখন আব হালে পানি পায় ন।" এখন স্রোতের বেগে নৌকা ছাড়িয়া নিশ্চিন্ত থাকা ভিন্ন সমাজ রক্ষার আব উপায় কি?

কাল বড ভয়ানক বস্তু। পবিবর্ত্তন আবার কালের স্বধর্ম্ম। পরিবর্ত্তন কেবল যে আজ দুই দশ বৎসর হইতেছে তাহা নহে। যাহারা মহাভাবত ও পুরাণাদি দেখিযা হিন্দু রাজ্যের পূর্ব্বাপর ইতিহাসেব বিষয় চিন্তা কবিয়াছেন তাঁহাবা বুঝিতে পাবিযাছেন পূর্ব্বকাল হইতেই হিন্দু সমাজের উপর্য্যুপরি পরিবর্ত্তন হইযা আসিতেছে। এখন পরিবর্ত্তনেব সময যেমন কালেব প্রভাব দেখা যায, তখনও সেইরূপ দেখা গিযাছিল। তখন যেরূপ প্রতিরোধ-চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল এখনও তাহাই হইবার সম্ভাবনা। জাতীযপ্রথা ও রীতিনীতি এবং জাতীয় সমাজের আমূল সংস্কার আমূল পরিবর্ত্তন বলিযা যে একটা রব উঠিয়াছে আমবা কোন ক্রমেই তাহাতে সম্মত হইতে পারি না। তাই আমবা সমাজের বযোবৃদ্ধ অধিনায়কগণকে অনুবোধ কবি তাহাবা কষাকষিটা কিঞ্চিৎ কমাইযা দিন, যুবকেরাও তাঁহাদেব উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তিব কিঞ্চিৎ দমন করন। নচেৎ সমাজের মঙ্গল নাই।

সোমপ্রকাশ

বিবিধ

রচনা-সংকলন

পদ্য। ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৭৩

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

মধুসম মধুমাসে মোহন বাঁশরী।
বাজান নিকুঞ্জবনে রাধাকান্ত হরি॥
শুনি গোপ গোপীগণ আনন্দে বিহ্বল।
চকিত স্থগিত নেত্রে হেরে বনস্থল॥
তেমতি বংশীর নাদে শ্রীমধুসূদন।
প্রেমানন্দে ভাসাইলা গৌড়জন মন॥
বীরাঙ্গনা, ব্রজাঙ্গনা, তিলোত্তমা মুখে।
তান লয় সঙ্গীতের ধ্বনি শুনি সুখে॥
পুন মেঘনাদ মুখে রণ ভেরি শুনি।
সদর্পেতে বীর হিয়া জাগিল অমনি॥
নবরস প্রপুরিত তোমার সঙ্গীত।
কাব্যপ্রিয় বাঙ্গালিব যাহে স্বপ্নে প্রীত॥
কাব্যের কাননদিকে পুন কর্ণ ধায়।
শুনিতে নূতন স্বর তোমার গাথায়॥

কপালকুণ্ডলা

ক তুমি যোগিনীবেশে বঙ্কিম নয়নে।
ত্রাণকর্ত্রী ভবানীরে ভাবিতেছ মনে॥
যুবতী হইয়া কর ভৈরবী সাধন।
সংসারেতে প্রীতি নাই সদা ক্ষুণ্ণ মন॥
পঙ্কজ বদনী বামা মুক্ত চারুকেশ।
পর্ব্বত দুহিতা যেন ভাবেন মহেশ॥
প্রশস্ত ললাটদেশ সরল হৃদয়।
পেয়েছ যবন হস্তে ক্লেশ অতিশয়॥
পরে দ্বিজ কাপালিক বিজন কাননে।
পালিত তোমারে সতী অতি সযতনে॥

কপালকুণ্ডলা তুমি চিনেছি এখন।
ভুলিবে না তব নাম যত গৌড়জন॥
অক্ষিযুগে অশ্রুবিন্দু পড়ে ঘন ঘন।
স্মরিলে তোমার খেদ পূর্ণ বিবরণ॥

বহরমপুর

ডাক্তার বেলি ও মোএট। ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৭

দুইজন উপযুক্ত লোক ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতেছেন। দুইজনেই চিকিৎসক, দুইজনই স্ব স্ব কার্য্যে বিলক্ষণ প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছেন। প্রথম ডাক্তার হারবার্ট বেলি, দ্বিতীয় মোএট। ডাক্তার বেলির নাম না জানেন বঙ্গদেশে এমত লোক বোধ হয় নাই। তিনি দরিদ্রদিগের পিতৃস্থানীয়। যিনি প্রাতঃকালে চাঁদনীর চিকিৎসালয়ে গমন করিয়াছেন, তিনি দেখিয়াছেন শত শত রোগী ডাক্তার বেলিকে বেষ্টন করিয়া আছেন এবং বেলি সমভাবে সকলকেই আহ্লাদসহকারে দর্শন করিতেছেন। সকলেরই সহিত হাস্য, সকলকেই মিষ্ট কথা বলা হইতেছে। চিকিৎসকের কথায় রোগীর বোধ হয় যেন অর্দ্ধেক কষ্টের নিবারণ হইল। ডাক্তার আবরণেথি এই নিয়ম প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, যে স্থানে রোগ জন্মিবে তাহার চিকিৎসা মাত্র না করিয়া যাহাতে সমুদায় শরীরের স্বাস্থ্যলাভ হয়, সেই প্রকার চিকিৎসা করা আবশ্যক। ডাক্তার বেলি সেই নিয়মানুসারে চিকিৎসা করেন। এই নিমিত্ত যে সকল রোগের শান্তি হয় না বলিয়া অনেকের কুসংস্কার আছে, তাহারও তাঁহার হস্তে শান্তি হয়। ছেদনভেদনাদি কার্য্যে এতদ্দেশীয়দিগের স্বভাবতঃ ভয় আছে, কিন্তু বেলি সাহেব অস্ত্র করিবেন এটি জানিতে পারিলে অতি ভীরু স্বভাব লোকেও হস্ত পদাদি বাড়াইয়া দেন। তাঁহার ভ্রম নাই, লোক মাত্রেরই এই সংস্কার। বেলি সাহেবের সর্ব্বপ্রধান গুণ এই তিনি এতদ্দেশীয়দিগকে অন্তরের সহিত ভালবাসেন। এতদ্দেশীয় রোগীকে উপেক্ষা করিয়া তিনি কখন ইউরোপীয় রোগীকে দর্শন করেন না। ইহাতে অনেকে বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। তথাপি তিনি স্বাবম্বিত কার্য্য প্রণালীর পরিবর্ত্তন করেন নাই। দরিদ্রের বন্ধু এ প্রকার নাই। ফি দিতে উদ্যত, কিন্তু যদি তিনি দেখিলেন যে রোগী দরিদ্র, তাহার নিকটে কখন টাকা লন না। বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও পাদরিদিগের নিকটে তিনি নিয়মিত ফী গ্রহণ করেন না। তিনি বলেন ইহাঁরা অল্প বেতনভোগী, ইহাঁদিগের নিকটে কিছু গ্রহণ করা নিষ্ঠুরতা। এক ব্যক্তির বাটীতে চিকিৎসা করিতে যাওয়া হইল, পল্লীশুদ্ধ দরিদ্র উপস্থিত হইল। তিনি তাহাদিগকে না দেখিয়া তথা হইতে গমন করেন না। এ প্রকার ব্যক্তির এদেশ ত্যাগ দুর্ভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নাই।

ডাক্তার মোএটের সহিত আমাদিগের জেল সম্বন্ধে মতভেদ আছে বটে, কিন্তু আমরা

মুক্তকণ্ঠে আবার স্বীকার করিতেছি তিনি এদেশের জেলের যে উন্নতিসাধন করিয়াছেন একজন লোক হইতে এত অল্পকালে এরূপ হওয়া সম্ভাবিত নহে। কেবল এইমাত্র নয়, আর এক বিষয়ে সমুদায় বঙ্গদেশ তাঁহার নিকটে ঋণী হইযা আছেন। তিনি শিক্ষাকার্য্যের যে উন্নতিসাধন করিযাছেন তাহা আর কাহারও নিকটে হইতে পারে না। ডাক্তার মোএট যখন এডুকেশন কৌন্সিলের সেক্রেটারী ছিলেন, তখন শিক্ষাবিভাগের শ্রীবৃদ্ধির পরাকাষ্ঠা হয়। তখন যে সকল ছাত্র বহির্গত হন, এক্ষণে আমরা সে প্রকার ছাত্র দেখিতে পাই না। বোধহয তিনি যদি বরাবর শিক্ষা বিভাগে থাকিতেন, তাহা হইলে আমাদিগের বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান ছাত্রগণ কেম্ব্রিজ ও অক্সফোর্ডের ছাত্রদিগের অপেক্ষা কোন বিষয়ে নিকৃষ্ট হইতেন না। সে সময়ে ডাক্তার মোএট যাহা করিযাছেন, চিরকাল আমাদিগের তাহা স্মরণ থাকিবে।

এক্ষণকার প্রশ্ন এই, ডাক্তর বেলি ও মোএট আমাদিগের উপকার করিয়া বৃদ্ধ হইযা এদেশ ত্যাগ করিতে চলিলেন। আমাদিগের কি কর্ত্তব্য এই মহাশয় ব্যক্তিদিগের স্মরণার্থ চিহ্ন করা অতিশয় আবশ্যক। ডাক্তার বেলি দরিদ্রের বন্ধু স্বর্ণময়ী প্রতিমূর্ত্তি তাঁহার যথেষ্ট পুরস্কার নহে। ডাক্তার মোএট আমাদিগের মনোবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন। আমরা প্রস্তাব করিতেছি এক সভা করিয়া উভয় চিকিৎসককে অভিনন্দন প্রদান ও তাঁহাদিগের অন্ততঃ এক এক প্রস্তরময়ী অর্দ্ধপ্রতিমূর্ত্তি করিযা ভারতবর্ষীয় সভাগৃহে অথবা অন্য কোন প্রকাশ্য স্থানে রাখা কর্ত্তব্য। ডাক্তার বেলির চিকিৎসিত দরিদ্র রোগীরা যদি একআনা করিযা প্রদান করেন, তাহা হইলে অনায়াসে ২৫,০০০৲ টাকা উঠিতে পারে। ডাক্তার মোএটের অনেক ছাত্র দেশের মধ্যে প্রধান প্রধান পদস্থ হইয়াছেন। তাঁহারা সাহায্য দানে আনন্দ অনুভব করিবেন সন্দেহ নাই।

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞানসভা। ১৪ চৈত্র ১২৭৭

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞানসভার প্রতি ক্রমশঃ লোকের যত্ন দেখা যাইতেছে। এটা যারপর নাই আনন্দের বিষয়। সেদিন পাতিয়ালার রাজা এই সভায় ৫০০০ টাকা দান করিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে এরূপ দানের সম্বাদ আমাদের শ্রুতিগোচর হইতেছে। এক্ষণে আমরা সর্ব্বসাধারণ এবং অন্য অন্য এতদ্দেশীয় রাজা, সর্দ্দার ও জমিদারদিগকে সাহায্যদান করিতে অনুরোধ করিতেছি। ডাক্তার সরকার যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন, এক সহস্র বৎসরের মধ্যে কোন ভারতবর্ষীয় তাহা করেন নাই। কেবল বিজ্ঞানের অনুশীলনার্থ এককালে শরীর ও মনকে উৎসর্গ করেন, এরূপ লোক এদেশে প্রায় দেখা যায় না। মহেন্দ্রবাবু যদি অন্যান্য এতদ্দেশীয় চিকিৎসকের দৃষ্টান্তের অনুগামী হইতেন, তাঁহার যেরূপ প্রতিপত্তি তিনি অল্পকাল মধ্যেই বিপুল ধনোপার্জ্জন করিতে পারিতেন।

কিন্তু তিনি এক বিজ্ঞানের নিমিত্ত সমুদায় পরিত্যাগ করিয়াছেন। এই সভাদ্বারা সমুদায় ভারতবর্ষের উপকার সাধিত হইবে, আমরা বোম্বাই, মান্দ্রাজ উত্তরাঞ্চল প্রভৃতি স্থানের লোকদিগকেও সাহায্য করিতে অনুরোধ করিতেছি। এ বিষয়ে রাণী স্বর্ণময়ী ও বর্দ্ধমানের রাজার মৌনাবলম্বন বিধেয় হইতেছে না।...

আমরা এস্থলে একটি প্রস্তাব করিতেছি। স্থানে স্থানে যে সকল বিজ্ঞানবিৎ আছেন, তাঁহারা এই বেলা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সভার সভ্য হইয়া বিজ্ঞানের উন্নতি সাধনে কৃতসঙ্কল্প হউন। আমরা ডাক্তার ভাউদাজি, অধ্যাপক রামচন্দ্র, অন্নদাচরণ খাস্তগিরি প্রভৃতি ব্যক্তিদিগকে এ বিষয়ে যত্নবান হইতে অনুরোধ করিতেছি।

অসমিয়া ও বাঙ্গালা ভাষা। ১৬ কার্ত্তিক ১২৭৯। ৪৮ সংখ্যা

মহাশয়! আসামপ্রদেশীয় ভাষা বাঙ্গালা কি না, ইহা লইয়া কিছু দিন যাবৎ আন্দোলন চলিতেছে। এডুকেশন গেজেট আসামের ভাষাকে পৃথক ভাষা বলার এই কারণগুলি দেখাইয়াছেন যথা (১ম) আসামীয় ভাষার সর্ব্বনাম ও বিভক্তি পৃথক। (২য়) আসামীয় ভদ্রলোকেরা বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি পুস্তকের অর্থ বুঝেন না। (৩য়) এদেশের মুদি দোকানদারেরা বাঙ্গালা রামায়ণ ও মহাভারত পড়ে না। (৪) আসামের ইতর লোকের মুখে গোবিন্দ অধিকারী প্রভৃতির গান শুনা যায় না ইত্যাদি।

এক্ষণে বিবেচনা করা যাউক, এই কারণগুলি যথার্থ কি না। ১ম আসামীয় ভাষার সর্ব্বনাম ও বিভক্তি পৃথক নয়। শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র বড়ুয়া আসামীয় ভাষার এক ব্যাকরণ প্রস্তুত করিয়াছেন। তাহাতে সর্ব্বনাম বিষয়ে এইরূপ লিখিত আছে "সেই সর্ব্ব নামই দুই প্রকার, সংখ্যা বাচক আর ব্যক্তি বাচক। সংখ্যা বাচক যথা—এক, দুই, তিন, তদ্ধিত প্রত্যয়ান্তর প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতি। ব্যক্তি বাচক যথা—যুষ্মদ, অস্মদ তদ্‌যদ্ এতদ্ কিম, আপন। পাঠকগণ! এই কি পৃথক সর্ব্বনাম? ইহা দেখিয়া কি আপনারা আসামের ভাষাকে পৃথক বলিবেন? হেম বাবু আসামের ভাষাকে পৃথক রাখার একজন প্রধান উদ্যোগী। যদি পৃথক সর্ব্বনাম থাকিত তিনি অবশ্যই তাহার উল্লেখ করিতেন। ফলতঃ আসামী ভাষায় পৃথক সর্ব্বনাম নাই। বিভক্তির পার্থক্য দেখাইবার জন্য উক্ত গেজেটে বাঙ্গালায় "কোথা হইতে" আসামে "কোর পরা" এই উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। এইরূপ প্রভেদ আছে সত্য; কিন্তু চলিত ভাষার বিভক্তির এইরূপ প্রভেদে ভাষা পৃথক হয় না। এক বাঙ্গলায় প্রদেশ ভেদে বিভক্তির এই প্রকার যথেষ্ট বিভিন্নতা লক্ষিত হয়, অথচ ঐ সকল প্রদেশের ভাষা এক। সেই প্রভেদগুলি এই যথা—"কোথা হইতে" "কোত্থেকে" "কোন্‌খান থান" ":কৈত্থনে" "কৈথইজা" "কৈগণে" ইত্যাদি। এই সমুদায় এক পঞ্চমার্থে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু বিক্রমপুর প্রভৃতি পুর্ব্বাঞ্চলের ভাষাকে সকলেই

বাঙ্গালা বলেন। যদি কোথা হইতে, আর কোন্‌খান থনে, কৈজনে প্রভৃতি বৈলক্ষণ্য ভাষা এক থাকিল তবে কোথা হইতে, আর কোরপবা, এই প্রভেদের জন্য ভাষা পৃথক বলিতে হইবে কেন পাঠকগণই বিবেচনা করুন।

২য়। আসামের ভদ্রলোকেরাও বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি পুস্তক বুঝেন না, গেজেটের এই কথাতে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না। প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধে আর কিছু প্রমাণ হইতে পারে না।। যখন আমরা সচবাচর দেখিতেছি আসামীয় ভ্রাতারা গদ্য পদ্য উভয়বিধ বাঙ্গালা পুস্তক যথেষ্ট পরিমাণে পাঠ করিতেছেন, সোমপ্রকাশ, এডুকেশন গেজেট প্রভৃতি বাঙ্গালা পত্রিকা লইতেছেন এবং আমাদের সহিত বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষাতে কথা-বার্ত্তা কহেন অথচ ইহাদের অধিকাংশ স্কুল কালেজের ছাত্র নন, তখন ইঁহারা বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি পুস্তক বুঝেন না এ কথা ন্যায্য বলিয়া আমরা কিরূপে স্বীকার করিব? এডুকেশন গেজেটের একজন আসামীয় পত্রপ্রেরক যিনি আসামীয় ও বাঙ্গালা ভাষার পৃথক করার জন্য অনেক লিখিয়াছেন, তিনিও স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারা বাঙ্গালা বুঝেন। ফলতঃ আসামের ভদ্রলোকেরাও বাঙ্গলা বুঝেন না এ কথা অনুসন্ধান না করিয়াই লেখা হইয়াছে।

৩য়। উক্ত গেজেট বলেন, আসামের মুদি দোকানদারেরা বাঙ্গালা মহাভারত ও রামায়ণ পড়ে না। আসামের মুদি দোকানদার বলিলে এ স্থলে আসামের অধিবাসী ও মুদি দোকানদারই বুঝিতে হইবে। কিন্তু তাহাদেব সংখ্যা এত অল্প যে গোয়ালপাড়া ও গৌহাটী ভিন্ন অন্যান্য জেলায় প্রায় নাই বলিলেই হয়। মাড়য়ারদেশীয় ও পূর্ব্ব বাঙ্গালার লোক এদেশের মুদি দোকানদার। তাহারা বাঙ্গালা পুস্তক পড়ুক আর না পড়ুক তদ্দ্বারা এদেশের ভাষার বিসয়ে সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। সুতরাং আসামের মুদি দোকানদারেরা রামায়ণ মহাভারত পড়ে না বলিয়া এদেশের ভাষা পৃথক বলায় এদেশের অবস্থা বিষয়ে অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করা হইয়াছে মাত্র। সে যাহা হউক, এদেশে বাঙ্গালা রামায়ণ মহাভারত দুর্লভ নয়। গ্রামে গ্রামে যে যে নামঘর আছে, তাহার প্রায় সমুদায়েতেই ঐ সকল পুস্তক অতি যত্নে রক্ষিত ও পঠিত হয়। তদ্ভিন্ন গ্রামিক লোকদিগের ঘরেও ঐ সকল পুস্তক সচরাচর পাওয়া যায়।

৪র্থ। এদেশের সাধারণ লোকের মুখে গোবিন্দ অধিকারী প্রভৃতির গান শুনা যায় না এ কথা যথার্থ, কিন্তু পৃথক ভাষা বলিয়া তাহা শুনা যায় না এ কথা যথার্থ নয়। পুর্ব্বোক্ত গায়কদিগের নিবাসস্থল হইতে আসাম বহু দূর এবং যাতায়াতের পথও অতি দুর্গম। এ জন্য বাঙ্গালী যাত্রাওয়ালা প্রভৃতি এদেশে প্রায় আসে না; সুতরাং এদেশীয়েরা যাত্রা কীর্ত্তন প্রভৃতি শুনিতেও পায় না এবং গায়ও না। সম্প্রতি নিম্ন আসামেব লোকেরা যাত্রার দল বাঁধিয়া স্থানে স্থানে যাইয়া গান করিতেছে। এক্ষণ কাহারও কাহারও মুখে স্বপ্ন বিলাস আদি গান শুনিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ এডুকেশন

গেজেটে যে যে কারণে আসামের ভাষা পৃথক বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে তাহার সকলই অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে।

কেহ কেহ বলেন আসামীয়েরা বিশুদ্ধ বাঙ্গালা চাহে না, গবর্ণমেণ্ট বলপূর্ব্বক এদেশে বাঙ্গালা চালাইতেছেন, একথাও অমূলক। উপরে যে আসামীয় যাত্রাওয়ালাদিগের বিষয় লিখিত হইয়াছে যদিও তাহাদের প্রশংসার যোগ্য কোন গুণ নাই তথাপি এদেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায় (বোধ হয় তাহাদের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ) যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়াও তাহা শুনিয়া থাকেন, আর এদেশের লোকেরা ধর্ম্ম বুদ্ধিতে রাস কৃষ্ণাদির লীলার অভিনয় করিয়া থাকে। পূর্ব্বে উহা প্রদেশীয় চলিত ভাষায় সম্পন্ন হইত। এক্ষণ স্থানে স্থানে বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে যে গবর্ণমেণ্টের সংস্রব মাত্র নাই বলা বাহুল্য। যদি বাঙ্গালার প্রতি ইহাদের অনুরাগ না থাকিত কখনও ইহারা এ প্রকার পরিবর্ত্ত করিত না।

সত্য বটে এদেশের স্কুলে ও আফিসে প্রদেশীয় ভাষা প্রচলিত করার জন্য কতকগুলি লোক লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের নিকট আবেদন করিয়াছেন, কিন্তু অনেকেই অনুমান করেন, উহা তাঁহাদের নিজ, বুদ্ধিতে হয় নাই। মিশনরি সাহেবদিগের উদ্যোগই উহার এক মাত্র মূল। শুনা গিয়াছে মিশনরি সাহেবেরা এদেশ হইতে বাঙ্গালা ভাষাকে দূর করার জন্য পূর্ব্বেও একবার চেষ্টা করিয়াছিল। তৎকালের প্রজাহিতৈষী কমিসনর জেনেরল জেঙ্কিন্‌স্ ও বহু ভাষাজ্ঞ স্কুল ইনস্পেক্টর রবিন্‌সন মহোদয় তাঁহাদের সে মনোরথ সিদ্ধ হইতে দেন নাই। সংপ্রতি কতকগুলি এদেশীয় ভক্তকে সহায় করিয়া পুনর্ব্বার যত্ন করিতেছেন। তাঁহারা হিতৈষণার বশবর্ত্তী হইয়াই এ প্রকার চেষ্টা করিয়া থাকিবেন। কিন্তু তাঁহাদের সে হিতৈষণা ভ্রমমূলক। কারণ এদেশের ভাষা বাঙ্গালা ভিন্ন নয় বলিয়া যাঁহাদের মত, তাঁহারা কেহই বিজ্ঞতা ও হিত কামনায় ইহাদের অপেক্ষা ন্যূনকল্প নহেন। পূর্ব্বোক্ত কমিশনর জেনেরল জেঙ্কিন্‌স্ ইনস্পেক্টর রবিনসন সাহেব এদেশের হিতানুষ্ঠান করিতে করিতে স্ব স্ব জীবন পর্য্যবসিত করেন। সিবিলিয়ান স্কুল ইন্‌স্পেক্টর মৃত মরে সাহেব এদেশের পরম বন্ধু ছিলেন। যদিও তিনি এদেশে আসিয়া অধিক দিন জীবিত থাকিতে পারেন নাই তথাপি ঐ অল্প সময়ের মধ্যে এত হিতকর কার্য্য করিয়া গিয়াছেন যে অনেকে বহুকালেও তাহা পারেন কি না সন্দেহ স্থল। গৌহাটীর হাইস্কুল, গোয়ালপাড়া তেজপুর, নওগাঁ ও ডিব্রুগডের জেলা স্কুল এবং তিনটা নর্ম্ম্যাল স্কুল তাঁহার পরিশ্রম ও হিতৈষণার আতিশয্যপক্ষে সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। তাঁহার চেষ্টাতেই ঐ সকল প্রতিষ্ঠিত হয়। তদ্ভিন্ন বাঙ্গালা স্কুল আর পাঠশালারও অনেক উন্নতিবিধান করেন। তিনি যে বাঙ্গালা ভাষায় সুব্যুৎপন্ন ছিলেন তাহা অনেকেই বিদিত আছেন। তাঁহার মত ছিল এদেশে বাঙ্গালাই প্রচলিত থাকে। পাঁচ টাকা বেতনের পাঠশালার শিক্ষকেরাও বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় কথাবার্তা করিতে না পারিলে তিনি

তাহাদিগকে পদস্থ রাখিতে সম্মত ছিলেন না। তৎপরবর্ত্তী স্কুলইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত জি. ই. পোটর সাহেবেরও মত ছিল এদেশের ভাষা বাঙ্গালা। মিসনারি সাহেবেরা যে বাঙ্গালা শব্দগুলির অন্যায় রূপান্তর করিতেছেন তিনি তাহার প্রতিবাদ করেন। বর্ত্তমান কমিসনর কর্ণেল হপকিন্স সাহেব অনেকানেক ডেপুটী কমিসনর এবং অত্রত্য অন্যান্য সাহেবদিগেরও অনেকের মত এদেশে বাঙ্গালা ভাষাই প্রচলিত থাকে।·· কএক জন স্বার্থপর ও অল্পজ্ঞ লোকের কথার উপর নির্ভর করিয়া গবর্ণমেণ্ট যে এদেশেব ভাষাকে বিকৃত করিয়া ফেলিবেন তাহা আমরা বিশ্বাস করি না, সুতবাং অধিক লেখা বাহুল্য।

সেপ্টেম্বর }
নওগা আসাম }

অনুগত
একজন আসামস্থ বাঙ্গালী

বাঙ্গালা সাহিত্যের অপকর্ষের কারণ কি? ২১ মাঘ ১২৮০। ১২ সংখ্যা

কোন দেশীয় সাহিত্য যেমন সেই দেশের লোকের রুচি ও প্রবৃত্তি গঠিত করিবাব উপায় এমন আর অল্প উপায় আছে। জননীর স্তনদুগ্ধ পরিত্যাগ করিতে করিতে বালক বালিকাদিগের হস্তে বিবিধ প্রকার পাঠ্য পুস্তক অর্পণ করা হয়। অন্নপান গ্রহণ করিয়া শিশুর শরীর যেমন দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তাহাব হৃদয় মনও সেই সকল পুস্তক হইতে নীতি ও ভাব গ্রহণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপে গঠিত হইতে থাকে। সেই কথাটি স্মরণ করিলে দেশেব ধর্ম্মনীতি ও রুচির সহিত যে সাহিত্যের কি সম্বন্ধ তাহা কতক হৃদয়ঙ্গম করা যায় এবং সেই সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনের জন্য যে কতদূর সচেষ্ট হওয়া উচিত তাহাও কতক অনুভব করা যায়। সুবিখ্যাত এমাবসন এক স্থানে বলিয়াছেন "কোন জাতি যে প্রকার লেখকদিগকে অধিক প্রশংসা করে তাহা দেখিলে তাহার ধর্ম্মনীতির অবস্থা স্পষ্টরূপে জানা যায়।"—বাস্তবিক ইহা অতি সত্য কথা। যেমন লোকের রুচি অনুসারে থাকে সেইরূপ ক্ষমতাশালী গ্রন্থকারদিগের রুচিব অনুসারে আবার দেশের লোকেব রুচি গঠিত হইয়া থাকে। যাঁহারা আপনাদের চিন্তাশক্তির দ্বারা দেশীয় লোকদিগের চিন্তাশক্তির উন্মেষ করিতে পারেন, আপনাদের সদ্ভাব দ্বারা অপরের সদ্ভাবের উদ্দীপন করিতে পারেন এবং আপনাদের সুরুচি প্রদর্শন করিয়া স্বজাতির রুচি ফিরাইতে পারেন, তাঁহারা যে দেশেব একটী প্রকৃত এবং মহদুপকার সাধন করেন, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ইংলণ্ড ফ্রান্স জর্ম্মণি প্রভৃতির চিন্তাশক্তিব যে এত উন্নতি হইয়াছে, সভ্যতা ও সুরুচির এত শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে তাহার মূলে আমরা কি দেখিতে পাই? সেই সকল স্থানের গ্রন্থকারদিগের চেষ্টা ও অধ্যবসায় কি তাহার প্রধান কারণ নয়? লর্ড বেকন, সার আইজাক নিউটন, বেন্থাম ও জন ষ্টুয়ার্ট মিল প্রভৃতি এক একজন গ্রন্থকারের গ্রন্থ ইংলণ্ডের চিন্তা ভাব রুচি বিষয়ে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে

বলিলে হয়। এক বাইবল গ্রন্থ ইংলণ্ডে কত পরিবারের ধর্ম্মনীতি পরিষ্কার করিয়াছে, কত ব্যক্তির স্বার্থপরতা অহঙ্কার প্রভৃতি চূর্ণ করিয়াছে, কত লোকের মনে সাধুভাব উদ্দীপন করিয়াছে। বাস্তবিক প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের লেখনী দিব্যমন্ত্রের কার্য্য করে। এক একটী কথাতে রাশি রাশি লোকের চিন্তা প্রভৃতির স্রোত ফিরাইতে পারে। এক একটী কথাতে নিজের হৃদয় স্থির ভাব পাঠকগণের হৃদয়ে অক্ষয় অক্ষরে মুদ্রিত করিতে পারে। এই জন্যই দেশের প্রকৃত হিতৈষী মাত্রেই সাহিত্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি করিয়া থাকেন।

দুর্ভাগ্যক্রমে বর্ত্তমান সময়ে একটী বিশেষ কারণে বাঙ্গালা সাহিত্যের আশানুরূপ উৎকর্ষ সাধন করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। আমরা উপরে বলিয়াছি প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ ভিন্ন সাহিত্যের গঠন ও উৎকর্ষের আশা করা যায় না। কেবল প্রতিভাশালী হইলেও হয় না। তাঁহাদের চিন্তাশক্তি পরিষ্কৃত ও রুচি সুমার্জ্জিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, নতুবা সাহিত্য দেশের উন্নতির হেতু না হইয়া অধোগতিরই কারণ হয়। [বাঙ্গালা সাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থা বিষয়ে আলোচনা করিতে গেলেই আমরা দেখিতে পাই যে যাঁহারা দেশের মধ্যে প্রতিভাশালী বলিয়া বিখ্যাত, যাঁহারা উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিয়া কৃতবিদ্য বলিয়া গণ্য হইয়াছেন তাঁহারা সকলেই প্রায় ইংরাজীতে মনের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য ব্যস্ত। বোধ হয় ইংরাজী চিন্তাশাস্ত্রের আলোচনা, ইংরাজী কাব্যরসের আস্বাদন, ইংরাজী ইতিবৃত্তের অনুশীলন প্রভৃতি দ্বারা তাঁহারা মনে মনে ইংরাজদিগের সমশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন; সুতরাং বাঙ্গালাতে লিখনপঠন করা তাঁহাদের পদ ও সম্ভ্রমের অযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করেন, অথবা বালককাল হইতে কেবল ইংরাজী চর্চ্চা করাতে ইংরাজী ভাষাতে মনের ভাব প্রকাশ করা অপেক্ষাকৃত সহজ বোধ হয়। যে কারণেই হউক দেশের সুশিক্ষিত ব্যক্তিরা সচরাচর বাঙ্গালার অনাদর করিয়া থাকেন।) এই কারণে যাঁহারই কিছু বলিবার থাকে তিনি সর্ব্বাগ্রে তাহা ইংরাজীতে প্রকাশ করিতে অগ্রসর হন, এবং কেবল দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত গ্রন্থকারেরা বাঙ্গালা সাহিত্যের অবয়ব গঠনের জন্য পড়িয়া থাকেন। তাঁহাদের যতদূর বিদ্যাবুদ্ধি ততদূর সেই কার্য্য সাধন করেন। তাঁহাদের চিন্তাশক্তি নাই, দেশের লোকদিগকে কিরূপে চিন্তা করিতে শিখাইবেন? পরিষ্কৃত রুচি নাই সুতরাং কিরূপে অন্যের রুচি পরিষ্কার করিবেন? তাঁহারা দেশের লোকদিগের প্রতিদিনের আহারের জন্য ভুসি যোগাইতে থাকেন এবং নিরীহ পাঠকগণ দিন দিন সেই ভুসি আহার করিয়া আরও নির্ব্বোধ ও চিন্তাশক্তিবিহীন হইয়া পড়ে। যে জাতির ভাবিবার কিম্বা করিবার কিছুই নাই, তাহার সাহিত্যেই কেবল অপদার্থ নাটক ও অরুচিজনক উপন্যাসের বাহুল্য দেখিতে পাওয়া যায়! দুর্ভাগ্যবশতঃ বাঙ্গালা সাহিত্যের সেই দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। দেশের লোক যেন নিদ্রিত থাকিয়া নাটক ও উপন্যাসের স্বপ্ন দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। নাটক কিম্বা উপন্যাসে যে কোন কার্য্য

হয় না তাহা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে; প্রতিভাশালী ব্যক্তির হস্তে পড়িলে ইহাই অশেষ উপকারের হেতু হয়।

আমরা যে উদ্দেশ্যে অদ্য লেখনী ধারণ করিয়াছি তাহা এই—দেশের সুশিক্ষিত চিন্তাশীল ও প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগী না হইলে ইহার উৎকর্ষ সাধিত হইবে না। বাবু বঙ্কিমচন্দ্র এবিষয়ে অগ্রসর হইয়া যে পথ দেখাইয়াছেন অন্য ক্ষমতাশালী লেখকদিগেরও সেই পথের অনুসরণ করা উচিত। বাবু শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইংরাজীতে মেগাজিন লিখিতে গিয়া ইংরাজ সমাজে তিরস্কৃত ও অপদস্থ হইতেছেন কিন্তু বঙ্কিমবাবু বঙ্গদর্শন প্রকাশ করিয়া দেশীয় সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি করিতেছেন, শত শত দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার পাত্র হইতেছেন, এবং বঙ্গভাষার ইতিহাসে আপনার অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতেছেন। ইংলণ্ডে যেমন এক শ্রেণীর লোক আছেন, গ্রন্থ প্রণয়ন করা ও সাহিত্যের উন্নতি করা তাঁহাদের জীবনের কার্য্য, সেইরূপ আমাদের দেশেও যদি এক শ্রেণী উপযুক্ত লোক সেই কার্য্যে নিযুক্ত হন, দেশীয় সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি হইতে পারে। (যদিও সাহিত্যের আলোচনা উপজীবিকার দ্বারা স্বরূপ হইতে পারে এরূপ অবস্থা আজিও উপস্থিত হয় নাই, কিন্তু কতকগুলি লোকের এ বিষয়ে বিশেষ সচেষ্ট হওয়া উচিত। কারণ দেশের সাধারণ লোকদিগকে উন্নত করিবার সেই একমাত্র উপায়।)

শিশুদিগের শিক্ষোপযোগী বাঙ্গালা সাহিত্যের অভাব

১২ ফাল্গুন ১২৮০। ১৫ সংখ্যা

…পত্যেক গৃহস্থ যদি পুত্রকন্যার শিক্ষার জন্য ব্যস্ত হইতেন, যদি কিসে শৈশব কালাবধি সন্তানদিগের বুদ্ধিশক্তি মার্জ্জিত, হৃদয় উন্নত ও রুচি পরিষ্কৃত হয়, তাহার জন্য চিন্তিত হইতেন, তাহা হইলে এতদিনে শিশুদিগের শিক্ষার উপযোগী বিবিধ উপায় আবিষ্কৃত হইত। মনুষ্য চিন্তাশক্তির নিয়োগ না করিলে কোন বিষয়ের উৎকর্ষ হয় না; নিতান্ত আবশ্যক বোধ না হইলে আবার লোকে সহজে প্রায় কোন বিষয়ে চিন্তাশক্তি নিয়োগও করে না। শৈশবাবধি সন্তানদিগের শিক্ষার বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হওয়া উচিত, অধিকাংশ পিতামাতার যদি এ সংস্কার থাকিত তাহা হইলে তাঁহারা সে অর্থ-ব্যয় স্বীকার করা অপব্যয় কিম্বা অনর্থক ব্যয় বিবেচনা করিতেন না, এবং দেশে শিশুদের শিক্ষার উপযোগী গ্রন্থাদিরও অসদ্ভাব থাকিত না। আপাততঃ দেখিতে গেলে শিশুদিগকে শিক্ষা দেওয়া সহজ কর্ম্ম বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু ইহা অপেক্ষা কঠিন ও গুরুতর বিষয় অধিক আছে কিনা সন্দেহ। অতি নিপুণ মনস্তত্ত্ব-বেত্তারাই এই কার্য্যে সমর্থ। উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পারিলে মনুষ্য কিরূপ উন্নতি লাভ করিতে পারে মৃত

জন ষ্টুয়ার্ট মিল তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। তিনি একদিনের জন্য কোন বিদ্যালয়ে প্রেরিত হন নাই। তথাপি তাঁহার সুবিখ্যাত পিতার সাহায্যে তিনি অতি অল্প দিনে কৃতবিদ্য অধিকার করিয়াছিলেন। সকল পিতা জেমস মিল এবং সকল পুত্র জন মিল হইতে পারে না, একথা যথার্থ, কিন্তু বুদ্ধিপুর্ব্বক শিক্ষা দিতে পারিলে যে অনেক পণ্ডশ্রম বাঁচিয়া যায় এবং মনেরও ক্ষতি হয় না তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমান সময়ে শিশুদিগের পাঠোপযোগী বাঙ্গালা সাহিত্যের বড় শোচনীয় অবস্থা। তাহাদের শিক্ষোপযোগী গ্রন্থও নাই এবং শিক্ষোপযোগী প্রণালীও নাই। কিছু না শিখিলে উত্তরকালে উদরের অন্ন মিলা দুর্ঘট, সুতরাং পিতামাতারা বালক বালিকাদিগকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন বটে, কিন্তু সেই পর্য্যন্তই যথেষ্ট। আর সে বিষয়ে চিন্তা করেন না। বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণও চিন্তাশক্তি বিহীন হইয়া গর্দ্দভের ভার বহনের মতো তাঁহাদের স্কন্ধে উত্তরোত্তর ভার অর্পণ করিতে থাকেন। এক পার্শ্বে কতকগুলি নীরস ও আকর্ষণবিহীন পাঠ্য বিষয়, অপর পার্শ্বে শিক্ষকের ভ্রুকুটী ও বেত্রাঘাত, ইহার মধ্যে নির্ব্বাক শিশুরা ভীত ও বিরক্ত হইয়া দিনপাত করে। এরূপ শিক্ষাবিষয় যতই তাহাদের উদরস্থ হয় ততই তাহাদের চিত্ত রুগ্ন ও দুর্ব্বল হইয়া আসে। এইরূপে বর্ত্তমান সময়ের বিদ্যালয়গুলি শিশুদিগকে বিকৃত করিবার উপায়স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অধিকাংশ পাঠ্য পুস্তকের আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেই গ্রন্থকারেরা শিশুদিগের প্রকৃতি কিছু মাত্র অবগত আছেন কিনা সন্দেহ জন্মে। বাঙ্গালা বিদ্যালয় সকলের ছাত্রগুলির যেন রক্ষাকর্ত্তা নাই। যিনি যাহা মনে করেন তাহাই পড়াইয়া থাকেন। যিনি যে পুস্তক রচনা করেন তাহাদের পাঠোপযোগী দুই একটী বিষয় থাকিলেই সুপারিস ও তোযামোদের বলে সেই হতভাগ্যদের পাঠ্যপুস্তক হইয়া যায়। জ্যামিতি, জরিপ, জমিদারি দর্পণ, ভূগোল, খগোল, তারিণীচরণের ইতিহাস, কৃষ্ণচন্দ্রের ইতিহাস, বেকনের এসে, ইত্যাদি ব্রহ্মাণ্ডের পুস্তক একটী দ্বাদশবর্ষীয় বালকের পৃষ্ঠে অর্পিত হয়। আমরা শপথ করিয়া বলিতে পারি এরূপ ভার হইলে মনুষ্য গর্দ্দভ না হইয়া থাকিতে পারে না।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া পুত্রকন্যাদিগকে আর বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে ইচ্ছা হয় না এবং দেশের অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তিও আর প্রেরণ করেন না। গৃহে বসিয়া যে শিক্ষা দেওয়া হইবে তাহারও সুবিধা নাই। শিশুদিগের পাঠোপযোগী গ্রন্থের নিতান্ত অসদ্ভাব। শিশুদিগের ভিন্ন ভিন্ন বয়সে ভিন্ন ভিন্ন মনোবৃত্তি বিকশিত হয়, ভিন্ন ভিন্ন ভাব হৃদয়ে আবির্ভূত হয়, সেই সেই সময়ে তদুপযুক্ত বিষয়গুলি তাহাদের সমক্ষে ধারণ করা উচিত, তাহা হইলে তাহাদের পড়িতে আনন্দ হয় এবং পাঠ করিয়া উপকারও লাভ করে। মনে কর একটী আটবৎসরের বালকের হস্তে সীতার কিম্বা সাবিত্রীর সতীত্ব বিষয়ক একখানি পদ্য দিলে। তাহাতে তাহার লাভ কি? তাহাতে তাহার অর্থবিহীন কথামাত্র। এই জন্য জন ষ্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছেন কবিতা বালকদিগের জন্য নহে। তবে যদি কবিতা পড়াইতে

হয়, উপন্যাস কিম্বা আখ্যায়িকাপূর্ণ কবিতা পড়িতে দেওয়া উচিত। আমাদের দেশের লোকেরা ইহার বিপরীত সংস্কার। অনেকে মনে করেন কবিতা শিশুদিগেরই জন্য বয়োজ্যেষ্ঠদিগের জন্য নয়; কিন্তু বাস্তবিক ভাবিয়া দেখিলে কতকগুলি প্রকৃতি বর্ণনা ও কতকগুলি ভাবোদ্দীপক কবিতা ভিন্ন অন্য কোন প্রকার কবিতাই শিশুদের পাঠোপযোগী বলিয়া বোধ হয় না। একটী চতুর্দ্দশবর্ষীয় বালক ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য খেদ লিখিতেছে ইহা আমাদের অস্বাভাবিক বিকৃত বলিয়া মনে হয়। কারণ ভারতবর্ষ কি, এবং স্বাধীনতা কি এ সংস্কার তাহার জন্মিয়াছে কিনা সন্দেহ।

শিশুদিগকে শিক্ষা দিবার সময় দুইটী কথা স্মরণ রাখা উচিত (১ম) পাঠ্য বিষয়গুলি যেন তাহাদের আমোদজনক হয় (২য়) সেগুলি পঠিত হইয়া যেন তাহাদের মনোবৃত্তির বিকাশের সাহায্য করে। যে শিক্ষায় ইহার অন্যতরের প্রতি ঔদাসীন্য ভাব সে শিক্ষা অঙ্গহীন ও দূষণীয়। আমরা যদি শিশুদিগের প্রকৃতির কিছুমাত্র বুঝিয়া থাকি তাহা হইলে জানি যে শৈশবকাল কেবল জ্ঞান সঞ্চয়ের সময়। তখন মন ব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ পদার্থের স্বরূপ ও ধর্ম্ম প্রভৃতি নির্ণয় করিতে ও পরস্পরের সম্বন্ধ নিরূপণ করিতে ব্যস্ত থাকে। সেই সকল সঞ্চিত জ্ঞান অবলম্বন করিয়া চিন্তা ও বিচার করার শক্তি তখনও জন্মে না। সুতরাং সে সময়ে যদি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের স্থূল স্থূল বিষয়গুলি তাহাদের গোচর করা যায় তাহা হইলে তাহারা ভবিষ্যতের জন্য অনেক জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারে—এবং আনন্দও লাভ করে। দ্বিতীয়তঃ দেখা যায় বাল্যকালে কল্পনাশক্তি প্রবল থাকাতে শিশুরা উপন্যাস ও আখ্যায়িকা শ্রবণ করিতে ভালবাসে, সুতরাং সে সময়ে গল্পের আকারে ইতিহাসের স্থূল স্থূল বর্ণনা, বিখ্যাত মহাত্মাদিগের জীবনচরিতের স্থূল স্থূল ঘটনা অতি অল্প আয়াসেই তাহাদের হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইতে পারা যায় এবং সেই আকারে তাহাদিগকে ধর্ম্মনীতি বিষয়েও শিক্ষা দিতে পারা যায়। কবিতার মধ্যে মাতৃস্নেহ, পিতৃভক্তি, সৌভ্রাত্র, সৌহার্দ্দ্য, নীচ প্রাণীদিগের প্রতি দয়া, প্রকৃতির শোভা দর্শনে অনুরাগ প্রভৃতি ভাব উদ্দীপন করিবার চেষ্টা করা উচিত। আবার কেবলমাত্র জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া দিবারও হৃদয়ের ভাবোদ্দীপন করিবার চেষ্টা না করিয়া তাহাদের রুচির উন্নতির দিকেও দৃষ্টিপাত করা উচিত। এই জন্য ভাল ভাল চিত্র ও সুন্দর সুন্দর বর্ণনা পাঠ করিতে দেওয়া উচিত। এইরূপে বালককাল অবধি যে শিশুর শিক্ষার জন্য আয়াস পাওয়া যায় সে শিশু উত্তরকালে প্রায় সুশিক্ষিত হইয়া থাকে।

উপসংহারকালে আমরা গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছি যে তাঁহারা ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের পাঠ্যপুস্তক নির্ণয় করিবার জন্য যেমন একটী কমিটী নিযুক্ত করিয়াছেন সেইরূপ বাঙ্গালা স্কুলের ছাত্রদিগের পাঠোপযোগী গ্রন্থ নির্ণয় করিবার জন্য একটী কমিটি নিয়োগ করুন। শ্রীযুক্ত বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন, শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী ও

শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিদিগকে সেই কমিটীর সভ্য করিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। কমিটি যদি বর্ত্তমান গ্রন্থ সকলের মধ্য হইতে শিশুদিগের পাঠোপযোগী গ্রন্থ নির্ব্বাচন করিতে পারেন ভালই নতুবা কতকগুলি পাঠ্য বিষয় ও রচনা প্রণালী প্রদর্শন করিয়া গ্রন্থকারদিগকে গ্রন্থ প্রণয়ন করিবার জন্য আহ্বান করুন। তাহা হইলে দেশের একটি বিশেষ অভাব দূর হইবে।

ভাবের সঙ্গীত। ২২ মাঘ ১২৮৫। ১২ সংখ্যা

কলিতে বৈরাগী দাদা,
আচ্ছা মজা লুটে নিলে।
তুমি চৈতন্যেরে প্রাণে মেরে
বুকের উপর টেক্কা দিলে॥
মানুষ বানর গাছ পাথর হয়
আরব দেশের গল্পে বলে।
তুমি ইণ্ডিয়াতে মাল্লে বাজী
জিতে গেলে ভেলকী খেলে॥
মরেছে রামমোহন, ও তার
পিণ্ড দাওগে তুলসী তিলে,
এখন পুর্ণব্রহ্ম কল্‌কেতাতে,
জয় বল তার সবাই মিলে॥
উনবিংশ শতাব্দীতে
জ্ঞানের আলো পায় সকলে;
তুমি সবার চোকে দিচ্চো ধূলো,
একি তোমার নূতন লীলে॥
প্রতিমূর্ত্তি ছিল যত
ফেলে দিলে মিথ্যা বলে।
শেষে বৃক্ষ নদী পার পেলে না,
নিজেই এবার দেবতা হলে॥
তুলসী বনে বাগের কথা
শুনেছিলেম প্রবাদ বলে।
ও তা এতদিনে দেখতে পেলাম্
তুমিই আমায় দেখিয়ে দিলে॥

তোমার ঘড়ী, নস্যদানী
আলবার্ট চেনের মালা গলে।
যত, দেড়ে চেলার আজব খেলা
পদ্মপুকুঁড়েয় বদরতলে॥
চোকে ঠুলি সরল বুলি
মাথায় টেরী টিকির ছলে।
দাদা শ্রীপাঠ তোমার, ফুলের বাগান,
চণ্ডী পড় গোলেমালে॥
অঙ্গ বিঁধে জপ কর তাই
পবনরূপী শক্তিশেলে।
তোমার আপন কীর্ত্তি ইষ্টমন্ত্র
তুমি নাচ নিজের মনের তালে॥
যিহোবা, জোভ, যীশুখ্রীষ্ট
আল্লা কৃষ্ণ দেব সকলে।
বুঝি সবার অংশে তোমার জন্ম।
এলেম শিখে জাহির হয়ে॥
তোমার কার্দ্দানি আব কেরামতে
রাজা উজীর ঘুরিয়ে ফেলে।
ঐ সে আমীর ওমরা পডচে ঘুরে,
মেয়ের জোর সার কলিকালে॥
ছেলের চেয়ে মেয়ের বাজার
গরম হলো ধরাতলে।
দাদা, বাদ্সা কাজি মেয়ের গোলাম
নবাব ত তার নখের তলে॥
বক্তৃতাতে হল্ ফাটান,
গাল টাটান কথা বলে।
দাদা, এবার শিখে লব, যা হয় হবে
বক্তা হব এবার মলে॥
মরে যদি জন্ম থাকে
জন্মাব তোমাদের কুলে।
তখন ত্রিকালজ্ঞ আমি কিনা
জানিয়ে দিব ধ্বজা তুলে।

বেজল এখন কেনান হলো
হাসি পায় তা মনে এলে
দাদা, কল্‌কেতা তার যেরুশালম
মন্দির ও তার পবলিক হলে ॥
নেটিভ ক্রাইষ্ট তুমিই এখন
সেভিয়ার হয়েছ হালে।
দাদা, কেনানের মেষ শিশুর মত
ঠাট্টাক্রুশে প্রাণ হারালে ॥
ভবেতে যার লেগেছে ঢেউ
যাবে তোমার পায়ের তলে ;
তখন দেখো দাদা রাগ কোর না,
দিয়ো তারে পায়ে ঠেলে।
তুমি, আগে শিষ্য পরে ছাত্র
অবশেষে গুরু হলে।
দাদা, হয়ে দৈবজ্ঞ আর আদেশধারী
অহংব্রহ্ম সার করিলে
ভবনদীর পারে ও ভাই
কে যেতে চাও এসো চলে।
এযে দাদার আমার চরণতরি
বাতাস বচ্চে আদেশ পা'লে ॥
সাম্‌লে এবার দাঁড় টেনো ভাই
পাণি যেন ঠেকে হা'লে।
দাদা, নিজে হয়ে সপ্ত মাঝি
শেষে সমাজদহে নাম ডুবালে ॥
এই কি তোমার ক্ষমা করা
ছল ছাড় না কসুর পেলে।
এখন মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল
মাত হয়েছে রাজার চেলে ॥
হাতে করে রসগোল্লা
ভোলাতে চাও কচি ছেলে ॥
এখন জহর কাঁচে সবাই বাচে
রঙ্গে নাচে মূর্খদলে ॥

শফরী শিশুদের মত
লাফাও দাদা অল্প জলে।
এদের বোঝাতে সে বুদ্ধি লাগে
মাছ ভাজা নয় মাছের তেলে॥
পরে রে কি দিবে বুদ্ধি
চিত্তশুদ্ধি সবার মুলে ?
করে আসলে ভুল পাকালে চুল
জড়িয়ে বেড়াও নিজের ভুলে॥
ঈশ্বর হওয়া মুখের কথা
হাতী মাবা মশার ছলে।
দাদা, রাং কি কভু হয় গো সোনা
থুথুতে কি ছাতু গলে॥
সত্যতত্ত্ব সার করো ভাই
আদেশ রাখো শিকেয় তুলে।
তখন, দৈবজ্ঞ হয় অনভিজ্ঞ,
পড়ে যখন যমের জালে॥
এখন দাদা সামলে চলো,
কে ভুলবে আর কথার ছলে।
ও তাই ফকিরচাঁদ বাবাজী বলে
ধর্ম্মেব মর্ম্ম কর্ম্ম ফলে॥

তাং ১০ মাঘ
নিমতলা গঙ্গাতীর

অনুগত বাউল
শ্রীফকিরচাঁদ বাবাজী।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভা। ২২ মাঘ ১২৮৫। ১২ সংখ্যা

সুবিখ্যাত মহাত্মা রাজা রামমোহন রায ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ইংলণ্ডের অন্তর্গত ব্রিশটল নগরে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দেব ২৭শে সেপ্টেম্বর মানবলীলা সংবরণ করেন। এই মহাপুরুষ স্বদেশের—সমগ্র ভারতবর্ষেব মঙ্গলার্থে কিরূপ প্রাণপণে যত্ন পরিশ্রম ও চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহার বর্ণনা কবা আমাদের এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্যে নহে, তাঁহার স্মরণার্থে বিগত ৭ই মাঘ কলিকাতায় শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাটীতে যে সভা হইযাছিল, তাহার সম্বন্ধে কএকটী কথা বলাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু এখানে একথা বলা একান্ত আবশ্যক যে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগেই এই সভার

অনুষ্ঠান হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহারা সাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। কৃতঘ্ন ব্রাহ্মেরা, বঙ্গবাসীরা, সমস্ত ভারতবর্ষীয়েরা সেই রামমোহন, সেই মহাপুরুষ রামমোহনকে এতদিন একপ্রকার বিস্মৃত হইয়াছিলেন কিন্তু এক্ষণে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাকে আমাদের সকলের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন, কৃতজ্ঞহৃদয়ে তাঁহাদের—সমস্ত ভারতবাসীর কর্ত্তব্য-কর্ম্ম সম্পাদনে অগ্রসর হইয়াছেন, এইজন্য হৃদয়ের সহিত আমরা তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ করি, এইজন্য আমরা তাঁহাদিগকে বিনীত অনুরোধ করি, সভা করিয়া, বক্তৃতা করিয়া তাঁহারা যেন মনে না করেন যে, তাঁহারা তাঁহাদের কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পন্ন করিলেন। যাহাতে রামমোহন রায়ের স্মরণার্থে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি বা অন্য কোন স্থায়ী চিহ্ন সংস্থাপিত হয়, তজ্জন্য তাঁহাদের, কেবল তাঁহাদের কেন, সমস্ত ভারতবাসীর যত শীঘ্র সম্ভব, তত শীঘ্র চেষ্টা করা একান্ত আবশ্যক। এতকাল কি আদি ব্রাহ্মসমাজ, কি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ, কি অন্যান্য সাধারণ সমাজ, সকলেই রামমোহন রায়ের প্রতি যারপরনাই তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছেন কিন্তু এক্ষণে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সে অভাব দূর করিতে, স্বকর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে অগ্রসর হইয়াছেন দেখিয়া আমরা বড়ই প্রীত হইয়াছি, বাস্তবিক এটী তাঁহাদের একটী নূতন কীর্ত্তি বলিতে হইবে।

এখানে আর একটী কথা বলা আবশ্যক বোধ করিতেছি যে, কেশব বাবু এবং তাঁহার গোঁড়া ব্রাহ্মেরা উপরিউক্ত সভায় উপস্থিত হন নাই। কিন্তু ইহাতে তাঁহাদেরই অকৃতজ্ঞতা ও নীচতা প্রকাশ পাইয়াছে, সভার কোন অনিষ্টই হয় নাই, সভাতে ন্যূনাধিক আটশত লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, কেশব বাবুরা সভাতে কেন উপস্থিত হন নাই, ইহার একমাত্র উত্তর এই যে, একে তো সভা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগে আহূত হইয়াছিল, তাহাতে আবার সভা দেবেন্দ্র বাবুর বাটীতে হইয়াছিল, সুতরাং সেখানে কেশব বাবুরা যে উপস্থিত হইবেন তাঁহাদের সে উদারতাটুকু নাই। এক্ষণে সভাব কার্য্য সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য তাহা বলিতে অগ্রসর হইতেছি। তাহা এই :

সভা আহ্বান ও বিজ্ঞাপন প্রচার। শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজ নামে সভা আহ্বান ও বিজ্ঞাপন প্রচার করেন। দেবেন্দ্র বাবু এখনও জীবিত আছেন, সুতরাং দ্বিজেন্দ্র বাবু কোন্ আইন ও কোন্ শিষ্টাচারানুসারে বিজ্ঞাপনে "আমার বাটীতে সভা হইবে" লিখিয়াছিলেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। কেবল ইহা নহে, তিনি যে প্রবন্ধটী পাঠ করেন তাহার মধ্যেও কতকগুলি "আমি সভা আহ্বান করিয়াছি" ছিল। এত "আমি" এত "আমার" ছড়াছড়ি কেন? আমি ও আমার পরিবর্ত্তে আমাদের ও আমরা বলিলে কি অপমান হইত? সভার দর্শকদিগের স্থান নির্দ্দেশ। স্থান নির্দ্দেশ সম্বন্ধে উক্ত সভায় পাঠক! তোমার, আমার বাটীর সভায় নহে, আমাদের দেশের আদর্শস্থল বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাটীর সভায়

সৃষ্টিছাড়া বন্দোবস্ত হইয়াছিল!! ইহাই সৃষ্টির নিয়ম যে, যাহারা নিজ কার্য্য ক্ষতি করিয়া ব্যস্তসমস্ত হইয়া সর্ব্বাগ্রে কোন সভায় উপস্থিত হয়, তাহারা সকল অপেক্ষা ভাল স্থানে বক্তাদিগের অতি নিকটেই বসিবার স্থান পাইয়া থাকে, কিন্তু এই সভায় যাহারা কষ্ট করিয়া তাড়াতাড়ি করিয়া সকলের আগে আসিয়াছিলেন তাঁহারাই অতি মন্দ স্থানে—বক্তাদিগের নিকট হইতে অতিদূরে বসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, আর যাঁহারা যত বিলম্বে আসিয়াছিলেন তাঁহারা তত ভাল স্থানে, বক্তাদিগের তত নিকটে বড় আরামে বসিতে পাইয়াছিলেন!!! আমরা জিজ্ঞাসা করিতে চাহি, সভায় যাঁহারা যত অগ্রে আসিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে সেই হিসাবে বক্তাদিগের নিকট হইতে ক্রমে ক্রমে তত নিকট বসিতে দিলে কি কোন বিশৃঙ্খলা বা অনিষ্ট হইত?

সঙ্গীত: "বিজ্ঞাপনে" এবং "প্রোগ্রামে" যেরূপ সঙ্গীত হইবার কথা লেখা ছিল তাহা হয় নাই। জিজ্ঞাসা করি, কেন হয় নাই? বাঙ্গালি সভা বলিয়াই কি? ইহাই কি বাঙ্গালির ধর্ম্ম? বাঙ্গালি কোন কালেই কি এ ধর্ম্ম ত্যাগ করিবেন না? কথা ছিল যে, রামমোহন রায়ের রচিত সঙ্গীতই গাওয়া হইবে, কথা ছিল যে, সভাস্থলে পাঁচটী সঙ্গীত হইবে কিন্তু কার্য্যস্থলে দেখা গেল যে কেবল মাত্র চারিটি গাওয়া হয়, আবার তাহার দুইটী অন্য দ্বারা রচিত হইয়াছিল। কিন্তু এ কথা আমাদিগকে এখানে অবশ্যই বলিতে হইবে যে, সঙ্গীত সম্বন্ধীয় নিয়ম লঙ্ঘনজনিত অপরাধ আমরা সেই অন্যের রচিত একটী সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া একেবারে বিস্মৃত হইয়াছিলাম। সেই সঙ্গীতটী এমন চমৎকার হইয়াছে যে এখানে তাহা উদ্ধৃত না করিয়া আমরা থাকিতে পারিলাম না। সেটী এই:

রাগিণী খাম্বাজ। মধ্যমান

কোথা আছ দেখ এসে মহামতি রামমোহন
তোমার জন্মভূমি, ভারতভূমি হয়েছে কি সুশোভন
যে বৃক্ষ রোপিলে তুমি, ছাইল সে বঙ্গভূমি,
সুপুষ্প ফলভার তার দেখা যায় অগণন,
ছুটে তার পরিমল, মোহিল দেশ সকল,
হস্তিনা, দ্বারকা আর মদ্রভূমি বাসিগণ।
ছিল তব আশা মাত্র, বুঝিবে লোক সত্যতত্ত্ব
দেখ হে কি পরিবর্ত্ত হয়েছে এখন,
যারা করিত পীড়ন (তোমায়) তাদেরি সন্তানগণ,
কৃতজ্ঞতা উপহার তোমারে করে অর্পণ।

পাঠক! এই সঙ্গীতটী পাঠ করিয়া তোমার হৃদয় মন কি প্রফুল্লিত ও বিকশিত হইতেছে না? যিনি ইহা রচনা করিয়াছেন তাঁহাকে ধন্যবাদ।

বক্তা বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মনে করিয়াছিলাম এবং আশা ও ভরসা ছিল

যে, ইনি মৌখিক বক্তৃতা করিবেন। কিন্তু যথাসময়ে দেখা গেল ইনি ইঁহার বক্তব্য-বিষয় একখানি কাগজে লিখিয়া সভায় পাঠ করেন, এত আস্তে আস্তে পাঠ করেন যে আমরা কিছুই শুনিতে পাই নাই। সুতরাং ইনি কি লিখিয়াছিলেন তাহা ইনি বলিতে পারেন, আমরা তাহা বলিতে পারি না। তবে ইহা বলিতে পারি যে, কাগজে লিখিয়া সভায় পাঠ করিবার সময় এখন আর নাই। মৌখিক বক্তৃতা শুনিতে লোকে চাহে কিন্তু রচনাপাঠ শুনিয়া কষ্ট পাইতে এখন আর কেহ চাহে না।

বক্তা বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। ইনি রামমোহন রায় সম্বন্ধে একটী উৎকৃষ্ট মৌখিক বক্তৃতা করিয়াছিলেন, কিন্তু সময়ে সময়ে বড় বিলম্ব করিয়াছিলেন, কি বলিবেন ভাবিয়াছিলেন এবং বড় শীঘ্র শীঘ্র "নোট পেপার" দেখিয়াছিলেন। এ সকল সত্ত্বেও ইঁহার বক্তৃতা বড ভাল হইয়াছিল। মনের কথা বলিতে চক্ষুলজ্জা কি, আমরা যদি ইঁহার বক্তৃতা এবং উপরিউক্ত সঙ্গীতটী শুনিতে না পাইতাম, তবে কেবল মাত্র সভায় কষ্ট পাইবার জন্যই যে সেখানে সকলে উপস্থিত হইয়াছিলেন কেবল তাহাই মনে করিতাম। ইনি আমাদিগকে দুই একটী নূতন কথাও শুনাইয়াছেন। রামমোহন রায় যে, ভূগোল ও জ্যোতির্ব্বিবরণ পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন তাহা আমরা পুর্ব্বে জানিতাম না। কিন্তু ইনি আবার কয়েকটী গুরুতর ভুলও করিয়াছিলেন। সে ভুলগুলি এই, ইনি ইঁহার বক্তৃতার মধ্যে রামমোহন রায়ের সঙ্গীতের বিষয় উল্লেখ করিতে একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছিলেন। বেদ ও বাইবেল অবলম্বন করিয়া রামমোহন রায় যেরূপ হিন্দু ও খ্রীষ্টানদিগকে এক ঈশ্বরের উপাসনাতে লওয়াইয়া ছিলেন, তেমনই তিনি কোরাণ অবলম্বন করিয়া, কোরাণের প্রমাণ উদ্ধৃতি করিয়া মুসলমানদিগকে এক ঈশ্বরের উপাসনাতে উত্তেজিত করিয়াছিলেন। কিন্তু নগেন্দ্র বাবু বেদ বাইবেল হিন্দু ও খ্রীষ্টানের কথা উল্লেখ করিয়াও কোরাণ ও মুসলমানের কথা বলিতে একেবারে বিস্মৃত হইয়াছিলেন। যাঁহার স্মরণের জন্য সভা আহ্বান, তিনি কোথায় মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ করা একান্ত আবশ্যক ছিল, কিন্তু নগেন্দ্র বাবু সে কথাটীও একেবারে ভুলিয়া-ছিলেন। আমরা আরো শুনিলাম যে, রামমোহন রায় প্রতিদিন দশসের করিয়া দুগ্ধ পান করিতেন, এটী বলিতে বিস্মৃত হইয়া তিনি নিজেই নাকি আক্ষেপ করিয়াছেন।

আমরা আরও যাহা শুনিলাম তাহা যদি সত্য হয়, তবে নগেন্দ্র বাবুর এই সকল ক্রটির জন্য তাঁহাকে অপরাধী করা যাইতে পারে না। শুনিলাম যে, নগেন্দ্র বাবু যখন বক্তৃতা করিতেছিলেন, তখন তাঁহার পা টানিয়া, পত্রের উপর পত্র লিখিয়া অতি শীঘ্র সেই বক্তৃতা শেষ করিবার জন্য তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করা হইয়াছিল, কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, কেন তাঁহাকে মনের সাধ মিটাইয়া বলিতে দেওয়া হয় নাই? যদি বল, সময়াভাবের জন্য; তবে প্রশ্ন এই, সভার কার্য্য আরম্ভ হইবার সময় ৩টার পরিবর্ত্তে কেন ১টা নির্দ্ধারিত করা হয় নাই? যদি ৩টার সময়েই কার্য্যারম্ভ

হইয়াছিল তবে আলোকের বন্দোবস্ত করা হয় নাই কেন? সন্ধ্যার পরেও সভার কার্য্য চালান হইল না কেন? আমরা পুর্ব্বে লিখিয়াছি যে প্রোগ্রামে উল্লিখিত দুইটী সঙ্গীত গাওয়া হয় নাই; পাঠক জানিবেন এই সময়াভাবই তাহার কারণ।

বক্তা বাবু রাজনারায়ণ বসু। ইনি মাথামুণ্ড কি যে বলিয়াছিলেন, কেন যে বলিতে উঠিয়াছিলেন, তাহা তিনিই জানেন। আমরা তাহা জানি না। কোথায় সকলে রামমোহন রায়কে স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞ হইবে, দুঃখ করিবে রোদন করিবে, না কোথায় সকলে ইঁহার কথা শুনিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে না পারিয়া অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইনি যখন রামমোহন রায় সম্বন্ধে গল্প বলিতেছিলেন তখন সেই "ধর্ম্মতত্ব দীপিকা" সেই "হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা" সেই "রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা"র রচয়িতা রাজনারায়ণ বসু বলিয়া বোধ হয় নাই, কিন্তু তখন ইঁহাকে একজন "রসরাজ" বলিয়াই বোধ হইয়াছিল। সময় বিশেষে, অবস্থা বিশেষে দর্শকদিগকে হাসান ভাল, কিন্তু মৃত ব্যক্তির স্মরণের জন্য যেখানে সভা, মৃত ব্যক্তির জন্য দুঃখ প্রকাশ, তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার জন্য যেখানে সভা, সেখানে এত হাসির ঢলাঢলি কেন? রাজনারায়ণ বাবু যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে গাম্ভীর্য্যের চিহ্নমাত্র ছিল না, তাঁহার বক্তব্য বিষয় যে গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিতে পারা যাইত না, এমন নহে, পাঠক কিছুতেই এমন মনে করিবেন না কিন্তু তথাপি রাজনারায়ণ বাবু যাহা কিছু বলিয়াছেন, দর্শকদিগকে হাসানোই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল। তাঁহার ন্যায় লোকের এরূপ কুরুচি দেখিলে যথার্থ ই মনে বড় কষ্ট হইয়া থাকে।

বক্তা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী। বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল যে, ইতিপুর্ব্বে অক্ষয় বাবু রামমোহন রায় সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ যাহা তত্ববোধিনীতে প্রকাশ করিয়াছিলেন শিবনাথ বাবু তাহাই পাঠ করিবেন। কিন্তু যথাসময়ে দেখা গেল তাহার পরিবর্ত্তে কিছুদিন পুর্ব্বে অক্ষয় বাবুর একটী প্রবন্ধ যাহা দুইজন পত্রপ্রেরক সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাই তিনি পাঠ করিলেন। এই প্রবন্ধটি অতি উৎকৃষ্ট, কিন্তু তা বলিয়া কথার অন্যথা করা শিবনাথ বাবুর পক্ষে ভাল হয় নাই। এই উৎকৃষ্ট প্রবন্ধটী আমরা পুর্ব্বে সোমপ্রকাশে পাঠ করিয়াছিলাম, সুতরাং আমাদের পক্ষে ইহা পুরাণ এবং সেই জন্য ইহা দ্বারা আমাদের মন তত আকৃষ্ট হয় নাই।

শিবনাথ বাবুর পাঠের পরে দুইটী সঙ্গীত হওয়া উচিত ছিল কিন্তু সময়াভাব বশতঃ অর্থাৎ সভার বেবন্দোবস্ত বশতঃ তাহা না হইযাই সভাভঙ্গ হয় এবং পরিশেষে সকলে আদি ব্রাহ্ম সমাজে উপস্থিত হইয়া "জয় দেব জয় দেব, জয় মঙ্গলদাতা" এই সুবিখ্যাত সঙ্গীতটী সমস্বরে গাইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করেন।

শ্রী ভগবতীচরণ দে

১৬ই মাঘ ১৮০০ শক।

বাঙ্গালা সংবাদপত্র ও তৎপাঠে লোকের ইচ্ছা। ৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৮৭ সন। ৫ সংখ্যা

…বাঙ্গলা সংবাদপত্রের ইতিবৃত্ত বর্ণন এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নয়। সেই ইতিবৃত্ত বর্ণনে রেভারেণ্ড জে. লং সাহেবের অধিকার। পরাধিকার হরণ করিয়া পাপগ্রস্থ হওয়া আমাদের কোষ্ঠীতে লেখে নাই। সাহিত্য গগনভাগে যে বিপ্লব ঘটিয়াছে, সংক্ষেপতঃ তাহারই উল্লেখ করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। ফলতঃ বঙ্গভাষা এক্ষণে যে অবস্থাসম্পন্ন হইয়াছে, তাহারই বর্ণন করা আমাদের অভিপ্রেত। সোমপ্রকাশের উদয়ের পূর্ব্বে আমরা জ্ঞানান্বেষণ, সমাচারদর্পণ, বঙ্গদূত, প্রভাকর, ভাস্কর, সমাচার চন্দ্রিকা, রসরাজ, সুধাকর, পূর্ণচন্দ্রোদয়, এই কয়েকখানি বাঙ্গালা সংবাদপত্র দর্শন করিয়াছিলাম, আর যদি দুই একখানি থাকে, তাহা আমাদের স্মরণ হইতেছে না। সোমপ্রকাশের জন্মের পর তিমিরাবৃত গগনমণ্ডলে নক্ষত্র মণ্ডলীর ন্যায় অসংখ্য বাঙ্গালা সংবাদপত্র সাহিত্য গগনভাগে শোভা পাইতেছে। এখনও অদৃষ্টপূর্ব্ব দুই একখানি নূতন উদিত হইতেছে। এগুলি সমুদায়ই ক্রমে গ্রাহকগণের উৎসাহ-দানস্বরূপ বারি দ্বারা সিক্ত হইয়া পরিপুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইতেছে। সকলগুলির সমানরূপ উন্নতি না থাকুক, সকলগুলিই যে গ্রাহকগণের সাহায্য দান দ্বারা প্রতিপালিত হইতেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এতদ্দ্বারা নিঃসন্দিগ্ধরূপে সপ্রমাণ হইতেছে যে বঙ্গভাষার পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উন্নতি হইয়াছে। পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষার যে প্রকার দুর্দ্দশা ছিল, এখন সেরূপ নাই। পূর্ব্বে যাঁহারা বাঙ্গালা লিখিতেন, রস, ভাব, গুণ, রীতি, অলঙ্কারাদি দ্বারা ভাষাকে সুশোভিত করা দূরে থাকুক, উজ্জ্বল ও ওজস্বিনী রচনা দূরে থাকুক, তাঁহারা স্পষ্টাক্ষরে স্বাভিপ্রায়ই প্রকাশ করিতে পারিতেন না, সুতরাং পাঠকও জুটিত না। পুষ্পে মধু না থাকিলে মধুকর কি সেখানে গিয়া থাকে? এখন সকল সংবাদপত্রেই যখন মধুলোভী মধুকর জুটিতেছে, তখন স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে, বাঙ্গালা সংবাদপত্রগুলি এখন মধুহীন নয়। এখন উহা মধু দ্বারা উন্মাদিত করিয়া তুলে বলিয়া উহার দৈনন্দিন উন্নতি লাভ হইতেছে। পূর্ব্বে পাঠকদিগের যে প্রকার বিকৃত রুচি ছিল, এখন তাহার বহুল পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পূর্ব্বে ব্যক্তিবিশেষের গ্লানি লইয়াই প্রায় সম্পাদকেরা ও পাঠকেরা আমোদ করিতেন। এখন তাহার বহুল পরিবর্ত্ত হইয়াছে। এখন সকলে রাজনীতি বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়াছেন। পাঠক এরূপ মনে করিবেন না যে পূর্ব্বে যে বিশ্বকর্ম্মা বেয়াল্লিশকর্ম্মা চুয়াল্লিশকর্ম্মা ও পঞ্চান্নকর্ম্মা সাহিত্য সংসারে জন্মিয়াছিলেন, এখন আর তাঁহারা নাই। এখনও সম্পাদকদলে তাঁহাদের অনেকের উদয় নয়নগোচর হয়। গ্লানি করিবার ও গ্লানি দিবার রোগটা আজও অনেকে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। অবসর উপস্থিত হইলে তাঁহারা চুপ করিয়া থাকিতে পারেন না। পরের গ্লানি করিবার ইচ্ছা তাঁহাদের জিহ্বাবর্ত্তী শিরাগুলিকে যেন বিষ নিক্ষেপ দ্বারা উন্মাদিত করিয়া তুলে! ঐ মহামতিদিগের

প্রাদুর্ভাব না থাকিলে বাঙ্গালা ভাষা অধিকতর উন্নত হইয়া উঠিত সন্দেহ নাই। ঐ মহামতিদিগের আরো একটী বিরুদ্ধ ইচ্ছা ও চেষ্টা দেখিতে পাই, তাঁহারা প্রত্যেকে মনে করেন, এক একটী নূতন ভাষার সৃষ্টি করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ দেশমধ্যে নিখাত করিবেন। এই প্রসঙ্গে আমরা একটী প্রস্তাব করিতেছি, প্রত্যেকে এক একটী ভাষার সৃষ্টি করিবার চেষ্টা না করিয়া সকলে মিলিয়া একটী ভাষাকেই পরিপুষ্ট বৰ্দ্ধিত মার্জ্জিত ও অলঙ্কৃত করিয়া তুলুন। তাহা না করিলে বাঙ্গালা ভাষার সম্যক উন্নতি লাভ দুর্ঘট।

বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ১৯ শ্রাবণ ১২৮৭

বঙ্গদেশে রায় বাহাদুর, রাজা বাহাদুর প্রভৃতির উপাধির ছড়াছড়ি হইয়া গেল, বঙ্কিমবাবুর অপেক্ষা শতগুণে হীন ব্যক্তিও পুরস্কৃত হইলেন, একটী যথার্থ যোগ্যপাত্র বঙ্কিমবাবু উপেক্ষিত হইলেন, এটী যথার্থ দুঃখের বিষয়। আমাদের হুগলীস্থ সংবাদ-দাতার এ নিমিত্ত ক্ষোভ করা অসঙ্গত হয় নাই। বাঙ্গালিরা যে কেবল ··তাহা আমাদের বর্ত্তমান লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর ইডেন সাহেবের অবিদিত নাই। এ বিষয়ে তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার নিকটে গুণেরও যথার্থ সমাদর হইয়া থাকে। ঈদৃশ গুণজ্ঞ ব্যক্তি বঙ্কিমবাবুর সদৃশ গুণীব্যক্তিকে যে বিস্মৃত হইলেন, ইহা অধিকতর বিস্ময় ও ক্ষোভের বিষয়। অতএব আমাদেরই হুগলীস্থ সংবাদাতা এ বিষয়টী লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের স্মরণপথে উপস্থিত করিয়া উচিত কাজই করিয়াছেন। তিনি আমাদের অপেক্ষা বঙ্কিমবাবুর বিষয় অধিক জানেন। এই হেতু আমরা তাঁহার পত্রখানি এস্থলে অবিকল উদ্ধৃত করিলাম:

রাজকর্ম্মচারীগণের মধ্যে যোগ্যব্যক্তি পুরস্কৃত বা সম্মানিত হন, এটী সকলেরই বাঞ্ছনীয়। যোগ্যব্যক্তি পুরস্কৃত বা সম্মানিত হইলে যেমন ইষ্ট ও সুখের কারণ হয়, অযোগ্য ব্যক্তি পুরস্কৃত বা সম্মানিত হইলে সেইরূপ অনিষ্ট ও অসুখের কারণ হইয়া থাকে। যোগ্য ব্যক্তি পুরস্কৃত হইলে অন্যান্য রাজকর্ম্মচারীগণ দৃষ্টান্ত দেখিয়া অধিকতর উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতে তৎপর হন, অযোগ্য ব্যক্তিকে পুরস্কৃত হইতে দেখিলে তাঁহারা নিরুৎসাহ হইয়া স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করিতে থাকেন। এতএব গবর্ণমেণ্টের উচিত তাঁহারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে পৃথিবীতে অনেক উৎকৃষ্ট হীরক পাওয়া যায়। যাঁহারা রাজাজ্ঞা বা কহিনুরকে সর্ব্বাপেক্ষা বহুমূল্য হীরক মনে করেন, তাঁহারা মনে করেন, তাহারা মহাভ্রমে পতিত আছেন। ভারতের প্রিয়রত্ন বঙ্গদেশের প্রিয়পুত্র ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট সমাজের রত্নমুকুট, বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজের অন্যতম ভূষণ, কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বি. এ. কাঁটালপাড়ার চট্টোপাধ্যায় কুলকেশরী হুগলীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট, শীর্ষ লিখিত শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র

চট্টোপাধ্যায় মহোদয়ই অদ্য আমাদিগের প্রস্তাবের প্রধান উদ্দেশ্য। মানবগণ সুশিক্ষিত হইলে যে সকল গুণগ্রামের অধিকারী হন, বঙ্কিম বাবুতে তাহার অনেকগুলি গুণ আছে। আমরা পুর্ব্বে বলিয়াছি ইনি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট সমাজের রত্ন মুকুট। স্বাধীন-চিত্ততা, ন্যায়পরায়ণতা, তীক্ষ্ণদর্শিতা প্রভৃতি যে সকল গুণ থাকিলে লব্ধ প্রতিষ্ঠ হওয়া যায়, বঙ্কিম বাবুর সে সমস্ত গুণই আছে আবার যে বিচারপতি আত্মীয় বন্ধুবান্ধব বা অনুগত ব্যক্তিগণের স্বার্থপরতামুলক চীৎকারে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অথবা উপরি পদস্থ কর্ত্তৃপক্ষগণের সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টির ভয়ে ভীত না হইয়া পক্ষপাতশূন্য হইয়া নির্ভয়-চিত্তে অকম্পিত হস্তে বিচারের তুলাদণ্ড ধারণ করিতে পারেন। তাঁহার ন্যায়পরায়ণতা, সুবিচারকতা ও তেজস্বিতা অবশ্যই প্রশংসনীয়। আমরা বঙ্কিম বাবুর এই গুণটী দেখিয়া অধিকতর আনন্দিত হই। ইঁহার সকল কার্য্যেই বহুদর্শিতা আছে। ফৌজদারী মকদ্দমায়। কি কালেক্টরী কার্য্যে, কি ট্রেজরীর কার্য্যে, কি আবগারীর কার্য্যে, কি রোডসেসের কার্য্যে। কি মিউনিসিপাল কার্য্যে বঙ্কিমবাবুকে যে কার্য্যেই নিয়োজিত করা হউক, ইনি সকল কার্য্যেই দক্ষ ও পটু। আমরা স্বজাতি পক্ষপাত দোষে দুষিত হইয়া কহিতেছি না। সত্য কথা বলিতে কি, অনেক ইংরেজ ফুল মাজিষ্ট্রেট অপেক্ষাও বঙ্কিম বাবু যোগ্য ও বহুদর্শী একজিকিউটিভ অফিসার। বাঙ্গালী ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটদিগের কথা দূরে থাকুক, আমরা জানি অনেক জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও অফিসিয়েটিং মাজিষ্ট্রেট সাহেব কার্য্য বিশেষে গোলযোগ হইলে বঙ্কিম বাবুর মতামত গ্রহণ করিয়া থাকেন। এক্ষণে আমাদিগের বক্তব্য বিষয়ে অবসর উপস্থিত। "গুণী ব্যক্তি" আমাদিগের মাননীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর শ্রীযুক্ত সার এসলি ইডেন মহোদয় গুণগ্রাহী লোক। বিশেষতঃ ইনি বাঙ্গালীদিগের পিতৃস্থানীয়। ইডেন সাহেব গুণ দেখিয়া অন্যান্য বিভাগে অনেক বাঙ্গালীকে উচ্চপদে নিয়োজিত করিয়া স্বীয় গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন। তবে তাঁহার পক্ষপাতশূন্য সুশাসনের সময়ে বঙ্কিম বাবুর সদৃশ ব্যক্তিগণ পুরস্কৃত বা সম্মানিত হন না কেন? এটী নিতান্ত ক্ষোভের বিষয় বলিতে হইবে।

উপসংহার কালে আমরা মহামান্য ইডেন মহোদয়ের নিকটে নির্ব্বন্ধতাশয় সহকারে নিবেদন করিতেছি, তিনি বঙ্কিম বাবুকে জিলার মাজিষ্ট্রেট অথবা তৎসদৃশ একটী একজিকিউটিভ কর্ম্মে নিয়োজিত করিয়া তাঁহার সুবিচার প্রদর্শন করিয়া বঙ্গে অনন্ত কীর্ত্তি রাখিয়া যাউন।

ইলছোবা মণ্ডলাই
৩০এ জুলাই ১৮৮০ খৃঃ

বশম্বদ
আপনার হুগলিস্থ সংবাদদাতা।

মুমূর্ষু সংস্কৃতশাস্ত্রের পুনরুদ্ধার এবং সংস্কৃতের অনুশীলন। ২৩ কার্ত্তিক ১২৮৮

পৃথিবীতে যত প্রকার ভাষা আছে, তন্মধ্যে সংস্কৃত ভাষাই প্রাচীনতম। কেবল

হিন্দুরা আত্মশ্লাঘা প্রকাশের নিমিত্ত এমন কথা বলেন না, ভূমণ্ডলের যাবতীয় সভ্যজাতি মুক্তকণ্ঠে ইহা স্বীকার করেন। পণ্ডিতগণ নানাদেশের ভাষা শিক্ষা করিয়া শব্দ শাস্ত্রের সহায়তায় পুরাতন ইতিহাস সঙ্কলন করিতেছেন, কিন্তু সংস্কৃতের তুল্য প্রাচীন আর কোন ভাষা তাঁহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল না। পুরাতন কালের সকলি কুৎসিত এবং কদাকার। ভোজ্যদ্রব্য বল, বসনভূষণ বল, গৃহাদি বল, কিছুই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট এবং সুরুচিসম্পন্ন নহে। ভাষা—তাও কিরাত বর্ব্বর প্রভৃতির মুখে অব্যক্ত ও অসম্পূর্ণ। কিন্তু সংস্কৃতভাষা তেমন নয়, প্রাচীন বলিয়া ইহার কোন অঙ্গটী খঞ্জ, দেহ লাবণ্যবিহীন, শরীরের কোথাও একটী অলঙ্কার নাই, তাহাই নহে। সংস্কৃত অতি মাজ্জিত, পরিপুষ্ট এবং নানা সজ্জায় সুজ্জিত। এই দেবমাতৃক ভাষার অনুপম গুণে মুগ্ধ হইয়া আমাদের গুণগ্রাহী রাজপুরুষগণ লুপ্ত গ্রন্থের উদ্ধার এবং সংস্কৃতের সবিশেষ অনুশীলননিমিত্ত বিস্তর টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন। সংস্কৃতের পুরাতন পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের জন্য ১৮৬৮ সালে গবর্ণমেণ্ট বাৎসরিক ব্যয়ের নিমিত্ত ২৪০০০ হাজার টাকা, অযোধ্যা এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ৩২০০ টাকা; মাদ্রাজ ও মহীশূরে ৩২০০ টাকা; পঞ্জাবে ১৬০০ টাকা, বোম্বাই, রাজপুতানা এবং মধ্য প্রদেশে ৮০০০ টাকা, এসিয়াটিক সোসাইটিতে ৩০০০ টাকা, মুদ্রাঙ্কনের জন্য ১০০০ টাকা, এবং বাজে খরচ ৮০০ টাকা; এই মোট ২৪০০০ টাকা দেওয়া হইয়াছে।

বঙ্গদেশের হস্তলিখিত পুরাতন পুস্তকের অনুসন্ধানী শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং তাঁহার সহকারিগণ ১৮৮০ সাল পর্য্যন্ত সর্ব্বসমেত ১০০০ হাজার পুরাতন পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন। বিকানিরের রাজার পুস্তকালয়ে অন্যান ২০০০ হাজার পুস্তক সঞ্চিত আছে। নেপাল দেশীয় প্রচলিত বৌদ্ধ ভাষার ব্যাখ্যা বিষয়েও সমধিক উন্নতি করা হইয়াছে। সাকুল্যে ৯৫৬ খানি তাঁহারা এই সময়ের মধ্যে সংগ্রহ করেন। তন্মধ্যে কতকগুলি ক্রয় করা হইয়াছে, এবং কতকগুলি নকল করিয়া লওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ইতিপুর্ব্বে ৬৫৬ খানি পুস্তক ক্রয় করা হয়; অতএব সমগ্র পুস্তকের সংখ্যা ১৬১২ খানি হইতেছে। ইহার মধ্যে অধিকাংশ পুস্তক নিতান্ত দুর্লভ ও অশ্রুতপুর্ব্ব, অবশিষ্টগুলি এদেশে প্রচলিত ছিল না।

ইংরাজাধিকারভুক্ত ব্রহ্ম দেশেও পুরাতন সংস্কৃত পুস্তকের অনুসন্ধান চলিতেছে। কিন্তু সেখানে এ পর্য্যন্ত নূতক পুস্তক একখানিও আবিষ্কৃত হয় নাই। তত্রত্য চিফ্ কমিশনর লিখিয়াছেন যে, রেঙ্গুনের উচ্চশ্রেণীস্থ বিদ্যালয়ের পালি ভাষার অধ্যাপক নূতন পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ বিষয়ে অচিরে কৃতকার্য্য হইবেন।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ঢুণ্টিরাজ শাস্ত্রী এই কাজে ব্রতী ছিলেন। তিনি অনেকগুলি বহুমুল্য দুর্লভ পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছেন। অযোধ্যায় পণ্ডিত দেবীপ্রসাদের হস্তে এই কার্য্যভার বিন্যস্ত ছিল। ১৮৭৮ হইতে ১৮৮০ পর্য্যন্ত তিনি সর্ব্বসমেত ২৪০ খানি পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছেন।

পঞ্জাব প্রদেশে শ্রীযুক্ত কাশীনাথ পণ্ডিত এই কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি পণ্ডিত হৃষীকেশের পুস্তকালয়ে ৫০০ খানি পুস্তক দর্শন করেন। তন্মধ্যে ২২৭ খানি হস্ত লিখিত। ইহার মধ্যে ২৭ খানি দুষ্প্রাপ্য। পণ্ডিত জনদত্ত প্রসাদের পুস্তকালয়ে ২৫০০ খানি পুস্তক আছে। তন্মধ্যে ১৯০০ খানি নির্ব্বাচন করিয়া দেখা হইয়াছিল। তাহার মধ্যে ১৫৩ খানি দুর্লভ ও বহুমূল্য বস্তু। পণ্ডিত দিনরায়ের পুস্তকালয়ে ৪৩০ খানি পুস্তক আছে। তন্মধ্যে ১০ খানি দুষ্প্রাপ্য।

মাদ্রাজ এবং মহীশূরে শ্রীযুক্ত ওপ্পার্ট এবং বর্ণেল সাহেব বিস্তর অনুসন্ধান করিয়া অনেকগুলি নূতন পুস্তকের নাম সংগ্রহ করিয়াছেন। ওপ্পার্ট সাহেব সর্ব্বসমেত ৮৮৭৬ খানি পাণ্ডুলিপির নামোল্লেখ করেন; এবং বর্ণেল সাহেব তাঞ্জোরে ১২৩৭৫ খানি এবং মহীশূরে ১৬০ খানি হস্তলিখিত পুস্তকের নাম তালিকায় মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন।

বোম্বাই, রাজপুতানা এবং মধ্যপ্রদেশে শ্রীযুক্ত বুল্লার সাহেব বিস্তর অনুসন্ধান করিয়াছেন। শান্তিনাথের পুস্তকালয়ে তিনি ৩০০ খানি হস্তলিখিত পুস্তক দেখেন; তন্মধ্যে ছয় খানি ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছে। পাটনের সঙ্ঘবিন পদ পুস্তকালয় অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত একজন পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তথায় তিনি অনেকগুলি দুলভ পুস্তক প্রাপ্ত হন। ঐ বহুমূল্য পুস্তকের মধ্যে একখানি উক্ত গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। এই সকল প্রদেশে সর্ব্বসমেত ৪২৯ খানি পুস্তক ক্রয় করা হইয়াছে। হস্তলিখিত প্রাচীন পুস্তকের এরূপ অনুসন্ধান করিলে লুপ্তকল্প সংস্কৃত শাস্ত্রের বিস্তর অশ্রুতপূর্ব্ব অভিনব বিষয় আবিষ্কৃত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। স্থানে স্থানে ব্রাহ্মণদিগের ঘরে এখনও দুই একখানি পুরাতন পুস্তক সঞ্চিত আছে। কিন্তু গোঁড়া হিন্দুদের ধর্ম্মান্ধতা এ পর্য্যন্ত সর্ব্বতোভাবে তিরোহিত হয় নাই। পুস্তকের নামপ্রকাশ করিলে পাছে তাহা যবনের হস্তগত হয়, সেই ভয়ে অনেক ব্রাহ্মণ নূতন পুস্তকের নামাদি গোপন করিয়া রাখেন। পাঠক মনে করিবেন, এখনও কি ভারতবর্ষের সেদিন আছে? এখনও কি পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত হইলে যবনাদি অস্পৃশ্য জাতি দেখিবে ব্রাহ্মণেরা সে আশঙ্কা করেন? আমরা জানি, এখনও এমন লোক বিস্তর আছেন। যাহা হউক, তাঁহাদের সংখ্যা দিন দিন কম হইয়া আসিতেছে। আর অত্যল্প দিন পরেই পুস্তক মুদ্রাঙ্কণের মহৎ ফল সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। কিন্তু গোঁড়া ব্রাহ্মণদের মনের কুসংস্কার দুরীভূত হইতে হইতে তাঁহাদের নিকটস্থ পুস্তকগুলি যদি কীটাদিতে বিনষ্ট করে তবে আক্ষেপের পরিসীমা থাকিবে না। নৃশংস যবন নৃপতিদিগের অত্যাচারে সংস্কৃতের ত আর কিছুই নাই, তাহার দেহের সহস্র স্থান ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বিকলাঙ্গ হইয়া এখনও যাহা বর্ত্তমান আছে, তাহাও যদি রক্ষিত হয়, তবে মুখ তুলিয়া পরিচয় দিতে আমাদের কিছু গৌরব থাকে।

বিদ্যানুরাগী রাজপুরুষদিগের ঈদৃশ যত্ন থাকিলে বিলুপ্তপ্রায় সংস্কৃতশাস্ত্রের যে পুনরুদ্ধার হইবে, আমরা তাহা আশা করিতে পারি। কিন্তু বিলুপ্ত পুস্তকগুলি উদ্ধৃত

হইলেই সকল দিক রক্ষা হয় না। সংস্কৃত শাস্ত্রের গাঢ়রূপে অনুশীলন করা চাই। এই বহু বিস্তীর্ণ আয়াসসাধ্য বিদ্যার যে প্রণালীতে পঠনপাঠন করা আবশ্যক, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত হওয়া অবধি আর তাহা হয় না। এখন ইংরাজি ভাষাই অর্থকরী, সুতরাং তাহারই সমধিক সম্মান বাড়িয়াছে।

সংস্কৃত কালেজের ছাত্রেরা যত্নপূর্ব্বক ইংরাজি পাঠ করিয়া থাকেন, সংস্কৃতের আলোচনায় আর পূর্ব্ববৎ মনোনিবেশ করেন না। কোন প্রকারে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইতে পারিলেই হইল। সে কারণ, তাঁহারা সংস্কৃতের কেবল পল্লবগ্রাহী হন, কোন একটী শাস্ত্রে তাঁহাদের সবিশেষ বুৎপত্তি জন্মে না।

শুভঙ্কর পণ্ডিত ও আত্মারাম সরকার। ২২ চৈত্র ১২৮৮

জীবনী ইতিহাসের প্রধান অঙ্গ। জীবনবৃত্ত পাঠে বহু জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে বলিয়া সকল সুসভ্য দেশবাসিগণই প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের জীবনী সংগ্রহ করিয়া থাকেন। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স দেশে আবার যে ব্যক্তি সামান্য স্বদেশহিতকর কার্য্য বা সামান্য একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন, তাঁহারও জীবনবৃত্তান্ত মহাসমাদরে লিখিত হয়। সেই জন্য তথাকার অধিবাসীগণের এত উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে আমাদিগের দেশের জীবনবৃত্তের তত আদর ছিল না। পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণে আমরা এক্ষণে আমাদের দেশীয় গুণগ্রামসম্পন্ন ব্যক্তিগণের জীবনচরিত্র সংগ্রহ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। অভিলাষী হইয়াছি সত্য বটে, কিন্তু অস্মদ্দেশীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের বাসস্থান, জন্ম মৃত্যু কার্য্যকলাপ এত অজ্ঞাতভাবে আছে যে, নিবিড় অন্ধকারময় মণিগর্ভ হইতে রত্ন সংগ্রহ করা যেমন সুদূরপরাহত বিষয়, সে সকল কার্য্যও অবিকল তদ্রূপ অবস্থাপন্ন। তথাপি যদি কোন পাঠক ইহাদের বিষয় অবগত থাকেন, এই আশায় আমরা অদ্য সোমপ্রকাশের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

প্রথম শুভঙ্কর পণ্ডিত। শুভঙ্কর পণ্ডিত গণিতজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার সময়ে আমাদের দেশে যেরূপ গণিতের চর্চ্চা হইত, তাহাতে শুভঙ্করকে অবশ্য অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিতে হইবে। তাঁহার প্রসাদে গুরুপাঠশালার অল্পবয়স্ক ছাত্রেরা যে সকল অঙ্ক অতি অল্পক্ষণের মধ্যে মৌখিক হিসাবে করিয়া দিতে সক্ষম, বোধ করি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণ সে অঙ্ক বহুক্ষণ ধরিয়া অঙ্কপাত ভিন্ন করিতে সমর্থ হন না। লেখার গুরু শুভঙ্কর কতকগুলি অঙ্কের সূক্ষ্মনিয়ম বাহির করিয়া আর্য্যা করিয়া গিয়াছেন। আমরা সচরাচর আর্য্যাতে কাঠাকালি, জমাবন্দী, মাসমাহিনা, বৎসরমাহিনা, কড়িকষা, কাগজ কষা, ইটকালি, দেওয়ালকালি, পুষ্করিণীকালি, আসল লভ্য ও মাথট প্রভৃতি অঙ্ক দেখিতে পাই। এই অঙ্কগুলিতে সাধারণ লোকের সন্তান-

গণের কত উপকার হইয়া থাকে। যিনি সাধারণ লোকের শিক্ষার এই সদুপায় করিয়া গিয়াছেন, যাঁহার প্রসাদে অনেক ব্যক্তি ব্যবসায়াদি করিয়া সূক্ষ্মহিসাবের গুণে অনায়াসে সুখে সচ্ছন্দে প্রতারিত না হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন, তাঁহার জীবনী সংগ্রহ পূর্ব্বক সাধারণ লোকের নিকট তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করা, তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইতে দেওয়া স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তিগণের পক্ষে শ্রেয়স্কর কিনা? অনেকে "শুভঙ্কর" এই নাম শুনিয়া বলিয়া থাকেন, এটি কাল্পনিক নাম। কিন্তু শুভঙ্কর যখন তাঁহার আর্য্যার ভণিতার শেষ শুভঙ্কর দাস বলিয়া পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তখন কাল্পনিক নাম হওয়া কিরূপে সম্ভবিতে পারে? কাল্পনিক নাম হইতে "দাস" এই জাতি বা বংশজ্ঞাপক শব্দ ব্যবহৃত হইবে কেন?

আর এক কথা, শুভঙ্করের সময়ে যে সকল পাঠশালা ছিল, সেই গুরুমহাশয়-দিগের মন এত উদার ছিল না, যে তাঁহারা একটি অঙ্কের সূক্ষ্ম নিয়ম বাহির করিয়া তাহা শুভঙ্করের নামে প্রচার করিয়া দিবেন? যাঁহারা কোন প্রকারে দেশমধ্যে আপনাদের নাম জাহির করিতে ব্যতিব্যস্ত, তাঁহার নাম যে একটি কাল্পনিক হয়, তবে তাঁহার প্রণীত অঙ্কগুলি যে একজনেব নয় অনেকজনের রচিত, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। অনেকজন নানাস্থান হইতে যে এক নামেরই ভণিতা দিবেন, ইহাতে বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। তাই বলি শুভঙ্কর কাল্পনিক মনুষ্য নহেন, তিনি প্রকৃতই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

কায়স্থবংশে তাঁহার জন্ম হয়। কারণ তাঁহার প্রণীত আর্য্যায় "আশী তিলে কড়া হয় কায়স্থের পো" এইরূপ উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে শুনিতে পাওয়া যায়। সকলেই স্বজাতির শিক্ষা ও উন্নতি সাধনে যখন যত্ন করিয়া থাকেন, তখন কায়স্থের পো ও দাস এই দুই শব্দ দ্বারা স্পষ্টই বোধ হইতেছে তিনি কায়স্থ ছিলেন। তবে তাঁহার জন্মভূমি বঙ্গদেশের কোন্‌স্থানে, কোন্ সময়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেন ও কখনই বা কালগ্রাসে পতিত হন ইত্যাদি কোন বিষয়ই জানিবার উপায় দেখা যাইতেছে না। এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের কৃপায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বহুল প্রচার হইতে চলিল, এই সময়ে কষ্ট করিয়া যদি কেহ তাঁহার জীবনবৃত্ত সংগ্রহ করিতে যত্নবান হন, তবেই তাঁহার বিষয় আমরা অবগত হইতে পারিব, নতুবা অনুমানে যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহাই যথেষ্ট হইয়াছে!

দ্বিতীয় আত্মারাম সরকার। ইনি কিমিয়া বা ভোজবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। ভোজবিদ্যা এক সময়ে—এখনও অনেক স্থানে অত্যন্ত সম্মানের ও আদরের বিষয়। কথিত আছে, ভোজরাজ দুহিতা ভানুমতির সময়ে ভোজবিদ্যার চরম উন্নতি সাধিত হইয়াছিল; এজন্য অনেকে অদ্যাপি ভোজবিদ্যাকে ভানুমতির বাজী বলিয়া থাকেন। আত্মারাম সরকার ভোজবাজীকরদের পরম শত্রু ছিলেন। নিকটে যেখানে ভোজবাজী

হইত, তিনি সেখানে যাইয়া গুপ্ত রহস্যগুলি প্রকাশ করিয়া দিয়া তাহাদের জারিজুরি ভাঙ্গিয়া দিতেন। এজন্য বাজীকরেরা তাঁহাকে পরমশত্রু জ্ঞান করিত। এমন কি এখনও যখন বাজীকরেরা কোনস্থানে বাজী করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন সর্ব্বাগ্রে ভূমিতে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া তাঁহার মস্তকোপরি সজোরে তিনবার বাম পদ ঘাত করিয়া তবে বাজী করিতে থাকে। শুনিতে পাওয়া যায়, আত্মারামও কায়স্থ ছিলেন। হুগলী জেলার কোন গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। এ কথার সত্য মিথ্যা ভগবানেই বলিতে পারেন।

আজকাল দুই একজনেও "কৌতুক তরঙ্গ" "মনোহর দর্শন" ইত্যাদি নাম দিয়া বৈজ্ঞানিক রীতিতে ইউরোপীয় ভোজবাজীর পুস্তক প্রণয়ন করিতেছেন। ইহা দেখিয়া মনে মনে আশা হইতেছে, অবশ্যই কেহ না কেহ হিন্দুদিগের ভোজবাজী ও তৎসঙ্গে আত্মারাম সরকার প্রভৃতি দুই একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কিমিয়া বিদ্যানিপুণ ব্যক্তিগণের জীবনচরিত্র সংগ্রহ করিয়া হিন্দুদিগের বৈজ্ঞানিক কৌতুককর কীর্ত্তিগুলি রক্ষা করিতে যত্নশীল হইবেন।

ভাগলপুর,
তারিখ ১৬ই চৈত্র } শ্রীবিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়

বঙ্গ রঙ্গভূমি। ২ জ্যৈষ্ঠ ১১৮৯। ২৬ সংখ্যা

"চণ্ডালের হাত দিয়া পোড়াও তাহারে,
ভস্মরাশি করি ফেল কর্ম্মনাশা জলে।"

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়, বিগত চৈত্র মাসের "সোমপ্রকাশে" "নরকের ভীষণ দৃশ্য" প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে পর ক্রমে "ষ্টেটস্ম্যান" 'ইণ্ডিয়ান মিরার" ও আর্য্যদর্পণ প্রভৃতি কয়েকখানি সংবাদপত্রে উক্ত বিষয় লইয়া বিশেষ আন্দোলন চলিতেছে; কিন্তু আজিও উহাতে কোনরূপ ফল জন্মিল না, এ জন্য আজি পুনরায় উক্ত বিষয়ে দুচারিটী কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আজি আমরা অন্যান্য বিষয় পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ দেশীয় নাট্যশালা সম্বন্ধে আমাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে বাধ্য হইলাম। কারণ, ইহার আক্রমণ সংক্রামক রোগের ন্যায় ক্রমশঃ ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া দিন দিন বঙ্গদেশের অনেক সুকুমারমতি বালক ও অপরিণামদর্শী যুবককে গ্রাস করিতেছে। এই সময় রোগের প্রকৃত ঔষধ ব্যবস্থা করা চাই, নতবা অচিরকাল মধ্যে বঙ্গদেশ বিষম দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবে।

দীর্ঘকাল হইল, বঙ্গদেশে নাট্যশালা সংস্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু আজি আমরা জানিতে চাই, একালমধ্যে বঙ্গভূমি উহা দ্বারা কি উন্নতিলাভ করিল? সমাজ সংস্কারের ও দেশের হিতসাধনের ছলনায়, নীচকুলসম্ভবা, নিকৃষ্ট পশুপ্রকৃতি বারবনিতার সহযোগে বঙ্গের রঙ্গভূমিকে কলুষিত আমোদপ্রমোদ ও ঘোরতর অসভ্যতা প্রকাশের স্থান করিয়া, অনন্ত কুহকজাল বিস্তারে যাহারা দরিদ্র বঙ্গের নিকট হইতে প্রতি সপ্তাহে

রাশি রাশি অর্থ শোষণ করিতেছে, আজি আমরা সেই নীচমনা যুবকদিগের নিকট জানিতে চাই, তাহারা হতভাগ্য বঙ্গদেশের জন্য কি করিয়াছে? যে দেশ শত শত বর্ষ হইতে গভীর অন্ধকারময় অবনতির দারুণ কশাঘাতে প্রপীড়িত—দীর্ঘকাল তীব্র কশাঘাত সহ্য করিয়া আজিও যাহার হৃদয়ে বেদনা বোধ জন্মিল না—যে দেশের মৃতকল্প হৃদয়ে প্রাণ ঢালিয়া দিবার জন্য শ্রীচৈতন্য, মহাত্মা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পণ্ডিত বিদ্যাসাগর, আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ, কালীচরণ, আনন্দমোহন এবং বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র স্বরূপ গুণশালী গ্রন্থকারনিচয় এবং সহৃদয় সংবাদপত্র সম্পাদকবর্গ প্রভৃতি শত শত প্রতিভাশালী লোক আপন আপন হৃদয়ের শোণিত ঢালিয়া দিয়া আজিও যখন কিছুই ফল পাইলেন না, তখন সেই ঘোর মরুভূমি সদৃশ বঙ্গের বাঙ্গালীর জন্য কতিপয় সুরাপ্রিয়, বেশ্যাভক্ত, বেশ্যাসক্ত, পশুস্বভাব, হৃদয়বিহীন, দুর্ম্মনা ও দুষ্কর্ম্মা যুবক, সমাজ সংস্কারের ছল করিয়া, কি কাজ করিয়াছে জানিতে চাই, এবং বঙ্গের শিরোভূষণ সদৃশ কৃতবিদ্য উন্নতমনা ব্যক্তিবর্গকে বিনীতভাবে অনুরোধ করি, তাঁহারা উহাদের কার্য্যের আমুল বিচার করুন।

বঙ্গের প্রাতঃস্মরণীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়, এই কঠোর উনবিংশ শতাব্দীতে আর কতদিন আপনাদের চক্ষের উপর ভণ্ডামির জয়পতাকা উড়িতে থাকিবে? বঙ্গের রঙ্গালয়ের অবস্থা বড় শোচনীয়, বড় ভয়াবহ—উহা আমাদের দেশের শত শত ছাত্রের জীবন পঙ্কিল করিয়া তুলিয়াছে—শত শত অদূরদর্শী যুবক উহার বাহ্যসৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া জন্মেরমত উচ্ছিন্ন গিয়াছে, দিন দিন যাইতেছে এবং অতি অল্প দিনেব মধ্যে আরও কতশত যে যাইবে তাহার সংখ্যা নাই। দুই চারি বৎসর পূর্ব্বে যে সকল পবিত্রহৃদয়, সাধুস্বভাব ছাত্র, হৃদয়ের একমাত্র উপাস্য দেবতা সারস্বত শক্তির ধ্যানে দেহমন উৎসর্গ করিয়া জীবনের উচ্চআদর্শ দেখাইয়াছিল, রঙ্গালয়ের কুহকে মাতিয়া আজি তাহাদের অধিকাংশই জীবনের মহৎব্রত ভঙ্গ করিয়া প্রকাশ্যভাবে সুরা ও বেশ্যার প্রকৃত স্তাবক হইয়া উঠিয়াছে, নিশাসমাগমে যখন তাহারা পৈশাচিক বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া কলঙ্কিত হৃদয়ের দুর্দ্দম পাশবপিপাসার চরিচার্থতা মানসে দলে দলে রাস্তায় রাস্তায় পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, তখন তাহাদের আত্মার নীচগতি দর্শনে দুঃখে ও ক্ষোভে হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইয়া যায়। পূর্ব্বে একদিন যাহাদের সহিত আলাপ ও সখ্যতা করিয়া প্রীত হইতাম, অতি অল্পবয়সে তাহারাও ইহার মোহময় জালে পড়িয়া অধঃপাতে গিয়াছে—তাহাদের দুর্দ্দশা ক্ষণকালের জন্য স্মরণ হইলে চক্ষে জল আইসে। এইরূপ তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে গেলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে বর্ত্তমান রঙ্গভূমি বঙ্গের বিন্দুমাত্র হিতসাধন না করিয়া বরং সহস্র প্রকার বিষময় ফল উপাদন করিয়াছে।

নাট্যশালার অধ্যক্ষদিগের চরিত্র যেমন কলঙ্কিত, রুচিও তেমনি বিকৃত। এখন প্রায়ই নিতান্ত দুর্গন্ধময়। দুর্নীতিপরিপূর্ণ, জঘন্য হাস্য রসোদ্দীপক সামান্য সামান্য পুস্তক অভিনীত হইতেছে, যথা, কামিনীকুঞ্জ, পারুলকুঞ্জ, ডাক্তার বাবু, চক্ষুদান, উভয়সঙ্কট, চোরের উপর বাটপাড়ি ইত্যাদি। নিয়ত সুরাপানে ও বেশ্যা সংসর্গে যাহাদের সভাব পশু অপেক্ষাও নীচভাবাপন্ন হইয়াছে, তাহারা এরূপ কদর্য্য চিত্র ভদ্র দর্শকমণ্ডলীর সম্মুখে উপনীত করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? তাই বলিতেছিলাম, আর কত দিন শিক্ষিত সমাজের চক্ষে ধূলি দিয়া ভণ্ডামির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইবে?

সমাজের অনেক লোকের দৃষ্টি রঙ্গালয়ের প্রতি পতিত হওয়ায় এখন পূর্ব্বের ন্যায় অধিক পরিমাণে দর্শক জুটে না—দর্শক সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য নাট্যশালার অধ্যক্ষেরা এক আশ্চর্য্য প্রতারণার ফাঁদ পাতিয়াছে—ঘড়ি, অঙ্গুরীয়ক, চেন প্রভৃতি দ্রব্য পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া বহু সংখ্যক দর্শকের নিকট হইতে বিস্তর অর্থ শোষণ করিতেছেন—আমাদের দেশের খেলনাপ্রিয়, বালকবৎ দর্শকবৃন্দ সামান্য পুরস্কারের লোভে ভুলিয়া দলে দলে আসিয়া অর্থ দিয়া উহাদের উৎসাহ বৃদ্ধি করিতেছেন। বলিতে বড় দুঃখ হয় উহাদের মধ্যে আমাদের স্কুলের ও কলেজের ছাত্রই অধিক। সে পুরস্কারের লোভে তাঁহারা নাট্যশালার উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেছেন, তাঁহারা তাহা পান না—তাহার পরিবর্ত্তে কেহ একটী ছোট ঘণ্টা, কেহ বা কলা, কুমড়া, সন্দেশ, ছুরি বা কলম, কেহ বা একটু এসেন্স বা সামান্য একখানি জলে তোলা ছবি লইয়া হাসিতে হাসিতে গৃহে প্রত্যাগত হন—মনে করেন আট আনা বা এক টাকার টিকিটে উপরিলাভ মন্দ হইল না। ধিক্ তাহাদের বিদ্যাবুদ্ধিকে—তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখেন না, দুই একজনকে সামান্য দু'চারি পয়সা বা দু'এক আনার জিনিষ দিয়া নাট্যসমাজ কত ঠকাইয়া হইল। আমরা শুনিয়াছি যে সকল জিনিষের দু'পাঁচ টাকা মূল্য, তাহা বাহিরের লোক পায় না—তাহা নাট্যসমাজ মধ্যে বিভক্ত হয়। একথা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। আমরা জিজ্ঞাসা করি, দেশের হিত সাধিতে গিয়া এই ঘৃণিত প্রতরণা কেন? বঙ্গীয় যুবকগণ! তোমরা কত দিনে প্রকৃত মনুষ্যত্বের গৌরব করিতে শিখিবে?

নাট্যশালার ঘৃণাস্পদ অনুষ্ঠাতৃগণ! এত দিনে শিক্ষিত সমাজ তোমাদের ভণ্ডামি বুঝিয়াছেন, এজন্য তোমাদিগকে সমুচিত শিক্ষা দিতে চাহেন। অতঃপর তোমরা রঙ্গভূমি হইতে অবসর গ্রহণ কর—রঙ্গালয় পুড়িয়া ছাই হউক! নাট্যশালা যে জগতের ঘৃণার বস্তু তাহা আমরা বলি না—সময়ে সময়ে বিশুদ্ধ অভিনয়জনিত আমোদ যে বিশেষ উপকারী, তাহা আমরা বিলক্ষণ জানি কিন্তু বর্ত্তমান নাট্যশালা-গুলির অধম-স্বভাবসম্পন্ন লোকদিগের জ্ঞান ও বুদ্ধির নীচতা দেখিয়া দেখিয়া আজি

আমরা বিষম ক্ষুব্ধহৃদয়ে উহাদের বিলোপ কামনা করিতেছি। অশিক্ষিত, পশু প্রকৃতি মনুষ্য যে নাট্যালয়েব অভিনেতা এবং নরকের কীটতুল্য ঘৃণিত বেশ্যা যাহার অভিনেত্রী, তাহা বিন্দুমাত্র উন্নতির আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। এই জন্য আমরা দেশের সদ্বংশজাত, সুশিক্ষিত মহাত্মাগণের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তাঁহারা বর্ত্তমান নাট্যশালাগুলির ধ্বংস করিবার সাধ্যমত চেষ্টা পাউন। অন্যথা উহা হইতে দেশ দুর্দ্দশাপন্ন হইবে সন্দেহ নাই।

আমরা যে দিকে চাহিয়া দেখি, সেই দিকেই বিষম অভাব দেখিয়া ব্যথিত হই। এ সময় কোথায় সকলে সেই অভাব জন্য বেদনাবোধ করিবেন—কোথায় বর্ত্তমান অধ্যয়নব্রত ছাত্রদিগের হৃদয় উচ্চ বিষয়ের উচ্চ ভাবে পূর্ণ করিয়া দিবেন, না তাহার পরিবর্ত্তে লোকে নীচ নাট্যশালার উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়া ছাত্রগণের বিকাশোন্মুখ হৃদয় কলঙ্কিত করিয়া তুলিতেছেন ! লোকের রুচিকে ধন্য !! যাঁহাবা দেশের হিতের জন্য অসাধ্যসাধনে জীবন বিসর্জ্জন দিতে ভয় না পান, আমরা তাঁহাদিগকে বলি আমরা পরস্পরের সহানুভূতির পাত্র—একবার চক্ষু মেলিয়া দেখ। দেশের দুর্গতি দেখিয়া সকলের চক্ষে জল আসিবে—ঐ দেখ, যে অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত শ্বেতাঙ্গ স্বদেশে স্বীয় মুষ্টিমিত উদরান্ন সংস্থানের জন্য লালায়িত হইয়া যে মুহূর্ত্তে সমুদ্র পার হইয়া সদর্পে ভারতবক্ষে পদার্পণ করিল, সেই মুহূর্ত্তেই অতুল প্রভুশক্তি তাহাকে সাদরে আলিঙ্গন করিল—সে একজন মহারাজাধিরাজ, দাসত্ব-শৃঙ্খলাবদ্ধ সুশিক্ষিত সুবিনীত, ভদ্রসন্তান দরিদ্রতানিবন্ধন তাহার পদসেবায় রত—নবপ্রভু ইহাতেও সন্তুষ্ট নন, অপরাধে বা বিনা অপরাধে তাহার বক্ষে পদাঘাত করিতেছে—সে একটী কথাও বলিতে পাইবে না। এই ভয়ানক দৃশ্য দেখিয়া কয়জন কাঁদিতে শিখিয়াছে ? কয়জন তাহার জন্য মরিতে শিখিয়াছে ? ঐ দেখ জাতীয় জীবনেব প্রধান বল একতা বা একপ্রাণতার অভাবে দেশ উচ্ছিন্ন যাইতেছে। দেশের প্রত্যেক লোকেব শিরায় শিরায় অত্যুগ্রতেজ, মদিরা ঢালিয়া দিয়া উহাকে এক প্রাণতার অমৃতাস্বাদ ভোগ করিতে দিবার জন্য কয়জন যত্ন পাইয়া থাকে ? ঐ দেখ দুর্নীতি ও স্বার্থপরতার স্রোতে দেশ ভাসিয়া যাইতেছে—বালবিধবার চক্ষের জল না মুছাইয়া তাহার অশ্রুজল বাড়াইবার জন্য অনাথ বালক-বালিকার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইবার জন্য শত শত মনুষ্য তৃষিত নয়নে সুযোগ ও পন্থার অন্বেষণ করিতেছে—এই দৃশ্যে কয়জনেব চক্ষে জল আসিয়াছে—কয়জন ইহার প্রতিবিধানে বদ্ধপরিকর হইয়াছে ? ঐ দেখ খ্যাতনামা, লক্ষ্মী বরপুত্রসদৃশ মহাধনীর দ্বারদেশে অনাথ বালক বালিকা সাহায্য ভিক্ষায় কাঁদিতেছে—ধনী মহাশয়ের অচল অটল হৃদয় তাহাদের মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদে বিন্দুমাত্র ব্যথিত হইল না। তিনি তাহাদিগকে বিদায় করিয়া দিলেন, পরক্ষণেই তাঁহার সংসারসাগরের ধ্রুব নক্ষত্র স্বরূপ উপপত্নীর সাধের কাকাতুয়ার অন্নপ্রাশনে তিনি মুহূর্ত্ত মধ্যে ১০০০০ সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া মুক্তহস্ততার পরিচয় দিলেন! এই বীভৎস দৃশ্য দর্শনে কয়জন লোক স্তম্ভিত হইতে শিখিয়াছে ? ঐ দেখ গবর্ণমেণ্টের প্রসাদ

লোলুপ বাবু দেশীয় ভ্রাতাকে মুষ্টিমিত আহার না দিয়া উপাধি কিনিবার জন্য দলে দলে ইংরাজ মহলে ভোজ ও বিবির নাচ দিয়া ধনের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন! কয়জন লোক সাহস করিয়া এই প্রথার মূলোচ্ছেদ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন? ঐ দেখ—আফিসের ঐ বড় চাকুরে বাবু দেশের কোন মহৎ কার্য্যানুষ্ঠান উপলক্ষে সামান্য অর্থব্যয় না করিয়া জঘন্য ইন্দ্রিয়-সুখলালসা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য প্রতিমাসে স্বীয় উপপত্নীকে ১০০।১৫০।২০০ টাকা বেতন দিতেছে। কয়জন এই পাশবক্রিয়ার গতিরোধ করিতে শিখিয়াছে? এইরূপে যে দিকে দেখিবে, সেই দিকেই আমাদের অভাব, সেই দিকেই আমাদের অপূর্ণতা, সেই দিকেই আমাদের লজ্জা ও কলঙ্ক, সেই দিকেই আমাদের অমনুষ্যত্ব! এই সকল দেখিয়া কোন্ কোন্ ব্যক্তির চক্ষে জল আসিতেছে—কেহ কেহ বাঙ্গালী-জীবনে ধিক্কার দিতেছেন, লোকে অনেককষ্টে এই সকল অভাব ও অপূর্ণতার জন্য ক্রমে ক্রমে কাঁদিতে শিক্ষা করিতেছেন—এ সময় যদি কোন রঙ্গভূমি বাঙ্গালী হৃদয়ে এই সকল অভাব ও কলঙ্কের প্রতিমূর্ত্তি স্পষ্টরূপে অঙ্কিত না করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে তাহাকে নীচ হাস্যামোদ ও কলুষিত নৃত্যগীতে মাতাইয়া তাহার হৃদয়ের অনল নিবাইয়া দেয়, তবে—

"চণ্ডালের হাত দিয়া পোড়াও তাহাবে
ভস্মরাশি করি ফেল কর্ম্মনাশা জলে।"

উপসংহারকালে আমাদিগকে ১০ই এপ্রেলের ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রে প্রকাশিত 'কসমো' স্বাক্ষরকারী লেখকের অসার পত্রের দুই একটী কথার প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইতে হইল। উক্ত মহাশয় গম্ভীরভাবে বলিয়াছেন "বর্ত্তমান রঙ্গভূমি হইতে বাঙ্গালী বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছে, বিশেষতঃ কলিকাতা সমধিক উন্নতিলাভ করিয়াছে।" আমরা ঠিক ইহার বিপরীত বলিতেছি। আমরা একবার বলিয়াছি—আবশ্যক হইলে সহস্র সহস্রবার মুক্তকণ্ঠে বলিব—বর্ত্তমান নাট্যশালা হইতে বাঙ্গালির বিন্দুমাত্র উপকার হয় নাই বরং অপকার হইয়াছে—অনেক বঙ্গীয় যুবক জন্মের মত অধঃপাতে গিয়াছে। কলিকাতার সমধিক উন্নতি হয় নাই বরং পল্লীগ্রাম ও অন্যান্য স্থান অপেক্ষা কলিকাতার বিশেষ অবনতি ঘটিয়াছে—কারণ কলিকাতার ছেলেরাই অধিকপরিমাণে উচ্ছিন্ন গিয়াছে "কসমো স্বাক্ষরকারী" মহাশয় নাট্যশালায় স্ত্রীলোকের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত একটী বড আশ্চর্য্য যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলেন বাইবলে লিখিত আছে পুরুষ, স্ত্রীর পরিচ্ছদ এবং স্ত্রী, পুরুষের পরিচ্ছদ পরিধান করিতে পারিবেন না, কারণ যে ওরূপ করে, প্রভু পরমেশ্বর তাহাকে ঘৃণারচক্ষে দেখেন। আমরা "কসমো স্বাক্ষরকারী" মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি, তিনি উল্লিখিত বাক্যের প্রকৃত অর্থ কি বুঝিয়াছেন? কি জন্য ইহা লিখিত হইয়াছে তাহা আগে তিনি বুঝিয়া দেখুন। এই যুক্তির অবমাননা না করিয়াই বুঝি নাট্যশালায় স্ত্রীলোক আনা হইয়াছে? বেশ কথা আমরা দেখাইব, সে কেমন স্ত্রীলোক।—যে স্ত্রী সরলতা ও পবিত্রতার প্রিয় করিতেন, সে স্ত্রী বঙ্গ-সরসীর নয়নরঞ্জিনী প্রেমময়ী প্রফুল্ল সরোজিনী। নাট্যশালার

স্ত্রীরা তেমন স্ত্রী নহে—তাহারা পবিত্র, পরমারাধ্য রমণীকুলের কলঙ্ক, নরকের কীটতুল্য ঘৃণিত বেশ্যা—যাহাদের ছায়াস্পর্শে শরীর অপবিত্র হয়। তিনি যে বাইবলগ্রন্থের দোহাই দিয়া নাট্যশালায় স্ত্রীলোক (বেশ্যা ?) রাখিবার আবশ্যকতা প্রমাণ করিয়াছেন, আমরাও সেই পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখিয়াছি—কই তাহার কোন স্থলে ত এমন কথা লেখা নাই যে, সুরা ও বেশ্যার প্রভাবে নাট্যশালাকে কলুষিত আমোদ প্রমোদের স্থান করিতে হইবে—কই তাহাতে ত এমন কথা পাইলাম না তাহা, যাহা ভণ্ডামি করিয়া লোকের নিকট হইতে অর্থশোষণ করিতে শিক্ষা দেয়—কই তাহাতে এমন কিছুই ত পাইলাম না, যাহা দুর্নীতি ও পাপের স্রোতে দেশকে অধঃপাতে লইয়া যাইতে বলে—কই তাহাতে এমন কিছুই ত লিখি নাই, যাহা বিডন ষ্ট্রীটের পার্শ্বস্থিত রঙ্গালয়ের লোকদিগকে নীচ বেশ্যাদিগের সহিত রঙ্গভূমির প্রকাশ্য লতামণ্ডপ পার্শ্বে একত্র একাসনে উপবিষ্ট হইয়া, এক আলবোলায় সকলে মিলিয়া তামাক খাইতে খাইতে, অশ্লীল আমোদপ্রমোদ ও জঘন্য হাস্যপরিহার দ্বারা ভদ্রপথিকদিগের চক্ষু ও মনের পীড়া দিতে শিক্ষা দেয়। "কসমো" স্বাক্ষরকারী মহাশয় দিব্য সারসত্যটুকু বাইবল হইতে বাছিয়া লইয়াছেন ! আশ্চর্য্য তাঁহার শিক্ষা। তিনি যে বাইবলের ভক্ত, আমি তাহারই দোহাই দিয়া তাঁহাকে ডাকিতেছি, তিনি আসিয়া আমাদের এই পত্রের প্রতিবাদ করুন।

২১ শে বৈশাখ }
১২৮৯ }

বিনয়াবনত
শ্রীবিজয়লাল দত্ত।

রূপচাঁদ পক্ষীর গীত। ১ জ্যৈষ্ঠ ১২৯০

(সুরেন্দ্রনাথের কারাবাস উপলক্ষে রচিত। মৃত গোবিন্দ অধিকারীর নিম্নলিখিত গানের সুরে সঙ্গীতটি রচিত হইয়াছে।)

লিখিতে শিখিতে, দিলে কই।
জন্মাবধি নিরবধি জানি না শ্রীরাধা বই ॥

রাগিনীঃ জঙ্গলা ; তাল, জং।

সুরেন্দ্রনাথ, অনাথের নাথ মহাশয়।
ধর্ম্মলাগি, অনুরাগি, মহাতেজি দিগ্বিজয় ॥
করিতে ধর্ম্মের হিত, ইচ্ছা তাঁর যথোচিত,
হিতে হলো বিপরীত মনোদুখ কব কায় ॥
সরে না বাক হলাম অবাক,
আফসোসে প্রাণ ফেটে যায়।
ধর্ম্মে অনুরাগ যাঁর তাঁর হলো কারাগার
সধর্ম্মী সব দুরাচার ষড়যন্ত্রে রত হয় ॥—১

দেবলোকের রাজা ইন্দ্র নর লোকের সুরেন্দ্র বন্দ্যো
বিদ্যার প্রভাবে চন্দ্র ইন্দ্রিযদোষ মাত্র নাই।
সত্যবাদী গুণনিধি মূলেতে মাৎসর্য্য নাই
বালক পালক, বালক শিক্ষক, যুবা বালকেব বক্ষক
আজন্ম কুকর্ম্মে নাহি সক লেখক পাঠক দয়াময়।—২

শুদ্ধ শান্ত দান্ত ধীব হিতকাবী মহাবীব
বিদ্যা বুদ্ধিতে গম্ভীর,
নব্য ভবা বিজ্ঞনব সেই সুজনের পীড়নে
কার না দহে অন্তব
বালকদেব মুখ মলিন হযে যেন পিতৃহীন
রোদন করে রাত্রিদিন কান বিবন বাঁধা হয।— ৩

সুরেন্দ্র বন্দ্যোব সৌবভ অতিশয অসম্ভব
এক্ষণে হলো সম্ভব আবাল বৃদ্ধে জানলেন সব,
দেশহিতৈষী গুণরাশি মিষ্টভাষী শিষ্টবব
অপাব উদ্যোগ তাঁব কর্ত্তে আত্মার উপকার
নিজেব হয কষ্ট স্বীকাব এরূপ ধার্ম্মিক জগতে আব
হয নাই হবার নয॥—৪

কহে কবি খগপতি হায কি কালেব গতি
যাঁর স্বজাতিতে এত ভক্তি তাঁরে ভক্তি কর্ত্তে হয।
কোন কোন ক্রূরলোক বাহ্যেতে প্রকাশে শোক
অন্তরেতে গবল বয
মনেব তাদেব বড ঈর্ষ্যা দেঁতোর হাসি ভালবাসা
সাক্ষাতে কন মিষ্টভাষা ধর্ম্মনাশাব এই আশায॥

সাহিত্য ও সুরুচি। ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৯২

এক সমযে বাঙ্গালা গদ্য দেশে প্রচলিত ছিল না বলিলেই হয়। যখন যিনি যাহা লিখিতে ইচ্ছুক হইতেন, তখনই তিনি পদ্যেব আশ্রয় গ্রহণ কবিযা ছন্দোবন্দে পদ রচনা করিয়া সাধারণ সমক্ষে তাহা প্রকাশ কবিতেন। তখন মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, তখন আজকালকার

ন্যায় পুস্তক প্রচারের উপায়ও ছিল না। তখনকার বঙ্গীয় সাহিত্য সঙ্গীতেই নিবদ্ধন ছিল। কবিগণ কবিতা রচনা করিয়া দিতেন গায়কদল তাহাতে তাললয় সংযুক্ত করিয়া গাহিয়া বেড়াইতেন। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, প্রভৃতির কবিতা বাস্তবিক কবিতা নহে, কিন্তু সঙ্গীত। তখনকার কবিতার বিষয়ও একটী মাত্র ছিল ধর্ম্ম। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণ শুধু কবি বলিয়া প্রাচীন বঙ্গসমাজে গৃহীত হইতেন না; ধর্ম্মোপদেষ্টা বলিয়াও আদৃত ও পুজিত হইতেন। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসে আমরা আজকাল যে সকল অশ্লীল পদাবলী দেখিতে পাই, প্রাচীন কালের সহজ লোকেরা উহার সেই অশ্লীলতা অনুভব করিতে পারিত না, ভগবানের লীলাবর্ণনা জ্ঞান করিয়া উহা ভক্তির সহিত শ্রবণ করিত। আজকালকার মার্জ্জিত রুচি, শিক্ষিত বুদ্ধি বঙ্গ যুবকের নিকট কৃষ্ণলীলার অধিকাংশ সঙ্গীতই অশ্লীল ও অশ্রাব্য, কিন্তু যাঁহারা কৃষ্ণভক্ত পরম বৈষ্ণব, তাঁহারা এই সকল গান শুনিয়া সরল প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন। ইহা কে না দেখিয়াছে? আমরা পিতা পুত্রে, জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠে, একত্র বসিয়া এই সকল গান শুনিতে নিরতিশয় লজ্জাবোধ করি। যদি কখনোও তাহা শুনিতে সাধ যায়, তবে সমবয়স্কগণ মিলিত হইয়া তাহা শুনিয়া থাকি। কিন্তু কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব পরিবারের মধ্যে পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, স্ত্রী কন্যা, পুত্রবধূ, সকলের নিকট এই সকল কৃষ্ণলীলার গান গীত হয়, কিন্তু তাঁহারা ইহাতে সঙ্কোচ বোধ করেন না। ইহার কারণ কেবলমাত্র এই যে আমরা কৃষ্ণলীলাকে জ্ঞানের চক্ষে দেখিয়া থাকি, কিন্তু প্রকৃত বৈষ্ণবেরা তাহাকে প্রকৃত ভক্তির চক্ষে দেখিয়া থাকেন। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের লেখাতে অনেক অশ্লীল কথা থাকিলেও তখনকার লোকদিগের নীতি ও চরিত্রের উপর কেবল তাঁহাদের কবিতাদিতে কোনরূপ হীনতা আনয়ন করে নাই। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের সময়ে তাঁদের লেখা তাঁহারা নিজে, কি তাহাদের সমসাময়িক পাঠকবর্গ কেহই অশ্লীলতা দোষে দুষিত বলিয়া মনে করেন নাই, যে কুভাব আজিকার পাঠকের মনে, সেই লেখা পাঠ করিয়া ভক্তি উদ্রিক্ত হইতে পারে, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের সমসাময়িক লোকদিগের মনে তাহা যেরূপ ভাবে উদ্রিক্ত হইত বলিয়া বোধ হয় নাই।

প্রাচীনতম বাঙ্গালা কাব্যসমূহ ধর্ম্মমূলক। ধর্ম্মহীন কাব্য প্রথম বোধ হয় কবিবর ভারতচন্দ্রই বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বপ্রথমে রচনা করেন। তাঁহার অন্নদামঙ্গল, চোর পঞ্চাশৎ প্রভৃতি গ্রন্থ ধর্ম্মমুলক, কিন্তু বিদ্যাসুন্দরের সঙ্গে ধর্ম্মের কোন মূলগত সম্পর্ক নাই। তিনি যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, তখন ধর্ম্ম কাব্যসমূহই বঙ্গীয় সাহিত্য ভাণ্ডারের প্রধান রত্ন। ভারতচন্দ্র তাহাদের আদর্শ গ্রহণ না করিয়া করেন কি। তখনকার কবিতার গৃহীত সবই শরীর বর্ণনা ও শরীরজ বৃত্তিসমূহের বর্ণনা। তখনকার প্রেমের আদর্শ দেহজ প্রীতি। কবির কবিত্ব আকাশ পাতাল তোলপাড় করিয়া স্বাধীন বিহঙ্গের মত সর্ব্বত্র যাতায়াত করিয়া নানা দ্রব্য সংগ্রহ করিত সত্য, কিন্তু এই নিরতিশয়

স্বাধীনতা কবিত্বশক্তিকেও একটী একটী বিশেষ গণ্ডীর মধ্যে থাকিতে হইত। তাহার প্রধান ভাব, যাহা অন্তঃসলিলে মত তাহার রচনার শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইয়া থাকে, সে ভাব সমসাময়িক লোকমণ্ডলীর নৈতিক ও মানসিক চিন্তার শক্তি একেবারে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে না। বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, এই সমুদায়ের বিচার করিলে সর্ব্বত্র এই সত্যের প্রমাণ প্রত্যক্ষ হইবে। বেদের কবিত্ব সরল কৃষকদিগের ভারতচিন্তার গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। পুরাণাদির কবিত্ব তাহাদের রচনা কালের লোকমণ্ডলীর প্রবলতম ভাব ও চিন্তার ছায়া সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। এইরূপ প্রত্যেক মহাকাব্যে প্রত্যেক কাব্যে, কবিগণের সমসাময়িক লোকদিগের ভাব ও চিন্তার প্রাধান্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি রাধাকৃষ্ণের প্রেমের আদর্শে ভারতচন্দ্রের সময়ের লোকদিগের প্রেমের ভাব গঠিত হইয়াছিল, সুতরাং এখনকার এই প্রবলভাব ও চিন্তার গণ্ডী ভারতচন্দ্র এডাইতে পারিলেন না, এড়ান তাঁহার সাধ্যয়ত্ত ছিল না। তিনি ধর্ম্ম কাব্য লিখিতে গিযা বিদ্যাসুন্দব লিখিলেন। বিদ্যাসুন্দরের দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের নহে, কিন্তু বাঙ্গালী সমাজের অনিষ্ট ঘটিল। ভারতচন্দ্রের কাব্যে অশ্লীলতা ও কুরুচি যথেষ্ট থাকিলেও সেই সময়ে তাহা আদৃত হইয়াছিল, কেন না তখনকার লোকের কাব্যে ও কবিতার আদর্শেই এই গ্রন্থ বিবচিত হইয়াছিল।

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণের ভাব ভারতচন্দ্র প্রভৃতি গ্রহণ করিলেন, কিন্তু তাঁহাদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন না। তাহাতেই বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতির লেখাতে যে অনিষ্ট হয় নাই, ভারতচন্দ্রের কাব্যে তদপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক অনিষ্ট হইয়াছে। বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের বাল্যকালেও লেখকগণের ভদ্রতা অভদ্রতা বা সুরুচি কুরুচির প্রতি বড একটা দৃষ্টি ছিল না। ইংরাজেরা এদেশে আসিয়া যখন আসন পাতিলেন, তখন পুর্ব্বকালের রীতিঅনুসারেই বাঙ্গালা সাহিত্য সঙ্গীতে নিবদ্ধ ছিল। তারপর লোকহিতৈষী ধর্ম্মপ্রচারকগণের যত্নেই বোধ হয় সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। বাঙ্গালার প্রাচীন গ্রন্থসমূহ খ্রীষ্টানী ছাঁদের অক্ষরে মুদ্রিত; ইহা দেখিয়া সাধারণ পাঠকেরও মনে হয়, বাঙ্গালার অক্ষরের ছাঁচ প্রথমতঃ সাহেবরাই প্রস্তুত করেন শ্রীরামপুরের খ্যাতনামা মার্শম্যান প্রভৃতির বোধ হয এই রুচি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইলে তাহার অল্পদিন পরেই রীতিমত বাঙ্গালা গদ্যেরও সৃষ্টি হইল। রাজা রামমোহন রায়কেই বাঙ্গালা গদ্যের প্রধান প্রবর্ত্তক বলিয়া ধরা যায়। গদ্য বাঙ্গালা একটু একটু প্রচলিত হইতে লাগিল সত্য, কিন্তু লোকের কবিতার রুচি কমিল না। ঈশ্বর গুপ্তের অভ্যুদয় এই সময়ে, তখনকার সংবাদপত্রাদিতেও কবিতায় প্রায় পূর্ণ থাকিত। তাহার বিষয়ও কুরুচিসম্পন্ন হইত। একজন লেখককে তাঁহার প্রতিপক্ষীয় লেখকের মাতাকে গাভী সাজাইয়া একখণ্ডের লিখিত প্রতিকৃতি উপস্থিত করিয়া, যথেচ্ছা অতি নীচলোকের মত গালাগালি দিতে দেখা গিয়াছে। এই সকল অশ্রাব্য কবিতা সকল

আবার প্রকাশ্য পথিপার্শ্বে দাঁড়াইয়া পড়া হইত। কিন্তু তখনকার এই সমুদায় কুরুচিপূর্ণ লেখাতে কলিকাতার লোকেরই ইষ্টনিষ্ট যাহা হয় হইত, মফঃস্বলে এই সকল সংবাদপত্র অতি অল্প লোকে পাঠ করিত।

ক্রমেই বঙ্গীয় সাহিত্যের রুচি প্রবিবর্ত্তিত, মার্জ্জিত ও বিশুদ্ধ হইয়া আসিতেছে। ঈশ্বর গুপ্তের সময়ের সেই সকল কবিতাদি আজকাল অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর সংবাদপত্রাদিতেও স্থান পাইবে না। পাইলে লোকে তাহাকে ঘৃণার সহিত ফেলিয়া দিবে। ইহা অতি শুভলক্ষণ সন্দেহ নাই। এই রুচির উন্নতি শিক্ষার উন্নতির প্রিয়তম সহচর। শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই রুচির উন্নতি সাধিত না হইলে রুচিসম্পন্ন সাহিত্য দ্বারা দেশের ভীষণ অনিষ্ট হইবার বিশেষ আশঙ্কা আছে।

সংস্কৃত সাহিত্যে অনেক অশ্লীল গ্রন্থাদি আছে সত্য, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের পদাবলির মত সেগুলি ধর্ম্মগ্রন্থ মধ্যে পরিগণিত নহে ইহাও সত্য; কিন্তু তাহাদের দ্বারা কি প্রাচীন সময়ে কি আজকাল সমাজের লোকের আকৃতি ও সচ্চরিত্রের কোন বিঘ্ন ঘটে নাই। সংস্কৃত কখনও এদেশের লোকের সর্ব্বশ্রেণীর ভাষা ছিল না। সকলে সংস্কৃত বুঝিত না, সংস্কৃত জানিত না। এমন কি উচ্চবংশের স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত প্রাকৃত ভাষায় কথাবার্ত্তাদি বলিতেন। এ অবস্থায় সংস্কৃত অশ্লীল গ্রন্থাদিতে দেশের অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা অল্প ছিল। এই সকল গ্রন্থ পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যেই প্রচারিত ও প্রচলিত ছিল। যাঁহারা দোষভাগ পরিত্যাগ করিয়া গুণভাগ গ্রহণে সমর্থ তাঁহারাই এই সকল পুস্তকাদি পাঠ করিতেন, সুতরাং তদ্দ্বারা সেই সময়ে দেশের বড একটা অনিষ্ট ঘটিতে পারে নাই। কিন্তু আজকাল সে দিন আর নাই। সৌভাগ্যক্রমে আজকাল সহস্র সহস্র বাঙ্গালা পুস্তক, সংবাদপত্রাদি দেশে প্রতি সপ্তাহে প্রচার হইতেছে। এখন আমরা যাহা লিখি তাহা শিক্ষিত, অশিক্ষিত, যুবা বৃদ্ধ সকলেই পাঠ করেন। সুতরাং আমাদের লেখা দ্বারা-আজকাল দেশের মঙ্গলা মঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা বেশী। আজ আমাদের লেখনী নিসৃত একটী সামান্য কথা দেশশুদ্ধ লোকে লুফালুফি করিয়া গ্রহণ করে, আজকাল আমাদের লেখনীপ্রসূত প্রবন্ধাদির সদ্ভাব, অসদ্ভাব, কুরুচি সুরুচি দেশের শিরায় শিরায় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এই যখন ভাবা যায়, তখন গ্রন্থকার ও সম্পাদকের বিষম দুঃখের বিষয়। এই দায়িত্ববোধ সকল লোকের নাই। লেখনী ধারণ করা যে একটী অতি পবিত্র, অতি মহৎ কর্ম্ম, ইহা অনেকেই বোঝেন না। বুঝিলে বাঙ্গালা সাহিত্যে আজকাল রাশি রাশি পুতিগন্ধময় গ্রন্থাদির সৃষ্টি হইত না। উপদেষ্টার পদ সামান্য নহে। যিনি লেখনী ধারণ করিয়া গ্রন্থকার কি সম্পাদকরূপে জনসমাজে দণ্ডায়মান হন, তিনি ইচ্ছা করিয়া এই গুরুতর ব্রত গ্রহণ করেন। কিন্তু এ ব্রতের মর্ম্ম অনেকেই বুঝেন না। এই গুরুতর কর্ত্তব্যের ভালরূপে সাধন করিবার জন্য অপর লোকের চক্ষুতে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহাদের কার্য্যের দায়িত্ব বুঝাইয়া দিতে হয়।

আজকাল পাঠকসংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পাইয়াছে। যাহার আর কোন জীবনোপায় নাই, সেই আজকাল হাতে কলম লইয়া মস্তক কুণ্ডয়ন করিতে করিতে সম্পাদক গ্রন্থকার হইয়া দাঁড়ান। রামু শামু সকলেই ত আর ভাল কথা লিখিয়, ভালভাবে প্রাণে জাগাইয়া দিয়া, লোকের মনোরঞ্জন করিতে পারে না, সুতরাং অন্যনোপায় হইয়া পেটের দায়ে এই সকল হাতুড়ে গ্রন্থকারগণ সর্ব্বপ্রকাব অশ্রাব্য অশ্লীল ভাষায় আপন আপন পত্র বা গ্রন্থ পূর্ণ করিয়া পাঠকের নীচ প্রবৃত্তিসমূহকে জাগাইয়া লম্বা চৌড়া বিজ্ঞাপনাদি দিয়া অসভ্য দুর্নীতি ও নীচ আমোদপ্রমোদের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়। এই সকল হাতুড়ে লোকদিগের দ্বারা সমাজের যে কি অপকাব হইতেছে, তাহা বলিয়া শেষ করা অসাধ্য। এই বিষয়ে সাধারণেব শীঘ্রই বিশেষ মনোযোগ দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। আমরা দেখিয়া নিরতিশয় সুখী হইলাম, কলিকাতার পুলিষের ডেপুটি কমিশনর সাহেব এই বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া অশ্লীল পুস্তকাদির প্রচার বন্ধ করা ও এরূপ গ্রন্থাদি যাহারা লেখে তাহাদিগেকে উপযুক্তরূপে শাস্তি দিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। এই বিষয়ে একটী মকদ্দমা কলিকাতার পুলিষে চলিতেছে, তাহার বিচার শেষ হয় নাই বলিয়া আজ আমরা তৎসম্বন্ধে কোন কথা বলিব না। বিচার হইয়া গেলে আমাদের বক্তব্য প্রকাশ করিব

"বঙ্গবাসীর" দুরাকাঙ্খা। ১২ আশ্বিন ১২৯৩। ৪৫ সংখ্যা

চিঠি

"একেই বলে ধান ভানিতে শিবের গীত।" গত ২০শে ভাদ্র শনিবার তারিখের বঙ্গবাসীতে সোমপ্রকাশের সম্পাদক স্বর্গীয় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহোদয়ের যে জীবনচরিত প্রকাশিত হয়, তাহার এক স্থলে বঙ্গবাসীর সম্পাদক মনের আবেগে লিখিয়া ফেলিয়াছেন "বিদ্যাভূষণ মহাশয় বহুকাল ধরিয়া সোমপ্রকাশের সম্পাদকতা করিয়া বাঙ্গালা সংবাদপত্র পরিচালনের সূত্রপাত ও যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি করিয়া দিয়া শেষদশায় উহার সংস্রব এক প্রকার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তদবধি সোমপ্রকাশের অবনতিরও সূত্রপাত হইয়াছে। বলিতে বড় দুঃখ হয় যে হিন্দুজাতির স্বপক্ষ সর্ব্বপ্রথম সর্ব্বপ্রধান, সেই সংবাদপত্রে আজ হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধ-মত সকল প্রকাশ্যে আলোচিত ও প্রচারিত হইতেছে।"

বঙ্গবাসী সোমপ্রকাশের উপর দুইটী চায্য আনিয়াছেন। প্রথম—সোমপ্রকাশের সহিত বিদ্যাভূষণের অনেক দিন হইতে সংস্রব না থাকা—ইহার অর্থ এই সোমপ্রকাশের ক্রমে অবনতি হইয়া আসিতেছে। দ্বিতীয় চায্য এই যে এক্ষণে সোমপ্রকাশে হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধমত সকল প্রকাশ্যে আলোচিত ও প্রচারিত হয়। প্রথম চায্য খণ্ডনের জন্য আমার বক্তব্য এই যে, আজ আমার সহিত সোমপ্রকাশের ন্যূনাধিক ২০।২২ বৎসরের সংবাদ-

দাতারূপ সম্বন্ধ, সুতরাং আমি বিশেষরূপে জানি আমার পূজ্যপাদ মাননীয় অধ্যাপক স্বর্গীয় মহাত্মা দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় সোমপ্রকাশের সহিত কখনই কোন কালেই সংস্রব ত্যাগ করেন নাই। বরং তিনি মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়াও মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সোমপ্রকাশের সহিত সর্ব্বতোভাবে সংস্রব রাখিয়াছিলেন। যদিও তিনি গত কয়েক মাস হইতে স্বাস্থ্যলাভের জন্ম সাতনায় অবস্থান করিতেছিলেন, তথাপি সম্পাদকীয় স্তম্ভ তাঁহার দ্বারাই পূর্ণ হইত এবং কাগজের কোন অংশ তাঁহার অনভিমতে সম্পাদিত হইত না। বিদ্যাভূষণ মহাশয় ভূতপূর্ব্ব লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর মহামতি সার এস্‌লি ইডেনকে যে সত্য-বাক্য দান করিয়াছিলেন কখনই সে সত্যবাক্যের লঙ্ঘন করেন নাই। যে বয়সে ও যে অবস্থায় অন্যান্য সম্পাদকগণ এতাদৃশ গুরুতর কার্য্য পরিত্যাগ করিতে বাধিত হন সোম-প্রকাশের স্বর্গীয় সম্পাদক সে বয়সে ও সে সময়ে পত্রিকা সম্পাদন পরিত্যাগ করেন নাই। অতএব বঙ্গবাসী কি জন্ম যে এরূপ কৌশলময় প্রলাপ উক্তি করিয়াছেন তাহা আমি পরে দেখাইতেছি। "বিদ্যাভূষণ মহাশয় সোমপ্রকাশের সহিত সংস্রব ত্যাগ করায় উহার ক্রমে অবনতি হইয়াছে।" বঙ্গবাসীর এ কথার কোন মূল্যই নাই। বরং সোমপ্রকাশের সহিত স্বর্গীয় শ্রদ্ধাস্পদ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ৩০ বৎসরেরও অধিক সংস্রব থাকায় সোম-প্রকাশের ক্রমশই শ্রীবৃদ্ধি হইয়া কি গবর্ণমেণ্ট কি দেশীয় সকলেরই নিকট সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছেন। সোমপ্রকাশের উপর "বঙ্গবাসীর" দ্বিতীয় চার্য্যের উত্তর এই যে সোমপ্রকাশে কখনই হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধমত সকল আলোচিত বা প্রচারিত হয় নাই। কিন্তু আমার বিশ্বাস এই যে ইহাতে হিন্দুশাস্ত্রের ও হিন্দুধর্ম্মের উদার বাক্য ও মত সকলই প্রকাশিত বা আলোচিত হইয়া থাকে। বিজ্ঞ পাঠকবর্গ! বঙ্গবাসীর মনের কথাটী আরও একটু খুলিয়া বলি। সোমপ্রকাশ বিলাত প্রত্যাগত যুবকগণকে সমাজে গ্রহণ করিবার অনুকুল ব্যবস্থা অনুমোদন করিয়াছেন। ইহাকেই "বঙ্গবাসী" হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধ-মত বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন।

বিদ্যাভূষণ মহাশয় যে সোমপ্রকাশের সংস্রব ত্যাগ করেন নাই, ইহার যে ক্রমেই শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, ইহাতে যে হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধমত সকল প্রকাশিত বা আলোচিত হয় নাই, গত ১১ই শ্রাবণ তারিখের সোমপ্রকাশে লিখিত "বাবু অমৃতলাল রায় ও হিন্দুসমাজ" এই শীর্ষক প্রস্তাবটী পাঠ করিলেই আমার কথার যাথার্থ্য প্রমাণিত হইবে। উক্ত প্রস্তাবের এক স্থলে লিখিত হইয়াছে—"কেহ কেহ লাভ ক্ষতি ছাড়িয়া কেবল ধর্ম্মের দোহাই দিয়া বিলাত ফেরত যুবককে সমাজ হইতে তাড়াইতে চান। অনেকেই এই বৃদ্ধের ধর্ম্মোপদেশ অনেকবার শুনিয়াছেন, এখন যাঁহারা কৃতবিদ্য হইয়া সংবাদপত্রের সম্পাদক হইয়া ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে স্ব স্ব মত অভিব্যক্ত করিতে শিখিয়াছেন তাঁহাদের অনেককেই বিদ্যাসাগরের ক, খ, পড়িতে দেখিয়াছি—তাঁহারা একবার যেমন বৃদ্ধের কথা শুনিয়াছিলেন এখন তেমনি আর একবার শ্রবণ করুন। ম্লেচ্ছদেশে বাস, ম্লেচ্ছান্ন ভোজন ও ম্লেচ্ছ স্ত্রী গমন ইত্যাদি

জ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত করিলে শাস্ত্রানুসারে অপরাধীকে হিন্দুসমাজে গ্রহণ করা যাইতে পারে। প্রমাণের জন্য শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিবার আবশ্যক নাই। বাবু অমৃতলালকে সমাজে গ্রহণ করিবার জন্য ভট্টপল্লীবাসী পণ্ডিতবর চন্দ্রনাথ, রাখালচন্দ্র ও মধুসূদন ভট্টাচার্য্য মহোদয় প্রমুখ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ যে সকল ব্যবস্থা দিয়াছেন তাহাই আমাদের মত সমর্থনের জন্য যথেষ্ট হইবে ইত্যাদি ইত্যাদি।" পাঠকবর্গ। "অনেকেই এই বৃদ্ধের ধর্ম্মোপদেশ অনেকবার শুনিয়াছেন।" এ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণটী কি বিদ্যাভূষণ মহাশয় নন? তবেই দেখা যাইতেছে স্বর্গীয় বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সহিত ১১ই শ্রাবণ পর্য্যন্তও সোমপ্রকাশের সহিত সংশ্রব ছিল। বঙ্গবাসী নিজেই বলিয়াছেন "দ্বারকানাথ—পণ্ডিত দ্বারকানাথ শাস্ত্রজ্ঞ ইত্যাদি।" যিনি হিন্দুশাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত, যাঁহার সংস্কৃতশাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি হিন্দুধর্ম্মে যাঁহার বিলক্ষণ অধিকার ছিল, তিনি কি প্রকারে সোম-প্রকাশে হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধ মত সকল প্রকাশ্যে আলোচনা বা প্রচার করিলেন? "তাঁহারা একবার যেমন বৃদ্ধের কথা শুনিয়াছিলেন এখন তেমনি আর একবার শ্রবণ করুন" এটী সেই বহুকালের কলের জল ব্যবহারের কথা। যখন কলিকাতায় হিন্দুসমাজে কলের জল ব্যবহারের কথা সোমপ্রকাশে সর্ব্বপ্রথম আলোচিত হয়, সে সময় এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণটী বিবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া হিন্দুসমাজে কলের জল ব্যবহারের ব্যবস্থা প্রদান করেন এবং পরলোকগত সুপ্রসিদ্ধ কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর প্রভৃতি, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মত শিরোধার্য্য করিয়া কলের জল পানাদি করিতে থাকেন। তখন বঙ্গবাসী সদৃশ (যথা পরিদর্শক প্রভৃতি) হিন্দুধর্ম্ম হিন্দুশাস্ত্রানভিজ্ঞ সদ্যোজাত শিশু সম্পাদকেরা বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে অহিন্দু অশাস্ত্রজ্ঞ ম্লেচ্ছ ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করিতে ত্রুটি করেন নাই। অথচ সেই কলের জল এখন কলিকাতাস্থ হিন্দুজাতির জীবন স্বরূপ হইয়াছে। বঙ্গবাসীর বাড়াবাড়ি দেখিয়া আমার আশঙ্কা হইতেছে হয়ত তিনি কোনদিন বা কলের জল পান নিষেধ করিয়া বসেন।

পাঠকবর্গ! বঙ্গবাসীর হৃদয়ের আসল ভাবটী দুর্য্যোধনের ন্যায় দ্বৈপায়ন হ্রদে লুক্কায়িত আছে। সোমপ্রকাশের প্রতি উপরিউক্ত দুইটী চাষ্য আনিবার যে গূঢ় মতলব আছে তাহা এই—সোমপ্রকাশ বাঙ্গালা সংবাদপত্রের শিরোমণি। তার নীচেই আজকাল নববিভাকরের আসন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় ইহলোক হইতে অবসর গ্রহণ করায় বঙ্গবাসী ঐ প্রধান স্থান অধিকার করিবার মনস্থ করিয়াছেন, তাই কলেকৌশলে বলা হইয়াছে সোমপ্রকাশের আর সে কাল নাই, সে প্রভা নাই সোমপ্রকাশ অহিন্দু নাস্তিক। আপনা আপনি মস্ত হইলে মতলব সিদ্ধ হইবে না। হিতৈষী ও ব্যবসাদারী লোকে দেখিলেই বুঝিতে পারে। তাহা বুঝাইবার জন্য অধিক প্রয়াস পাইতে হয় না।

উপসংহারকালে আমার বক্তব্য এই যে সোমপ্রকাশ স্বর্গীয় বিদ্যাভূষণ মহোদয়ের বড় আদরের ধন, বড় স্নেহের সামগ্রী ছিল। তিনি মৃত্যুকালে কয়েকজন বিদ্বান পারদর্শী

চিন্তাশীল মহাত্মাহস্তে ইহার তত্ত্বাবধানের ভার দিয়া গিয়াছেন, আমি ভরসা করি তাঁহার উপযুক্ত পুত্রগণ ঐ সকল বিদ্বান পারদর্শী চিন্তাশীল মহোদয়গণের সহিত পরামর্শ করিয়া উত্তরোত্তর সোমপ্রকাশ উজ্জ্বল ও তাহার মহিমা বর্দ্ধন করিবেন।

রাণাঘাট
১১ই সেপ্টেম্বর

বশম্বদ
শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন ঘোষ।
সাং ইলছোবা মোণ্ডলাই।

সোমপ্রকাশের অধঃপতন হয় নাই। ১২ আশ্বিন ১২৯৩। ৪৫ সংখ্যা

শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদক মহাশয়! আমাদের চিরভক্তিভাজন পরলোকগত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহোদয়ের বিয়োগে আপামর সাধারণ ও দেশীয় ইংরাজি ও বাঙ্গালা সংবাদপত্র সমূহ হৃদয়ভেদী শোক প্রকাশ করিয়াছেন। হায়! যাঁহার নিকট বঙ্গদেশ ও বঙ্গভাষা চিরঋণী—যাহার তেজস্বিনী লেখনী জলদগম্ভীর ভাষায় ত্রিংশ বৎসর কাল দেশীয় কুসংস্কার, দেশাচারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছেন—ইংরাজের অবৈধ আচরণ ও অবিচারের ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়াছেন তাঁহার বিয়োগে কোন্ পাষণ্ড একবিন্দু অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারে? প্রত্যেক হৃদয়বান ব্যক্তিকেই তাঁহার জন্যে কাঁদিতে হইয়াছে। কিন্তু আজ আমরা বড়ই দুঃখিত হইলাম যে প্রত্যেক সংবাদপত্রের সঙ্গে শোকপ্রকাশ করিতে গিয়া আমাদের বালক বঙ্গবাসী বালকত্বের পরিচয় দিয়াছেন। বঙ্গবাসী এ সময় কেমন করিয়া বলিলেন যে সোমপ্রকাশের অধঃপতন হইয়াছে। পিতার বিয়োগ হইয়াছে বলিয়া কি সোমপ্রকাশের একেবারে অধঃপতন হইল? বালক বঙ্গবাসী তুমি কি জান না যে সোমপ্রকাশ তাহার ত্রিংশ বৎসর অতিক্রম করিয়াছে, যদি পিতার আশীর্ব্বাদ থাকে সন্তান নিশ্চয়ই কাটিয়া উঠিবে। পিতামাতা কাহারও চিরস্থায়ী নহে। বঙ্গবাসী কি বিশ হাজার গ্রাহক সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া কি একেবারে অহঙ্কারে কিছু দেখিতে পান না? বঙ্গবাসী কি মনে করিয়াছেন যে তিনি সকল সংবাদ-পত্রের গ্রাহকদিগকে ভাঙ্গাইয়া বিশ হাজারের উপর আরও শূন্য বাড়াইয়া লইবেন? হায়! পঞ্চানন্দ লিখিয়া লোকের কুৎসা কীর্ত্তন করিয়া ব্রহ্মকীর্ত্তি লিখিয়া যদি গ্রাহক বাড়াইতে হয় তাহা হইলে এতদিন অনেক কাগজ বিশ হাজার কেন বিশ লক্ষ গ্রাহক সংগ্রহ করিতে পারিত। পঞ্চানন্দের ছড়া বিলাসপ্রিয় উনবিংশ শতাব্দীর বাবুদিগের প্রিয়, তাই বঙ্গবাসীর গ্রাহক জুটিয়াছে—আপনার দোষ না দেখিয়া পরের দোষ কীর্ত্তনে নব্যবাবুদলের বড়ই আনন্দ—তাই বঙ্গবাসীর গ্রাহক জুটিয়াছে—হিন্দু সমাজের মধ্যে কত অনর্থ ঘটিয়া যাইতেছে—হিন্দু অভিমানী যুবক উইলসন দেবের হোটেলের রসনা-তৃপ্তিকর বিফ্‌মটন্ খাইয়া উদর পূর্ণ করিতেছেন—হিন্দু পরিবারের মধ্যে ভ্রূণহত্যার

স্রোত চলিয়াছে—কুলীন বিবাহের অত্যাচারে দেশ ছারখারে যাইতেছে—সুরার আদর দিন দিন বাড়িতেছে—বঙ্গবাসী তাহা অসন্দিগ্ধচিত্তে দেখিতে প্রস্তুত আছেন, কিন্তু দেশ, সমাজ ও ধর্ম্ম সংস্কারক ব্রাহ্ম সমাজের তিল প্রমাণ দোষ পাইলে (কোন কোন স্থলে না পাইয়াও) তাহাকে তাল করিয়া থাকেন। ৩।৪ বৎসর পুর্ব্বে যে মহাচূড়ামণির নাম কেহই জানিত না তাঁহাকেই একেবারে ধর্ম্মের নেতা পরকালের নেতা করিয়া তুলিলেন। তিনি যে কি নূতন কথা বলিয়াছেন তাহা আমরা জানি না। হিন্দু দেবমূর্ত্তির ভিতরে যে সকল গূঢভাব নিহিত আছে সে সম্বন্ধে তাঁহার মুখ হইতে কোন নূতন কথা বাহির হয় নাই। বঙ্গবাসীর পাঠকবর্গ যদি ব্রাহ্মসমাজের প্রকাশিত "সেবকের নিবেদন" পুস্তকেব প্রথম খণ্ড পাঠ করিয়া দেখেন তাহা হইলেই জানিতে পারিবেন যে সে কথা অনেক দিন পুর্ব্বে ব্রাহ্মমন্দিরের বেদী হইতে প্রচারিত হইয়াছে। ব্রাহ্ম সমাজ কেবল মূর্ত্তির বিরোধী কিন্তু মূর্ত্তিগতভাব সমূহের বিরোধী নহেন। যাহা হউক বঙ্গবাসী মনে করেন যে তিনি প্রতি সপ্তাহে গ্রাহকদিগকে কি নূতন নূতন তত্ত্ব ও সত্য প্রদান কবিতেছেন—দেশের কি একটা মহাব্রতে ব্রতী হইয়াছেন। গ্রাহক বৃদ্ধি সম্বন্ধে বঙ্গবাসীর যাহা কিছু বাহাদুরী তাহা আমাদের এবং গভীরদর্শী মহোদয়-দিগের অবিদিত নাই।

যাহা হউক আমরা এত কথা বলিতাম না, কারণ আমরা জানি যে বঙ্গবাসীর মূল্য কত দূর তাহা ভারত একদিন বুঝিতে পারিবে। সত্য কখনই গুপ্ত থাকিবেক না। তবে আজ আমাদের পরলোকগত বঙ্গবাসীর জীবনদাতা পণ্ডিতবর প্রকাশিত সোম-প্রকাশ পত্রের উপর এরূপ অযথা উক্তি প্রকাশ করাতেই আমরা আমাদের লেখনীকে কলুষিত করিয়া, সহিষ্ণুতাকে অতিক্রম করিয়া বঙ্গবাসীর সম্বন্ধে এতদূর আসিয়া পড়িয়াছি। ভরসা করি বঙ্গবাসী ও সহৃদয় পাঠকবর্গ আমাদের অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

সাহিত্য জগতের অপূর্ব্ব ছবি। ২৬ মাঘ ১২৯৩। ১১ সংখ্যা।

যে সব তরঙ্গে মত্ত হইয়া বঙ্গবাসী আদিরসে প্রাণ মাতাইয়া দিয়াছে, যে ধর্ম্ম ক্রীডায় নগর, উপনগর, 'সেতু' পয়ঃনালা পর্য্যন্ত প্রকম্পিত, সেই রসেব মধ্য দিয়া বঙ্গের ভাবুকের নয়নপথে দিব্য জাতীয় সঙ্গীতসুধা নূতন হইয়া উথলিয়া উঠিয়া ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল। বস্তুতঃ সাহিত্য জগতের ইহা প্রকৃত ছবি, ভূতলে ইহা অপূর্ব্ব আন্দোলন, আনন্দমঠ আজি আবার আমবা নূতন দেখিতেছি যেন এই সঙ্কটকালে উৎপাতের দিনে আনন্দমঠ বড়ই সময়োপযোগী হইতেছে, গ্রন্থখানিতে আমরা কিছু শিক্ষার কথা, আশার কথা শুনিবও ভাবিয়াছি। গ্রন্থ অনেক সময় শিক্ষকদের কার্য্য করিয়া থাকে বটে, কিন্তু বঙ্গে এ প্রণালীর এই নূতন সংস্করণ, এখানে এ প্রকরণে প্রভূত

দোষ, আজি কালি ভাষার দিকে উপমার দিকে ও অলঙ্কারের দিকেই অনেকের দৃষ্টি প্রখরা, ভাবের প্রতি যদি বা কখন পূর্ণ কবিত্বে জড়াইয়া ফেলেন, সেখানে কেবল কবিত্ব, সেইখানেই প্রবল কুজ্‌ঝটিকা, তাহার ভিতর রস আছে মাত্র জানিয়া ভাবিয়াই সুখী হই, আস্বাদনে আলাপনে চরিতার্থ হই না। যাহা প্রাণের ভিতর প্রবেশ করিবামাত্র হৃদয়ের ভিতরে প্রতিধ্বনি বাজিয়া উঠে, আপনি প্রতিধ্বনি ফুটে, তাহাতে গ্রন্থের ভাষা যে আদর্শ মানুষ কখনও ইহজীবনে ভুলিতে পারিবে না, যাহা উঠিতে বসিতে ভাবুক হৃদয়কে শাসিত আশ্বাসিত করিবে তাহাই ত জীবন্ত চিত্র—তাহাই প্রশংসার কথা, যাহা ভাষাপথের গোপনে থাকিয়া প্রতি পাদক্ষেপে তোমার মুখের পানে তাকাইয়া দেখে যখন তোমার পদস্খলন হইল, যতটা তুমি অনুশীল করিলে তাহা কি যদু মধুর গ্রন্থে মিলে? আদর্শের চূড়ান্ত ছবি বঙ্কিমচন্দ্ররই তুলিকায় অঙ্কিত, অন্য কোন কবি এ পথে চলিতে পারেন নাই। সাধারণতঃ বাঙ্গালা গ্রন্থ হট্ করিয়া বুট হুট করিয়া পৈতা পোড়ায়, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থে ক্রম আছে, সকল বিষয়য়েরই সময় আছে। এক ধ্রুবের দৃষ্টান্ত করিয়া সকল শিশুকেই কিন্তু কৈশোরে বৈরাগ্য শিক্ষা দেওয়া সঙ্গত নহে, দিলেও হয় না, সকলে ধ্রুব হইলে গার্হস্থ্য আশ্রম লোপ পায়। সুতরাং সকল বিষয়েরই সকল দিক দেখিয়া চলিতে হয়। এই চীন, সময়ের উপক্রমে এখন হইতে চীন দেশে বুদ্ধদেবের অহিংসা-পরমধর্ম্ম প্রচার করিলে অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্টে সম্ভাবনা থাকে না, বলিতেছি ধর্ম্ম মনুষ্যের জন্য, ধর্ম্ম উন্নতশ্রেণীর স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, পর প্রবৃত্তির পরিচর্য্যায় জ্ঞানময়ী বিদ্যা এবং মনুষ্যত্ব বিধায়ক প্রকরণের আবশ্যক সত্য, কিন্তু যে দেশ রক্ষায় সমাজ রক্ষায় জাতি রক্ষায় আত্মরক্ষায় অক্ষম, তাহার ধর্ম্ম কিসের জন্য? যাহা কোমল তাহাই ধর্ম্ম নহে, নারী-প্রকৃতি ও কোমলাপ্রবৃত্তি ধর্ম্মপ্রবৃত্তি নহে, যাহার দেশবাৎসল্য নাই, তাহার ধর্ম্মে প্রয়োজনই বা কি? নিবিড় অরণ্যরাশি কাহার রাজত্ব, রাজধানীতে বুদ্ধদেবের প্রজাদের আত্মোৎসর্গ; শ্রীচৈতন্যের স্বার্থাহুতি তাহার জন্য কেন? অগ্রে মাতৃভূমি কি, তাহা আমরা বুঝি, তাহার দুঃখের জন্য কাতর হই, তাহার সুখে লালায়িত হই, পরে বৈরাগ্য-প্রাণ ধর্ম্মের বিভূতিমণ্ডিত কৃশকায় ধীরেস্থিরে দেখিব, যে স্বদেশভক্ত হয় নাই, সে বিশ্বভক্ত হইতেই পারে না, আর ঐ বিশ্বভক্ত ওটা ত বিশ্বব্যাপিনী কথা বই ত নয়। উহার ভিতর কি আছে না আছে তাহার আমরা বড় একটা ধার ধারি না।

বাঙ্গালায় বঙ্কিমচন্দ্রের আধিপত্য বড় বেশী। বঙ্কিমচন্দ্রের এক এক গ্রন্থে এক একটী অপূর্ব্ব সঙ্কেত আছে। আনন্দমঠে নিয়তই কবির দৃষ্টি জন্মভূমি পানে। আনন্দমঠে বঙ্কিমচন্দ্র জন্মভূমিই সর্ব্বেসর্ব্বা দেখাইয়াছেন। বুঝাইয়াছেন বচনমাতার নীতির মূল লক্ষ্য ধরণীতলে মনুষ্য, আনন্দমঠে পদেপদে গ্রন্থকারের সৌন্দর্য্যময়ী কল্পনার সহিত সাক্ষাৎ হয় না বটে, কিন্তু সমগ্র আনন্দমঠ পরিদর্শনে যাঁহার দেখা পাই, তাঁহার নিকট কবিত্বকৃতিত্ব সকল হীনপ্রভ হইয়া যায়, ভূত বর্ত্তমান ভবিষ্যতের ত্রিমূর্ত্তি দেখিয়া হর্ষে

ত্রাসে আশায় উৎসাহে নাচিতে কাঁপিতে কাঁদিতে হাসিতে থাকি, ভাবরাজ্যের বহুমূল্য রত্নরাজিতে আনন্দমঠ বিভাসিত নয় বটে, কিন্তু এক সঙ্কেত ত যাহা আনন্দমঠে আছে তাহা স্পষ্টাক্ষরে স্বরেন্দ্রবিনোদিনীতে নাই, শরৎসরোজিনীতেও নাই, ভারতসঙ্গীতে কথঞ্চিন্মাত্র তাহার আভাস দেখিতে পাই। কবির কি মর্ম্মভেদী দিব্যদৃষ্টি। গ্রন্থে কেমন অভূতপূর্ব্ব ভাব, পড়িয়াই পাঠকের প্রাণে আনন্দলহরী স্বতঃই খেলাইয়া উঠে, যিনি অধ্যবসায়ের আসনে উপবিষ্ট হইয়া সমগ্র আনন্দমঠ পাঠ করিবেন, তিনি যথার্থই চরিতার্থ হইবেন, বলিতে কি এ গ্রন্থদ্বারা বঙ্গের সাহিত্যক্ষেত্র পবিত্র হইয়াছে। গ্রন্থখানি এখন আবার বিশেষরূপে বড়ই সময়োপযোগী, এই উন্নত যুগে সভ্যতা সংঘর্ষণে এক দিকে রাবণের চিতার ন্যায় স্বদন সমরানল জলিয়াই রহিয়াছে। অন্যদিকে রুদ্রের ভীষণ তীব্র জটিলকুটিল ভ্রূকুটি আয়ার্লণ্ডের রক্তপাতের প্রবল উপক্রমণিকামধ্যে দীনহীনা ভারতের কঠোর রাজশাসন এমন সময় লুপ্তপ্রায় স্বদেশভক্তি আত্মমর্য্যাদার পুনরুত্থান হইলে এ দারুণ তিমিররাশি দূর করিতে পারি। যে স্বদেশভক্ত, সে কখনই রাজদ্রোহী নহে। ইহা বিজ্ঞানসম্মত কথা ইহা স্পষ্ট কথা, এইজন্য আমরা সিপাহী সংঘর্ষকে সিপাহী যুদ্ধ বা সিপাহী বিদ্রোহ বলি। প্রাণ থাকিতে আমরা কি এতই নরাধম, এতই অকৃতজ্ঞ হইব যে যাহারা স্বদেশের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত, তাহাদের ভাষায়ও বিকৃত করিব?

রহস্যপূর্ণ আনন্দমঠ চিত্তকে কোথায় যে কতদূরে লইয়া যায়, তাহার ঠিকানা থাকে না। সম্মুখে যদি কখন আসিয়া পড়ি, তবু যেন বোধ হয় লক্ষ্যের সীমানা নাই, ধরিবই বা কি? বুঝিবই বা কি? আনন্দমঠে কেমন এক গুরুতর লক্ষ্য আছে। কেমন পবিত্র ভিত্তির উপর ইহা সংস্থাপিত। আইস ইহার নিকটে আমরা প্রণত হই।— শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু।

খবর কাগজে গ্রাহকফন্দি কাব্যছড়া। ৩ ফাল্গুন ১২৯৩

কে বলে রে হয় না গ্রাহক বাংলা কাগজের
বাংলা পত্রে হয় না প্রীতি বঙ্গ বাবুদের,
টেবিল জোড়া কাগজ লিখে—
ধাঁধা দিয়ে সবাব চখে
করবো গ্রাহক মেয়ে ছেলে যুবা বুড়োদের।
কে বলে রে হয় না গ্রাহক বাংলা কাগজের।

২

গালি দেবে সাহেব লোকে লাট গভর্ণরে
ছাড়বোনাকো গালি দিতে পাদরি পেগম্বরে,

বিশেষতঃ ব্রাহ্মগুলো—ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে মলো
আড়ে হাতে লেগে লিখ্‌বো কীর্ত্তি ব্রাহ্মদের
কে বলে রে হয় না গ্রাহক বাংলা কাগজের।

৩

পুঁথি পাঁজি লিখ্‌বো নানা লোক হাসানো মত
গ্রাহক হলে দেব তায় উপহার কত
মডেল ভ্রাতা ভগ্নী দেখে—
বাঙ্গাল[১] ইংরাজ চরিত্র লিখে
উচ্চনীতি শিখবে লোকে বাংলা দেশের,
কে বলে রে হয় না গ্রাহক বাংলা কাগজের।

৪

সর্ব্বধর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে চুড়োমণির মতে
আর কি মান্‌তে দিব লোকে নিরাকারাতে
বেদ, বাইবেল, কোরাণ ভুল নাই, সত্য একতুল
মানাব সাকার এবার যত যোগী ঋষিদের
কে বলে রে হয় না গ্রাহক বাংলা কাগজের।

৫

লিখে দিব গ্রাহক সংখ্যা পত্রশিরে আর
গ্রাহকসংখ্যা আমাদের বিংশতি হাজার
ভড়কে যাবে গ্রাহক দেখে—
দুই মুদ্রা পকেট থেকে
মণি অর্ডার করবে লোকে বঙ্গ প্রদেশের
কে বলে রে হয় না গ্রাহক বাংলা কাগজের?

৬

লিখব এবার ষড়ানন্দ পঞ্চানন্দ ছেলে
মুলুক যুড়ে হুজুক নিয়ে হয়ে হাটের নেড়ে
পাঁচু ঠাকুর লিখব বসি, এই শাস্ত্রে বঙ্গবাসী,
তবে সবে শাস্ত্র কথা পাঁচু ঠাকুরের
কে বলে রে হয় না গ্রাহক বাংলা কাগজের।

পুস্তক সমালোচনা

মহাভারত অনুবাদ। ৫ বৈশাখ ১১৬৭। ২২ সংখ্যা

শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ পুরাণসংগ্রহ নাম দিয়া মহাভারতের অনুবাদ প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমরা তাহার প্রথম খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি। এই খণ্ডে অনুক্রমণিকা অবধি করিয়া শকুন্তলার উপাখ্যান পর্য্যন্ত আছে। ইহার অনুবাদ, মুদ্রণ ও প্রচারণ বিষয়ে কালী বাবুর বহুতর অর্থব্যয় হইয়াছে। ইহার স্থানে স্থানে পাঠ করিয়া আমাদিগের যেরূপ সংস্কার জন্মিল, তাহাতে আমরা মুক্তকণ্ঠে কহিতে পারি, অর্থ ব্যয় বৃথা হয় নাই। ইহা পাঠকগণের প্রীতিকর হইবে।

কালীপ্রসন্ন বাবু সমুদয় মহাভারত অনুবাদ সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই সঙ্কল্প অতিশয় প্রশংসনীয়। এতদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিলে তিনিই যে কেবল যশস্বী হইবেন এরূপ নহে, দেশেরও বিশিষ্ট উপকার করা হইবে। মহাভারত পাঠে দণ্ডনীতি, ধর্ম্মনীতি, শিল্প বাণিজ্যাদি ঘটিত নানা বিষয়ক জ্ঞান লাভ হয়। এক্ষণে সংস্কৃত ভাষার অনুশীলনের দিন দিন অল্পতা দৃষ্টিগোচর হওয়াতে সেই জ্ঞানলাভের ব্যাঘাত উপস্থিত দেখা যাইতেছে। এ সময়ে বাঙ্গালা অনুবাদ মহোপকারের নিমিত্ত সন্দেহ নাই। এ সময়ে মহাভারত বাঙ্গালায় অনুবাদিত হইলে বাঙ্গালা দেশীয়েরা সেই অনুবাদরূপ উপায়দ্বারা উল্লিখিত জ্ঞানলাভে সমর্থ হইবেন। বিশেষতঃ ঐ অনুবাদের দ্বারা বাঙ্গলাভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন বিষয়ে সবিশেষ উপযোগিতা আছে।

আমরা কালীপ্রসন্ন বাবুর এই সৎক্রিয়ানুষ্ঠান প্রবৃত্তি দর্শন করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমাদিগের দেশীয় যে সকল ভাগ্যবান লোক অলস ও ব্যসনাসক্ত হইয়া অনর্থক অর্থ ও সময় ব্যয় করিয়া স্বজন্মভূমির দুর্নাম ক্রয় করিতেছেন, তাঁহারা যদি তাহা হইতে বিনিবৃত্ত হইয়া স্বদেশের ক্ষেমঙ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন স্বল্পকাল মধ্যে বঙ্গদেশের সবিশেষ উন্নতিলাভ হইতে পারে। আমরা তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা কালীপ্রসন্ন বাবুর এই সৎধীয়সী প্রবৃত্তিকে আদর্শ করুন।

অদ্য আমরা আর একখানি নূতন গ্রন্থের প্রচারসমাচার পাঠকগণের গোচর করিতেছি। সে গ্রন্থ রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। ঢাকা কালেজের অন্যতম ছাত্র শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ইহার সঙ্কলন করিয়াছেন। মহানুভব রামমোহন রায় ভারতভূমির প্রসূত অন্যতম রত্ন। তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্ত অনেকেই উৎসুক হইবেন সন্দেহ নাই। যাদব বাবুর সঙ্কলিত গ্রন্থ সেই ঔৎসুক্য নিবৃত্তি করিবার এক উৎকৃষ্ট উপায় হইয়াছে।

দুর্গেশনন্দিনী। ১৩ বৈশাখ ১২৭২। ২৩ সংখ্যা

এখানি ইতিহাসমূলক উপন্যাস। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি. এ. ইহার রচনা করিয়াছেন। পাঠকগণ গ্রন্থের নামটী দেখিয়া কৌতূহলাবিষ্ট হইয়াছেন সন্দেহ নাই। আমাদিগের মনেও প্রথমে কৌতুক জন্মিয়াছিল। নামটী শ্রুতিমধুর হয় নাই বটে কিন্তু বিলক্ষণ কৌতুকাবহ হইয়াছে। যদি আমরা বিপরীত অর্থ বুঝিয়া না থাকি, পাঠকগণকে এই অর্থ বুঝাইয়া দিতে পারি, গডমান্দারণ নামক দুর্গের ঈশ্বর বীরেন্দ্র সিংহ, তাঁহার কন্যা তিলোত্তমা, তিনিই এই গ্রন্থের নায়িকা।

যাঁহারা আরব্যোপন্যাস পড়িয়াছেন, আসিয়ার লোকের অদ্ভূত উপন্যাস রচনা শক্তি কেমন প্রবল, তাঁহারা তাহা জানিতে পারিয়াছেন। দুর্গেশনন্দিনী রচনাকার সেই শক্তিকে প্রতীচ্যদিগের প্রদর্শিত নৈসর্গিক রচনারীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিয়া প্রস্তাবিত উপন্যাসের সবিশেষ মনোহরতা সম্পাদন করিয়াছেন। মনোহর উপন্যাস পাঠ চিত্তকে যেরূপ আকর্ষণ করে, দুর্গেশনন্দিনী আমাদিগের চিত্তকে সেইরূপ আকর্ষণ করিয়াছিল। আমরা ঔৎসুক্যসহকারে ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি।

পাঠকালে অনেক স্থলে গ্রন্থকারের নায়ক নায়িকা প্রভৃতির রূপ বর্ণনাদি ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া আমাদিগের অন্তঃকরণ আনন্দরসে পরিপ্লুত হইয়াছে। সে স্থলে যে ব্যক্তি বা যে বস্তুর সদ্ভাব অথবা যেরূপ বর্ণনা অত্যাবশ্যক, গ্রন্থকার তত্তৎ স্থানে যথোচিতরূপে সে সকলের সন্নিবেশাদি করিয়াছেন। জগৎ সিংহের নায়কোচিত সাহসিকতা, উন্নতভাব বিনয়, আয়েষার সৌজন্য, ও বিমলার বুদ্ধিচাতুর্য্য দেখিয়া পাঠকগণের মন যেমন বিস্ময় ভক্তি ও কৌতুক প্রভাবে স্তিমিত হইবে, গজপতি দিগ্‌গজের কাপুরুষোচিত ব্যবহার দেখিয়া তেমনি অধৈর্য্য হইয়া উঠিবে সন্দেহ নাই। আয়েষার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী ওসমান জগৎসিংহের প্রতি তাঁহাকে অনুরক্ত অনুমান করিয়া ঈর্ষ্যান্বিত হন এবং নির্জ্জন অরণ্য মধ্যে জগৎসিংহকে লইয়া গিয়া তাহার প্রাণবধে উদ্যত হন। জগৎসিংহ পূর্ব্ব উপকার স্মরণ পূর্ব্বক ক্ষমা করিয়া রজঃপুত জাতিসুলভ যে মহামনস্কতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা চিকিৎসক ঔষধের সঙ্গে বিষপান করাইবেন এই পত্র পাইয়াও আলেকজাণ্ডার ঔষধ সেবন করিয়া যে মহামনস্কতা প্রকাশ করেন, তাহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। বিমলা বুদ্ধিকৌশলে দুরাত্মা কতলু খাঁর প্রাণ বধ করিয়া যেরূপে স্বামিবধবৈর শোধ এবং আপনার ও তিলোত্তমার সতীত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা দেখিলে কে না বিস্মিত হইবেন?

শুক্ল কৃষ্ণ, সুখ দুঃখ, শীত গ্রীষ্ম, পরস্পর সন্নিহিত না হইলে পরস্পরের মহিমা ও শোভা বৃদ্ধি হয় না। আমরা অতঃপর দুর্গেশনন্দিনীর দোষগুলি পার্শ্বে সন্নিবেশিত করিতে চলিলাম। এদেশের লোকের এক বিষয় লইয়া অধিক বর্ণন করিবার যে একটী রোগ আছে, গ্রন্থকার সম্পূর্ণরূপে তাহার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই। কয়েকটি

স্থানে অতিবর্ণন দোষে বিরস হইয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে পতৎপ্রকর্ষতা দোষ ঘটিয়াছে। মধ্যে মধ্যে অশ্লীলতা ও গ্রাম্যতা দোষেরও বিন্দুপাত হইয়াছে। ভাষাটীও ললিত ও সর্ব্বজন হৃদয়গ্রাহিণী হয় নাই।

যাহা হউক, যদি কেহ তুলামানে দুর্গেশনন্দিনীর গুণদোষেব পরিমাণ করেন। গুণভার গুরু হইবে সন্দেহ নাই। গ্রন্থখানি মৃজাপুর অপর সরকিউলার রোড নং ৫৮।৫ বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য এক টাকা।

সুরধুনী কাব্য। ৩ আশ্বিন ১২৭৮ ৪৪ সংখ্যা

সুরধুনী কাব্য। প্রথম ভাগ। শ্রীদীনবন্ধু মিত্র রায় বাহাদুর ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন। ভীষ্ম জননী জাহ্নবীর গোমুখী হইতে অবতারণানন্তর ত্রিবেণী পর্য্যন্ত আগমন পদ্যে বর্ণন করিয়া প্রথম ভাগের সমাপ্তি করা হইয়াছে। যে যে স্থান দিয়া গঙ্গা আসিয়াছেন, সেই সেই স্থানের নাম তাহার উৎপত্তি বিবরণ, নগরের ঐশ্বর্য্যাদি ও তদানুসঙ্গিক ইতিবৃত্ত, তত্রত্য অধিবাসিদিগের আচার ব্যবহার, এবং স্থানীয় বাণিজ্য প্রভৃতি অনেক অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় অতি সংক্ষেপে ও মনোহররূপে বর্ণিত হইয়াছে। গঙ্গার ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থান বিশেষের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে হিন্দু ধর্ম্মান্ধ ব্যক্তিদিগের যে সকল কুসংস্কার আছে, যুক্তিযুক্ত প্রমাণ ও হেতু প্রদর্শন করিযা সেগুলির অপনয় করা হইয়াছে। ফলতঃ ইহাতে ভূগোল, ইতিহাস, সাহিত্য ও পুরাণ প্রভৃতি বহু বিষয়ের একত্র সমাবেশ দ্বারা গ্রন্থকার স্বীয় বহুদর্শিতা কবিত্বশক্তি লিপিনৈপুণ্য ও ধর্ম্মতত্ত্বানুসন্ধায়িত্বের বিলক্ষণ পবিচয় প্রদান করিয়াছেন। দীনবন্ধু বাবুর এই সকল গুণ অপ্রসিদ্ধ নয়। তাঁহার কৃত নীলদর্পণ, লীলাবতী, সধবার একাদশী প্রভৃতি ইহার প্রমাণ। সুধুধনী ইহার অন্যতর কাহার অপেক্ষা কোন বিষয়ে ন্যূন, প্রত্যুত বিষয় বিশেষ ইহাতে গ্রন্থকারের অধিকতর ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে। কবিতাগুলি মিষ্ট সুরস ও কোমল হইয়াছে।

পুস্তক আলোচনা। ২০ চৈত্র ১১৭৮। ১৯ সংখ্যা

বঙ্গদেশের বাণিজ্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, দ্বিতীয় ভাগ। শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণমোহন মল্লিক ইহার সঙ্কলনকর্ত্তা। ইহাতে বস্ত্র ধাতু সুরা আহিফেন ও চা প্রভৃতি বাণিজ্য-দ্রব্যের বিষয় অতি সংক্ষেপে ও সুন্দররূপে লিখিত হইয়াছে। বঙ্গদেশের পূর্ব্বকার বাণিজ্যের অবস্থার সহিত এক্ষণকাব অবস্থার যে বহু বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয় তাহা বলা বাহুল্য। যে যে বিষয়ের সুবিধা হইলে দেশের বাণিজ্যেব শ্রীবৃদ্ধি হয়, এক্ষণে তাহার অনেকেরই সদ্ভাব দৃষ্ট হয়। এক্ষণে পথঘাটের বিলক্ষণ সুবিধা হইয়াছে। সভ্যতার বৃদ্ধির সহিত লোকেরও রুচির ও স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সুতরাং ক্রমে বাণিজ্যে

উৎকর্ষ দেখা যাইতেছে; তবে পূর্ব্বে ভারতবর্ষে যে সকল দ্রব্যের বাণিজ্য ছিল, এক্ষণে তত্তাবতেরই যে উন্নতি হইয়াছে এরূপ নয় কোন কোনটীর অবনতিও হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে সুতার বাণিজ্য যেরূপ লব্ধপ্রবেশ হইয়াছে এমন আর কোন দ্রব্যই নয়। পূর্ব্বে অন্য অন্য দেশ হইতে সুতা ও বস্ত্রাদি ভারতবর্ষে আমদানী হইত না। এদেশীয় স্ত্রীলোকেরা চরকায় সুতা কাটিত, সেই সুতায় বস্ত্রাদি প্রস্তুত হইয়া এদেশীয়দিগের অভাব মোচন হইত। সামান্য চরকার সুতায় সমুদায় দেশের বস্ত্রাদি জন্মিত, এই বাক্যে আপাততঃ কোন বিদেশীয়ের বিশ্বাস জন্মিতে না পারে। কিন্তু যাঁহারা এদেশের পূর্ব্বতন অবস্থা ভালরূপ জানেন, তাহারা এ বাক্যের প্রতি সন্দিহান হন না। এমন কি ঐ চরকা কাটা সুতার বস্ত্রে এদেশের অভাব মোচন হইয়াও উদ্বৃত্ত হইত। প্রায় এমন গৃহস্থ ছিল না যাহার বাটীতে দুই একটী চরকা দেখা না যাইত। বিধবাদিগের উহাই একমাত্র জীবনোপায় ছিল। চরকার অপেক্ষা টাকুতে উত্তম সরু সুতা প্রস্তুত হইত কিন্তু তাহা অধিক পরিমাণে হইত না। উহা বিক্রয়ের জন্য লালায়িত হইতে হইত না। ফিরিওয়ালারা দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া তুলাযন্ত্রে সুতা ওজন করিয়া নগদ মূল্য দিয়া লইয়া যাইত। পূর্ব্বে ইটালি দেশে এইরূপ ছিল, স্ত্রীলোকেরা অল্প অল্প পরিমাণে রেশম কাটিয়া সুতা প্রস্তুত করিত, তাহাতে যে বস্ত্রাদি হইত তদ্দ্বারা সমুদায় ইউরোপে অভাব পূরণ হইত। যাহা হউক পরে বিদেশীয় কলের সুতা আমদানী হইয়া অল্পমূল্যে বিক্রীত হওয়াতে ভারতবর্ষের প্রস্তুত সুতা বিক্রয়ের ব্যাঘাত জন্মিল। পরিশেষে এই দেশীয় বাণিজ্যটী এককালে উঠিয়া গেল। এক্ষণে চরকার ব্যবহার আর দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা গিয়াছে বটে, কিন্তু এই বাণিজ্যের অভূতপূর্ব্ব শ্রীবৃদ্ধি হওয়াতে দেশের মহোপকার সাধিত হইয়াছে। এক্ষণে এই সুতার বাণিজ্যের কতদূর শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, কৃষ্ণমোহন বাবুর উদ্ধৃত তালিকা দ্বারা তাহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইয়াছে। একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে। ১৮৩০-৩১ অব্দে গ্রেট ব্রিটন হইতে ২৯৪৮৭৩ টাকার সারা সুতার আমদানী হয়। ১৮৭০-৭১ অব্দে ৯৮১৬৭২১ টাকার সুতা ভারতবর্ষে আসিয়াছে। এ চল্লিশ বৎসরের মধ্যে এ বাণিজ্যের কত শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে ইহা তাহার পরিচয় দিয়া দিবে। এক্ষণে যে যে বাণিজ্যের উন্নতি হইয়াছে পূর্ব্বে তাহার কিরূপ অবস্থা ছিল, কোন্ কোন্ বাণিজ্যের অবনতি ও উন্নতি হইয়াছে এবং কি পরিমাণেই বা তাহা হইয়াছে কৃষ্ণমোহন বাবু বহু পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক নানা স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া সুন্দররূপে তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন।

"বঙ্গদর্শন"। ১১ বৈশাখ ১২৭৯। ২৩ সংখ্যা

মাসিক পত্র ও সমালোচনা। শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গভাষার যেরূপ অবস্থা ছিল, তাহার সহিত ইদানীন্তন

অবস্থার তুলনা করিয়া দেখিলে যুগপৎ বিস্ময় ও হর্ষে অভিভূত হইতে হয়। পূর্ব্বে বাঙ্গালায় গদ্য রচনা প্রণালীর পারিপাট্য ও চাতুর্য্য কিছুমাত্র ছিল না। যে সমস্ত গুণসদ্ভাব নিবন্ধন ভাষা পরিষ্কৃত হইয়া সামাজিক গুণের সন্তুষ্টি সম্পাদনের হেতুভূত হয়, বঙ্গভাষায় তৎসমুদায়ের নিতান্ত অভাব ছিল। আমাদিগের এইরূপ কথায় কেহ যেন ভারতচন্দ্র রামপ্রসাদ প্রভৃতির কবিগণের রচনা প্রণালীর প্রতি কটাক্ষ করিয়া এটী নিরবচ্ছিন্ন বাতুল প্রলাপবৎ নিরর্থক ও অযুক্তিসম্পন্ন বিবেচনা না করেন। আমরা পদ্য রচনাপ্রণালীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া এরূপ বলিতেছি না, সামাজিক জনহৃদয়গ্রাহিণী গদ্য রচনাই আমাদিগের লক্ষ্যস্থল। ভারতচন্দ্রের চিত্তবিমোহিনী বর্ণনা লোকপ্রসিদ্ধ, কিন্তু তিনি পদ্য রচনা বিষয়ে যেরূপ কুহকিনীশক্তি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, গদ্য রচনায় তাহার কিছুই দেখাইতে পারেন নাই। তৎপ্রণীত চণ্ডী নাটক আমাদিগের বাক্যের যথার্থ প্রতিপাদন করিয়া দিবে। ভারতচন্দ্র এই নাটক সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। যাহা কিছু লিখিয়াছেন, তাহাতে অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় বচনা লালিত্য কোনও অংশে প্রদর্শিত হয় নাই। প্রবোধচন্দ্রিকা ও পুরুষপবীক্ষা অন্যতর দৃষ্টান্তস্থল। এই দুই গ্রন্থের রচনা যেরূপ নিবস বর্ণনার তদ্রূপ জুগুপ্সিত। উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের রচনা প্রণালীর সহিত আধুনিক রচনাপ্রণালীর তুলনা করিয়া দেখিলে বঙ্গভাষা সমূহ পরিবর্ত্ত হইয়াছে বলিয়া প্রতীত হয়। বস্তুতঃ পুর্ব্বাপেক্ষা বঙ্গভাষাব ভূয়সী শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। এক্ষণে প্রাচীন গ্রন্থকারগণ দিন দিন নূতন নূতন পুস্তক হস্তে করিয়া বঙ্গীয সমাজে উপনীত হইতেছেন। অনেকে ইংরাজীকে আদর্শ করিয়া উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রণযন করিয়া ও সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়া মাতৃভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেছেন। অদ্য আমরা পাঠকবর্গকে শীর্ষলিখিত যে পত্রিকাখানির পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হইলাম, তাহাও উৎকৃষ্টতর ইংরাজী পত্রিকাসমূহের আদর্শানুসারে লিখিত।

যে সমুদয় ব্যক্তি বঙ্গদর্শন সম্পাদন কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহারা বঙ্গসমাজে অপ্রসিদ্ধ নহেন। ইঁহাদিগের অনেকেই লেখনীর বলে সহৃদয়গণের নিকট বিপুল প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। ঈদৃশ বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ যে সমবেত চেষ্টা হইয়া মাতৃভাষায় সৌষ্ঠব সম্পাদনার্থ অগ্রসর হইয়াছেন, এটী নিরতিশয় আহ্লাদের বিষয় সন্দেহ নাই। "বঙ্গদর্শন" সুলেখক ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিগণের রসময়ী লেখনী বিনির্গত হইবে বলিয়া অনেকেই সোৎসুক চিত্তে ইহাব প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। বৈশাখের প্রথম দিবসে সেই অভীষ্ট বঙ্গদর্শন কুতুহলপর পাঠকগণের সমক্ষে উপনীত হইল। সকলেই উৎফুল্লনয়ন হইয়া আগ্রহসহকারে বঙ্গদর্শন পাঠে প্রবৃত্ত হইলেন। আমরাও সেই আগ্রহের বশবর্ত্তী হইয়া বঙ্গদর্শনখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম; কিন্তু ক্ষোভের বিষয়, আমাদিগের মন আশানুরূপ পরিতৃপ্ত হইল না। বঙ্গদর্শনে অতৃপ্তির অনেকগুলি কারণ লক্ষিত হইল। এই কারণগুলি তিরোহিত না হইলে "বঙ্গদর্শন" কোনও কালে সহৃদয় সমাজে

আদরণীয় হইতে পারিবে না। এতন্নিবন্ধন অদ্য আমরা বঙ্গদর্শনের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

"বঙ্গদর্শন" রয়েল আটপেজী ফর্ম্মার ৪৮ পৃষ্ঠা পরিমিত। বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকাগুলি সচরাচর যেরূপ আকারের হইয়া থাকে, "বঙ্গদর্শন" তাহা অপেক্ষা অনেক অংশে বৃহৎ হইয়াছে বটে; কিন্তু উচ্চশ্রেণীর ইংরেজী পত্রিকা সমূহের অনুরূপ হয় নাই। এ অংশে "বঙ্গদর্শনে"র অবয়ব আরও পরিবর্দ্ধিত করা উচিৎ ছিল।

বঙ্গদর্শনের প্রস্তাবিত সংখ্যায় পত্রসূচনা, ভারত কলঙ্ক, কামিনী কুসুম, বিষবৃক্ষ, আমরা বড়লোক, সঙ্গীত, ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল, এবং উদ্দীপনা এই আটটী বিষয় বর্ণিত আছে। লিখিত বিষয় সমূহের মধ্যে অনেকগুলি পত্রিকানুরূপ হয় নাই। পত্রসূচনাটী অনেকাংশে যুক্তিপূর্ণ হইয়াছে সন্দেহ নাই। বাঙ্গালিগণের বাঙ্গালা পত্রিকা পাঠে অনাস্থা, তাহার কারণ, বঙ্গদর্শনের উদ্দেশ্য প্রভৃতি পত্রসূচনাতে সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে। ভারত কলঙ্কে, হিন্দুজাতির বীরত্ব, স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা, অনাস্থা, অনৈক্য প্রভৃতি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই প্রস্তাবে লেখক যে সমস্ত স্বমতপরিপোষক কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তৎসমুদয় যুক্তিবহির্ভূত হয় নাই। আমরা অনেকাংশে ইহার অনুমোদন করিতেছি। কিন্তু লেখক, মীবারবাসিগণ ভিন্ন আর সমুদয় হিন্দুকেই যে স্বাধীনতায় অনাস্থাবান্ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এটী আমরা কোনও প্রকারে স্বীকার করিতে পারিলাম না। আর্য্যজাতির ইতিহাসে স্বাধীনতার অনেক গুণগান আছে।

কামিনী কুসুম পদ্যময়। সচরাচর বাঙ্গালা পত্রিকাতে যে সমস্ত পদ্য দৃষ্ট হয়, কামিনী কুসুম তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হইল না। বিষবৃক্ষ একটা ধারাবাহিক উপন্যাস। শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এটী লিখিতেছেন। ইহার কিয়দংশ মাত্র প্রস্তাবিত সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্কিম বাবুর উপন্যাস গ্রন্থনচাতুরী সাধারণের অবিদিত নাই। তাঁহার উপন্যাস সকলেই আগ্রহ সহকারে পাঠ করিয়া থাকেন। কিন্তু বিষবৃক্ষের প্রারম্ভ দেখিয়া আমাদিগের স্পষ্ট বোধ হইল, বঙ্কিম বাবু স্বপ্রণীত দুর্গেশনন্দিনী ও কপালকুণ্ডলার ন্যায় ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। যে উপন্যাস পাঠে পাঠকের কৌতূহল উত্তরোত্তর প্রদীপ্ত হয়, তাহাতেই যথোচিতরূপে উপাখ্যান গ্রন্থনের চাতুর্য্য আছে, এটী অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। উপাখ্যান যোজনার কৌশল বিকশিত না হইলে পাঠকের কৌতূহল উদ্দীপনের সম্ভাবনা নাই। বঙ্কিম বাবু স্বপ্রণীত অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় বিষবৃক্ষে এই কৌতূহল উদ্দীপ্ত করিতে সমর্থ হন নাই। তিনি গ্রন্থের প্রারম্ভেই সমাপ্তি ফল নির্দ্দেশ করিয়া নিতান্ত অবিবেচনার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। সূচনাতেই আখ্যায়িকার সমুদয় ফল খুলিয়া বলিলে পাঠকের পাঠেচ্ছা বলবতী হওয়া সম্ভাবিত নহে। আদৌ উত্তরোত্তর উদ্ভাবনীশক্তি প্রদর্শন করিয়া পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ কর্ত্তব্য; পরিশেষে যখন প্রারম্ভ নিহিত বীজ ফলোনোন্মুখ হইবার সময় উপস্থিত হইবে, তখনই সেই

ফল নির্দ্দেশ করিয়া আখ্যায়িকার উপসংহার করা বিধেয়। কিন্তু বিষবৃক্ষ লেখক, এই চিরন্তন পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়াছেন। বীজ অঙ্কুরিত না হইতেই কি তাহার ফল লক্ষ্য করিয়া আড়ম্বর করা বিধেয়? এরূপ করিলে কি বক্তার শূন্যহৃদয়তা প্রকাশ পায় না? বিষবৃক্ষের এইরূপ গল্পবন্ধন প্রণালী নিরতিশয় অসহৃদয়তার পরিচয় প্রদান করিতেছে। লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকের এদোষ মার্জ্জনীয় নহে।

"আমরা বড়লোক" প্রস্তাবে বঙ্গদেশীয় পরিচ্ছদের বিষয় লিখিত হইয়াছে। লেখক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমাদিগের একেবারে অননুমোদনীয় নহে। কিন্তু তিনি যেরূপ রসিকতা ও বিদ্রূপ করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অরুচিকর হইয়াছে। রসিকতা প্রদর্শন সময়েও ধীরতা ও গাম্ভীর্য্য পরিত্যাগ করা বিধেয় নহে। অধৈর্য্য বিলসিত রসিকতা অসামাজিকতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই। আমরা দুঃখিত হইলাম, বঙ্গদর্শন এইরূপ অসামাজিকতা দোষে দূষিত হইয়াছে। সঙ্গীত বিষয়ক প্রস্তাব সম্বন্ধে আমাদিগের কিছুই বক্তব্য নাই। সচরাচর সঙ্গীত সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রস্তাব দৃষ্ট হইয়া থাকে, এ প্রস্তাবটীও তাহাদিগের অন্যতম সহোদর। ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল ও উদ্দীপনা প্রস্তাব দুটা মন্দ হয় নাই। লেখক, ভারতবর্ষীয়গণের উদ্দীপনা সম্বন্ধে অনেকস্থলে যথার্থ কথা বলিয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষীয়গণ যে একেবারে উদ্দীপনাবিবর্হিত ছিলেন, এটী আমরা কোনও মতে স্বীকার করিতে পারিলাম না। যাঁহারা আর্য্যজাতির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা অসঙ্কুচিতচিত্তে স্বীকার করিবেন যে পুরাতন আর্য্যগণ বক্তৃতাশক্তি (এলোকোয়েন্স্) শূন্য ছিলেন না।

বঙ্গদর্শন যে যে বিষয়ে পরিসমাপ্ত হইয়াছে, তাহা আমরা একে একে নির্দ্দেশ করিলাম। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি লিখিত বিষয় সমূহের অনেকগুলি বঙ্গদর্শনের অনুরূপ হয় নাই। "আমরা বড়লোক" "ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল" প্রভৃতি বিষয় বঙ্গদর্শনে শোভা পায় না। এরূপ সামান্য বিষয় এক্ষণে অনেক বাঙ্গালা পত্রিকাতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। বৈজ্ঞানিক রহস্য গবেষণা সম্বলিত ইতিহাস আর্য্যগণের প্রকৃত পুরাবৃত্ত, লোকবিশ্রুত দেশীয় ব্যক্তিগণের জীবন চরিত প্রভৃতি বিষয়ই বঙ্গদর্শনের অনুরূপ। এইরূপ বিষয় লিপিবদ্ধ হইলে বঙ্গদর্শন সকলের নিকট সবিশেষ আদরণীয় হইবে সন্দেহ নাই। অন্যথা বঙ্গদর্শন সাধারণ বাঙ্গালা পত্রিকা অপেক্ষা উচ্চ আসন পরিগ্রহ করিতে পারিবে না।

এক্ষণে বঙ্গদর্শনের ভাষার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। বঙ্গদর্শনের ভাষা সাধারণতঃ অনুৎকৃষ্ট হয় নাই। কিন্তু ইহাতে অনেকগুলি হৃদয়ভেদীদোষ দৃষ্ট হইল। বঙ্গদর্শনের স্থানে স্থানে যেরূপ ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে, সাধারণ লোকেও তাহা প্রয়োগ করিতে লজ্জাবোধ করিয়া থাকে। "বিবরিত" প্রভৃতি কতকগুলি ণ্যন্ত ক্রিয়ার শ্রাদ্ধ করা হইয়াছে। এগুলি বাঙ্গালায় প্রচারদ্রূপ নহে। এই ণ্যন্ত ক্রিয়া প্রয়োগ করিলেও শ্রুতিমধুর হয় না। বিবরিত স্থলে "বিবৃত" প্রয়োগ করাই অপেক্ষাকৃত যুক্তিসিদ্ধ।

"সাবধানী" "একেবারে" "কেবলমাত্র" পদগুলি দুষ্ট। এইগুলির পরিবর্ত্তে "সাবধান" "একবারে" "কেবল" অথবা "মাত্র" প্রয়োগ করা বিধেয়। "কেবল মাত্র" এই দুটী কথা একবারে প্রয়োগ করা কোনও মতে যুক্তিসঙ্গত নহে। "আমরা বড়লোক" প্রস্তাবে লেখক "সাবধানী" পদটী কি প্রকারে সিদ্ধ করিলেন, তাহা আমাদিগের ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে প্রতিভাত হইতেছে না। বিজ্ঞ ব্যক্তির এইরূপ চাঞ্চল্য অসমীক্ষ্যকারিতা প্রদর্শন নিরতিশয় লজ্জা ও ক্ষোভের বিষয় সন্দেহ নাই। "বিষবৃক্ষ" আখ্যায়িকার স্থলে "গুরু সাহেবী" বাঙ্গালা ব্যবহৃত হইয়াছে। "হাসিতেছে, ছুটিতেছে, নাচিতেচে, ঠেঙ্গান হইতেছে" প্রভৃতি ক্রিয়াগুলি এক স্থলে এরূপ অনুচিত রূপে প্রয়োগ করা হইয়াছে, যে পাঠ করিলে আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারা যায় না। এই আখ্যায়িকার লেখক অনেক স্থলে ব্যাকরণ ও ভাষার মস্তকে পদাঘাত করিয়া যাহা মনে আসিয়াছে, মুদ্রিত নয়নে তাহাই লিখিয়াছেন। "সরলতা চমৎকারা" কিরূপ বাঙ্গালা তাহা আমরা বঙ্কিম বাবুকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। দশম বর্ষীয় বালকও এইরূপ বাঙ্গালা ব্যবহার করিতে লজ্জাবোধ করিয়া থাকে। লেখক ব্যাকরণ-বিজ্ঞতা প্রদর্শন করিতে যাইয়া ভাষা ও ব্যাকরণ উভয়েরই মুণ্ড নিপাত করিয়াছেন। "পদ্ম পলাশ নয়নী" কোন্ ব্যাকরণ অনুসারে সিদ্ধ হইয়াছে? এইরূপ গৃহপুষ্ট ব্যাকরণের আঘাতে ক্ষীণাঙ্গী বাঙ্গালা ভাষাকে প্রহার করিলে আর রক্ষা নাই। "পদ্ম পলাশ নয়না"-ই বিশুদ্ধ পদ "ন ধ্যাধিক স্বরান্নাসিকোদর বর্জ্জাৎ" সূত্র ইহার যাথার্থ্য প্রতিপাদন করিতেছে। মুগ্ধবোধ টীকাকার, দুর্গাদাসও ইহার পোষকতা করিয়াছেন। কিন্তু বিষবৃক্ষ লেখক এই মতকে পদদলিত করিয়া বিলক্ষণরূপে স্বীয় স্ত্রীত্যবিজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছেন। "শ্যামাঙ্গিনী" পদটীও দুষ্ট। বহুক্ষণ ব্যাকরণের আরাধনা করিলে, এই পদটী সিদ্ধ হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা বাঙ্গালা কি সংস্কৃতে কোথাও দৃষ্ট হয় না। "শ্যামাঙ্গিনী" স্থলে শ্যামাঙ্গী লিখাই সঙ্গত। কাব্য নির্ণয়কার "চ্যুত সংস্কৃতি" "দোষের উদাহরণ স্থলে "শ্যামাঙ্গিনী" পদের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে "শ্যামাঙ্গিনী" বিশুদ্ধ তাহা নহে।

বঙ্গদর্শনের অনেক স্থলে উদাত্ত ও সমাসবহুল পদের সহিত সাধারণ ব্যবহার্য্য শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে। এইরূপ ভঙ্গ প্রক্রমতা নিতান্ত দোষবহ। আমরা উদাহরণস্থলে "মসীনিন্দিত গায়ের বর্ণ" বাক্যটা গ্রহণ করিলাম। "মসীনিন্দিত" পদের সহিত "গা" শব্দটা প্রযুক্ত হওয়াতে ভাষার কিরূপ লালিত্য বর্দ্ধিত হইয়াছে তাহা সহৃদয় পাঠকগণই বিবেচনা করিবেন। "তিনি খাওয়া দাওয়া করিয়া দুগ্ধফেণনিভ পর্য্যঙ্কে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে দুইজন অসূর্য্যম্পশ্যা কামিনী কুলিশ পাতোপমরবে ঝগড়া করিতে করিতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। এইরূপ বাঙ্গালা কর্ণে যেরূপ অমৃত বর্ষণ করিয়া থাকে "মসীনিন্দিত গায়ের বর্ণ"-ও সেইরূপ অমৃতবর্ষণ করিতেছে। আমরা জিজ্ঞাসা করি, যাহারা সুলেখক বলিয়া গণ্য, লোকে যাহাদিগের রচনার

অনুকরণে ব্যগ্র. তাঁহাদিগের এইরূপ ভাষা ব্যবহার করা কি বিধেয়? ইহাতে কি গাত্রে উষ্ণবারি নিক্ষিপ্ত হয় না? বঙ্কিম বাবু প্রভৃতি সুলেখক বলিয়া যশোলাভ করিয়াছিলেন, আক্ষেপের বিষয় এক বঙ্গদর্শনের প্রান্তরে তাঁহাদিগের সেই কীর্ত্তি মলিন হইল।

বঙ্গদর্শনে অস্পষ্টতা প্রভৃতি দোষও বিলক্ষণ দৃষ্ট হইল। "ভারত কলঙ্ক" প্রস্তাবের "ভারতবর্ষীয়দিগের এইরূপ স্বভাবসিদ্ধ স্বাতন্ত্র্যে অনাস্থার কারণানুসন্ধান করিলে তাহা দুর্জ্ঞেয়ও নহে।" "আরব্যেরা যেরূপ বিফলযত্ন হইয়াছিল গজনী নগরাধিষ্ঠাতা তুরকীয়েরা তদ্রূপ।" "নিঃশেষ বিজিত হয়।" প্রভৃতি কিরূপ বিশদ বাঙ্গালা তাহা সহৃদয়গণ বিবেচনা করিবেন। আমরা সাহস সহকারে বলিতে পারি এইরূপ অবিশদ বাঙ্গালা ব্যবহৃত হইলে ভাষার অণুমাত্র উন্নতি হইবে না। যিনি মনের কথা সুস্পষ্ট রূপে ব্যক্ত করিতে না পারেন, তাঁহার লেখনী ধারণ করা বিড়ম্বনা মাত্র। উল্লিখিত তিনটী বাক্যের এইরূপে পরিবর্ত্তন হইলে ভাষা অপেক্ষাকৃত বিশদ হইত। যথা—"ভারতবর্ষীয়গণের এইরূপ স্বভাবসিদ্ধ স্বাতন্ত্র্যে অনাস্থার কারণ দুর্জ্ঞেয় নহে।" "আরবদিগের ন্যায় গজনী নগরাধিষ্ঠাতা তুরকীয়েরাও বিফলযত্ন হইয়াছিল।" "সম্পূর্ণরূপে বিজিত হয়।" ভাষার এইরূপ অস্পষ্টতা বঙ্গদর্শনের অনেক স্থলে দৃষ্ট হইবে। বঙ্গদর্শনের স্থল বিশেষে ইংরাজী শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এগুলি অবশ্য দোষের মধ্যে পরিগণিত। "ফেসিয়ন ও পবলিক ডিনারে"র কি বাঙ্গালা শব্দ নাই? নাটক কিম্বা প্রহসনে যদি কোন ইংরাজী প্রিয় সৌখীন পুরুষের মুখ হইতে এই কথাগুলি নির্গত হইত, তাহা হইলে এটী দোষ বলিয়া গণ্য হইত না। কিন্তু বঙ্গদর্শনে যেরূপ ভাবে এই কথাগুলি প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে অবশ্য তাহা দোষ বলিয়া গণনা করিতে হইবে। যে ইংরেজী শব্দগুলির বাঙ্গালা হয় নাই অথচ ঐ ইংরেজী শব্দগুলিই সর্ব্বদা চলিত বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সেই ইংরেজী শব্দ বাঙ্গালার দুই এক স্থলে প্রযুক্ত হইলে ভাষার তাদৃশ ক্ষতি নাই। কিন্তু যাহার বাঙ্গালা আছে, তথাবিধ ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করা কোনও প্রকারে সঙ্গত নহে। যাঁহারা এইরূপ পদ্ধতির অনুসরণ করেন, তাহারা মাতৃভাষার শত্রু সন্দেহ নাই।

যাহা হউক, বঙ্গদর্শনের অনেক স্থলে নিতান্ত কদর্য্য ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে। এইরূপ বাঙ্গালা প্রচার হইলে ভাষার উন্নতি হওয়া সুদূরপরাহত। বড়লোকের লিখিত বলিয়া কেহ যেন এইরূপ ভাষার অনুকরণ না করেন। বঙ্গদর্শনের লেখকগণ লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইলেও তাঁহারা রচনা বিষয়ে যেরূপ চাপল্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অবশ্য দোষ বলিয়া গণনা করা উচিত। রচনাগত দোষ সংশোধন করা লেখকগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। অন্যথায় তাঁহারা ভবিষ্যতে সুলেখক পদবাচ্য হইতে পারিবেন না।

উপসংহার সময়ে আমাদিগের এই মাত্র বক্তব্য, যে কেহ যেন আমাদিগকে লেখকগণের বিদ্বেষ্টা বিবেচনা না করেন। আমরা বিদ্বেষের বশীভূত হইয়া দোষ প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হই নাই। অমনোযোগিতা নিবন্ধনই হউক অথবা অন্য কোন কারণেই

হউক, বঙ্গদর্শনের লেখকগণ রচনা বিষয়ে নিতান্ত অধীরতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহারা ভবিষ্যতে সাবধান হইয়া লিখুন, বঙ্গদর্শন আদরণীয় হইবে, তাঁহাদিগের কীর্ত্তিও উজ্জ্বলভাব ধারণ করিবে। বঙ্গদর্শনে বর্ণ বিন্যাস ঘটিত দোষ (স্পৃহনীয় প্রভৃতি) দৃষ্ট হইল। এ বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা বিধেয়।

শ্রী—

পুস্তক সমালোচনা। ১৫ আষাঢ় ১২৭৯। ৩৪ সংখ্যা

দ্বাদশ কবিতা। শ্রীযুক্ত বাবু দীনবন্ধু মিত্র প্রণীত। সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত

যখন এই পুস্তকখানি প্রথমতঃ অ,মাদিগের হস্তগত হয়, তখন আমরা ইহার আকৃতি দর্শন করিয়া ভাবিয়াছিলাম, বাবু দীনবন্ধু মিত্র "জামাইবারিক" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে সম্বোধন কবিয়াছেন। কিন্তু পুস্তকখানি বিদ্যাসাগরকে উৎসর্গ করা হইয়াছে। গ্রন্থকার উৎসর্গের স্থানে বলেন, "কল্পনা কাননে প্রবেশপূর্ব্বক যত্নসহকারে কয়েকটি কবিতাকুসুম চয়ন করিয়া 'দ্বাদশ কবিতা নামে এক ছড়া মালা সঙ্কলন করিয়াছি। আপনি বর্ত্তমান বঙ্গভাষাব জনক, বঙ্গভাষা আপনার তনয়া। ভক্তিসহকারে মালা ছড়াটি মহাশয়ের হস্তে অর্পণ করিলাম, যদি যোগ্য বিবেচনা করেন আপনার তনয়ার কণ্ঠে দিয়া আমাকে চরিতার্থ করিবেন।" এতদ্দর্শনে অবশ্যই পুস্তকখানি বিদ্যালয়ের পাঠের উদ্দেশ্যে লিখিত হইয়াছে উপলব্ধি হয় না। বাবু দীনবন্ধু মিত্র "কল্পনা কাননে"র কুসুম মালা চিরকাল বঙ্গভাষার কণ্ঠে রাখিতে চাহেন। আশাটী অতিশয় উচ্চ, কিন্তু রামচন্দ্রের পদরেণুতে যে প্রকার পাষাণ মানবী হয়, বিদ্যাসাগরের যদি এমত কোন অলৌকিক ক্ষমতা থাকিত তাহা হইলে "দ্বাদশ কবিতা" ভবিষ্যদ্বংশীয়দিগের পর্য্যন্ত আদরণীয় হইত, কিন্তু বিদ্যাসাগর কি করিতে পারেন? দীনবন্ধু বাবু ককপিব মালা কারয়াছেন, বিদ্যাসাগব ইহাকে গোলাপ করিতে পাবেন না। বাবু দীনবন্ধু মিত্র এ পর্য্যন্ত অনেক গ্রন্থ লিখিলেন, কিন্তু নীলদর্পণের নামটী ব্যতীত (ইহাও সাহিত্য নহে, রাজনীতি সম্বন্ধে) আর একখানিও ভবিষ্যদ্বংশীয়দিগের হস্তে যাইবে না। এটা মঙ্গলের বিষয়, কিন্তু আপাততঃ তিনি একটী অনিষ্ট করিতেছেন। এক দল কুরুচিবিশিষ্ট লোকে তাঁহাকে কবি বলিয়া জ্ঞান করেন, কেহ কেহ তাঁহার বক্র কবিতা অশ্লীলতা ও গ্রাম্য রসিকতার অনুকরণ করিতেছেন। কৃতবিদ্য মণ্ডলী অবশ্যই জামাইবারিকের ন্যায় অসম্ভব ও অশ্লীল গল্প পাঠে ঘৃণা করেন, কিন্তু যে দল অদ্যাপিও তাঁহাকে কবি মনে করেন, তাঁহাদিগের ভ্রম দূর করা কর্ত্তব্য হইতেছে।

"দ্বাদশ কবিতা" আমরা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া গ্রন্থকারের কোন গুণপনা দর্শন করিলাম না। একজন পরের ভাবচোর যুবক গ্রন্থকার মস্থর পেরণের নিকটে আপনার

কবিতা পাঠ করিতেছিলেন। পেরণ বারম্বার টুপি খোলাতে গ্রন্থকার তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, পেরণ বলিলেন "আপনি অনেক পুরাতন বন্ধুর সহিত আমার সাক্ষাৎ করাইয়া দিলেন। তাঁহাদিগকে আমি নমস্কার না করিয়া থাকিতে পারি না।" "শকুন্তলার তনয় দর্শনে দুষ্মন্তের মনের ভাব" "সূর্য্য" "প্রবাসির বিলাপ" "বন্ধু বিদায়" প্রভৃতি কবিতাগুলি পাঠ করিবার সময়ে আমাদিগকেও নমস্কার করিতে হইয়াছে।

"ভয়ঙ্কর মনোহর বিজন বিশেষ" "যায় যায় ফিরে চায়, এই বুঝি দেখা যায়, যে তরি প্রাণের বন্ধু করিছে বহন।"—(২২ পৃষ্ঠা।)

ভাব চুরির দৃষ্টান্ত অনেক দেওয়া যাইতে পারে। এক্ষণে দীনবন্ধু বাবুর দাঁতভাঙ্গা ছন্দের দুই একটী উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। পোপ বলিতেন যে, তিনি যখন আধ আধ কথা কহিতেন তখনও তাঁহার মুখে কবিতা নির্গত হইত। যথার্থ কবির লেখনী হইতে জলের ন্যায় কবিতা বহির্গত হয়, কিন্তু দীনবন্ধু বাবুর কবিতা পাঠ করিলে বোধ হয় তিনি দশ দিস্তা কাগজ নষ্ট না করিয়া আর দশ ছত্র লিখিতে পারেন না।

"এ শিশু হেরিয়ে বুক কেন ফেটে যায় রে।"

এক নিশ্বাসে যিনি এই ছত্রটী পাঠ করিতে পারেন তিনি বাহাদুর।

"বাবা বলে জুড়াইত ব্যথিত হৃদয় রে"—(২ পৃষ্ঠা)।

এটীতে কেবল অক্ষর কয়েকটীর মিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। "ব্যথিত" না "তাপিত" হৃদয়কে জুড়ান হয়? আবার দেখ: "জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতের স্থির বিবেচনা, গ্রহণ রাহুর গ্রাস করির রচনা।"

এ কি কবিতা, না কেবল জোড়ে তাড়ে কথার মিল?

"অনল বেলুনবৎ বিমল আকাশে ভাসি ভাসি প্রভাকর প্রভা পরকাশে।' (৮ পৃষ্ঠা)

"বেলুনবৎ" কথাটী কেমন শুদ্ধ ও সুশ্রাব্য। এই নিমিত্তই বঙ্গভাষাকে বেওয়ারিস বলা হইয়াছে। আবার দেখ নেপোলিয়নের কেমন বর্ণনা হইয়াছে, গ্রন্থকারের যেমত অলঙ্কার সেই প্রকার ইতিহাস জ্ঞানও আছে:

রাজ বংশে জন্ম নয়, রাজ বংশ কর,
নিজ পরাক্রমে বীর অপূর্ব্ব ভূধর,
টিরাণি করিয়ে লোপ, ভেঙ্গে পড়ে ইউরোপ,
পলকেতে পরাভূত হইল মিসর,
প্রজ্ঞার পালনে রাজা প্রজা পুজনীয়
বাহুবলে বীর কেতু বীর বরণীয়।"

"টিরাণি" পুষ্পটি কল্পনা কাননের কোন্ বৃক্ষে পাওয়া গিয়াছে? শেষ দুই ছত্রের সহিত পূর্ব্বের ছত্রের ভাগের কি সম্বন্ধ আছে তাহা আমরা ভাবিয়া পাইলাম না। কয়েকটী ছন্দ মিলাইতে হইবে, দীনবন্ধুবাবুর মনে যাহা আসিয়াছে তাহাই লিখিয়াছেন।

রেলওয়ে শকটের কি আশ্চর্য্যই বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহার উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে :

"গড গড তাড়াতাড়ি, চলিছে রেলের গাড়ী
ধারেতে নড়িছে বাড়ী, জানালায় পরে সাড়ী
রমণীরা দেখিছে।" (৬২ পৃষ্ঠা)

"জানালায় পরে সাড়ী, রমণীরা দেখিছে" কি ভয়ানক ভাব। দীনবন্ধু বাবুর মানসে বোধহয় মানসিংহের যুদ্ধযাত্রার বর্ণনা এইসময়ে উদিত হয়। তিনি কেমন গোবরের চাঁচ তুলিয়াছেন। আমাদিগের মনে এই সময়ে একজন মুসলমান গ্রাম্য কবির কথা মনে পড়িল। তিনি লেখেন :

"পঞ্চম স্বরে ডাকে কোকিল আমার
হানিফ গেছে মারা
ভণে দ্বিজ গোলাম কাদের আমি ভেবে
হলেম সারা।"

"দ্বিজ" গোলাম কাদেরের ন্যায় দীনবন্ধু বাবুর অনেক ছন্দ দেখিতে পাওয়া যাইবে। আর দুটী দৃষ্টান্ত দিয়া আমরা গ্রন্থকারের "কবিতা কুসুম চয়নে"র বিষয় শেষ করিতেছি :

"স্নেহের লতিকা সম সুশীলা ভাগিনি!
কত শত দিন গত তোমায় দেখিনি।
সেই জোড়ে তাড়ে, মিলন পুনর্ব্বার—
রেলের কল্যাণে করে, মঙ্গল সাধন হবে,
ভারতের জাতি সবে, এক মত হয়ে রবে
সুমিলনে মিলিয়ে,
সাধিতে স্বদেশ হিত, মনে হয়ে হরষিত
করে বিজ্ঞ মনোনীত, বিলাতেতে উপনীত
হবে মুখ খুলিয়ে।"

আমরা প্রার্থনা করি, ভবিষ্যতে দীনবন্ধু বাবুর ভাব না হউক অন্ততঃ কথাগুলি যেন 'সুমিলনে মিলিয়ে' যায়। "বিজ্ঞ মনোনীতের" (কাহার সাধ্য শীঘ্র ইহার অর্থ বুঝেন?) বিলাতে মুখ খুলিবার সহিত রেলওয়ে শকট বর্ণনার কি সম্বন্ধ আছে আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। এই সকল অসংলগ্ন ভাব দর্শনে আমাদিগের স্পষ্ট বোধ হইতেছে, দীনবন্ধু বাবু যখন কিছু লেখেন তাহার পূর্ব্বে চিন্তা করেন না। কথায় মিল করিতে তিনি এত ব্যস্ত হন যে ভাবের প্রতি দৃষ্টি থাকে না। কোন প্রকারে ছন্দের মিল করিয়া পরিত্রাণ পান। কবির অলঙ্কার জ্ঞান থাকা অতিশয় কর্ত্তব্য। দীনবন্ধু বাবুর তাহার কিছুই নাই। "আশার" ন্যায় মহার্থ বিষয়ের বর্ণনার সময়ে একজন সদরআলার প্রতি বিদ্রূপ

কি অতিশয় অরুচিকর নহে? চন্দ্রের বর্ণনার স্থলে নিম্নলিখিত পঙক্তিগুলি কেবল লাঠি বোধ হয়?

"ভালবাসে কুমুদিনী তোমার কিরণ,
আনন্দে প্রফুল্ল হয় পেলে দরশন,
তুমি না কি বিয়ে তারে করিয়াছ শশি?"

পুর্ব্বতন নাইট এরাণ্টগণ একজন স্ত্রীলোককে মোহিত করিবার নিমিত্ত নানাবিধ বীরত্বের কার্য্য করিতেন। সকল কাজের সময়ে উক্ত স্ত্রীলোক নাইটের মানসে অবস্থিতি করিতেন। দীনবন্ধু বাবু ছেবলা লেখক, ছেবলাদিগকে সন্তুষ্ট করা তাঁহার অভিপ্রেত। সুতরাং এই সকল অসাময়িক গ্রাম্য রসিকতা তাঁহার লেখার মধ্যে বিস্তর পাওয়া যায়। দ্বাদশ কবিতাতে যত গ্রাম্যতা আছে তাহা প্রদর্শন করিবার আমাদিগের সময় নাই, যাঁহার ধৈর্য্য গুণ বিস্তর তিনি গ্রন্থখানি পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন।

এই গ্রন্থকার অনেক গ্রন্থ লিখিলেন, কিন্তু আমরা বলিতেছি ইহার একখানিও চিরস্থায়ী হইবে না। ইউরোপের ন্যায় এখানে সাহিত্যপ্রিয় দলের ক্ষমতা থাকিলে দীনবন্ধু মিত্রের ন্যায় মুণ্ডরে কবি সধবার একাদশীর ন্যায় ঘৃণাকর গ্রন্থ লিখিবার পর আর লেখনী ধারণ করিতে সাহসী হইতেন না। বঙ্গদেশ বলিয়াই এখনও তিনি লিখিতেছেন। দ্বাদশ কবিতার ন্যায় কুসুম (?) মালা যে দিবস বঙ্গভাষার কণ্ঠে ধারণ করিতে হইবে সে দিন দুর্ভাগ্যের হইবে। বিদ্যাসাগর স্বহস্তে তুলিয়া দিলেও বঙ্গভাষা মস্তক অবনত করিবেন না।

পুস্তক সমালোচনা। ১৯ চৈত্র ১২৭৯। ২০ সংখ্যা

হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা। শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু প্রণীত। কলিকাতা জাতীয় যন্ত্রে মুদ্রিত।

এই গ্রন্থখানি সময়োচিত হইয়াছে। এক্ষণকার যুবকেরা বিষম অবস্থায় পতিত হইয়াছেন। ইঁহাদিগের অধিকাংশ বাল্যকাল অবধি কেবল ইংরাজী অধ্যয়ন করিয়াছেন। তাহাতেই সমুদায় সময় অতিবাহিত হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্মে কি সার আছে, তাহা জানিতে না পারিয়া কতকগুলি কেশব মতাবলম্বী হইতেছেন, কতকগুলি খৃষ্টধর্ম্মের শরণ লইতেছেন, কতকগুলি কোন্ ধর্ম্ম অবলম্বন করিবেন, তাহা বুঝিতে না পারিয়া অস্থির হইয়া বেড়াইতেছেন। অতএব এ সময়ে রাজনারায়ণ বাবু হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়া হিন্দুসমাজের যে কি মহোপকার সাধন করিয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ইহা সমুদ্রমগ্ন ব্যক্তির আশ্রয়ফলক তুল্য হইবে সন্দেহ নাই। হিন্দুধর্ম্মের তুল্য উদার ধর্ম্ম আর নাই। যিনি যে ভাবে ঈশ্বরের আরাধনা করিতে চান, সেই ভাবেই করিতে পারেন এমন উদার ব্যবস্থা কি আর কোন ধর্ম্মে আছে? ধর্ম্মনীতির উপদেশ বিষয়েও ইহা

অন্য কোন ধর্ম্মের অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। ইহার মূলও ঈশ্বরে অনুস্যূত। যে ধর্ম্মের মূল ঈশ্বরে অনুস্যূত না হয়, তাহা লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইতে পারে না। ইহার একটী উৎকৃষ্ট প্রমাণ এই সে দিন ইণ্ডিয়ান মিরর আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন কৈশব সম্প্রদায়ের অধিকাংশ ব্যক্তি তৎ সম্প্রদায় পরিত্যাগ করিতেছেন। এ অবস্থায় হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদক গ্রন্থ যুবকদিগের ভ্রান্তি নিরাসের যে মহৌষধ হইবে, সে বিষয়ে সংশয় নাই। রাজনারায়ণ বাবু যে যে যুক্তিদ্বারা হিন্দু ধর্ম্মেব শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়াছেন, নিম্নে তাহার কয়েকটা উদ্ধৃত হইল।

"প্রথমতঃ, হিন্দুধর্ম্মের নাম কোন ব্যক্তিবিশেষের নামমূলক নহে। যেমন বৌদ্ধ, খৃষ্টীয় ও মহম্মদীয় ধর্ম্ম বুদ্ধ, খৃষ্ট ও মহম্মদের নামে প্রচলিত, হিন্দুধর্ম্ম তেমন কোন ব্যক্তি বিশেষের নামে প্রচলিত নহে। ইহা দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের প্রশস্ততা প্রমাণীকৃত হইতেছে। ধর্ম্ম সনাতন পদার্থ, তাহার নাম কোন ব্যক্তির নামে হওয়া উচিত নহে। এই জন্য হিন্দুরা আপনাদিগের ধর্ম্মকে সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া ডাকেন এবং কোন ব্যক্তির নামে আপনাদিগের ধর্ম্মের নামকরণ করেন নাই।

দ্বিতীয়তঃ, হিন্দুধর্ম্ম ব্রহ্মের অবতার স্বীকার করে না। হিন্দুধর্ম্মে বিষ্ণু শিব প্রভৃতি দেবতার বহুল অবতারেব কথা কথিত হইয়াছে কিন্তু তাহা এমন বলে না যে অনাদ্যনন্ত নির্ব্বিকার পরব্রহ্ম কোন মানবীয় গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

তৃতীয়তঃ, হিন্দুধর্ম্ম কোন মধ্যবর্ত্তী অর্থাৎ পেযগম্বব স্বীকার করেন না। খৃষ্টানেরা যেমন প্রত্যেক প্রার্থনার শেষে, প্রভু ও পরিত্রাতা ইশু দ্বাবা তুমি আমাকে পরিত্রাণ কব বলে হিন্দুরা সে প্রকার বলে না।

চতুর্থতঃ, আর একটী বিষয়ে হিন্দুধর্ম্ম অন্যান্য ধর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাহা এই, ইহাতে ঈশ্বরকে হৃদয়স্থিত জানিয়া উপাসনা করিবার উপদেশ আছে। কি বাইবল কি কোরাণ, কি আর কোন ধর্ম্ম শাস্ত্র, কোথাও এরূপ উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এইটী হিন্দু ধর্ম্মের প্রধান গৌরবস্থল। ঈশ্বরকে হৃদয়স্থিত করিয়া দেখিলে ঈশ্বরকে যেমন নিকট করিয়া দেখা হয় তেমন অন্য প্রকারে দেখা হয় না।

পঞ্চমতঃ, হিন্দুধর্ম্ম অন্যান্য ধর্ম্ম অপেক্ষা এই বিষয়ে শ্রেষ্ঠ যে ইহাতে ঈশ্বরের সহিত যোগের উপদেশ আছে। যোগের বিষয় হিন্দুশাস্ত্রে যেমন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচারিত নিয়মিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে এমন আর কোন জাতির ধর্ম্মশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না। আমি সে যোগের কথা বলিতেছি না যাহাতে সংসাব ত্যাগ করিয়া বনে যাইতে হয়। যে যোগ সংসারে থাকিয়া হয়, তাহাই শ্রেষ্ঠ যোগ।

ষষ্ঠতঃ, হিন্দুধর্ম্মের আর একটী চমৎকার লক্ষণ এই যে তাহাতে নিষ্কাম উপাসনার বিধি আছে। হিন্দুধর্ম্মে সকাম নিষ্কাম, দুই প্রকার উপাসনারই বিধি আছে কিন্তু অন্যান্য ধর্ম্মে আদবে নিষ্কাম উপাসনার কথা নাই। হিন্দুশাস্ত্র নিষ্কাম উপাসনাকে শ্রেষ্ঠ উপাসনা

বলিয়াছেন অন্য সকল ধর্ম্মে কেবল পারলৌকিক সুখ প্রত্যাশায় ধর্ম্মানুষ্ঠানের বিধান দৃষ্ট হয়। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের প্রধান উপদেশ এই যে কোন ফল কামনা না করিয়া কেবল ঈশ্বরের উপাসনা করিবে। ধর্ম্মের নিমিত্তই ধর্ম্ম সাধন করিবে।

সপ্তমতঃ, হিন্দুধর্ম্ম অন্যান্য ধর্ম্ম অপেক্ষা আর এক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ এই, উহাতে সর্ব্বভূতের প্রতি দয়া করিবার উপদেশ আছে। বাইবেল ও কোরাণে কেবল মনুষ্যের প্রতি দয়া করিতে উপদেশ দেয়। হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশ এই যে সর্ব্বভূতের হিতসাধন করিবে। হিন্দুশাস্ত্রকারদিগের দৃষ্টি এই বিষয় কেবল মনুষ্যের প্রতি নিবদ্ধ ছিল না। পশু পক্ষী জীবন মাত্রেই উহা বিস্তারিত ছিল। মা হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি, সর্ব্বভূত হিতে রতঃ ইত্যাদি বাক্য ইহার প্রমাণ।

অষ্টমতঃ, পরকালসম্বন্ধীয় মতে হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব বিশেষ প্রকাশিত আছে। যোনি ভ্রমণ অর্থাৎ পাপী মনুষ্য মৃত্যুর পর পশুযোনিতে অথবা কীট যোনিতে অথবা মনুষ্য যোনিতে জন্মগ্রহণ করিবে, এইমত পরকাল বিষয়ক হিন্দুধর্ম্ম মতের নিকৃষ্ট অংশ। কিন্তু দেখ ইহাতেও হিন্দুধর্ম্মের কেমন শ্রেষ্ঠতা প্রকাশ পাইতেছে। মুসলমান ও খৃষ্টানধর্ম্মে অনন্ত স্বর্গ ও অনন্ত নরকের কথা আছে। পুণ্যবান ব্যক্তি অনন্ত কাল স্বর্গ ভোগ করিবে। পাপী ব্যক্তি অনন্তকাল নরকে পতিত থাকিবে। ইহাতে পাপী মনুষ্যের আর পরিত্রাণের আশা থাকে না। কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম এই আশা প্রদান করিতেছেন যে যোনি ভ্রমণ দ্বারা পাপী ব্যক্তির পাপ ক্ষয় হইলে সে পুনরায় উন্নতির পথে সংস্থাপিত হইবে। এ মত সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, কিন্তু উহা যে পুর্ব্বোল্লিখিত মত অপেক্ষা ঈশ্বরের ন্যায় ও করুণাভাবের সঙ্গে অধিক সঙ্গত তাহার আর সন্দেহ নাই।

নবমতঃ, হিন্দুধর্ম্মের ঔদার্য্য সর্ব্ব ধর্ম্মাপেক্ষা অধিক। খৃষ্টীয় ও মহম্মদীয় ধর্ম্মাবলম্বীরা বলে যে আমার এই ধর্ম্মটী না মানিলে তুমি অনন্ত নরকে পড়িবে, হিন্দুধর্ম্মের ভাব তেমন নয়। হিন্দুধর্ম্মের মুখ্য উপদেশ এই যে, যাহার যে ধর্ম্ম সে ব্যক্তি সেই ধর্ম্ম সর্ব্বপ্রকারে পালন করিলেই উদ্ধার হইবে।

দশমতঃ, হিন্দুধর্ম্ম অন্যান্য ধর্ম্ম অপেক্ষা এই বিষয়ে শ্রেষ্ঠ যে এই ধর্ম্মে জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে ঈশ্বরের স্মরণ করিবার বিধান দেখা যায়।

একাদশতঃ, অন্যান্য ধর্ম্মাপেক্ষা হিন্দুধর্ম্ম এই বিষয়ে শ্রেষ্ঠ যে হিন্দুদিগের সকল কার্য্য ধর্ম্মের অনুশাসনানুসারে সম্পাদিত হয়। কোন মহাশয় ব্যক্তি যথার্থই বলিয়াছেন যে, হিন্দুগণ ধর্ম্মানুসারে আহার করেন, ধর্ম্মানুসারে পান করেন, ধর্ম্মানুসারে নিদ্রা যান। "হিন্দুধর্ম্ম শরীর মন, আত্মা, সমাজ ইহার কাহাকেও অবজ্ঞা করে না।' প্রথমতঃ শরীর পালন অর্থাৎ স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে ইহাতে যেমন উপদেশ ও যেমন অনুশাসন পাওয়া যায় তেমন আর অন্য কোন ধর্ম্মে পাওয়া যায় না।

দ্বাদশতঃ, অন্যান্য ধর্ম্ম অপেক্ষা হিন্দুধর্ম্ম অতিশয় প্রাচীন। মনুষ্যের পুরাবৃত্তের

অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে এই ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছিল ইহা খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম অপেক্ষা প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্ম্ম ইহার বিদ্রোহী সন্তান, ইহার তুলনায় মহম্মদীয় ধর্ম্ম ত সেদিনের।

পুস্তক আলোচনা। ৩ বৈশাখ ১২৮০। ২২ সংখ্যা

বহুবিবাহ বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তক*

বিদ্যাসাগরের যেমন নাম, পুস্তকখানি তদনুরূপ হইয়াছে। ইহাতে তাঁহার প্রগাঢ় বিদ্যা, অসামান্য বুদ্ধি, বিপক্ষ মত খণ্ডনের অদ্ভুত ক্ষমতা, মীমাংসা করিবার অসাধারণ শক্তি, বিপুল পরিশ্রম ও অবিচলিত অধ্যবসায়াদি অনেকগুলি অত্যুদার গুণের সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। তিনি যে কত পরিশ্রমে কত গ্রন্থ হইতে কত প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া কেমন চমৎকাররূপে স্বমত সংস্থাপন করিয়াছেন, যিনি প্রস্তাবিত পুস্তকখানি পাঠ না করিয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া সাধ্যায়ত্ত নহে।

বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা, তাহার বিচার করিয়া বিদ্যাসাগর প্রথমে যে পুস্তক প্রণয়ন করেন, শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি, গঙ্গাধর কবিরত্ন, রাজকুমার ন্যায়রত্ন, ক্ষেত্রপাল স্মৃতিরত্ন ও সত্যব্রত সামশ্রমী, এই পাঁচ ব্যক্তি তাহার প্রতিবাদ করিয়া এক একখানি পুস্তক প্রচার করেন। বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় পুস্তক ঐগুলির প্রতিবাদ স্বরূপ। তাঁহার পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমাদিগের যেমন বিপুল আহ্লাদ হইল, তেমনি এক অংশে অতিশয় অসন্তোষ জন্মিল। তিনি যদি প্রতিবাদিগণের প্রতি গালিবর্ষণ বিষয়ে কিঞ্চিৎ হস্ত সঙ্কোচ করিতেন, তাহার পুস্তকখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রের হৃদয়হারী হইত সন্দেহ নাই।

পুস্তকখানির রচনা মধুর বিশদ ও উর্জ্জস্বল হইয়াছে। পাঠকালে প্রতিক্ষণে মনে হইল, প্রাঞ্জলভাষায় সুস্পষ্টরূপে স্ববক্তব্য ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা বিদ্যাসাগরের তুল্য অতি অল্প লোকের আছে, বোধহয় স্বাভিপ্রেত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার অত্যধিক বাসনা নিবন্ধন পুস্তকখানির স্থানে স্থানে পুনরুক্তি দোষ ঘটিয়াছে।

রামমোহন গ্রন্থাবলী। ২৪ আষাঢ় ১২৮০। ৩৪ সংখ্যা

চিঠি

মহাশয়! আপনি জগৎবিখ্যাত† মহাত্মা রামমোহন রায় মহোদয়ের গ্রন্থের বিষয়ে যে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন তাহা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইল না।

---

* শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত। কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত।

† রাজা রামমোহন রায় জগৎবিখ্যাত, আমরা তাহার অপলাপ করি না। তিনি বড় লোক ছিলেন, ইহাও আমরা মুক্তকণ্ঠে কহিয়া থাকি। কিন্তু বড়লোক হইলে তাঁহার কোন অংশে ক্ষুত থাকে না, এ সিদ্ধান্ত নিতান্ত অসঙ্গত। মনুষ্যের বিষয়ে এ সিদ্ধান্ত করা অবিমৃষ্যকারিতার কার্য্য সন্দেহ নাই।

ভারতসংস্কারক রাজা রামমোহন রায়ের উপর এ পর্য্যন্ত কেহ কোন দোষার্পণ করেন নাই, কিন্তু কি পরিতাপের বিষয় আপনি একজন বিজ্ঞ লোক হইয়া "ছেলেছুঁটকে"র মত স্বদেশ বিদেশ হিতৈষী মহাত্মা প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তির প্রতি অবলীলাক্রমে দোষারোপ করিলেন। 'মধ্যস্থ' সম্পাদক মহাশয় আপনার অভিপ্রায়ের উপব যেরূপ প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছেন শুদ্ধ 'প্রয়াগদূত' কেন আপনার মত দুই একজন লোক ভিন্ন কোন্ সহৃদয় না তাহার অনুমোদন করিবেন? রাজা বামমোহন রায়ের মত যদি ভারতভূমি আর দুই একটী সন্তান প্রসব করিতেন তবে আমাদের দেশের আব এরূপ দুর্দ্দশা হইত না। এমন মহাত্মার উপর দোষারোপ করা আপনার মত লোকের উচিতই হইয়াছে। সে সব কথা এখন যাউক, ভাল সম্পাদক মহাশয। আপনাকে একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কবি আপনি যে বলেন "অনেকে আপনার অভিপ্রেত স্পষ্ট কবিয়া ব্যক্ত করিতে পারেন না। বোধহয় রামমোহন রায়ের ঐ দোষ ছিল।" রামমোহন রায মহাশয কোন বিষয়ের কোন অভিপ্রায় প্রকাশ করেন নাই।* সম্পাদক মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার এই প্রশ্নের সদুত্তর দানে বাধিত করিবেন। এই বিযয লইযা আন্দোলন করা আমাব মানস ছিল না, তবে সে সকল

---

* আমবা লিখিযাছিলাম, বাজা গ্রন্থেব অনেক স্থলে আপনাব অভিপ্রায বিশদরূপে ব্যক্ত কবিতে পাবেন নাই। গ্রন্থখানি যে বিশদ হয নাই, পত্রপ্রেবক কিঞ্চিৎ অভিনিবেশসহকাবে পাঠ কবিলেই তাহা বুঝিতে পাবিবেন। মনোযোগ দিযা ২।৩ বাব পাঠ না কবিলে যে লেখাব অর্থ পবিস্ফুটরূপে হৃদযঙ্গম না হয, পত্রপ্রেরক কি সে লেখাকে বিশদ বলেন। যেখানে বেদান্ত সূত্রেব ব্যাখ্যা আরম্ভ হইল, আমবা তাহাব কথা কহিতেছি না, সেখানকাব অস্পষ্টতাদোষ কথঞ্চিৎ মার্জ্জনীয হয। কিন্তু বাজা যে ভূমিকা ও অনুষ্ঠান লিখিযাছেন, তাহাও বিশদ কবিযা তুলিতে পাবেন নাই।

(১) উদাহবণ "ইহাব দৃষ্টিতে জানিবেন যে আমাদেব মূল শাস্ত্রানুসাবে ও অতি পূর্ব্ব পবম্পবায় এবং বুদ্ধিব বিবেচনাতে জগতেব স্রষ্টা সংহর্ত্তা পাতা ইত্যাদি বিশেষণ গুণে কেবল ঈশ্বর উপাস্য হইযাছেন, অথবা সমাধি ক্ষমতাপন্ন হইলে সকল ব্রহ্মময এমতরূপ সেই ব্রহ্মসাধনায হযেন।" (ভূমিকা পৃষ্ঠা ৮, পংক্তি ১০) কোন ব্যক্তি একবাব মাত্র পাঠ কবিযা ইহাব অর্থবোধে সমর্থ হয? পত্রপ্রেবক আমাদিগকে জানাইযা অনুগৃহীত কবিবেন।

(২) উদাহবণ "তিন চাবি বাক্য লোকেব প্রবৃত্তেব নিমিত্ত বচন কবিযাছেন ঐ লোকেও তাহাব পূর্ব্বাপব না দেখিযা আপন আপন মতেব পুষ্টিব নিমিত্ত ঐ সকল বাক্যকে প্রমাণেব ন্যায জ্ঞান কবেন এবং সর্ব্বদা বিচাবকালে কহেন।" ভূমিকা পৃষ্ঠা ৮, পংক্তি ১৫।

(৩) "এ ভাষা সংস্কৃতেব যেরূপ অধীন হয, তাহা অন্য ভাষাব ব্যাখ্যা ইহাতে কবিবাব সময স্পষ্ট হইযা থাকে, দ্বিতীযতঃ এ ভাষাব গদ্য তে অদ্যাপি কোন শাস্ত্র কিম্বা কাব্য বর্ণনে আইসে না।" অনুষ্ঠান, পৃষ্ঠা ১৩, পক্তি ২।

(৪) "এতদ্দেশীযেরা যদি অনুসন্ধান আব দেশ ভ্রমণ করেন, তবে কদাপি এ সকল কথাতে যে পৃথিবীব এবং সকল পাণ্ডিতেব মতের ভিন্ন হয এমত বিশ্বাস কবিবেন না। আমাদিগেব উচিত যে শাস্ত্র এবং বুদ্ধি উভযেব নির্দ্ধাবিত পথেব সর্ব্বথা চেষ্টা কবি এবং উহাব অবলম্বন কবিযা ইহলোকে এবং পবলোকে কৃতার্থ হই।" (স)

ব্যক্তি আপনার 'সোমপ্রকাশ' ভিন্ন আর কোন পত্রিকা পাঠ করেন নাই, পণ্ডিতপ্রবর রাজা রামমোহন রায়ের নিন্দা শুনিলে পাছে তাঁহাদের অকলঙ্ক হৃদয় কলঙ্কে পূর্ণ হয় কেবল এইমাত্র আশঙ্কায় লিখিলাম। প্রশ্নের উত্তর পাইলে আমি যথাসাধ্য আপনার ভ্রম সংশোধনে যত্নশীল হইব।

বশম্বদ

৩০।৬।৭৩ শ্রীনন্দমোহন চট্টোপাধ্যায়

রাজা রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ প্রদৌহিত্র।

দেশীয় ভাষার অনুবাদ। ২৪ আষাঢ় ১২৮০। ৩৪ সংখ্যা

এখানকার সমাচারপত্র সম্পাদকেরা সচরাচর এই আক্ষেপ করিয়া থাকেন দেশীয় সংবাদপত্র সকলের যথোচিত অনুবাদ হয় না। নেটিভ পাবলিক ওপিনিয়নও দাক্ষিণাত্যের সংবাদপত্রের বিষয়ে ঐরূপ আক্ষেপ করিয়াছেন। অনুবাদের রীতি দেখিয়া সময়ে সময়ে আমাদিগের মনে এই ভাবের উদয় হয়, অনুবাদ প্রথাটী বিড়ম্বনা হইয়া উঠিয়াছে। অনেক সময়ে অনুবাদের দোষে যে উদ্দেশ্যে অনুবাদের রীতি হইয়াছে তাহা সুসিদ্ধ না হইয়া বিপরীত ফল ফলিয়া থাকে। অনুবাদকের হাতেই সমাচার পত্র সকলের পরমায়ু। বিধাতা পুরুষের ন্যায় তিনি কাহাকে বড করেন কাহাকে ছোট করেন। আমরা দেখিয়াছি যে সকল প্রস্তাবের অনুবাদ একান্ত আবশ্যক, সময়ে সময়ে তাহা উপেক্ষিত হয়, কখন কখন অনাবশ্যক বিষয়েরও অনুবাদ করা হইয়া থাকে। অনুবাদক অনেক প্রস্তাবের প্রকৃত মর্ম্মগ্রহণে সমর্থ হন না, একে আর করিয়া থাকেন। এরূপ যথেচ্ছ অনুবাদে লেখকদিগের গুণ দোষ বিচার হইয়া উৎসাহবৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক ভগ্নোৎসাহ হইয়া পডিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট ও বিদেশীয়েরা লেখকদিগের ক্ষমতার পরিচয় পাইতেছেন না। প্রত্যুত, অনেকের এ প্রকার সংস্কার জন্মিতেছে যে এদেশীয়েরা অতি অপদার্থ। ইঁহাদের আর কোন ক্ষমতা নাই, কেবল গবর্ণমেণ্টকে ও অন্য অন্য লোককে অকারণ গালি দিয়া থাকেন। অনুবাদের দোষে এ দেশীয় সমাচারপত্র সম্পাদকদিগকে রাজদ্রোহী বলিয়া অধিকসংখ্যক ইউরোপীয়ের সিদ্ধান্ত হইয়া আছে। যদি অনুবাদ প্রথায় এই ফল ফলিল, আমাদিগের বিবেচনায় ইহা রহিত হইলে মঙ্গল।

সমালোচনা। ২১ শ্রাবণ ১২৮০। ৩৮ সংখ্যা

বঙ্গদর্শন। ২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা। শ্রাবণ ১২৮০

১২৭৯ সালের বৈশাখ মাসে যখন "বঙ্গদর্শন" সাহিত্য রঙ্গভূমিতে প্রবিষ্ট হয়, তখন আমরা ইহার অভিনয় দর্শন করিতে নিতান্ত কুতূহলী হইয়াছিলাম। প্রথমবারের

অভিনয় দর্শন করিয়া আমরা তাদৃশ তৃপ্তিসুখ অনুভব করিতে পারি নাই। সে সময়ে অনেকগুলি অন্তরায় আমাদিগের অতৃপ্তির হেতুভূত হইয়া উঠিয়াছিল। ভাবিয়াছিলাম, পুনর্ব্বার যবনিকা উত্তোলন সময়ে এগুলির অন্তর্দ্ধান হইবে। প্রতিমাসে বঙ্গদর্শনের যবনিকা উত্তোলিত হইতে লাগিল, প্রতিমাসে বহু সংখ্য ব্যক্তি দর্শনী দিয়া অভিনয় দেখিতে প্রবৃত্ত হইলেন: কিন্তু আমরা সেই ১২৭৯ সালের বৈশাখ মাসে বঙ্গদর্শনের অভিনয় দেখিয়া যেরূপ আক্ষেপ করিয়াছিলাম, কিছুতেই তাহা তিরোহিত হইল না। মধ্যে দুই একটী অভিনয় আমাদিগের কিছু হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল, কিন্তু সাধারণ্যে বিবেচনা করিলে ইহাই বলিতে হয়, যে বঙ্গদর্শনের কো· ও অভিনয় বঙ্গীয় সাহিত্য রঙ্গের উৎকর্ষসাধক হয় নাই।

সম্প্রতি শ্রাবণ মাসের "বঙ্গদর্শন" আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। পুর্ব্বে যেরূপ হইয়া থাকে, এখানি পাঠ করিয়াও সুখিত হইতে পাবিলাম না। এবাবকার "বঙ্গদর্শনে" যে সমুদয় দোষ দৃষ্ট হইল, এই সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় তাহা প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

শ্রাবণ মাসের বঙ্গদর্শনে ১। জন ষ্টুয়ার্ট মিল। ২। হিন্দুদিগেব নাট্যাভিনয়। ৩। জাতিভেদ। ৪। চন্দ্রশেখর। ৫। স্বপ্ন প্রয়াণ। ৬। গদ্দভ। ৭। প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা, এই সাতটী বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই বিষয়গুলিব কোন কোনটীতে অতিব্যাপ্তি কোন কোনটীতে বা অব্যাপ্তি দোষ দৃষ্ট হইল। "জন ষ্টুয়ার্ট মিল" প্রস্তাবটী "যেনতেন প্রকারেণ" করিয়া সম্পন্ন করা হইয়াছে। প্রস্তাব লেখক উপসংহার সময়ে জীবনচরিত সংগ্রহের প্রথা অনুসারে মিলের সম্বন্ধে কতকগুলি তারিখ লিখিয়া দিয়াছেন। কিন্তু প্রস্তাবটী আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে মিলেব জীবনী সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই জন্মে না। এরূপ অব্যাপ্তি নিতান্ত দোষাবহ সন্দেহ নাই। "হিন্দুদিগের নাট্যাভিনয়" প্রস্তাবে কতকগুলি সংস্কৃত শ্লোকের উদ্গার করা হইয়াছে মাত্র। সাময়িক পত্রিকায় একপ "চর্ব্বিত চর্ব্বণ" শোভা পায় না। রামদাস বাবু, "হিন্দুদিগেব নাট্যাভিনয" লিখিযা বঙ্গীয সমাজেব কি উপকার সাধন করিলেন তাহা আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে প্রতিভাত হইতেছে না। তাঁহার প্রস্তাবে কিছুই নূতনত্ব দৃষ্ট হইল না। কেবল যেখানে সেখানে বিশ্বনাথের শ্রাদ্ধ করা হইয়াছে। লেখক যদি হিন্দুদিগের নাট্যাভিনয় সংক্রান্ত ইতিহাস সূক্ষ্মরূপে লিপিবদ্ধ করিতেন, তাহা হইলে প্রস্তাবটী অপেক্ষাকৃত হৃদয়হারী হইত। রামদাস বাবু এক্ষণে লোকসমাজে প্রাচীন তত্ত্বানুসন্ধানী বলিয়া পরিচিত হইতে চাহিতেছেন। আমরা তাঁহার এই চেষ্টার প্রশংসা করিতেছি। কিন্তু তিনি কোন কোন প্রস্তাবে, যেরূপ কতকগুলি অপ্রচলিত পুস্তকের নাম নির্দ্দেশ করেন তাহা হইতে সেরূপ সূক্ষ্ম বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারেন না। ফলতঃ যিনি প্রস্তাবেব মূল বিষয়ের আবিষ্কাবে সমর্থ নহেন, তাঁহার তত্ত্বানুসন্ধানী হইবার প্রয়াস বিড়ম্বনা মাত্র।

"জাতিভেদ" প্রস্তাবটী নিতান্ত মন্দ হয় নাই। ইহাতে লেখকের কল্পনাশক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু লেখক, প্রস্তাবে যে যে বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন, সুস্পষ্টরূপে তাহার সমর্থন করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, এ দোষ সত্ত্বেও আমরা অন্যান্য প্রস্তাব অপেক্ষা জাতিভেদের প্রশংসা করিতেছি।

"চন্দ্রশেখর" ইতিবৃত্তমূলক-উপন্যাস। সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখনী হইতে এটী বিনির্গত হইতেছে। প্রস্তাবিত সংখ্যক বঙ্গদর্শনে চন্দ্রশেখরের "শৈবলিনী" "দলনীবেগম" ও "লরেন্স ফষ্টর" নামে তিনটী পরিচ্ছেদ প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্কিম বাবু স্বপ্রণীত "বিষবৃক্ষে"র প্রারম্ভেই যেরূপ মুক্তহৃদয়তা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, "চন্দ্রশেখরে" সেরূপ করা হয় নাই। গ্রন্থনের সূচনায় সমুদয় কথা খুলিয়া বলিলে যে কৌতূহল উদ্দীপ্ত হয় না, বিষবৃক্ষ তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। বস্তুতঃ বঙ্কিম বাবু সময়ে সময়ে বাঙ্গালা গ্রন্থগুলিকে যেরূপ "অপাঠ্য" বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাঁহার বিষবৃক্ষও সেইরূপ "অপাঠ্য" হইয়াছে, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, চন্দ্রশেখরের অতি অল্প অংশমাত্র প্রকাশিত হইয়াছে; সুতরাং আমরা ইহার গ্রন্থন চাতুরী সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে চাহি না। উপাখ্যানের প্রারম্ভেই গ্রন্থকার শৈবলিনীকে পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন। এই শৈবলিনী চরিত্র আমাদিগের একান্ত রুচিবিকার জন্মাইয়া দিয়াছে। বঙ্কিম বাবু যেরূপ জঘন্য ভাবে শৈবলিনীকে চিত্রিত করিয়াছেন, এরূপ জঘন্য ভাব গৃহস্থ বাঙ্গালী কামিনীতে দৃষ্ট হয় না। এটী বঙ্কিম বাবুর অসহৃদয়তা ও উদ্ভাবনী-শক্তি ক্ষীণতার পরিচায়ক। ফলে বঙ্কিম বাবুর উপন্যাস গ্রন্থন চাতুরী যে দিন দিন বিলুপ্ত হইতেছে, তাঁহার রচিত উপন্যাসগুলিই তাহার সাক্ষী স্বরূপ।

"চন্দ্রশেখরে" বঙ্কিম বাবু স্বীয় ইংরাজী বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিতে নিতান্ত ইচ্ছুক হইয়াছেন। এতন্নিবন্ধনই লরেন্স ফষ্টরের ইংরাজী কথার "ছড়াছড়ি" হইয়াছে। দীনবন্ধু বাবু উড়িয়া ভাষায় অভিজ্ঞতা প্রদর্শনার্থ লীলাবতীতে রঘুয়াকে প্রবেশিত করিয়া যেরূপ উপহাসিত হইয়াছেন, বঙ্কিম বাবুও ফষ্টরের ইংরেজী কথার ছড়া বান্ধিয়া সেইরূপ উপহাস-ভাজন হইলেন সন্দেহ নাই। "লরেন্স ফষ্টর" ইংরেজ। তাহার মুখ হইতে বাঙ্গালা কথা বহির্গত হইলে যদি পাত্রানৌচিত্য দোষ ঘটে, এই ভয়ে কি লেখক ইংরেজীর অবতারণা করিয়াছেন? তাঁহার অন্তঃকরণে যদি এই ভয় থাকিত, তাহা হইলে দুর্গেশনন্দিনীতে "জগৎ সিংহ" "ওস্মান খাঁ" প্রভৃতির মুখ হইতে তাঁহাদিগের দেশীয় ভাষা বহির্গত হইল না কেন? "কপালকুণ্ডলা"তে দিল্লীশ্বরের মুখ হইতেই বা পারস্য ভাষা নির্গত হইল না কেন? কপালকুণ্ডলাতে এক সময়ে কাপালিকের মুখ হইতে "কস্ত্বং" "মামনুসর" প্রভৃতি সংস্কৃত কথা বহির্গত হইল, পরক্ষণেই আবার সমাসবহুল বাঙ্গালার অভিনয় আরম্ভ হইল, এরূপ বিসদৃশ ব্যাপার কেন? এটী কি সামাজিকতার অনুমোদিত? ফলে সাধারণে এইরূপ বিশ্বাস করিবেন রাজপুত ভাষা প্রভৃতিতে বঙ্কিম বাবুর অধিকার নাই; এতন্নিবন্ধন তিনি

জগৎ সিংহ প্রভৃতিকে বাঙ্গালী ভাবাপন্ন করিয়াছেন। কিন্তু ইংরেজী ভাষা, লেখকের প্রধান উপাস্যদেবতা। ইংরেজী অনুশীলনেই ইহাঁর অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইয়া থাকে। ইংরেজী ভাব, ইংরেজী ভাষা গ্রন্থকারের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিয়াছে। এই ইংরেজীর কোনরূপ অমর্য্যাদা করিলে অকৃতজ্ঞ হইতে হয়। এতন্নিবন্ধন লেখক লরেন্স ফষ্টরকে রঙ্গভূমিতে আনিয়াই ইংরেজীর উপাসনা পূর্ব্বক বলিয়াছেন "আই কম এগেইন ফেয়ার লেডী" এইরূপ সাধারণ বিশ্বাসে কি লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকের গুণসমূহ অপরাহ্নূত হয় না?

কেবল যে "চন্দ্রশেখরে"ই ইংরেজীর "ছড়াছড়ি" হইয়াছে, এরূপ নয়। ইংরেজী বঙ্গদর্শনের স্তরে স্তরে প্রবেশ করিয়াছে। ইহার বহু সংখ্য প্রস্তাবেই ইংরেজী ভাব, ইংরেজী ভঙ্গী দেখিতে পাইবে। মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালা কথা খুঁজিতে গলদঘর্ম্ম কলেবর হইতে হয় বলিয়া ইংরেজী কথাগুলিই বাঙ্গালার অস্থিতে প্রবেশিত করা হয়। ইহা বঙ্গভাষার দুর্ভাগ্য। বাঙ্গালা ভাষাকে "বেওয়ারিস" পাইয়া সকলে ইহার প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছেন। অধিক কি লোকপ্রসিদ্ধ বঙ্কিম বাবুও ইহাকে ফিরিঙ্গী ভাবাপন্ন করিয়া তুলিতেছেন। বঙ্গদর্শনের এক স্থলে উক্ত হইয়াছে—"এগন আব্‌সোলিউটিষ্ট বলিয়া কাহারও পরিচয় দিলে তাঁহার এক প্রকার নিন্দা করা হয়" অন্যস্থলে লিখিত হইয়াছে—"অর্থশাস্ত্র 'ল অব সাপ্লাই এণ্ড ডিম্যাণ্ড' নামক বিধান কেবল পণ্য দ্রব্যের প্রতিই বর্ত্তে এমত নহে।" পাঠকগণ! বঙ্গদর্শন লেখকদিগের বাঙ্গালা ভাষা নৈপুণ্য দর্শন করুন। আপনারা ইদানীন্তন নব্য সম্প্রদায়কেই (ইহাঁরা বাঙ্গালা কথায় ইংরেজী ব্যবহার করেন বলিয়া) নিন্দা করিয়া থাকেন, কিন্তু বঙ্গদর্শনের লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকদিগের লিখনভঙ্গী দর্শনে বুঝিতে পারিবেন, বড লোকের মধ্যেও এ রোগ আছে। যাঁহারা বিশুদ্ধ বাঙ্গালা কথা যথাযথরূপে প্রয়োগ করিতে পারেন না, তাঁহাদিগের বাঙ্গালা লেখক বলিয়া পরিচয় দেওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। জিজ্ঞাসা করি, এরূপ যথেচ্ছ ব্যবহার প্রদর্শন করিলে কি স্বীয় শূন্যহৃদয়তা ও অনভিজ্ঞতা প্রকাশ পায় না? যাঁহারা বাঙ্গালা লিখিতে যাইয়া ইংরেজীর শ্রাদ্ধ করেন, তাঁহারা কি সুলেখক পদবাচ্য? তাঁহাদিগকে ইংরেজীর কৃতদাস বলিলেও অসঙ্গত হয় না। সত্য কথা বলিতে কি, "বঙ্গদর্শন" বঙ্গভাষার কলঙ্কস্বরূপ হইয়াছে। যাঁহারা বঙ্গভাষায় অঙ্গবৈকল্য সাধন করেন, ভবিষ্যবংশীয়গণ তাঁহাদিগকে কখনও ক্ষমা করিবেন না।

"স্বপ্নপ্রয়াণ" পদ্যময়। এরূপ জঘন্য পদ্য ইতিপর্ব্বে আর আমাদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। ইহার ছন্দ যেরূপ শ্রুতিকটু বর্ণনাও সেইরূপ ইতর ভাবাপন্ন।

বঙ্গদর্শনের যেরূপ মাহাত্ম্য!!! "গর্দ্দভ স্তোত্রটী" তাহার অনুরূপই হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমরা অধিক কিছুই বলিতে ইচ্ছা করি না। গর্দ্দভবুদ্ধি যখন যাহার ঘাড়ে চাপে সে সময়ে তিনি যে গর্দ্দভবৎ ব্যবহার করেন তাহা আশ্চর্য্যের নহে। বঙ্গদর্শন গর্দ্দভবুদ্ধি বিশিষ্ট হওয়াতেই গর্দ্দভের স্তুতিবাদ করিয়াছেন। হিতচিকীর্ষু বন্ধুর মনোরঞ্জন না করা কৃতঘ্নের কার্য্য। গর্দ্দভ বঙ্গদর্শনকে নিজের বুদ্ধি প্রদান করিয়াছেন; সুতরাং তাহার

মনোরঞ্জনার্থ স্তব না করিলে অকৃতজ্ঞতা দোষে দূষিত হইতে হয়। পরিহাস দূরে থাকুক, বঙ্গদর্শন যাহাদিগকে গর্দ্দভ শ্রেণীতে নিবিষ্ট করিয়াছেন, স্বয়ংও তাহাদিগের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারেন। সম্বাদপত্রের সম্পাদকগণ বঙ্গদর্শনের লেখকগণ অপেক্ষা অনেকাংশে উন্নত, সন্দেহ নাই। ইহাঁদিগকে এইরূপ উপহাস করা যারপরনাই অন্যায় হইয়াছে। বঙ্গদর্শন, স্তোত্রের একস্থলে বলিয়াছেন—"তুমি কখন ঘাস খাও কখন ঠেঙ্গা খাও, কখন গ্রন্থকারের মাথা খাও, হে লোমশ! কোন্‌টী সুভক্ষ্য অর্ব্বাচীনকে বলিয়া দাও।" বলা বাহুল্য, ইহাতে বঙ্গদর্শনের গর্দ্দভ বুদ্ধিই পবিস্ফুট হইতেছে। "প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনায়" বঙ্গদর্শনের ন্যায় আর কেহ আগ্রহ সহকারে গ্রন্থকারদিগের "মুণ্ড ভক্ষণ" করেন কিনা সন্দেহ।

বঙ্গদর্শনের লিখন প্রণালী যে বিশুদ্ধ বাঙ্গালার অনুগত নহে, আমরা অনেকবার ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছি। প্রস্তাবিত সংখ্যক বঙ্গদর্শনেও অনেক কদর্য্য বাঙ্গালা ব্যবহৃত হইয়াছে। "চন্দ্রশেখরে"র 'শৈবলিনী' পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় স্তবকটী পাঠ করিলেই আমাদিগের বাক্যের যথার্থ অনুমিত হইবে। আমরা নিম্নে একটী উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছি :

"পরন্তু বিশিষ্টরূপে অনুধাবন করিলে বল্লাল সেন ও দেবীবব ঘটকের কীর্ত্তি এবং তাহার ফলের সহিত প্রাচীন জাতিভেদ নিয়ম এবং তাহা হইতে যে সকল ঘটনার উৎপত্তি, তন্মধ্যে অনেক সাদৃশ্য লক্ষিত হইবেক।"

এরূপ অবিশদ বাঙ্গালা উনবিংশ শতাব্দীর উপযোগী নয়। আজিও যদি রামমোহন রায়ের সমকালীন বাঙ্গালা ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে এই ভাষার উন্নতি হওয়া সুদূর পরাহত। বঙ্গদর্শনের লেখকগণ এ বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করিবেন।

উপসংহার সময়ে বক্তব্য এই : "বঙ্গদর্শন" প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় নিতান্ত চপলতার পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহার মতে বঙ্গভাষায় যে সমস্ত গ্রন্থ (দুর্গেশ-নন্দিনী প্রভৃতি ব্যতীত) প্রচারিত হয়, তৎসমুদয়ই অপদার্থ। কোন গ্রন্থকারকে রাজদ্বারে অভিযোগ করিবার ভয় দেখান, কোন গ্রন্থকারেব গ্রন্থ অকর্ম্মণ্য ও অপাঠ্য বলেন। এরূপ উদ্ধতার পরিচয় দেওয়া ধীর জনোচিত কার্য্য নহে। বঙ্গদর্শন কেবল পরের দোষ খুঁজিয়াই বেড়ান, কিন্তু একবার নিজের দিকে দৃষ্টি পড়ে না। অপদার্থ উপন্যাসপ্রিয় বাঙ্গালীদিগের নিকটেই বঙ্গদর্শনের গৌরব। একটী উপন্যাস শেষ হইলেই অমনি আর একটীর জন্য বঙ্গদর্শনে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। ইহাতেই আমাদিগের বাক্যের যথার্থ প্রতীত হইবে। বস্তুতঃ বঙ্গদর্শন চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের আদরভাজন হইতে পারে নাই। যাহারা নিজের দোষ সংশোধন না করিয়া কেবল পরের দোষগ্রাহী হয়, সামাজিকগণ, তাহাদিগকে "অপদার্থ" ব্যক্তিরিক্ত অন্য নামে অবিহিত করেন না। সম্পাদক যেন অতঃপর সাবধান হইয়া "বঙ্গদর্শন" প্রকাশ করেন।

—শ্রী—

চিঠিপত্র। ৩ ভাদ্র ১২৮০। ৪০ সংখ্যা

বঙ্গদর্শন প্রসঙ্গে

"ভাল করতে পারবো না
মন্দ করব কি দিবি তা দে।"

মহাশয়! বঙ্গীয় কতিপয় বিদ্যাভিমানী কিন্তু বস্তুতঃ কাণ্ডজ্ঞান শূন্য ও অন্তঃসারহীন ব্যক্তি এই আবহমান প্রচলিত প্রবাদ বাক্যটির সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তদনুসারিণী ক্রিয়ানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত। পরপদদলিত অনাথিনী বঙ্গভূমির এমনি দুর্ভাগ্য যে কেহই ইহার দুঃখোপশমের নিমিত্ত একবার মাত্রও মস্তিষ্ক সঞ্চালন করিবে না, পরন্তু যদি অপর কেহ চেষ্টা করে সাধ্যানুসারে তাহার আয়াসসাধ্য কার্য্যের প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইবে বাঙ্গালীর স্বভাবই এই। দুই জনে একত্রে কার্য্য করিলে যে কার্য্য সুসম্পাদিত হইতে পারে, সেই কার্য্যে যদি একজনের সহিত অপরের অনৈক্য হইল, অমনি একজন অপরের কার্য্যের ব্যাঘাতে প্রবৃত্ত হইবে। দৃষ্টান্তের প্রয়োজন নাই বাঙ্গালীদিগের দৈনন্দিন কার্য্যের প্রতি অভিনিবেশ করিলেই ইহার যথার্থ প্রতিপাদিত হইবে। এই প্রকার বিদ্বেষভাব ও অনৈক্য হেতুই আজি ভারতবর্ষ পঞ্চশত বর্ষাধিক কাল যাবৎ পরাজিত পদানত, এই হেতুই আধুনিক বঙ্গসমাজের এতদূর হীনাবস্থা, এই হেতুই আমরা রাজদ্বারে বাক্যসার অকর্ম্মণ্য বাঙ্গালী বলিয়া পরিচিত।

কুক্ষণে বঙ্গদর্শন "বিদ্বেষভাবপরবশ" জনসমাকীর্ণ বঙ্গদেশে আবির্ভূত হইয়াছে। এই উপলক্ষে সমালোচনা শুনিতে শুনিতে শ্রবণবিবর কলুষিত হইল। যখনি কেহ কোন প্রস্তাব না পান "বঙ্গদর্শনের' খানিকটা নিন্দাবাদ করিয়া বা তৎসম্পাদককে গালি দিয়া চিত্ত প্রসাদন করেন। আমরা অনেকবার দেখিয়াছি যে, কোন কোন সম্বাদপত্র সম্পাদকও এই প্রলোভন এড়াইতে পারেন নাই। আমরা এক্ষণে তৎসমুদয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত নহি, তবে কর্ত্তব্যানুবোধে ও কৃতজ্ঞতার উত্তেজনায় সাধারণতঃ গুটীকত কথা বলিব। ভরসা করি মহাশয় পত্রস্থ করিতে কুণ্ঠিত হইবে না।

"বঙ্গদর্শন" চিরন্তনব্যাপি ঘন কুসংস্কার কুহেলিকা সমাকীর্ণ বঙ্গ-সাহিত্য সংসারের সূর্য্যোদয়। প্রতি সংখ্যায় আমরা তাহার ভূয়োভূয়ঃ পরিচয় প্রাপ্ত হইতেছি। বঙ্গদর্শন বিশুদ্ধ বাঙ্গালার আদর্শ। সে প্রণালী অনুসারে "বঙ্গদর্শনের" প্রস্তাবাবলি লিখিত হয়, তাহা অমার্জ্জিত ও সমুন্নত। ইতস্ততঃ দুই একটি সামান্য লিপিগত প্রমাদ ব্যতীত এমন একটি দোষের উল্লেখ করিতে পারিবেন না যাহাতে বঙ্গদর্শন যথার্থই অপাঠ্য। তবে আপনার "শ্রী" স্বাক্ষরিত লিপি প্রেরকের ন্যায় যাহারা বোধান্ধ ও পরযশোহসহিষ্ণু তাহাদিগেরও বিষয় বোধগম্য না হইতে পারে। কতকগুলি নিন্দুক সর্ব্বদাই বলিয়া থাকেন, যে "বঙ্গদর্শনের" লেখকগণ মিথ্যাবিদ্যাভিমানী, কিন্তু আমরা তাহাদিগের কথায় বড়

আস্থা করি না, যেহেতু "বঙ্গদর্শন" নিজেই নিজ ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিতেছে। সহস্র কথা বলিলেও নিন্দুক নিন্দুকই থাকিবে। তাহার কোন পরিবর্ত্তন হইবে না, কিন্তু যাহারা সদাশয় ও সহৃদয় তাঁহারা আমাদিগের বাক্যের যথার্থ অনুভব করিবেন। ইতিপুর্ব্বে বঙ্গভাষায় যে কয়খানি পুস্তক লিখিত হইয়াছে তাহার সমস্ত না হউক, অধিকাংশই অপাঠ্য। জন কয়েক সুপ্রসিদ্ধ লেখক প্রণীত পুস্তকাবলি ভিন্ন এমন একখানি পুস্তকের উল্লেখ করিতে পারিবেন না যাহা যথার্থ্যই পাঠ্য বা হৃদয়গ্রাহী। আমাদিগের কথায় আস্থা না জন্মে বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজ উল্লোড়ন করিয়া দেখুন। এ অভাব যে কতদিনে পুর্ণ হইবে, তাহা দুরনুমেয়। বোধ হয় এ অভাবের নিমিত্তই "বঙ্গদর্শনে"র সৃষ্টি এবং তাহা যে আংশিকরূপে সিদ্ধ হইয়েছে কে অস্বীকার করিবে? "ভারত-কলঙ্ক" "উদ্দীপনা," "উত্তর-চরিত" "ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত" "বঙ্গদেশের কৃষক" "সাঙ্খ্য দর্শন" "সাম্য" "ধর্ম্মনীতি" প্রভৃতির ন্যায় প্রস্তাব বাঙ্গালায় অতি বিরল, দেখাই যায় না। এই সকলের ন্যায় উন্নত ভাব লিপিপ্রণালী আমাদিগের নেত্রে কখনই পড়ে নাই। পরন্তু লেখার পারিপাট্যে "বঙ্গদর্শন" অতুল্য ও অননুকরণীয়। বঙ্গভাষায় যে কয়েকখানি সাময়িকপত্র দৃষ্ট হয় কেহ ইহার সমকক্ষ বা নিকটস্থ হইতে পারে না। "বঙ্গদর্শন" যেরূপ সর্ব্বাঙ্গীন লোকের মনোরঞ্জন করে কোন পত্র তদ্রূপ কখনই পারে নাই। ইহাতে অনেকে আমাদিগের উপর বিরক্ত হইবেন এবং হয়ত আমাদিগকে "বঙ্গদর্শনে"র স্তাবক মনে করিবেন করুন, কিন্তু আমরা মুক্তকণ্ঠে নির্দ্দেশ করিতেছি যে যাহারা এ কথায় আস্থা না করেন তাঁহারা "বঙ্গদর্শনে"র অন্তরেই প্রবেশ করেন নাই।

আপনার "শ্রী" স্বাক্ষরিত পত্রপ্রেরক বলেন যে "বঙ্গদশন" বঙ্গভাষাব কলঙ্ক স্বরূপ হইয়াছে। এতন্মত পোষণের নিমিত্ত তিনি কতকগুলি কারণও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরা সেই সকলের প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইব। কিন্তু তৎপুর্ব্বে বলা উচিত যে "বঙ্গদর্শন" বঙ্গভাষার কলঙ্কস্বরূপ না হইয়া ইহার শিরোভূষণ স্বরূপ হইয়াছে। "বঙ্গদর্শনে"র ন্যায় পত্র যে বঙ্গভাষায় গ্রথিত হয় ইহা বঙ্গভাষার স্পর্দ্ধার বিষয়। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে "বঙ্গদর্শন" দ্বারা যথার্থই বাঙ্গালা ভাষার সমুন্নতি ও সংস্কার সম্পাদিত হইবে এবং তাহা যে কতক অংশে সিদ্ধ হইয়াছে তাহাও বলিতে প্রস্তুত আছি। "শ্রী" মহাশয় যে সকল দোষের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার বিদ্বেষভাব ও অন্তঃসারহীনতার পরিচায়ক, যথার্থ দোষ বলিয়াই গণ্য হইতে পারে না। তিনি রামদাস বাবুর সমালোচনা উপলক্ষে যে কথাগুলি বলিয়াছেন তাহাই ইহার উদাহরণ স্থল। রামদাস বাবু যে প্রকার অধ্যবসায়-সহকারে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাবলী হইতে অমূল্য সত্য সমুদায় নির্ব্বাচন করিতেছেন, "কালিদাস," "বররুচি," "শ্রীহর্ষ" প্রভৃতির অভ্যুদয়কাল নির্ণয় ও তাঁহাদিগের গ্রন্থাবলি প্রণয়ন বিষয়ক ঘটনাদি সংগ্রহ করিতে তিনি যেরূপ আয়াস স্বীকার করিয়াছেন তন্নিমিত্ত তিনি আমাদিগের সহস্র ধন্যবাদের পাত্র। রামদাস

বাবুর বিষয়ে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, প্রাচীন পুরাবৃত্ত তত্ত্বানুসন্ধায়িগণ আমাদিগের বাক্যের পোষকতা করিবেন সন্দেহ নাই।

"শ্রী" মহাশয় "বঙ্গদর্শনে" ইংরাজী ভাবের আধিক্য দেখিয়াছেন সেই হেতু বলেন "ইহার বহুসংখ্য প্রস্তাবেই ইংরাজী ভঙ্গি দেখিতে পাইবে। আমরা কতকঅংশে একথা স্বীকার করিতেছি, কিন্তু তাঁহার কথা প্রমাণে ইহাকে দোষ বলিয়া স্বীকার করিতে ইচ্ছুক নহি, কারণ নির্দ্দেশ করিতেছি যখন যে জাতি আমাদিগের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন তখনই আমরা তাহাদিগের আচার ব্যবহার সিখন প্রণালী প্রভৃতি অনেকাংশে অনুকরণ করি, এটি সংসর্গ দোষ। কিন্তু তাই বলিয়া সকলগুলিই যে দোষ একথা স্বীকার করিতে পারি না। আমাদিগের যেগুলির অভাব আছে বা যেগুলি মন্দ তৎপূরণার্থ বা তৎপরিবর্ত্তে বিজাতীয় প্রকরণগুলি গ্রহণ করিলে লাভ ভিন্ন অলাভ নাই। একটি বিষয় আমাদিগের ছিল না, তাহার চিরাভাবাপেক্ষা অপর জাতি হইতে সেটি পূরণ করা ভাল, অথবা আমাদিগের একটি দোষ ছিল সেই দোষে মগ্ন থাকা অপেক্ষা অপর জাতির অনুকরণ করিয়া তাহার সংশোধন অবশ্য কর্ত্তব্য। এতদ্ব্যতিরিক্ত দূষণীয় সন্দেহ নাই। ইংরাজী ভাষায় কতকগুলি এমন সমুন্নত ভাব আছে যাহা বঙ্গভাষায় দৃষ্ট হয় না এমন স্থলে সেগুলি গ্রহণ করিয়া সেই অভাব পূরণ করিলে তাহাকে দোষ বলি না, বরং তাহাতে আরও লেখার ঔজ্জ্বল্য সম্পাদিত হয়। একথা যিনি অস্বীকার করিবেন তিনি ভাষা প্রকরণই অবগত নহেন। তিনি আরও বলেন "বঙ্কিম বাবু ইহাকে ফিরিঙ্গি ভাবাপন্ন করিয়া তুলিতেছেন" কেন না ইহার রচনা মধ্যে কদাচিৎ এক আধটি ইংরাজী শব্দ দৃষ্ট হয়। তাহার প্রত্যুত্তরে বলা আবশ্যক যে বঙ্গভাষার আজিও একরূপ সম্যক পুষ্টিসাধন হয় নাই যে তাহাতে সকল বিষয়ক সকল শব্দই পাওয়া যায়। এতদভাব পূরণের নিমিত্ত বিজাতীয় শব্দ ব্যবহার দোষাবহ নহে, অপিচ ভাষার পুষ্টি এইরূপেই সম্পাদিত হয়। ইংরাজীতে এমন একটি শব্দ থাকিতে পারে যাহার সমশব্দ বাঙ্গালায় নাই, সেই স্থলে কি কর্ত্তব্য? দৃষ্টান্ত প্রদান করিলে এ বিষয় স্পষ্ট বুঝা যাইবে। "বিষবৃক্ষে"র এক পরিচ্ছেদে "সোফা" এই শব্দের উল্লেখ দেখা যায়। "সোফা" এই শব্দ আমরা সকলেই বুঝি ইহা দ্বারা একটি বস্তু বিশেষ বুঝাইতেছে। "সোফা"র অনুরূপ বাঙ্গালায় কোন শব্দ নাই, যাহাদ্বারা সেই বস্তুটিই বুঝাইবে, তাহা থাকিলে "সোফা" শব্দ প্রয়োগ দোষাবহ বটে। মনে করুন, তৎপরিবর্ত্তে আমরা "আসন" বলিলাম তাহাতে কি অবিকল সেই বস্তুটিই বুঝাইল কখনই না, আসন অনেক প্রকার হইতে পারে। পীঠ পর্য্যঙ্ক প্রভৃতি বুঝাইতে পারে, কিন্তু তাহারা কেহ অভিপ্রেত বস্তুটি বুঝাইল না। অতএব উদ্দেশ্য বস্তু নির্ণয় নিমিত্ত "সোফা" শব্দ প্রয়োগ দূষণীয় নহে। অপিচ এমন কতকগুলি শব্দ আছে যাহা এক প্রকার মোটামুটি বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া দেওয়া যায়, কিন্তু সেই শব্দটি রাখিলে সেই বিষয়টি স্পষ্টই বুঝা যায়।

আমরা এই স্থলে আপনার পত্রপ্রেরকোল্লিখিত "আবসোলিউটিষ্ট" শব্দটি বাঙ্গালায় প্রকারান্তরে অনুবাদ করা যায় বটে, কিন্তু তাহাতে লেখকের অভিপ্রেত সিদ্ধ হইল না। অনুবাদ দ্বারা সে বিষয়টি স্পষ্ট বুঝায় না, কিন্তু ইংরাজী শব্দটী রাখিলে সহজেই বুঝা যায়। এস্থলে ইংরাজী শব্দ দূষণীয় নহে। এতদতিরিক্ত হইলে তাহাকে দোষ বলা যাইবে। "নব নাটকে"র মতে "বাবা না বলিয়া ফাদার বলিলে তাহা অবশ্যই দূষণীয়।"

আপনার পত্রপ্রেরক "চন্দ্রশেখর" সম্বন্ধে যে সকল উক্তি করিয়াছেন তাহার প্রতিবাদে আমরা এক্ষণে প্রবৃত্ত নহি কারণ এখানি অসম্পূর্ণ। কেবল দুই একটি কথা বলিয়া আমরা আপাততঃ ক্ষান্ত হইব। "চন্দ্রশেখরে" বর্ণিত "লরেন্স ফষ্টর" সম্বন্ধে তিনি বলেন যে বঙ্কিম বাবু "লরেন্স ফষ্টর"কে চিত্রিত করিয়া নিজ ইংরাজী শিক্ষার পরিচয় প্রদানে ইচ্ছুক হইয়াছেন। বাস্তবিক তাহা নহে। তিনি বঙ্কিম বাবুর উদ্দেশ্যই বুঝিতে পারেন নাই। আখ্যায়িকার উদ্দেশ্য যে, কয়টি ব্যক্তির অবতারণা করা যাইবে তাহাদিগের চরিত্র সম্যক চিত্রিত করা। এতদ্বিষয়ের যিনি কৃতকার্য্য তিনিই উৎকৃষ্ট আখ্যায়িকা লেখক। বঙ্কিম বাবু এবিষযে যেরূপ পারদর্শী তাঁহার প্রণীত উপন্যাসগুলিই ইহার সাক্ষী। ফলতঃ চরিত্র প্রণয়ন করিতে তাঁহার সমকক্ষ লেখক বাঙ্গালায় নাই। তিনি যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহাই তাঁহার ক্ষমতা প্রভাবে ঔজ্জ্বল্য ধারণ করিয়াছে। "লরেন্স ফষ্টর" ইংরাজ। তাহারা স্বভাবতঃই চঞ্চল বা অধৈর্য্য, সেই চিত্র চিত্রিত করিবার নিমিত্তই বঙ্কিম বাবুর তন্মুখনিঃসৃত ইংরাজীর অবতারণা। যে সময়ের বর্ণনায় এই আখ্যায়িকা প্রবৃত্ত সে সময়ে ইংরাজেরা নূতন বাঙ্গালা দেশ অধিকার করিয়াছে। তাহারা বাঙ্গালীদিগের প্রকৃতি বা ভাষা তখনও সম্যক অবগত নহে, কেবল তাহাদিগের বাঙ্গালী কর্ম্মচারীর সংসর্গ যাহা কিছু শিখিয়াছিল। "চন্দ্রশেখরে"ও এ বিষয়ের উল্লেখ আছে। "লরেন্স ফষ্টর" কিরূপ প্রকৃতির মনুষ্য তাহার প্রযুক্ত দুই কথাতেই প্রতিপন্ন হইয়াছে। এ প্রকার চিত্র সামান্য ক্ষমতার পরিচয় নহে। "আই কম এগেইন ফেয়ার লেডি" বলার তাৎপর্য্য এই—লরেন্স ফষ্টর মনে করিয়াছিলেন যে "শৈবলিনী" কুঠীর কর্ম্মচারীদিগের ন্যায় তাহার কথার অর্থ বুঝিতে পারিবে; কিন্তু যখন দেখিলেন "শৈবলিনী" সে প্রকৃতির নহে, তখন আপনার ক্ষমতানুযায়ী বাঙ্গালা বলিলেন। ইংরাজদিগের স্বভাবই এইরূপ, যাঁহারা তাহাদিগের সংসর্গ করিয়াছেন একথা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। নতুবা ইংরাজী শিক্ষার পরিচয় এই সামান্য কথা দ্বারা প্রদত্ত হইতে পারে না। "দুর্গেশনন্দিনীতে" জগৎসিংহ, ওসমান খাঁ, প্রভৃতির মুখ হইতে তাহাদিগের দেশীয় ভাষা নির্গত হয় নাই কেন তাহার অনেক কারণ আছে; বাহুল্য ভয়ে আমরা সে সকল বিবৃত করিব না। যাঁহারা উপন্যাস কাহাকে বলে অবগত আছেন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন চিত্র প্রণয়নের নিমিত্ত যেটুকু প্রয়োজন তাহা করিলেও ক্ষতি হয় না। "কপালকুণ্ডলা"য় কাপালিকের মুখ হইতে এক সময় যে "কস্তুং" "মামনুসর" প্রভৃতি

সংস্কৃত কথা বাহির হইয়াছিল তাহারও কারণ ঐ কাপালিকের চরিত্র প্রণয়নের নিমিত্ত ঐটুকু প্রয়োজনীয়। ঐ দুই কথাতেই আমরা তাহার চরিত্র সম্যক বুঝিতে পারিয়াছি। কাপালিক পরম দাম্ভিক, তাহার মুখ হইতে ঐ প্রকার বাক্য নিঃসরণ হওয়া বিচিত্র নহে। পরন্তু প্রয়োজনীয় বিশেষ তিনি ভয়ানক নরঘাতন ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, লোকদিগকে আকৃষ্ট করিবার নিমিত্ত ও লোকের মনে তাঁহার প্রতি ভক্তি সঞ্চারণের নিমিত্ত ঐ প্রকার ব্যবহার অবশ্য প্রয়োজনীয়, ইহাতে দোষ ঘটে নাই। "লরেন্স ফষ্টরে"ও তদ্রূপ।

পত্রপ্রেরক "বিষবৃক্ষ"কে অপাঠ্য বলিয়াছেন তদালোচনায় আমরা বারান্তরে প্রবৃত্ত হইব। তবে এক্ষণে মুক্ত কণ্ঠে বলিতে সঙ্কুচিত হইতেছি না সে বঙ্গ ভাষায় যত উৎকৃষ্ট পুস্তক লেখা হইয়াছে "বিষবৃক্ষ" তাহাদিগের অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে বরং কোন কোন অংশে তদপেক্ষা মনোহর ও হৃদয়গ্রাহী।

প্রাপ্ত গ্রন্থের "সংক্ষিপ্ত সমালোচনায" সম্পাদক যাহা বলেন তাহার এক বর্ণও মিথ্যা নহে। সাধারণতঃ যে সকল বাঙ্গালা পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে তাহার অধিকাংশ যথার্থই অপাঠ্য তাহাতে ভাষার উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক বরং অবনতি হয়। তবে যেগুলি যথার্থ ভাল সম্পাদকও তাহাদিগের প্রশংসা করিয়া থাকেন।

উপসংহারকালে আমরা বঙ্কিম বাবুর এই উদ্যমকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। তিনি যেরূপ বিদ্যাবান ও লিপিকুশল বঙ্গভূমি তাঁহার নিকট অনেক আশা করেন। নিন্দুকে যাহা বলে বলুক তাহাতে তাঁহার উদার হৃদয় যেন একবার মাত্রও বিচলিত না হয়। তিনি যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন তৎসম্পাদনার্থ পূর্ব্বের ন্যায় অবহিত চিত্ত থাকুন। বঙ্কিম বাবু ও বঙ্গদর্শনের অন্যান্য লেখকবর্গের "জয় জয়কার হউক"। তাঁহারা বঙ্গভাষার দুর্দ্দশা দেখিয়া তৎসংস্কারার্থ কটিবদ্ধ হইয়াছেন তন্নিমিত্ত আমরা তাঁহাদিগের মঙ্গলাচরণ করিতেছি। তাহাদিগের লেখনীর উপর (সচন্দন) পুষ্পবৃষ্টি হউক।

২৫শে শ্রাবণ ২৮০ } একান্ত বশম্বদ
কলিকাতা চড়কডাঙ্গা। } কস্যচিৎ বঙ্গদর্শন পাঠকস্য।

চিঠিপত্র। ১০ ভাদ্র ১২৮০। ৪১ সংখ্যা

বঙ্গদর্শন প্রসঙ্গ

"যে জানে না এবং শিখে না কিন্তু
জানায় যে আমি জানি, তাহার
মূর্খতা কখনও ঘোচে না।'

কতকগুলি অসার গর্ভ বাক্য বিন্যাস করিয়া প্রতিবাদ করা বিবাদকণ্ডু প্রয়াসী ব্যক্তির স্বাভাবিক ধর্ম। তথাবিধ ব্যক্তিগণ সদালোচনা ও সদযুক্তির মস্তকে পদাঘাত

করিয়া যাহা মনে উদিত হয় তাহাই প্রকাশ করিয়া স্বীয় বিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। এই প্রকার কাণ্ডজ্ঞানশূন্য অপদার্থগণ ভাবী উন্নতির উৎপাত হেতু স্বরূপ। ইহাদিগের কথায় আস্থাবান হওয়া ধীর জ্ঞানোচিত কার্য্য নহে।

৩রা ভাদ্র প্রকাশিত বঙ্গদর্শন পাঠকের পত্রখানি এই প্রকার অসার বাক্যে পরিপূর্ণ হইয়াছে। পত্রপ্রেরক আমাদিগের ভ্রম প্রদর্শন করিতে যাইয়া নিজেই মহাভ্রমে নিপতিত হইয়াছেন। স্নিগ্ধ নয়নে কোন বস্তুই সৌন্দর্য্যহীন দেখায় না। পত্রপ্রেরক বঙ্গদর্শনের প্রতি একান্ত স্নেহবান, সুতরাং তাঁহার চক্ষে দোষগুলিও গুণ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। যথার্থ দোষ থাকিলে উপশান্তির নিমিত্ত তাহার উল্লেখ না করা হীনজন বিহীত চাটুকারিতার লক্ষণ। আমরা দুঃখিত হইলাম, পত্রপ্রেরক এই চাটুকারিতা দোষে দূষিত হইয়াছেন।

পত্রপ্রেরকের মতে বঙ্গদর্শন বিশুদ্ধ বাঙ্গালার আদর্শ। যাহাদিগের রুচি বিকৃত তাহাদিগের লেখনী হইতে যে প্রকার অজ্ঞাতসুলভ অদ্ভুত বাক্য নির্গত হইবে তাহা আশ্চর্য্যের নহে। বঙ্গদর্শন কিসে বিশুদ্ধ বাঙ্গালাব আদর্শ হইল, তাহা আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে প্রতিভাত হইতেছে না। বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হওয়াতে ভাষার উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক প্রত্যুত অবনতি হইবার সূত্রপাত হইয়াছে! গৃহপুষ্ট ব্যাকরণ যাঁহাদিগের প্রধান অবলম্বন, যাঁহাদিগেব রসময়ী লেখনী হইতে একেবারে কেবলমাত্র সরলতা চমৎকারা সাবধানী, শ্যামাঙ্গিনী, মহতী আত্মগরিমা প্রভৃতি বাক্যসমূহ অবিশ্রান্ত নির্গত হয়, পত্রপ্রেরকের ন্যায় স্থূলদর্শী হীনবুদ্ধি লোকের নিকটেই তাঁহাবা ভাষার আদর্শভূত সংস্কারক!!! কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী সামাজিকগণ সমক্ষে তথাবধি ব্যক্তিগণ ভাষার অমার্য্যাদাকারক ব্যতিরিক্ত অন্য নামে পরিচিত হইবেন না।

উদ্দীপনা প্রভৃতি কয়েকটী প্রস্তাব অনুৎকৃষ্ট হয় নাই। আমরা বঙ্গদর্শনেব প্রথম সমালোচনা (১) স্থলে ইহার উল্লেখ করিয়াছি, কিন্তু তা বলিয়া উত্তর চরিত প্রভৃতি উন্নতভাবাপন্ন প্রস্তাব নয়। পত্রপ্রেরক যে কয়েকটী প্রস্তাবের উল্লেখ করিয়াছেন, তৎসমুদায়ে ভাষাগত দোষ বহুল পরিমাণে লক্ষিত হয়। এক স্থলে লিখিত হইয়াছে। এরূপ প্রস্তাব বঙ্গভাষায় দেখাই যায় না। পত্রপ্রেবক বোধ হয়, বিদ্যাসাগব মহাশয়ের বর্ণপরিচয়ের কয়েক পাত উল্টাইয়া "বঙ্গদর্শন" ধরিয়াছেন, অন্যথা এরূপ ভাষাভিজ্ঞতার সম্ভাবনা কোথায়?

পত্রপ্রেরক এক স্থলে লিখিয়াছেন, ভাষার পারিপাট্যে "বঙ্গদর্শন অতুল্য ও অননুকরণীয়।" পত্রপ্রেরক যে ভাবেই এই বাক্য উপন্যস্ত করুন না কেন আমরা প্রকারান্তরে ইহাতে আস্থাবান হইতেছি। বঙ্গদর্শনের ভাষা বিশুদ্ধ প্রণালীর অনুগত নহে; সুসংস্কৃত বলিয়া সামাজিকগণও উহার অনুকরণপ্রয়াসী নহেন। সুতরাং বঙ্গদর্শনের ভাষা "অতুল্য" ও "অননুকরণীয়" এই উভয় বিশেষণেই বিশেষিত।

রামদাস বাবু যে ভূয়োদর্শন বলে, অনেক অপ্রচলিত বিষয় লিপিবদ্ধ করিতেছেন, এটী আমরা অস্বীকার করি নাই। পত্রপ্রেরক এই প্রসঙ্গে যেরূপ অমানুষতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে আমরা নিবতিশয় দুঃখিত হইয়াছি। বস্তুতঃ রামদাস বাবু যেরূপ পরিশ্রম সহকারে প্রাচীন বিবরণ সমূহের অনুসন্ধান করিতেছেন, তদ্রূপ ফল প্রদর্শন করিতে পারিতেছেন না। তৎ প্রণীত "মহাকবি কালিদাস" ইহার অন্যতম দৃষ্টান্ত, এই বিষয়ের অনুসন্ধান লব্ধ ফলের বিষয়ে এই বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে, রামদাস বাবু যেরূপ ভাবে কালিদাসের অভ্যুদয় কাল নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাতে কেহই আস্থাবান হয়েন নাই।

ইংরাজী হইতে ভাব (বাক্যগত গূঢ় তাৎপর্য্য) সংগ্রহ করিয়া বঙ্গভাষাব পুষ্টি সম্পাদন দূষণীয় নয়, ইহা আমবা স্বীকার করিতেছি। ইংবাজী ভাব (তদীয় ধর্ম্ম) ও বাঙ্গালী ভাব উভয়ই বহুদূর ব্যবহিত। সুতরাং ভাব প্রয়োগ বিষযে ইহাদিগের অনুকরণ বিধেয় নহে। ইংরাজেরা যে বিষয় যে ভাবে প্রয়োগ কবেন, আমাদিগের, পক্ষে ঠিক তদনুরূপ না করিযা বাঙ্গালীভাবে তাহা যেরূপে শোভা পায় তাহাই করা উচিত। যিনি এই প্রথার বিপর্য্যয় করেন, তিনি অবশ্যই অসহৃদয় বলিযা পরিগণিত। বঙ্গদর্শনের অনেক বাক্য বাঙ্গালীভাবে গ্রন্থন না করিযা ইংবাজী ভাবে গ্রথিত হয়। এতন্নিবন্ধনই আমবা ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলাম।

বঙ্গদর্শনে যেভাবে ইংবাজী শব্দের "ছড়াছড়ি" করা হয়, তাহা অত্যন্ত দূষণীয় ও অমার্জ্জনীয়। যাঁহারা "আবসোলিউটিষ্ট" "পাবলিক ডিনর" "ফেসিযান" 'পলিগেমী" প্রভৃতি বাঙ্গালা করিতে পাবেন না. তাঁহাদিগেব বাঙ্গালী লেখক বলিয়া পরিচয় দেওয়া নিববচ্ছিন্ন প্রগলভতা প্রদর্শন মাত্র। উল্লিখিত ইংরাজী শব্দগুলি বঙ্গভাষায় গ্রথিত হইলে কি ভাষায় উৎকর্ষ হইবে? আমরা স্পষ্টাক্ষবে নির্দ্দেশ করিতেছি, যাঁহারা এইরূপ যথেচ্ছাচার প্রদর্শন করেন তাঁহারা মাতৃভাষার হন্তা এবং যাঁহাবা এইরূপ অমানুষদিগকে প্রণয় দান করেন তাঁহারা মাতৃহত্যাজনিত অপবাধে অপরাধী। পত্র প্রেবকের মতে "আবসোলিউটিষ্ট" বলা দোষের নয়; ফাদার বলাই দূষণীয়, জগদীশ্বর এই কাণ্ডজ্ঞানশূন্য দুর্দ্ধর্ষদিগেব হস্ত হইতে ক্ষীণাঙ্গী বঙ্গভাষাকে রক্ষা করুন।

বঙ্কিম বাবু ইংরাজী বিদ্যাবত্তাব পরিচয প্রদানার্থ ই লরেন্স ফষ্টব চিত্রিত করিয়াছেন, পত্রপ্রেরক একপ বাক্য কোথায় দেখিতে পাইলেন? প্রতিবাদ স্থলে এইরূপ স্বকপোল কল্পিত বাক্য উপন্যস্ত করা কি ধীর জনোচিত কার্য্য? ইহাতে কি অন্তঃসার শূন্যতা ও বিবাদ প্রিয়তা পরিস্ফুট হয় না? বঙ্কিম বাবু অবশ্যই কোন গুরুতর উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত চন্দ্রশেখরের ফষ্টর চিত্র পাঠকগণ সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছেন। আমরা ইহার অপলাপ করিতেছি না। পত্রপ্রেরকগণ আমাদিগের লেখার তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া অযথা বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। একপ ঔদ্ধত্য একরূপ অসমীক্ষাকারিতা নিতান্ত ক্ষোভজনক।

আমাদিগের আক্ষেপ এই, বঙ্কিম বাবু ফষ্টর চিত্রে ইংরাজী কথা দিয়া নিরতিশয় অসহৃদয়তা প্রদর্শন করিয়াছেন, আচার ব্যবহার বর্ণন দ্বারা কি ব্যক্তিগত চরিত্র উত্তমরূপে চিত্রিত হয় না? ইংরেজীর ছড়া না বান্ধিয়া ব্যবহার কি ফষ্টরের চাঞ্চল্য পরিস্ফুট হইতে পারে না? পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন "লরেন্স ফষ্টর" এদেশের ভাষা ভাল জানিতেন না বলিয়াই ইংরেজীর অবতরণা করা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করি, জগৎসিংহ, ওসমান খাঁ জাহাঙ্গীর কি সংস্কৃত কালেজ নর্ম্মাল স্কুল প্রভৃতিতে প্রবিষ্ট হইয়া কি সমাসবহুল বাঙ্গালা শিক্ষা করিয়াছিলেন? পত্রপ্রেরক এস্থলে বাহুল্য ভয়ের ব্যপদেশে তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিয়াছেন কেন? অদ্ভুত মত পোষণী অদ্ভুত যুক্তির অপ্রতুল হইয়াছে না কি?

পত্র প্রেরকের মতে "কস্তং" "মামনুসর" এই দুটী সংস্কৃত কথা দ্বারাই কাপালিক চরিত্র সম্যক্‌রূপে হৃদগত হয়। পত্রপ্রেরক কি গভীর মানব হৃদয় তত্ত্ববিৎ!! ঐ দুই কথার স্থলে বাঙ্গালা প্রযুক্ত হইলে কি তাহার চরিত্র উত্তমরূপে চিত্রিত হইত না? দেশ কাল ও পাত্রানুসারে মিষ্ট ভাষা মাত্রেই লোকের মন আকৃষ্ট হইয়া থাকে। দুই একটী সংস্কৃত কথা শুনিলেই যদি লোকের মন ভক্তিবিগলিত হয়, তাহা হইলে ওরূপ অন্ধভক্তি পত্র প্রেরকের হৃদয়েই স্থান পাওয়ার যোগ্য। ফলে ভক্তিরসার্দ্র করিবার নিমিত্তই "কস্তং' "মামনুসর" প্রযুক্ত হইয়াছে। এরূপ বাক্যবিন্যাস নিরবিচ্ছিন্ন মূঢ়তার পরিচায়ক।

পত্র প্রেরক "বিষবৃক্ষে"র কিরূপ সমালোচনা করেন, জানিবার নিমিত্ত আমার একান্ত কুতূহল জন্মিতেছে।

"প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা" ব্যপদেশে বঙ্গদর্শন সময়ে সময়ে নিতান্ত অধীরতার পরিচয় দিয়া থাকেন। সমালোচন স্থলে ধীরতা সহকারে দোষ প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু জগদীশ্বর বঙ্গদর্শনের কোষ্ঠিতে এই "ধীরতা" লিখেন নাই। পত্র প্রেরক এক স্থলে লিখিয়াছেন সম্পাদক সমালোচন স্থলে যাহা বলেন, তাহার এক বর্ণও মিথ্যা নয়। যিনি এরূপ মোহান্ধ পক্ষপাতী তিনি যে বঙ্গদর্শনকে বঙ্গভাষার শিরোমণি বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন, তাহা আশ্চর্য্যের নহে।

আমরা বিদ্বেষভাবের বশীভূত হইয়া বঙ্গদর্শনের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হই নাই। পত্র প্রেরক অকারণে আমাদিগকে "পর যশোঽসহিষ্ণু নিন্দক" বলিয়া নিতান্ত অমানুষতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বঙ্গদর্শন দোষ পরিত্যক্ত সুসংস্কৃত ভাষার অনুগামী হয় ইহাই আমাদিগের উদ্দেশ্য। সমালোচন স্থলে দোষ প্রদর্শন করিলেই যদি নিন্দক হইতে হয়, তাহা হইলে কোন সমালোচকই এই দোষ স্পর্শ শূন্য নহেন পত্রপ্রেরক পরমসেব্য বঙ্কিম বাবু ত বিশিষ্টরূপে উক্ত বিশেষণ ভাজন হইবেন। ফলে পত্র প্রেরক না জানিয়া অযথা বিবাদে প্রবৃত্ত হওয়াতে এই পত্রের শীর্ষ লিখিত প্রবাদ বাক্যটীকেই অন্বর্থ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই।

বঙ্গদর্শন হইতে বঙ্গসমাজের উপকার অথবা অপকার হইবার সম্ভাবনা?

২৭ ভাদ্র ১২৮০। ৪৩ সংখ্যা

সোমপ্রকাশের মন্তব্য

'বঙ্গদর্শন' বালক বলিয়া আমরা এতদিন উহার বিষয়ে কোন কথা কহি নাই, মৌনাবলম্বী হইয়া উহার বঙ্গদর্শন করিতেছিলাম। সম্প্রতি কএকজন পত্রপ্রেরক আমাদিগের সেই মৌনব্রত ভঙ্গ করিয়া দিলেন। কএক সপ্তাহকাল বঙ্গদর্শনের প্রশংসা ও নিন্দা পূর্ণ এত প্রেরিত পত্র আমাদিগের হস্তে আসিতেছে আমরা যদি উহার সমুদায়গুলি মুদ্রিত ও প্রচারিত করি, সোমপ্রকাশে অন্য বিষয়ের স্থান সমাবেশ হয় না। বঙ্গদর্শনের এরূপ শত্রু ও মিত্র বৃদ্ধির কারণ কি? আমরা চিন্তা করিয়া দেখিলাম বঙ্গদর্শন কাহাকে মানুষ জ্ঞান করেন না, সকলেরই নিন্দা করেন, উহাই তাঁহার শত্রু ও মিত্র উভয় বৃদ্ধিরই একমাত্র কারণ। আমাদিগের সমাজের অধিকাংশ লোকের রুচি আজিও সংস্কৃত হয় নাই। অনেকে অন্যের নিন্দা ভাল বাসেন। যে লেখায় পরের নিন্দা থাকে, তাঁহারা আদর পূর্ব্বক তাহা পাঠ করিয়া থাকেন। বঙ্গদর্শনের লেখকেরা বুদ্ধিমান লোক, তাঁহারা সমাজের এই গতিটী সুন্দররূপে বুঝিয়া লইয়াছেন। লোকে তুষ্ট হইবে বলিয়া তাঁহারা বঙ্গদর্শনকে বড়লোকের নিন্দা পরিহাস ও গালি বর্ষণাদি দ্বারা পরিপূরিত করিয়া থাকেন। উহাতে বড়লোকের ক্ষতি নাই। এই নিন্দায় বঙ্গদর্শনের লেখকদিগের গ্রাহক বৃদ্ধি হইয়া স্বার্থ সিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু আমরা সমাজের একটী মহৎ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা দেখিতেছি। বঙ্গদর্শন পাঠে লোকের রুচির সংস্কার না হইয়া রুচি বিকার জন্মিতে চলিল। যে সকল লোকের পরনিন্দা শ্রবণে অনুরাগ ও প্রবৃত্তি আছে তাহা উদ্দীপিত হইয়া উঠিবে। সাময়িকপত্র সম্পাদকদিগের স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত এরূপ ব্যবহার একান্ত অন্যায়। যাহাতে দেশের লোকের রুচি সংশোধন হয়, তাঁহাদিগের সেই চেষ্টা পাওয়াই কর্ত্তব্য। বঙ্গদর্শনের লেখকেরা বিপরীত পথগামী হইয়াছেন। তাঁহারা লোকের কুপ্রবৃত্তির যে প্রকার উদ্দীপন করিয়া দিতেছেন, তাহাতে তাহাদিগের পিলোড়ি দণ্ড হওয়া উচিত। ইউরোপ খণ্ডে হইলে ঠিক পিলোড়ি দণ্ড না হউক ঐরূপ একটী দণ্ড হইত সন্দেহ নাই। যাহাদিগের রুচি মার্জ্জিত হইয়াছে তাহারা বঙ্গদর্শনের এই দোষ দর্শন করিয়া শত্রু হইয়া উঠিয়াছেন। তাহারা এই দোষ প্রদর্শন করিয়া বঙ্গদর্শনকে সংপথে আনিবার চেষ্টা পাইতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের সেই চেষ্টা সান্নিপাতিক বিকারে বীর্য্যবান ঔষধের ন্যায় বিফল হইতেছে।

বঙ্গদর্শন হইতে সমাজের কেবল যে এক রুচি বিপর্য্যয়রূপ অনিষ্ট ঘটিতেছে তাহা নহে, বাঙ্গালাভাষা ও রচনা প্রণালীরও মহৎ অনিষ্ট হইতেছে। বঙ্গদর্শন লেখকেরা ভাবেন, মুখে বলিয়াও থাকেন আমরা সচরাচর যে ভাষায় কথোপকথন করি, ঐ ভাষা

লেখাতেও যত প্রচলিত হইবে ততই ভাষার উন্নতি সাধিত হইবে কিন্তু ওদিকে দেখিতে পাওয়া যায়, দীর্ঘ সমাসাশ্রিত সংস্কৃত শব্দও তাঁহাদের নিকটে হতমান নহে। উভয়েরই সমান সম্মান আছে, কিন্তু কোন্ স্থলে কিরূপ শব্দ প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা লেখক-দিগের জানা নাই। তাহাতে বঙ্গদর্শনের লেখা এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। যদি সকলে এই লেখার অনুকরণ করেন বাঙ্গালা ভাষাটী অদ্ভুত হইয়া উঠিবে সন্দেহ নাই। আমরা বঙ্গদর্শন প্রসাদে বাঙ্গালা ভাষার যে অপূর্ব্ব আকার লাভের সম্ভাবনা করিতেছি, পাঠকগণ আমাদিগের প্রদর্শিত দুই তিনটী উদাহরণ প্রদর্শন করিলেই অনায়াসে অনুমান করিয়া লইতে পারিবেন। বাঙ্গালা ভাষার নিয়ম এই যদি আমরা চলিত শব্দ প্রয়োগ করা হয় তাহা হইলেই ভাষার শোভা হইয়া থাকে। আর যদি সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করিবার ইচ্ছা হয়, পূর্ব্বাপর সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করাই উচিত। শব শব্দের পর দাহ শব্দ ও মড়া শব্দের পরে পোড়ান শব্দ প্রয়োগ করিলেই ভাষার সৌষ্ঠব ও শোভা সম্পাদিত হয়। কিন্তু আমরা যদি শব পোড়ান এ মড়া দাহ এইরূপ প্রয়োগ করি, পাঠকগণ বস্তুত তাহা কেমন কৌতুকাবহ হইয়া উঠে। এক গালে চুণ ও এক গালে কালি দিলে, সেই দিব্য মূর্ত্তিটী দেখিতে যেমন সুন্দর হয়, শব পোড়ান ও মড়া দাহ প্রয়োগ করিলে পাঠকগণ শুনিতে কি সেইরূপ মধুর হয় না? বঙ্গদর্শনের লেখকগণ মাতৃভাষাকে এই দিব্য মূর্ত্তি পরিগ্রহ করাইতে উদ্যত হইয়াছেন !!

উপসংহারকালে পত্রপ্রেরকদিগের প্রতি বক্তব্য এই তাঁহারা বঙ্গদর্শন সংক্রান্ত পত্রপ্রেরণ করিয়া আমাদিগের সময় ক্ষতি ও সোমপ্রকাশের স্থান গ্রহণ চেষ্টা না করেন।...

চিঠিপত্র। ২৪ ভাদ্র ১২৮০। ৪৫ সংখ্যা

সোমপ্রকাশের শ্লোক

মহাশয়! আপনার সোমপ্রকাশের শিরোভূষণ স্বরূপ শ্লোকার্দ্ধ অবলোকন করিয়া অনেক দিন হইল আমার মনে একটী সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। উক্ত শ্লোকার্দ্ধ মহাকবি কালিদাসের সুধাময়ী লেখনী নিঃসৃত অভূতপূর্ব্ব সৌরভ পূর্ণ অভিজ্ঞান শকুন্তলা হইতে উদ্ধৃত। উহা গ্রন্থ সমাপ্তে ভরতের (নটের) আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ বাক্য। প্রকৃতি-হিত সম্বন্ধে রাজার এবং আপনার মঙ্গল প্রার্থনাই উদ্দেশ্য। আপনিও আপনার দেশহিতৈষী সংবাদপত্রের প্রথমে মঙ্গলাচরণ স্বরূপে উক্ত অর্দ্ধভাগ শ্লোক সন্নিবেশিত করিয়াছেন, ইহ পাঠকবর্গ মাত্রেই অবগত আছেন। কিন্তু সর্ব্বগুণসাগর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংগৃহীত ও মুদ্রিত অভিজ্ঞান শকুন্তলে উহার পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। উক্ত মুদ্রিত গ্রন্থে "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতি হিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুত মহতাং মহীয্যতাম" এবং "মহীয্যতাম্" ইহার পরিবর্ত্তে

"১।২।৩।৪ পুস্তকে "মহীয়সাম" পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। সোমপ্রকাশের শিরোভাগে "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতি-হিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতি মহতী ন হীযতাং" শ্লোকার্দ্ধ সন্নিবিষ্ট আছে। "শ্রুত মহতাং মহীয্যতাম্" ইহার পরিবর্ত্তে "শ্রুতি মহতী ন হীয়তাং" প্রয়োজন হইল কেন? স্পষ্টই বোধ হয় আপনিই এই পাঠান্তর সন্নিবেশ করিয়াছেন এবং তদর্থে আপনারও অভীষ্ট সিদ্ধি হইয়াছে। অথবা উহা কি আপনার কপোল কল্পিত? না অন্য কোন মূল গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত? যদি আপনার কল্পিত হয়, তাহাতেও বিশেষ অর্থ গৌরব দৃষ্ট হয় না। বোধ হয় মূল পাঠ সন্নিবিষ্ট হইলে আপনার মনোগত সিদ্ধির ব্যত্যয় হইত না। মূল পাঠ কোন্‌টী তাহাই আবার সন্দেহস্থল। যে হেতু অনেকানেক সহৃদয় পণ্ডিত কর্ত্তৃক অভিজ্ঞান শকুন্তলের অনেক স্থানেই নূতন পাঠ কল্পিত হইয়াছে। তাহাতে উক্ত রত্নের কোন স্থান কলঙ্কিত ও কোন কোন স্থান বা শাণ যোগে উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। বহু শাস্ত্রদর্শি সুভাবগ্রাহি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মনোনীত পাঠই এক প্রকার মূল বলিয়া এখন অনুভূত হয়। তিনিও মূল নির্ব্বাচনে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহা তিনিই জানেন। কিন্তু সময়ে সময়ে পণ্ডিত বিশেষ কর্ত্তৃক প্রাচীন গ্রন্থের পাঠ পরিবর্ত্তন বোধ হয় তাদৃশ সুখকর নহে। এই প্রকার পাঠান্তর গৌরবের হানি হয় কি না? মূল গ্রন্থগত রসভাবাদির পরিবর্ত্তন জন্য তাঁহাদের রস মাধুর্য্যে কৃত্রিমতা জন্মে কি না? ইহাতে তাঁহাদের প্রকৃতগুণাদি প্রচ্ছন্ন থাকাই সম্ভব। অভিজ্ঞান শকুন্তল পাঠ করিয়া পাঠান্তর স্থলে বোধ হয় কেহই কালিদাসকে চিনিতে পারিবেন না স্বাভিলাস সিদ্ধি জন্য বিজ্ঞাপন কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ পাঠান্তর কল্পনায়ও বোধ হয় সেই ভ্রম দোষ আরও বাহুল্য হইতেই চলিল। এক মূল শ্লোক উদ্ধৃত নতুবা স্বরচিত কবিতা নির্দ্ধ করাই কি উচিত নহে? নতুবা এ প্রকার পাঠান্তর ক্রমশঃ সন্নিবিষ্ট হইতে থাকিলে শেষে আমার মত অনভিজ্ঞ অন্ধেরা কালিদাস প্রভৃতি প্রাচীন কবিদিগকে চিনিতে অক্ষম হইবে। মূল গন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া পাঠান্তর কল্পনা-পূর্ব্বক সংবাদপত্রে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এবং সম্পাদক মহাশয়ও উহার অন্য পাঠ-যোজনা করিয়াছে বোধ হয় ভবিষ্যতে ইহা অনুভব হওয়া দুষ্কর। তখন ইহাই কালিদাসের পাঠ * বলিয়া প্রতীতি হইবার আশ্চয্য কি?

ভবদীয় বশম্বদ

শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

* বিদ্যাসাগর অথবা সোমপ্রকাশ সম্পাদক ইঁহাদিগের অন্যতর কেহই সোমপ্রকাশের শিরোভূষণ শকুন্তলার কবিতার্দ্ধের পাঠ কল্পনা করেন নাই। সোমপ্রকাশ সম্পাদক বঙ্গদেশ প্রচলিত পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং বিদ্যাসাগর পশ্চিম দেশ প্রচলিত পুস্তক আদর্শ করিয়া শকুন্তলার পাঠগত বহু বৈলক্ষণ্য দেখাইয়াছেন। এই বৈলক্ষণ্যের কারণ অনুমান করা সহজ নয়। কালিদাসের সময়ে এদেশে মুদ্রাযন্ত্র ছিল না। বোধ হয় এদেশে প্রাচীনকালে এই রীতি ছিল অধ্যাপকেরা ছাত্রদিগকে স্মৃত গ্রন্থের অধ্যাপনা

মৃত মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও মায়া কানন। ২২ বৈশাখ ১২৮১। ২৪ সংখ্যা

চিঠি

যে উৎকট রোগে বঙ্গীয় কবিকুলভূষণ মাইকেল মধুসূদন দত্তজ কালধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই রোগ শয্যায় শয়ান থাকিয়া তিনি দুখানি নাটক রচনারম্ভ করেন। দুইখানিই "বঙ্গ রঙ্গভূমি"র নিমিত্ত লিখিত হইতেছিল। প্রথমখানির নাম "মায়াকানন" অপরখানির নাম "বিষ কি ধনুর্গুণ"। "মায়াকানন" সমাপ্ত হইয়াছিল, "বিষ কি ধনুর্গুণ ?" অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে। "রঙ্গভূমির" অধ্যক্ষ যুবকদিগের যত্নে সম্প্রতি "মায়া কানন" মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। দত্তজ মহাশয়, যে, অনন্যসাধারণ দুর্লভ শক্তি লইয়া, বঙ্গদেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন—স্বরচিত মেঘনাদবধ প্রভৃতি কাব্য গ্রন্থে যে অতদ্ভুত অমানুষীশক্তি পরিচয় প্রদান করিয়া বঙ্গীয় কাব্যানুরাগী সহৃদয় সমাজে চিরস্মরণীয় এবং পরম বরণীয় হইয়া গিয়াছেন, তদীয় "মায়া কাননে" সেই অনন্যজন দুর্লভ কবিত্ব-শক্তির পরিচয় আছে কিনা, সে বিচার করা আমার উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু, এই নাটক, তাঁহার মর্ত্ত্যজীবনের শেষ সম্পূর্ণ গ্রন্থ এবং এই গ্রন্থ রচনাকালে তাঁহার লেখনী ধারণ শক্তি না থাকায়, আদ্যোপান্ত আমার হস্তলিখিত বলিয়া, তদীয় বন্ধুতার অনুরোধে এতদ্বিষয়ক পরিজ্ঞাত এবং সাধারণের অবশ্য পরিজ্ঞেয় কয়েকটি কথা বলিবার উদ্দেশেই প্রধানতঃ এ আড়ম্বর। এই "মায়াকানন" রচনাকালে কবিবর পীড়ার আতিশয্য হেতু প্রায় সর্ব্বদাই শয্যাগত থাকিতেন। সেই শয্যা পার্শ্বে লেখনী হস্তে বসিয়া আমি "মায়া কানন" লিখিতাম। মুহুর্মুহুঃ রক্ত বমন হইত, ঐৎকট রোগের দুঃসহ জালা দ্বিগুণতর হইত, তথাপি রচনাকার্য্যে বিরতি ছিল না। বমনকালে অগত্যা লেখনীর বিরাম হইত, অমনি আবার আরম্ভ করিতেন। যখন একটী মনোহর ভাব উপস্থিত হইত তখনি তাঁহার সেই ব্যাধিক্লিষ্ট মুখকান্তি আনন্দোদ্ভাসিত হইয়া অগ্রেই তাহার পরিচয় প্রদান করিত।

করিয়া উহার প্রচার করিতেন। কালিদাসও ঐ রীতির অনুবর্তী হইয়া স্বকৃত শকুন্তলার অধ্যাপনা করেন। অধ্যাপনা কালে যে যে স্থানের পাঠ তাঁহার হৃদয়গ্রাহী না হয় পশ্চাৎ তিনি তাহার পরিবর্তন করেন। পূর্ব্বে যে যে ছাত্র পাঠ সমাপ্ত করিয়া তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া যাইত, তাহারা আর পরিবর্ত্তিত পাঠ দেখিতে পায় না। এই রূপে শকুন্তলার বহু পরিবর্ত্ত হইয়া গিয়াছে। এদেশীয় পণ্ডিতদিগের একটী রোগ আছে ইঁহারা অন্যের কৃত গ্রন্থের পাঠ কল্পনা করিয়া দেন একথা মিথ্যা নয়, কিন্তু তাহার স্থল বিশেষ আছে। যে সকল গ্রন্থ অপ্রচলিত হইয়া যায় তাহার উদ্ধার সময়ে যে যে স্থলের অর্থ বোধ হওয়া দুরূহ হয় সেই স্থানেই পাঠ কল্পনার প্রয়োজন হইয়া থাকে। শকুন্তলা সেরূপ গ্রন্থ নয়। ইহা যে কখন অপ্রচলিত ছিল এরূপ বোধ হয় না। বোধ হয় রচনা অবধি সাদরে ইহা অধীত ও অধ্যাপিত হইয়া আসিতেছে। আমরা অনেকগুলি শকুন্তলা পুস্তক মিলাইয়া দেখিয়াছি যে যে স্থলের পাঠ সহজে বোধগম্য হয় সে সে স্থলেও ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পাঠ আছে। এই সকল কারণেই আমরা পূর্ব্বোক্ত প্রকার অনুমান করিলাম।

আমার আসন্নিধি সময়ে যে সকল ভাব মনে মনে সঙ্কলন করিতেন, তাহার লিপি শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি ক্ষিপ্তবৎ থাকিতেন। কোনও এক সময়ে আমি গিয়া দেখিয়াছিলাম, তিনি উন্মত্তভাবে ঘরের ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন। প্রথম দর্শনে আমি সে ভাব, রোগ মুলক বলিয়া আশঙ্কা করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি আমাকে দেখিবামাত্রই যখন স্মিতমুখে শীঘ্র শীঘ্র লিখিবার উপকরণ সমস্ত আনিতে কহিলেন তখন সে আশঙ্কার সম্যক নিরাকরণ হইল। পশ্চাৎ এই অংশটি লেখা হইলে—

"চলো সখি! আমরা এখন যাই, গিয়া দেখি, ইন্দুমতীর মনের কি ভাব। আমি শুনেছি, অনেক সময় এমন ঘটে যে, কিরাত কুরঙ্গীকে শরাঘাতে বিদ্ধ করে, অন্যত্র চলে যায়; আর মনেও করে না যে সে অভাগীর কি দুর্দ্দশা ঘটেছে। কিন্তু সে যেখানেই যায় ঐ রক্তশোষক যমদূত তার পার্শ্বে লেগে থাকে।"

কহিলেন এতক্ষণে আমি স্থির হইতে পারিলাম। হায়! সেই সময়ে যদি জানিতে পারিতাম, প্রিয় বন্ধু ততশীঘ্র আমারদিগকে ছাড়িয়া যাইবেন, তাহা হইলে, তাঁহার জনমনো-মোহিনী আকৃতির তদানীন্তন "শেষচ্ছবি" সংগ্রহ করণে কখনও অবহেলা করিতাম না!!

"বঙ্গভূমি"র কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা "মায়াকানন" যে আকারে বাহির করিয়াছেন, ফলতঃ সে আকারে তাঁহাদের হস্তে সমর্পিত হয় নাই। তাঁহারা তাহার কোনও কোনও স্থান পরিবর্ত্তন, কুত্রচ নূতন অংশ সংযোজন করিয়া দিয়া অসহৃদয়তার অবস্থাজ্ঞতার পরন্তু অবিমৃশ্যকারীতার একশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন। "বঙ্গভূমি'র অধ্যক্ষ মহামতিরা যে কি ভাবিয়া এরূপ বিসদৃশ ব্যবহার প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অস্মদাদির দুর্ব্বোধ্য। তাঁহারা যদি আপনাদের জ্ঞান গরিমা প্রদর্শনার্থে এরূপ করিয়া থাকেন, স্বতন্ত্র পুস্তকে করিলেই প্রকৃত জ্ঞানির কার্য্য হইত। যদি কবিবর দত্তজর অভাব পুরণার্থে করিয়া থাকেন, সমধিক দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, তাঁহাদের ন্যায় পণ্ডিতের হস্তে দত্তজর অভাব পুরণ হয়, দত্তজ কিম্বা সাধারণে এরূপ প্রত্যাশা কখনও করেন না। পরিশেষে অধ্যক্ষ বাবুদিগকে আমি বন্ধুভাবে পরামর্শ দিতেছি, এবারকার মুদ্রিত পুস্তকগুলি অবিলম্বে ভস্মসাৎ করিয়া আমার হস্তলিখিত আদর্শানুরূপ পুস্তক মুদ্রিত করিয়া অভিনয় করিবেন। পরন্তু এই স্থানে সমাজস্থ জনসাধারণ সন্নিধানে আমার সানুনয় নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন এবারকার "মায়াকাননে"র সমালোচন প্রসঙ্গে মাইকেলের চিরবিজয়িনী ও যশস্বিনী লেখনীকে ধিক্কার প্রদান না করেন।

প্রাসঙ্গিক না হইলেও দত্তজর প্রণয়ানুরোধে লিখিতব্য যে, "রঙ্গভূমি"র অধ্যক্ষ যুবকেরা কতকগুলি বেশ্যা লইয়া রসব্যাপার নির্ব্বাহ করেন বলিয়া সাধারণে তাঁহাদিগকে সর্ব্বদাই নিন্দাবাদ করিয়া থাকেন। তাঁহারা স্ব স্ব দোষক্ষালনার্থে বা আপনাদের মত পুষ্ট করণার্থে কবিবর দত্তজ মহাশয়কে ঐ কুৎসিত ব্যাপারের প্রবর্ত্তক ও উৎসাহদাতা বলিয়া প্রচার করেন, পরম্পরায় এরূপ শুনিতে পাই। যদি ইহা সত্য হয়, তাঁহারা প্রকৃত

সত্যের অপলাপ করিয়া, অমনুষ্যত্বের পরিচয় দিতেছেন। এই ঘৃণাকর, লজ্জাকর এবং সমাজের সমধিক অনিষ্টকর ব্যাপারে প্রবৃত্তি উৎসাহ দেওয়া, সহৃদয় মাইকেলের কার্য্য নহে। "রঙ্গভূমি"র অধ্যক্ষ যুবকগণের মধ্যে কোন কোন বাবু, তাঁহার নিকট ঐ বিষয়ে প্রস্তাব করিলে, তিনি এই বলিয়াছিলেন "বঙ্গীয় সমাজের ভূষণ সহৃদয় চূড়ামণি বহুদর্শী শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত, এবিষয়ে সর্ব্বোপরি প্রামাণিক হইবে। অতএব, তাঁহার মত গ্রহণ করা উচিত ইত্যাদি।" এ বড় আক্ষেপের বিষয় যে, অপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া, অপরের স্কন্ধে বিশেষতঃ একজন সর্ব্বজন পরিচিত মৃত ব্যক্তির স্কন্ধে সেই দোষ চাপাইয়া দেওয়া হইতেছে। যাহা হউক আমি মৃত কবিবরের প্রতিনিধি হইয়া সাধারণকে জানাইতেছি, তাঁহারা যেন বেশ্যা ভক্ত নটমণ্ডলীর কথা শুনিয়া, দত্তজ মহাশয়কে এবিষয়ে দোষী মনে না করেন। ফলতঃ উক্ত বিষয়ে তাঁহার মতামত যাহা ছিল, আমি তাহা স্পষ্টবাক্যে নির্দ্দেশ করিয়াছি।

দত্তজ মহাশয়, যে নিদারুণ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন, বঙ্গীয় সমাজে তাহা অবিদিত নয়। তথাপি, তাঁহার অবস্থা-ঘটিত, তদীয় বিরচিত একটী ভাবপূর্ণ শ্লোক এইস্থানে অবিকল উদ্ধৃত হইল—

"ভেবেছিনু মোর ভাগ্য, হে রমাসুন্দরি,
নিবাইবে সে রোষাগ্নি,—লোকে যাহা বলে,
হ্রাসিতে বাণীর রূপ, তব মনে জ্বলে, —
ভেবেছিনু হায়। দেখি, ভ্রান্তিভাব ধরি।
ডুবাইছ দেখিতেছি, ক্রমে এই তরী
অদয়ে, অতুল দুঃখ-সাগরের জলে
ডুবিনু, কি যশঃ তব হবে বঙ্গ-স্থলে ?"

কবিবরের মুদ্রিত কাব্যাবলী সাধারণ্যে সুপরিচিত বটে। তদ্ভিন্ন তিনি আরও এতগুলি কাব্য লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন :—(১) দ্রৌপদী স্বয়ম্বর, (২) ভারত বৃত্তান্ত অথবা পাণ্ডব বিজয় (৩) ব্রজাঙ্গনা দ্বিতীয় সর্গ, (৪) সুভদ্রাহরণ, (৫) মদন সংকীর্ত্তন, (৬) চন্দ্রবদন, (৭) আশার ছলনা, (৮) নীতিগর্ভ গল্পাবলী, (৯) তিলোত্তমা সংস্করণ, (১০) বীরাঙ্গনা, (দ্বিতীয় খণ্ড)। ইহা ভিন্ন আরো কএকটী ক্ষুদ্র কবিতাও লিখিয়া গিয়াছেন। অস্মদাদির দুর্ভাগ্যাতিশয় প্রযুক্ত "নীতিগর্ভ গল্পাবলী" ভিন্ন অন্য কোনও কাব্যই শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। ঐ সমুদয় কাব্যের হস্তলিপি আমার নিকট রহিয়াছে, অতি শীঘ্র আমি তাহা অবিকল মুদ্রিত করিব, সংকল্প করিয়াছি।

দত্তজ মহাশয়, আমাকে যে সোদর নির্ব্বিশেষ স্নেহ করিতেন, তাহা এ ক্ষুদ্র লেখনী মুখে ব্যক্ত হইবার নহে। তদীয় মুমূর্ষু কালের এক পত্রাংশদ্বারা তাহার কিঞ্চিন্মাত্র আমি সাধারণ সন্নিধানে প্রকাশ করিতেছি।

"প্রিয়তম কৈলাস।
যদি তোমার, তোমার মাইকেলকে দেখিবার ইচ্ছা থাকে, তবে পত্রপাঠ মাত্র এখানে পৌঁছিবা ইহাতে মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করিবা না ; মাইকেল মৃত্যু শয্যায়। ২৫শে জুন ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ।"
কলিকাতা, বহুবাজার শ্রীকৈলাসচন্দ্র বসু।

বঙ্গদর্শন এবং বাঙ্গালা গ্রন্থকার। ১৪ শ্রাবণ ১২৮৫। ৩৬ সংখ্যা

চিঠি

বঙ্গদর্শনে প্রথম প্রকাশ অবধি এ পর্য্যন্ত কত গ্রন্থকার যে ইহার নিকট অভদ্রোচিত তিরস্কার লাভ করিয়াছেন, তাহা বঙ্গদর্শনের পাঠক মাত্রেই জানেন। তথাপি কি সাহস,- কি বিবেচনায় তাঁহারা বঙ্গদর্শনে সমালোচনার জন্য আপন আপন পুস্তক পাঠান, আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। বাল্মীকি, কালিদাস, হোমর, বর্জ্জিল প্রভৃতির যখন কাব্য সৌন্দর্য্য বুঝাইয়া দিবার জন্য বঙ্গদর্শন ছিল না, অথচ তাহাতে পাঠকের অভাব নাই। "গুনৈর্হি সর্ব্বত্র পদং নিধীয়তে" বঙ্গদর্শনের নিন্দা বা প্রশংসায় কিছু আসে যায় না। তবে গ্রন্থকারদিগের এ রোগ কেন ? যদি সাধারণকে জানান তাঁহাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য হয়, সে জন্য সংবাদপত্র আছে, বিজ্ঞাপন দিলেই ত চলিতে পারে।

যদিও বঙ্কিম বাবুর আদিরস প্রবাহিনী "মেয়েলী" ভাষাতে অনেক নির্ব্বোধ যুবক-যুবতীর সর্ব্বনাশ হইয়াছে, বঙ্গীয় অর্দ্ধশিক্ষিত নবেল-প্রিয় যুবক যুবতীর মধ্যে কুরুচি ও কুনীতির প্রণয় দিন দিন বাড়িতেছে, তথাপি বঙ্কিম বাবুর একটি গুণ ছিল,—তিনি অতি কদর্য্য জিনিসকেও সুন্দর করিতে পারিতেন। এই জন্যই তিনি নবেল রূপে যে সব নরকের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার মনোজ্ঞ আবরণে ভুলিয়া অসার হৃদয় যুবক যুবতী তাহাতে ডুবিতেছে। এতদ্ব্যতীত তিনি সৌন্দর্য্য বুঝিতে পারিতেন তাঁহার সমালোচনা পক্ষপাতিত্ব দোষে পূর্ণ হইলেও একেবারে বিচারশক্তি রহিত নহে। আবার অনেক বাঙ্গালা গ্রন্থ এমন আছে যে, তাহাতে আমাদেরই ঘৃণা উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং এ সমস্তের সমালোচনায় গালি ভিন্ন প্রশংসা আইসে না। বঙ্কিম বাবু প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক এসব গ্রন্থের সমালোচনা হইতে বিরত হইয়া বিবেচনার কার্য্যই করিয়াছিলেন।

কিন্তু অপাত্রের সঙ্গে সংপাত্রকেও সময়ে সময়ে বঙ্কিম বাবু তাচ্ছিল্য করিয়াছিলেন ; দৃষ্টান্ত স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্য। আমরা বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠে স্বপ্নপ্রয়াণের নাম দেখিয়া মনে করিলাম, বুঝি ভিতরে ইহার সমালোচনা আছে। কিন্তু বই খুলিয়া দেখি, কয়েকটী শ্লোকমাত্র উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহার অর্থ কি ? অর্থ যিনি যাহা মনে করুন, আমরা বুঝিলাম যে স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্য বঙ্গদর্শনের সমালোচনার যোগ্য নহে, কেননা ইহাতে কামমুগ্ধ যুবক-যুবতীর প্রেম ঢালা-ঢালি নাই। তবে, দ্বিজেন্দ্রবাবু একজন বড় লোক, তাঁহার কাব্যকে একেবারে উল্লেখ না

করা সহজ কথা নহে। অতএব ভালমন্দ কিছু না বলিয়া বঙ্গদর্শনে কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত করা গেল, পাঠকগণ ভালমন্দ বাছিয়া লউন। কেমন, এই অর্থ না? আমরাও (পাঠকগণ) কেবল বঙ্গদর্শনের আশায় থাকি না, বঙ্গদর্শন বুঝাইয়া না দিলেও অনেক কাব্য বুঝিতে পারি। স্বপ্নপ্রয়াণ পড়িয়া আমরা যাহা বুঝিয়াছি, তাহা বঙ্গদর্শন একবার শ্রবণ করুন—

কে বলে দুর্ব্বল বাঙ্গালীর ভাষা
কাব্যধনে কাঙ্গালিনী?
কে বলে আধার বাঙ্গালী হৃদয়ে
শোভে না সুচিন্তন মণি?
বাঙ্গালীর মনে কল্পনার পক্ষ
কে বলে বাঁধা শৃঙ্খলে?
বাঙ্গালীর চিত্তে কবিত্ব কুসুম
ফুটে না,—কে ইহা বলে?
কেমন যে এক অপূর্ব্ব উদ্যান
বাঙ্গালার কাব্য বনে
হইল নির্ম্মাণ, চক্ষু আছে যার,
দেখ আসি এই খানে!
শরতে বসন্তে যা কিছু সুন্দর,
প্রকৃতি যা ভাল বাসে,
স্বর্গ পাতালের যে কোন শোভায়
অমর আনন্দে ভাসে,
খেদ, স্মৃতি, ভয়, পুলক, বিস্ময়,
প্রেম, প্রীতি, ভক্তি, স্নেহ,—
একাধারে যদি এসব সম্পদ
দেখিবারে চাও কেহ,
করহ প্রবেশ এ রম্য উদ্যানে,
সকলি দেখিতে পাবে,
পুঞ্জে পুঞ্জে শোভা নিরখি
নিরখি আপনা ভুলিয়া যাবে।
কিন্তু কুরুচির তিক্ত রস পানে
রসনা বিকৃত যার,—
স্বপ্ন প্রয়াণের সুরস আস্বাদে
বিফল উদ্যম তার!

তারপরে বঙ্কিম বাবু বঙ্গদর্শন ছাড়িলে, আমরা মনে করিলাম, বুঝি গ্রন্থকারগুলির প্রাণ বাঁচিল। ওমা! এ যে আরও ভয়ানক! এ যে 'চাষার হাতে শালগ্রাম!" এ সমালোচনার মূলে বঙ্কিম বাবু প্রচ্ছন্ন ভাবে আছেন কিনা তাহা আমরা জানি না। কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে, বঙ্গদর্শনের সম্পাদকের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্বভাবেরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। যে বঙ্গদর্শন একদা দেশীয় সংবাদপত্র দিয়া পচা গলা রাঁধিতে ভালবাসিতেন, আজকাল সেই বঙ্গদর্শনের "জটাধারীর রোজনামচা" প্রভৃতি প্রবন্ধ দিয়া সংবাদপত্রের সম্পাদকেরাও পচাকলা এবং গর্ব্বস্ফীত হৃদয়ে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, বঙ্গদর্শন অথবা সংবাদপত্র,—কাহার দ্বারা অধিক উপকার হইয়াছে।

যাহা হউক, বঙ্গদর্শনের সমালোচনা আমার উদ্দেশ্য নহে, কেবল তাহার সমালোচন পদ্ধতি আমার উদ্দেশ্য। আজকাল বঙ্গদর্শন বিচার বিষয়ে যেমন নিস্তেজ, ভাষা সম্বন্ধেও তেমনি ভদ্রতাহীন। ভাষা যে বক্তার প্রকৃতি প্রকাশ করে, ভাষা হইতেই যে বক্তার স্বভাব, শিক্ষা, রুচি ও সদগুণ উপলব্ধি হয় বঙ্গদর্শনের মস্তিষ্কে আজ কাল একথা প্রকাশ করে না। অসার এ কথার পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য দুইটা উদাহরণ দিতেছি—প্রথম হেলেনা কাব্য, দ্বিতীয় সুশিক্ষিত চরিত।

হেলনা কাব্যের প্রথম অপরাধ এই যে, তাহার প্রণেতা শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার জন্য বিলাতে যাইতে উৎসুক। এই কথা হইতেই সমালোচক অনুমান করিয়া লইয়াছেন গ্রন্থকার অশিক্ষিত। ইহার বিবেচনায়, যাহারা বিলাতে যায় না তাহারা অশিক্ষিত। "তবে আবার বিলাতে গেলেই দরবাজিদিগের কিছু উপকার হয়" বলিয়া যে কেন বিদ্রূপ করিয়াছেন, বলিতে পারি না। বোধহয় "বিলাত ফেরত' নামে যে একটা সংক্রামক রোগ অনেকের মনে প্রবেশ করিয়াছে, ইহা তাহারই এক লক্ষণ। নতুবা, যে বিলাত না যাইতে পারিয়া আনন্দ বাবু অশিক্ষিত হইলেন, সে বিলাতের আবার নিন্দা কেন?

দ্বিতীয় অপরাধ, শ্রীনাথবাবু গ্রন্থের ভূমিকায় তাঁহার উদ্দেশ্যটা বলিয়াছেন, গ্রন্থকারের মানসিক তেজের কিছু পরিচয় দিয়াছেন। আবার অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রশংসা করিতে বলিয়া ফেলিয়াছেন,—"কিন্তু অনেক দিন পরে আমাদের কর্ণে একটী বহুদূর সমানীত শঙ্খধ্বনি প্রবেশ করিল। প্রাণ তৃপ্ত হইল। অন্যেরও হইবে কি? শেষ কথাটা সমালোচকের সহ্য হয় নাই! তিনি অমনি হেমচন্দ্রকে ডাকিয়া বলিয়াছেন,—"হায়! হেমচন্দ্র ··ময়মনসিংহ স্কুলের ছেলে মহলে শাঁক বাজিয়াছে। ·তুমি আর বৃথায় কলম ধর!" অহো হিংসা! অহো পক্ষপাতীত্ব! হেমচন্দ্রের যশ লুপ্ত হইবে বলিয়া এত ভয়? হেমচন্দ্রের যদি বাস্তবিক গুণ থাকে তবে তাঁহার যশের তরণীতে বঙ্গদর্শন-সম্পাদক কাণ্ডারী না থাকিলেও তাহা ডুবিবে না। আমরা হেমচন্দ্রের যশের বিরোধী নহি—হেমচন্দ্র যে বর্ত্তমান প্রধান কবি, তাহা আমরাও স্বীকার করি, এবং তাহা বুঝাইবার জন্য বঙ্গদর্শন এত কাটাকাটি না করিলেও আমরা স্বীকার করিতাম। কিন্তু অমিত্রাক্ষর

ছন্দে হেমচন্দ্রকে উচ্চ সিংহাসন দিতে পারি না। বৃত্রসংহারের অমিত্রাক্ষর নীরস। যেখানে মিত্রাক্ষর আছে সেখানে হৃদয় নাচিতে নাচিতে চলে, আর যেখানে অমিত্রাক্ষর আছে, সেখানে বোধ হয় যেন কোন মরুভূমির উপর দিয়া যাইতেছি! কবি তাহাতে ভাবের জল বর্ষিতে ক্রটি করেন নাই, তবু যেন মরুতে সব শুকাইয়া গিয়াছে! মাইকেলের কথা ছাড়িয়া দিই,—নবীন বাবুর ক্লিয়পেট্রা এবং আনন্দ বাবুর হেলেনা কাব্য যাহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারা হেম বাবুর অমিত্রাক্ষর পড়িয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন না।

তৃতীয় অপরাধ, প্রথম বারেই ইহাকে সটীক করা হইয়াছে। এ প্রশ্নটা শাস্ত্রানুসারে নিষিদ্ধ, তাহা অবশ্য বঙ্গদর্শন সম্পাদক ভিন্ন আর কেহ জানেন না। অধিকন্তু কঠিন শব্দের টীকা লিখিতে যাইয়া টীকাকার দুই চারিটী সরল শব্দের অর্থও লিখিয়া ফেলিয়াছেন। কি ভয়ানক! এত বড় দোষ!! সটীক মেঘনাদ বধ কাব্যে বোধ হয় এ দোষ খুঁজিলে পাওয়া যাইবে না, পাওয়া গেলে তাহা প্রধান কাব্যের মধ্যে গণ্য হইত না।

এইরূপে ত তিন পৃষ্ঠা সমালোচনা চলিয়াছে, কিন্তু সে সমালোচনা হেলেনা কাব্যের নহে, তাহার লেখকেরও নহে,—আগাগোড়া কেবল শ্রীনাথ বাবুরই সমালোচনা। তারপরে একস্থানে বলিয়াছেন,—"ফলতঃ শ্রীনাথ বাবুর মত নিভৃক সমালোচক আমরা দেখি নাই,—অথবা কেবল বাঙ্গালা সংবাদপত্রেই দেখিতে পাই। বাস্তবিক এই হেলেনা কাব্য কিছুই নহে, কোন অল্পবুদ্ধি অশিক্ষিত ব্যক্তি রচিত মধুসূদন দত্তের অসার অনুকরণ" ইত্যাদি। এই বলিয়া কতকগুলি সাদৃশ্য দিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কাব্যাংশ উদ্ধৃত করিয়া পাঠককে দেখান নাই। সংক্ষেপে রামায়ণ এবং ইলিয়দের সাদৃশ্য দোষারোপ করিলেই চলিত। মনের ভাব 'পাঠক! তোমরা অন্ধ! তোমরা আর কি বুঝিবে? বাঙ্গালা কাব্যের আমিই অর্থবিৎ, আমি যাহা বলি তাহাই শোন, তাহাই বিশ্বাস কর।' পাঠকও হয়ত মনে মনে বলিয়া থাকিবেন "আচ্ছা বাপু যাহা শুনাইলে ভাল! আর এমন সমালোচনা করিয়া হাড় জ্বালাইও না।"

দ্বিতীয়, সুশিক্ষিত চরিত। "পাবনান্তর্গত মালঙ্কা নিবাসিনাম্ শ্রীমধুসূদন সরকারস্য প্রণীত প্রকাশিতঞ্চ" এই একটু উদ্ধৃত করিয়া সমালোচনার ভার পাঠকের প্রতি অর্পণ করিলেই যথেষ্ট হইত। পাঠকের মধ্যে এমন গোমুর্খ বোধহয় কেহই নাই যে, এতদূর পরিচয় পাইয়াও পুস্তক পড়িতে প্রবৃত্ত হইবে। তবে ইহার জন্য দেড় পৃষ্ঠা জুড়িয়া সমালোচনচ্ছলে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিবার কি প্রয়োজন ছিল, শেষ লেখা হইয়াছে,—"মধুসূদন সরকারস্য পৃষ্ঠদেশ বঙ্গদর্শনের বেত্রাঘাতের যোগ্য নহে।" আমরাই যেন তাহা বুঝিলাম। কিন্তু গ্রন্থকার বুঝিলেন কই? যদি বঙ্গদর্শনের সঙ্গে কখনও তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, আর বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠদেশ তাহার পাদুকাঘাতের যোগ্য বলিয়া মনে করেন, তবেই পতুল; বাঙ্গালা সাহিত্যে মিথ্যা কথা, পুরুষ হইয়া রমণীর সাজা প্রভৃতি অনেক দৃষ্টান্তে বঙ্গদর্শন তাহারও কি পথ দেখাইলেন।

শ্রীধর্ম্মমঙ্গল। ১৭ আশ্বিন ১২৮৯। ৪৬ সংখ্যা

সম্পাদক মহাশয়! গত ৯ই সেপ্টেম্বর ও ১৬ই সেপ্টেম্বরের বঙ্গবাসীর ক্রোড়পত্রে দেখিলাম যে, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় আগামী অগ্রহায়ণ মাস হইতে দুই সর্গ করিয়া বর্দ্ধমানান্তর্গত কুঁকুড়া নিবাসী মহাদেবী গৌরীকান্তসুত মহাকবি ঘনরাম প্রণীত শ্রীধর্ম্মমঙ্গল সর্ব্বপ্রথম নূতন মুদ্রিত করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। অবশ্য বাঙ্গালী হইয়া প্রাচীন বাঙ্গালী মহাকবিকে কীটের হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিয়া বাঙ্গালীর গৌরব রক্ষা করিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? বিশেষ সংস্কৃত ভাষায় বাল্মীকির রামায়ণ, গ্রীক-ভাষায় ইলিয়াদ, লাটিন ভাষায় ইনিদ, ইংরাজি ভাষায় প্যারেডাইস লষ্ট, বঙ্গভাষায় শ্রীধর্ম্মমঙ্গল সেইরূপ। এ প্রকার মহাকাব্যখানি কীটের খাদ্য হইতেছে দেখিয়া কোন বাঙ্গালীর হৃদয় ব্যথিত না হয়? কিন্তু তা বলিয়া, সাধুজননিন্দিত পথ অবলম্বন করিয়া কে আপনাকে সাধারণের নিকট ঘৃণাস্পদ করিতে ইচ্ছা করেন? যাঁহারা ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যসমাজ-সংস্কারক প্রভৃতি যাবতীয় সদ্‌গুণের আধার, যাঁহারা মূর্খ, অর্দ্ধশিক্ষিত, অসামাজিকদিগকে উপদেশ দিয়া ঈশ্বর-প্রেরিত ভাবকের ধারক বলিয়া গৌরব করিয়া থাকেন, যাঁহারা সুরাপান, বেশ্যাসক্তি, মিথ্যা চৌর্য্য প্রভৃতি দুষ্ক্রিয়াকে পরিত্যাগ করিতে সাধারণকে উত্তেজিত করেন, সকল প্রাণীকেই যাঁহারা নিজের প্রতিরূপ দেখেন, যাঁহারা নিজের লঘুচিত্তত্ব প্রকাশ ভয়ে অপরের নিন্দা বা অপমান করিবার মনেও কল্পনা করেন না, এমন উদার উচ্চদলভুক্ত যোগেন্দ্র বাবু কেন এরূপ করিলেন, বুঝিতে পারিলাম না।

যেহেতু ১২৮৪ সালে আমি সর্ব্বপ্রথম নূতন উক্ত মহাকবির শ্রীধর্ম্মমঙ্গল সোমপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত করিয়া সাধারণের নিকট প্রচার করি। এডুকেশন গেজেট প্রভৃতি সমাচার-পত্রে অনেকবার কতক কতক অংশ বাহির হইয়াছিল। মৎপ্রকাশিত শ্রীধর্ম্মমঙ্গল এখনও উক্ত যন্ত্রে আছে, কেবল আমার পরমারাধ্য পিতৃদেব ও পিতৃব্যদেব মহাশয়দিগের মৃত্যু প্রভৃতি নানাপ্রকার দৈব দুর্ঘটনা বশতঃ কয়েক খণ্ড মাত্র ছাপাইয়া আর ছাপাইতে পারি নাই, এবং আর যে ছাপা হইবে না, একথা কে বলিতে পারেন? অতএব শ্রদ্ধাস্পদ মহাশয় বলিতে পারেন আমাদের প্রিয় যোগেন্দ্র বাবুর "সর্ব্বপ্রথম নূতন মুদ্রিত" কি করিয়া হইল?

একান্ত বশম্বদ

শ্রীমহেন্দ্রনাথ ঘোষ।

শর্ম্মিষ্ঠা নাটকাভিনয়। ১১ আশ্বিন ১২৬৬। ৪৬ সংখ্যা

আমরা গত বুধবারে শ্রীযুক্ত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের বেলগাছিয়ার বাগানে শর্ম্মিষ্ঠা নাটকের অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। অভিনয়ক্রিয়া অতি চমৎকারিণী ও মনোহারিণী হইয়াছে। বাদ্য হইতে আরম্ভ করিয়া যযাতি রাজার সভাভঙ্গ পর্য্যন্ত যাবতীয় বিষয় আমরা একতান মনে শ্রবণ ও অবলোকন করিয়াছি। একবারও চিত্ত বিরক্তি হইয়া অন্য দিকে ধাবমান হয় নাই। কি সঙ্গীত, কি বাদ্য, কি অভিনয়, সকল বিষয়ই উৎকৃষ্ট হইয়াছে। যদি নাট্যোক্ত স্ত্রী ও পুরুষদিগের কথোপকথনগুলি সহজ ও স্বাভাবিক হইত, তাহা হইলে বোধ হয়, কাহারও কোন অংশে কিছুমাত্র অতৃপ্তি ও আপত্তি থাকিত না।

প্রথম বাদ্য আরম্ভ হয়। বাদ্য অতি চমৎকার ও নূতন তাললয়বিশুদ্ধ রাগপূর্ণ সুমধুর বাদ্যধ্বনি শ্রুতিমূলে প্রবিষ্ট হইবামাত্র বোধ হইল, শর্ম্মিষ্ঠার নাট্যাচার্য্য এতদ্দেশীয় ইউরোপীয় উভয়বিধ বাদ্যের যোগসম্পাদন করিয়া নূতনত্ব ও বিচিত্রতাবিধান করিয়াছেন।

হিমালয় পর্ব্বত, তাহার উপত্যকা অধিত্যকা ভৃগু সানু প্রভৃতি প্রদেশে, শর্ম্মিষ্ঠার ভবনপুরোবর্ত্তী নিকুঞ্জ, যযাতির সভা ও তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী প্রাসাদ শ্রেণী, এই সকলের যে প্রতিরূপ করা হইয়াছিল, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর মনোহর। যযাতি যখন জরামুক্ত হইয়া উভয় পার্শ্বে উভয় মহিষীকে লইয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন, ওদিকে দেবগণ তুষ্ট হইয়া পুষ্পবৃষ্টি, গন্ধর্ব্বেরা গান এবং অপ্সরারা নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। এদিকে যযাতির সভাস্থলে শুক্রাচার্য্য, কপিল, মাধব, মন্ত্রী ও অন্য অন্য সভাসদ্গণ উপবিষ্ট, সম্মুখে দুই নর্ত্তকী নৃত্য করিতে লাগিল। এই সকল উদাত্তকাণ্ড দেখিয়া তৎকালে মনে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদয় হইয়াছিল।

যে সকল ব্যক্তি অভিনয়ক্রিয়া সম্পাদনে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা সকলেই শিক্ষানৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহার মধ্যে যাঁহারা বিদূষকের এবং শর্ম্মিষ্ঠার বেশ পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে অধিকতর প্রশংসা করিতে হয়। আলঙ্কারিকেরা লিখিয়াছেন, বিদূষক—বেশ ভাষা অঙ্গভঙ্গী প্রভৃতি দ্বারা হাস্যকর হইবে। বেলগাছিয়া রঙ্গভূমির বিদূষক এমনি সম্পূর্ণ লক্ষণাক্রান্ত হইয়াছিলেন, যে তাঁহাকে রঙ্গভূমিতে দেখিবামাত্র না হাসিয়া থাকিতে পারা যায় না। শর্ম্মিষ্ঠা বেশধারীর স্ত্রীলোকসদৃশ মধুর স্বর ও মিষ্ট কথাগুলি কাহার না হৃদয়গ্রাহী হয়।

উল্লিখিত অভিনয় দর্শন করিয়া কেবল যে এদেশের প্রাচীন কালের আচার ব্যবহার ও রীতিনীতি প্রভৃতি জানা যায় এরূপ নয়, তদানীন্তন লোকদিগের মনে ভাব সংস্কার ও চরিত্র প্রভৃতিরও সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। শর্ম্মিষ্ঠার শান্ত ভাব, সস্নেহ ব্যবহার এবং বিশুদ্ধ চরিত্র দর্শন করিয়া কাহার মনে বিস্ময় ভক্তি ও করুণার উদয় না হয়? দেবযানী শর্ম্মিষ্ঠার সপত্নী। তিনি বিবিধরূপে তাঁহার অপকার চেষ্টা ও ঈর্ষ্যা করেন। কিন্তু শর্ম্মিষ্ঠা একক্ষণের নিমিত্তও তাহার অনিষ্ট চেষ্টা করেন নাই। বরং কেহ দেবযানীর নিন্দা করিলে শর্মিষ্ঠা তাহাতে বিরক্ত হন। ঈদৃশ উদার স্বভাব দর্শন করিলে কাহার মন ভক্তিভাবে আর্দ্র না হয়?

যেরূপ সুসমৃদ্ধ কাণ্ড দেখা গেল, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইল, রাজা বাহাদুরের অনেক ব্যয় হইয়াছে। গত বর্ষেও তিনি রত্নাবলীর অভিনয়ে যথেষ্ট ব্যয় করিয়াছিলেন, তাঁহার এই ব্যয় নিরর্থক হয় নাই। দর্শকগণ পরিতৃপ্ত হইয়া আসিয়াছেন বলিয়া তাহার অর্থ ব্যয় সার্থক হইয়াছে আমরা একথা কহিতেছি না। আমাদিগের দেশের লোকের রুচিপরিবর্ত্ত ও উত্তরোত্তর সমধিক সহৃদয়তা বৃদ্ধি হইবে তাহার আকার হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার অর্থ ব্যয়ের এই বিশেষ ফল দর্শিয়াছে, অনেকে প্রোৎসাহিত হইয়া নূতন গ্রন্থ প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। উৎসাহদাতা না থাকিলে প্রতিভাগুণ সম্পন্ন ব্যক্তির প্রতিভা প্রকাশ পায় না। পূর্ব্বকালে এই ভারতবর্ষে অনেকে অসাধারণ পণ্ডিত হইয়া গিয়াছেন, এখন আর সেরূপ লোক জন্মিতেছে না, তাহার কারণ কি? এখন ভারতবর্ষে তেমন বুদ্ধিমান লোক জন্মেন না, একথা বলা কোনক্রমেই সঙ্গত হইতে পারে না। সে কাল এ কাল বলিয়া সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টিবিষয়ে ইতর বিশেষ করা নাই। তদানীন্তন হিন্দুরাজগণ সংস্কৃত শাস্ত্রের অতিশয় আদর করিতেন, তাঁহারা পণ্ডিতগণকে যারপরনাই উৎসাহদান করিতেন। সুতরাং সংস্কৃত শাস্ত্রেরও সমধিক অনুশীলন হইয়াছিল। এখন সেরূপ উৎসাহদান নাই, সুতরাং সংস্কৃতের হীন দশা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর যেরূপ উৎসাহদান করিতেছেন, এইরূপ উৎসাহ দাতা ও সদাশয় লোক যদি দুইচারিজন পাওয়া যায়, তাহা হইলে স্বল্পকালমধ্যে বাঙ্গালাভাষার সবিশেষ উন্নতি হইয়া উঠে। যাঁহারা ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিয়া সভ্যতা সহচর সদগুণ গ্রহণে বিমুখ হইয়া কেবল দোষগুলি গ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহারা সদ্ব্যয় করিতে নিতান্ত কাতর হন, কিন্তু অসদ্ব্যয়কালে এককালে মুক্তহস্ত হইয়া পড়েন, যাঁহাদিগের অসচ্চরিত্রতা দেখিয়া এতদ্দেশীয় ইংরাজীভাষানভিজ্ঞ লোকেরা মনে করেন, লোক ইংরাজী পড়িলেই অসচ্চরিত্র হয়, তাঁহারা একবার নয়ন উন্মীলন করিয়া শ্রীযুক্ত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুরদিগের ব্যবহার দর্শন করুন।

এই প্রস্তাবের উপসংহারকালে আর একটি কথার উল্লেখ করা অতিশয় আবশ্যক হইয়াছে। রাজবাহাদুরেরা যখন বারান্তরে এইরূপ রঙ্গভূমির সৃষ্টি করিবেন, তখন যাহাতে

নাট্যোক্ত স্ত্রীপুরুষদিগের কথোপকথনগুলি নৈসর্গিক হয়, সে চেষ্টা করেন। দাসীর মুখে সংস্কৃত শব্দ ভাল লাগিবে কেন? কি সামান্য লোক, কি ইতর লোক সকলেই রূপক উৎপ্রেক্ষা উপমা না দিয়া কথা কহেন না, ইহাই বা কিরূপে মিষ্ট লাগিতে পারে? এ সকল গ্রন্থকারের দোষ বটে, কিন্তু রাজবাহাদুরেরা যখন সকল বিষয়েই অসাধারণ সহৃদয়তা প্রদর্শন করিয়াছেন, তখন এ বিষয়ে গ্রন্থকারের দোষ দিয়া আপনারা শুদ্ধ হইলে চলিবে কেন?

আগড়পাড়ার নাট্যশালা। ১৭ পৌষ ১১৭৩

আমরা আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, কলিকাতায় নাটক অভিনয়ের যে সুপ্রণালী হইয়াছে, মফঃস্বলে তাহার অনুসরণ করা হইতেছে। অভিনয় যে প্রকার হওয়া উচিত তাহা সম্পূর্ণরূপে কোন স্থলেই হইতেছে না বটে, কিন্তু এ বিষয়ে দৈনন্দিন উন্নতি লক্ষিত হইতেছে। নাটকের ভাষারও উন্নতি হইবে এ আশাও করা যাইতে পারে। এবিষয়ে অনেকের কুসংস্কার আছে যথার্থ, কিন্তু বিশুদ্ধ রুচির নিকট ইহা বহুকাল স্থায়ী হইতে পারিবে না। রঙ্গভূমির বন্দোবস্ত, কাঠগড়া প্রভৃতির অভাব অদ্যাপিও রহিয়াছে। কিন্তু যখন লোকে এই অভাব বুঝিতে পারিয়াছেন, তখন ইহা শীঘ্র দূর হইবে সন্দেহ নাই। ৮ই পৌষ শনিবার আগড়পাড়ায় "বিদ্যাসুন্দরে"র অভিনয় হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে জোড়াসাঁকোর সঙ্গত দল উপস্থিত ছিলেন। এই দলটি নূতন হইয়াছে এবং ইহার মধ্যে যে সকল লোক আছেন, তাঁহাদিগের অধিকাংশ যুবক। তথাপি আমরা সঙ্গীত শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়াছি। এ পর্য্যন্ত সচরাচর ঢোলক, তবলা, তানপুরা, বেহালা ও মন্দিরা আমাদিগের সঙ্গীতযন্ত্র মাত্র ছিল, কিন্তু নতন দলে ইংরাজি ফ্লুট (বাঁশী) ফ্লাজেলট, পিকলু (ছোট বাঁশী) ও বাস (বড় বেহালা) ইংরাজি যন্ত্র সকল লওয়া হইয়াছে। আমাদিগের প্রাচীন বীণা ও করতাল গ্রহণ করা হইয়াছে। পাঠকগণ বৈষ্ণবদিগের করতাল মনে করিবেন না, এই করতাল চারিখানি অষ্ট অঙ্গলি পরিমাণ লৌহ খণ্ড, প্রতিহস্তে দুইখানি লইয়া বাজাইতে হয় এবং ইহা বাজানও কঠিন। ইহা ভিন্ন সেতার, তানপুরা এসরাজ বেহালা ও ঢোলক ছিল। সঙ্গীত দল অভিনয়ের মধ্যে মধ্যে যবনিকা পতিত হইলে বাদ্য করেন। শ্রোতা-মাত্রেই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, বিশেষতঃ বাবু নীলমাধব ঘোষের ফ্লুট, বাবু যদুনাথ দত্তের বেহালা ও সর্ব্বাপেক্ষা বাবু হরিমোহন কর্ম্মকারের ঢোলক বাদ্য বিশেষ মনোহর হইয়াছিল। যেখানে যন্ত্র বাজান হয়, সেখানে বাজনার স্পষ্ট বোলগুলি বিশেষ মিষ্ট লাগে। তবে আমরা সঙ্গীত দলের একটি বিশেষ দোষ দেখিয়াছি। অভিনয়ের এক এক অঙ্ক শেষ হইবামাত্র সঙ্গীত হওয়া উচিত। কিন্তু আমরা দেখিয়া বিরক্ত হইয়াছিলাম প্রতিবার সঙ্গীত দল অপ্রস্তুত ছিলেন। যন্ত্র মিলাইতে, কোনমতে বাজাইতে হইবে তাহা স্থির

করিতে অনেক সময় যায়। এ সকল পুর্ব্বে স্থির করা উচিত এবং একজন প্রধান না হইলে চলে না। যেখানে অস্ত্রাদি প্রদর্শন করিতে চাহেন, সেখানে বিশৃঙ্খলা ঘটে। আর একটি দোষ এই বড় বাঁশীর সংখ্যা কমান উচিত। দুই দুইটি করিয়া উভয়বিধ ফ্লুট রাখিলে যথেষ্ট। আর করতাল অপেক্ষা মন্দিরা অধিক মিষ্ট, অথচ যিনি করতাল বাজান তাঁহাকে রাত্রি শেষে উর্দ্ধ বাহু হইয়া এক ঘটিকা কাল থাকিতে হয়। এ যন্ত্রটা পরিত্যাগ করা উচিত। ইহার শব্দ মনোহর নহে। আগড়পাড়ার অভিনয় প্রকৃত নাটকাভিনয় নয়। ইহা যাত্রা ও নাটক মিশ্রিত। অভিনয়ের পূর্ব্বে সেই সেকেলে আকড়াই বাজনা ও বেহালার গৎ, তৎপরে ধূর পদে শ্যামাবিষয়ের গীত শ্রুত হয়। যখন সঙ্গীত ছিল, তখন ইহার প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং গীত দুইটি অসংলগ্ন হইয়াছে। প্রথমতঃ রঙ্গভূমি ভাল হয় নাই। সঙ্গীত দলের আর এক দোষ এই তাঁহাদিগের গৎ সকল প্রায় একঘেয়ে। সেই সেকেলে সামিয়ানার নীচে মাদুর ও সতরঞ্চি মাত্র উপবেশন জন্য দেওয়া হয়। পৌষ মাসে এ প্রকার স্থানে বসা সকল শরীরে পোষায় না। ভোজ ও সঙ্গীত সকল দেশে সুখের হয়, কিন্তু আমাদিগের দেশে বিড়ম্বনা মাত্র। বাটীতে গেলে সন্তোষকর আসনে বসিয়া থালায় অন্ন আহার করেন, নিমন্ত্রণ হইলে সদ্য পরিষ্কৃত তৃণাঙ্কুরপূর্ণ প্রাঙ্গণে জলের উপরে নিরাসনে বসিয়া বেলা তিনটার সময়ে কদলীপত্রে আহার করিতে হয়। সঙ্গীত হইলে বসিবার কষ্ট, হিম ও দুর্গন্ধ কষ্টদায়ক হয়। এদেশে সর্ব্বসাধারণকে সঙ্গীত শ্রবণ করিতে দিবার প্রথা থাকাতে বসিবার কষ্ট সহজে হয়, কিন্তু নাটকের অভিনয় বিশুদ্ধ রুচিবিশিষ্ট লোকেদেরই আমোদের জন্য হয়। এস্থলে শ্রোতার সংখ্যা সীমাবদ্ধ করিলে ক্ষতি নাই। আগড়পাড়ার নাটকে দৃশ্যের মধ্যে কিছুই ছিল না। তবে আসরের উত্তরাংশে একটি কাগজের পথ ছিল এবং একটি বকুলের শাখা তাহার সম্মুখে বসাইয়া দেওয়া হয়, সুন্দর প্রথমতঃ আসিয়া তথায় উপবেশন করিয়াছিলেন এবং দক্ষিণাংশে এক ছাদের উপর হইতে মালিনী বিদ্যাকে সুন্দর দর্শন করাইয়াছিলেন। এটি বাটীর গঠনে হইয়াছিল এবং অন্যত্র অভিনয় হইলে এ সুবিধা থাকিবে না। নাট্যোক্ত ব্যক্তিদিগের বস্ত্রঘটিত অনেক দোষ ছিল। বিদ্যার বস্ত্র ঘেমটাওয়ালীদিগের ন্যায় হয় এবং যে রূপে বক্ষঃস্থলের গঠন হয় তাহা অস্বাভাবিক এবং সামান্য বেশ্যারাও এই প্রকারে স্তন প্রদর্শন করিতে পারে না। বিদ্যা সংস্কৃত উত্তমরূপে জানিবেন, এ প্রকার স্ত্রীলোকের এমত বস্ত্র নিতান্ত অরুচিকর। সুন্দরের বস্ত্র কাঞ্চীপুরের বস্ত্র নহে, ইহা বর্ত্তমান যুবক বাঙ্গালীর বস্ত্র, পেণ্টুলুন, চাপকান ও জরির টুপি। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের চাপকান, পাজামা ও পাগড়ী দিবার কি ক্ষতি ছিল। কিন্তু ইউরোপীয় স্ত্রীলোকেরা বক্ষঃস্থলে যে ব্রচ (অলঙ্কার বিশেষ) ধারণ করেন রাজার শরীরে তাহা দৃষ্ট হয়। কোটাল ও প্রহরীদিগের বস্ত্র উত্তম হইয়াছিল, কিন্তু মন্ত্রী কনষ্টা-বুলরি পুলিযের কোর্ত্তা ও ফরেজ টুপি ও বন্দুক ধারণ করিয়াছিলেন। অভিনয়কারিগণ সতর্ক হইবেন, পুলিষের বস্ত্র ব্যবহার করিলে দণ্ডবিধির সহিত গোলযোগ হইবে। মালিনীর

বেশ ঠিক হইয়াছিল, বিধবার হস্ত, কিন্তু দুশ্চরিত্র বিধবাদিগের ন্যায় সোনার দানা ও কেশ-বিন্যাস ছিল। সখীদিগের বস্ত্র ভাল হয় নাই, বিদ্যার সময়ে বাণারসি বস্ত্রের চলন ছিল-না, ঘাগরা এ স্থলের বস্ত্র। আর বিদ্যা ও সখীদিগের নাকের নোলোক পরিত্যাগ করা উচিত। বালিকারা নোলোক পরিয়া থাকে, কিন্তু যে যুবতী গোপনে নায়ক আনিতে সাহসী হন, এমত বয়ঃক্রম হইয়াছিল, তাহার এ বেশ নহে, এবং কোথাও আমরা বিদ্যার এ অলঙ্কারের বিষয় পাঠ করি নাই। এ সকল সামান্য দোষ বটে, কিন্তু অনেকগুলি সামান্য দোষ একত্রিত করিলে গুরুতর হয়। অভিনয়ের ব্যক্তিদিগের মধ্যে মালিনী সর্ব্বাপেক্ষা স্বাভাবিক অভিনয় করিয়াছিলেন, তবে সুন্দরের সহিত "মাসী" সম্পর্ক হইলেও "ভাই" বলাটা বড় কটু শুনাইয়াছিল। বিদ্যার সহিত সুন্দরের কথা, তাহার মন আকর্ষণ করা ও দূতীর প্রকৃত চতুরতা মালিনী প্রকাশ করেন। কোটালেরা ধরিলে সুন্দরের স্কন্ধে দোষ নিক্ষেপের চেষ্টা ও কাল্পনিক ক্রন্দন প্রভৃতি স্বাভাবিক হইয়াছিল। বিদ্যাও আপনার অংশ মধ্যবিধরূপে সম্পাদন করেন, কিন্তু পশ্চাৎ হইতে বলিয়া দিতে হয় এমত বিদ্যা সর্ব্বদা প্রদর্শন করা উচিত নয়। আমরা সুন্দরের অংশে সন্তোষলাভ করি নাই, বিদ্যার সহিত প্রথম আলাপের অঙ্গভঙ্গি বাক্য ও শ্লোকে অনেক আয় বৈপরীত্য প্রদর্শিত হয়। তবে বিদ্যার বিবাহকালীন ছাদনাতলায় সুন্দর 'বরটির' ন্যায় স্বাভাবিকরূপে দণ্ডায়মান ছিলেন, এবং পূর্ব্বের অভিনয় ঘটিত দোষ স্ত্রী আচারের সময়ের কানমলায় ক্ষালিত হইয়াছিল। রাজার অংশ উত্তম হইয়াছিল, আমরা এ ব্যক্তির গাম্ভীর্য্য বাক্য ও অঙ্গ-ভঙ্গিতে যথার্থ সন্তোষলাভ করিয়াছিলাম, তবে ভবিষ্যতে তাঁহাকে শ্মশ্রুহীন অবস্থায় প্রদর্শন না করিয়া যথার্থ ক্ষত্রিয়ের বেশে প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য হইতেছে। কোটালদিগের অংশও উত্তম হইয়াছিল, দর্শকেরা শেষে হিজড়াকে দর্শন করিয়া অকৃত্রিম আনন্দ ভোগ করেন। উভয় আকৃতি ও বর্ণে হিজড়ার কোন বৈলক্ষণ্য ছিল না, কথা ও গানের ত কথাই নাই। অভিনয়কালীন যে সকল গান হয়, তাহার অধিকাংশ উত্তম বোধ হইয়াছিল। বিশেষতঃ শ্রোতৃবর্গ বাবু যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গীতে বিশেষ আনন্দ লাভ করেন। ইনি নট সাজিয়াছিলেন। বস্তুতঃ ইনি অভিনয়ের জীবনস্বরূপ বাচোয়া যাহার তাহার মুখে ভাল লাগে না, এবং অঙ্গভঙ্গি গ্রাহকের অহঙ্কারের স্বরূপ। যদুবাবু এ বিষয়ে সম্পূর্ণ প্রশংসার উপযুক্ত। প্রাতঃকালে দুইটি স্ত্রীলোকবেশধারী বালক নৃত্য করে, নৃত্য উত্তম হইয়াছিল, এবং সেই সময়ে সঙ্গীত দলের বাদ্য আরও মনোহর হইয়াছিল।

যাহা হউক, আমরা আগড়পাড়ায় শনিবার রাত্রি সুখে যাপন করিয়াছিলাম। শিশির ও বসিবার কষ্ট পীড়াদায়ক হইয়াছিল। এ পর্য্যন্ত অভিনয় প্রকৃত প্রণালীতে হইতেছে না, ইহাকে উৎকৃষ্ট যাত্রা বলিলেও চলে। কিন্তু অধ্যক্ষদিগের যত্ন আছে, যখন অল্পদিনে এতদূর হইয়াছে তখন শীঘ্র উন্নতি হইবে এ আশা করা যাইতে পারে, এস্থলে আমরা একথা বলা কর্ত্তব্যকর্ম্ম জ্ঞান করিতেছি, রাজা সাধু ভাষায় প্রায় কথা বলেন, ইহাতে

শ্রোতৃগণ অসন্তুষ্ট হন নাই। ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে ইতর চলিত কথা রাখিয়া আর সকল সাধুভাষা দিলে উত্তম হয় তাহার সন্দেহ নাই। আমরা ভরসা করি শীঘ্র সর্ব্বত্র নাটক অভিনয়ে সাধারণ এ বিষয়ে মনোযোগী হইবেন। আর যাঁহার যে গীত বলা উচিত, তাহা হইলে ভাল হয়। শীঘ্র ইহা হইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু এটি যেন দৃষ্টি পথের বহির্ভূত না হয়।

মালতীমাধব নাটকের অভিনয়। ৫ই ফাল্গুন ১২৭৫। ১৪ সংখ্যা

গত ২৫ শে মাঘ শনিবার রাত্রিতে আমরা পাথুরিয়াঘাটায় মালতীমাধব নাটকের অভিনয় দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। নাটকের গল্প এই :

বিদর্ভনগরের মন্ত্রিপুত্র মাধব নিজ বন্ধুসহ উপস্থিত হইয়া তত্রত্য মন্ত্রীর কন্যা মালতীকে দর্শন করেন এবং তাহার প্রতি আসক্ত হন। মালতীরও মনে অনুরাগসঞ্চার হয়। মকরন্দও মালতীর সহচরী দময়ন্তিকার প্রতি অনুরক্ত হইলেন। নায়ক নায়িকাদিগের পরস্পর মিলনের চেষ্টা হইতেছে, এমন সময়ে অঘোরঘণ্ট নামক একজন যোগী যোগসিদ্ধির উদ্দেশে মালতীকে বলি দিবার নিমিত্ত এক শ্মশানে লইয়া গেলেন। মাধব তথায় উপস্থিত হইয়া যোগীকে বধ করিয়া তাঁহার উদ্ধার সাধন করিলেন। রাজার এই চেষ্টা ছিল যে দময়ন্তিকার ভ্রাতা নন্দনের সহিত মালতীর বিবাহ হয়, কিন্তু পরিব্রাজিকা কামন্দকীর কৌশলে সে চেষ্টা সফল হইল না। উহারই কৌশলে মকরন্দ স্ত্রীবেশে বাসরগৃহে প্রেরিত হইলেন। সেইখানে দময়ন্তিকাকে লইয়া পলায়ন করিয়া আসিতেছেন, এমন সময়ে নগররক্ষক তাঁহাকে ধরিল। মাধব তাঁহার সাহায্যার্থ গমন করিলেন। মালতীকে একাকিনী দেখিয়া অঘোরঘণ্টের শিষ্যা কপালকুণ্ডলা গুরুবধজনিত বৈরনির্য্যাতনের অবসর পাইলেন। তিনি তাঁহাকে নরবলি দিবার নিমিত্ত শ্রীপর্ব্বতে লইয়া গেলেন, তথায় সৌদামিনী তাঁহাকে রক্ষা করিলেন, মাধব প্রিয়াবিরহে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া মকরন্দসমভিব্যাহারে তাঁহার অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনেক কষ্টের পর মালতীকে দেখিতে পাইলেন, পরে মন্ত্রির সম্মতি ক্রমে উভয়ের বিবাহ হইল।

যে গ্রন্থ দেখিয়া অভিনয় হইয়াছে, এখানি সংস্কৃত মালতীমাধব অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে। কিন্তু লেখক সকল দিক সমন্বয় করিয়া আপনার লিপিনৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। আমাদিগের প্রাচীন কালের কবিগণ ঘরে বসিয়া ভূগোল বর্ণনা করিতেন এটী দোষ সন্দেহ নাই ; কিন্তু এ দোষ প্রাচীন কালের বলিয়া মার্জ্জিত হইয়া থাকে, কিন্তু এখনকার এ দোষ মার্জ্জনীয় নহে শ্রীপর্ব্বত মধ্যভারতবর্ষস্থিত। মধ্য ভারতবর্ষে বৃহৎ ও অধিকসংখ্যক নদী নাই। এখনও তথায় কয়েকটীমাত্র প্রধান নগর আছে, মধ্য ভারতবর্ষে এরূপ উচ্চ একটিও পর্ব্বত নাই যে তথা হইতে সমুদ্র দৃষ্টিগোচর

হয় কিন্তু মকরন্দ শ্রীপর্ব্বতে বসিয়া বন্ধুকে সান্ত্বণা করিবার নিমিত্ত বলিতেছেন, "দেখ এখান হইতে কত সমুদ্র কত নদ, কত নদী, কত নগর দেখা যাইতেছে!" কোন্ নদ, কোন্ নদী ও কোন্ সমুদ্র এখান হইতে দেখা যায়? অতি উচ্চ পর্ব্বত হইলেও কি তথা হইতে আবার সমুদ্র অথবা বঙ্গদেশীয় তথায় দর্শন করা সম্ভাবিত হয়। গ্রন্থের নায়ক মাধব; কিন্তু তাঁহার অভিনয় প্রীতিকর হয় নাই। বন্ধুকে ব্যাঘ্রে আক্রমণ করিলে মাধব "কৈ" "কৈ" কে কোথায় আছে? বলিয়া একটী স্ত্রীলোককে সম্মুখে অগ্রসর করিয়া দিলেন, নিজে নায়িকার অনুরোধে গমন না করিয়া একটী স্ত্রীলোককে "কি হইতেছে" দেখিতে বলিলেন এটী নিতান্ত কাপুরুষের কাজ। কোন গ্রন্থকার কখন নায়ককে এরূপ কাপুরুষ করিয়া বর্ণন করেন নাই।

মকরন্দের অভিনয়টী অতিশয় মনোহব হইয়াছে। তাঁহাব অভিনয়ে চতুরতা, তীক্ষ্ণবুদ্ধিতা, সদাশয়তা ও অকপট মিত্রানুরাগ প্রকাশ পাইয়াছে। অঘোরঘণ্টনের পূজা মন্ত্রপাঠ, কপালকুণ্ডলার বলিদানেব উদ্যোগ হইয়াছে বলিয়া জিজ্ঞাসা এগুলি অতি সুন্দর হইয়াছিল। মাধব যখন মালতীর উদ্ধারসাধন করিলেন তখন তাহার মনোরথ বিফল ও যোগসিদ্ধির ব্যাঘাত হইল দেখিয়া তাঁহার প্রগাঢ় ক্রোধ গালী না দিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সহকারে কটিবন্ধন, অব্যাকুলভাবে মাধবকে খড়্গাঘাত করিবার উদ্যোগ, নয়নরক্তিমা ও অঙ্গভঙ্গী এগুলি অতিশয় চমৎকার হইয়াছিল। বৃদ্ধ মন্ত্রীর যোগিবেশ ও ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করিয়া শোক সম্বরণ অপ্রীতিকর হয নাই। মালতীব অভিনয় উত্তম হইয়াছে। কামন্দকীর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব স্ত্রীজনদুর্লভ প্রশান্ত সাহস ও চতুরতা অতিশয় আনন্দিত করিয়াছিল। চন্দ্রোদয় মেঘাডম্বর বিদ্যুৎ জলপ্রপাত প্রভৃতিও যাবপব নাই প্রীতিকর হইয়াছিল। এখানকার একতানবাদ্যের ন্যায় বাদ্য আমরা আব কোথাযও শ্রবণ কবি নাই।

যাত্রাগানের পুস্তক। ৬ আষাঢ় ১২৭৮। ৩১ সংখ্যা

চিঠি

সম্প্রতি ঢাকার প্রসিদ্ধ "স্বপ্নবিলাস ও রাই উন্মাদিনী" নামক যাত্রাগান রচয়িতা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল গোস্বামী মহাশয় "বিচিত্র বিলাস" নামে আর এক নূতন যাত্রাগান রচনা করিয়াছেন। কোণ্ডা গ্রামবাসিদিগের যত্নে ও অর্থ ব্যয়ে এই যাত্রার অভিনয় হইতেছে। প্রায় প্রতি রবিবার উহার অভিনয় হইয়া থাকে। আজি কালি এখানে ইহা সর্ব্বসাধারণের আলোচ্য বিষয় হইয়া উঠিয়াছে! এতৎ সম্বন্ধে নানা জনে নানা মত প্রকাশ করিতেছেন। আমরা স্বীকার করি, সঙ্গীতগুলি উত্তম হইয়াছে। রাগ, রাগিনী ও পদবিন্যাস মন্দ হয় নাই। অনুপ্রাস, যমক, উপমান, উৎপ্রেক্ষা রূপক প্রভৃতি অলঙ্কারের বিলক্ষণ সদ্ভাব আছে এবং হাস্য, বীভৎস রৌদ্র ও করুণ প্রভৃতি অনেকগুলি রসেরও সমাবেশ করা

হইয়াছে। গানগুলিও সহজ ভাষায় বিরচিত হইয়াছে, কিন্তু রাই উন্মাদিনী ও স্বপ্ন বিলাসের সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে না। যাঁহারা স্বপ্ন বিলাস ও রাই উন্মাদিনী গান শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকটে বিচিত্র বিলাস নূতন বলিয়া বোধ হইবে না। ইহাতে উক্ত গানদ্বয় হইতে অধিকাংশ ভাব, রাগ, রাগিনী, সুর ও তাল মানাদি গ্রহণ করা হইয়াছে। রচনাও তাদৃশ উৎকৃষ্ট নহে। যদিও বিচিত্র বিলাসের সরলতা গুণটী অপেক্ষাকৃত অধিক, কিন্তু ইহাতে অশ্লীলতা দোষ বিলক্ষণ আছে। সত্য বটে, কৃষ্ণলীলাই অশ্লীলতাপূর্ণ, কিন্তু এই যাত্রার কতকগুলি গানে অশ্লীলভাব ও অঙ্গ ভঙ্গী প্রভৃতি যেরূপ স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হয়, অন্য কোন যাত্রার গানে তদ্রূপ নহে। গুরু জনের নিকটে বসিয়া এই গান শ্রবণ করা যায় না। পিতা, পুত্র, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং মাতা কন্যা প্রভৃতি এক স্থানে বসিয়া নির্লজ্জ মনে বিচিত্র বিলাস শ্রবণ করিতে পারেন না। যদি বিচিত্র বিলাস পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণের এক স্থানে বসিয়া শ্রোতব্য হয়, তাহা হইলে বেশ্যালয়ে গিয়া এক বেশ্যার সঙ্গে পিতা, পুত্র জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার একত্রে আমোদ প্রমোদ করাও দূষণীয় নহে। যাহা হউক, আমাদের মতে স্বপ্ন বিলাস প্রথম, রাই উন্মাদিনী দ্বিতীয় এবং বিচিত্র বিলাস গুণে ভাবে, রসে, অলঙ্কারে তালে মানে, রাগে, রাগিনীতে সর্ব্ব বিষয়ে তৃতীয় হইয়াছে। গোস্বামী মহাশয় আমাদের প্রতি বিরক্ত হইবেন না। আমরা বিলক্ষণ জানি, তিনি পূর্ব্ব বাঙ্গলার একজন বিজ্ঞ, বহুদর্শী ও অদ্বিতীয় সঙ্গীত-বিদ্যা-বিশারদ পণ্ডিত, স্বপ্ন বিলাস ও রাইউন্মাদিনীই ইহার প্রমাণ দিতেছে। কিন্তু বিচিত্র বিলাস তাঁহার নামানুরূপ হয় নাই। বিচিত্র বিলাস সকলের আলোচনার বিষয় হওয়াতেই আমরা তদালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। কিন্তু তাঁহাকে বড় দোষ দিতে পারি না; কারণ, গ্রন্থকারের প্রথম ও দ্বিতীয় পুস্তক যেরূপ উত্তম হয়, পরবর্ত্তী গ্রন্থ সকল অনেক স্থলে সেরূপ হয় না।

১লা আষাঢ়

১২৭৮

নাটকাভিনয়। ১৭ পৌষ ১২৭৯। ৭ সংখ্যা

জ্বর, ওলাউঠা, বসন্ত এ সকলের এক এক সময়ে মরসুম পড়ে, আজিকালি নাটকাভিনয়ের মরসুম পড়িয়াছে। যেখানে অভিনয়কারির দল না হইয়াছে, সে গ্রাম বিরল। আমাদিগের পত্রপ্রেরকেরা স্থানে স্থানে অভিনয় হইতেছে বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। এ আনন্দ প্রকাশ সুসঙ্গত হইতেছে কি না? এ সকল অভিনয়ে দেশের ইষ্ট অথবা অনিষ্ট ইহার অন্যতর কি হইতেছে? নাটকাভিনয়ে উপকার আছে কি না? প্রায়শঃ এইগুলি বিবেচনা করা যাইতেছে।

মানুষ সভ্য পদবীতে অধিরূঢ় হইয়া যে সমস্ত বিশুদ্ধ আনন্দ ভোগ করেন, নাটকাভিনয় তাহার অন্যতর মুখ্যতম কারণ। আলঙ্কারিকেরা "কাব্য রসাত্মক বাক্য" কাব্যের এই লক্ষণ করিয়াছেন। দৃশ্য ও শ্রাব্য ভেদে কাব্য দুই প্রকার। নাটক রূপকাদি দৃশ্যকাব্যের অনেকগুলি ভেদ আছে। শৃঙ্গার বীর করুণ রৌদ্র হাস্য ভয়ানক বীভৎস অদ্ভুত শান্ত এই নয় প্রকার রস। এক এক রসের এক একটী স্থায়ীভাব আছে। রতি শৃঙ্গার রসের উৎসাহ বীর রসের শোক করুণ রসের ক্রোধ রৌদ্র রসের হাস হাস্য রসের জুগুপ্‌সা বীভৎস রসের বিস্ময় অদ্ভুত রসের শম শান্ত রসের স্থায়ীভাব। এই স্থায়ী ভাবগুলি বিভাব অনুভাব সঞ্চারিতভাবে মিলিত হইয়া সামাজিকদিগের হৃদয়ে রসতা প্রাপ্ত হয়। বিভাব দুই প্রকার। আলম্বন ও উদ্দীপন। আলম্বন নায়ক নায়িকাদি, উহাদিগকে অবলম্বন করিয়া রসের উদয় হয়। চন্দ্র চন্দন কোকিলাদি উদ্দীপন বিভাব। ভ্রূবিক্ষেপ কটাক্ষাদি অনুভাব। শ্রম মত্ততা জড়তা প্রভৃতি সঞ্চারি ভাব। অভিনয় শব্দের অর্থ অবস্থার অনুকরণ। এক ব্যক্তি রামের ও এক ব্যক্তি রাবণের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া রঙ্গভূমিতে উপনীত হইল। রাম ও রাবণ যেরূপ পরস্পরের ক্রোধোদ্দীপক বাক্‌প্রয়োগ ও রণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন, ভূমিকাগ্রাহীরাও সেইরূপ করিতে লাগিল। কবির বর্ণনার চমৎকারিতা ও অভিনয়কারিদিগের অভিনয়-নৈপুণ্যের গুণে সামাজিকদিগের তন্ময়তা হইয়া উঠিল। তাহাদিগের মনে এমনি উৎসাহ বৃদ্ধি হইল, তাঁহারাই যেন রাম ভাব প্রাপ্ত হইয়া রাবণের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। কতক্ষণে রাবণ বধ হইবে তদর্থ তাঁহাদিগের অতিশয় ব্যগ্রতা জন্মিল। তৎকালে সামাজিকদিগের যে প্রকার মনের ভাব হয়, যে সকল সহৃদয় ব্যক্তির অভিনয় দর্শনকালে ঐরূপ মনের ভাব হইয়াছে, তাঁহারাই বুঝিয়াছেন। তৎকালে যে কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ ভোগ হয়, তাহা কহিয়া দিবার নয়, বুঝাইয়া দিবাব নয়। যাঁহাদিগের সহৃদয়তা নাই, তাঁহারা তাহা কখন বুঝিতে পারেন নাই, বুঝিতে পারিবেন সে সম্ভাবনাও নাই। অভিনয় সভ্য সমাজের অনির্ব্বচনীয় বিশুদ্ধ আনন্দ সম্ভোগের উপায় বলিয়া কালিদাস, সেক্‌সপিয়ার প্রভৃতি অনেক মহাকবি হইয়া গিয়াছেন। অভিনয়গত উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠাও প্রদর্শিত হইয়াছে। সভ্য পদবীতে অধিরূঢ় হিন্দু, গ্রীক, রোমক প্রভৃতি এই আনন্দ ভোগ করিয়াছিলেন।

পাঠকগণ দেখিলেন, অভিনয়ের কেমন উপযোগিতা ও উপকারিতা আছে। এই অভিনয়প্রথা থাকাতে অনেক মহাকবি প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, এবং এক এক সভ্য সমাজ এক এক সময়ে বিশুদ্ধ আনন্দ ভোগ করিয়াছেন। আমাদিগের দেশে যে সকল অভিনয় হইতেছে, ইহার এই প্রকার উপযোগিতা আছে কি না, এখনকার এই জিজ্ঞাসা। এদেশে বহুদিন অবধি যে একটী যাত্রা প্রথা হইয়াছে, উহা এই অভিনয়ের অপভ্রংশ। অপভ্রংশে বিশুদ্ধ ভাব থাকিবার সম্ভাবনা নাই। উহাতে অনেক গ্রাম্যতা ও অশ্লীলতাদি দোষ প্রবেশ করিয়াছে। উহা সভ্য সমাজের সমুচিত নহে। ঐ প্রথা থাকাতে রুচিবিকার জন্মিবার

বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। অতএব উহাব উচ্ছেদ হইলেই সমাজের পরম মঙ্গল্। উল্লিখিত অভিনয়প্রথা উহার উচ্ছেদ করিবার সুন্দর উপায় হইয়াছে। অনেকের কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিবাব ইচ্ছা ও চেষ্টা জন্মিযাছে। কালক্রমে ভাবতচন্দ্রের ন্যায মহাকবিও জন্মগ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু দুটী দোষের নিমিত্ত বর্ত্তমান অভিনযগুলি আমাদিগের রুচিকর হইতেছে না। প্রথম, যে সকল নাটক রচিত হইতেছে, তাহাব অধিকাংশ অপকৃষ্ট। সেগুলির রচনা যে কেমন চমৎকার, নিম্নলিখিত কবিতা দুটী পাঠ কবিলেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন।

> "কাস্তে হাতে নাচ্‌তে নাচ্‌তে কৃষ্ণ আসছে ঐ।
> চুড়া ধড়া সব আছে মযর পাখা কৈ?"
> "বাড়ীব কাছে আছে তাল বোনা,
> ডেক নাবে কোকিল পাখী করি রে মানা।"

ইদানীন্তন অধিকাংশ বাঙ্গালা নাটকে এই প্রকাব বচনা প্রবেশ কবিয়াছে। গল্প বচনারও চাতুবী নাই। এরূপ রচনাপূর্ণ গ্রন্থ দ্বারা সম্ভব উপকার না হইযা রুচিবিকাররূপ অপকাব ঘটিবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

দ্বিতীয়, অধিকাংশ স্থলে বিদ্যালযেব বালক ও শিক্ষক লইয়া অভিনয করা হইতেছে। ইহাতে সমাজের যাবপরনাই অপকারেব সম্ভাবনা। লেখাপডাব সমযে আমোদেব দিকে মন গেলে পডাশুনা হয না, এটী সিদ্ধান্ত বাক্য। আমবা বিশেষ করিযা দেখিয়াছি, যাহার মনে কাব্যরস প্রবেশ করে, তাহার ব্যাকবণ পাঠে প্রবৃত্তি থাকে না। বিশেষতঃ এদেশেব লোকের শ্রমসাধ্য কার্য্যে স্বভাবতঃ প্রবৃত্তি নাই, আমোদেই অনুবাগ অধিক। বাল্যকালে যদি সেই আমোদের পথেব পথিক করিযা দেওযা হয, তাহা হইলে কি আব রক্ষা থাকে? আমবা দেখিযাছি, অনেক বালক বিদ্যালযে দিব্য পডাশুনা কবিতেছিল, অভিনয় ধরিয়া লেখাপড়া পরিত্যাগ কবিযা যারপরনাই জঘন্য হইযা গিয়াছে। বিদ্যালয়ের বালক ও শিক্ষকগণ কোথায সর্ব্বদা পড়াশুনা লইয়া থাকিবেন, তাহা না হইয়া কেহ সাগরিকা সাজিতেছেন, কেহ ভগী চাকরাণী হইতেছেন, কেহ গুরুমহাশয়েব পাঠশালার পড়ো সাজিযা ময়রাণীকে ক্ষেপাইতেছেন, ইহা কি বিডম্বনা নয? যাহাবা অভিনয় করিতে যায, তাহাদিগেব অধিকাংশের চবিত্র মন্দ হইযা যায। যে প্রকার লোকেব সংসর্গ হয, তাহাতে যে চরিত্র মন্দ হইবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয নহে। যদি বিদ্যালযের বালক ও শিক্ষক ধরিযা অভিনয় করিবার প্রথা পরিত্যাগ কবিযা ব্যবসাযী লোক দ্বাবা অভিনয় করা হয়, আমাদিগের কোন আপত্তি থাকে না। পূর্ব্বে ব্যবসাযী লোক দ্বারা অভিনয় করাইবারই রীতি ছিল। প্রাচীন নাটকাদি পাঠ কবিলে তাহাই স্পষ্ট বোধগম্য হইয়া থাকে।

বসন্তকুমারী নাটক। ১৪ ফাল্গুন ১২৭৯। ১৫ সংখ্যা

ভাষার বিশেষজ্ঞতা ও আচার ব্যবহারাদির সবিশেষ অভিজ্ঞতা ব্যতিরেকে কাহার নাটক রচনা করিয়া কৃতার্থতা লাভের সম্ভাবনা নাই। এক সমাজের লোকের অপর সমাজের এ সকল বিষয়ে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভের সম্ভাবনা অল্প। আমাদিগের এই সংস্কার ছিল, মুসলমান ও ইংরাজ প্রভৃতি অন্য সমাজের লোকেরা আমাদিগের সমাজের বৃত্তান্ত লইয়া নাটক রচনা করিয়া কখন কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। কিন্তু বসন্তকুমারী নাটকখানি আমাদিগের এ সংস্কারকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। ইহার প্রণয়নকর্ত্তা মুসলমান। নাটকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, গ্রন্থকার আমাদিগের আচার ব্যবহারাদিগত নিগূঢ় বৃত্তান্তগুলি সূক্ষ্মরূপে অবগত হইয়াছেন। নাটকোক্ত প্রতি ব্যক্তির আচরণ কথাবার্ত্তা ভাবভঙ্গী আমাদিগের সমাজের অনুরূপ হইয়াছে। পাঠকালে কোনরূপেই এরূপ বোধ হয় না যে মুসলমানে এখানি লিখিতেছেন। রচনাতেও মুসলমানগন্ধ নাই। যাঁহারা বলেন, আমরা যে ভাষায় কথোপকথন করি, সেই ভাষায় গ্রন্থ না লিখিলে বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি হইবে না, তাঁহারা দেখুন, তাঁহাদিগের সিদ্ধান্ত কেমন অপসিদ্ধান্ত। বসন্তকুমারী নাটককার সাধু বাঙ্গালায় গ্রন্থ না লিখিয়া যদি চলিত ভাষায় লিখিতে যাইতেন, তিনি নিঃসংশয় মুসলমান বলিয়া ধরা পড়িতেন, তাঁহার গ্রন্থ অনাদরোপহৃত হইত সন্দেহ নাই। সাধু বাঙ্গালা ভাষার গ্রন্থ প্রণয়ন প্রবৃত্তি ও চেষ্টা ব্যতিরেকে বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি সম্ভাবনা নাই, এতদ্দ্বারা এ সিদ্ধান্তও অভ্রান্ত বলিয়া অঙ্গীকৃত হইতেছে।

আমরা গ্রন্থের প্রশংসা বিষয়ে এতক্ষণ অনেক বলিলাম, এখন দোষের বিষয়েও কিছু বলা আবশ্যক হইতেছে। গ্রন্থের প্রারম্ভেই একটী প্রস্তাবনা লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এটী লিখিয়া যে কি ইষ্টলাভ হইয়াছে আমরা বুঝিতে পারিলাম না। বোধ হয়, সংস্কৃত নাটককারদিগের অনুকরণ করিয়া গ্রন্থকার ইহার অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু সংস্কৃত কবিরা যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, ইনি সে পথে যান নাই। সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা প্রস্তাবনার এই লক্ষণ করিয়াছেন :

> "নটী বিদূষকোবাপি পারিপার্শ্বিক এববা।
> সূত্রধারেণ সহিতাঃ সংলাপং যত্র কুর্ব্বতে।
> চিত্রৈর্ব্বাক্যৈঃ স্বকার্য্যোত্থৈঃ প্রস্তুতাক্ষেপিভির্মিথঃ আমুখং
> তত্তু বিজ্ঞেয়ং নাম্না প্রস্তাবনাহাপি সা।"

নটী বিদূষক অথবা পারিপার্শ্বিক সূত্রধারের সহিত এরূপ কথোপকথন করিবে যে তদ্দ্বারা প্রস্তুত গ্রন্থের অবতারণা হইবে। বসন্তকুমারীর প্রস্তাবনায় কোনক্রমেই এ লক্ষণের সমন্বয় হইতেছে না। প্রস্তাবনার শেষ ভাগে আছে, নেপথ্যে সভাভঙ্গবাদ্য। তাহার পরেই

নট বলিল "প্রিয়ে শুনছ রাজা বীরেন্দ্র সিংহের সভাভঙ্গ হলো। চলো আমরা যাই।" বীরেন্দ্র সিংহ বসন্তকুমারী নাটকের একজন প্রধান পাত্র, তাঁহার সহিত নট নটী বাক্যের এইমাত্র সম্বন্ধ, ইহাতে কিরূপ আলঙ্কারিকদিগের কৃত প্রস্তাবনার লক্ষণ সমন্বয় হইল আমরা বুঝিতে পারিলাম না। অলঙ্কার শাস্ত্রে প্রস্তাবনার কথোদ্ঘাতাদি পাঁচটী ভেদ করাই হইয়াছে। রত্নাবলীতে সূত্রধারের বাক্য গ্রহণ করিয়া যৌগন্ধরায়নের, বেণীসংহারে বাক্যার্থ গ্রহণ করিয়া ভীমের প্রবেশ হইতেছে, বসন্তকুমারীতে সেরূপ হইতেছে না।

বসন্তকুমারীর গল্পটীও অতি সামান্য রূপ হইয়াছে। গল্প রচনা বিষয়ে গ্রন্থকারের কোন প্রকার চাতুর্য্য প্রকাশ হইতেছে না। গ্রন্থখানি করুণ রস প্রধান, কিন্তু যেরূপে গ্রন্থের উপসংহার করা হইয়াছে, তাহাতে "ফলেনো আর মলো' এই যে প্রবাদ বাক্যটী আছে তাহাই আমাদিগের স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল। গ্রন্থকার এত ব্যস্ত না হইলে উপসংহারটি অধিকতর মনোহর হইত সন্দেহ নাই। গ্রন্থকর্ত্তা বসন্তকুমারীর সতীত্বের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া এদেশীয় রমণীগণের রমণীয় সতীত্ব গুণ প্রতিপাদন চেষ্টা পাইয়াছেন, কিন্তু বসন্তকুমারীর সতীত্বের যেরূপ তাড়াতাড়ি বর্ণন করা হইয়াছে, তাহাও ইষ্ট ফলোপধায়ী হয় নাই। রেবতীর অসতীত্ব বর্ণনও বিসদৃশ হইয়াছে, এই দুই স্থানে গ্রন্থকার আপনার গল্প রচনা কৌশল ও বর্ণনা নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিতে না পারাতে তাঁহার যে তত সহৃদয়তা নাই তাহাই সপ্রমাণ হইতেছে।

আধুনিক রঙ্গভূমি। ১৯ মাঘ ১২৮০। ১৫ সংখ্যা

কয়েক বৎসর অবধি দেশে রঙ্গভূমির শ্রীবৃদ্ধি দেখা যাইতেছে। নানা দিকে নানা সম্প্রদায় উৎসাহের সহিত অভিনয়কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। দেখিলে বোধ হয় নাটক লেখা যেন দেশীয় গ্রন্থকারদিগের এবং নাটক অভিনয় করা ও অভিনয় দর্শন করাই যেন যুবকদিগের প্রধান কার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের যুবকগণ যখন যে দিকে গমন করেন তখন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়াই সে দিকে ধাবিত হন। দেখিতে দেখিতে এক কলিকাতাতেই তিনটি প্রকাশ্য রঙ্গভূমি নির্ম্মিত হইয়াছে। তিন সম্প্রদায় অন্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল এই কার্য্যে ব্যস্ত হইয়াছেন। এমন কি এক সম্প্রদায় রঙ্গভূমিতে কুলটা অভিনেত্রী নিযুক্ত করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা বাহাদুরি দেখাইয়াছেন। ঐ তিন সম্প্রদায়ই রঙ্গভূমিকে ব্যাবসায়ের দ্বার করিয়াছেন। তাহা মন্দ নহে, কিন্তু তাঁহারা লাভবান হইতে পারিবেন কি না বিশেষ সন্দেহ। আজিও বাঙ্গালিদিগের সেরূপ ধনবৃদ্ধি হয় নাই যে আমোদার্থে মাসে এত ব্যয় করিতে পারেন। একে সেরূপ সম্পন্ন লোকের সংখ্যা অধিক নয়, তাহাতে আবার তিনটী ভিন্ন ভিন্ন রঙ্গভূমি। সম্ভবতঃ তিন সম্প্রদায়কেই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি যদি লাভ ও

ক্ষতির উপর রঙ্গভূমিগুলির জীবন ও মৃত্যু নির্ভর করে তাহা হইলে তিনটী কখনই দীর্ঘজীবী হইবে না। যে সম্প্রদায়ের অভিনেতারা অপেক্ষাকৃত দক্ষতা দেখাইতে পারিবেন এবং যাঁহারা ভাল ভাল গ্রন্থকারদিগকে হস্তগত করিতে পারিবেন তাহাদেরই রক্ষা পাইবার অধিক সম্ভাবনা।

এক সময়ে ভারতবর্ষে দৃশ্যকাব্যের যথেষ্ট চর্চ্চা হইয়াছিল।...কালক্রমে সে সমুদায় বিকৃতভাব ধারণ করে। সম্প্রতি দেশের লোকের চিন্তার ও রুচির উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে অভিনয় কার্য্যেরও উৎকর্ষ আবশ্যক হইয়াছে এবং সেজন্য চেষ্টাও হইতেছে। এই রঙ্গভূমিগুলি তাহার ফল স্বরূপ। রঙ্গভূমির পুনরুজ্জীবনে আনুষঙ্গিক দেশের অনেক উন্নতি হইবে। প্রথম এই উত্তেজনায় অনেক গ্রন্থকারের শক্তি বিকশিত হইবে; অনেক ভাল ভাল নাটক রচিত হইবে, চিত্র বিদ্যা এবং সঙ্গীত বিদ্যার যথেষ্ট উন্নতি হইবে। অপর দিকে লোকের রুচি পরিষ্কৃত হইবে এবং ভাল ভাল নাটকের অভিনয় হইলে দেশের ধর্ম্মনীতিরও উন্নতি হইতে পারে। ইহা ভিন্ন রঙ্গভূমির শ্রীবৃদ্ধি হইলে দেশের একটি বহু দিনের অভাব দুর হইবে। তাহা এই বালককে এক একবার খেলিতে না দিলে যেমন সে প্রায় অকর্ম্মণ্য হইয়া যায় সেইরূপ যে জনসমাজে লোকের বিনোদনের কোন প্রকার নির্দ্দোষ উপায় নাই সে জনসমাজ প্রায় অকর্ম্মণ্য কিম্বা ধর্ম্মনীতিভ্রষ্ট হইয়া যায়। আমোদ চিরকাল মনুষ্যকে আকর্ষণ করিবেই করিবে, কোন প্রকার নির্দ্দোষ আমোদের উপায় না থাক, লোকে সদোষ আমোদের অন্বেষণে অগ্রসর হইবে। রঙ্গভূমির উৎকর্ষ হইলে সেই মহৎ অনিষ্ট নিবারিত হইবে। সভ্য সমাজ মাত্রেরই রঙ্গভূমি একটী প্রধান অঙ্গ। এই জন্য কি প্রাচীন কি আধুনিক সকল সভ্যসমাজ মাত্রেই রঙ্গভূমির উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায়।

আমরা যে উপলক্ষে রঙ্গভূমি সম্বন্ধে এত কথা বলিতেছি তাহা এই। আমরা গত বুধবার বিশেষ অনুরুদ্ধ হইয়া গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার কোম্পানির রঙ্গভূমিতে মৃত দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণের অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। রঙ্গভূমিটী নির্ম্মিত ও সজ্জিত করিতে অধ্যক্ষদিগের প্রচুর অর্থ ব্যয় হইয়াছে। আলেখ্য পট, সমবেত বাদ্য প্রভৃতি অভিনয়ের সকল অঙ্গই সুন্দর ও মনোরম হইয়াছিল। মূল অভিনয়টীর সম্বন্ধে কিছু বিশেষ করিয়া বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে। অভিনয় উৎকৃষ্ট হইলে কিম্বা অপকৃষ্ট হইলে তাহা বুঝিবার দুইটী লক্ষণ আছে। প্রথম নাটকখানি পড়িয়া না গেলেও যদি অভিনেতারা গ্রন্থকারের বর্ণিত চরিত্রগুলি ও ঘটনাগুলি দর্শকদিগের মনে দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত করিতে পারেন তাহা হইলে সে অভিনয়কে উৎকৃষ্ট বলিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, দেখিতে দেখিতে অভিনয়ের কথা বিস্মৃত হইয়া দর্শকেরা যদি সে সমুদায়কে বাস্তবিক ঘটনা বলিয়া মনে করেন এবং তদনুসারে হৃদয় ক্ষণে ক্ষণে হর্ষ শোকে আন্দোলিত হইতে থাকে, চক্ষে জলধারা বহিতে থাকে কিম্বা ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ

হইতে থাকে, তাহা হইলে সে অভিনয় উৎকৃষ্ট। এই দুইটী লক্ষণ অনুসারে বিচার করিতে গেলে সে দিনের অভিনয়কে উৎকৃষ্ট শ্রেণীভুক্ত করা যায় না। কেবল ক্ষেত্রমণির উদ্ধার প্রভৃতি দুই এক স্থানে অভিনয় বলিয়া মনে হয় নাই, নতুবা সকল স্থানেই অভিনয় বলিয়া মনে হইয়াছে। শ্রেণী বিভাগ করিয়া বলিতে গেলে ক্ষেত্রমণির মৃত্যু-শয্যা, নবীন মাধবের মৃত্যুশয্যা, বালকদিগের হস্তে ময়রাণীর নিগ্রহ, মাজিষ্ট্রেটের আদালত এই কয়টী দ্বিতীয় শ্রেণী গণ্য, অপর সকলগুলি তৃতীয় শ্রেণী গণ্য। অভিনেতাদিগের মধ্যে তোরাপ, খাঁউড় সাহেব, রোগ সাহেব, পাদ্রী, ক্ষেত্রমণি প্রথম শ্রেণী গণ্য, নবীন মাধব, গোলক বসু সৈরিন্ধ্রী সরলা সাধুচরণ দ্বিতীয় শ্রেণী ভুক্ত। অপর সকলে তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত।

অভিনয় দেখিলে নাটককর্ত্তার দোষগুণ অনেক জানা যায়। দীনবন্ধু বাবু নবীন মাধব ও তোরাপের চরিত্র দুইটী বড় চমৎকার করিয়াছেন। তোরাপের কথা বোধ হয় চির দিন মনে থাকিবে। বড় বড় কথার আড়ম্বর না থাকিলে নবীন মাধবের অভিনয়টী আরও উৎকৃষ্ট হইত। যাহা হউক সাধারণতঃ বলিতে গেলে অভিনয়টী সন্তোষজনক হইয়াছে। আমরা রঙ্গভূমির অধ্যক্ষদিগকে একটী পরামর্শ দিতেছি। তাঁহারা উত্তম উত্তম গ্রন্থ সংগ্রহের চেষ্টা করুন। কোন ক্ষমতাশালী গ্রন্থকারকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করুন এবং শিক্ষিত ও সুচতুর লোক দেখিয়া অভিনেতা নিযুক্ত করুন, তাঁহাদের রঙ্গভূমির নিশ্চয় উন্নতি হইবে।

বঙ্গে নাট্যাভিনয়। ১ বৈশাখ ১২৮১। ১১ সংখ্যা

চিঠি

মহাশয়। চতুর্দ্দিকেই নাটকাভিনয়ের ধুম পড়িয়াছে। দিন দিন কত নাটকই অভিনীত হইতেছে এবং কতই নাটকাভিনয় সমাজ দেশময় সংস্থাপিত হইতেছে। দেশস্থ যুবকগণ একচিত্তে কেবল রঙ্গভূমির উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত অগ্রসর হইতেছে। এ প্রকার আমোদ নিন্দনীয় নহে। বৃদ্ধপিতামহকালের ক্রমাগত কুৎসিত পাঁচালী হাফ্ আখড়াই প্রভৃতির উচ্ছেদ হইয়া দেশের রুচি ভিন্ন পথাবলম্বী হইয়াছে ইহা দেখিয়া কে না আনন্দিত হইবেন? সেকালের বৃদ্ধপিতামহের ন্যায় দেশীয়গণ অশ্লীল খেঁউড় গান বা ছড়াকাটাকাটি লইয়া আর বিবাদ করেন না। কবির লড়াই প্রভৃতির আমোদে বঙ্গবাসীগণের মন আর আমোদিত হইতে দেখা যায় না। এ সকল সুলক্ষণ সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সকল আমোদের মধ্যে আমাদিগের একটী বক্তব্য আছে অদ্য তাহারই অবতারণা করিব।

প্রাচীন পিতামহ সম্প্রদায় খেঁউড় গাইয়া ও কবির লড়াই করিয়া আসর হইতে

অপসৃত হইলে যুবক সম্প্রদায় রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহারা সখের যাত্রা করিতে আরম্ভ করিলেন সুতরাং চতুর্দ্দিকে তাহারই ধুম পড়িয়া গেল। এঁড়িয়াদহ, দক্ষিণেশ্বর প্রভৃতি স্থানে স্থানে আকড়া আরম্ভ হইল ও যুবক সম্প্রদায় একাগ্রচিত্তে তাহাতেই প্রবৃত্ত হইল। ক্রমে সখের যাত্রা হইতে নাটকাভিনয়ের সূত্রপাত হইল এবং কোমলমতি, পাঠাধ্যায়ী বালকবৃন্দও সেই সঙ্গে যোগ দিয়া আমোদ লইয়া ব্যস্ত হইল। সখের যাত্রা হইতে ক্রমে সখের কীর্ত্তন সখের বাউলের নাচ পর্য্যন্তও হইল এবং কালে যে সখের মুটে, সখের নাপিত, সখের ধোপা প্রভৃতিও হইবে আমাদিগের এরূপ ভরসা আছে।

সখের যাত্রা বা নাটকাভিনয়ের উদ্দেশ্য কি? কেহ কেহ বলিবেন দেশের নিন্দনীয় রীতিনীতি প্রভৃতির অনিষ্টকারিতার অভিনয় দ্বারা লোকের মনে তৎপ্রতি ঘৃণা বা বিরাগ উৎপাদন করা এবং তৎসঙ্গে ঐ সকলের সংশোধন স্পৃহার বীজ দর্শকগণের হৃদয়ে নিহিত করাই নাটকাভিনয়ের উদ্দেশ্য। সত্য বটে, "একেই কি বলে সভ্যতা" "বিধবাবিবাহ নাটক" "সধবার একাদশী" প্রভৃতি নাটকের অভিনয় দ্বারা এতদুদ্দেশ্য কতকাংশে সাধিত এবং তৎপ্রদর্শিত ঘৃণিত আচারোচ্ছেদের প্রবৃত্ত্যুদ্দীপক হইতে পারে কিন্তু "বিদ্যা-সুন্দর নাটক", "কাদম্বরী নাটক" প্রভৃতির অভিনয় দ্বারা কোন উদ্দেশ্যকে নাটকাভিনয়ের প্রধান উদ্দেশ্য বলিব না। আমাদিগের মতে বিশুদ্ধ আমোদ যোগানই অভিনয়ের মূল উদ্দেশ্য বোধ হয়। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয় এই সে কার্য্য কাহার দ্বারা সুসম্পাদিত হইতে পারে? যাহাদিগের সম্পূর্ণ অবকাশাভাব তাহাদিগের দ্বারা এ কার্য্য কখনই সুসম্পাদিত হইতে পারে না। অতএব আমাদিগের মতে পেশাদার-দিগের দ্বারাই এ কার্য্য সুসম্পাদিত হইতে পারে।

কেহ কেহ বলিবেন তবে কি কেহ সখ করিয়া এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইবে না? করুন তাহাতে কোন আপত্তি নাই কিন্তু ইহাও বিবেচ্য যাহাতে সেটি নির্দ্দোষভাবে সম্পাদিত হয় এবং কোন ভাবী অনিষ্টোৎপাদনের মূল না হয় এ প্রকার সখের যাত্রা বা নাটকাভিনয়ে কাহারও আপত্তি নাই। দিবারাত্রি তাকিয়া ঠেস দিয়া ও গুড়গুড়িতে মুখ সংযুক্ত করিয়া ঝিমান অপেক্ষা এরূপ বিশুদ্ধ আমোদ দ্বারা চিত্ত প্রসাদন করিলে তাহাতে অনেকটা শুভোৎপাদন হয়। সমস্ত দিবস মসিযুদ্ধ করিয়া অসম্ভব কালে চিত্তবিনোদনের নিমিত্ত একটু আমোদ করিলে মনটা অনেক সুস্থির থাকে। এ প্রকার করিলে কাহারও কোন আপত্তি নাই। কিন্তু এক্ষণে যত সখের যাত্রা বা নাট্যসম্প্রদায় আছে তন্মধ্যে অধিকাংশেই পাঠাধ্যায়ী বালকবৃন্দ দৃষ্টিগোচর হয়। স্কুলের নাম করিয়া প্রতিদিন আকড়ায় থাকিয়া বিরহ বিষয়ক গানে আত্মা ও মনকে কলুষিত ও জড়ীভূত করিয়া তাহারা আমোদের চূড়ান্ত করে! এই প্রকার বালকবৃন্দ আধুনিক সখের যাত্রা ও নাটকাভিনয়ের প্রধান অবলম্বন। আরও একটি বিষয় আছে, এক্ষণে কোন কোন সম্প্রদায় এতই জঘন্য হইয়াছে যে যত প্রকার কু আচার ও কু প্রবৃত্তি তাহার

অধিকাংশই এইরূপ স্থান হইতে উদ্ভূত হয়। কোমলমতি বালকগণ অধিকারী মহাশয়গণের মোহে ভুলিয়া পাঠ পরিত্যাগ করে এবং নিয়তই এই কার্য্যে ব্যস্ত থাকে। এক একজন বালক যাহার বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসর অতিক্রম করিয়াছে কিনা সন্দেহ, গাঁজায় ও মদে এরূপ প্রবীণ যে দেখিলে অবাক হইতে হয়, ইহার সঙ্গে আর একটি মহানিষ্টকর প্রবৃত্তির যোগ আছে। এই ত সখের যাত্রা ও নাটকাভিনয়ের চূড়ান্ত চরম ফল, এই প্রকার বৎসরে বৎসরে মাসে মাসে দিনে দিনে ঘণ্টায় ঘণ্টায় যে কত বালকের সর্ব্বনাশ হইতেছে তাহা মনে করিলেও দুঃখ উপস্থিত হয়। আমরা বরং একেবারে এ সকল আমোদের সমুলোচ্ছেদ সহ্য করিতে পারি, তথাপি এইরূপে অপরিণত বালকবৃন্দের ইহ ও পরকালের পথে কতকগুলি অধম প্রবৃত্তি লোকের দ্বারা চির-কণ্টকারোপ আর সহ্য করিতে পারি না। যাহারা এরূপ অভিনয়ের প্রবৃত্তি প্রদায়ক বা তদধিকারী তাহাদিগকে আমরা দেশের পরম শত্রু বিবেচনা করি, আইনানুসারে তাহাদিগের দণ্ড হওয়া উচিত। দুঃখের বিষয় যে দেশস্থ অনেক বড়মানুষ, বিজ্ঞ ব্যক্তি এই বিষয়ের প্রধান উত্তেজক!

বৃদ্ধ সম্প্রদায় পাঁচালী কবি প্রভৃতি লইয়া যে আমোদ করিতেন তাহাতে ইহার শতাংশের একাংশও অনিষ্ট সঙ্ঘটন হইত না। তাঁহারা ঐ বিষয়ে স্বয়ং নিযুক্ত থাকিতেন বটে কিন্তু তাহাতে তাঁহাদিগের বালকবৃন্দের কোন অনিষ্টই হইত না। অতএব দেশস্থ ঐরূপ সখের যাত্রা ও নাট্যাভিনয় সমাজের কর্ত্তাদিগের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিতেছি যে তাঁহারা এই সর্ব্বনাশকর মহানিষ্টোৎপাদক সর্ব্বমঙ্গলবিনাশক জঘন্য প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করুন, তাহা হইলে বালকবৃন্দের পিতামাতাগণ নিশ্চিন্ত মনে স্ব স্ব সন্তানগণের ভাবী মঙ্গলাশা করিয়া তাঁহাদিগকে দুই হস্তে আশীর্ব্বাদ করিবে।

১৯শে চৈত্র ১২৮০ সাল কস্যচিৎ শিশুহিতৈষিণঃ কলিকাতা চড়কডাঙ্গা।

ন্যাশনাল থিয়েটার। ৮ মাঘ ১২৮৫। ১০ সংখ্যা।

"ক মিনীরঞ্জ"

শীত ঋতুর আগমনে কলিকাতা প্রকৃত প্রস্তাবেই "আজব সহর" হইয়া উঠে। যে দিকেই দৃষ্টি কর, দেখিবে যেন আমোদস্রোত চলোর্ম্মিমালার ন্যায় একে একে নৃত্য করিতে করিতে অনন্ত কালসাগরে প্রবাহিত হইতেছে। এদিকে উইলসনের সার্কাস, ওদিকে করিন্থিয়ান থিয়েটার, সেদিকে ইটালিয়ান অপেরা, এখানে ঘোড়দৌড়, সেখানে কন্সার্ট, আমোদপ্রমোদে কলিকাতাকে একেবারে মাতাইয়া তুলিয়াছে। বাস্তবিক ইহার কোন্‌টী ত্যাগ করিয়া কোন্‌টী দেখিবেন, এই চিন্তায় দর্শকগণও এক প্রকার চঞ্চলচিত্ত হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু এই সকল আমোদ প্রমোদের মধ্যেও আমাদের জাতীয় নাট্যশালার

শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া আমরা যারপরনাই সুখলাভ করিয়াছি। গত ৬ই মাঘ শনিবার রাত্রে কলিকাতা ন্যাশনাল থিয়েটারে "কামিনীকুঞ্জ অথবা শ্রীরাধিকার মানভঞ্জন" নামক একখানি অতি চমৎকার গীতিনাট্যের অভিনয় হইয়া গিয়াছে। বিষয়টী পৌরাণিক। সুতরাং বহু দিনের পুরাতন হইলেও প্রণেতার গুণে উহা রমণীয় আকার ধারণ করিয়াছে। প্রস্তাবনায় বারিধিবক্ষে কমলাসনে প্রকৃতি ও পুরুষ উপবিষ্ট, এই চিত্রটী যেমন নূতন, তেমনি মনোহারী হইয়াছিল। অন্য অন্য অভিনেতৃগণের মধ্যে রাধিকার অভিনয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছিল। যিনি শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকা পরিগ্রহ করেন, তাঁহার কিছু বাড়াবাড়ি হইয়াছিল। তবে তাঁহার "দেহি পদপল্লবমুদারং" এই বাক্যটীও এই সময়ের কার্য্যটী সমধিক হৃদয়গ্রাহী হয়। অন্যান্য সখীগণের নৃত্যগীতে দর্শকগণ বাঞ্ছাধিক সুখলাভ করিয়াছেন। কিন্তু মধ্যে মধ্যে সমস্বভাবতার বৈলক্ষণ্য ঘটাতে সময়ে সময়ে কিছু কিছু কর্কশ বলিয়া বোধ হইয়াছিল। এগুলি সামান্য দোষ। এই সামান্য দোষ পরিত্যাগ করিয়া অভিনয়ের দোষগুণ বিবেচনা করিতে গেলে অভিনয়টী উৎকৃষ্ট হইয়াছে, এই কথা বলাই সঙ্গত হয়। পুলিস ইনস্পেক্টর অক্ষয় বাবুর সৌজন্য ও সতর্কতার জন্য কোনরূপে গোলযোগ ঘটে নাই।

অভিনয় সমালোচনা। ১৩ কার্ত্তিক ১২৮৮

কতদিন হইল আমাদের নাট্যশালাগুলিতে অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু এখাল পর্য্যন্ত কোন নাট্যশালাতে মনের মত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় দর্শন জনিত আনন্দ উপভোগ করিতে পারি নাই। অর্থ দিয়া টিকিট কিনিয়া কতবার অভিনয়গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছি। এমন কি সময়ে সময়ে রঙ্গভূমিতে অনেকানেক অভিনেতার অন্যায় অভদ্র আচরণ, কোন কোন অভিনেত্রীর পবিত্র চক্ষুর পীড়াদায়ক অযথা অঙ্গভঙ্গি ও জঘন্য হাস্য পরিহাস পঙ্কিলহৃদয় ও কুরুচির পরিচায়ক। দর্শকবৃন্দের ঘোরতর অসভ্যতা দেখিয়া আমাদের মন এমন ব্যথিত হইয়াছিল যে আমরা সহজেই এই স্থির করিয়াছিলাম, আমাদের দেশীয় নাট্যশালাগুলি কোনক্রমেই আমাদের আশানুরূপ সংস্কৃত ও সমুন্নত হইবে না। দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া এই বিশ্বাস মনোমধ্যে পোষণ করিয়া আসিয়াছি, অত্যল্পকাল গত হইল একদিন আমরা কথাপ্রসঙ্গে আমাদের কোন সুশিক্ষিত ও সুরুচিসম্পন্ন বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম আমাদের নাট্যশালাগুলি কতদিনে এবং কেমন করিয়া উন্নতির সমুচ্চ সোপানে উপনীত হইতে পারে? ইহাতে তিনি হাসিতে হাসিতে এই উত্তর দান করেন যে, যেদিন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সদৃশ কোন মহাত্মা নাট্যশালার নেতা হইবেন, সেই সুখময় দিন হইতে দেশীয় নাট্যশালাগুলি উন্নতিমার্গে পদার্পণ করিতে সমর্থ হইবে। আমাদের বন্ধুর কথা যে নিতান্ত অসম্ভব তাহা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলে তিনিও আমাদিগকে বিশেষ বিশেষ কারণ দর্শাইয়া বুঝাইয়া দিলেন যে তাঁহার কথা যে পরিমাণে অসম্ভব দেশীয়

নাট্যশালাগুলির পক্ষে সম্পূর্ণ উন্নতিলাভও সেই পরিমাণে অসম্ভব। সে যাহা হউক, আমরা ততদূর চাই না, কারণ আমরা জানি যে যতদিন ভারত সমাজ উচ্চ জ্ঞান ও উচ্চ সভ্যতার সুবিমল আলোকে সমুজ্জল না হইবে, যতদিন ভারতের সম্রান্ত বংশজাত নরনারী রঙ্গভূমিতে না নামিবেন, ততদিন সেইরূপ পূর্ণ উন্নতির আশা করা ঘোর বিড়ম্বনামাত্র। কিছুকাল গত হইল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশ্রমে বিদ্বজ্জন সমাগম উপলক্ষে বাল্মীকি প্রতিভা অভিনয়ে কবি রবীন্দ্রনাথ ও সুকুমারীর প্রতিভা আমাদের হৃদয়ে সে বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া দিয়াছে, কিন্তু তাহা বলিয়া ভারতসমাজে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবার তুল্য কয়টী সুসংস্কৃত পরিবার আছে যে, তত্তৎস্থানে বাটীর পুত্র কন্যাগণ দ্বারা অভিনয়কার্য্য সম্পাদিত হইবে। সুতরাং এখন উক্ত বিষয় আমাদিগের নিকট আকাশকুসুম বা সাগর-কমল-সদৃশ অসম্ভব বোধ হয়। এখন সাধারণতঃ আমাদের সমাজের যেমন অবস্থা, তদনুসারে আমরা এই চাই যে, আমাদের নাট্যশালাগুলি বিশেষরূপে সংস্কৃত ও নৈতিক অনুশাসনে পরিচালিত হইয়া পরিমার্জ্জিত রুচিবান ব্যক্তিবৃন্দের দর্শনোপযোগী হউক। উল্লিখিত নাট্যশালার অধ্যক্ষগণ বিশেষ যত্ন পাইলেই প্রস্তাবিত বিষয়টী অতি সহজেই কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

বিগত ১৬ই কার্ত্তিক সোমবার পাথুরিয়াঘাটা রাজভবনে জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে জাতীয় নাট্যশালায় (National Theatre) অতি সুন্দর অভিনয় দর্শনে আমাদের মনে এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে এই রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষগণ অন্তরের সহিত যত্ন পাইলে ইহাকে অচিরকাল মধ্যে বিশেষ উন্নতিশালী করিতে পারেন। অতঃপর আমরা উক্ত অভিনয় সম্বন্ধে কিছু বলিতে অগ্রসর হইলাম। রঙ্গভূমিতে "সীতার বনবাস" অভিনীত হইয়াছিল। যারপরনাই মনোহর হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে দেশীয় কোন নাট্যশালায় এরূপ মনোহর অভিনয় হয় নাই। অভিনয়স্থলে প্রায় ২০০ শত সম্রান্ত বংশজাত সুশিক্ষিত লোকের সমাগম হইয়াছিল। সকলেই অভিনয় দর্শনে বিমোহিত হইয়াছিলেন। জাতীয় নাট্যশালা পূর্ব্বে আর কখনও একসময়ে এত অধিকসংখ্য সজ্জনমণ্ডলীর মনোরঞ্জন করিতে পারে নাই।

এই সুযোগে আমরা উল্লিখিত অভিনয়ের দুই একটী দোষগুণ প্রদর্শন করিতে অগ্রসর হইলাম। রাম ও লক্ষ্মণের চরিত্রাভিনয় আমাদের আশানুরূপ না হইলেও নিতান্ত মন্দ হয় নাই। রামবেশধারী যুবকের কণ্ঠস্বর কর্কশ না হইলে এবং স্থল বিশেষে উহা অধিকতর ফলিত অথচ গম্ভীরভাবে ধীরে ধীরে বিনির্গত হইলে অতি উত্তম হইত। লক্ষ্মণ বেশী যুবক অপেক্ষাকৃত স্থূলকায় ও সবল হইলে এবং যুবকের কণ্ঠস্বর কিঞ্চিৎ গম্ভীর হইলে আরও ভাল হইত। আসল জিনিষ নকল করিয়া দর্শকের মনে বিভ্রম উৎপাদন করাই যখন অভিনয়নের ধর্ম্ম, তখন সেই নকলটী যত অধিক পরিমাণে আসলের অনুরূপ হইবে, ততই অভিনয়ে গৌরব বৃদ্ধি হইবে, এবং দর্শকবর্গও বিভ্রমবিমুগ্ধ হইয়া অপরিসীম হর্ষানুভব করিবে। এই সকল প্রধান বিষয়ে নাট্যশালার অধ্যক্ষবর্গের সর্ব্বপ্রযত্নে দৃষ্টি রাখা উচিত।

সীতা-চরিত্র সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে অভিনীত হইয়াছিল। আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত অভিনেত্রীর মুখে গভীর বিষাদের কালিমা ব্যাপিয়াছিল এবং অভিনেত্রী যেন মূর্ত্তিমতী সরলতা কোমলতা ও বিষাদ প্রতিমা রূপে শোভা পাইয়াছিল। তাহার মর্ম্মভেদী খেদোক্তি ও বিজন বনমাঝে "লজ্জা রাখ শিবরাণী ও মা লজ্জানিবারিণী" ইত্যাদি ঘোর নৈরাশ্য ব্যঞ্জক ও হৃদয়বিদারক গান শ্রবণে সমবেত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অনেককেই অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে হইয়াছিল।

দুটি অল্প বয়স্ক অভিনেতা সুন্দররূপে সজ্জিত হইয়া চারুদর্শন কুশীলবের চরিত্রের অভিনয় করিয়াছিল। ইহাদের অভিনয় দর্শকগণের এত মনোহর হইয়াছিল যে ইহারাই যে পুর্ব্ব অঙ্কে সীতার সহচরী বেশে কাননে গান গাহিতে গাহিতে পুষ্পচয়ন করিতেছিল, তাহা অনেকে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ইহাদের অভিনয় আদ্যন্ত পূর্ণভাবে বিকসিত হইয়াছিল। সংক্ষেপতঃ সীতা, উর্ম্মিলা ও কুশীলব উপস্থিত হইয়া পিশাচারী হৃদয়ের পৈশাচিক বৃত্তির পরিচয় দিয়া দর্শকমণ্ডলীকে বিলক্ষণ মাতাইয়াছিল। সুমন্ত্র মন্দ হয় নাই। মহর্ষি বাল্মীকি আশানুরূপ ভাল হয় নাই। অন্যান্য চরিত্রগুলির অভিনয় নিতান্ত মন্দ হয় নাই। গানগুলি সুন্দর রূপে গীত হইয়াছিল।

নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে যে স্থানে লক্ষ্মণ সরযূ প্রান্তবর্ত্তী ভয়াল শ্বাপদসঙ্কুল বিজনকানন মাঝে কাঁদিতে কাঁদিতে সীতাকে রামের নিষ্ঠুর আজ্ঞা জানাইয়া সহসা অদৃশ্য হইলেন এবং অসহায়া সীতা ভীতিবিহ্বল হৃদয়ে আপনার দুরবস্থা ভাবিয়া প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বনদেবতাদিগের নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছেন এবং পরক্ষণেই সেখানেই বিবশ হইয়া শিবরাণীর চরণে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছেন, সেই স্থানটী অতিসুন্দররূপে অভিনীত হইয়াছিল। আবার চতুর্থ অঙ্কের যজ্ঞস্থলের স্থানে রাম সীতার পরীক্ষাপ্রয়াসী হইলেন এবং সীতা দারুণ অভিমানভরে পতিহস্তে প্রাণসম কুশীলবকে সমর্পণ করিয়া জননীর ক্রোড়ে লুকালেন এবং রাম সীতার আদর্শ যে দুঃখে ও ক্ষোভে অধীর হইয়া পৃথিবীর বক্ষবাণ বিদীর্ণ করিতে উদ্যত হইলেন সেই স্থানটীর অভিনয়ও অতিমনোজ্ঞ হইয়াছিল। ক্রমে আমাদিগের সমালোচনা শেষ হইয়া আসিল। উপসংহার কালে আমরা আর দুই একটী কথা বলিয়া নিরস্ত হইব। নাট্যশালার অধ্যক্ষবর্গের নিকট আমাদের এই অনুরোধ যে তাঁহারা উহার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধনে কৃতসঙ্কল্প হউন। পুরুষ চরিত্র অভিনয়ের উৎকর্ষসাধনে অধিক পরিমাণে মনোযোগ দান করুন। বলা বাহুল্য যে পুরুষ চরিত্র অপেক্ষা স্ত্রীচরিত্র অভিনয়ের উৎকর্ষ প্রদর্শনে তাঁহারা অধিকপরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। নাট্যশালা জঘন্য আমোদপ্রমোদ ও অসভ্যতা প্রকাশের স্থান নহে, একথা যেন তাঁহারা কার্য্যে দেখাইতে সমর্থ হন। অতঃপর আর যেন আমাদিগকে কোন সময়ের নিমিত্ত ভাঁড়ামিপূর্ণ, অসার হাস্যরসোদ্দীপক গ্রন্থের অভিনয় দর্শনে ব্যথিত হইতে না হয়। তাঁহারা চেষ্টা করুন, উৎকৃষ্ট দৃশ্য কাব্যগুলির মনোহর অভিনয় প্রদর্শনে সাধারণের নিকট

যশস্বী হইতে পারিবেন। এস্থলে দেশীয় ধনশালী মহাত্মাদিগের নিকট সানুনয় এই প্রার্থনা যে তাঁহারা কোন সদনুষ্ঠান উপলক্ষে আমোদ জন্য নিকৃষ্ট বারাঙ্গনাদিগের নৃত্যগীতে রাশি রাশি অর্থ অপব্যয় করার পরিবর্ত্তে সুরুচিসম্পন্ন মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর প্রদর্শিত পথ অবলম্বনে দেশীয় নাট্যশালাগুলিকে উৎসাহদানে উহাদের উন্নতি বিধান করুন।

১০ নং কাশীঘোষের লেন, মাণিকতলা ষ্ট্রীট।

শ্রীবিজয়লাল দত্ত।

১৮ ই কাত্তিক, ১২৮৮

বঙ্গীয় যুবক ও থিয়েটার অপেরা। ১৮ শ্রাবণ ১২৯৩। ৩৮ সংখ্যা

চিঠি

সম্পাদক মহাশয়! ওলাউঠা ও সর্পদংশনের হস্ত হইতেও মানুষ উদ্ধার পাইতে পারে, সিংহ শার্দ্দূলের মুখ হইতেও পরিত্রাণ পাওয়া যায়, ওলাউঠা ও সর্পদংশনের চিকিৎসা আছে কিন্তু থিয়েটার অপেরা যাহাকে গ্রাস করিয়াছে তাহার আর উদ্ধার নাই, এ পীড়া শিবের অসাধ্য। একবার যাহাকে থিয়েটার বিকারে ঘেরিয়াছে তাহার আর পরিত্রাণ নাই। এ দেশের বালক ও যুবকদলের যাহা কিছু সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহা এই নাচ তামাসা থিয়েটার অপেরা যাস গোষ্ঠ দ্বারাই হইতেছে। আহা! বলিতে কষ্ট হয় কচি কচি ছেলেগুলো দিব্য চালাক চতুর, লেখা পড়ায় বেশ মনোযোগ, কোথা হইতে সর্ব্বনেশে নাচ তামাসা আসিল, অপেরা থিয়েটার দেখা দিল, আর অমান সোনার চাঁদ-ছেলে একবারে বিগড়াইয়া গেল। বিদ্যালয় যেমন ছাড়িল, অমনি নেশা ভাঙ অভ্যাস করিল, "গঙ্গা মড়া এলেন না।" অধমতারণ থিয়েটার তাহাকে লুফিয়া লইল, ছেলে বাঙ্গালা ছাড়িয়া ফরাশডাঙ্গায় বাস করিতে লাগিল।

আজকাল কোন কোন অপরিণামদর্শী যুবক থিয়েটারের স্বপক্ষে সংবাদপত্রে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাদের মত যে বেশ্যাদিগকে তাড়াইয়া পুরুষ দ্বারা ধর্ম্মপুস্তক অভিনীত হইলে যুবকদের চরিত্র নিখুঁত থাকিতে পারে। তাহাদের জানা উচিত যে কেহ জাহান্নামে না যাইলে আর থিয়েটারের দলে প্রবেশ করে না, মাধব থিয়েটারের দলে থাকে বলিলে কি বুঝায়? বুঝায় না কি যে মেপোটা একেবারে গোল্লায় গিয়াছে?

যাঁহারা থিয়েটারের পোষকতা করিতেছেন তাহারা বলুন দেখি এক একটী থিয়েটারের দলে কয়জন কৃতবিদ্য কয়জন বয়াটে হইতে বাকি আছে আর কয়টা জ্যাঠা হয় নাই এবং কয়জনই বা জগাই মাধাই অবস্থা হইতে ধ্রুব প্রহ্লাদের অনুবর্ত্তী হইয়াছে চিকিৎসক! অগ্রে আপনি নীরোগ হও পরে অন্যের চিকিৎসা করিও। যাঁহারা ধর্ম্মপুস্তক পুরুষদিগের দ্বারা অভিনয় করাইয়া লোককে ধর্ম্মপথে চালাইবেন আশা করিতেছেন— পরের ব্যাধি আরোগ্য করিবার প্রয়াস পাইতেছেন, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি তোমরা

নিজ নিজ ব্যাধি দূর করিতে সক্ষম হইয়াছ কি? নিজে পীড়িত, যাঁহার সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত সে যদি পরের চিকিৎসা করিতে যায় তবে তাঁহাকে কি বলিব? বেশ্যাই নাচাও—আর পুরুষই হাসাও—কিছুতেই কিছু হইবে না। ভাই, থিয়েটারে মত্ত যুবক! তুমি বলিতে পার কি? নাটক, নভেল, অভিনয় দেখিয়া কোথায় কে ধাৰ্ম্মিক হইয়াছে? যদি ধর্ম্মগ্রন্থ অভিনয় করিলেই ধাৰ্ম্মিক হওয়া যাইত তবে রঙ্গালয়ের বেশ্যারা কেন ধাৰ্ম্মিক হয় না, তাহারা ত দুবেলা ধর্ম্মপুস্তক অভিনয় করিতেছে, ধর্ম্মকথা শুনিতেছে, ধর্ম্মে কাঁদিতেছে, লোককে কাঁদাইতেছে, তথাচ তাহাদের ধর্ম্মে মতি হয় না কেন? ধর্ম্মপুস্তকাদির অভিনয় দেখিলে ক্ষণিক মনটা আৰ্দ্ৰ হয় বটে, কিন্তু পরক্ষণেই ত দেখিতে পাই যে মেধো সেই মেধো।

হে ভবিষ্যৎ বংশের কল্যাণকারী থিয়েটারের পৃষ্ঠপোষকগণ! তোমরা কি বলিতে পার—তোমাদের দ্বারা কয়জন জগাই মাধাই উদ্ধার পাইল? কয়টী গোল্লায়গত যুবকের চরিত্র সংশোধিত হইল?

আজকাল নববিধানী ভাই সকল কলিকাতায় একটী থিয়েটার খুলিয়াছেন। তাহার যে কি উদ্দেশ্য তাহা ভাল করিয়া বুঝা যায় না। যদি লোককে নববিধান ধর্ম্মে দীক্ষিত করা ইহার উদ্দেশ্য হয়, লোককে পাপপঙ্ক হইতে উদ্ধার করা ইহার উদ্দেশ্য হয়, তবে তাঁহারা কতদূর সফল হইবেন তাহা আর লোকের বুঝিতে বাকি নাই। অহো বিধাতঃ তোমার পবিত্র-ধর্ম্মের কিরূপ দুর্গতি হইতেছে দেখ! ধর্ম্মকে লইয়া এখন লোকে একটা আমোদের জিনিষ তৈয়ার করিয়া বসিয়াছে। ধৰ্ম্ম এখন নকড়া ছকড়া হইয়া পড়িয়াছে—তাই বলি পরমেশ্বর তোমার সন্তানদের সুমতি দাও—আর যেন তাহারা তোমাকে লইয়া রং তামাসা না করিতে পাবে।

বিজ্ঞাপন ।

নিরুদ্দেশ ।

শান্তিপুর নিবাসী আমার অগ্রজ শ্রীযুক্ত ভুবনচন্দ্র ঘোষ প্রায় তিন চারি বৎসর হইল নিরুদ্দেশ হই য়াছেন বয়স প্রায় ৭০ বৎসর হইবে, শ্যামবর্ণ দেখিতে লম্বা, ইনি প্রথমে ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ের বগুলা ষ্টেষণে সব ওভারশিয়রের কর্ম করিতেন পরে তথা হইতে কুষ্টিয়ার নিকট জগতি ষ্টেসন ষ্টেষণে কয়েক মাস অবস্থিতি করিয়া দিনাজপুর যান দিনাজপুর হইতে কোথায় গিয়াছেন আমি তাহার কিছুই অনুসন্ধান করিতে পারি নাই। অতএব যিনি তাঁহার অনুসন্ধান করিয়া দিবেন আমি তাঁহাকে ২৫ টাকা পারিতোষিক দিব। আর যদি কোন মহাত্মা পারিতোষিক না লইয়া অনুসন্ধান করিয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকিব। অনুসন্ধানের বিবর মান্যবর শ্রীযুত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়কে লিখিলে আমি শীঘ্র প্রাপ্ত হইব। ইতি

১৩ ই জ্যৈষ্ঠ । ১২৮১ } শ্রীভগবতীচরণ ঘোষ ।

উপহার ।

সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান
সাধু রচনা ও সমালোচন পূর্ণ
মাসিক পত্রিকা ।

এই উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রিকাখানি বর্ত্তমান জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতেছে। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩।৵০। গ্রাহকেচ্ছু মহোদয়গণ স্ব স্ব নাম ধাম লিখিয়া মুশাসহ নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলে পত্রিকা প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ
২ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট ।
সভাবাজার কলিকাতা ।

বি, এন, দাসের গণোরিয়া স্পেসিফিক ।

শীঘ্র । নির্ভয় ।। নিশ্চয় ।।

বি, এন, দাসের গণোরিয়া স্পেসিফিক।

ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার নূতন পুরাতন মেহ শ্বেত প্রদর এক সপ্তাহে নিশ্চয় আরোগ্য হয় এবং আর কখন হইবে না। মূল্য ২ টাকা।

শক্তিসঞ্চারক আরক মূল্য ১।০ টাকা

ইহা দ্বারা রক্ত পরিষ্কার হইয়া ক্ষুধা বৃদ্ধি করে শরীরে বলাধান হইয়া দেহ পুষ্ট ও কান্তিবিশিষ্ট করিয়া থাকে।

৪৫ নং চুনাগলি কলুটোলা কলিকাতা এবং ১২ নং দুর্গাচরণ পিতুড়ির গলি বহুবাজার কলিকাতা শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস দের নিকট পাওয়া যায়

নবীন অবলেহ ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয় আমরক্ত, গ্রহণী হস্তিকাগ্রহণী এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছি এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম নিম্নে লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র ঔষধের সহিত বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়মপত্র ঔষধের সহিত পাইবেন। ৴০ আনার টিকিট পাঠাইলে ঔষধের তালিকা পাঠান যায়।

এক শিশির মূল্য ২ টাকা ডাকমাশুল ।৵০

চন্দনাসব ।

সকল প্রকার মেহ রোগের মহৌষধ।

এই সুবিখ্যাত ঔষধ নিয়মপূর্ব্বক তিন দিবস সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ এবং তৎসংক্রান্ত প্রস্রাব কালীন জ্বালা বা ধাতু নিঃসরণ হইলেও তিন দিবস মধ্যে রোগের বিশেষ শান্তি হইবে। এতদ্ভিন্ন ইহা দ্বারা শুক্র প্রদর ও মূত্রকৃচ্ছ্র আশু শান্তি হয়। শিশির মূল্য ২ টাকা প্যাকিং ও ডাকমাশুল ॥৵০ আনা

সুবাহু ঘৃত ।

সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুগন্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর দোষ নিবারণ করিয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে এই কারণ বিশেষ মত শ্বেত প্রদর ও রক্ত প্রদর নাশক এবং ঋতু দোষ অথবা অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং ঋতু দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল মৃত্যু ও অকালে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সকল এই সুগন্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

১ পোয়া মূল্য ৪ টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল ৸৵ আনা

মার্ত্তণ্ড তৈল ।

এই তৈল [illegible] সকল প্রকার শক্তিবর্দ্ধক চৌষধিবাত [illegible] শক্তি না থাকে অর্দ্ধ শীর্ণ অসাড় পক্ষাঘাত এবং শক্তি হ্রাসের কারণ সূচি বিদ্ধ বা আঘাত [illegible] বাতজনিত বেদনা হস্ত পদাদির [illegible] প্রভৃতি রোগ সকলের বিশেষ শান্তি হইয়া থাকে এবং [illegible] বহু দিবস বিলম্ব হইলে বেদনা সকলের [illegible]
[illegible]

৸০ পোয়া শিশির মূল্য ২ টাকা প্যাকিং ৸০

শ্রীযুক্ত ডাক্তার দুর্গাদাস বসু, এম এম এ
" " কেত্রমোহন মিত্র, " "
[illegible] নং ব্রজেন্দ্রনাথ দে অনরেরি ম্যাজিষ্ট্রেট
শ্রীযুক্ত বাবু রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।
" " উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণী
" " কিশোরিমোহন চট্টোপাধ্যায় ব্যারিষ্টার
শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ মতে ঔষধালয়।
১৪০ নং মানিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া।

যোগসিদ্ধরস ।

এই সুসিদ্ধ ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার মেহ ৭ দিবসের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। আমি সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি যে মেহরোগের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। মেহ রোগের অব্যর্থ ঔষধ যদি কিছু থাকে, তবে ইহাই অব্যর্থ নামের সার্থকতা সম্পাদন করিবে। প্রস্রাব-কালীন জ্বালা, সপূয় ধাতুনিঃসরণ রক্ত প্রস্রাব, খড়ি জলের ন্যায় প্রস্রাব প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকিলে আশু শান্তি হইবে। ইহা আমরা সহস্র পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছি। এতদ্ভিন্ন দুর্গন্ধ শ্বেত প্রদর, রক্ত প্রদর মূত্রাশ্মঃ রোগ এবং মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি রোগ সকলও বিনষ্ট হইয়া থাকে। ১ শিশির মূল্য ২, প্যাকিং ৸০

মংলতি কুসুম তৈল ।

এই তৈল নিয়ম পূর্ব্বক ব্যবহারে নিশ্চয় টাক আরোগ্য হয় পরিণামে অকাল পক্কতা প্রাপ্ত হয় না। কেশের মূল সকল দৃঢ় এবং কেশ সকল কোমল ও কৃষ্ণ [illegible] ইহা শীঘ্র পরিবর্দ্ধিত হয়। বিশেষতঃ [illegible] মস্তক ঘূর্ণন প্রভৃতি শিরোরোগ বিনষ্ট [illegible] স্মৃতি শক্তি বৃদ্ধি এবং মস্তিষ্ক শীতল [illegible] [illegible] মানব শরীরে শোণিত উত্তপ্ত [illegible] ইহা ব্যবহারে ঐ [illegible] ক্রিয়াবান ও [illegible] বায়ু বিকার [illegible] ইহাতে মূর্চ্ছা বায়ু [illegible] চিত্ত [illegible] চিৎকার [illegible] [illegible] এবং হস্তপদাদির জ্বালা প্রভৃতি রোগ সকল বিনষ্ট হয় এবং ইহার মনোহর সৌরভে গৃহ আমোদিত হয় শিশির মূল্য [illegible] প্যাকিং ৵ ।

[illegible]

এই [illegible] [illegible]

ঘোষপাড়ার মেলা। ২৩ চৈত্র ১২৭০। ২১ সংখ্যা

অনেকেই এই প্রসিদ্ধ মেলার নাম শুনিয়া থাকিবেন। ফাল্গুনী পূর্ণিমার দোলযাত্রা উপলক্ষে "কর্ত্তাভজা" ধর্ম্মাবলম্বিরা এই উৎসব ও মেলার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। গ্রামটি অতি ক্ষুদ্র, এখানে ঊর্দ্ধ সংখ্যা ১০০ ঘর লোকের বসতি, কিন্তু এই মেলানিবন্ধন মিসনরিগণ ইহার সবিশেষ বর্ণন করিয়া পুস্তক রচনা করাতে বিদেশীয় লোকদিগের নিকটেও ইহা বিখ্যাত হইয়াছে। ঘোষপাড়া কলিকাতার প্রায় ১৬ ক্রোশ উত্তরে। পূর্ব্ব বাঙ্গালা রেলওয়ের কাঁচড়াপাড়া ষ্টেসনের উত্তর-পশ্চিমদিকে দুই ক্রোশ গমন করিলেই গ্রাম পাওয়া যায়। আমি এ বৎসর এই প্রসিদ্ধ মেলা দর্শনে উৎসুক হইয়া দোলের চাঁচরের দিন (১০ই চৈত্র) তথায় উপস্থিত হইয়াছিলাম। এই মেলা ও কর্ত্তাভজা ধর্ম্মের বিষয়ে যাহা যাহা অবগত হইয়াছি, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।

১০ই চৈত্র সন্ধ্যার সময় উক্ত গ্রামে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বেই দেখিলাম প্রায় ২০।২৫ জন স্ত্রী পুরুষ রাস্তার মধ্যস্থলে পড়িয়া রহিয়াছে। বোধ হইল যেন, কোন দেবতার উদ্দেশে হত্যা দিতেছে। মধ্যে মধ্যে কেহ কেহ বা মাথা ঠুকিয়া নমস্কার করিতেছে। এই সকল দর্শন করিতেছি ইতিমধ্যে উত্তর দিক হইতে কতকগুলি স্ত্রীলোক "সতী মা, মা গো" বলিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিল। ব্যাপার কি, জানিবার নিমিত্ত গ্রাম মধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম। প্রবিষ্ট হইয়াই দেখি, লোকারণ্য, সকলেই ঐ রূপ চীৎকার ও নমস্কার প্রভৃতি করিয়া বেড়াইতেছে। গ্রামের দক্ষিণাংশে "হিমসাগর" নামে একটি পবিত্র পুষ্করিণী আছে, যাত্রীদিগের সকলকেই ঐ জল স্পর্শ করিতে হয়। এই নিমিত্তই তথায় ঐরূপ জনতা হইয়াছে।

ঐ দলস্থ একব্যক্তি আমার পায়ে জুতা দেখিয়া আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। (ইহারা অন্য ধর্ম্মাবলম্বী লোক দেখিলেই প্রায় চিনিতে পারে) আমি আমার পরিচয় প্রদান করিলে পর সে আমাকে জুতা পায়ে দিয়া যাইতে নিষেধ করিল, আমাকে অগত্যা জুতা খুলিতে হইল। অনন্তর আমি ভিড়ের মধ্যে গমন করিতে করিতে দেখিলাম, কর্ত্তারা তিন চারি জন শিষ্যকে প্রহার করিতেছেন। শিষ্যেরা রোদন করিতেছে, কেহ কেহ গজ মাপিয়া নাকে খৎ দিতেছে। কাহারো বা ২।৫ টাকা জরিমানাও হইতেছে। এগুলি তাহাদিগের পাপের দণ্ড। আমি সে রাত্রি এক সদ্গোপের বাটীতে শয়ন করিয়া থাকিলাম, রাত্রিতে অনেকগুলি বাজি পুড়িল।

আমি দোলের দিবস অত্রত্য প্রধান "কর্ত্তা" বাবু ঈশ্বরচন্দ্র পালের বাটীতে গমন ও অনেকের সহিত ধর্ম্মবিষয়ক কথোপকথন করিয়া সবিশেষ অবগত হইলাম।

এই স্থানে উহাদিগের ধর্ম্মের বিষয় উল্লেখ করা আবশ্যক হইতেছে। খৃষ্টীয়ান ও মুসলমান প্রভৃতি খৃষ্ট ও মহম্মদাদি এক এক ব্যক্তিকে যেরূপ ঈশ্বরের পুত্র অথবা অনুগৃহীত বোধ করিয়া তাঁহাদিগের দ্বারা মুক্তি লাভের আশা করিয়া থাকেন, "কর্ত্তা ভজারা" সেরূপ এক ব্যক্তি মাত্রকে অবলম্বনে সন্তুষ্ট হয় না। ইহারা নূতন নূতন কর্ত্তাভজা গুরুদিগকে ঈশ্বর বলিয়া পুজা করিয়া থাকে। এটি বড অধিক দিনের ধর্ম্ম নহে, প্রায় ১০০ বৎসর হইল আউলেচাঁদ নামে এক ব্যক্তি পুর্ব্ব অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন, ইনিই এই কর্ত্তাভজা ধর্ম্মের সৃষ্টিকর্ত্তা। শুনিলাম, ইনি জাতিতে সদ্গোপ। ইনি এক বারুইয়ের বাটীতে সাত বৎসর কাল গোমেষাদি চরাইয়াছিলেন। পরে সন্ন্যাসী হইয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া ২২ জন শিষ্য করেন। এই ২২ জনের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয়ই আছে। হিন্দুর মধ্যে সদ্গোপ, কলু, মুচি ও বৈষ্ণব প্রভৃতি ইতর জাতি। রামশরণ পাল (সদ্গোপ) মহাদেব (কলু), কানাই ঘোষ, (গোয়ালা) ও আর এক জন মুচি, এই ৪ জন প্রধান শিষ্য। কেহ কেহ কহেন ঘোষপাড়ার প্রায় ১।৹ ক্রোশ পুর্ব্বে আলাইপুর নামক এক সামান্য গ্রামে আউলেচাঁদ কিছু দিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন বলিয়া গ্রামের নামে ইহার নাম আউলেচাঁদ হইয়াছে। আউলেচাঁদ ঘোষপাড়ায় প্রবিষ্ট হইলে অনেকে ইহাকে পাগল বলিয়া ধূলি কাদা গায়ে দেয়। সেই সময়ে রামশরণ পাল ইঁহাকে গৃহে লইয়া গিয়া আশ্রয় দেন। ইনি রামশরণের গুণে বশীভূত হইয়া তাঁহার প্রতি ধর্ম্মপ্রচারের ভার সমর্পণ করেন। তাহাতেই তিনি কথা বলিয়া বিখ্যাত হন। রামশরণের বাটীতেই আউলেচাঁদের মৃত্যু হয়। চাকদহের নিকট পডাবি গ্রামে ইহার সমাধি হইয়াছে। ঘোষপাডায় একটি সমাজবাটী আছে। কেহ কেহ বলে, ঐটি রামশরণের স্ত্রী সতীমার সমাধিস্থান। কর্ত্তাভজা স্ত্রী ও পুরুষেরা ঐ বাটীস্থ এক শুম্ভে আবির ও পুষ্পমালা প্রভৃতি প্রদান করিয়া ভক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে। ধর্ম্মাবলম্বিরা রামশরণের স্ত্রীর প্রতি অতিশয় ভক্তি করিয়া থাকে। রামশরণের পুত্র রামদুলাল, রামদুলালের দুই পুত্র, ঈশ্বরচন্দ্র ও ইন্দ্রনারায়ণ। এই ঈশ্বরচন্দ্র বর্ত্তমান কর্ত্তা, ইহাঁদিগের পৌত্র হইয়াছে। এই ১০০ বৎসরের মধ্যে পালদিগের ৫ পুরুষ ও বঙ্গদেশের ভিতরে ভিতরে প্রায় এক লক্ষ লোক কর্ত্তাভজা হইয়াছে। ইহাদিগের উপাসনা প্রকার বড় বাহুল্য নয়, একখানি গীতগর্ভ পুস্তক আছে, আহারের পর ১০ জন একত্র উপবেশন করিয়া আউলেচাঁদ, রামশরণ ও তাঁহার স্ত্রীর মুর্ত্তি ভাবনা, ক্রন্দন ও গান করিয়া থাকে।...

কর্ত্তাভজা ধর্ম্মাবলম্বিরা পুত্রকে পুত্র ও পিতাকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করে না। ইহারা বলে, সকলেই একজনের পুত্র, একমাত্র গুরুই সকলের পিতা। মফঃস্বলের গুরু-(কর্ত্তা) দিগকে 'মহাশয়' বলে। এক একজন মহাশয়ের অধীনে কয়েকজন করিয়া শিষ্য আছে। শিষ্যদিগের নিকট হইতে যে প্রণামী আদায় হয়, ঈশ্বরবাবু তাহার অংশ পান, মফঃস্বলের মহাশয়েরা তাহার কিছু কিছু পাইয়া থাকেন। ঈশ্বরবাবু এই দোল উপলক্ষে

প্রায় ১০।১২ হাজার টাকা পাইবেন। ২।৩ হাজার টাকা ব্যয় হইবে। প্রতি বৎসরই এইরূপ হয়।

এবৎসর দোলে প্রায় ৬৫ হাজার লোকের সমাগম হইয়াছিল। যাত্রীদিগের মধ্যে চৌদ্দ আনা স্ত্রীলোক। কুলকামিনী অপেক্ষা বেশ্যাই অধিক, পুরুষদিগের সকলেই প্রায় মুর্খ। এখানে জাতিভেদ নাই। সকল জাতিই সকলের মুখে অন্ন তুলিয়া দিয়া থাকে। এবিষয়ে ঘোষপাড়া জগন্নাথ ক্ষেত্রকেও পরাজয় করিযাছে। সেখানে মুসলমানদিগের প্রবেশাধিকার নাই, এখানে মুসলমানেরা স্বচ্ছন্দে ব্রাহ্মণের মুখে অন্ন প্রদান করিতেছে! রামশরণ বাবুর পুজার বাটীতে একটি দাডিম্ব বৃক্ষ আছে, কেহ কেহ বলে, এই দাড়িম্ব তলায় আউলেচাঁদের গোধূড়ী প্রোথিত আছে, কেহ বলে, রামশরণ ঐ স্থানে বসিতেন, এই নিমিত্ত উহার অধিক মাহাত্ম্য হইয়াছে। দেখিলাম ২০ রোগী আরোগ্যলাভ করিবার আশায় দাডিম্বতলায় হত্যা দিয়া পডিয়া রহিয়াছে। অন্য অন্য ধর্ম্মাবলম্বিদিগের ন্যায় ইহাদিগের বুজরুকীও অল্প নয়। কোন পরিচিত ব্যক্তিকে বোবা সাজাইয়া "বোবার কথা হউক" প্রভৃতি বলিয়া রোগ আরাম করিতেছে! ঈশ্বর বাবুর বাটীতে দুর্গোৎসব, রাস, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায় পর্য্যন্ত সমুদায় অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। তিনি নিজেও ব্রাহ্মণের পদধূলি গ্রহণ করিয়া থাকেন। সকল কর্ত্তাভজারই প্রায ঐরূপ ব্যবহার দেখা যায়। আমাকে কল্য জুতা পায়ে দিতে দেয় নাই, কিন্তু অদ্য আমি দাডিম্বতলা পর্য্যন্ত জুতা পায়ে দিয়া বেড়াইয়াছি।

এই রাধাকৃষ্ণের দোল উপলক্ষে প্রতি বৎসর অনেক চুরি ও হত্যা হইয়া থাকে। এ বৎসর তিন ব্যক্তির ওলাউঠায় মৃত্যু হইয়াছে, দেখিয়া আসিয়াছি। ইহার পর আর কত হয়-বলিতে পারি না। পুলিষের কনষ্টবলেরাও অত্যাচার করিয়া পয়সা গ্রহণ করে।

উপসংহার স্থলে সমাজের বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক। বাঙ্গালাদেশের প্রায় সমুদায় জেলা হইতেই কর্ত্তাভজা আসিয়াছে, তাহার মধ্যে মুরশিদাবাদের লোকই অধিক। যে সমাজের স্ত্রীলোকেরা লজ্জা ও কুলভয়ে গৃহের বাহির হইতে সাহসী হয় না, সেই সমাজের সেই স্ত্রীলোকেরা এক "কর্ত্তা"র অনুরোধে বহুসংখ্য অপরিচিত পুরুষের সহিত একত্রে বসিয়া আমোদ করিতে লজ্জিত হইতেছে না॥ এক একটি পুরুষের নিকটে গড়ে ৪।৫টী করিয়া যুবতী বসিয়া আছে॥

ইতর লোকের মধ্যে এই ধর্ম্মের সবিশেষ প্রাদুর্ভাব। ভদ্রলোকেরা ইহার আদর করা দূরে থাকুক, যাহারা এই ধর্ম্ম অবলম্বন করে তাহাদিগকে ঘৃণা করিয়া থাকেন, তবে যে ২।৪ জন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থকে এই ভ্রমে পতিত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারাও মুর্খতায় ইতর লোকের তুল্য। এ ধর্ম্মের এরূপ প্রাদুর্ভাব হইবার এই কারণ অনুমান হয়, ইহার ভক্তদিগের নানাপ্রকার যথেচ্ছাচারিতার বিলক্ষণ সুবিধা আছে। হিন্দুদিগের শাস্ত্র ও ব্যবহারানুসারে স্ত্রীজাতির স্বাতন্ত্র্য নাই। তাহাদিগকে সকল সময়ে ও সকল

অবস্থাতেই পিতা, মাতা, পতি ও পুত্রাদির পরতন্ত্র হইয়া থাকিতে হয়, কিন্তু কর্ত্তাভজা ধর্ম্মে বিলক্ষণ স্বাতন্ত্র্য লাভ আছে। আমাদিগের সম্বাদদাতা বলিলেন, মেলাস্থলে কর্ত্তাদিগের অতিশয় কড়াকড়ি আছে, কেহ কোন কুকর্ম্ম করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার দণ্ডবিধান হয়। এরূপ হওয়া অসম্ভাবিত নয়। কর্ত্তা পর্য্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল হইলে ধর্ম্মলোপ ও স্বার্থহানি হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। কিন্তু সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, যে স্থানে মূর্খতা ও স্বাতন্ত্র্য উভয়ের যোগ, সেখানে কুক্রিয়ার বিলক্ষণ আধিপত্য হয়, ধর্ম্মের নাম তাহার সহিত সংযোজিত হইলে তাহার ত আর কথাই নাই। আমাদিগের সম্বাদদাতা এ বিষয়ের একটী দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া আসিয়াছেন। তিনি দেখিয়া আসিয়াছেন, বর্ত্তমান কর্ত্তা ঈশ্বর বাবু একটী শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, অনেকগুলি স্ত্রীলোক তাঁহার চতুর্দ্দিকে বসিয়া কেহ পদ সেবা করিতেছে, কেহ গা টিপিয়া দিতেছে, কেহ মুখে আহার দ্রব্য প্রদান করিতেছে, কেহ বা অঙ্গে চন্দন লেপন করিতেছে এবং কেহ কেহ বা গলদেশে পুষ্পমাল্য পরাইয়া দিতেছে। আমরাও অনেক লোকের মুখে শুনিয়াছি, এই ধর্ম্মাবলম্বিদিগের মধ্যে শ্রীবৃন্দাবনের প্রকৃত কৃষ্ণলীলাটাই অনুষ্ঠিত হয়। কোন কোন কর্ত্তা কুলবালাদিগের বস্ত্র হরণ করিয়া বৃক্ষে আরোহণ করেন, রমণীরা করযোড় করিয়া বৃক্ষতল হইতে উহা প্রার্থনা লয়। এতদ্ব্যতিরিক্ত ভূতছাড়ান, ডাইনঝাড়ান প্রভৃতি বিস্তর রহস্য আছে। অতএব অনুমান হইতেছে অনেকে দুষ্প্রবৃত্তির চরিতার্থতা ও স্বার্থসিদ্ধির আশ্রয়ে ঐ দলের পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে।

কর্ত্তাভজাদলে জাতিভেদ নাই, স্ত্রী পুরুষ একত্র বসিয়া উপাসনাদি করা হইয়া থাকে, ঐ ধর্ম্মের উপদেশগুলিও সৎপথ প্রদর্শন। এই সকল দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হইতেছে, যিনি এই ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তিনি বিলক্ষণ বুদ্ধিমান, চতুর ও ঔদার্য্যশালী। এই ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়া তাঁহার নিজ নামকে চিরপ্রসিদ্ধ করিবার অভিলাষ ব্যতিরিক্ত অন্য কোন অভিসন্ধি ছিল কি না, এখন নির্ণয় করিয়া উঠা কঠিন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, কর্ত্তারা আপনাদিগকে ঈশ্বর স্থানীয় বলিয়া জ্ঞান করেন, উপাসকদিগের নিকটেও পূজা পাইয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা আবার নিজ গৃহে দুর্গোৎসবাদি ও ব্রাহ্মণের পদধূলি পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন! অথচ তাহাদিগের উপাসকেরা তাঁহাদিগের প্রতি দৃঢ়ভক্তি প্রকাশ করে।

আমাদিগের অধিকতর চমৎকার বোধ হইতেছে, খৃষ্ট, মহম্মদ গৌরাঙ্গ ও আউলে চাঁদ, ইহাঁদিগের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের ও সেই ধর্ম্মপ্রবর্ত্তন প্রকারের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে।

কথকতা। ২৩ চৈত্র ১২৭০। ২১ সংখ্যা

দিনকতকাল এই ব্যবসায়ের সবিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। এক্ষণে দিন দিন হিন্দু সমাজের অবস্থা পরিবর্ত্ত সহকারে যেমন লোকের মনে ভাব পরিবর্ত্ত হইতেছে, তেমনি

কথকতার প্রাদুর্ভাব হ্রাস হইতেছে। সুশিক্ষিত দলে ইহা আর অধিকার পায় না, এক্ষণে কেবল অশিক্ষিত দল হইতেই কথঞ্চিৎ ইহার জীবন রক্ষা হইতেছে। অশিক্ষিত দলের মধ্যে কেবল স্ত্রী ও নীচ লোকেরাই ইহার অধিকতর ভক্ত। সুশিক্ষিতদলের এ বিষয়ে অরুচি জন্মিবার তিনটী কারণ আছে। এক, ইহা হিন্দুধর্ম্মে গ্রথিত, যাহাদিগের সেই ধর্ম্মে অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, তাঁহাদিগের এ বিষয়ে শ্রদ্ধা থাকিবার সম্ভাবনা নাই। যে সকল পুরাণাদি লইয়া কথকতা করা হয়, তদ্দ্বারা সৎ ও অসৎ উভয়বিধ উপদেশ শিক্ষার সম্ভাবনা আছে। মানুষের মন অসৎ উপদেশ গ্রহণে যেরূপ অগ্রসর হয়, সদুপদেশ গ্রহণে সেরূপ হয় না। কৃষ্ণলীলা বর্ণনাবাসরে রাস ও বস্ত্র হরণাদি বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অশিক্ষিত যুবতীর চিত্ত অবিচলিত থাকা সম্ভাবিত নয়। এই অসৎ উপদেশ শিক্ষাশঙ্কা শিক্ষিতদলের এবিষয়ে উপেক্ষা প্রদর্শনের দ্বিতীয় কারণ।

তৃতীয়, এতন্মধ্যে কতকগুলি বিশেষ দোষ প্রবেশ করিয়াছে। গত বারে সোমপ্রকাশের একজন পত্রপ্রেরক তাহার বর্ণন করিয়াছেন। যেরূপে এই কথকতা সৃষ্ট, এবং যে যে দোষ এতন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে, এস্থলে তাহার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইতেছে না। ··

হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে শয্যা পরিত্যাগ অবধি যাবৎ শয়নকাল দিবাকে ভাগ ভাগ করিয়া গৃহস্থের এক একটা কর্ত্তব্যতার উপদেশ করিয়াছেন। ইতিহাস ও পুরাণাদি শ্রবণ দিবসের ষষ্ঠ ও সপ্তম ভাগের কর্ত্তব্য। হিন্দু শাস্ত্রকারদিগের মতে এইটীই বিশ্রামকাল। বিশ্রামকালে নির্দ্দোষ আমোদপ্রমোদের অনুভব অপ্রশংসনীয় নয়। ইতিহাস ও পুরাণাদি দ্বারা আমোদের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও জ্ঞানোপার্জ্জনেরও বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। পুরাণাদি সংস্কৃতে লিখিত, এদেশের সকলে সংস্কৃতজ্ঞ নহেন, সুতরাং তাহা দ্বারা সাধারণের প্রীতিলাভ সম্ভাবনা নাই। প্রথমে বাঙ্গালাদি ভাষায় পুরাণাদি ব্যাখ্যা প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। এই প্রথা হইতেই ক্রমে ক্রমে কথকতার সৃষ্টি হইয়াছে। ব্যাখ্যাকর্ত্তারা দেখিলেন, কেবল নীরস ব্যাখ্যায় সকলের মনোরঞ্জন হয় না, ক্রমে উহাতে স্বর ও গীত যোগ করিলেন।

বেদীর উপর উপবেশন পূর্ব্বক স্বর ও গীত সংযুক্ত কথকতা রীতি বঙ্গদেশ ব্যতিরিক্ত আর কোন দেশেই নাই। যিনি ইহার প্রথম সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তিনি অতিশয় বুদ্ধিমান ও বিজ্ঞ লোক ছিলেন সন্দেহ নাই। ভাল লোকে ইহাতে হস্তার্পণ করিলে অবশ্যই লোকের মনোরঞ্জন হইয়া থাকে। বাস্তবিক কথকতার অশ্লীল ভাগটী পরিত্যাগ করিয়া যদি গুণ ভাগ ও রাগরাগিণীর বিষয় পর্য্যালোচনা করা যায়, ইহা একটী উপদেশ লাভ ও মনোরঞ্জনের উত্তম উপায় বলিয়া প্রতীয়মান হইবে সন্দেহ নাই। গদাধর শিরোমণি ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তিনি একশত বৎসরের অধিক দিনের লোক নহেন। তাঁহার পর কৃষ্ণহরি শিরোমণি ও রামধন তর্কবাগীশ প্রভৃতি কয়েকজন সবিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া গিয়াছেন।

যে উদ্দেশ্যে ইহার সৃষ্টি হয়, তাহা কোন ক্রমে নিন্দনীয় নহে, কিন্তু কতকগুলি কথক ও কতকগুলি শ্রোতা ইহাকে নিন্দনীয় করিয়া তুলিয়াছে। কথকদিগের অনেকে লম্পটস্বভাব হন, এক্ষণকার শ্রোতাগণের মধ্যেও বেশ্যা, অসতী ও লম্পটই বাহুল্য পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে। উল্লিখিত পত্রপ্রেরক এ বিষয়টীর সুন্দর বর্ণন করিয়াছেন, তবে যে তিনি লিখিয়াছেন, বিখ্যাত বিদ্বান্ ব্যক্তিরাও অসদভিসন্ধিতে কথকতার স্থলে গমন করিয়া থাকেন, সে অংশটী অত্যুক্তি দোষে দূষিত বোধ হইতেছে। তবে যদি পত্রপ্রেরক ইংরাজীর আঘ্রাণকারিদিগকে বিদ্বান্ বোধ করিয়া থাকেন, সে 'স্বতন্ত্র কথা'। এই প্রকার লোকেরই আজি কালি কিছু দলপুষ্টি দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল ব্যক্তি হইতেই অসূক্ষ্মদর্শির নিকটে সময়ে সময়ে প্রকৃত বিদ্বান ব্যক্তিরও নিন্দা রটিয়া থাকে।

এক্ষণে আমাদিগের প্রস্তাব এই, বিষয়টী যখন এত দোষের আকর হইয়া উঠিয়াছে, তখন ভদ্রলোকদিগের এ বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া আর বিধেয় হয় না। যাঁহারা কুলকামিনীদিগকে কথকতার স্থলে গমনে অনুমতি দিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের সতর্ক হওয়া উচিত। অসাধু দৃষ্টান্ত দর্শন অতিশয় অপকারক। কথকতা শুনিবার যোগ্য সময়টীতে যদি স্ত্রীলোকদিগের গৃহে বসিয়া সদুপদেশ শ্রবণ, সৎগ্রন্থের আলোচনা ও শিল্প শিক্ষার উপায় করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে তাহাদিগের ধর্ম্মনীতির বৃদ্ধি সহকারে চিত্ত শুদ্ধি হইয়া সাংসারিক কার্য্যে বিলক্ষণ উপযোগিতা জন্মিতে পারে।

রাসের মেলা। ২১ বৈশাখ ১২৭১। ২৫ সংখ্যা

চিঠি

মহাশয়! সেদিন আপনার নিয়োজিত সংবাদদাতা ঘোষপাড়ার "কর্ত্তাভজা" পর্ব্বের বর্ণন করিয়াছিলেন, অদ্য আমিও একটী হিন্দু পর্ব্বের বর্ণন করিতেছি।

জেলা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী হরিণাভি নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র ঘোষ গত চৈত্রী পূর্ণিমাতে এক রাস করিয়াছেন। ১০ই বৈশাখ অবধি ১২ই বৈশাখ পর্য্যন্ত তিনদিন এই রাসযাত্রা হইয়াছিল। আমি তিন দিনই উহা দর্শন করিয়াছি। যাহা দেখা গিয়াছে, অগ্রে সংক্ষেপে তাহার স্থূল স্থূল বিবরণগুলি বলিয়া এতদ্দ্বারা যাহা বুঝিতে পারিলাম, নিম্নে লিখিয়া দিতেছি—

১০ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় রাস দেখিতে গমন করি, প্রথমে সদর রাস্তার উপরে নহবৎ ফটক ও লোকের ভিড়, তাহার পর দোকান। দোকান বড় অধিক আইসে নাই, কয়েকজন ময়রা মিঠাইকর, কয়েকজন মাদুরওয়ালা, জন দশ বার মৎস্য ব্যবসায়ী, কয়েকজন মণিহারি, আর কয়েকজন ডাব নারিকেল, আতোষবাজী, মাটীর পুতুল, সরা ঢাক, বাঁশী, পাজী ও পট বিক্রয় করিতেছে। দোকানের পার্শ্বে অথবা রাস্তার

দুই ধারে নানাপ্রকার মাটীর সঙ। সঙেরা যেন বিপণিগুলির প্রহরিস্বরূপ হইয়াছে, যত অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই নূতন নূতন সঙ আমার নয়নগোচর হইতে লাগিল। কতকদূর যাইয়া দেখি, একটা দরমার বেড়া দেওয়া ক্ষুদ্র গৃহের মধ্যে কলের পুতুল নাচ হইতেছে, ঢুলিরা নীচে দাঁড়াইয়া তালে তালে সঙ্গত করিতেছে। পুতুল নাচের পর একটী পুষ্করিণী, পুষ্করিণীতে কমলে কামিনী সঙ হইয়াছে। জলের উপর কতকগুলি সোলার পদ্মফুল এবং জেলে ডিঙি চড়া সকাগুারী মাটীর শ্রীমন্ত সওদাগর ভাসিতেছে। কামিনীরূপা মাটীর ভগবতী একধারে বসিয়া গজ গিলিতেছেন।

রাস্তার সঙ দেখা শেষ হইলে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। ভাবিয়াছিলাম, এখানেও কোন প্রকার আশ্চর্য্য সঙ থাকিতে পারে, কিন্তু সে কল্পনা সম্পূর্ণরূপে সত্য হইল না। বাটীর ভিতরে অতিশয় লোকের ভিড। সেই ভিড়ের ভিতর একটী স্ত্রীলোক কীর্ত্তন করিতেছে। কীর্ত্তনীযাটী কিছু স্থূলকায, সুতরাং সকল গীত স্পষ্ট করিয়া গাইতে পারিতেছে না। দোযারেরা খোল কত্তালের সঙ্গে সঙ্গে কামিনীর বদনার্দ্ধ বিনির্গত স্বর কাড়িয়া লইতেছে, এ কীর্ত্তন আমার প্রীতিকর হইল না, কিন্তু এই স্থানেই লোকারণ্য। কীর্ত্তনের সম্মুখেই দালানের উপর কাষ্ঠময় সিংহাসনে সকিশোরী ত্রিভঙ্গ রাসবিহারী দুলিতেছেন। চৌকীর পার্শ্বে মাটীর গোপীগণ ও সোলার ফুল প্রভৃতি সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে। নিম্নে কতকগুলি প্রকৃত পুষ্পরিকী রহিয়াছে। এই স্থানে বলিয়া রাখা আবশ্যক, কি দালান, কি কীত্তনস্থান, কি পুতুল নাট্যশালা এবং কি রাস্তা, সকল স্থানেই প্রায় স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক।

গ্রীষ্মের কল্যাণে সর্দ্দিগরমি হইবার উপক্রম হইল, আমি বাটী হইতে বহির্গত হইয়া গঙ্গাতীরে আসিলাম। তথায় দুখানি ময়ূরপঙ্খীর উপর একদল স্ত্রী ও একদল পুরুষের সারি গাওয়া হইতেছিল। সারির কুৎসিৎ খেঁউড় ও দর্শকদলের করতালি ও হরিবোলের ধ্বনিতে গঙ্গা যেন এক একবার লজ্জায অধোবদন হইতেছেন। আমি ঐরূপ ব্যবহার দর্শন করিয়া দুঃখিত চিত্তে তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। রাত্রিতে খেমটার নাচ, একদিন বৈঠকী গাওনা ও দুইদিন যাত্রা হইয়াছিল।

এইস্থানে রাসযাত্রার ফলের বিষয়ে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। নানাপ্রকার দ্রব্য বিক্রয় ও নানা স্থানের লোকের সমাগম হওয়াতে ব্যবসায়ের বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া হয় বটে, কিন্তু ভিড়ের ভিতর অনেকে লম্পট স্ত্রীলোকের প্রতি অনুচিত ব্যবহার করে।

সঙের দ্বারা এদেশের শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। মিতুয়া, মৌলবী, মাতালের সঙ মন্দ হয় নাই, কিন্তু চীনে প্রভৃতি কয়েকটী সঙে কারিকরের "শিব গড়িতে বানর গড়া" বাক্যের পরিচয় দিয়াছে। পুতুলনাচে আমার কিছু বলিবার নাই। কীর্ত্তনের দ্বারা হিন্দুধর্ম্মাবলম্বিদিগের ধর্ম্মচর্চ্চা ও ধর্ম্মকথা শ্রবণ করা হয় বটে, কিন্তু কাজে তাহা ঘটিয়া উঠে না। আমি দেখিলাম, অনেক শ্রোতা নীচে ও উপরের বারাণ্ডার দিকে হাঁ করিয়া

চাহিয়া আছেন। ফলতঃ নবীন বাবু অনাবৃত স্থানে স্ত্রীলোক বসাইবার নিয়ম করিয়া ভাল করেন নাই। গঙ্গায় সারি গাওয়ার কথা ত মুখেই আনিবার নয়। খেমটার নাচও অতিশয় অনিষ্টকর। নর্ত্তকীরা যত নৃত্য করিতে পারুক আর না পারুক, বাবুদিগকে কটাক্ষে মোহিত করিয়া অর্থ শোষণ করে। এই দুটী বিষয় দর্শকদিগের চরিত্রদোষ সম্পাদনের প্রধান কারণ। রাসযাত্রা যখন হিন্দুশাস্ত্রের অনুমোদিত তখন হিন্দুধর্ম্মাবলম্বিরা উহা করিতে পারিবেন না, ইহা বলা অন্যায়, কিন্তু এ সকল উপসর্গ কেন? ভদ্রলোকের বাটীর ভিতর গোপাল উড়ের যাত্রা দেওয়া কোন্ যুক্তির অনুসারী কার্য্য? এই যাত্রার সকল অঙ্গই প্রায় আদিরস ঘটিত, বিশেষতঃ যখন মালিনী আইসে, তখন কোন্ ভদ্রলোক অনাবৃত কর্ণে বসিয়া স্থির থাকিতে পারেন?

এই রাস উপলক্ষে আব তিনটী প্রকাশ্য অনিষ্ট ঘটনা হইযাছে। এক মুসলমান আপনাকে "পীরের" প্রেরিত বলিয়া একজন গোয়ালাব নিকট হইতে ।৵১০ আনা জুয়াচুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। সে আবাব এই বৃহস্পতিবার আসিবে। দ্বিতীয়ত, নবীন বাবুব প্রতিষ্ঠিত সঙদিগের মধ্যে একটী গোয়ালিনী ছিল, তাহার গলায় এক ছড়া পিত্তলের চিক ও হাতে একখানি ঐ ধাতুর ইষ্ট কবচ ছিল, শেষ রাসেব দিন রাত্রি ১০টার সময় এক ঢুলি ঐ গোয়ালিনী সঙেব চিক ও কবচ চুরি করিয়াছে॥ পুলিসেব লোকেরা তাহাকে ধরিয়া কেবল প্রহার করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে! বিচারার্থ পাঠায় নাই। তৃতীয়, রাসের ভিতর ফড খেলা হইতেছিল, একজন চোর ক্রীড়াকাবী ঐ ক্রীড়ার সানকী ও বাটী চুরি করিয়া পলায়ন করে, পুলিসের লোকেরা তাহাকেও ঐরূপে ছাড়িয়া দিয়াছে॥ ফড খেলাটা দিনকতক শুনা যায় নাই, সম্প্রতি নতন পুলিসের সঙ্গে সঙ্গে ইহাব পুনবাবির্ভাব হইয়াছে। এতদ্ব্যতিরেকে আব কোথায় কি হইয়া গিযাছে, আমি তাহার বিশেষ স্বাদ জানি না। আবকাবীর বিশেষ উন্নতির মুখ, স্বতরাং তাহার সৌভাগ্যের কথা না বলিলেও পাঠকগণ অনায়াসে বুঝিয়া লইতে পারিবেন।

উপসংহাব স্থলে নবীন বাবব প্রতি আমার একটী বক্তব্য আছে। তিনি পূজার ন্যায় অঙ্গ ব্যতিরেকে জলকীর্ত্তন, খেমটা ও গোপাল উড়ের যাত্রাতে যত টাকা ব্যয় করিলেন, অথবা জলে ফেলিয়া দিলেন, অন্য কোন সৎকার্য্যে এই টাকা দিলে কি ইহা অপেক্ষা অধিকতর আমোদ, প্রশংসা ও পুণ্য লাভ করিতে পারিতেন না? শাস্ত্রে কি বেশ্যার নৃত্য ও থেঁউড়ে পূজার অঙ্গ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে? একটা আহ্লাদের বিষয় এই যে, নবীন বাবু বাজী পোড়াইয়া কতকগুলি টাকা হুতাশন মুখে আহুতি প্রদান করেন নাই। ইতিপুর্ব্বে জগদ্দল নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু গোলোকনাথ ঘোষ গোষ্ঠযাত্রা উপলক্ষে তিন দিন অনেকগুলি টাকা জলে ও অনলে নিক্ষেপ করিয়াছেন।

১৪ই বৈশাখ
১২৭১ } দর্শক

চৈত্রপর্ব্ব। ২৯ চৈত্র ১২৭৮। ২১ সংখ্যা

চিঠি

মহাশয়! এই পর্ব্বোপলক্ষে আমাদিগের গ্রামের লোকেরা অসীম অর্থ ব্যয় করিয়া যে কতদূর আনন্দ প্রকাশ করেন, তাহা বর্ণনাতীত। এই গ্রামবাসী লোকেরা চারিটী প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত, অর্থাৎ এই পর্ব্বোপলক্ষে চারি পাড়ার লোকে এক একদল হইয়া মহোৎসাহ সহকারে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, এবং এই কার্য্য সমাধা করিতে পারিলেই তাঁহারা আপনাদিগকে চরিতার্থ জ্ঞান করেন। ইহারা চৈত্র মাসের প্রথম দিবসে আনন্দসূচক ধ্বজা উত্তোলন করিয়া অন্য সম্প্রদায়ের বিপক্ষবর্গকে অবগত করাইয়া থাকেন যে আমরা অপেক্ষাকৃত অধিক অর্থ ব্যয় করিয়া এবং নানাবিধ বাদ্য বাদন করিয়া এই কার্য্য সম্পাদন করিব। এইরূপে প্রথম দিবসাবধি সংক্রান্তি পর্য্যন্ত প্রত্যহ মহামহোৎসবে নানাবিধ নৃত্য গীত হইয়া থাকে। গ্রামস্থ অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরা পরস্পর গানের উত্তর প্রত্যুত্তর দেন এবং মাসের শেষ দুই দিবসে উত্তম যাত্রা ও নৃত্যাদি হইয়া পর্ব্ব সমাপ্ত হয়। মহাশয় চৈত্র পর্ব্বের কি অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য! এ সময়ে ভদ্রাভদ্রের কিছুই বিচার থাকে না, সকলেই সমবেত হইয়া নৃত্যাদি করেন।

সম্পাদক মহাশয়! বরং ছেলে ছোকরাদের পাব আছে কিন্তু গ্রামের অশীতিবর্ষবয়স্ক ব্যক্তিগণ যে কি পর্য্যন্ত ঘৃণিত কার্য্যে রত হন তাহা বলা যায় না, এমন কি আমিও এক সময়ে আহ্লাদে মগ্ন হইয়া বাঁশ বহন এবং নৃত্যাদি করিয়াছি। আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন অস্মদ্দেশীয় লোকেরা কিরূপ ভ্রমান্ধ, তাঁহারা প্রাণে প্রাণে এরূপ অলীক আমোদে মত্ত হইয়া অকাতরে অজস্র অর্থ ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হন না, কিন্তু তাঁহাদিগের নিকটে দেশের কোন শুভ সাধনোদ্দেশে বা বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে তাঁহারা সাধ্যমতে তাহার বাধা জন্মাইয়া থাকেন।

মোগুলাই }
২৪শে চৈত্র }

কস্যচিৎ যথার্থবাদিনঃ

গাজিসাহেবের মেলা। ১১ আষাঢ় ১২৭৯। ৩২ সংখ্যা

এই অম্বুবাচীতে মাতলা রেলওয়ের বাঁশড়া ষ্টেসনের নিকটে গাজিসাহেবের মেলা বলিয়া একটী মেলা হয়। এটী মুসলমানদিগের মেলা। আমরা দেখিলাম, শত শত মুসলমান মেলাস্থলে যাইতেছে। এত জনতা হইয়াছে যে গাড়িতে স্থান সমাবেশ হইতেছে না। অধিকাংশ যাত্রির সঙ্গে ছাগল ও মুরগী আছে। শুনিলাম, উহারা মেলাস্থলে উপস্থিত হইয়া ঐ সকল ছাগল ও মুরগী জবাই করিবে। একজন কহিলেন, যে সকল

পুংছাগল লইয়া যাওয়া হইতেছে অগ্রে সেগুলিকে খাসী, তাহার পর জবাই করা হইবে, শুনিয়া আমাদিগের অন্তঃকরণে এই চিন্তা উপস্থিত হইল, মুসলমানেরা নিষ্ঠুর বলিয়া যে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, ধর্ম্ম, ধর্ম্মমূলক এই অভ্যাসই তাহার কারণ। একটী পাঁঠাকে প্রথমে খাসী করিবার যন্ত্রণা দিয়া শেষে আবার তাহাকে জবাই করিবার যাতনা দেওয়া নিতান্ত নিষ্ঠুরের কাজ সন্দেহ নাই। অম্বুবাচীতে এই মেলাটীর সৃষ্টি হইবার এই কারণ বোধ হয়, অম্বুবাচীর তিনদিন কৃষিকার্য্য নাই। কৃষকদিগের অবসর থাকে। মাতলা রেলওয়ের পার্শ্ববর্ত্তী এক এক গ্রামে অধিকাংশ কৃষকের বাস। তাহারা এই অবসরকাল আমোদ-প্রমোদে অতিবাহিত করে। গাজিসাহেবের বিষয়ে একটী মনোহর গল্প আছে, তাহার স্থূল মর্ম্ম এই—নবাবী আমলে জমিদারেরা সহজে খাজনা দিতেন না, তখন সূর্য্যাস্ত-কালে নীলামের নিয়ম ছিল না। নবাবের যখন যে জমিদারকে মনে পড়িত, খাজনার নিমিত্ত তাঁহাকে পীড়ন করা হইত। যিনি কোনক্রমে কর না দিতেন তাঁহাকে কারারুদ্ধ করা হইত। বারুইপুরের জমিদার মৃত মদনমোহন রায় একদা নবাব সংসারের খাজনা দেন নাই। তাঁহাকে ধরিয়া মুরসিদাবাদে লইয়া যাইবার নিমিত্ত নবাবের লোক আইল। তিনি এই বিপদ উপস্থিত দেখিয়া প্রস্থান করিলেন। তৎকালে গাজি নামে এক মুসলমান ফকির বুজরুক হইয়াছিল। মদন রায় তাহার নিকটে গেলেন। সে দেখিয়াই তাঁহাকে বলিল তুমি যে নিমিত্ত আসিয়াছ, আমি বুঝিয়াছি, তোমার কোন ভয় নাই। তুমি স্বচ্ছন্দে মুরসিদাবাদে যাও, নবাব তোমার খাজনা লইবেন না। সেখানে তোমার বিশেষরূপে সম্মানলাভ হইবে। এই কথা কহিয়া ফকির তাহার প্রতি মদন রায়ের আস্থা আছে কি না তাহার পরীক্ষার্থ বলিল, তোমাকে আমার এই আস্তানার নিকটে স্বহস্তে একটী পুষ্করিণী খনন করিতে হইবে। মদন রায় দ্বিরুক্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ কোদাল লইয়া মৃত্তিকা খনন করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি সবে ৩টী কোপ মারিয়াছেন, ফকির অমনি তাঁহাকে নিষেধ করিয়া কহিল, আর তোমার ক্লেশ স্বীকারের প্রয়োজন নাই, তিনি বিরত হইলেন। ফকিরের প্রভাবে ঐ তিন কোপেই একটী বৃহৎ পুষ্করিণী হইল। অতঃপর মদন রায় মুরসিদাবাদে যাত্রা করিলেন। ফকীর ওদিকে সুবর্ণময় ভ্রমরের রূপ ধারণ করিয়া মুরসিদাবাদে গিয়া নবাবকে এই স্বপ্ন দিলেন, তুমি মদন রায়কে খাজনার নিমিত্ত পীড়ন করিও না। তাহা করিলে রাজ্য অচিরকালমধ্যে তোমার হস্তপরিভ্রষ্ট হইবে। অনন্তর মদন রায় মুরসিদাবাদে উপনীত হইলেন। নবাব তাঁহাকে মহা সমাদর করিয়া লইয়া গেলেন। গাজি এইরূপ বুজরুকী দেখাইয়া দেবত্ব লাভ করিয়াছেন। গাজিসাহেব বলিয়া তাঁহার প্রসিদ্ধি হইয়াছে। দক্ষিণ প্রদেশের আবাদ অঞ্চলে তাঁহার বড় প্রাদুর্ভাব। তত্রত্য লোকের এই প্রকার সংস্কার, তাঁহার সিরণী না দিয়া কেহ কোন কাজ করিলে তাহা সিদ্ধ হয় না। এইরূপে অনেকে দেবত্ব লাভ করিয়াছেন। এদেশে আজিও এই প্রকারে দেবত্বলাভ চেষ্টা পরিত্যক্ত হয় নাই।

কলিকাতার মহাপ্রদর্শনী। ১৩ কার্ত্তিক ১২৯০

কলিকাতার মহা সমৃদ্ধ মেলা আগতপ্রায়, পাঠক! বিজ্ঞাপনস্তম্ভে তদ্বৃত্তান্ত দর্শন করিবেন। বিজ্ঞাপনে বলা হইয়াছে, এরূপ ব্যাপার কেহ কখন দেখেন নাই। বাস্তবিক যেরূপ আড়ম্বর তাহাতে ঐ বাক্য অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। যাহারা ইউরোপের প্রদর্শনী দর্শন করিয়াছেন, তাহাদিগের কথা স্বতন্ত্র কূপমণ্ডুক ভারতবাসিরা যে কখন দেখেন নাই, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিজ্ঞাপনের ভাবে স্পষ্ট বোধ হইতেছে ভারতের ঐশ্বর্য্য প্রদর্শনই এ প্রদর্শনীর মুখ্য এবং শিল্পজাত দ্রব্যাদি প্রদর্শন করিয়া তত্তংবিষয়ে উৎসাহ দান করা গৌণ উদ্দেশ্য, অতএব এতৎ সম্বন্ধে আমাদিগের দুই চারিটী বক্তব্য উপস্থিত হইতেছে। এক্ষণকার প্রদর্শনী ও দরবারগুলি ঐশ্বর্য্য প্রদর্শনের ও তামাসার ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে দেশের যে কোন স্থায়ী ও পারা উপকার হয়, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। যে দর্শক মেলা দেখিতে আসিবে, তাহার মনে যদি তামাসার ভাব প্রবল হয়, শিক্ষার উদ্দেশ্য কখনই তাহার হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হইতে পারে না। কোন্ দ্রব্য দেখিতে কেমন সুন্দর, কেমন উজ্জ্বল কেমন মূল্যবান্ তদ্দর্শনার্থই তামাসাদর্শীর মনে আগ্রহ জন্মিবে। কোন্ দ্রব্যে কিরূপ কারুক্রিয়া আছে, কোন্ দ্রব্যে কিরূপ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, কোন্ দ্রব্য কি প্রণালীতে উৎপাদিত হইয়াছে তাহা শিখিবার তখন কি তাহার ইচ্ছা থাকে? দর্শকেরা এটীকে যে ঐশ্বর্য্য ও তামাসা দেখিবার ব্যাপার মনে করিবে তাহার অপর কারণ এই, দর্শকদিগের চিত্তরঞ্জনার্থ গীত বাদ্যাদিরও অনুষ্ঠান করা হইবে। এ দেশে সচরাচর যে সকল মেলা হয় তাহাতেও নানা প্রকার গান বাদ্য ও ভাঁড়ের তামাসা প্রভৃতি হইয়া থাকে। অতএব ঐটী যে সেই ধাতুর একটী মেলা নয়, দর্শকের মনে কি ভাবে তাহার উদয় হইবে। অধিক ঐশ্বর্য্য হইলে তাহার প্রদর্শন করা মানুষের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। মানুষের যে মহামোহ ও গর্ব্ব আছে, তাহা স্থির হইয়া থাকিতে দেয় না। আসিয়া খণ্ডে বিশেষতঃ ভারতবর্ষে এ রোগটী বিশেষ প্রবল। বিভবশালিরা নানা উপায়ে আপনাদিগের সমৃদ্ধিমত্তা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। এ দেশের ধর্ম্মকার্য্যেও ভূরি পরিমাণে তামসিক ব্যাপারের অনুষ্ঠান হয়। যিনি দুর্গোৎসব করেন, বহুলভাবে তামসিক ব্যাপারের অনুষ্ঠান না হইলে তাঁহার গর্ব্বিত চিত্তের তৃপ্তি লাভ হয় না। হিন্দু রাজারা যে রাজসূয় যজ্ঞ করিতেন, প্রধান ভাবে তামসিক ব্যাপারের অনুষ্ঠান তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। যিনি সম্রাট হইতেন, তাঁহারই রাজসূয় যজ্ঞে অধিকার। তিনি রাজসূয় যজ্ঞের আরম্ভ করিয়া অধীন রাজগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়া আপনার ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন করিতেন। ঐ ব্যবহারটী যে উদার ও বিশুদ্ধ, তাহা আমাদিগের মনে হয় না। ইহাতে অধীন রাজগণের গর্ব্বে আঘাত লাগে। ইংরাজ রাজপুরুষেরা ভারতে আধিপত্য লাভ করিয়া, হিন্দুরাজগণের মনের ভাব তাহাদিগের অন্তঃকরণেও সংক্রামিত হইয়াছে।

অতএব তাঁহারা দরবার ও মেলার অনুষ্ঠান করিয়া যে আপনাদিগের ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন করিবেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু ঐ প্রদর্শনী দ্বারা শিল্পাদি শিক্ষার উৎসাহদান করা হইবে যে ঘোষণা করা হয়, তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয়, আমাদিগের বিবেচনায় প্রদর্শনীর দ্বারা শিল্পাদি শিক্ষার অনুরাগ কাহারই মনে দৃঢ়বদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। এ দেশে কত কৃষিপ্রদর্শনী হইল, কত শিল্প প্রদর্শনী হইল, এ দেশের কত লোকে ও কত কৃষকে তাহা দর্শন করিল, কিন্তু কৈ কোন কৃষকই ত আপনার পৈতৃক কৃষিপদ্ধতির পরিবর্ত্ত চেষ্টা পাইল না কিংবা পুর্ব্ব শিক্ষিত শিক্ষাপ্রণালীর উৎকর্ষসাধন চেষ্টা করিল না। একমাত্র দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া কৃষি ও শিল্পাদির উৎকর্ষসাধন করিতে পারে এমন কয়জন আছে? রীতিমত শিক্ষা দিলেই যখন অধিকাংশ লোকে সমীচীন ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারে না, তখন কেবল দেখিয়া যে ব্যুৎপত্তি লাভ করিবে ইহা কি সম্ভাবিত হয়? গবর্ণমেণ্ট কৃষি বিভাগ করিয়াছেন, শিল্পাদি শিক্ষাদান বিষয়েও ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন, কিন্তু কৈ রীতিমত শিক্ষা দিবার ও ঐ ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত কবিবার ত তেমন ব্যবস্থা ও উপায় অবলম্বন করা হইতেছে না। আমরা ত কলিকাতার কানের কাছে আছি, কিন্তু এখানে সেই চিরকেলে কৃষিপ্রণালী আছে তাহার পবিবর্ত্তেব ত নামগন্ধ শুনিতে পাই না। পরিবর্ত্তের মধ্যে এই দেখিতে পাই, পুর্ব্বে যে সকল ভূমি নিম্ন ছিল, তাহা ক্রমে পুবিয়া উচ্চ হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে পুর্ব্বে যে পরিমাণে ধান্য জন্মিত, এখন তাহার অর্দ্ধেক হওয়াও ভার হইয়া উঠিয়াছে। অতএব আমরা এ সম্বন্ধে প্রস্তাব করিতেছি, যাহাতে কৃষি শিক্ষা ও শিল্পাদি শিক্ষা প্রচারদ্রূপ হয়, তাহার ব্যবস্থা ও উপায় অবলম্বন কবা কর্ত্তব্য। স্থানে স্থানে গবর্ণমেণ্টের নিজকৃত ও সাহায্যকৃত উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় আছে, সেইখানে কৃষি ও শিল্পাদি বন্দোবস্ত করা হউক, কৃষি ও শিল্পজ্ঞ এক এক জন অতিবিক্ত শিক্ষক নিযুক্ত থাকিবেন, তাঁহারা নিরূপিত সময়ে তত্তৎ বিষয়ের শিক্ষাদান করিবেন এবং সময়ে সময়ে ক্ষেত্রে গিয়া কৃষিপদ্ধতি দেখাইয়া দিবেন। যে পর্য্যন্ত না লোকে উপকার দেখিতে পাইবেন, সে পয্যন্ত গবণমেণ্টেকে শিক্ষা দিবার সমুদায় ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে। প্রথমে লোকের প্রবৃত্ত লওয়াইবার নিমিত্ত এবং প্রথম পথ পাতিত করিবার মিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট নিজে সমুদায় ব্যয়ভার বহন করিয়া আসিয়াছেন ইহার অনেক উদাহরণ আছে। কলিকাতাস্থ গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত বিদ্যালয়ই ইহার প্রধান উদাহরণ। গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ের সমুদায় ব্যয়ভার বহন করিয়া এবং বিদ্যার্থিদিগকে মাসিক পাঁচ ও আট টাকার বৃত্তি দিয়াও ছাত্র পান নাই। এখন সেই বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা ব্যগ্রভাবে বেতন দিয়া অধ্যয়ন করিতেছে। ইহার কারণ এই, ঐ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া ছাত্রেরা উপকার দেখিতে পাইয়াছে। ঐ বিদ্যালয়ের এমনও অবস্থা গিয়াছে, ছাত্রেরা জীবিকার বিষয়ে হতাশ্বাস হইয়া শিক্ষা-সমাজের নিকট এই প্রার্থনা করিয়াছিলেন, বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর তাঁহাদিগের জীবিকার একটী উপায় করা হয়। মেকলে সাহেবের তখন শিক্ষা-

সমাজের সহিত সংস্রব ছিল, তিনি ঐ দরখাস্ত পাইয়া গবর্ণমেণ্টে লিখিলেন, যদি পাঠার্থিরা ভাবী জীবিকার নিমিত্ত এরূপ আকুল এবং সেই জীবিকাব কোন উপায় নাই তবে সংস্কৃত পাঠশালা রাখিযা আবশ্যক কি? তিনি বিদ্যালযটী উঠাইযা দিবার কল্পনা করিয়াছিলেন, কিন্তু অন্য অন্য সভ্যদিগের মত না হওযাতে তাঁহার কথা রক্ষা হইল না। এখন সেই বিদ্যালয রূপান্তব ধাবণ কবিযাছে। তাহাব উন্নতিব মূল মহোপাধ্যায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগব, তিনি ঐ বিদ্যালযেব উন্নতি সাধনার্থ বিপুল পরিশ্রম করিয়াছিলেন। কিঞ্চিৎ অপ্রাসঙ্গিক হইলেও বলিতে হইল, গবণমেণ্ট তাঁহার গুণের সমুচিত পুরস্কাব করেন নাই। আমরা মফঃস্বলেব উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালযে যে শিক্ষাদান প্রস্তাব কবিতেছি, যদি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরেব ন্যায উৎসাহসম্পন্ন দযালুহৃদয় হিতৈষী লোক উহার ভাব গ্রহণ করিয়া এবং মফঃস্বলেব স্থানে স্থানে ভ্রমণ কবিযা উৎসাহবান হিতৈষী ব্যক্তিদিগেব উপবে ভাব অর্পণ করেন, কলিকাতার সংস্কৃত বিদ্যালযের ন্যায তত্তৎ বিভাগগুলি উন্নত হইযা উঠিতে পাবে এবং দেশেব মহোপকার সাধিত হয। কেবল প্রদর্শনী করিয়া অভীষ্টসিদ্ধিব সম্ভাবনা নাই। প্রদর্শনী সম্বন্ধে আমাদেব অপব বক্তব্য এই দর্শনার্থী দরিদ্রদিগেব নিমিত্ত চাবি আনা দামের টিকিট কবা হইয়াছে, এমন দরিদ্রও অনেক আছে, চাব আনা দিতেও কষ্ট বোধ কবিবে। অতএব সপ্তাহের মধ্যে একদিন বিনা টিকিটে দেখিতে দিবাব ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। এ ব্যাপাবটি যেমন মহৎ, আমাদেব গবর্ণমেট যেমন মহৎ এ কায্যটিও তেমন মহৎ হয। এ দেশেব লোকে দান ব্যাপারটি কিছু ভাল বুঝে। খযবাত খাতায কিছু না থাকিলে জমা হয না।

বারয়ারী। ২৯ আষাঢ় ১২৯৩। ৩৭ সংখ্যা

আমাদের কোন সহযোগী বাবযাবীর বড পক্ষপাতী হইযাছেন। তাঁহার মতে বারয়ারী অনেক লোকের আমোদেব আহ্লাদেব স্থান এরূপ 'জাতীয আমোদ একতার আমোদ" উঠাইযা দেওযা তাঁহাব মতে বুদ্ধিমানের কায্য নয।

আমাদের আহ্লাদ যে মনুষ্য জীবনেব নিতান্ত প্রযোজনীয একথা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন কিন্তু সেই আমোদ দূষিত হইলেই প্রযোজনটা কিছু সামান্য হইয়া পডে। যদি গ্রামেব ভিতব একটী শুঁডীব দোকান ব্যতীত আমোদ আহ্লাদেব আর স্থান না থাকে, তবে কি সেখানকাব আমোদপ্রমোদ জীবনেব কোন অভাবপূরণ করে? আজকালকার বাবযাবীতে বিশুদ্ধ আমোদ লাভ কবা যায না। প্রায়ই মদ বেশ্যা ইত্যাদি লইয়া বারযাবীব পাণ্ডাদিগের আমোদপ্রমোদ হয়। ইহাতে আমোদের সঙ্গে সঙ্গে পাপেরই বিলক্ষণ প্রশ্রয় পাইয়া থাকে। বাবয়ারীতে স্থানে স্থানে দাঙ্গা হাঙ্গামা নিবারণ করিবাব জন্য পুলিষের সাহায্য আবশ্যক করে। কোথাও বা হত্যাকাণ্ড

হইতেও দেখা গিয়াছে। বারয়ারীর পাণ্ডারা প্রায়ই নিষ্কর্ম্মা। দেশের ভিতর তাহারা কেবল পরনিন্দা পরগ্লানি করিয়া দিনাতিপাত করে। যাহাদের কোন সঙ্গতি নাই, এমন কোন সামর্থ্য নাই, যাহাতে স্বীয় ভরণপোষণের উপায় করিতে পারে, চৌর্য্যবৃত্তি যাহাদের অভ্যস্থ, দেশে গ্রামে প্রায়ই যাহাদের অত্যাচারের কথা শুনিতে পাওয়া যায় এই প্রকার লোকই বারয়ারীর গন্ধ পাইয়া নাচিয়া উঠে, পাণ্ডা সাজিয়া চাঁদা আদায়ের জন্য গ্রামের লোকের উপর উৎপীড়ন করে, কাহারও চাঁদা দিবার সামর্থ না থাকিলে ঘরের ঘটি-বাটী ঝাড়ের বাঁশ কাড়িয়া লইয়া যায়। যে যে গ্রামে এই প্রকার বারয়ারীর পাণ্ডারা বাস করে সেখানে বিবাহ দিতে যাওয়া ভদ্রলোকের পক্ষে বড় বিপদের কথা। বরকন্যা বিদায় কালীন বর পক্ষীয় ও কন্যাপক্ষীয় আত্মীয়দিগের ভিতর অপ্রণয় জন্মাইবার প্রধান কারণ এই সকল বারয়ারীর পাণ্ডা। ইহারা অভদ্রোচিত গালাগালি দিয়া বরযাত্রের নিন্দা করাকে বড় পুরুষতত্ব মনে করে, তাই বরযাত্রীরা যতই কেন বারয়ারীর জন্য টাকা দিন না, পাণ্ডাদের নিন্দা কুৎসা অপমানসূচক বাক্য, এমন কি কুৎসিত ভাষায় গালি পর্য্যন্তও না খাইয়া ফিরিতে পারেন না। এই সকল ব্যক্তি যখন বারয়ারীর পাণ্ডা তখন যে তাহাদের কার্য্যে বিশুদ্ধ আমোদ পাওয়া যাইবে তাহা কখনও সম্ভব নহে।

সহযোগী কেবল কলিকাতা ও সহর অঞ্চলে বারয়ারীর চাঁদা আদায়ের প্রথার কথা উল্লেখ করিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। একবার যদি তিনি পল্লীগ্রামের চাদা আদায়ের দিকে দৃষ্টিপাত করেন তাহা হইলে আদায় প্রথার ততদূর সুখ্যাতি করিতে তাঁহাব আর প্রবৃত্ত হইতে হইবে না। সহরের ভিতর দোকানদারেরা খদ্দেরের কাছে বৃত্তি (বিত্তি) আদায় করে। ইহাতে কাহাকেও বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় না। কিন্তু পল্লীগ্রামে দোকানদারেরা সেরূপ বিত্তি আদায় করে না। সেখানে কেবল কতকগুলি মাদকসেবী রূঢ়স্বভাব নিকর্ম্মা ব্যক্তি দ্বারে দ্বারে রাজস্ব আদায়ের মত বারয়ারীর চাঁদা আদায়ে বহির্গত হয়। কেহ চাঁদা দিতে অপারক বা অস্বীকৃত হইলে পাণ্ডাদের হস্তে তাহাদের আর নিস্তার থাকে না। গাল মন্দ প্রহার, এমনকি ডাকাইতি করিয়া সময়ে সময়ে বারয়ারীর পয়সা আদায় হয়। বার্ষিক বারয়ারীর সময় হইলে লোকের মনে আমোদ দূরে গিয়া ভয়ের সঞ্চার হয়।

বারয়ারী নির্ব্বোধ ও অপরিণামদর্শী ব্যক্তিদিগের উৎসন্ন যাইবার হেতু। পল্লীগ্রামে জোর জবরদস্ত করিয়াও আশানুরূপ চাঁদা উঠে না, প্রায়ই একটী যাত্রার খরচ যোগাইবার সংস্থান হওয়া কোন কোন স্থানে ভার হইয়া উঠে, কিন্তু বারয়ারীর আদায়ের অগ্রে খরচের ব্যবস্থা। টাকা সংগ্রহ না করিয়া বারয়ারীতে যাত্রার বায়না হয়। শেষে সেই টাকার অধিকাংশ সংগ্রহ করিতে না পারিয়া যাত্রাওয়ালা বিদায়ের সময় পাণ্ডাদের মোড়লকে ঘরের টাকা বাহির করিয়া দিতে হয়। আমরা

কোন দরিদ্র মোড়লকে স্ত্রী ও পুত্রবধূর গহনা বন্ধক দিয়া যাত্রাওয়ালা বিদায় করিতে দেখিয়াছি।

বারয়ারী বালকগণের মাথা খাইবার সহজ উপায়। বারয়ারীর দুই চারি দিন পূর্ব্ব হইতে পল্লিগ্রামের বালকেরা পড়া শুনা স্কুল পাঠশালা ছাড়িয়া পাণ্ডাদের সঙ্গী হয়, তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে চাঁদা আদায়ের জন্য বাহির হয়। পাণ্ডাদের কুৎসিৎ বিদ্রূপ কদর্য্য গীত, পাষণ্ডের ন্যায় ব্যবহার এই চারি পাঁচদিন কি সপ্তাহ কালের মধ্যে তাহারা বেশ অনুকরণ করিতে শিখে। যমের বুদের ন্যায় বারয়ারীর সময়ে তাঁহাদের কেহ কোন কথা বলিতে সাহস পায় না। সুতরাং অনুকরণ স্বভাব বালকের কোমল মনে একটা কালির দাগ পড়ে। সহস্র চেষ্টায় প্রায় তাহার অপনোদন হইতে দেখা যায় না। বারয়ারীর উদ্যোগের পর, উৎসবের দিন এই সকল পাণ্ডাদের মাদক সেবন, দাঙ্গা হাঙ্গামা, গালাগালি বীভৎস কৌতুক এ সকলও বালকদিগের বেশ অনুকরণের সামগ্রী, বারয়ারীতে বালকেরা হলাহল পান করে আর তাহাদের চরিত্রের মাথা খায়।

এই সকল কথাই আমরা পল্লিগ্রামের বারয়ারী সম্বন্ধে বলিলাম। সহরের বারয়ারীতে লোকের উপর উৎপীড়ন হয় না বটে কিন্তু সেখানেও পাপের স্রোত বন্ধ নাই। মদ ও বেশ্যার কাণ্ডটা সহরেই কিছু বাড়াবাড়ি। যে আমোদের সঙ্গে মদ ও গণিকার সংস্রব রহিল তাহাকে আমরা আমোদের মধ্যে গণ্য করি না। এই বারয়ারী ছাড়া বাঙ্গালী হিন্দুর আমোদের বায়স্য অনেক আছে। যার ঘরে বারমাসে তের পার্ব্বণ তাহার আবার আমোদের অভাব কি? যদি জাতীয় আমোদ ও একতার আমোদের কথা বলেন হিন্দুর দশবিধ সংস্কার কার্য্যে তাহার যতটুকু উপভোগ হয় বারয়ারীতে কখনই ততটুকু হয় না। জন্ম, আদ্যশ্রাদ্ধ, বিবাহ এই তিনটি সংস্কারে হিন্দুর আত্মীয় স্বজন জ্ঞাতি বান্ধব স্বদেশী বিদেশী নানা বর্ণের নানা শ্রেণীর লোক গৃহস্থের গৃহে সমবেত হয়, জন্ম ও বিবাহাদি আনন্দের কার্য্য, কখনও কখনও বৃদ্ধগণের শ্রাদ্ধ কার্য্যে নাচ তামাসা আমোদ আহ্লাদের অভাব হয় না। বিশেষতঃ একত্রে বসিয়া ভোজন, আলাপ, পরিচয় তর্ক-বিতর্ক ইত্যাদি দ্বারা জাতীয়তার যত বৃদ্ধি পায় বারয়ারীতে কখনও ততদূর হইতে পারে না। এত বিশুদ্ধ জাতীয় আমোদ ও জাতীয় একতার সময় ও উপকরণ থাকিতে দূষিত বারয়ারী আমোদের প্রশ্রয় দিবার আমরা কোনও আবশ্যকতা দেখি না।

বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের মৃত্যু। ১০ শ্রাবণ ১২৭৭

আমরা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম, কালীপ্রসন্ন সিংহ ৯ই শ্রাবণ দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইনি এক প্রসিদ্ধ ধনিবংশজাত বলিয়াই যে প্রসিদ্ধলাভ করিয়াছিলেন এরূপ নয়, মহাভারতের অনুবাদ ও হুতোম পেঁচার প্রণয়দ্বারা ইঁহার নাম প্রায় কাহারও অবিদিত নাই। ইঁহার সামান্য জনদুর্লভ কতকগুলি সদ্‌গুণ ছিল বটে, কিন্তু কতকগুলি অপগুণ ইঁহাকে আশ্রয় করাতে·· সেই সদ্‌গুণের প্রভা তত প্রকাশ পায় নাই। নিজ বিষয়-বিভবের তত্বাবধান রক্ষণ চেষ্টায় ইঁহার অতিশয় ঔদাসীন্য ছিল। এই দোষে শেষে ইনি ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়েন। ইঁহাব সম্পত্তি নাশ ও তন্নিবন্ধন অবমাননা ও মনের অসুখই ইঁহার অকাল মৃত্যুর কারণ।

আমরা এই প্রস্তাবটি লিখিতেছিলাম এমত সময়ে আমাদিগের এক আত্মীয়ের লিখিত এতৎ সংক্রান্ত এক প্রস্তাব আমাদিগের হস্তগত হইল। অতএব আমরা লেখনীর ব্যায়াম ক্রীড়া হইতে বিরত হইয়া ইহার সহিত ঐ প্রস্তাবটির সংযোগ করিয়া দিলাম।

'৯ শ্রাবণ রবিবার অপরাহ্ন তিন ঘটিকার সময়ে বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এই সংবাদে ভারতবর্ষীয় মাত্রেই শোকার্ত হইবেন সন্দেহ নাই। কালীপ্রসন্ন সিংহ জোড়াসাঁকোর সিংহ বংশীয়। অতি অল্প বয়সে তিনি পিতৃহীন হন। মৃত জজ বাবু হরচন্দ্র ঘোষ তাঁহার সম্পত্তির রক্ষক হইয়াছিলেন। তন্নিবন্ধন তিনি পিতৃবিয়োগের কষ্ট বড জানিতে পারেন নাই। হরচন্দ্র বাবুর যত্নে তাঁহার সম্পত্তির অনেক বৃদ্ধি হইয়াছিল। কালীপ্রসন্নেব বাল্যকালাবধি অতিশয় চতুরতা ছিল। পরিহাস অতিশয় ভাল বাসিতেন। যেখানে মারামারি ও তামাসা সেইখানেই তিনি অগ্রে উপস্থিত হইতেন। তাঁহার একজন শিক্ষক বলেন, এক দিবস তিনি অন্য অন্য ছাত্রের সহিত বহির্দৃশ্যমান প্রগাঢ অভিনিবেশ সহকারে শিক্ষকের উপদেশ শ্রবণ করিতেছেন, এমত সময়ে হঠাৎ পার্শ্বস্থিত এক বালকের মস্তকে চপেটাঘাত করিলেন। শিক্ষকের নিকটে অভিযোগ হইলে কালীপ্রসন্ন কাল্পনিক গম্ভীর ভাবে বলিলেন "মহাশয়। আমি জাতিতে সিংহ, জাতীয় স্বভাব ত্যাগ করিতে না পারিয়া এক থাবা মারিয়াছি!" এই চঞ্চলতা নিবন্ধন তিনি বিদ্যালয়ে বড় উন্নতি করিতে পারেন নাই। কিন্তু বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া এ অভাব পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সংস্কৃতের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। এই অনুরাগ বশতঃ মহাভারতের অনুবাদে প্রবৃত্তি জন্মে। অনুবাদ করিয়া বিনামূল্যে বিতরণ করেন। ইহাতে একলক্ষ টাকা ব্যয় হয়। পণ্ডিতেরা অনুবাদ করেন

বটে, কিন্তু এ নিমিত্ত তাঁহার অল্প পরিশ্রম হয় নাই। তাঁহার হুতোম পেঁচা ও "মহাভারত" তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। তিনি মৃত্যুর অল্পদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সাহিত্যের আলোচনা পরিত্যাগ করেন নাই। এ নিমিত্ত তাঁহার বিস্তর অর্থব্যয় হইয়াছিল। কোন গ্রন্থকার ও বিদ্বানব্যক্তি তাঁহার নিকটে সাহায্যপ্রার্থী হইয়া পরাঙ্মুখ হইয়া আইসেন নাই। সাধারণের কল্যাণকর কার্য্যে তাঁহার বিলক্ষণ যত্ন ছিল। তিনি দয়ার সাগর ও বদান্যতার আকর ছিলেন। এই নিমিত্ত জমিদার হইয়াও প্রজার পক্ষ অবলম্বন করেন। লঙ সাহেবের কারাবাসকালে তিনি অর্থদণ্ডের সহস্র টাকা প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি নিজ ব্যয়ে নীলদর্পণ পুনর্মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করেন। বিধবাবিবাহ ও অন্য অন্য সামাজিক উৎকর্ষ সাধন প্রস্তাবে তাঁহার ন্যায় অল্পলোকে সাহায্য দান করেন। তিনি কপটতা ও আড়ম্বরের অতিশয় বিপক্ষ ছিলেন, বৃথা গোলযোগ দেখিলে অমনি চটিয়া উঠিতেন। তাঁহার সকল সংস্কার বিশুদ্ধ ছিল, এই নিমিত্ত তিনি "উন্নতিশীল" ব্রাহ্মদলের উপধর্ম্ম ঘটিত আড়ম্বরের প্রতি প্রকাশ্যরূপে ঘৃণা প্রদর্শন করিতেন। মাতৃভক্তি, দয়া, দানশীলতা সম্বন্ধে কালীপ্রসন্ন সিংহ আদর্শ স্বরূপ ছিলেন। তাঁহার বুদ্ধি অতিশয় তীক্ষ্ণ ছিল। মানুষ দেখিবা মাত্র চিনিতে পারিতেন। তাঁহার পরিচ্ছদ প্রভৃতিতে আড়ম্বরের লেশমাত্র ছিল না। তাঁহার কিছু দোষ ছিল বটে, কিন্তু তাঁহার গুণে পৃথিবী লাভবান হইয়াছেন, দোষে তাঁহারই ক্ষতি হইয়াছে। তিনি যথার্থই মানুষের বন্ধু ছিলেন। এমত লোকের ৩৩ বৎসর বয়সে মৃত্যু অতিশয় শোকের বিষয় সন্দেহ নাই। অধিকতর শোকের বিষয় এই, তাঁহার অল্পবয়স্কা স্ত্রী (প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি সম্প্রতি দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়াছিলেন) ও বৃদ্ধমাতা জীবিত আছেন। এই বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের আর একটী কন্যাও নাই যে তাহাকে দর্শন করিয়া কতক সন্তোষ লাভ করেন।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত। ২৪ আষাঢ় ১২৮০। ৩৪ সংখ্যা

সম্পাদকীয়

আমরা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম, মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৬ই আষাঢ় দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। ইনি একজন সুকবি ছিলেন। ইঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা দেশ ক্ষতিগ্রস্থ হইলেন। তিনি জীবিত থাকিলে আমরা মেঘনাদবধ কাব্যের অনেক সহোদর দেখিতে পাইতাম। তিনি একটী নূতন ছন্দের সৃষ্টিকর্ত্তা ছন্দটী সুললিত ও সুহৃদয় জনের হৃদয়গ্রাহী হয় নাই বটে; কিন্তু বাগ্‌দেবী তাঁহাকে কবিত্ব শক্তি দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। উহা নব্য দলে এক প্রকার লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে। ছন্দ যেরূপ হউক, তিনি যে অসামান্য কবিত্ব শক্তিসম্পন্ন ছিলেন, সে বিষয়ে সংশয় নাই। আমরা তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া খেদ করিতেছি, কিন্তু তাঁহার কৃত কাব্যগুলি তাঁহাকে অমর করিয়া তুলিয়াছে।

মানুষ যে গুণে সুখী ও ঐশ্বর্য্যশালী হয়, তাঁহার সে গুণ ছিল না। অমিতব্যয়িতা দোষে তিনি কেবল যে দরিদ্র নাম ক্রয় করিয়া গিয়াছেন এরূপ নয়, সময়ে সময়ে বিলক্ষণ সঙ্কটে পড়িয়াছিলেন। তিনি যখন ইংলণ্ডে ব্যারিষ্টর হইতে যান, মহামহিমশালী দয়াসাগর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হস্তাবলম্বদান না করিলে তাঁহাকে নিজ দোষের তীব্রতর ফলভোগ করিতে হইত সন্দেহ নাই।

মধুসূদনের আচার সংযত ও ব্যয় পরিমিত ছিল না বটে, কিন্তু তাহার সরলতা পরোপকারিতা ও অমায়িকতাদি অনেকগুলি সদগুণ ছিল।

আমাদিগের অধিকতর দুঃখ এই, তিনি মৃত্যুকালে পীড়ার অসহ্য যন্ত্রণার ন্যায় শোক ব্রজের একটী দারুণ আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রিয় গৃহিণী তাঁহার মৃত্যুর তিন দিবস পুর্ব্বে কালধর্ম্ম প্রাপ্ত হন।

তাঁহার দুটী পুত্র ও একটী কন্যা আছে। এক পুত্রেব বয়স এগার ও আর একটীর বয়স সাত বৎসর। হিন্দু পেট্রিয়ট বঙ্গবাসিদিগের নিকটে উহাদিগের সাহায্য দানের যে প্রস্তাব করিয়াছেন, আমরা সানন্দচিত্তে তাহাব অনুমোদন করিতেছি। তিনি বঙ্গদেশের যে উপকার করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাহার অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রদ্বয়ের সাহায্যদান রূপ পুরস্কার অধিক নয়।

মধুসুদন স্মরণে। ২৪ আষাঢ় ১২৮০। ৩৪ সংখ্যা

গৃহস্থ ভবন লুঠি দস্যু পরিকর
সর্ব্বস্ব যদ্যপি লয় কি দুঃখ তাহার?
কিম্বা সেনাদলে লয়ে, সমর সজ্জিত হয়ে
অন্য ভূপ আর ভূপ রাজ্যে যদি যায়,
ছারখাব করে সব করিয়ে সমব।

তাহাতে অন্তর কিছু বেদনা না পায়,
যে হৃদয়ভেদী কষ্ট পাইল রে আজ,
পোড়া কাল কালামুখ, ঘুচায়ে বঙ্গের সুখ
কাড়ি নিল মহারত্ন কাঁদায়ে সমাজ।
আকুল বাঙ্গালাবাসি করে হায় হায়!

তস্কর মাণিক যথা হেরি রাজালয়ে,
পাপ দণ্ড ভয় ভুলি চুরি করি লয়
জীবন তস্কর সম, অবিচারি নিরমম,

হরিল রতন রাশি এ বঙ্গ আলয়ে
মারিয়ে শোকের শেল বঙ্গের হৃদয়ে।

চৌদিক আঁধার আজি নিরখি নয়নে,
নিশাপতি বিনে হেরি নিশারে যেমন,
নিশায় জলন্ত বাতি নিভিলে না রহে ভাতি
যেরূপ গৃহের মাঝে, হায়রে তেমন.
অন্ধকারময় হেরি এ বঙ্গ ভবনে!

হে কবিশ! ছাড়ি তব প্রিয় জন্মভূমি
বাঙ্গালারে, গেলে চলি তরে চিরন্তন,
কিহেতু কি দোষ পেলে বঙ্গবাসিগণে ফেলে
কোথা গেলে আর কি হে পাব দরশন?
আর কি সুধার ধারে ঝঙ্কারিবে তুমি?

কবিতা কাননে তুমি করি গুঞ্জরণ
ভুঞিতে প্রপ্রঞ্চ সুখ, সুখী হতো সবে
তোমারে নিরখি, আহা আর কি লভিবে তাহা
বঙ্গবাসী? হায় আর সেদিন কি হবে?
সেপথে দিয়েছে কাঁটা বিকট শমন।
রত্নগর্ভা পুণ্যময়ী ভারত জননী
হায় আজি কুভাগ্যের কুলিশখন বলে
তোমা হেন প্রিয় পুত্রে হারাইয়ে কর্ম্মসূত্রে
মৌ• বতী হয়ে ভাসে নয়নের জলে,
ফণিণী বিলাপে যেন হারাইয়ে মণি।

মধু মাসে মধু ঘোষ মধুর স্বপনে
মধু ধারা ঢালে যথা শ্রবণে সবার,
হইয়ে বঙ্গের বঁধু হে মধু কবিতা মধু
ঢালিলে তেমতি এই বঙ্গের মাঝার!
আর কি তা আমাদের পশিবে শ্রবণে?

আর কি তোমার মত হে মধুসূদন!
বঙ্গ কবিকুল বন্ধু এ বঙ্গ পাইবে?

আর কি বীণার নাদ ঘুচাইবে অবসাদ ?
আর কি লেখনী তব অজস্র গাইবে ?
সে আশে হতাশ হায় করিল শমন !

এ বঙ্গ ভূমিতে চারু কবিতা কাননে,
কোকিল আছিলে তুমি কাব্য কুহু রবে
কতই আনন্দ দিলে গৌড জনে ভুলাইলে,
আবার সে দিন কবি আর কি গো হবে ?
এ চৌদিক পুর্ণ বঙ্গের রোদনে।

রে কাল। অকালে তুই কি কাজ করিলি
কি হেতু হরিলি হায, শ্রীমধুসূদনে ?
ধিক চোর, ধিক তোরে উদরে কেমন কোরে
ভরিলি নিদয এঁরে চিবাযে বদনে।
কেমনে কবির দেহ ও করে ধরিলি।

যদিও কবিরে তুই হরিলি শমন।
তথাপি কবির কীর্ত্তি যে কীর্ত্তির বলে,
খ্যাত উনি এ ভারতে না পারিবি কোনমতে
হরিতে নিষ্মম তুই ছলে বলে কলে।
কীর্ত্তিই ধরণী মাঝে অক্ষয জীবন ;

পাথুরিয়া ঘাটা) নিতান্ত অনুগত
২৯শে আষাঢ ১২৮০) শ্রীরাজ

মধুসূদন-পরিবারের সাহায্য ভাণ্ডার। ১৪ই শ্রাবণ ১২৭০। ৩৭ সংখ্যা।

সাধারণের প্রতি সোমপ্রকাশের অনুরোধ

আমরা আহ্লাদিত হইয়া পাঠকগণের গোচর করিতেছি, মৃত কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের পুত্রগণের ভরণপোষণ ও বিদ্যাশিক্ষার্থ একটী মূলধন সংস্থানের চেষ্টা হইতেছে। রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও দিগম্বর মিত্র প্রভৃতি কয়েক জন সম্রান্ত ব্যক্তি এক সভা করিয়া এ নিমিত্ত চাদা সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত সভার অন্যতর সভ্য এবং সেক্রেটারি। মাইকেল মধুসূদন দত্ত বঙ্গদেশ ও বঙ্গভাষার অনেক উপকার করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গবাসী মাত্রেই তাঁহারা নিকটে ঋণী আছেন। তাঁহার

অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্রদ্বয়ের বিদ্যাশিক্ষা ও ভরণপোষণার্থ সাধারণের সাহায্যদান একান্ত কর্ত্তব্য। মৃত কবির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এই এক সময় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব সর্ব্বসাধারণে এ বিষয়ে যথাসাধ্য সাহায্যদান করে এই আমাদিগের অনুরোধ।

রায় দীনবন্ধু মিত্র। ২৬ কার্ত্তিক ১২৮০। ৫০ সংখ্যা

নীল দর্পণের গ্রন্থকার আর এ জগতে নাই। এই বিষাদের সংবাদে অনেক বঙ্গবাসী ও বঙ্গবাসিনীর চক্ষে জল পড়িয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা দীনবন্ধু বাবুর রচনা-শক্তি ও কবিত্ব সম্বন্ধে অনেকবার অনেক কথা বলিয়াছি। এমন কি সে দিনও তাঁহার "কমলে কামিনীর" দোষ প্রদর্শন করিয়াছি, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গদেশের একটী অহঙ্কারের ধন নষ্ট হইল এ কথা কে অস্বীকার করিবে, তাঁহার কি মরিবার সময় হইয়াছিল। এই অসময়ে স্বীয় সহধর্ম্মিনীকে চির দুঃখিনী ও শিশু সন্তানদিগকে পিতৃহীন করিয়া তিনি পরলোকে প্রস্থান করিলেন। জীবদ্দশায় তাঁহার চরিত্রের বিরুদ্ধে কিছু বলিবার ছিল না, তাহা আমরা বলিতেছি না, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে যে অনেক সাধুতা ও সদ্ভাব নিহিত ছিল তাহা তাঁহার গ্রন্থেই সুপ্রকাশ। তিনি নিন্দনীয় কোন কার্য্য যদি কখন করিয়া থাকেন, তাহা বন্ধুতার অনুরোধে। এমন বন্ধুপ্রিয় লোক অতি অল্প দেখা যায়। দুই দিন যাহার সহিত আলাপ হইত তিনি তাহাকেই ভালবাসিয়া ফেলিতেন এবং উত্তরোত্তর সেই ভালবাসা বর্দ্ধিত হইত। কোন সহযোগী বলিয়াছেন তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রশংসা এই যে তিনি কাহাকেও শত্রু রাখিয়া যান নাই।

তিনি যে বিভাগে কর্ম্ম করিতেন তাহাতেও ক্লেশ স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। দেশের সকল স্থানে যাইতে হইত, সকল প্রকার লোকের সহিত মিশিতে হইত। তাঁহার প্রত্যেক নাটকে এই কথায় প্রমাণ পাওয়া যায়। গবর্ণমেণ্টও তাঁহার দক্ষতা স্বীকার বিষয়ে উদাসীন ছিলেন না। তিনি রায় বাহাদুর উপাধি উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহার উপর অতি কঠিন কঠিন কার্য্যের ভার দিতেন। গত লুসাই যুদ্ধের সময় তাঁহারই উপর ডাকের পথ নির্ণয় করিবার ভার হইয়াছিল। তিনি যে প্রকারে কার্য্য করিতেন তাহাতে তাঁহার উত্তরোত্তর পদবৃদ্ধি হওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু সে জন্য একজন ইংরাজ প্রার্থী হইলে এদেশীয়দিগের পাইবার আশা থাকে না, সেই জন্যই তিনি উন্নত হইতে পারেন নাই। তিনি এত কাজের ব্যস্ততার মধ্যেও যে পুস্তক রচনা করিবার সময় পাইয়াছিলেন, ইহাও অল্প প্রশংসার বিষয় নহে। যাহা হউক, তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গদেশের আর একটী দুর্ভাগ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি হইল।

দীনবন্ধু স্মরণে। ১০ অগ্রহায়ণ ১২৮০। ২ সংখ্যা

কাব্যকুঞ্জ-বন-মধু পায়ী সে ভ্রমরা,
গেছে সে মধুসূদন কাঁদাইয়া ধরা,
সেই শোকে চিরদুঃখী বঙ্গবাসীগণ,
মহুত্তাপে এ পর্য্যন্ত দহিছে জীবন।
হায়রে ! মরার প্রতি খড়্গের আঘাত,
হায় ! কি হলরে দেখ পুনঃ অকস্মাৎ
নাটক বনবিহারী দীনবন্ধু রায়,
সর্ব্বত্যাগী হয়ে পুনঃ কাঁদাল ধরায়।
কে আর রচিবে নীল দর্পণ সুন্দর,
লীলাবতী, তপস্বিনী অতি মনোহর,
কেবা সন্তোষিবে লিখে নব প্রহসন,
নানা রঙ্গ কে সাধিবে বঙ্গে অনুক্ষণ।
কোন্ জন সমতলে সহায়তা করে,
দুঃখী ভদ্রে দিবে কর্ম্ম সদা ডাকঘরে,
নামানুসারেতে কার্য্য বল কার হয়,
হায় দীনবন্ধু কোথা দুঃখীর সহায় !
আত্ম গর্ব্বী মহাপাপী দুরন্ত শমন !
বঙ্গসহ বাদ তোর কেন রে এমন ?
দিয়াছে কি বঙ্গ তব পাকা ধানে মই ?
বিদরিছে বক্ষঃ হায় দুঃখ কারে কই।
শুন রে পামর তুই শমন কুমতি,
আছে কি শকতি তোর, হরিতে দুর্ম্মতি
তার চিরস্মরণীয় গুণের মহিমা ?
হরে নিস যারে তোর দেখাতে গরিমা ?
কত সে বাদ সাধিয়া বঙ্গ প্রাণাধিক,
অকালে করিলি গ্রাস, বলি কিমধিক।
হলি কি সক্ষম তার নাশিতে গৌরব ?
লয়েছিস ফুল ছিঁড়ি, বঞ্চিত সৌরভ।
কি ফল হল রে তোর তাহে মূঢ় মতি।
অপমান পদে পদে হরিলে দুর্ম্মতি।

তবু শিক্ষা না হইল হায় রে যেমন
শত দণ্ডে মহাপাপী নহে সংশোধন।

শ্রীপার্ব্বতীনাথ চট্টোপাধ্যায়।
গোস্বামী দুর্গাপুর।

সুরেন্দ্রনাথ স্মরণে। ৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৮০

কি শুনি রে আজ হৃদি ফেলে যায়।
এ দুঃখের কথা বলিব রে কায়॥
ভারতের মাঝে সুরেন্দ্র সমান।
সুরেন্দ্রের আজ কারাগারে স্থান॥
মুখেতে বাণী যে সরে না আর।
আমি নিজ মুখে ভারতের তরে।
ধরম কৃপণ লয়ে নিজ করে।
অন্যায়ের সহ করিতে সমর॥
যে জন ভারতের নত নিরন্তর।
আজি রে আঘাত হৃদয়ে তাঁর
কাঁদ বঙ্গবাসী কাঁদ রে বেহারী।
ফেল রে মাদ্রাজী নয়নের বারি॥
কোথায় বোম্বাই পশ্চিম অঞ্চল।
ফেল রে সকলে নয়নের জল॥
দেখা রে তোদের হৃদয় খুলি।
কি বিষাদ শরে বিঁধেছে অন্তর।
সুরেন্দ্রের হেন শুনি হতাদর॥
জষ্টিস নরিস ভাবি হত মান।
কারাগারে রাখি মোদের পরাণ॥
কি দুঃখ অনল দিয়াছে জ্বালি?
আর একবার ন্যায়ের কারণ।
শ্রীনন্দকুমার দিয়াছে জীবন॥
সুরেন্দ্রের দশা দেখিয়া নয়নে॥
সেই সব কথা পড়ে গেল মনে।
জ্বলিল দ্বিগুণ হৃদয় জ্বালা।

সাহস উৎসাহ ত্যজিল অন্তর।
ধৈর্য্য-গুণ আজ হলো-রে অন্তর ॥
সুরেন্দ্রের তরে কাঁদে রে যুবক।
জরাজীর্ণ কাঁদে কাঁদে রে বালক ॥
কাঁদে রে ভারত অবলা বালা ?
প্রাণের সুরেন্ হৃদয়ের নিধি।
সুকঠিন বড় শ্বেতাঙ্গের বিধি ॥
তাইতে তোমার এই দশা আজ।
তাই তব শিরে পড়িযাছে বাজ।
তাই কারাগারে তোমাব বাস।
হত যদি তব শ্বেতকলেবর।
কিংবা তোষামোদে পুরিত অন্তর ॥
তাহলে এ দশা হত না তোমার।
দেখিতে হত না কভু কারাগার।
পুরিত না তব অরির আশ ॥
যেই অপরাধে এ দশা তোমার ॥
সেই দোষে দোষী ছিল ত টৈলব ॥
ইংলিসম্যানের সম্পাদক হয়ে
সেই দোষে দোষী ছিল এক দাযে ॥
কিন্তু কই তবে তাদের তরে ॥
এমন বিধান হয় নি তখন।
নহে কি এসব শ্বেতাঙ্গ কারণ ?
ভাবিলে সে সব চেতনা থাকে না।
হেন কষ্ট আর জীবনে সহে না ॥
অবিরল জল নয়নে ঝরে ॥
ভারতের শশি! কাল মেঘে হায়।
দুই মাস তরে ঢেকেছে তোমায় ॥
হয়েছে আঁধার ভারত গগন।
হেন সুবাতাস হবে কি এখন ॥
এ মেঘ যাহাতে উড়িয়া যায়।
কার কাছে যাব কি বলে কাঁদিব।
এ দুঃখের কথা কারে বা করিব ॥

সকলেই এবে তোমার লাগিয়া।
মড়ার মতন রয়েছে পড়িয়া।
তেজোহীন আজ সবার কায়॥
ধিকি ধিকি জ্বলি মনের আগুন।
ক্রমেই সবার হতেছে দ্বিগুণ॥
ক্রমেই নিস্তেজ ভারত হৃদয়।
হেন বন্ধু কেবা আছে এ সময়
শান্তি বারি দেয় ভারত মুখে॥
সবার (ই) পরাণ হয়েছে আকুল
বিপদ সাগরে নাহি দেখি কুল।
ভারত হৃদয় সহজে দুর্ব্বল
ভারতের অস্ত্র নয়নের জল
তাই বলি আজ মনের দুঃখে
কাঁদ বঙ্গবাসী কাঁদ রে বিহারী
ফেল রে মান্দ্রাজী নয়নের বারি।
কোথায় বোম্বাই পশ্চিম অঞ্চল
ফেল রে সকলে নয়নের জল
দেখা রে তোদের হৃদয় খুলি –
কি বিষাদ শরে বিঁধেছে অন্তর
সুরেন্দ্রের হেন শুনি হতাদর।
জষ্টিস নরিস ভাবি হতমান
কারাগারে রাখি মোদের পরাণ
কি দুঃখ অনল দিয়াছে জ্বালি।

শ্রীদ্বারকানাথ ধর।

৮ কেশবচন্দ্র। ১ মাঘ ১২৯০

২৪ শে পৌষ সোমবার কি অশুভক্ষণেই বঙ্গভূমিতে সূর্য্য উদয় হইয়াছিল।… করাল কাল ঐ দিবস বেলা ৯টা ৫৩ মিনিটের সময়ে বঙ্গের একটী উজ্জ্বল রত্ন হরণ করিয়া লইয়াছে। বাবু কেশবচন্দ্র সেন দেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন। পাঠক! এই নিষ্ঠুর সংবাদ শুনিয়া আপনারা কি আমাদিগের ন্যায় শোকাহত হইবেন না? আর কি আপনারা সেই মধুর বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া শ্রবণদ্বয়কে পরিতৃপ্ত করিতে পারিবেন?

আর কি সেই ধর্মোন্মাদ দর্শন করিয়া আনন্দ অনুভব করিতে পারিবেন? আর কি তাঁহার সেই স্বদেশহিতৈষিতা-বিজৃম্ভিত হিতকর প্রস্তাব সকল শ্রবণ করিয়া সুখিত হইতে পারিবেন? সমুদায় শেষ হইয়া গেল! সমুদায় ফুরাইয়া গেল! কেশব বাবু যথার্থ স্বদেশহিতৈষী লোক ছিলেন। আমরা তাঁহাকে স্বদেশ হিতকর যাবতীয় অনুষ্ঠানে দেখিতে পাইতাম। বঙ্গদেশের অবনত অবস্থা দেখিয়া তিনি সতত সন্তপ্ত হইতেন। যাহাতে ইহার উন্নতি হয় তদ্বিষয়ে তাঁহার সম্পূর্ণ ইচ্ছা যত্ন ও চেষ্টা ছিল। তিনি কায়মনোবাক্যে সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টায় ত্রুটি করিতেন না। তাঁহার ধর্ম্মসংস্কার প্রবৃত্তিই তাহার স্বদেশহিতৈষিতার প্রধান প্রমাণ। যাঁহাদিগের দয়া ও স্বদেশহিতৈষিতা প্রবল, তাঁহারাই ধর্ম্মসংস্কারে প্রবৃত্ত হন। সমাজস্থ লোকের ভ্রম নিবন্ধন কষ্ট দেখিয়া তাঁহাদের অন্তঃকরণ একান্ত অসুখিত হয়। সুতরাং তাঁহারা সেই ক্লেশ পরিহারের উপায় বিধানের অনুসন্ধানে উন্মত্তপ্রায় হইয়া ওঠেন। তখন তাঁহাদিগের নিজের কষ্ট স্বার্থহানির শঙ্কা থাকে না। সমাজস্থ সহচরদিগেব কষ্ট দূর করাই তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া ওঠে। এই কারণেই বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাব হয়, এই কারণেই খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, এই কারণেই মহম্মদ পুরাতন ধর্ম্মেব উচ্ছেদ করিয়া নূতন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করেন। সমাজ-মধ্যে হিংসা প্রবল দেখিয়া বুদ্ধেব দয়া উদ্বেল হইয়া উঠিল, তিনি ধর্ম্মের সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ স্বদেশহিতৈষিতাই বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ ও চৈতন্যের ধর্ম্মসংস্কাব প্রবৃত্তির ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মহামান্য ব্যক্তিদিগের সমাজ সংস্কার প্রবৃত্তিব মূল। হৃদয়ে অসামান্য দয়া ও স্বদেশহিতৈষিতার প্রাদুর্ভাব ব্যতিরেকে কখন ধর্ম্মসংস্কারে বা সমাজ-সংস্কারে প্রবৃত্তি জন্মে না। কেশব বাবু যে একজন অকপট স্বদেশহিতৈষী ছিলেন, সে বিষয়ে সংশয় নাই। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গদেশ যে ক্ষতিগ্রস্থ হইলেন, সে বিষয়েও সন্দেহ নাই। এ ক্ষতি অপ্রতি-বিধেয়। প্রকৃতিই কেশব বাবুব হৃদয়ে ধর্ম্ম সংস্কাব প্রবৃত্তির বীজ বপন করিয়া দিয়াছিল। বাল্যকালেই উহা পরিস্ফুট হইয়া পড়ে। আমবা শুনিলাম যখন তাঁহার ১২।১৪ বৎসর বয়স সেই সময় অবধি তাঁহার মনে ধর্ম্মসংস্কাবের ইচ্ছা প্রকাশিত হয়। তিনি সকলকেই ধর্ম্মসংস্কারার্থ উত্তেজিত করিবার নিমিত্ত কাগজে লিখিয়া বাড়ীর গায়ে গায়ে সেই কাগজ বসাইয়া দিতেন। রাত্রিকালে তিনি এই কাজ করিয়া বেড়াইতেন। কেশব বাবুর অনেকগুলি অসামান্য গুণ ছিল। তাঁহার গুণে অনেকেই মুগ্ধ হইতেন। তাঁহার সেই গুণগরিমায় সচরাচর সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া দলপুষ্টি হয়। কেবল দলপুষ্টি নয়, সেই সেই গুণের বলে তিনি কি বড কি ছোট সকলের নিকটে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও সমাদৃত হন। আমরা একটি জীবন্ত ঘটনার কথা বলি। পাঠক শুনিয়া বিস্মিত হইবেন। শিবনাথ শাস্ত্রী এক্ষণে একজন বিখ্যাত লোক হইয়া উঠিয়াছেন। কৃতবিদ্য দলের মধ্যে ইঁহাকে না চেনেন, এরূপ লোক অতি বিরল। সেই শিবনাথ শাস্ত্রী কেশব বাবুর গুণে মুগ্ধ হইয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্মে প্রথমে দীক্ষিত হন। আমরা কেশব বাবুর স্বদেশহিতৈষিতার ও সাহসিকতার একটী

বিশেষ প্রমাণের উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হইয়াছি। তিনি যখন বিলাতে যান তখন এইভাবে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, যে সকল ইংরাজ রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া ভারতে গমন করেন, তাঁহারা সেখানে অনেক প্রকার অন্যায়, যথেচ্ছাচারিতা ও অত্যাচারিতার কার্য্য করিয়া থাকেন। ইংরাজদেশে বসিয়া ইংরাজদের দোষের কথা বলা প্রবল স্বদেশ-হিতৈষিতা ও সাহসিকতা না থাকিলে কখন সম্ভাবিতে পারে না। আমরা কেশব বাবুর বক্তৃতাশক্তি ও লেখাপড়া বিষয়ের পাঠকের নিকটে কি অধিক পরিচয় দিব। এই এই বিষয়ে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সমকক্ষতা করিতে পারেন, এরূপ লোক অতি বিরল। অতি দুশ্চিকিৎস্য বহুমূত্র রোগে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি অনেক দিন অবধি এই রোগ ভোগ করিতেছিলেন। সকল কষ্টের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া পরম শান্তি নিকেতনে গমন করিলেন। বয়স ৪৫ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। কলিকাতায় তাঁহার কৃত প্রিয় পদ্মকুটীরে তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। তাঁহার পীড়ার বৃদ্ধির সময়ে তাঁহার জামাতা কুচবিহারের মহারাজ, ডাক্তার ডাল সাহেব এবং তাঁহার স্বধর্ম্মাবলম্বিগণ নিয়ত উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার কষ্ট পরিহার করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তাঁহার দাহের সময়ে অসংখ্য লোক সমবেত হন। সকলেই তাঁহার নিমিত্ত দুঃখিত-চিত্তে অশ্রুমোচন করেন। উপসংহারে আমাদিগের একটি প্রস্তাব করিবার ইচ্ছা হইল। কেশব বাবু যেমন একটী মস্ত লোক ছিলেন, তাঁহার অনুরূপ তাঁহার চিরস্মরণার্থ কীর্ত্তি রাখা আবশ্যক। একটি চিত্র বা একটী প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি আমাদিগের চিত্তের পরিতৃপ্তি সাধনে সমর্থ হইবে না। কেশব বাবুর সমধর্ম্মা তাঁহার শিষ্য অনুচর ও সহচর অনেক লোক অনেক স্থানে আছেন। তাঁহারা কেশব বাবুর স্মরণার্থ স্থানে স্থানে এক একটী শিল্পবিদ্যালয় খুলুন। তাহাতে দুটী মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইবে এক, তাঁহার নাম চিরস্থায়ী হইবে। দ্বিতীয়, দেশের মহোপকার সাধিত হইবে। আমরা পল্লীগ্রামে ভদ্রকুলজাত এরূপ অনেক লোক দেখিতে পাই যে তাঁহাদিগের কোন জীবিকা নাই [illegible] নাই, জাত্যাভিমান হেতু মজুরী করিতেও পারেন না। তাহাদিগকে যদি শিল্প শিখান যায়, তাহাদিগেরও উন্নতি হইবে। আমাদিগকে শিল্পজাত দ্রব্যের নিমিত্ত পরমুখ নিরীক্ষণ করিয়াও থাকিতে হইবে না।

অনরেবল কৃষ্ণদাস পাল। ১৪ শ্রাবণ ১২৯১। ৩৭ সংখ্যা

হায়! পাঠক! কি দুর্বিপাকই উপস্থিত হইল। মন শোকান্ধতামসে আচ্ছন্ন হইতেছে, জিহ্বায় জড়তা জন্মিতেছে। বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছে না। আমরা যে কেবল নিজের পরম বন্ধু হারাইয়াছি তাহা নয়। একজন অদ্বিতীয় ভারতবন্ধুকে হারাইয়াছি। ১০ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার সময়ে সুমেরুর একটী চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। বঙ্গভূমির হৃদয়ে

নিদারুণ আঘাত লাগিয়াছে। সহৃদয় বাঙ্গালী মাত্রেরই হৃদয় কাঁপিয়া উঠিয়াছে। আমরা নিতান্ত দুঃখিত চিত্তে জানাইতেছি অনরেবল কৃষ্ণদাস পাল ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমরা আর ব্যবস্থাপক সভায় বা টাউন হলের সাধারণ সভায় তাঁহার অর্থপুর্ণ উজ্জ্বল বক্তৃতা শুনিতে পাইব না। আর হিন্দু পেট্রিয়টে তাঁহার তেজস্বিনী লেখনী প্রসূত সারগর্ভ প্রবন্ধও পড়িতে পাইব না। অনন্ত কালের মত তাঁহার সহিত আমাদিগের পরিচয় বিচ্ছিন্ন হইল ও সৌহৃদ্দসূত্র পুনঃগ্রথিত হইবার সম্ভাবনা নাই। ১০ই শ্রাবণ কি কালরাত্রি প্রভাত হইয়াছিল যে বঙ্গভূমি একটী অমূল্য রত্ন হারাইলেন। বঙ্গের সমস্ত সম্পত্তি প্রদান করিলেও ঐ রত্নটী আর আমরা ফিরিয়া পাইব না। কৃষ্ণদাস পাল বঙ্গের অদ্বিতীয় গৌরব ও অদ্বিতীয় অলঙ্কার স্বরূপ ছিলেন। তাঁহার বিরহে বঙ্গ শ্রীহীন হইল তিনি বঙ্গের মুখপাত্র ছিলেন। রাজদ্বারে যে কোন বিষয় জানাইবার প্রয়োজন হউক সকলে কৃষ্ণদাসের মুখ নিরীক্ষণ করিতেন। মালায় যেমন মধ্যমণি থাকে তিনি তেমনি রাজা ও প্রজা উভয়ের মধ্যস্থলে ছিলেন। রাজপুরুষদিগের তাহার উপরে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। তিনি প্রজার হিতার্থে যে কথা বলিতেন রাজপুরুষেরা অবহিতচিত্তে কাণ পাতিয়া শুনিতেন।

তাঁহার কতকগুলি অসামান্য গুণ ছিল। তিনি অতিশয় ধীর ও শান্তপ্রকৃতি ছিলেন। যিনি যেরূপ লোক তিনি তাহার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিতেন। তাঁহার রাজদ্বারে সম্মান, দেশের লোকের নিকটে যারপর নাই মান। তিনি সামান্য বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া এতদূর সম্মানিত হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার মন অহঙ্কারে স্ফীত হয় নাই। তিনি কখন গর্ব্বিত আচরণ বা গর্ব্বিত ব্যবহার করেন নাই। তিনি অনেকেরই বিপদকালে আশ্রয় হইয়াছিলেন। তিনি কখন দেশের মঙ্গলার্থ চেষ্টার ক্রটী করেন নাই। তাঁহার চেষ্টায় দেশের অনেক অনিষ্ট নিবারিত হইয়াছে ও অনেক ইষ্ট সাধিত হইয়াছে, তাহা হইতে অনেকের উন্নতিদ্বার মুক্ত হইয়াছে।

তিনি যে কেমন বুদ্ধিমান ও বিদ্বান ছিলেন হিন্দু পেট্রিয়ট ও তাহার বক্তৃতাগুলি তাহার পরিচয় দিয়া দিতেছে। তিনি পেট্রিয়টে দেশের হিতার্থ রাজদোষ কীর্ত্তন করিয়াছেন কিন্তু রাজা তাঁহার উপর কুপিত হন নাই বরং প্রসন্নই ছিলেন। হিন্দু পেট্রিয়ট মৃত হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ন্যায় তাঁহারও কীর্ত্তিস্বরূপ চিরস্থায়ী হইবে। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর হিন্দু পেট্রিয়ট যায় যায় হইয়াছিল। মহাত্মা শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যত্ন পাইয়া কৃষ্ণদাস পালের হস্তগত করিয়া দেন। তাঁহার হস্তে পতিত হওয়াতে কেবল যে উহার জীবন রক্ষা হয় তাহা নয় অসাধারণ উন্নতিও হইয়াছিল। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে ইহার যে ক্ষতি হইয়াছিল কৃষ্ণদাস পালের লেখনীগুণে সাধারণে তাহা অনুভব করিবেন। আমরা যে দ্বিতীয় কৃষ্ণদাস পালকে দেখিতে পাইব আমাদের সে আশা নহে।

কৃষ্ণদাস পাল যে অসাধারণ বুদ্ধিমান ছিলেন সে বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। বুদ্ধির

আধারও তদনুরূপ ছিল। তাঁহার মস্তক বৃহৎ ও ললাট অতিশয় প্রশস্ত ছিল। লোকে বলে "বড় কপালে" তিনি বাস্তবিক সেই বড় কপালেই ছিলেন। তাঁহার দেহ নাতিদীর্ঘ ও নাতিখর্ব্ব, বর্ণ কৃষ্ণ, শরীর বলিষ্ঠ ছিল। প্রস্রাবের পীড়াতেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। এদেশের জলবায়ুর দোষে সচরাচর এই ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা শারীরিক শ্রমহীন হইয়া অধিকতর চিন্তাশীল হন তাঁহারা প্রায় এক একটী দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকেন। বহুমূত্র রোগটী এই দলে প্রবল দেখিতে পাওয়া যায়।

কৃষ্ণদাস পাল এদেশের যে প্রকার উপকার সাধন করিয়াছেন দেশের লোকেরা তাঁহার স্মরণার্থ কি করিবেন স্থির করিতেছেন? আমাদের মতে তাঁহার দুই প্রকার স্মরণচিহ্ন হওয়া উচিত। এক তিনি বরাবর জমিদারদিগের স্বার্থরক্ষা করিয়া গিয়াছেন। অতএব তাঁহার স্মরণার্থ জমিদারদিগের একটী স্বতন্ত্র চিহ্ন স্থাপন করা উচিত। জমিদারেরা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশন সভাগৃহে তাঁহার একটী প্রশস্তময় প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। যিনি ঐ সভা গৃহে প্রবেশ করিবেন তিনি জানিতে পারিবেন যে যিনি জমিদারদিগের স্বার্থ-রক্ষা করিবেন তিনি এইরূপে পুরস্কৃত ও পূজিত হইবেন। তিনি ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় যে অসাধারণ দক্ষতা ও ক্ষমতা সহকারে জমিদারদিগের স্বামিত্ব সংস্থাপন করিয়াছেন জমিদারেরা কি তাহা বিস্মৃত হইতে পারিবেন? তিনি সাধারণতঃ দেশের মহোপকার সাধন করিয়াছেন, দেশের ধনী ও কৃতবিদ্য ব্যক্তিরা কি তাঁহার স্মরণার্থ স্বতন্ত্র চিহ্ন স্থাপন করিবেন না? তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া বাঙ্গালি বালকদিগের সমর শিক্ষার্থ একটী সামরিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করুন, তাহাতে তাঁহার নাম যে কেবল চিরস্মরণীয় হইবে এরূপ নয়, তিনি জীবদ্দশায় যেমন দেশের উপকার করিয়াছিলেন, মরণের পরেও তাঁহা হইতে দেশের সেইরূপ উপকার হইবে। বাঙ্গালিরা যদি যুদ্ধশিক্ষা করেন তাঁহাদিগের শারীরিক বলবীর্য্যের বৃদ্ধি হইবে। ইহাদিগের ভীরুতা দুর্নাম দূর হইবে। শারীরিক বল বৃদ্ধি হইলে ম্যালেরিয়াও দেশকে প্রণাম করিয়া দেশান্তরে প্রস্থান করিবে।

অনরেবল কৃষ্ণদাস ১৮৩৮ অব্দে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ঈশ্বরচন্দ্র পাল। বাল্যকালে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারির অন্তর্গত পাঠশালায় অধ্যয়ন করিতেন। ইনি অতি যত্নসহকারে পাঠাভ্যাস করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা ভালরূপ পড়া বলিতে পারিতেন বলিয়া কর্তৃপক্ষ ইঁহাকে একটী রোপ্যপদক পুরস্কার দিয়াছিলেন। ১৮৪৮ অব্দে ইনি উক্ত বিদ্যালয়ে ইংরাজী শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। অধ্যবসায়বলে ইনি বর্ষে বর্ষে বিদ্যালয়ে দুই শ্রেণী উপরে উঠিতেন এবং পুরস্কারও পাইতেন। ইনি সহাধ্যায়িদিগের মধ্যে সকলেরই উপরে থাকিতেন। কিন্তু এই বিদ্যালয়ের অধ্যাপনাকার্য্য ইঁহার মনঃপুত না হওয়াতে তিনি ১৮৫৩ অব্দে উক্ত বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া পাদরী মিলনি সাহেবের নিকট পড়িতে থাকেন। কিন্তু মিলনি সাহেব তাঁহাকে অন্য পুস্তক না পড়াইয়া কেবল বাইবেল পড়াইতেন বলিয়া ইনি তাঁহার নিকট হইতে পড়া ছাড়িয়া দেন। এই সময়ে রতন সরকারের

গার্ডেন ষ্ট্রীটে সাহিত্যালোচনী সভা নামে একটী সভা হইয়াছিল। কৃষ্ণদাস বাবু এই সভায় যোগদান করিয়া অন্যান্য সভ্যের সহিত পরামর্শ করিয়া পেরেণ্টাল একাডেমিক ইনষ্টিটিউসন অর্থাৎ ডভটন কলেজের অধ্যক্ষ রেবরেণ্ড মর্গান সাহেবের সাহায্যে উক্ত সভায় একটী শ্রেণী খুলিলেন। ইহাতে প্রত্যহ প্রাতঃকালে মর্গান সাহেব অধ্যাপনাকার্য্য সম্পন্ন করিতেন। এই শ্রেণীটী দুই বৎসর ছিল। পরিশেষে ইহা ডভটন কলেজে সম্মিলিত হইল। প্রথম মর্গান সাহেব কলেজে এই শ্রেণীর অধ্যাপনাকার্য্য সম্পন্ন করিতেন। মর্গান সাহেবকে ইঁহারা ইণ্ডিয়ান আলণ্ড উপাধি দিয়াছিলেন। ইঁহার পরে ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার সম্পাদক জর্জ্জ স্মিথ অধ্যাপনার ভাব গ্রহণ করেন। ১৮৫০ অব্দে কাপ্তেন ডি. এল রিচার্ডসন ও ভারতবর্ষের প্রধান সওদাগবের পুত্র কাপ্তেন এফ. পামার হিন্দু মেট্রপলিটান কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন। মর্নিং ক্রানিকালের সম্পাদক কাপ্তেন হারিস এবং উইলিয়ম ক্রিকপাট্রিক ও উইলিয়ম মাষ্টার্স এই বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হন। উভয়েরই শিক্ষকতা কার্য্যে বিশেষ সুখ্যাতি ছিল। বিশেষতঃ মাষ্টার্স সাহেবের ন্যায় অঙ্কশাস্ত্রজ্ঞ লোক তখন ছিলেন না বলিয়া সকলেই স্বীকার করিতেন। বাবু কৃষ্ণদাস পাল এই বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইলেন।

যত্নসহকারে বিদ্যাভ্যাস করিয়া ইনি শিক্ষকদিগের নিকট অত্যন্ত প্রশংসাভাজন হন এবং দুই বৎসরের জন্য একটী বৃত্তিলাভ করেন। ডাক্তার মওয়াট ও ইগ্‌লিনটন তৎকালে ছাত্রদিগের পরীক্ষা গ্রহণ করিতেন। তাঁহাদিগের নিকট কৃষ্ণদাস বাবু যে পরীক্ষা দেন, তাহা তাঁহার বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক ও প্রশংসার উপযুক্ত। ১৮৫৭ অব্দে তিনি কলেজ পরিত্যাগ করেন, কিন্তু অধিকতর জ্ঞানোপার্জ্জনের নিমিত্ত স্বয়ং কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরী ও মেট্রপলিটান কলেজের পুস্তকালয়ে গিয়া মনোমত পুস্তক পাঠ করিতেন। ইংরাজী সাহিত্য ও ইংরাজী রচনাশিক্ষার উপযোগী অনেক গ্রন্থ ডবলু. ক্রিকপাট্রিক সাহেব তাঁহাকে নির্ব্বাচন করিয়া দিতেন। মেট্রপলিটান কলেজে গিয়া যখন অধ্যয়ন করিতেন, সেই সময়ে তিনি বাবু শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহিত মিলিত হইয়া কলিকাতা মন্থলি ম্যাগাজিন নামে একখানি মাসিকপত্র প্রচার করিয়াছিলেন। এই পত্রখানি ছয়মাস মাত্র চলিয়াছিল। বাবু প্রসাদদাস দত্ত ইহার অধিকারী ছিলেন। ইহার পরে তিনি তাঁহার অধ্যাপক কাপ্তেন হারিসের অগোচরে মর্নিং ক্রনিকাল পত্রে প্রস্তাব লিখিতে আরম্ভ করেন। সবিশেষে প্রকাশ্যভাবে ও নিয়মিতরূপে উক্ত পত্র ও সিটিজেন নামক পত্রে প্রবন্ধ লিখিতেন। ফিনিকস্ হরকরা ও ইংলিসম্যানে মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইতেন। ইংলিসম্যানের তদানীন্তন সম্পাদক উইলিয়ম কব হরি ইঁহার লেখার বড় আদর করিতেন। এই সময়ে নাইট সাহেব কানপুর হইতে সেণ্ট্রাল স্টার নামে একখানি সংবাদপত্র প্রচার করেন। কৃষ্ণদাস বাবু ইহার কলিকাতাস্থ পত্রপ্রেরক ছিলেন। ইনি ব্লু বার্ড স্বাক্ষর করিয়া ইহাতে পত্র লিখিতেন। ইহার পরে বিখ্যাত কবি বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সর নামে একখানি পত্র প্রকাশ করিলেন। কৃষ্ণদাস বাবু ইহাতেও

লিখিতে আরম্ভ করেন। ইহার পরে যে হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদকতা কার্য্যে তাঁহার জীবন অতিবাহিত হইয়াছে এবং যাহার দ্বারা তিনি দেশের নানা হিতকার্য্য সাধন করিয়া ভারতবর্ষের সমগ্র লোকের শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলেন সেই হিন্দু পেট্রিয়ট বাবু হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রচার করেন। হরিশ বাবুর সম্পাদকতাকালে কৃষ্ণদাস বাবু ভারতে সিপাহী বিদ্রোহ নাম দিয়া কতকগুলি অতি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠান। হরিশ বাবু এই সকল প্রবন্ধ পাঠে মুগ্ধ হইয়া স্বয়ং ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসনের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারির পদ পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণদাস বাবুকে তাহাতে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার পরে তিনি হেয়ার সাহেবের সম্মানার্থ সভায় "ইয়ং বেঙ্গল ভিণ্ডিকেটেড' অর্থাৎ নব্যদলের নির্দ্দোষিতা সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধটী কলিকাতা ছোট আদালতের তদানীন্তন অন্যতম জজ রায় হরচন্দ্র ঘোষের নামে উৎসর্গীকৃত হয় এবং তিনি নিজে ইহা মুদ্রাঙ্কিত করেন। এই রায় হরচন্দ্র ঘোষ ইহাকে সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিতেন এবং ইহার নিমিত্ত অনেক অর্থ ব্যয়ও করিয়াছিলেন। ম্যারিথিড টাউনসেণ্ড সাহেব ফেণ্ড অব ইণ্ডিয়ায় "ভানিটেটস্ ভানিটেটম" শিরোনামা দিয়া এই প্রবন্ধের সমালোচনা করেন। কিন্তু কলিকাতা লিটরারি গেজেট অল্প বয়স্ক বালকের হস্ত হইতে এরূপ প্রবন্ধ বাহির হইতে দেখিয়া ইহার অতিশয় সুখ্যাতি করিয়াছিলেন ফলতঃ ইহার সকল প্রবন্ধই বিলক্ষণ লিপিচাতুর্য্য ও প্রগাঢ় বিদ্যাবত্তার পরিচয় দেয়। ইনি নীল চাষ এবং সিপাহীবিদ্রোহ ও সাহেব প্রভৃতি এই নাম দিয়া অতি উৎকৃষ্ট ক্ষুদ্র দুইখানি পুস্তক লেখেন। ইহাতে ভারতবর্ষীয় প্রজাদিগের রাজভক্তির বিশিষ্ট পরিচয় দেওয়া হইয়াছিল। কৃষ্ণদাস বাবু যদিও হিন্দু পেট্রিয়টে নিয়মিতরূপে লিখিতেন তথাপি বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র ইণ্ডিয়ান ফিল্ড নামে যে পত্র প্রচার করিয়াছিলেন, ইনি তাহাতেও প্রস্তাব লেখা পরিত্যাগ করেন নাই। ১৮৬০ অব্দে বাবু হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হওয়াতে ইনি পেট্রিয়টের সম্পর্ক পরিত্যাগ করেন। ছয় মাস পরে অর্থাৎ ঐ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কৃষ্ণদাস বাবু স্বয়ং হিন্দু পেট্রিয়টের একমাত্র স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক হন। ইনি কেবল যে সংবাদপত্রে রাজনীতি বিষয়ে ভাল ভাল প্রবন্ধ লিখিতে পারিতেন তাহা নহে, একজন সদ্বক্তাও ছিলেন। কৃষ্ণদাস বাবু যেমন জ্ঞানাপন্ন লোক ছিলেন, তেমনি ইঁহার বহুদর্শনও ছিল এবং ইংরাজী অনর্গল বলিতে পারিতেন। তিনি কি সামাজিক কি রাজনৈতিক কি মিউনিসিপাল সভায় আর কি লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ও জেনেরলের ব্যবস্থাপক সভার সকল স্থানে সকল বিষয়ে তুল্যরূপ সংবরং বক্তৃতা করিতে পারিতেন। কৃষ্ণদাস বাবুর অসাধারণ ক্ষমতা দর্শন করিয়া সার উইলিয়ম গ্রে সাহেবের নিকটেই তাঁহাকে ইনকম ট্যাক্সের আসেসর পদে নিযুক্ত করিতে চাহেন। কিন্তু বর্ম্মস্বীকার করিলে পাছে উপরিপদস্থ কর্ম্মচারীর দোষ বলা কঠিন হইয়া উঠে, এই ভয় ও দেশের হিতচেষ্টা ইঁহাকে উক্ত কার্য্যে । সাধারণের হিতচেষ্টাতেই ইহার জীবন পর্য্যবসিত হয়। লোককে পরামর্শ ও আবেদনপত্র লিখিয়া দিতে ইহার অনেক সময় যাইত।

অনবরত শ্রম করিয়া স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসন হইতে সাধারণের হিতোদ্দেশে যে রাশি রাশি মেমোরিয়াল ও রিপোর্ট প্রভৃতি পাঠান হইত, তৎসমুদায়ই কৃষ্ণদাস বাবু লিখিতেন। এইগুলি এমন যুক্তিসঙ্গত করিয়া লেখা হইত যে তৎপাঠে গবর্ণমেণ্ট ও তাঁহাদিগের বড বড রাজকর্ম্মচারীরা বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক কাজ করিতেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহার এই সকলগুণে প্রীত হইয়া তাঁহার প্রতি সম্মানের চিহ্নস্বরূপ প্রথম রায়বাহাদুর তৎপরে কম্প্যানিয়ন অব দি ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার উপাধি দান করেন।

পরলোকগত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। ৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৯২

আজ অতীব শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সোমপ্রকাশ পাঠক মহোদয়ের নিকট বঙ্গের একটী উজ্জল বত্ন হারাইবার সংবাদ উপস্থিত করিতেছে। খ্যাতনামা কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গালা দেশের অনেক সাধুকার্য্য সাধন করিয়া বার্দ্ধক্য অবস্থাতে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ইনি খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন বটে কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহাব স্বজাতিপ্রেম একমূহর্ত্তকালেব জন্য অন্তর হইতে অপসারিত হয় নাই। দেশের উন্নতিব জন্য যেরূপ যৌবনাবস্থাতে উৎসাহ, অধ্যবসায় ও কার্য্যতৎপবতা দেখাইয়া সকলকে উৎসাহিত করিতেন, সেইরূপ বার্দ্ধক্য অবস্থাতেও সমভাবে উৎসাহিত করিয়া আসিতেছিলেন। বঙ্গীয় কৃতবিদ্য সমাজের কিসে উন্নতি হয়, কিসে ইহারা সমাজকে উন্নত করিয়া তুলিবেন সেই চিন্তা অবিরত অন্তবে বিবাজ থাকিত। সমাজের প্রতি এত যত্ন এত আগ্রহ ছিল বলিয়া তিনি বৃদ্ধ হইয়াও যুবক সম্প্রদায়ের একমাত্র বন্ধু ও নায়ক ছিলেন। তিনি বলিতেন যুবকগণ বঙ্গেব একমাত্র উন্নতিব আশাস্থল। অতএব ইহাবা যাহাতে সৎপথের প্রদর্শক হন, নিয়ত তাঁহাব এই চেষ্টা ছিল। যুবকেরাও এই ভাবে প্রমত্ত হইয়া তাঁহার সহিত সখার ন্যায় আলাপ করিতেন। যুবকগণ যে স্থানে সমবেত হইতেন সেইখানেই কৃষ্ণমোহন বিরাজমান হইতেন। যদি সামান্যভাবে বালকস্বভাবশতঃ ছাত্রগণ একটি সভা করিয়া পরিণত বয়স্ক কৃষ্ণমোহনকে আহ্বান করিত, তখনই তিনি আগ্রহের সহিত সভাপতির আসন গ্রহণ করিতেন। বালকেরা এবং দর্শকগণ যেন তাঁহাকে পাইয়া পূর্ণ আনন্দে মাতিয়া যাইত। যেন তাহাদিগের কার্য্যতৎপরতা দ্বিগুণিত হইত এবং উৎসাহ, বল, অধ্যবসায় একযোগে নৃত্য করিত; যুবক ও বালকগণ যেন তাহাদিগের মনোমত সখার মিলনে অতুল আনন্দ-স্রোতে মিশিয়া যাইত। কিন্তু হায়! আজ যুবকবৃন্দের সে আনন্দ, সে উদ্যম, সে উৎসাহ প্রবাহের ধারাকে কে প্রবাহিত করিবে! কে সেই যুবকদিগের উৎসাহ মৃদুমন্দ গতি স্রোতের ন্যায় মৃদুস্বরে চিত্তকে সরলপথে নীত করিবে। আমরা দেখিতেছি এরূপ যুবকদিগের চিত্তের প্রবাহ তাঁহার সহিত পঞ্চভূতে মিশাইল। আজকাল অনেকে

কৃতবিদ্য হইয়াছেন। অনেকে প্রাণ ভরিয়া বিশাল বাক্যবিন্যাসের সহিত বক্তৃতা করিয়া চিত্তহরণ করেন বটে কিন্তু কৃষ্ণমোহনের অন্তরে যে ভাব নিহিত ছিল, সে ভাব কি কেহ যুবকসমাজে প্রদীপ্ত করিতে পারিবেন? সে ভাব অন্য আকারে বর্ণিত ছিল। সে উদ্যম, সে চিত্তরঞ্জন ক্ষমতা অনন্যরূপ ছিল। সে পথের পথিক যে আর দ্বিতীয় ব্যক্তি হইবেন তাহার আশা নাই।

আজ আমরা এই মহাত্মার জীবনী প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। গত সোমবার অপরাহ্ণে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী কৃষ্ণমোহন ৭১ বৎসর বয়ঃক্রমে ইহজগৎ পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইনি ১৮১৩ সালের বৈশাখ মাসে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম জীবনকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায়, ইনি সপ্তমবর্ষে পদার্পণ করিয়া ডেভিড হেয়ার মহোদয়ের প্রতিষ্ঠিত ইংরাজী বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। ১৮২৪ অব্দে দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমে হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হয়েন ও তাঁহার অধ্যবসায়গুণে তাঁহার সুখ্যাতি প্রকাশিত হইয়া পড়ে, সেই পঠদ্দশাতে ডিরোজিও নামক হিন্দু কলেজের অন্যতম শিক্ষক হইতে খ্রীষ্টধর্ম্মে মতি হয়। ইনি এবং ইহাঁর সহাধ্যায়িগণও এই পথের পথিক হন। কিছুদিন পরে যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগে ও সমাজ নিষিদ্ধ খাদ্যে প্রবৃত্তি জন্মে। এইরূপে বন্দ্যোপাধ্যায় একটি দল বাঁধিয়া সমাজ পরিত্যাগ করিয়া ও বাটি হইতে বহিষ্কৃত হইয়া খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী শিক্ষক মহোদয়ের বাটীতে সভা করিয়া প্রচার আরম্ভ করেন।

কলেজ অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়া হেয়ার স্কুলের শিক্ষক হন। বালক স্বভাব-প্রযুক্ত খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া প্রতিবেশীগণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিলেন। আপনিও প্রতিবেশীগণের নিকট লাঞ্ছিত, তিরস্কৃত ও প্রহৃত হইয়াছিলেন। কয়েকদিন পরে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী শিক্ষকের ওলাউঠা রোগে মৃত্যু হইলে কৃষ্ণমোহন "ইনকোয়ারার" নামক একখানি ইংরাজি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। ১৮৩২ অব্দে খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারক গ্রণ্ট ডফ সাহেব কর্তৃক এই ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া ১৮৩৭ অব্দে "সর্ব্বার্থ সংগ্রহ" নামক পুস্তক প্রচার আরম্ভ করেন। এই পুস্তক সংগ্রহ নিবন্ধক গবর্ণমেণ্ট হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হন। ১৮৫২ অব্দে বিশপ কলেজের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। ১৮৬১ "ষড়দর্শন সংগ্রহ" প্রণয়ন করেন। ১৮৬৮ অব্দে কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৭৫ অব্দে আর্য্য সাক্ষ্য নামে আর একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। এতদ্ব্যতীত রঘুবংশ কুমারসম্ভব ভট্টিকাব্য ঋগ্বেদ সংহিতা প্রভৃতি সংস্কৃত পুস্তকের সটীক অনুবাদ প্রকাশ করেন।

বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটী, বেথুন সোসাইটী এবং হেয়ার সাহেবের স্মরণার্থ সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছেন। ১৮৫৮ অব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য হইয়া তিনি বৎসরকাল সাহিত্য বিভাগের সভাপতি হন। ১৮৭৬ অব্দে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এল এল. ডি. বা ডাক্তার ইন ল উপাধি প্রাপ্ত হন।

১৮৮০ অব্দে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির করদাতাদিগের নির্ব্বাচননীতি প্রচলিত হইলে মিউনিসিপালিটীর সভ্যপদে নিযুক্ত হইয়া কয়েক বৎসর সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত হন।

বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদিনিবাস ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী জয়নগর মজিলপুরের নিকট ছিল। তাঁহার পিতামহ দক্ষিণেশ্বর গিয়া বাস করেন। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ভট্টাচার্য্য বংশীয় কন্যার সহিত ইঁহার পিতার বিবাহ হয়। কৃষ্ণমোহন ১৮১৩ অব্দের বৈশাখ মাসে ভূমিষ্ট হন। শৈশবাবস্থায় মাতুলালয়ে থাকিয়া বিদ্যাচর্চ্চা আরম্ভ করেন। বাল্যকালে ইনি বড় চঞ্চলস্বভাব ছিলেন। ইনি কলিকাতা বোর্ড অব একজামিনারের পদে প্রতিষ্ঠিত হন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

কৃষ্ণমোহন বৃদ্ধ হইয়াছিলেন বটে কিন্তু তাঁহার সেই বার্দ্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে যে তাঁহার ক্ষমতার হ্রাস হইয়াছিল তাহা নহে। স্বাস্থ্যরক্ষার উপর তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। প্রতিদিন প্রত্যুষে ও সন্ধ্যার সময়ে পদব্রজে বিচরণ করিতেন। এইটিই তাঁহার স্বাস্থ্যলাভের প্রধান সহায় ছিল। সাহিত্যসমাজে ইঁহার নাম স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকিবে। মহাত্মা রামমোহন রায়ের পরেই তিনি এই সাহিত্য সমাজের সংস্কারকরূপে অবতীর্ণ হন। পরে বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতি সংস্কারকগণ এই বঙ্গের সাহিত্যসমাজ অলঙ্কৃত করিতে আরম্ভ করেন। তিনিই রাজনীতিক্ষেত্রেও অকুতোভয়ে বিচরণ করিয়া ন্যায় ও যুক্তি প্রদর্শন করিয়া রাজপুরুষদিগের চক্ষু উন্মীলিত করিয়াছিলেন কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, তাঁহার জীবনের শেষভাগে তাঁহার এই রাজনৈতিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছিল। এই জন্য তাঁহার মৃত্যু আমাদিগের দুঃখ ও ক্ষোভের কারণ হইয়াছে। ইঁহার সন্তান সন্ততির মধ্যে একটী কন্যা ও দৌহিত্র সন্তান আছে। দৌহিত্রটী এক্ষণে বিলাতে অবস্থিতি করিতেছেন। এরূপ মহাত্মার স্মরণার্থ একটী চিহ্ন যাহাতে স্থাপিত হয়, সহৃদয় বঙ্গবাসী মাত্রেরই তাহাতে যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য।

তারানাথ তর্কবাচস্পতি। ১৬ আষাঢ় ১২৯২

ভারতবাসীর উপর যে বিধাতার কি কোপদৃষ্টি পতিত হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না। একদিকে দুর্ভিক্ষ ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া রাক্ষসীবেশে মুখব্যাদান করিয়া বঙ্গের এক এক অংশ গ্রাস করিতেছে। অপরদিকে অনাবৃষ্টি নিবন্ধন সরোবরাদি সমস্ত শুষ্ক হইয়া লোকের ওষ্ঠাগত প্রাণ হইয়াছে, আবার যুদ্ধের আশঙ্কায় বিচলিত নেত্রে ভারতবাসী চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে। তাহার উপর যাঁহারা দেশের আশাভরসা, যাঁহাদিগের গৌরবে ভারত ও বঙ্গদেশ গৌরবান্বিত, যাঁহারা ভারতকে এত উৎসাহিত করিয়াছেন,

যাঁহাদিগের দৃষ্টান্তে বঙ্গদেশ এত উন্নত হইযাছে সেই সকল মহাত্মা একে একে ধরা হইতে অপসারিত হইতেছেন।

সংস্কৃতশাস্ত্রাধ্যাপক তারানাথ তর্কবাচস্পতির মৃত্যুতে আমবা যে ভাবী উন্নতির একটী আদর্শ হারাইযাছি তাহা নহে, আমরা যাহাদিগকে পূর্ব্বে হারাইয়াছি সেই সকল বঙ্গের উজ্জ্বল রত্ন আর কি ফিরিযা পাইব? সেই দ্বারকানাথ মিত্র, সেই কৃষ্ণদাস, কেশব, কৃষ্ণমোহন ও হরিশ্চন্দ্র—যাঁহারা বর্ত্তমান সমাজের বঙ্গের এক একটী উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন, যাঁহাদিগের জ্ঞান বিকাশে এই ভারত আলোকিত হইযাছিল, আজ সেই আলোক ক্রমে নির্ব্বাণ হইতে লাগিল, আবাব যাঁহারা আছেন তাঁহারাও ক্রমে ক্রমে যে ধরা ছাড়িবেন তাহার সূচনা দেখিতেছি।

প্রাচীনশাস্ত্রাধ্যাপক তারানাথ তর্কবাচস্পতি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ সংস্থাপনের প্রারম্ভ হইতেই অধ্যাপকতা কার্য্যে নিযুক্ত হন। ইনি ব্যাকবণাদিতে সুপণ্ডিত ছিলেন, দর্শন, স্মৃতি ও ন্যায়শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি ছিল। সংস্কৃতশাস্ত্রে ইনি যে একজন সুপণ্ডিত ছিলেন, বাচস্পত্য অভিধান এবং শব্দস্তোমমহানিধিই ইহার জলন্ত প্রমাণ। ইহা ভিন্ন অনেক অমূল্য সংস্কৃত গ্রন্থের উদ্ধাব করিয়াছেন। গত ফাল্গুন মাসে ইনি ৺কাশীধামে গমন করেন। সেইস্থানে সুস্থ শবীরে ধর্ম্মকার্য্য ও শাস্ত্রালোচনায় কবিতেন। হঠাৎ জ্বরবোগে আক্রান্ত হন। ৯ই আষাঢ শনিবাব দিবা ৩ ঘটিকার সময পরলোকে গমন করিয়াছেন। ইঁহার ৭৯ বৎসব বয়ঃক্রম হইযাছিল। অনেকদিন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকতা কবিযা বৃদ্ধ বয়সে পেন্সন গ্রহণ কবেন।

শেষে ঠনঠনিয়াতে চতুষ্পাঠী করিযা অনেককে বিদ্যাদান করিযাছিলেন। বাচস্পতি সামাজিকতা বড় ভালবাসিতেন। সেইজন্য কোন রাজা বা জমিদারের বাটীতে সমারোহ ব্যাপার উপস্থিত হইলে দূরদেশ হইতে তাহাব আমন্ত্রণ পত্র আসিত এবং সমস্ত কর্তৃত্ব-ভারও তিনি গ্রহণ করিতেন তাঁহাতে অনেকগুলি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অনুগত ছিলেন। কিছু তমোগুণ ছিল বলিয়া কেহ কেহ দুষিত, কিন্তু এ দোষ কযেকটী সৎকার্য্যের প্রভাবে বিকশিত হয নাই।

বঙ্গদেশের মধ্যে সংস্কৃত শাস্ত্রে যে ইনি একটী সুপণ্ডিত ছিলেন তাহাব বর্ণনা করা বাহুল্য। ইদানীন্তনকালে সংস্কৃতেব বীজ যে ইহা হইতে বোপিত পলিত ও ফলফুলে সুসজ্জিত হইয়াছিল, তাহা অনেকেই স্বীকার কবিবেন। এক্ষণে যে ক্রমশঃ সংস্কৃতশাস্ত্রের আলোচনার লোপ হইবে তাহা বুঝা যাইতেছে।

অক্ষয়কুমার দত্ত। ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৩। ৩০ সংখ্যা

বঙ্গ সাহিত্য ভাণ্ডারে আর একটী রত্ন হারাইলাম। সুপ্রসিদ্ধ অক্ষয়কুমার দত্ত

গত সপ্তাহে পরলোক গমন করিয়াছেন। অক্ষয়কুমার বঙ্গের আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেরই নিকট পরিচিত। তাঁহার প্রণীত চারুপাঠ নামক গ্রন্থত্রয়ে বালক ও শিক্ষক সমাজে তাঁহার যথেষ্ট সুখ্যাতি। এমন বিদ্যালয় নাই যেখানে তাঁহার চারুপাঠ কোন না কোন সময়ে পাঠ্যস্বরূপে গৃহীত হয় নাই। "বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার" তাহার বহুজ্ঞতার আর একটী পরিচয়। তাঁহার সম্পাদিত তত্ত্ববোধিনীর গভীর তত্ত্ব, সুন্দর এবং প্রাঞ্জল ভাষা, পবিত্র ধর্ম্মভাব, হিন্দু, ব্রাহ্ম, মুসলমান খৃষ্টান সকলেরই নিকট সমুচিত সম্মান ও আদর পাইয়াছে। "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" অক্ষয়ের অক্ষয়কীর্ত্তি চিরদিনই দেদীপ্যমান রাখিবে। অক্ষয়কুমার বঙ্গভাষার একটী প্রধান স্তম্ভস্বরূপ। বঙ্গের সাহিত্য সংসারে নূতন নূতন ছোট বড যত লেখক হইয়াছেন সকলেই প্রায় অক্ষয়কুমারের সৃষ্ট। নবলেখক মাত্রেই তাঁহার নিকট চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকিবেন। শিশুকাল হইতে তিনি সাহিত্য সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ হন। ইনি কবি ঈশ্বর গুপ্তের সহিত প্রথমে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। কাব্যে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া গদ্যে তাঁহার বিশেষ মনোযোগ আকর্ষিত হয়। এই পরিবর্ত্তনে বঙ্গসাহিত্য তাঁহার নিকট যত উপকৃত হইয়াছেন, কাব্যে তত্দূব উপকার পাইতে পারিতেন না। ঈশ্বর গুপ্ত অক্ষয়কুমার এই দুইজনেব মধ্যে অক্ষয়কুমারই আমাদের অধিক উপকার করিয়াছেন বলিতে হইবে। ১৮৬২ অব্দ হইতে রোগাক্রান্ত হইয়া বালিতে বাস করেন। ২৪ বৎসরকাল পীড়িত অবস্থায় অতিবাহিত করিয়া ৬৬ বৎসব বয়ঃক্রমে স্বীয় বাসভূমি বালিগ্রামে তাঁহার ইহজীবনের শেষ হয়। এমন একটী অমূল্য রত্ন হারাইয়া আমরা সকলেই তাঁহার জন্য কাঁদিতেছি, বঙ্গবাসী মাত্রেই তাঁহার শোকে মুহ্যমান। কিন্তু কেবল কাঁদিলে চলিবে না। এমন অমূল্য নিধি হাবাইয়াছি, আব ত পাইব না, কেবল তাঁহার বিমল মূর্ত্তিই ইহজগতে পড়িয়া থাকিবে। যাহাতে সেই কীর্ত্তি রক্ষা হয় সাহিত্যানুরাগী মাত্রেরই তাহার জন্য উদ্যোগী হওয়া কর্ত্তব্য। আমবা প্রস্তাব করি কলিকাতা সেনেট হাউসে অক্ষয়কুমার দত্তের একটী প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিবার জন্য দেশের লোকে সযত্ন হউন। এ সৎকার্য্যে কেহই সাহায্য করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন না।

৺অক্ষয়কুমার দত্ত। ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৩। ৩০ সংখ্যা

প্রাপ্ত

অক্ষয় বাবুর নামের অগ্রে শ্রীর পরিবর্ত্তে ৺ লিখিতে আমাদের অন্তঃকরণ বিদীর্ণ হয়। যিনি নিজের গভীর জ্ঞান, অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্য, তীক্ষ্ণ মনীষা, প্রগাঢ় বিদ্যা ও গবেষণা বলে সমাজের ভূয়সী শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিয়াছেন, বহুকাল তত্ত্ববোধিনীতে ধর্ম্ম, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও সুনীতির গূঢ়তত্ত্ব সমুদায় প্রকাশ করিতে করিতে জীবন

স্থাপন করিয়াছেন, বঙ্গভাষার নূতন মূর্ত্তি সংগঠন পূর্ব্বক বঙ্গবাসীকে উপহার দিয়াছেন, তাঁহার নামের পূর্ব্বে ৺ লিখিতে কেনই না প্রাণ কাঁদিয়া উঠিবে? যিনি সহস্র লোকের জীবনী লিখিয়া বঙ্গবাসীর ইতিহাসজ্ঞান জন্মাইয়া দিয়াছেন আজ তাঁহারই জীবনী আমাদের আলোচ্য। ১২২০ সালের ১লা শ্রাবণে অক্ষয়কুমার দত্ত চুপীগ্রামে ভূমিষ্ট হন। ৭।৮ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় লিখিতে যান। পাঠশালায় কাঠাকালী বিঘাকালী লিখিবার সময়েই তাঁহার মনে হয় "পৃথিবীতে কত বিদ্যাই আছে? পৃথিবী কতই বড? পৃথিবীর সীমাই বা কোথায় ও তাহার পরেই বা কি? যদি তার পর আকাশ হয়, আকাশই বা কতদূর?" কিছুকাল পরে তিনি পার্সী পডিতে প্রবৃত্ত হন, তৎপরে পিয়ার্সন রচিত ইংরেজী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষায় লিখিত ভূগোলের বাঙ্গালা অংশে মেঘ, বিদ্যুৎ, বৃষ্টি, বজ্রপাত ইত্যাদি বিষয় অধ্যয়ন করিয়া ইংরেজী শিক্ষা করিতে দৃঢপ্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিলেন। কিছু দিন বাটীতে সামান্যরূপ ইংরেজী পডিয়া তৃপ্ত না হইয়া অবশেষে "ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে" ভর্ত্তি হন। এই বিদ্যালয়ে সার্দ্ধ দ্বিবর্ষমাত্র পাঠ চলে। এই সময়ে তিনি নিজের ভবিষ্যৎ উন্নতির অনেক পরিচয় দেন। বিদ্যালয়স্বামী গৌরমোহন আঢ্য মহাশয় তাঁহাকে সুবুদ্ধি ও সুশীল বলিয়া অত্যন্ত স্নেহ করিতেন।

বিদ্যালয় পরিত্যাগের কারণ অকালে পিতৃবিয়োগ। বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়াও, তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমে উচ্চ গণিতশাস্ত্র ও বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের অনুশীলনে নিমগ্ন থাকিতেন। এই সময়েই সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় ও অবশেষে ঘনিষ্টতা জন্মে। প্রথমে অক্ষয় বাবু পদ্য রচনা করিতেন। হঠাৎ একদিন ঈশ্বর বাবুর অনুরোধে গদ্য লিখিতে বাধ্য হন। তদবধি পদ্যের পরিবর্ত্তে গদ্য লেখায় তাঁহার অপ্রবৃত্তি হইয়াছিল। অতঃপর একদা ঈশ্বর বাবুর সহিত মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ দেখিতে যান। সেই সূত্রেই আত্মীয়তা জন্মে। এমন কি, দেবেন্দ্র বাবুর ইচ্ছানুসারে তিনি তত্ত্ববোধিনী সভায় সভ্য হন। কিয়দ্দিনান্তর দত্তজ "বিদ্যাদর্শন" নামে এক মাসিকপত্র প্রচার করেন।

তত্ত্ববোধিনী সভার অধীনে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপিত হইলে পর অক্ষয় বাবু তাহার ভূগোল ও পদার্থবিদ্যার শিক্ষক নিযুক্ত হন। ইহারই কিছুকাল পরে সুপ্রসিদ্ধ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৭৬৫ শকে প্রকাশিত হইবার সঙ্কল্প হয়। অক্ষয় বাবু প্রথমাবধি একাদিক্রমে ১২ বৎসর কাল উহার সম্পাদন করিতে থাকেন। এই কার্য্যে ব্রতী হইয়া দত্তজের সময় মতে আহার নিদ্রা হইত না। কঠোর পরিশ্রমে অক্ষয় বাবুর মস্তিষ্ক পীড়া জন্মে। যখন তাঁহার ৩০ বৎসর বয়স সেই সময়েই ঐ সাংঘাতিক রোগ উৎপন্ন হয়। তদবধি এ পর্য্যন্ত ·· ক্রমাগত রোগযন্ত্রণা সহ্য করিয়া বিগত

১৪ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার রাত্রি ৩টা ১৫ মিনিটের পর ৬৬ বৎসর বয়সে ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। বৈশাখের শেষার্দ্ধ হইতে রোগের বৃদ্ধি হয়। মস্তিষ্ক রোগের আনুষঙ্গিক উদরাময় ও কাশির বৃদ্ধি হইতে থাকে। তাঁহার চিকিৎসক ডাক্তার চন্দ্রকুমার দে এম ডি তাঁহার চিকিৎসা করিয়াছিলেন। পরে কবিরাজ দ্বারা উদরাময়াদির চিকিৎসা হইবার চেষ্টা হয় কিন্তু সে চিকিৎসা আর করাইতে হইল না। যে দিবস রাত্রিতে কবিরাজ আসিয়া উপস্থিত হন, সেই রজনীতেই তাঁহাকে ভবলীলা সাঙ্গ করিতে হয়।

তাঁহার মৃত্যুতে সমস্ত বঙ্গদেশ অন্ধকারময় হইল নিদারুণ ক্ষোভে বালি উত্তর-পাড়ার বালক, বৃদ্ধ, যুবক, স্ত্রী,—ভদ্র অভদ্র সকলেই অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইল। কলিকাতা হইতেও কতকগুলি ভদ্রলোক তাঁহার শবদেহ দেখিতে গিয়াছিলেন।

অক্ষয় বাবু পরোপকারী, অমায়িক স্বভাব, মিতব্যয়ী, অথচ দানশীল, নিরহঙ্কার ও গম্ভীর প্রকৃতি ছিলেন। তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি যেরূপ সূক্ষ্ম ছিল, তর্কশক্তিও তদনুরূপ প্রখর ছিল। তাঁহার মত কঠোর জ্ঞানের চর্চ্চা করিতে কোন বাঙ্গালীকেই দেখিতে পাওয়া যায় না। জীবিতবস্থায সকলে যেমন তাঁহাকে হাস্য-বদন সৌম্যমূর্ত্তি ও প্রশান্ত-স্বভাব দেখিতেন, মরণেব পবেও তদ্রূপ সন্দর্শন কবিযাছে। তাঁহার সহধর্ম্মিণীর বিয়োগ ঘটিলেও সেই গভীব চিন্তাশীল মহাপুরুষেব প্রগাঢ় চিন্তাই প্রিয়তমা প্রণয়িণীর কায্য করিত। পারিবারিক সুখ তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে নাই বটে, কিন্তু তিনি কদাপি অসুখী ছিলেন না। তাহার সুখ অসুখ এখন তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারিবে না। কিন্তু বঙ্গদেশ বত্নহারা হইযা চিবদিনই তাঁহার জন্য কাঁদিবে। ভগবান অক্ষয়কুমারের অমরাত্মাকে শান্তি প্রদান করুন।

অক্ষয় স্মরণে। ১ আষাঢ় ১২৯৩। ৩১ সংখ্যা

১

বাজিল শোকেব ভেরী ভারতে আবার
মরম ভেদিয়া উঠে শোক পাবাবার ,
আজি বঙ্গবাসিগণে—বালবৃদ্ধ যুবাজনে
অনন্ত বিষাদে কাঁদে শোকের উচ্ছ্বাসে,
মলিন সবার মুখ ভারত প্রদেশে।

২

আজি কুমারিকা হতে হিমাদ্রির গায
প্রতিধ্বনি প্রতিজনে শোকে কথা কয় ,

আজি দীনা বঙ্গমাতা—কহিতে না সরে কথা
বিষম বিষাদে আজ কাঁদিয়া বিরলে
ভাষায আপন বক্ষ নযনেব জলে।

৩

হায় কি শুনিবে আজ। বঙ্গ হাহাকার
বঙ্গের অক্ষয় রত্ন অক্ষযকুমাব,
নাহি আর বঙ্গভূমে—কালেব নিযতি ক্রমে,
শূন্য করি গেছে ক্রোড ভাবত মাতার
বঙ্গেব শ্মশানে দেহ ভস্মীভূত তাঁব।

৪

অক্ষযের হায। আজ অক্ষয লেখনী
অক্ষযেব হায। উচ্চ বিজ্ঞান কাহিনী,
অক্ষযের ধর্ম্মনীতি—অমূল্য অক্ষয নীতি
অক্ষয কীর্ত্তি যার করিছে প্রচার
আজ সে অক্ষয তবে বঙ্গে হাহাকার।

৫

"একমেবা দ্বিতীয়ং" প্রচাব যাঁহার
অক্ষয় উদ্যমে আব ধর্ম্মের প্রচার,
তত্ত্ববোধিনীপত্রে—তত্ত্ব কথা প্রতি ছত্রে
লিখিযাছে হায়। যাব অক্ষয লেখনী,
আব নাই আজ সেই ভারতেব মণি।

৬

জড জীব ধর্ম্মতত্ত্ব মানব প্রকৃতি
মানবেব হিত তবে নানা শিক্ষানীতি,
যাঁব কৃত চারুপাঠ—বঙ্গশিশু করি পাঠ
বঙ্গেব অক্ষয রত্নে জেনেছে সবাই,
আজ সে অক্ষয় হায বঙ্গধামে নাই।

৭

একটী একটী করি বঙ্গের রতন
অকালে কালেব গ্রাসে হতেছে পতন,
বঙ্গের বুকেতে হায—কত দুঃখ সয়ে যায়

তবু যার মুখ দেখে বেঁচে আছে প্রাণ,
সেটিকেও লও বিধি কি তব বিধান !

অক্ষয় স্মরণে। ৮ আষাঢ় ১২৯৩। ৩২ সংখ্যা

বঙ্গীয় লেখক চূড়ামণি স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্তের মৃত্যু উপলক্ষে লিখিত
"একে একে শুকাইছে ফুল, এবে নিবিছে দেউটী।"

১

বঙ্গের সাহিত্যাকাশে, যে দুটী নক্ষত্র
উজলিল এতদিন বিমল কিরণে,
মহাকাল ঝটিকায়—নিবিল একটী
তার, আর কি তা উঠিবে গগনে ?
শুখাল যে ফুল আহা মার্ত্তণ্ড আতপে,
আর কি তা ছড়াবে সৌরভ ?
জানে না দুরন্ত কাল কি ক্ষতি বঙ্গের
করিয়াছে করি চুরি বঙ্গের গৌরব।
ভাগ্যহীনা বঙ্গভাষা কি কুক্ষণে আজ
পিতৃহীন হলি তুই—"অক্ষয়" বিহনে ,
কার মুখ চেয়ে আর দাঁড়াবি সংসারে
কে তোরে দেখিবে আর সস্নেহ নয়নে ?
কে আর এখন তোর হইল অভাব—
দীনহীন বঙ্গভাষা, তোমারই প্রসাদে
হইয়াছে অগ্রসর—উন্নতির পথে ,
মাতৃভাষা প্রিয় যত বাঙ্গালী সন্তান
সাধ্যমতে করিবেক পূরণ তাহার ?
সাজাইতে নানা সাজে কে তোরে এখন
পরাইবে মনোমত রত্ন অলঙ্কার ?

২

জান না কি অরে কলি দরিদ্র সম্বল
করেছিস্ চুরি তুই দরিদ্র কুটীরে ?
যে কটী রতন ছিল আঁধারে কুটীর
হরিলি রে একে একে কাঁদায়ে বঙ্গেরে।

অনাথা করিয়া আহা বাঙ্গালা ভাষায়
হরিলি সে ধন তুই—পাব কি তা আর ?
হিত উপদেশ দানে কে আর এখন
যুবজন মন হতে ঘুচাবে আঁধার ?
বিশ্বপতি বিধাতার বিশ্বরচনায়
বিমুগ্ধ হইয়া কেবা ধরিবে লেখনী ?
কে দেখাবে গ্রহ তারা, অবিশ্রান্তগতি
ভ্রমিছে আকাশ পথে দিবস রজনী ?
প্রাকৃতিক শোভা হ'তে কৃত্রিম সুষমা
কে দেখাবে কত হীন মূঢ়মতি নরে ?
কে দেখাবে হিম-গিরি হিমানী শিখরী
কেমনে তুলিছে শির সুদর অম্বরে ?
বিশাল বারিধি হৃদে সফেন তরঙ্গ—
কেমনে ছুটিছে বেগে গর্জি ভীষণ ?
গাঢ় জলধের মাঝে থাকিয়া থাকিয়া
কেমনে বিজলি বালা ঝলসে নয়ন ?
শারদ পূর্ণিমা রাতে শীতল কিরণে
কেমনে শশাঙ্ক ঢালে কৌমুদী লহরী
বাষ্পপুচ্ছ ধূমকেতু (নক্ষত্র নিরস্)
কেমনে আকাশে থাকি উজলে শর্বরী ?
মানস-নয়ন খুলি কে দেখাবে আর
বিশ্বশিল্পী বিধাতার বিচিত্র কৌশল ?
বিফল এ আশা আজ "অক্ষয়" হরিয়া
ঘুচায়েছে কাল সব—করেছে নিষ্ফল।

৩

ভাসাইয়া অশ্রুনীরে রে নিষ্ঠুর কাল
ভিখারিণী করি বঙ্গে কি ফল লভিলি ?
হরিলি সে রত্ন হায়, আর কি তেমন—
জনমিতে বঙ্গভূমে স্বদেশ উজলি ?

৪

যাও হে "অক্ষয়" তবে সে অক্ষয় ধামে
রাখিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি অনন্ত উল্লাসে,

ভুঞ্জিয়া বিবিধ দুঃখ, ভব মরুভূমে
যাও এবে শান্তি তবে অমর নিবাসে।
অনুক্ষণ রাখিবেক তোমা হৃদি রথে।

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা।

সোমপ্রকাশের অশৌচ গ্রহণ। ১৫ ভাদ্র ১২৯৩। ৪১ সংখ্যা

পাঠক আজ আমরা পিতৃহীন হইয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। আজ তোমায় কি বলিব জানি না, এ হৃদয়ের দারুণ যন্ত্রণা কি করিয়া জানাইব তাহা বুঝিতে পারি না। আজ কেবলই ইচ্ছা হয় তোমা সবার গলা ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করি, অশ্রুর সহিত অশ্রু মিশাইয়া প্রাণ ভরিয়া পিতার নাম উচ্চারণ করি। ভাই রে! পিতৃশোক কি এমনই প্রবল যে মানুষকে আত্মহারা পাগল করিয়া তুলে? আমরা পিতৃহীন হইয়াছি, রত্নহারা হইয়াছি, প্রাণের আরাধ্য দেবতা, ইহকালের সাকার ঈশ্বর, বঙ্গভূমির শিক্ষা গুরু, ভারতভূমির জ্ঞানকল্পতরু, সকল গুণের আধার—এমন ধন রত্ন, শ্মশানাগ্নির প্রদীপ্ত শিখায় বিসর্জ্জন দিয়া শূন্য মনে উদাস হৃদয়ে ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছি, কি বলিব ভাই!—সোমপ্রকাশের জন্মদাতা বঙ্গভূমির জাতীয় সংবাদ-পত্রের পিতা; আমরা পিতৃহীন হইয়াছি, তোমরাও পিতৃহীন হইয়াছ, দ্বারকানাথকে হারাইয়া "সোমপ্রকাশ" যেমন অনাথ, বাঙ্গালা সংবাদপত্রের সকলেই তেমনি অনাথ, "সোমপ্রকাশ" অগ্রজ তোমরা আমাদের অনুজ। তাই ভাই! শোকের উত্তরীয় স্কন্ধে করিয়া ভাইদের গলা জড়াইয়া কাঁদিতে আসিয়াছি। এস দেখি, কে আমাদের উদাস প্রাণে প্রাণ ঢালিয়া দিবে, কে ভাই বলিয়া আমাদের সঙ্গে কাঁদিতে আসিবে, কে এই হতভাগ্যের চীৎকার শুনিয়া অশ্রু মুছাইতে আসিবে। সহৃদয় বাঙ্গলা মুদ্রাযন্ত্র! তোমরা বৃদ্ধের বড় আশার সামগ্রী। যে উদ্দেশে "সোমপ্রকাশে"র জন্ম, যে উদ্দেশে সোমপ্রকাশ রক্ষণে বৃদ্ধের প্রাণপণ চেষ্টা এক দিন তোমাদের হইতে সফল হইবে, অগ্রজে ও অনুজে মিলিয়া তোমরা এক দিন প্রিয়ভূমি মাতৃভূমির শোক অশ্রু মোচন করিতে পারিবে, ইহাই বৃদ্ধের ভরসা ছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্রের উপর যেমন তাঁহার স্নেহ ছিল বৃদ্ধবয়সের কনিষ্ঠ পুত্রগণের উপর তাঁহার আরও স্নেহ বাড়িয়াছিল। তোমরা যাঁহার পরম যত্নের ধন তিনি আজ তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, বঙ্গভূমি শূন্য করিয়া বঙ্গের রত্ন পলাইয়া গিয়াছে, দক্ষিণ দেশ আঁধার করিয়া দক্ষিণ বঙ্গের উজ্জ্বলমাণিক নিবিয়া গিয়াছে। কাঁদিব না ভাই! সেই সৌম্যমূর্ত্তি একবার স্মরণ করিয়া কার না কান্না আইসে? তুমি জ্ঞানী, তুমি বৈজ্ঞানিক, তুমি বৈরাগী, তুমি দার্শনিক—যাহা ইচ্ছা

তাহাই হও, পিতৃশোকের প্রবল স্রোত বন্ধ করিবার ক্ষমতা তোমাদের নাই। সান্ত্বনা করিবে? দারুণ পুত্রশোকের সময়ও সেই দেবতার মুখে যে অমিয়মাখা মধুর সান্ত্বনা শুনিয়াছি আর কি কেহ তাহা শুনাইতে পারিবে? বিপদে পড়িয়া কাতর হইলে তেমন করিয়া আর কি কেহ জলন্ত বাক্যে উৎসাহিত করিতে পারিবে? সম্পদ পাইয়া অহঙ্কৃত হইলে তাঁহার মতন আর কি কেহ এ জগতের অসারত্ব দেখাইয়া প্রাণের ভিতর বৈরাগ্য আনিতে পারিবে? শোকের সময়, দুঃখের সময়, আনন্দের সময়, বিষাদের সময়, সম্পদের সময়, বিপদের সময়, চক্ষের সম্মুখে অগ্রণী হইয়া মস্তকের উপর দেবতা হইয়া রাজনীতির অকূল সাগরের তরণী হইয়া আর কি কেহ বঙ্গবাসীকে গম্যপথে লইয়া যাইতে পারিবে? কাঁদিব না ভাই। এ ভগ্ন হৃদয়ের ক্রন্দন ছাড়া আর কি সম্বল আছে? সেই জলন্ত চিতার প্রদীপ্ত অনলে আমাদের আশা, ভরসা, বল, বীর্য্য, উৎসাহ মনুষ্যত্ব সকলই যে পুড়িয়া ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে—আজ বালকের ক্রন্দন ভিন্ন আর কি লইয়া এ সংসারে থাকিব ভাই? আমাদের বিজ্ঞতা গিয়াছে, সাহস গিয়াছে, বিক্রম গিয়াছে বুদ্ধি গিয়াছে, স্মৃতি গিয়াছে—শ্রী ভ্রষ্ট অধঃপতিত মনুষ্যের ন্যায় আজ আমরা পাগল হইয়া দ্বারে দ্বারে বেড়াইতেছি, আর ডাক ছাড়িয়া কাঁদিবা বলিতেছি বঙ্গবাসী ভাই রে। আজ তোদের চক্ষে ধূলি দিয়া পালাইয়াছেন। বাঙ্গালী সব আজ কাঁদিতে কাঁদিতে এস গঙ্গার তীরে পিতৃশ্রাদ্ধে পিণ্ডদান করিবার জন্য দৌড়িয়া এস, বড় ভাই ছোট ভাইয়ে মিলে অশ্রুর স্রোতে গঙ্গার হৃদয় শোকের তরঙ্গে উদ্বেলিত করিবে এস। আজ বুঝি বিজয়া আসিয়াছে, শরতের প্রারম্ভেই মনুষ্যত্বের শারদীয়া প্রতিমাখানি কালদর্পণের ভিতর অল্পে অল্পে অন্তর্হিত হইয়াছে। বিজয়ার দিন বড় যন্ত্রণার দিন। বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে সেই দিন কান্না শোক আর হা হুতাশ। আজ বুঝি সেই দিন আসিয়াছে। বঙ্গবাসী কাঁদ ভাই। একদিনে এ কান্নার নিবারণ হইবে না।

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মরিয়াছেন? একথা কেহ বলিও না ভাই। কথাটা বলিলেই অমনি যেন একটা প্রতিধ্বনি আসে, অমনি যেন একটা প্রতিশব্দের গম্ভীর রব প্রচার করে—বঙ্গভাষার পিতা মরিয়াছেন বঙ্গসমাজ অধিনায়ক শূন্য হইয়াছে, বঙ্গের রাজনীতি সংস্কারশূন্য হইয়াছেন, অমনি যেন মনে হয় রাজা যথেচ্ছাচারী হইয়াছেন, প্রজা বিবেকহীন হইয়াছে, যুবক সম্প্রদায় উন্মার্গগামী হইয়াছেন—ধৃতি, ক্ষমা, দয়া, সাহস, নির্ভীকতা কর্ত্তব্যশীলতা, সত্যবাদিতা সহৃদয়তা, আলাপকুশলতা, পরিপক্কবুদ্ধি সংস্কৃতজ্ঞান, আর্য্যের আদর, ভারতের গৌরব সকলেই যেন একযোগে ভারতভূমি পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। দ্বারকানাথ মরিয়াছেন একথা শুনিলে বিশ্বাস হয় না,—তাঁহার কীর্ত্তি তাঁহাকে জীবিত করিয়া রাখিয়াছে। যতদিন বঙ্গভাষার আলোচনা ততদিন তিনি জীবিত, যতদিন বঙ্গসাহিত্যের আদর, ততদিন তিনি বঙ্গবাসীর সম্মুখে বিরাজমান, যতদিন বাঙ্গালীর রাজনীতি, সমাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি

শিখিবার অভিলাষ, ততদিন তিনি তাহাদের হৃদয়ের ভিতর জাগরূক, যতদিন সংস্কৃত ভাষার আলোচনা, আর্য্যশাস্ত্রের গৌরব ততদিন তাঁহার সৌম্যমূর্ত্তি ভারতবাসীর হৃদয় সিংহাসনে দেদীপ্যমান। সেরূপ কি কেহ ভুলিতে পারে?—সে শ্রীমুখের সুমধুর বাণী কেহ কি কখনও বিস্মৃত হইতে পারে?—তাই আবার বলি ভাই কাঁদ, এ হতভাগ্যের সহিত একত্রে মিলিয়া কাঁদ। আজ এই বরষার নৈশ-আকাশ চাঁদে হারাইয়া যেমন মেঘের রবে কাঁদিতে থাকে, তেমনি করিয়া কাঁদ আর অজস্রধারে অশ্রুর ধারায় ধরাতল প্লাবিত কর। কাঁদিয়া কাঁদিয়া শোকের আবেগ একটুও যদি কমিয়া যায়, একবারও যদি বুকের বোঝা কিয়ৎক্ষণের জন্য ভারহীন হয়, একবারও যদি সুস্থ হইয়া গুরুদেবের অমরাত্মার জন্য প্রার্থনা করিতে পারি তাঁহার স্বর্গবাসের জন্য ভগবানে উপাসনা করিতে পারি, দীনহীন বেশে আকুল প্রাণে একবারও যদি হৃদয়ের সহিত বলিতে পারি যে "ভগবান আমাদের বড আরাধনার সামগ্রীকে অযত্ন করিও না, হেলায় যাহা হারাইয়াছি তাঁহাকে তোমার শান্তির ক্রোড হইতে বিচ্যুত করিও না, প্রাণ দিয়া যাঁহার সেবা করিতে পারি নাই, স্বর্গে তাঁহার সুখের সামগ্রীব অভাব থাকিতে দিও না" এই উত্তরীয় স্কন্ধে অশৌচ বেশে কৃচ্ছ্রসাধ্য শোক সাধনায় প্রাণ সমর্পণ করিয়া একবারও যদি তাঁহার মঙ্গল কামনায় প্রাণের সহিত ভগবানের নিকট ভিক্ষা করিতে পারি—সোমপ্রকাশ বঙ্গীয় সংবাদপত্রের লেখক পাঠক, সকলে মিলিয়া মরমের অশ্রু দয়ামায়ার চরণে উপহার দিতে পারি, তবেই আমাদের অশৌচ গ্রহণ সার্থক হয়, পিতৃকৃতের ফল ফলে, পিতৃঋণের কিয়ৎ পরিশোধ হয়।

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সংক্ষিপ্ত জীবনী। ১৫ ভাদ্র ১২৯৩। ৪১ সংখ্যা

পাঠক আমাদের দীনবেশ দর্শন করিয়া শোকেব ধ্বনি শ্রবণ করিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন আমরা আমাদের পরমারাধ্য পণ্ডিতবব দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণকে হারাইয়াছি। যিনি পৃথিবীর সহস্র গণনীয় ব্যক্তির জীবনী লিখিয়া বঙ্গবাসীর ইতিহাস জ্ঞান জন্মাইয়া দিয়াছেন, আজ আমাদিগকে তাঁহারই জীবনচরিত লিখিয়া, ইতিহাসের একটা প্রকাণ্ড শূন্যস্থান পূরণ করিতে হইতেছে। নদীর এককুল ভাঙ্গিয়া গিয়া আর এক কুল গঠিত হয়। কালের স্রোতে দেশ ও সমাজের যে অংশ ভগ্ন হইয়া যায়, তাহাতেই ইতিহাসের দিক ভরিয়া উঠে; সমাজ যাহাকে হারাইয়া হাহাকার করে ইতিহাস তাহাকে পাইয়া রত্নাভরণে বিভূষিত করে। আমরা আজ তন্মধ্যে একটী উজ্জ্বল ভূষণে ইতিহাসকে সজ্জিত করিবার প্রয়াস পাইতেছি। কিন্তু সংবাদ পত্রিকায় দুই চারিটী স্তম্ভ পূরণ করিয়া বিদ্যাভূষণের অমূল্য ভূষণ বর্ণনা করা যায় না। দুই চারি কথায় দ্বারকানাথের গুণগ্রাম শেষ করা যায় না। সে মহাত্মার জীবনী লিখিতে হইলে একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থের

আবশ্যক। আমরা আজ তাহা পাঠককে উপহার দিতে পারিলাম না। সংবাদপত্রে যতদূর সম্ভব উৎসুক শোকে কাতর পাঠকবর্গকে আমরা তাহাই আজ প্রদান করিতেছি।

১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে জেলা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী কলিকাতার পূর্ব্ব-দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতা নামক গ্রামে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ জন্মগ্রহণ করেন। দ্বারকানাথ দাক্ষিণাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ইঁহার পিতার নাম ৺হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন। হরচন্দ্র দাক্ষিণাত্য বৈদিক সমাজে একজন বিশিষ্ট স্মৃতিশাস্ত্রজ্ঞ ও বৈয়াকরণিক পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার তাদৃশ বিষয়সম্পত্তি ছিল না। কেবল পৌরোহিত্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ব্যবসায়ে তিনি জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় অতিশয় তেজস্বী ও স্বাধীনচেতা ব্যক্তি ছিলেন। সংসারে সহস্র ক্লেশ সহ্য করিয়াও তিনি কখন যজমানবর্গের দ্বারস্থ হইতেন না। ন্যায়রত্নের দুই পুত্র জ্যেষ্ঠ দ্বারকানাথ ও কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী। দ্বারকানাথ বাল্যকালে স্বীয় পিতার নিকট ব্যাকরণশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পণ্ডিত সর্ব্বানন্দ সার্ব্বভৌম দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত দ্বারকানাথের ব্যাকরণ শিক্ষক ছিলেন। ব্যাকরণ শিক্ষা-কালে সার্ব্বভৌম তাঁহার অধ্যবসায় দেখিয়া বলিয়াছিলেন "এই বালক কালে একজন দিকপাল পণ্ডিত হইবে" সার্ব্বভৌম "বালকে"র পঠদ্দশায় তাহার ক্রমোন্নতি দেখিয়া মরিতে পারিয়াছিলেন। দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহাকে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে নিযুক্ত করিয়া দেন। সেখানে ক্রমাগত দ্বাদশ বৎসরকাল ন্যায়, স্মৃতি, বেদান্ত, দর্শন, সাহিত্য, অলঙ্কার, কাব্য ও জ্যোতিষ শিক্ষা করিয়া তিনি অধ্যক্ষগণের বিশেষ প্রিয় হইয়া উঠেন। বাল্যকালে দ্বারকানাথ পিতাকে বড় ভয় করিতেন। সেজন্য অসৎসঙ্গে বা অসৎকার্য্যে যোগদান করিতে কখনই তিনি সাহসী হন নাই। যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই সুশিক্ষালাভ করিয়া যখন তাঁহার চরিত্র সংগঠিত হইতে লাগিল তখন অসৎসঙ্গ ও অসৎকার্য্যের প্রতি স্বভাবতই তাঁহার বড় বিদ্বেষ জন্মিয়া উঠিল। ভয়ে যাহার উৎপত্তি হইল, স্বভাবে তাহা প্রতিফলিত হইয়া ক্রমেই তাহার শিক্ষার পথে সহায়তা করিতে লাগিল। পল্লীগ্রামের যুবক সম্প্রদায় মধ্যে যেরূপ যথেচ্ছাচারিতার প্রাবাল্য ছিল তাহাতে সম্প্রদায় ভুক্ত হইলে কখনই দ্বারকানাথ সুশিক্ষা লাভ করিয়া পণ্ডিতবর্গের অগ্রণী হইতে পারিতেন না, দলভুক্ত সহযোগীদিগের মত তাঁহাকে জীবদ্দশায় আমোদ প্রমোদ, কুৎসিত চিন্তা কুৎসিত আলোচনা ও কুৎসিত কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকিয়া বৃদ্ধকালে যজমানের নিকট ভিক্ষালব্ধ আতপ তণ্ডুল সংগ্রহ করিয়া, কলিকাতার দধিহাটায় ফলাহার অন্বেষণে ঘুরিয়া ঘুরিয়া জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় দেখিতে হইত। দ্বারকানাথ প্রথম হইতেই পিতার ভয়ে কুসংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া সতর্ক হইয়াছিলেন। সেই অভ্যাসবশতঃ অদ্যাপিও অসৎ সংসর্গে তাঁহার দারুণ ঘৃণা ছিল। যাহাকে তিনি অসচ্চরিত্র বলিয়া জানিতেন নিতান্ত আত্মীয় হইলেও তাহার সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত রহিত করিতেন। ভদ্রতার খাতিরে অসৎ লোকের সম্মান করিতে

কখনই তাঁহাকে দেখা যায় নাই। এই কারণেই দেশের মধ্যে অনেকের সহিত ঘনিষ্ঠতা ছিল না। দ্বারকানাথ কখনও কাহাকে কটুকথা বলিতেন না কিন্তু যৌবনকাল তাঁহার সিংহের রাশ ছিল—অসৎ স্বভাবের লোকে সহসা তাঁহার নিকট অগ্রসর হইতে সাহসী হইত না।

দ্বাদশ বৎসর কাল সংস্কৃত শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া স্বীয় ধীশক্তির গুণে দ্বারকানাথ ক্রমেই শিক্ষক ও ছাত্রসমাজে মান্যগণ্য হইয়া উঠিলেন। তৎপরে কলেজের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা প্রবর্ত্তিত হয়। দ্বারকানাথ পরীক্ষিত ছাত্রগণের মধ্যে প্রথম ও প্রধান বৃত্তি পাইয়া বিদ্যাভূষণ পদবী লাভ করেন, সংস্কৃতের সহিত ইংরাজী ভাষা ক্রমেই কলেজের পাঠ্য হইয়া উঠিল। দ্বারকানাথ পুনরায় ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ করেন। অধ্যবসায় গুণে অধিক বয়সেও দ্বারকানাথ ইংরাজী বর্ণমালা শিখিতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে নিজের চেষ্টায় বেশ ইংরাজী ভাষা জ্ঞান লাভ করেন। সংস্কৃত কলেজে পাঠ সমাপ্ত করিয়া ইনি কিয়দ্দিবস ফোর্ট উইলিয়মে সিবিল সার্ব্বণ্টদিগের শিক্ষকতাকার্য্যে নিযুক্ত হন। পরে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপনা কার্য্যে থাকেন। শেষে বিদ্যাসাগর মহাশয়েব পরিবর্ত্তে কিয়দ্দিন সংস্কৃত প্রিন্সিপলের অর্থাৎ প্রধান অধ্যক্ষের কার্য্য করিয়া ১২৮০ সালে পেন্সন গ্রহণ করেন। কলেজের অধ্যাপনাকালে ইনি হিন্দু স্কুলেব কৈলাসচন্দ্র বসু নামক জনৈক শিক্ষকের সহিত স্বীয় সংস্কৃত শাস্ত্রজ্ঞতার বিনিময় করিয়া ইংরাজী শিক্ষা লাভ করিতেন।

সংস্কৃত কালেজের অধ্যাপনা কালেই "সোমপ্রকাশে"ব সৃষ্টি কল্পনা হয়। সারদা-প্রসাদ নামক জনৈক বধিব ছাত্রের ভরণপোষণ করিবার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ই প্রথমে এই পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা করেন। প্রস্তাব হয় যে বিদ্যাসাগব মহাশয় স্বয়ং এই পত্রিকাখানি লিখিবেন এবং সারদাপ্রসাদ তাহার সম্পাদক হইবেন, সাবদা-প্রসাদ তৎপরে বর্দ্ধমানের মহারাজার অধীনে একটী কর্ম্ম পাইয়া বর্দ্ধমানে গমন করেন। সঙ্গে সঙ্গে সোমপ্রকাশ প্রকাশের কল্পনাটিও পরিত্যক্ত হয়। এই সময়ে বঙ্গদেশে কেবল সংবাদ প্রভাকর ও সমাচার চন্দ্রিকা নামক দুইখানি সংবাদ পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছিল। তখন এই দুইখানি পত্রেরই অবস্থা অতি হীন ছিল। কোন রাজনৈতিক বিষয়ই উহাদের আলোচনাব বিষয় ছিল না। ধীর ভাবে কোন সামাজিক বা ধর্ম্ম নৈতিক প্রবন্ধ সংবাদ পত্রিকায় আলোচিত হইত না। কেবল কোন বিশিষ্ট লোকের নিন্দাবাদ, কোন সামাজিক কাণ্ডেব বহস্যবাদ ইহা লইয়া পত্র দুই খানি পূর্ণ করা হইত। শ্রীরামপুর হইতে খ্রীষ্টীয় মিসনরিগণ যে সকল সাময়িক পত্রাদি প্রচার করিতেন তাহাও কেবল খ্রীষ্টীয়ভাব পরিপূর্ণ। সুতরাং সংবাদপত্রের সৃষ্টি করা নিতান্ত প্রয়োজন বলিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় আবার "সোমপ্রকাশ" সৃজনের কল্পনা করিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় একদিন দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রমুখ আর কয়েকজন পণ্ডিতকে আহ্বান করিয়া "সোমপ্রকাশ" প্রকাশের প্রস্তাব করেন। সকলেই এই প্রস্তাবে সম্মত হন এবং

বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের হস্তে ইহার সম্পাদকীয় ভার অর্পণ করা হয়। কিয়দ্দিন সকলেই সোমপ্রকাশে প্রস্তাব লিখিয়া অবসর গ্রহণ করেন, ১৮৫৬ অব্দে সোমপ্রকাশ যখন প্রথম প্রচারিত হয় তখন কলিকাতার চাঁপাতলায় সোমপ্রকাশের মুদ্রাযন্ত্র ছিল। ১৮৬২ অব্দে মাতলা রেল খোলা হইলে বিদ্যাভূষণ সোমপ্রকাশ লইয়া স্বদেশে গেলেন।

এই সময় হইতেই তাঁহার আর একটী গুণেব পরিচয় পাওয়া গেল। বিদ্যাভূষণ কেবল যে বিদ্যার ভূষণে ভূষিত হইযাছিলেন তাহা নহে। স্বোপার্জ্জিত বিদ্যাধনে স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য এখন হইতে তাঁহাকে বিশেষ উদ্যোগী দেখা গেল। স্বদেশে আসিযাই তিনি হরিনাভি গ্রামে একটী উচ্চশ্রেণী; ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। বিদ্যালয়টী প্রথমে একটী সামান্য বাঙ্গালা বিদ্যালয ছিল। বিদ্যাভূষণ তাহার জীর্ণঅবয়ব সংস্কার করিযা ইংবাজি সংস্কৃত এণ্ট্রান্স বিদ্যালযে পরিণত করেন। এই পুরাতন বিদ্যালয়টী হইতে অনেক ছাত্র শিক্ষালাভ কবিযা এক্ষণে উপাধিধাবী খ্যাতি সম্পন্ন হইয়াছেন। পরলোকগত ৺রামনাথ সরস্বতীও এই বিদ্যালয়েব ছাত্র ছিলেন, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের পুর্ব্বে অনেকের হস্তে ইহার কর্ত্তৃত্ব ভার ন্যস্ত হয়, কিন্তু ইহার উন্নতি দেখাইতে এতাবৎকাল বিদ্যাভূষণের সমান কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অদ্যাপিও বিদ্যালযটী "বিদ্যাভূষণেব স্কুল" বলিযা খ্যাত।

বিদ্যালয়টি সংস্থাপন করিযা রাজপুবে একটী ডাকঘর স্থাপন করিবার জন্য বিদ্যাভূষণ উঠিয়া পডিযা চেষ্টা কবেন। কিছুদিনেব মধ্যেই সে চেষ্টায় সফল হইয়া বিদ্যাভূষণ স্বদেশবাসীর কৃতজ্ঞতা ভাজন হন। ইহাব পরই রাস্তাঘাট ও মিউনিসিপালিটীর দিকে তাঁহার দৃষ্টি পতিত হয। তখন রাজপুর হরিনাভি চাঙ্গডিপোতা ও তন্নিকটবর্ত্তী আবও কয়েকখানি গ্রাম সাউথ সুবার্ব্বন মিউনিসিপালিটীর অধীন ছিল। এতদঞ্চলেব অধিবাসীগণ মিউনিসিপালিটীতে যথেষ্ট পরিমাণে ট্যাক্স দিতেন কিন্তু তাঁহাদের একটী অভাবও মোচিত হইত না। দেশের ভিতর একটীও পাকা রাস্তা ছিল না। একস্থানেরও বন জঙ্গল কাটা হইত না। বিদ্যাভূষণ তৎকালীন হরিনাভি বিদ্যালয়ের শিক্ষক পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও বাবু উমেশচন্দ্র দত্তের সাহায্যে এদেশে একটী স্বতন্ত্র মিউনিসিপালিটী স্থাপন করিবাব চেষ্টা করেন। সোমপ্রকাশের জ্বলন্ত ভাষা এবং বিদ্যাভূষণের ক্রমাগত চেষ্টার গুণে ১৮৭৩ অব্দে রাজপুব মিউনিসিপালিটী নামে একটী স্বতন্ত্র মিউনিসিপালিটী স্থাপিত হয়। বিদ্যাভূষণ মিউনিসিপালিটীব কার্য্যগুলি তন্ন তন্ন করিয়া পবিদর্শন করিতেন এবং সময়ে সময়ে প্রশংসা উৎসাহ তিরস্কার ও ভর্ৎসনা বাক্যে কমিশনরগণকে তাহাদের কর্ত্তব্য বুঝাইয়া দিতেন। ইহাঁর আর একটী সৎকার্য্য—চাঙ্গড়িপোতার ষ্টেশন সংস্থাপন। দক্ষিণ পূর্ব্ব রেলওয়ে ডায়মণ্ডহারবার পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে বিদ্যাভূষণ হরিনাভি কোদালিয়া ও চাঙ্গডিপোতার অধিবাসিবর্গের সুবিধার জন্য চাঙ্গডিপোতায় একটী রেলওয়ে ষ্টেশন স্থাপিত করিবার জন্য চেষ্টা করেন।

তাঁহার ক্রমাগত চেষ্টায় নিকটে সোণারপুর ষ্টেশন থাকিতেও চাঙ্গড়িপোতায় আর একটী ষ্টেশন স্থাপিত হইয়াছে। গ্রামবাসীরা দ্বারকানাথকে দুইহস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছেন।

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের ন্যায় স্বদেশের হিতচিকীর্ষু ব্যক্তি বৈদিক ব্রাহ্মণসমাজে ও কলিকাতার দক্ষিণে আর একজনকেও দেখা যায় না। লোকের সহিত হিত চেষ্টাতেই তাঁহার সমস্ত দিন অতিবাহিত হইত। কিসে দেশের লোকে স্বচ্ছন্দে দুমুঠা খাইতে পায, কিসে তাহাদের অবস্থার উন্নতি হয়, বিদ্যাভূষণ নিয়তই তাহার চেষ্টা করিতেন। তিনি স্বকৃত উপার্জ্জনে কেবল যে স্বীয় দারিদ্র্য নিবারণ করিয়াছেন তাহা নহে। দেশের লোকেও তাঁহার নিকট যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছে। এতদঞ্চলে যে ব্যক্তি বড দরিদ্র বিদ্যাভূষণের কৃপায় তাহাকেও কখন, অন্নকষ্ট সহ্য করিতে হয় নাই। যে সকল বিষয় কার্য্যে লাভ নাই বরং দশটাকা ক্ষতি আছে বিদ্যাভূষণ তাহারই প্রবর্ত্তনা করিয়া এতদঞ্চলের ইতর দবিদ্র সম্প্রদায়কে চাকরি দিতেন। যদি কেহ বলিত এ ক্ষতিজনক ব্যাপারে প্রয়োজন কি? বিদ্যাভূষণ উত্তর করিতেন লাভ করা আমার উদ্দেশ্য নহে, দরিদ্র সম্প্রদায়কে কার্য্যপটু করা ও তাহাদের প্রতিপালন করাই আমার উদ্দেশ্য। দ্বারকানাথ আবার বড দয়ালু লোক ছিলেন। প্রকৃত দুরবস্থায় পড়িলে কেহই তাঁহার সাহায্যলাভে বঞ্চিত হইত না। ক্রিয়াকাণ্ড ব্রাহ্মণ ভোজনে অর্থশ্রাদ্ধ করিতে তাঁহার : প্রবৃত্তি ছিল না। ফলাহারপ্রিয় ব্রাহ্মণসমাজে সেই জন্য তাঁহার অপযশ হইয়াছিল।

বিদ্যাভূষণ মিতব্যয়ী পরিশ্রমী অধ্যবসায়শীল দৃঢ প্রতিজ্ঞ ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। কখনও কেহ তাঁহাকে মিথ্যা কথা কহিতে শুনে নাই অথবা কোন বিষয় গোপন করিতে দেখে নাই। তিনি সত্যপ্রিয়তার বড আদব করিতেন। মিথ্যাবাদীকে দুই চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। কপটতা তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। যাহার উপর তাঁহার মনোভঙ্গ হইত তিনি তাঁহার ভয়ানক শত্রু হইয়া দাঁডাইতেন। মিত্রস্থলে তিনি হৃদয় ঢালিয়া দিয়া ভাল বাসিতেন। স্বীয় পরিবার, দাসদাসী ও অধিকাংশ প্রতিবেশী-গণের নিকট ইনি বড়ই প্রিয় বস্তু ছিলেন। কেহ কখনও তাঁহার উপর বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হন নাই। তেজস্বীতা দ্বারকানাথের গুণগ্রামের শিরোভূষণ ছিল। তিনি স্বয়ং কখনও কাহারও আরাধনা করেন নাই। চাটুকার লোকের উপরও তাঁহার বিষদৃষ্টি ছিল। সমাজ সংস্কার ও স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনকার্য্যে তাঁহার চিরজীবন অতিবাহিত হইয়াছে। ইনি বৈদিক ব্রাহ্মণের কুলপ্রথানুসারে "পেটে পেটে সম্বন্ধ" রহিত করেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে বৈদিক সমাজে অনেকেই এখন শিশু সম্বন্ধ রহিত করিয়াছেন। ইঁহার স্বদেশ-বাৎসল্য এত প্রবল ছিল যে মৃত্যু শয্যায় শয়ন করিয়াও তিনি স্বদেশবাসীর উন্নতির চেষ্টা করিয়াছিলেন।

দ্বারকানাথের প্রধান কীর্ত্তি "সোমপ্রকাশ"। সোমপ্রকাশ বঙ্গবাসীর শিক্ষাগুরু বাঙ্গালা সংবাদপত্রের পিতা স্বরূপ। ইহাতেই প্রথমে বঙ্গবাসীকে রাজনীতি শিক্ষা ও রাজনৈতিক আন্দোলনের রুচি জন্মাইয়া দেয়। মার্জ্জিত রুচির সহিত সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে "সোমপ্রকাশই" প্রথম শিক্ষা দিয়াছে। সোমপ্রকাশের জলন্ত লেখনীর অগ্রে শ্বেতাঙ্গদিগের অত্যাচার প্রবৃত্তি পুড়িয়া গিয়াছে। বঙ্গবাসীর কি অভাব, কি প্রার্থনা এবং বাঙ্গালীর প্রতি গবর্ণমেন্টের কর্ত্তব্য কি সোমপ্রকাশ প্রথমে তাহা গবর্ণমেণ্টকে বুঝাইয়া দিয়াছেন. যে সকল পুরাতন কথা লইয়া গবর্ণমেণ্টকে আমরা এখন চাপিয়া ধরিতেছি সোমপ্রকাশের স্তম্ভেই পূর্ব্বে তাহার সূচনা ও প্রস্তাবনা করা হয়। সোমপ্রকাশ বঙ্গভাষার সংস্কারকর্ত্তা। পূর্ব্বের সাহেবি বাঙ্গালা, মৈথিলি বাঙ্গালা ভাঙ্গিয়াচুরিয়া সোমপ্রকাশই আধুনিক বিশুদ্ধ বঙ্গভাষার সংস্কার করিয়াছেন। বিদ্যাভূষণ ও তাঁহার পরম বন্ধু বিদ্যাসাগর যদি জন্মগ্রহণ না করিতেন, বঙ্গভাষার বর্ত্তমান উন্নতি আরও একশত বৎসর দূরে গিয়া পড়িত। ইঁহার প্রণীত একখানি গ্রীস ও রোমের ইতিহাস আছে। বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীর পাঠের জন্য ইঁহার প্রণীত তিনখানি "নীতিসার" গ্রন্থ বর্ত্তমান রহিয়াছে। তদ্ভিন্ন বিদ্যাভূষণ একখানি ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। ১৮৮৫ অব্দ হইতে চাঙ্গড়িপোতা হইতে কল্পদ্রুম নামক একখানি মাসিক পত্র বাহির হয়। ৬ বৎসর কাল কল্পদ্রুমের সম্পাদকের কার্য্য করিয়া বিদ্যাভূষণ পীড়িত হন এবং কল্পদ্রুম বন্ধ করিয়া কাশীধাম যাত্রা করেন, সেখান হইতে কাশীর অবস্থা বর্ণনা করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি কবিতা লিখিয়া বিশ্বেশ্বর বিলাপ নামে একখানি খণ্ড কাব্য প্রকাশ করেন ১২৮৯ ও '৯০ সালে তাহার প্রণীত "উপদেশ মালা" প্রচারিত হয়। তিনি সম্প্রতি মূলটীকা ও ব্যাখ্যা সহিত সাংখ্যদর্শন প্রকাশ করিয়াছিলেন। লেখাটী সম্পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে।

বিদ্যাভূষণ বহুদিন হইতে বহুমূত্র রোগে ক্লেশ পাইতেছিলেন। তাঁহার স্বাস্থ্যও ভগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল। জলবায়ু পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত কয়েক বৎসর ধরিয়া তিনি মুঙ্গের প্রভৃতি নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে গত কার্ত্তিক মাসে জব্বলপুর ডিষ্ট্রীক্টে সাতনা নামক স্থানে গমন করেন। সেখানে তাঁহার সদাশয়তা গুণে তিনি সাতনাবাসী সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। সাতনাতে বায়ু পরিবর্ত্তন করিতে গিয়া তিনি সেখানে একটী বিদ্যালয়ের সংস্কার করেন। একটী নাইট স্কুল স্থাপন করেন। সাতনা মিউনিসিপালিটীর বিলক্ষণ উন্নতি সাধন করেন। সাতনায় শবদাহ স্থান নির্ম্মাণ জন্যও তিনি বিলক্ষণ উদ্যোগী হইয়াছিলেন। দেশের উন্নতিপক্ষে তিনি এত চিন্তা করিতেন যে মৃত্যুশয্যায় বিকারগ্রস্ত হইয়া কেবল ভারতের উন্নতি ও দেশের লোকের উন্নতি লইয়াই প্রলাপ বকিয়াছিলেন, মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বে তিনি কিছুদিন স্বাস্থ্যলাভ করিয়াছিলেন। সহসা তাঁহার গ্রীবাদেশে একটী বৃহৎ

কারবঙ্কল হয়। তথাকার রাজবাটীর প্রধান ডাক্তার গোলডস্মিথ সাহেব এক পয়সাও গ্রহণ না করিয়া তাঁহার চিকিৎসা করেন। সেখানকার পোলিটীকাল এজেণ্ট এবং স্থানীয় ভদ্রমণ্ডলীর সকলেই তাঁহাকে আরোগ্য করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হন। কিন্তু কারবঙ্কল আরোগ্য করা শিবের অসাধ্য। গত ৭ই ভাদ্র রবিবার প্রাতঃকালে গোলডস্মিথ সাহেব অতি সতর্কতার সহিত কারবঙ্কল কাটিয়া দেন—তারপর নাড়ীতে জ্বর আসে। সেই জ্বরেই সোমবার বেলা দুই প্রহর ৫ মিনিটের সময় ৬৭ বৎসর বয়সে স্বীয় পরিবারবর্গ ও সমস্ত সাতনাবাসীকে কাঁদাইয়া তিনি ইহজগৎ পরিত্যাগ করিয়া যান।

কর্পূর যেন উবিয়া গেল,—তাঁহার তেজস্বী লেখনী পরিত্যাগ করিয়া গেল সূর্য্যের কিরণভাতি দেখিতে দেখিতেই নিবিয়া গেল, হতভাগ্য বঙ্গবাসী কাঁদিবার জন্য পড়িয়া রহিল। সোমপ্রকাশের পিতা স্বর্গগমন করিলেন। পাঠক! যাহা হারাইয়াছি তাহা ত আর পাইব না, যেমনটী গিয়াছে তেমনটী ত আর হইবে না। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া কেবল আমরা এক একটী রত্ন হারাইতেছি। কোন শূন্য স্থান পরিপুর্ণ হইয়াছে তাহা আমরা জানি না? যাহা দাও এমনি করিয়া কি তাহা কাড়িয়া লইতে হয়? এত দিনে সোমপ্রকাশ পিতৃশোক অবগত হইল!!!

স্বর্গগামী পণ্ডিত ৺দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ। ১৬ ভাদ্র ১২৯৩। ৪১ সংখ্যা

প্রাপ্ত

আমাদের কোন সহৃদয় পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন,—"পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ আর এই সংসারে নেই" এই শোকসমাচারে সমস্ত বঙ্গদেশ আজ গভীর শোকসাগরে নিমগ্ন হইবেন। সোমপ্রকাশের পাঠকগণ শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে অবিরল অশ্রুধারা বরিষণ করিবেন। ভারতমাতার একজন বরপুত্র আজ মাতৃক্রোড় শূন্য করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। বঙ্গীয় সংবাদপত্রের শিরোভূষণ "সোমপ্রকাশ" এতদ্দিনে অনাথ হইল! দ্বারকানাথ যন্ত্রণাময় দারুণ সংসার পরিত্যাগ করিয়া চিরদিনের জন্য শান্তিদেবীর ক্রোড়ে আশ্রয় লইলেন। পাঠক! আজি যে অসংখ্য বাঙ্গালা সংবাদপত্র পাঠ করিয়া কত সামাজিক, রাজনৈতিক বিষয় সকলে অবগত হইতেছেন—বঙ্গের গৃহে গৃহে নগরে নগরে সংবাদপত্রের বহুল প্রচার দেখিতেছেন—ইহার প্রবর্ত্তক পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ। আজি ত্রিংশতাধিক বর্ষ ধরিয়া কত সহস্র বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া জ্বলন্ত উৎসাহে ও অশঙ্কিত চিত্তে যেরূপ দক্ষতার সহিত সোমপ্রকাশের সম্পাদকতা কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন তাহার তুলনা দুর্লভ। বঙ্গমাতার আর একটী অমূল্য রত্ন দারুণ কালে গ্রাস করিল,—পাঠক! যে মহাত্মা দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া অবিশ্রান্তভাবে আপনাকে বিবিধ বিষয়

শিক্ষা দিলেন, অত্যাচারপীড়িত বঙ্গের অসহায় সন্তানকে ঘোর অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য লেখনী ধারণ করিলেন। নীলকর প্রপীড়িত নির্ব্বোধ অশিক্ষিত কৃষকদিগকে সাহায্য করিবার জন্য প্রাণপণ যত্ন করিলেন। তাঁহার শোক প্রকাশের জন্য আপনারা কি বিন্দুমাত্র অশ্রুজল ফেলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন? যিনি বঙ্গদেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য দেহ মন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। যাঁহার লেখনী সময়ে সময়ে অগ্নিরাশি উদ্গিরণ করিয়া নীলকরদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিল, রাজাকে সতর্ক করিয়াছিল, প্রজাকে কর্ত্তব্যশীল করিয়াছিল, সেই দ্বারকানাথ আজ আমাদিগকে কাঁদাইয়া বঙ্গদেশ আঁধার করিয়া ভারত জননীকে পুত্রহীন করিয়া বঙ্গভাষাকে অনাথ করিয়া অনন্তধামে যাত্রা করিলেন। আইস আমরা সকলে মিলিয়া তাঁহার নাম বঙ্গসমাজে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখি। সংসারের রোগ শোক তুচ্ছ করিয়া সংসারের চিন্তা সকল পদদলিত করিয়া দ্বারকানাথ সেইখানে গিয়াছেন যেখানে সংসারের নিন্দা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না, কিন্তু আমাদের প্রাণের বেদনা, হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা বায়ুরূপে স্বর্গে গিয়া চিরদিনই তাঁহার চরণতল পুজা করিতে পারিবে।

রাজপুর, হরিনাভি, কোদালিয়া চাঙ্গড়িপোতা প্রভৃতি গ্রামবাসী কৃতবিদ্য যুবকগণ! আপনারা এই যে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল হইতেছেন দশ মুখে আপনাদের যে যশোগান করিতেছে ইহার জন্য কি আপনারা মৃত মহাত্মা পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নিকট কিয়ৎপরিমাণে কি ঋণী নহেন? এই যে রাজপুর মিউনিসিপালিটীর অন্তর্গত উচ্চশ্রেণীর ইংরাজি বিদ্যালয় হইতে বর্ষে বর্ষে কত বালক বহির্গত হইয়া জ্ঞানোপার্জ্জনে রত হইতেছেন ইহারা কি তাঁহার গৌরবের পতাকা স্বরূপ হইবে না? রাজপুর নিবাসী অতি অল্পলোকেই আছেন যাঁহারা জ্ঞান লাভের নিমিত্ত কিছু পরিমাণে এই মহাত্মার নিকট ঋণপাশে আবদ্ধ নহেন। এতদঞ্চলের যুবকগণকে সুশিক্ষা দিবার জন্য বহু আয়াস স্বীকার করিয়া নিজ অর্থ অকাতরে ব্যয় করিয়া বিদ্যাভূষণ এই যে বর্ত্তমান ইংরাজি বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া গিয়াছেন ইহা কি স্বর্গীয় মহাত্মার মণিময় কীর্ত্তিস্তম্ভ বলিয়া পরিগণিত হইবে না।

বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মৃত্যুতে হরিনাভি স্কুল একদিবস বন্ধ হইয়াছিল। বিদ্যালয়ের বালকগণ দশ দিবসের জন্য শোক চিহ্ন স্বরূপ কাল ফিতা ধারণ করিয়াছে। কিন্তু আমরা ইহাও যথেষ্ট হইল এইরূপ বিবেচনা করি না। তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ, এই প্রাচীন সোমপ্রকাশ সংবাদপত্রখানির স্থায়িত্ব বিধানের জন্য তাঁহার নিকট উপকৃত বঙ্গবাসী মাত্রেরই ইহার গ্রাহক হওয়া কর্ত্তব্য। ছাত্রদিগের জন্য এই পত্রিকার মূল্য ডাকমাসুল সমেত ৩॥০ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। বঙ্গের স্কুল সমূহের ছাত্র ও শিক্ষকগণ সকলে আসুন এই প্রাচীন পত্রিকার গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়া তাঁহার কীর্ত্তি অক্ষয় করিয়া রাখিবার চেষ্টা করি যেরূপ দুঃসহ শোক ভারে আমাদের হৃদয় অবনত হইয়াছে

তাহা এই সামান্য লেখনীতে প্রকাশিত হইবার নহে। আমাদের এই শোক রোদনের অতীত। আজ বঙ্গের যে নির্ম্মলচন্দ্র নিদারুণ রাহু আসিয়া গ্রাস করিল শত বর্ষেও বঙ্গের আকাশে তাহা পুনরুদিত হইত কিনা সন্দেহ। রাজপুর নিবাসী ভদ্রমণ্ডলী আজ আপনারা যে অমূল্য নিধি হইতে বঞ্চিত হইলেন শত রাজ্য বিনিময়েও তাহা পুনঃপ্রাপ্ত হইতে পরিবেন না। আপনারা সকলে অকপট হৃদয়ে মৃত মহাত্মার স্মৃতিচিহ্ন রক্ষা করুন।

আপনারা স্বদেশ বৎসল অনাথপালক বঙ্গসন্তানের জন্য রোদন করিতে শিখিয়াছেন। কখনই উপকার লাভ করিয়া কৃতঘ্ন হইতে পারিবেন না। পণ্ডিতপ্রবর দ্বারকানাথের বিয়োগে গত বারের সোমপ্রকাশ শোক চিহ্ন ধারণ করিতে পারে নাই ইহার কারণ বোধ হয় পত্রিকা বাহির হইবার পরে মৃত্যুসংবাদ পৌঁছিয়াছিল। আশা করি আগামীবারে সোমপ্রকাশ পিতৃবিয়োগের যথারীতি শোক চিহ্ন ধারণ করিয়া সামাজিকতা রক্ষা করিবেন।

উপসংহারে রাজপুর মিউনিসিপালিটীর করদাতৃগণ আপনাদের নিকট এই শেষ ভিক্ষা আপনারা সকলে মুক্তহস্ত হইয়া যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য করিয়া সেই স্বর্গারূঢ় মহাত্মার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টীর নিমিত্ত একটী স্বতন্ত্র বাটী নির্ম্মাণ করিয়া দ্বারকানাথের নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখুন। তাহা হইলে সমস্ত বঙ্গদেশ ব্যাপিয়া আপনাদের যশোরাশি বিঘোষিত হইবে। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের শোকচিহ্ন প্রকাশ জন্য সংস্কৃত কলেজ একদিবস বন্ধ হইয়াছিল।

বিদ্যাভূষণ স্মরণে। ২৯ ভাদ্র ১২৯৩। ৪৩ সংখ্যা

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের পরলোক গমনে আজ বঙ্গবাসী শোকে অভিভূত। আমাদের সহযোগিগণ তাঁহার গুণগ্রাম কীর্ত্তন করিয়া কাতর হইতেছেন, আমাদের আত্মীয় বান্ধব আমাদিগের সান্ত্বনা করিতেছেন, সোমপ্রকাশের গ্রাহক ও পাঠকগণ নিতান্ত শোকাকুল হইয়া পত্র লিখিতেছেন কোন কোন যথার্থ হৃদয়বান ব্যক্তি আত্মপ্রীতির জন্য জ্ঞাতি সম্পর্ক না থাকিলেও দ্বারকানাথকে জনক সদৃশ জ্ঞান করিয়া অশৌচ গ্রহণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ ভোজনাদি করাইয়া সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন। আজ আমরা সমগ্র বঙ্গবাসীর নিকট সান্ত্বনা পাইয়া পিতৃদেবের অশেষ গুণগ্রামের কথা শ্রবণ করিয়া বুঝিতে পারিতেছি বাঙ্গালীর সহৃদয়তা আছে। কনিষ্ঠ ভ্রাতা সহযোগিগণের সকলেরই চক্ষে অশ্রু দেখিলাম, কনিষ্ঠতম বঙ্গবাসী দৈনিকের মুখেও দুঃখের কথা শুনিলাম কিন্তু বালক বঙ্গবাসী ও দৈনিকের দুঃখের কথায় কেমন একটা ভঙ্গিমা আছে। হিন্দুপরিবারের ভিতর আজ কাল অগ্রজের উপর অনুজের কেমন একটা ঈর্ষ্যাদ্বেষ থাকে সেটুকুও বর্ত্তমান আছে। বঙ্গবাসী ও দৈনিক সোমপ্রকাশের

অধঃপতন হইয়াছে বলিয়া সাধারণ্যে সোমপ্রকাশের অপযশ কীর্ত্তন করিয়াছেন। ইহার কারণ কি? নিজের অহঙ্কার প্রকাশ ইহার উদ্দেশ্য কি? সহযোগিগণের পসার বৃদ্ধি করিবার জন্য সোমপ্রকাশের পাঠকগণকে উত্তেজিত করা। যখন সোমপ্রকাশ উত্তরীয় স্কন্ধে করিয়া সহযোগিগণের নিকট উপস্থিত "বঙ্গবাসী" তখন ঢাক বাজাইয়া লোক সমাজে প্রকাশ করিয়াছেন "সোমপ্রকাশের অধঃপতন হইয়াছে" সোমপ্রকাশের হিন্দুয়ানী নাই—ইচ্ছা সোমপ্রকাশের গ্রাহক চটিয়া গিয়া হিন্দুয়ানীর "শালগাছ" দৈনিক ও বঙ্গবাসীর আশ্রয় গ্রহণ করুন। সোমপ্রকাশ এখন হিন্দু কি অহিন্দু সোমপ্রকাশের পাঠক তাহা জানেন। এতদিন সোমপ্রকাশেরই প্রসাদে হিন্দুয়ানী শিক্ষা করিয়া সহযোগিগণ লেখনী ধরিতে শিখিয়াছেন, এখন ঈর্ষ্যাবশত সেই সোমপ্রকাশের উপরেই আক্রমণ করিয়া মনুষ্যত্বের পরিচয় দিতেছেন। সহযোগিগণ যাহাই বলুন সোমপ্রকাশ—পাঠকের নিকট কখনই অহিন্দু বলিয়া নিন্দিত হন নাই। সোমপ্রকাশে এমন কথা, এমন ভাব এ পর্য্যন্ত কখনই প্রকাশিত হয় নাই যাহাতে হিন্দুয়ানীর ব্যাঘাত জন্মিতে পারে না। সোমপ্রকাশ হিন্দু, কিন্তু গোঁড়ামির ধার ধারে না। সহযোগীরা হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু সমাজের ভিতরে সাপ বেঙ যাহাই থাকুক সকল বিষয়েই যেমন উন্নতিভাব ও উৎকৃষ্ট নীতি দেখিয়া থাকেন, তাহা দেখিতে পারেন না, কুলী মজুর, দোকানদার ভুনোওয়ালা, আর অশিক্ষিত গ্রাহকমণ্ডলীর নিকট তাঁহারা যেমন ধর্ম্মের বাগাড়ম্বর দেখাইয়া বাহবা লইয়া থাকেন—সোমপ্রকাশ সেরূপ করিতে সমর্থ নহে। সংস্কারই সোমপ্রকাশের চিরব্রত। সমাজ বল, ধর্ম্ম বল, রাজনীতি বল, সোমপ্রকাশের জন্ম হইতেই তাহাদের সংস্কার সাধনে ধৃতব্রত হইয়াছেন। সমাজ ও ধর্ম্মের যেখানে দোষ সোমপ্রকাশ নির্ভীক চিত্তে তাহা সাধারণ্যে প্রকাশ করিয়া থাকেন। সহযোগিদের ন্যায় অর্থলালসার বশবর্ত্তী হইয়া কেবল কতকগুলি লোকের মনে যোগাইবার মন্ত্রতন্ত্র "সোমপ্রকাশ" কখনই শিক্ষা করেন নাই। সোমপ্রকাশের পিতৃদেব ৺দ্বারকানাথ এই সংস্কারের বীজমন্ত্র আমাদের কর্ণে প্রদান করিয়া গিয়াছেন। সেই বীজমন্ত্র লইয়াই আমাদের সাধনা। সহযোগিগণের বঙ্গদেশের শত্রুর ন্যায় বঙ্গবাসীর চিরপোষিত কুসংস্কার ও কদাচারগুলির প্রশংসা করিয়া থাকেন সোমপ্রকাশ যথার্থ মিত্রের কার্য্য করিয়া বঙ্গবাসীর দোষগুলি চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দেন। সহযোগিগণ অর্থলালসায় পাগল হইয়া সংবাদপত্রের পবিত্র ব্রত ব্যবসাকারে পরিণত করিয়াছেন সোমপ্রকাশ পরোপকার ব্রত মস্তকে ধরিয়া কেবল নিস্বার্থভাবে লোকশিক্ষা দিবার জন্যই জীবনধারণ করিতেছেন। সোমপ্রকাশের ব্রতের সহিত "বঙ্গবাসী" ও "দৈনিকে"র ব্রতের এত প্রভেদ। সুতরাং আজ হিন্দুয়ানীর গুপ্তশত্রু সহযোগিগণ যে কৃতঘ্ন হইয়া আমাদের শত্রুতা করিতে আসিবেন তাহার কিছু বিচিত্রতা নাই। আমরা সহযোগিদিগের এরূপ ধৃষ্টতায় ক্ষুণ্ণ হই নাই। দিমু কাসারির মন যোগাইয়া অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত যাঁহাদের সৃষ্টি তাঁহাদের চেষ্টায় সোমপ্রকাশের প্রতিষ্ঠিত গৌরবের বিন্দুমাত্রও হ্রাস হইতে

পারে না। তবে সহযোগিগণ আমাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তাঁহাদিগকে আমরা স্নেহ করিয়া থাকি। তাঁহারা বিপথগামী হইলে আমাদিগকে দুইটা কথা বলিতে হয়। বিশেষতঃ পিতার মৃত্যুর পর যে সন্তান উচ্ছৃঙ্খল হয়, অগ্রজকে পিতৃস্থানীয় হইয়া তাহাকে শিক্ষা দিতে হয়। "বঙ্গবাসী" বা "দৈনিক" আমাদের দুইটা মানের কথা বলিলে অথবা আমাদের অনিষ্ট চেষ্টায় চেষ্টিত হইলে ছোট ভাই বলিয়া তাহা আমাদের গায়ে সহিতে হয়, কিন্তু অনিষ্ট চেষ্টায় ব্যাঘাত দেওয়াও আবশ্যক। এই দুই কারণে এই প্রস্তাবের অবতরণা।

বিদ্যাভূষণ স্মরণে। ৫ আশ্বিন। ৪৪ সংখ্যা

"সোমপ্রকাশ" আজি কেন প্রভাহীন ?
নাহিক সে বেশ হেরি যে মলিন ?
জ্যোতি তব কেন আজ রহিয়াছে ঢাকা ?
কলেবর দেখ যেন শোকদুঃখ মাখা ?
দীন বেশ দেখি বিদরে হৃদয়।
অমঙ্গল চিহ্নে, মনে হয় ভয়।
বুঝি সর্ব্বনাশ হয়েছে তোমার।
আভা বুঝি নিবে গিয়েছে বিদ্যার।
যাঁর করে দীপ্ত, এ "সোমপ্রকাশ".
করেছেন তিনি স্বরগে আবাস।
তাই হাহাকার বঙ্গের মাঝারে।
শুনি শোকধ্বনি, প্রতি দ্বারে দ্বারে।
কোথা গেলে আজ, হা বিদ্যাভূষণ,
শ্রীদ্বারকানাথ, বঙ্গের রতন!
পিতার বিরহে, যত পুত্রগণ।
ক্রন্দন ধ্বনিতে ফাটায় গগন।
ফুকারিয়া কাঁদে কাতর অন্তরে।
হৃদি বহি অশ্রু ঝর ঝর ঝরে।
কাঁদে বঙ্গবাসী, বিদেশী যাহারা।
হারায়ে ভূষণ, শোকে হয়ে সারা।
বঙ্গের বান্ধব, ছিলেন যে জন।
তাঁর তরে কেবা না করে ক্রন্দন ?

প্রকাশিত যতনে এ "সোমপ্রকাশ"।
বঙ্গের আঁধার করেছেন নাশ।
রাজনীতি পুর্ণ জ্বলন্ত বচনে।
উপদেশ দিয়া রাজার শ্রবণে।
ধর্ম্মনীতি শিক্ষা করি বিতরণ।
হরিয়া যতেক যুবকের মন ?
সমাজ নীতির সুব্যবস্থা করি
উপদেশ রত্ন কেবল বিতরি।
হতভাগ্য দুঃখী বাঙ্গালীর হয়ে,
কে আর কাঁদিবে ব্যথিত হৃদয়ে ?
হে বিদ্যাভূষণ দয়ার সাগর
সাহসী নির্ভীক, বহুগুণাকর,
সত্যবাদী বিজ্ঞ, বঙ্গের গৌরব।
এমন কি আর—হইবে উদ্ভব ?
মনে হয় যবে সে সৌম্য মুরতি।
তেজস্বিতা পুর্ণ মধুর প্রকৃতি।
চিন্তাশীল ধৃতি ক্ষমার আধার।
অন্তর যাঁহার দয়ার ভাণ্ডার।
কেন না কাঁদিব, আজি তাঁর তরে,
পারি না যে শোক রাখিবারে ধরে।
স্বদেশ হিতৈষি! ঋণী তব কাছে।
কৃতজ্ঞতাবদ্ধ, বল কেনা আছে ?
তোমা হতে বঙ্গে শ্রীবৃদ্ধি সাধন।
সুমার্জ্জিত সাধুভাষা আলোচন।
বিস্মৃত কে হবে এই উপকার।
তাই তোমা লাগি করি হাহাকার।
উপদেশ পুর্ণ শ্রীমুখের বাণী।
তব ছাত্রবৃন্দে করিতে সুজ্ঞানী।
বিদ্যা জ্ঞান ধর্ম্ম, বিলায়ে ভারতে।
সুকীর্ত্তির স্তম্ভ স্থাপিলে জগতে।
এস ভ্রাতা সব পিতার লাগিয়া,
কাঁদি আজি সবে একত্র বসিয়া।

নিবাতে কি পারে সেই শোকানল।
যতই ঢালি না কেন অশ্রুজল।
পিতার শোকেতে আকুল হৃদয়।
দশদিন যেন শূন্য বোধ হয়।
এ জনমে তাঁয় হেরিব কি আর?
ঘুচিবে এ হৃদয়ে শোকের ভার?
দেবাত্মা তাঁহার স্বর্গের উপরে
নর অমরেতে গুণ গান করে।
বঙ্গে যতদিন এ ভাষা রহিবে।
তাঁর কীর্ত্তি কভু কেহ না ভুলিবে।
আর ভবে ভাই করো না রোদন।
বাঁধ হৃদি করি শোক সম্বরণ।
কর তাঁর তরে বিভু আরাধনা
অক্ষয় স্বরগ করহ কামনা।
শ্রদ্ধাবান হয়ে, শ্রদ্ধা তাঁর কর।
ব্রাহ্মণ দবিদ্রে আহার বিতর।
এই পথে গতি সকলের হবে।
এ ভব ভবনে কেহ নাহি রবে।
রাখ তার নাম ওহে ভ্রাতৃগণ।
মুছি অশ্রুধারা করি প্রাণপণ।
যদি কাঁদ কর এ শরীর ক্ষয়।
গত পিতৃদেব ফিবিবার নয়।

বশম্বদ
শ্রীগোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায
(চাঁচল বড়তরফ)।

গোলকধামে ৺দ্বারকানাথের অভ্যর্থনা। ৫ আশ্বিন ১২৯৩। ৪৭ সংখ্যা

এস মা কল্পনে কহ দয়া করি মোরে
কেন বা খুলি না আজি স্বরগের দ্বার
সুমধুর রবে? কেন শুনি আজি এত
কোলাহল অমর আলয়ে? অকস্মাৎ।

কহিতে লাগিলা দেবী স্নেহ ভরে তবে
মধুর ছন্দেতে দাসে, নিম্নোক্ত প্রকারে।
"জান না কি বাছা? ভারতমাতার কন্যা
বঙ্গভূমি নাম, তাহার প্রাণের পুত্র
সর্ব্বগুণে গুণী, বিদ্যাই ভূষণ যার
ছিল একমাত্র, বৈদিক কুলভূষণ—
সপ্ত ষষ্টি বর্ষ পূর্ব্বে লভিলা জনম,
দাক্ষিণাত্য দ্বিজ হরচন্দ্রের ভবনে।
তেঁহ এবে, সংসারের ধূলা খেলা করি
(মাতৃক্রোড়ে শিশু শান্তি লভয়ে যেমতি)
বিশ্রাম লভিতে গেলা বিশ্বমাতা কোলে।
(ভবের যন্ত্রণা যেথা জুড়ায় মানব)
তাই সে ত্রিদিব দ্বারে এত কোলাহল,
তাই সে খুলিছে আজি অমর দুয়ার।
দেবগণ সাজাইছে হিরণ্ময় দ্বারি—
(হীরক খচিত যাহা) নানা ফল ফুলে,
রাখিছে হীরক ঘট সুধা পুরিপুরি
দ্বারপাশে স্বর্গীয় কদলী তরু সহ।
আপনি গোলকপতি দাঁড়াইয়া দ্বারে
পার্শ্বে প্রিয়পুত্র তাঁর (মম সহোদর)
বাল্মীকি, ভারত, আর কবি কালিদাস,
মনুর পরাশর আর আচার্য্য শঙ্কর
দাঁড়াইয়া তার পাশে জ্ঞানী বৈজ্ঞানিক;
কবি দার্শনিক নাম কব আর কত
সারি দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মাঝে শোভে
আর মম প্রিয় পুত্র কবিবর মধু।
অমর অক্ষয় আর মধুচক্রকার
হোমর মিল্টন আদি বৈদেশিক কার
শোভিছে অপর দিকে দিক উজলিয়া:
নিমাই, নানক আর রাজর্ষি জনক,
ঈশা মুসা বুদ্ধদেব আদি মহাজন
ত্রস্তভাবে ভ্রমিছেন ত্রিদিব দুয়ারে।

ভারতের বীরপুত্র প্রবল প্রতাপ,
কুরুকুল ধ্বংসকারী পাণ্ডব কেশরী
অজেয় যুদ্ধেতে যত রাজপুতবলী
বীরবেশে বিলম্বিছে স্বর্গ মার্গপাশে।
সীতাসতী দময়ন্তী দ্রুপদ দুহিতা
আর ভারতের যত পুণ্যবতী সতী,
মাঙ্গলিক দ্রব্য লয়ে অপেক্ষিছে তারা
বরিতে বিদ্যাভূষণ বিশিষ্ট প্রকারে।"
অপূর্ব্ব রথারোহণে হেনকালে তথা
উতরিলা ভারতের বরপুত্র আসি,
মহাকোলাহল এবে উঠিল গগনে
বাজিল মঙ্গলবাদ্য শঙ্খ ঘণ্টা আদি,
তুরি ভেরি আর যত মঙ্গল বাজনা,
হুলুধ্বনি পড়ি গেল সতী দল মাঝে,
বীরদল দাঁড়াইলা নতশির করি।
আপনি অমরপতি বাহু প্রসারিয়া
দিলা কোল সুধিবরে, স্নেহের অন্তরে
চুম্বি শির আশীসিলা তারে "এস বাছা,
স্নেহের পুতলি মম থাক চির দিন
এ অমরপুরে, লভ চির শান্তি হেথা,
ভুলি পাপ সংসারের মায়া মোহ যত
আলিঙ্গন দিলা আসি সুধী শ্রেষ্ঠ যত
কোলাকুলি পড়ি গেল ধর্ম্মপুত্র দলে।
বিবিধ ভূষণে, দিলা দেবগণ আসি
সাজাইয়া বধুবরে পুণ্যবতী যত
আপনি গোলকপতি মাল্য পরাইলা,
শোভিল বিদ্যাভূষণ স্বর্গীয় ভূষণে

হরিনাভি } বিনীত
শ্রীশ্রীশচন্দ্র রায়।

'সোমপ্রকাশ' প্রসঙ্গে বিজ্ঞাপন। ১২ই আশ্বিন ১২৯৩। ৪৫ সংখ্যা

বিশেষ দ্রষ্টব্য

স্বর্গীয় পিতৃদেবের আদরের ধন এই সোমপ্রকাশ সংবাদপত্রখানির দীর্ঘ জীবন ও উন্নতি কামনায় নিম্নলিখিত মহোদয়গণের হস্তে অর্পণ করিলাম, সোমপ্রকাশ গুরুদেবের অনুবর্ত্তী হইয়া নির্ভীকচিত্তে লোকসমাজে বিচরণ করিবে। পাঠক, গ্রাহক, অনুগ্রাহক সকলেরই আমরা মুখাপেক্ষী।

ট্রষ্টি

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
রায় কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
পেন্সনর (ছোট আদালতের জজ)
বাবু বিপ্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
গবর্ণমেণ্টের প্লিডার।
বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত বি. এ.
প্রফেসর সিটি কলেজ।

লেখক

শ্রী বাবু রামলাল চক্রবর্ত্তী
প্লিডার আলীপুর।

সাময়িক লেখক

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এম এ.
বাবু ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
পেন্সনর (বেঙ্গল একাউনটেণ্ট)

সোমপ্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি পত্র, টাকা কড়ি, মণি অর্ডার আদি যেরূপ চাঙ্গাড়িপোতা সোমপ্রকাশ কার্য্যালয়ে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে গ্রাহক মহোদয়গণ পাঠাইতেছেন সেই রূপ পাঠাইবেন। অতঃপর সোমপ্রকাশ সম্বন্ধে চিঠিপত্র বা টাকা কড়ি মণি অর্ডার যোগে গ্রাহক মহোদয়গণ আর কাহারও নামে পাঠাইবেন না অথবা কার্য্যালয়ের কোন কর্ম্মচারীর নামে সোমপ্রকাশের মুল্য প্রেরণ করিবেন না। অপর নামে পাঠাইলে অধিকারীর হস্তগত না হওয়া সম্ভব। গ্রাহকগণের সে বিষয়ে যেন দৃষ্টি থাকে। ইহার পুর্ব্বে যদি কোন গ্রাহক আমাদিগের কার্য্যালয়ের কোন কর্ম্মচারীর নামে মণি অর্ডার যোগে টাকা পাঠাইয়া থাকেন এবং পুর্ব্বে পুর্ব্বমূল্য প্রাপ্তিতে প্রকাশ না দেখিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া আমাকে রসিদ আদি প্রমাণ করিয়া অনুগৃহীত করিবেন।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার শর্ম্মণঃ
সোমপ্রকাশ অধ্যক্ষস্য।

বিদ্যাভূষণ স্মরণে। ২১ অগ্রহায়ণ ১২৯৩। ৫৫ সংখ্যা

রূপচাঁদ পক্ষী বিরচিত

বঙ্গদেশের সুরসিক ও প্রসিদ্ধ গায়ক বাবু রূপচাঁদ দাস (পক্ষী) বহুদিন হইতে পীড়িত ছিলেন বলিয়া উপযুক্ত সময়ে নিম্নলিখিত এই গীতটী প্রকাশ করিতে পারেন নাই। সময় অতীত হইলেও গীতটীর মাধুর্য্য হ্রাস হয় নাই বলিয়া প্রকাশিত হইল।

রাগিণী জয় জয়ন্তি । তাল ঝাঁপতাল

সোমপ্রকাশ তাতঃ
পণ্ডিত দ্বারকানাথ,
বিদ্যাভূষণ রতনমণি ।
তাঁর মৃত্যু শুনি,
চক্ষে বহে পানি,
চলে না লেখনী,
লিখিতে জীবনী ॥

বারশত তিরানব্বুই সালে,
১৬ই ভাদ্রের সোমপ্রকাশ খুলে,
পাঠন করিয়ে ভাসি নয়ন জলে,
মানবলীলা ত্যজিলেন দ্বারকানাথ
মনের বিরাগে চাহি দশদিকে ।
একি বিনামেঘে হল বজ্রাঘাত ,
ওহো কিরূপে সহিব তাঁহার বিরহ,
ত্যজিলেন ভৌতিক অনিত্য দেহ,
সুরপুরে গেলেন পণ্ডিত বিগ্রহ,
ত্যজি পাপ তাপ ভরা মেদিনী ॥

কলিকাতার পুর্ব্বদক্ষিণে মোকাম,
চব্বিশ পরগণা চাঙ্গড়িপোতা গ্রাম,
দাক্ষিণাত্য বৈদিক হরচন্দ্র নাম,
ন্যায়রত্ন দ্বারকানাথের পিতা ,
সুদিনে সুক্ষণে, অমুল্য রতনে,
প্রসব করিলেন তাঁহার মাতা ,
হরচন্দ্র বাসে দ্বারকা বল্লভ,
বারশত ছাব্বিশে হ'লেন আবির্ভাব,
শুক্ল কলা নিধি সম সে শৈশব,
কলায় কলায় বৃদ্ধি পুর্ণ নিশা মণি ॥
সর্ব্বানন্দ সার্ব্বভৌম বিদ্যমানে,
দ্বাদশ বৎসর ছিলেন অধ্যয়নে,

বহুবিদ্যা শিক্ষা করি গুরু স্থানে,
বিয়াল্লিশ সালেতে কলিকাতায় আসি,
কিঞ্চিৎ দিন ব্যজে, সংস্কৃত কলেজে,
দ্বাদশ বৎসর শিক্ষা করেন গুণরাশি,
ন্যায়, স্মৃতি, বেদান্ত, সাহিত্য, দর্শন,
অলঙ্কার কাব্যাদ্দি করিয়ে পঠন,
পান ছাত্রবৃত্তি উপাধি বিদ্যাভূষণ,
হ'ন ফোর্ট উইলিয়ম সিভিলের শিক্ষক শিরোমণি ॥

বিদ্যাসাগর ল'তে অবসর,
সে পদ সম্পদ পেলেন পণ্ডিত বর,
বারশত আশীর পর, পেন্‌সনে নির্ভর,
চাঙ্গড়িপোতায় সুখে করেন বাস ,
ক'রে বহুশ্রম লেখেন কল্পদ্রুম,
তাঁর জীবনের ধন সোমপ্রকাশ,
হরিনাভি গ্রামে উক্ত মহাশয়,
উচ্চ শিক্ষার এণ্ট্রান্স করেন বিদ্যালয়,
বিদ্যাভূষণ স্কুল সাধারণে কয়,
স জীবতি কীর্ত্তি মাঝে এ ধরণী ॥

খৃষ্ট অষ্টাদশ তিরাশি অব্দেতে,
চাঙ্গড়িপোতায় ষ্টেশন তাঁর লেখনীতে,
মিউনিসিপালিটী তাঁহার চেষ্টাতে,
সাদরে আদরে হয় নির্ব্বাহ ,
দুঃখী দরিদ্রের, ঘৃণা নাহি ক'রে সমাদরে দিতেন উৎসাহ ,
বাঙ্গালা ভাষার বাড়ালেন আদর,
বিদ্যাভূষণ বিদ্যার সাগর,
যুগে যুগে গুণ গা'বে নারীনর,
হ'ল স্বদেশে বিদেশে বিদ্যার নিছনি ॥

হয় নাই হবার নয় এমন ক্ষমতা,
বৈদিক শ্রেণী বিপ্রের ঘুচালেন কুপ্রথা,

গর্ভে থাকৃতে সন্তান সন্ততির পিতা,
বিবাহের করিতেন সম্বন্ধ ;
বিদ্যাবুদ্ধি বলে, সমাজে কৌশলে,
পূর্ব্ব রীতিনীতি করিলেন বন্ধ ;
যাহে আর্য্য ধর্ম্মে মতি রাখে যুবাগণ,
সে জন্য ভবনে হরি সভা স্থাপন
সাম্বৎরিক উৎসবে হয় সঙ্কীর্ত্তন ,
সপ্তাহ ২ হয় রবি শনি ॥

তিন খানি গ্রন্থ নাম নীতিসার
মুলটীকা সাংখ্য দর্শন তাঁহার,
কাশী ধামে গ্রন্থ রচেন আব আর
বিশ্বেশ্বর বিলাপ উপদেশ মালা,
প্রথম তৃতীয় ভাগ, তাহাতে সুখ্যাতি সুবে বাঙ্গালা ,
সনাম পুরুষ পণ্ডিত আখারী স্বোপার্জ্জিত,
কিঞ্চিৎ আছে জমিদারী,
তিন পুত্র মাত্র সর্ব্ব অধিকারী,
সাধ্বী সতী লক্ষ্মী তাঁহার ঘরণী ॥

স্বদেশ হিতৈষী পর হিতে ব্রতী,
পরিশ্রমে অসুস্থ হলেন মহামতি,
কিছুদিন করিয়ে কলিকাতায় বসতি,
ডাক্তারে তাঁহারে আদেশ দিলেন ;
বায়ু পরিবর্ত্তন, করিয়ে এখন,
ভ্রমিলে থাকিবে কুশলে ,
জব্বলপুর ডিষ্ট্রীক্ট সাতনায় করে বাস,
একাদিক্রমেতে একাদশ মাস ;
নাইট্‌ স্কুল তথায় করিলেন প্রকাশ,
শ্রমজীবী ভাবী দুঃখ বিমোচনী ॥

দারা পুত্র কন্যা ল'য়ে সমিভারে,
মহানন্দে ছিলেন সাতনায় বাস করে,

গ্রীবায় কার্বঙ্কল ব্যাধি হ'ল পরে,
ভাদ্র মাসে হন শয্যাগত ,
টেলিগ্রামে পত্র, পাইয়ে মধ্যম পুত্র,
তথায় গিয়ে হন উপনীত,
গোল্ডস্মিথ বাজ বাটীর ডাক্তারে,
সাতই ভাদ্র দেন অস্ত্র ক'রে, দিবা দ্বিপ্রহরে,
সোমের বাসরে,
সোমপ্রকাশ তাত ত্যজিলেন অবনী ॥

সাতষট্টি বৎসর পূর্ণ বয়ঃক্রমে
ইহলোক ত্যজে গেলেন দিব্য ধামে,
সুরপুরে সুখ ভুঞ্জেন সম্ভ্রমে
সর্ব্বসাধারণের এই বাঞ্ছা মনে ,
ইহলোকের সুখ অবশ্য লভযে সুধীজনে ,
উপেন্দ্র, ভূপেন্দ্র, নৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী,
তিনপুত্র তাঁব সভ্য ভব্য অতি
পিতার অনুরূপ হ'ক রীতি নীতি,
যশে পুরুক ক্ষিতি, কহে খগমণি ॥

২৪ পরগনার দক্ষিণে চাংড়িপোতা গ্রামে (বর্তমানে সুভাষগ্রাম) দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বাড়ি।
এখান থেকে 'সোমপ্রকাশ' প্রকাশিত হত।

পরিশিষ্ট ১

সংবাদ প্রভাকর ১৮৫৫-৫৬

২৮ বৈশাখ ১২৬১। ১০ মে ১৮৫৫

বিধবাবিবাহ

বর্ত্তমান সময়ে যখন হিন্দু বিধবাদিগেব বিবাহ বিষযক প্রস্তাব বাহুল্যরূপে আন্দোলন হইতেছে তখন কোন বিধবার গর্ভস্রাব, অথবা তদ্গর্ভজাত কোন সন্তান-সন্ততি সঙ্গোপনে বাজপথে নিক্ষিপ্ত হইলে বিবেচকদিগের অন্তঃকরণে অসীম দুঃখের সঞ্চার হয় এবং ঐ ঘটনা বিধবাবিবাহের কর্ত্তব্যতা বিষযে সম্পূর্ণ পোষকতা করে, অতএব আমরা গত সোমবার রজনীযোগে আমাদিগের যন্ত্রালযের সম্মুখে বাজপথেব উপর যাহা দর্শন কবিয়াছি তাহার সংক্ষেপ বিবরণ নিম্নভাগে লিখিলাম।

আমরা সন্ধ্যার পরে শ্রবণ কবিলাম যে একটি সদ্যঃপ্রসূত কন্যা রাজপথে নিক্ষিপ্ত হইযাছে এবং সে ক্রন্দন করিতেছে, আমরা শ্রুতমাত্র তথায উপস্থিত হইযা দেখিলাম, ঐ কন্যা এক ধূলাব উপরে শযন কবিযা আছে তাহার নাডিচ্ছেদও হয় নাই শবীরে বক্তচিহ্ন বহিযাছে, একজন দয়াবান যবন তাহাকে দুগ্ধপান করাইতেছে, আমরা তৎক্ষণাৎ পুলিশ প্রহরীকে নিকটস্থ সারজন সাহেবের নিকট পাঠাইলাম, কিন্তু প্রায দুই ঘণ্টার পবে সে সাহেব ও জমাদার প্রভৃতিকে সঙ্গে লইযা প্রত্যাগত হইল, সাহেব কন্যাকে দেখিযা নিস্তব্ধে ক্ষণকাল চিত্র পুত্তলিকাব ন্যায় দণ্ডাযমান থাকিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন পবে বহু বিলম্বে সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আদেশ লইয়া আসিয়া জমাদার ঐ কন্যাকে মেডিকেল কলেজে লইযা গিয়াছে, আমরা সাবজন সাহেবের বিবেচনায আশ্চর্য্য হইয়াছি, ঐ মেডিকেল কলেজে পাঠাইতে তাঁহার সাধ্য হইল না, তিনি উচ্চপদস্থ কর্ম্মচাবির অনুমতি অপেক্ষা করিলেন, কি আশ্চয্য। ঐ সময়ের মধ্যে কন্যাব প্রাণ বিযোগ হইলে কে তাহার দাযী হইত। ঐ কন্যা ভদ্রকুলোদ্ভবা বিধবার গর্ভজাত তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই, পুলিশেব লোকেরা এরূপ ঘোষণা করিয়াছে যে, যে তাহাব জননী ও জন্মদাতার নির্দ্দেশ করিতে পাবিবেক তাহাকে ১০০ টাকা পারিতোষিক দিবেন।

বিধবাদিগের বিবাহের নিয়ম থাকিলে এরূপ ঘটনা কদাচ হইতে পারে না, আহা। অন্ধকারে যদ্যপি কোন গাডী ঐ সদ্যপ্রসূত কন্যার উপর দিয়া যাইত, তবে তৎক্ষণাৎ সে বিনষ্ট হইত, আহা যে কুল-কলঙ্কিনী এই কার্য্য কবিযাছে তাহার অসাধ্য কোন কার্য্যই বোধ হয় না।

আমরা যে বিষয়ে লিখিলাম এ বঙ্গদেশের ব্যভিচারিণীদিগের দ্বারা এইরূপ কত শত ঘটনা হইতেছে তাহার সংখ্যা হয় না, ইহাতেও হিন্দুমণ্ডলী বিধবাবিবাহে সম্মত হয়েন না, কি চমৎকার! আমরা অবগত হইলাম যে মেডিকেল কলেজের চিকিৎসকেরা নাড়িচ্ছেদ করিয়া ঐ কন্যাকে উত্তমাবস্থায় রাখিয়াছেন, একজন দাই নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন এবং সে বিলক্ষণ সুস্থ আছে।

৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৬২। ১৭ মে ১৮৫৫

বিধবাবিবাহ

আমাদিগের সংবাদ প্রভাকর পত্রের প্রথমাবস্থায় আদি হিতৈষি বন্ধুর পত্র প্রাপ্ত হইয়া অতি সমাদর পুর্ব্বক নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম, পাঠক মহাশয়েরা মনোযোগ পুরঃসর পাঠ করিবেন।

"সম্পাদক মহাশয়! বর্ত্তমান শকের প্রথম বৈশাখ দিবসীয় প্রভাকর পত্রে বিধবাবিবাহোপলক্ষে যেরূপ গদ্য পদ্য ও সৎসন্দর্ভ এবং সদ্যুক্তি যাহা করিয়াছেন তাহা অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ আদি নানা দেশে সল্লোক বদনে আপনকার যশঃ কীর্ত্তনে ও বাল্য বিধবাদিগের আশীর্ব্বচনে মনে কি পর্য্যন্ত হর্ষযুক্ত হইয়াছি তাহা পঞ্চাশৎ বর্ণে বর্ণনাতীত। দ্বিতীয় পতিহীনা ললনাদিগের নিমিত্ত বুধগণের সমীপে করুণাসহ ব্যবস্থা প্রার্থনা করিয়াছেন, সে রচনার তুলনা নাই, ইহাতে গুণাকর দয়াময়দিগের যদ্যপি দয়া না হয় তবে জানিলাম দয়ার গয়া হইয়াছে।

হে প্রিয়ঙ্কর প্রভাকর সম্পাদক মহাশয়। আপনকার নববর্ষের নব দিবসের বালিকা বিধবার দুঃখ পাঠকালীন এক অতি সমীচীন প্রকরণ আমার মনের মধ্যে স্মরণ হইল, এ কারণ অনাথিনীদিগের সাপক্ষ সজ্জন বান্ধবগণের বিদিতার্থ এবং সাধারণের উপকারার্থ লিখিতে বাধ্য হইলাম। বিগত বর্ষের বৈশাখীয় নবম দিবসে এতদ্দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণমন্ত শ্রীমন্ত রাজা রাধাকান্ত দেব মহোদয় আপন পৌত্রের শুভোদ্বাহ অতি সমারোহ পুর্ব্বক দিয়াছেন তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন, উক্ত উদ্বাহোপলক্ষে অনেক দিগ্‌দেশীয় অধ্যাপকগণের রাজভবনে শুভাগমন হইলে রাজা বুধগণের সমক্ষে প্রশ্ন করিলেন, "কুশণ্ডিকা ও সপ্তপদী গমন দ্বিজগণের ভিন্ন কি অন্য বর্ণের নাই" পণ্ডিতেরা কহিলেন "শাস্ত্রকর্ত্তারা চতুর্বর্ণের প্রতি সংপুর্ণরূপে বিধি দিয়াছেন কুশণ্ডিকা অবশ্য কর্ত্তব্য, এবং সপ্তপদী গমন ভিন্ন কন্যা পতি গোত্রে প্রবিষ্টা হইতে পারে না। মহাগুরু নিপাত হইলে উক্ত কন্যার হস্তে অন্ন ভোজন নিষিদ্ধ। পর গোত্রে যাঁহাদিগের অন্নগ্রহণ নাই তাঁহারা যদ্যপি এতাদৃশ্য কন্যার করে অন্নগ্রহণ করেন তবে তাঁহাদিগের ব্রত ভঙ্গ হইবে।" এ কথা শুনিয়া রাজসভায় বিষয়িলোক মাত্রে সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন "তবে

পুরুষানুক্রমে শূদ্র জাতির পরিণয় সিদ্ধ নহে" এতচ্ছ্রবনে পণ্ডিত মহাশয়েরা উত্তর করিলেন "বিবাহ অসিদ্ধ বলিতে পারি না, কিন্তু ইহার মহৎ কারণ দৃষ্ট হইতেছে, এ দেশের প্রচলিত কুপ্রথায় শূদ্রের প্রধান সংস্কার কুশণ্ডিকা তাহাই লোপ হইয়াছে, যেহেতু শাস্ত্রে অষ্ট প্রকার বিবাহ দেখিতেছি, যথা ব্রাহ্ম্য, দৈব, আর্য্য গান্ধর্ব্ব, প্রাজাপত্য, আসুর, রাক্ষস, পৈশাচ ইত্যাদি বিবাহ বিধি যখন বিধিকর্ত্তারা লিখিয়াছেন তখন পিতৃদত্তা কন্যা গ্রহণে বিবাহ সুসিদ্ধ হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাস্তি, তত্রাপি সে গৌণ কল্প, কারণ কুশণ্ডিকা ব্যতিরেকে যে বিবাহ তাহার মুখ্য কল্পাভাগ মানিতে হইবে।" এতাদৃশ তর্কবিতর্ক সমাপনান্তর রাজা কুশণ্ডিকার পদ্ধতি প্রার্থনা করিবায় শ্যামপুকুর নিবাসী রাজগুরু অগ্নিহোত্রী শ্রীনবকুমার তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য ও প্রভাকরের পরম্ হিতকারী সিমুলিয়াস্থ শ্রীমান গঙ্গাধর তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য এই দুই মহাশয় প্রসিদ্ধ প্রখ্যাত ব্যবসায়ি অধ্যাপক, ইহারা যজুর্ব্বেদী কুশণ্ডিকার পদ্ধতি প্রস্তুত করিয়া দেন, সেই পদ্ধতির বিধি বিধান ক্রমে রাজা মহাশয় পৌত্রের পাণিগ্রহণে কুশণ্ডিকা করিয়াছেন। গ্রামীণ পক্ষপাত বিহীন গ্রন্থকর্ত্তাদিগের এতাদৃশ্য হিতকর ব্যবস্থা একাল পর্য্যন্ত গোপন থাকায় শূদ্রদিগের প্রধান সংস্কার বিবাহ তাহার মূল দূষণাবহ রহিল। রাজ কর্ত্তৃক এই মহদ্ব্যবস্থা রাষ্ট্র হওয়ায় ভদ্রসমাজে স্থানে স্থানে কয়েকজন কুশণ্ডিকা করিয়াছেন। কালে কায়স্থ কুলে কুশণ্ডিকা প্রচলিত হইবার উপক্রম দেখিতেছি। গৌড় মণ্ডলে বল্লালী ব্রাহ্মণের দল আদৌ বালিকা বিধবা কুলের কাহার কুশণ্ডিকা হয় নাই তাহার মহৎ প্রতিবন্ধক টাকা, আধুনিক কাল্পনিক কৌলীন্য অভিমানী ইহারা পণ গণ বরাভরণ লইয়া প্রথম কেবল শূদ্রের মতো গোটাকয়েক মন্ত্র পড়িয়া যান। কুশণ্ডিকা গর্ভাধান প্রভৃতির বাবসবাব বুঝিয়া পান তবে কালান্তে আসিয়া কুশণ্ডিকা ও পুনর্বিবাহ করেন, ইতিমধ্যে যদি চিতাশয্যা হয় তবেই বালিকাকে কুলে বন্ধনে ফুল করিয়া গেলেন।

এইক্ষণে সম্পাদক মহাশয় বিবেচনা করিয়া দেখুন, সম্যককুলের অক্ষতযোনি বালা বিধবাকুলের কাহার কুশণ্ডিকা হয় নাই, বিশেষতঃ শূদ্র জাতির এ বিধায় কুশণ্ডিকা বিহীন বিধবারা পিতৃগোত্রে আছে, অনন্তর পতি মরণানন্তর তাহার গোত্রান্তর হয় নাই, অতএব স্বতন্ত্র পাত্রে বিধি পুর্ব্বক পাত্রান্তর করা অবশ্য বিধেয়। এমন সুলভ ব্যবস্থা যখন শাস্ত্র মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তখন আর সঙ্কোচের বিষয় কি? পণ্ডিত মহাশয়েরা আপনাপন মহত্ত্ব প্রকাশ করিয়া অবীরার নিমিত্ত যদি সাহায্য প্রদান করেন, বড়ই ভাল নচেৎ পুর্ব্বরীতি মত বালিকা অনাথিনীদিগের বিবাহ দিয়া কুশণ্ডিকা প্রভৃতি মুখ্য কল্প করিলে সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র সংস্কার হইবেক, বাল বিধবাদিগের পুর্ব্বে যে উদ্বাহ হইয়াছিল সে অসিদ্ধ গৌণ কল্প, নিন্দাবাদ মাত্র। এ প্রযুক্ত অবীরাদিগের মধ্যে দুই শ্রেণীভুক্ত দেখিতেছি। যাহারদিগের কুশণ্ডিকা ও সপ্তপদী গমন প্রভৃতি

হইয়াছে তাহারা স্বাধীনা। অবশিষ্ট যাহারদিগের প্রধান কল্প কুশণ্ডিকা হয় নাই তাহারা পিতৃ গোত্রে আছে। এইস্থলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি নিবেদন ইহার সূক্ষ্ম বিবেচনা করিয়া ভিন্ন ব্যবস্থা প্রকাশ না করিলে বিরোধীদিগের নিরস্ত করিতে পারি না এবং চিরকালের নিষিদ্ধ কর্ম্মের সম্প্রদানের মন্ত্রের বড় গোল উঠিয়াছে, অতএব বিধবাবিবাহের পদ্ধতি না পাইলে কোন্ মন্ত্রে কন্যা সম্প্রদান করিব ইহার বিধি আজ্ঞা হয়, অলমতি বিস্তরেণ।

শ্রীস. দ. শিরোমণি।

৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৬২। ১৮ মে ১৮৫৫

শিক্ষক গুরুচরণ দত্ত

শ্রীযুত বাবু গুরুচরণ দত্ত শিক্ষাদান বিষয়ে যেরূপ সুযোগ্য ও সুনিপুণ তাহা অনেকেই অবগত আছেন, তিনি যখন ওরিএন্টল সেমিনরি বিদ্যালয়ে ছিলেন তখন তথাকার বহু ছাত্র তাঁহার নিকট পাঠ্য পুস্তকের ভাবঅর্থ ও অভিপ্রায় ইত্যাদি বিষয়ে উত্তম উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া পরম সন্তুষ্ট ছিলেন, পরে কোন কারণ বশতঃ গুরুচরণ বাবু উক্ত বিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত হইয়া হেয়ার একাডিমি স্বতন্ত্র বিদ্যামন্দির সংস্থাপন করিলে ওরিয়েণ্টাল সেমিনরি হইতে অনেক ছাত্র তথায় গমন করিয়াছিলেন, গুরুচরণ বাবু উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া অতুল পরিশ্রম স্বীকার পুর্ব্বক উপদেশ প্রদান করাতে অল্পদিনের মধ্যে হেয়ার একাডিমিতে প্রায় ৪০০ ছাত্র হইয়াছিল, পরন্তু বহুবাজার নিবাসী গুণরাশি স্বদেশহিত তৎপর বদান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র দত্ত প্রভৃতি কতিপয় বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ সংস্থাপন করিলে তাহার সহিত হেয়ার একাডিমির সংযোগ হয়, এবং ঐ নূতন কালেজের কর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয়েরা অতি সুবিবেচনা পুর্ব্বক বাবু গুরুচরণ দত্তকে সহকারি সম্পাদকের পদে অভিষিক্ত করেন, গুরুচরণ বাবু কালেজের উন্নতি বর্দ্ধনার্থ অল্প পরিশ্রম করেন নাই।

অপরন্তু হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজের যে শাখা বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয় তাহার অবস্থা উত্তম না হওয়াতে কালেজের কর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয়েরা গুরুচরণ বাবুকে তাহার অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করিয়াছেন এবং তিনি যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে তথাকার শিক্ষাকার্য্য নির্ব্বাহ করাতে ঐ শাখা বিদ্যালয়ের ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে। গুরুচরণ বাবু যখন তাহাতে সংযুক্ত হয়েন তখন ৩০।৪০ জন ছাত্র ছিল, এইক্ষণে শতাধিক হইয়াছে, এবং দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। হিন্দু মেট্রোপলিটান কালেজের সুযোগ্য প্রোফেসর কাপ্তেন রিচার্ডসন ও কাপ্তেন পামর এবং ডবলিউ. কার্ক পেট্রিক প্রভৃতি বিখ্যাত বিদ্বান্ লোক সকল এই শাখা বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগ্যে পরীক্ষাদি করেন, বিশেষতঃ আরো এক নূতন নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে শাখা

বিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ উপযুক্ত ছাত্রগণ প্রতি বৎসর বিনা বেতনে মেট্রোপলিটান কালেজে নিযুক্ত হইবেন। এই শাখা বিদ্যালয় দ্বারা কোন ব্যক্তি লভ্য করিবার মানস করেন না, যাঁহারা বহু ব্যয় স্বীকার পুর্ব্বক সন্তানদিগকে শিক্ষা প্রদানে অক্ষম তাঁহারদিগের মঙ্গলোদ্দেশেই ঐ বিদ্যামন্দির স্থাপিত হইয়াছে, মেট্রোপলিটান কালেজের কর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয়ের তাহার উন্নতি সাধন নিমিত্ত যথেষ্ট অনুরাগ প্রকাশ করিতেছেন, তথায় প্রত্যেক ছাত্রের মাসিক বেতন এক টাকা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, অতএব যাঁহারা অল্পব্যয়ে সন্তানদিগকে উত্তম শিক্ষা প্রদানের মানস করেন তাঁহারা শোভাবাজারের রাস্তার পুর্ব্ব ভাগে শ্রীযুত বাবু জয়চন্দ্র মিত্র মহাশয়ের গলির বাম ভাগে মেট্রোপলিটান কালেজের শাখা বিদ্যালয়ে তাঁহারদিগকে প্রেরণ করিবেন।

৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৬২। ১৯ মে ১৮৫৫

বাংলার যুবক

বর্ত্তমান সময়ে এই বঙ্গরাজ্যের যুবক সম্প্রদায় যেরূপ অবস্থা ও স্বভাব প্রাপ্ত হইতেছেন, তাহাতে বোধ হয় যে অল্প কালের মধ্যে দেশীয় প্রচলিত রীতিনীতির অনেক পরিবর্ত্তন হইবেক এবং বিলাতীয় বিজাতীয় প্রণালী ও প্রথা এবং দোষের আধিক্য হইয়া উঠিবেক। মনুষ্য একে নব নব দর্শন ও নব নব সম্ভোগ ও সমস্ত নবীন বিষয়ে অধিক যত্নশীল, তাহাতে আবার একদল এমত বিদেশীয় লোকের প্রতি এ দেশের রাজকার্য্যের ভার অর্পিত হইয়াছে যে তাঁহারদিগের সহিত প্রজাপুঞ্জের আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, রীতি ইত্যাদি কোন বিষয়েই ঐক্য হয় না, বিশেষতঃ যবনাদি জাতি যেরূপ অন্য জাতির সহিত একত্র ভোজন ও সারল্য ব্যবহার ও অন্য ধর্ম্মাবলম্বিকে স্বীয় ধর্ম্মে গ্রহণ করিতে বিষমতর বিদ্বেষভাব ধারণ করে, ইংরাজদিগের তাদৃশ কিছুই নাই। অপিচ ইংরাজেরা এ দেশের অধীশ্বর হওয়াতে সকলেই স্বীয় স্বীয় সন্তানদিগকে শৈশবকালাবধি ইংরাজী বিদ্যার উপদেশ প্রদান করাতে অনেকে সেই শিক্ষা প্রভাবে ও সাহেব শিক্ষকগণের সহবাসে এবং উপদেশক্রমে সর্ব্ব বিষয়েই সাহেবি স্বভাব এবং সাহেবি ব্যবহার প্রাপ্ত হইতেছে, সুতরাং স্বজাতীয় প্রথা পুঞ্জের প্রতি তাহারদিগের তাদৃশ শ্রদ্ধা নাই। পুর্ব্বতন লোকেরা যে সকল কার্য্যকে অতি হীন ও ঘৃণিত এবং পাপজনক বোধ করিতেন, ভ্রমেও যাহার অনুষ্ঠান করিতেন না, অধুনাতন ব্যক্তিগণ সেই সকল কার্য্যকে অবশ্য কর্তব্য ও পরম সুখদায়ক এবং তদনুষ্ঠানে পরম পুরুষার্থ বিবেচনা করিতেছেন।

জাতীয় প্রচলিত রীতিনীতি ও ধর্ম্মের প্রতি যুবকদলের অবিশ্বাসের স্রোতঃ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া তাহাতে ভয়ানক তরঙ্গরাশি উত্থিত হইয়াছে। হিন্দুজাতির রীতিনীতি ও ধর্ম্ম বহুকালের বর্দ্ধিত ও গিরি মুল প্রস্তরের ন্যায় দৃঢ় কৃত, একারণ ঐ তরঙ্গ দ্বারা

এ পর্য্যন্ত তাহার সমুলোৎপাটিত হয় নাই পুনঃ পুনঃ আঘাতে স্রোতের হীনবলই অবধারণ হইতেছে, হিন্দু জাতি যদ্যপি ত্রির্ব্বৎ প্রভৃতি পর্ব্বতবাসি লোকদিগের ন্যায় অসভ্য ও অশিক্ষিত হইত তবে তাহারদিগের শাস্ত্রাদি কিছুই থাকিত না, অর্থাৎ তাহা অদৃঢ় বর্দ্ধিত বালুকার ন্যায় হইলে ঐ প্রবল তরঙ্গে এতদিনে সমুলে নির্ম্মূল হইত।

পরন্তু হিন্দু যুবকদিগের আধুনিক মত পরিবর্ত্তনের বিশেষ কারণ উদ্দেশে অনেকে অনেক কথার আন্দোলন করেন, কেহ বলেন যে বিদ্যারূপ ভানু কিরণে তাঁহারদিগের অন্তঃকরণস্থ অজ্ঞান তিমির বিনষ্ট হওয়াতে অনৃত বিষয়ে অবিশ্বাস জন্মিয়াছে, কেবল ধর্ম্মের দোহাই দিয়া এ দেশের শাস্ত্রকার ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা আপনারদিগের লভ্য সাধন ও প্রভৃত্ব স্থাপন নিমিত্ত যে সকল অযৌক্তিক প্রথা ও রীতিনীতি এবং পূজা যাগাদি প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন তাহা কত কাল থাকিবেক। এইক্ষণকার লোকেরা কার্য্যমাত্রেরই কারণ জানিতে ইচ্ছা করেন এবং সেই কারণের আবার অভিপ্রায় বিবেচনা করেন, অন্যায় অভিপ্রায় জনিত অকারণ কার্য্যের প্রতি কেন বিশ্বাস করিবেন? অনুশীলন প্রভাবে এইক্ষণে অনেকে ন্যায়দর্শি হইয়াছেন। যেমন সূর্য্যের কিরণে চক্ষের সমক্ষে কোন বস্তুর রূপ গোপন থাকে না, সেই প্রকার ন্যায়দর্শিগণের নিকট অন্যায় বিষয় অবশ্য প্রকাশ হয়।

আবাব কেহ কেহ বলেন যে কালেজ প্রভৃতি বিদ্যালযে যাঁহারা অনুশীলন করিয়াছেনা, তাঁহারদিগের মধ্যে অত্যল্প ব্যক্তি যথার্থ বিদ্বান্ বলিয়া বাচ্য হইয়াছেন। এমত ব্যক্তি অনেক দেখা যায় যাঁহাবা কালেজে উত্তম ছাত্র ছিলেন কিন্তু তথা হইতে বহিষ্কৃত হইয়া আর পুস্তকের সহিত সাক্ষাৎ না করাতে যাহা শিখিয়াছিলেন তাহাও আহার করিয়া বসিয়াছেন, অতএব বিদ্যা প্রভাবে এই মত পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হয় নাই, মা সরস্বতীর সহিত যাঁহারদিগের লাঠালাঠি সম্বন্ধ এবং যাঁহারা অল্প শিক্ষা দ্বারা কেবল বিদ্যানের ভান করিয়া বেডান তাঁহারদিগের অধিকাংশ যখন দেশীয় রীতিনীতি ও ধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা ও তাহার নিন্দা করেন তখন এই মত পরিবর্ত্তন বিদ্যাজনিত বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না, আর ঐ যুবকদল যদ্যপি বিদ্বান হইতেন তবে তাঁহারদিগের পরস্পর একতা ও প্রতিজ্ঞা দৃঢ়তা এবং বিশ্বাসের স্থিরতা থাকিত, তাঁহারদিগের মুখেই ব্রহ্মজ্ঞান, মুখেই সৎকার্য্যের প্রতি অনুরাগ, মুখেই বিধবার বিবাহ প্রদান এবং মুখেই কুলীনের বহুবিবাহ নিবারণ করেন, কিন্তু কার্য্যে কিছুই নাই। আধুনিক যুবকদিগের মতের কিছুই স্থিরতা দেখা যায় না, এবং দেশীয় কোন প্রকার প্রথা পরিবর্ত্তন করিতেও সাহস নাই, শুদ্ধ মুখভারতীতে কি হইতে পারে? তাঁহারা যৎকিঞ্চিৎ ইংরাজী শিক্ষা করিয়া ইংরাজ জাতির গুণভাগ গ্রহণ করিতে না পারিয়া কেবল দোষভাগ গ্রহণ করিয়াছেন, সাহেবি ধরণ, সাহেবি কথা, সাহেবি মেজাজ পাইয়াছেন, সাহেবি আহার, বিহার, পরিচ্ছদ ভালবাসেন, কিন্তু সাহেবি বিদ্যা, সাহেবি বুদ্ধি সাহেবি প্রতিজ্ঞা ইত্যাদি সাহেবদিগের সদগুণ কিছুই প্রাপ্ত হয়েন নাই।

আধুনিক যুবকদিগের পক্ষ প্রতিপক্ষেরা এইরূপ বিবিধ কথার আন্দোলন করেন এবং উভয় পক্ষেই যুক্তি ও প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া থাকেন আবার কতিপয় দীর্ঘদর্শি লোকদিগের এমত অভিপ্রায় যে এ দেশের যে সমস্ত কুপ্রথা প্রচলিত আছে তাহার পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক বটে, কিন্তু এখানকার লোকেরা যে পর্য্যন্ত যথার্থরূপে বিদ্যারসের রসজ্ঞ হইয়া আপনাপন ব্যবহার ও চরিত্র নির্ম্মল করিতে না পারিবেন, একতা স্থাপন ও প্রতিজ্ঞা তৎপর না হইবেন সে পর্য্যন্ত তদ্বিষয়ে তাঁহারদিগের হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে।

বর্ত্তমান সময়ে যখন এইরূপ মতামতের বিচাব আরম্ভ হইয়াছে এবং অনেকে সাহসিকরূপে স্বদেশের কুপ্রথা সকল প্রকাশ পূর্ব্বক বিচার কবিতেছেন তখন বর্ত্তমান সময়ে এ দেশের রীতিনীতি ও আচার প্রভৃতি পরিবর্ত্তনের প্রাক্কাল বলিযা স্বীকার করিতে হইবেক।

৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৬২। ২২ মে ১৮৫৫

হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ

হিন্দু মেট্রোপলিটান কালেজের মেনেজরি অর্থাৎ কর্ম্মাধ্যক্ষগণ সংপ্রতি এতদ্দেশীয় ধনাঢ্য ও বিদ্যানুরাগি মহাশয়দিগের বিদিতার্থ যে এক ঘোষণাপত্র প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি, শিঘ্র অনুবাদ পুর্ব্বক প্রকাশ করিয়া পাঠক মহাশয়দিগকে জ্ঞাত করিব, তাহাতে মেনেজর মহাশয়েরা যে যে কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহার কিছুই অসত্য অথবা অযৌক্তিক নহে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বহুকাল এদেশের অধিকারী হইয়াছেন বটে, কিন্তু প্রজাদিগের বিদ্যানুশীলন বিসয়ে প্রায় ৫০ বৎসব পর্য্যন্ত কোনরূপ সদুপায় করেন নাই, সিবিলিয়ান সাহেবগণ কেবল একচেটিয়া বাণিজ্য দ্বারা বিপুলার্থ লুটিয়া লইয়া গিয়াছেন, ঐ সময়ে যিনি বণিক তিনিই বিচারক ছিলেন, প্রজার নিকট হইতে উৎকোচ পয্যন্ত গ্রহণ করিতেন, রাজকার্য্যেব প্রধান'ধ্যক্ষদিগের এমত অভিপ্রায় ছিল যে হিন্দু প্রজাদিগ্যে বিদ্যা শিক্ষা প্রদান করা উচিত নহে, তাহারা বিদ্যা দ্বারা হিতাহিত বিচার ও রাজকার্য্যের দোষগুণ বিবেচনায সক্ষম হইলে সিবিলগণের অত্যাচার ও অবিচার এবং অর্থোপার্জ্জন কিছুই হইবেক না। অতএব ঐ সময় কিরূপ ভয়ানক সময় ছিল পাঠক মহাশয়েরাই তাহাব বিবেচনা করিবেন।

হিন্দু প্রজাদিগের ইংরাজী বিদ্যানুশীলন নিমিত্ত হিন্দু মহাশয়েরা প্রথমতঃ এই মহানগর কলিকাতায় হিন্দু কালেজ নামক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। হিন্দুদিগের নিকট হইতে তাহার মুলধন সংগ্রহ ও হিন্দু মেনেজরদিগের দ্বারা তাহার সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, পরে কোন কারণ বশতঃ ব্যয়োপযোগি অর্থের অভাব হইলে তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করেন, এবং গবর্ণমেণ্টও তৎপ্রদানে স্বীকৃত হয়েন,

ঐ সময়ে বিদ্যালয়ের প্রচলিত নিয়মাদি পরিবর্ত্তন করণের কোন প্রসঙ্গই হয় নাই, পরে গবর্ণমেণ্ট ক্রমে ক্রমে হিন্দু মেনেজরগণের সকল ক্ষমতা অপহরণ করিয়া হিন্দু কালেজে যবনাদি সকল বর্ণকে নিযুক্ত করিবার নিয়ম করাতেই হিন্দুরা অতিশয় দুঃখিত হইয়া আপনাপন সন্তানগণের বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত হিন্দু মেট্রোপলিটান কালেজ সংস্থাপন করিয়াছেন, পুরাতন কালেজের অধ্যক্ষদিগের সহিত শাত্রবতা করণাভিপ্রায়ে এই কালেজ স্থাপিত হয় নাই, বালকদিগের কোমলান্তঃকরণে সিধর্ম্মের উপদেশ দ্বারা কোন প্রকার বিরূপ ভাব উদয় না হয়, যবনাদি বহুবর্ণের সহিত একত্র উপবেশন পুর্ব্বক উপদেশ গ্রহণ করিতে না হয় ইত্যাদি অভিপ্রায়েই হিন্দু মেট্রোপলিটান কালেজ খোলা হইয়াছে, অল্প সময়ের মধ্যে ঐ কালেজের অবস্থা যে প্রকার উন্নত হইয়াছে, বোধকরি অন্য কোন বিদ্যালয়ের তদ্রূপ হয় নাই, আমরা শ্লাঘা পুর্ব্বক বলিতে পারি যে হিন্দু কালেজের অপেক্ষা হিন্দু মেট্রোপলিটান কালেজে শিক্ষা প্রদানের নিয়মাদি উত্তম হইয়াছে, মেনেজরগণ অতি সুবিবেচনাপুর্ব্বক উত্তম উত্তম শিক্ষক সকল নিযুক্ত করিয়াছেন, বিদ্যালয়ের নিমিত্ত মূলধন সঞ্চিত এবং তাহার অবস্থা আরো উন্নত হয়, এই অভিপ্রায়েই মেনেজর মহাশয়েরা প্রাগুক্ত ঘোষণাপত্র প্রকাশ করিয়াছেন, অধুনা হিন্দুমাত্রেরই উচিত যে তাঁহারা হিন্দু মেট্রোপলিটান কালেজের প্রতি বিহিত সাহায্য প্রদান করেন, কারণ কেবল হিন্দু বালকদিগের বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের বিনা সাহায্যে ও স্বাধীনরূপে যখন ঐ কালেজ স্থাপিত হইয়াছে তখন তাহা হিন্দুদিগেরই সম্পত্তি। কালেজের উন্নতি হইলে হিন্দু জাতিরই উপকার এবং খ্যাতি প্রকাশ হইবেক, অতএব এই বিদ্যালয়ের প্রতি হিন্দুগণ অবশ্য মনোযোগ করিবেন, না করিলে তাঁহারা অখ্যাতি ভাজন হইবেন।

পরন্তু অভিনব কালেজের মেনেজরদিগের পূর্ব্বোক্ত ঘোষণাপত্র উপলক্ষ করিয়া আমাদিগের শ্রীরামপুরস্থ সহযোগি মহাশয় যে সকল অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে হিন্দু জাতির প্রতি তাহার বিলক্ষণ বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ হইয়াছে, তিনি লেখেন যখন ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মতামতের এবং জাতিভেদের বিচার উপলক্ষ করিয়া হিন্দুগণ মেট্রোপলিটান কালেজ সংস্থাপন করিয়াছেন, তখন পুরাতন কালেজের প্রতি নূতন কালেজের কর্ম্মাধ্যক্ষদিগের দ্বেষ নাই? একথা কে স্বীকার করিবেক। ফ্রেণ্ড সহযোগী মহাশয় মেট্রোপলিটান কালেজের প্রকাশিত ঘোষণাপত্রের যথার্থ মর্ম্ম গ্রহণ করিলে এরূপ কুতর্ক কদাচ উত্থাপন করিতেন না, পুরাতন হিন্দু কালেজ শক্তির দ্বারা হিন্দুদিগের নিকট হইতে গ্রহণ পুর্ব্বক গবর্ণমেণ্ট যখন আপনারদিগের সম্পত্তির মধ্যে গণনা করিয়াছেন, তখন তথায় ইচ্ছানুরূপ নিয়মাদি অবশ্য করিবেন, হিন্দু সন্তানদিগে শিক্ষার নিমিত্ত স্বাধীন রূপে হিন্দুরা এই স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, এখানে তাঁহারা হিন্দু ব্যতীত অপর জাতীয় বালকদিগকে নিযুক্ত করিবেন না, সকল লোকের যখন আপনাপন বিষয়ে ইচ্ছানুরূপ নিয়মাদি করণের ক্ষমতা আছে, তখন হিন্দুরা আপনাদিগের ইচ্ছানুরূপ স্বাধীন বিদ্যালয়

অবশ্য করিতে পারেন, ইহাতে দ্বেষ ভাব কোথায় তাহা আমরা স্থির করিতে পারিলাম না, বিলাতের সকল লোকেই খ্রীষ্টান, কিন্তু সেই খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বিদিগের মধ্যেও আবার রোমান কেথোলিক, প্রোটেষ্টেন্ট, ডি সেণ্টর ইত্যাদি ভিন্ন সম্প্রদায়দিগের নিমিত্ত যখন ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যালয় আছে তখন হিন্দুরা এক স্বতন্ত্র জাতি তাঁহারা স্বতন্ত্ররূপ বিদ্যালয় অবশ্য করিতে পারেন, ইহাতে ফ্রেণ্ড মহাশয় দ্বেষ ভাব কোথায় দেখিলেন ?

অদ্য আমরা ফ্রেণ্ড মহাশয়ের অন্যায় লেখার প্রতি আর অধিক লিখিতে ইচ্ছা করি না, এই নগর মধ্যে হিন্দু বালকদিগের বিদ্যানুশীলন নিমিত্ত হিন্দু মেট্রোপলিটান কালেজ স্থাপিত হওয়াতে হিন্দু মণ্ডলীর বিশেষ উপকার দর্শিয়াছে একথা সকলেই স্বীকার করিবেন, কাপ্তেন রিচাডসন, কাপ্তেন পামর, ডবলিউ. কার্ক পাট্রিক প্রভৃতি গণ্য ও মান্য শিক্ষকগণ বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার পুর্ব্বক তথায় ছাত্রদিগকে উপদেশ প্রদান করিতেছেন, গবর্ণমেণ্ট বিদ্যাদান বিষয়ে বিস্তর আড়ম্বর করিয়াছেন বটে ফলতঃ তাঁহাদিগের স্থাপিত কোন বিদ্যালয়েই ঐরূপ উপযুক্ত শিক্ষক নাই, কিয়দ্দিবস গত হইল ডাক্তার মৌয়েট সাহেব হিন্দু মেট্রোপলিটান কালেজে গমন করিয়া উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদিগকে কঠিন কঠিন পুস্তকের ভাব অর্থ ও তাৎপর্য্য বিষয়ে পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাতে ছাত্রেরা সকল প্রশ্নের যথার্থ উত্তর প্রদান করাতে সাহেব পরম পরিতুষ্ট হইয়া বিদ্যালয়ের দর্শকগণের অভিপ্রায় লিখিবার পুস্তকে পরম সন্তোষ-সূচক অভিপ্রায় লিখিয়াছেন, বহুবাজার নিবাসি পরহিততৎপর বিদ্যানুরাগি শ্রীযুত বাবু রাজেন্দ্র দত্ত প্রভৃতি কতিপয় বিশেষোৎসাহি ব্যক্তি যাঁহারদিগের প্রযত্নে এই বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, তাঁহারা তাবতেই ছাত্রদিগের শিক্ষার উন্নতি নিমিত্ত অধিক অনুরাগ করিয়া থাকেন, যে প্রকার নিয়মে কালেজের কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে ও তাহার অবস্থার উন্নতি হইয়া আসিতেছে, তাহাতে হিন্দুগণ বিশেষ মনোযোগ করিলে অল্প কালের মধ্যে হিন্দু মেট্রোপলিটান কালেজ হিন্দু বালকদিগের বিদ্যানুশীলনের প্রধান বিদ্যামন্দির হইবেক তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

১ জ্যৈষ্ঠ ১২৬২। ১৪ মে ১৮৫৫

বিধবাবিবাহ

আমারদিগের মেদিনীপুর প্রবাসি কোন বন্ধু দ্বারা তদঞ্চলস্থ ভদ্র গ্রাম নিবাসিনী বিপ্রকুলোদ্ভবা বিধবা কামিনীগণের রচিত যে এক পত্র আমরা প্রাপ্ত হইলাম তাহা অবিকল নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম।

"অশেষ গুণালঙ্কৃত শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর দীর্ঘজীবেষু।

আমরা জিলা মেদিনীপুরের অন্তঃপাতি কতিপয় ভদ্র গ্রাম নিবাসিনী বিপ্রকুলোদ্ভবা বিধবা কুলীন কন্যাগণের নিবেদন এই যে আমরা অতি শৈশবাবস্থায় পতিরত্ন বিহীনা হইয়া

এ পর্য্যন্ত অসহ্য বৈধব্য যন্ত্রণায় কাল যাপন করিতেছি, কিন্তু অদ্যাবধি আমারদিগের ক্লেশ নিবারণের কোন সদুপায় প্রচলিত না হওয়াতে অস্মদগণ পক্ষে বিবিধ অনিষ্ট ঘটনা হইতেছে। অধুনা শ্রুত হইলাম দেশ হিতৈষী গুণরাশি বিপুল যশস্বী অদ্বিতীয় পণ্ডিতবর গুণসাগর শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বহ্বায়াসে বিবিধ শাস্ত্রান্বেষণ করত পরিশেষে বর্ত্তমান কলিযুগের প্রচলিত শাস্ত্র অর্থাৎ পরাশর সংহিতা হইতে বিধবা বিবাহ হওনের যে শাস্ত্র প্রচার করিয়াছেন, তৎপাঠে বিদিত হইল যে বিধবাদিগের পুনঃ পরিণয় কিছু অশাস্ত্রিক নহে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে আমারদিগের দেশীয় পণ্ডিত মহোদয়েরা শ্রীযুত বিদ্যাসাগরের এই উৎকট পরিশ্রমে বাধিত না হইয়া তাহাতে নানা প্রকার ফন্দি তুলিতেছেন, এবং স্থানে স্থানে দলবদ্ধ হইয়া এই যুক্তিসিদ্ধ শাস্ত্রীয় প্রথা যাহাতে প্রচলিত না হয় তাহারাই চেষ্টায় যত্নশীল হইয়াছেন ; কিন্তু বিদ্যাসাগরের প্রকাশিত ভগবান পরাশরের বচন অদ্যাবধি কেহই খণ্ডন করিতে পারগ হয়েন নাই। কেবল তন্তুবায়দিগের ন্যায় নিরর্থক কোলাহল ও কলহ করিয়া এক এক খানি পুস্তক রচনা করিয়া আপনাপন পারগতা দর্শাইতেছেন, কিন্তু তাঁহারদিগের বাটীর বিধবারা অসহ্য ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্ম প্রতিপালনে যে অপারগ হইয়া স্বেচ্ছাচারিণী হইতেছে তাঁহারা কি একবারও নেত্রোন্মীলন করিয়া দেখেন না ? কি আক্ষেপের বিষয়! কিয়দ্দিবস গত হইল এই মেদিনীপুরে কোন ভদ্রাভিমানী স্বীয় বাটীতে উল্লেখিত বিধবা বিবাহ ঘটিত এক সভা স্থাপন করিয়া বিধবা সাপক্ষ পক্ষে যেরূপ অভদ্রতা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা অত্র পত্রে প্রকাশ করিলে অধম হাড়ি বেহারাদিগের উৎসাহ বৃদ্ধি হইবেক, অতএব তাহা প্রকাশে বিরত হইলাম। সে যাহা হউক, এইক্ষণে আমারদিগের এই বঙ্গদেশের মধ্যে আপনকার তুল্য সুপণ্ডিত ও বিজ্ঞ আর কাহাকেও দেখিতে পাই না, অতএব আপনি ইহাতে হস্তার্পণ না করিলে ঘৃণিত ব্যভিচার দোষে এই সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের গর্ব্ব একৈকশঃ খর্ব্ব হইয়া যায়। অতএব যথোচিত সম্বোধন পুরঃসর আমরা প্রার্থনা করিতেছি যে আমারদের এই বর্ত্তমান লুকাচুরি খেলা হইতে নিবৃত্তি করাইয়া ভগবান পরাশর বাক্য প্রচলিত করিতে যত্নশীল হউন, নচেৎ মহাশয়কে ভবিষ্যতে শত শত ভ্রূণহত্যা পাপে জড়িত হইতে হইবে, নিবেদন মিতি।

মেদিনীপুর
১২৬২ সাল তাং ৫ই জ্যৈষ্ঠ"

উক্ত বন্ধু ঐ পত্রের সমভিব্যাহারে তথাকার সংবাদ লেখেন যে "এইক্ষণে এ অঞ্চলে সর্ব্বদা বারিবর্ষণ হইতেছে, বর্ত্তমান বৎসরের ন্যায় সুবৎসর প্রায় বহুকাল দেখা যায় নাই। এ বৎসর অগ্নিভয় হয় নাই, তাহাতে প্রজামণ্ডলী অতিশয় সুখে কালযাপন করিতেছে, এবং এ অবধি প্রজারা ক্রূর বিকার ও নিষ্ঠুর বিসূচিকা রোগের সহিত সাক্ষাৎ করে নাই অতএব সকলে সুস্থ শরীরে পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।"

১১ জ্যৈষ্ঠ ১২৬২। ২৪ মে ১৮৫৫

বিধবাবিবাহ

ছাত্র হইতে প্রাপ্ত

অধুনা এদেশে বিধবাবিবাহ লইয়া বড গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে, সংস্কৃত কলেজাধ্যক্ষ পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয় আপন প্রণীত পুস্তকে নানা শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা এ বিষয় যে অবশ্য কর্ত্তব্য তাহা বিলক্ষণরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বাস্তবিক প্রথমতঃ অনেকেই তাঁহার প্রচারিত পুস্তক পাঠে বিধবাবিবাহ অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে স্বীকার করিয়াছিলেন, এ পর্য্যন্ত অনেকেই স্ব ২ আপত্তি ও অভিমত সম্বলিত তদ্বিরুদ্ধে এক এক খানি পুস্তক প্রকটিত করিয়াছেন। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহার মধ্যে ২।১ খানিই যথার্থ লেখা বলিয়া গণ্য হইতে পারে। অনেকে বিশেষতঃ কতিপয় বিদ্যাভিমানী মহাপুরুষেরা জনসমাজে আপনাদিগের বিদ্যার পরিচয় দেওনার্থ তদ্বিষয়ে অন্যায় প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত করিতেছেন। ফলত সে সকল কোন কার্য্যেরই হয় নাই। এই সকল লেখার দ্বারা ভাষা লেখার অধিক চর্চ্চা প্রভৃতি কয়েকটি উপকার দর্শিতেছে বটে, কিন্তু মুল কার্য্য সিদ্ধ হওনের কোন সুলক্ষণ দেখা যাইতেছে না। বিধবা বিবাহ প্রতিবাদী মহাশয়গণের প্রতি আমার এইমাত্র নিবেদন যে তাঁহারা পক্ষপাতশূন্য হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রণীত পুস্তক এবং প্রভাকর সম্পাদক মহাশয়ের লিখিত ১ বৈশাখ দিবসীয় পত্র অভিনিবেশ পুর্ব্বক পাঠ করেন তাহা হইলে অনেক সংশয়োচ্ছেদ ও মতের স্থৈর্য্য হইবেই হইবে। হা ঈশ্বর! আমাদের দেশকে কেন এমত হীনাবস্থায় ফেলিলে? আমরা কি এত দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি?

পুর্ব্বে বিলক্ষণ বিশ্বাস ছিল যে বিদ্যার বিমলজ্যোতিঃ দেশে ২ যতই বিস্তীর্ণ হইতে থাকিবে লোকের মন দেশের উন্নতি সাধনে ততই যত্নশীল হইবে। কি আশ্চর্য্য! তাহা তো কিছুই দেখিতে পাই না। অনেকেই লেখা পড়ায় বিলক্ষণ গুণবান বটেন, কিন্তু কার্য্য বিষয়ে তাঁহাদের তাদৃশী প্রবৃত্তি ও অনুরাগ দেখা যায় না। বলিতে কি একবার রাজপুরুষেরা এ বিষয়ে মনোযোগ না করিলে কোন মতেই এবং কস্মিন্ কালেও এই শুভকার্য্যে সম্পাদিত হইবেক না। এই স্থলে সকল সহগমন প্রভৃতি পুর্ব্বকার কতিপয় নিদারুণ প্রথা একবার স্মরণ করিয়া দেখুন। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের অসাধারণ বুদ্ধিবলে ও প্রচুর প্রযত্নেই এই সকল প্রথা রহিত হইয়াছে, তাঁহারই গুণে এইক্ষণে অসংখ্য মনুষ্যের প্রাণ রক্ষা হইতেছে। আহা কি পুণ্যাত্মা আমাদের ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এইক্ষণে একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন যখন তিনি আপন সাহসে ভর করিয়া দেশের মহানিষ্টকর রীতি ও প্রথা সমুদয় উচ্ছেদ করণে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, এদেশের কোন্ ব্যক্তি না তাঁহার অপযশ ঘোষণা করিয়াছিল? এককালে তাবতেই শত্রু

হইয়া উঠিয়া তাঁহার প্রাণ পর্য্যন্ত বিনষ্ট কল্পনা করিয়াছিল, কিন্তু আবার দেখুন এইক্ষণকার প্রায় তাবল্লোকেই তাঁহার যশঃকীর্ত্তন করিতেছে, কহিতেছে ধন্য রামমোহন রায়! অতএব এতদ্দ্বারা বিলক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে যে যদবধি বিধবাবিবাহ প্রচলিত না হইবেক তদবধি সকলেই বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এবং তাঁহার সপক্ষ ব্যক্তিদিগকে নিন্দাবাদ প্রদান করিবেক। কিন্তু যখন একবার ঐ প্রথা প্রচলিত হইয়া যাইবেক তখন আবার সেই নিন্দকেরাই উহাদিগকে দেশের পরম হিতকারি বন্ধু বলিয়া আহ্বান করিবেক তাহাতে কোন সংশয় নাই।

১২ জ্যৈষ্ঠ ১২৬২। ২৫ মে ১৮৫৫

চুঁচুড়ার প্রিপ্যারেটার স্কুল

সম্পাদক মহাশয়। আপনার প্রণীত প্রভাকরে এদেশীয় অনেকানেক বিদ্যালয়ের বিবরণ প্রকাশিত হয় কিন্তু চুঁচড়া নগরে যে একটি প্রসিদ্ধ বিদ্যালয় আছে, তাহার বিবরণ লিখনে এ পর্য্যন্ত কেহই হস্তক্ষেপ করেন নাই, অতএব আমি সেই বিদ্যালয়ের সম্বন্ধীয় যৎকিঞ্চিৎ যাহা অবগত হইয়াছি লিখিয়া প্রেরণ করিতেছি কৃপা করিয়া ত্বরায় পত্রস্থ করিতে আজ্ঞা হইবেক।

অধুনা প্রায় ১২ বৎসর হইল এই বিদ্যালয় হুগলি কালেজের সদ্বিদ্বান ছাত্র শ্রীযুত বাবু দিগম্বর বিশ্বাস মহাশয়ের প্রযত্নে সংস্থাপিত হইয়াছে পরে এই বিদ্যালয়ের বয়ঃক্রম যতই বৃদ্ধি হইতে লাগিল তাহার অবস্থা ক্রমশঃ ততই উন্নতি হইতে লাগিল। এখানকার অনেক সম্ভ্রান্ত মহাশয়েরা তাহার উন্নতিকল্পে প্রচুর প্রযত্ন প্রকাশ করিতে লাগিলেন, এবং বুক অব রোমান হিষ্টরি, লেনিজ্ গ্রামার অঙ্ক·

তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষক বাবু দয়ালচন্দ্র মল্লিক। এই শ্রেণী মধ্যে তিনটি ডিবিজন অর্থাৎ বিভাগ আছে।

১ বিভাগ। প্রোজ্ নং ১ স্পেলিং নং ২ লেনিজ গ্রামার অঙ্ক।

২ বিভাগ। প্রোজ্ নং ৪ স্পেলিং নং ২ উল্যাষ্টনস্ গ্রামার অঙ্ক।

৩ বিভাগ। স্পেলিং নং ১ অঙ্ক।

প্রত্যেক বালকের প্রতি অর্দ্ধ মুদ্রা বেতন নির্দ্দিষ্ট আছে, কিন্তু দৃষ্ট হইল যে এক্ষণে অধিকাংশ বালক বিনা বেতনে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছে। প্রধান শিক্ষক মহাশয় কহিলেন যে এক্ষণে এখানে ১০০ জন ছাত্র আছে, আয়ের স্বল্পতা প্রযুক্তই এই বিদ্যালয়ের এতদ্রূপ দুরবস্থা হইয়াছে, অবগত হইলাম এইক্ষণে গবর্ণমেণ্ট সম্পর্কীয় কোন সাহেবই ছাত্রদিগের পরীক্ষা গ্রহণে আসেন না এই জন্যই বালকদিগের উৎসাহের হ্রাস হইয়াছে, আবার শুনিলাম গবর্ণমেণ্ট ঐ বিদ্যালয়ে মাসে ২৫০ টাকা করিয়া দিবেন এমত অভিপ্রায়

প্রকাশিত হইয়াছে। পরমাহ্লাদের বিষয় এইক্ষণ গবর্ণমেণ্টের উচিত উক্ত বিদ্যালয়ের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশে আর যেন কার্পণ্য না করেন।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শর্ম্মণঃ

২৪মে ১৮৫৫

১৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৬২। ২৬ মে ১৮৫৫

হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ

হিন্দু মিট্রোপলিটান কালেজের মেনেজর অর্থাৎ কর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয়েরা হিন্দুদিগের বিদিতার্থ যে ঘোষণাপত্র প্রকাশ করিয়াছেন তাহার কিয়দংশ আমরা অদ্য প্রকাশ করিলাম, অবশিষ্টাংশ পরে প্রকটিত হইবেক, ঐ বিদ্যালয়ের প্রতি তাহারদিগের কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য এইক্ষণে বিবেচনা করুন।

"হিন্দু মিট্রোপলিটান কালেজ

তথা মৃত মহাত্মা মতিলাল

শীল মহাশয়ের প্রণীত

কালেজ

ঘোষণাপত্র।

ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট এক মহৎ কার্য্য ধার্য্য করিয়াছেন, তাহারদিগের প্রযত্নে এত পূর্ব্ব দেশে পশ্চিম রাজ্যের জ্ঞান ও দর্শন বিদ্যানুশীলনের অনুরাগ বর্দ্ধিত হইয়াছে, ভারতবর্ষের প্রজাগণ পুরাকালের সঙ্কলিত বিবিধ বিদ্যা ও অধুনাতন প্রকাশিত নানাবিধ অদ্ভুত ও বিচিত্র বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতেছেন, এবং অতি উৎকৃষ্ট ও প্রয়োজনীয় জ্ঞানবস্তু সকল যাহা বর্ত্তমান সময়ে অবণীর ভূষণ স্বরূপ হইয়াছে, তাহারা তাহার রসাস্বাদন গ্রহণ করিতেছেন, এজন্য তাহার ক্ষণকালের নিমিত্ত অকৃতজ্ঞ নহেন।

এই রাজ্যে বিদ্যানুশীলন নিমিত্ত ব্রিটিস রাজপুরুষেরা যে সকল উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন এবং করিতেছেন যদিও তত্তাবৎ প্রশংসা জনক বটে, তথাচ স্বীকার করিতে হইবেক, যে হিন্দু কালেজ নামক বিদ্যালয় যাহা প্রথমতঃ স্থাপিত হয়, এবং এইক্ষণেও প্রধানরূপে গণ্য রহিয়াছে এতদ্দেশীয় ব্যক্তিরাই তাহা স্থাপন করেন, এবং তাহাদিগের সাহায্যেই কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত উত্তম নিয়মে তাহার কার্য্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ হয়।

৪০ বৎসরের অধিক হইবেক, মহারাজ বর্দ্ধমানাধীশ্বর। রাজা রাধাকান্ত দেব। চন্দ্রকুমার ঠাকুর। গোপীমোহন দেব। জয়কৃষ্ণ সিংহ। গঙ্গানারায়ণ দাস। রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়। রামকমল সেন। এবং কালেজের মৃত বিচক্ষণ ও বহুদর্শী সেক্রেটারি রসময় দত্ত প্রভৃতি মহাত্মাগণ হিন্দুকালেজ স্থাপনপুর্ব্বক তাহার প্রতি যথোচিত সাহায্য

করেন, এবং তাঁহারদিগের বিবেচনানুসারে সকল কার্য্যনির্ব্বাহ হয়, এতদ্দেশীয় ব্যক্তিগণ চাঁদার দ্বারা একলক্ষ তেরো হাজার টাকা প্রদান করেন।

ইউরোপীয় অথবা খ্রীষ্টান বালকদিগের বিদ্যানুশীলন নিমিত্ত এই বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় নাই যেহেতু তাঁহারদিগের শিক্ষার নিমিত্ত অন্যান্য অনেক বিদ্যালয় নিরূপিত থাকে।

১৮৩২ সালের মুদ্রিত নিয়মাদি মধ্যে লিখিত আছে যে কেবল হিন্দু বালকদিগের ইউরোপীয় বিদ্যানুশীলন নিমিত্ত হিন্দু কালেজ স্থাপিত হইয়াছে।

৭ বৎসর কালেজের কার্য্য নিষ্পাদিত হইলে, মূলধন ন্যূন হইয়া গেল, কর্ম্মাধ্যক্ষেরা গবর্ণমেণ্টের নিকটে বিহিত সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, এবং তাঁহারাও তৎপ্রদানে স্বীকৃত হইলেন, কালেজের স্থায়িত্ব বিষয়ে আর কোন সংশয় রহিল না, গবর্ণমেণ্ট অধিক পরিমাণে সাহায্য করিতে লাগিলেন, সুতরাং অধিক পরিমাণে তাঁহাদিগের কর্ত্তৃত্বও বৃদ্ধি হইল, এতদ্দেশীয় কর্ম্মাধ্যক্ষগণ ক্রমে ক্ষমতাচ্যুত হইয়া বিবেচনা করিলেন যে তাঁহারা নামমাত্র অধ্যক্ষ, কালেজের সংস্থাপকগণ ক্ষমতাভ্রষ্ট হইয়াছেন বলিয়া তাহারা দুঃখিত নহেন, কারণ যেখানে অন্যের সাহায্যের প্রতি নির্ভর করিতে হয় সেইখানেই এইরূপ হইয়া থাকে, গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া হিন্দু মেনেজরগণ ক্ষণকালের নিমিত্ত দুঃখিত নহেন, ফলতঃ হিন্দু কালেজ যে অভিপ্রায়ে সৃষ্টি হইয়াছিল, অর্থাৎ তথায় কেবল হিন্দু বালকগণ অধ্যয়ন করিবেক, এবং যাহা তাহার নামের দ্বারাই প্রকাশিত আছে, গবর্ণমেণ্ট যখন ক্ষমতাবলে সেই অভিপ্রায়ের অন্যথাচরণ করিয়া হিন্দু কালেজকে সর্ব্বজাতির শিক্ষা স্থান করিলেন, তখন হিন্দুরা দুঃখিত হইলেন, কারণ হিন্দু কালেজ যখন প্রথমতঃ স্থাপিত হয় তখন তাহার এরূপ হইবেক স্বপ্নেও কেহ এমত বিবেচনা করেন নাই।

এই ঘটনায় হিন্দুরা প্রতিজ্ঞাপুর্ব্বক আপনারদিগের এক কালেজ স্থাপন করিয়াছেন, এই কালেজের দ্বারা হিন্দু কালেজের প্রতি কোনপ্রকার প্রতিযোগিতা করণের অভিপ্রায় নাই, গবর্ণমেণ্টের সাহায্যের প্রতি নির্ভর না করিয়া স্বাধীনরূপে শিক্ষাদানের অভিপ্রায়েই ঐ কালেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং তাহা হিন্দু মিট্রোপলিটান কালেজ নামে বিখ্যাত করিয়া তাহার সহিত শীল্‌স ফ্রি কালেজ নামক অবৈতনিক বিদ্যালয়ের সংযোগ করিয়াছেন। ১৮৫৩ সালের ২ মে তারিখে এই কালেজ সংস্থাপিত হইয়াছে।

শাত্রবতা করণাভিপ্রায়ে হিন্দুরা প্রতিজ্ঞারূঢ় হয়েন নাই, গবর্ণমেণ্টকে অমান্য করিবেন এমত অভিপ্রায়ও নাই, বিদ্যালয় স্থাপন করিলেই তাহাতে বিবিধ ধর্ম্ম জ্ঞানবিশিষ্ট ছাত্রদিগকে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য কি না তদ্বিষয়ে কোন অভিমতও ব্যক্ত করেন নাই, ঐরূপ বিদ্যালয় স্থাপনে যাঁহারা অভিপ্রায় করেন তাঁহারা আপনাপন ইচ্ছানুরূপ নিয়ম অবশ্য করিবেন।

১৭ই জ্যৈষ্ঠ ১২৬২। ২৯ মে ১৮৫৫

মুসলমানদের সভা

নগরবাসি সদ্বিদ্বান্ ও সম্ভ্রান্ত যবনেরা স্বজাতির হিতবর্দ্ধনার্থে এক সভা স্থাপন করিয়াছেন, তাহার বিবরণ আমরা ইংরাজী পত্রে পাঠ করিয়া যে প্রকার সন্তুষ্ট হইয়াছি তাহা লিখিয়া ব্যক্ত করিতে পারি না। ইংরাজ ও বাঙ্গালির মধ্যে বহুবিধ সভা স্থাপিত থাকাতে অনেক বিষয়ে তাঁহারদিগের উপকার হইতেছে ও ইংরাজজাতির সহিত হিন্দুজাতির সদ্ভাবের ক্রমশঃ আধিক্য হইয়া আসিতেছে এবং হিন্দুমণ্ডলী মধ্যে একতা বর্দ্ধনের সূত্র সঞ্চারিত হইয়াছে, কিন্তু কি পরিতাপ। যবনজাতি মধ্যে একাল পর্য্যন্ত কোন প্রকার সভা স্থাপন হয় নাই, একতার গুণ তাঁহারা কিছুই জানিতে পারেন নাই, গবর্ণমেণ্ট যাহা ইচ্ছা তাহা করুন, তাঁহারদিগের কার্য্য বিষয়ে যবনজাতি কোন কথাই উল্লেখ করেন না, ইহাতে সভ্য লোকেরা ভারতবর্ষবাসি যবনগণকে অসভ্য বলেন। আহা। যে জাতি এক সময়ে এই সুদীর্ঘ রাজ্যের শাসনদণ্ড ধারণ করিয়া সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব করিয়াছেন তাঁহারদিগের এরূপ অবস্থা হইলে অতিশয় আক্ষেপের নিমিত্ত হয়। এদেশে অল্প যবন বাস করে না, কোন কোন প্রদেশে হিন্দু ও অন্যান্য জাতি অপেক্ষা যবনের সংখ্যা অধিক, অতএব তাহারদিগের মঙ্গলোদ্দেশে কোন প্রকার সভা স্থাপিত না থাকাতে আমরা অতিশয় দুঃখিত ছিলাম, অধুনা নগরবাসি সম্ভ্রান্ত ও সদ্বিদ্বান যবনেরা আমারদিগের সেই দুঃখ নিবারণ করিলেন। এইক্ষণে আমরা পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি এই নবীনা সভা চিরস্থায়িনী হউক এবং নগরীয় ও অন্যান্য স্থানের যবনগণে তাহার প্রতি বিহিত সাহায্য ও উৎসাহ প্রদানপুর্ব্বক স্বজাতির সম্মান বৃদ্ধি করুন।

২২ জ্যৈষ্ঠ ১২৬২। ৪ জুন ১৮৫৫

দক্ষিণেশ্বরের নবরত্ন মন্দির প্রতিষ্ঠা

জানবাজার নিবাসিনী পুণ্যশীলা শ্রীমতী রাণী রাসমণি জ্যৈষ্ঠ পৌর্ণমাসী তিথিযোগে দক্ষিণেশ্বরের বিচিত্র নবরত্ন ও মন্দিরাদিতে দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, ঐ দিবস তথায় প্রায় লক্ষ লোকের সমাগম হইয়াছিল, এই পুণ্যকর্ম্ম উপলক্ষে রাণী রাসমণি অকাতরে অর্থ-ব্যয় করিয়াছেন, প্রত্যেক শিবস্থাপনে রজতময় ষোড়শ ও অন্যান্য বিবিধ দ্রব্য পট্টবস্ত্র নগদ টাকা দিয়াছেন, তারামূর্ত্তি স্থাপনোপলক্ষে যে যে অনুষ্ঠানের আবশ্যক তত্তাবৎ বাহুল্যরূপে আয়োজন হইয়াছিল, আহারাদির কথা কি বলিব, কলিকাতার বাজার দূরে থাকুক, পাণিহাটি, বৈদ্যবাটি, ত্রিবেণী ইত্যাদি স্থানের বাজারেও সন্দেশাদি মিষ্টান্নের বাজার আগুন হইয়া উঠে, এমত জনরব যে ৫০০ মোণ সন্দেশ হয়, নবরত্নের সম্মুখস্থ নাটমন্দির অতি রমণীয়রূপে সজ্জীভূত হইয়াছিল, ঝাড়লণ্ঠন প্রভৃতিতে খচিত হয়, বরাহনগর অবধি নাটমন্দির

পর্য্যন্ত রাস্তার উভয় পার্শ্বে বান্ধা রোসনাই হয়, কোনরূপ অনুষ্ঠানের কোনপ্রকার বৈলক্ষণ হয় নাই, পুণ্যবতীর পুণ্যকার্য্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে নির্ব্বাহ হইয়াছে, গঙ্গার উপর পিনিস, বজরা, বোট, ভাউলিয়া প্রভৃতি জলযান কত গিয়াছিল, রাজপথে গাড়ীই বা কত একত্রিত হইয়াছিল তাহার সংখ্যা করা যায় না, কাঙ্গালি লোক অনেক গিয়াছিল, তাহারা মিষ্টান্ন প্রভৃতি উপাদেয় দ্রব্যাদি আহারে পরিতৃপ্ত হইয়া কেহ টাকা কেহ অর্দ্ধ মুদ্রা কেহ কেহ বা সিকি দক্ষিণা লইয়া বিদায় হইয়াছে, গোস্বামী মহাশয়েরা প্রায় সকলেই গিয়াছিলেন, রাণী রাসমণি তাঁহাদিগের সকলের যথাযোগ্য সম্মান পুরঃসর টাকা দিয়াছেন, এই পুণ্যকার্য্যে রাণী রাসমণির প্রায় দুইলক্ষ টাকা ব্যয় হইবেক, অনেক পুণ্যাত্মা ব্যক্তি অনেকানেক স্থানে দেবালয় করিয়াছেন বটে, কিন্তু এপ্রকার বৃহৎ নবরত্ন ও নাটমন্দির কেহই করেন নাই, জগদীশ্বর পুণ্যবতী রাণী রাসমণিকে যে প্রকার অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী করিয়াছেন, সেইপ্রকার মহৎ অন্তঃকরণও দিয়াছেন, তিনি স্বীয় অতুল ধনের সার্থকতা করিলেন, এই অবনীমণ্ডলে তাঁহার চিরকীর্ত্তি সংস্থাপিত রহিল।

৩০ জ্যৈষ্ঠ ১২৬২। ১২ জুন ১৮৫৫

'বিধবাবিবাহ'

পরম মান্যবর শ্রীল শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদনঞ্চেতৎ।

নিম্নদেশে কয়েকটী বর্ণমালা মসীসূত্রে গ্রন্থন করিয়া ভবসদনে প্রেরণ করিতেছি। দোষাদোষ সংশোধন পূর্ব্বক ভবদীয় প্রভাকর পত্রাঙ্গে পরিধাপন করত অকিঞ্চনের আকিঞ্চন সম্পূর্ণ করিবেন।

অধুনা ভুলুয়া প্রদেশে প্রভাকর পত্রিকায় বর্ণিত বিধবা বিবাহের প্রসঙ্গ পরম্পর জনশ্রুতি হওনে এ প্রদেশস্থ আপামর সাধারণ সকলেরি এমত মনোরঞ্জনোৎসাহের সহিত লোলুপ যে অহরহ হাটে ঘাটে গোঠে মাঠে গমনে ভ্রমণে গৃহে প্রাঙ্গণে উত্থানোপবেশনে ভোজনে শয়নে বোধকরি সুপ্তিসম্ভোগীয় স্বপনেও ঐ কথার আন্দোলন হইতেছে। যেস্থানে যাই সে স্থানেই ঐ কথা শুনিতে পাই, কেহ বলে, "রামমাণিক্য বাই, হুঞ্চনি, রাঁড়ির হাঙ্গা অইব" কেহ বলে, "ওবা, পাটারির পুং, হুঞ্চনি বাঁড়ির হাঙ্গা অইব। বিশেষতঃ রমণীমণ্ডলে ঐ সুধাসিক্ত প্রসঙ্গ উপলক্ষে নানাপ্রকার কৌতুক ও হাস্য পরিহাস্য রঙ্গরহস্য সর্ব্বদাই হয়। এই দিবস এই ভুলুয়ার অন্তর্গত পানপাড়া কাছারির অনতিদূর বামনী নামক পল্লীতে কোন কার্য্যবশতঃ অস্মদের গতি হওনে অবলোকন ও অত্যাশ্চর্য্য বাক্য কর্ণকুহরস্থ হইল যে এক গৃহস্থালয় মাণিক্যমালা ও পুষ্পমালা ও কণকমালা ও সোনামালা ও রঙ্গমালা ও মোহনমালা প্রভৃতি কতিপয় সধবা বিধবা নবীনা ও প্রাচীনা কুলাঙ্গনা গৃহপ্রাঙ্গণে চক্রাকারে উপবিষ্ট

প্রস্তর ফলক। চাংড়িপোতা গ্রামে (সুভাষগ্রাম) মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের গৃহে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী জন্মগ্রহণ করেন।

হওত পরমোৎসাহে সাষ্টাঙ্গ ভঙ্গিক্রমে বিধবাবিবাহের প্রস্তাব করিতেছে। রামমালা নাম্নী অত্যল্প বয়স্কা এক বিধবা গৃহমধ্যে শয়নে ছিল, মাণিক্যমালা তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "রামমালা কণ্ডাইলা" রামমালার উত্তর, "আঁই গরের বিতর হুইছি।" ও "পোড়া কণ্ডয়ালি। তুই আর হোতনের দিন পাচ্নানি? এরো আয়, ডাবাগাৎ একটু তামুক বরি, ডাবাগা আঁরে দেচাই" রামমালা তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করণান্তে তামাক সাজিয়া হুঁকটী মাণিক্যমালার হস্তে প্রদান করত রমণী সমাজে উপবিষ্ট হইল। মাণিক্যমালা হুঁকটী বাম হস্তে ধারণ পূর্ব্বক তামাক খাইতে খাইতে মৃতুমন্দাস্যে কহিতে লাগিল, "তোরা হুগলে হুঞ্চনি, রাঁড়ির হাঙ্গার অইন অইচে" তচ্ছ্রবণে তাহারা কহিল, "তোরা এই কথা কনে কইছে, কণ্ডাই হুঞ্চচ্, হাঁচা মিছা কচ্" সে কহিল, "হাঁচা হাঁচা, আমাগো বাড়ির বুডাতে, পানপাডা কাচারিৎ গেছিল্ হেইতে, হমাচারের কাগজে হুনি আই কইছে" এতাবতা হিতকর বাক্য শ্রবণে ঐ বৈধব্য সন্তপ্তা বালাগণ অসীম বস প্রবাহে নিমগ্না হইয়া ভাবি উৎসাহে রসোল্লাসিনী হইয়া অতি সুললিত স্বরে যে সভ্য বাক্য প্রযোগ প্রবৃত্ত হইল, তৎপাঠে পাঠকবৃন্দও সন্তোষিত হইতে থাকিবেন। ওল্মতিলার উক্তি, এতদিনে বুজি বগবান গোহাই ··

বিধবা বিবাহেব ব্যবস্থাপক তদানুসঙ্গিক সাহায্য কাবক মহাশয়েবা ও সম্পাদক মহাশয় প্রস্তাবিত বিষয়েব কিঞ্চিৎ পবিবেদনা করিলেই ষষ্ঠীরও সম্মান থাকে ভুজঙ্গের পঞ্চত্ব লব্ধ হয় না। ভবসা কবি এরূপ ব্যাপাবে প্রশংসিত মহাশযের অবশ্যই সদুপায়ের মার্গ পরিষ্কাবে বিরত হইবেন না।

১৫ আষাঢ় ১২৬২। ২৮ জুন ১৮৫৫

রেলওযেব কথা

রেইলওয়ে সংক্রান্ত ব মচারিদিগেব অত্যাচার ক্রমে অতি ভয়ানক হইযা উঠিয়াছে. আমারদিগের রাজপুরুষগণ অথবা উক্ত কার্য্যের প্রধান অধ্যক্ষ শ্রীযুত আর মেকডোলেণ্ড ষ্টিফেন্সন সাহেব তাহাব প্রতীকারার্থ কিছুই মনোযোগ করেন না, কি আশ্চয্য। আহা যাহারা তৃতীয় শ্রেণীব শকটারোহণে গমনাগমন করে তাহারদিগের দুঃখ বর্ণনা করা যায় না, কোন ব্যক্তি হাবড়াতে তৃতীয় শ্রেণীব টিকিট ক্রয় করিতে গেলে কি সাহেব কি সামান্য চাপবাসি সকলেই তাহার উপর বিরক্ত হইয়া উঠে, ধাক্কা দেয়, ঠেলা মারে, সময়ে সময়ে বেত্রাঘাতও করিযা থাকে, ঐ ব্যক্তি এই সমস্ত ক্লেশ স্বীকার করিয়া যদ্যপি টিকিট প্রদানের গর্ত্তেব সম্মুখে গিয়া ৵০ তিন আনার একখানি টিকিট চাহে তবে বিক্রেতা রৌপ্য মুদ্রা চাহেন ক্রেতা ৵০ মূল্যের বৌপ্য মুদ্রা কোথায় পাইবে, অতএব যদ্যপি টাকা কিম্বা আধুলি দিয়া অবশিষ্ট পয়সা চায় তাহা গোলযোগে প্রায় প্রাপ্ত হয় না। সুচতুর ও বলবান

লোকেরাই তাহা পাইয়া থাকে, এইরূপে টিকিট ক্রয় করিতে পারিলেই যে ঐ ব্যক্তির ক্লেশ নিবারণ হয় এমত নহে, সে গাড়িতে উঠিবার স্থানে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলে তথাকার প্রহরিরা তাহাকে ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দেয়, এই সমস্ত যন্ত্রণা সহ্য করিয়া গাড়ি আরোহণ করিলেও তাহার নিস্তার নাই, সাহেব ও চাপরাসিগণ গাড়িতে অধিক লোক পুরিবার নিমিত্ত ঘুসা ও ধাক্কা মারিতে থাকেন, এইরূপে গাড়ি পরিপূর্ণ হইলে এবং সকলের অঙ্গ প্রসারণের শক্তি অবরোধ হইলেও যদ্যপি কোন ব্যক্তি টিকিট লইয়া উপস্থিত থাকে তবে তাহাকে জানোয়ারের গাড়িতে তুলিয়া লয়েন, তৃতীয় শ্রেণীর আরোহিদিগকে যে প্রকার ক্লেশ সহ্য করিতে হয় তাহা আমরা আর লিখিতে পারি না, আমেরিকার গোলামের জাহাজের যে ছবি দেখা হইয়াছে ইহা ঠিক সেইরূপ।

আমরা রেইলওয়ের কর্ম্মচারিদিগের ব্যবহার দৃষ্টে চমৎকৃত হইয়াছি প্রথম শ্রেণীর গাড়িতে চড়িবার নিমিত্ত কোন সাহেব বা বিবি গমন করিলে তাঁহাবদিগের সহিত অত্যন্ত সরল ব্যবহার করেন, যথেষ্ট সম্মানও করিয়া থাকেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ির আরোহিগণেরও তাদৃশ ক্লেশ নাই, আক্ষেপের কথা কি ব্যক্ত করিব, যত অত্যাচার কেবল তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ির আরোহিদিগের প্রতি হইতেছে, আবার গাড়িতে যে উপর নিচে থাক বান্ধা হইয়াছে তাহাতে উপরের লোকেরা নিম্নভাগের লোকদিগের উপর থুথু গয়ার ফেলিয়া থাকে, রেইলওয়ে কোম্পানিদিগের যে হিসাব প্রকাশ হইয়াছে, তাহাতে ব্যক্ত করিয়াছেন যে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ির অপেক্ষা তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ি হইতে অধিক টাকা উৎপন্ন হইয়া থাকে, অতএব যাহাদিগের নিকট হইতে অধিক আয় তাহারদিগের প্রতি অত্যাচার ও প্রহারাদি করা ও বস্ত্রাদি ছিঁড়িয়া দেওয়া কি সামান্য অন্যায়? রেইলওয়ের রিপোর্ট পুস্তকেই প্রকাশ আছে যে এক সপ্তাহের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর গাড়িতে ৪৬৭ দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়িতে ১১৮৪ এবং তৃতীয় শ্রেণীর গাড়িতে ৫৮৬৪ ব্যক্তি গমন করিয়াছে, অতএব যে গাড়িতে বহুলোকের সমাগম ও অধিক আয় তাহার নিমিত্ত উত্তম নিয়মাদি না হইলে রেইলওয়ের উপকার সাধারণ রূপে বিস্তার হইতে পারে না, এবং রেইলওয়ে কোম্পানীদিগের আয়ও বৃদ্ধি হয় না, তৃতীয় শ্রেণীর গাড়িতে লোকে গমনাগমন না করিলে কি এ দেশে রেইলরোড রক্ষা হইতে পারে? নৌকা গাড়ি ইত্যাদি সকল প্রকার যানে লোক গমনাগমনের নিয়ম আছে কেবল রেইলওয়ের নিয়ম থাকিবেক না, ইহা কি অল্প অবিচার।

আমরা উপরিভাগে যে বিষয় উত্থাপন করিলাম তদ্ব্যতীত রেইলওয়ে কর্ম্মচারিদিগের আরো অনেক অত্যাচার আছে, মূর্খলোকগণ যাহারা ইংরাজী পড়িতে জানে না তাহারদিগের নিকট হইতে বর্দ্ধমানের টিকিটের মূল্য লইয়া বালির টিকিট দেয়, সে ব্যক্তি অনবধানতা প্রযুক্ত তাহা বর্দ্ধমানের টিকিট বলিয়া রক্ষা করে, বালিতে গাড়ি উপস্থিত হইলে ও ডাক হইলে সে নাবে না, সুতরাং সে ব্যক্তি বর্দ্ধমান গিয়া সেই টিকিট দেখাইলে ঘোরতর যন্ত্রণায়

পতিত হয় তথাকার কর্ম্মচারিরা তাহাকে প্রতারক বিবেচনা পূর্ব্বক পুলিসে প্রেরণ করেন, অপিচ কোন ব্যক্তি শ্রীরামপুর প্রভৃতি কোন স্থানে টিকিট কিনিয়া কর্ম্মচারিদিগের অত্যাচার জন্য যদ্যপি শকটে আরোহণ করিতে না পারে তবে ষ্টেসিযান রক্ষক টিকিট লইযা তাহাকে পয়সা দেয় না, তাহাকে নিরর্থক ব্যয স্বীকার কবিতে হয়, এইরূপ রেইলওযে কর্ম্মচারিদিগের বিস্তর অত্যাচার আছে, একত্রে সকল লিখিতে হইসে এক সপ্তাহেব প্রভাকরেও স্থানের সঙ্কীর্ণতা হয, এই সমস্ত অত্যাচাবে অনেকে বিবক্ত হইযা রেইলওযেব গাড়িতে গমন করণে ক্ষান্ত হইতেছেন, রেইলওযের কর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয়েরা এই সকল অনিয়ম সংশোধন ও অত্যাচাব নিবাবণ পূর্ব্বক যদ্যপি তৃতীয শ্রেণীব গাড়ির আরোহিদিগের প্রতি কিঞ্চিৎ সুবিবেচনা করেন তবে আরোহির সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতে পারে, আমরা যে কথা উত্থাপন করিলাম ইংলিসম্যান পত্রের কোন পত্রপ্রেরক অতি বিস্তাবিত রূপে তাহাব বর্ণনা করিয়াছে, এই বিষযের তথ্যানুসন্ধান নিমিত্ত যদ্যপি কতিপয উপযুক্ত ব্যক্তিকে কমিটি রূপে নিযুক্ত কবিযা সাক্ষ্য গৃহীত হয় তবে শ শ শত ব্যক্তি সই কমিটিব সমীপস্থ হইযা সাক্ষ্য দিতে পারেন।

৩০ আষাঢ ১২৬২। ১৩ জুলাই ১৮৫৫

বাংলা পাঠশাল

আমবা অবগত হইলাম যে গবর্ণমেণ্ট সঙ্কল্পিত বাঙ্গালা পাঠশালা সকলের শিক্ষকতা পদে অভিষিক্ত হইবাব অভিপ্রাযে যে সকল ব্যক্তি পবীক্ষা দিযাছেন তাঁহারা আপাততঃ কায্য প্রাপ্ত হইবেন না, তাঁহারদিগকে শিক্ষাদানের রীতিনীতি সমস্ত শিক্ষা ও অপরাপর পুস্তকাদি অধ্যযন করিতে হইবেক, তাঁহাবা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইবেন, এক শ্রেণীস্থগণ বিনাব্যযে পাঠ করিবেন অপর শ্রেণীস্থগণ ৫ টাকা অথবা ৬ টাকা মাসিক বৃত্তি পাইবেন, বিদ্যাধ্যাপন কাযোর ডিবেক্টব জেনেরল সাহেব এই অভিপ্রায কার্য্য কবাতে আমরা পরম সন্তুষ্ট হইলাম, কাবণ যাহারা বঙ্গভাষা লিখন পঠনে কিঞ্চিৎ পাবদর্শি হইয়াছেন ঐ বিদ্যালযে অধ্যযন করিলে তাঁহারদিগের শিক্ষা বৃদ্ধি হইতে পারিবেক এবং তথায় পবীক্ষা প্রদান পূর্ব্বক তাহারা প্রতিষ্ঠাপত্র পাইলে প্রদেশ মধ্যে গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত পাঠশালাব শিক্ষক হইবেন, কিন্তু ঐ পদের যেরূপ বেতন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাতে এইরূপ অনুশীলন পূর্ব্বক কায্য গ্রহণে অনেকে স্বীকৃত হইবেন না, তবে যাহারা বঙ্গভাষা কিছুই জানে না তাহারদিগেব কথা স্বতন্ত্র।

পবন্তু আমারদিগেব মনে আবো এক সংশয় জন্মিয়াছে ঐ শিক্ষকতা পদাকাঙ্খিদিগকে কে শিক্ষা প্রদান কবিবেন, যথার্থ প্রণালীসিদ্ধ বঙ্গভাষা লিখন পঠনে সুযোগ্য লোক আমরা অতি অল্প দেখিতেছি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগব মহাশয সর্ব্ববিধায়ে সুযোগ্য ও উপযুক্ত বটেন কিন্তু তাঁহাব এমত সময়ে কিছুই নাই যে যথানিযমে শিক্ষা প্রদান করিতে

পারেন, আমারদিগের বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় সুবক্তা ও সুলেখক এবং শিক্ষাপ্রদান বিষয়ে অতি যোগ্যপাত্র বটেন ফলতঃ তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা লিখনে নিযুক্ত আছেন, বিশেষতঃ তিনি যখন বঙ্গভাষায় পুস্তকাদি রচনা করণে অনুরাগী হইয়াছেন তখন সামান্য বেতনে শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন এমত বোধ হয় না বিচক্ষণবর শ্রীযুক্ত মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত বটেন কিন্তু তিনি গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত যে উচ্চপদ পাইয়াছেন তাহাতে বহু পরিশ্রমসাধ্য শিক্ষকের কার্য্য গ্রহণ করিবেন না। সংস্কৃত কালেজ হইতে যাঁহারা বহিষ্কৃত হইয়াছেন এবং তথায় এইক্ষণে অধ্যয়ন করিতেছেন তাঁহারদিগের অধিকাংশই উত্তমরূপে বাঙ্গালা ভাষা লিখিতে পারেন না, তাঁহারা ভালরূপ সংস্কৃত জানেন বলিয়াই যে বঙ্গভাষা লিখন পঠনে উপযুক্ত হইয়াছেন, একথা আমরা কদাচ বলিতে পারিব না, কারণ যে ব্যক্তি লাটিন ভাষা জানেন তিনিই ইংরাজিতে যে সুপণ্ডিত একথা কে বলিবেন? যদিও সংস্কৃত ভাষার সহিত বঙ্গভাষার সম্যক্ সম্বন্ধ আছে তথাচ বঙ্গভাষাকে এক স্বতন্ত্র ভাষা বলিতে হইবেক, বাংলা গদ্য পদ্য লিখিবার প্রণালী সংস্কৃত হইতে অনেক বিভিন্ন, কিন্তু যাঁহারা সংস্কৃত জানেন তাঁহারা বঙ্গভাষা শিক্ষা করিলে শীঘ্র শিক্ষা করিতে পারেন।

আমরা আরো অবগত হইলাম যে শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অধীনস্থ হুগলি, বর্দ্ধমান, কৃষ্ণনগর এবং মেদিনীপুরে যে সকল বাঙ্গালা পাঠশালা আপাততঃ স্থাপিত হইবেক, সংস্কৃত কালেজের ছাত্রেরাই তাহার শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইবেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কালেজের ছাত্রদিগকে নিযুক্ত করুন তাহাতে আমারদিগের কোন আপত্তি নাই, কিন্তু সংস্কৃত কালেজের ছাত্র বলিয়াই কার্য্য দিবেন না, যাহারা বঙ্গভাষা লিখন পঠনে বিলক্ষণ নিপুণ তাঁহারদিগকেই পদস্থ করিবেন।

আমরা আরো শুনিলাম যে মেং উডরো সাহেব এই বঙ্গ রাজ্যের পূর্ব্ববিভাগের বাঙ্গালা পাঠশালা সকলে তত্ত্বাবধায়কের পদে অভিষিক্ত হইয়া এরূপ অভিপ্রায় ধার্য্য করিয়াছেন যে তিনি কোন নূতন পাঠশালা স্থাপন না করিয়া গ্রাম্য গুরুমহাশয়দিগের পাঠশালার উন্নতিসাধন নিমিত্ত অর্থ দিয়া সাহায্য করিবেন ইহাতে বঙ্গভাষা শিক্ষা প্রদানের সুপদ্ধতি কিছুই হইবেক না।

১ শ্রাবণ ১২৬২। ১৬ জুলাই ১৮৫৫

কবি ভারতচন্দ্র

আমরা বহু পরিশ্রম বহু যত্ন, এবং বহু ব্যয় স্বীকার পূর্ব্বক কবিবর ও ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবন বৃত্তান্ত সংগ্রহ করত মুদ্রাঙ্কিত করিয়া তাহার এক একখানি পুস্তক ইংরাজী পত্র প্রকাশক মহাশয়দিগকে উপহার দিয়াছিলাম, তন্মধ্যে কলিকাতা লিটেরেরি গেজেট

পত্রের সুকবি ও বিখ্যাত সুলেখক সম্পাদক মহাশয় ঐ পুস্তক বিষয়ে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকট বিশেষ বাধিত হইলাম। এইক্ষণে যে সকল ব্যক্তি বঙ্গভাষায় পুস্তকাদি রচনা পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছেন তাঁহারদিগের মধ্যে প্রায় তাবতেই সংস্কৃত অথবা ইংরাজী পুস্তকের অবিকল অনুবাদ কিংবা তাহার ভাবার্থ প্রকাশ করেন, কদাচ কোন বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয় সংগ্রহ অথবা স্বয়ং লিখিতে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু আমরা যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছি ইহাতে কেবল রচনা অথবা ভাষান্তর করণের শক্তির আবশ্যক করে না, বহুকাল হইল যাঁহারা এই অবণী হইতে অবসৃত হইয়াছেন, শুদ্ধ কবিতা দ্বারা যাঁহারদিগের নাম দীপকের ন্যায় প্রকাশ আছে, তাঁহারা কোন সময়ে কোন দেশে কিরূপ অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিয়া কিরূপে বিদ্যানুশীলন ও বৈষয়িক কার্য্যকদম্ব নির্ব্বাহ করিয়াছেন কিরূপেই বা তাঁহারদিগের কবিতাশক্তির উদ্দীপন হইয়াছে আমারদিগের সেই সমস্ত বিষয়ের সূক্ষ্মানুসন্ধান করিতে হইতেছে, অতএব আমরা এক গুরুতর কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছি এ বিষয়ে বিদ্যোৎসাহি মহোদয়গণ আমারদিগকে সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান করিলে আমরা তাঁহারদিগের নিকট যাবজ্জীবন কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিব।

আমরা লিটেরেরি গেজেটের লিখিত বিষয় নিম্নভাগে অবিকল উদ্ধৃত করিলাম।

BENGALEE POET

The life of the great Bengalee Poet Bharut Chunder Roy By Eshwer Chunder Goopto, the Editor of the "Prabhakur" Calcutta, "Prabhakur" Press, 1855

[FROM A CORRESPONDENT

This work is a novelty in the literature of Bengal. Nothing similar to it is extant in the whole range of Bengalee literature. It is a move in the right direction, and we speak moderately when we say that this small unassuming pamphlet is calculated to be of far greater service to the Bengalee language than the late presumptuous and idle attempts to transfer to that language the masterpieces of British poetry and eloquence However opposed we may be to ill-judged and absurd proposals or attempts to substitute Bengalee literature and science for the literature and science of the West in giving the people of this country an education at all worthy of

the name, we are nevertheless not at all inclined to overlook anything really worthy of encouragement in Bengalee. Considering the subject-matter of the work before us, the well-known ability of its author, his peculiar aptitude for the theme he has handled, and above all, his unrivalled command of the sources of required information, we might be disposed, a priori, to class it among the best Bengalee books that have been published for a very long time past. Nor does its execution belie our anticipations. Inspite of all its defects, this first Biography of the first poet of Bengal is a most acceptable addition to Bengalee Literature. Much as we regret the scantiness of information regarding the personal history of the Poet,—his way of living with men and books—it is better that we should have such an outline of his life's story as there is in this book than remain totally in the dark, as we have heretofore been.

The author informs us that the present is but an experimental publication Should he succeed in securing for it an amount of sale sufficient to meet the labour and expense bestowed on its preparation and printing, he intends to follow it up by the Biographical Notices of other Bengalee Poets We congratulate our native contemporary on having presented us, in this durable shape, with his intellectual labours, which were before scattered over the pages of his periodical publication.

Bharut Chunder Roy was born about the year 1712 in the village of Perro, in the district of Burdwan. He was the youngest of four sons. Though descended from a respectable family in affluent circumstances, he had the misfortune to be early dependent on a near relative for his maintenance and education. While thus estranged from home, and before completing his fourteenth year he made himself proficient in the elements of the Sanskrit language. Soon after his returning to his family, he married a girl of a neighbouring village. Instead of finding favour in the eyes of his relations for his literary attainments, and domestic felicity from his

matrimonial connection, those circumstances exposed him to the reproof of his brothers, who blamed his imprudence in burdening himself with a wife before he had the means to support her, and wasting his energies upon the acquisition of a language which could be, as they supposed of no service whatever to a person in his situation Far from disheartening the young poet, their reproaches only served to excite him to the development of his high intellectual qualities Forthwith he resolved once more to quit the home of his fathers and not to return to it before making himself a perfect master of Persian—then the only passport to all high offices in the country. He repaired for this purpose to the house of a rich kyest, known under the title of Moonshees Here he is known to have been very hospitality treated by the Moonshees, and also unmindful of every thing else to have devoted his whole soul to the learning of Persian Now and then he would indulge his natural aptitude for poetic compositions, but these he was unwilling to shew to any person until the occurence of an event in the family with whom he resided When his genius as well as his private history were revealed, no one had the least previous suspicion that within the bosom of that youth slumbered the sacred fire of poetry. Having completed his Persian studies, probably at the age of twenty, he returned home once more where his brothers, discovering his high and useful acquisitions were delighted beyond measure They unanimously selected him as the fittest amongst them to act as their representative at the court of Burdwan from which their father had leased a small estate. Bharut Chunder accepted their proposal, and for some time transacted their business to the satisfaction of all parties Unfortunately for him his brothers failing to remit to him the requisite amount of rent in due time, the Raja of Burdwan rejected the claims of his father upon the estate he had leased, and Bharut having raised some objection to this course of conduct was thrown into imprisonment. He had not long to suffer the miseries of

a prison. for having prevailed upon the gaoler by his earnest entreaties he was permitted to fly in secrecy from the prison and hastened beyond the dominions of the Raja. He was accompanied in his flight by a servant who shared with him his various fortunes. Their kind reception by the Maratha Subhadar of Cuttack, his liberal order to the priests of Juggurnauth to let Bharut and his servant see whatever they liked and receive every day of their continuance the most sumptuous food without charge ; Bharut's frequenting the place of worship of the Bhisnubas ; his throwing off his ordinary habits for those of an ascetic ; his preparation for repairing to Brindabun—the scene of the youthful frolicks of Krishna ; his arrival in the course of his journey at the village where his Sister-in-law resided, the communication of his state to her husband by the poet's servant ; the earnest entreaties of his brother-in-law to induce him to relinquish the ascetic's life and his final success ;—all these events succeeded one another in the order in which they are noted Remaining for a short time with his brother-in-law he came to see his wife who was living with her father. The joy of this unexpected meeting can not be described , his wife had not seen him since the night of their marriage. A few day's residence here and a solemn request to his father-in-law not to send his wife to his house until he could earn his livelihood, concluded this interview.

We are now entering upon the bright part of this poet's history. Soon after leaving his father-in-law he repaired to the Dewan of the French settlement at Chandernagore. Here he obtained not only the kind promise of being served as soon as an opportunity occurred, but through the interference of the Dewan he very soon found means of being introduced to his great patron—the munificent encourager of learning and learned men*—the late Rajah Krishno Chunder Roy of Krishnagore. At the Court of this prince be obtained a monthly allowance of 40 Rs. and lodgings. At the commencement of his acquaintance with the Rajah he entertained him occasionally with

short and unconnected pieces of poetical composition. His patron, however, not contented with these fragmental production and satisfied that the poet was fully equal to something more elaborate and finished, suggested to him the composition of the Annoda-Mongol, our poet's great work, in imitation of the Chundy of Kobi kunkun, an earliar poet. Bharut daily wrote a portion of it and produced it in the presence of his highness where it was corrected and revised by the assembled wits of the court. Hence the unrivalled excellency of the poem subsequently our poet was required by the Rajah to incorporate the beautiful story of Biddha and Soondra into his original work as an episode. There is another episode, that of Bhobanundah Mojumdar in this poem, on which, as a whole depends his reputation as a poet There is another poetical work of his extent by name Rusho Munjuree This is little more than a translation of a Sanskrit work of that name But it is executed with more attention to taste and spirit than to the mere letter of the original The close of this poet's life was spent at Moolahjore, a village on the Hooghly, not far from Calcutta. Here blast with a numerous family and a respectable competence for which he was no less indebted to his own prudence and economy than to the libarality of his patron, and honoured and beloved by his neighbours and acquaintance, the poet died at the age of 48 in the year 1760 He has left an unfinished drama in imitation of the Sanskrit master. This fragment is not unworthy of him

১ শ্রাবণ ১২৬২। ১৭ জুলাই ১৮৫৫

সাঁওতাল বিদ্রোহ

রাজমহল হইতে কোন সংবাদদাতা যে পত্র লিখিয়াছেন আমরা তাহার স্থূলমর্ম্ম নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম। এতৎপাঠে পাঠক মহাশয়েরা চমৎকৃত হইবেন, এই কাণ্ডকে প্রকৃত তিতুমিরের কাণ্ড বলিতে হইবেক। এবিষয়ে আমাবদিগের যাহা বক্তব্য তাহা পরে প্রকাশ কবিব, অদ্য স্থানাভাব হইল।

অদ্য শ্রুত হইলাম যে জিলা ভাগলপুরের অধীন মোং রাজমহলের পশ্চিম অনুমান ৬।৭ ক্রোশ অন্তর ভগ্না ডিহি নামক পাহাড়ে প্রায় দশ বারো হাজার পাহাড়িয়া লোক একত্র হইযাছে, যাহারা ঐ অত্যাচারিদলের অধ্যক্ষপদে অভিষিক্ত হইয়াছে তাহারা দুই সহোদর, এক দিবস নিদ্রাভঙ্গে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক এরূপ ব্যক্ত করে যে পরমেশ্বর স্বপ্নে আমারদিগের সাক্ষাৎ হইয়া এরূপ আজ্ঞা করিযাছেন যে এই দেশ তোমারদিগকে প্রদান করিলাম, তোমরা পর্ব্বতীয় লোকদিগের সাহায্যে ইংরাজদিগকে দূরীভূত করিয়া স্বচ্ছন্দে পরমসুখে রাজত্ব কর, এই বিষয় কোন ধনাঢ্য যবন শ্রবণ করিয়া উক্ত দেবতার স্থান দর্শনার্থ গমন করাতে তাহারা তাহাকে ধৃত করত বন্ধন করিয়া রাখে, এবং ঐ অধ্যক্ষদিগের দলবল ক্রমে বৃদ্ধি হইতে থাকে, ঐ যবন বন্ধনাবস্থায় অতিশয় কাতর হইয়া মিনতি প্রকাশ করাতে ঐ রাজলোভী বুজরুক ভ্রাতাদ্বয় তাহাকে ক্ষমা করিয়া আপনারদিগের দলভুক্ত করে ও তিনি তাহারদিগের অধীনে লেখকের পদে নিযুক্ত হয়েন।

ঐ সম্ভ্রান্ত যবন এই প্রকার পদ প্রাপ্ত হইলে গোপনীয় পত্রদ্বারা দুইজন দারোগাকে তদ্বিশেষ বিজ্ঞাপন করিলেন।

৫ শ্রাবণ ১২৬২। ১৯ জুলাই ১৮৫৫

রাজমহলের পর্ব্বতীয় লোকদিগের অত্যাচার ক্রমে অতি ভয়ানক হইয়াছে, আমরা মুরশিদাবাদ ভাগলপুর ও আমড়ার রাজধানী হইতে যে পত্র পাইয়াছি তাহা নিম্নভাগে লিখিলাম।

"ভাগলপুর ১ জুলাই

সম্পাদক মহাশয়। ভাগলপুর, বীরভূম, রাজমহল, মুরশিদাবাদ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন জিলার পর্ব্বতবাসী অসভ্যলোক সকল একত্র দলবদ্ধ হইয়া রাজ বিদ্রোহ উপস্থিত করাতে চারিদিগে হাহাকার শব্দ উঠিয়াছে, মাজিষ্ট্রেট সাহেবরা ভীত হইয়া একত্র বাস করিতেছেন, প্রজাদিগের ধন প্রাণ রক্ষা করা দূরে থাকুক তাঁহারা আপনাপন প্রাণরক্ষার নিমিত্ত সঙ্কুচিত হইয়াছেন, দুরাত্মারা যেখানে গমন করিতেছে সেইখানেই নির্দ্দয়রূপে স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকার প্রাণ বিনাশপূর্ব্বক সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিতেছে, প্রায় বিংশতি ক্রোশ পর্য্যন্ত দেশ তাহারদিগের অধিকারভুক্ত হইয়াছে, তাহারদিগের সংখ্যা অন্যূন যোল হাজার হইবেক, ব্রিটিশ অধিকার মধ্যে এরূপ ঘটনা কোন কালেই হয় নাই, বর্গির হেঙ্গামা অপেক্ষা এই ব্যাপারকে অতি ভয়ানক বলিতে হইবেক, সম্পাদক মহাশয় আমি হৃত-সর্ব্বস্ব হইয়া ছিন্ন বসন পরিধান পূর্ব্বক এক কর্ম্মকারের গৃহে বসিয়া আপনাকে এই পত্র লিখিলাম।"

"আমড়া ১৩ জুলাই।

সম্পাদক প্রবর। পর্ব্বতবাসিদিগের ভয়ঙ্কর অত্যাচারের বিষয় লিপিতে বক্ষঃস্থল

বিদীর্ণ হইতেছে, তাহারা ঝিকরহাটীতে আসিয়া যে নিষ্ঠুর কার্য্য করিয়াছে বোধ হয় ব্যাঘ্রাদি পশুরাও তদ্রূপ করে না, অনল দ্বারা গৃহাদি দগ্ধ করিয়াছে, যাহাকে পাইয়াছে তাহাকেই কাটিয়াছে এবং যথাসর্ব্বস্ব লইয়া প্রস্থান করিয়াছে, আমি এই বিষয়ে ঐ অসভ্য পর্ব্বতীয় লোকদিগকে বড় দোষ করিতে পারি না। বিবেচনা করিলে গবর্ণমেণ্টের প্রতিই সকল দোষ অর্পিত হইতে পারে, কারণ নিকটস্থ কোনস্থানে সৈন্য থাকিলে কদাচ এরূপ হইত না।

সাঁওতাল জাতিদিগের বিলক্ষণ ঐক্য আছে, কোন বিপদ সময়ে তাহারা যদ্যপি পর্ব্বতের উপর নাগরা ধ্বনি করে তবে এক ঘণ্টার মধ্যে ৪।৫ হাজার লোক অস্ত্র ধরিয়া একত্র হয়, যে জাতির মধ্যে এরূপ একতা সেই জাতির নিকট সৈন্য রাখা কত আবশ্যক তাহা মহাশয়েরাই বিবেচনা করিবেন, যাহা হউক এই ঘটনায় গবর্ণমেণ্টের কোন ক্ষতি নাই যে ক্ষতি সে কেবল প্রজার। এই অত্যাচার ব্যাপার আবার কি পর্য্যন্ত প্রবল হয় তাহাও নিরূপণ করা অসাধ্য, কি কারণে ইহার সূত্রপাত হইয়াছে তাহাও নিশ্চয় হয় নাই, কেহ বলে তিতুমীরের ন্যায় দুইজন যবন বুজ্‌রুক ব্রিটীস অধিকার অপহরণের স্বপ্ন দেখিয়া এই ব্যাপার উপস্থিত করিয়াছে, কিন্তু দুরাত্মারা যখন কালীপূজা করিয়া তাহার সম্মুখে নরবলি দিতেছে, তখন যবনের দ্বারা এই ব্যাপার হয় নাই, কেহ বলে যে রেইলওয়ে সংক্রান্ত কর্ম্মচারিরা সাঁওতাল জাতীয় স্ত্রীলোক ধরিয়া বলাৎকার করিয়াছিল তাহাতেই তাহারা ঐক্য হইয়া যুদ্ধ সজ্জা করিয়াছে, কেহ আবার বলেন যে রাজস্ব সংগ্রহ বিষয়ে অত্যাচার হইয়াছিল, যাহা হউক বিস্তারিত জ্ঞাত হইয়া আমি পরে লিখিব।'

"বহরমপুর ১৪ জুলাই"।

আমি পুর্ব্বপত্রে লিখিয়াছি যে বিদ্রোহকারিদিগের দমনার্থ এখান হইতে ৫০০ সোয়ার ও ৪০টা হাতি ও দুইটা তোপ গিয়াছে নবাব নাজিম ২০০ সিপাহী দিয়াছেন, তাহারা কোন কালেই সংগ্রামের মুখ দেখে নাই, অতএব এই অল্প সেনার দ্বারা বিদ্রোহ নিবারণের কোন সম্ভাবনা নাই, একারণ দানাপুরে পত্র গিয়াছে যে স্থান হইতে সেনারা জলপথ দিয়া রাজমহলে উপস্থিত হইবেক, কলিকাতা হইতেও রেইলওয়ের গাড়িতে সৈন্য আসিলেক, দুরাত্মারা দমন হইবেক বটে, কিন্তু তাহারদিগের কোন বিশেষ হানি হইবেক না, পর্ব্বতের উপরে ভয়ানক শালবন আছে তাহারা তথায় গোপন হইলে রাজসেনারা তাহাদের কিছুই করিতে পারিবেন না, সাঁওতাল জাতি অতি ভয়ানক, তাহারা যাহা পায় তাহাই আহার করিয়া যুদ্ধ করিতে পারে তিরের যুদ্ধে তাহারা বিলক্ষণ নিপুণ, আমারদিগের মাজিষ্ট্রেট মেং টুগুড সাহেব অরঙ্গাবাদে অনরবিল মেং ইডেন্স সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন, ভাগলপুরের মাজিষ্ট্রেট সাহেব তথায় আসিয়াছেন, সেনারা অরঙ্গাবাদ হইতে ঘটনাস্থানের নিকটবর্ত্তি হওয়াতেও দুরাত্মারা ভয় পায় নাই, দুই এক দিবসের মধ্যে সাংগ্রামিক সমাচার প্রাপ্ত হওয়া যাইবেক।

৫ শ্রাবণ ১২৬২। ২০ জুলাই ১৮৫৫

ইয়ংম্যান্স লিটেরার সোসাইটি নামক সভায় বাবু মধুসূদন মুখোপাধ্যায় "বঙ্গদেশীয় নীচ জাতিদিগের বর্ত্তমান অবস্থা" বিষয়ে যে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন তাহা পুস্তকাকারে সম্প্রতি প্রকাশ হইয়াছে, আমরা তাহার একখণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি, মুখোপাধ্যায় মহাশয় যে যে কথার উল্লেখ করিয়াছেন তত্তাবৎ যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবেক, দেশীয় প্রথা ও জাতিভেদের নিয়ম উত্তোলন না হইলে এতদ্দেশীয় লোকেরা অন্যান্য দেশীয় লোকদিগের ন্যায় হইবেক না, আমারদিগের সেহ আশা দুরাশা বলিতে হইবেক, তাহা সিদ্ধ হইবার কোন সম্ভাবনাই নাই, মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের লেখা অতি উত্তম হইয়াছে, তিনি যে সকল প্রমাণ ও যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন তত্তাবৎ উত্তম বলিতে হইবেক, তাঁহার লেখা কিঞ্চিৎ সরল ও পরিষ্কার হইলে আরো উত্তম হইত আমরা পাঠক মহাশয়দিগেব বিদিতার্থ ঐ পুস্তকের কিয়দাংশ নিম্ন ভাগে উদ্ধৃত করিলাম।

"বঙ্গদেশীয় নীচজাতিদিগের বর্ত্তমান অবস্থা

বহুকালাবধি এই বঙ্গভূমিতে উত্তম, মধ্যম এবং অধম এই ত্রিবিধ জাতির বাস, ইহারা অন্যান্য দেশীয় লোকের ন্যায় পদমর্য্যাদা হেতুক আপনাদিককে উত্তম মধ্যম এবং অধম এই ত্রিবিধ জাতিতে বিভক্ত করে নাই, কিন্তু জাতিসঙ্কর নামক ব্যবস্থা গ্রন্থদ্বারা ভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইয়া স্ব স্ব শ্রেণীস্থ লোকদিগের সহিত আহার ব্যবহার বিবাহাদি ক্রিয়া কলাপ সকলই সমাধা করিতে থাকে।

বিস্তারিতরূপে লিখিবার পুর্ব্বে ঐ ত্রিবিধ জাতি কাহাকে কহা যায়, ইহা লেখা আবশ্যক বুঝিয়া সভ্য মহাশয়দিগের বিশেষ উপলব্ধি জন্মাইবার নিমিত্ত আমি উত্তম মধ্যম এবং অধম এই ত্রিবিধ জাতির বিষয় কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিয়া বলি।

উত্তম, যথা ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, ক্ষত্রিয়, ছত্রি, কায়স্থ ইত্যাদি যাহাদিগকে লোকসমাজ মধ্যে ভদ্রলোক বলিয়া উল্লেখ করা যায়।

মধ্যম, যথা তন্তুবায়, কর্ম্মকার, কাঁসারি, গন্ধবণিক, সদ্গোপ, তেলি, নাপিত, শঙ্খবণিক, তামলি, মালী, ইত্যাদি। ইহারা লোক সমাজ মধ্যে নবশাখ বলিয়া গণ্য হয়।"

... ...

রাজমহল, ভাগলপুর, মুরসিদাবাদ, জঙ্গিপুর অরঙ্গাবাদ, আমড়া, জিয়াগঞ্জ ইত্যাদি স্থান হইতে আমরা যে সকল পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি এবং ইংরাজী পত্রে যাহা প্রকাশ হইয়াছে তদ্দারা নিশ্চয় প্রতীতি হইতেছে যে সাঁওতাল জাতিরা কোনকালে রাজ-বিরুদ্ধাচরণ করে নাই তাহারা চিরকাল রাজানুগত ও পরিশ্রম তৎপর, তাহারদিগের পরিশ্রমে রাজমহলের পর্ব্বোপরি বিচিত্র উদ্যান ও নগর নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহারা কৃষিকার্য্যের দ্বারা প্রচুর শস্য উৎপন্ন করিতেছে, মেং পটেণ্ট সাহেব যে সময়ে

ঐ পর্ব্বতের রাজস্ব বিষয়ের ভার গ্রহণ করেন সে সময়ে কেবল ৩০০ মাত্র সাঁওতাল জাতি তথায় বাস করিয়াছিল এইক্ষণে তাহাদিগের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ হইয়াছে এবং দক্ষিণ পর্ব্বত হইতে সাঁওতাল জাতি অধিক পরিমাণে আগমন করিতেছে তাহারা বাঙ্গালীর ন্যায় ভীরুস্বভাব নহে বলবান এবং সাহসিক। রেইলওয়ে সংক্রান্ত কর্ম্মচারীরা তাহাদিগের প্রতি নানা বিধায়ে অত্যাচার করাতে তাহারা অস্ত্র ধারণ করিয়াছে।

রেইলওয়ে কর্ম্মচারিগণ হুগলি ও বর্দ্ধমানে যে প্রকার অত্যাচার করিয়াছিলেন তাহাতে আগেকার ভীরু স্বভাব লোকেরা কোন আপত্তি না করাতে তাঁহাদিগের সাহস বৃদ্ধি হইয়া গিযাছে কিন্তু বলবান লোকেরা কেন তাহা সহ্য করিবেক? আমরা অবগত হইলাম যে রেইলওয়ের কর্ম্মচারিরা সাঁওতালজাতির যুবতি স্ত্রীলোকদিগকে ধরিয়া বলৎকার করিয়াছেন, কোন কোন স্ত্রীলোকদিগকে ধরিয়া পাচ সাত দিবস আপনাদিগের নিকট রাখিয়াছেন, তাহাদিগের উদ্যান হইতে বল দ্বারা ফল কাষ্ঠাদি লইযাছেন তাহার মূল্য দেন নাই, সাঁওতাল লোকদিগকে পরিশ্রম করাইয়াছেন অথচ মূল্য কিছুই দেন নাই, বলবান জাতি এ অত্যাচার কেন সহ্য করিবেন? এই বিষয়ের বিশেষ তদন্ত অতি আবশ্যক, যাহারা চিরকাল রাজানুগত তাহারা বিনা কারণে রাজবিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিযাছে এ কথা কে বলিবেন?

আমাদিগের কোন সংবাদদাতা লিখিযাছেন যে প্রায় ৩০০০০ হাজার পর্ব্বতী-য় লোক একত্র দলবদ্ধ হইয়া অস্ত্র ধরিয়াছে, তাহারা দুই দলভুক্ত হইযাছে, একদল বীরভূমাভিমুখে গিয়াছে. অপর একদল সম্মুখস্থ সকল গ্রাম দগ্ধ করিয়া প্রজাদিগের প্রাণ বিনাশ ও দ্রব্যাদি লুঠ করিতে রঙ্গিপুরাভিমুখে আগমন করিতেছে, তাহারদিগের এমত প্রত্যাশা আছে যে জিযাগঞ্জ ও মুর্শিদাবাদ লুঠ করিবেক, কিন্তু এতদিনে বোধহয় রাজসেনারা তাহারদিগের আগমনের পথ রুদ্ধ করিযাছে, কযেকজন বিবির প্রতি দুরাত্মারা যে প্রকার অত্যাচার করিয়াছে তাহা লিখিয়া বর্ণনা করা যায না, কয়েকজন সাহেব হত হইযাছে।

কমিস্যনর সাহেব এক পলটন্ সিপাহী লইয়া বীরভূমাভিমুখে গিয়াছেন, বোধহয় বিদ্রোহকারিরা তথায় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে তিনি উত্তীর্ণ হইবেন।

গত দিবস সন্ধ্যার সময়ে সংবাদ আসিয়াছে যে ১৫ জুলাই সোমবার প্রাতে মহেশপুরে রাজসেনারা সাঁওতালদিগকে আক্রমণ করে, তাহাতে প্রথমতঃ তাহারা তির ও বন্দুক ধরিয়া যুদ্ধ করে, পরে রাজসেনারা গুলিবৃষ্টি করাতে তাহারা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া প্রস্থান করিয়াছে একশত সাঁওতাল হত ও একশত আঘাতি হইয়াছে, ২৮ জন ধরা পড়িয়াছে। ৫০০ নগদ টাকা ও অন্যান্য দ্রব্যাদি পাওয়া গিয়াছে। রেইলওয়ের কর্ম্মচারি টেলর সাহেব ভালরূপে যুদ্ধ করিয়াছেন। বিস্তারিত সংবাদ আমরা আগামি পত্রে লিখিব।

৮ শ্রাবণ ১২৬২। ২৩ জুলাই ১৮৫৫

মুর্শিদাবাদের মাজিষ্ট্রেট মেং টুগুড সাহেব লেপ্টেনাণ্ট গবরণর সাহেবের নিকট যে পত্র লেখেন তাহা ইংলিসম্যান প্রভৃতি পত্রে প্রকাশ হইয়াছে যদিও ঐ সংবাদ আমরা অরঙ্গাবাদের সংবাদদাতার পত্র দ্বারা প্রাপ্ত হইয়া পুর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি, তথাচ মেং টুগুড সাহেবের পত্রের মর্ম্ম কিঞ্চিৎ গ্রহণ করা আবশ্যক বোধ করিলাম। "তিনি ১৪ জুলাই তারিখে সৈন্য লইয়া পলসায় উপস্থিত হয়েন, সেখানে রাজবিরোধীদিগকে দেখিতে পান নাই, তাঁহার গমন করিবার পুর্ব্বেই সাঁওতালেরা ঐ গ্রাম লুঠ করিয়া মহেশপুরাভিমুখে যাত্রা করে, সেনারা ধান্য ক্ষেত্র দিয়া গমন ও নদী নালা পার হইতে বিস্তর ক্লেশ পায় কিন্তু পলসাতে তাহারা বিশ্রাম করে নাই, একেবারে মহেশপুরে গিয়া ১৫ তারিখে প্রাতঃকালে এক সরোবরের নিকটে প্রায় ৩।৪০০০ সাওতালকে আক্রমণ করে, ঐ দলের অধ্যক্ষ সিদু ও কিনু তাহারদিগের আদেশক্রমে সাঁওতালেরা তির ছুঁড়িয়াছিল তাহাতে কেবল ৫ জন সেপাই অল্পাঘাতি হইয়াছে। বিপক্ষদিগের একশত হত ও একশত নিহত হওয়াতে তাহারা অতি বেগে জংলের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। সেনারা তাহারদিগের পশ্চাদ্বর্ত্তি হইতে পারে নাই, মহেশপুরে বিখ্যাত জানকী কুমারীর স্বামী গোপাল সিংহের বাটী ঐ অতি উচ্চ প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত, দুরাত্মারা তাহা আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হয় নাই

রাজসেনারা কয়েকখানা পাল্কি, বগিগাড়ি পিত্তল ও কাংশ্য নির্ম্মিত নানা প্রকার তৈজস, রেসম, বস্ত্র ও প্রায় ৫০০ টাকা মূল্যের যুদ্ধাস্ত্র ৭২৬০৫/০ নগদ পাইয়াছে, ২৮ জনকে কয়েদ করিয়াছে, ফলতঃ বিপক্ষেরাও অনেক দ্রব্যাদি লইয়া প্রস্থান করিয়াছে, দুইটা হস্তির উপর বিস্তর নগদ টাকা ছিল তাহা রাজসেনারা লইতে পারে নাই।

ভগ্নাডিহী নামক স্থানে সাঁওতালদিগের ঠাকুর বাটী, টুগুড সাহেব সৈন্য লইয়া সেই স্থানে যাইবেন, যেহেতু ঐ ঠাকুরের প্রত্যাদেশ হইয়াছে যে যুদ্ধ সময়ে ইংরাজদিগের বন্দুক হইতে কেবল জল নির্গত হইবেক, ইহাতেই মূর্খ লোকেরা রাজবিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছে এইক্ষণে কিছু দিবস অরঙ্গাবাদ অথবা পলসা কিম্বা মহেশপুরে সৈন্য রাখিতে হইবেক, শীত ঋতুর আগমন না হইলে জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করা যাইবে না, কিন্তু যাহাতে উপস্থিত অত্যাচার নিবারণ হয়, এবং ছষ্টেরা প্রজাদিগের প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার করিতে না পারে এমন উপায় করিতে হইবেক।

আমরা জঙ্গীপুরের সংবাদদাতার পত্র নিম্নভাগে গ্রহণ করিলাম।

জঙ্গীপুর ৩ শ্রাবণ।

"সম্পাদক মহাশয় সাঁওতাল জাতিরা বেলিয়া ও পলসা ও পুকর ও মহেশপুর ইত্যাদি কতিপয় গ্রাম দগ্ধ ও লুট করিয়া বহু প্রজার প্রাণ বিনাশ ও অর্থ এবং দ্রব্যাদি

গ্রহণ পূর্ব্বক জঙ্গীপুরাভিমুখে আগমন করিতেছে যাহাকে সম্মুখে দেখিতেছে তাহাকে ছেদন করিতেছে, লোকসকল নিজ নিজ গ্রামাদি হইতে পলাইয়া আসিতেছে, জঙ্গীপুর এবং নিকটস্থ গ্রামাদিতে দুই তিন হাজার লোক আসিয়াছে এখানকার লোকেরাও সুস্থ নহেন কখন কি হয় কখন কি হয় এ চিন্তায় তাহারা এক প্রকার আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছে, বহরমপুর হইতে ৫০০ সিপাহী মহেশপুরে গিয়া ২।৩ শত সাঁওতালকে হত করিয়াছে, অধুনা তাহারদিগের দলে কতলোক আছে এ পর্যান্ত তাহা নিশ্চয় হয় নাই। এই প্রকার অত্যাচার ব্যাপার কোনকালে শ্রুত হই নাই, যে সকল লোক এখানে আসিয়াছে তাহারদিগের দুঃখ দেখিলে বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া যায়।"

বর্দ্ধমানের সংবাদদাতার পত্র নিম্নভাগে প্রকটিত হইল।

"আমারদিগের এই বর্দ্ধমানবাসি ধনি ও দুঃখি সকলেই অতিশয় ত্রাসযুক্ত হইয়াছেন, তদ্ধেতু এই, ধনি লোকেরা আগত রাজবিদ্রোহী পর্ব্বতীয় সাঁওতালগণের দৌরাত্ম্য সংবাদ শ্রুত হইয়া ধন, মান, প্রাণ রক্ষার বিবিধ প্রকার উপায় চিন্তা করিতেছেন, যথা কেহ বা দ্বার দেশে নিযমিত প্রহরির দশ গুণ বৃদ্ধি করিয়াছেন, কেহ বা মৃত্তিকা খনন পূর্ব্বক অর্থ লুক্কায়িত করিয়া কেবল ত্রাহি মধুসূদন ত্রাহি মধুসূদন এই শব্দ করিতেছেন কেহ বা সংবাদ পত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া স্থির রহিয়াছেন, কেহ বা কোম্পানি বাহাদুরের সৈন্য কত গুলিন গেল তাহারি সংবাদ রেইলওয়ে ষ্টেসনে জানিতেছেন, ইত্যাদি প্রকারে মহা কোলাহল রব উঠিয়াছে, ধবল রাজপুরুষেরা অতিশয় সঙ্কুচিত হইয়া বন্দুক ও বারুদ আদি আগ্নেয়াস্ত্র সুশোভন করিতেছেন, সাঁওতাল জাতীয়দের গুরুতর কোপ কেবল তাহারদের উপর, বীরভূম, রাজমহল আদি অনেক জিলায় রেইলওয়ে সংক্রান্ত কয়েকজন সাহেব ও বিবিকে অস্ত্রের দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়াছে এবং বীরভূমের মাজিষ্ট্রেট সাহেব অতিশয় বিপদাপন্ন হইয়াছেন, শুনা গেল যে তিনি দশ সহস্র সাঁওতাল জাতির মধ্যে পতিত হইয়াছেন, এবং তাঁহার জীবনের আশাও বিপথগামী হইয়াছে, এই সকল কারণ বশতঃ অনেক সিপাহী ঐ অঞ্চলে প্রেরিত হইয়াছে কিন্তু গবর্ণমেণ্টের এক নিদারুণ বিচার, আগত শমন সম দুরাত্মাগণের আগমন বার্ত্তায় প্রজাগণের ব্যাকুলতা দর্শন করিয়া তাহাদিগকে ভরসা দেওয়া ও সান্ত্বনা করা দূরে থাকুক অদ্য তিন দিবস হইল বেগার ধরার হেঙ্গামায় দুঃখিজন মাত্রেই দ্বারের বাহির হইতে পারে নাই, কি আশ্চর্য্য। তাহারা দুঃখিলোক দৈনিক শ্রমের প্রতি তাহাদের উপজীবিকার নির্ভর সুতরাং তাঁহাদের দৌরাত্ম্য নিবারণ না হওয়ায় তাহারা সপরিবারে অন্নাভাবে সমূহ ক্লেশ পাইতেছে, শুনা যায় সাত শত কুলির আবশ্যক, ইহাতে কেবল নীচ জাতীয় ব্যক্তিগণের প্রতি অত্যাচার করিতেছেন, এমত নহে, বর্দ্ধমান বাসিন্দা এ কার্য্যোপলক্ষে স্থায়ি লোকেরদের প্রতিও দৌরাত্ম্য হইতেছে, কারণ ভদ্রলোকেরা স্বয়ং যাইয়া হাট বাজার করিয়া আনিতে পারেন না, চাকরদিগে যাইতে হয়, কিন্তু ঐ হেঙ্গামায় তাহারাও প্রাণভয়ে যাইতে অসম্মত, এজন্য তাঁহাদিগের অতিশয় ক্লেশ হইয়াছে অপিচ,

অনেক লোকের ভৃত্যকেও ধরিয়া লইয়া গিয়াছে, নীচ জাতিদিগের প্রতি অত্যাচারের কথা কি কহিব, কয়েকজন ব্রাহ্মণ বাজারে গিয়াছিলেন, তাহাদিগকে ধৃত করে, তাহাতে তাঁহারা মিনতিপুর্ব্বক কহেন যে হে বাপু আমরা ব্রাহ্মণ আমরা যাইয়া কি করিব, তাহাতে কোম্পানির লোকেরা উত্তর করিল যে বেগারদিবার প্যাঁচ কি কেহ নাই, তোমাদিগকে তদুপলক্ষে যাইতে হইবেক বলিয়া লইয়া গেল, আর কয়েকজন ব্রাহ্মণকে ঐ মতে ধৃত করিয়াছিল, আহারা অতিশয় বলবান এজন্য "প্রহারেণ ধনঞ্জয়:" ঔষধ অবলম্বন করিয়া অতিবেগে তাহাদের হস্ত ছাড়াইয়া প্রস্থান করিল। হায় ক্ষমতাবানের নিকট সকলেই নত, শ্রীলশ্রীযুত বৰ্দ্ধমান অধীশ্বরের কয়েকজন বেহারাকে ধৃত করিয়াছিল, এই সংবাদ শ্রীযুতের কর্ণগোচর হইবামাত্র মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে তৎক্ষণাৎ এক চিটি লেখেন যে এ প্রকার দৌরাত্ম্য আমার চাকরদিগের প্রতি হইলে তোমাদের অতিশয় দুর্নাম হইবেক, অতএব যাহাদিগকে ধৃত করা হইয়াছে তাহারদিগো অবিলম্বে প্রেরণ করিবে, উক্ত সাহেব ক্ষণকাল গৌণ না করিয়া তৎলিপি পাঠ করিতে করিতে তাহাদিগকে বিদায় দিলেন, এবং এইমত হুকুম প্রচার করিলেন যে ভবিষ্যতে কেহ মহারাজার সম্পর্কীয় লোকদিগকে আক্রমণ না করে তদবধি অনেকেই অধীরাজ বাহাদুরের দোহাই দিয়া ইংলণ্ডীয় শমন হস্ত হইতে কিমতে পরিত্রাণ পাইবেক তাহার কোন রাহা দেখি না। বৰ্দ্ধমান স্থানস্থ রাজপুরুষেরা আপনাদিগের রক্ষার কোন উপায় স্থির করিতে পাবেন নাই, প্রজাগণের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষি কি হইবেন তবে এক উপায় দেখিতেছি যে বর্দ্ধমানাধিপতির মনোভিনিবেশ হইলে বর্দ্ধমান বাসিরা নিরাপদে থাকিতে পারে, ৺ না করুন যদি এমত কোন বিপদ উপস্থিত হয় যে বর্দ্ধমান ছারখারে যাইবার সম্ভাবনা তাহা হইলে শ্রীযুতকে অবশ্যই বর্দ্ধমানবাসিগণের রক্ষার উপায় করিতেই হইবেক, অতএব আমাদের অভিলাষ যে আমাদের কর্ত্তা যেন গবর্ণমেণ্টের শান্তি রক্ষার প্রতি নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত না থাকেন। হে সম্পাদক মহাশয়! তিনি নিশ্চিন্ত থাকিলে বর্দ্ধমানবাসিগণকেও নিশ্চিন্ত পুরবাসি হইতে হইবেক দাদার যে মত বন দিদির পাদপদ্মে প্রকাশ আছে, জিলাস্থ শান্তিরক্ষকদিগের যাদৃশ ক্ষমতা তাহা দেখা যাইতেছে, যে সকল গ্রাম বা দেশে ঐ সাঁওতাল জাতিদিগের আসিবার কল্পনা হইতেছে তত্রস্থ লোকেরা প্রাণভয়ে পুর্ব্বাহ্লেই পলায়ন পরায়ণ হয়, ইত্যবধানে তাহাদের ভরসা আমরা সামান্য করি, পরে যেমত হয় সংবাদক হইব নিবেদন

মোং বৰ্দ্ধমান। কেষাঞ্চিৎ ভীত জনানাং।"

৪ শ্রাবণ ১২৫২।

পরিশিষ্ট ২

'জ্ঞানান্বেষণ' : ১৮৩২-৩৯ রচনা-সংকলন

[বাংলাভাষায় 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীর (ডিরোজীয়ান) অন্যতম মুখপত্র 'জ্ঞানান্বেষণ' ১৮ জুন ১৮৩১ সনে প্রকাশিত হয় এবং প্রায় দশ বছর চলবার পর ১৮৪০ সনের নভেম্বর মাসে বন্ধ হয়ে যায়। আজ পর্যন্ত এই পত্রিকার একটি কপিও খুঁজে পাওয়া যায় নি। সমসাময়িক যে দু'একখানি পত্রিকায় 'জ্ঞানান্বেষণ'-এর রচনা মধ্যে মধ্যে উদ্ধৃত হত, 'সমাচার দর্পণ' তার মধ্যে একটি। ৺ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' গ্রন্থের দু'খণ্ডে 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকার রচনাবলী সংকলন করেছেন। এই সংকলনের মধ্যে 'জ্ঞানান্বেষণ' থেকে উদ্ধৃত কয়েকটি রচনা ছড়ানো আছে। সেগুলি একস্থানে সংগ্রহ করে দেওয়ার কারণ হল, অনুসন্ধানীদের পক্ষে সেই সময়ে 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীর সামাজিক দৃষ্টি কিরকম ছিল তা এই রচনাগুলি থেকে খানিকটা বিচার করা সম্ভব হবে।

তৃতীয় সংখ্যক 'পরিশিষ্ট' 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীর ইংরেজী-মুখপত্র *Enquirer* পত্রিকার কয়েকটি রচনা সমসাময়িক ইংরেজী পত্রিকার উদ্ধৃতি থেকে একই কারণে এখানে সংকলন করা হয়েছে।

—সম্পাদক]

১৩ অক্টোবর ১৮৩২। ২৯ আশ্বিন ১২৩৯ *

দুর্গোৎসব

অবশ্য পাঠকবর্গের স্মরণে থাকিবে অনেকস্থলে যেমন এবৎসর মুসলমানেরা মহরম উঠাইয়াছেন তদ্রূপ হিন্দুদের প্রধান কর্ম্ম যে দুর্গোৎসব তাহাও এবৎসরে অনেক ন্যূনতা শুনা যাইতেছে পূর্ব্বে এতন্নগরে ও অন্যান্য স্থানে দুর্গোৎসবে নৃত্যগীত প্রভৃতি নানারূপ সুখজনক ব্যাপার হইয়াছে বাইনাচ ও ভাঁড়ের নাচ দেখিবার নিমিত্তে অনেক ইঙ্গরেজ পর্য্যন্ত নিমন্ত্রণ করিয়া এমন জনতা করিতেন যে অন্যান্য লোকেরা সেই সকল বাড়ী প্রবিষ্ট হইতে কঠিন জ্ঞান করিতেন এবৎসরে সেই সকল বাড়ীতে ইতর লোকের স্ত্রীলোকেরাও স্বচ্ছন্দে প্রতিমার সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইয়া দেখিতে পায় এবং

* এই তারিখগুলি 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় উদ্ধৃতির তারিখ।

বাইজীরা গলী গলী বেড়াইয়াছেন তত্রাপি কেহ জিজ্ঞাসা করে নাই অনেকে এ বৎসর পুজাই করেন নাই এবং যাঁহারদের বাডীতে পাঁচ সাত তয়ফা বাই থাকিত এবৎসর কোন বাডীতে বৈঠকি গানের তালেই মান রহিয়াছে কোন ২ স্থলে চণ্ডীর গান ও যাত্রার দ্বারাই রাত্রি কাটাইয়াছেন দুর্গোৎসবে প্রায় বাড়ীতে এমত আমোদ নাই যে লোকেরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারে এবং যাঁহারা আল করিয়া কাল বিনাশ করিতেন তাঁহারাও প্রায় এতদ্বর্ষে বাতীর স্বাশ্রয় করিয়াছেন অতএব দুর্গোৎসবে যে আমোদ প্রমোদ পুর্ব্বে ছিল এবৎসরে তাহার অনেক হ্রাস হইয়াছে ইহাতে অনেকে কহেন যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের ধন শূন্য হওয়াতেই এরূপ ঘটিয়াছে ইহা হইতেও পারে কেননা ধন থাকিলে যেমন মনের স্ফূর্ত্তি থাকে ও আমোদ প্রমোদ করিতে বাঞ্ছা হয় দরিদ্র হইলে তাহার কিছুমাত্র থাকে না সর্ব্বদা পরিবারের ও আপনার ভরণ-পোষণ এবং অন্ন বস্ত্রাদির ভাবনাতেই উদ্বিগ্ন থাকিতে হয় ধন যে কেমন বস্তু আর তাহা না থাকিলে কিরূপ যাতনা পাইতে হয় তাহা এতদ্দেশীয় প্রায় ভাগ্যবন্ত সন্তানেরা পুর্ব্বে বিবেচনা করেন নাই বৃথা কর্ম্মে অনেক ধনের ব্যাঘাত করিয়াছেন যে সকল বাবুরা বাইজীর বাড়ীতেই হাঁড়ী কাড়িয়াছিলেন এবং নানাপ্রকারে রসনেন্দ্রিয় প্রভৃতির সুখ দিয়াছেন এইক্ষণে স্ব ২ ভবনে তাঁহারদিগের শাকান্নে পরিতোষ জন্মিতেছে ধনাভাবে এইরূপ শোকসাগরে পতিত হওয়াতে কেহ এরূপও কহেন যে বর্ত্তমান রাজ্যাধিকারি মহাশয়দিগের শাসনে বিস্তর ধন ব্যয় হইতেছে একারণ লোকেরদের তাদৃক চাকচিক্য নাই ইহা সত্য বটে শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের শাসনে ধন ব্যয় বিস্তর হইতেছে কিন্তু আমরা সাহসপুর্ব্বক ইহা কহিতে পারি যে জবনাধিকারাপেক্ষা এইক্ষণে প্রজারা বিস্তর অন্যায় হইতে মুক্ত হইয়াছেন যদিও কোম্পানি বাহাদুর টাক্স ইষ্টাম্প পরমিট ইত্যাদির দ্বারা ধন লইতেছেন বটে কিন্তু প্রজারদের হিতার্থে চেষ্টাও বিস্তর করিতেছেন দেখ জবনাধিকারে লোকের গমনাগমনের পথ এমত কদর্য্য ছিল যে লোকেরা তাহাতে বিস্তর ভয় পাইত এবং দস্যুকর্ত্তৃক হত হইত কোন ২ পথে পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইলেও জল মিলিত না এবং নানা রোগে দরিদ্র লোকেরদের মহাক্লেশ ভোগ হইত। এইক্ষণে বর্ত্তমানাধিকারিরা প্রজার নিকটে টাকা লইয়া দুর্গম্য পথসকল সুগম্য করিয়াছেন এবং স্থানে ২ জলাশয় করাতে লোকেরা জলপান করিয়া সন্তুষ্ট হন বিশেষতঃ চিকিৎসার বিষয়ে এমত সুধারা করিয়াছেন যে দরিদ্র লোকেরদের চিকিৎসাতে কপর্দ্দক মাত্রও লাগে না এবং বিদ্যার বিষয়ে এমত সুগম করিয়াছেন যে এতদ্দেশীয়েরা যে সকল বিদ্যার শব্দমাত্র বুঝিতে পারিতেন না তাঁহারা এইক্ষণে ঐ সকল শাস্ত্রের প্রসাদাৎ বিস্তর ধনোপার্জ্জন করিতেছেন অতএব রাজ্যাধিপতিরা যে ধন লন তাহার সমুদায়ই বৃথায় যায় ইহা কি প্রকারে কহা যায়।

—জ্ঞানান্বেষণ

১৭ নবেম্বর ১৮৩২। ৩ অগ্রহায়ণ ১২৩৯

সতীদাহ

স্ত্রীদাহ নিবারণে হর্ষসূচক সভা।—গত শনিবার [১০ নবেম্বর] সন্ধ্যাকালে ব্রাহ্ম্য সমাজের সাধারণ গৃহে স্ত্রীদাহ নিবারণে আনন্দিত মহোদয়েরা এক মনোরম কমিঠি করিয়াছিলেন তাহার প্রধানাধ্যক্ষ শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ঐ সভোপবিষ্ট ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় মহাত্মাবর্গের সমক্ষে প্রথম প্রশ্ন এই হইয়াছিল যে অত্যধিক ঘৃণ্য স্ত্রীহত্যা-রূপ দুষ্কর্ম্ম নিবারণপ্রযুক্ত আমাদের যে পবমানন্দের মঙ্গল সমাচার সংপ্রতি ইঙ্গলণ্ড হইতে আসিয়া কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র আহ্লাদিত বরিয়াছে ইহার সম্পূর্ণ ক্ষমতাবিশিষ্ট শ্রীশ্রীযুত ইঙ্গলণ্ডাধিপতি ও প্রবিকৌন্সেলকে ধন্যবাদ দেওনেব বিষয়ে আপনারদের কি অভিপ্রায় তাহাতে পরম্পব সভ্যগণেবা পরমোল্লাসিত হইয়া অত্যাবশ্যকরূপে সম্মতি প্রদান করিলেন অপর কোর্ট আব্ ডিবেকটর্সকে ধন্যবাদ দেওনের প্রস্তাবেও সভ্যগণের অভিমত সম্পূর্ণ হইল তৃতীয় প্রশ্ন এই যে আমারদের এই মহোল্লাষের আদি কারণ পরম দয়ালু শ্রীশ্রীযুত লার্ড উলিএম বেণ্টীঙ্ক গবর্ণর্ বাহাদুব অতএব তাঁহাকে এক ধন্যবাদ দেওয়া আমারদেব উচিত কি না ইহাতে সভ্যগণেরা সম্পূর্ণ সম্মতি দিলেন যে তাঁহার ধন্যবাদ দেওয়া অতি কর্ত্তব্য চতুর্থ প্রশ্ন এই যে শ্রীযুত রাজা রামমোহন রায় মহাশয়ের দ্বারা ঐ ধন্যবাদ পত্র বিলাতে পূর্ব্বোক্ত উভয় বিচার স্থানে অর্পিত হওনের বিষয়ে আপনাবা কি অনুমতি করেন তাহাতেও সভ্যগণেরা আনন্দিতরূপে সম্মত হইলেন। বিশেষতঃ সভ্যগণেবা এই অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে স্ত্রী হত্যা নিবারণার্থে শ্রীযুত রাজা রামমোহন রায়েব যে পর্য্যন্ত পবিশ্রম ও নির্দ্দয় স্ত্রীবধিরদের কটুক্তির ভাগী তিনি হইয়াছেন বাঙ্গালির মধ্যে অন্য কাহারও এরূপ হয় নাই অতএব এতদ্বিষয়ে তাঁহাকে এক ধন্যবাদ দেওয়া অত্যাবশ্যক ।

—জ্ঞানান্বেষণ

২৭ এপ্রিল ১৮৩৩। ১৬ বৈশাখ ১২৪০

চড়কপূজা

গত সন্ন্যাসবিষয়ক নীলের উপাখ্যান।—দেশ দেশান্তর ভ্রমণকারিরা কহেন যে পৃথিবীতে যত জাতি আ৷ তাহার মধ্যে হিন্দু জাতির আচাব ব্যবহার অত্যাশ্চর্য্য এবং বহুকালাবধি ইহাঁরা যেরূপ কর্ম্ম করিয়া আসিতেছেন তদ্দ্বারাই এ জাতি বিলক্ষণ পরিচিত আছেন যে সকল ভ্রমণকারিরা পাঠকবর্গের অগোচর আশ্চর্য্য ২ বিষয় দর্শন করিয়াছেন তাঁহারা উপরোক্ত কথা সপ্রমাণ করিয়া কহিয়াছেন এবং এতদ্দেশীয় লোকেরাও ঐমত বোধ করিবেন হিন্দুদিগের মধ্যে একটা সামান্য কথা প্রচলিত আছে যে প্রাচীন

মদিরিকা ও বন্ধু অত্যন্ত প্রিয়মাত্র এতদ্বিষয়ে যদ্যপি ইঙ্গলণ্ডীয়েরা সুধারাকরণে অনুকূল হন তবে হিন্দুরা বলিবেন যে প্রাচীন ব্যবহার প্রাচীন মদিরিকা ও বন্ধু হইতেও অধিক গুরুতর।

উপরে যাহা বর্ণন করা গেল তাহার তাৎপর্য্য এই যে তদ্বিষয়ে কিছু উদাহরণ দর্শান যায় ও অস্মদ্দেশীয় লোকেরা এরূপ উদাহরণাদিকে অতিযথার্থ বোধ করে।

কিন্তু গত সন্ন্যাসবিষয়ক নীলোৎসব দর্শন করিয়া তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ উক্তি করাতে পাঠকগণের সন্তোষ জন্মিতে পারে যেহেতু চরকপূজা বিষয়ে সর্ব্বসাধারণের বিশেষ মনোযোগ প্রার্থনা করা গিয়াছিল। অতএব এখনও তদ্বিষযে কিঞ্চিৎ বক্তব্য প্রকাশ করিবার সুসময় বটে। চিৎপুরের রাস্তায় অসংখ্য ঢাকের মহাশব্দ এবং রাস্তার উভয়পার্শ্বের বাটির বারান্দার উপর লোকের মহাকোলাহল হয়। সন্ন্যাসির দল সকল বাণপ্রভৃতি ফুড়িয়া বাদ্য সহিত আসিল এই সকল ব্যাপার বেলা ৯ ঘণ্টা পর্য্যন্ত দেখা যায় পরে তামাসা যাহা দর্শনার্থে অনেক লোক জমা হয় তাহার ক্রমে কম হইয়া আসিতে লাগিল। বাঁশ বাঁকারি ও কাগজমণ্ডিত একটা পাহাড নিম্মিত হইয়া নীল ও রক্তবর্ণের রং করা গিয়াছিল তদুপরি একটা প্রকাণ্ড মন্দির তন্মধ্যস্থিত কাগজে নিম্মিত হিন্দুর দেবতারা ইহাই দেখিয়া প্রথমে দর্শকগণেরা চমৎকার ভাবিলেন ইহাতে তামাসা এই আছে যে কয়েকটা সোলার পুত্তলিকা বানাইয়াছিল তৎপরে একখানা ময়বপঙ্খী দেখা গেল তাহা বাঁশ বাঁকারিদ্বারা নির্ম্মাণ হয় মুখটা ময়ূরাকার তাহাতে নানা চিত্র বিচিত্র করা গিয়াছিল তাহার উপরে কয়েক জন লোকেতে গান বাদ্যকরও দাঁড ফেলিতেছিল। তাহা একটা পাঠশালার ন্যায় কিন্তু বালকের নহে সেটা প্রকাণ্ড মনুষ্যের বিদ্যালয় ইহা গুরু-মহাশয় ছাত্রগণের মুর্খতা দেখিয়া লজ্জিত হইয়া কহিলেন আমি ইহারদিগকে আর মারিয়া সোজা করিতে পারি না। লোকেরা হাসিতে ২ ঘণ্টা করতাল ধ্বনি শ্রবণ করিতে পারিলেন। পরে গোদযুক্ত একটা বৃদ্ধ পুষ্প চন্দনাদিদ্বারা শরীর আবৃত করত দেবতাতুল্য হইয়া প্রকাশমান হইবার ন্যায় এক জন তাহার গোদ পূজা করিতেছিল এবং সং দেখিয়া বডই হাসির ধূম পডিল কিন্তু দেবপূজা করেন যে হিন্দু তিনি কিরূপে গোদ পূজা করিলেন তাহা আমরা বলিতে পারি না ঐ সংটা প্রকৃত গণেশের ন্যায় সাজাইয়াছিল।

পদপূজা তামাসার শেষ হইলে যাহারা এই মহোৎসবোপলক্ষে ক্ষুদ্র ২ বস্তু লইয়া রাস্তায় ফিরি করিয়া বিক্রয় করিতেছিল তাহারদের এবং দর্শক লোকেরদের মধ্যে চাপড়াচাপডি মারামারি বডই পডিয়া গেল কিন্তু তাহারদের লম্বা অথচ শ্বেতবর্ণ গোঁপ দৃষ্টি করিয়া তাহারা যে কর্ম্মের কর্ম্মী তাহা আমারদের বোধ হইল যে তামাসা দেখিয়া আমরা অধিকন্তু আহ্লাদিত হইলাম তাহা এপর্য্যন্ত বর্ণিত হয় নাই কিন্তু ভণ্ড তপস্বী এবং যে সকল প্রবঞ্চকেরা লোককে দেখাইবার জন্য বডই পূজা ও ভজনা করিয়া থাকে তাহারদের এই বিষয় বিশেষ অবধারণ করা উচিত ছিল। একখান চিত্র বিচিত্র করা

ডাণ্ডিওয়ালা তক্তার উপর একজন ধ্যান করিতেছিল তাহা বেহারা লোকে স্কন্ধে করিয়া লইয়া যায় এবং সে মালা জপিতে ২ বেহারারা তাহাকে চারি দিগে ফিরাইতে লাগিল এবং তাহার দৃষ্টি কেবল চতুর্দ্দিগস্থ স্ত্রীলোকের উপরই। ঐ ভক্তযোগির নয়ন একবার বারান্দাস্থ স্ত্রীলোকরূপ দেবীর প্রতি একবার স্বীয় বরদাতা দেবতার প্রতি অতএব সংটার বড়ই তামাসা হয়। ঐ ভক্তলোকধারি তক্তারামা তখন সুদৃশ্যরূপে ঘূর্ণিত হয় যে তাহাতে তাহার মুখ একবার এদিগ্‌ একবার ওদিগ্‌ দেখা গেল তৎপরে বৈরাগির দল আসিল। আমারদের ইউরোপীয় পাঠক মহাশয়েরা বৈরাগির অর্থ না বুঝিতে পারিবেন তাহা এ যে হিন্দু সন্ন্যাসি সাংসারিক ধর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক কেবল যোগে মগ্ন হন ঐ সং একটা মালার থলি হস্তে গ্রহণ করিয়াছিল। তাহার কপালে বক্ষঃস্থলে এবং উভয় বাহুতে নানা ছাপায় চিহ্নিত ছিল এবং রোমান কাতালিক পুরোহিতের ন্যায় তাহার মস্তকে চুলের ঝুঁটি এবং যোদ্ধারা যেমন রাগান্বিত হইয়া আস্ফালন করে ও তাহারদের মস্তকে পালক উড়িতে লাগে সেইপ্রকার সে এদিগ্‌ ওদিগ্‌ ফিরিতে লাগিল। বৈরাগী স্বর্গীয় অস্ত্রধারী হইয়া নিত্যানন্দধামে গমনোদ্যত। তাহার দেবতার নাম মোক্ষসুখ। সাংসারিক লোভ ইত্যাদি ত্যাগ করিয়াছে এই প্রকার শস্ত্রধারাও বিবধরূপে প্রস্তুত হইয়া স্বর্গে গমন না করিয়া বাস্তারূপ স্বর্গে আসিলেন। কেগবাক্যে বিরত ঐ বৈরাগিগণের মধ্যে এক জন এমন এক প্রস্তাব করিলেন যে সে অতিমনোরঞ্জক ইহাতে তাহার সহিত কোলাকোলি আলিঙ্গনাদি হইল তাহাতে তাবল্লোকের হাসিতে ও তাহারা আপনারদের পরমাহ্লাদে আপনারা নিমগ্ন।

—জ্ঞানান্বেষণ

১৯ অক্টোবর ১৮৩৩। ৪ কার্ত্তিক ১২৪০

দুর্গোৎসব

দুর্গোৎসব নিকট হওয়াতে আমারদের দেশস্থ লোকের মন পুলকিত হইতেছে এবং ভাগ্যবন্ত বা গরীব যাঁহারা তামাসা দেখিয়া সুখবোধ করেন তাঁহারা অতি প্রফুল্ল মনে নিরীক্ষণ করিতেছেন দুর্গোৎসবের সে দিন কবে আসিবে আর স্থানে ২ পূজার তাবৎ প্রস্তুত হওয়াতে চতুর্দ্দিগে ক্রয় বিক্রয়ের শব্দই শুনা যাইতেছে এবং ধনরূপ দেবতার আরাধনার্থ যাঁহারা এই রাজধানীতে আসিয়াছিলেন তাঁহারাও সামগ্রীসহিত দুর্গার আরাধনার্থ স্বদেশে গমন করিতেছেন অতএব এই সময়ে আহ্লাদপূর্ব্বক আহারাদির ধূমেই কয়েক দিবস কাটাইবেন এবং পরিশ্রমি গরীব লোকেরাও ধনির নিকট তাঁহার-দিগের জিনিসপত্র অধিক বিক্রয় করিয়া কএক দিবস সুখে থাকিবেন কিন্তু যদিও এই পুত্তলিকা পূজাদিকে আমরা ঘৃণিত ব্যাপার কহি তথাপি এ কর্ম্মেতে স্বদেশীয় লোকের-

দিগের আহ্লাদেই আমরা আহ্লাদিত আছি কেননা যাঁহার যে প্রকার মত তদনুসারে তিনি কর্ম্ম করুন তাহাতে আমরা প্রতিবন্ধক নহি পরন্তু যেমতে চলাতে যখন তাঁহারদিগের অনিষ্ট দৃষ্ট হইবে তখন সেই মতে দোষ দেখাইয়া আমরা অবশ্য বারণের চেষ্টা করিব। অদ্যকার জ্ঞানান্বেষণে প্রকাশিত এক পত্রের দ্বারা প্রেরক মহাশয় আমারদিগের জ্ঞাত বিষয় লিখিয়াছেন যে এতদ্দেশীয় লোকেরা স্বীয় পরিশ্রমের এবং পিতৃপিতামহাদির সঞ্চিত সম্পত্তি নাচগানেতে ব্যয় করিতেছেন অতএব কহিতেছি এ সকল বিষয়ে আমরা কোন ব্যক্তির চক্ষুকর্ণের সুখের বিপক্ষ নহি কিন্তু আবশ্যক বিষয়ে শৈথিল্য করিয়া অনাবশ্যকবিষয়ে অধিক ব্যগ্র দেখিলে সে বিষযে দোষ দেখাইয়া আবশ্যক নিবারণের চেষ্টা করাই আমারদিগেব উচিত এবং নাচ প্রভৃতি অন্যান্য বিষয় যাহা দুর্গোৎসবের কালে হইয়া থাকে তাহা ধর্ম্মের অংশ নহে এবিষয়ে আমারদিগের সহিত যে দেশস্থ লোকেরা ঐক্য হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই তবে একথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি এবং বোধ হয় দেশস্থ মহাশয়েরাও শুনিতে পারেন যে সকল ভারি ২ বিষয়ে তাঁহারদিগের সাহায্য করা এবং তত্ত্ব নেওযা অত্যাবশ্যক সে সকল বিষযে মনোযোগ না করিয়া নাচ প্রভৃতি তুচ্ছ বিষয়ে কি জন্যে ব্যয় করিতেছেন তাহারা কি সর্ব্বসাধাবণের উপকার যোগ্য এমন কোন বিষয় দেখিতে পান না যে ঐ সকল বিষয তাহাবদিগের সাহায্য করিতে হয আর ভাবতবর্ষ কি বিদ্যার দ্বারা একেবারেই উচ্চে উঠিয়াছে এবং ভারতবর্ষেব তাবৎ গ্রামেই কি বিদ্যালয স্থাপিত হইয়াছে আব ভারতবর্ষস্থ তাবদ্দুঃখি ভিক্ষুকেরাও কি সুখী হইয়াছেন ইহাতে যদ্যপি দেশস্থ মহাশযেরা স্বীকার করেন এ সমুদায়ই হইয়াছে তবে তাঁহারা নৃত্যাদিতে যে ব্যয় কবিতেছেন তাহাতে আমাবদিগের কোন আপত্তি নাই শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁহাব জনকের শ্রাদ্ধে এতদ্দেশীয মহাশযদিগের দানের যে নূতন দৃষ্টান্ত দেখাইযাছেন সেই দৃষ্টান্ত উপযুক্ত বোধ কবিলে নৃত্যাদির কিয়দাংশের কর্ত্তন করিযা যে ধন বাঁচিবে তাহা কি ২ বিষযে খরচ করিতে হয় যদ্যপি দেশস্থ মহাশযেরা তাহা না জানেন তবে কহিতেছি ভাবতবর্ষীয় লোকেরদিগের বিদ্যাশিক্ষার্থ ব্যয় করুন অথবা বিলাতে গমনোপযুক্ত জাহাজ নির্ম্মাণার্থ চাঁদা যাহা এতদ্দেশীয় লোকের উপকারার্থ হইযাছে তাহাতেই দেউন কিম্বা ঐ ধন একত্র করিয়া বাণিজ্য করুন অথবা নানাবিধ শিল্প যন্ত্র এবং দেশের চাস বৃদ্ধি করুন আর প্রয়োজন মতে যদ্যপি নূতন ২ অস্ত্রের আবশ্যক হয় তবে তদর্থে ব্যয় করুন কেননা ঐ সকল বিষয়ে লাভ ও সম্ভ্রমের পত্তন যে প্রকার দৃঢতর ভাল নৃত্যাদি করাইলে তাহার লাভ সম্ভ্রম তদ্রূপ হইবেক না জ্ঞানান্বেষণে স্থান সংকীর্ণপ্রযুক্ত পরিশেষে এই কবিয়া সমাপ্ত করিতেছি যে আমরা যাহা লিখিলাম দেশস্থ মহাশয়েরা তাহাতে মনোযোগ করেন ইতি।—

—জ্ঞানান্বেষণ

৯ আগস্ট ১৮৩৪। ২৬ শ্রাবণ ১২৪১

Tagore and Company

পত্রপ্রেরকের স্থান.হইতে প্রাপ্ত

আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি এতদ্দেশীয় কতক মর্য্যাদাবন্ত মহাশয়েরা এই প্রশংসিত অভিপ্রায় করিয়াছেন যে তাঁহারা এক বাণিজ্যের কুঠী স্থাপন করিয়া ঠাকুরাণ কোম্পানি [Tagore and Company] নামে ঐ কুঠীর কার্য্য চালাইবেন ইহাতে বোধহয় এদেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষি লোকেরা সাধারণের উপকারজনক এই অত্যাশ্চর্য্য সাহসিক উদ্যোগের অসংখ্য প্রশংসা করিবেন এবং আমরা অনুমান করি এই দৃষ্টান্ত দর্শনে এতদ্দেশীয় লোকেরদের মন এইরূপ উত্তম কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া বাণিজ্যকার্য্য করত পুনশ্চ হিন্দুস্থানকে অতিসমৃদ্ধ ও মর্য্যদাশালী করিবে যাঁহারা প্রথম ২ নম্বরের জ্ঞানান্বেষণ পাঠ করিয়াছেন তাঁহারদিগের স্মরণ থাকিতে পারে যে আমরা কতকতবার লিখিয়াছি আভাগা অনিচ্ছাপ্রযুক্তই এদেশের ধনি লোকেরা বাণিজ্য কার্য্যের পরিশ্রমে প্রবর্ত্ত হয় না কিন্তু এইক্ষণে বড় আহ্লাদিত হইলাম ঐ লোকেরা যে অবশ বুদ্ধিতে এ বিষয় নিদ্রিতের ন্যায় ছিলেন তাহা সারিয়া আপনারদের কর্ত্তব্য অথচ উপকার জনক কর্ম্মে মনোযোগ দিলেন এ কর্ম্মে যে তাঁহারদের কর্ত্তব্য তাহার কারণ এই যে সাধ্যানুসারে দেশের উপকার করাতে সৎলোক মাত্রই বাধ্য আছেন এবং হিন্দুস্থানীয় লোকেরদের শিল্পাদি নির্ম্মিত বস্তু ক্রয় বিক্রয় করাতে আপনারদের ধন সংলগ্ন করাই সকল স্বাধীন হিন্দুরদের উচিত আর উপকারজনক বলিবার কারণ এই যে অন্যান্য দেশীয় বাণিজ্যকারি লোকেরদের সহিত সমানভাবে কর্ম্ম করা ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে হিন্দুস্থানীয় লোকদের বিশেষ উপকার হয় না, এবং আর ২ দেশাপেক্ষা আমারদিগের দেশের যে উর্ব্বরতা গুণ তাহাতে অন্য দেশীয়ের সহিত বাণিজ্য করাতে বিস্তর উপকারের সম্ভব আছে ভিন্ন দেশীয় লোকেরা কেবল ধনোপার্জনার্থ এদেশে আসিয়া অত্যল্পকাল বাস করেন কিন্তু যাহাতে তাঁহারা দেশে গিয়া পরিবারের সহিত স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারেন তদুপযুক্ত ধন ঐ অল্পকালের মধ্যেই সংগৃহীত হয় এই প্রকারে এদেশের ধনের কূপ সকল শূন্য হইতেছে অতএব দেশস্থ লোকেরা যৎকালে দুর্ভাগ্যক্রমে দৈন্য দশায় পড়িয়া রোদন করেন তখন দূর দেশীয়েরা স্বদেশে বসিয়া পরিবারের সঙ্গে আমারদের জমীর উপরস্থ নিয়া স্বচ্ছন্দে সুখভোগ করিতেছেন কিন্তু বোধ হয় এদেশের দুরবস্থা পরির্ত্তনের কাল উপস্থিত হইল এবং পৃথিবীর বাণিজ্যকারি দেশের সহিত পতিত হিন্দুস্থানেরো নাম লিখিত হইবে অতএব প্রার্থনা করি এইক্ষণে ঠাকুরেরা যে পথ দেখাইবেন এই দৃষ্টান্তে আমারদের দেশীয় লোকেরাও উপকারজনক প্রশংসিত সাহসিক ব্যাপারে প্রবর্ত্ত হন এবং হিন্দু নামেতে যে এই কলঙ্ক ছিল তাঁহারা নির্ব্বোধ ও নিষ্কর্ম্মা তাহা দূর করেন ইতি।—

—জ্ঞানান্বেষণ

১৩ এপ্রিল ১৮৩৬। ১২ বৈশাখ ১২৪৩

কুলীনদের বহুবিবাহ

কুলীনেরদের বহুবিবাহ।—কুলীনেরদের বহু বিবাহ বিষয়ে অনেকবার সকলকে জ্ঞাপন করা গিয়াছে এবং ঐ কুব্যবহারেতে কি পর্য্যন্ত দুঃখ জন্মে তাহাও বিলক্ষণ-রূপে বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্দেশীয় কোন ২ সম্বাদপত্রসম্পাদকেরা লিখিয়াছেন যে এতদ্রূপ বহুবিবাহ এইক্ষণে প্রায় নাই। আমরা পুর্ব্বেই জ্ঞাত ছিলাম যে এই কথা নিতান্ত অমূলক এবং এইক্ষণে জ্ঞানান্বেষণ হইতে নীচে লিখিতব্য বিবাহিত কুলীনেরদের নামের ফর্দ্দ ও তাঁহাবদের বাসস্থান ও কে কত বিবাহ করিয়াছেন তদ্বিবরণ অর্পণ করাতে পুর্ব্বোক্ত অপহ্নবের কথা বিলক্ষণ প্রামাণিকই হইল।

আমরা এ স্থলে কএক জন কুলীনের নাম ও তাঁহারা কে কত বিবাহ করিযাছেন তাহাও লিখিতেছি ইহাতে জানিতে পাবিবেন এক ২ জন কুলীন কত সংখ্যক বিবাহ করিয়া কত ২ স্ত্রীলোকের সুখের কণ্টক হয়।

ধাম	নাম	বিবাহ
ময়াপাড়া	রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায	৬২
জয়রামপুব	নিমাই মুখোপাধ্যায়	৬০
আড়ুয়া	রামকান্ত বন্দ্য	৬০
মালগ্রাম	দিগম্বর চট্টোপাধ্যায়	৫৩
নগর	খুদিবাম মুখ	৫৪
বলুটী	দর্পনারায়ণ মুখ	৫২
	নয়কড়ী বন্দ্য	১৮
সিঙ্গী	কৃষ্ণদাস বন্দ্য	৪৭
ফতেজঙ্গপুর	শম্ভু চট্টোপাধ্যায	৪০
পাঁচন্দি	রামনারায়ণ মুখ	৩৭
বিল্লগ্রাম	রাধাকান্ত বন্দ্য	৩০
কৃষ্ণনগর	কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	৩৪
	গোকুল মুখ	২৭
হালদামহেশপুর	রাধাকান্ত চট্ট	২৭
হাজরাপুরমথুবা	যজ্ঞেশ্বর মুখ	২৬
সিঙ্গী	গঙ্গানন্দ মুখ	২৫
পুর	ভগবান মুখ	২২
	শম্ভু মুখোপাধ্যায়	১৭

গ্রাম	নাম	বিবাহ
বালী	রামজয় চট্টোপাধ্যায়	২২
পানিহাটী	রামধন মুখোপাধ্যায়	১৮
পারহাট	তারাচাঁদ	১৫
চন্দ্রহাট	রাধাকান্ত চট্ট	১৫
কইকালা	জগন্নাথ মুখোপাধ্যায়	১৪
করুম্বা	কাশীনাথ বন্দ্য	১৩
ওআড়ী	রামকানাই চট্ট	১২
খিরগ্রাম	ত্রিলোচন মুখ	১০
পতসপুর	গিরিবব বন্দ্যোপাধ্যায	৮

—জ্ঞানান্বেষণ

৩১ ডিসেম্বর ১৮৩৬। ১৮ পৌষ ১২৪৩

পুলিশ দাবোগাব উপবি লাভ

পোলীসের দারোগারা চুরি ডাকাইতির এবং মাজিস্ট্রেট সাহেবদিগের আজ্ঞা-প্রামাণিক তদারকদেব উপার্জ্জন ভিন্ন যে প্রকারে উপরি লাভ করেন হরকরার এক জন পত্রপ্রেরকের লেখা প্রমাণে আমরা তাহা নীচে প্রকাশ করিতেছি এবং আমারদিগের বোধ হয় মফঃসলের পোলীসের যে নূতন বন্দোবস্তেব আন্দোলন হইয়াছে তাহা স্থির হইলে এই সকল মন্দ প্রকরণ দূর হইবেক।

দারোগার মাসিক বেতন ২৫ বৎসরে ৩০০
প্রথম থানাতে আসিলে চৌকীদার প্রতি ১
দোলের পার্ব্বনি ... ... ঐ ... ... ঐ
দুর্গোৎসবে . ... ঐ ... ... ঐ
আড়াইশত চৌকীদার প্রতি গড়ে বৎসরে ৭৫০
এক স্থান হইতে অন্যত্র যাইতে প্রত্যেক প্রজা প্রতি ... ১ অবধি ৩
বৎসরে এইরূপে দুই শত প্রজা প্রতি গড়ে ... ৪০০
জমিদারেরদের গোমস্তা ও ক্ষুদ্র ২ তালুকদারেবদের যানমাসিক রিপোর্ট
প্রতি অনিশ্চিত লাভে তালুক বুঝিয়া গড়ে ... ৮০০
প্রথম আসিলে তালুকদারের গোমস্তা ও ক্ষুদ্র ২ তালুকদারের
দত্ত নজর বৎসরে ... ২০০

২৪৫০

—জ্ঞানান্বেষণ

১৭ জুন ১৮৩৭। ৫ আষাঢ় ১২৪৪

কন্যা ক্রয়বিক্রয়

শ্রীযুত জ্ঞানান্বেষণ সম্পাদক মহাশয়েষু।—অন্যদেশীয় লোকেরদের বিদ্যা বুদ্ধি বল কৌশলাদি অনেক সম্পত্তি আছে তাঁহারা এই সকল নানা বিষয়ে অহঙ্কার করিতে পারেন এতদ্দেশীয় লোকেরদের উক্ত সম্পত্তি নাই কেবল জাতি হইয়া ইঁহারদিগের অহঙ্কার কিন্তু বিবেচনা করিলে এইক্ষণে তাহাও গিয়াছে। সম্পাদক মহাশয় এ দেশের কুলীন বংশজ ব্রাহ্মণেরাই জাতি লোপ করিয়াছেন তাহার কারণ আমি বিশেষ করিয়া বলি আপনি বিবেচনা করিবেন বংশজ ব্রাহ্মণেরা কন্যা ক্রয় করিয়া বিবাহকরণ ব্যবহার থাকাতে বংশজ ব্রাহ্মণ মোসলমানের কন্যাপর্য্যন্তও বিবাহ করিয়াছেন আমি ইহার কএক প্রমাণ লিখিতেছি।

১। এক সময়ে কন্যাবিক্রয়ি দুই ব্রাহ্মণ বর্দ্ধমান দিয়া আসিতেছিল তাহাতে পথিমধ্যে এক সুরূপা বালিকাকে দেখিয়া তাহাকে ক্রয়করণার্থ ইচ্ছা প্রকাশ করিলে পরে তাহারদিগের অভিলাষ বুঝিয়া এক জবনী কহিল ব্রাহ্মণঠাকুর এইটি মোসলমানের কন্যা ইহার কেহ নাই শিশুকালাবধি আমি প্রতিপালন করিয়াছি তোমরা মোসলমানের কন্যাকে লইয়া কি করিবা তাহাতে ব্রাহ্মণেবা কহিল ভাল সে কথা পরে সংপ্রতি তুমি দিবা কি না তাহা বল অনন্তর জবনীকে ছয় টাকা দিয়া কন্যাকে ক্রয় করিল এবং বাজারে আসিয়া একখানি শাডী কিনিয়া পরাইয়া লইয়া চলিল কিন্তু পথের মধ্যেই কুমারীকে শিক্ষা দিল কাহার সঙ্গে বাক্যালাপ করিবে না পরে ঐ ধূর্ত্তেরা সন্ধ্যাকালে এক ব্রাহ্মণের বাটীতে গিয়া অতিথি হইল তাহার দুই মাস পুর্ব্বে গৃহস্থ ব্রাহ্মণের স্ত্রী বিয়োগ হইয়াছে তাহাতে ব্রাহ্মণ ব্যাকুল ছিলেন সেই শোকের সময়ে দিব্যাঙ্গনা দেখিয়া অতিথির ঘনাইয়া বসিলেন ঐ ব্রাহ্মণের সম্পত্তিও কিঞ্চিত ছিল অতএব বিবাহের প্রস্তাব করিয়া মুল্যের ডাক আরম্ভ হইল বিক্রেতারা প্রথমতঃ পাঁচশত টাকা চাহিল কিন্তু শেষ চারিশত টাকা রফা হইলে তৎক্ষণাৎ টাকাগুলি গণিয়া লইয়া সেই রাত্রিতে বিবাহ দিল এবং পরদিবস প্রাতে উঠিয়া তাহারা প্রস্থান করিল অনন্তর গৃহী সকল জ্ঞাতি কুটুম্বাদিকে গৃহিণীর পাকান্ন ভোজন করাইয়া এক বৎসর পর্য্যন্ত ঐ স্ত্রীকে লইয়া সুখভোগ করেন তাহার পরে এক দিবস লাউ পাক করিতে ঐ স্ত্রী অভ্যাসপ্রযুক্ত হঠাৎ কহিয়া উঠিল যে "কদু ছে কেয়া ছালান হোগা" এই শুনিয়া ব্রাহ্মণের ভগিনী তাহার মাতাকে ডাকিয়া কহিল "ওমা শুন্ আসিয়া তোর বৌ কি বলিতেছে" তাহার পরে জিজ্ঞাসা করিবাতে জবন কন্যা আপন জাতিকুলের সকল কথাই ভাঙ্গিয়া বলিয়া ফেলিল তাহাতে ব্রাহ্মণ চমৎকার ভাবিয়া স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিলেন।

২। কলিকাতা শহরের সীমাসংযুক্ত পূর্ব্বাংশবাসি—মুখোপাধ্যায় এক সাহেবের হিন্দুস্থানীয় উপপত্নী ব্রাহ্মণীর কন্যাকে বিবাহ করেন ঐ কন্যা সাহেবের ঔরসজাতা পরে তাহার গর্ভে মুখুয্যের এক কন্যা এবং তাহাকে রাঢ়দেশবাসি এক শুদ্ধাচার বিশিষ্ট পরিমিষ্ট ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সঙ্গে বিবাহ দেন ঐ পণ্ডিতের চতুষ্পাঠী কলিকাতাতেই ছিল পরে বিবাহ করিয়া বাটীতে গেলেন তিনি ঐ ভার্য্যাকে অনেক বৎসর পর্য্যন্ত সহবাস করিয়াছিলেন এবং তাহার গর্ভে দুই তিনটা সন্তানও জন্মিল পরে টের পাইলেন সাহেবের দৌহিত্রী বিবাহ করিয়াছেন কিন্তু পণ্ডিতের যজমান শিষ্য ও জ্ঞাতি কুটুম্ব অনেক আছেন সাহেবের কন্যার অন্নে সকলের উদর পবিত্র হ্ইয়াছে।

৩। কাজলা পাড়াতেও দুই ব্রাহ্মণ ঘটকের কথা প্রমাণে কন্যা কিনিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন কিন্তু বহুকালের পর সন্তানাদি উৎপত্তি করিয়া শেষ টের পাইলেন ঘটকেরা প্রতারণাপূর্ব্বক মালাকারের কন্যা বিবাহ দিয়াছে।

৪। ভাটপাড়াতেও এক ব্রাহ্মণ ক্রীত কন্যা বিবাহ করেন এবং বহুকাল বসবাস করিয়া শেষ জানিলেন পোদজাতীয় বৈষ্ণবের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন এতদ্ভিন্ন কলিকাতা শহরের মধ্যে এইরূপ স্ত্রী অনেক আছে আমি সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি ভারি ভারি পণ্ডিত ন্যায়রত্নের ও প্রধান ২ ঠাঁড়ুয্যের ঘরে যে তাঁহাবদিগের পুত্র পৌত্রাদির গৃহিণী সকল আছেন তাহারদিগের মধ্যে অনেকেই ধোপা নাপিত বৈষ্ণব মালি কামার কপালির কন্যা কিন্তু সম্পত্তিশালি ব্রাহ্মণের ঘরে পড়িয়া পবিত্রা ব্রাহ্মণী হইয়া গিয়াছেন এখন তাঁহারদিগের পাকান্ন সকলেই পবিত্র জ্ঞান করেন।—

—জ্ঞানান্বেষণ

২১ অক্টোবর ১৮৩৭। ৬ কার্ত্তিক ১২৪৪

বিধবাবিবাহ

শ্রীযুক্ত জ্ঞানান্বেষণ সম্পাদক মহাশয়েষু।—৩।৪ বৎসর হইল আপনকার সমাচার পত্র পাঠ করিয়া আহ্লাদিত হইয়াছিলাম যে কতিপয় ধনিলোক হিন্দু বিধবা স্ত্রীলোকের পুনর্ব্বিবাহার্থ এক সভা করিতে মানস করিয়াছিলেন স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়কে ঈশ্বর সমান সুখ ভোগ করিতে শক্তি দিয়াছেন কিন্তু পুরুষ যত ইচ্ছা তত বিবাহ করিতে পারেন স্ত্রী বাল্যাবস্থায় প্রথম স্বামী মরিলে দ্বিতীয়বার স্বামী করিতে পারেন না কিন্তু স্ত্রীলোকেরদের বন্ধু যাঁহারা তাঁহারা স্ত্রীলোকেরদের চিরকাল বৈধব্য দশা হইতে মুক্ত করিবার উপায় স্থির করিতেছেন কিন্তু তাহারা ঐ বিষয়ে এক্ষণে কি করিতেছেন তাহা আমি জানিনা আমি বোধ করি তাঁহারা বিধবাদের পক্ষে যে মনোযোগ করিয়াছিলেন এক্ষণে বিস্মৃত হইয়া থাকিবেন প্রথমে যে সকল উপায় স্থির করিতে প্রবর্ত্ত হইয়াছিলেন তাহা আরম্ভেতেই ভঙ্গ হইয়াছে।

আমি স্বয়ংও এবিষয় বিস্মৃত হইয়াছিলাম কিন্তু ১৫ ভাদ্রের জ্ঞানান্বেষণ পাঠ করিয়া স্মরণ হইল যে বোম্বের কমিস্যনর সাহেবেরা নিজ আমলারদের জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে হিন্দু বিধবারদিগের পুনরায় বিবাহ হইলে ইহাতে আপত্তি আছে কি না আমি এই সময়ে ঐ সকল মহাশয়েরদের নিকট নিবেদন করিতেছি যাহারা পুর্ব্বে এই স্ত্রীলোকেরদের বৈধব্যাবস্থা হইতে সকল মুক্ত করিকে মনস্থ করিয়াছিলেন তাঁহারা আলস্য ত্যাগ করিয়া এই প্রশংসনীয় বিষয় সংপূর্ণ করিতে চেষ্টা পাইবেন সম্পাদক মহাশয় আপনি জ্ঞান এবং বিবেচনা পূর্ব্বক এ বিষয়ে যে প্রমাণ দিয়াছেন ইহাতে বোধ হয় আপনি মনোযোগী আছেন এবং আমি জানি যে হরকরা কুরিয়র ইঙ্গলিসমেন রিফর্ম্মর ও দর্পণ সম্পাদক মহাশয়েরা ইহারাও হিন্দু বিধবারদিগের এই দুরবস্থা হইতে মোচন করিতে ইচ্ছুক আছেন অতএব আমি আপনারদিগকে মিনতি করিতেছি আপন ২ পত্রে আন্দোলন করিয়া যাহাতে সকলের এবিষয়ে মনোযোগ হয় এমত চেষ্টা পাইবেন ইহা করিলে পর গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ে মনোযোগ দিতে পারেন এবং হিন্দু মহাশয়েরাও বিধবাদিগের দ্বিতীয় বিবাহ না দেওয়া অন্যায় বিচার জানিতে পারিবেন আমি জানি চন্দ্রিকা সম্পাদক মহাশয় এবিষয়ে বিপক্ষ হইবেন এবং ইহার বিপক্ষে শাস্ত্রেরও প্রমাণ দিবেন কিন্তু ঐ আপত্তি সকল আমারদিগের ন্যায্য বিচারে থাকিতে পারিবে না স্ত্রীলোকেরদের অনেক বিবাহ করিতে নিষেধ আছে বটে কিন্তু ঐ নিষেধের তাৎপর্য্য এই যে তাঁহারদের প্রথম স্বামী বর্ত্তমান থাকিতে বিবাহান্তর করিতে পারিবেক না স্ত্রীলোকেরদিগকে এমন সুখজনক ব্যাপাবে এই নিষেধের নিমিত্ত এই ও বহুকালাবধি এইরূপ ব্যবহার হওয়াতে বঞ্চিত করা উচিত নহে অতএব সম্পাদক মহাশয় আপনি এবিষয়ে কিঞ্চিৎ আন্দোলন করুন এবং চন্দ্রিকা সম্পাদক যে কিছু আপত্তি করিবেন তাহার প্রত্যুত্তর করিতে আমি অগ্রসর হইব।

—জ্ঞানান্বেষণ পাঠকস্য

৯ ডিসেম্বর ১৮৩৭। ২৫ অগ্রহায়ণ ১২৪৪

রাজকীয় পদ

অচিহ্নিত কর্ম্মকারিদিগকে প্রধান রাজকীয় ২ পদে নিযুক্তকরণের ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে। বাবু দুর্গাচরণ রায় যিনি পশ্চিম বর্দ্ধমানে সদরঃসদুর ছিলেন তিনি গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে ২৫ অক্টোবরে সিবিল শেষণ জজের চলিত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে যেপর্য্যন্ত না অন্য হুকুম আইসে সেপর্য্যন্ত ভার পাইয়াছেন। অস্মদ্দেশীয় লোকের প্রতি গবর্ণমেণ্ট যে এতদ্রূপ ব্যবহার করিতেছেন তাহাতে আমরা আহ্লাদিত আছি। ইহাতে গবর্ণমেণ্ট তাঁহারদের স্নেহ পাইবেন কারণ তাঁহারদিগের গুণের আদর শিক্ষাইবার এবং গুণ অবজ্ঞেয় বস্তু নহে ইহা দর্শাইবার এই যথার্থ উপায় ইহার স্বাভাবিক ফল এই তাঁহারা স্বীয় ক্ষমতা

বুঝিতে পারিবেন এবং যথার্থ বুঝিলে পর অনেক অদ্ভুত কর্ম্ম করিবেন যাহাতে তাঁহারদিগের অবস্থা শোধন হইতে পারিবেক।

—জ্ঞানান্বেষণ

১৬ ডিসেম্বর ১৮৩৭। ৩ পৌষ ১২৪৪

বিবাহ ও স্ত্রীজাতি

আমারদিগের পত্র প্রেরক এমত এক ব্যবহারের উপর লিখিতে আমারদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন তাহাতে পুরুষের পক্ষে কলঙ্ক স্ত্রীর পক্ষে দুঃখজনক ঐ ব্যবহার আমারদিগের মতে নিতান্ত অন্যায়। ঐ ঘৃণিত ব্যবহার ঐ যে হিন্দু স্ত্রীলোকেরদের বিবাহ বিষয়ে এপর্য্যন্ত আপত্তি আছে তাহাতে চিরকালের নিমিত্ত তাঁহারদিগের মনকে দাস্যাবস্থায় রাখে ঐ অবস্থা হইতে এক্ষণে উদ্ধার হইবার চেষ্টা আমরা পাইতেছি কিন্তু স্ত্রীলোকেরদিগের বিবাহ বিষয়ে নীচ ব্যবস্থা থাকাতে উঁহারা কদাচ ঐ অবস্থা হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন না। আমরা বোধ করি এই দাসত্ব শৃঙ্খল ত্বরায় ত্যাগ করিলে এই জানা যাইবেক যে বিদ্যা আমারদিগের মধ্যে রোপণ হইয়াছে তাহা অনর্থক হয় নাই বরং যে সুফলের আশা করা গিয়াছিল তাহা ফলিতেছে। ঐ দাসত্ব শৃঙ্খল ব্যবহারের নিমিত্ত আমাদিগকে মানিতে হইতেছে কিন্তু এব্যবহার অতি কদর্য্য। জগদীশ্বর স্ত্রী নির্ম্মাণ করিয়া এমন কখন মনে করেন নাই যে একজন অন্য জনের দাস হইবে কিম্বা একজন অন্যকে নীচ বলিয়া গণ্য করিবেক। বিধাতা যিনি অতি জ্ঞানী ও দয়াল তাঁহার এমত ইচ্ছা নহে যে তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে একজন জন্মাবধি অন্যের দাস হইবে কিন্তু মনুষ্যের শঠতাক্রমে এই সকল বাধাজনক শৃংখল হইয়াছে ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে নহে। স্ত্রীলোকেরদিগের সুখের নিমিত্ত শাস্ত্রীয় বচন প্রমাণ দেওনের কোন আবশ্যক নাই। স্ত্রীলোকেরদিগের অবশ্য মনুষ্য বলিয়া গণনা করিতে হইবেক ইহারা সর্ব্বতোভাবে পুরুষের সঙ্গে সমান কিন্তু আমারদিগের ব্যবস্থা ও ব্যবহারের দ্বারা তাঁহারদের অবস্থা এ প্রকার নীচ করাতে তাঁহারা যে মনুষ্য নহেন এমত প্রকাশ পাইতেছে না বরং আমারদিগের নিষ্ঠুর ব্যবহারেতে তাঁহারদিগের মনুষ্য বোধ করি না এমত প্রকাশ হইতেছে যদ্যপি কেহই ইহা কহেন যে স্ত্রীলোকেরদিগের পৃথিবীস্থ লোকেরদের সঙ্গে আলাপ কুশল না থাকিলে তাঁহারদের অত্যল্প কুকর্ম্ম করিবার সম্ভাবনা হয় কিন্তু আমরা এই কথায় বিশ্বাস করি না স্ত্রীলোকেরা কিছু মাত্র উপদেশ না পাওযাতে এবং ঠিক মতামত বিষয় ও যথার্থ অযথার্থ বোধ শিক্ষা না পাইলে তাঁহারদিগের মন সৎপথে থাকিবে এমন আমরা বোধ করি না সাংসারিক জ্ঞান দ্বারা এই জানা যাইতেছে পূর্ব্বে আমরা যেমত কহিলাম ইহারও ভিন্নতা কখন ২ হইয়া থাকে কিন্তু আমরা ইহাও জানিতেছি যে কোন নিশ্চিত ব্যবস্থানুসারে ব্যবহার করা আমারদিগের অত্যাবশ্যক কারণ ইহা করিলে আমরা

হঠাৎ স্বীয় মতের ও যথার্থের বিপক্ষে অনুচিত কর্ম্ম করিতে পারি না। ইহা জগতের মধ্যে সর্ব্ববিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞানী হইব এমত চেষ্টা পাওয়াতে মূর্খতা প্রকাশ হয় আমারদিগের ভালমন্দ উভয় বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকা উচিত কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য কোন পথে চলা আমারদিগের আবশ্যক তাহা উপদেশ দ্বারা জানা যায় এবং নিজ বিপথগামি ইচ্ছাক্রমে ইহা ত্যাগ করি। বিদ্যা দ্বারা মনের দৃঢ়তা হইলে যথার্থ পথে চলিবার সম্ভাবনা কি থাকে না যদ্যপি এমত হয় তবে আমারদিগের সকল বিদ্যা মন্দ বোধ করিয়া পশুদের ন্যায় অন্ধকারে মগ্ন হইয়া থাকা উচিত কারণ আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক জ্ঞান পরিত্যাগ করি যাহাতেই কেবল আমরা প্রধানরূপে গণ্য হই। কিন্তু যদ্যপি আমরা অনুমান করি যে বিদ্যাদ্বারা মনের দৃঢ়তা ও মতের বিচক্ষণতা এবং ন্যায় অন্যায়ের যথার্থ বোধ জন্মে তদ্দারা আমারদিগের সুখ্যাতি ও অখ্যাতি হয় ইহা জানিয়া শুনিয়া আমরা স্ত্রীলোকেরদিগকে এ বিষয়ে বঞ্চিত করিয়া রাখি তবে এজন্য আমরা দোষী আছি। কয়েকজন স্ত্রীলোক আমারদিগের ইতিহাসের মধ্যে আছে যাহারা বিদ্যাদ্বারা দাসত্বাবস্থা হইতে মুক্ত হইয়াছিল। যত স্ত্রীলোক আছে তাহার মধ্যে অত্যল্প এরূপ হইয়াছে। এপ্রকার বিদ্যা পাইয়া কয়েক জনের বুদ্ধি ও মতি শোধন হয় নাই স্ত্রীলোকেরা নীচ সমভিব্যাহারে থাকিয়া অত্যন্ত কুমতি পায় কারণ ইহারদিগের আলাপ কুশল সর্ব্বদা অতি হীনের সহিত হইয়া থাকে আমরা স্পষ্ট কহিতেছি বিদ্যা দ্বারা কখন মন্দ ফল জন্মে না ও ইহাতে কদাচ পরস্পরের বিচ্ছেদ করে না যদ্যপি হয় তবে স্ত্রীলোকেরদিগেরও যে দেশে এরূপ ব্যবহার তাহারও পক্ষে লজ্জাকর হয়।

—জ্ঞানান্বেষণ

১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৮। ৭ ফাল্গুন ১২৪৪

দ্বারকানাথ ঠাকুর

শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর। পশ্চিম দেশে ভ্রমণার্থ অদ্য উক্ত শ্রীযুক্ত বাবু যাত্রা করিলেন।

অনেক মাস নিমিত্ত বাবু এই রাজধানী পরিত্যাগ করিলেন আমরা এক চিত্তে প্রার্থনা করি যে তাহার শারীরিক পীড়া ছিল তাহা এই ভ্রমণদ্বারা বিনাশ পাইবে শ্রীযুক্ত বাবুর এই স্থানে না থাকাতে কলিকাতার অনিষ্ট হইবে যদ্যপি তিনি আমারদিগের উত্তম না হউন তথাচ আমারদিগের সর্ব্বগুণান্বিত বিখ্যাতের মধ্যে তিনি অত্যুত্তম নিজগুণ ও ধন দ্বারা ব্যবসায়িদিগের অতি প্রশংসনীয় সংপ্রতি ব্যবসায়ের মন্দী ভাব এসময়ের যে বাবু প্রশংসনীয় তাহা লোকদিগের উপকারার্থই জানিবে এবং সরলতা-পূর্ব্ব দানহেতু অনেকের প্রাণ বিনাশ হইতে রক্ষা করিবেন আর তাহার সংজ্ঞান দ্বারা অনেককে কার্য্যোপযুক্ত করিয়াছেন বিদেশীয়দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া অকাপট্যে

অতিথি সেবনার্থ এবং অত্যুত্তম অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং তাহার অট্টালিকোপরি এক দিন গমন ও স্থিতি না করিয়াছেন এমত কোন বিদেশী কহিবেন সত্য ধর্ম্মে রত ও নির্ম্মলান্তঃকরণ এইহেতু অনেক সহায়হীন মনুষ্যকে অতি উচ্চ পদে নিযুক্ত করিয়াছেন এবং তাহার কাপট্য রহিত দানশীলতা দ্বারা পতিত অনেক ২ বিদ্যালয় উদ্ধার করিয়াছেন এই সকল হিতজনক কার্য্য দ্বারা বোধ হইতেছে যে অতি ধনাঢ্যের উপযুক্ত যে কর্ম্ম তাহা করিয়াছেন আমরা শ্লাঘ্যপুর্ব্বক কহিতেছি যে বাবুর অকাট্য দানশীলতা দ্বারা ৫ বর্ষ বয়স্ক অবধি সকলেই প্রশংসা করিতেছেন এই ক্ষণে হিন্দুগণ মধ্যে ধর্ম্মনিষ্ঠ পরহিতৈষী মনুষ্য তদ্ভিন্ন আর দৃষ্ট হয় নাই।

আমরা এক চিত্তে পুনর্ব্বার প্রার্থনা করি যে ত্বরায় বাবু সুস্থ হউন তিনি মফঃসলে প্রবিষ্ট অনেক বন্ধু পাইবেন এবং বাবুর সচ্চরিত্র ও সদ্ব্যবহার দৃষ্টে মফঃসলস্থ তাবৎ বিষয় তাহাকে দেখাইবেন আর কৃতজ্ঞ বন্ধু ও অন্যান্য বন্ধুগণ তাহার আগমনাপেক্ষা রহিলেন কিন্তু আগমন হইলে তাহারা পরমাহ্লাদ করিবেন।

—জ্ঞানান্বেষণ

২৬ জানুয়ারি ১৮৩৯। ১৪ মাঘ ১২৪৫

মুচ্ছুদিকর্ম

আমরা শ্রবণ করিতেছি যে মাধব দত্ত মুচ্ছদ্দি পদ প্রপ্ত্যর্থ আর সি জ্যানকিন কোম্পানিকে ৩ লক্ষ টাকা দিয়াছেন। তিনি যে এই কর্ম্ম লভ্যের জন্য করিয়াছেন এমত নহে কেবল দস্তুরি লাভমাত্র এই আচরণ অতি কুৎসিত এবং এই ব্যবহার অতি নিন্দনীয় এইরূপ কুব্যবহার ও কুৎসিতাচরণ কেবল ইহাদিগের দৃঢ়তাভাবে ও নূতন লাভের উপায় জ্ঞানেই হয়। যেমন যবন রাজাধিকারে কোন কার্য্যে অন্তঃকরণ নিবিষ্ট হইত না কেবল জড়ের ন্যায় সর্ব্বদা অন্তঃকরণ আর্দ্র থাকিত তাহার ন্যায় ইহারদিগেকে জানিবা আমরা এতৎ বিষয় বহুদর্শি বিজ্ঞ সমীপে শ্রবণ করিয়াছি যে সুবিবেচনায় বিজ্ঞ ব্যক্তি উত্তম ২ দ্রব্য বিষয়ে বাণিজ্য দ্বারা যাহারা উতপন্ন করিতেন তাহার অর্দ্ধ লভ্য ইহাতে হয় না। যদ্যপি এতব্যয় দ্বারা তাদৃশ লভ্য হয় তথাপি আমরা প্রকাশিতরূপে বলিতে পারি না কেননা তাদৃশ লভ্য হইলেও তথাপি কিনিমিত্ত তাহারদিগের হানি হয় অতএব সেই অংশিগণের মধ্যে এক জন বিজ্ঞ তবিলদার হইলেই ভাল হইতে পারে। এমত সকল বৃহত ২ ধনী কিন্তু বাণিজ্যদ্বারা কিরূপে অর্থ লাভ হয় কিপ্রকারে বাণিজ্য করিতে হয় তাহা জ্ঞাত নহেন আর বাণিজ্যে যে স্বাধীনতা তাহা ইহারদিগের অন্তঃকরণে এক বারও উদয় হয় না ইহারা করেন কি কেবল অর্থ প্রদান পুর্ব্বক দাসত্ব স্বীকার করিয়া আত্মাকে গৌরবান্বিত করিয়া মানেন। যেমন ইংলণ্ডীয়েরা স্বীয় ধনদ্বারা সুখ উৎপন্ন

করেন সেইরূপ এতদ্দেশীয় দিগের উচিৎ যে বহুদর্শী ঐ কর্ম্মচার ব্যক্তিদিগেরা রীতি সন্দর্শন ও শ্রবণ করিয়া বিশেষ জ্ঞাত হইয়া দেশস্থ লোকদিগের আশীর্ব্বাদ জনক সুখ উৎপন্ন করাইয়া আপনারা সুখী হয়েন। অতএব এতদ্দেশীয়দিগের উচিত যে ব্যয় বাণিজ্য এবং দানদ্বারা সকলে সুখী হয়েন আর অতি তুচ্ছ নিন্দনীয় কিঞ্চিদন্তরি প্রাপ্ত্যর্থ আপনার টাকা লইয়া মনিব ইংলণ্ডীয়ের অনুমাত্র পাইবামাত্র তাহাকে প্রদান করেন ইহা কি উচিত হয়। অতএব এতদ্দেশীয়দিগের কর্ত্তব্য এই তুচ্ছ পদ আকাঙ্খা না করিয়া উক্ত উত্তম ২ পদ প্রাপ্ত্যর্থ যত্ন করেন এবং কেবল অত্যল্প পরিবার ও কুটুম্ব লইয়া আহ্লাদ করেন উচিত যে অধিক ব্যক্তিকে আমোদিত করেন সকল মনুষ্যের কর্ম্মেই দোষ আছে ইহা সত্য বটে কিন্তু যাহারদিগের অর্থ প্রদান করিতেছেন তাহারদিগের নিমিত্ত সাবধান থাকিতে হয়। এই সকল দোষ ব্যতিরিক্ত দোষান্তর আছে দেখ যেমন মিলিত পঞ্চজন মধ্যে একজন আগামি ভয় ভাবিয়া শঙ্কায় পলায়ন করে কিন্তু সেই ভয় আপাতত অনিষ্ট জনক ফলত ভয়জনক নহে তাহার ন্যায় ইহাতেও আপাতত ভয়দায়ক চরমে ইষ্টদায়ক। এই সকল বিবেচনা দ্বাবা আমরা অনুমান কবি যে এতদ্দেশীয় ধনি বন্ধুগণ বিবেচনা কবিবেন যে এই রূপ অর্থ ব্যয় কেবল নিন্দনীয় অতি কুৎসিত এবং অত্যন্ত কার্য্যাক্ষম ভীতের স্বভাব জানিবে। অতএব এইক্ষণে যেমত কাল ও যেমত দেশ এবং ব্যক্তি আব যে প্রকার সংসর্গ ইহা বিবেচনা করিয়া সাবধানে আচরণ করিবে।

—জ্ঞানান্বেষণ

২১ এপ্রিল ১৮৩৮। ১০ বৈশাখ ১২৪৫

বিদ্যা ও বাণিজ্য

এইক্ষণে সর্ব্বসাধারণে যেরূপ ব্যবহার করেন তদ্দ্বাবা পরে তাহারদিগের যে উত্তমতা হইবে ইহা আমারদিগের বোধ হয় বলিয়া এই সময় আমরা তাহারদিগের কিঞ্চিৎ কহিবার নিমিত্ত মানস করি বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তারা অতিশয় সভ্য ও ধনাঢ্য প্রায়ই হইয়াছেন সভ্যতা ও ধনাঢ্যতা কোন ২ উপায় দ্বারা হইতে পারে এতদ্দেশীয় জনগণ তাহার কিছুই অন্বেষণ না করিয়া আপনারদিগের যে স্বাভাবিক নীচাবস্থা তাহাতেই স্বচ্ছন্দ বোধ করিয়া সুখসম্ভোগ করেন। ইউরোপীয়েরদিগের যে উত্তম ২ গুণযুক্ত উত্তমাবস্থা তদ্দর্শনে সেইরূপ উত্তমাবস্থা প্রাপ্তির নিমিত্ত সর্ব্বসাধারণেরি লোভ জন্মাইতে পারে। কিন্তু এতদ্দেশীয় মনুষ্যগণ এমত নীচাবস্থায় আছেন যে তদ্দ্বারা উত্তমাবস্থা একবার মানসেও করেন না ইঙ্গলণ্ডীয় বিদ্বান ব্যক্তিরা যে সকল উত্তম কার্য্য করিয়াছেন তাহা এতদ্দেশীয়েরা চিত্তেও স্থান দান করেন না এবং তাহার কিছুই বিবেচনা করেন না' আর স্বাভাবিক নীচাবস্থা হেতু তদ্ভাব এতদ্দেশীয়-

দিগের মনে একবার উদয়ও পায় না। এবং কোন দেশীয় কোন ব্যক্তির সৌভাগ্য কেবল সময় গুণেই হয় এমত নহে শারীরিক পরিশ্রম চেষ্টা ব্যতিরেকে হইতে পারে না। ইউরোপীয়দিগের যে সকল অতিশয় পরিশ্রম উদ্যোগ চেষ্টা সার্থকতা বিদ্যা দ্বারা এমত অনুপম সভ্যতাদিগুণ যুক্তাবস্থা হইয়াছে যে আমরা তন্নিমিত্ত তাঁহারদিগকে প্রশংসা করি। ইঙ্গলণ্ডীয়দিগেব মূলধনের উত্তমরূপে ব্যবহার্য্যতা হেতু যে ধনাঢ্যতা ইহা সর্ব্বসাধারণ জনকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে কেবল বিদ্যা দ্বাবা যে জনদিগের ধনাঢ্যতা সৌভাগ্য হয় এমত তাঁহারা বলেন না বাণিজ্যাদি সহকারে সৌভাগ্যাদি হয়। তন্নিমিত্ত আমরা বলি যে এতদ্দেশীয় জনগণ স্বাভাবিক অলস ও নিদ্রা প্রভৃতি যে দোষবর্গ তাহা পবিত্যাগ করিয়া উক্ত বাণিজ্যাদিরূপ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক সৌভাগ্যের বিরোধী যে কুস্বভাব তাহাকে জয় করিয়া সৌভাগ্যকে প্রবল করুন। আর পরমেশ্বর বহু গুণযুক্তা উর্ব্বরা ভূমি প্রদান করিয়াছেন এবং তাহার উপাযও প্রদান করিয়াছেন ইহা পাইয়া কি উত্তমরূপে ব্যবহার করা উচিত হয় না এই সময়ে অনেকেব উত্তমতা ও সভ্যতা হইতেছে অতএব এতদ্দেশীয়দিগের উচিত যে পশ্চিম প্রদেশীযদিগেব যে সকল সদুপায দ্বারা সভ্যতা হইতেছে সেই সকল সদুপায় সদা আচরণ করেন।

আমাদিগের এই বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচব হইতেছে যে অন্য দেশীযদিগের যাহাতে ভাল হইযাছে এতদ্দেশীয়রা তাহার অনুশীলন করেন না। আমরা জানি এতদ্দেশীয় যাঁহারা পৈতৃক ধন পাইয়াছেন তাহারা সেই ধনেব উত্তমরূপে ব্যবহার ত্যাগ করিয়া গবর্ণমেণ্টে অতিক্ষুদ্র কার্য্যের ভার লইয়া তাহাতেই স্বচ্ছন্দবোধ করিয়া গৃহে বসিয়া বৃথা জল্পনায় বৃথা কালক্ষেপ করেন ইহাতে ইহাদিগের সেই সকল ধনের বৃদ্ধি হইতে পারে না আর ক্রমে ২ নানা কার্য্যে মূলধন বিনাশ পায় আর কিছুদিন পরে আমরা দেখি যে ঐ ব্যক্তি হয় কারাগারে আছেন অথবা কোন আত্মীয়ের বাটীতে পাতডায় নিযুক্ত হইয়াছেন আমাদের এতদ্দেশীয় কত জনকে এতদ্রূপ দৃষ্ট হয় এবং কেহ ২ বলেন যে কি কুরীতি ছিল।

এতদ্বিষয়ে অনেকের সহিত কথোপকথন হয় কিন্তু তাঁহারা বলেন যে ধন নাই আমরা কিরূপে বাণিজ্যাদিতে প্রবৃত্ত হইব। এইরূপ নির্ব্বোধেব বাক্যের আমরা উত্তর দিতে পারি না ইহাতে মৌন দ্বারা ঘৃণাই ভাল। তাঁহারা সাহেবের মুচ্ছুদ্দি হয়েন সে সাহেবকে কি টাকা দেন না আর ঐ সাহেব আপদগ্রস্ত হইলে তাহাকে কিছু দিয়া সেই কুঠীর মান রাখেন না এবং ঐ মুচ্ছুদি মহাশয় কি ইহা দেখিতে পারেন না যে তাহার ধনে নির্ধনী সাহেব অতি ধনাঢ্য হয় আর যাঁহারা কিঞ্চিৎ সুদ পাওয়ার প্রার্থনায় মুদ্রা প্রদান করেন। এতদ্দেশীয়দিগের যে এতদ্রূপ কৃতকার্য্যতা তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই কিন্তু এতদ্দেশীয় ধনিগণ বাণিজ্যাদি দ্বারা ধনাঢ্য হউন আর যে কেরাণির প্রভৃতির কার্য্য

পরিত্যাগ করুন যে সেইসকল কার্য্যদ্বারা দীনদিগের ভরণপোষণ হউক। অতএব আমরা বলি যে ইহাতে তাঁহারা সৌভাগ্যযুক্ত ও ধনাঢ্য হইয়া স্বচ্ছন্দে থাকিবেন আর সর্ব্বসাধারণের সুখ সৌভাগ্য হইবে।

—জ্ঞানান্বেষণ

২৬ অক্টোবর ১৮৩৯। ১০ কার্ত্তিক ১২৪৬

শারদোৎসব

বর্ত্তমান বর্ষীয় শারদোৎসবোপলক্ষে নৃত্য সংদর্শনার্থ খ্রীষ্টিয়ানগণের মধ্যে অত্যল্প মনুষ্য আগমন করিয়াছিলেন এতদ্দর্শনে আমরা অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি আর যখন সর্ব্বসাধারণের একেবারে এতদ্বিষয়ে উৎসাহ পরিত্যাগ করিবেন তাহা আমরা আরো অধিক সন্তুষ্ট হইব কারণ তাহাতে তাঁহারদিগের জ্ঞান ও সুনীতি এবং অন্যান্য বিস্তার আধিক্য হইবে। আমরা অনুমান করি যে এতদ্দেশীয় ধনী বিশিষ্ট মনুষ্য যাঁহারা নৃত্য বিষয়ে উৎসাহ করিতেন তাঁহারা এইক্ষণে ঐ নৃত্য ধর্ম্মশাস্ত্রে ও ধর্ম্ম সভায় নিন্দিত এবং জ্ঞানি বিদ্বিষ্ট এই বোধ করিয়া পরিত্যাগ করিবেন যদ্যপি তাঁহারা উৎসবোপলক্ষে উৎসাহই করেন তবে তাঁহারা ঐ যবন রমণীর নৃত্যের পরিবর্ত্তে অন্য কোন উৎসাহ করেন কেননা মহৎ ভদ্র জ্ঞানী জনগণ দর্শন করণে সমর্থ হয়েন।

—জ্ঞানান্বেষণ

পরিশিষ্ট ৩

[১৮৩০-৩১ সনে 'ইয়ং বেঙ্গল'-গোষ্ঠীর সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের সূচনাকালে, হিন্দুসমাজের বিভিন্ন সংস্কারপন্থীদের সম্বন্ধে তৎকালের বিখ্যাত ইংরেজী পত্রিকা 'ইণ্ডিয়া গেজেট' ও 'বেঙ্গল হরকরা' আলোচনা ও সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন। এরকম কয়েকটি সমালোচনা এবং ইয়ং বেঙ্গলের ইংরেজী মুখপত্র 'দি এনকোয়ারার' পত্রিকায় তার উত্তর এখানে উদ্ধৃত হল।]

—সম্পাদক

India Gazette : August 15, 1831

(From *The Enquirer*)

Hindoo Orthodoxy

Our orthodox contemporary of the Chundrika is very active in publishing stories for the sake of fostering prejudice of the natives. After the abolition of the Satte his paper was full of instances of woman burning themselves alive inspite of the opposition of Government. We are indebted to the *Sambad Cowmuddy* for setting us right in these respects, and answering us that the examples of disloyalty mentioned by Bhobany Banerjee were creation of "the heat-oppressed brain." His attempts to lower down Baboo Roy Kaleenath Choudry in the estimation of the public have received their appropriate reward. Scarcely is the Chundrika published for a month but our secretary falls into a difficult situation. Many days did not pass after his exposure by the Cowmoody when a new story was published in his columns. The subject of this was that an idol rose from the ground at Beneras, and that this was the true image of the goddess Juggatdhatry !!! Before its rising (or more properly her rising) she intimated to potter her intention of appearing upon an alarm of trumpets and other musical instruments. It is said that she insisted upon a procession of ladies attending her with music

and publishing her divinity to the world. The Editor of the *Samachar Darpan* in noticing this tale, refers to another of similar nature, which was by trial proved to be a deciet.

We are at a loss to account for the purpose and intention of persons, who with the greatest confidence rush forward into the notice of the public, with tales and inventions that only lend to throw them into disrepute. The orthodox Hindoos whose credulity can only be exceeded by the bricks played upon them by artful persons, receive with greedy ears whatever is ministered to their belief. The Chundrika's triumph would be very short if the Hindoos could see their own faces. The friends of humanity will, we trust, lose no time in enlightening the minds of the Hindoos and making them perceive the deceits practised upon them. The illiberal papers are indeed very great obstacle's to improvement. They should be discouraged as much as possible. They should not be suffered to baffle the attempts of the patriot for any considerable space of time. Venality is very strong in the orthodox , if therefore the influential sons of civilized England have any sincere wish to ameliorate the condition of the natives, they should render liberalism as particular recommendation to their favours. We know from respectable authority that there are persons among the orthodox flocks—persons who now stand as the defenders of faith, and who strongly animadvert upon the least deviation from Hindooism—who at one time were Christians when under the services of Bishops. Religious hypocrisy will perhaps tell us that these were real Christians ; but that as soon as the rupees, annas, and pice were denied to them by the Right Reverends, they were—reconverted into Hindooism. When those round silver pieces bearing the stamp of "Shah-Alm-Badsaw" have such a magical effect upon our religious brethren, much may be done to discourage the rage of superstition if the influential members of the public take upon them to improve the condion of the natives. But stop a little—

the growing spirit of opposing liberalism has become very general; papers after papers are getting up professedly for the purpose of defending the religion of the country. The *Probakhur* has brought himself to the notice of the public by the indecencies his columns abound with, and his intemperate abuses against the liberal Party. His example has fired others with a desire of gaining the same influence among the orthodox community, by pursuing the track he has pointed out. These reflections serve only to stigmatize the moral and intellectual characters of the bigoted Hindoos ··We do not know what terms to use in our notice of these people. The absurdities they advocate prevent us from being serious with them. The indecencies they bring forward disarm us and render us incapable of handling them.·· We patiently look out for the day when they will tire themselves and their readers, and fall off from their vulgarisms.···

India Gazette : September 6, 1831

(From *The Enquirer*)

Hindu Free School

On Wednesday least we had the pleasure of witnessing the first quarterly examination of the Hindu Free School, conducted by Baboo Madhabchunder Mullick and two other young Hindoo gentlemen. The boys assembled at 10 O'clock and about half past eleven the classes were called upon before Mr. Hare, Mr. Derozio, Baboo Dakchinnanundan Mookerjee, Baboo Rasick Krishna Mullick and a few other native gentlemen. The exhibition was extremely pleasant, and the progress the pupils have made reflects credit upon Baboo Madhabchunder Mullick and his assistants.

The Hindu Free School was first planned by a young gentleman with the pure motive of communicating instruction to native youth. The small fund that has been raised by subscription for its support,

added to the patriotic spirit with which its teachers have voluntarily given their assistance to it, without any desire of gain, gives us cause to hope···. The students are at present limited to history, grammar, geography and arithmetic.

The natives have been hitherto indebted to European charity for education ; they have had hitherto no schools to attend but such as were established by the benevolence of foreigners. Time has produced a happy change ; they now see in their countrymen images of brethren ; they now feel the duty they owe to their country. Since the notice we took of a school at Andoola we have heard of several establishments in different parts of Calcutta, all conducted by Hindoos, and all expressly for the instructions of Hindoos. We understood from good authority that there are at present existing in this town six morning schools in six different quarters, where upwards of three hundred and seventy boys receive instructions. It is a pleasing incident that all these institutions have been projected and are materially assisted by the exertions of young men whose youth would never create in the philosopher any expectation of what they are realizing. These considerations must be gratifying to the feelings of a philanthropist, and should produce happy conceptions in the mind of a Hindoo. The growing spirit of emulation in furthering the interests of India, observable in these admirable young men, will gain new strength from every encouragement that may be afforded to their pursuits···. The spirit of liberalism has been widely diffused, and, that the march of intellect will now he retarded, is far from probable. When upwards of three thousand boys are receiving systematic instructions in the refined language of England we have nothing but hope upon our side. The rays that have emanated from the Hindoo College and that are now diverging to other places must eventually dissipate the mists of ignorance and superstition. When knowledge once begins its march, it cannot, without the greatest difficulty, be retarded in its progress.···.

The liberal, although now persecuted by the brutal tyranny of priestcraft, will soon have occasion to seal his triumph in the overthrow of ignorance···

India Gazette: September 10, 1831

(From *The Enquirer*)

Education

Our knowledge of the various schools at present existing in Calcutta has given rise to several serious reflections into our mind. Education is rapidly advancing in this country, and sentiments of liberalsim are entertained by the Hindoos. There are more than 2000 boys receiving instructions in English literature in the many schools conducted here. Their minds, freed from the shackles of prejudice, are undergoing a complete change. Superstition, which kept them so long involved in moral debasement, is vanishing from their minds. Knowledge enlightens them and enables them to feel the truth and conform to her dictates···

When their thoughts and sentiments are refined, the ocupations the natives were hitherto employed in, will not be suitable to them. When they think and feel so highly, they will not condescend to act as Sircurs and Karanies.···If one that has laboured for years for the cultivation of his mind, be not better off than a common Sircar or Karany, serious evils will be the consequence.···The progress of civilisation will be materially retarded. If, education be not duly appreciated, few will trouble their friends and relatives about it···

India Gazette: October 21, 1831

Editorial: Educated Hindu Youth

Our readers must have perceived from various recent indications and discussions, that considerable excitement has for some time past existed among the more intelligent and educated classes of the Native population of Calcutta. Here as well as elsewhere there is a

conflict going on between light and darkness, truth and error, and it is because we cannot fully approve of the temper and proceedings of those who have our best wishes that we now advert to the subject, in the hopes of leading them to a more correct appreciation of the circumstances in which they are placed, and to the adoption of better adopted means for the promotion of their object. The labours of Rammohun Roy and the establishment of the Hindoo College have together contributed to give a shock to the popular system of idolatry in Calcutta, perhaps we might say in Bengal, which has evidently alarmed the fears of its supporters. A *Bruhmu Shubha*, or Hindoo Theistical Society, has been formed by Rammohun Roy and his friends, who besides have the command of several presses and conduct several periodical publications both in the English and Bengalee languages. Those young men who have received their education at Hindoo College and have embraced liberalism, have not united with the former party, nor do they agree perfectly among themselves, but have apparently divided into two classes, according as they are more or less disposed to encounter all risks in their opposition to the prevailing system. The more moderate division have not any organ for the communication and defence of their sentiments ; while the Ultra or Radical party have boldly taken the field, and are carrying on an active warfare against their opponents. While we wish well to all, it is this last mentioned party that have our warmest wishes in their favour, and we trust they will receive with candour the suggestions we are about to offer, dictated by a conviction that they are, in some respects, mistaking their mission and the nature of the means most likely to promote it.

The first objection we have to make against their proceeding is that instead of limiting their attention to essential, they lessen their own influence and strengthen the cause of their idolatrous opponents by unnecessarily running counter to the customs and institutions of native society. We take it for granted that their object is what it

ought to be,—to make a stand against the folly, the vice, and the impiety of idolatry, and to vindicate for themselves and others the rights of conscience, the right of exercising their own judgement on moral and religious truth, and the right of acting in conformity with the connection of their own minds. These are noble objects worthy of every sacrifice they can be called to make, and we would not recommend anything that would in the slightest degree compromise them. But the attainment of these objects, insted of being furthered, will be retarted by certain views which in their minds appear to be combined with them. For instance, indiscriminate eating and drinking, i. e. eating and drinking not in conformity with the rules of caste, are inconsistent with the enjoyment of respect in Hindoo society as at present consituted, and are consequently incompatible with the possession and exercise of a salutary influence over those who compose the society. Yet most of those of whom we are speaking despite the rules of caste and refuse all conformity to them, by which means they not only banish themselves from Hindoo society and lose all influence over it, but even supply their enemies with a handle against themselves, as if their only purpose in rejecting the religion of their country was to obtain the gratification of their appetites. We are far from thinking that the institution of caste is harmless, but the observance of its rules in respect of eating and drinking need not trouble any man's conscience; and the only question is, whether more good will not be done by conforming to them than by violating them, always combining the observance with the open profession of those sentiments and principles which will prevent it from being misinterpreted. Another instance occurs to us of the way in which popular prejudice is unnecessarily offended and native customs broken down. Everybody knows that good manners, according to the etiquette introduced by the Mussalman courts, require a native to have his head covered in the presence of others, but some of

our youthful Hindoo Reformers, from a weak imitation of English customs, are now in the practice of going about with their heads uncovered. Such sights have grated harshly on our associations: how must they be regarded by their bigoted countrymen, to whom habit and custom are everything! They must shut the door against the entrance of every argument which might otherwise find access to their understanding. They must awaken and strengthen every prejudice which might otherwise, by almost imperceptible approaches and in a thousand nameless ways, be undermined and destroyed. As our reformers wish to be considered philosophers, that should not forget that it is human nature they have to work upon.

Another way in which they are acting unworthily of themselves and creating, amongst the English community atleast, a moral impression against their cause, is by treating with scorn and contumely the praiseworthy literary exertions of their idolatrous opponents. The example which we quote here is the case of Raja Kali Kishen who lately published a translation from the Sanskrit of "the Neeti Shunkhulun, or collection of Sanskrit Slokas of enlightened Moonees." To judge correctly of the reception, to which this work was entitled, we should not only consider the character of the work, but also the situation of the translator. The work itself doubtless contains many puerilities, but to our apprehension it also contains some beauties, and unfolds a page of human nature from which we acknowledge that we have derived both amusement and instruction. But let the work be from beginning to end as silly as it has been unjustly represented to be, still it is an attempt atleast by the translator, to communicate moral instruction to his countrymen, and to make English readers better acquainted with the contents of Sanskrit literature. Are these objects to be met with vollies of ridicule or abuse? The Raja Kali Kishan is an evidence and representative

of one of the beneficial effects that has been produced upon the wealthy Hindoos by the progress of education, Possessed, we believe, of great wealth, his understanding and his attainments are not of that class that would raise him to great eminence among his countrymen. Fifteen years ago a Hindoo of this description would have plunged into sensuality and expended his superfluous riches in the most evanescent gratifications. Instead of following in this respect the examples of others by whom he is surrounded, he is laudably desirous of benefitting his countrymen, and the desire alone to be useful ought to procure him the respect and co-operation of every well-wisher to the progress of the society. Yet because the mode he has adopted does not fully meet the wishes or expectations of the reformers, he is met with a storm of obloquy far more to be regretted on account of its authors than for his sake. These are not the doings of real reformers.

We shall advert at present to only one other point. They not only unnecessarily shock the prejudices of their country-men by disregarding their long established customs, and excite deserved odium on their opponents, but even in opposing what is wrong they do not pursue that temperate and consistent course which would satisfy the mind of the observer that their opposition it founded on sound principle and good feeling. We would not refer to the incident which occured at the house of the Editor of the *Enquirer* in proof of this, if we did not know on authority which cannot be questioned that it is not a solitary instance in which the tenderest prejudices of the Hindoos have been grossly insulted and trampled on. We now refer to it, as it has been amply explained and atoned for, only for the purpose of showing the nature of the acts to which we refer. In acts of this nature there is a radical intolerance which is utterly opposed to that philosophy and

love of freedom and truth and virtue of which such ample profession is made. We may refer also an illustration of what we mean to the pages of the *Enquirer*, the chief organ of the party. There we find almost everything that is calculated to irritate and inflame, scarcely anything to persuade or convince. When it is considered that the writers are young and inexperienced, imperfectly acquainted with the language in which they write, superficially informed on the religion of their forefathers which they have forsaken, and not even professing to have any system of their own to substitute for it, we may conceive·· ···and conclude that until it is abandoned they must abandon all hope of being useful in the cause of truth and virtue.

Bengal Harkaru : October 25, 1831

Hindoo Reformers

We have made several quotations in to-days paper from *The Enquirer*, because we are anxious to bring the proceedings of Native Editors as much as possible to the notice of our European readers. It is not to be supposed because we are thus ready to encourage the Native Liberals that we approve of all their acts or opinions, though we think it neither politic nor generous at such a time as this to dwell with hypercritical nicety on slight errors or improprieties. We agree with our contemporary of the *India Gazette*, that some of the Hindoo Reformers in their strong enthusiasm in the cause of truth and in their abhorrence of superstition have been in some instances carried away by the violence of their feelings into foolish extravagances and very idle bravadoes. These errors, however, which are so natural to youth and so difficult to avoid in a time of great excitement are no more than we anticipated from the students of the Hindoo College ; for these gentlemen, though highly accomplished and intelligent, are young in years and are full of the fire and spirit that

are characteristic of the spring of life. They are dazzled and intoxicated with the loveliness of truth, and look perhaps with too unqualified contempt and abhorence on those amongst their countrymen whose eyes have not yet been couched by the hand of reason. If they would be some-what more temperate, they might possibly effect more extensive good for the superstitions and···are not to be dragged into the right road by main force, nor convinced of their errors by ridicule and insult. At the same time let us not check the ardour of our youthful reformers because their judgement is not always so perfect as we could wish it to be. As the homely proverb has it, we cannot put old heads on young shoulders, and we are by no means sure that the colder and calmer temperament of age is better calculated for working great political and moral changes than the quick intelligence···enthusiasm of youth. If the discretion of age could be combined with the fervour of youth, we might hope for a class of Reformers against which neither friends nor enemies would raise a plausible objection···we must therefore be content with things and persons as they are, and not expect miracles. Taking all things into consideration, we think our Native Reformers are entitled to the admiration and support of all liberal-minded men··

It is to the rising generation that the Reformer is to direct his arguments and persuasions, and hold up the mirror of truth. ·

India Gazette : October 25, 1831

Editorial

It was our intention before now to have resumed our remarks on the progress of religious reform among the educated Natives of Calcutta, had we not been prevented by other unavoidable calls on our time and attention ; and we now return to the subject with the diminished expectation of gaining the candid consideration of those whom we have particularly in view, but more strongly convinced on

that very account of the necessity of using means to temper their ardour in support of a cause which ought not to be desecrated by violence of manner or expression of thought or action. Whatever they may say or think of us, we admire the intrepidity with which they have attacked error, and we sympathize with those who have been made the objects of persecution, but we must not be deterred by personal considerations from remonstrating against a style of controversy which compromises the cause of truth and the character of its defenders, and which has, according to our judgement, a very obvious tendency to retard its progress by multiplying and embittering its enemies, and by alienating or dividing its friends. We have known both the warmth of youth and the experience of age employed as pleas to justify intolerance and dictation, but while we are willing to give all, due consideration both to the one and the other, we cannot admit that either is entitled to claim exemption from animadversion when it injuriosly affects the interest of society. A philosopher, not a Christian, has said that "though freedom from prejudice is one part of liberality, yet to respect the prejudices of others is a greater, and it is certainly that part which most contributes to the peace, comfort and pleasure of socicty". Some of the Hindoo reformers of the present day appear to have forgotten this important branch of liberality, as we formerly showed, in their treatment of their idolatrous opponents ; and if we consider their proceedings we shall find them equally intolerant towards those who are equally as desirous as they can be of promoting the improvement of their countrymen, but who, either from deficient courage or superior judgment, think that the object may be more beneficially accomplished by milder means and a more gradual process. It is no part of our business at present to pronounce, respecting these two parties, which is in the right and which is in the wrong. What we mean to say is that both might go on together in friendly co-operation, to the extent to which they agree, against the common enemy,

and that what prevents this is the intolerant tone assumed by the radical reformers against their moderate coadjutors, as well as against the adherents and defenders of the old system. As friends to native improvement, we lament this schism amongst the liberal Hindoos, and every friend to native improvement must, we should hope, concur with us in considering it a matter of regret and in endeavouring to heal the breach which unfortunately exists.

The Moderate party appears to consist of two divisions,—the friends and adherents of Rummuhan Roy, and a number of youngmen of amiable manners and good aquirements who have received their education at the Hindoo College. These two divisions nearly coincide in the course they have marked out for themselves, but as far as we are aware, there is no actual co-operation, and little inter-course between the individuals who respectively compose them. Both of them, speculatively, reject idolatry, one on the alleged authority of the Vedas, and the other solely, we believe, on the ground of its opposition to right reason ; but while they speculatively reject it, they do not practically abstain from all its observances. We are not prepared to assign all the reasons which influence them in thus conforming to a system of religion which they consider both absurd in principle and injurious in its consequences ; but some of the considerations that operate to produce this effect a·e in themselves highly praiseworthy, and are connected with the best and tenderest affection of our nature. Still, however excellent the motives may be in themselves, it is utterly impossible for us to reconcile the conduct of the individuals we are referring to which a just sense of religious and moral obligation. Idolatry is a great crime against the Sole and Infinite Deity, and although it may be excused in those who commit it ignorantly, we cannot discover any process of reasoning by which it can be justified in those who perceive the unreasonableness of the grounds on which it is defended, condemn the immorality of

which it is productive, and recognize the total overthrow of religious obligation which it involves. In so far therefore as the moderate Hindoo reformers practically countenance idolatry, we consider their conduct as wholly indefensible ; but even after this is unequivocally admitted, it will still remain to be considered what is the best mode of leading them to act in faithful conformity with the acknowledged dictates of their understanding. Is this to be effected by reproaches and vituperation ? Assuredly not. Conviction of error was never produced by such means since the world began. We can easily conceive that the blandishments of affectionate relatives, the ties of mother, wife and children, past habits and the prospects of the future, may intimidate an honest mind into the practice of forms of religion against which reason revolts. Now what is desirable is not that the holy affections of nature should be rudely snapped asunder, where it can be avoided, but that the preservation of them should be rendered consistent with the maintenance of the rights of conscience. This is a result which can be effected only by gradual means. Reason works her way slowly both in the individual and in the mass, but she always is working, and she will in time produce in the cases we are considering, such an amount and strength of conviction as will compel obedience to her dictates, and it is only such an obedience as reason compels, that is either voluntary in the act or possesses any moral value.

In the mean time the gradual nature of the process not only prepares the mind of the individual for the act of duty and self-denial that may be required of him, but also prepares the minds of others to witness or perhaps sanction it with their approbation, and thus that shock is spared which bigotry on the one side and fanaticism on the other would have given to the humanities of life.

In opposition to all this, the cry of the Radical Reformers against the Moderates is, that they are hypocrites, and this is

not insinuated, or implied, or conveyed in general terms, but is broadly expressed in connection with the names of individuals who are thus personally stigmatized. Let it be admitted that they are hypocrites. What then? Why then the cause of truth is not so badly off as we had thought it to be, for some natives of talent, of wealth, and of influence, find it worth their while to profess, however insincerely, that they are friends to it and moreover, give no small portion of their time, labour, and means to promote its extension. Either they are traitors to the cause of truth or to the cause of error. If to the cause of truth, truth can be no loser, for she has no secrets they can betray; if to the cause of error, then the cause is so much weaker than their devotion to it would imply. But we perhaps do wrong in admitting even for a moment that they are hypocrites. They are not hypocrites and the writers who apply this term to them have not reflected sufficiently on its meaning. Hypocrisy implies concealment, and we do not know that this can be justly charged against them. It has been insinuated against Rammohun Roy, but in the speech which he delivered before the Unitarian Society he distinctly gave the members of it to understand that he did not agree with them in every particular and that the unity of the Deity was the chief point in which his faith was coincident with theirs. With respect to the Moderate Reformers now in Calcutta, we have understood that they do not hesitate to express their disbelief in the efficacy of idolatrous rites at the very time that they take a part in them, and that they reason against the truth and utility of the popular superstitions as strenuously in the presence of their idolatrous relatives as of their Christian friends. However lax a notion of morality, however imperfect a sense of religious obligation this may be considered to imply, it is anything but hypocrisy, and we can neither admit the truth nor admire the honesty of the writers

who can fulminate such groundless accusations. Again, we ask what good effect do they hope to produce by such means ? Whcm will they conquer or intimidate by such weapons ? Whom will they convince by such reasoning ? Will they not rather confirm and strengthen the prejudices of the prejudiced, and in the minds of the impartial and disinterested create a moral impression against a cause which requires such means for its support and against themselves for employing them ? What assures them with all friendliness, that such an impression against themselves does already exist to a certain extent in the minds of some whose good opinion, we believe, they would be desirous of enjoying, and who would be anxious on their own part to co-operate with every zealous effort, guided by discretion and temper, to promote the cause of truth. Why should the views of any-one party or division among the liberal Natives be assumed as those to which all the others must conform or incur the brand of hypocrisy ?···

Bengal Harkaru : October 26, 1831

Hindoo Reformers

The *Reformer* of Sunday last contains a long editorial article which may be considered as an exposition of the principles and opinions of that party of which the Editor and his friends are the leaders. By the *Ultra-Radicals* these are called the *Half-Liberals*, whilst by those who share in their sentiments they are styled the *Moderate Reformers.* The merits of the two sects have excited some rather angry and irritating discussions, which while they can do no good to either party may seriously injure the cause which both equally profess to have at heart, and only adopt different means for the attainment of the same end, We regret extremely to observe these dissensions among the common friends of liberty and knowledge, and we sincerely wish that they could be induced to direct all their efforts against their general enemy, and not

lessen the effect of their exertions by petty squabbles and divisions amongst themselves. It is true that the Moderate Reformers, less bold than the Ultra-Radicals, have not wholly and openly rejected the creed of their forefathers, but they have refined upon it in so subtle a manner and have cut off so many of its grosser absurdities and superstitions, and appear to be so sincerely desirous of liberalizing the minds of their countrymen, that it is in the highest degree churlish and injudicious, in those who merely somewhat further on the same road, to regard them with a feeling of hostility. We believe that the Ultra Radicals reject entirely the Hindoo creed and while they profess pure Deism or the belief in one God, are inclined to lend a favourable ear to the arguments in support of Christianity. Their religious opinions indeed are very little opposed to those of the Unitarian. The Moderate party, on the other hand, believe in the Hindoo Scriptures, but acknowledge only one true God, and discard all those ceremonies and superstitions which excite the indignation of enlightened minds, and which, as they maintain, have no necessary or legitimate connection with genuine Hindooism. It is clear therefore, that there is really no very important difference of opinion between the two parties, and it is equally clear that the exertions of both are calculated to be of eminent service to the great body of their countrymen if they do not neutralize the effect of their several labours and give a triumph to the bigots by absurd and idle quarrels amongst themselves. For our parts we are equally the friends of both the Moderate Reformers and the Ultra-Radicals; and though we should rejoice to hear the former reject Hindooism in toto, and without any reservation, we are not quite certain that the general cause would gain an accession of strength by their more bold and decided apostacy, for it is probable that many Hindoos over whom they now exert a considerable influence would in that case have infinitely less respect for their arguments and opinions··

India Gazette : October 20, 1831

(From *The Enquirer*)

Hindoo Reformers

In noticing the remarks of the *India Gazette* upon the matters transpiring in our community, we confess we feel a material disadvantage. Our contemporary commands much influence; we can boast of none. Our contemporary's mistakes may be in some measure overlooked by the public; ours will have a prominent feature because we are young. We accordingly earnestly solicit our readers to consider the importance of the subject we are treating upon, and reflect without prejudice or partiality upon what we have to state in confirmation of the views we expressed before, and in refutation of the objections our contemporary has brought against them. The cause which we have engaged ourselves in promoting is dear to our hearts, and consequently in discussing it we will not be influenced by any spirit of opposition. If what we hitherto thought upon the subject be wrong, we, in the name of all the 'Ultras', declare that we will lose no opportunity of renouncing them. The Editor of the *India Gazette* avoids discussions; we request him not to follow his usual course upon this occasion. We appeal to his feelings of benevolence to consider that the subject involves the interests of a vast portion of mankind— that a cause in which the real and solid happiness of a large portion of mankind concerned, is not to be trifled with. If he indulges in his usual taciturnity after having handled the subject so far, he will materially injure the cause which we have warmly undertaken to promote—a cause for which our party has made so many sacrifices, and is ready to undergo the severest hardships.

The Editor of the *India Gazette* begins by objecting to our "despising the rules of caste and refusing all conformity to them."

We scarcely thought that a man of our contemporary's feelings and sentiments—whose watchword is "Reform"—would object to our breaking off this unnatural distinction; a distinction which prevents man from looking upon his fellow as a brother—which is blasphemy because it attributes Divine Powers to a Bramin. Our contemporary is led with the idea that we lose our influence over the orthodox by it:—We are surprized that after knowing our object from us in a personal interview, he still perseveres in mistaking us. We told him that our purpose is to deal with the rising generation, and that we do not consider the loss of our influence over the orthodox (we mean persons that have forty or fifty years been continually wrapt up in prejudice) as of any consequence. Nay, we also insinuated that we have no hopes of effecting a reformation in the old bigots, and that our struggle is to work upon the minds of the rising generation by examples, and excite their curiosity by expatiating upon the evils of Hindooism and the tricks of those who are for chaining and confining the intellect. We are convinced that if a spirit of investigation be diffused among youthful minds, they cannot embrace a system of idolatry, the absurdities of which are so palpable that they are unable to stand the test of the most superficial examination. Boys in their tenderest years are taught to believe that a Hindoo cannot break the distinctions of caste without some severe misfortunes befalling them, they take the words for granted, and never think upon what they believe. But we hope the case will now be otherwise; Hindoos have unshackled their minds from the bonds of prejudice, and practically act upon liberal principles. The boy hears this, and feels astounded: what his parents have said is contradicted; he is not yet sunk in prejudices and begins to hesitate believing all that was said; he endeavours to think and appeals to his reason, when this last spirit of enquiry and reflection is diffused, we begin to feel the triumph of our party. The

orthodox whose prejudices are opposed, the Bramins whose interests are hurt, the Hypocrites whose wiles are discovered, may all join and thunder ; we disregard all that they say or do, and are engaged in measuring our success with the rising generation. These are advantages which an open violation of the distinction of caste must give rise to ; we know this, we feel this, and we endeavour to set a good example. Again, if we observe the rules of caste, and sanction by our practice what are revolting to our reason and feelings, we shall be positively instrumental in encouraging a serious evil—hypocrisy. How few are those that have the boldness to act as they feel ! And if this handful of young men too, follow the India Gazette's doctrines and live conformably to the rules of caste and creed, who will hereafter come forward and talk of reformation ? If the Ultras having brought the cause so far flinch from their course, it will be a severe check to the progress of Truth. Reports will be abroad that they have been justly punished by those gods whose worship they call idolatry. The bigots will triumph and prejudice the rising generation with the idea that we have fallen because we have renounced the religion of our forefathers. Can there be any improvement when such rumours exist ? Will there be found any in the Hindoo community who will set himself up as a reformer ?—We hope the Editor of the India Gazette will reflect upon all these matters with due consideration. We hope he will not forget that our object is to influence our younger friends with a liberal example, and that we never entertained the presumptuous hope of being at all useful to the elder members of the orthodox community.

We are surprized that the Editor of the India Gazette, who knows us personally, should give ground to the supposition that we have left the religion of our ancestors for gratifying our appetites. Our contemporary, we thought, was more considerate ; and from what he knew of us, we thought he would be the last to

entertain such an unjust and unfounded notion of us. In the first place the very supposition that such a thing is possible, is an absurdity. Is embracing a set of doctrines or renouncing a number of prejudices like putting on red coats, or silk stockings that any man has only to will it, and it is done ? Is it possible for one to give up a creed from any motive whatever, when he feels it is true, and when in consequence such a renouncement points before his mind eternal punishment ? He who says that a human being would, to satisfy appetites and enjoy transient pleasure, commit acts which in his notions are calculated to throw him into "bottomless perdition", is one that has imperfectly studied the human mind. In the second place it is pretty well known to all that they have made sacrifices of serious natures for their opinions. Some have forfeited all hopes of getting their heritage ; some have been obliged to part from their dearest objects of affection and regard. Are these proofs of their primary object being to indulge their appetites ? Some were offered a stipulated sum monthly by their family in case they would cease to declare their sentiments, and in case they would indulge in eating and drinking in their closets ; they treated the offer with contempt and indignation because they had a higher and a nobler motive—of appealing to the reason of their Juvenile countrymen by their examples. These are not proofs of their wishes to indulge in the gratification of their appetites ! In the third place the simplicity and stoicism observed by the liberals ; the aversion they have to excesses ; their domestic economy in matters of satisfying hunger and thirst, are conclusive arguments against the supposition that their purpose is to indulge in excesses.

Our contemporary has given more importance to our bare heads than they deserve, Our bigotted countrymen never remarked this, it being such a trifling matter. We are surprized that his association (?) was hurt by our bare head, since he is one who is so staunch an advocate for reform, and who is so averse to Tory

principle—'let things remain as they are now'. We cannot reconcile his saying that we go about with uncovered heads from a "weak imitation of English customs" with what we said to him in personal interview. The talk falling upon bare heads. We told him that we have thrown off turbans because they pinch our head and make us extremely uncomfortable. What then made him assert in his journal—what he knows we have contradicted—that we go about with bare heads in imitation of English manners, it is impossible for us to determine ; such gentlemen as have constant intercourse with us know that we adopt nothing in our habits and customs but what we consider to be worthy of adoption. The following words of the *India Gazette* have particularly astounded us.

"Another way in which they are acting unworthy of themselves and creating among the English community atleast a moral impression against their cause, is by treating with scorn···the praiseworthy literary exertions of their idolatrous opponents. The example which we quote here is the case of Raja Kali Kissen who lately published a translation from the sanskrit of the Neeti Sankhulan or collection of Sanskrit slokas of enlightened Moonees."

How far the above lines contain facts, and how far Raja Kali Kisheen "is met with a storm of obloquy" by us, the public will be able to judge better than the India Gazette or we, by once perusing the 19th number of the Enquirer. Raja Kali Kisheen, who was never personally known to us, wrote us after the issue of our paper containing remarks upon him, several letters where he evinces a very kind regard for us. If there had been any bad feeling in our remarks he would have felt more than our contemporary. He wrote us so cordially, and here is the India Gazette taxing us of illiberal desires ! Let the public judge impartially, and we want no more. The effects produced upon Rajah have been very desirable ; he has left off his former ideas of translating old sanskrit maxims into English, and is, we understand, about to translate

Johnson's *Rasselas* into Bengalee. Surely the India Gazette's silence could not have achieved this happy change in Rajah. What does our contemporary say to this ? He says that the Neeti Sankulun afforded him much amusement and instruction. Will he condescend to quote a few lines that did so ? Or are we to be led by his authority.

Our contemporary has adverted to the throwing of the meat in the house of an orthodox Hindoo—a circumstance which the perpetrators confessed was wrong, and which no generous mind could—after our confession of repentance, and assurance of strict conduct, think of referring to. It is true that the feelings of the bigots have been improperly wounded ; we have perceived our guilt and have corrected ourselves. Is it then consistent with one that "wishes us well"—nay whose "warmest wishes" we have the happiness to be entitled to—to rake up faults which we have confessed ourselves guilty of, and which perhaps the most implacable foe would have the generosity to excuse ?

Before we dismiss this subject, we feel it right to state that we have been greatly surprised by what the India Gazette has said. That a liberal contemporary would come out against us in strong terms was never expected by us. While we have the happiness to see the fruits of our labour around us, while we see members of the rising generation flocking and approximating to our standard, we are surprized to see the India Gazette professing to give us his "warmest wishes" and at the same time undeservedly stabbing us in a cruel manner. The influence of our contemporary is vast. We particularly request our readers to consider the case with impartiality. If the Ultras suffer unjustly, it is a great discouragement to the propagation of liberal sentiments. We are always ready to acknowledge our faults when pointed out satisfactorily. But when a public journal misrepresents us, and thereby endeavours to hurt us and our whole party, we cannot hold our peace. We beg

of the India Gazette, as a favour atleast, to recur to this subject and state his views after the explanation given. If he be really a friend to the cause, he will undoubtedly take it up again in preference to his Belgium or Poland.

Since sending above to the press, we had the mortification of seeing ourselves grossly misrepresented by the India Gazette. Our contemporary's vast influence is a dangerous weapon against us (Although we will presently prove that every charge of the India Gazette against us was revolting to facts). Yet because it was written by the Editor of the India Gazette it will retain some weight upon the public. Humbly requesting our readers to consider these matters impartially, we proceed to defend ourselves from the attacks our contemporary, evidently in party spirit, has made. He insinuates that we are unreasonably hostile to the Moderates who, he describes, are young, of amiable character. He says, "what we mean to say is that both might go on together in friendly co-operation, to the extent to which they agree against the common enemy, and that what prevents this is the intolerant tone assumed by the Radical Reformers against their more moderate co-adjutors, as well as against the adherents and defenders of the old system." This is an ugly misrepresentation. We never were, nor ever will be, hostile to the moderates unnecessarily, so long as by our being friendly with them we produce no evils. We boldly say what the India Gazette has attributed to us is a mistake. It is the Moderate not we, who from a fear of incurring the censure of the bigots refuse to co-operate with us, and in order to appear active in the cause of superstition before the bigots, actually abuse us for our renouncing idolatry, although they themselves are convinced of its folly. Editorial courtesy prevents us from bringing this into light, although perhaps we would be excused in doing so, in consequence of the extremity into which we have been by our contemporary, whom we would have passed by in silence forthe spirit

he has betrayed, had it not been for his vast influence. The pages of the *Enquirer* give abundant proofs of our wishing to co-operate with the Moderates. Whenever we talked of the educated natives in general, we always recommended a Union. We heard that the Moderates were thinking of establishing a theatre ; we heartily suggested to them a co-operation with us. We did in one instance act in a manner that was unpleasant to them ; that is, we exposed the inconsistencies and the mean hypocrisy of some. This we did only because we saw them going too far. Is this intolerant ? We spoke what was the truth ; our contemporary calls us intolerant ! Let the public judge of the unreasonableness of the charge which he has brought against us. We never intended to intrude upon the natural right of man—his right of thought. How then have we been intolerant ? It is the Moderates that are intolerant, because they daily want to injure us in consequence of our free inquiries respecting theology.···Having in some measure defended ourselves from the aspersions of our contemporary, we have to address ourselves to all natives of knowledge. To the Ultras we have to recommend a strict adherence to their principles inspite of the insinuations of party sprit.···

India Gazette : October 29, 1831

Editorial

We do not grudge the space which is occupied in this day's paper with the answer of the Editor of *The Enquirer* to our recent animadversions, but we feel that an apology is due to our readers, and we trust they will consider that the re-publication of his defence is due from us in courtesy, after the remarks we made on the proceedings and style of controversy adopted by that writer and his friends. We have, as *The Enquirer* remarks, in general declined controversy,—not, certainly, because we disapprove of it when conducted with temper, but because we have been disgusted with

the almost total want of self-respect, and respect for the public which we have too frequently seen exhibited by the controversialists ; and although we observe the inclinations of a more moderate tone in the Enquirer, yet we must take the liberty, notwithstanding his wishes to the contrary, of adhering to our formal practice. We might easily explain or refute where explanation or refutation may happen to appear to be necessary, but we prefer to let his statements go forth entire and uncontradicted rather than by a reply endanger the good which we trust has already been effected. Let the Enquirer and friends be assured that they have not more sincere well-wishers than we are, and that we shall rejoice when their objects can be fully accomplished.···

India Gazette : February 4, 1832

(From : *The Enquirer*)

Prospects Of Hindoo Improvement

Every day adds to the high importance and necessity of a Union among the Hindoo in a political capacity. Scattered and thinly dispersed as they are, they have no means of ascertaining the sentiments of each other respecting any grievance they may commonly labour under. If Ram feels a certain Government order as an imposition upon him, he patiently and quietly submits to it because he sees others do so, though perhaps they too feel it as keenly. Persuaded that his countrymen generally are connected with their condition, however despicable this may be, the Hindoo murmurs not at the heaviest griefs, and makes an effort of reconciling himself to them. Thus it is that ignorant of one another, they are blindly led into hardships and difficulties without ever making any attempt to get rid of them. Grievances succeed grievances, and no effort—no energetic step—is taken-to procure a redress for them. The father meets his death, leaving the task of political improvement for the son ; the son

exerts not a thought upon it, because his ancestors did not show him the way. Generations accordingly have passed in the miserable circumstances arising from weakness and moral imbecility. It is doubtful whether the Hindoo ever enjoyed what may be called political bliss, and whether he ever felt *the equality of men* in its strictest sense. Let us view him even under the native Rajahs of old ;—he was slavish and as degradingly submissive as he may still continue to be. The prince swayed his sceptre with absolute authority, and himself a dupe to the Brahmins, held all the inferior orders of men in utter contempt. His word was the law···

But we think that times are wearing a better aspect. Moral improvement must insist upon political rise. The friends of India, in contemplating its grandeur, could not have adopted a better means for gaining their object, than the institution of Schools for intellectual and moral education—the improvement and elevation of the mind. It would seem indeed wonderful, that the effects of these establishments have not yet been visible in respect to politics. But to a deeply thinking observer it is not surprising. This is but the dawn of civilization in India. The bud of the great flower is but beginning to blossom. There is yet much time to come before the fruit is reaped. Obstacles will fall upon obstacles that were never anticipated before. The Hindoo is but just renouncing his superstition. A change of opinion produces a breach of friendship. The orthodox looks upon the heterodox with anger, with malice—with hatred. The Brahmin curses all that stab his interests, and exercises his influence in creating violent oppositions against the apostates from prejudice. Heart-burning jealously is thus entertained against the liberal, and persecution comes to be the effect. All this flame is again fanned by the Bengalee press. The *Chundrika*, the *Probhakar*, the *Timirnusak*, aim their battery against liberalism, and pursue all enemies to Hindooism to extremes. Abuses, invectives, slanders and every epithet which the native language, pregnant as

it is with indecent vulgarisms, is found to contain, and which genius inured to indecencies can invent, are heaped against the heretic with freedom. These even are by no means sufficient to satisfy the rage of bigotry against liberalism. Can it be expected that under these differences any co-operation will be found among the natives, although in a capacity unconnected with their religious feelings ? But notwithstanding these positions, a political union is not impossible····· Although circumstances appear unfavourable, yet, as the coductors of a paper for native interests, we are not deterred from deposing that a co-operation is necessary and that the Hindoos should come here as friends and foes may both come and shake hands is fancy dress and masquerade—stript of that animosity against each other which religious feelings may have given rise to and fostered. If such a junction be for the advantage of every body—if politics may be considered abstracted from religion—if the physical strictures upon us all ought to be removed—if we be lively to all that we suffer—if our senses have not altogether been callous through long degradation—if those sparks which mark the dignity of human nature be also found in us—if heaven in his gifts have not been sparing to us—if a Hindoo born be equal in his natural state to a British born······what soul that is capable of reflection will not appreciate us when we say that the political improvement of the natives depends upon their own energies. They have only to make known their cases without exaggeration, and then their English rulers will attend to, hear and render their hardships.

India Gazette : February 14, 1832

(From *The Enquirer*)

Mr. Duff's Lecture

To a reflecting mind the things that are transpiring around are fraught with the sublimest lessons. Circumstances apparently

insignificant in themselves, and devoid of any connection with the interest of man, do not unfrequently decide the destiny of a whole nation at large, and strike out the channel through which the minds of countless millions, yet unborn, are to proceed. The unnoticed and unjustly neglected lectures of Mr. Duff on the Evidence of Christianity are likely to assume an importance of the kind and cause a revolution of opinions among the Hindoos utterly unexpected and surprising. These lectures,···guided by no religious principles, are not so convincing as to make us embrace them, not so important as to make us despise them. They are neither indicative of talents of very high order, nor very mean, but stand as a medium between the two extremes. They are highly creditable to Mr. Duff as a man of learning, and, as far as we can guess from our short acquaintance with him, they are highly creditable to him also as a man of honest inclination, which does him more honour than his learning. His lectures, if left to themselves, are in all probability incapable of achieving so great change as is sanguinely expected, but extraneous motives besides themselves, are capable of effecting it in not so insignificant a degree as to make us overlook it. The consequences they are in likelihood to produce, demand our utmost attention as the conductors of a paper avowedly intended to cause a revolution of opinions among our countrymen, and require of us to offer as powerful an antidote as our humble abilities will allow us,

The lectures of Mr. Duff embrace a subject universally liked by the community, and a Hindoo convert to its doctrines will be hailed by it with unbounded applause, and treated with a respect which neither the talents nor the moral character of the individual will entitle him to. The name of a Christian will be sufficient to cover the moral deformities of his heart and the worthlessness of his head. Persons of powerful minds—persons determined to embrace *truth*, and nothing *but the truth*, wherever it can be found—persons leading the most rigidly moral lives, shunning every vice like a filthy load :

persons of this class shall be neglected, merely because they are not Christians, and merely because they have erred perhaps once, and that again honestly. This consideration, to which we cannot but give our consent, rouses our utmost indignation, for we cannot, as Hindoos, and as men, patiently behold honest men despised and truth neglected. A fair enquiry after truth is difficult and at stake, when the unbounded praise of the public, and the devoted love of the community, weigh heavy at the hearts of men. *That this will be the consequence*, a superficial—and much more a deep view of human kind is enough to coroborate. There are more men that are guided merely by the paltry considerations of selfishness than men who are prepared to sacrifice their home, their fortune, their fame, their interest, and their very lives, for the sake of truth. The conclusion then inevitably follows, that interested men, when they find that fame, love, and interest are to be gained by professing Christianity, although opposed to it in action and in opinion, will pretend to be Christians, and thereby be encouraged to pursue their immoral career. This belief, that the letures of Mr. Duff will rather encourage error than truth, though not directly, called upon us to give publicity to our opinions, that thereby if possible we may crush the evil in its bud.

The apprehension that our remarks about Mr. Duff's lectures may be misconstrued into a censure upon them, compels us to speak a few words in defence of ourselves, and also in justice to Mr. Duff.

পরিশিষ্ট ৪

রূপচাঁদ পক্ষী

সঙ্গীত রস কল্লোল

বিজ্ঞাপন

কবিবর রূপচাঁদ পক্ষীর বহুকালের রচিত যে সমস্ত গীত, কবিতা ও পাঁচালীর "সেট" প্রভৃতি পুঞ্জিকৃত হইয়াছিল, সে সমস্ত একেবাবে বিস্মৃতির করালগ্রাসে পতিত হইতেছিল দেখিয়া, প্রায় দুই বৎসর পরিশ্রম করিয়া আমবা তাহার অনেক অংশ সংগ্রহ করিয়াছি। উপস্থিত ঐ সংগৃহীত অংশের কতকগুলি শ্রেণীবদ্ধ করিয়া 'সঙ্গীত রস কল্লোল" নামে প্রকাশ করা গেল। যদি ইহা জনসমাজে আদৃত হয়, তাহা হইলে অন্য অন্য অংশ প্রকাশ করিব।

দুঃখের বিষয়, তাঁহার আদি রস ঘটিত গীতেব যে কি চমৎকার রচনা চাতুর্য্য, পাঠক মহাশয়দিগকে তাহা উপহার দিতে অক্ষম। যিনি তাহা শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। সে যাহা হউক সঙ্গীত রস কল্লোল পাঠ করিয়া যদি একজনও তৃপ্তি লাভ করেন শ্রম সফল হইয়াছে বিবেচনা করিব। —প্রকাশক

কবিবর শ্রীযুক্ত বাবু রূপচাঁদ দাসের সংক্ষিপ্ত জীবনী

কবিবর রূপচাঁদ দাস কে ইহাঁর পরিচয় দিতে হইলে তাঁহার স্বোপার্জ্জিত পক্ষিরাজ বলিলেই যথেষ্ট হইল, তিনি এ উপাধিতে আবাল বৃদ্ধের নিকট সুপরিচিত, যিনি কখন উক্ত কবিবরকে স্বচক্ষে দেখেন নাই তিনিও পক্ষিরাজ নাম শুনিয়া ঠিক ধারণা সক্ষম হন। ফল কথা "রূপচাঁদ পক্ষি" সাধারণের পরিচিত ব্যক্তি। ইহাঁর পরিচয় দানের আড়ম্বর বৃথা, কবিত্ব শক্তিই তাঁহাকে সাধারণের নিকট সুপরিচিত করিয়াছে। যাহা হউক ইহাঁর সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত অবগত হইতে বোধহয় অনেকের ঔৎসুক্য থাকিতে পারে, এই জ্ঞানে আমরা গল্পচ্ছলে ইহাঁর নিকট বাল্যকালাবধি বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত জীবনীর যে যে ঘটনা শুনিয়াছিলাম তাহার যতদূর স্মরণ হইল সংক্ষিপ্তভাবে লেখা গেল।

ইহাঁর পূর্ব্ব পুরুষগণ দক্ষিণ দেশবাসী ছিলেন। উড়িষ্যা প্রদেশে চিল্কা হ্রদের সন্নিকটে ইহাঁদের বাসস্থান ছিল। শ্রীশ্রী৺জগন্নাথদেবের বিশ্ববিখ্যাত কীর্ত্তি স্থাপয়িতা মহারাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের বংশ লোপ হইলে রাজা গৌড়েশ্বর চডঙ্গদেব রাজত্ব করেন। উক্ত বংশ

সম্ভূত হরেকৃষ্ণ দাস মহাপাত্র ইঁহার পিতামহ। তিনি কিলে কনিকা প্রদেশের রাজা বঙ্গভদ্র ভঞ্জের রাজদরবারে কর্ম্ম করিতেন। তাঁহার সন্তান গৌরহরি দাস মহাপাত্র। তিনি রাজা হরিহর ভঞ্জের আমমোক্তার ছিলেন। এই কর্ম্ম উপলক্ষে তাঁহাকে কলিকাতা গড গোবিন্দপুরে থাকিতে হইত। তদবধিই কলিকাতা থাকিবার সূত্রপাত হয়। গৌরহরি দাস মহাপাত্রের ঔরসে কবি রূপচাঁদ সন ১২২১ সালের মাঘ মাসে জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতা সহরের বহুবাজার মলঙ্গা নামক স্থানে ইঁহার বাল্যকাল অতিবাহিত হয়। এই সময় তিনি রামমোহন সরকার নামক গুরু মহাশয়ের নিকট বিদ্যাভ্যাস করেন। পরে হৃদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বৈঠকখানা বাটীতে শম্ভুনাথ মাষ্টারের স্কুলে প্রবিষ্ট হইয়া ইংরাজি ভাষা শিক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন। পরে পঞ্চদশবর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত ধনঞ্জয় দের স্কুলে পাঠ করিয়া শেষে ডেভিড হেয়ার সাহেবের স্কুলে প্রবেশ করেন ও তৎকালে পণ্ডিতপ্রবর রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকটেও শিক্ষা লাভ করিতেন। পঠন-কালীন পারস্য এবং উৎকল ভাষাও শিক্ষা করিতেন। ইঁহার পিতা ইঁহাকে সুপণ্ডিত করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু রূপচাঁদের নিজের অমনোযোগে বাঙ্গলা কি ইংরাজী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারেন নাই। কারণ বাল্যকাল হইতেই ইঁহার কবিতায় অত্যন্ত আশক্তি ছিল। কিরূপ করিয়া রচনা করিতে পারিব ও ইহা শিক্ষা করিবার কোন উপায় আছে কিনা এইরূপ ভাবনাতেই তিনি অধিক সময় অতিবাহিত করিতেন। কাজেই বিদ্যাভ্যাসে কিঞ্চিৎ শৈথিল্য হয়। কবিত্বশক্তি স্বাভাবিক, ইহা শিক্ষনীয় সামগ্রী নহে, ঈশ্বরের কৃপায় যাহার প্রকৃতিগত সেই কবি হইতে পারে। নচেৎ মহা বিদ্বান হইলেও কবি হইতে পারে না, তবে শিক্ষা দ্বারা কিঞ্চিৎ বিকাশ পায় ইহা স্বীকার্য্য।

যাহা হউক তৎকালে সমাধ্যায়ী বালকেরা ও ইনি বাঁশীনাথ দে নামক এক ব্যক্তির নিকট হইতে খেঁউড় গীত ইত্যাদি লিখিয়া তাহা গান করত জনসমাজকে মুগ্ধ করিতেন। কিন্তু সর্ব্বদা তাঁহার নিকট গীত লেখান সুবিধা হইত না বলিয়া ক্ষুব্ধ হইতেন ও নিজে গীত রচনা করিতে চেষ্টা করিতেন। এইরূপে ক্রমে ইঁহার রচনা শক্তি উত্তেজিত হইতে লাগিল, এবং উত্তম উত্তম গীত রচনা দ্বারা জনসমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিতে লাগিলেন। যৎকালে গীত রচনায় বিশেষ পারদর্শী হইলেন, তখন সেই সমস্ত গীত যাহাতে রাগে, লয়ে গান করিতে পারেন এইরূপ ইচ্ছা বলবতী হওয়ায় সঙ্গীত শিক্ষার জন্য প্রথমে শাঁখারী টোলা নিবাসী রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করেন, পরে ছোট মিঞা কালাবতের নিকট ৫।৬ মাস শিক্ষা করার পর তাঁহার পরলোক হওয়াতে তাঁহার শ্যালক ছুট্টি খাঁ ও তাঁহার ছাত্র কাম্মু খাঁর নিকট ২ বৎসর শিক্ষা করেন, পরে শ্রীরামপুর নিবাসী কানাই দাস এবং অন্যান্য গায়কের নিকটও শিক্ষা করিতেন, ও মিঞা গোলাম মাহাব্বাশের নিকট তবলা বাদ্য শিক্ষা করেন ও পন্নু মিঞার নিকট কিছু সেতারও অভ্যাস করিয়াছিলেন।

এইরূপে সঙ্গীত ও কবিতায় ব্যুৎপত্তি লাভ হইলে, কতকগুলি ভদ্র সন্তান জুটিয়া "পক্ষীর জাতিমালা" নামক পালার সখের পাঁচালির দল করেন। এই দল তৎকালীন নূতন ধরণের হওয়ায় সাধারণের নিকট শীঘ্রই আদরণীয় হইয়াছিল ও এই দলের স্থাপয়িতা রূপচাঁদকে রাজা বৈদ্যনাথ রায়, আশুতোষ দেব (ছাতুবাবু), ব্রজমোহন সিংহ রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু), কাশীনাথ মল্লিক, রমানাথ ঠাকুর, নীলরতন হালদার, •বুষচন্দ্র মল্লিক, মোহনচাঁদ বোস, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি সহরের প্রধান প্রধান মহাত্মারা পক্ষিরাজ উপাধি প্রদান করেন, তদবধি রূপচাঁদ পক্ষি নামে খ্যাত হয়েন।

এই সময় তিনি পাচালি, হাফ আখড়াই প্রভৃতির কবিতা রচনা ও রামায়ণ, কৃষ্ণমঙ্গল, যাত্রা, অপেরা, টপ, কবি, বেহুলা, গাজনের সংগের গান, হেয়ালি এবং সময়ে ২ নানাবিধ সাময়িক গীত ইত্যাদি রচনা করিয়া সম্বাদ, প্রভাকর, সোমপ্রকাশ প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশ করিতে লাগিলেন, ও এই সময় চুঁচুড়ার কুলীন কুল সর্বস্ব নাটকের সমস্ত গীতগুলি রচনা করিয়াছিলেন। এইরূপ নানা কারণে শীঘ্রই দেশ বিদেশে খ্যাতি প্রচার হইল। অনেক দূর দূর দেশ হইতে নানাবিধ লোক তাঁহার সঙ্গীত শ্রবণ বা নানা প্রকার অভিপ্রেত বিষয়ের রচনা প্রস্তুত করাইতে প্রায়ই তাঁহার নিকট আসিতেন এবং ইনিও যথেষ্ট সমাদর পূর্বক তাঁহার আশা সিদ্ধি করিতেন। মুক্ত রসিকতা ও সৌজন্যতা গুণে প্রত্যেকে এরূপ প্রীত হইতেন যে তাহারা তাঁহাদের বন্ধু বান্ধবকে সঙ্গে করিয়া পক্ষিরাজকে দেখাইয়া লইয়া যাইতেন।

কোন ব্যক্তি তাঁহাকে কোন দূরদেশে লইয়া যাইবার জন্য আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিলে তাহাতে তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। এমত নিজের ব্যয় ও নানাপ্রকার অসুবিধা ও ক্লেশ সহ্য করিয়াও তাহাদের মনস্তুষ্টি করিতেন।

পাঠক মহাশয়! আপনারা এরূপ মনে করিবেন না যে, রূপচাঁদ শুদ্ধ রং তামাশা লইয়াই থাকিতেন। না, নৈতিক, সামাজিক, নানা বিষয়ের প্রবন্ধ রচনা করিয়া প্রধান প্রধান হরিসভা ও সভায় গান করিয়া লোকের হৃদয়ে যেরূপ ভাব অঙ্কিত করিয়া দিতেন তাহা, আধুনিক নব্য দলের বক্তৃতা অপেক্ষা অনেকগুণে কার্যকারী হইত। সেরূপ গীত আমরা এখনও সমস্ত সংগ্রহ করিতে পারি নাই তবে আধুনিক রচনা দুই একটী যাহা পাওয়া গিয়াছে এই পুস্তকের শেষভাগে তাহা সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।

কবি রূপচাঁদের আর একটী বিশেষ গুণ আছে। তিনি বাঙ্গালা, উড়িয়া, দেশীয়, তৈলঙ্গী ও ইংরাজী প্রভৃতি নানা ভাষায়ও অতি অল্প সময়ের মধ্যে এরূপ কবিতা রচনা করিতে পারেন যে, অনেক কবির দীর্ঘকাল চিন্তা প্রসূত কবিতা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট বলিলে অত্যুক্তি হয় না

এ সম্বন্ধে আমরা ভূয়ো ভূয় দেখিয়াছি, তথাপি পাঠক মহাশয়দিগকে একটী গল্প না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। গল্পটী এই :

মিঃ মেয়ার কোম্পানীর হৌসের মুচ্ছুদ্দী, গুপ্তিপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু যজ্ঞেশ্বর সেনগুপ্ত যে সময়ে ফরেস ডাঙ্গায় বাস করেন, সেই সময়ে উক্ত কবিবরকে তিনি আহ্বান করেন এবং ১০।১২ জন উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয়, বড়বাজারের মহাজন, দালাল প্রভৃতিও তথায় আহুত হইয়াছিলেন। সেই সভায় কবিবর নিম্নলিখিত গীতটী গান করেন।

রাগিণী সিন্ধু—তাল একতালা

চিরদিন কখন সমান না যায়।
দুখ সুখ দেখ, উভয় প্রত্যক্ষ, যেন জলবিম্ব প্রায়॥
শুন হে ভাবতী, অযোধ্যার পতি।
রাজা হবেন রাম বনে হল গতি।
পঞ্চবটী বনে আসি লঙ্কাপতি সীতা সতী লয়ে যায়॥ ইত্যাদি।

এই গান শুনিয়া উক্ত খোট্টা বাবুরা বলিলেন, "পণ্ডিৎরাজ। হাম লোক্ বাঙ্গালা বুলীকা গানা সমঝ্তা নোহি, উস্‌কা মানে বাৎলাও।" এই কথা শুনিয়া উক্ত গীতের অর্থ না করিয়া, হিন্দুস্থানী বুলিতে, তদ্দণ্ডে মুখে মুখে (কাগজ কলম ব্যতীত) ঐ রাগিণী, ঐ তালে ও ঐ গীতের ভাবে নিম্নলিখিত গীত রচনা করিয়া গাহনা আরম্ভ করিলেন—

(গীত).

এসা দিন, দেখো ফিন, রহেগা নেই।
যব্ যেসা, তব্ তেসা, ছোড় দিলকি আশা,
দুনিযা কে তামাসা দেখো ভাই॥
এই যো দুনিয়া, দেখো মেরে ভেইয়া।
দুখ সুখ প্রভু, সব কুছ বানাযা,
যব্ তক্ জীতা কাযা তব্ তক্ রহে মায়া।
যায়া ভাতিজা ভাই॥
দুনিয়া দারি খেলা, কভি বুরা ভালা।
কভি ঘটা ঘোর, কভি হোয় উজালা।
কভি হীরা মতি, কভি মিলে লীলা।
কভি ঘাটতি হ্যায় বাড়তি নেই॥
ছোড় নিরানন্দ, করো জী আনন্দ।
ধ্যানসে ধরো জী সদা সদানন্দ।
চন্দ্ রোজকে বাস্তে দুনিয়াকে এ ফন্দ্।
দ্বন্দ্ব ধন্দ না রই॥

কহে পক্ষি রূপ, নহো জী বিরূপ।
ধ্যানসে ধরো জী প্রভুজি কি রূপ।
অপরূপ রূপ ও রূপ স্বরূপ, এরূপ জগমে নেই॥

এই গীত তদ্দণ্ডে মুখে মুখে তৈয়ারি ও গাহনা করায়, উত্তর পশ্চিম প্রদেশবাসী বাবুরা শুনিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, "আপ কবিবর তুলসী দাসকে মাফিক্, সঙ্গীত রচ্‌নে সেক্তেহে। আপকে নাম কবিবর পক্ষিরাজ আবসে সবকৈ বোলেঙ্গে।"

রূপচাঁদ কাব্য ও সঙ্গীত সাগরে নিরন্তর ভাসমান থাকিয়াও সাংসারিক বিষয়ে উদাসীন ছিলেন না, অর্থোপার্জ্জনও করিয়াছেন, তজ্জন্য এই বৃদ্ধাবস্থায় তাঁহাকে আর্থিক কোন ক্লেশ পাইতে হইতেছে না। উপার্জ্জিত অর্থের আয়ে ভদ্রোচিত রূপে জীবন কাটাইতে সক্ষম আছেন। পূর্ব্বে একখানি অদ্ভুত প্রকারের গাড়ী ছিল। তাহাকে সকলে পক্ষির খাঁচা বলিত ও তাঁহার সাহেব বন্ধুগণও রহস্য ভাবে "Birds cage" ও তাঁহাকে Bird of Paradise বলিয়া সম্বোধন করিতেন, এবং তাঁহার একটী মুদ্রাযন্ত্র আছে তাহাতে নানা প্রকার মুদ্রাঙ্কন কার্য্য হয়। সাহেবেরা তাহার নাম Bird of Paradise Press রাখিয়াছিলেন।

এক্ষণে রূপচাঁদ বৃদ্ধ ও জরাজীর্ণ হইয়াছেন, নানা প্রকার শোকে ও তাপে দেহ মন ভগ্নপ্রায় তথাপি সঙ্গীত বিষয়ের আলোচনা ও সজ্জন তুষ্টি প্রবৃত্তি সমভাবেই আছে।

রূপচাঁদ বাবুর দুইটী স্ত্রী। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহাদের গর্ভজাত পুত্র কন্যাগণ সকলেই অসময়ে কালগ্রাসে পতিত হইয়া তাঁহাকে দুস্তর শোক সাগরে নিক্ষেপ করিয়াছে। এক্ষণে কেবল মাত্র তিনটী দৌহিত্রী পুত্র ও একটি দৌহিত্রী কন্যা লইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। কিছুদিন হইল ইনি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে তীর্থ যাত্রা প্রসঙ্গে গমন করিয়া গয়া, কাশী, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি নানা পবিত্র ক্ষেত্রে বিচরণ পূর্ব্বক স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিয়া বিষয় কর্ম্ম হইতে বিরত চিত্ত হইয়া পরমার্থ চিন্তনে মন নিবেশ করিয়াছেন।

কবিবর রূপচাঁদ, জীবিত আছেন—সুতরাং ইহার চরিত্র সমালোচনায় বিরত থাকিতে বাধ্য হইতে হইল। তবে স্থূল কথা এই ইনি ধর্ম্ম সম্বন্ধে অন্ধ বিশ্বাসী নহেন, বিশেষ বিচার শক্তি আছে ও জীবনে এমন কোন কাজ করেন নাই, যাহাতে অন্য কাহাকেও মনে ক্লেশ পাইতে হইয়াছে। কিন্তু ভদ্র আখ্যাধারী অসভ্য "বে আদব" লোকদিগের প্রতি বড় বিরক্ত। এবং পূর্ব্বোক্ত সখের পাঁচালার দল স্থাপন করায়, নানা প্রকৃতির লোক একত্র সমাবেশ করিতে হইয়াছিল, কারণ গাহনার উৎকর্ষ সাধনের জন্য সঙ্গীত অভিজ্ঞ লোকের বিশেষ প্রয়োজন। ঐ সমস্ত লোকের অনুরোধে যুবাকালে দুই একটা এরূপ বিদ্রূপাত্মক কাজ করিয়াছিলেন যে শুনিলে হাস্য সম্বরণ দুর্ঘট। যদিও আমরা দুইটী ঘটনা অবগত

আছি, কিন্তু রুচিবাদীদিগের ভয়ে ব্যাখ্যা করিতে সাহসী হইলাম না। ইহাঁর বাটীর সন্নিকটস্থ বৈষ্ণবদিগের "অষ্ট প্রহর" দেখিয়া তাহার ব্যঙ্গচ্ছলে "চতুপ্রহর" ও "জলছত্রে"র পরিবর্ত্তে বিদ্রূপাত্মক "সদাব্রত" করিয়াছিলেন। ইহাতে অনেক "বাবাজী" এক ঐক্য হইয়া, রূপচাঁদকে কষ্ট দিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।

রূপচাঁদ স্বভাবতঃ বাক্যে হাস্যরস কুশলী ও বিদ্রূপপ্রিয়। বাক্ পটুতায় কোন সভায় এ পর্য্যন্ত কাহারও নিকট পরাজিত হন নাই, বরং প্রত্যেক সভ্যকে পরম আপ্যায়িত করিয়াছেন। ইনি কীর্ত্তন অঙ্গের ও খেয়াল, টপ্পা ইত্যাদির নানা প্রকার সুর একত্র সংমিশ্রণে, মিশ্র রাগ রাগিণীর, শ্রবণ মধুর অনেক নূতন নূতন সুর নিজে প্রস্তুত করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সমস্ত নূতন ধরণের সুরগুলি লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে। কারণ যে যে ব্যক্তি ইহাঁর নিকট ঐ সমস্ত সুর শিক্ষা করিয়াছিল, প্রায় সকলেই কাল কবলে পতিত হইয়াছে। রূপচাদ নিজেও এ জন্য দুঃখ করিয়া থাকেন। গীতগুলি আমাদের দিবার সময় আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন "কাহারও সুর জানা রহিল না 'সাপের মন্ত্র' লিখিয়া কি করিবে।"

রূপচাঁদের ভিক্ষা দেওয়া ইত্যাদি কাজও অনেকটা অদ্ভুত প্রকার। সে সমস্ত বিষয় লিখিলে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ হইয়া পড়ে। কিন্তু তাহার প্রয়োজন নাই। আমরা এইখানে সংক্ষিপ্ত জীবনীর শেষ করিলাম। —প্রকাশক

[সঙ্গীত রস কল্লোল]

[১] রাগিনী গরজ—তাল সওয়ারী

দীনে কৃপা কর, লম্বোদর গজানন।
না জানি ভকতি স্তুতি, আমি অতি অভাজন ॥
ত্বমেব জগত পূজ্য, স্থূলদেহ চতুর্ভুজ,
মূষিকোপরি বিরাজ, ত্যজি রত্ন সিংহাসন ॥
শঙ্খ চক্র গদা ধারী, তব নাম প্রাতে স্মরি।
জ্ঞান দেহ কৃপা করি, ওহে বিভু জ্ঞানাঞ্জন ॥
অপার তব মহিমা, বেদাগমে নাহি সীমা।
খুঁজে না পাই উপমা, তুমি ব্রহ্ম সনাতন ॥
কহে দীন খগপতি, সতত করি আরতি।
বিঘ্ননাশ গণপতি, বিঘ্ন বিনাসন ॥

[২] রাগিণী পবজবাহাব—তাল কাওয়ালি

শারদে বরদে জ্ঞানদে জননী।
বেদ মাতা বিদ্যা দাত্রী জড় নাশিনী ॥
সপ্ত স্বর তিন গ্রাম, একুশ মূর্চ্ছনা নাম,
পুরাণে শুনি, (জননী) বীণাযন্ত্র ল'য়ে করে, বাজাও মধুর স্বরে
ভ্রাড়ে ডারা, ডারা ডারা, ছত্রিশ রাগিণী ॥
ধ্রেগেম্বন্ ধ্রেগেম্বন্, তাক্কা থুনা হুনা হুনা,
তাক্ কেটে গেদে ঘেনা, গেদে ঘেনা, গেদে ঘেনা,
তাদারে দানি (জননী) নাদ্রে দ্রেদ্রে তোম্ দ্রে দ্রেদ্রে,
দ্রেদ্রে ২ দ্রেদ্রে, ২ তাক কেটে গেদে ঘেনা নিনি নিনি, নিনি ।
পুরবী, ভৈরবী, খট্, যোগীয়া, বাগেশ্রী, ধানেশ, ইমন পুরিয়া,
বাহার সোহিনী, (জননী) ভৈরোঁ, মালকোশ,
শ্রী, হিণ্ডোল, মেঘ, দীপক্, সহ বাজে বীণা নি ।
কহে দীন খগবরে, তব নাম উচ্চৈস্বরে,
গুণীগণে গান করে, গো বীণাপাণি (জননী),
সা, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি সা।
নি, ধ, প, ম, গ, ঋ, সা, সঙ্গীত কারিণী ॥

[৩] রাগিণী সোহিনীবাহার—তাল একতালা

শারদে বরদে বাণী, এমা বিশ্ব রূপিণী।
অনাদ্যা আদ্যা, তুমি মহা বিদ্যা, বিদ্যাদায়িনী ॥
ব্রহ্মময়ী পরাৎপরা, সর্বোজ বাসিনী বাসুদেব দারা,
সপ্তস্বর উদারা মুদারা, তারা উচ্চস্বর ব্রহ্ম স্বরূপিণী ॥
বাক বাদিনী পুরাণেতে কয়, তব কৃপায় মুকে স্পষ্ট কথা কয়।
বর্ণহীনজন কবিতা রচয়, জড় মুঢ় জন নিস্তার কারিণী ॥
ধ্রুপদ খেয়াল, টপ্পা গজল আদি, রেক্তা পাচালি কবিতার বাদি,
তাল লয় আদি সব ৩ঃ বিধি, রাগ উপরাগ ছত্রিশ রাগিণী ॥
দীন খগ কয় মাতা পদ্মাসনা করে বহু শিক্ষা কামনা পুরেনা,
রাগে সুরে আছে গলেতে মেলেনা, মুদ্রা দোষ বেহুঁস কোন ২ গুণী।

শ্রীশ্রীচৈতন্য প্রভুর গুণগান

[৪] রাগিণী পরজবাহার—তাল ঝাঁপতাল

জয় জয় শ্রীচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত বিভু প্রভু গৌর ভক্তবৃন্দ॥
শান্ত দান্ত চৌষট্টী মোহন,
ক্ষমাবন্ত শ্রীনিবাস, হরিদাস শ্রীচরণ বন্দ্য॥
গদাধরে প্রণিপাত, শ্রীআচার্য্য রঘুনাথ, মুরারি মুকুন্দ,
হরিনাম বিলাইয়ে, কলি কলুষ নাশিয়ে,
বলেন হরি হরি হয়ে, জীবে লাগে ধন্দ॥
এমন দয়াল প্রভু নয়নে না হেরি কভু,
কলসীর কানা প্রহারেতে নহে নিরানন্দ।
এমন দয়াল কে আর আছে, মার খেয়ে প্রেম যাচে,
জগাই মাধাই তরে গেছে, পাইয়ে পদবৃন্দ॥
নবদ্বীপে গৌর রূপে, নন্দের গোবিন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, অবধৌত,
কইলেন এ আনন্দ॥ (খগ কহে সদা চাই, চরণার বৃন্দ)

[৫] রাগিণী দেশ—তাল কাওয়ালি

গৌর রূপে, নবদ্বীপে, আসিয়া হরি।
করি দলন, পাষণ্ডগণ, বিলাইলেন নাম সুধা ভবক্ষুধা নিবারি॥
সঙ্গে প্রভু নিত্যানন্দ, সহিত সুন্দরানন্দ, রামানন্দে লয়েছেন সঙ্গে করি
শ্রীনিবাস মাঝে মাঝে, অদ্বৈত আচার্য্য নাচে,
তাতাথৈ তাতাথৈ থৈ থৈ থৈ থৈ বাজিতেছে ঝাঁঝরী॥
প্রেমের বন্যা আনি, ভাসাইলেন সর্ব্ব প্রাণী,
শ্রীচৈতন্যের কি প্রেমের লহরী।
তিন বাঞ্ছা অভিলাষী, শচীগর্ভে পরকাশি,
পারিষদ সঙ্গে রঙ্গে বলেন হরি হরি॥
ত্যজিয়ে ব্রজের ভাব, কি ভাব ভাবি মাধব,
রাধা ভাবে নদিয়ায় অবতরি।
শুধিতে প্রেমের ঋণ, পরিলেন ডোর কৌপীন,
দীনের অধীন হয়ে প্রেম যাচেন বাহু পসারি॥

কহে দীন খগ বরে, শ্রীচৈতন্তের রূপ হেরে,
কেমনে সে ধনে বল পাসরি।
হেন বাঞ্ছা হয় আমার, ত্যজি গৃহ পরিবার,
শ্রীচরণ করি সার, ভবজ্বালা নিস্তারি॥

[৬] রাগিণী জংলা ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল টিমা তেতালা

লাগিল নয়নে মনে নটবর গোরা।
(নাগর বর নটবর গোরা) মোহিত নয়ন মন
যায় না পাসরা (গৌর রূপ যায় না পাসরা)॥
মনে করি ভুলে থাকি, মুদে থাকি যুগল আঁখি।
হৃদি মাঝে গৌর দেখি, কেন সখী মোরা।
(বল বল কেন সখী মোরা)
অপরূপ গৌররূপ, ধরাতে ধরেনা রূপ,
সনাতন শ্রীরূপ, রূপে দিলৈন ধরা (গৌররূপে দিলেন ধরা)॥
হরি হরি হরি ব'লে, ভেসে যায় নয়ন জলে,
প্রেমে চলে ঢোলে ঢোলে, যেন মাতয়ারা (গৌর প্রেমে মাতয়াবা)
প্রেমের বন্যা আনিলে, পৃথিবী ধন্য করিলে,
প্রেমে জগৎ ভাসাইলে, শচীর নয়নতারা॥
(যেচে যেচে, বিলাইছে, প্রেমের পসরা)
কহে দীন খগপতি, কার ভাবে গৌর মূরতি,
হয়েছ বল সম্প্রতি, ব্রজের মাখন চোরা॥
(পায় গুরু মুড়ায়ে মুণ্ড ধন্য কৈলেন ধবা)

[৭] রাগিণী মূলতান—তাল কাওয়ালি

ব্রজলীলা পরিহরি শ্যাম রায়।
আসি [illegible] যায় আ-আ-আ-আয়॥
(হরিনাম সুধা গোরা জগতে বিলায়)
(অনর্পিত ধন গোরা জীবেরে বিলায়)
রাধার ভাবে হরি হইলেন গৌরাঙ্গ,
অন্তরেতে কাল বাঁকা ত্রিভঙ্গ, সঙ্গে লয়ে সাঙ্গো পাঙ্গ,
হরি হরি হরি গুণ গায়॥

শ্রীরাধার, প্রেমধার, শুধিব ব'লে, ধড়া চূড়া ত্যজে কৌপীন পরিলে,
রাধা রাধা ব'লে নয়ন সলিলে, ভাসিছে গৌর রায় ॥
যে প্রভু ত্রৈলোক্য পূজ্য, বৈকুণ্ঠ যাহার রাজ্য।
ঐশ্বর্য্য করিয়ে ত্যজ্য চিন্তা কাম্থা গায় ॥
বলিহারি গৌর লীলার কহে খগবরে, বৈরাগ্য ধর্ম্ম জীবে দেখাইবারে,
দণ্ড কমণ্ডলু লইলেন করে, তুচ্ছ করি সংসার মায়ায় ॥

[৮] রাগিণী পূরবী ইমন—তাল কাওয়ালি

নাগর বর নটবর গোরা।
ত্রিভুবন ভবনিদান, ত্রিজন মন চোরা ॥
সত্য অগ্রে শ্রীচৈতন্য বট পত্রেতে শয়ন।
পৃথিবী উদ্ধার কারণ, সৃজিলেন ধরা ॥
ত্রেতাযুগে ক'রে লীলা, সাগরে ভাসালে শিলা,
পাষাণ মানবী কৈলা, বল্ক বাস পরিধান, শিরে জটা ধরা ॥
দ্বাপর যুগের লীলা, আপনি রাখাল হৈলা,
বনে গো বৎসেরে চরাইলা, ব্রজ গোপীগণ জন মনচোরা ॥
কলিযুগে অবতরি, পাষণ্ড দলন করি।
ব্রজ ত্যজে এলেন হরি, তারিবারে ধরা ॥
ব্রজের রূপ ত্যজিয়ে, নদীয়ায় আসিয়ে।
চূড়া বাঁশী কারে দিয়ে, ডোরকৌপীন পরা ॥
খগবর বর্ণয়ে, চৌষট্টী মোহন্ত ল'য়ে।
হরিনাম বিলাইয়ে, ধন্য করিলেন ধরা ॥

[৯] রাগিণী জংলা সিন্ধু—তাল ঠুংরী

শ্যামসুন্দর, অতিমনোহর, ত্যাতী কদম্ব সন্দিপিত সদা।
লীলা করি হরি, ব্রজে অবতরি, মস্তকেতে ধরি, নন্দের বাধা ॥
নবদ্বীপে আসি, প্রভু গোলকবাসী, জীবে দিছেন তুষি, নামসুধা।
শুনিয়ে কীর্ত্তন, যুড়াল শ্রবণ, হইল মোচন, ভব ক্ষুধা ॥
কহে খগবরে, হৃদয় কন্দরে, প্রভু কৃপা ক'রে, থাক সদা ॥

[১০] রাগিণী ইমনবাহার—তাল আড়াঠেকা

হে, জন রঞ্জন, বিভু নিরঞ্জন,
দীন অকিঞ্চন, ভবভয় মোচন ॥

নির্ব্বিকার নিরাকার, নিরাধান সাবাৎসাব।
নিত্যানন্দ নন্দাগাব, লীলাচল, নিত্যধন ॥
মহিমা তোমাব, বেদে অগোচব, ভূচব, খেচব, রচনা তোমাব,
দিবাকর নিশাকর রত্নাকব, বৈশ্বানর, নব, সুরাদি পবন।
সৃজন কারণ, সৃজন পালন, সৃজন স্থাপন, সৃজন নিধন।
সৃজন রঞ্জন, সৃজন মোহন, শ্রীধব শ্রীপতি শ্রীচৈতন্য ॥
মৎস্য কচ্ছ নৃসিংহ ববাহ, বামন, রূপেতে বলিবে চলহ।
ভৃগুরাম রাম শ্যামল বিগ্রহ, (হবে) কল্কিরূপেতে শ্বেতাশ্ব বাহন ॥
কভু নিরাকার, কখন সাকাব সাকারেতে কভু জন্মযে বিকাব।
জ্যোতির্ম্ময় বিভু কভু জলাকাব, শক্তির সঞ্চারে বহু অবতার,
বটপত্রে কভু করহে শযন ॥
এক অদ্বিতীয় নাহিক দ্বিতীয, একের সৃজন চরাচরময়।
দশ অবতাব দেবাদি বিগ্রহ, সর্ব্বেশ্বর বি; সর্ব শক্তিমান ॥
ব্রহ্ম ধ্যান হয অতীব দুর্লভ, গৃহাশ্রমে থাকি না হয সম্ভব,
অতএব সূক্ষ্ম কহেছেন উদ্ভব, অর্চ্চন মনন ধ্যান কীর্ত্তন ॥
ত্যজ মোহ সব, যেভাবে যেভাব, পূরিবে সাধকেব মনবাঞ্ছা সব
সূর্য্য গণদেব শিবাণী শিব, বত্নাকরে যথা নদনদী মিলন ॥
ভক্ত জীবন, ভক্ত প্রাণ, ভক্তি ভাবাতে যে করে স্মবণ।
ভক্তি রস প্রভু সদা সর্ব্বক্ষণ, ভক্তাধীন বিভু ভগবান ॥
ত্বমেব, নির্গুণ, গুণাতীত পুন, জ্ঞানেব অগোচব তাঁহার গুণ।
গুণগানে মগ্ন ত্রিজগতে জন, কহে দীন হীন পদ্মগামন ॥

[১১] রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালি

শ্রীনিবাস যশ রস ভাবনা (বসনা)
অলসের বশ হোযে থেকনাবে থেকনা,
গুণগানে লযতানে, তারে তাব সাধনা।
নামেব মহিমা, বেদে সীমা দিতে পারে না,
হরি হয়ে বলেন হরি, হরিবারে বেদনা ॥
নবদ্বীপে, গৌরকপে আসিয়ে কেলেসোনা।
সঙ্কীর্ত্তনে জগজনে, করিলেন মগনা ॥
সত্যভামাব ব্রতকথা ত্রিজগতে ঘোষণা।
হরি হতে নাম ভারী তুলে তুলে তুলনা ॥

কুরু করে, দ্রৌপদীরে, সভাতে বিবসনা।
পীতবাস দিয়ে বাস, পুরাইলে বাসনা॥
দুর্লভ মানব জন্ম, সার কর্ম্ম করনা,
বিশ্বম্ভর চিন্তাকর, বিষয়েতে ম'জনা॥
খগবরে, সদাকরে, জোড় করে প্রার্থনা
সুখ দুঃখ পরিহরি, হরিহরি বল না॥

[১২] রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল একতালা

ভব পারাবারে, আয় কে যাবিরে, শ্রীনাথের তরী লেগেছে তীরে।
জগৎ চিন্তামণি, প্রভুচক্রপাণি, আপনি, ক্ষেপনি শ্রীকরে ধরে॥
হেরিয়ে তরঙ্গ পাইও না আতঙ্ক, ভেবোনা ভেবোনা ও মন মাতঙ্গ।
তেজিয়ে কুসঙ্গ, কর সাধুসঙ্গ, তবে সে ত্রিভঙ্গ লবেন কৃপা করে॥
ক'রনা কো হেলা, চাপ এই বেলা, সে ঘাটেতে নাই দান আর তোলা।
ভক্তিভাবে কর করে জপ মালা, চিকন কালা রূপ ভাব রে অন্তরে॥
হেলায় ভেলা, ভোলা, হারালি হারালি, ছয়ের দায়ে, এবার ডুবিলি ডুবিলি
প্রপঞ্চ পঙ্কেরে সুখে রাখ বলি, যুগল বাহু তুলি বল মুরারে॥
দ্বেষাদেশ ত্যজি হও এক মত, পথের সম্বল লহবে কিঞ্চিৎ।
হরি নামের সারি গাও অবিরত, নারায়ণ ব্রহ্ম ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে॥
কহে খগইন্দ্র নরেন্দ্র গজেন্দ্র মুনীন্দ্র, ফণীন্দ্র সুরেন্দ্র চন্দ্র যোগে যাগে।
যাঁরে না পায় যোগেন্দ্র, সেই কৃষ্ণচন্দ্র, নদীয়া নগরে।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমি

[১৩] রাগিণী ইমনকল্যাণ—তাল কাওয়ালি

কংশ ধ্বংশ এইবার। (হবে)
নিত্য ধনের আগমনে, ঘুচিবে মহীর ভার॥
দৈবকী মেলি আঁখি, ক্রোড়ে কৃষ্ণচন্দ্র দেখি।
তিলার্দ্ধ নাহি বিশ্রাম এক দৃষ্টেতে নিরখি।
বসুদেবে কহে ডাকি, কংশ ভয়ে কোথা রাখি।
এমন পরাণ-পাখী, অঞ্চলেরি ধন আমার॥
সূর্য্য চন্দ্র বজ্রপাণি, ব্রহ্মা আদি শূলপাণি,
ত্রিজগতের চিন্তামণি, মর্ত্ত্যে আগমন জানি।

বসুদেবের ধ'রে পাণি, সঁপে দিলেন নীলমণি,
যাও যথা নন্দরাণী হইয়ে যমুনা পার ॥
অষ্টম গর্ভ জানিয়া, কংশ কারাগারে গিয়া,
হেরিয়া সে যোগ-মাযা, যায় বাহু পসারিয়া।
অন্তরীক্ষেতে অভয়া, কহেন কংশে হুঙ্কারিয়া,
তোর যে করিবে গযা, তার ব্রজে অবতার ॥
প্রভাতে গোপ-গোপীতে, আসিযা নন্দালয়েতে দেখে রাণীর ক্রোড়েতে,
জগদ্বন্ধু জগন্নাথে, নন্দ সানন্দচিতে, দধি দুগ্ধ ঢালে মাথে,
খগবর ভাবে চিতে, ভবার্ণব কর্ণধার ॥

[১৪] রাগিণী ইমনকল্যাণ—তাল কাওযালি

আজ নন্দালয়েতে।
গোলক বিহারী হরি মানবলীলা প্রচারি, অবতার হবণেতে ॥
যতেক প্রতিবাসী, ব্রজবাসীর মহিষী,
হেরিযে সে কাল শশী আনন্দ সাগবে ভাসি,
যেন গগনের শশী, উদয ভূতলেতে ॥
বরজ রমণী ধন্য, ব্রজের গোপ গোপিনী।
হেরি নীলকান্ত মণি, করয়ে আনন্দ ধ্বনি ॥
তব পুণ্যে নন্দরাণী, পুলকিত হোল ধরণী।
ত্রিজগত চিন্তামণি, হেরি তব ক্রোড়েতে ॥
উপানন্দ আর নন্দ, আদি যত গোপ বৃন্দ,
পুলকে পুর্ণিত হয়, হেরি মরি শ্রীগোবিন্দ।
নাচিছে গাইছে করিছে বহু আনন্দ ॥
প্রবন্ধ দন্ধ ছন্দ রাগ সুর লযেতে।
বাজে ঝাঁঝরী মাধুরী, বেণু বীণা তুরি ভেরী,
জগঝম্প দম্ফ লম্ফ করে ব্রজ পুরি ভরি,
নন্দালয়ে যায ধেয়ে যোগি ঋষি ব্রহ্মচারী।
খগ কহে হরি হরি বলরে বদনেতে ॥

১৫] রাগিণী মূলতান—তাল খেমটা

আজ নন্দের আনন্দ গোবিন্দ পাইযে, সানন্দ সুনন্দ উঠে মাতিয়ে।
বাজে ধিকতাং ধিকতাং তাং তা তাং, মৃদঙ্গ তাতা থইয়ে ॥

ভোঁ ভোঁ ভোঁ বাজে তুরি ভেরী, ঝন ঝন ঝন বাজিছে ঝাঁঝরী।
জগঝম্প ডম্ফ বাজে সারি সারি, ভূমিকম্প হয় শুনিয়ে ॥
ভূতলে উদয় নীল কমল, কালরূপে জগত করেছে আলো,
তরুণ অরুণ জিনি পদতল, ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ শোভয়ে ॥ (পায়ে)
গোপ পরস্পরে ধরাধরি করে, জড়া জড়ি করে,
পড়ে ধরা'পরে, দধি দুগ্ধ আদি আনি ভারে ভারে।
হাতে মাথে দেয় ঢালিয়ে ॥
আনন্দ সলিলে ভাসে নন্দরাণী, ক্রোড়েতে পাইয়ে নীলকান্ত মণি,
আনন্দ বাধাই গায় খগমণি, শ্রবণ যুড়াবে শুনিয়ে ॥

[১৬] রাগিণী সিন্ধু ললিতমিশ্র—তাল পোস্তা

কি আনন্দ হের হের হের, নন্দালয়েতে।
গোলক বিহারী হরি, অবতরি ব্রজেতে ॥
দেব দেব পঞ্চানন, সদা যারে করেন ধ্যান।
পূর্ণব্রহ্ম ভগবান, যশোমতির কোড়েতে ॥
মোক্ষদাতা জ্ঞানদাতা, যিনি বিধির বিধাতা।
নন্দ হলেন তার পিতা, কি কঠোর তপেতে ॥
ব্রজবাসীর মহিষী, হের প্রভু ব্রহ্ম বাশি।
চেয়ে আছে দিবানিশি, অনিমিষ নেত্রেতে ॥
কহে দীন খগমণি, শ্রীপদের কি নিছান,
তরুণ অরুণ জিনি, শোভা সে শ্রীপদেতে ॥

[১৭] রাগিণী সুরট— তাল জৎ

ধেয়ে এস দেখ রোহিণী। (সরনা রাণী)
এক সর্ব্বনাশী, রাক্ষসীর বক্ষে বসি, নীলমণি ॥
হেরে হলেম হতজ্ঞান, গোপাল করে স্তন্যপান,
আমার বিদরে প্রাণ, সরেনা বাণী।
হলো একি অমঙ্গল, আমায় খুলে বল বল, ওগো দিদি রোহিণী।
গোপালে শোয়ায়ে সেজে, আমি গেলাম গৃহ কাজে।
কে আনিলে আঙ্গিনা মাঝে, তত্ত্ব ইহার না জানি ॥
এরূপ দৌরাত্ম্য হলে কি ক'রে থাকি গোকুলে।
কাত্যায়নী কুল দিলে, বাঁচে গো জীবন।
কত আরাধনা করে, পুজে ষোড়শ উপচারে, পেলেম সাধের নীলরতন ॥

হারালে বাছা নীলমণি, হব মণিহারা ফণি,
সুখে থাকে রতনমণি, তাই ভাবি দিবা যামিনী ।।
বলেছেন মুনিবর, বড় দুষ্ট কংশ চব ।
সেই হতে হলো ডর ভাবি আমি নিরন্তর ।।
মনে হতেছে ভাবনা, আব এ বাজ্যে বব না, যাব আমি দেশান্তর ।
দুঃখ পাইলে সন্তানে, সয় কি মায়েব প্রাণে ।
আব বাঁচিনে বাঁচিনে অস্থিব হয় পরাণি ।।
ভাবিযে হলেম আকুল, কি সে বস পাব কূ ,
আমরা গোপের কুল , ভাল মন্দ জানি না ।
কৃষ্ণনিধি দিযে বিধি, আব বাদী হইও না ।
কহে দীন খগপতি, শুন শুন যশোমতি,
গোপাল অগতিব গতি, ত্রিজগৎ চিন্তামণি ।।

[১৮] রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল একতালা

পডেছি বিপদে, শুনগো যশোদে, তোর কালাচাঁদেব লাগিযে ।
ননি নাহি চায, ভাণ্ড ভেঙ্গে খায, বলিলে পলায ধেয়ে ধেযে ।।
ননিসর লয়ে সাধাসাধি কবি, ভাবনা বনিযে যায ফিরি ফিবি ।
মোবা অন্য মনে গৃহ কর্ম কবি, পুন ফিরি এসে লুকাযে ।
যত পাবে খায, মর্কটে বিলায, শেষে ভাণ্ড ফেলে ভাঙ্গিযে ।।
দোহন না হতে ছাড়যে বাছুরি বাথানেতে করে গণ্ডগোল ভাবি,
ইচ্ছা হয় ধরি, আমবা নাবী নাবি, বাজাযে বাঁশরী, দাঁডায বাঁকা হযে ।।
সম বযসের বালক সঙ্গ, কভু গৃহ পশি বিবিধ রঙ্গে,
লম্ফ দিয়ে উঠে শয়ন পালঙ্কে, কোন শঙ্কা ভয করে না ।
দুগ্ধ সমুদয, করে অপচয়, বারণ করিলে শুনে না ।।
উচ্চে দুগ্ধ রাখি সিকাব উপরে খুঁজে খুঁজে খুঁজে সন্ধান ক'রে ।
নল শর দিয়ে ভাণ্ড ছিদ্র করে, ফেলে গৃহ পরে, দেয গো ভাসায়ে ।।
আমরা তো ব্রজে আছি এতকাল, ওমা দেখি নাই আব এমত ছাওযাল ।
গোপালের লাগি হলেম নাজেহাল, একি গো জঞ্জাল করো কারে ।।
যুড়ি যুগল পানি, তবু নীলমণি, রমণী বলিয়ে ক্ষমা নাহি করে ।
বাঁকা ভঙ্গিভাবে সব ভুলে যাই, আদরেতে ডাকি রে কাল কানাই ।
কালো বল্লে আব রাগের সীমা নাই, পাড়ে গালি মুখ খুলি সম্পর্ক ছাড়িয়ে ।।

গোপালের দায় ঘর করা দায়, নন্দের প্রমদা রাখ এই দায়।
এত কষ্ট পেয়ে এলাম হেতায়, তোমার নিকটে জানাতে॥
ইহার প্রতিকার কর এইবার ভার দিলাম তব করেতে।
কহে খগমণি, শুন বরঙ্গিনী,
গোলক ত্যেজে ব্রজে এলেন চিন্তামণি,
গোপলীলা খেলা করিতে আপনি,
এ লীলা তাঁহার ব্রহ্মার অগোচর, ব্রহ্ম সম্মোহন গাথাতে লিখয়ে

[১৯] রাগিণী মিশ্রললিত—তাল সওযাবি

ছিছি একি কর্ম্ম তব বাছা ওরে নীলমণি।
চোরা স্বভাব যায়না তোর, ব্রজের মাখন চোর,
ভাণ্ড ভেঙ্গে খাও নবনী।
এই তো গো কচি ছেলে, চড়িয়াছে উদুখলে,
কি আছে আমার কপালে, ও দিদি রোহিণী॥
লয়ে গেল ক্ষীর সর, ধর ধর যুগল কর।
রজ্জুতে বন্ধন কর, পলাবে এখনি॥
যশোমতি ক্রোধ ক'রে, রজ্জু লন বাঁধিবারে,
অকুলান রজ্জু হেবে, ভাবেন নন্দরাণী॥
যক্ষ রক্ষ দেবগণ, যাব মায়াতে বন্ধন,
তাবে কে করে বন্ধন, কহে দীন খগমণি॥

শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা

[২০] রাগিণী ললিতমিশ্র—তাল সওযাবি

নবীন ২ রাখাল মিলে যায় গোচারণে।
সাজায়ে দেন নন্দরাণী, নীলমণি নানা আভরণে॥
চরণে হেম নূপুর, কটিতটে পীতাম্বর,
কম্বুকণ্ঠে লুণ্ঠে হার, অঞ্জন নয়নে॥
কটিতটে পীত ধড়া, মোহন চূড়ায় গুঞ্জ বেড়া,
ঈষৎ বামেতে টেড়া, দুলিছে পবনে॥
সঙ্গে নব লক্ষ ধেনু, করে লয়ে বেত্র বেণু।
রাখালগণ সনে কানু, ধেয়ে যায় বনে॥
জনম সফল আজ, কহে দীন খগরাজ।
হেরিয়ে রাখাল রাজ, যুগল নয়নে॥

[২১] রাগিণী মিশ্রমল্লার সারেঙ্গ—তাল একতালা

যায় কানু, লয়ে ধেনু যমুনার তীরে, রে।
চারিদিকে গোপবৃন্দ ঘেরিয়ে গোবিন্দেরে॥
এক এক ঠাঁই এল ধেনু পাল সঙ্গে রঙ্গে নবীন রাখাল,
হৈ হৈ রবে বাজায় বিশাল, আভীর বালকে রে॥
ধবলী শ্যামলী, কালিন্দী, কপিলা, মাণিকী, মেনকা, সুরভী সুশীলা,
রবি রমা চাঁপা রত্নমালা হাম্বা রবে ডাকে রে॥
(কানাই আয় ভাই বেলা হ'ল রে)
হাম্বা রব করি, তুলিয়ে পুচ্ছ, আগেতে ধাইছে নবীন বৎস,
ব্রজের বালক ক'রে ত্রিকচ্ছ, ধড়া চূড়া বেশ ভূষা রে॥
ধাগিড়ি ধাগিড়ি, বাজিছে ঝাঁঝরী,
থৈ থৈ রবে বাজে তুরি ভেরী,
মোহিত হইল ব্রজের ব্রজ নারী, মুরলীর রবে রে॥
(কানু যায় যায় যায় জাবট পানে চায়)
বলদেবের অঙ্গে দিয়েছেন শ্রীঅঙ্গ, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিতে দাঁড়ায়ে ত্রিভঙ্গ,
খগ কয় হের গোষ্ঠের রঙ্গ, সাঙ্গোপাঙ্গ লয়ে ধীর সমীরে॥

[২২] রাগিণী মিশ্রবাহার (কোনটি সংকীর্ত্তনের অবিকল)—তাল তিওট

গোষ্ঠে যেতে দিব না।
শ্রীদাম রে, বাছাধন, আজ সদা দহিছে মন।
জানি কি কারণ, হারাই ২ হারাই রে কেলে সোণা॥
কৃষ্ণবর্ণ জলধর, ফেরু রব নিরন্তর,
দহিছে মন অন্তর, নীলমণি বনে যাবে না॥
সবে এক নীলরতন, মা বলে আর নাই রে এমন।
সবে মিলে গোধন, আঙ্গিনায় গোষ্ঠ কর না॥
স্বপ্নে দেখলাম গত নিশি, অঞ্চলের ধন কালশশী।
কালিয় হ্রদে প্রবেশি, পুন ফিরি এল না॥
দীন খগপতি কয়, যার সম মৃত্যুঞ্জয়।
সে কি·করে নাগে ভয়, যশোমতি জান না॥

[২৩] রাগিণী মিশ্র ললিত—তাল কাওয়ালী

ওগো কি হলো রোহিণী।
গোচারণে গেছে গোপাল, কি হলো না জানি॥

অবোধ বালক সনে, গেছে গোপাল গোচারণে,
বিপদ হইলে বনে, কে রাখে নীলমণি ॥
বলাই আজ গেল না গোঠে, তাই তো প্রাণ কেঁদে ওঠে,
নীলমণি পড়লে সঙ্কটে, রেখো কাত্যায়নী ॥
দিবানিশি মরি ভেবে, যদি দূর বনে যাবে,
ক্ষুধা পেলে কে খাওয়াবে, ক্ষীর সর নবনী ॥
কহে দীন খগবর, বৃথায় ভাবনা কর,
গোপাল তোমার সর্ব্বেশ্বর, জান না গো রাণী ॥

[২৪] রাগিণী পরজবাহার—তাল কাওয়ালি

ফিরে আয় কানাই ভাই চল রে গৃহে যাই।
তোমা বিনে, হ্রদপানে চায়ে নব লক্ষ গাই।
তুমি রহিলে এ জলে, কি করে যাব গোকুলে, বল রে জীবন কানাই।
যশোমতি জিজ্ঞাসিলে, বুঝাব তাঁরে কি ব'লে,
শ্রীদাম সুদাম, সবাই এলি, ত্রিভঙ্গ শ্যাম সঙ্গে নাই ॥
মোরা করে জলপান, আগে ত্যজে ছিলাম প্রাণ,
তুমি দিলে জীবন দান, বাঁকা ত্রিভঙ্গ।
তুমি রহিলে জীবনে, জীবন রাখি কেমনে দহিছে অঙ্গ।
ওরে কৃষ্ণ, গোষ্ঠেতে আজ, এলেন নাই দাদা বলাই ॥
কে আর ফিরাবে ধেনু, কে আর বাজাবে বেণু,
কে আর যুড়াবে তনু, দিয়ে মিষ্ট ফল।
মুনি রমণীর অন্ন, কে করাইবে ভোজন, বল রে, কৃষ্ণ বল।
না পেলে খিদে, সেধে ২, কে খেতে দিবে সদাই ॥
বনফল হলে মিষ্ট, খেতে ২ দিই উচ্ছিষ্ট,
তাইতে বুঝি রেগে কৃষ্ণ, ডুবিলি হ্রদে।
আমরা রে অবোধ গোয়ালা, না জেনে তোর লীলাখেলা,
পোড়লেম বিষম বিপদে।
কহে খগমণি, দমন হলে ফণি, ফিরে আসিবে কানাই ॥

[২৫] বেনেটি মনোহরসাই—তাল ফেরতা নাম সংকীর্ত্তন

ব্রজের রাখাল জীবন গোপাল আজ পাঠাই কেমনে।
নিশিতে আচম্বিতে গোষ্ঠের কষ্ট দেখি স্বপনে ॥

(ধৈরজ না মানে,) কৃষ্ণবর্ণ জলধর
ফেরুরব ঘোরতর, উল্কাপাত হয় নিরন্তর।
স্বপ্ন সব অসম্ভব, নারি কেশব পাঠাতে বনে ॥
তখন কহিছে মধুমঙ্গল, কেশবের নাই অমঙ্গল গো)
নন্দরাণী নীলমণি সামান্য নয়। (কারে করি ভয় গো)
চতুর্মুখ এক জন, বন্দিল কৃষ্ণের চরণ গো,
সহস্র লোচন যাঁরে সেবে, (তাঁর কি বিপদ হবে গো)।
শুনি রাখালের বাণী, নন্দের গৃহিণী, সঁপিয়ে দিল গোপালে।
নিবিড় কাননে, হিংস্র পশুগণে, যেওনারে ব্রজ রাখালে।
দেখো ২ কথা রেখো, কৃষ্ণে ক্ষুধা পেলে খেতে দিও,
কংশ দণ্ডধারি, কৃষ্ণের বিষম অরি, দেখ যত্নে রেখো নীলকমলে ॥
(আমার অঞ্চলের ধন) রাখাল মিলে কালিন্দীতে ধায়।
গোষ্ঠ পরিশ্রমে,, ভ্রমি বনে বনে ॥
(তৃষ্ণায় কণ্ঠ শুখায়েছে গো, বিধুবদন শুখায়েছে গো)
জীবন পানেতে যায় ॥
কালিয় গরল, মিশ্রিত সে জল, পানেতে পরাণ যায়,
তখন নিকটে না দেখে, ব্রজের বালকে,
(বলে শ্রীদাম সুবল কোথায় গেলি বল)
কৃষ্ণ প্রাণে কষ্ট পায় ॥
শব প্রায় সবারে হেরি, যতনে ক্রোড়েতে করি,
শান্তি বারি দিয়ে বাঁচাইলা। (ত্রিভঙ্গ কালা)
হের হের শিশুগণে, আজি পশিয়ে জীবনে,
ঘুচাইব কালিন্দীর জ্বালা ॥
বংশাবলী নাগগণ শ্রীকৃষ্ণ করি দলন।
কালি শিরে শ্রীপদ রাখিলা ॥ (করি লীলা)
ব্রজের সানন্দ সুনন্দ, হয়ে নিরানন্দ, সন্দেহ করিয়ে ধায়।
আসি কালিন্দীর কূলে, না দেখে গোপালে।
আঁখি জলে ভেসে যায় ॥
তখন না হেরে নীলমণি নন্দের গৃহিণী মণিহারা ফণি প্রায়।
বলে ওরে বলরাম, নবঘন শ্যাম, এনেদে আমায়।
আমার কোথায় সে নীলরতন, দিয়ে নিধি বিধি করিল হরণ।
ও বাপ নয়ন পুতলী, মায়ে রেখে গেলি,

(কত কষ্টে কৃষ্ণ তোরে পেয়েছিলাম রে)
ওরে অন্ধের নয়ন, দুখিনীর ধন,
কালি হ্রদে কালাচাঁদ হলি কি গোপন।
উঠে জীবন হ'তে জীবনধন একবার দে রে দরশন।
ও তোর গুণগান করিতে করিতে যাবে কি জীবন॥
তখন ধুলায় পড়ে নন্দ, বলে বাপ গোবিন্দ,
একি হেরি অকস্মাৎ, হায় একি অসম্ভব,
কোথায় রে কেশব, (ব্রজের সবে শব প্রায় ক'রে গেলি রে,
বাঁকা আঁখি, তোর মনে কি এই ছিল রে, কালাচাঁদ কি বাদ সাধিলি রে)
তোমা বিনে করিব এ দেহ পতন॥
শিঙ্গা করেতে ধরিয়ে ডাকে বলরাম, কি বিষাদে হ্রদে ত্রিভঙ্গ শ্যাম,
হ্রদে বিলম্ব করিলে কানাই, (তোর মনে কি দয়া নাই ভাই)
ব্রজে কারো দেখা পাবি না ভাই।
আমায় একা ফেলে রে নীল রতন
(হ্যাদে রে ভাই ব্রজের জীবন) করবি ব্রজলীলা সম্বরণ।
তখন শিঙ্গা রবে বলাই বলে (জীবন কানাই আয় আয় ভাই)
জল হতে উঠে আয় রে কোলে॥
তখন কালিয় দমন করি, বারিদ বরণ তীরে উতারি।
হেরে শ্রীগোবিন্দে, (আনন্দের আর সীমা নাই রে)
ব্রজবাসী বৃন্দে, পরমানন্দে বলে হরি হরি॥
যশোদা, নন্দের প্রমদা, করেন চুম্বদান শ্যামের চন্দ্রবদনে॥
কালিয় দমন, গোষ্ঠলীলা বর্ণন, দীনহীন খগপতি ভনে।

[২৬] রাগিণী মিশ্রললিত—তাল একতালা

বিনোদ ও সাজে। বিহরৈ ব্রজমাঝে, রে॥
কত বিনোদিনী, হেরে সে নিছনি, ত্যজে কুলশীল লাজে রে।
নখচন্দ্র হেরে গগণচন্দ্র চমকি লুকায় লাজে রে॥ (অমানিশি শশী)
বিনোদ শ্রীপদে বিনোদ নূপুর, দূর হতে শুনি ধ্বনি সুমধুর।
কটীতে কিঙ্কিনী, মণিশ্রেণী জিনি, রুনু রুনু রবে বাজে রে॥
পরিধান তাঁর বিনোদ পীতাম্বর, বিনোদ পীত ধটী কটী আঁটিবার,
বিনোদ কণ্ঠে লুঠে, বিনোদ হার, জড়িত রতন কাজে রে।
(করেতে বলয়, মণি মুক্তাময়, কি সেজেছে রাখাল রাজে রে)॥

বিনোদ বরণ যিনি নবঘন, কোটীচন্দ্র জিনি শোভা চন্দ্রানন।
সর্ব্বাঙ্গে চর্চ্চিত অগুরু চন্দন, নাশায় গজমতি সাজে রে।
(কর্ণেতে কুণ্ডল, করে ঝলমল। আবৃত কুন্তল মাঝে রে) ॥
কিবা বিনোদ ২ মোহন চূড়া, বিনোদ ২ গুঞ্জমালা বেড়া।
বিনোদ ভাবেতে, বামেতে টেড়া, নেহারে চরণ সরোজে রে।
(চূড়া বাঁকা, তায় ময়ূর পাখা। কি সেজেছে বঙ্ক রাজে রে) ॥
বিনোদ অধরে বিনোদ মুরলী, ছত্রিশ রাগিণী ছয় রাগ তুলি,
একুশ মূর্চ্ছনা সপ্ত স্বরে খুলি, রাধা ২ বলি বাজে রে।
(শ্যাম নীরদে, বিজরি শ্রীরাধে, কহে দীন খগরাজে রে ॥

৭] রাগিণী কাললেংড়া—তাল ঠুংরি

লেগেছে নয়নে গো সই কাল বরণে (নবঘন)
অন্তরে অন্তর তারে করি কেমনে ॥
নিদ্রাগত যদি থাকি, স্বপনে শ্যামরূপ দেখি,
চেতনে সখি নিরখি, আঁখির কোণে ॥
ভুলিলে কি ভোলা যায়, দেখি সদা শ্যামকায়,
আর কি সখি করি ভয়, গুরু গঞ্জনে ॥
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠামে, শিরে চূড়া টেড়া বামে।
হৃদয় নিকুঞ্জধামে, রাখি যতনে ॥
মনোহর তাঁর বেশ, সেজেছে কি বেশ বেশ,
পীতধটী কটীদেশ, বংশীবদনে, কহে খগ দীনহীন, হও জীব সচেতন।
ভাব জীব নিশিদিন, ঐ শ্রীচরণে ॥

২৮] পাহাড়ি খাম্বাজ—তাল কাওয়ালি

ঐ, নীপমূলে সই, শিরে চূড়া, বামে টেড়া, ভুবন বিজই।
কি ক্ষণে যমুনায় গেলাম কালরূপ হেরিলাম।
মনপ্রাণ শ্যামে দিলাম, আমি আমার নই ॥
সে ত্রিভঙ্গ রূপ তাঁর, যে হেরেছে একবার।
নয়ন না চায়ে আর, শ্যামরূপ বই ॥
মনে মনে করি সখি, নয়ন মুদিয়ে থাকি।
হৃদি মাঝে শ্যামে দেখি, কত সুখি হই ॥
সে ত্রিভঙ্গ রূপ দেখি, কার না ভোলে গো আঁখি,
সাধে কি মজেছে সখি রাই রসময়ই ॥

কহে দীনহীন খগ, হবে কি এমন ভাগ্য।
কবে লইয়ে বৈরাগ্য, পদ সেবায় রই ॥

[২৯] রাগিণী মিশ্রসিন্ধু—তাল জলদ তেতালা

জলে জলে, প্রাণ জলে, শীতল যমুনাজলে।
হরিবাস, পীতবাস, অপ্রকাশ্য কোথা হলে ॥
অবলা, সরলা বালা, বুঝিতে নারি তব ছলা।
না জেনে ত্রিভঙ্গ কালা, দুকুল রাখিলাম কুলে।
ননি চোর তব গুণ, প্রকাশ্য এ ত্রিভুবন।
গোপনে হরি বসন, লুকালে কদম্ব তলে ॥
ক্ষমাকর হে কেশব, বিবসনা গোপী সব।
যাবে কুলের গৌরব, লোকে জানিলে ॥
নারী করি বিড়ম্বনা, কি সু'খ হবে বলনা।
ঘরে পরেতে গঞ্জনা, কেলেসোণা দিলে দিলে ॥
(ওহে) বারিদ বরণ হরি, গভীর যমুনা বারি,
শীতে হরি, কেঁপে মরি, রমণী কুলে।
রঙ্গ ত্যজ হে ত্রিভঙ্গ ক্রমে উঠিছে তরঙ্গ,
ভয়েতে কম্পিত অঙ্গ, আতঙ্ক হলো অনিলে ॥
ব্রজে হবে অপবাদ, জান নাকি কালাচাঁদ,
বৃথা কেন সাধ বাদ, গোপীকা কুলে।
অপমানে প্রাণে মরি, আমরা, নারী সইতে নারি,
দেহপরি হরি হরি, ডুবে মরিব সলিলে ॥
কহে দীন খগবর, তীরে গোপীকা উতর।
সূর্য্যেরে প্রণতি কর, দ্বি বাহু তুলে ॥
জলকেলি সমাপন, হোলে পাইবে বসন,
হয়োনাকো উচাটন, গোপিনীগণ সকলে ॥

[৩০] রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা

সই, ঐ, নীপমুলে, ত্রিভঙ্গ ধামে বামে হেলে।
অধরে মুরলী, উচ্চ রব তুলি, শ্রীরাধে, জয়রাধে, রাধে রাধে বলে ॥
সপ্ত স্বরে যোগ করি, তিন গ্রাম, একুশ মুর্চ্ছনা অতি অনুপম,
ছয় রাগে বেগে, নব ঘন শ্যাম।
রাগিণী সহিত লয়ে তালে তালে ॥

এ রবে কি রবে বরজিনী সবে।
কেশবের জ্বালা কে সবে কে সবে।
যায় যাক কুল শীল যাবে যাবে।
হেরিব মাধবে, জল ছলা ছলে ॥
কি ক্ষণে সে ধনে, হেরেছি নয়নে।
আর আঁখি সখি, ফিরাতে পারিনে।
হৃদি মাঝে শ্যাম পসিল গোপনে।
অন্তর, বাহির, তিমির নাশিলে ॥
করি অনুরাগ, দীন খগ কয়, কষ্ট নষ্টকারি কৃষ্ণ দয়াময়।
সর্ব্বত্রে তাঁহার আবির্ভাব হয়, ভূতলে কি জলে অনলে অনিলে ॥

[৩১] রাগিণী মিশ্রসুবট—তাল কাওয়ালি

সৈ, হের নব জলধর বরণে।
কটি তটে পীতাম্বর, কিবা শোভাকর,
মনোহর সুরহর বংশী বদনে ॥
চরণ অরুণ কর, নখরেতে নিশাকর,
মনোহর শোভাকর জানু করি কর জিনে।
চূড়া টেরা মনোহর, তাহে বেড়া গুঞ্জহার।
পক্ক বিম্ব ওষ্ঠাধর সুধাক্ষরে বচনে।
শ্রীনন্দের কুমার, পুতনা নিধন কর,
ননিচোর বৃন্দা বিপীনে, নট শঠ নাগর,
ব্রজবধূ মনচোর, স্মরশর নয়ন সন্ধানে ॥
ভনে দীন খগবর, সযতনে ধ্যানে ধর,
শ্যামল সুন্দর ধনে।
যাবে যদি ভব পার, ভাব ভব কর্ণধার,
রে মূঢ় মন তমসার, হৃদি পদ্মাসনে ॥

[৩২] রাগিণী সিন্ধুকাফি—তাল একতালা

শ্যাম নটবরে, নয়নে লেগেছে রে।
কেমনে পাসরি তাঁরে (রে) ॥
তরুণ অরুণ অরুণ চরণ কিরণ, নবঘন বর্ণে হারে।
আম রি বাঁশরি শ্রীকরে ধরে (রে) ॥
ধ্বজ বজ্রাংকুশ, চিহ্ন উনবিংশ, পীতবাস কটী পরে।

পীতধড়া চূড়া, টেড়া, শিরোপরে (রে) ॥
শয়নে স্বপনে, সেরূপ ভুলিনে, মনে প্রাণে ভাবি তাঁরে ।
তাঁহার বিচ্ছেদে, সদা মন কাঁদে, নিরখি সুখী অন্তরে (রে) ॥
অপরূপ রূপ, সে শ্যামল রূপ, রস কুপ ভূপ হেরে।
সখি রে সেরূপ, হইলে বিরূপ বাঁচি কি রূপ ক'রে (রে) ॥
কহে দীন খগ, করি অনুরাগ, শ্যাম বামভাগ হেরে।
যেন নব মেঘে, বিজলী স্ববেগে, নিরদে শ্রীরাধে বিহরে (রে) ॥

[৩৩] রাগিণী দেশ—তাল জৎ

হের হের নব জলধর কায়।
(ঐ সই) ধরাতে ধরে না রূপ নয়নে কি ধরা যায় (যুগল) ॥
জিনি রক্ত কোকনদ, শোভিত তাঁর শ্রীপদ,
পদোপরে দিয়ে পদ, দাঁড়ায়ে কদম তলায় ॥
পাইলে যুগল পদ, ভবেরে ভাবি গোষ্পদ।
তুচ্ছ হয় ব্রহ্মপদ, ও শ্রীপদ যেবা পায় ॥
রম্ভা তরু উরু দুটি, কেশরী জিনিয়ে কটি।
পরিপাটি পীতধটী, আঁটিসাঁটি বাঁধা তায়।
কক্ষেতে পাচনী লাঠি, বক্ষে লেপা গোপীমাটী।
হেরিয়ে সে ভঙ্গি দিঠি, কোটী চন্দ্র লাজে ধায় ॥
দিনকর জিনি কর, নখরেতে নিশাকর।
কণ্ঠে লুণ্ঠে মণিহার, নাশা তিল ফুল প্রায় ॥
পক্ক বিম্ব ওষ্ঠাধর, অধরে মুরলী ধর।
সপ্তস্বরে নিরন্তর, রাধা রাধা গুণ গায় ॥
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠামে, শিরে চূড়া টেড়া বামে,
বিহরই ব্রজধামে, রাধা প্রেমে শ্যাম রায় ॥
খগ অনুরাগ ক্রমে, হৃদয় নিকুঞ্জ ধামে।
রাইকে রাখি শ্যামের বামে, অন্তিমে দেখিতে চায় ॥

[৩৪] রাগিণী সিন্ধু খাম্বাজ—তাল কাওয়ালি

প্রিয়সখি বল দেখি, হলো একি জানিনে।
ক্ষণমাত্রে হেরে নেত্রে, বারিদ বরণে,
মরি লাজে হৃদি মাঝে পসিল কেমনে ॥

অন্তর বাহিরে শ্যাম শ্যামময় ভুবনে,
জাগ্রতে নিদ্রিতে হেরি শ্যামেরে স্বপনে ।।
মনে করি ভুলি ভুলি, শ্যাম নয়ন পুতলি।
তাঁহারে ভুলিতে সখি পারিনে।
হায় হায় ভোলা দায়, মরি হরি অদর্শনে ।।
সখি আর তো রমণী, গেল গো সজনি শ্যাম দরশনে।
কেবা জলে এ গোকুলে, বিরহ আগুণে,
মনোহর রূপে তাঁর, যে হেরেছে একবার নয়নে।
কহে খগ, অনুরাগ, জন্মে মনে মনে ।।

[৩৫]

বাগ মিশ্রমেঘ—তাল মধ্যমান

(সখি) দেখি চল চল।
নবীন শ্যামল ত্রিভঙ্গ, শ্রীঅঙ্গ নিরমল,
সপ্তস্বরে অদূরে বংশীনাদ হলো হলো ।।
শুনি সে বাঁশীর গান, যমুনা বহে উজান।
গোপিনী রমণীর প্রাণ, এ রবে কি রবে লো।
গুরুজনা গঞ্জনা দেয়, তায় ক্ষতি কি বলো বলো,
বাঁশীর হইব দাসী, নাশিয়ে কুল শীল ॥
পুর্ণমাসী, পূর্ণশশী, গগনে উদয় লো,
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে চন্দ্রমুখী, নিরখি চল চল ।।
অন্যমনা ব্রজাঙ্গনা, হবে না বল বল।
নিকুঞ্জ বিহারীরূপে করেছে কুঞ্জ আলো ॥
প্রফুল্ল ফু ' বন, গহন কানন লো,
শোভাকর শশধর, বিস্তারে কিরণ লো।
শরদে শ্রীরাধে, কালাচাঁদে হইবে মিলন লো।
বঙ্কিম শ্যাম ঠাম হেরে, হবে জনম, সফল লো ॥
শারী শুক, পিক চাতক, করিছে কলরব লো,
অভিসারে, গুণ গুণ স্বরে, গায় অলিকুল লো।
শ্রীরাস রস খগদাস, বর্ণে কি সাধ্য বল বল,
কোটী সূর্য্য তেজ আজ হেরিবে নয়ন যুগল ॥

[৩৬] রাগিণী মিশ্রখাম্বাজ—তাল লক্ষ্ণৌআড়া

নব জলধর নবীন কিশোর।
নবনারী কুঞ্জ'পর বিহর (হের)॥
নবীন অরুণ চরণ কিরণ, ঊনবিংশ চিহ্ন শোভে তনুপর॥
নব কল্পতরু, রাম রম্ভা উরু।
কেশরীর গুরু, কটি শোভাকর॥
আজানু লম্বিত কর, নখে শশধর।
বলয়ে প্রস্তর, কিবা শোভাকর॥
পীতাম্বর, পরিধান কব,
কণ্ঠে লুণ্ঠে হার, নাসা অগ্রে বেশব॥
তুলি সপ্তস্বব, কিবা বেণুস্বব।
চূড়া শিরোপর বেড়া গুঞ্জহাব॥
করি যোড় কব, কহে খগবব।
সদাধ্যানে ধব নবনারী কুঞ্জর (বংশীধর)॥

[৩৭] বাগিণী ইমন ঝিঁঝিট—তাল কাওয়ালি

ভব পার কর্ণধার, তুমি ত আপনি।
যমুনায় কাণ্ডারী, হরি, লইযে ক্ষেপণী॥
এ যমুনা ক্ষুদ্র নদী, পার কর ভব জলধি।
তুমি অনাদির আদি, পুরাণেতে শুনি॥
অবলা গোপের নারী, তাহে হরি জীর্ণতবী।
তরঙ্গের আতঙ্কে মরি, বক্ষ চক্রপানি (এ দায়ে)॥
প'ড়ে এই ভব নীরে, যে ডাকে প্রভু তোমারে।
ভব পাবে দাও তাঁরে চরণ তরণী (যুগল)॥
যমুনার দেখে তরঙ্গ, কাঁপিছে গোপিনী অঙ্গ।
কৃপা কর হে ত্রিভঙ্গ, কহে খগমণি॥

[৩৮] বাগিণী মিশ্রদেশ—তাল জৎ

তুমি বটে, এ ঘাটে, নবদানি। (এ দানি)
কাণ্ডারী সহেনা দেরি, পারে লহ তরণী॥
ক্ষীর সর ছানা দধি, গব্য রস, নানা বিধি,
বিকিকিনি, জন্মাবধি, এ মথুরা নগরে।

আসি যাই শতবার, ওহে নব কর্ণধার,
কখন দেখি নাই ঘাটে তোমারে।
পূর্ব্বদানি যেই জন, সে চিনিত বিলক্ষণ,
স্বল্প লইত পারের পণ, দেখে ব্রজ রমণী।
দাঁড়ায়েছ হয়ে বাঁকা, দূরেতে রাখিয়া নৌকা,
এ ঘাটেতে তুমি একা, অন্য কর্ণধার নাই।
মাঝির গরব দেখে, মরে যাই মনো দুঃখে।
আই আই কি বালাই, (ওহে) ছাড ছাড ভঙ্গি ছলা,
গব্য রস আছে মেলা, বয়ে যায় হাটের বেলা, প্রখর দিনমণি।
অন্য তরী থাকলে তটে, কে এসে তব নিকটে,
কথায় কথায় উঠ চটে, হাতে করিয়ে বোটে ॥
খাটনা তুমি বেগার, কড়ি দিযে হয়ে পার, থাকব কি করপুটে।
বেগে বেগে বলে বডাই, চল গৃহে ফিরে যাই, শ্রীরাধা বিনোদিনী ॥
কহে দীন খগবর, কৃপা কবি নটবর,
গোপীকারে পার কর, বয়ে যায় হাটের বেলা।
গব্যরস হবে নষ্ট, সকলে পাইবে কষ্ট, গৃহে রুষ্ট হবে স্পষ্ট গোয়ালা।
এ যমুনা করিতে পার, ভাব কি নন্দকুমার,
ভবার্ণব কর্ণধার, বেদে পুরাণে শুনি ॥

[৩৯] রাগিণী মিশ্রখাম্বাজ—তাল পোস্তা কিম্বা একতালা

তরী তীরে আন ধীরে অগাধ নীরে আর যেওনা।
কাণ্ডারী দেরী করো না ॥
ছিদ্র ভারী জীর্ণ তরী, বারি নিবারি চল না ॥
প্রবল বহে ঝটিকা, টল টল করে নৌকা, ভেবে বাঁচেনা গোপিকা।
হোলো প্রাণ রাখা ভার, এই ভাবনা ॥
ঘন ঘটা ত্রিভুবন, মাঝে গরজে গগন,
ঝম ঝম বরিষণ, বৃষ্টিতে দৃষ্টি চলে না ॥ (শ্রীলা)
হে দে হে নব নাবিক, ত্বরা তীরে তরী রাখ,
তোমার যে বিবেক, হাল ধরায হাল গেছে জানা ॥
চিরকাল নায়ে চেপেছি, এ যমুনায় পার হযেছি,
আজকের দিনটে বাঁচলে বাঁচি,
আনাড়ি দাঁড়ি হব না ॥ (মাঝী বলে)

কহে দীন খগবরে, শ্রীনাথ ক্ষেপণী ধ'রে,
তরাণ ভব পারাপারে, কোথালাগে এ যমুনা ॥ (ইহার আগে)

[৪০] রাগিণী মিশ্র ঝিঁঝিট—তাল কাওযালি

এই ফল শেষে হলো, হের হে ত্রিভঙ্গ কেলে।
শ্যাম কলঙ্কিনী নাম, সকলে বলে গোকুলে ॥
আমরা কুল মহিষী, কুলশীল নিল বাঁশী।
নিশিতে কাননে পশি, সুতান কানে শুনিলে ॥
ঘরে পাপ ননদিনী, বলে কাল' কলঙ্কিনী।
ঘৃণায় মরি গুণমণি তব গুণে যাই হে ভুলে ॥
দাসীরে সাধিলে বাদ, কি হবে হে কালাচাঁদ।
ঘুচাও রাধার অপবাদ, কোনছলে কৌশলে ॥
কহে দীন খগমণি, মনে চিন্তি চিন্তামণি।
কলঙ্ক ঘুচাও চক্রপাণি, ব্রজ রমণীর কুলে ॥

[৪১] রাগিণী শঙ্করা—তাল একতালা

গোষ্ঠে কষ্ট পাইয়ে কৃষ্ণ, পড়ে আছে ধরাসনে।
শ্রীমুখ দেখে, মনো দুঃখে, ধৈর্য্য ধরিতে পারিনে ॥
দেখ সে, দিদি রোহিণী, নীলমণি আজ কয় না বাণী।
খেতে চায় না ক্ষীর নবনী, শীর্ণকায় হলো শ্রীহীনে ॥
আঁখি করে ছল ছল, দেহে বাছার নাহি বল,
ধারা শ্রাবণের জল, বহিতেছে দ্বি নয়নে ॥
হায়, আমার কপাল মন্দ, বাথানে গিয়েছে নন্দ।
আন ডেকে উপানন্দ, স'ন্দ ঘুচাও তাপিত মনে ॥
ঘোর বনে করিত ক্রীড়া, কখন দেখি নাই পীড়া,
আজকে ফেলো ধরা চুড়া, পাশ মোড়া আর দেয় না কেনে ॥
কহে দীন খগপতি, ভেবোনা গো যশোমতি।
শ্রীমতিরে আজ শ্রীপতি, করিবেন কলঙ্ক হীনে ॥

[৪২] রাগিণী মিশ্রবাগেশ্রী—তাল টিমেতেতালা

নবীন নবঘন বর্ণ, ভিষজ রাজ সুজন।
নন্দালয়েতে আসিয়ে, দিলেন দরশন ॥

নন্দ ধরি বৈদ্য কর, করি বহু সমাদর,
লইয়ে যশোদা গোচর, মধুস্বরে কন।
নীলমণির ভাগ্য বলে, বিধি বৈদ্য মিলাইলে,
আরোগ্য কর গোপালে, পাবে বহু ধন ॥
শয্যাগত নীলমণি, শুনি যত বরঙ্গিনী।
ধাইয়ে আসিয়ে অমনি, করে দরশন।
(দেখে) বৈদ্যের রূপ কৃষ্ণের মূর্ত্তি, উভয়েতে একাকৃতি।
নন্দাদি ব্রজ যুবতী, ভেবে ভাবে হয় মগন ॥
বৈদ্য কয় বিষম রোগ, জন্মাবধি হবে ভোগ।
দেখ করি মুষ্টিযোগ, করিব নিবারণ।
যদি মেলে সতী নারী, লয়ে এসো ত্বরা করি।
ছিদ্রে কুম্ভের পেলে করি, পীড়া হবে বিমোচন ॥
খগ কহে কুতুহলে, সতী জটিলে কুটিলে।
আছে এ ব্রজ মণ্ডলে, জানে সর্ব্বজন।
কাজ কি আর বহ্বারম্ভে, যান্‌। করুন অবিলম্বে,
বারি আনুন ছিদ্র কুম্ভে, ফলে পরিচয় জান ॥

[৪৩] বাগ মিশ্র নটনারায়ণ—তাল ঝাঁপতাল

মান রাখ কমলাক্ষ হরি।
ছিদ্র কলসী লয়ে দাসী, যমুনায় ধেয়ে যায়, আনিবারে পুরি বারি ॥
তোমারে দেখে মূর্চ্ছিত, হইয়াছি জ্ঞান হত।
মান রাখ গোপীকানাথ, তোমা বিনে এ দুর্দ্দিনে, কেমনে তরি মুরারী ॥
ত্যজে ল শীল ভয়; লয়েছি তব আশ্রয়,
তুমি দাও হে অভয়, নিরাশ্রয়েরি আশ্রয়, ভব ভয় মোচন কারী ॥
ছিদ্র কুম্ভে আনা বারি, সামান্য হে বংশীধারী,
বাম করে ধরে গিরি, ইন্দ্র দর্প চূর্ণ করি, রাখিলে হে ব্রজপুরী ॥
কহে দীন খগপতি, ব্রজে ব্রজেশ্বরী সতী, কলঙ্কিনী নন শ্রীমতী।
কবিরাজে ব্রজমাঝে দিলেন ঘোষণা করি ॥

[৪৪] বাগিণী সিন্ধু—তাল জৎ

প্রত্যক্ষ দেখ স্বচক্ষে, কুঞ্জ কাননে পশি,
তব নারী, রাই কিশোরী, শ্যামের বামেতে বসি ॥

করিতে সদা তাচ্ছল্য শ্রীকৃষ্ণ কুৎসিত কাল।
কিসে রাধা বাসবে ভাল, তব প্রিয় মহিষী॥
বলিলে বিরক্ত হতে, আজ ধরেছি হাতে হাতে,
দেখ গিযে স্বচক্ষেতে, আমায় করোনা দোষী॥
ওগো দাদা একি নেঠা, বৌয়ের এমন বুকের পাটা
অকলঙ্ক কুলে খোঁটা, রাখলে ঐ সর্ব্বনাশী॥
এ সংসারে নাইকো টান, বাঁশীব দিকে থাকে কাণ,
খগ কহে শ্রীরাধার প্রাণ, বাঁশী করে উদাসী॥

[৪৫] রাগিণী মিশ্রমঙ্গল—তাল কাওয়ালি

মরি কি বালাই, চল বনে যাই।
দেখা, দেখা শ্রীরাধিকা, কোথা বাঁকা কানাই॥
এই দণ্ডে এই দণ্ডে, করিব মুণ্ড নিপাত,
আযান আইন মতে দণ্ড বিধিতে তফাৎ,
কুকর্ম্মী বিধর্ম্মী জনে, এড়াতে কে পাবে হাত,
মম নারী হরি হরি, করিতেছে আত্মসাৎ,
দেখ দেখ মান রাখ, অনাথের নাথ বিশ্বনাথ,
হয়ে আত্মঘাতী, বিশ্বপতি, অখ্যাতি হ'তে এড়াই॥
মহামান্যা রাজকন্যা বৃকভানু নন্দিনী।
রমণীর শিরোমণি, আমার সে গৃহিণী,
প্রাণাধিকে শ্রীরাধিকে, সে হলে কলঙ্কিনী,
মম দেহে কেন রহে, আছ পাপ পরাণি।
জীবনে জীবন দিব, ত্যেজিব এ অবনী।
হলো গোকুল চিকণ কাল, আমাব কুল বালাই।'
লম্পট কপট শঠ, সে নট চিকণ কালা,
অখলা অবলা বালায়, সতত দেয় জ্বালা।
কভু উঠে বংশী বটে, কভু কদম্ব তলা,
স্বরে নাদে খাদে সাধে, রাধা রাধা দুবেলা।
বংশীতানে গুণগানে মদনে হয় বিভোলা,
এ রবে কে ববে সবে হয় চঞ্চলা।
কালরূপে, রস কূপে ডুবেছে গোপী সবাই॥

কাল ভাল বাসে বল কিসেতে ব্রজাঙ্গনা,
কয়লা হতে অধিক ময়লা যশোদার কেলেসোণা,
বদন মেলে যখন কেলে বোধ হয় কোকিল ছানা,
বাঁকা নয়ন মদন মোহন ঠিক যেন সূর্য্য কাণা,
তিন ঠাঁই বাঁকা, ধড়া ঢাকা, কচি খোকার ভাবখানা,
হাঁড়ি চাঁচার মতন বাছা হাতে পায়ে গহনা,
বাঁশের বেণু বাজায় কানু হনু বার করে সদাই ॥
শ্রীরাধারে অগ্রে বেঁধে, পরে কৃষ্ণে বাঁধিব,
মম সাধে, বাদ সেধে, দেশান্তরী করিব,
যশোদা নন্দের প্রমদা সুধালে না বলিব,
কৃষ্ণ নাম ব্রজ ধাম হতে আজি উঠাব।
বংশীরব নীরব হয়, এই যুক্তি করিব,
কহে খগবরে, যে ভব বন্ধন হরে।
বাঁধে তাঁরে কে রে ভাই ॥

[৪৬] রাগিণী মিশ্রমঙ্গল—তাল কাওয়ালি

যায় যায় প্রাণ, হে বংশী বয়ান।
দেখ ফিরে যষ্টি করে অদূরে এসে আয়ান ॥
মদগর্ব্বী অসভ্য গোয়ালা অতি গোঁয়ার,
একাসনে দুজনে হে দেখিলে নন্দকুমার।
নিশ্চয় নিধন বিধি লিখেছে তোমার আমার,
সহচরী আদি করি সকলে হবে সংহার
ত্বরা করি বংশীধারী কর ইহার প্রতিকার।
নিকটে বিকট কাল বিলম্ব সহেনা আর,
মরুক রাই, ক্ষতি নাই তুমি হও সাবধান ॥
আমরা নারী বুঝতে নারি, শুনেছি হে মুরারি,
বাম করেতে গিরি ধরি রেখেছ ব্রজপুরী,
কালীয় দমন গুণ বিখ্যাত জগৎ ভরি।
স্তনপানে পুতনে পাঠালে যমপুরী ॥
চতর্ম্মুখ হ'ল মুক গোধনগণ হরি,
কংশ শিষ্য বৎস মেঘ সংহারকারী হরি,
সম্প্রতি শ্রীপতি, শ্রীমতী রে কর ত্রাণ ॥

বউ কাটকী দুর্ম্মুখী পাতকী ননদিনী।
তিলে দোষ পেলে তারে তাল করি বাখানি,
ছিদ্র খুঁজে ব্রজমাঝে সর্ব্ব কাজে পাপিনী।
বরের মাসী কনের পিসী মাগী সর্ব্বনাশিনী।
বড যক ধনে সক, করে সরে না পানী।
নিকষা প্রায রুক্ষ ভাষা কর্কশবাদিনী।
তেকে তেকে জেগে থাকে শুনবে ব'লে বাঁশীব গান॥
আমি থাকি যেই ঘরে বাহিরে দেয অর্গল।
আতঙ্কে শুয়ে পালঙ্কে আঁখি করে ছল ছল।
নয়নে হেবিলে জল, বলে কবিস কত ছল।
গৃহ কর্ম্ম দেয সকল, খেতে দেযনা অন্নজল,
অঙ্গে নাহি পাই বল, তবু বলে চল চল।
কে আব বেচিবে বল, দধি ক্ষীবাদি সকল,
হে কৃষ্ণ কর শীতল, এ গৃহ সব অমঙ্গল।
খগ কয দযাময়, শ্রীরাধাব রাখ মান॥

[৪৭] বাগিণী ইমন—তাল কাওয়ালি

বারে তুমি ভেবোনা, কমলিনী, তোমার কারণে, নিকুঞ্জ কাননে,
এখনি হইব আমি হব মন মোহিনী॥
শ্যামরূপ ত্যজি, হইব শ্যামা, মুক্তকেশী হর মনোবমা,
ত্যজিয়ে বাঁশী, করে লব অসি, কাট তটে কিঙ্কিনী করিব কর শ্রেণী॥
শ্যাম অঙ্গে সর্ব্বাঙ্গে মাখিব গো রুধির,
পদ ভরে ধবাধর হইবে গো অধীর।
নর শিবঃ করে, অন্য করে অভয বর,
চণ্ড মুণ্ড ঘাতিনী, হব নৃমুণ্ড মালিনী॥
পীতাম্বর পবিহরি পরিব দিক্‌বসন,
এসব আসন ত্যজে করিব শবাসন।
বনমালা রাজ বালা, হইবে মুণ্ড মালা,
বেণীমুক্ত রধিরাক্ত ভক্ত মুক্ত কাবিণী॥
কর্ণ মূল, কুণ্ডল, শব শিশু করিব,
শ্যাম নাম ত্যজিযে শ্যামা মূর্ত্তি হইব।
লোল রসনা বিকট দশনা তিমির বরণা ত্রিনয়না
হব ত্রিতাপ হারিণী॥

বিনোদিনী তব সঙ্গের সঙ্গিনী গোপিনী,
পরম রঙ্গে মম সঙ্গে, হবে ডাকিনী যোগিনী।
অসংখ্য আমাব মায়া, নাম মম মহামায়া,
কহে খগাধম, তুমি হে পুরুষোত্তম,
অচিন্ত্য কৃপায় নম, চিন্ময়ী চিন্ময় চিত্তহারিণী ॥

[৪৮] রাগিণী বিভাস—তাল কাওয়ালি

কৈ বনমালী, এ যে কালী, (বনে)।
রাধে সাধে, শ্যামাপদে দিযে পুষ্পাঞ্জলি ॥
তরুণ অরুণ যেন, শ্রীপদ শোভাকর,
চবণ সরোজে সাজে মণিময় নূপুর।
অনুমানি ত্রিনয়নীর পদতলে শঙ্কব, শ্রীঅঙ্গ দিছে ঢালি।
ক্ষীণ কটি তাতে আঁটি, নর কর কিঙ্কিনী,
শবাসনা, বিবসনা, নবঘন বরণী।
চতুর্ভুজ দনুজ নির্ম্মূল কারিণী, শিববাণী নৃমুণ্ডমালী ॥
করে অসি মুক্তকেশী, অট্ট হাসি বদনে,
মনোলোভা কিবা শোভা, জিহ্বা চাপি দশনে,
আসব পানেতে মত্ত দৈত্য রক্ত মর্দ্দনে, বিশ্ব পালী বিশালী
সাধ্বী সতী শ্রীমতী পদ সেবা করে,
জনম সফল হ'ল শ্যামা মায়েরে হেরে,
কুটিলা ত্যজিয়া ছল, পুজ শ্যামামায়েরে,
অগতি খগপতিব গতি গো কবালী ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ঝুলন যাত্রা

[৪৯] রাগিণী ভক্তাবলি কানেড়া—তাল তেতালা

কুঞ্জ কানন। (কিবা শোভা)
শ্রাবণ ঘন ঘন গরজে নবঘন, বহিছে মন্দ পবন ॥
নব পল্লব সব কুঞ্জেতে মণ্ডিত, তরুতলা তদুপরেকে বেষ্টিত,
হেরিলে হয় মুনি মন মোহিত প্রফুল্লিত ফুল বন ॥
মধু লোভে অলিকুল আকুল, ধাইছে কুঞ্জ কাননে,
পুষ্পোদ্যানে, তাহে শারি শুক, কাক পিক, সবে প্রফুল্ল মনে।
শ্রীহরি গুণ গাইছে বদনে, আনন্দে নাচিছে যতনে,
কিশোর কিশোরী, উভয়েরে ঘেরি, হিন্দোলা, লীলা।

করিছে বনে, আনন্দ মনে, তাহে রাই শ্যাম,
অনুপম পুরাইছে মনস্কাম, সখী বৃন্দেতে ঘেরি প্যারী।
বনফুল তুলি যতনেতে গাঁথি হার।
ভক্তি ভাবে দুতী দেন গলে দোঁহার॥
মরি কি শোভা কর, বর্ণয়ে খগবর, ঝুলিছে মনমোহন॥

[৫০] রাগিণী মিশ্রখাম্বাজ—তাল একতালা

নবীন নবীনে ব'সে একাসনে, হিন্দোলা খেলিছে বিপিনে।
ঘন ঘন ঘন, গরজে গগন, নব ঘনেরি দরশনে॥
আহা মরি মরি কিবা কুঞ্জ শোভা, সুর নরগণ জন মনোলোভা।
যুগল রূপে যেন কোটী চন্দ্র প্রভা, অতুল্য অমূল্য ভুবনে॥
নব নব বন, নব তরুগণ, নব শোভা বৃন্দাবনে।
নব নব সখী, নবভাব দেখি, সেবা করে নব নবীনে॥
নব নব বালা, গাঁথি নব মালা, নব ভাবে সাজায় নবীন হিন্দোলা
নব চাঁদে ঘেরি নব গোপবালা, গায নবরঙ্গ তানে॥
নব নব পিক, ডাহুকী ডাহুক, নব নব শিখিগণে।
নব মেঘে হেরি, নাচে পুচ্ছ ধরি, ঘুরি ফিরি নব বনে॥
নব নব অলি, নব নব কলি, নব মকরন্দ পিয়ে বুলি বুলি,
নত শিরঃ করি, খগ কৃতাঞ্জলি, নবরূপ ভাবে ধ্যানে॥

[৫১] রাগিণী স'হানা—তাল একতালা

ঝুলিছে ঝুলনে। (একাসনে)
অনুপম রাধাশ্যাম, নিকুঞ্জ কাননে॥
শ্রাবণ ঘন ঘন, গরজিছে নব ঘন।
তৃষিত চাতকীগণ, তৃপ্ত বারি পানে॥
ফুল্ল ফুল নানাজাতি, নাগেশ্বর জাতী যুথী,
টগর চম্পক সেঁওতী, পুষ্পিত উদ্যানে।
নব নব গোপবালা, গাঁথি নব ফুলমালা।
সাজায়ে নব হিন্দোলা, দোলায যতনে॥
রাধা অঙ্গে দিয়ে অঙ্গ, ঝুলিছে বাঁকা ত্রিভঙ্গ।
শীতল হয় তাপিত অঙ্গ, হেরিলে নয়নে॥
দীন খগের অভিলাষ, রাই সহ পীতবাস।
করেন হিন্দোলা প্রকাশ হৃদি বৃন্দাবনে॥

[৫১] রাগিণী মিশ্র খাম্বাজ—তাল একতালা

শ্যাম নীরদে, বিজলী শ্রীরাধে, মনলোভা শোভা হয়েছে।
(ঐ ঐ সই) নিকুঞ্জ কাননে, রত্ন সিংহাসনে, কিশোর কিশোরী, ঝুলিছে॥
তরুণ অরুণ যুগল চরণ মণি কি নূপুরে সেজেছে;
রুণু রুণু রুণু, ঝুনু ঝুনু ঝুনু, ঠমকে গমকে বাজিছে॥
রাধে নীল শাটি, শ্যাম পীত ধটি, শাটি ধাঁটি কটি বেঁধেছে;
কণ্ঠে লুণ্ঠে হার, নাশায় বেশর, পবন হিল্লোলে দুলিছে॥
ভুবন উজ্জলা, বরজেরি বালা, নবঘন কালায় ঘেরেছে,
বেগে, সোহাগে, মেঘ রাগে, সুস্বরে মল্লারে গাইছে॥
কহে খগপতি, শ্রীমতি শ্রীপতি নব লীলা দোলা রচেছে,
সুর লয় তালে মুরলীর গানে, সুর নর মন মোহিছে॥

[৫৩] রাগিণী মিশ্র সিন্ধু—তাল ধিমা তেতালা

নিকুঞ্জ কাননে। একাসনে, রাধা শ্যাম অনুপম, ঝুলিছে ঝুলনে
নানাবর্ণ ফুলমালা, গাঁথি নব নব বালা।
সাজায় নব হিন্দোলা, অতীব যতনে॥
ডাকে ডাহুক ডাহুকী, চক্রবাক চক্রবাকী।
যুগল রূপ নিরখি, নাচে শিখিগণে॥
হেরে যুগল চরণ, পদ্ম ভ্রমে অলিগণ।
গুণ গুণ রবে অনুক্ষণ, বৈসে শ্রীচরণে॥
দীন খগের মনন, শ্রীরাধা রমণ।
সদা করি দরশন, হৃদি পদ্মাসনে॥

[৫৪] রাগিণী বেহাগ—তাল কাওয়ালী

অপরূপ রূপ যুগল মাধুরী।
কিবা শোভা, মনোলোভা, আমরি॥
নিকুঞ্জ কাননে রত্ন সিংহাসনে,
শ্যামসনে ঝুলনে, ঝুলিছে রাই কিশোরী॥
কিবা রূপ অনুপম, লালিত ত্রিভঙ্গ ঠাম।
রূপ জিনি কোটি কাম, বামে কিশোরী,
শ্যাম নীরদে রাধে খেরি যেন বিজরী॥

নীরদ গর্জ্জন জিনি কানুর বেণুর ধ্বনি।
ব্রজ গোপী চাতকিনী তৃষিত বারি,
জলধর কলেবর নিরখে আঁখি ভরি॥
জিনিয়ে ধারা শ্রাবণ, শ্যাম প্রেম জীবন করিতেছে বরিষণ,
প্রফুল্লিত ফুলবন অলিগণ নেহারি;
গোবিন্দ পদারবিন্দ মকরন্দ আশা করি॥
কাক পিক বক ডাহুক ডাহুকী,
চক্রবাক চক্রবাকী পাখি সুখী।
শ্যামল রূপ নিরখি, শুকশারী,
উচ্চ পুচ্ছ করি শিখি নাচে ঘুরি ফিরি॥
নন্দ দুলালা চিকণ কালা, বৃক ভানু বালা,
তড়িত উজলা, হিন্দোলাব লীলা বনে প্রচারি,
খগেন্দ্র ভনিত চিত মোহিত রূপ হেরি॥

[৫৫] রাগিণী বেনেটি, কীর্ত্তনের সুরে—তাল ছুটো কিম্বা একতালা

হের হের কুঞ্জ বনে।
ঐ শ্যাম সনে রাই ঝুলিছে ঝুলনে॥
আহা মরি মরি, যুগল রূপের কি মাধুরী।
নব তমালে জড়িতা স্বর্ণলতা, রাইকিশোরী, ওরূপ অতুল্য,
অমূল্য ভুবনে
রক্ত উৎপল, জিনি পদতল, পদনখে চন্দ্র করে ঝল মল।
শতদল ভ্রমে যত অলিকুল, মধুলোভে বৈসে চরণে।
(যুগল পাদ পদ্মে কত সুধা আছে রে)
শ্যাম শ্রীপদে কনক নূপুর, রুণু ২ রবে বাজিছে মধুর।
শ্রীরাধার পদে গুঞ্জরী ঘুঙ্গুর, বাজিছে চরণ চালনে॥
(নূপুর ধন্য ২ মহী মাঝে, তাই রাই শ্যামের পদে বাজে রে)
কটিতে কিঙ্কিনী, মণি শ্রেণী জিনি।
আহা মরি মরি কিবা সুগাঁথনি।
কিঙ্কিনীর ধ্বনি মন নিল কিনি এমন নিছনি, নাহি আনে।
(তার কিবা শোভা, মুনির মনলোভা।)
তদুপরি হরি পীতাম্বর, শ্রীরাধা অম্বর নীলাম্বর,
যুগল বাহুতে বহু অলঙ্কার, কণ্ঠে লুণ্ঠে হার, যতনে॥

(মালা না দোলাতে আপনি দোলে চরণ পানে চেয়ে দোলে)
নাসায় বেশর মুকুতার দামে, আস্য হাস্য কিবা হেরি রাই শ্যামে,
হিন্দোলায়, শ্রীরাধায়, বসাইয়ে বামে,
হেরিছেন বঙ্কিম নয়নে।
(শ্যামের আর কি আঁখির পলক পড়ে)
কর্ণেতে কুণ্ডল, করে ঝল মল,
যুগল রূপে হল ব্রজধাম আলো।
রাই শিরে বেণী, যেন কাল ফণি,
শ্যামের শিরে চূড়া টেড়া, বংশী বদনে ॥
(বাঁশী শুনে, যমুনে, ধায় গুজনে, সুর নরগণ মোহিত তানে)
নব গোপবালা, গাঁথি নব মালা।
নব সাজে সাজায়ে, নবীন হিন্দোলা,
নব চাঁদে ঘেরি নব গোপবালা দোলায় নবীন নবীনে।
(রাধা শ্যামে ঘেরি, নব গোপ নারী, নাচে ঘুরি ফিরি)
খগের অনুরাগ নব লীলা হেরি,
(যেন) নব মেঘে মেলে নবীন বিজরী।
নব নটবর, নবীন কিশোরী।
নিতি নিতি হেরি হৃদি পদ্মাসনে ॥
(শয়নে, স্বপনে, ধ্যানে, মননে)

[৫৮] মনোহর সাই—তাল একতালা

নবীন নবীনে, নব কুঞ্জ বনে, নব লীলা করে বিপিনে।
নব নব বালা, নবীন হিন্দোলা, নব ফুলে সাজায় যতনে।
নবীন নী দে, বামে নব রাধে, মন সাধে ঝুলায় ঝুলনে।
নব ২ বন, নবীন গহন, নব শাখা দোলে পবনে।
নব নব পিক, সরোবরে বক, ডাহুক ডাহুকী গগনে।
নব নব শারী, ময়ুর ময়ূরী, নাচে পুচ্ছ ধরি, স্বগণে ॥
ঝুরি কাকাতুয়া মনিয়া পাপিয়া, মোহিত করিছে সুতানে।
নবীন আহিরী, করে করে ধরি, নাচে ঘুরি ফিরি কাননে।
নব অলঙ্কার, নব ফুব হার, নবাঙ্গ চর্চ্চিত চন্দনে ॥
শ্রীপদ পঙ্কজ, হেরি অলিরাজ, মধু ভ্রমে বসে চরণে।
পেলে পদ সুধা, দূরে যাবে ক্ষুধা, তরিবে সে ভব বন্ধনে।
সদা বাঞ্ছা করি, যুগল রূপ হেরি, শয়নে স্বপনে মননে ॥

হরি নাম বিনা, গোপিকা রসনা, অন্য নাম না শুনে শ্রবণে।
সদা এ দ্বিকর, কিশোরী কিশোর, থাক রে যুগল সেবনে।
দীন খগপতি, করয়ে প্রণতি, শ্রীমতী শ্রীপতি চরণে॥

[৫৭] রাগিণী মিশ্রখাম্বাজ—তাল ক্যাসমেরি খেমটা

যুগল রূপের কি মধুরী।
(ঐ) হিন্দোলাতে, নন্দলালা, বামে লয়ে রাই কিশোরী।
প্রফুল্লিত ফুল বন, লতা বেষ্টিত কানন,
মিলি সব সখীগণ, মদন মোহনে ঘেরি॥
গাঁথি নব নব মালা, সাজায়ে নব হিন্দোলা।
বসাইয়ে শ্রীনন্দলালা, দেয় দোলা কর বিস্তারি॥
আহিরী করিয়ে রঙ্গ, নাচিছে ঘেরি ত্রিভঙ্গ।
বাজায় ডম্ফ মৃদঙ্গ, মোচঙ্গ বীণা বাঁশরী॥
কহে দীনহীন খগ, হবে কি এমন ভাগ্য।
কবে লইয়ে বৈরাগ্য, অনুরাগে বলবো হরি॥

ব্রজ ভাষায় সঙ্গীত

[৫৮] রাগিণী গৌড়মল্লার—তাল কাওয়ালি

ঝুলে ২ ঝুলন পর, শ্যামল সুন্দর, যুগল কিশোর কিশোরী।
হো (ঝুলে ২ ঝুলনি ঝুলে)
বহেত পবন ঘন, গরজেত নব ঘন, চমকে বিজরি, বেরি ২।
বোলে মওরা মরি, সুরী শুকশারী, মনিয়া পাপিয়া, ঝঙ্কারি॥
হো লিয়ে বহু ফুল হার, কৈ করত সিংহার।
কৈ নাচে, সখি বিচে, দিয়ে তরতারি।
কৈ ২ হরদম, আলাপে রাগ লয় সম, বরখত ঝম ২ বারি॥
হো কৈ লিয়ে তম্বুরা, কৈ সখি লিয়ে দারা,
বাজাওয়ে সপ্তসুরা, গাওয়ত গৌরি।
কৈ লাগাওয়ে কেদার, সোহিনী সুর বাহার,
কৈ খেলে, কৈ ঝুলে, ঘেরি রাধে প্যারি॥ হো
ঘেরি বাঁকে ত্রিভঙ্গ, করতহি ঢং রং।
কৈ বাজায় মৃদং, তেহাই বিস্তারি।
পক্ষি ধায়ে মন হর, শ্রীরাধে শ্রীদামোদর।
রে মন কর স্মরণ চরণ দোঁহারি॥ হো

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ফল্গুৎসব।

[৫৯] রাগিণী কেদার—তাল ঢিমা তেতালা।

কিবা শোভা বৃন্দাবন।
নবনব তরুগণ, নব পল্লবে মণ্ডিত, নব শাখা সুশোভন॥
নবীন পুষ্প কানন, নানা পুষ্প সুশোভন,
সূর্য্য মণি রঞ্জন, নীরেতে কমল দল, হেরে ধায় অলি কুল,
মধু লোভেতে আকুল, গুণ ২ স্বরে করে গান॥
তমাল শাখা উপরে, পঞ্চম স্বরে
পিকবরে গান করে, কুহু স্বরে।
সুখে ময়ুর ময়ূরী, নাচে পুচ্ছ উচ্চ করি, সুখেতে হয়ে মগন
নবরস বৃন্দাবন, নব মলয়া পবন, বহিতেছে অনুক্ষণ।
কহে দীন খগদাস, মেষাসুরে করি নাশ,
ফাগুনেতে পীতবাস, ফল্গু খেলিতে মনন॥

[৬০] রাগিণী মিশ্র শঙ্করা—তাল একতালা।

চল সখি রে, ত্বরা করে চাঁচরেতে খেলব হরি।
দূরে থেকে, দেখব সুখে, শ্যামের বামে রাই কিশোরী॥
কংশ অনুচরে কালা, অগ্নিতে দাহ করিলা,
চাচর লীলা ফল্গু খেলা, প্রকাশে জগৎ ভরি॥
বসে বসে বৃথা ভাবি, সুদেবী আর রঙ্গ দেবী,
সময় গেলে আর কি পাবি, হরি করিবেন শ্রীহরি।
মিলিয়ে সখী সকল, লহগে তুলসীদল,
হরি হরি হরি বল, উড়াও গন্ধ আবিরি॥
ঘেরিয়ে ত্রিভঙ্গ শ্যাম, মার লয়ে কুঙ্কুম।
ব্রজেতে উঠেছে ধুম, লালে লাল যমুনা বারি॥
সাজায়ে রূপের ডালি, ধর ধর বনমালি,
গোপী সকলেতে মেলি, কেড়ে লও চূড়া বাঁশরী॥
কহে দীন খগবর, নয়ন মেলি হের হের,
কিশোরী নব কিশোর, নটবর বংশীধারী॥

[৬১] রাগিণী মিশ্রপিলু—তাল একতালা।

দেখলো সই, ঐ ও, নিধুবনে খেলছে হরি।
ত্রিভঙ্গ শ্যাম, করেন বিরাম, সঙ্গে লয়ে রাই কিশোরী॥

অনুরাগে, ছয়রাগে, আলাপে মোহন বাঁশরী ;
ছত্রিশ রাগিণী, ধ্বনি, শুনি মোহিত আভিরী ॥
লালে লাল নন্দলাল, লাল লাল ব্রজপুরি ,
লতা বৃক্ষ, পশু পক্ষ, লাল ময়র ময়ূরী ॥
লালে লাল ব্রজ রজ, লাল ব্রজ আহিরী।
তরু শাখা, অট্টালিকা. লালে লাল যমুনা বারি ॥
হাটবাট, নদীতট, লাল গোবর্দ্ধন গিরি !
কহে খগলাল, নন্দলাল, লাল গোপালে নেহারি ॥

[৬২] রাগিণী মিশ্রবাহার—তাল ঝাঁপতাল

হোলি খেলে, লয়ে তালে, মিলে, ব্রজ গোপিনী।
মৃদঙ্গ বাজিছে রঙ্গে, কেড়ান্ ধা ২, নি নি, নি ২ ॥
লালে লাল বৃন্দাবন, লাল পশু পক্ষীগণ।
লাল যমুনা জীবন, লালে লাল রাধারাণী ॥
কেহ গাইছে সঙ্গীত, কেহ বা করিছে নৃত্য।
অনুরাগেতে নিয়ত, আলাপে রাগ রাগিণী ॥
ঠমকে গমকে চলে, কেহ নাচে তালে ২।
ধরাধরি গলে গলে, হেলে দোলে কিঙ্কিনী ॥
তেরে কেটে ঝা ঝা ঝা, হেরে গেল রাখাল রাজা।
রাই রাজার জয় বাজা বাজা, তাক্ তাক্ সিন্ বিনোদিনী ॥
খগ কহে গোপিকারা, স্বর বেঁধে সপ্তস্বরা,
কেহ বাজায় সেতারা, ডাড্রে ডারা, গৎ ছুনি ॥

[৬৩] রাগিণী পিলু—তাল যৎ

খেলিতে হরি, বংশীধারী, কে তোমায় শিখায়েছে।
পাইয়ে অবলা বালা, লোলা বেডা গিয়েছে ॥
শিখাব আজ হে বঙ্করাজ, অনেক দিন মনে আছে,
চোরে কামারেতে দেখা দৈবযোগে হয়েছে ॥
মেজাজ টেড়া, পীত ধড়া, চুডা বামে হেলেছে।
করবো সোজা, রাখাল রাজা, মনে মনে রয়েছে ॥
হারি কি পারি বংশীধারী, আবিরে নারী মেতেছে।
মেখে আবির গোলাল, কৈ হলো লাল, সেই কালামুখ রয়েছে

দিলে চক্ষে আবির, হবে অস্থির, বীরত্ব ঘুচে গিয়েছে।
কর যোড় কর, নটবর, শ্রীরাধার জয় হয়েছে॥
আর করোনা বড়াই, কাল কানাই, তোমার বড়াই বড়াই ভেঙ্গেছে।
দুধের জলে, কয়লা ধুলে, কাল রং কোথা ঘুচে॥
পুলিন, রস বৃন্দাবন আবিরে লাল হয়েছে।
কহে খগভূপে, যুগলরূপে কিবা শোভা হয়েছে॥

[৬৪] রাগিণী মিশ্রপিলু খাম্বাজ—তাল যৎ

এখনি বিনোদিনী, ঘুচাইব চাতুরী।
এ যে ফস্ত খেলা, রাজবালা, এ নহে লুকাচুরি॥
বাঁশী, আমি ভালবাসি, তাই করেছ চুরি।
নাই বোধাবোধ, এর প্রতিশোধ, পাবে ওগো কিশোরী॥
সুদেবী, রঙ্গ দেবী, চিত্রা বৃন্দা সুন্দরী।
বিশাখারে করবো ভেকা, মারিযে পিচকারী।
চম্পকলতা, ললিতা, মনে দেখ বিচারি,
দেখ গোপী সমাজ, করিব আজ, চোরের উপর বাটপাড়ি॥
করবো বিবসনা, ব্রজঙ্গনা, নবীনা, কুলনারী,
ব্রজ মাঝে, মরবে লাজে, দেও চূড়া ধড়া ফিরি॥
কাঁচলি, খুলি খুলি, খুঁজে লব বাঁশরী।
কহে খগবর, ক্ষমা কর, অবলা গোপ নারী॥

ব্রজ ভাষায় সঙ্গীত

[৬৫] রাগিণী মিশ্রসিন্ধু খাম্বাজ—তাল ঝাঁপতাল

খেলেত ফগুয়া কওর কাধইয়া,
ধাকেটে তাক্, ধুম কেটে তাক্, বাজে মৃদং।
ভও বৎ লাই, নাচে ব্রজ মাই, ওড়েত তেহাই, তবড়তং॥
বিন বিনা তম্বুরা, দারা সপ্ত স্বরা,
টিকারা, মন্দিরা, সুর জম্ জম।
মাধেলা, তবলা, সারঙ্গি বেহালা,
কৈ ব্রজবালা, লিয়ে মোচরং॥
সপ্তস্বর তে দুনা, একুশ মূর্চ্ছনা,
আলাপি অঙ্গনা, গায় অহং।

ষড়রাগে যোগে, গায় অনুরাগে,
সোহাগে, বেহাগ গৌড় সারং ॥
রুনু রুনু বুলি, বাজত পায়েলি, রঙ্গিলি ছবিলি সুরঙ্গে রং।
কেদার, মল্লার, বসন্ত বাহার, করেত ওঙ্কার বিবিধ ঢং ॥
গোলাপ আবেরি, মারি পিচকারী, ভিঙ্গায়ে সারি, কুঞ্জ পালং।
কহে পক্ষিবর, মন ধ্যানে ধর, শ্যামল সুন্দর, বাঁকে ত্রিভং।

[৬৬] রাগিণী সিন্ধুকাফি—তাল যৎ

কাহে রঙ্গ ডারি, হো ত্রিভঙ্গ মুরারি, সম্ভার ২, হো বাঁকে শ্যামর।
মৎ মার পিচকারী, শাশ, শুনেগি' ননদী লড়েগি।
মোরে সৈঁইয়া, দেওগি মুজে গারি (মুরারি) ॥
ছোড় ছোড় বাট, যানেদে যমুনা তট,
রে ধিট লানেদে বারি, রঙ্গিলা ছবিলা রেন্দ দুলালা,
ছোড়দে বৈঁইয়া হামারি (মুরারি) ॥
তু কেয়া জান লালা, ফগুয়া কে নিলা, হো ২ গোয়ালা গিরধারী ;
বন বন ঢোঁড়ত, গৌয়া চরাওত,
তু কেয়া জানত খেলেন হোরি ॥ (মুরারি)
কহে পক্ষিবর, মন ভাওয়ে মোর, যুগল চরণ তুহারি।
হো ২ ত্রিভঙ্গ তেড়া, রহোজি জেরেসে খাড়া,
ময়ূর মকুট বেড়া, বাঁকে বেহারী (মুরারি) ॥

[৬৭] রাগিণী বাহারবাগেশ্রী—তাল রূপক

কুঞ্জে কুঞ্জ বেহারী, খেলেত হোরি,
সঙ্গে লিয়ে গোরী প্যারী ॥
বহে মলয়া পবন, প্রফুল্লিত ফুলবন,
গুঞ্জরে ভঁওরা অন যুগল চরণ'পরি ॥
পীতাম, পীত পাছড়ী, রাধে পহেনি নীলা সাড়ী।
পট্টা দো পট্টা উড়ি, তেড়ি কবেরী ॥
বেরি ২ সখী অন, দেওয়ে চুয়া চন্দন।
নিরখি নন্দ নন্দন, মারে পিচকারী ॥
বাজে মৃদং রসাল, ব্রহ্মতাল, রুদ্র তাল,
পক্ষি কহে নন্দলাল, খেলে আবেরি ॥

[৬৮] রাগিণী পরজবাহার—তাল যৎ

এসে ফাগুণ কে দিন, আই সজনী।
পুর্ণমাসী, শশী, ভঁই উজারা চাঁদনী ॥
বহে মলয়া পবন, কোয়েলা কুহরে ঘন।
গায়ে সব সখী অন, বাহার সোহিনী ॥
লালে লাল যমুনা তীর, উড়ে কুঙ্কুম আবির,
জাবট ধীর সমীর, লাল ব্রজ ভামিনী।
লালে লাল কুঞ্জবন, লাল রত্ন সিংহাসন।
লাল মদনমোহন, লাল রাধেরাণী।
লাল তমাল পশু, পক্ষি লালে লাল,
কহে দাস পক্ষি লাল, লাল গোপ, গোপিনী ॥

[৬৯] রাগিণী সিন্ধুড়া—তাল ধামার

হোরি খেলিছে শ্রীহরি।
সহ রাধা প্যারী, কুঙ্কুম ধুম শ্যাম অঙ্গ ভরি।
পুষ্পমালা, হিন্দোলা সাজায়ে ব্রজনারী ;
রাই শ্যাম, অনুপম, দোলে তদুপরি ॥
নব নব সখীগণ, আনি চুয়া চন্দন, গোলাব সহিত আবিরী ॥
ঐ ঐ রসময়ী, শ্যামের বামেতে ঐ,
যুগল রূপ রস কুপ, হের নয়ন ভরি ॥
উড়ে আবির গোলাল, বৃন্দাবন লালে লাল,
লালে লাল যমুনার বারি,
লালে লাল কেসি ঘাট, লালে লাল বংশীবট,
জাবট কালিন্দী তট, গোবর্দ্ধন গিরি ॥
লাল শ্রীদাম সুবল, লাল শ্রীমধু মঙ্গল।
লালে লাল জল স্থল, গোপ নর নারী,
নন্দ আদি উপানন্দ, আবিরে করে আনন্দ।
সদানন্দ শ্রীগোবিন্দ, গোপ বৃন্দে ঘেরি ॥
তাল, তমাল, হিন্তাল, দ্বাদশ কানন লাল,
লতা বৃক্ষ, পশু পক্ষ লাল শুকশারী।
লাল হংসাদি শাবক, পিক ডাহুকী ডাহুক,
কহে খগ মৃগী মৃগ, লাল ব্রজপুরী ॥

[৭০] রাগিণী সুরটমল্লার—তাল জলদতেতালা

মুরলীতে বনমালী, সুস্বরে সঙ্কেত করে ।
নিশিতে ব্রজ রূপসী যাইও কুঞ্জ অভিসারে ॥
মিলি নব নব বালা, গাঁথি নব নব মালা,
কুঞ্জ করিবে উজ্জ্বলা বিবিধ প্রকারে ;
সুগন্ধি ফুল চন্দন, উপাচার নানাবর্ণ,
রাখিও করি যতন, প্রয়োজন অনুসারে ॥
আমার এই মিনতি, অবিলম্বে যাবে দূতী ।
পশ্চাতে যাবেন শ্রীমতী সখী সমিভ্যারে,
আজি সঙ্কেত কাননে, নিশি বঞ্চি' যতনে ।
বহু সাধ আছে মনে, ল'য়ে শ্রীমতী রাধারে ॥
এমত সুখের নিশি, আর হবে না প্রেয়সী ।
পুনঃ ২ বলে বাঁশী, মধু মাখা স্বরে ॥
শুনি সে বংশীর গান, যমুনা বহে উজান,
অবলা বালার প্রাণ, কুল মান সব হরে ॥
ত্বরা কুঞ্জ সাজাইতে, কহে দীন খগপতে,
কৃষ্ণ সন্ধ্যা প্রাক্কালেতে, যাবেন কুটীরে ;
ত্রিজগত চিন্তামণি ধ্যানে না পায় ঋষি মুনি,
তাঁরে বেঁধেছে গোপিনী ভক্তি প্রেমডোরে ॥

[৭১] রাগিণী সোহিনবাহার—তাল ধামার

চঞ্চলা চপলা সম, যতেক বরজিনী ।
কুঞ্জেতে কুঞ্জ বিহারী নিশিতে আসিবেন শুনি ॥
করয়ে কুঞ্জ সজ্জিত, হার গাঁথে মনোমত ।
কেহ বা নিরখে পথ, নাথ আগমন জানি ॥
হারে ২ দিয়ে যোড়া, দেয় ফুল বেড়া ।
কেহ করে ফুল তোড়া, তেড়া রূপ ভাবে ধনী ॥
কেহ করি পরিশ্রম, সাজায় কস্তুরী কুঙ্কুম,
কেহ করিছে বিশ্রাম, দ্বিতীয় যাম রজনী ॥
কহে দীন খগপতি, হইল গভীর রাতি ।
উৎকণ্ঠা হয়ে শ্রীমতী, বলে কৈ নীলকান্ত মণি ॥

[৭২] রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা

নটবর বেশে, মনের উল্লাসে, শ্রীরাধার উদ্দেশে, কুঞ্জেতে ধায়।
কটিতে কিঙ্কিনী, মণি শ্রেণী জিনি, রতন নূপুর বাজিছে পায়॥
পীত বসন পীত ধড়া, পরিপাটি আঁটি কটিতে বেড়া,
ত্রিভঙ্গ শ্যাম অঙ্গ, তিনঠাঁই তেড়া, গুঞ্জা বেড়া চূড়া, ময়ুর পাখায়।
করেতে বলয় মণি মুক্তাময়, হীরক অঙ্গুরী কর কনিষ্ঠায়;
ভৃগু পদাঙ্কিত, বক্ষ সুশোভিত, অগুরু চন্দন চর্চ্চিত গায়॥
কণ্ঠে লুণ্ঠে হার, অমূল্য প্রস্তর, নাশায় বেশর, [illegible] মৌক্তিকায়,
অলকা ভালে, কুণ্ডল শ্রুতি মূলে, ভঙ্গি ভাবে চলে বাঁশী বাজায়॥
নট বনমালী, হেরি চন্দ্রাবলী, পথেতে আগলি ধরি কালায়,
লইয়ে নিজ কুঞ্জে, সুখে নিশি ভুঞ্জে, খগপতি কয় ভুলে রাধায়॥

[৭৩] রাগিণী সোহিনীবাহার—তাল জলদতেতালা

আজিকে রাধিকের কুঞ্জে যেতে দিব না তোমায়।
হাতে নিধি, দিলে বিধি, ছেড়ে থাকে কে কোথায়॥
শুন শুন বনমালী, বিনয়ে তোমায় বলি,
দেখাইও না চতুরালি, চন্দ্রাবলী গোপিকায়॥
সকলে তব প্রয়াসী, জান না কি কালশশী,
আজ রাধার একাদশী, অনশনে শ্যাম রায়॥
ভাগ্যগুণে তোমা ধনে, আজি পেয়েছি নির্জ্জনে,
সেবিব রাঙ্গা চরণে, কাল শশী দাসী প্রায়॥
তাম্বুল দাগ দেখে স্পষ্ট, মানিনী রাই হবেন রুষ্ট,
চন্দ্রাবলী তিষ্ঠ তিষ্ঠ, কহে দীন খগরায়॥

[৭৪] রাগিণী বেহাগ—তাল কাওয়ালি

কার কুঞ্জে, সুখ ভুঞ্জে, নিকুঞ্জ বিহারী সই।
যৌবন রতন ধন, করি তারে সমর্পণ,
নিলাম চরণে শরণ, তার মন পেলাম কই॥
আশা দিয়ে কালিয়ে, অগ্রেতে পাঠাইয়ে,
অবলা সরলা বালায়, ছলে কলে ভুলাইয়ে,
বন মাঝে আনিয়ে, দুঃখ নীরে ভাসাইয়ে,
নিয়ত জ্বালালে এত, আর কত, সয়ে রই॥

ফুলহার, উপহার, ত্বরা করি পরিহর।
হেরিব না, সুলোচনা, নয়নে ও সব আর,
শ্যামা সখীগণে ধর কুঞ্জের বাহির কর,
সে কাল কুটিল রূপ হেরিতে আর প্রার্থী নই॥
কি আর কব অধিক, এ প্রণয়ে ধিক ধিক,
কে বলে কেলে প্রেমিক, নট শঠ অরসিক,
নব প্রণয়ের কালে, দিত ইন্দু করতলে।
এখন চখের দেখা, দেয় না বাঁকা, সাধে কি সই বিরূপ হই
উর্ব্বর ধরা দেখিয়ে প্রেম বীজ বুনিয়ে,
ক্রমে অঙ্কুর হেরিয়ে, ছিলাম আনন্দিত হ'য়ে;
কোথা সখী পাব ফল, সকলি হ'ল বিফল,
সে মন মোহন যেন পাকা ধানে দিলে মই॥
কহিছে বিহঙ্গ কুঞ্জ ভঙ্গ হবে এখনি,
যার লাগি নিশি জাগি, পাবে সে গুণ মণি,
সে তোমার, তুমি তার, জাননা বিনোদিনী,
সদা রাধা, প্রেমে বাঁধা, জানেনা শ্যাম রাধা বই॥

৭৫] রাগ মিশ্রভৈঁরব—তাল তেতাল।

ভোর ভইল রজনী, সজনী, যায় যায় যামিনী।
এমন এল না কেন, নীলকান্ত মণি ধনী॥
পঞ্চমে ধরিয়ে তান, কোকিলে করিছে গান, যায় যায় প্রাণ,(সজনী)
রব করে কুহু কুহু, প্রাণ যায় আহা উহু,
টুন্ টুন্ টুন্ টুন্ টুন্ টুন্ স্বরে, ডাকিছে টুনটুনি ধনী॥
কুমুদিনী মুদিত, পদ্মিনী প্রফুল্লিত,
ত্রিজগৎ জাগ্রত, ভানু তনু প্রকাশিত।
(দেখ দেখ সই) বাজ ব্রজে শিঙ্গা বেণু, হাম্বা রব করে ধেনু,
নবানার অলঙ্কার, করে রুনু ঝুনু ধ্বনি॥
ভৈঁরব রাগে গায় গুণী, কেহ ভৈরবী রাগিণী,
যোগিয়া, আলেয়া খটে নটী নটের কান্দানি।
(সজনী) রামকেলী বিভাস টোড়ী, ললিত মঙ্গল পাহাড়ী,
মৃদঙ্গে বাজিছে রঙ্গ, কেড়ান, ধাধা থুম্বা নি, নি॥

রজনী হইল ভোর, কৈসে মাখন চোর,
কুঞ্জেতে আসিতে মোর, বারণ করিও ধনী (সজনী)
কহে দীন খগপতি, দয়া নাই শ্রীমতীর প্রতি,
কোথা পোহাইলে রাতি, তাই চিন্তি চিন্তামণি ॥

শ্রীশ্রী শ্রীমতীর অভিমান

[৭৬] রাগিণী মিশ্রলালিত তাল—জলদ তেতালা

অলসে বিরসে, শ্যাম, ভ্রমে ভ্রমে কুঞ্জ দ্বারে ।
প্রতি পদেতে বিপদ, শ্রীপদ চালিতে নারে ॥
অবসাদ হ'ল রাতি, দিবাকর কর ভাতি,
কুঞ্জ ভঙ্গ করে দূতী দুঃখিত অন্তরে,
শ্যাম সময় বুঝিয়ে, যুগল কর পসারিয়ে ।
ধ'রে শ্রীমতীর পায়ে, করুণা প্রার্থনা করে ॥
দোষী নহি কমলিনী, কুঞ্জে করিব মেলানি ।
সে সময়ে নন্দরাণী, দ্বারে ধরিল আমারে,
গোষ্ঠ কষ্টের অলসে, অচেতন নিদ্রাবেশে,
দোষী হয়েছে এ দাসে, অবশ্য তব গোচরে
বেশ ভূষা আভরণ, সহিত করি শয়ন,
রাত্রে থাকি অনশন শয়নাগারে ,
অতি ক্ষুধা পিপাসায়, হইয়াছে শীর্ণকায়,
নিরুপায়ের নাহি উপায়, প্রসন্ন হও এ দীনেরে ॥
দাসের দোষ প্রায় ঘটে, প্রভু তা ধরে না মোটে.
কহে খগ কর পুটে মিনতি ক'রে,
অবশ্য হয়েছেন দোষী, গত নিশি নাহি আসি ।
ক্ষমা গুণে রে প্রকাশি, লও সন্তাষী, বংশীধরে ॥

[৭৭] রাগিণী মিশ্রটোড়ি—তাল কাওয়ালি

সাঁচি কহ মন মোহন মুঝে কাহানিশি গোঁয়াই (হো) ।
ভোর ভয়েসে., চিড়িয়া বোলে, আব, কে তুনে আয়ি (হো) ॥
চপল নয়না, মদন মোহনা, অরুণ বরণ কাহে ভঁয়ো (হো) ।
হো, নট নাগর, কোন্ সতিনী তোর, মনকো লোভাই ॥
হো কাহা হো অলকাবৃত, আব, দেখা নখ ক্ষত তাম্বুল, রাগ সোহাগ
কে হো, ঢিট লম্পট শট, কুঞ্জে সে হট হট, রাধে রাণীকে হুকুম ভই (হো)

যিনে লিয়ে নিশি জাগো, তড়পে হ্ঁম্না হো ভাগো,
তেরে রাগ সোহাগ, কো শুনেগা হো।
ভোরে চতুর আয়ি, মিঠি ঝুঁট বাতাই, না শুনেগা ব্রজ মায়ি, কাঁধাই (হো)॥
দুঃখ দেয়ি ভগ্তা নে আয়ি, রে কপট চতুরায়ি, হাম সবে বিসরছি,
নিশি গোঁয়াই হো, বিরহে কহে খগ দাস,
নিকট রহ পীত বাস, কৃপা কর পরকাশ, চরণ ধেয়াই (হো)॥

[৭৮] মনোহর সাই—তাল ছুটো।

(গোবিন্দ অধিকারীর এই গানের অবিকল সুর : চাঁদ চাঁদ চাঁদ, চাঁদের বামে চাঁদ বদনী দাঁড়াল।)

শ্যাম কাল শশী নয়ন জলে ভাসি, ফেলে দিল বাঁশী, ভূমেতে।
বৃন্দার করে ধরি, কহে বেরি বেরি রাখ সহচরী, দায়েতে॥
কমিয়ে বিষাদ, কহে কালাচাঁদ, হেন অপরাধ, করিবনা ত জনমেতে।
আন ভূর্জ্জপত্র, আর মসী পাত্র, দাসখত লহ ইহাতে॥
বিনা সে কিশোরী, বিনাশে মাধুরী, দিবস শর্ব্বরী, ভাবিতে।
সখী হায় হায়, বিরহ কি দায়, প্রাণ ফেটে যায়, তিলেতে॥
মিলনের ভার, করেতে তোমার, কেহ নাহি আর জগতে।
শয়নে স্বপনে, ধ্যানে মননে, রাধা পড়ে মনে মনে তে॥
কহে খগপতি, জেন হে শ্রীপতি, এর গতি দূতীর করেতে।
দাও বৃন্দার প্রতি ভার, ব্রজেন্দ্র কুমার, হবে নাকো আর কাঁদিতে॥

[৭৯] রাগিণী মিশ্রযোগিয়া—তাল কাওয়ালি

যাও যাও, যাও যাও, বাঁকা ত্রিভঙ্গ, ক'রনা ২ রঙ্গ।
তোমায় দেখে, মনো দুখে, দহিছে অঙ্গ॥
দুর্ব্বার রাধার রাগ, যতই কর সোহাগ, আজ আর ফিরবেনা রাগ,
সাদা প্রেণে দিলে দাগ, দংশেছে বিচ্ছেদ ভুজঙ্গ॥
যথা পোহাইলে নিশি, তথা যাও হে কাল শশী।
দেখাও ভাল বাসাবাসি, তার মন তোষী,
গুণরাশি শুনাও প্রেম প্রসঙ্গ॥
বিচ্ছেদানলে শ্রীমতী, পশু পতির আকৃতি
নিকটে থাকলে শ্রীপতি, ঘটিবে তব দুর্গতি হইবে হে অনঙ্গ॥
কহে দীন খগবর, শুন শুন নটবর, হও কিঞ্চিৎ অন্তর,
দহিবে রাধা অন্তর, হইবে মানভঙ্গ॥

[৮০] রাগিণী ঝিঁঝিটখাম্বাজ—তাল মধ্যমান

সমাধান কর মান, গো বিনোদিনী।
ষট্‌পদ দাসের দোষে রোষে, কি গো পদ্মিনী॥
যার মানে জগতে মানে, তার কাছে আর মান করিস্ নে।
মানে ম'জে মান খোয়াস্‌নে, শেষ হবি অপমানী॥
(ক'রে) ভালবাসার এ দুর্দ্দশা, মান হ'ল তোর ভালবাসা।
কে শিখালে মানের নেশা, এ তামাশা সজনী॥
প্রণয়ে মান অপমান, উভয় জেনো সমান।
যার উপরে কর মান, সে কি রাই নহে মানী॥
মান ভাল নয় বিধি মতে, শেষে হবে মান খোয়াতে,
কহে দীন খগপতে, মান ত্যজ রাই মানিনী॥

[৮১] রাগিণী ভৈরবী—তাল ঢিমা তেতাল।

সদা মন উচাটন কি করি এক্ষণে।
বিরহ অসহ্য হ'ল ধৈর্য্য ধরিতে পারিনে॥
যেদিকে ফিরাই আঁখি, সেদিকে সেরূপ দেখি।
নয়ন মুদিলে সখি, দেখি হৃদি পদ্মাসনে॥
মানে মনেতে কলহ, হইতেছে অহরহ।
প্রাণ কি সহে বিরহ, পলকে প্রলয় গণে॥
মতভেদে হত জ্ঞান, মান রাখি কি রাখি প্রাণ।
কিসে করি এর বিধান, উভয় সঙ্কটে বাঁচিনে॥
সাধিয়ে ধরিল পায়, দেখিনু না ফিরে তায়।
এখন প্রাণ যায় হায়, সে জীবন ধন বিনে॥
খগ ক আছে বিধি, করিবারে পার যদি।
বিরহ ব্যাধির মহৌষধি, দূতা বিদ্যমানে॥

[৮২] রাগিণী সাহানা—তাল ঝাঁপতাল

আন বৃন্দে, শ্রীগোবিন্দে, মিনতি করি তোমায়।
প্রাণ জলে বিরহানলে, জল দিলে প্রাণ জ্ব'লে যায়॥
সলিল দিলে অনলে, সেই ক্ষণেতে নিভায়।
এতে বিপরীত রীত, বিধির কি কৌশল হায়॥
বিরহানল জ্বলিলে, জলে দ্বিগুণ জ্বালায়।
যে জ্বালালে তারে পেলে, তবে তো জ্বালা এড়ায়॥

আন শ্যাম, গুণ ধাম, প্রাণ ওষ্ঠাগত প্রায়।
মান ক'রে পরাণে মরি প্রাণ যায় সই মানের দায় ॥
রাধা কুণ্ডে, হেঁট মুণ্ডে, আছে দূতী শ্যামকায়।
যুগলে মিলাও কৌশলে, বলে দীন খগরায় ॥

[৮৩] রাগিণী সুমঝিঁঝিট—তাল আড়খেমটা

যাও হে যাও কেন জ্বালাও জ্বালাব জ্বালা দিয়ে।
কাটা ঘায়ে লবণ ছিটে, দিয়ে এঁটে, ধর পায়ে (শ্যাম) ॥
কুলশীল বিসর্জ্জন, দিয়ে লইয়ে শরণ।
তথাচ পেলে না মন, বিনি মূলে, কেনা হ'যে (রাধে) ॥
পায়ে ধরা কে যায় না পারা, উপদেশ লও মাখন চোরা।
বেশ পরিবর্ত্ত-ত্বরা, নারী সাজ, বিনোদিয়ে (তুমি) ॥
চূড়া ফেলে এলিয়ে বেণী, বীণা লহ বংশী পাণি।
সাজ হে শ্যাম বিদেশিনী, মান ভিক্ষা লহ চাহিয়ে (রাধার নিকট) ॥
কহে দীন খগপতি, অগতির গতি দূতী।
পাবে হে শ্যাম অব্যাহতি, দূতীর পুথির নীতি লয়ে (এ দায়ে) ॥

[৮৪] রাগিনী ঝিঁঝিট—তাল কাওয়ালি

কে ও বিদেশিনী। (লো সৈ)
অবয়ব, সব ভাব, শ্যাম গুণমণি ॥
এ নবীনা, নহে প্রবীণা, করে কবি রস বীণা।
বীণা স্বরে প্রাণ কেনা, বিনাশে কামিনী ॥
আহা মরি কি সুঠাম, নয়ন ভঙ্গি বঙ্কিম।
বর্ণ নব ঘনশ্যাম, কাম প্রসবিনী ॥
নারীর বসন ত্যজে, যদি এ রাখাল সাজে।
চিনিতে নারিবে ব্রজে, ব্রজের আহিরিণী ॥
কহে দীন খগভূপ, অপরূপ রস কূপ।
ধ্যানে ভাবে যাঁর রূপ, যোগী ঋষি মুনি ॥

[৮৫] রাগ মালকোশ—তাল জলদতেতালা

এই খেয়ালের অবিকল: (মোরে পিত লাগিলিরে, শো বলমা মোরে—ইত্যাদি)

গেল রে বিষাদ, মন সাধ পুরিল।
রাই শ্যাম, অনুপম, যুগল মিলন হ'ল ॥

বরিষার তম নাশি, উদয় শরত শশী ।
মন চকোরী হাসি হাসি, আনন্দে বিহ্বোল ॥
রাধা অঙ্গে আধ অঙ্গ, হেলায়ে ত্রিভঙ্গ ।
সঙ্গিনীরা করে রঙ্গ, খগবব কুতূহল ॥

[৮৬]

রাগিণী সিন্ধুড়া—তাল ধামার

হের রে নয়নে, নিকুঞ্জ কাননে , রাজবেশে রাধে ব'সে রত্ন সিংহাসনে ।
রাজমন্ত্রী বৃন্দা দূতী, সুদেবী সভাপতি, রঙ্গ দেবী আজ্ঞনতি, শুনান সঘনে ॥
বিশাখা রাজকোষাধ্যক্ষ, চিত্রা চিত্ত হারক ।
চম্পকলতা পাঠক, সভা বিদ্যমানে ॥
আয় ব্যয়ের বুঝেন খাতা, নায়েব সখী ললিতা ।
গোমস্তা অপরাজিতা, বহু সখিগণে ॥
কানন শুঁই দাওয়ান, মোক্তার শ্যামা সখী হুঁশিয়ার ।
তোষাখানার সরকার, বৃন্দার অধীনে ॥
মফঃস্বল গাঁয়ের মোড়ল, দেবত্ব ব্রহ্মত্ব মহল ।
রাজে আদায় তসিল হয়, সদর উদ্যানে ॥
হাজা শুকা বাজেয়াপ্ত, না হয় রাজস্ব প্রাপ্ত ।
যে মহল আছে গুপ্ত, রাই রাজা না জানে ॥
কহে দীন খগপাল, কুঞ্জে রাই মহীপাল ।
গোপের মহিষীপাল, কার্য্য রক্ষণে ॥
আপনি শ্রীনন্দলাল, হাতে তরয়াল ঢাল ।
রাই রাজার কোতোয়াল, বস বৃন্দাবনে ॥

[৮৭]

রাগিণী গৌড়মল্লার—তাল ঝাঁপতাল

বেজনা বেজনা বংশী তুমি, ঘন ঘন বিপিনে ।
নিয়েছ নিয়েছ কুলমান, পুনপ্রাণ নাশিবে ক'রেছ মনে ।
গুরুজন মাঝে, থাকি গৃহ কাজে, সেই সময়েতে বংশী বাজে ।
ছি ছি মরি লাজে, একি তোর সাজে, কোন কাজে মন রাখিনে ।
সদত ব্যথিত, বনে ধায় মন, থাকি অনশনে করিয়ে শয়ন ।
দাবাদগ্ধা বন হরিণী যেমন, ত্যজে সে জীবন, পসিয়ে জীবনে ॥
অসার বংশেতে জন্ম তোর বংশ, মম কোপে ধ্বংস হবে তোর বংশ ।
কখন জানিনা দুখের অংশ, স্বাধীনে নবীনে গোপিনীগণে ॥

বংশী স্বর, ক্রুর, শুনি সুধামাখা,
নিশিতে, বনেতে ধায়রে গোপিকা।
কৃষ্ণ মন রাখা, তোমামোদে নেকা,
কচি খোকার মত দেয়ালি করিস নে॥
অসার কুলাঙ্গার তোমার বহু ছিদ্র।
কৃষ্ণের মুখে থেকে হয়েছিস্ রুদ্র॥
বড় রে অভদ্র, শাল হ'তে ক্ষুদ্র।
তব বাস খাস অরণ্যে॥
তব যম ডোম, ঘুচায় সব ভ্রূকুটি।
চালনী ধুচনী করে কাটি ছাঁটি॥
আমরা হ'লাম মাটী, বনে হাটি হাঁটি।
ধরি চরণ দুটি, জ্বালাসনে জ্বালাসনে (তোর)॥
স্বপনে কখন দুঃখের বেদনা, জানে না হে ব্রজনারী
(রে বাঁশরী) তুমি হয়ে অরি, করিলে বনচারী॥
বনে বনে ফিরি, ওরে বাঁশরী।
হরি মুখামৃত কর রে পান, তবু না ছাড়রে কুটিল জ্ঞান।
কহে খগবর, বাধায় পরিহর, কৃষ্ণনাম কর, সুস্বর স্বভাবে

[৮৮] রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল একতালা

কেন এলে এ বনে (গোপীগণে)।
তোমরা কুল নারী, কুল পরিহরি,
ঘোর বিভাবরী, না জেনে না শুনে (এলে এ বনে)॥
হিংস্র পশু সব অতি ভয়ঙ্কর, নদ নদী আদি তাহে জলচর
খালে বিলে স্থলে কুশাঙ্কুর বিস্তর, পাছে বাজে চরণে॥
না জেনে নিগম, করিলে আগম।
কিসেতে রাখিবে কুলের সম্ভ্রম॥
অখলা অবলার এই কি ধরম,
নাহি শম দম, প্রেম ভ্রম টানে॥
কুলের কুলবতী, তোমরা সব সতী।
একা ফেলে গৃহে এলে প্রাণপতি, হইবে অখ্যাতি,
যাবে জাতি পতি, এহেন কুরীতি কেনে॥

যাও যাও গৃহেতে ফিরি,
রাখ রাখ রাখ বচন আমারি।
ক্রমে ক্রমে হয় ঘোর বিভাবরী,
শ্রীহরি কর এক্ষণে ॥
করিয়ে মিনতি খগপতি কয়,
বাঁশীতে উদাসী হয় গোপচয়।
সে রবে যমুনা উজানে বয়,
মুগ্ধ পশুপক্ষিগণে ॥
যে শুনেছে বাঁশীর মধুর তান,
সে কি ভয় কভু করে কুল মান।
কন্দর্পে মোহিত করে তার প্রাণ,
শুন ভগবান নিবেদি চরণে ॥

[৮৯] রাগিণী পিলু-খাম্বাজ—তাল পোস্তা

বাঁশীর গানে এনে বনে, এখন কেন হওহে নিদয়।
দয়াময় জগতে কয়, সেই দয়ার কি এই পরিচয় ॥
ত্যজি কুল শীল লাজ, গৃহকার্য্য সমুদয়।
নিশিতে কাননে পশি কালশশী করিনে ভয় ॥
তব লাগি বংশরাজ, ত্যজিয়ে গৃহ ঐশ্বর্য্য।
বহু কষ্ট করি, সহ এ কার্য্য উচিত নয় ॥
শয্যা হইতে গোপিকা, পতিরে ফেলিয়ে একা।
পাব ব'লে তব দেখা, এসেছি হে প্রেমময় ॥
তোমার নিষ্ঠুর বাণী, অশনি প্রায় কর্ণে শুনি।
রাখিতে পাপ, রাণী তিল মাত্র ইচ্ছা নয় ॥
শরচ্চন্দ্রে কৃষ্ণচন্দ্র এসেছেন গোপিকাচয়,।
কয় খগপতি, গোপীর প্রতি শ্রীপতি হে হও সদয়

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের মহারাস।

[৯০] রাগিণী মিশ্র [illegible] খাম্বাজ—তাল ঠুংরি

শরতে, শ্রীরাধে সহ নিকুঞ্জ বিহারী (হরি)।
কুঞ্জে কুঞ্জে, সুখ ভুঞ্জে কুঞ্জর গমনা প্যারী ॥
বরিষার তম নাশি, উদয় শরত শশী।
চকোরী সুধা প্রয়াসী, আনন্দে ভরি (মরি)।

ফলে ফুলে সুশোভন, বন আদি উপবন।
পল্লবিত তরুগণ, শাখা বিস্তারি ॥
মনে ভাবি সর্ব্বব্যাপী, হলেন প্রভু বহুরূপী।
এক এক কৃষ্ণ যুগল গোপী, বিপিন ভরি (বৃন্দা) ॥
সঙ্কেত বংশী উদ্দেশ্যে, গোপী মতি রাস রসে।
ভেটে আসি পীত বাসে, বরজনারী।
শরতের পুর্ণচন্দ্র, ভুতলে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র।
নিষ্কলঙ্ক রাধাচন্দ্র, রাসেশ্বরী ॥
মোহিতে গোপীকা মন, প্রভু মদনমোহন।
রাস রসেতে মগন, রস বিস্তারি ॥
কহে দীন খগদাস, জ্ঞান নয়ন প্রকাশ।
হের রে শরতরাস, নয়ন ভরি (মরি মরি) ॥

[৯১] রাগিণী মনোহরসাই—তাল ছুটো

নাচেত কানু, সাজাইয়ে বেণু, রাস রসে মাতিয়া।
বরজ নারীরে, মণ্ডলাকারে, মদন মোহনে ঘেরিয়া ॥
নবঘন বরণ, মদনমোহন, শ্রীরাধা তড়িৎ কিরণ।
আহা মরি কিবা শোভারে ॥
জগজন মন লোভারে, সখি বিচে বিবে।
রাই শ্যাম নাচে, বাজেত মৃদঙ্গ থেইয়া ইয়া ॥
বাজিছে মাদল বেণু বীণা ঢোল।
হরি হরি বোল, বলে সখীরে ॥
গোপী অঙ্গে অঙ্গ, মিলায়ে ত্রিভঙ্গ, নানারঙ্গ ভঙ্গ প্রসঙ্গ করে।
কোন সখী গায় কেহবা বাজায়, কেহ সোহাগেতে পড়ে ঢলিয়া ॥
তা তা থুন, থুন, ঝুম্বা ঝুম্বা ঝুনা, রাই নাচনা, শ্যাম নাচনা।
নাচেরে ব্রজের ব্রজাঙ্গনা, কৃষ্ণ হলেন বহুরূপী ॥
এক এক কৃষ্ণ যুগল গোপী।
কহে খগরাজ, কোটী সূর্য্য তেজ, নিকুঞ্জেতে আজ দেখরে চাহিয়া ॥

[৯২] রাগিণী মনোহরসাই—তাল ছুটো

ওই বিনোদ কুঞ্জে বিনোদ বিহারী, বিনোদ বিনোদ সাজে বিনোদিয়ায় হেরি
বিনোদ বৃন্দাবনে, বিনোদ সিংহাসনে,
বিনোদ সখীগণে বিনোদ বিনোদিয়ায় ঘেরি।

বিনোদ বিনোদ শাখায, বিনোদ বিনোদ কলি।
বিনোদ বিনোদ পুষ্প নানা জাতি তুলি॥
বিনোদ বিনোদভাবে বিনোদ গোপালী।
বিনোদ বিনোদ হার করে কবি॥
বিনোদ বিনোদ বিনোদ ছাঁদে, বিনোদ শ্রীপদে।
বিনোদ বিনোদ ভাবে সঁপিছেন বৃন্দে॥
বিনোদ পদারবিন্দের মকরন্দ গন্ধে।
ভ্রমে আনন্দে ভ্রমর ভ্রমরী॥
(যুগল পাদপদ্মে কত মধু আছে রে।
তাইতে অলিকুল আকুল হইছে রে।)
বিনোদ বিনোদ কটি, বিনোদ পীত ধটী।
বিনোদ বিনোদ ভাবে বিনোদিয়া আঁটি॥
বিনোদ বিনোদ ভাব কিব। পরিপাটি।
বিনোদ বিনোদ ভাবে বিনোদ দিঠি॥
বিনোদ বাহুদ্বযে বিনোদ বলয।
বিনোদ সমূহ অলঙ্কার মর।
বিনোদ বিনোদ সাজে, বিনোদ ভুজ মাঝে।
শোভে বিনোদ করে বিনোদ অঙ্গুরী।
(লাজে মরে গগনচাঁদ, বিংশতি চাঁদ নখে হেরি)॥
বিনোদ বিনোদ গলে, বিনোদ হার দোলে।
বিনোদ নাসিকায় বিনোদ বেশর ঝুলে॥
বিনোদ কর্ণমূলে, বিনোদ কুণ্ডলে।
বিনোদ ভাবে গলে হিল্লোলে॥
বিনোদ বিনোদ ভালে বিনোদ মৃগমদ অলকা উজ্জ্বলে।
বিনোদ তেড়া চূড়া, বিনোদ গুঞ্জা বেড়া॥
শিখী পুচ্ছে রাধার নাম হেরি॥
(বাঁশী সাধে বং- 'ধে দিবস সর্ব্বরী।
গোপী আ'ল থা'ল হযে বৈঠল ঘোর॥)
বিনোদ বিনোদ সখী বিনোদ সঙ্গ।
বিনোদ বিনোদিনী ঘেরি করে রঙ্গ।
বিনোদ সাজে, বাজে বিনোদ মৃদঙ্গ ঘেরিযে বিনোদ ত্রিভঙ্গ

বিনোদ হেরি খগ কহে কি রঙ্গ।
বিনোদ বিনোদিনীর শ্রীঅঙ্গে অঙ্গ॥
বিনোদ গৌরাঙ্গী বিনোদ শ্যামাঙ্গ, যেন বিনোদ মেঘে বিনোদ বিজরী॥
(নব তমালে জড়িতা স্বর্ণলতা রাইকিশোরী)

[৯৩] রাগিণী মিশ্রনট—তাল কাওয়ালি

হের রে নয়ন, বাঁকা মদন মোহন।
নবঘন জিনি বরণ, মনোহর মুরহর, গোপীর মনরঞ্জন॥
চরণ চরণোপর, তাহে রতন নূপুর, রুণু রুণু রবে বাজে অনুক্ষণ।
কেশরী জিনিয়ে কটি, তাহে শোভে পীতধটি॥
(শ্যামচাঁদের রূপের কিবা শোভা, গোপীগণের মনলোভা)
বাঁধিয়াছে আঁটি ধটি সুশোভন, গলে বনহার, কিবা শোভা তার।
শিরে চুড়া গুঞ্জা বেড়া, চন্দ্র জিনি চন্দ্রানন॥
অলকা আবৃত ভালে, কুণ্ডল শ্রুতিমূলে, নাসায় বেশর কিবা সুশোভন।
ভানুর নন্দিনী কূলে, দাঁড়াইয়ে নীপ মূলে।
(হের হের নটবর, নবীন কিশোর, বেণুধর)।
ঈষৎ বামেতে হেলে, ছলে করে নিরীক্ষণ।
কিবা শ্রীঅঙ্গ, বাঁকা ত্রিভঙ্গ, অনঙ্গ তাজেছেন অঙ্গ, হেরে শ্যামাঙ্গ গঠন॥
(কে বলে ভস্ম করিলে অনঙ্গেরে ত্রিলোচন)।
হের হের শ্যামরূপ, অপরূপ রস কূপ।
বিরাজে মোহন সাজে, ব্রজ ভূপের নন্দন॥
বাঁশরী ধরি অধরে, প্রেমে গদ গদ স্বরে।
(অতি সুস্বরে ফুকারে শ্রীরাধে প্রেমময়ী রাধে)।
একুশ মূর্চ্ছনা করিয়ে সন্ধান, শুনে বংশী তান গৃহে না রয় প্রাণ।
কালা কুলশীল নিল, মোহিয়া গোপিকামন॥
(কবে হাম ব্রজধাম, শ্যাম পাব দরশন)।
মনোহর রূপ তার, যে হেরেছে একবার।
ইহ জনমে কি আর ভুলিবে তার নয়ন॥
যদি থাকে আঁখি মুদে, শ্যামরূপ দেখে হৃদে।
দীনখগকয়, কৃষ্ণ সর্ব্বময়, যে ভাবে যে ভাবে পাবে ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন॥
(ভক্তাধীন ভগবান, পুরাণে আছে লিখন।
ত্রিভঙ্গ তেড়া নহে ছাড়া, তিল আধ বৃন্দাবন)॥

[৯৪] রাগিণী সুরট—তাল কাওয়ালি

বেশ বেশ বেশ সেজেছে শ্যামে, কিবা নিরমল, চরণ কমল।
অলিকুল আকুল, মধু লোভে ভ্রমে ভ্রমে॥
চরণে শোভিত কনক নূপুর ক্ষীণ কটি আটি পরি পীতাম্বর,
কণ্ঠে লুণ্ঠে মণিময় হার, নাসায় বেশর মুকুতার দামে॥
কটিতে শোভিত কনক কিঙ্কিনী, মণিগ্রে॥ জিনি তাহার সুগাঁথনি
পৃষ্ঠে দোলে বেণী জিনিয়ে ফণি, রূপের নিছনি, জিনিয়ে কামে॥
শিরেতে শোভিত মোহন চূড়া, গুঞ্জমালা তাহে বেড়া।
ঈষৎ রয়েছে বামেতে টেড়া, বিহরে হরি এই ব্রজধামে॥
খগবর কহে হের রে নয়ন, তড়িত জড়িত যেন নব ঘন।
আহা মরি কিবা রূপের কিরণ, শ্রীরাধা শোভিত শ্যামের বামে॥

[৯৫] রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল [illegible]

হের রে নয়ন ভরি।
বৃন্দাবনে, রত্নাসনে শ্রীকিশোর শ্রীকিশোরী॥
শ্যাম নব জলধর শ্রীরাধিকা বিজরী।
নীরদ গায় ঝিনি ঝিনি বাজে কিঙ্কিনী বাঁশরী॥
শ্রীপদাম্বুজে নূপুর বাজে শ্রীরাধার গুঞ্জরী।
শ্যাম কটি পীত ধটী নীল শাটী রাধাপরি॥
কণ্ঠে লুণ্ঠে বনহার তেড়াচূড়া শ্রীহরি,
মণিহার শ্রীরাধার শিরেতে শোভে কবরী॥
কহে খগ হেন ভাগ্য হবে কি বাই কিশোরী।
অন্তিম কালে গঙ্গা জলে জিহ্বা রটবে হরি হরি॥

প্রার্থনা

[৯৬] রাগিণী সুরট—তাল কাওয়ালি

দিন যায় দীননাথে একবার ডাকনা রে।
যতন ক'রে, এ দিন তো চির দিন সুদিন আর রবে না রে।
আইলে কুদিন কি করিবে সে দিন।
সে দিন কেন ভাব না রে॥
বৃথা কাজে যায় দিন, না ভাবিলে সেই দিন।
হয়ে জীব পরাধীন, দিন গেল রে॥

হেলায় হারালে দিন, দিন দিন তনুক্ষীণ।
বারি হীন মীন প্রায় ক্ষীণ হলি রে॥
যদি পেয়েছ রে দিন, হইয়ে দীনের অধীন।
কর রে নাম সাধন বদন ভরে॥
এ অতি সুখের দিন, আর পাবে না হেন দিন।
নিকটে এসে সে দিন, দিক তম ক'রে॥
সে দিনের যে উপসর্গ দিনে দিনে গর্ব্ব খর্ব্ব।
কারে দেখাবি বৈভব, সে দিন এলে রে॥
সে দিনের কর সম্বল, মুখে দীননাথ বল।
হাতে হাতে ফলাফল, সেদিন পাবি রে॥
দুর্দ্দিন সেই দিন, অতিশয় কুদিন, কি করিবে সেই দিন ভেবে দেখ রে।
দেখ দেখ দিন গেল, মুখে দীননাথ বল, দিনের ভাবনা ভাবতে হবেনা তোরে॥
কহে খগ দীনহীন, ভাব তাঁরে নিশি দিন।
দীনের অধীন হলে তবে পাবে তাঁরে॥

[৯৭] রাগিণী মিশ্রমেঘসারঙ্গ – তাল ঢিমাতেতালা।

দিন গেল গেল, কি কর রে বাতুল।
নিকট বিকট কাল, কর চিত্ত নির্ম্মল,
সচেতনে সেই ধনে কেন না ডাক বল॥
আছ ভাবি চিরজীবী, রবে কি চির কাল।
দেহ গেহ অহরহ দহিছে চিন্তানল,
দেখ ভেবে প্রবেশিবে কবে রে চিতানল।
দুর্লভ মানবজন্ম হ'ল হ'ল বিফল।
দিনে দিনে দিন গত, আগত নিশা কাল।
ত্রিকাল বৃথারে গেল, এল চতুর্থ কাল॥
দেখ ফিরি কেশে ধরি রয়েছে মহাকাল।
ত্যজে ছল মুখে বল হরের্নামৈব কেবল॥
বিষয় বিষেতে ম'জে ব্যতিব্যস্ত কেবল।
বিব্রত বিলাস রসে বাতিকে হীন বল।
বার্দ্ধক্যে মরিবি শোকে, নাশিবে ব্যাধি খালি॥
বিষয় গরল পানে হবে কি ফলাফল॥
নাম সত্য সব অনিত্য গুরুদত্ত সম্বল।
হরি হতে নাম ভারি তুলে পরীক্ষা স্থল॥

নামের মহিমা সীমা উপমা হে বিরল।
কহে খগে অনুরাগে হরি হরি হরি বল॥

[৯৮] রাগিণী মিশ্রখাম্বাজ—তাল ঢিমাতেতালা

রসনা সদা রটনা মুরারে।
কেশব মাধব যাদব মধুকৈটভারে॥
দিনে দিনে দিন গত, সে দিন হ'ল আগত।
বুদ্ধি হত জ্ঞান হত, হতায়ু হইবে পরে॥
কিছু মাত্র নাহি বোধ, শুন বলি রে নির্ব্বোধ।
কফে কণ্ঠ হ'লে রোধ, কেমনে ডাকিবি তাঁরে॥
পঞ্চ ভূতের দেহ কল, যেন পদ্ম পত্রের জল।
সদা করে টল টল পঞ্চে পঞ্চ মিশাবে রে॥
যতকাল ক্রিয়া কর্ম্ম. নহে হরিনাম সম।
খগ কহে নাম ব্রহ্ম একাল কলুস ঘোরে॥

[৯৯] রাগিণী পরজবাহার—তাল একতালা

কর চিন্তে, চিন্তামণির পদ প্রান্তে,
বিষয় বাসনা ক'র না ক'র না ম'জ না ভ্রান্তে
জল বিম্ব প্রায় জীবন রে ভাই, নিশ্বাসে বিশ্বাস নাই নাই নাই।
নিলাজ মনুজের বাহ্যজ্ঞান নাই, বুঝে না কি হবে অন্তে॥
পুত্র কলত্র অতুল বৈভব, হ'লে পরে শব।
কোথা রবে সব, ঘৃণা করি সব,
কুটুম বান্ধব, অনলে জ্বালে প্রাণান্তে॥
দারা পরিবার কহ নহে কার, এসব জানিহ মায়ার বিকার।
প্রকৃতির রোগে ভোগে বার বার, পারেনা কো জীব জান্তে॥
কহে দীনখগ, ত্যজ উপসর্গ, যতন করিয়ে লহ রে বৈরাগ্য।
ভক্তি মার্গের আগে কি ছার স্বর্গ, কর অনুরাগ শ্রীরাধাকান্তে॥

[১০০] রাগিণী পরজবাহার—তাল একতালা

যাতনা যায় যায় যে পায় সে পায়।
করিলে উপায় সে পার পায়, কেবা বল তারে পায়॥
পায়ের যে গুণ, পায় সেই জন, ভব পারাবারে যায় যায়।
পায়েতে ভকতি, পায়ে রতি মতি, অন্তে পায় গতি, মিশায় পায়॥

পায়ের মহিমা, পায় নাকো ব্রহ্মা, পঞ্চমুখ পশুপতি ধ্যায় পায়।
পায়ে পরশিয়ে, গৌতমের প্রিয়ে, পাষাণ মানবী পায় পায়॥
ও পায়ে বিশেষ, ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ, চিহ্নাদি শোভিত রাঙ্গা পায়।
পুরাণেতে শুনি, যামি পা দুখানি, সুরধুনী নাম পায় পায়॥
কুবের ঐশ্বর্য্য, ধন ধান্য রাজ্য, ব্রহ্ম পদ তুচ্ছ পায় পায়।
খগ নিরুপায়, নাহিক উপায়, অন্তে পদ প্রান্ত যেন পায়॥

[১০১] রাগিণী দেশ—তাল কাওয়ালি

নিকট বিকট কাল, ওরে মন বাতুল।
ভাব সে পদ রাতুল, ভ্রান্তে ভুলনা রসনা (হরি হরি বলনা)॥
নাম ল'লে একবার, পুনর্জ্জন্ম নাহি তার।
ত্যজিয়ে বিষয় বিকার, কর হরি আরাধনা॥
কৃপা করি গুণধাম, প্রকাশেন অসংখ্য নাম।
কেশব মাধব রাম, ঘন শ্যাম কেলেসোণা॥
নরহরি নারায়ণ, যদুপতি জনার্দ্দন।
বিপদে মধুসূদন, আছে জগতে ঘোষণা॥
খগ কয় কলুষ ব্যাধির, হবেনাঔষধ ঔষধ।
পথ্য পরমার্থ বিধি, জীব বে জানন।

[১০২] রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা

মন প্রাণ দিয়ে, প্রফুল্ল হৃদয়ে, হরি হরি বল বদনে।
এ কলি কলুষ, হইবে নাশ, মধুর মধুর মধুর তানে॥
বল উচ্চৈঃস্বরে, যতন ক'রে, কেশব মাধব যাদব শ্রীহরে।
শ্রীপতি শ্রীধর শ্রীকৃষ্ণ কংসারে, ডাক শ্রীনন্দ নন্দনে॥
যেই নাম লাগি, সদাশিব যোগী, সর্ব্বস্ব ত্যাগী, হলেন বৈরাগী।
নামে অনুরাগী, জটাধারী যোগী, হরি হরি গুণ গানে॥
হরি নাম ব্রহ্ম চারি যুগে বলে, নাম বলে জলে ভেসেছিল শিলে
পিতা পুত্রে ডাকি নারায়ণ ব'লে, গেল সে কৈবল্য ভবনে॥
গজরাজ হয়ে বিপদে পতন, উচ্চৈঃ ডাকে রক্ষ শ্রীমধুসূদন।
কহে খগে বেগে চক্র সুদর্শন, দুষ্টে নষ্ট করে প্রাণে॥

[১০৩] রাগিণী খাম্বাজ—তাল মধ্যমান

ভাব রে মানসে, সেই শ্রীনিবাসে।
তরিবে অনা'সে, জীব ভব পাশে॥

সদা রটনা, ওরে রসনা ব্রজের কেলেসোণা।
যাতনা রবেনা, হরি নাম করনা, ভুলে থেকনা কখন অলসে॥
যতন করি বদন ভরি, বল হরি হরি, মায়া পরিহরি দিবস সর্ব্বরী
দেখ ধ্যানে ধরি, বঙ্কিম বিহারী, সেই পীতবাসে॥
ত্যজিযে কুসঙ্গ, কর সাধু সঙ্গ, ও মন মাতঙ্গ, হবে শুদ্ধ অঙ্গ।
ত্যজ অন্য প্রসঙ্গ, গাও হরি প্রসঙ্গ,
ধুলাতে লুটাও অঙ্গ, ভাব সে ত্রিভঙ্গ, কহে খগদাসে॥

[১০৪] রাগিণী খাম্বাবতী—তাল একতাল

রসনা বাসনা একবার পুরানা রে।
অলস ত্যজ রে, যত্ন করি, বদন ভরি, বল হরি হরি, উচ্চৈঃস্বরে॥
শুনিলে কীর্ত্তন যুড়াবে শ্রবণ ডাক অনুক্ষণ তাঁরে॥
আশী লক্ষ যোনী ভ্রমে, আসিযে এ মর্ত্ত্য ভূমে।
নরদেহ ক্রমে ক্রমে পা'লি জীব রে॥
দুঃসহ গর্ভ যাতনা, তাকি তোর মনে পড়েনা।
ভূমেতে পতিত হ'য ভুলে গেলি রে।
সে সব যাতনা আর, হবে নাকো পুনর্ব্বার।
নামব্রহ্ম কর সার, হবে কৃষ্ণ হবে।
ভ্রমি নানা স্থানে স্থানে, উৎকৃষ্ট মিষ্ট অন্বেষণে।
তত্ত্বকরি প্রাণপণে, তা কারণে, রে রসনে
তিক্তরস পরিহরি, সুপক্ক ভক্ষ তত্ত্ব করি।
কত করি যত্ন করি দিই রে রসনে॥
যে করে রে উপকার, প্রতিশোধ দাও তার।
এই মিনতি আমার, বল হ'র হবে॥
হরি নামের কি মহিমা, বেদাগমে নাহি সীমা।
বেদ, বেদ বক্তা ব্রহ্মা জানিতে নারে॥
হরি নাম সঙ্কীর্ত্তন, দেবের দুর্গত ধন।
নাম সত্য নিত্য তত্ত্ব গুরুদত্ত রে॥
নাম যপ নাম ভজ, হরি গুণ গানে মজ।
অন্তিমে শ্রকৃষ্ণাঙ্গজ, লাজে যাবে ফিরে॥
একমুখে রাম নাম, করি হর অবিশ্রাম।
না পুরিল মনস্কাম, নাম যপি রে

হরিনামের কারণ, হলেন হর পঞ্চানন।
পঞ্চমুখে অনুক্ষণ গান করে রে ॥
নামে বাম দেব যোগী, সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী।
হরি নামে অনুরাগী, রাগানুগাভরে ॥
সুধা হ'তে কত সুধা, নামে হরে ভবক্ষুধা।
নামেতে জন্মেনা দ্বিধা, শ্রদ্ধা বাড়ে রে ॥
কহে দীন খগবর, কৃষ্ণ ব'লে কষ্ট হর।
নষ্ট বুদ্ধি পরিহর, স্পষ্ট বলি রে ॥
শয়নে স্বপনে হরি, ধ্যানে হরি জ্ঞানে হরি।
সুখে মুখে বল হরি, হরষ অন্তরে ॥

[১০৫] রাগিণী বাহার—তাল একতালা

দীননাথ এ কেমন হে, দীনের প্রতি চহিলে না।
দীনহীন ক্ষীণ, আমি পরাধীন, সদা ভাবি দিনের ভাবনা।
কবে দীনবন্ধু, ভব কৃপাসিন্ধু, বারি এক বিন্দু পাব প্রার্থনা।
দীনহীন জীবে, কবে দিন দিবে, দনুজারি হরি বলনা ॥
গত সে সুদিন, আগত কুদিন, সে দিনে এ দীনে ভুলোনা।
দুর্দ্দিনের ভার, দরিদ্রের আর, কে লবে দয়াময় বিনা ॥
মুরঅরি হরি, তুমি দনুজারি, দুষ্ট দমন কারী, কেলেসোণা।
কংশ ধ্বংস করি, উগ্রসেনে হরি, বৈলেদণ্ডধারী স্থাপনা ॥
দরিদ্রের ধন, ত্যেজে দুর্য্যোধন, বিদুরের পুরালে কামনা।
কহে দীনখগ, হবে কি এ ভাগ্য, করিব বৈরাগ্য সাধনা ॥

[১০৬] রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল একতালা

সমন ভবন দমন কারি, হে হে বিভু প্রভু শ্রীহরি।
ভক্ত জীবন, ভক্ত প্রাণ, ভক্তাধীন ভব কাণ্ডারী ॥
ভ্রমেতে ভুলায়ে ভবেতে আনি, ভব জলে ফেলে কর টানাটানি।
ভেসে উঠে খাই নাকানি চোপানি, ভয়ে ভীতচিত ভূভার হারী।
ভ্রমে ভোলা মন, প্রভু ভগবান, ভজন-সাধন ভক্তি বিহীন।
ভূতময় পঞ্চ প্রপঞ্চ জীবন, আশা ভরসা চরণারারি ॥
ভুবন বিখ্যাত, ভুবন মোহন, ভূদেব ভূধর, ভূভার হরণ।
ভব পারাবারে নাই কোন জন, ভগবান বিনে ভবের কাণ্ডারী ॥
ভদ্রাভদ্র কর দণ্ডে দণ্ডে, ভিষক ভেষজ তুমি ব্রহ্মাণ্ডে।
ভবে ভেলা দেহ খগ পাষণ্ডে, ভূলোকে গোলকে ভ্রমিবে ভেরী ॥

[১০৭] রাগিণী ইমনকল্যাণ—তাল কাওয়ালি

আমার মন মজ হরি চরণে, ডাকবে রসনা যত্নে নন্দের নন্দনে।
হরি নামে কতই গুণ, নাই জানে পঞ্চানন, অদ্যাপি করেন পঞ্চবদনে॥
মুখে বল হরি হরি, ভব জ্বালা পরিহরি, তরিবে রে ভব বারি নামের গুণে।
হরি নামের গুণে রে ভাই, তরে গেল জগাই মাধাই।
নবদ্বীপেগৌর নিতাই তরালেন পাষাণ্ড গণে।
কহিছে খগবল্লভ, নামের গুণ অসম্ভব ধ্রুবলোকে গেলেন ধ্রুব, নাম স্মরণে॥

[১০৮] রাগিণী আড়ানাবাহার– তাল কাওয়ালি ঢিমাতেতাল

ওরে জীব কেনভাব আর, অনিবার। শ্রীহরি ভবকাণ্ডারী ভবার্ণব কর্ণধার॥
এ কলি কলুষ ঘোরে, আর কে তরাতে পারে।
যাবে যদি ভব পারে, কর রে তার প্রতিকার॥
মুখে বল দীনবন্ধু বিন্দুবোধ হবে সিন্ধু।
তিনি ত্রিজগৎ বন্ধু, পূর্ণেন্দু নন্দকুমার॥
পরশিয়ে শ্রীচরণ, কাষ্ঠতরী হ'ল স্বর্ণ।
গুণাতীত সে নির্গুণ, সর্ব্বগুণ মূলাধার॥
অহল্যা গৌতম শাপে, পাষাণী হইয়ে থাকে।
শ্রীচরণ দিয়ে তাঁকে, অনায়াসে কৈলে উদ্ধার॥
প্রহ্লাদে বিপদে রক্ষে, কৈলে অগ্নি সর্প মুখে।
দৈত্যবর কোপে কেঁপে, বলে কৃষ্ণ কই তোমার॥
ভক্তের বাঞ্ছা পূরাতে অবতীর্ণ স্তম্ভ হ'তে।
বক্ষ বিদার নখেতে, নরসিংহ অবতার।
অজামিল ছিল পাপী, নাম যপি হ'ল তপী।
জলে শিলা ভাসায় কপি, সর্ব্বব্যাপী লীলা তাঁর।
নবদ্বীপে গৌর নিতাই, তরাইলেন জগাই মাধাই।
সঙ্কীর্ত্তনে মাতি গোঁসাই প্রেম তরঙ্গে দেন সাঁতার॥
হরি নাম ক্রিয়া কর্ম্ম, নাম ব্রহ্ম নাম ধর্ম্ম
নাম ল'লে নাই পুনর্জ্জন্ম, নাম সংসারের সার॥
খগ কহে রে সংসারী, মুখে বল হরি হরি।
হরি নামে যাবে তরি, নাই শমনের অধিকার॥

[১০৯] রাগিণী মিশ্রঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল একতালা

কেন মন, অকারণ, মজ ভ্রান্তে।
যায় দিন, দিনের দিন, একবার ডাক রে শ্রীকান্তে॥

অসার সংসার প্রলয় জলধি, মায়া তরঙ্গ বাড়ে নিরবধি।
কিসেতে তরিবে গভীর জলধি. সতত কর রে তাহার চিন্তে॥
দুস্তার পাথার মায়ার সাগর, ষড়রিপু তাহে অতি ভয়ঙ্কর।
কুৎসা কচ্ছ মৎস্য, নানা জলচর, হিংসা অহঙ্কারে পার না অন্তে।
অতল পরশ এভব বারি, বিপদে শ্রীপদ সে বারিতে তরী।
আপনি ক্ষেপনী শ্রীহরি ধরি, তাঁর কৃপায় ভয় না হয় কৃতান্তে॥
কহে দীনহীন পন্নগাশন, ভব পারের কর এই আয়োজন।
গুরু দত্ত ধন, কর রে সাধন, স্মরণ মনন চিত্তে একান্তে॥

[১১০] রাগিণী মিশ্রমলতান—তাল একতালা

কেন রে দুরন্ত, ও মন অশান্ত, না চিন্ত অচিন্ত্য চরণ।
ভয় ভঞ্জন, ভব কারণ, ভবাব্ধি পোত, সেই ত শ্রীনাথ, অনাথ আশ্রিত তারণ॥
ষড়রিপু বশ, হ'লে রে মানস, কিসে খণ্ডে ভব বন্ধন।
এ কলি কলুষ, হইবে নাশ, ভাব সে কংশ ঘাতন।
অমূল্য অতুল, শ্রীপদ রাতুল, চতুর্ব্বর্গ ফল কারণ।
করিয়ে সমাধি, ভাব নিরবধি, সর্ব্বাধি আদি নিবারণ।
পঞ্চভূত কৃত, এ দেহ অনিত্য ভূতগত অকারণ।
লভেনা শান্তি, সতত ভ্রান্তি, ক্রমে ক্ষীণ কান্তি মূঢ় জন॥
এ দেহ নশ্বর, জান না কি নর, জন্ম ল'লে হয় মরণ।
কহে খগপতে, ভাবয় শ্রীপতে, ত্রাহি মাং, পতিত পাবন॥

[১১১] রাগিণী সিন্ধু—তাল ঠুংরি

হরি নাম সুধা রস, পিয় পূরি মানস, অলসের বশে কাল হ'রনা।
হরির সহস্র গুণ, শ্রীহরি নামের গুণ, তুলে তুলে নামের গুণ পেলে তুলনা॥
সত্যভামা ব্রত ছলে, শ্রীকৃষ্ণেরে তুলে তুলে।
মণিরত্ন আদি দিলে, তুল টলে না॥
তুলসী পত্রে লিখি হরি, দিলেন ধরি তুলোপরি।
হ'রি হ'তে নাম ভারি, সেই হ'তে জানা॥
লইলে শ্রীহরির নাম, পূর্ণ হয় মনস্কাম, প্রাপ্ত হয় কৈবল্যধাম, বেদে বর্ণনা।
কর শ্রীহরি কীর্ত্তন, শুন হরিগুণ গান, হরি ভিন্ন অন্য কোন রসে মজনা॥
বাসনায় রসনা যন্ত্রে, সাধনা শ্রীহরি মন্ত্রে, সুস্বরে সুকণ্ঠ তন্ত্রে, দিয়ে মূর্চ্ছনা।
ছয় রাগে অনুরাগে, ছত্রিশ রাগিণী যোগে, তালে লয়ে দ্রুত বেগে, হরি সাধনা।

হরের্নামৈব এই কথা, কলৌনাস্তেব গতিরন্যথা, তপস্বী ঋষির গাথা গীতা বর্ণনা।
তিনবার হবে হরে, বলিলে কলুষ হরে, হরি ব'লে উচ্চৈঃস্বরে হরে বেদনা ॥
হরির-নাম অগতির গতি, নামে কর রতি মতি, নাম কর নিতি নিতি, দিবারাতি ছেড না।
কহে দীন খগপতি, ভবধব পশুপতি, কেবল হরিনামে মতি, রতি টলেনা ॥

[১১২] রাগিণী সাহানা—তাল একতালা

কর রে সাধন (মন)। জিহ্বা যন্ত্রে, অবিশ্রান্তে গুরুদত্ত ধন ॥
হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম ব নারায়ণ ॥
কলি যুগে নর হরি, নামরূপে অবতরি, হরি হয়ে বলেন হরি শচীর নন্দন।
নাহি ক্রিয়া, নাহি কর্ম্ম, কলিযুগে নাম ব্রহ্ম, না হইবে পুনর্জ্জন্ম, কর সঙ্কীর্ত্তন ॥
দেহ মধ্যে মন রাজা, ইন্দ্রিয় সমূহ প্রজা, মনতেজা, হ'লে সোজা, অজপা ভজন।
যদি থাকে পুণ্য অংশ, রিপুগণ হবে ধ্বংশ, হবে জীব পরম হংস, অংশ জনার্দ্দন ॥
হরি বলিতে অলস, কর'না রাত্র দিবস, কহে দীন খগদাস, জপ অনুক্ষণ ॥

[১১৩] রাগিণী মিশ্র খাম্বাজ—তাল একতালা

কালের বশে যায় কাল পরকাল ভাবনা।
একি রে জঞ্জাল, কোলে সে কাল, মনে বুঝি পড়ে না ॥
ও নাম লইতে নাহি কালাকাল, কাল হবে কাল কাটাও না কাল।
জিহ্বাযন্ত্রে ডাক তাহাবে ত্রিকাল, কাল ভয় রবে না ॥
জননী জঠরে ছিলে যে কালে, ভেবে দেখ দেখি এলে কি ব'লে।
কাল পেয়ে শেষে সকলি ভুলিলে, ঘটিল কাল ঘটনা ॥
কালী দাও কেন মস্তকের চুলে, পড়িয়ে আর কালের জালে।
মহাকাল বসে হাসে ত্রিকালে, কাল বাজে সহেনা ॥
ক্রীডা বশে আর গেল ব কাল, যুবায় যুবতী বশে হয় কাল।
খগ কহে শেষে হবে জরা কাল, অন্তিমে কাল তাডনা ॥

[১১৭] রাগিণী সাহানা—তাল মধ্যমান

উন্মত্ত মন বারণ, কারণ শুন।
বিষয় অরণ্যে কেন ভ্রম রে অকারণ (যেমন ভ্রমে দুর্গমে হারাবে জীবন) ॥
সুত সুতা জ্ঞাতি ভ্রাতা, জামাতা, স্বজন, মমতা মায়ালতায় হইবে বন্ধন।
খল শার্দ্দূল দল তম গুণ মন, গৃহিনী সাপিনী ফণা তুলি করে গর্জ্জন ॥
অশ্বত্থ তরু দেবদারু, উচ্চ গুরুজন, প্রফুল্ল ফুল নারীকুল, আকুল করে মন।
চিন্তা দাবানলে, চিত্ত সদা করে দহন, দুষ্ট বড, ষড়রিপু হিংসক পশুগণ ॥

কুসঙ্গ কুরঙ্গ রঙ্গ সতত করে দেখ, পাতক জম্বুক ভেক, অধর্ম্ম রূপী বক।
গাত্রদাহ মায়ামোহ শোক কণ্টক, বন গিরি পরিহরি, কর হরি সাধন ॥
বন ত্যজ রে নিলাজ, মূঢমন মাতঙ্গ, বৈরাগ্য আরোগ্য ক্ষেত্রে কর রে সাধু সঙ্গ ॥
নির্ম্মাল্য ফল মূলে শীতল হবে অঙ্গ।
কাল কেশরী, যাবে ফিরি, শুনি হরি কীর্ত্তন ॥
গুরু মন্ত্রের অঙ্কুশাঘাতে, শিক্ষা পাবি রে মন।
বিবেক ধার্ম্মিক ধামে, পাবি রে দিব্যাসন ॥
আনা গোনা, আর হবে না, হরি ভেবে হবি হরি তেলাপোকা লক্ষণ ॥
(ক'রে সৎসঙ্গ, তেলাপোকার অঙ্গ, হয় কাচপোকার বরণ।)
ইহা মুক্ত ফলদেবী সাধন কর তত্ত্বমসী জ্ঞান শাণ তমনাশি উদয় হবে হৃদেতে।
কলুষ হইবে নাশ নাম অভ্যাসেতে, কহে খগে অনুরাগে বশে আন মন ॥

[১১৫] রাগিণী ভৈরবী—তাল কাওয়ালি

বিশ্বপতে তবাগ্রেতে এই নিবেদন।
অন্তিমে শ্রীহরি নাম থাকে হে স্মরণ ॥
কপালে ঘটেনা ঘটে, নিবেদি তব নিকটে।
জিহ্বা যেন সদা রটে গঙ্গা নারায়ণ ॥
সে সময়ে হে দৈত্যারি, কফে কণ্ঠ হবে ভারি।
বলিতে না পারি হরি দিও দরশন ॥
কালগত কালাগত, আর বা ভ্রমিব কত।
বুদ্ধি হত জ্ঞান হত, হত ধন জন ॥
খগ কয় আসন্ন কালে, যেন হে জাহ্নবী কূলে।
হরি ব'লে গঙ্গাজলে যায় হে জীবন ॥

[১১৬] রাগিণী সিন্ধু—তাল যৎ

ডাক রে বদন ভ'রে যতন করে সে ধনে।
ঐহিক সুখ, অন্তে মোক্ষ, প্রত্যক্ষ নাম স্মরণে ॥
নাম ব্রহ্ম, নাম ধর্ম্ম, নাম ধর্ম্ম, কে জানে।
নাম লাগি অনুরাগী, যোগী শ্রীপঞ্চাননে ॥
অসীমা নাম মহিমা, উপমা নাই ভুবনে।
হরি হ'তে নাম ভারি, দেখ ভুল প্রমাণে ॥
শ্রীগুরু দত্ত, পরম তত্ত্ব, শুন শুন শ্রবণে।
সে সুধাতে হরে ক্ষুধা, দ্বিধা জন্মেনা মনে ॥

হরি ভিন্ন অন্য গতি নাই এ ত্রিভুবনে।
কহে খগ, অনুরাগ, কর যোগ সাধনে ॥

[১১৭] রাগিণী ললিত—তাল জলদ তেতালা

এ বিপদে বিশ্বপতে, তোমা ভিন্ন নাই গতি।
সার জেনে, শ্রীচরণে, এ দীনে করে আরতি ॥
শুন হে জগত স্রষ্টা, ক'রে বহুবিধ চেষ্টা, না মিটিল ধন তৃষ্ণা
তাই ক'রে মন নিষ্ঠা, ডাকি হে তোমারে ॥
এ বিশ্ব রাজ্য তোমার, তুমি বিশ্ব মূলাধার।
করিয়ে সূক্ষ্মবিচার, দীনে দেহ অব্যাহতি।
ঘোর সংসার জলধি, তরঙ্গের আতঙ্কে কাঁদি।
আছে মায়াজাল ফাঁদি, আমারে বেষ্টন ক'রে ॥
কি রূপে হইব পার, জানিনা ভজন সাধন।
তোমা বিনে কেবা আর, খগেন্দ্র কবে মুকতি ॥

[১১৮] রাগিণী কেদারা—তাল আড়াঠেকা

সাধনের ধন হরি, সাধ তারে সাধ করি।
সাধ রে সর্ব্ব শক্তি রে, সাদরে দিবা সর্ব্বরী ॥
সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বজীবে সম স্নেহ।
সর্ব্বশক্তি স্থূল দেহ, সাকার আকার ধারণ করি ॥
সাধি [illegible] সাধনা সিদ্ধ, সাধন পরম আরাধ্য।
সাধ মনে হয়ে শুদ্ধ, সাধ্য মতে [illegible] করি
সংসারের [illegible], হরি নাম সঙ্কীর্ত্তন।
রসনা সাধ রে [illegible] [illegible] কর ॥
সচেতন হয়ে না, [illegible] [illegible] [illegible]।
কহে দীন খগেশ্বর, [illegible] রে শান্তি [illegible] ॥

[১১৯] [illegible]

বৃথা কাজে যায় দিন।
(দেখ) গেলে এ সুদিন হবে রে দুর্দিন, কি করিবে সেই দিন
দিন যায় একদিন ভাবনা, এদিন তো চির দিন রবেনা।
এ দিনে সে দিন মনে পড়ে না, হয়ে আছ দীনের দীন ॥

দিনে দিনে দেখ দিন খোয়ালে, দিনের অধীন আসিয়ে হ'লে।
উচ্চৈঃস্বরে দীননাথ, ব'লে, ডাকিলে না এক দিন ॥
দিন দিন দেহ হতেছে ক্ষীণ, সে পদ সম্পদ হইও না বিহীন।
খগ বরে কহে নহে সে কঠিন, হও যদি তাঁর অধীন ॥

[১২০] রাগিণী মিশ্রজয়জয়ন্তী—তাল একতালা

কেন বৃথা চিন্তা কর মন (অকারণ)।
কা চিন্তা ওরে কর রে চিন্তা, চিন্তামণির শ্রীচরণ ॥
সে ধনে যে জনে পারে রে চিনিতে , তার নাহি হয় ভবের চিন্তে।
ত্রিজগতে পারে সকলে চিনিতে, চিন্তাজয়ী সেইজন ॥
জোড় করে খগবরেতে চিন্তে, সে চিন্তে, সে চিন্তে চিন্তিলে তরিবে অন্তে।
সদা চিন্ত চিন্তামণি পদপ্রান্তে, কা চিন্তা বল মরণ ॥

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্তোত্র

[১২১] রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালি

জগত জীবন জগবন্ধু, কৃপাময় করুণা সিন্ধু।
শুনেছি পুরাণে কয়, পুনর্জ্জন্ম নাহি হয়, হেরিলে তোমার মুখ ইন্দু ॥
এ'ঘোর ভবাব্ধি বারি, হেরি হরি ভয়ে মরি।
ত্যজি ছল বল বল, কিসে তরি সিন্ধু ॥
তোমার কটাক্ষ হ'লে, তরি বারি অবহেলে।
বাহু তুলে যাই চ'লে বোধ করি বিন্দু ॥
লীলা করেন নারায়ণ, লীলাচলে অনুক্ষণ সঙ্গে ভদ্রা বলভদ্র সুদর্শন।
ব'সে বিভু শ্রীমন্দিরে, রতন বেদির পরে, মোক্ষ ধাম, ক্ষেত্রধাম, দক্ষিণেতে সিন্ধু ॥
ধন্য সে অক্ষয় বট, ধন্য সে উড়িষ্যা মঠ, নাহি তথা খল শঠ, লম্পট কপট।
ধন্য সে আঠার নালা, পুরী মাঝে লক্ষ শিলা, আনন্দবাজারে মেলা, মিলি ভাই বন্ধু ॥
ধন্য সে উড়িষ্যা দেশ, নাহি তথা দ্বেষাদ্বেষ, বর্ণভেদ নাহি করে সকলেতে বন্ধু।
চণ্ডালে আনিলে অন্ন, বিপ্রেতে করে গ্রহণ, জগবন্ধু ধন্য ধন্য, দরিদ্রের বন্ধু ॥
কখন বা বৈকুণ্ঠে, কখন কালিন্দী তটে।
কভু যশোদা নিকটে, যুগল কর পুটে ॥
কখন বা কুরুক্ষেত্রে, কখন বা শ্রীক্ষেত্রে।
কখন বা বটপত্রে, ক্ষীরোদ সিন্ধু ॥

কৈবল্য অমূল্য ধন, ব্রহ্মা পাইয়ে কারণ।
কুকুর বদন হ'তে লইলেন এক বিন্দু॥
'আপনারে ধন্য মানি, আপনি সে পদ্মযোনা।
জগবন্ধুর কাহিনী, কহে খগইন্দু॥

[১২২] রাগিণী মিশ্রললিত—তাল একতালা

(ব্রজ বুলি)

জগত জীবন জগত পতে যপত্‌ু মানসে রে।
জগত সার, নন্দন, কুণ্ডার কোই আর নেহি রে ([illegible])॥
তরুণ অরুণ, যুগল চরণ, বাজেত নূপুর রুণ রুণ রুণ।
কটিতে শোভিত পীত বসন, কণ্ঠে কৌস্তুভ হার রে॥
সবক অ'দ পরম ধরম, কভু কভু শ্যাম, কভু ভয়োরাম।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম, চতুর্ভুজ ধারী রে॥
কভু বংশীবট কভু কুরুক্ষেত্র, দশবিধ রূপ তুঁহি হো পবিত্র।
নীলাচল তুঁহারি ক্ষেত্র, ইন্দ্রদ্যুম্ন মনোহারী রে॥
বৈকুণ্ঠ লালা করকে তুচ্ছ, শীস মকুট ময়ূরপুচ্ছ।
পঙ্ক্তি কহে বাইশ পাবচ্ছে। বত্নবেদি [illegible] রে।

[১২৩] রাগিণী সিন্ধু—তাল [illegible]

হের রে নয়নে, রজত বরণে নব ঘনে, একাসনে যুগল বনে।
তরুণ অরুণ জিনি, শ্রীপদের কি নিছনি, নূপুর মধুর ধ্বনি তানে।
কটি তটেতে কিঙ্কিণী, শোভে মণি শ্রেণী জিনি, এমন নিছনি নাহি আনে।
হলধর বংশীধর নীলাম্বর, পীতাম্বর শোভিত বিদ্যুত ঘনে॥
যুগলের বাহুদ্বয়ে, শোভে হীরক বলয়ে, কনিষ্ঠায় অঙ্গুরী রত্ন সাজে।
চন্দন চরচিত, দোঁহা অঙ্গ অঙ্কিত, মোহিত সৌরভ ঘ্রাণে।
কণ্ঠে লুণ্ঠে বন হার, নাশায় শোভে বেশর, মুক্তার গাঁথা তাহে স্বর্ণে।
অলকা আবৃত ভা. , কুণ্ডল শ্রুতি মূলে সতত দোলে পবনে॥
অপরূপ নাম রূপ, ঘনশ্যাম রসকূপ, রসিকের ভূপ ত্রিভুবনে।
সিঙ্গে বাজে অহরহ, রাগ রাগিণী সহ, বাঁশরী মূর্চ্ছনা ভরি তানে।
শিরেতে মোহন চূড়া, গুঞ্জা মালা তাহে বেড়া, বামে তেড়া চা'য়ে চরণ পানে।
খগ কহে সদা হেরি, নীলগিরি রজত গিরি, আঁখি ভরি, হৃদি বৃন্দাবনে।

[১২৪] বাগিণী মিশ্রখাম্বাজ—তাল কাওয়ালিখেমটা

হের হের হলধর। মুখচন্দ্র, জিনি চন্দ্র, নেত্রদ্বয় ইন্দিবর।
আহা মরি কি অঙ্গজ্যোতি, বামেতে শোভে রেবতী॥
যেন পশুপতি সতী, জটাধারী গঙ্গাধর॥
কিবা রূপ অনুপম, রেবতী রমন রাম।
হলধর বলরাম, রাম রজত শেখর॥
জিনি তরুণ অরুণ, শোভা যুগল চরণ।
হের হরে ভক্ত মন, নখরেতে সুধাকর (শোভাকর)॥
অনন্ত না পায় অন্ত, কে জানে তাঁহার অন্ত।
সাক্ষাৎ প্রভু অনন্ত, ক্ষমাবন্ত অন্তরেশ্বর॥
ভাবিয়ে যাঁহার ভাব, দেবের দেব মহাদেব।
তুচ্ছ করিয়ে বৈভব, ভাবেন দ্বাপর অবতার (নাঙ্গলেশ্বর)।
ভাবিলে তাঁর শ্রীপদ, থাকেনা কোন বিপদ।
গদা যুদ্ধ বিশারদ, কুরু গুরু সর্ব্বেশ্বর॥
জগন্নাথের জ্যেষ্ঠভাই, পুরুষোত্তমেতে বলাই।
নবদ্বীপেতে নিতাই, সঙ্কীর্ত্তনে মোহকর॥
বামে হেলায়ে শ্রীঅঙ্গ, রেবতী অঙ্গেতে অঙ্গ।
হেরিলে হয় শীতল অঙ্গ, কহে দীন খগবর (যুড়িয়ে যুগল কর)॥

[১২৫] রাগিণী ইমনকল্যাণ—তাল মধ্যমান তেতালা

এ দেহ অনিত্য, পঞ্চভূত কৃত মাত্র।
নশ্বর এ দেহ নর কেন দম্ভ কর এত॥
কেবা পুত্র কেবা যায়া, সকলি অলীক মায়া।
সম্বন্ধ থাকিতে কায়া, ছায়া নাট্যালয়॥
কর যত অভিনয় সকলি হইবে লয়।
যেন তুমি রঙ্গ ভূমি ক্রমেতে হইবে হত॥
কোথা যাবে গাম্ভীর্য্য, বাণিজ্য ঐশ্বর্য্য রাজ্য।
আশ্চর্য্য গর্ব্ব মাৎসর্য্য, রাজকার্য্য মন্ত্রিত্ব॥
বৃথা ধনের গরিমা, অসীমা নাম মহিমা।
দেহ গেহ মনোরমা, কালেতে হইবে চ্যুত॥
রূপ যৌবন লাবণ্য, হইবে রে ছিন্ন ভিন্ন।
ক্রমে কায়া হবে শীর্ণ যঘন্য আকৃতি॥

দেখ দেখি মনে ভেবে, কি ক'রে গেলে এ ভাবে।
শব হ'লে সব যাবে, পঞ্চ পঞ্চেতে মিশ্রিত ॥
রয়েছ কি মনে ভাবি, হবে জীব চিরজীবী।
দুঃসহ ভাবনা ভাবি, হয়েছ মোহিত ॥
কহে দীন খগপতি, কর রে জীব সুমতি।
ভাব সেই বিশ্বপতি, অনাদি আদি অচ্যুত ॥

[১২৬] রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালি

একভাবে ভাব হরিহর (রে নর) শিব মাধব মুরহর।
হেরগে পুরাণ বেদ, নাহি এতে ভেদাভেদ, হরি হ'রেতে অভেদ, অন্তর বাহির ॥
পিণাকপাণি, চক্রপাণি, বেণু গান তান মধুর।
রাগিণী সহিত রাগে, কখন বা বাজে শিঙ্গে,
ডিমিকি ডিমিকি ডিমি বাজিছে ডম্বুর ॥
বৈকুণ্ঠ নাথ, কৈলাশ নাথ, বিশ্বনাথ বিশ্বেশ্বর।
কাশীবাসী গোকুল নিবাসী ভালে শশী; অলকা সুন্দর ॥
ভক্তজন মনহারী, নীলগিরি, রজতগিরি, চূড়াধারী, জটাধারী, হর গঙ্গাধর।
ঢুলু ঢুলু লোচন, বঙ্কিম নয়ন, গরুড়াসন হরি কখন বৃষভ'পর ॥
যপ সেই মহামন্ত্র, দেহ হইবে পবিত্র, ত্রিপত্র তুলসী ধর।
পাইবে পবিত্র ধাম, বল শিব রাম রাম, শিব শিব রাম রাম, কাল পরিহর ॥
আদ্যাশক্তি বগলা, ক্ষীরোদশায়ী কমলা, চঞ্চলা চপলা দোঁহার।
কহে দীন খগপতি, পশুপতি, রমাপতি, শ্রীচরণে রতি মতি, স্তুতি নতি কর ॥

শ্রীমন্মহাদেব স্তোত্র

[১২৭] রাগিণী ভৈরবী—তাল কাওয়ালি

সুখে মুখে, মনসুখে, বল রে হর (নর)।
বল বোম্, যাবে ভ্রম, অন্তর বাহির ॥
বন্দী হ'য়ে মায়া ফাঁসে, মজিযে বিষয় বিষে।
মহাকাল হাসে ব'সে, তিলেক না হের ॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহ, মদ মাৎসর্য্য সহ।
এ রভ, নাশিছে দেহ, উপায় কর ॥

পাইয়ে মানব জন্ম, অসুখে গেল আজন্ম।
না ভাবিলে পরম ব্রহ্ম, তারকেশ্বর ॥
কহে দীন খগপাল, বোম্ বোম্ ব'লে বাজাও গাল।
হরশিরে লয়ে ঢাল, জাহ্নবী নীর ॥

[১২৮] রাগিণী সিন্ধুদেশ—তাল ঠুংরী

দুখ পরিহর, বল হর হর হর, ওরে রসনা।
অলস ক'রনা রূপ ধ্যানে ধরনা ॥
শুনরে যুগল কর, লইয়ে জাহ্নবী নীর।
ত্রিপত্রে একত্রে ক'রে শিবে ঢালনা ॥
আমার যুগল নেত্র, সদা হের শিবনেত্র,
অনায়াসে হবি পবিত্র, যত্র করনা (সাধনের) ॥
দেহ মাঝে রাজা মন, তুমি ক'রে আয়োজন।
দেবের দেব পঞ্চানন' ধ্যানে ধরনা ॥
যথা তথা ভ্রম পদ, জাননা হবে বিপদ, পাবি যদি উচ্চ পদ, কাশী চল না।
কহে দীন খগপতি, থাকে পদে রতি মতি, এই প্রার্থনা ॥

[১২৯] রাগিণী সুরটমল্লার—তাল একতাল

বোম্ বোম্ বোম্, ববম, তারকেশ্বর হর (বল)।
বিষয়ে মজিয়ে দিন যায় বসে, কি কর রে মূঢ় নর ॥
রসনা বাসনা, পুরাণা পুরাণা, বল বল দিগম্বর।
মন দেহে রাজা, ইন্দ্রিয় প্রজা, তারে বশ তুমি কর ॥
ডাক রে একান্তে গৌরীকান্তে, ভুলনা ভুলনা কখন ভ্রান্তে।
কি করিতে পারে অন্তে কৃতান্তে, ভ্রান্তে যদি চিন্তা কর ॥
জাননা রে মন, বাদী ছয় জন, তারে বিসর্জ্জন কর।
পঞ্চভূতে মিলি, করিতেছে কেলি, খোলা পাইয়ে নবদ্বার ॥
হও সচেতন, লভিবে চেতন, আনন ভরিয়ে বল পঞ্চানন।
সে নাম কীর্ত্তনে, মজাও মন, সে ধনেরে ধ্যানে ধর ॥
মাতা পিতা সুত, ভ্রাতা দারা সুহৃদ কেহত নহে কাহার।
সুখের বিভাগ, আছে লাভালাভ, এই হেতু আশা কর।
তুমি হলে শব, তাহারা সব, ঘৃণায় ছোঁবেনা বলিয়ে শব।
খলি খুলি খালি, লইবে বৈভব, শব শিব অধিকার।

অসার সংসার, অতি ঘৃণাকর সাগর, মাঝে সন্তর।
হবে যদি পার, দুস্তর সাগর, শঙ্কর নাবিকে ধর॥
ব'লে হর হর, পাপ তাপ হর, করে কর লহ জাহ্নবী নীর।
হর শিব' পর ঢাল নিরন্তর, কহে দীন খগেশ্বর॥

[১৩০] রাগিণী সিন্ধু—তাল মধ্য

রসনা বাসনা ভরি, বল ত্রিপুরারী।
(দেহ) ত্রিনেত্রের, শিরে ত্রিপত্র, সহিত গঙ্গা বারি
আশুতোষ, সে মহেশ, ভূতেশ, জটাধারী'।
ত্যজি বাস, কীর্ত্তিবাস, চিতাভস্ম সার করি
যাবে জ্বালা, এই বেলা, বল ভোলা বদন ভরি।
বলিলে বোম, ঘুচিবে ভ্রম, যম যাবে হেরি ফিরি॥
কদর্য্য এই সুখৈশ্বর্য্য, মাৎসর্য্য পরিহরি।
ভাব জীব সদা শিব, কি দিবা কি সর্ব্বরী॥
দেব দেব মহাদেব, বৈভব তুচ্ছ করি।
কহে খগে, মনুরাগে, বৈরাগ্য আশ্রয় করি॥

[১৩১] রাগিণী [illegible]—তাল [illegible]

ডাকরে সঘনে, হর পঞ্চাননে (প্রফুল্ল বদনে)।
দেবের দেব, মহাদেব, পিনাক পাণে।
রজত গিরি, ত্রিশূল ধারী বৃষ বাহনে।
অসার পদ্ম সংসার, ভাবনা মনে।
সব অনিত্য, শিব সত্য, [illegible] পুরাণে
ঘুচাও ভ্রম, [illegible] বোম, জীব সঘনে।
[illegible] জীব, ভাব শিব, শয়নে স্বপনে।
মজরে মানস, আশুতোষের গানে।
কহে খগ, কর যোগ [illegible] যোগী চরণে॥

[১৩২] রা[illegible] [illegible] জ—তাল আড়াঠেকা

হেলায় হায় যায় বয়ে কাল।
মন খুলে, ডাক ববম ব'লে, বাজাইয়ে গাল।
বাল্যকাল ক্রীড়া বশে, প্রগণ্ড পকাণ্ড রসে।
যুবাত্তে যুবতী বশে, বার্দ্ধক্যে বেহাল॥

সংসারে হ'য়ে আবৃত, ভুলেছ রে নিত্য তত্ত্ব।
ভজ শিব নিত্য নিত্য, লয়ে যপমাল ॥
অধৈর্য্য জীব ধর ধৈর্য্য, ত্যজ ঐশ্বর্য্য মাৎসর্য্য।
পাইবে রে সুখ রাজ্য, কাট মায়াজাল ॥
করিলে হে দৃঢ় ভক্তি, শক্তি পতি দিবেন মুক্তি।
শিব তন্ত্রে এই যুক্তি, কহে খগপাল ॥

[১৩৩] রাগিণী মিশ্রসাহানা—তাল একতালা

বোম, বোম, ববম, ব'লে, ডাক'রে বদনে।
কেন মন, অকারণ, ভ্রম বিষয় অরণ্যে ॥
হও কাশীবাসী, নাশি ভব জ্বালা, সুখে মুখে বল ববম্ বোম, বোম, ভোলা
তবে সে স্বরূপ। করিবেন করুণা, শিবা শব রূপে যেই চরণে ॥
হও শান্ত দান্ত, ত্যজিয়ে ভ্রান্ত, সুখে মুখে বল গৌরীকান্ত।
কি করিতে পারে অন্তে কৃতান্ত, দিলে মন সে ত্রিপুরান্ত চরণে ॥
বৃথা দিন যায় মায়ার বশে, মহাকাল দেখ হাসিছে বসে।
দিনান্তে, প্রান্তে ডাক কাশীবাসে, অনায়াসে কৈলাসে পাবে নিত্য ধনে ॥
মাতা পিতা ভ্রাতা বনিতা স্বজন কাম ক্রোধ আদি রিপু ষড জন।
ভ্রমেতে ভুলায় তোমার সাধন কহে দীনহীন পন্নগাশনে ॥

১৩৪ রাগিণী মিশ্রসিন্ধু—তাল পোস্তা

কাটালি কাল, হ'লে নাকাল, ভাবলি না সেকাল।
(জীব) দেখবে পরে, দুদিন হবে, আজ মোলে তুই কাল ॥
বাল্যকাল ক্রীড়ায় মতি, যুবা কালেতে যুবতি।
বার্দ্ধক্যে হ'লে হীনশক্তি, হবে কালা কাল ॥
বৃথা কাজে কাল কাটে, মলি ভূতের ব্যাগার খেটে।
চিত্রগুপ্ত হাতচিটে গুণচে রে ত্রিকাল ॥
লেগেচে কি কালের দিশে, কাজ হারালি কালের বশে।
মহাকাল হাসেন ব'সে, পেতে কাল জাল ॥
কুলেতে কালী দিও না, (মনুজ) কাল যায় তোর নাই চেতনা।
কাল দমনে ভাব না, কহে খগপাল ॥

[১৩৫] রাগিণী মিশ্র ঝিঁঝিট— তাল পোস্তা

বোম্ বোম্ ববম্ ব'লে ডাকরে সদা রসনা।
ও নাম লইতে জীব কভু অলস ক'রনা॥
গঙ্গাজল বিল্বদল, ল'য়ে হর শিবে ঢাল।
সুখে মুখে ববম্ বল, শমনের ভয় রবে না॥
হর হর দুখ হর, শোক হর তাপ হর।
এ অধমে কৃপা কর, নিবার ভয় ভাবনা॥
আশীলক্ষ যোনী ভ্রমে, আসিয়ে এ মর্ত্ত্যভূমে।
কি কর মন মোহ ভ্রমে, মানব জনম আর হবেনা॥
কহে দীন খগবর, তার হে তারকেশ্বর।
এ অধমে কৃপা কর, বিতর বিভু করুণা॥

[১৩৬] রাগিণী মিশ্র [illegible]

বোম্ ২ বব বোম্ বল বদনে, ভব যাতনা ভবে রবেনা।
ভাব জীব সদা শিব, জিনিবে রে শমনে।
বোম বোম ভোলা, কাঁধে মৃগ ছালা, গলে দুলিছে হাড়ের মালা।
ও নাম লইলে নাহি রয় ভব জ্বালা, কাশীধামী পিনাক পাণে॥
বোম ২ হর, শিরে জটা ভার, সদানন্দ আনন্দে সতত বিহর।
ভব তারণ কর্ত্তা তারকেশ্বর, তোমার মহিমা, বল বিভু কে জানে।
বোম ২ বব বোম, বব বোম বব বোম, ঘুচাও রে ভব জীব, মনের যতেক ভ্রম।
গাও গুণী তানা নানা, তোম তোম্ তোম তোম্, ধাকেটে তাক।
ধুম কেটে তাক, ধুম কেটে তাক মৃদঙ্গেনা, শুনে শুনে শুনে শুনে॥
ভাব কিরে জীব সদা ভাব শিব শিব,
কোথা পালাবে অশিব, বব শুন শিব শিব।
কহিছে খগবল্লভ, ভাব ধর সদাশিব, উচ্চে কর এই রব, রূপ ধর ধ্যানে॥

[১৩৭] রাগিণী [illegible] তাল [illegible]

বার ব্রত কর, বৃথা ঘুরে মর, হর হর মুখে বলনা।
লয়ে গঙ্গাজল পাত্র, মিশায়ে ত্রিপত্র, ত্রিনেত্রের শিরেতে ঢালনা॥
জাননা রে মন, শিয়রে শমন, কেমনে দমন করনা।
ত্যজিয়ে ভ্রান্ত বল গৌরীকান্ত, এ দিন তো একান্ত রবেনা॥

যাঁরে যপে নিরবধি, ইন্দ্রচন্দ্র বিধি, হেন নিধি পেয়ে ছেড়না ।
তাঁরে যতনে আরাধ্য, করি গাল বাদ্য, মায়া জালে বদ্ধ হইও না ॥
মন দেহে রাজা, ইন্দ্রিয় প্রজা, কুতন্ত্রি কুমন্ত্রি ছয় জনা ।
তারে ক'রে ত্যজ্য, সাজ নিজ রাজ্য, ঐশ্বর্য্য পাইয়ে ভুলনা ॥
কহে খগপতি, কর রে সুমতি, পশুপতি ব'লে ডাকনা ।
তিনি অগতির গতি, পার্ব্বতীর পতি, যাঁরে প্রজাপতি, ধ্যানে পায়না।

[১৩৮] রাগিণী সিন্ধুকাফি—তাল একতালা

বোম্ ও বব বোম্, ব'লে ঘুচাও জীব মনের ভ্রম ।
কি করিতে পারে তোমার অন্তকালে যম ॥
শিরে দিলে গঙ্গাবারি, তুষ্ট হবেন ত্রিপুরারি ।
শমন স্মরবে ঘুরি ফিরি, যেন বাঁশ বনেতে ডোম্ ।
আশী লক্ষ যোনী ভ্রমে, আসিয়ে এ মর্ত্ত্য ভূমে ।
কি কর রে মন ভ্রমে, তিনি দেবোত্তম ॥
আশী লক্ষ ব'রে পাওনা টের, সংসার চিঁড়েন বাইশ ফের ।
বলে হর শমন দূতের, খাটে না বিক্রম ॥
নাকাল হ'য়ে, কাটালি কাল, কহে দীন খগপাল ।
বোম্ বোম্ ব'লে বাজারে গাল, এতে নাইকো পরিশ্রম ॥

[১৩৯] রাগিণী পরজবাহার—তাল ঝাঁপতাল ।

দীনে কৃপা কর, হর গঙ্গাধর, দিগম্বর ।
অশিব নাশিয়ে শিব, জীবে নিস্তার ।
সর্ব্বজীবে ভাব সম, তুমি প্রভু দেবোত্তম ।
কে আছে তোমার সম, মনোরম কলেবর ॥
মহাযোগী যোগ বলে, যোগসিদ্ধ ভূমণ্ডলে ।
যজ্ঞেশ্বর নাম খুলে, দেব সকলে ॥
ত্যজিয়ে কৈলাশ কাশী, হইলে শ্মশানবাসী ।
অঙ্গে মাখ ভস্ম রাশি, কহে খগবর ॥

[১৪০] রাগিণী মিশ্রঝিঁঝিট—তাল কাওয়ালি

ভব ব্যাধির মহৌষধি, বাবা বৈদ্যনাথ ।
অনুপান, গুণ গান, নিদান বিহিত মত ॥

যার থাকে কর্ম্ম ভোগ, সে ভুঞ্জয়ে ভব রোগ।
হ'লে তব মনোযোগ, আরোগ্য নিশ্চিত॥
তোমায় স্মরণ মাত্র রোগীতে হয় পবিত্র।
কৃপা করিলে ত্রিনেত্র, তার শত শত॥
ওহে প্রভু কৃত্তিবাস, ঝাড়খণ্ডে তব বাস।
পুরাও জীবের আশ, তুমি বিশ্বতাত॥
তুমি ধন্বন্তরি বৈদ্য, তব সৃজিত ঔষধ।
ত্বংহি জগত আরাধ্য, কহে খগনাথ॥

[১৪১] রাগিণী চর্চরি ঝিঁঝিট — তাল ? স্তু

কি কব রে মূঢ় জীব, সদা ভাব সদা শিব।
মুখে মুখে বল হর, ত্যজিয়ে বিষয় বৈভব॥
মায়াতে হ'য়ে আবৃত, বিস্মরিলে নিজ তত্ত্ব।
রবে না সামর্থ্য অর্থ, শব হইলে যাবে সব॥
কোন দিন হবে আগতকাল, সদা ভাব মহাকাল।
এড়াবি কালের জাল, বদনে বলিলে শিব
প্রকাশিবে জ্ঞান নেত্র, হের নিত্য ত্রিনেত্র।
গঙ্গা নীর শিবে ঢাল রে জীব
অপার তাঁর মহিমা, কে করিতে পারে সীমা।
খগাধমে কর ক্ষমা, দেব দেব মহাদেব।

[১৪২] রাগিণী জয়জয়ন্তী — তাল ঝাঁপতাল

বিশ্ব ঈশ্বর জগদীশ্বর, মহিমা তোমার বেদে অগোচর।
সুরগণ সহিতে, শঙ্কর মহীতে, জীবেরে তরাতে যজ্ঞেশ্বর॥
কাশীবাসী কৈলাসবাসী, শ্রীঅঙ্গেতে মাখা ভস্মরাশি।
বৈভব ত্যজিয়ে শ্মশানবাসী, বহু গোপবাসী গোপেশ্বর॥
তুমি ভূতনাথ, তুমি বৈদ্যনাথ, ত্রিজগত তাত বিখ্যাত জগত।
বাংলগোড়ের অগ্রেতে, জীবেরে তরাতে তারকেশ্বর॥
পঞ্চভূত আত্মা তুমি পঞ্চানন, ভক্তভাবন ভক্তজীবন।
পঞ্চোপাসকের ধ্যানের ধন, পিনাক পাণি বাণেশ্বর॥
ত্রিভুবন মনরঞ্জন কারণ, ত্রিতাপ নাশক তুমি ত্রিলোচন।
গুণাতীত বিভু তুমি হে নিগুণ, কহে দীনহীন খগেশ্বর॥

[১৪৩] বাগিণী মিশ্রমঙ্গল—তাল কাওয়ালি

ধন্য ধন্য কল্যাণেশ্বর। তুমি হে উকার, মহিমা তোমার কি জানে মূঢ় নর ॥
ত্রিপুরারি, ত্রাণকারী, ত্রিতাপ হর হর, ত্রিনেত্র।
ত্রিপত্র মাত্র যোত্র হ'লে নিস্তার, ত্রাহি মাং তারকেশ্বর, তাপিতে তৃপ্ত কর।
তন্ত্র মন্ত্র যন্ত্র শাস্ত্র সার মাত্র হে হর, পশুপতি শক্তিপতি তুমি বিভু ঈশ্বর ॥
কাশীবাসী কৈলাশবাসী, বিভু ব্রহ্মরাশি ভালে অর্দ্ধশশি।
ঐশ্বর্য্য নাশি, হয়েছেন উদাসী, অঙ্গে ভস্মরাশি।
শ্মশানবাসী মহাযোগে বসি, আছেন দিবানিশি,
ভূতনাথ ভূতপ্রেত সঙ্গেতে বিহর ॥
বৈদ্যনাথ, প্রমথনাথ, অনাথনাথ, পশুপতিনাথ,
শ্রীপুরুষোত্তমে লোকনাথ, ত্রিজগততাত বিশ্বনাথ।
পার্ব্বতীনাথ, গৌরীনাথ, শৈলসুতা মাতা বিহরে জটা'পর ॥
পিনাকপাণি, ত্রিশূলপাণি জটাজুট মুকুট লম্বিত বেণী।
শ্রীঅঙ্গে রঙ্গে ফণা ধরি ফণী, সুপবিত্র শিবনেত্র উদ্ধতে চাহনি ॥
ধুতুরাফুলে কর্ণমূলে মরি কি নিছনি।
কণ্ঠে লুণ্ঠে হাড মাল মণি শ্রেণী জিনি, কটি আঁটি পরিপাটি বাঘাম্বর ॥
কর জুড়িয়ে যুগল, বাজাবে বগল, সুখে মুখে উচ্চৈঃস্বরে শিব শিব বল।
বিল্বদল গঙ্গাজল শিরোপরে ঢাল, অনায়াসে পাবিরে জীব চতুর্ব্বর্গ্য ফল ॥
ভব পারের ভেলা ভোলার চরণ যুগল, কহে খগে যোগ কর।
মনের সম্বল, বল শিব শিব জীব অশিব পারহব ॥

[১৪৫] বাগিণী মঙ্গল—তাল কাওয়ালি

অশিব নাশিয়ে বল শিব (শিব শিব)।
জগদীশ্বর হর সদা ভাব জীব ॥
গঙ্গাজল বিল্বপত্র, এই মাত্র চাই যোত্র।
জল পাত্র মাত্র হয় অতুল বৈভব, কখনা ক'রনা হেলা।
ভুলনারে মন ভোলা, সুখে মুখে ব'লে ভোলা, শমনেরে জিনিব ॥
বল বল বোম্ বোম্, ঘুচাও মনের ভ্রম,
তানা তানা তোম্ তোম্, সাধ সুর ঋখব।
মন প্রাণ ঐক্য ক'রে থাকরে সমাধি করে।
নয়ন মুদ্রিত ক'রে, হরে হৃদে হেরিব ॥

অনাদি আদি মহেশ, ধূর্জ্জটি ব্যোমকেশ,
দীনেশ অশেষ শেষ, বাহন বৃষভ।
খগের শ্রীপদে আশ, সদানন্দ আশুতোষ।
বর্ণনে অশক্ত ব্যাস, আমি কি বর্ণিব ॥

ব্রজ ভাষার সঙ্গীত

[১৪৫] রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালি

রঘুবর রাম কহ ভাই, এ জগমে আওর কোই নেই।
এ কলি কলুস ঘোর, ক্যা ধরেগা ভইয়া তোর,
সজোরসে কর সোর, কহ রঘুরাই ॥
বিশ্বামিত্রকে চিত, কর দিয়ে মোহিত, তাড়কা রাচ্ছসী মারি।
পাঁও পরশি তোরি, কাঞ্চন কাষ্ঠ তরী, পাষাণ মানবী হুই ॥
জনক জীউ কে কোদণ্ড, করদিয়ে খণ্ড খণ্ড, দূর দণ্ড পাষণ্ড ভাগাই।
শ্রীসীতা জাউ কর করি, বরমাল্য গলে ডারি, নারীকুল মঙ্গল গাই ॥
পিতা সত্য কারণ, চৌদবরষ বন, পঞ্চবটীমে পুন, সীতা খোয়াই।
পক্ষিবর জটায়ু, সন্দেশ বাতায়ু, মরকট ঠাট ভিড়াই ॥
পবনকে নন্দন, ভেজি অশোক বন, সীতাকে দরশন পাই।
ধন্য ধন্য ধনুধারী, রাবণ নিধনকারী, সুর নর তোর গুণ গাই ॥
সদা কহ রাম রাম, তারকব্রহ্মকে নাম, দেহ জি তুলসী দাম, সিঙ্গার বানাই।
[illegible] চরঙ্গ ফুল আকে, ঝালর বনায়েকে, খাতে হিলাও সংগে, পক্ষি বাতাই ॥

ষড়ানন স্তুতি

[১৪৬] রাগিণী বাগেশ্রী—তাল আড়াঠেকা

মনোহর কলেবর, হের শিখির উপর।
হেরে আঁখি পাপ নাশে কবে করি ধনুঃশর ॥
চরণ যিনি অম্বুজ, আজানু লম্বিত ভুজ।
কটি হেরি পেয়ে লাজ, কেশরী ভাবি অস্থির ॥
কন্দর্প পায় দুঃখ, হেরিলে কুমার বক্ষ।
কণ্ঠেতে মণি হীরক, নাসায় শোভে বেশর ॥

মহাবলী ষড়ানন, দেবসেনা অগ্রগণ্য,
যুদ্ধ কৌশলে নিপুণ, রসময় রসিক শেখর
কহে দীন খগপতি, করিলে কুমার স্তুতি।
বন্ধ্যা হয় পুত্রবতী, যৌবনে হয় মুক্ত নর।

শক্তি বিষয়ক গীতি

(আগমনী)

[১৪৭] রাগিণী বিহঙ্গড়া—তাল কাওয়ালি

গিরিবর যাও হর ভবনে, স্বপনে হেরেছি সে উমা ধনে।
কি করি গিরি, কেমনে ধৈর্য্য ধরি,
বিনে প্রাণের কুমারী, বাঁচিনে আর পরাণে॥
হে গিরি রাজন, তুমি ত পাষাণ, পাষাণেতে তব হিয়া করেছ বন্ধন।
ভাঙ্গড়ে কন্যা সঁপিলে বলে কুলীন, কৃত্তিবাসের নাহি বাস, সদা ফেরে শ্মশানে॥
ধুতুরা করে ব্যবহার অম্বর নাই দিগম্বর, উমায় পরায় বাঘাম্বর, শুনে বাঁচিনে।
পার্ব্বতীর অঙ্গে বিভূতি, প্রসূতি সহে কেমনে॥
সদাশিব চাপিয়ে বৃষভ পরে, গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করে।
যোগে যোগে দিন হরে, সে শ্মশানে,
এক গ্রাসে উপবাসে, ক্ষীণাঙ্গী ভেবে ক্ষীণে॥
বৎসরাবধি হ'ল আসি, না হেরি সে মুখশশী।
চাতকিনী প্রায় বসি, ঊর্দ্ধ বদনে, অচল হয়ে সচল, আন উমা জীবনে॥
খগপতি করে স্তুতি যোড় কর করি, এই বেশে কৈলাসে যাও ওহে গিরি।
অবিলম্বে, জগদম্বে, আন সগণে, হরগৌরী একাসনে, হেরিব আজ নয়নে॥

[১৪৮] রাগিণী বাগেশ্রী—তাল জলদতেতালা

যাব জনক ভবনে, আজ্ঞা দেহ পঞ্চাননে।
অচল হ'য়ে সচল, এসেছেন সম্ভাষণে॥
মম বিরহে কাতরা, জননী লুণ্ঠিতাধরা।
মুখে বলে তারা তারা, জলধারা দ্বিনয়নে॥
তাপিনী মম জননী, পুত্রশোকে পাগলিনী।
যেন মণিহারা ফণী, মা ব'লে নাহি আনে॥

বর্ষশেষ হ'ল আসি, চিন্তিতা মাতা দিবানিশি,
চল তাঁরে দেখে আনি, কৈলাসবাসী সগণে ॥
কহে দীন খগপতি, শরদে শারদা মূর্তি,
হেরি যেন নিলি নিতি, শয়নে স্বপনে ধ্যানে ॥

[১৪৯] রাগিণী মিশ্রবিহঙ্গড় —তাল কাওয়ালি

গো মেনকা, অম্বিকায় হের আসিয়ে।
একবার নয়ন প্রকাশিয়ে, গগনের শশী আসি উদয় ভবালয়ে ॥
সঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতী, ষড়ানন গণপতি, এসেছেন পশুপতি বৃষে চাপিয়ে।
গা তোল, মঙ্গলা এ'ল লহ লহ সম্ভাষিয়ে ॥
নিষ্কলঙ্ক করে চন্দ্র, চন্দ্রমুখ নিন্দে চন্দ্র, পদনখে দশ চন্দ্র আছে লুকায়ে।
ভালে চন্দ্র চন্দ্রাননীর, চাঁদের হাট সঙ্গে লয়ে ॥
এই [illegible] কন্যা উমা, জগতে নাহি হয় সমা, কিসেতে দিব উপমা, উমারে লয়ে।
এ অভয়া, মহামায়া আছে [illegible] ॥
হর জায়া অন্নপূর্ণা, [illegible] অন্নপূর্ণা, তুমি ধন্যা গিরিকন্যা, নহ সামান্যা মেয়ে।
[illegible] চরণে, দেহি মে চরণ [illegible] ॥

[১৫০] [illegible] —তাল একতাল

দুঃখিনী, তাপিনী, জননী ব'লে কি মনে পড়ে না মা, তারিণী।
তোমার বিচ্ছেদে মরি কেঁদে কেঁদে, ভাবি গো দিবস যামিনী ॥
তব আশা পথ, চাহিয়ে নিয়ত আছি গো তৃষিত চাতকির মত।
অত্যাপি যদ্যপি, নাহি আশা হ'ত শোকে শব হ'তাম [illegible] ॥
মম ভাগ্য ফলে [illegible] এসে তাপিত প্রাণ জুড়াইলে।
পুরবাসী [illegible] আনন্দে অচলে বেগে ধায়ে গিয়ে এখনি ॥
সম্বৎসর পরে এলে মম পুরে, এখন আর যাইতে দিব না তোমারে।
যতনে রাখিয়ে হৃদয় মাঝারে জুড়াব তাপিত পরাণী ॥
যোড় কর করি কহে [illegible], মা বলে গৃহেতে কেহ নাহি আর।
জননীর [illegible] কর কর, ক্ষমা কর হর মোহিনী ॥

[১৫১] রাগিণী মিশ্রমুলতান —তাল খেমটা

গো মেনকা শোন তোর অম্বিকার দুর্গতি,
গাঁজা টেনে, শ্মশানে যায় পশুপতি।
মাঠে, ঘাটে, বেড়ায় ছুটে কার্ত্তিক গণেশ দুই নাতি ॥

শৈশব হ'তে যদি শিখাতে দুটিরে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ওরা আসিত পাশ ক'রে।
অনায়াসে দুটিতে বিদ্যা বুদ্ধির জোরে হ'ত হাইকোর্টের বিচারপতি॥
যত হট্টের সঙ্গে থেকে শিখেছে হট্টতা, কিরূপে তাহারা শিখিবে সভ্যতা।
অসিদ্ধ বালকের নাম সিদ্ধিদাতা, কলা বৃক্ষ যার সঙ্গতি॥
(দেখ) সংসর্গ দোষেতে তোর দশভুজা, চণ্ডালের গৃহেতে লয় অগ্রে পূজা।
ভোলা মহেশ্বর দিন রাত টানে গাঁজা, সঙ্গে সব আবাগের সন্ততি॥
কহে দীনখগ দ্বিকর যুড়ে, ইঁদুরে, ময়ূরে দুটি শিশু চড়ে।
মাতঙ্গীর সিংহ বুড়োর বুড়ো এঁড়ে, কে দিবে ঘোড়া হাতি॥

বিজয়ার সঙ্গীত

[১৫২] রাগিণী মিশ্রললিত—তাল আড়াঠেকা

ওরে নবমী নিশি পোহাইও না।
তুমি গেলে উমা যাবে দুঃখিনী বাঁচিবে না॥
শুন শুন বিভাবরী, তোমাকে মিনতি করি, রাখ বচন আমারি, বরি করুণা।
ক্ষমাকর দিননাথ, অদ্য হইওনা প্রভাত,
দুঃখিনী তব আশ্রিত, দিওনা মর্ম্মে বেদনা॥
প্রভাকর কৃপাকর অদ্য নিজ কর হর, রাখি গৃহে গৌরী হর, পুরাই বাসনা।
উমারে হৃদে রাখিব, মায়ের সাধ মিটাইব,
সকল দুঃখ জানাইব, দুঃখহরা দুঃখ দিবেন না॥
গত সপ্তমী অষ্টমী, অদ্য শেষনিশি নবমী,
কি ক'রে প্রাণ ধরি আমি, উপায় বলনা।
মা বলে আর নাহি অন্যে, সবে মাত্র এক কন্যা,
এসেছেন তিন দিনের জন্যে, মায়েরে দিতে যাতনা॥
কহে দীন খগপাল, শুন শুন মহাকাল,
অচল অতি দুর্ব্বল, উমা যাবে না।
পিতারে শুশ্রূষা করি, কৈলাসে যাবেন গৌরী,
বল হে বিনয় করি, বিভাবরী এই প্রার্থনা॥

[১৫৩] রাগিণী মিশ্ররামকেলী—তাল কাওয়ালি

নবমী নিশি পোহা'ল কি করি কি করি বল।
ছেড়ে যাবে প্রাণের উমা, দেখনা বিজয়া এলো, (ওগো জয়া)॥

বৎসরাবধি পরে তারা আনন্দ করিলেন ধরা,
যায় কিসে দুঃখ পাসরা, আমারে বল।
নবমী নিশি প্রভাতে, একি দেখি বিপরীত,
উমা হয়ে চমকিত, নত শিরে রহিল (ওহে গিরি) ॥
বাণী শুনি বজ্রাঘাত, করি শিরে করাঘাত, কেন রে হলি প্রভাত, নবমী বল।
পুত্র শোকে জীর্ণ জরা, ভুলেছিলাম পাইয়ে তারা।
হই যদি তারা হারা, জীবনে কি ফল বল (ওহে গিরি) ॥
ওগো গিরিপুরবাসী, বৎসরাবধি পরে আসি,
ত্রিরাত্র বাস উমাশশীর, কব। কি ভাল।
পুরবাসী করে ধ'রে, বুঝাও গিয়ে মহেশেরে,
উমা যাবেন দুদিন পরে, আজ্ঞা দেহ মহাকাল ॥
মহামায়ার মহামায়া, মুগ্ধ করিলেন অভয়া,
মা প্রকাশি নিজমায়া, হলেন চঞ্চল।
কহে দীন খগপতি, দুঃখিতা তব প্রকৃতি,
মাযে ভুলনা পার্ব্বতী, ছাড়না মা, হিমাচল।

[১৫৪] রাগিণী কেদারা—তাল চিমাতেতালা

দুর্গে দুর্গতি নাশিনী।
দুস্তরে নিস্তার তারা, দনুজদল দলনী ॥
দয়াময়ী দুঃখহরা, দাক্ষায়ণী ভব দারা।
দুস্তারে নিস্তার তারা, দুর্দ্দৈব দুঃখ বারিণী।
দুরন্ত কৃতান্ত ভয়ে, দুর্গে গো দহিছে হিয়ে।
দয়া কর ভবপ্রিয়ে, ধূর্জটি মনোহারিণী ॥
দ্বেষাদ্বেষ ছয় জনে, এ দাসে ছয় দিকে টানে।
দাস্তিষ্য গাম্ভির্য্য হীনে, দুর্গে গো কম্পিত প্রাণী ॥
কহে দীন খগপতি, কি হবে দীনের গতি।
দীনতারিণী দেও সুমতি, দরিদ্র দুঃখ হারিণী ॥

[১৫৫] রাগিণী ভৈরবী—তাল কাওয়ালী

কি দিবে, গো শিবে, তব কি আছে বৈভব।
সবেধন শ্রীচরণ, লয়েছেন শিব ॥
অন্য ধনের প্রয়াসী, নহি গো মা মুক্তকেশী।
শ্রীচরণ ধন ভালবাসি, কোথায় বা পাব ॥

আশায় ভুলে তোমার, এলেম আশী লক্ষ বার।
না হ'ল আশার সুসার, আর কারে জানাব ॥
বন্ধ্যা প্রসব বেদনা, কোন ক্রমে জানেনা।
গতায়াতের যে যাতনা, কারে বুঝাব ॥
তপি জপি ঋষি যোগী, তা'রা নয় না ভুক্তভোগী।
খগে ভবরোগে ভোগে মুক্তি অভাব ॥

[১৫৬] রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল ঝাঁপতাল

সুরেশ্বরী, যোগেশ্বরী, মহেশ্বরী, সিংহবাহিনী।
অমলা কমলা, বগলা, বিমলা, সর্ব্বমঙ্গলা মঙ্গলদায়িনী ॥
কভু চতুর্ভুজা, কভু দশভুজা, দ্বিভুজা রূপেতে কভু লহ পূজা ॥
বসন্তে বাসন্তি, শরদে চণ্ডী, অকাল বোধনে পুজেন রঘুমণি।
সতী সাবিত্রী, তুমি মা গায়ত্রী, তুমি জগৎকর্ত্রী।
তুমি জগদ্ধাত্রী, তুমি তন্ত্র মন্ত্র, তুমি যন্ত্র যন্ত্রী ॥
পার্ব্বতী পতিত পাবনী, অম্বি অম্বালিকে, চণ্ডী, চামুণ্ডিকে।
কৈলাসবাসিকে, নগেন্দ্রবালিকে, জগৎ নাশিকে,
জগত পালিকে, কালী কপালিকে, করালবদনী
কহে দীনহীন খগ অধমে, বেদাগমে তত্ত্ব না পায় সীমে।
ঈশানী, কি জানি, মা তব মহিমে, উমে ভীমে ভব ভাবিনী ॥
এই নিবেদন শ্রীপদ যুগলে, সদা যেন দিন যায় মা বিমলে নাম বোলে।
মম অন্তিম কালে, যেন গঙ্গা জলে, নারায়ণ ব্রহ্ম নাম বোলে বাণী।
(যেন সজ্ঞানে, জীবনে, জীবন যায় চলনা ॥)

[১৫৭] রাগিণী খাম্বাজ—তাল ঠুংরি

ভব ভয়ভঞ্জিনী ভয়হরা, ভয়ঙ্করা ভবভারহরা (তারা)।
শিবে সাকাম্বরা, শম্ভুমনহরা, তুমি সারাৎসারা শ্যামা শিব দারা ॥
মরি ভব ভয়ে, তার গো অভয়ে দেও গো অভয় ভয়ে, বরাভয় নিবারা ॥
দীনতারিণী শিবে, দীনে কি সুদিন দিবে, দীনহীনের ভবে, কেহ নাই গো তারা ॥
দীন খগবর, শোক তাপ হর, ব্যাধি নাশ কর, গো কৃপাণ ধরা ॥

[১৫৮] রাগিণী বাহার—তাল জৎ

তিমির বরণী, কাহার রমণী সে।
ভয়ঙ্করা, চতুষ্করা, দনুজ দল নাশে ॥

সগর রাজার বংশ, ব্রহ্ম শাপে হইল ধ্বংশ।
আপনি হলেন অবতংশ, পরশি বারি, গেল তরি, সবংশে অপাঙ্গে ॥
শতেক যোজন থেকে, যদি গঙ্গা ব'লে ডাকে।
বৈসে গিয়ে ব্রহ্মলোকে, তব কৃপাতে বিহরে, দেবগণ সঙ্গে ॥
শুনি গো বেদের উক্তি, দরশনে মুক্তি।
গঙ্গের পরমং গতি, খগ দীনের আসয়ে যেন ঢেউ লাগে অঙ্গে ॥

[১৬২] [illegible] পঞ্চমবাহার—তাল ধামার

হরশির বিহারিণী, সুরধুনী, তরল তরঙ্গে, গঙ্গে, সুরাসুর বন্দিনী।
অসীমা, তব মহিমা, মাত মন্দাকিনী—
বিষ্ণুপদে-উদ্ভব তব, ওগো ভব ভাবিনী ॥
শতেক যোজন থেকে, যদি গঙ্গা বটে মুখে,
তবে পাপ তাপ শোকে, বৈসে গিয়ে ব্রহ্ম লোকে ,
সগর রাজার বংশ, ধ্বংশ ব্রহ্মসাপে জননী,
পরশি বারি, গেল তরি, কহে দীন খগমণি ॥

[১৬৩] [illegible]—তাল [illegible]

নমস্তে মাত শীতলা, মঙ্গলা মঙ্গল দায়িনী।
তব সামন্ত বসন্ত, প্রাণান্ত করে জননী ॥
তবাজ্ঞায় জরাসুর, স্বর্গাদি তিন পুর,
দেব দানব অসুর ভূচর, খেচর নর, চামরে বধে প্রাণ।
খগদীন অভাজন, ভজন সাধন হীন, কি জানিবে তব গুণ, জ্ঞানদায়িনী।
জয় দে শীতলা চণ্ডী, চণ্ড ঘাতিনী চামুণ্ডা সেবে তোমায়,
ঋষি দণ্ডি চণ্ডা, নৃমুণ্ড মালিনী ॥

[১৬৪] [illegible]—[illegible]

এ মা মনবাঞ্ছা পূর্ণকর গো মাত মনসা দেবী।
দীনহীন ক্ষাণ আমি সাধ্য কি তোমারে সেবি ॥
নাগদল মহাবল, উগারে সদা গরল।
তোমাবিনে শীতল কে করে গো ভার্গবী ॥
বেহুলার মন আশা, তুমি পুরালে মনসা।
তোমার আশা ভরসা, জীবগণের আশা ভাবি ॥
সদা করে খগনাথ, যোড় করে প্রণিপাত।
সুদিন দাও মনসা মাত, আর কিছু করিনে দাবি ॥

সন্ধ্যা বর্ণন

[১৬৫] রাগিণী পূরবী—তাল কাওয়ালি

দিবা গত দিবানাথ, চলে, অস্তাচলে (চলে চলে)।
ভুবন তিমিরাচ্ছন্ন হল ইন্দ্রজাল (নভমণ্ডলে) ॥
বকী বক কাক পিক, ডাহুকী আর ডাহুক।
চক্রবাকী চক্রবাক, লইয়ে নিজ শাবক, ধায় নীড়ে দলে দলে (কুতূহলে) ॥
গত প্রভাকর কর, আগত ঘোর তিমির।
ভ্রমে ভ্রমে মধুকর বৈসেনা কমল দলে ॥
গোষ্ঠ লীলা করি সাঙ্গ, গো ধূলি ধূসর অঙ্গ।
সঙ্গে লয়ে সাঙ্গোপাঙ্গ ভক্তেক গোপালে (গৃহে চলে)
দেবালয়ে তুরী ভেরী, বাজিছে শঙ্খ ঝাঝরী,
ভক্তবৃন্দে হরি হরি, বলে বাহু তুলে (তুলে তুলে) ॥
শিশু পশু ত্যজে খেলা, দেখে অপরাহ্ণ বেলা,
চঞ্চলা অবলা বালা, সরোবর কূলে (কূলে কূলে)।
হেরি নাথ নিশানাথ, সরোজিনী মুদিত।
কুমুদা, প্রফুল্ল চিত, সরোবর জলে (জলে জলে) ॥
কহে দীন গণধর, প্রকাশিত শশধর।
কুমুদী করে আদর, পবনেতে হেলে (দুলে দুলে) ॥

ব্রহ্মবিষয়ক সঙ্গীত

[১৬৬] [illegible] —তাল একতা[illegible]

ত্যজ কা[illegible] [illegible], [illegible] মত্ত, সদা ভাব সর্ব্বেশ্বরে রে।
এ তিন ভুবন, যাঁহার সৃজন, কর রে স্মরণ তাঁহারে রে।
ক্ষিত্যাপতেজ মরুত, ব্যোম আদি পঞ্চ তাহাতে মিশ্রিত।
পঞ্চভূত আত্মা এই [illegible] [illegible] সকলি জানিবে তাঁহার রচিত রে ॥
বৃথা দম্ভ অহঙ্কার কেন এত, কামে পঞ্চে পঞ্চ।
হবে রে মিশ্রিত, হবে হতচেতন জীব রে ॥
আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত তাঁহার, ভূধর সাগর অতল [illegible] পারাবার।
ভূচর খেচরে যে দেয় আহার রে ॥
মহিমা অপার সর্ব্ব মূলাধার, ভব কর্ণধার।
তাহা ভিন্ন আর সকলি অসার, এ সংসারে রে

ত্রিজগৎ তাত, ত্রিজগৎ নাথ তাঁহার আশ্রিত জীবজন্তু যত।
জীব না হ'তে করেন আহার প্রস্তুত রে ॥
পয়োধরে পয় অপরিমিত, মহিমা অনন্ত।
কেবা পায় অন্ত, বিভু দয়াবন্ত, লিখিল অখিল সংসারে ॥
কুরঙ্গী কুরঙ্গ মাতঙ্গী মাতঙ্গ, কীটাদি পতঙ্গ ভৃঙ্গী আদি ভৃঙ্গ।
সিংহী আর সিংহ, পশু শিশু সমূহ, বর্দ্ধিত করেন দেহ রে ॥
আহা মরি মরি তাঁহার কিবা স্নেহ, অহোরহ দেন সবারে উৎসাহ।
দীনখগ কহে, যে জন স্বজন লয় করে ॥

[১৬৭] রাগিণী ইমনকল্যাণ—তাল কাওয়ালি

বৃথা কাজে ম'জে যায় দিন (দিন দিন)।
ক্রমে তনুক্ষীণ, সরোবরে মীন, যেন, হয়ে বারি হীন (দিন দিন) ॥
দেখদেখি মনে ভেবে, কি বলে এসেছ ভবে।
তাঁরে গিয়ে কি জানাবে, ছিলে পরাধীন (চির দিন) ॥
আহা মরি কি যাতনা, মনেতে কিছু ভাবনা।
যাঁর এ সৃষ্টি রচনা, তাঁরে ভাব ভিন (অন্য দিন) ॥
তুমি কার কে তোমার, জান কিছু সারাৎসার।
বৃথা দম্ভ অহঙ্কার মায়ায় হয়ে লীন (দিন দিন) ॥
বৃথা কাজে দিন গত, আপনায় হবে হত।
পঙ্কে পঙ্ক মিশাইলে রবে না রে চিন (এ দিনেতে) ॥
কহে দীন খগবর, যিনি এ বিশ্ব ঈশ্বর।
তাঁরে স্মর নিরন্তর শোধ তাঁর ঋণ (নবীন প্রবীণ) ॥

[১৬৮] রাগিণী বাহাবহারে শ্রী—তাল আড়াঠেকা

তারে তারে সাধ তাবে, মন প্রাণ ঐক্য ক'রে।
সপ্ত স্বর তিন গ্রামে একুশ মূর্চ্ছনা স্বরে ॥
ঢিমা দ্রুত তালে তালে লয়ে লয়ে সমে মিলে, ষড়জ ঋষভ গান্ধার স্বরে।
মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ আদি স্বরসপ্ত।
ভাব নিত্য তৎসৎ, আভোগ যোগ ওঙ্কারে ॥
ছয় রাগে অনুরাগে, ছত্রিশ রাগিণী যোগে, থাক মন মনযোগে, সমাধি ক'রে।
সুস্বর সঙ্গীত শাস্ত্রে, গুরুদত্ত মহামন্ত্রে,
গাওরে রসনা যন্ত্রে, সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বেশ্বরে ॥

সাধিলে সাধনা সিদ্ধ, সাধ রে সে জগ আরাধ্য।
হও রে শ্রীগুরুর বাধ্য, সর্ব্ব প্রকারে॥
কহে দীন খগপতি, বিশ্বকর্ত্তা বিশ্বপতি।
অগতি জনার গতি, সর্ব্বাত্মায় যে বিহরে

[১৬৯] রাগিণী মিশ্র সিন্ধু—তাল ঠুংরি

ত্বমেব নির্গুণ নিত্য নিরঞ্জন, ভুবন সৃজন কারণ।
সর্ব্ব আদি কর্ত্তা, বিধির বিধাতা, মোক্ষদাতা পিত সর্ব্বজন॥
এই চরাচর, ভূচর খেচর, কীট পশু নর সৃজন তোমার।
হে জগৎ ঈশ্বর, ত্বংহি পরাৎপর, জ্ঞানের অগোচর ধ্যান ধন॥
ত্বংহি জলাধার, নির্ব্বিকার নিরাকার, জগতের আধার সর্ব্বগুণধর।
ত্বংহি বৈশ্বানর, ত্বংহি রত্নাকর, সর্ব্বেশ্বর বিভু পতিত পাবন॥
ত্বমেব দিবাকর, ত্বমেব নিশাকর, সর্ব্বশক্তিধর, সর্ব্বত্রে বিহর।
তোমার আজ্ঞায়, সৃজন লয় হয়, জরা ভয়, ক্ষয় মরণ বারণ॥
ত্বমেব অকার, ত্বমেব উকার, ত্বমেব মকার, ব্রহ্ম পরাৎপর।
সর্ব্ব শ্রয় চিন্ময়, অব্যক্ত বেদান্তৈকময়, ভবের ভয় ভীষণের ভীষণ॥
ত্বংহি ধরা জল, ত্বমেব অনিল, ত্বং ত্রিলোক সপ্ত পাতাল।
ত্বংহি জগৎ পতে, নমস্তে নমস্তে, কহে খগপতে, দীনহীন।

[১৭০] রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল [illegible]

বিভু পরাৎপর, অখিল ঈশ্বর, এই চরাচর, তোমারি সৃজন।
তুমি জগৎ কর্ত্তা, বিধির বিধাতা, মোক্ষ দাতা, পিতা নিত্য নিরঞ্জন
সত্ত্ব রজ তম ত্রিগুণ অতীত, নির্গুণ হে বিভু তুমি গুণাতীত।
গুণগানে তব জগৎ মোহিত, নিজ পদার্থ সত্য সনাতন॥
মহিমা অপার, জ্ঞানের অগোচর ভূচর খেচর রচনা তোমার।
শশধর দিবাকর রত্নাকর বৈশ্বানর সুরাদি পবন॥
সৃজন লয় তোমারি আদেশে, পুনরায় হয় আঁখির নিমিষে,
পুনরায় তায় কালেতে গ্রাসে, তথচ মনুজে ভাবে না কখন॥
কহে খগবাহন এর দিন যায়, এ দীনের সে দিনে কর হে উপায়।
দীনবন্ধু ব'লে ডাকি উভরায়, দুর্দ্দিনের ভার অর্পণ॥

[১৭১] রাগিণী কেদারা—তাল ঢিমাতেতালা

কাজে মজে দিন গেল, সে কাজের কি হল বল।
বৃথা কাজে কাবে ভ'জে আছ ম'জে রে বাতুল॥

সেখানে কি বলে এলি, এসে শেষে ভুলে গেলি।
কি সুখেতে কাল কাটালি, কাল ব্যাজ নাই কালাকাল।
ত্যজে পরমার্থ তত্ত্ব, কর রে পর দাসত্ব।
কি হবে অনিত্য বিত্ত, সে তত্ত্ব যার নাই সম্বল ॥
জ্ঞাতি গোত্র দারা সুত, তারা যদি সঙ্গে যেত।
বাঁচিত তোমায় বাঁচাত, হ'ত কত সুখ মূল ॥
কহে দীন খগরাজ, কর রে সাত্ত্বিক কাজ।
করনা, আর কালব্যাজ ভাব সে সর্ব্ব মঙ্গল ॥

[১৭২] রাগিণী ভৈরব– তাল কাওয়ালি

ব্রহ্মাণ্ডের ভাণ্ডোদর, বিভু জগৎ ঈশ্বর।
ভূচর খেচর নর, সৃজন তোমার ॥
কিবা কৌশল তোমার, জ্ঞান মন অগোচর।
সৃজন পালন লয় কটাক্ষেতে কর ॥
তুমি তন্ত্রী তুমি তন্ত্র, তুমি যন্ত্রী তুমি যন্ত্র।
তব নাম মহামন্ত্র, ল'য়ে তরে নর ॥
তুমি বিভু ইচ্ছাময়, ইচ্ছাতে সকলি হয়।
তব ইচ্ছায় হয় লয়, এই চরাচর।
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড 'পরে, কার সাধ্য কে কি করে।
তুমি কর্ত্তা এ সংসারে কহে গদাধর

বাউল সঙ্গীত

[১৭৩] রাগিণী আলাইয়া—তাল জলদতেতালা

সাধ্যাতীত তত্ত্ব নিরূপণ, হবার নয় অসাধ্য সাধন।
সে বিভু অব্যক্ত জগৎ ব্যাপ্ত, এই দ্বীপ সপ্ত, লিপ্ত তিনি নন ॥
কোথায় আছেন তিনি কে কহিতে পারে, ভূধরে সাগরে কিম্বা মহী'পরে।
আকাশে পাতালে সপ্ত তলাতলে, কোথা গোলমেলে, নাহি নিদর্শন ॥
যন্ত্রে তন্ত্রে শাস্ত্রে অষ্টাদশ পুরাণে, শ্রীমৎ ভাগবৎ গ্রন্থ রামায়ণে।
চণ্ডী কাশীখণ্ডে, পুরাণ ব্রহ্মাণ্ডে, চৈতন্যমঙ্গলে আছে কি সেই জন ॥
রামাত নিমাত আর ব্রকদ ব্রহ্মচারী, কর্ত্তাভজা নেড়া নেড়ী পুরি, গিরি।
বৌদ্ধ জৈন সংসার ত্যাগ করি ফকির, জপী তপী ঋষি,
অনশনে বসি, সেই গুণরাশির পায়না দরশন ॥

নিদেহ নিগূহ নাহি পদ পাণি, সর্ব্বাত্মায় আছেন আত্মা বাম তিনি।
ক্ষিত্যপতেজ আদি এই পঞ্চে আনি, কহে খগমণি,
করেন মহাপ্রাণী আপনি সৃজন॥

[১৭৪] রাগিণী মিশ্রবাহার—তাল একতালা

দেহ গেহে পঞ্চভূত (আছে স্থিত)।
জানহ নিশ্চিত। কেন নশ্বর দেহেতে অহঙ্কার এত।
জানত এ দেহ মর্ম্ম, অপ বায়ু তেজে জন্ম, অস্থি মেদ চর্ম্ম (দেহধর্ম্ম)।
কুসূত্র দেহ ক্ষেত্র, মল মূত্রপাত্র মাত্র, আছয়ে পুণিত॥
প্রাজ্ঞ বিজ্ঞ বুদ্ধিমান, বিদ্যাবান, ধনবান, কর অভিমান (করি বহু দান)।
কিমাশ্চর্য্য এ মাৎসর্য্য, ক্রমে ঐশ্বর্য্য রাজ্য বীর্য্য হবে হত॥
তুমি কার কে তোমার, কর নাহে এ বিচার, এ সংসার সংসাজ্ঞা সার।
কলত্র জ্ঞাতি গোত্র পিতাপুত্র লবে না কো তত্ত্ব॥
মনুজের কায়া ধরি, অজ্ঞানে দিবা শর্ব্বরী আছ আমরি, (তাঁরে পাশরি)।
আমি কারে কর হায়, গুটিপোকার প্রায়, আপন জালে আপনি হও হত॥
নশ্বর হে এ দেহটা, তার ভিতরে ভূত পাঁচটা মরি কি নেটা, (ধার ন টা)।
দুর্জ্জন ছ'টা বড ডানপিটা, মণি কোটার ভিতর প্রবেশে নিযত॥
ভাঙ্গা ঘরে দিয়ে খুঁচি, ইচ্ছা কর অধিক বাঁচি, এই আচাঁর্চি, (অভিরুচি)।
গোড়া গিলে, পড়ছে হেলে, বলে লাঠি ধরে ঠেলে রাখিবে কত॥
এই দেহ এই নাই, নিশ্বাসে বিশ্বাস নাই, বেদের বাজি ভাই,

(সব দেখতে পাই)।

প্রতি পলে, যেটা টলে, পাপ বেঝা বইছ মায়া কেন রে এত॥
উন্মত্ত যুবা বয়সে, ধুটে পোড়ে গোবর হাসে, বলি না ত্রাসে, (পাছে দোষে)।
একটা যাচ্ছে, চখে দেখছে, তবু হাসছে খেলছে নাচছে উন্মাদের মত।
ব্যবসায়ী তেজা রাজা, দাসদাসী কৃষি প্রজা, বয় ভূতের বোঝা(হ'য়ে সোজা)।
এ জগত' সব অনিত্য, সত্য পদার্থ বিভু তত্ত্ব॥
ভূতে দেয় ভূতেরে মত, যেন কানা দেখায় কানারে পথ।
এইরূপ প্রায় জগৎ, (বাঁধি গৎ) চালুনি কয়, ছুঁচে ছিদ্র॥
হ'তে চায় রুদ্র, ধর্ম্ম কর্ম্মে রত।
পুরুষে ভূত পেত্নী প্রেতিনী, যে ভাবেরা অধম প্রাণী,

ঘোর অভিমানী (শিরোমণি)॥

কহে খগ রাজা, মন্ত্র করে সোজা শ্রীগুরু গুরু, কেড়ে নামামৃত॥

[১৭৫] রাগিণী মিশ্রদেশ—তাল একতালা

ভাঙলো না তোর মায়ার ঘুম।
বিষয় মদে, চক্ষু মুদে, শুয়ে আছ বেমালুম ॥
ঐশ্বর্য্যের মাৎসর্য্যে তুমি মনে কর বাসনা কুম।
এ প্রপঞ্চ এক সাজ সেজেছ, ঠিক যেন ভাই হাতুমথুম ॥
তোর সঙ্গের ছ'টা, বড় ঠেটা, ওদের চটা বেমালুম।
জ্ঞান অনলে, দেনা জ্বেলে, ক'রে হরি পূজার হুম ॥
(পোলা) পাযরার বাচ্ছা, পুষে বাছা, শুকভেবে তায় খাচ্ছ চুম।
ও বল্বে কৃষ্ণ, শুন্বি স্পষ্ট, ডাকবে ব'সে বাকুম-কুম ॥
(এখন) দারা পুত্র, জ্ঞাতি গোত্র, সকলে শুনছে হুকুম।
শিবনেত্র হবামাত্র, আপনি হ'বি রে নিঝুম ॥
বহিমুখের দূতে ধ'রলে, হবে রে মজা মালুম।
কুমিত্রদে দলে গেছে, দ্বিপদে দিয়ে ভুড়ুম ॥
স্বর ব্রহ্ম, না জেনে মর্ম্ম, সান ব'সে গান্ডুম তুম।
রাগেতে তোর, নাই অনুরাগ, কে শোনে তোর ঝিঁঝিট ধুম ॥
কপট ভক্তির, বিষম জ্যোতি, বাহ্যাড়ম্বর বড়ই ধুম।
খগ ভনে, সাধন বিনে, দেহ গেহ শ্মশান ভূম ॥

[১৭৬] রাগিণী ভূপালীগৌড়—তাল একতালা

মানুষ চলে কলের বলে, পঞ্চভূত, পাঁচ মজবুত, ধেরেছে সহস্র দলে
(ওরে ভাই)।
এই যে দেহ মেসিন, ইহা ভাই বড়ই প্রবীণ ইংরাজ চিন ফ্রেঞ্চ মারকিণ ॥
সবাই হার মানিলে, মরি কি শিল্পবিদ্যা করেছেন মহাবিদ্যা।
যোগারাধ্যে, পায় না যুদ্ধে, অসাধ্য হয় ভাবতে গেলে ॥
একলের কি কৌশল, কল থেকে জন্মাচ্ছে কল রেলওয়ে ষ্টিম ভেসল।
লোক সাহায্যে চলে, টেলিফোন ফনোগ্রাপ, ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ্,
মানুষ কল কলের বাপ, চৈতন্য রয়েছে মূলে ॥
কলটা সাড়ে তিন হাত, এতে হয় ত্রিজগৎ মাৎ,
মন পবন বর্ষ্চে দিন রাত, জঠর অনলে।
জীবাত্মা মহাপ্রাণী, এ কলের ড্রুটো চিম্নি,
ব্রহ্মা বিষ্ণু, শূলপাণি, নাড়ে নড়ে পল বিপলে ॥

এই কল কি চমৎকার, নয় দিকে নটা দ্বার,
মণি কোটায় আছে একজন বসিয়ে বিরলে।
ছয় জন কুজন ধ'রে, কলেরে বিফল করে,
শ্রীরূপ কয় সারতে পারে, গুরুমন্ত্র যন্ত্র পেলে।

[১৭৭] রাগিণী মিশ্রমূলতান—তাল একতালা

এই মানুষের ভিতর মানুষ গুপ্তভাবে ব'সে (আছে)।
চেতনে সে ধনে, দেখাপাবে চিদাকাশে (সাধনে)॥
সর্ব্বদা কর সাধন, দিয়ে নিজ মন প্রাণ।
আপনি কেটা আপনি চেন, জ্ঞানে আর মানসে (উদ্দেশে)॥
সুরু থেকে কর গুরু, মন্ত্রভবীজ কল্পতরু,
ফল ফলিবে সুচারু, দেখবে অনায়াসে (মানসে)
শিঁড়ি ২, ধাপে ২, উঠরে ভাই খেপে খেপে,
এক কালীন যেওনা খেপে, চেপে ২ ঘেঁষে (মিশে)।
আকাশ আর মহীখণ্ড, অনিল জল অনল কাণ্ড।
এই দেহে ক্ষুদ্রে ব্রহ্মাণ্ড, কাণ্ড সর্ব্বদেশে (না পায় দিসে)॥
সে মানুষ যে দেখা পায়, তারে বল কেটা পায়।
প্রণিপাত তাঁর পায়, করে শ্রীরূপদাসে (গলবাসে)॥

[১৭৮] রাগিণী সিন্ধুকাফি—তাল একতালা

ছার দেহের গুমর এত, করিস কত, অজ্ঞানী।
হবে চৌগুণি মাৎ কুপোটিকাৎ, পড়বি পপাৎ ধরণী (পলকে)॥
এই প্রপঞ্চ দেহ ইহাতে মায়া মোহ, করিছ অহরহ কি কুগ্রহ, না জানি।
দেখ দেখি মনে ভেবে, যেমন পঞ্চত্ব হবে, পঞ্চে পঞ্চ মিশাইবে,
ছোঁবে না তোর ঘরণী (মড়া ব'লে)॥
মৃত্যুরূপ স্বপ্ন দেখে, অমনি উঠবে চোমকে, তখনি রোজা করবে অঙ্গে বন্ধনি।
তার ফরজনের পুত, তোমারে বলবে ভূত, ভজনিলে শ্রীঅচ্যুত,
অভাগার পুত ম'রে হবি ভূত যোনি (সাধন বিনে)॥
যেনমত্ত মাতঙ্গ, মন ভ্রমে অঙ্গ বঙ্গ, বলিতে শ্রীগৌরাঙ্গ স্বরেনা তোর বাণী।
বিষয়বিষে মাতোয়ারা, শরা বোধ করিস্ ধরা,
শুনে কি তস্করেরা, ডাকাত যারা ধর্ম্মাধর্ম্মের কাহিনী (পাষণ্ড)॥

দিন হলো আখেরী, মুখেবল হরি২,ছেড়েদে ফোতোজারি, জুয়াচুরি হায়রানি
দুদিন বৈ পরবি কাচা, মুখ তোর পোডাবে বাছা,
এ লম্বা কোঁচা, গাল মোচ্চা, কোথায় রবে কারদানি (বাছাধনি) ॥
কহে দীন রূপদাস, সদা কর নাম অভ্যাস,
আখেরে পাবি পাস, তজবিজ হ'লে ছানি।
ছেড়ে দে দুনিয়ার খেল, সাধুদের সঙ্গে মেল,
চিনে নে আসল ভেল, খুলে দেল, চিন্তা কর চিন্তামণি (সচেতনে) ॥

[১৭৯] রাগিণী জঙ্গলামুলতান—তাল একতাল।

হরির লুটের গুণ জাননা বেদেতে লেখেন বিধি ভব ভয়ের ভয় থাকে না।
থেকে সূতিকাগারে, যে হরি স্মরণকরে,ঝালমসলা খেতে তারে,
হরিভক্তের মানা ভোগে না কোন পাপ, বেদনা শোক তাপ,
বালকে মারে লাফ, পোওয়াতির পোরে কামনা ॥
পোওয়াতির কাঁচানাড়ী, বলে সকল আনাড়ী,
খরচ নয় অধিক কড়ি, সওদা পাঁচটি আনা।
বালকে কোলে রেখে, পান্ত ভাত খাওগে সুখে,
নগরের ছেলে ডেকে, হরিনামের দেও ঘোষণা ॥
পড়ে বিষম শঙ্কটে, যে মানে হরির লুটে, সব বিপদ কেটে ওঠে, জোটে সুমন্ত্রণা।
দেওয়ানি ফৌজদারি, অপবাদ জোয়াচুরি, সব রক্ষা করেন হরি হরিসাড়ীর হরগহনা ॥
রোগেতে জীর্ণ করে কবিরাজ পলায় ডরে, ডাক্তারে হেরে তারে, ভয়ে পাশ ঘেঁষে না।
শ্রীরূপদাসেতে ভণে হরির লুটে যদি মানে, নাড়ী আসে স্বস্থানে, শমনে ছুঁতে পারে না।

[১৮০] রাগিণী মিশসিন্ধু—তাল একতালা।

দেখা ২, ওরে খেপা, জেন্ত মানুষ কই।
দেখছি যে সব খোঁজে বৈভব, বলবো কি, আর শব বই ॥
বৃথা পোষে কুপোষ্য, এরা মানুষ নয় সব বনমনুষ্য।
বোধাবোধ দীর্ঘ হ্রস্ব মাথার বাঁধে টই ॥
আহার নিদ্রা মৈথুন সকল জীবের প্রয়োজন।
বিধির সৃজন, মানুষ যে জন, জানে না যোগ সাধন বই ॥
ঐশ্বর্য্য রাজ্য বাড়ী ঘর, এসব বাহ্য আডম্বর।
ভজন হয় উনপঞ্চাশ নম্বর, সাধুর খাতায় ঢেরা সই ॥
দশ ইন্দ্রিয় বর্ত্তমান, থাকতে জীবের না হয় জ্ঞান।
থাকা না থাকা সমান, চিনবো কিসে এঁড়ে নই ॥

কহে দীন খগদাস, নিত্য তত্ত্ব কর অভ্যাস।
শ্রীগুরুর প্রতি কর বিশ্বাস হবে জগৎ বই॥
(সুধার মতন, রূপ, সনাতন আর যত জন টকো দই)॥

[১৮১] রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা

ভগ্ন খাঁচায়, বিরক্ত হয়, প্রাণ পাখি।
মাতার খুঁটী হ'লো মাটি, ক্রমে বক্র হয় দেখি (দেখ দেখি)॥
সাড়ে তিনটী জাত, হচ্চে ক্রমে কাত, উড়বে পাখি, দিয়ে ফাঁকি, বাজি ক'রে মাত॥
হলো খাঁচা জীর্ণ, ছিন্ন ভিন্ন, শব প্রায় হায় সব দেখি॥
ধন্য শিল্পকার, কর'লে খাঁচার নটা দ্বার, কলকৌশলেতে বানালে, গঠন পরিষ্কার।
পাদপদ্ম, নাভিপদ্ম, হৃদিপদ্মের নাই বাকি॥
এই খাঁচার যে কাণ্ড, কি জানবে পাষণ্ড, খাঁচার ভিতর পরাৎপরের, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড।
এতে খুঁজে নিলে, সকল মেলে, সহস্র দল নিরখি॥
তিনটী খাঁচার তার, বেড়া নবদ্বার, হেলেদোলে পল বিপলে, থামলে অন্ধকার।
কহে খগপতে পাঁচভূতেতে, আছে ইথে ভাবচ কি॥

[১৮২] রাগিণী মিশ্র ললিত—তাল একতালা

শোনরে মন বারণ, করি তোমারে বারণ, যেওনা বিষয় বনে।
কুমতি অরি, বেড়ায় ফিরি, লহে ধরি পথিক জনে॥
গুল্মলতা, ভগ্নী ভ্রাতা, মহাদারু গুরুজনে।
জ্ঞাতি শার্দ্দূল বড়ই খল, সম্বল ধরিয়ে টানে।
কুরঙ্গ সম বিষয় বিষযারণ্যে, প্রফুল্ল ফুল, নারীকুল মনা কুল করে ঘ্রাণে
(মধুলোভে ভেবে ভেবে, নিশি দিনে, আয়ু ক্ষীণে)॥
কর পসারি, কালকেশরী, কেশে ধরি সদা টানে।
ও বন পরিহরি, যত্ন করি, হরি হরি বল বদনে,
কহে দীন খগে, অনুরাগে, থাক যোগে নিশি দিনে॥

[১৮৩] রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা

যে কালি সেই কৃষ্ণ, আছে স্পষ্ট পুরাণে।
এরা উভয়ে এক, ভাবিয়ে দেখ, অন্য নাই ত্রিভুবনে (শ্যামা শ্যাম)॥
কৃষ্ণের অনন্তলীলা, লইয়ে গোপবালা, নিকুঞ্জে করেন খেলা, সে কাল বরণে।
পাইয়া সে সন্ধান, ধাইয়ে যায় আসান, বনমালী হলেন কালী,
ভক্তের ভক্তির কারণে (নিধুবনে)॥

কটিতটে কিঙ্কিণী, হইল করশ্রেণী, যুগল কর তাঁর, চতুর্ভুজ সেস্থানে।
মধুর মোহন বাঁশী, তৎদণ্ডে হ'লো অসি,
মুক্তকেশী, কালশশী, অট্টহাসি বদনে (তমোনাশি) ॥
কভু ক্ষীরদ তটে কভু শম্ভু নিকটে, কখন বৈকুণ্ঠে, ঘাটে মাঠে, বিপিনে।
কখন শৈলসুতা, কখন গোপবণিতা, দৈত্যঘাতা কামপিতা,
সুরমাতা শোভনে (ত্রিনয়নে) ॥
প্রপঞ্চে পথমত, কিছু নাই ভিন্ন পথ, একেতে মনোরথ, পূর্ণ হয় জ্ঞানে।
দীনহীন খগ কয়, এক বৈ দুই নয়, দিনমণি শূলপাণি, ভবানী,
গজাননে (নারায়ণে) ॥

ইংরাজি বাঙ্গলা মাথুর সখী সংবাদ

[১৮৪] রাগিণী ঝিঁঝিটখাম্বাজ—তাল পোস্তা

আমারে ফ্রড ক'রে কালিয়া ড্যাম তুই কোথা গেলি।
আই য়্যাম ফর ইউ ভেরি সরি, গোল্ডন বডি হ'ল কালি ॥
ও, মাই ডিয়র ডিয়রেষ্ট, মধুপুর তুই গেলি কৃষ্ণ।
ও মাই ডিয়র হাউ টু রেষ্ট, হিয়ার ডিয়র বনমালী
(শুন রে শ্যাম তোরে বলি)
পুওর কিরিচর মিল্ক গোয়েল, তাদের ব্রেষ্টে মারলি শেল,
নন্সেন্স তোর নাইকো আক্কেল, ব্রিচ অফ্ কনট্র্যাক্ট করলি ॥
(ফিমেলগণে যেন করলি)
লম্পট শঠের ফরচুন খুললো, মথুরাতে কিং হ'লো।
আঙ্কেলের প্রাণ নাশিল, কুবুজার কুঁজ, পেলে ডালি ॥
(নিলে দাসীরে মহিষী বলি)
শ্রীনন্দের, বয় ইয়ং ল্যাড, কুকেড মাইণ্ড হার্ড।
কহে আর. সি. ডি. ব্যাড, এ পেলাকার্ড রঙ্গকেলি ॥
(হাফ ইংলিশ হাপ বাঙ্গালী)।

[১৮৫] রাগিণী ঝিঁঝিটখাম্বাজ—তাল পোস্তা

লেট মি গো ওরে দ্বারী, আই ভিজিট টু বংশীধারী।
এসেছি ব্রজ হ'তে আমি ব্রজের ব্রজ নারী ॥
বেগ ইউ ডোরকিপর লেট মি গেট, আই ওয়াণ্ট সি ব্লক হেড,
ফার হুম আউয়র রাধে ডেড, আমি তারে সার্চ্চ করি ॥

শ্রীমতী রাধার কেনা সারভেণ্ট, এই দেখ আছে দাসখত এগ্রীমেণ্ট।
এখনি করব প্রেজেণ্ট, ব্রজপুরে লব ধরি (দাসখত দেখে ঘুচবে জারি)॥
রয়্যাল ক্যাবেকৃটাব শুন ওর, বটব থিব ননী চোর।
ব্ল্যাগার্ড রাখাল পুওব, চোব মথুবাব দণ্ডধাবী (রাখাল ভূপাল কপাল ভারি)
কহে আর. সি. ডি. বাড কিং, বেলাক নানসেন্স ভেরি কনিং।
ফ্লুটেতে ক'রে সিং, মজাযেছে বাই কিশোরী (কুলনাশা বাঁশী করে করি)॥

১৮৬] বাগিণী মিশ্রদেব—তাল কাওযালী

আহা মরি মরি, যাই বলিহাবি, ভাবেতে তোমাবি, বাঁকা বংশীধারী।
গেছে জানা কেলেসোণা, যত তোমাব চাতুবী॥
পায়েছ বহু ঐশ্বয্য, কংশ নৃপতিব বাজ্য, ত্যজ্য করেছ হে ব্রজপুরী।
কেন হে বাম, ত্রিভঙ্গ শ্যাম, এখন মনে পড়বে কেনে ব্রজেব ননীচুরি॥
শুনেছি পুবাণে কয, তোমাবে হে দযাময, প্রত্যয নাহি হয ওহে মুবারি।
দয়া থাকে যাব, তাব কি এ ব্যবহার, ব'ধে নাবী, বংশীধাবী আসে কি মথুরাপুবী

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীশ্রীগরুড় স্তোত্র। ব্রজভাষার সঙ্গীত

১৮৭] বাগিণী বামকলি—তাল একতালা

মাধেলেরা বাজে রম্যকদ্বীপমে, মিলি যুলি, পক্ষিযন গাযে বাজাযে।
ধা কেটে ধা, ধুম কেটে ধা ধা ধা তাক ধেলাৎ,
ধুম কেটে তাক, থুন্না হুনা, থিযে ইযে ইযে ইযে।
সিংহাসন'পব খগেন্দ্র বীরমণি, উনমুটি পক্ষি আলাপে বাগ বাগিণী।
ভঁযবো মালকোষ বাহাব সোহিনী, শ্রীহিণ্ডোল মেঘ দীপক,
নট নাবায়ণ তান লাগায়েত গাযক, কৈ কৈ বনিহুই ভাও বাতাইযে॥
সপ্তসুর তিন গ্রাম একুইশ মুরচ্ছানা, পিউ পিউ পিউ তান শুনায়ত ময়না॥
কাকাতুয়া থেঁ থেঁ ফুকারে সাহানা, কুবকুট কোঁ কোঁ কু, পাখা হেলানা।
হীরামন, গুণ গুণ গাযেত গানা, তানা নানা নানা ২ তাতে থৈয়ে থাইয়ে॥
বুলবুল বোস্তা, রাজ গোমস্তা, টুনটুনি গুণী সেবেস্তাদাব।
কোয়েলা কল কল লাগায়ে বসন্ত বাহার, হামা শ্যামা লেকে জিম্বা তহকিৎ করে ভাণ্ডার,
পাপিয়া মণিয়া, টিয়া, চামর হিলাইযে॥

[১৮৮] রাগিণী মিশ্রমঙ্গল—তাল কাওয়ালি

রাজ রাজেশ্বর, বীর খগবর। বিনতা, তাঁর মাতা, পিতা কশ্যপপ্রবর ॥
খগেশ্বর জ্যেষ্ঠ, অরুণ কনিষ্ঠ হন, আদিত্যের রথে ব'সে ভ্রমেণ এই ত্রিভুবন।
জটায়ু সম্পাতি খগবীরের নন্দন, রামচন্দ্রের পিতা, দশরথের মিতা শ্রীল শ্রীজটেশ্বর ॥
বিনতা পুত্র, জন্ম ল'বামাত্র, ক্ষুধাতে হয়ে ব্যস্ত, গজ কচ্ছপেরে ধরি করিলেন উদরস্থ।
সুমেরু শিখর ভেঙ্গে ভূমে করিলেন ন্যস্ত, ইন্দ্রচন্দ্র দেব সবে হয়ে ব্যতিব্যস্ত ॥
বৈকুণ্ঠ শ্রেষ্ঠ, কৃষ্ণ অগ্রে করিলেন দরখাস্ত, নারায়ণ খগসনে রণে হয়ে পরাস্ত।
বারিদ বরণ, করেন বরদান, বিষ্ণুরথ হবে তুমি চারিযুগ অমর ॥
রাবণ করি হরণ জনকের দুহিতা, র'থপরি লঙ্কাপুরী লয়ে যায় রামের সীতা।
চঞ্চুমেলি মহাবলী পুরিলেন উদরে, সীতাদেবী আছেন ভাবি শেষে উদগার করে ॥
জটায়ু মহামতি, রক্ষে পরাজয় করে, দেবের অভিসম্পাতে, ঘোর বিপদে।
গেল জটায়ুর আয়ু, বায়ু, ভস্ম হ'ল কলেবর ॥
রম্মক দ্বীপে গরুড় ভূপের প্রধান রাজধানী, হ'ল দেবেন্দ্র জিনিয়ে।
নাম খগেন্দ্র চূড়ামণি, সভাসদ সম্ভ্রান্ত বিদ্যাবন্ত গুণবন্ত ধনী মানী ॥
রাজহংস সারস সংবংশ গুণী জ্ঞানী, মহামতি সম্পাতি,
কেনেরী বুরী টুনটুনি, পক্ষির কণ্ঠ নীলকণ্ঠ খঞ্জন মনোরঞ্জন আবগিন খঞ্জনী।
পাপিয়া টিয়া, কাকাতুয়া, মৎস্যরাঙ্গা ফিঙ্গা ক্ষীর সঙ্কর ॥
মহাদানি খগমণি, ব্যাপ্ত এই চরাচর, যাচকের মান রাখেন ব্যয় করিয়ে বিস্তর।
খোসামুদে তোষামোদে, অনুগত ভেতো নর, হাড় চাঁচা, কাদাখোঁচা, ফক্কড়ে হাঁক আড়ম্বর
নিয়ে ব্যস্ত, হেড়া গোস্ত, কিড়িং ফড়িং ধান মটর শস্য পক্ষগণে,

বসেন ভোজনে, লয়ে দধি ক্ষীর সর।

হাড়গিলের, গলে দোলে দেখ যে লম্বা থলি, ও থলি নহে শুন বলি হরিনাম ঝুড়োজালি।
তুলে ওষ্ঠ, বলেন কৃষ্ণ, শ্রীধর বনমালী, কেশব মাধব হবে শ্রীকরেতে মুরলী।
কলির গুরুড, ভাব সুমধুর, মানে না দলাদলি, এই হাড়গিল মুনি ব্রহ্মজ্ঞানী ক্রিমি বমি সমাদর

সম্পাতি পক্ষিজাতি গীতিবর্ণন

[১৮৯] রাগিণী মঙ্গল—তাল কাওয়ালি

খগ সম্পাদি, কশ্যপ নাতি। খগ লীলা জাতিমালা কুলজি নবপুথি ॥
খগবর, শ্রীগরুড় কশ্যপ ঋষিনন্দন জটায়ু, সম্পাতি পক্ষি জাতিতে এরা ব্রাহ্মণ।
রাজহংস বংশাবলি সবে ক্ষত্রিয় রাজন, সারস বাবুই জাতি ব্যবসায়ী মহাজন ॥

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষি শূদ্র, শুক শারী হীরামন, কুলীন কায়স্থ পবহাম্মা।
নীলকণ্ঠ আদি খঞ্জন, আষ্ট ঘর, সেন সিংহ কব, গৃহবাজ বাজবউরি বাঁসপাতি ॥
(দে দত্ত দাস, হয় পাতিহাঁস, ভীমবাজ কপোত কপোতী) ॥
গলাফোলা, মুক্ষিগোলা, ডবডক্ষণ্ড পবপণ্ড সকর খুবে, পক্ষির গুছা কাদাখোঁচা,
কালপেঁচা বাহাত্তুরে, পাখী আবগিন, বঙ্গেব কুলীন, গুহ পদবি ধরে।
উত্তরবাড়ি কাযস্থ, মুবি মস্ত বুলি বাব কবে, বারেন্দ্র ফরিযাদি ॥
বাদী পেলে ঘাল ববে, কোবল বৈশ্য বুদ্ধি হৃদ, ঠকায কালো কাদেরে।
নবশাক চক্রবাক নবরঙ্গেব নবজাতি, ময়না মদনা চন্দন কামার

কুমার তিলি তাঁতি ॥

(নাপিত নবশাক ধূর্ত্ত কাক জগতে আছে খ্যাতি)।
শঙ্খচিল গোদাচিল, হাডগিল বক বকী কাকাতুযা, টিযা মোনিয়া।
ছত্রিশ বর্ণের পাখী, কবি উচ্চ নিজ পুচ্ছ নাচে আহিরী শিখী,
বেনেবৌ স্বর্ণবণিক, পাপিযা গন্ধবণিক যোগী চাতক চাতকী,
উগ্রক্ষত্রি দোযেল ঘোডেল শাখাবি চকাচকী, ছুতর কেওরা,
কাটঠোকবা বৈরাগি শকুনি মড়ার কবে সৎগতি ॥
(পেক মুবগী বগি, গুযেনেকডা, বাগদি জাতি) ॥
গৃধিনী পোদ হাডচাঁচা ধাই, পানকৌটী জেলেমালা।
ফিঙে আর তাল চড়াই, চামচিকে লাখে ২ ঝাঁকে ২ দেখতে পাই ॥
কলুব ঘানির মত কলু ২ রব কবিছে সবাই।
বুনো বাদুড মেথব, এক তিল অবসর নাই, টুনটুনি মহাজ্ঞানী,
সকল পক্ষীদেব গোঁসাই, মসনদ আদি তুলোর গদি, ডুমুব বৃক্ষে বসতি ॥
(মস্তবাবু বাস্তুঘুঘু চণ্ডাল কাল আকৃতি) ॥
বিশ্বজযী পক্ষী বাবুই বিশ্বকর্ম্মা হইতে শ্রেষ্ঠ,

ফ্রেঞ্চ চীন, লোকমান হাকিম হ'তে ইনি উৎকৃষ্ট।

চরাচর শিল্পকর, সকলে এঁব কনিষ্ঠ, ইনি শিল্প বিদ্যাতে জযী জগতে,

সকলের হ'তে জ্যেষ্ঠ ॥

বিশেষে দেশ বিদেশে বাবুই নাম আছে রাষ্ট্র,

ইঞ্জিনিয়রেব বাদশা, খাসা বাসা দেবলোকে বলে স্পষ্ট।

হায়রে বাবুই পৃথিবী জযী, পক্ষীব প্রজাপতি

(নবাব চাল, হামেহাল তালবৃক্ষে বসতি) ॥

ব্রজভাষার সঙ্গীত

[১৯০] রাগিণী পবজব'হাব—তাল কাওযালি

সঙ্গে লিয়ে কোয়েলা, পিউ ২ পিউ ২ বোলে পাপিয়া।
পিছে ধাওয়েত মনিয়া, পরহাম্মা, বুল বুল বোস্তা, হররঙ্গ চিড়িযা॥
ফডক ফুড়ুক ফুড়ুক পনছি চলে, পাখা সট্ পট ঝট পট বোলে,
ঝাঁকি ঝুঁকি দেকে খেলে, কুহু ২ ফুকাবে।
নাচে সবকে বিচে বিচে বাজে ধাকেটে ধুমকেটে ধেইয়া॥
কেনেরি, মুরি, আওর গোদাচিল, গাংসালিক গুযে সালিক,
বেল্লিক হাডগিল, পানকৌটী বারবিল বাঁসপাতি কপোত পাতিহাস টিয়া।
হাঁড়িচাঁচা কাদাখোঁচা পেঁচা দাঁডকেউযা॥
চক্রবাক চক্রবাকী শারীশুক বকবকী বঞ্জন খঞ্জন পাখী।
মৎস্যরাঙ্গা ফিঙ্গা শারী সুয়া ভীমবাজ চাতক চাতকী॥
টুনটুনি আরগিন শিখী, কাজলা মদনা গৃহবাজ শকনি গিধিযা॥
রাজহাঁস পাতিহাস, জলে থাকে বারমাস, সকল পাখীব অভ্যাস উদ্ধে যায উডিয়া।
চডাই চিক ২ রবে ডাকে, বাদুড পেঁচা চামচিকে ঝাঁকে ২ লাখে লাখে,
রাত্রপেঁচা ছেচা বোঁচা, ডাকে আধাব রাতিযা॥

[১৯১] বাগিং জযজযন্তী—তাল ঝাঁপতাল

ওরে সামাল সামাল, বাস্তুঘুঘুর পাল, বেবোল সাজিযে যেন পঙ্গপাল।
এরা কুহকমন্ত্র জানে বশীকবণ গুণে, লোকে টেনে এনে কবে বে নাকাল॥
খোসামদি তোসামদি আজ্ঞাকাবী মধুব চাটুবাক্য বদনেতে পুবি।
বাবু তোসা পেসা, খাসা দোকানদাবি, ধোনে ভাঙা রসিক চোঙা॥
ফর্কডগিরি, খেতে শুতে বসতে কুডোয় কত গাল॥
ঘুঘু বাবুর নাম জগৎ রাষ্ট্র, বাপন্ত পিতান্তে না হয এদেব কষ্ট॥
কথায় ২ লোকেব করেন অনিষ্ট, দেহটি বলিষ্ঠ বডই পাপিষ্ট,
গলা কাটে নোট কেটে, করে জাল॥
এই ঘুঘু বাবু কৃপা করেন যারে, শনি গহে তাব কি করিতে পারে।
গ্রহশান্তি যাগে শনি হতে তরে, ঘুঘু বাবু সাক্ষাৎ মহাকাল॥
পূজালন ঘুঘু ষোডশ উপচারে, ধুনোর গন্ধে যেন মনসা নৃত্য কবে।
এদের কুমন্ত্রণায় ভিটেয় ঘুঘুচরে, ধনহরে, মান হবে করে নাজেহাল॥

গৃহস্বামী যার আছেন বর্ত্তমান, দূরে থেকে, দেখে ২ ছোটে যান।
সুচারু গাছ গোরু, বালক যদি পান ছলে বলে ঠুকে বসেন তাল ॥
প্রথম নাটক সখের ভালবাসা, চরস তাসের রস অবিদ্যার নেসা।
সুরার সলিলে ঢেলে সকল পয়সা, খাসা বাসা কারাগারে হরে কাল ॥
ভূতে পেলে ছেলে রোজাতে ছাড়ায়, মন্ত্র ঔষধিতে ঘুঘু না ডরায়।
যারে পায় তারে শেষ করে যায়, ঐশ্বয্য রাজ্য বেচায় ঘটি থাল ॥
কবি কহে যার স্কন্দে চাপে ঘুঘু, দুঃখ সিন্ধু মাঝে খায় হাবুডুবু।
ঘুঘুর মায়ায় কভু যেওনা বাবু, শেষে হাপু গুণবে বাবু, তোড়ে প'ড়ে ভেসে যাবে বৈষয় হাল ॥

কলির গরুড় শ্রীল শ্রীহাড়গিল গুণগান

[১৯২] রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা

লম্বা ঠেঙ্গে কি ঢঙ্গে হাড়গিলে চলে। পাখা নেড়ে ঝেড়ে উড়ে বাসে হেলে ॥
(তাঁর পাখার পবন, সাইকোলন বোধ করে সকলে) ॥
দেহটি স্থূলাকার নধার দীর্ঘাকার, শ্বেত কৃষ্ণবর্ণ তার পাখায় মলে ২।
জগৎ শ্রেষ্ঠ লম্বা ওষ্ঠ রাষ্ট্র ভূমণ্ডলে (মস্তকে রেখেছেন শিককে কেঁদে পাকা চুলে)
হাড়গিলের নিষ্ঠাধর্ম্ম, ভজন তাঁর এক ব্রহ্ম, অন্য ধর্ম্মে মন কভু না টলে।
যাননা সমাজের মাঝে মিশেন নাকো দলে (হাড়গিল তপা, সদাপাপী নহেন ভজন [illegible])।
মান্য সুরাসুর, বিজয়ী তিন পুর, কলির গরুড় শ্রীশ্রীযুক্ত হাড়গিলে।
ইনি ব্রহ্মজ্ঞানীর, শিরোমণি, হয়েছেন যোগবলে
(বিষ্ঠা রমি, স্বাব ত্রিগুণ এক ভাবেন হলাহলে) ॥
নাহি তাঁর গৃহবাস, বনেতে করেন বাস, বহিবাস চোনন কোঁচলে।
প্রধান ধর্ম্ম, অন্ন ব্রহ্ম, ভেড়ার হেড়া চলে (মড়ি গুলির পাল একত্র করে সদা দোলে) ॥
নাহি তার জীব হিংসা করেন না কোন নেসা, সমভাবে ভালবাসা,
জীবজন্তু সকলে, সর্ব্বপ্রিয় জিতেন্দ্রিয় ভূযোঃ ২ বলে ॥
(হাড়গিল পাঠক, অজাচক, তুষ্ট আহার পেলে) ॥
সহরে আনাগোনা, ছটী তাঁর বৈটকখানা, ছয় জায়গায় গমন হয় কিঞ্চিৎ সময় পেলে।
ধর্ম্মতলায় প্রত্যুষে, গভর্ণমেণ্ট প্যালেসে বেল্লায় বসে, আকাশে উড়ে পবন হিল্লোলে ॥
(নিমতলার ঘাট, ধাপার মাঠ, রেখেছেন দখলে) ॥
হাড়গিলে নির্ব্বিকার, ধারেন না কার ধার, সংগুণ শুদ্ধাচার,
দেশহিতে থাকেন পদতলে।
কহে দীন খগপতি, হাড়গিল ঋষির জাতি, রক্ষক দ্বীপে বসাত মহাবলী বর্ম্মবলে ॥
(কি করবে ব্যাধে, পড়েননা ফাঁদে, বরা নন নাই দলে।

[১৯৩] রাগিণী মুলতান—তাল একতালা

"গরুড়স্তা'ন গরুড় স্তার্ক্ষো বৈনতেয় খগেশ্বরঃ।
নাগান্তকো বিষ্ণুরথ সুপর্ণো পন্নগাশনঃ॥"

গরুড় গরুড় বল বদনেরে রসনা। এমন দিন ভবে আর হবে না॥
যেতে ভব পারে, ভয় কি আছেরে, বগলে বেরুবে দুখানি ডানা (উড়ে যাইও)॥
কুমারীর শিশু, কেহ ভজে পশু, নেড়া নেড়ী, রাঁড়ী করে সাধনা।
কেহ মানব ভজা, করে দালিম গাছে পূজা, কাষ্ঠ লোষ্ট্র ভজার বিড়ম্বনা (ভ্রমে)॥
তেত্রিশ কোটী দেবতা, কশ্যপ ঋষি পিতা, তাঁর ঔরস জাতা, ফণি দমনা।
রণে হারিয়ে দেবেন্দ্র, নাম দিলেন খগেন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্র যাঁর ভাবে মগনা (স্বয়ং)॥
খগ ভক্তেতে অন্তিমে, যায় গরুড় ধামে, যমের গরিমে তথা খাটেনা।
এসে যম দূতে, পারেনা ছুঁইতে, নখাঘাতে দূতে করে তাড়না (খগপতি)॥
আছে বীজমন্ত্র, শ্রীগরুড় তন্ত্র, যত্নে স্মরে লয়ে যোগ করনা,
রে জীব অশান্ত, ত্যজিয়ে ভ্রান্ত, তার নখ প্রান্ত চিন্তা করনা (সচেতনে)॥

[১৯৪] রাগিণী রামকেলি—তাল কাওয়ালি

ভজ মন গরুড় চরণ, অনায়াসে লভিবে কারণ, জীবন্মুক্ত, সুপণ্ডিত নারায়ণ বাহন।
(তাঁরে প্রণিপাত কর যার পৃষ্ঠে দিনে কর, পাবে ত্রৈলোক্য ঈশ্বর ব্রহ্ম সনাতন)॥
শিলাকাষ্ঠ সোনা ক'রে মনুজে যত্নপি তবে, তবে কেন শ্রীগরুড়েনা করে স্মরণ,
দিন যায় অবহেলে ডাকরে গরুড় ব'লে, ঢেকি ভজে কৃষ্ণ পেলে, প্রকাশ্য ভুবন (মন)॥
মাতঙ্গ পশু রাজা, মকরবাহিনী ভজা, শক্তি অগ্রে অজা পূজা, আছেযে প্রমাণ।
বুদ্ধ জিন গুরু নানক, আদ্য পঞ্চ উপাসক, নব হুল্লোড় ভজে লোক, নব যুবাগণ॥
(মানুষ পূজা, কর্ত্তাভজা, বলে মহাজন)॥
ষষ্ঠী মাকাল কেতু রাহু, পিশাচসিদ্ধ ঊর্দ্ধবাহু, কেহ বৃদ্ধি করেন আয়ু করে যোগাসন॥
সকল পন্থার রাজা, শ্রেষ্ঠ জেন গরুড় ভজা, ভয়ে হয় সবাই সোজা।
নখাঘাতে, রবি সুতে করিবেন দমন (নাম সুমধুর গরুড় গরুড় কররে কীর্ত্তন)॥

কলিকাতা বর্ণন

[১৯৫] রাগিণী সিন্ধুকাফি—তাল যৎ

ধন্য ধন্য কলিকাতা সহর, স্বর্গের জ্যেষ্ঠ সহোদর।
পশ্চিমে জাহ্নবী দেবী দক্ষিণে গঙ্গাসাগর (পূর্বে বাদাচিংড়িহাটা পদ্মানদী তদুত্তর)॥
হেষ্টিংস ব্রীজ বাগবাজার, এই আয়তন তার।
সরকিউলার রোড পোরমিট ধার, চতুঃসীমা সার॥

অতুল্য মর্ত্ত্য ভুবনে, বৈকুণ্ঠ যায় হারমেনে, হেরে টেলিগ্রাফ।
বলে বাপ, লাজে লুকায় পুরন্দর, (তারেতে তার, বর্ণ বিস্তার, ধন্য শিল্পী কারিকর)॥
তার হেরে তাঁর লাগলো দিশে, তারে তারে খবর এসে, ছয় মাসের পথ এক দিবসে,
মেলে ত্বর অনায়াসে।
ধন্য ডাক্তার ওসগনেসি, সকলকে করেছেন খুসী,
বৃটনদেশী গুণরাশি, সুখে বসি হউন অমর॥
(রোগশোক তাপ নাশি হউক সরল অন্তর)॥
স্বর্গধামে মন্দাকিনী, কলকাতাতে সুরধুনী,
নন্দন কানন ইডেন গার্ডেন সম নিছনি।
ইন্দ্রের বাহন ঐরাবৎ, কলকাতাতে ফিটেন বগ,
পারিজাতকে করে মাৎ গোলক সিঁউতি নাগেশ্বর।
(ফুলের টবে ধাপে ২ শোভা পায় সিঁড়ির উপর)॥
বরিষায় হয় বজ্রাঘাত, হেথা কামান ঝাড়ছে দিন রাত, স্বপ্রাতে সাজে নিশির প্রভাত।
স্বর্গে আছেন ইন্দ্রের শচী, এমন শচী দেখলে হয় অরুচি,
ইংরাজের মিস রুচি রুচি অঙ্গভঙ্গি বহুতর॥
(গাউন পরা রুমালভরা এসেনস্ বোজ লাভেণ্ডার)॥
উর্ব্বশী কিন্নরী, রম্ভা নর্ত্তকী সুন্দরী, সম সৌদামিনী জ্যোতি সম সুন্দরী।
কলকাতাতে তয়ফাআলি, খেমটাআলি চপআলি, মেগে পাঁচালি,
যাত্রাআলি, গলি গলি তব বিস্তর (খেমানী, টপ্পাআলি, মদমাতা গায় বা)
পরিষ্কার পথ নাইকো ময়লা, সারি ২ গ্যাস লাইট আলা।
চন্দ্রদেবের ষোলকলা, হতে উজ্জ্বলা, শুক্লপক্ষে উদেন শশী,
এর পক্ষপাত নাই কোন নিশি, কৃষ্ণপক্ষ, শুক্লপক্ষ উভয় পক্ষ সমান আলা
(চাঁদেতে আর "তাতে" তুলা কল্লে ইংরাজ কারিকর)॥
কবিয়ে বুদ্ধির কৌশল, নলা হতে আনলে জল।
জমে শত সিংহের বল, লক্ষহাত প্রবল, ধন্য বৃটেন রাজধানী, প্রস্রাব ঘরে বাহিরে সুরধুনী
অপঘাতে ম'লে প্রাণী, তাহার ভূতযোনীর নাহিক ডর॥
(যাবে মন সুখে, স্বর্গলোকে, হইযে অমর নর।)
আমরি কি পরিপাটী, বৃটেন রাণীর বাড়ীটী, আর্দ্দিটা বটা পাঁচটী ফলত একটী,
প্যালেষ অব গভর্ণমেণ্ট, শোভা জিনিযে বৈকুণ্ঠ, গড়ের মাঠে মনুমেণ্ট,
পেঁড়োর মন্দিরের ফাদর (আখাম্বা সাজোয়ান লম্বা, যেন ভগদত্তের বাবার বর)॥
ফোর্ট উইলিয়ম ইংরেজ কেল্লা, কামান বন্দুক গুলিগোলা,
চারিপাশে দ্বার খোলা, জল প্রনালা, যড়যন্ত্র এমনি কল।

বিপক্ষে না পায় স্থল, সেলে থানায় অস্ত্র মহল, সোরজার সব ভয়ঙ্কর ॥
(ইংলণ্ড গোরা, খোস চেহারা যুদ্ধেতে অতি তৎপর) ॥
আরটিলারি ক্যাভেলারি, কাপটেন লেপটেন কর্ম্মচারী।
জেনারেল কর্ণেল মিলিটরি, অশ্বউপবি, ধন্য রে ব্রিটিশ সৈন্য, ত্রিজগৎ বাধ্য মান্য।
সর্ব্ববীর অগ্রগণ্য স্বয়ং প্রভু কম্যাণ্ডার (শোভে টুপির উপর শ্বেত ফেদর) ॥
গবর্ণর জেনারেল বেঙ্গল গভর্ণর, প্রাইভেট সেক্রেটরী মেম্বর,
এডিক্যাম্প কমাণ্ডার, এডমিনিসট্রেটর, রেজেষ্টর,
লেজিসলেটিভ ফ্যাইন্যানস্যাল, হোম মিলিটারি জুডিস্যাল,
ফরণ গবর্ণমেণ্টের অধীন, মেরীণ পোষ্টমাষ্টার ॥
(জোরদণ্ড ইংলণ্ডেশ্বরীর, প্রাণ্ডী রাজ্ঞী মনোহর) ॥
বৃটিশ বড়সাহেব, ভাবেন সর্ব্বজীবে সমভাব, কি রাজা প্রজা নবাব,
রাখেন সবার সঙ্গেই ভাব, প্রজায় পীড়ন কল্লে রাজা, বিচারে দেন উচিত সাজা।
বৃটেনগণের আইন সোজা, মুড়ি মিছরির একদর ॥
(বাঘেতে ছাগেতে জলপানের এক সরোবর) ॥
ট্রেজারি ট্যাকশাল, হাইকোর্ট, টাউনহল, পোষ্ট আফিস,
বাংশাল, পুলিশ সেণ্টপাল, সল্‌টবোর্ড বেঙ্গল হোম, মেটকাপ্ হল।
সেলার হোম, হরিণ বাড়ীর কড়া হুকুম, চোরের পক্ষে যমের ঘর ॥
(খোয়া ভাঙ্গায়, ময়দা পেষায়, ঘানি টানায় নিরন্তর) ॥
ধন্য ধন্য ট্যাকশাল, তোমের হচ্ছে নগদামাল, সুখে থাকুক চিরকাল, বৃটেন মহাপাল,
হয় লক্ষ টাকায় একশ মোট, লোকে খোঁজে ব্যাঙ্কের নোট।
হায় কি কাগজের চোট, নোটে লালাইত বাহির ঘর ॥
(বদলাইয়ের সময়, আপনার টাকায়, আপনারে করিতে হয় স্বাক্ষর)
জাহাজে পূর্ণ জাহ্নবীর গর্ভটী, আমদানী রপ্তানী জেটী, মাল তোলার কল পরিপাটী,
শোভে কয়েকটী, যে মাল খ্রীযাব হোতো এক মাসে, তাহা হচ্ছে, এক দিবসে।
চয়লাপ জেটীর পাশে পাশে, কচ্চেল পোর্ট কমিসনর ॥
(খিদিরপুরে ডক হবে, তার পাশেতে খাল খুলিবে যাবে সাগর বরাবর) ॥
ইষ্টিম ভেসেল রেলওয়ে, এই সকলের তেজ হেরিয়ে,
বেদ ব্রহ্মা ভোমা হ'য়ে, গেলেন চাপিয়ে, অগ্নি জল আর পবনে।
যায় এক মাসের পথ একটি দিনে, এক কোটী মণ দ্রব্য টানে, নাহি রাত্রি দিবা অবসর
(রেলের বাঁশী শুনে আসি, যোটে যত নারী নর) ॥
লেসলী সাহেবের বুদ্ধি নিজ, হাবড়ার ঘাটে ফাষ্ট ব্রীজ,
শিল্পবিদ্যা, জগৎ আরাধ্যা, হায় কি আজব চীজ।

ত্রেতাতে ভেসেছে পাথর, ইনি লোহা ভাসান জলের উপর,
মাঝে খুলিলে, জাহাজ চলে, অর্দ্ধ ঘণ্টার ভিতর ॥
(রেল চলিবার হেতু, হুগলির সেতু, জুবিলি ব্রীজ নামান্তর) ॥
হুষ্টেল হোটেল কাফি রুম, বোর্ডিং লজিং বেদিং রুম,
আড্ডা নানবাই মোগলাই মিঠাই, ইংরেজের বলরুম, চণ্ডুগুলি বহুতর।
ভেটেল্‌নীদের খালি ঘর, পাখীব্যাচ, কাদাখোঁচা উল্লুক ভল্লুক বুনোনর ॥
(বিলাতি ইন্দুর কেনেরি, নুরী, শুক সারি, পরহ্যামার পর) ॥
আম হউস অতিথিশালা, কত আছে যায় না বলা, রাবণের চিতার মত খোলা।
জলে দুবেলা, আহার প্রস্তুত পাকিকাঁচি, যার যেরূপ হয় অভিরুচি
পিষ্টক পায়স মাংস লুচি, ভারতাশ্রম ধর্ম্মের ঘর ॥
(ন্যাড়া নেড়ী, খালি বাড়ী কর্ত্তা ভজা স্বতন্তর) ॥
পুলিস সেকসন এক্সেসন, ইংস্পেক্টর ঘুরে সহর নেটিভ ইউরোপিয়ান,
ডি. উইলসন কেশব সেন, আছেন সবাচন জেনটেল্‌ম্যান।
গঙ্গাধর সেন, রমানাথ সেন, আরাম করেন দিলে জর ॥
(হোমিওপ্যাথিতে সুখ্যাতি নিলে সরকার মহেন্দর) ॥
এলোপ্যাথিক অলিগলি, হামিজ খাঁ আশ্রপ আলি, জগবন্ধু, ব্রজবন্ধু,
হালদার কালী, ধর্ম্মদাস রামনারায়ণ দাস, শিবু দাস, কৃষ্ণদাস,
নীলমাধব, লালমাধব, কাস্গিরি, আর জি. কর ॥
(আর হাতুড়ে ডাক্তারের ভিড়ে, পথেতে চলা দুষ্কর) ॥
নিকাশ হচ্ছে ময়লা জল, করেছে প্রস্তুত ড্রেনেজ কল,
ধুলো থামে দিলে জল, স্বতন্ত্র এক কল, অগ্নিদেব হলে প্রবল,
নির্ব্বাণ করে দমকল গোরাদের চেহারা দেখে, ভয়ে পলায় বৈশ্বানর,
পাল্লে জল যোগাবে, সাধ্যমতে সাধ্য কি যে পোড়ে ঘর ॥
(মেসিনেতে দিলে দম, ডাকে ঝম ঝম, তেজে বেরোয় ওয়াটর) ॥
সকল প্রস্তুত কলিকাতাতে, এমন নাই এ ভূভারতে এক লামার্টিনের ফণ্ড হতে,
তরে জগতে, অনাথ মন্দির ঔষধালয় জেলে জেলে অন্ন বিলোয়,
ঐ ফণ্ডের ধন, কারাগার হয় মোচন ইনসলভেন্ট পায় নর ॥
(অন্ধ খঞ্জে, টালিগঞ্জে, টিকিট পায় বৎসর বৎসর) ॥
সতীর কনিষ্ঠ অঙ্গুলি, কলিকাতাতে আছেন কালী, মা কালী,
কলকাতাওয়ালী সর্ব্বমঙ্গলী, শ্যামা মায়ের কি বৈভব।
প্রত্যহ হয় উৎসব, ঈশানেতে কাল ভৈরব শ্রীপ্রভু নকুলেশ্বর ॥
(কালী ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য দেবগণের অগোচর) ॥

বার মাস নিশি দিবা, হতেছে অতিথি সেবা, প্রতি ঘরে দেব সেবা, দেবী আর দেবা,
বাগবাজারে মদনমোহন, ভক্তগণের জীবন ধন, উত্তরে গুপ্ত বৃন্দাবন খড়দহে শ্রীশ্যামসুন্দর।
(নিত্যানন্দ সুত, বীরভদ্র সেবিত, তরাতে ভবেরি নর) ॥
স্থানে স্থানে পুরাণ প্রকাশ, চতুষ্পাঠীতে হয় বিদ্যা অভ্যাস,
ঝুলন দোল নিত্য রাস শ্রীকৃষ্ণ বিলাস, কৈলাসনাথের লীলা প্রকাশ,
খিদিরপুরে ভূকৈলাস, হরিসভা বার মাস সঙ্কীর্ত্তন অষ্টপ্রহর ॥
(মহোৎসব নন্দোৎসব সাধুগণের সমাদর) ॥
পল্লী পল্লী দেবালয়, বর্ণিবার সাধ্য নয়, ঔষধালয়, ধর্ম্মালয, অতিথি আলয়,
ইংরাজ ডাক্তার কি মজবুত, হেরে পলায যমের দূত, এক আধটা হাতুড়ে ঘাটা,
ছায় ছাপটা যায় যমের ঘর ॥ (গলায় দড়ী চেপে গাড়ী জলে ডুবে মরে নব) ॥
কাশী ক্ষেত্রে অন্নপূর্ণা এখন তথাকার লোক অন্ন পায না।
চোর বাগানে ক্ষুধার্ত্ত জনার নাহি বঞ্চনা, রাজ রাজেন্দ্র মল্লিক বায়,
অকাতরে অন্ন বিলায়, বসৎ বাটী পবিপাটি মর্ত্ত্যের বৈকুণ্ঠ নগব ॥
(চিড়িয়াখানার যে কারখানা বাণী বর্ণিতে কাতর) ॥
লালাবাবু, আশুতোষ, মতিলাল শীল, কৃষ্ণ বোস, পুণ্যবান নির্দ্দোষ,
অকুতো সাহস, স্বর্ণময়ী রাসমণি, আছেন বহু দানী মানী, গুণী, জ্ঞানী শিবোমণি,
অধ্যাপক বিদ্যাসাগব ॥ (কলকাতার গাছে পাতায রত্নগাঁথা, কোথা লাগে বত্নাকর) ॥
বাগবাজাব, কুলীবাজার, বাজারে বাজারে একাকার, এত বাজার দোকানদার,
কোন রাজ্যে নাইক আর, পাহারাওযালা গলি গলি, হাতে লযে পুলিস ঝুলি,
দেখিলে মাতাল মাতোযালী, ঠেলে ঢুকায গারদ ঘর ॥
(উত্তম মধ্যম অধম দিয়ে করে বহু সমাদর) ॥
চিৎপুর রোড, চৌরঙ্গী রোড, মেছুযাবাজার রোড, এলিযেট রোড,
এসপ্ল্যানেড রোড, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, থিযেটাব রোড, পার্ক ষ্ট্রীট, ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
বিডন ষ্ট্রীট, ক্যানিং ষ্ট্রীট, বসল ষ্ট্রীট, ক্যামাক ষ্ট্রীট, জানবাজার, বহুবাজার বৈঠকখানা
সাবকিউলর ॥
(অলিগলির ঘরগুলি মিউনিসিপ্যালের গোচর) ॥
গবর্ণমেণ্ট প্রেস, ফ্যারলি প্রেস, ওয়েলেসলি প্রেস, হিউমাউন প্রেস,
কত শত আছে প্রেস, কে করে তার শেষ, ম্যাঙ্গো লেন, জিগজ্যাগ লেন,
ডিক্রুস লেন, ব্রাটুস লেন, ভিকটোরিযা টেরেস, এজরা টেরেস, সারপেনটাইন স্ক্যাভেঞ্জর ॥
(লায়নস্ রেঞ্জ, মিছরি গঞ্জ, এক্সচেঞ্জ থইরমেটর) ॥
পাটের কল আর ময়দার কল, রেড়ির কল, কাপড়ের কল, সুরকির কল,
জলতোলা কল, খোয়া ভাঙ্গা কল, কলাকৃতি ঐরাবৎ, করে এক দিবসে সোজা পথ।

কলের খুরে দণ্ডবৎ, জুড়ে গেল গ্রাম নগর ॥
(আনাচে কানাচে কল পেতেছে, দাসদাসী মেলা দুষ্কর) ॥
সেরে দিলে কলে কলে, এর পরে কলেতে বানাবে ছেলে।
পুত্রহীন মহীমণ্ডলে থাকবে না মূলে, মনে ক'রবে বিষয় ভোগ ॥
পিণ্ড পাবার এই সুযোগ, পুত্রহীন মহারোগ হতে হবে অবসর।
(একটা ম'লে কল চালালে দশটা পাবে ফি বছর) ॥
কলিকাতার যে নিছনি বর্ণিতে অশক্ত বাণী, পার চলে না লেখনি সংক্ষেপেতে ভণি।
কত রোড কত গলি, সাধ্য কি যে তাহা বলি, ইচ্ছা করে ছবি তুলি, হয়ে উঠা সে দুষ্কর ॥
(অল্পে স্বল্পে ন্যূন কল্পে ভণে দীন খগবর) ॥

ফ্রেঞ্চ প্রুসিয়ার যুদ্ধ বর্ণন

[১৯৬] রাগিণী মুলতান—তাল একতলা

পড়তা কাত, বাজি মাৎ, করলে প্রুসিয়া।
কি আশ্চর্য্য ফ্রেঞ্চ রাজ্যে হ'ল বদ হাওয়া,
হায় জগদীশ, প্যারিস লুইস বিষ হারা ঢোঁড়ার কায়া ॥
বোনাপার্টি ছিল ফ্রেঞ্চ রাজ্যপতি, হেন যোদ্ধা আর জন্মে না সম্প্রতি।
যার দম্ভে কম্পে ইউরোপ খণ্ড পৃথ্বী সুখ্যাতি এ ক্ষিতি জুড়িয়া ॥
দানে কর্ণ সম প্রতাপে রাবণ, ভীষ্ম তুল্য যুদ্ধে মানে দুর্য্যোধন,
যম সম তারে হেরে সর্ব্বজন, রণজয়ী সেই বীর হিয়া।
সে বংশে উদ্ভব লুইস নৃপবর, নিগম না জানি যুদ্ধে কৈল ভর,
সপ্তরথী মিলি প্রুসিয়া ঈশ্বর, (যেন) অভিমন্যু নিল ঘেরিয়া ॥
প্রুসিয়ার কিং উইলিয়মে হেরে, লুইস নৃপবর যুদ্ধ ত্যাগ করে।
ভীষ্ম হেরে যেন শিখণ্ডি সমরে ধনুর্ব্বাণ দিল ফেলিয়া ॥
লুইস বন্দি হতে প্যারিস সৈন্যগণ, নিঃসহায় হইয়া প্রবেশিল রণ।
ঘেরিল সে দলে ব্যাবেরিয়ান স্যাকসন, মিলে পাঁচে পেঁচে দিল ফেলিয়া ॥
ফ্রেঞ্চ যোদ্ধাগণ বহু যুদ্ধ করি, আহারের ক্লেশ শেষে পেলে ভারি।
ঘোড়া ভেড়া ছাগ খেলে ধরি মারি, সংকটে বেলুনেতে লুকাইয়া ॥
প্যারিস ফরাসী অতি বুদ্ধিমান, ছোরা পোরা গোলায় ঝাড়িল বামান।
তোপে খেপে খেপে মরে প্রুসিয়ান, রণ ক্ষান্ত দিল হেরিয়া ॥
খেপে খেপে তোপ তোপে অস্ত্র যায়, গগনে উড়িলে ধূমে ধূমাকার, সপ্তবাণ মারি,
করে ছারখার, পুনঃ সৈন্য আসে সাজিয়া (রক্ত বীজের প্রায়) ॥

যেমন জরাসন্ধ ছিল একাদশী ক'রে, অনাহারে ভীম সহ যুদ্ধে মরে।
সেইরূপে ফ্রেঞ্চ এই যুদ্ধে হারে, কে জানে চক্রীর কি মায়া ॥
(যেন ষষ্ঠীর দিনে হ'ল বিজয়া)॥
করে অসি মুক্ত কেশী ফ্রেঞ্চ নারী, থলি পোরা গোলা নানা অস্ত্র ধরি,
রণমাঝে যেন বিরাজে শঙ্করী, নির্ভয় কায়াতে অভয়া ॥
প্রুসিয়া বসিল প্যারিস কেল্লা ঘেরে, (এরা) গগনে বেলুনে যাতায়াত করে
বিসমার্ক বাদী কি করে ফিকিরে, রণ-বিকায়ে দিল সারিয়া ॥
সন্ধি করে ফ্রেঞ্চ বিপদ দেখি, প্রুসিয়া লইল আশী লক্ষ পাউণ্ড চাকী।
মান গেল, শেষ প্রাণ রইল বাকী, আকাশ পাতাল ভাবিয়া ॥
চিরদিন সমান যায় নারে ভাই, উন্নতি বিলয় প্রায় দেখতে পাই।
ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসিছে সদাই, কালে হ'ত হবে তুনিয়া ॥
করিয়া মিনতি খগপতি কয়, মিলে মিশে থাকা সর্ব্বজাতির শ্রেয়।
অতি দক্ষ যার, তার বল ক্ষয়, কভু ভাল নহে অসুয়া ॥

মহাত্মা গবর্ণর মার্কুইস অফ রিপণের গুণগান

[১৯৭] রাগিণী মিশ্রমঙ্গল—তাল কাওয়ালি

রিপণ গবর্ণর, নয় সামান্য নর। হিংসা দ্বেষ, নাহি লেশ, সর্ব্ব জীবে সমাদর ॥
খৃষ্টাব্দ আঠার আশি, আটুই জুনে গুণরাশি, ইণ্ডিয়ায় নির্বিঘ্নে আসি,
সিমলা হিলেতে প্রবেশি, কাবুল ওয়ার তম নাশি, সৈন্যগণের সন্তোষী।
প্যালেসে আসিয়ে বসি, উদয় পূর্ণ শশধর ॥
যে দিন হ'তে ইণ্ডিয়াতে হয়েছে শুভাগমন, অনাবৃষ্টি দুর্ভিক্ষ সেদিন হতে নিবারণ।
সুলভ মূল্যে তণ্ডুল কুশলে সব প্রজাগণ মারি ভয় তত নয়, সুখে করে কাল যাপন।
নিজগুণে ইণ্ডিয়ানে দিলেন আত্মশাসন।
প্রেস এক্ট মহাকষ্ট নষ্ট কৈলেন সুধীবর ॥
রাইটারস্ বিল্‌ডিং কোরে হত নব বিল্‌ডিং হোলো হাল।
নারীর ব্যায়রাম আরোগ্য ধাম ইডেন নামে হাসপাতাল ॥
ইম্পোর্ট ডিউটি গেলো উঠি সস্তা দরে পাবে মাল।
ট্রামওয়ে, চলেছে ধেয়ে, প্রাতঃ হ'তে রাত্রকাল ॥
পবলিক ওয়ার্কে, কত লোকে, সুখেতে কাটাচ্ছে কাল।
পোষ্ট আফিসে, দিলেন ঠেসে, অনা'সে, মণি অর্ডার ॥

ওহাবি কেশ ক'রে শেষ গেজেটে করিলেন প্রকাশ।
নির্দ্দোষীরা হ'ল খুসী বেকসুর পেয়ে খালাস ॥
ইণ্ডিয়ান সিবিলিয়ান যাবেন না আর বিলাতে।
ইণ্ডিয়া গবর্ণর দিলেন অর্ডার পাশ হবে এই ভারতে ॥
ধর্ম্ম অবতার ধর্ম্মের বিচারে চলেন ধর্ম্মের পথেতে।
এরূপ ভাইসরায় ইণ্ডিয়ায় পাবনা জন্ম জন্মান্তরে ॥
হুগলির সেতু নির্ম্মাণ হেতু তাঁহার অগ্রে হয় মনন।
কলিকাতাতে চৌরঙ্গিতে তাঁর আজ্ঞায় একজিবিশন ॥
তাঁর সময়, এসে বাঙ্গলায়, বঙ্গেশ্বর রিভার টমসন।
মাদ্রাজবাসীকে করলেন খুসি কারাগার করে মোচন ॥
ইলবার্ট বিলে বেহার বেঙ্গলে করেন সুখী গুণাকর ॥
চৌদ্দ আইন বড়ই কঠিন ছিল বার বর্ণিতার, হিন্দুধারী নারীগণে।
তা হতে পেলে নিস্তার, ইণ্ডিয়ার শিল্পচাত আছে যে যত প্রকার ॥
পুন করিতে উচিত মত স্থির হোলো তাঁর।
প্রজা বৎসল গবর্ণর জেনেরল রিপণ ধর্ম্ম অবতার ॥
উচ্চ শ্রেণীর সাহেব ইনি দয়ালু দয়ার সাগর।
(জিতেন্দ্রিয় সত্যবাদী, প্রতিনিধি রাজ্যেশ্বর) ॥
অতি রাগে রেগেতে ইংলিশম্যান ছাপাগালা, নেটিবে চিপ জষ্টিস হলো
প্রকাশে পাত্র জ্বালা, সর্ব্বজীবে সমভাবেন ভিন্ন না [illegible]।
সিনিয়ার যিনি পাবেন তিনি যথার্থ হ'ল [illegible],
কহে খগে অনুরাগে বঙ্গজের হক [illegible],
দুর্লভ সম্পদ চিপ জষ্টিস পদ প্রাপ্ত রমেশ মিত্তির ॥
(লেডি গবর্ণর, হোন অমর, সুখেতে রাখুন ঈশ্বর) ॥

ঊনবিংশ শতাব্দীর বিবাহ বর্ণন

[১৯৮] রাগিণী মিশ্রসিন্ধু—তাল ঠুংরি

আমরি কি নাকাল, কন্যার বিবাহ কাল, আজকাল হচ্ছে বঙ্গদেশেতে।
মাতৃদায় পিতৃদায়, এর আগে লাগে কোথায় ভিটে মাটী চাটি হয় বিয়ের ব্যয়েতে ॥
(কত শত মানীর হতেছে মান হানি, ছাই চাপা পড়ে গেছে মা নব মুলেতে) ॥
বল্লালি বাঁধা কুল, প্রায় হ'ল নিম্মূল, বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল সুরু যে হ'তে।
এনট্রেন্স এক পেশে, এলে দো পেশে, [illegible] পেশে, মাঙ্গ ভারতে ॥

বল্লভি সর্ব্বানন্দ, ফুলে খড়দহ হয় না স'ন্ধ, পাশ করা ছেলে পসন্দ, সকল মেলেতে।
কন্যা দিতে হন ব্যস্ত অর্থ নাই শূন্য হস্ত, হইয়ে ঋণগ্রস্ত পড়েন দায়েতে॥
অর্থাভাবে কত লোকে, পড়িয়ে বিষম বিপাকে, থুবড়ী মেয়ে ঘরে রাখে নিরুপায়েতে।
খত লিখে কর্জ্জ ক'রে খুঁজে দেশ দেশান্তরে, সগভা দান করে, বৎস সহিতে॥
বারেন্দ্র বৈদিক, সকলের ততোধিক, কি আর কব অধিক নারি বর্ণিতে।
সম্বন্ধ না হ'তে, বরের মুরুব্বিতে, লম্বা ফর্দ্দ দেন হাতে নবাবি মতে॥
মহামান্য কুলিন ঘরে, পাশ কবা বাহাদুরে, আদর করে ধ'রে তারে, হয় কন্যা দিতে।
জড়াও গহনা রূপার ঘাট, ঘড়ি চেন আলবার্ট, বরযাত্রীর মদের চাট হয় যোগাতে॥
কন্যা কর্ত্তা এসে, নিষেধ করে বিশেষে, দিগুনা মর্ম্মে ব্যথা, ধরি কবেতে।
বরপাত্র, রেগে কয়, আমবা তো কুলিন নয়, তেপেশে দিগ্বিজয়, উনবিংশেতে॥
বাইশ পোঁচ কালা কাফ্রি, পাশ করার বিষম জারি, পাত্রী খোঁজেন সুশ্রী, কিন্নরী হতে।
পাকা বাড়ী মার্ব্বেল ম্যাজ, দরয়ানের রূপার ব্যাজ,
হীরেব আংটি সোনার ল্যাজ ঝুলবে পশ্চাতে॥
ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র জাতির ছিল নাকো এ পদ্ধতি, সর্ব্ব বর্ণে হয় সম্প্রতি, দেশের রীতিতে।
জন্মে পাশ করা নয়, বওযাটে ফেল নয়, বরের বাবা মিথ্যা কয় ধন লোভেতে॥
দাতব্য পাঠশালে চিরকাল পড়ে ছেলে, বিয়ের সম্বন্ধ এলে, দেন স্কুলেতে।
বিবাহে মেরে মাল, গুমী গুটিয়ে নেয জাল, যে রাখাল সেই রাখাল পাঁচনী হাতে॥
চার পেশের কর্ত্তা পক্ষ, ঠিক যেন সর্ব্ব ভক্ষ, যার ছেলে গণ্ড মূর্খ সে মরে দুঃখেতে।
ছেলে হলে গুণবন্ত, এক রাত্রে হ'তেম ভাগ্যবন্ত, পোড়াকপালী ভ্যাডাকান্ত ধল্লে গর্ব্বেতে॥
বিয়ের গোল দেখে ভারী, বণিকে কমিটি করি, এক হুকুম কল্লে জারি, সপ্তগ্রামীতে।
এরূপ সোনা দেনা লেনা, অধিক চাইতে কেউ পাবে না, স্বাক্ষর ক'রে সর্ব্বজনা,
চলেনা মতে॥
অলঙ্কার চায়না ইদানি, কোম্পানির কাগজ রেডিমণি, বাড়ীর পাট্টা সোণার গিনী,
চায হাতে হাতে।
মেয়েব বেলা বেল তলা, নিমতলা ছাদ খোলা, মরা দুগাছা সোনার বালা
ছালনা তলাতে॥
বিয়ের এই গণ্ডগোলে, যত ইয়ং বেঙ্গলে, ঢুকচে গিয়ে ব্রাহ্মের দলে, এ জ্বালা এড়াতে।
জাতির বিচার কে আর করে, কোর্টসিপেতে কার্য্যসারে
কেহ দিচ্ছে কুচবিহারে, কেহ বা স্বজাতিতে॥
উচ্চ শিক্ষার প্রভাবে, দেশের উন্নতি হবে।
সামাজিক কুক্রিয়া যাবে, বিদ্যা জ্যোতিতে।
হিতে হ'ল বিপরীত, পাশ করায় বাড়ায় কুরীত,

এ শিক্ষা কার মনোনীত, হয় অনিষ্ট যাতে ॥
সভ্যভব্য গুণবন্ত, সকলে কর সিদ্ধান্ত যা'তে হয় এ বিষয় ক্ষান্ত চূড়ান্ত মতে।
বিয়ে কর্ত্তে টাকা চায়, ছি ছি মরে যাই লজ্জায়,
আর্য্যের কলঙ্ক রটায় আর্য্যাবর্ত্তবাসীতে ॥
খগপতির এই মিনতি, যার যেরূপ হয় সংগতি,
দেওয়া লওয়া সেই পদ্ধতি, হ'ক ধর্ম্ম মতে।
বিবাহের ঘোর বিপদ, হায়রে কি হাস্যাস্পদ, মনুষ্য কি চতুষ্পদ, হ'ল ভাবে ॥

[১৯৯] রাগিণী বাহাবঋ খাজ—তাল কাওয়ালী।

ধন হীনে ত্রিভুবনে মান্য কে করে।
ক্ষুদ্র লোকে হয রুদ্র ধন অহঙ্কারে ॥
চর্ম্ম কর্ম্ম করা মুচি, টাকার গুণে হয় সে শুচি, তার ধনেতে মণ্ডা লুচি ব্রাহ্মণ মারে।
নাই ব্যবসাতে দোষ, দিয়ে সাহস, এক শ্লোক ঝাড়েন পরে।
ধনং উপার্জ্জনং জন্যং ন দোষঃ ন দোষী নরে ॥
রিক্রুটার আর মুটের সর্দ্দার, এর পাপের নাই পারাবার,
সজীব মানুষ কচ্ছে পাচার শত সহস্র।
মানুষ বেচে, অনায়াসে করিছে যোত্র,
যার ভারে পৃথিবী ডরে, সে তরে টাকার জোরে ॥
কড়ি থাকলে বুড়'র বিয়ে, নির্ধনি যুবা বসিয়ে, থাকেন হা করে।
আইবুড়ো হয়ে, চেয়ে খেয়ে পথে যান মরে,
তিথির দোষে শেষে তারে মহাপাপ ঘেরে,
তার পুত্র হয় না, পিণ্ড পায না, আবাগের বেটা নাম ধরে।
এ জগতে মান্য টাকা, টাকায় সাবে ন্যাকা ভ্যাকা,
সন্ত মেজাজ হয় বাঁকা, ফুলিয়ে যান ছাতি।
টাকার জোরে, ভেকে মারে, হাতিকে লাথি ॥
থাকলে পাতি সঙ্গতি খোঁড়া ঢোঁড়া ফোঁস করে।
পতির না থাকলে সঙ্গতি, সাধ্বী সতী রসবতী।
সে বিরক্ত হ'যে অতি, শয্যা ত্যাগ করে ॥
চলে আগুন, চাইলে দ্বিগুণ, তিরস্কার করে।
ফুড়ুক ফুড়ুক টানছ গুড়ুক, উপায় কর্ত্তে যম ধরে ॥
ব্যাধিগ্রস্তের থাকলে রেস্ত, তার নারী হ'য়ে শশব্যস্ত,
ইচ্ছামত কর্ত্তে সুস্থ বিবিধ মতে।

বলে এসো, জল খেতে ব'স, কাজ কী দেরীতে।
দিয়ে আদার কুচি, খাওগে লুচি, মিশ্রি দেও দুধের সরে ॥
নির্ধনী সব মুসলমান, যদি ধনীর বাটী যান,
অমনি তাবে দরয়ান, দেয় দূর ক'রে ॥
পাতির পাতি থাকলে বসায় মছলন্দের উপরে।
বলে বন্দা গোলাম, করে সেলাম, খোদাবন্দের হুজুরে ॥
সাবেক ধনী টেপেন বোড়ে, কেহ ঘোড়া গাড়ি চ'ড়ে।
নিউজ পেপার উলটে পড়ে, চোখে দেন চশ্‌মা ॥
ডুবুরি পাঠালে পেটে খুঁজে পায় না মা।
কহে খগপতি, চুনো পুঁটী, কাৎলাব মত খাই মারে ॥

[২০০] রাগিণী দেব—তাল সৎ

আর্য্য জাতির উন্নতি আর দেখিনে।
(এক্ষণে) কারে বলি, ঘোর কলি, হলোরে এতদিনে ॥
(নব্য দলে, বাক্ত বলে অখ্যাতি দিলে কিনে)।
সভাতে বক্তৃতা কেবল, কিছু হয় না ফলাফল।
যত নব্য বাবুর দল, খোসনামী খান বাগানে।
হাত পা নাড়ে, বচন ঝাড়ে, কথাটি কয় বগ টেনে,
কখন বক্তৃতার বেগে, গলদ ঘর্ম্ম উঠেন রেগে,
বৃথা গর্জ্জন প্রভাত মেঘে, বর্ষা ভরসা বিহীনে ॥
পীড়া হলে বাড়াবাড়ি, দেবোদ্দেশে রাখ্‌তো দাড়ি,
এখন দাড়ির ছড়াছড়ি, স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালপুর।
গালপাট্টা নাই, চিনে কি মালাই, মধ্যে চৈতন ফুরফুর।
কারো দাড়ি লম্বমান, কারো দাড়ি ঠিক সয়তান।
কেউ সেজেছে জাম্বুবান, হিন্দু পাঠান কে চেনে ॥
হ'লে লোকের চাল্লিশে, চশ্‌মা ব্যবহার করতো শেষে,
১২ কি ১৩ প্রবেশে নাকের ডগায় চশমা লয়,
যাদের গলায় অম্বল বেঁধে দিলে দম্বল হয়,
দুদের বালক কচি ছেলে, চশমা ছাড়া নাহি চলে,
সুধালে সর্ট সাইট বলে, হেঁই মা রাধে বাঁচিনে ॥
আর্য্য বিদ্যা অধ্যয়ন, করেনা আর কোন জন,
এখন স্কুলে গমন, কেবল অর্থের প্রয়োজন।

একপেশে, দোপেশে, তেপেশের তো নাই কথন।
মুরুব্বি যার আছে পোক্ত, স্কুল ত্যাগ করেই দাসত্ব,
মুরুব্বি হীন কাঁঠাল আমসত্ব, মরেন আহার বিহিনে॥
ধুতী চাদর, নেইকো আদর, কাটা পোষাক ঘর ঘর,
সামনে গোটা, পেছুন ছাঁটা, মাথার চুলের টেস্থ ভাব,
পথে চলে ট'লে ট লে ফুটপাথে হয় পদ্মলাভ।
পুলিশ পাহারাওয়ালাব ঝোলা বাবুদের চোতুন্দোলা,
মধ্যে মধ্যে ডাণ্ডাব ঠেলা এই সুকর্ম্মের দক্ষিণে॥
ইংরাজী পড়ে পাত দুচার, সরাটা দেখেন ধবার আকার,
মদগর্ব্ব অহঙ্কার, জীবে ভাবেন তৃণবৎ।
দেখ্‌লে অভিষ্ট, হন রুষ্ট, করেনাকো দণ্ডবৎ।
কেবল বুঝেন আপ্ত সুখ, পব দুঃখে নাহি দুখ,
হেরেন না জননীব মুখ, শয্যা গুরুর বাবণে॥
আর নাই আমাদের কাল, এখনকাব ইংরাজী চাল,
মহামান্য মদ মাতাল, বাবু বল্লে হয গালি।
স্যার, স্কোযার, না বল্লে পব, অমি করেন চক্ষু লাল।
খোঁজেন না আর চটী ঠেটী, চাস ভেড়াটি ঘোড়াটি।
ঘবে মজুত মদেব ভাঁটি, খুচরা খচরা কে কেনে॥
(বলেন) ইযং বেঙ্গল সভ্য ভব্য সাবেক হিন্দু সব অসভ্য।
পড়েন কাশীরাম দাস, এসে বি এ এম এ এরা সাত জন্মে করে না পাশ
লেখাপড়া যাক গোল্লায, যদি ডিনার পার্টিতে যায,
তথচ শরীরে বল পায়, তবে দশ জন ইংবাজে চেনে॥
(ঐ যে) রামাযণ ভাগবত, সুপথ থেকে নে যায কুপথ,
হায় কি বিশ্রী মত, করে গেছেন বেদব্যাস।
এরা মাইকেল মধুব, দীনবন্ধুর বুঝে নাকো ব্ল্যাঙ্ক ভার্স।
খগ কহে একি বিপদ, ধম্ম কর্ম্ম হ'ল বদ,
গোডিম্ ফুটেই খোঁজেন মদ, যান সদ্য শমন ভবনে॥
(ভাবতমাতা, দুঃখিতা, পুত্রগণ নিধনে)॥

[২০১] রাগিণী দেশ—তাল যৎ

বিধি বৈমুখ, ভারতের সুখ আর কি হয়।
এক সিভিল পদে, পদে পদে জানা গেল সমুদয়॥

একবিংশ ছিল বিধি, তাহে হ'য়ে প্রতিবাদী,
উনবিংশ কল্লে বিধি, সিভিল সার্ভিস পদ পাশ।
দুগ্ধ পোষ্য শিশুগণে, কিরূপে যাইয়ে লণ্ডনে করিবে বিদ্যা অভ্যাস॥
জ'টে বুড়ী আছে জলে, ব'লে লুকায় মায়ের কোলে,
সে যাবে সিন্ধু সলিলে, ঘুচে নাই যার জুজুর ভয়॥
যিনি সিভিল পদের করেন আশ, লণ্ডনে গিয়ে করুন বাস,
পুর্ণ হবে অভিলাষ, নতুবা হওয়া দুষ্কর।
দশ বারো বৎসরের বয়, অম্বল ছুঁলে দম্বল হয়, হিম লাগলে হয় বালসা জ্বর
পঠনের চাই অবসর, নিদান পাঁচ সাত বৎসর,
উনবিংশে নহে সম্ভবপর, সাধ্যাতীত শাস্ত্রে কয়॥
ইউরোপ শিশু ভারতে এসে, সংস্কৃত পার্শী ভাষে,
পাশ হ'তে পারলে উনিশে, বাহাদুরি জানা যায়।
কৃপা ক'রে ইণ্ডিয়া গভর্ণর, ছোটকর্ত্তা বঙ্গেশ্বর,
পরীক্ষা করুন হানি কি তায়॥
কত শত বিজ্ঞ লোকে, ভারতে এসে বাঙ্গলা শিখে।
কথা কইতে কইতে ঠেকে, তুমি বলতে টুমি কয়॥
ভারতের বিদ্যা উন্নতি, দেখে ঈর্ষা হ'ল অতি।
কুরীতি খল প্রকৃতির, দেহে সহ্য হ'ল না।
তার সাক্ষ্য ইলবার্ট বিলে, বিদেশী বিদ্বেষী মিলে কবিলে কি কারখানা।
শ্বেতকায়ের বিচার স্থলে, জুরী হয় শ্বেতাঙ্গ দলে,
কৃষ্ণকায় সাক্ষিগোপালে, ছারকপালে কিছুই নয়॥
উচ্চপদ না ছিল মোটে, সব করছে একচেটে।
কার যো নাই আনতে ঠোটে, যাবার যো নাই নিকটে।
কিসেতে ফেলবেন বিপদে, ছিদ্র খোঁজেন পদে পদে॥
লঘু পাপে গুরু দণ্ড দিচ্চেন কত বিদকুটে।
তিলটী দেখলে করেন তাল, ওঁদের পিলে ফাটে ক'রে খাল।
সুরেন্দ্র বন্দ্যোর কল্লে নাকাল, অক্ষয় সিবিল পদক্ষয়॥
একুশেতে মত দিয়ে, অনেক গেল পাশ হ'যে।
তাইতে এরা ঠেকে দায়ে, এক্ষণে করেন উনিশ॥
উনিশেতে হ'লে পাশ, আপনা আপনি পেয়ে ত্রাস।
পরে কর্ব্বেন ইণ্ডিয়া সিভিল এবালিশ॥
কত মত করে ভান, করেন লোককে বিদ্যা দান।

স্বদেশেতে নাড়ীর টান, সর্ব্ব জীবে সম নয় ॥
ইণ্ডিয়া সিভিল সমুদয়, ইণ্ডিয়ায় পরীক্ষা হয়।
রাজ্ঞীর আজ্ঞা যদি হয়, সকল দিক থাকে বজায় ॥
ভারতবাসী হয় সন্তোষ, সমাজে ধরে না দোষ।
বিলাত ফেরত ভারতবাসী কখন বলে না তায়।
পূর্ণ করুন অভিলাষ, ভারতী হউক ভারতে পাশ।
রাজ্যেশ্বরীর দয়া প্রকাশ, হউক এই ভারতময় ॥
ভারতবাসীরা সমস্ত, সকলে ক'রে মনস্থ।
লণ্ডনে কর দরখাস্ত, পুরিবে মন আশা।
যদি মহাসভায় বিচার হয়, সূক্ষ্মদর্শীরা নিশ্চয়।
বলিবেন ভারতের নয় ইংরাজী মাতৃভাষা।
কহে কবি গগবর, হ'লে রাজ্যেশ্বরীর সূক্ষ্ম নজর।
বজায় থাকবে এক্শ বৎসর, বল রাজীর জয় জয়
(তাঁর পুত্র পৌত্র জ্ঞাতি গোত্র, সকলে হউক অক্ষয়)।

[২০২] রাগিণী মিশ্রখাম্বাজ—তাল একতাল

পরিপাটী কমিটী টাউন হলে।
শোনা যায় না স্পীচ লোকের কিচ্ কিচ্ হরিবোল গণ্ডগোল (হ'ল)
টাউন হল কলিকাতার কৈলাস, তার পাশ্বে স্যারসির গেলাস।
খালি জুতার শব্দ চটাস পটাস, যত ভেড়া ঢুকেছে গোয়ালে ॥
পেনটুলুন কোট শামলা নেড়া ফঁপিয়ে লাফিয়ে দাড়ি ঝাড়া।
কেউ পারয়ে জামা জোড়া, যেন কত্তে এসেছেন পার্মলীলে ॥
কেবল চাপড়ে উল্টে পালট, কেউ করে বক্তৃতার নোট,
প'ড়ে যায় হাততালির চোট, ফলশূন্য আসরে।
হাকিম প্লিডার জমিদার উকিল, দেশবাসীর নাইকো মিল।
হলো বিপরীত পাস ইলবার্ট বিল, ঝোল টেনে ইংরাজের কোলে ॥
ক'রে এই লম্বা বক্তৃতা, কার উপকার হলেন কোথা।
মাথা নাই তার মাথা ব্যথা, আর সুখ নাই এই কপালে ॥
রাজা রামমোহন রায়, তুখ্ ন ব বক্তৃতায়,
সতীদাহ এ্যাক্ট যিনি উঠালেন বৈদিক আমলে ॥
শব্দাহ নিমতলার ঘাটে, তুলে দিল বাগার মাঠে।
রামগোপাল ঘোষ সে সদ্ধে, হিন্দুধর্ম্ম রাখিলে ॥

গুণসিন্ধু সম্ভ্রান্ত, ছিলেন রাজা রাধাকান্ত।
হিন্দুদের পক্ষে নিতান্ত, কে শাস্ত করে একালে॥
মরি মরি কি আপসোস, থাকলে বেঁচে রামগোপাল ঘোষ।
রেণ্টবিলের দেখাত দোষ, চুল চিরে তিলে তিলে॥
জেতা আর বিজেতা, মনে রেখো দুটী কথা।
সূক্ষ্ম বিচার পারে কোথা, কুইন না জানতে পেলে॥
মহারাণীর কর্ম্মচারী, সবাই এখন স্বেচ্ছাচারী।
আত্মসুখে যত্ন ভরি, উচ্চপদ সব দখলে॥
উগ্র স্বভাব ইয়ং বালক, দেখেন নাই সমাজ সংস্কারক।
শ্রীচৈতন্য, শাক্য, নানক, আর আছেন কি ভূতলে॥
একখানি অস্ত্র নাই কো ঘরে, শিয়ালে বেরালে কামড়ে মারে।
পারলিয়ামেণ্টের দরবারে, ঢুকতে চাও গো কি ব'লে॥
ক'রে খোসামোদী, তোষামোদী, ডিটো দিয়ে বহুবিধি।
পেলে ভুয়া উপাধি কাঁদি কাঁদি, ভলেণ্টিয়ার কৈ হলে॥
নাই তালুক মুলুক নাইকো প্রজা, সেইসব লোককে করছেন রাজা।
রায় বাহাদুর, নবাব মুন্সী, ছড়াছড়ি বেঙ্গলে॥
ইংরাজী প'ড়ে হ'য়ে মত্ত, করেন গিয়ে পরদাসত্ব।
আর্য্যশাস্ত্র স্মৃতিগ্রন্থ দেখ্‌লেন না নয়ন মেলে॥
নব্য আর্য্য সন্তানেরা, উচিত কি দাসত্ব করা,
ভারতভূমি যে উর্ব্বরা, এর মাটিতে সোণা ফলে॥
দুখে কহে খগপতি, করযোড়ে করি নতি।
আর্য্য সন্তান সন্ততি, মিশ না বিজাতি দলে॥

[২০৩] রাগিণী সিন্ধুখাম্বাজ—তাল একতালা

আপন দোষে, যাচ্ছে টে'সে, ভারতি।
(প্রাতে) ঝুবো লুসে, যায় আপিসে, দাসত্বের এই দুর্গতি॥
প্রাতঃকৃত্য সমাপ্ত হ'লে, আহার হয় মধ্যাহ্নকালে।
থাকে সুস্থ শরীর শাস্ত্রে বলে, আর্য্যের ছিল এই নীতি॥
ইউরোপে সায়ং প্রাতে, বরফ জমে থাকে পথে।
হয় দশটা পাঁচটা আফিস সারতে, শীতল দেশের এই রীতি॥
ভারতবাসীর পূর্ব্বাপরে, প্রাতে বিষয় কর্ম্মে সেরে।
মধ্যাহ্নে আহারের পরে বিশ্রাম করার পদ্ধতি॥

রাত্রের আহার হয় না জীর্ণ, প্রাতে উঠে ভুঞ্জে অন্ন।
পেট আঁটে অতি জঘন্য, পাকযন্ত্র হয় বিকৃতি॥
কেহ এঁটে প্যানটুলন কোট, বলে দশটা বাজবে ত্বরায় ছোট।
হাজরে বইয়ে করবে নোট, আবসেণ্টটা সম্প্রতি॥
দাসত্ব করা কি অধর্ম্ম, হয় না দেহেব ধর্ম্ম কর্ম্ম।
জানতে পেলে শ্বেতচর্ম্ম ধনঞ্জয় দেয় বিলাতি॥
দৈবে একদিন কামাই হলে, ড্যাম বাস্কেল কুলি ব'লে।
বেগে রেগে বাহু তুলে, ঘুসিযে ভেঙ্গে দেয ছাতি॥
ইংরাজ লোকের আফিসে ভাই, মলিন বসন পববার যো নাই,
কোট প্যাণ্টলন বুট পাযে চাই, চলে না সাদা ধুতি॥
হোটেলেতে খান খানা, বেবিযে পডে সেসব দেনা,
পুঁজির মধ্যে গাড়ীখানা, লাগ্ঠনের ঢোটা বাতি॥
বেতন অল্প আব নাই উপায, পোসাকে সর্ব্বস্ব যা ।
দেনাব জ্বালায জেল ভুগতে হয, কাঁদে সন্তান সন্ততি॥
বিদেশীব দেখে শিখে চাল, চাল বাড়ানে ইয়ং বেঙ্গল।
পানায দোষে চক্ষু লাল, কালস্য কুটিল গতি॥
পিলে যকৃত অগ্নিমাস, কার হচ্চে যক্ষ্মাকাশ।
মুত্রকৃচ্ছ্র দমা শ্বাস, কচ্চে ক্ষয় আধা জাতি॥
অত্যাচাবে জন্মে বোগ, ভুগতে হয কর্ম্মভোগ।
ডাক্তাবেব বড সুযোগ, রোগীর থাকলে সঙ্গতি
যদি বৈদ্যে চিকিৎসা করে, অল্পবাসে বোগ সাবে।
সার্টিফিকিট না পেলে পরে, ফর্‌ফিট হয বেতন পাতি॥
নব্যভব্য গুণবান, ভারত মাতাব পধান সন্তান।
পান ভোজনে হাবাচ্চে প্রাণ, কাঁদছে মা বসুমতী॥
ইংলিশ পলিশির এই এক বিধি, ধন তোব আমাব বুদ্ধি।
আমি মনিব, তুই মুচ্ছুদ্দী, লাভ আমাব, তোব ক্ষতি॥
আহা মবি কি আক্ষেপ বোগে শোকে, মরলো বাঙ্গা।
তথাচ বোঝে না আধা, সন্তানে সমাজ গতি॥
বাণিজ্যে বশতে লক্ষ্মী, অনেক ইহার পাবে সাক্ষি।
ছিল পাল চৌধুরী দুলাল দুঃখী, হ'লো বিশ কোব পতি॥
কহে কবি খগ দাস, কেন সব ভাই পরেব দাস।
কৃষি রেখে চাষ, দ্বারেতে বাঁধবে হাতি॥

স্বাধীন জানানার গুণগান বর্ণনা

[২৯৪] রাগিণী মিশ্রখাম্বাজ—তাল একতালা

আর্য্য জাতি, সুনীতি, বোঝে না হায়।
পাশ্চাত্য শিক্ষার দীক্ষার দোষে, অবিদ্যায় বিদ্যা শিখায় ॥
আর্য্যকুল করিতে নির্ম্মূল, বেথুন করেছেন ইস্কুল।
শিক্ষার দোষে বালিকার কুল, সমূলে নির্ম্মূল প্রায় ॥
করিয়ে বিদ্যা অভ্যাস, কেহ কর্‌চে চারটে পাশ,
গৃহস্থের হয় সর্ব্বনাশ, (যেন) কাঁচা বাঁশে ঘুন ধরায় ॥
বিয়ে হয় পাশের জোরে, পড়েন যদি ধনীর ঘরে।
মিলে যায় ধারে ধারে, রন্ধনশালার দায় এড়ায় ॥
কেতাব পড়া উল বোনা, সময় থাকলে বাজায় পেয়ানা।
দশটার সময় হাজারে খানা, টিফিন হয় দুটো বেলায় ॥
শতরঞ্চি মাদুর আদি, এসব ব্যাভার কবে মুদি,
চাই ইস্পিং কোসেন কৌচ গদি, বাঁদী চাই পদ সেবায় ॥
সাধারণ গৃহস্থ ঘরে, পাশ করা মেয়ে এলে পরে।
গৃহলক্ষ্মী পলায় ডরে, অলক্ষ্মী মেয়ের শিক্ষায় ॥
শাশুড়ী যদি হয় বুড়ী, দেখে হেসে মরে ছুঁড়ী।
ছোঁয়না বাসন হাতা বেড়ী, কি ঘড়ি তেড়ী ফেরায় ॥
গিন্নী ডাকেন আদর ক'রে, বৌমা এস রান্নাঘরে,
বৌ বলে কাজ নাই ভাতারে, বাপের ঘরে যেতে চায় ॥
রং ময়লা কি করব গিন্নী, ওমা আগুনতাতে আমরা যাইনি।
পাক ক'রিনে উল বুনি, বডি আঁটা জুতো পায় ॥
আফিস হ'তে এলে পতি, দেখে বিরক্ত হ'য়ে অতি।
তোমাদের অসভ্য নীতি, বৌ থাকে শাশুড়ীর সেবায় ॥
এই যে নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরি, স্বাধীনতার আদর ভারি।
এই দণ্ডে বিবাহ কেন্সেল করি, যাই চলে নিজ স্বেচ্ছায় ॥
তোমরা নিউস পেপার পড় নাই, ভাতার ত্যাগ কল্লে রুক্‌মা বাই।
নূতন আইন হবে তাই, গোল বেধেছে ইণ্ডিয়ায় ॥
ছলনা ক'রে ননসেন্‌স থিফ, কোবেচ ফল্‌স্ কোর্টসিপ।
দাওনা খেতে মটন বিফ, ডাল চাল জঞ্জাল কেবা খায় ॥
কি সাধ্য বন্ধ কর দেখি, এই দণ্ডে ফ্রেণ্ডকে পত্র লিখি।
চলে যাব চেপে পালকি, কার সাধ্য আমায় ফেরায় ॥

বিবাহ ক'রবো না থাক্‌বো ফ্রি, ক'রবো মিডওয়াইফগিরি।
ডফরিণ স্কুলে শিখব ডাক্তারি, প্রাকটিস করবো সব পাড়ায়॥
ছোঁড়া শুনে ভাবে গ'লে, ধরে প্রিয়ার পদতলে।
মা বাপ ত্যাগ করচি ব'লে, নয়ন জলে ভেসে যায়॥
পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণে, ঘোমটা দেয় না মাথায় টেনে।
চিঠি লিখে লোক আনে, মানে না গুরুজনায়॥
চোর মজায় সাত ঘর নিয়ে, এরা ডেকে এনে পাড়ার মেয়ে।
বিদ্যা শিক্ষার ভাণ করিয়ে, বালার পরকালটা খায়॥
স্বাধীন রমণীর পেয়ে অর্ডর, মজুমদার কোম্পানি টেলর।
অবলা আবরণ বেচ্চে বিস্তর, কি ঢংটা, ঘোমটার, ছটা তায়॥
খালি সাটি পরার রেওয়াজ নাই, আংজামা আর ওড়না চাই।
দেখে তক্তা নামার বাই, লজ্জা পেয়ে মুখ লুকায়॥
(কেহ) দিলেন বিধবার বিয়ে, (কেহ) ব্রহ্ম মত দিলো চালায়ে।
(হ'ল) স্বাধীন ইয়ং বাবু ভেয়ে, বেদব্যাস কি কল্‌কে পায়॥
কহে কবি খগমণি, স্বাধীন রমণী ইদানি, ঘর ভাঙ্গানি।
দেশ ঢলানী, ভাতারকে বাঁদর নাচায়॥

[২০৫] রাগিণী সিন্ধুকাফি—তাল একতালা

গুলি হাড় কালি, মা কালীর মত রং।
টান্‌লে ছিটে বেচায় ভিটে, বানায় যেন চুঁচ্‌ড়োর সং॥
খেলো হুঁকো কল্‌কে ভাঙ্গা, পাঁচ পো লম্বা বাঁশের চোঙ্গা।
কলসীর কানায় হুঁকোর সেঙ্গা, মরি কি বৈঠকের ঢং॥
হাত পা সরু পেট্‌টা ফেলে, কালি পড়ে ঠোঁটের তলে।
ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে পথে চলে, বাতব্যাধে জবড় জং॥
মুখে মারে মালপাট, অর্থাভাবে মুড়ীর চাট।
নানা ভঙ্গি ঠমক ঠাট, কথায় কথায় রেগে টং॥
এই নেশাটী সর্ব্বনেশে, ছিল ইহা চীনের দেশে।
চণ্ডুগুলির বড় পিসে, জন্মস্থান এদের হংকং॥
খগবরেতে বর্ণয়ে, নেশায় আত্মবিস্মরিয়ে।
স্বপ্ন দেখেন চেটায় শুয়ে, সাজাদার সোণার পালং॥

[২০৬] রাগিণী জংলাললিত—তাল একতালা

গেল গেল হিঁদুয়ানি, অসুখী সব প্রাণী।
(কেবল) রোগে, শোকে, তাপে তাপিত ধরণী ॥
ভারত মাতার কি দুর্গতি, পুত্রে ত্যজলে মাতৃভক্তি।
বিদরে ছাতি, (দিবারাতি) অবিদ্যে, শিখান বিদ্যে,
এঁরা মহাবিদ্যের বাধ্যে চলেন না এক প্রাণী ॥
হায় হায় একি ক্লেশ, হিন্দু ধর্ম্মে দেখি দ্বেষ।
জেতের দফা শেষ (ম'জলো দেশ) বারি হীন,
যেন মীন, তাইতে এ ধরা, উর্ব্বরা হ'চ্ছে না ইদানী ॥
অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, হের হের তার সাক্ষ,
হচ্চে প্রত্যক্ষ, (বাজ্যে বাজ্যে) শুক্লপক্ষ হয় না লক্ষ।
এখন কৃষ্ণপক্ষের ন্যায় কলায় কলায় হানি ॥
পরাধীন ফাঁসে আবদ্ধ, মনে করেন স্বাধীন মদ্দ।
পান ক'রে মদ্য, (সদ্য সদ্য) খাদ্যাখাদ্য নাই বিরুদ্ধ,
খানা খেয়ে খানায় প'ড়ে থাকেন বাহ্যাধান ॥
নারীর স্বাধীনতা দিয়ে, বিধবা মেয়ের দিলেন বিয়ে,
পাত্র খুঁজিয়ে (সভ্য হয়ে) টাউন হলে।
মেয়েছেলে, ঘোমটা খুলে, গলা তুলে, ঝাড়েন রাগ রাগিণী ॥
ধর্ম্মেতে দিয়েছেন মন, নাই অধর্ম্মের আচরণ, পেলে করেন সর্ব্বস্ব হরণ (সাধুজন)
জিতেন্দ্রিয় সর্ব্বপ্রিয়, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, সাক্ষাৎ কলির মানী ॥
ন্যায়শাস্ত্রে নাহি অভিলাষ, কেবল খোঁজেন এণ্টেন্স পাশ,
হ'তে কৃতদাস (ইংরাজ বর্গের) বি এল হ'য়ে ফেল।
কলুর সঙ্গে ভেল, চালান তেলের ঘানি ॥
কেহ হ'য়ে বিদ্যাবন্ত, ধেয়ে যান বিলাত পর্য্যন্ত,
কত্তে চুড়ান্ত (হিন্দুয়ানীর) সিভিল পদ।
কি বিপদ, শেষে চতুষ্পদের ন্যায় প্রাণ নিয়ে টানাটানি ॥
(হিন্দুয়ানী ত্যজে, এলেন সাহেব সেজে, ঠিক যেন সিওর আণ্টুনী) ॥
দেখিনে আর বাঙ্গলা পাঠশাল, এখনকার ইংরাজী চাল,
পণ্ডিত তাল বেতাল, (সামাল সামাল) অনাদর।
শুভঙ্কর, এখন তস্কর, তস্কর, ভাস্কর, বর্ব্বরের গাঁথুনী ॥
(ঋজুপাঠ, জুজুপাঠ, নোপাঠ, ব্যাপারখানি) ॥
ভাব দেখে ভাব যায় না ভাবা, ব্যাভার চটি চৈঁটি নিশি দিবা।

পুরুষ বিধবা, (চলে সকল সেবা) মরি দুখে,
শাস্ত্র শিখে, মাথায় শিক্কে রেখে, ত্যজ্‌লেন সনাতনী ॥
খোলা দিল মতিঝিল, দেখতে পেলে ডিনার টেবিল,
ব'সে যান হাড্‌গিল, (খুলে খিল) নহে মন্দ।
কি আনন্দ, পেয়ে মড়ার গন্ধ। যেন ধেয়ে যায় শকুনি ॥
স্কুল ছোঁড়া সব বেয়াড়া, কেহ টোঁড়া কেহ বোড়া,
কেহ ল্যাজ ছেঁড়া, (ভুঁই ফোড়া) সুরু খোড়া
কাঁকড়া পোড়া, এর পর হবেন ঘোড়া ভেড়া, হ'লে ধনীমানী ॥
ইয়ং বেঙ্গল বাড়ী বাড়ী, চক্ষে চস্‌মা নবীন দাড়ী।
হাতেতে ছড়ি, (টেঁকে ঘড়ি) পেটে পাড়ি।
ফিরিয়ে টেড়ী, মারেন ফিরিঙ্গিদের বাড়ীর হাঁড়ির আমানী ॥
এখনকার যে হ'চ্ছে নাটক, নাই মিষ্ট রস নাইকো টক।
প্রাণ করে ধক ধক (শুনে রূপক) কৃত্তিবাস,
কালিদাস, এদের ব্লাঙ্কভার্স, শুনে কাণে পড়লো তালি ॥
(শুনে কবির মিল, ফেটে যায় দিল, বলিহারী মরি ধন্য রে খেঁচুনী) ॥
আর কি হয় অভিরুচি, নবরত্নের বররুচি,
পোয়েট বিজাতি মুচি (মগ বাবুর্চি) মাইকেল মধু, দীনবন্ধু, কবির সিন্ধু।
এর আগে, কি লাগে বেদব্যাস মুনি ॥
হিন্দুধর্ম্ম সর্ব্ব সার, শুদ্ধাচার পরিষ্কার,
অন্য ধর্ম্মে সকল অনাচার (সব একাকার)।
ডুবে মদে, জুতো পদে, দেবাপরাধে, এমন আহ্লাদে প্রহ্লাদের বিভু মন তিনি।
সংস্কৃত আদিবর্ণ, হিন্দু হ'তে হিন্দুস্থান, ম্লেচ্ছ যবন।
(পুরাণ প্রমাণ) ব্রহ্মণ হ'তে জার্ম্মণ, যত অসভ্য নরে,
আসল খাস্তা ক'রে, পরধন হ'রে হ'য়েছেন ধনী ॥
আছে কার শাস্ত্রে কটা কথা তেত্রিশ কোটী হিন্দুর দেবতা
অন্যে কা কথা (পুরাণ সংহিতা) জ্ঞানোদ্দীপন।
পাষণ্ডদলন, মুগ্ধবোধ আমি বিদগ্ধ চন্দ্রামণি ॥
কহে দীন খগপতি, কি হবে দীনের গতি।
ভাবি সম্প্রতি, (রমাপতি) দেশের রীতি, ফিরছে নীতি।
ক্রমে সকলে একজাতি, হবে এ মেদিনী ॥

বিশ্বকর্ম্মার গুণ বর্ণন

[২০৭] বাগিণী মিশ্রঅ.লাহিয়া—তাল কাওয়ালি
"আমি আছি গো তারিণী ঋণী তব পায" এই গানের অবিকল

ধন্য ধন্য ধন্য হে বিশ্বকর্ম্মা, (বিভু তুমি) অসীমা মহিমা।
তুমি যে হে কারিগব, দেবগণ অগোচব,
কি বর্ণিতে পারে নর, না পারে বেদ ব্রহ্মা ॥
রূপে গুণে মান্য তুমি হে সুধীব, লীলাচলে গঠিলা শ্রীহস্তেতে শ্রীমন্দির ॥
ভুবনেশ্বরে লীলা প্রকাশিলা। আপনি গঠিলা নউকোটী শিলা।
তব হস্তের কারিগবি, ইন্দ্রের অমবা পুরী, আহা মবি, মরি মরি কি দিব হে উপমা ॥
ছুতোবের র্যাঁদা তুবপুন জিনবাড়ী, স্বর্ণকারের কিট্‌কিটে যন্তরী লেই হাতুড়ী।
ধোপার ঘরেতে তুমি ইস্তিরী, ঘরামীর গুণছুঁচ আর কাটারী ॥
কখন কিবা ধর রূপ, হও ঘেসেড়াব ঘাসছোলা খুরপো।
চোরের সিঁদ কাটি গুপো, ডাকপেয়াদার মোম জামা ॥
ছুঁচবাঁচি আঙ্গুস্তানা দরজির, চাষার লাঙ্গল বাস্কে হেঁসো হও সিউলির।
মিতুয়ার তুমি হে ঝুড়ি কোদাল, নাপিতের খুরভাণ্ড, ডাকাতের ঢাল তবোয়াল ॥
শাঁখারির করাত বট, মসিতে যাইতে বাট।
তাঁতির সানা মাকু, তুমি বাদ্যকরের দামামা ॥
যন্ত্র অস্ত্র কেহ ছাড়া নাই, মুচির বীবস্থল জুতিযার শেলাই।
তোমার কৃপায ইংরাজ ভাসায় লোহার জাহাজ, চিনের ফক্কিকারি কাড,
কহে খগ পরছামা ॥

[২০৮] বাগিণী মূলতান—তাল একতালা

বিশ্বকর্ম্মারি কি মহিমা কে জানে। যাঁর সুত, শ্রীকৃষ্ণ, বাস করেন চীনে,
ইনি বিশ, তিনি বেযাল্লিশ, শিল্পবিদ্যারি গুণে।
বিশাই-এব গঠন ঘটী বাটী থালা বেয়াল্লিশের গঠন পিরিচ ডিস পেযালা,
এর চ্যানা জ্যার ওর ঢাকাই জালা, ওর স্ক্রুপ এর একোণে (ছোট পেরেক) ॥
ঢাল, তরয়াল, চক্র ধনুর্ব্বাণ, বঞ্জক সহ বন্দুক এব পিস্তল কামান,
ওর খুন্তি, গাঁতি, এব বর্শা নিশান, এব গাঁজাখোব, ওব শিশু চণ্ডু টানে ॥
এব পেড়ী, পিঁড়ে, পাটরা তক্তা ক্যাওড়াকাষ্ঠ,
ওর জিঙ্কটিন্ট্রে লোহার আয়রণ চেষ্ট, এব কামাব, ছুতাব, হতে চিনের শিল্পী শ্রেষ্ঠ,
উৎকৃষ্ট, স্পষ্ট, লোক বাখানে ॥
এর হুঁকো দেরকো চৌপল লাণ্ঠান্, ওব ওয়াল লাইট্ ফিট শ্যামাদান।

ওব শিষ্য খায় মাংস, এর জীবন রক্ষা হয় চাল ধানে ॥
ছুঁচের কাজে চিনের মত কেহ নাই, বাঙ্গালির তালি, ঠিক, কোথায় গেলাই।
হুজুগে বাঙ্গালি চিনে শিল্পী ভাই, খগে ভণে গীতি মুলতানে ॥

শ্রীশ্রী৺ শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় কারাগারে জন্মবিবরণ গীতি

[২০৯] রাগিণী মিশ্রললিত—তাল একতালা

পূর্ব্ববঙ্গদর্পণ। ভ [illegible] সঙ্গত—[illegible] গানের ধন।

আচম্বাত মতুরাতে জন্ম নইল এগলা পুনা।
পুলার বদন দেকি দৈবকী, হানন্দেতে মগ্ন ঐলা ॥
হে পুলা নিরোদবরণ, দলিত অঞ্জন, হিকন কালা।
যার, নামটি ডাইকে জায় গুলকে, যমেরে দেখাইয়া হলা।
পুলা কারাকারের তীমির অরে, অয় কটি চা.দর আলা।
বসুদ্যাবে বলে, দ্যাব হকলে, যাও গোকুলে লৈয়া চাইলা ॥
যোগমায়ারে, আন গরে, যশোদারবে, কৈবা চলা ॥
কংসেরে, কইব উ'কারে, আকাশবাণী সিবিবালা।
খগপতি, বচয়ে গীতি, জন্মাষ্টমী বৈষ্ণবী লীলা।
মন মজ মজ, অরি ভজ, ভাজবে, হংসারের জ [illegible] ॥

[২১০] রাগিণী মিশ্রললিত—ত [illegible]

[illegible]

ডুবস্তি বসন্তি কাল [illegible] ।
নাস্তায় যাতি নতি পতি [illegible] (মামলো)
ওবে ঝড়তেচে বড় দোআলা, প্রাণটা কবে হোবা তোলা।
এ বান্দারে বাপ আল্লা খাকল সব গেল ॥ (মামুলো)
হাঁ রে কাল কে ছিলে শুনে গান ঝমকে, দমকে চমকে প্রাণ।
ফকির মামুদ হয়ে হাবধান, হায়রানে জান গেল ॥
পরমিট ধারে হয়ে জেটি, মুটেব দফা, করলে মাটি।
ওরে দেশে কোরচে কাদাকাটি, মাটির খাজনার কি হোলো (মামুলো).
ওবে পানাউল্লা ঝড়ু কামু, বসন্তির দাযে কিসে বাচমু,
ওবে ঋণ সুদমু কি পেটে মানু খগ [illegible] (মামুলো) ॥

উৎকল ভাষায় চিত্র ত্রিপদী তিন স্থানে তিনবার নিবেদন

[২১১]

উৎকল টাইপ হইলে ঠিক হইত

রু ক্মিণী হরণ করি, রু ক্মিণী কুরথোপরি, রু ক্মিণী সহিত দ্বারা পুরে।

প র্য্যাঙ্ক পর বসাই, প দ্ম মুখ নিবখই, প রমানন্দ আনন্দ ভরে॥

চা রুশীলা সুবদনী, চা ন্দে নিন্দে চন্দ্রাননী চা টু বাক্যে তুষন্তী শ্রীহরি।

দ য়া দেখি কৃষ্ণঙ্কর, দ য়া হেলা রুগ্মিণীর, দ রদ বুঝিলে পাটেশ্বরীর॥

দা মুদব দয়া সিন্ধু, দা রিদ্র মানঙ্ক বন্ধু, দা শরথী দ্বারিকা ভূপতি।

স র্ব্বাঙ্গ সুন্দরী পাই, স গৃহ সর্ব্বস্ব দেই স বিনয়ে করন্তি ভকতি॥

র মণীর শিরোমণি, র থ রথ আন্ত পাণী, র ঙ্গ দেবী বস সিংহাসনে।

নি রখি শ্রীচন্দানন, নি স্তাব হইবে জন, নি ভাননী তুস্ত দরশনে॥

বে হার স্থল দ্বারকা, বে দ পতি বেদে লিখা, বে গবতী সাগর মঝির।

দ বশন কি সুচারু, দ শ দিগে দেব দারু, দ গুধারী শ্রীহরি তথির॥

ন র হরি নরোত্তম, ন ব ঘন ঘন শ্যাম, ন র সিংহ দৈত্য নাশকারী।

জা বট বেহার স্থান, জা ম্ববতীর জীবন, জা রুবী পদে জন্ম যাহারি॥

নি স্তার কব হে জীব, নি লাকারী শ্রীমাধব, নি ত্যধন নীলাদ্রি বেহারী।

ব রদা বল্লভ হবি, ব র দিহ কৃপা করি, ব নমালী শুনে মো গুহারি॥

——— –

প্রাসঙ্গিক তথ্য

নদীয়ার নীলকর প্রসঙ্গ : পৃষ্ঠা ৭৫-৮৪

"During the first half of the nineteenth centu the manufacture of indigo was the most important industry in the district. It sprang originally from very small native factories which were bought up by Europeans. The district became gradually dotted with indigo concerns, owned by English capitalists, or by proprietors backed by money advanced by agents in Calcutta. A great impetus was thus given to the cultivation and manufacture of indigo Large factories rapidly sprang up, taking the place of the smaller native ones. Money was plentiful with the planters, and the ryots, eagerly took advances to grow indigo. The cultivation increased, and the high rates which the dye then commanded yielded large profits One of the greatest difficulties which presented itself in the earlier days of indigo cultivation was the contention which arose between neighbouring planters as to the right to sow in the different villages. This difficulty. however, gradually righted itself, and boundaries were laid down between the different indigo factories, beyond which neither party could extend except under a penalty. At first the ryots were not averse to the cultivation, and as the country was then lower than during later years, and more liable to fertilizing inundations from the rivers, the plant grew more luxuriantly, and the crop was less liable to failure from drought The European planter soon gained for himselt an important position in the district, although at first he held but little property The large native landlords, and holders of sub-tenures, finding that their influence was interfered with by the planters, endeavoured to stir up a feeling against them, and to prevent the spread of indigo cultivation. This led to quarrels, and the planter, failing to get redress from or through

the courts, had recourse to fighting the native landholder with bands of clubmen, according to the practice in Bengal at that time. The planter began also to buy real property (when it became legal for Europeans to hold land), even at fancy prices, in order to get rid of the annoyance and injury to which he was subjected by hostile native proprietors.

"This, however, was but the commencement of still greater troubles for the European planter He had got over his early disputes with neighbouring planters, and had surmounted the difficulty of inimical *Zamindars* by himself becoming a proprietor, or at any rate by buying a sub tenure upon the lands which surrounded his factory. But the greatest difficulty still remained. This was the native agency which he had to employ in carrying on the cultivation. The district was now dotted with large concerns, whose managers and sub-managers could give but slight personal supervision to their work, and had to leave it to native servants. A great deal too much was thus committed to underlings who fleeced the cultivators, and as the planter often declined to hear complaints from the latter and redress their wrongs, a very bitter feeling was engendered against factories. This was intensified by illegal practices committed in the badly managed factories to enforce the cultivation of the plant, and also by a very marked rise in the price of other agricultural produce, which brought home to the ryots the loss which they sustained by the cultivation of indigo Moreover, the commencement of the Eastern Bengal State Railway through Nadia at about that time led to a sudden rise in the price of labour, with which the planters failed to keep pace. Also the ryots were in a chronic state of indebtedness to the factories for advances, which went on in the books from father to son, and were the source of a hereditary irritation against the planters, whenever a bad season forced them to put pressure upon the ryots to pay up. The dislike to indigo, thus generated, grew apace, and on a rumour being started that the

Bengal Government had declared itself against indigo-planting, the whole district got into a ferment, which culminated in the disturbances of 1860. At first all the planters suffered equally, the good with the bad, and for sometime the district lay at the mercy of the cultivators, and those of them who had acted on their own judgment, and sown their lands with indigo in the terms of the contract which they had entered into with the factory, were seized and beaten by the mob. The Bengal Government endeavoured to arrest the devastation, and eventually passed Act XI of 1860 "to enforce the fulfilment of indigo contracts, and to provide for the appointment of a Commission of enquiry.

"This Commission sat during the hot weather of 1860, and its report was submitted in August of the same year. The report gave an account of the various systems of indigo cultivation in Bengal and Bihar, and divided the subjects of the enquiry into three heads:—(1) the truth or falsehood of the charges made against the system and the planters, (2) the changes required to be made in the system, as between manufacturer and cultivator, such as could be made by the heads of the concerns themselves; and (3) the changes required in the laws or administration, such as could only originate with, and be carried out by, the legislative and executive authorities

"The general conclusion at which the Commission arrived was that the cause of the evils in the system of indigo cultivation as then practised was to be found in the fact that the manufacturer required the ryot to furnish the plant for a payment not nearly equal to the cost of its production, and that it was to the system, which was of very long standing, rather than to the planters themselves, that blame attached The only remedy recommended by the Commission which it was in the power of Government to apply was a good and effective administration of the law as it stood. Accor-

dingly new subdivisions were created and various other steps taken to improve the efficiency of the civil courts.

"The moral effect of the temporary Act of 1860, and the public assurance given to the complaining ryots that proved grievances should be remedied for future seasons, was such that most of the planters were able to complete their spring sowings, but, as autumn came on the state of affairs became very critical. Lord Canning wrote "I assure you that for about a week it caused me more anxiety than 'I have had since the days of Delhi,' and 'from that day I felt that a shot fired in anger or fear by one foolish planter might put every factory in Lower Bengal in flames.' The intensity of feeling aroused among the ryots may be gauged from a note recorded by the Lieutenant Governor in September 1860 Sir J. P Grant wrote : 'I have myself just returned from an excursion to Sirajganj on the Jamuna river, where I went by water for objects connected with the line of the Dacca Railway and wholly unconnected with indigo matters I had intended to go up the Mathabhanga and down the Ganges but finding, on arriving at the Kumar, that the shorter passage was open, I proceeded along the Kumar and Kaliganga, which rivers run in Nadia and Jessore, and through that part of the Pabna district which lies south of the Ganges [i e, the north-eastern corner of the Nadia district, as now (1909) constituted] Numerous crowds of ryots appeared at various places, whose whole prayer was for an order of Government that they should not cultivate indigo On my return a few days afterwords along the same two rivers, from dawn to dusk, as I steamed along these two rivers for some 60 or 70 miles, both banks were literally lined with crowds of villagers, claiming justice in this matter Even the woman of the villages on the banks were coufected in groups by themselves , the males who stood at and between the riverside villages in little crowds must have collected from all the villages at a great distance on either side I donot know that it ever fell to the

lot of an Indian officer to steam for 14 hours through a continued double line of suppliants for justice : all were most respectful and orderly, but also were plainly in earnest. It would be folly to suppose that such a display on the part of tens of thousands of people, men women and children, has no deep meaning The organization and capacity for combined and simultaneous action in the cause, which this remarkable demonstration over so large an extent of country proved, are subjects worthy of much consideration."

Bengal District Gazetteers. NADIA : J. H. E. Garrott, Calcutta 1910, pp 32-36

W. W. Hunter : Statistical Account of Bengal : Nadia.

পাবনার প্রজাবিদ্রোহ : পৃষ্ঠা ১১৫-১৬

"In 1872-73 agrarian trouble broke out in the district, originating in the Yusufshahi *pargana* of the Sirajganj sub-division. The actual rental of the estates in the disturbed *pargana* had not been raised for some years, but the zamindars were in the habit of realizing heavy cesses of various sorts, which had gone on for so long that it was scarcely clear what portion of their collections was rent and what illegal cesses. Whereas under the law rents could only be enhanced by a regular process after notice duly given in the previous year, no such notices had been served, but the zamindars, or many of them, attempted irregularly to effect a large enhancement both by direct increase of rent and by the consolidation of rent and cesses, Besides this enhancement they stipulated that the ryots were to pay all cesses that might be imposed by Government, and that occupancy ryots should be made liable to ejectment if they quarrelled with their Zamindar, Enquiries with respect to illegal exactions by Zamindars, and the apprehended extension to the district of the Road Cess Act, under which the rental was registered, induced

the zamindars to try to persuade their tenants to give them written engagements. Some zamindars in 1872 actually succeeded in this, and the terms of the engagements granted were very unfair to the ryots. These were partially registered, but before the process was complete they repudiated the authority of the registering agent.

"The difficulties were enhanced by disputes as to measurement, which all over Bengal had always afforded a fertile source of quarrel between landlord and tenant, there being no uniform standard and the local measuring rod varying from *pargana* to *pargana* and almost from village to village. In Pabna especially there is extreme diversity of measuring standards. All the Zamindars were not equally bad, but there were undoubtedly some among them who resorted to illegal pressure resulting in illegal enhancement, in cases where the shares were much subdivided special oppression was practised, and the quarrels among the sharers themselves had not a little to do with the outbreaks.

"At first, the ryots gave way for the most part, but later one or two villages, which had not been so submissive, gained success in the courts. One village stood out from the first, certain suits for enhanced rents were rejected on appeal after having been won in the Munsif's Court, a kidnapped ryot had been liberated and the zamindar punished. These and other successes gradually turned the scale, and there was a reaction against exorbitant demands. In the spring the ryots commenced to organize themselves for systematic resistance. By the month of June the movement had spread over the whole of the Yusufshahi *pargana*. The ryots calmly organized themselves into a league, and assumed the designation of *bidrohi* (rebels) under the influence of an intelligent leader and petty land-holder, and peaceably informed the Magistrates that they had united.

---

1. Minute, dated the 30th September 1858, records by Sir F. Halliday, Lieutenant-Governor of Bengal, on "The Mutinies as they affected the Lower Provinces under the Government of Bengal, 1858."

One Ishan Ray was known as Bidrohir Raja, the rebel chief. The terms held out by the league were tempting, viz, the use of a very large *bigha* of measurement and very low rent, and it was not therefore necessary to resort to much intimidation to induce fresh villages to join. In some instances intimidation was resorted to with this object, but it was of a mild form.

"Toward the latter end of June 1872 emissaries were sent in all directions to extend the league and large bands of villagers were formed. Persons who owed private grudges, and bad characters inspired by the hope of plunder, took advantage of these gatherings to turn them to their own ends and to commit excess, but serious outrages by bona-fide tenants were not very numerous, and few houses were actually burnt and plundered. Stories of murders and of other outrages were current, but were without foundation. No one in the subdivision of Sirajgunj was seriously hurt during the disturbances: no zamindar's house was attacked and nothing of considerable value was stolen. Such cases of violent crime as did occur were due to the criminal classes, who took advantage of the excitement, and the actual riots only lasted only from the middle of June to the 3rd July 1873. Up to the 1st July 69 villages had signified by petition that they had joined the union after that ten or twelve more a day gave in their adherence.

"On the 4th July the Government of Bengal issued the following proclamation

"Whereas in the district of Pabna, owing to attempts of zamindars to enhance rents and combinations of ryots to resist the same, large bodies of men have assembled at several places in a riotous and tumultuous manner, and serious breaches of peace have occurred. This is very gravely to warn all concerned that, while on the one hand the Government will protect the people from all force and extortion, and the zamindars must assert any claims they may have by legal means only, on the other hand the Government will

firmly repress all violent and illegal action on the part of the ryots and will strictly bring to justice all who offend against the law, to whatever class they belong.

"The ryots and others who have assemled are hereby required to disperse and to prefer peaceably and quietly any grievances they may have. If they so come forward, they will be patiently listened to ; but the officers of Government cannot listen to rioters ; on the contrary, they will take severe measures against them. It is asserted by the people who have combined to resist the demands of the zamindars, that they are to be the ryots of Her Majesty the Queen, and of Her only. These people, and all who listen to them, are warned that the Govenment cannot and will not interfere with the rights of property as secured by law ; that they must pay what is legally due from them to those to whom it is legally due. It is perfectly lawful to unite in a peaceable manner to resist any excessive demands of the zamindars, but it is not lawful to unite to use violence and intimidation."

"While the attitude of Government was thus made clear, measures were taken for the restoration of peace and order. Extra police were despatched to the district, whereupon rioting ceased almost immediately, after many arrests had been made, principally for rioting and illegal assembly, and 147 persons convicted. But there was no abatement of the combinations of the ryots and the movement spread through most of the Pabna district and into Bogra ; the ryots met the demand of the zamindars for too much by offering too little. The Lieutenant-Governor (Sir G. Campbell) did not see his way to interfere by legislation without raising large questions which could not be settled without long and difficult discussions. His course was to attempt to promote compromise by influence and advice. The zamindars were urged to offer reasonable terms of present settlement and future security to the ryots, and the latter were strongly advised and urged to accept such terms as the

Government officers thought reasonable. Considerable success attended these efforts.

"Meanwhile there was a remarkable subsidence of unhealthy excitement. The organs of the zamindars urged direct Government interference by means of a Commission empowered to settle defferences. The Government of India also suggested this solution. Sir George Campbell had been reluctant to appoint extra Munsifs to try the rent cases, as he found that things settled themselves much more fairly by compromise. He saw that the whole question of the relations of landlords and tenants was being raised and doubted whether it would be possible to avoid some further revision of the rent law, as there was great difficulty in determining what rents were really payable. As to the appointment of a special Commission, he objected to one that would merely deal summarily with the differences between landlord and tenant, but expressed his acceptance of one that would deal thoroughly with the points at issue and settle them for a long time. In the end no special Commission was appointed; partly by compromise, partly by the natural movement of events, partly by the shadow of the impending famine of 1873-74, the Pabna difficulties to a very great extent settled themselves for the time. The dispute between landlords and tenants, in fact remained in abeyance during the fomine which postponed the adjustment of the rent question.

"These rent disturbances of 1873 were however really the origin of the discussion and action which eventually led to the enactment of the Bengal Tenancy Act I of 1885."

Bengal District Gazetteers : *Pabna* : L. S. S. O'Maloy, 1923 : Pp 25-28.

C. E. Buckland : *Bengal under the Lieutenant Governors* (Calcutta 1901) Vol, 1, Pp 544-8 ; W. W, Hunter : *Statistical Account of Bengal* (1876)—Vol IX, p 319—25,

বহুবিবাহ প্রসঙ্গ : পৃষ্ঠা ২৪১, ২৪৪-৫৩

বহুবিবাহ প্রসঙ্গে সোমপ্রকাশ পত্রিকায় যে আলোচনা হয় তাতে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি অংশ গ্রহণ করেন। এই কুপ্রথা নিবারণের পন্থা নিয়ে পত্রিকাতে খানিকটা বাদানুবাদও হয়। এই বাদানুবাদ বিষয়ে "এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তাবহ" যে মন্তব্য করেন এখানে তা উদ্ধৃত হল :

বিদ্যাসাগর, সোমপ্রকাশ ও বহুবিবাহ

এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তাবহ । ১৭ ভাদ্র ১২৭৮

"বহুবিবাহের বিচার ক্রমে গরম হইয়া উঠিতেছে। বিদ্যাসাগর, সোমপ্রকাশ সম্পাদক ও তারানাথ তর্কবাচস্পতি এই তিনজনে সশস্ত্র রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কিছুদিন হইল, সোমপ্রকাশ সম্পাদক বহুবিবাহ নিবারণের জন্য উপায় স্বরূপ বহুবিবাহের উপরে ৫০০ টাকা কর নিয়োগের প্রস্তাব করেন। বিদ্যাসাগর ভাবিলেন, সম্পাদক গম্ভীরভাবে এই প্রস্তাব করিয়াছেন। ভাবিয়া তাহার প্রতিবাদার্থে সোমপ্রকাশে পত্র লিখিলেন। সোমপ্রকাশ সম্পাদক পণ্ডিত মানুষ, বিশেষতঃ কলেজের অধ্যাপক, বলিতে পারেন না, আমি সে প্রস্তাব রহস্য ভাবে করিয়াছিলাম, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতিবাদ-পত্র পাইয়া তাঁহাকে কাজে কাজেই তৎখণ্ডনে প্রবৃত্ত হইতে হইল। খণ্ডন করিতে গিয়া সম্পাদক যে সমস্ত যুক্তি দেখাইয়াছেন, তাহা বিদ্যাসাগরের সদৃশ ব্যক্তির হস্তে তিল তিল পরিমাণে খণ্ডিত হইতে পারিবে। বিদ্যাসাগর মহাশয় কিছুদিন হইল, বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না, এই প্রস্তাবে যে পুস্তক প্রণয়নপূর্ব্বক প্রচার করেন, তাহার এক ক্রোড়পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় পূর্ব্বে একবার বহুবিবাহের প্রতিকূলে রাজদ্বারে আবেদন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, সম্প্রতি তাঁহাকে ধর্ম্মরক্ষণী সভার বহুবিবাহ নিবারণ বিষয়ক চেষ্টায় প্রতিকূল দেখিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় এই ক্রোড়পত্রে তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের পূর্ব্বকথা প্রকাশ করিয়া দেন। তর্কবাচস্পতি মহাশয় সোমপ্রকাশে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে গুটি কত সস্নেহ অনুযোগ করিয়া রাজবিধি দ্বারা বহু পরিণয় নিবারণের প্রতি স্বীয় প্রতিকূল ভাবের কারণ প্রচার করিয়াছেন। সর্ব্বসাধারণে এতদ্বিধ পণ্ডিতত্রয়ের মধ্যে এরূপ বাগবিতণ্ডা দর্শনে যৎপরোনাস্তি উপদেশ লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই। তবে এই শঙ্কা হইতেছে, বাদানুবাদ পাছে এই পর্য্যন্ত হইয়াই পরিসমাপ্ত হইয়া যায়।

"ফলত আমরা এ বাদানুবাদে সোমপ্রকাশ ও তর্কবাচস্পতি মহাশয়কে দোষী করিতে পারি না। সোমপ্রকাশ বহুবিবাহাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির উপরে কর নিয়োগের যে

প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহাতে বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেরই বোধ হইয়াছিল, প্রস্তাবটী গম্ভীরভাবে করা হয় নাই। অন্ততঃ আমরা বুঝিয়াছিলাম, সম্পাদক রাজবল দ্বারা বহুবিবাহ নিবারণাকাঙ্ক্ষী সম্প্রদায়কে ফাঁকি দিবার জন্য এই প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রস্তাব পড়িবার সময়ে আমাদের একটি গল্প মনে পড়িয়াছিল। এক ব্যক্তি কোন গৃহস্থের বাটীতে অতিথি বলিয়া উপস্থিত হয়। গৃহস্থ অত্যন্ত কৃপণ ছিল, কোন মতে তাহাকে অতিথি করিতে স্বীকার করিল না। অতিথি অগত্যা চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল, এমন সময়ে দেখিল, গৃহস্থের হাঁপানি কাশি আছে। দেখিবামাত্র অতিথি কহিল, মহাশয় আপনকার দেখিতেছি হাঁপানির পীড়া আছে, আমি তাহার উত্তম ঔষধ জানি। যদি বলেন, আমি আপনকার নিমিত্ত এই ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দিই। গৃহস্থ চিররোগী ঔষধ পাইবার আশয়ে অতিথিকে সমাদর পূর্ব্বক বসাইয়া তাহার উত্তমরূপ আতিথ্য সম্পাদন করিল। অতিথি পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজনাদি সমাপনান্তে অপরাহ্ণ উপস্থিত হইলে, গৃহস্থকে বলিল, মহাশয় অনুমতি করুন, আমি এক্ষণে বিদায় হই। গৃহস্থ উত্তর করিল হাঁ, কিন্তু আপনি আমাকে যে ঔষধের কথা বলিয়াছিলেন তাহার কি? অতিথি বিস্মৃতমনার ন্যায় কহিল হাঁ হা বটে। আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আপনি এক কর্ম্ম করিবেন, তিনটী তাল লইবেন, লইয়া একটী তাল পায়ের নীচে দিয়া ফেলিযা দিবেন, আর একটী মাথা ডিঙ্গাইয়া ফেলিবেন, আর একটি টুপ করিয়া গিলিয়া ফেলিবেন। গিলিবার সময় সাবধান হইবেন, যেন তালটি দাঁতে না ঠেকে। এই বলিয়া অতিথি চলিয়া গেল।

"সোমপ্রকাশের বহুবিবাহাকাঙ্ক্ষীর উপরে কর নিয়োগের প্রস্তাব এই অতিথির ব্যবস্থিত তাল ফল গ্রাস করিবার বিধির ন্যায়। নতুবা এরূপ প্রস্তাব সোমপ্রকাশ সম্পাদক কেন, বহুবিবাহ নিবারণার্থ রাজবলাকাঙ্ক্ষী সম্প্রদায় হইতেও সম্ভবিত নহে। অতএব বিদ্যাসাগর মহাশয় সদৃশ সারগ্রাহী ব্যক্তি তাদৃশ প্রস্তাব ধরিয়া সোমপ্রকাশ সম্পাদককে অপ্রতিভ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন, ইহা অতি আক্ষেপের বিষয়। সোমপ্রকাশ সম্পাদকও যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভয়ে প্রকৃত কথা ব্যক্ত করিতে অসমর্থ হইয়া অসার যুক্তি দ্বারা আত্মসমর্থন চেষ্টা পাইয়াছেন, ইহাও অতি আক্ষেপের বিষয়। কিন্তু বিদ্যাসাগর তর্কবাচস্পতি মহাশয়কে পর্য্যন্ত যে আঁধি করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন, ইহা সর্ব্বাপেক্ষা আক্ষেপের বিষয়। তর্কবাচস্পতি মহাশয় কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বহু পরিণয় নিবারণার্থ রাজবলের প্রার্থনীয়তা স্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়া কি তাহাকে তাহা চিরকালই করিতে হইবে। মনুষ্যের বুদ্ধি ক্রমোন্নতিশীল, আমার মানসপটে যে যুক্তিকলাপ উদিত হইয়া আজি এবম্বিধ সিদ্ধান্তের নির্দ্দেশ করিতেছে, কালক্রমে তদপেক্ষা বহুপ্রসারি যুক্তিকলাপ উদিত হইয়া অন্যবিধ সিদ্ধান্তের নির্দ্দেশ করিতে পারে। তর্কবাচস্পতি মহাশয় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যে কথা বলিতেন, আজিও যদি তাঁহাকে সেই কথা বলিতে হইবে, তবে এ পাঁচ বৎসর জীবিত থাকিয়া তাঁহার নিজের লাভ কি হইল? তাঁহার বুদ্ধির কি ক্রমশঃ বিস্তার ও

উন্নতি হইতে নাই। আর বুদ্ধির বিস্তার ও উন্নতির সঙ্গে কি মতের পরিবর্ত্তন হয় না? ফলতঃ আমরা শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের বিশেষ প্রশংসা স্থলে এইরূপ শুনিয়াছি যে, বিদ্যা ও বয়সের তাদৃশ পরিপাক প্রাপ্ত হইয়াও তিনি তরুণ বয়স্ক ব্যক্তির ন্যায় জ্ঞানোপার্জ্জন বিষয়ে সমর্থ ও আগ্রহশীল। ঈদৃশ ব্যক্তির সিদ্ধান্ত বিশেষের সংশোধন হইবে, তাহা বিচিত্র নহে, বরং অপেক্ষাকৃত অল্প জ্ঞানবান ব্যক্তিদের চিত্তের তাদৃশরূপ সংশোধন হয়, ইহাই প্রার্থনীয়।"

'এডুকেশন গেজেট' থেকে **'বহুবিবাহ'** বিষয়ে আরও দুটি রচনা এখানে উদ্ধৃত হল। প্রধানতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বহুবিবাহ' পুস্তকের প্রতিপাদ্য সম্বন্ধে এই রচনা দুটিতে আলোচনা করা হয়েছে:

বহুবিবাহ

এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ। ১৮ কার্ত্তিক ১২৭৮

অশেষ মান্যবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুবিবাহ প্রতিপক্ষে যে শাস্ত্র ও যুক্তি পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়াছেন, পুস্তকখানি দর্শন করিতে আরম্ভ করিয়া প্রথমাংশে আমার যে সন্দেহ জন্মিয়াছে, সেই সন্দেহটীর উচ্ছেদ করিলে চরিতার্থ হইব।

বিধি ত্রিবিধ,—অপুর্ব্ববিধি, নিয়মবিধি ও পরিসংখ্যাবিধি। স্বর্গকামো যজেত এই বাক্যটীকে অপুর্ব্ববিধি বলিয়া বিদ্যাসাগর কর্তৃক উদাহৃত হইয়াছে। এইরূপ বিধিটী কোন্ গ্রন্থকারের অভিমত বলিতে পারি না। স্বর্গকামো বিশ্বজিতা যজেত, অগ্নিহোত্রংজুহুয়াৎ স্বর্গকাম ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ বিধি সর্ব্বত্র দৃষ্টিগোচর হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ সমে যজেত, ইহাকে যে নিয়মবিধি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, ইহা নিতান্ত অসঙ্গত বলা যাইতে পারে। যেমন লোকের পক্ষে, যাগ করিবার বিধি আছে, সেইরূপ ঐ যাগ কোন্ স্থানে করিবেক? যজমান ইচ্ছানুসারে সমান অসমান উভয়বিধ স্থানেই যাগ করিতে পারিত। কিন্তু সমে যজেত এই বিধি দ্বারা সমান স্থানেই যাগ করিবার নিয়ম বদ্ধ হইয়াছে।

ঐরূপ যাগে তিথি বিশেষ নিয়মবদ্ধ না করিলে লোকে প্রতিপদাদি সকল তিথিতেই দর্শপৌর্ণমাসী নাম যাগ করিতে পারিত। কিন্তু পৌর্ণমাস্যাং পৌর্ণমাস্যা যজেত, অমাবস্যায়া মমাবাসায়া যজেত এই বিধিদ্বয় দ্বারা দর্শপৌর্ণমাসী কাল নিয়মবদ্ধ স্বীকার করিতে হয়। ইহা মীমাংসক মতবিরুদ্ধ। তথাচ মহামহোপাধ্যায় পার্থসারথি মিশ্র শাসদীপিকা নামক মীমাংসাগ্রন্থের দ্বিতীয়াধ্যায়ের তৃতীয় পাদে, সমে দর্শপৌর্ণমাসাভ্যাং যজেত, পৌর্ণমাস্যাং পৌর্ণমাস্যা যজেত, এই বাক্যদ্বয় অধিকার করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, উদ্দেশাভ্যামপি দেশকালাভ্যাং, সম্বন্ধ মাত্র মপ্রাপ্ত মিতি তন্মাত্রং বিধীয়তে, ইহা দ্বারা প্রতীত হইতেছে যে, ইহা অপুর্ব্ববিধি। উক্ত বাক্যে অপ্রাপ্ত দেশকাল সম্বন্ধ মাত্র বিহিত হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ, সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দ্বার কর্ম্মণি। কামতস্ত প্রবৃত্তানা মিমাঃ স্যাঃক্রমশোহবরা। শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্ত সাচ স্বাচ বিশঃ স্মৃতে। তেচ স্বাচৈব রাজ্ঞশ্চ তাশ্চ 'স্বাচাগ্র জন্মনঃ। এই বচনের পরিসংখ্যা পক্ষে কামতঃ বিবাহ প্রবৃত্ত বিপ্রের অসবর্ণা কন্যার সহিত বিবাহবিধান এবং সবর্ণা কন্যার সহিত বিবাহনিষেধ অভিপ্রায় বোধ হইতে পারে না। পরন্ত তাশ্চ স্বাচ এই পদদ্বয় দ্বারা সর্ব্ববর্ণীয় কন্যা বিবাহ করিতে পারিবে, ইহাই বচনার্থ প্রতিপন্ন হইতেছে। পরিসংখ্যা দ্বারা উক্ত বর্ণচতুষ্টয়াতিরিক্ত অপধ্বংসজাদি কন্যা বিবাহ নিষেধ প্রতিপাদন করিলে শাস্ত্রমূল চিরন্তন ব্যবহার অনিন্দনীয় হয়, এবং শূদ্রজাতির বহুবিবাহে দোষ নাই ইহাই প্রতিপন্ন হয়।

ভাটপাড়া নিবাসী
বিদ্যারত্নোপাধিক
শ্রীঅভয়াচরণ দেবশর্ম্মা।

বহুবিবাহ

এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ। ২৮ বৈশাখ ১২৮০

বিদ্যাসাগর বাদী, স্মৃতিরত্ন প্রভৃতি প্রতিবাদী

বহুবিবাহের শাস্ত্রীয় বিচারে আমরা এতদিন কোন কথা বলি নাই। কথা বলিতে আমাদের অধিকার ছিল, এমন নহে। পণ্ডিতেরা প্রথমাবধিই বাঙ্গলা ভাষাতে বিচার করিতেছেন। বিচার এমনভাবে করিতেছেন যে, বিষয়ী লোকেরাও যেন তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারেন, এবং বুঝিয়া কোন্ পক্ষের কথা প্রকৃত শাস্ত্রসম্মত, তাহার মীমাংসা করিতে পারেন। কাজেই এ বিচারে বিষয়ী লোকেরাই প্রকৃত বিচারকের আসন পাইয়াছেন, পণ্ডিতেরা কেবল স্ব ব পক্ষে ওকালতী করিতেছেন মাত্র। এই প্রযুক্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবসায়ী না হইয়াও আমরা এ বিচার স্থূল অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে অধিকারী হইয়াছি। অতএব এক্ষণে এ বিচার কি পর্য্যন্ত উঠিয়াছে, সংক্ষেপে তাহার নির্দ্দেশ করিতেছি।

বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত কি না, এ মোকদ্দমায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ই বাদী। তাঁহার আর্জির মূল মর্ম্ম এই ;—স্বজাতিতে একবিবাহ বৈধ, বহুবিবাহ নিষিদ্ধ, অতএব যাহারা বহুবিবাহ করে, তাহারা বে-আইনী করে। আর্জিতে আইনের দোহাই দিতে হয় ; বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাও দিয়াছেন। আইনটী এই :

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোঽবরা ॥
শূদ্রৈবভার্য্যা শূদ্রস্য সাচ স্বাচ বিশঃ স্মৃতে।
তে চ স্বাচৈব রাজ্ঞঃস্যুস্তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ ॥

বিবাহ প্রথম বারে স্বজাতিতে করিবে, পরে হীন জাতিতে করিবে।

প্রতিবাদিগণ যে জবাব দিয়াছেন, তাহাতেও এই আইনের দোহাই আছে, এবং তাহাতেও এই আইনের অর্থ এইরূপই করা আছে।

তথাপি উভয় পক্ষের মধ্যে অনেক প্রভেদ ঘটিতেছে।

বাদী বলিতেছেন, স্বজাতিতে বিবাহ কোন্ স্থলে করিতে পারা যায় কোন্ স্থলে করিতে পারা যায় না এ বচনে তাহাই বলা আছে। প্রতিবাদীগণ বলিতেছেন, হীন জাতিতে বিবাহ কোন্ স্থলে করিতে পারা যায় কোন্ স্থলে করিতে পারা যায় না, এ বচনে তাহাই বলা আছে। বাদী ভাবিতেছেন যেন মনু প্রজাগণকে বলিয়াছেন, "ওহে বাপু সকল! স্বজাতিতে বিবাহ, প্রথমবারটিতে যে করিবে সেই, আর করিতে পাইবে না।" প্রতিবাদীগণ ভাবিতেছেন যেন মনু বলিযাছেন, "ওহে বাপু সকল! হীন জাতিতে বিবাহ প্রথমবারটিতে করিতে পাইবে না, তাহার পরে করিতে পাইবে।" বাদী বুঝিতেছেন, প্রজাগণ মহর্ষির নিকটে যেন স্বজাতিতে বারম্বার বিবাহ করিবার অনুমতি চাহিয়াছিল। প্রতিবাদীগণ ভাবিতেছেন, প্রজাবর্গ যেন স্বজাতিতে অজাতিতে ইচ্ছামত বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল। বাদীর বিবেচনায় মনু স্বজাতিতে বহুবিবাহ নিষেধ করিয়াছেন। প্রতিবাদীগণের বিবেচনায় মনু হীন জাতিতে প্রথম বিবাহ নিষেধ করিয়াছেন। বচনের ভাষা যেরূপ, তাহাতে উভয় তাৎপর্য্যই সঙ্গত হইতে পারে। বিবাহ প্রথমবারে স্বজাতিতে করিবে, পরে হীনজাতিতে করিবে, এ কথাতে এমন বুঝাইতে পারে যে শাস্ত্রকার স্বজাতিতে বারম্বার বিবাহ নিষেধ করিয়াছেন, আবার এমনও বুঝাইতে পারে যে, যাহাতে প্রজাগণ প্রথম বিবাহটী অজাতিতে না করে, শাস্ত্রকার তাহারই নিয়ম বন্ধন করিয়াছেন। একটী উদাহরণ দ্বারা আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতেছি। মনে কর, আমি আমার পুত্রকে বলিলাম, প্রথমবারে কলিকাতায় যাইবে, পরে অন্য স্থানে যাইবে। কথাটী সহজেই বুঝা গেল বটে, কিন্তু অবস্থাভেদে ইহার তাৎপর্য্য ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইবে। আমার পুত্রের যদি অন্য কোন স্থানে যাইবার ইচ্ছা না থাকিয়া কেবল কলিকাতাতেই বারম্বার যাইবার ইচ্ছা থাকে, মনে কর আমার পুত্রের শ্বশুরালয় কলিকাতায়, তবে আমার আদেশে এই বুঝাইবে যে, আমি তাহাকে কলিকাতায় একবারের অধিক যাইতে নিষেধ করিয়াছি। আর, আমার পুত্রের যদি কলিকাতায় যাইতে কোন ইচ্ছা না থাকে, কেবল অন্য স্থানে বেড়াইবারই ইচ্ছা থাকে, এবং আমি জোর করিয়া তাহাকে কলিকাতায় পাঠাইতেছি। তাহা হইলে আমার আদেশে এই বুঝাইবে যে আমি তাহাকে প্রথমবারে কলিকাতা ভিন্ন অন্য স্থানে যাইতে নিষেধ করিয়াছি। অর্থাৎ আমার আদেশটী অবস্থাভেদে কলিকাতায় বারম্বার যাইবার নিষেধক হইবে, এবং অবস্থাভেদে কলিকাতা ভিন্ন অন্য স্থানে প্রথম গমনের নিষেধক হইবে। যে মনুবচন ধরিয়া বহুবিবাহ বিষয়ক বিচার হইতেছে, তাহার বাক্যার্থ একরূপ

হইয়াও তাৎপর্য্যটি এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইতে পারে। বাদী বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিতেছেন, স্বজাতিতে বহুবিবাহ নিষেধ করা এই বচনের অভিপ্রেত। প্রতিবাদিগণ বলিতেছেন, ভিন্ন জাতিতে প্রথম বিবাহ নিষেধ করা এই বচনের অভিপ্রেত। অতএব এই বচনটী লিখিবার সময়ে শাস্ত্রকর্ত্তার অভিপ্রেত কি ছিল, তাহা নিরূপণ করিবার নিমিত্ত আরও প্রমাণের প্রয়োজন করিতেছে। তখনকার লোকের বিবাহ বিষয়ে প্রবৃত্তি কি প্রকার ছিল, তাহারা স্বজাতিতে বারম্বার বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত ছিল, কি স্বজাতি অজাতি বিবেচনা না করিয়া বিবাহ মাত্রেই প্রবৃত্ত ছিল, তাহার প্রমাণের প্রয়োজন করে। এই প্রযুক্ত উপস্থিত মোকদ্দমার নিষ্পত্তির নিমিত্ত এই ইস্গুলি ধার্য্য করা গেল।

প্রথম ইস্থ।

আইনের কোন প্রিএম্বেল আছে কি না, অর্থাৎ যে প্রয়োজনের অনুরোধে শাস্ত্রকর্ত্তা এই আইন করিয়াছিলেন, তাহা বুঝা যাইতে পারে, আইনের এমন কোন ভূমিকা আছে কি না। অথবা অন্য কোন ধর্ম্ম শাস্ত্রকর্ত্তার কথাতে সেই প্রয়োজনটী বুঝা যায় কি না।

দ্বিতীয় ইস্থ।

অন্যান্য মীমাংসাকার যেরূপ অর্থবাদ করিয়াছেন, তাহার দলীল-ঘটিত কোন প্রমাণ আছে কি না। যদি থাকে তবে কিরূপ।

তৃতীয় ইস্থ।

যদি সে প্রকার দলীল না পাওয়া যায়, অথবা সে প্রকার দলীলেরও তাৎপর্য্য অস্পষ্টতাবশতঃ বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষেরই সমান পোষক হয়, তবে প্রজাগণ আপনাপন ব্যবহারকালে এই আইনের কি প্রকার অর্থবাদ করিয়াছিল ; অর্থাৎ চিরাগত আচারের দ্বারা কোন পক্ষের পোষকতা হইতেছে। এই আচার শাস্ত্রানুমত কি না, তৎসম্বন্ধে বাদী প্রতিবাদীর কোন আপত্তি শুনা যাইবে না। শাস্ত্র কি তাহাই স্থির করিবার নিমিত্ত এ মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে। অবশেষে আদালত এই বলিতে চাহেন যে, অন্যান্য মোকদ্দমা-স্থলে যে প্রণালীতে ইস্থ ধার্য্য করা যায়, এ মোকদ্দমাস্থলে তাহার কিছু ইতর বিশেষ করা গেল। ইস্থগুলি যেরূপ ধরা গিয়াছে, তাহাতে প্রমাণের ভার বাদীরই উপরে পড়িত। কিন্তু এ মোকদ্দমায় বাদীর নিজ ইষ্ট সাধনের সম্ভাবনা অল্প, পরদুঃখকাতরতাবশতঃই পরিশ্রম স্বীকার ও ব্যয় স্বীকার পূর্ব্বক বাদীস্থলীয় হইয়াছেন। সেইপ্রযুক্ত আদালত দয়া ভাবিয়া প্রমাণের ভার কেবল তাঁহার উপরে না রাখিয়া, উভয় পক্ষেরই উপরে সমান ভাবে অর্পণ করিলেন।

অতএব হুকুম হইল যে বাদী প্রতিবাদী বৃথা বৃথা বাদানুবাদ না করিয়া কেবল এই তিনটী ইস্থর বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া আপনাপন প্রমাণ উপস্থিত করেন।

বাল্যবিবাহ ও মালাবারী : পৃষ্ঠা ৩২৩-২৮, ৩৬২, ৫৬৯

"Behramji Merwanji Malabari was editor of the Bombay *Indian Spectator*, a weekly journal, and also of the *Voice of India*, a monthly founded by Dadabhai Naoroji. The *Voice of India* was a small publication containing extracts from the chief Indian papers on different questions, with a page of introduction. The *Indian Spectator* was a cautious and carefully edited paper, with attractive, well-written paragraphs, often humorous. These were mostly written-by Malabari himself. There were one or two leading articles, usually written by others. The *Indian Spectator* was what may be called an 'acceptable' paper. In a lecture delivered in Bombay, Sir William Lee-Warner, Secretary to the Government of Bombay, held the *Indian Spectator* up as a model critic. As Sir Willian Lee-Warner was a typical bureaucrat of the spread-eagle order, his appreciation was significant. Latterly, Malabari used to write in the first person singular, following the example of Mr. W. T. Stead in the Pall Mall Gazette and the Review of Reviews. He appeared in the role of a social reformer in 1885. He wrote two notes on Infant Marriage and Enforced Widowhood and circulated them for opinion, and the opinion he received, whether in personal letters or in newspapers, were published, sometimes with running comments, in the *Indian Spectator*. In orthodox Hindu quarters Malabari's social reform campaign was strongly resented on the ground that he was an outsider and had no concern with Hindu society. Malabari felt himself ill-used and wrote several times that he was 'Only a Parsi'. Humanity, however, is higher than communalism, and a Parsi, Or a Muhammedan, Or a Christian, would be perfectly justified in raising his voice against an evil Hindu custom, just as a Hindu is entitled to protest against a Parsi, Muhammedan or Christian social evil in the name of humanity. Whether he can obtain a hearing or not is another question. But there is a great deal of difference

between the experiences of a social reformer from inside and those of one from outside. Malabari was severely criticized by some Hindu newspapers, but hard words break no bones and Malabari had none of the bitter experiences of Pandit Iswara Chandra Vidyasagar or Kursondas Mulji. There was no tangible outcome to Malabari's agitation. It had no relevant bearing on the Age of Consent Act. The most stalwart supporter of that measure in Bombay was K. T. Telang, who in a series of admirable articles in the *Indu Prakash*, then edited by N. G. Chandavarkar, supported the Bill and traversed the arguments of Sir Romesh Chunder Mitter*, who had opposed it in the Imperial Legislative Council. I corresponded with Malabari before we met, and I stayed with him twice for a few hours in Bombay when he was living in Hornby Road At one time Malabari had an idea of starting a daily paper He wrote to me asking for a rough estimate and suggesting that I should take up the editorship of the proposed paper. Some correspondence passed between us, but nothing came out of it. I met Malabari again in Lahore and Calcutta, and I had a letter from him a few days before his sudden death at Simla. Malabari told me himself that the *Indian Spectator* never paid its way and that there was a small loss every month, but he had other sources of income and left a considerable fortune amounting to several lakhs of rupees. Malabari was in high favour with successive Viceroys and Governors of Bombay, and when Lord Randolph Churchill visited Bombay, Lord Reay sent him to Malabari's house to meet a select gathering of Indian leaders. He never attended the Indian National Congress

* THE AGE OF CONSENT BILL, REPORT OF THE SELECT COMMITTEE. The Hon. Sir Romesh Chunder Mitter's Dissent.

After bestowing careful consideration upon all that has been said for and against it, I am still of opinion that the proposed amendment of the *exception* to section 375, Indian Penal Code, is likely to cause more harm than good.

—The Statesman of March 7, 1891 [75 years Ago] The Statesman, March 7, 1966.

even when it met in Bombay and called himself a recluse. Malabari latterly established a monthly magazine called East and West."

—Nagendranath Gupta : *Reflections and Reminiscences :* Bombay 1947, Pp 127-29

অক্ষয়চন্দ্র সরকার, বিধবাবিবাহ ও 'নবজীবন'

"Akshay Chandra Sarkar was perhaps the most powerful opponent of progressive social views represented by not only the Brahmo Samaj but even by such advanced Hindu social reformers as Pandit Iswar Chandra Vidyasagar. Babu Akshay Chandra delivered an address in defence of the disabilities imposed by Hinduism upon young widows in regard to re-marriage about the middle of 1884 [May 1885] before a large and distinguished audience. The meeting was held under the auspices of the Savitree Library. It was presided over, I think, by Dr. Gurudas Banerjee, who subsequently rose to the position of a puisne judge in our High Court and was knighted in recognition of his distinguished services. I was then Sub-Editor of the "Brahmo Public Opinion." I had been relieved from the beginning of 1884 of the charge of Durga Mohan Babu's sons, who went to the new Civil Service classes opened by Dr. Aghore Nath Chattopadhyaya, who had been deported from Hyderabad (Nizam) a few months earlier, in consequence of some political intrigue, which is so common in our Native States, and had come and settled in Calcutta. I was present at this meeting and though comparatively young and unknown, I did not hesitate to take up the challenge of the veteran Bengalee essayist. My speech in opposition to Babu Akshya Chandra Sarkar's attracted considerable notice not only at the meeting but also in the periodical press of that time. I reproduced a summary of it in our monthly, "Alochona". This was practically my first appearance before a large and distinguished Calcutta audience."

Bipinchandra Pal : *Memories of My life and Times*, Pp. 439-40
Calcutta 1932

সাবিত্রী লাইব্রেরির অধিবেশনে অক্ষয়চন্দ্র সরকার 'বিধবাবিবাহ' সম্বন্ধে যে বক্তৃতাটি দিয়েছিলেন তা এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হল :

হিন্দু বিধবার আবার বিবাহ হওয়া উচিত কিনা ?*

সকল অনুষ্ঠানই যেমন দুইদিক দিয়া দুই ভাবে দেখা যায়, হিন্দুর বিবাহও সেইরূপ দুই দিক দিয়া দুই ভাবে দেখা যায়। একভাবে বলা যাইতে পারে, যে ইন্দ্রিয়-চরিতার্থ করাই বিবাহের উদ্দেশ্য। জড়দিক্ দেখিলে উদ্দেশ্য ঐ রূপই বটে। কিন্তু বিবাহের উদ্দেশ্য যদি ঐ রূপই হইল তবে আর অত বাঁধা ছাঁদা কেন ? উপবিবাহই ত যথেষ্ট। ইহার উত্তর স্বরূপে বলা হইয়াছে যে, পুত্রের জন্য বিবাহ করা আবশ্যক। ভাল, পুত্রের'ই বা প্রয়োজন কি ? পিণ্ড প্রাপ্তির জন্য পুত্রের প্রয়োজন। পিণ্ড আত্মতোষণের উপকরণ, উহাতে আর 'কেন' এই শব্দটা উঠিবে না। আত্মপোষণ আত্মতৃপ্তি স্বার্থ রক্ষা এই সকলের একটি না হয় আরটিই, এরূপ যুক্তির চরমপদ।

অপত্যোৎপাদনের জন্যই বিবাহের প্রয়োজন এ সিদ্ধান্ত—বিবাহের অতি নিকৃষ্ট ভাগ, অতি সামান্য ভাগ—দেখিয়াই হইয়াছে। হিন্দুবিবাহের অতি উচ্চতর, অতি প্রশস্ততর, অতি পবিত্র সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক দিকে দৃষ্টি প্রখরা। হিন্দুর বিবাহ ব্যাপারেও আধ্যাত্মিক ভাবটা উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত।

বিশাল হইতে বিশালতরে, বিশালতর হইতে বিশালতমে পরিণতি, অথচ বিলয়, ইহাই জগতের ক্রম, ইহাই জগতের নিয়ম, ইহাতেই জগতের সৌন্দর্য্য। এই ক্ষুদ্র মানব-জীবনের বিশাল হইতে বিশালতমে পরিণতিই ইহাই পরমার্থ। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে তাহার সুন্দর ক্রম আছে, সুচারু পদ্ধতি আছে। প্রথমে আপনার শারীরিক ও মানসিক উন্নতি তাহার পর পারিবারিক বা সাংসারিক উন্নতি ; তাহার পর সামাজিক উন্নতি ; সর্ব্বশেষে ঐশ্বরিক উন্নতি। জীবনের এই চারিটি ক্রম হইতেই চারিটি আশ্রম। দ্বিতীয় আশ্রমের ; ়াং গৃহীর পারিবারিক জীবনের মূল গ্রন্থি গৃহিণী। গৃহিণী লইয়াই গৃহ। গৃহিণী না হইলে গার্হস্থ্য হয় না। গার্হস্থ্য আশ্রমের পরে না হইলে সন্ন্যাস ধর্ম্ম হয় না। সন্ন্যাস[illegible] বিশালতর সামাজিকতা হইতে বিশালতম বিশ্বযোগ বা সমাধি। কাজেই পণ্ডিতে বলিয়াছেন, "হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য মুক্তি।" "বিবাহ মোক্ষলাভের সুপ্রশস্ত এবং সর্ব্বকৃষ্ট প্রণালী।" বিবাহ গৃহস্থাশ্রমের অবলম্বন। "অসম্পূর্ণ পুরুষ, স্ত্রীর সহিত মিলিত হইয়া একটি সম্পূর্ণ ব্যক্তি" হন। হিন্দু বিবাহে পতিপত্নীর যেরূপ একত্ব হয়, "এরূপ মিশ্রণ এরূপ একীকরণ পৃথিবীতে আর কোন জাতি কল্পনা করে নাই।" "সে বিবাহ প্রক্রিয়া

* ২৮শে বৈশাখ সন [মে ১৮৮৫] ১২৯২ সালে সাবিত্রী লাইব্রেরির ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার কর্তৃক এই প্রবন্ধ পঠিত হয়।

যখন আরম্ভ হয়, তখন আমরা দুইটি ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ করি, সে বিবাহ প্রক্রিয়া যখন সমাপ্ত হয়, তখন কেবল একটি ব্যক্তিকে দেখিতে পাই।" "জল যেমন জলে মিশিয়া যায়, বায়ু যেমন বায়ুতে মিশিয়া যায়, অগ্নিশিখা যেমন অগ্নিশিখাতে মিশিয়া যায়, তখন পুরুষ তেমনি স্ত্রীতে, এবং স্ত্রী তেমনই পুরুষে মিশিয়া গিয়াছে।" "স্বয়ম্ভু নিজদেহ যে দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া পুরুষ নির্ম্মাণ করিযাছিলেন, সেই দুই খণ্ড মিলিয়া এবং মিশিয়া আবার সেই এক স্বয়ম্ভু প্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছে।" "স্ত্রী এবং পুরুষের সম্পূর্ণ মিশ্রণ মনুষ্যত্ব সাধক।" হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য "এই মিশ্রণ এবং একীকরণ।"

একটি পুরুষের সহিত একটি স্ত্রীর একীকরণের নাম বিবাহ বটে, কিন্তু সেই পুরুষ আকাশ বিক্ষিপ্ত প্রান্তরস্থিত কোন ব্যক্তি নহেন, তিনি একটি বিশেষ গোত্রের, বিশেষ প্রবরের, বিশেষ কুলের অন্তর্গত এবং অঙ্গীভূত ব্যক্তি। স্ত্রীকে পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গ হইতে হইলে অগ্রে তাঁহার গোত্রান্তর আবশ্যক; হিন্দুর বিবাহ বিলাতের মত রূপজ, গুণজ মোহের মিলন নহে, নেড়া নেড়ির কাণ্ডও নহে। একটি পরিবারে দশটি স্ত্রী পুরুষ আছেন, আর একটি আসিয়া তাহাতে মিশিয়া যাইবে তবে তাহার বিবাহ হইবে। সেই বিবাহের পর হইতে সেই পরিবার মধ্যে আর একটি সম্পূর্ণ পুরুষ হইল, একথা ঠিক, কিন্তু একে আর একে মিলনে যে একরূপ হইল তাহা নহে, দশে আর একে মিলন হইয়া, তবে সেই সম্পূর্ণতা সম্পাদন হইল। অতএব, কেবল একে আর একে মিলনের নাম বিবাহ নহে আধখানিকে পুরা একখানি করিবার জন্য একটি পরিবার মধ্যে একটি নারীর আগম, মিলন, ও মিশ্রণই বিবাহ। বিবাহ—কুললক্ষ্মীর কুলে প্রতিষ্ঠা। ভবিষ্যদ গৃহিণীর গৃহে অধিষ্ঠান। বৈদেশিক বিবাহের পরই যুবক, যুবতী মধুমাস কুলভ্রষ্ট, গোষ্ঠীভ্রষ্ট, সমাজভ্রষ্ট হইয়া বাস করেন; আমাদের দ্বিরাগমনের নবোঢ়া সমস্ত পরিবারের সাম্রাজ্ঞীসেবিকারূপে অর্দ্ধহস্ত গুণ্ঠনে গুণ্ঠিত হইয়া কুটনা কুটিতে বসিলেন। হিন্দুর বিবাহ একটি কুল-কর্ম্ম। আত্মকৃতি নহে।

অতএব বুঝিতে গেলে বলিতে হয় একটি পরিবারের সহিত একটি হিন্দু কুমারীর বিবাহ হয়; কেবল একটি পুরুষের সহিত নহে। আমাদের লৌকিক কথায় ও ব্যবহারেও আমরা সেইরূপ বুঝিয়া আসিতেছি। "মেয়েটির কোথায় বিবাহ দিলেন মহাশয়?" "উত্তর শ্রীপুরের চৌধুরীদের বাড়ী।" "ভাল বংশ বটে, ভাত কাপড়ের দুঃখ হবে না।" তাহার পরের প্রশ্ন "পাত্রটি কেমন?" "কলেজে লেখা পড়া করিতেছে।" তবেই মুখ্য কথাটা হ'ল যে কুল কেমন? কেননা হিন্দু বুঝেন, বিবাহ কুলের সহিত, বিশেষ পুরুষ কেবল পাত্র মাত্র।

বিবাহের মন্ত্রে বর বারম্বার বলিতে থাকেন,—

ওঁ ধ্রুবা দ্যৌঃ ধ্রুবা পৃথিবী,
ধ্রুবং বিশ্বমিদং জগৎ,
ধ্রুবাসঃ পর্ব্বতাইমে,
ধ্রুবাস্ত্রী পতিকুলে ইয়ম,

আকাশ ধ্রুব, পৃথিবী ধ্রুব এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সকলই ধ্রুব, পর্ব্বত সকল ধ্রুব, এই স্ত্রীও পতিকুলে ধ্রুব।

· কন্যা বলেন,—

ধ্রুবমসি ধ্রুবাহং
পতি কুলে ভূয়াসম্।

হে ধ্রুব নক্ষত্র, তুমি যেমন অচল, আমি যেমন তেমনি পতিকুলে অচলা হই।

বর কন্যাকে বলিতেছেন,—

ওঁ সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব,
সম্রাজ্ঞী শ্বশ্রাং ভব
ননন্দারচ সম্রাজ্ঞী ভব,
সম্রাজ্ঞী অধিদেবৃষু।

শ্বশুরে সম্রাজ্ঞী হও, শ্বশ্রূজনে সম্রাজ্ঞী হও, ননন্দার সম্রাজ্ঞী হও দেবর সকলে সম্রাজ্ঞী হও।

অতএব স্ত্রীকে কেবল The Empress of my heart হইলে চলিবে না, The Empress of a whole family হওয়া চাই। যতগুলি লোক লইয়া পরিবার, পত্নীর ততগুলি সম্বন্ধ বা ততগুলি লোকের সহিত সম্বন্ধ, "হিন্দু পত্নীকে পতিতে এবং পতির কুলেতে চিরকালের জন্য অচলভাবে "ধ্রুব নক্ষত্রের মত, স্থির রাখিতে" আবদ্ধ রাখিতে যত্নবান। হিন্দুর বিবাহে দুটি তারা দেখিতে হয়—একটি অরুন্ধতী, আর একটি ধ্রুবতারা। অরুন্ধতীকে সাক্ষী করিয়া, আদর্শ করিয়া কন্যা বলেন, 'হে অরুন্ধতী আমি যেন তোমার মত পতিতে আবদ্ধ থাকি। (অরুন্ধতী বশিষ্ঠের জায়া, তিনি আকাশেও বশিষ্ঠের সহচরী) অর্থাৎ ইহকালে পরকালে যেন সমান আবদ্ধ থাকি। আর ধ্রুবকে সাক্ষী করিয়া বলেন, আমি যেন তোমার মত পতিকুলে চিরস্থির থাকি।

এতক্ষণ ধরিয়া আমরা বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে একটিও কথা কহি নাই, এখন একবার আস্তে আস্তে ভয়ে ভয়ে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করি, হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহ কথাটা যেন কেমন কেমন লাগে না? ধর্ম্মের দিক দিয়া দেখিলে হিন্দু নারীর বিবাহ যেরূপ পদার্থ তাহাতে তাঁহার পুনর্বিবাহের কথা উঠিতেই পারে না।

হিন্দু রমণী একবার যে কুলে গৃহীতা, নীতা ও পরিণীতা হইয়াছে সে কোন প্রকারেই আর সে কুল ত্যাগ করিতে [illegible]ব না। কুল-ত্যাগিনী কুলটা ব্যভিচারিণী আমাদের হিন্দুদের অভিধানে একই পর্য্যায়ভুক্ত। এই পরিভ্রাম্যমান জগতের মধ্যে এক মাত্র অচল অটল পদার্থ ধ্রুব নক্ষত্রকে সাক্ষী করিয়া হিন্দু নারী বলিয়াছেন,—

ধ্রুবমসি ধ্রুবাহং।
পতিকুলে ভূয়াসম্।

আমি যেন পতিকুলে অচলা হই ; তবে আজি কোন্ প্রাণে সেই পতি-কুল ত্যাগ করিবেন ? তবে যে ধর্ম্মের দিকে তাকাইবে না, তাহার কথা স্বতন্ত্র।

তাহার পর আবার দেখ বিবাহ ঘোরতর আধ্যাত্মিক যোগের অনুষ্ঠান। হৃদয়ে হৃদয়ে মিল, প্রাণে প্রাণে মিল, আত্মায় আত্মায় মিল। হিন্দুর দৃঢ় বিশ্বাস মানবের পঞ্চত্ব প্রাপ্তিতে তাঁহার আত্মার ধ্বংশ হয় না পরকালে বিশ্বাস হিন্দুর জাতি ধর্ম্ম। এখন বলুন দেখি, হিন্দু নারী স্বামীর পরলোকপ্রাপ্তিতে কি বলিয়া পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে যাইবে ? তাহা যদি সঙ্গত হয়, তবে স্বামী বিদেশে থাকিলে তো তাঁহার পুনর্ব্বার বিবাহের দাবি চলিবে। পবিত্র সাবিত্রী নামে উৎসর্গীকৃত এই লাইব্রেরীর অধিবেশন অবসরে, এ সকল কথা মুখে আনিতেও কুণ্ঠা হয়। সাবিত্রী চতুর্দ্দশীর ব্রতকথার শিক্ষা আমরা ভুলিতেছি ; শাস্ত্রের উপদেশ যে, যিনি সতী, তিনি স্বয়ং যমরাজকেও ভয় করেন না, কৃতান্ত তাঁহাকে পতি হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না ! একথা আমরা বিশ্বাস করি, সতী কখন বিধবা হন না, স্বামী দেশেই থাকুন, আর বিদেশে থাকুন, ইহলোকেই থাকুন, আর পরলোকগতই হউন, দুইদিনের, দশদিনের, যুগের, মহাযুগের বিচ্ছেদ হইলেও তিনি স্বামীর ; স্বামী তাঁহার ; তবে সতী আর বিধবা হইলেন কৈ ? সাবিত্রী চতুর্দ্দশীর ব্রতকথার এই গভীর উপদেশ। যে নারী এই মহৎ উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তাঁহাকে কখনই বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। চমৎকার উপদেশ ! চমৎকার ধর্ম্ম।

দেখা যাইতেছে, যে দুইটি তারাকে সাক্ষী রাখিয়া হিন্দু নারী বিবাহিতা হইয়াছিলেন, তাঁহারা দুই জনেই তাঁহার পুনর্বিবাহের একান্ত বিরোধী, অরুন্ধতী বলেন, 'তুমি আমার মত ইহকালে পরকালে স্বামী সহচরী থাকিবে বলিয়াছিলে, তোমার সে কথা থাকে কৈ ?' ধ্রুব বলেন, 'তুমি যে আমার মত স্বামীকুলে অচল অটল থাকিবে বলিয়াছিলে, তোমার সে কথাটাই বা থাকে কৈ ?' তবে ত হিন্দু বিধবার আর বিবাহ করা হয় না ? যদি নাই হয়, তবে পঞ্চমবর্ষীয় বালকের পর্য্যন্ত কণ্ঠস্থ 'নষ্টেমৃতে' শ্লোকের কি দশা হইবে ? দ্বাদশ প্রকার পুত্রের মধ্যে পৌনর্ভবও এক প্রকার বৈধ পুত্র, সে ব্যবস্থার কি হইবে ?

আমার সুদীর্ঘ ব্যাখ্যার প্রথমাংশ যদি আমি বিশদ করিতে পারিয়া থাকি, তাহা হইলে আপনারা অবশ্যই বুঝিয়া থাকিবেন, যে আমি এই তর্কের মীমাংসা জন্যই, মাংসাহার সম্বন্ধে মনুর মত সঙ্কলন করিয়াছি।

মাংস সম্বন্ধে হরিণটি, ছাগলটি,—কোন কোন স্থলে খাইতে পার বটে, কিন্তু—

প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।

এই প্রবৃত্তির নিবৃত্তি করিতে পারিলেই ধর্ম্ম। এস্থলেও ঠিক তাই, 'নষ্টে' পারিবে 'প্রবজিতে' পারিবে ইত্যাদি কিন্তু—

প্রবৃত্তিরেষা নারীনাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।

আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে দেবল, নারদ, পরাশর, মনু,—ধর্ম্মশাস্ত্র

প্রযোজক সকলেরই এই মত, সমগ্র হিন্দু শাস্ত্রের এই মত। নষ্টে মৃতের পরের শ্লোকটি পড়িলেই তাহা বুঝা যায়। মনু যেমন পৌনর্ভবকে পুত্র মধ্যে ধরিয়াছেন, তেমনই কানীন ও গূঢ়োৎপন্নকেও পুত্র বলিয়াছেন। যদি পৌনর্ভবের পুত্রত্ব দেখাইয়া বিধবা বিবাহ ধর্ম্মসঙ্গত বলিতে পারা যায়, তাহা হইতে কানীন ও গূঢ়োৎপন্ন পুত্রের দোহাই দিয়া, পিনালকোর্ডের ধারাবিশেষের ধর্ম্ম ত সাফাই করা চলে। না, শাস্ত্রের ওরূপ ব্যাখ্যা সঙ্গত নহে।

আদর্শ সমাজের রীতিনীতি লইয়া শাস্ত্র নহে। ধর্ম্মের আদর্শ ব্যবস্থা বলিয়া সমাজের সংরক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে সংস্করণ,—শাস্ত্রের উদ্দেশ্য যে দেশে বন্য বিন্ধ্যাচল-বাসী হইতে, বেদনিরত ব্রাহ্মণ,—চিরদিনই আছেন, সে দেশে অষ্ট প্রকার বিবাহ, দ্বাদশ প্রকার পুত্র, শতকর্ম্মে শতবিধ ব্যবস্থা থাকিবেই থাকিবে; অন্তত থাকাই স্বাভাবিক, মাংসাহার প্রসিদ্ধ, আবাব নিষিদ্ধ, যজ্ঞে পশুবধ শ্রেয়, আবার অহিংসা পরম ধর্ম্ম; বিধবা বিবাহের নিষেধ, আবার বিধি; এ সকলই থাকিবে, তাই বলিয়া তাহার সকল কথাই কি ধর্ম্মসঙ্গত? কখনই কোন শাস্ত্রকার তাহা বলেন না। তাঁহারা সকলেই সকল কার্য্যে মুখ্য গৌণ ভেদ করিয়াছেন, যেটা হওয়া উচিত, কিন্তু পুরাপুরি হয় না, সেইটিই মুখ্য। আমরা পুর্ব্বে বলিয়াছি যে, তাহাই ধর্ম্ম। সুতরাং শাস্ত্রের মুখ্য বিধিগুলিই ধর্ম্ম। তবে আবার গৌণ ব্যবস্থাগুলি লইয়া আমার ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচারে প্রবৃত্ত হইবে কেন? কোন্‌টি উচিত কোন্‌টি অনুচিত—ধর্ম্মের নিকষেই তাহা স্থির হয়; মুখ্য ব্যবস্থা দেখিয়াই ধর্ম্ম বুঝিতে হয়, 'নষ্টে মৃতে' ইত্যাদি গৌণ ব্যবস্থা লইয়া উচিত অনুচিত মীমাংসা করা যাইতে পারে না।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া সহমরণ বিষয়ে শাস্ত্র বিচার করিযাছিলেন, তাহার আলোচনা করিলে, হিন্দু শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ গ্রহণের কতটা সঙ্কেত পাই।

বিধবার ব্রহ্মচর্য্যের বিধিও শাস্ত্রে আছে, বিধবার সহমরণের বিধিও শাস্ত্রে আছে, মহাত্মা রামমোহন রায় বলেন যে দুইরূপ বিধি থাকিলেও কেবল ব্রহ্মচর্য্যই বিধবার অবলম্বনীয়। এই কথা লইয়া সে সময়ে ঘোবতর বিচার বিতর্ক হয়। মহাত্মা কিরূপ যুক্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন, দেখুন;—

কোন কোন শাস্ত্রে আছে বটে, "যে স্ত্রীলোক সহমরণ ও অনুমরণ করে, তাহার বহুকাল ব্যাপিয়া স্বর্গ ভোগ হয়" কিন্তু বিধবা ধর্ম্মে মনু প্রভৃতি যাহা করিয়াছেন, তাহাতে অনুধাবন কর। "আহারাদি বিষয়ে নিয়মযুক্ত হইয়া সাধ্বী স্ত্রী কেবল ধর্ম্ম আকাঙ্ক্ষা করিয়া ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান পুর্ব্বক থাকিবেন।" কিন্তু সহমরণ সকাম কার্য্য, ব্রহ্মচর্য্য নিষ্কাম ধর্ম্ম। "ভগবান মনু সর্ব্বাপেক্ষা বেদজ্ঞ হয়েন, তেঁহ ঐ দুই শ্রুতির অর্থকে বিশেষ জানিয়া সকাম শ্রুতির দুর্ব্বলতা স্বীকার পুর্ব্বক, নিষ্কাম শ্রুতির অনুসারে, পতি মরিলে, স্ত্রীকে ব্রহ্মচর্য্যে থাকিতে বিধি দিয়াছেন।" যেহেতুক "ঐহিক কিম্বা পারত্রিক ফল কামনা পুর্ব্বক কর্ম্মকে অনুষ্ঠান করিলে, সেই কর্ম্মকে কাম্য কহা যায়, সে কাম্য কর্ম্ম সর্ব্বথা নিষিদ্ধ।" আর

প্রতিবাদীরা যে লিখিয়াছেন, "কাম্য কর্ম্মের নিষেধ কোথাও নাই,—এ অশাস্ত্র; যেহেতুক কাম্য কর্ম্মের নিষেধক শ্রুতি ও স্মৃতি লিখিলে, স্বতন্ত্র্য বৃহৎ এক গ্রন্থ হয়।" রাজা মহাশয় যদিও বৃহৎ গ্রন্থ লেখেন নাই বটে, কিন্তু তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহার পর্য্যালোচনা করিলেই বুঝা যায়, যে নিষ্কাম আশ্রম ধর্ম্মের যাজনা করাই হিন্দু শাস্ত্রের উপদেশ; সকাম ধর্ম্মের নিষেধ শ্রুতি, স্মৃতিতে,—উপনিষৎ, গীতায়—সর্ব্বত্র সমান ভাবে আছে।

এখন মহাত্মার প্রদর্শিত যুক্তির অনুসরণ করিয়া হিন্দু বিধবার কোন্ পথ অবলম্বন করা উচিত তাহা একবার ভাবিয়া দেখুন,—বিধবা পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারেন, স্বামী সহমরণে, তনুত্যাগ করিতে পারেন, আর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া জীবন অতিপাত করিতে পারেন; মনে করুন শাস্ত্রে তিন পন্থাই দেখান হইয়াছে—তিনটি কি উচিত? তাহা কখনই হইতে পারে না। কোন্‌টি ত্যজ্য, আর কোন্‌টি অবলম্বনীয়, হিন্দু তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারেন।

স্বামীর পরলোক গতির পর যে রমণী বিবাহ করেন, তিনি আপনার জন্যই বিব্রত; তাও আবার কেবল নিকৃষ্ট বৃত্তির চরিতার্থ করিবার জন্য উৎসুক। সুতরাং তাহার কাম্য, কাম্য মধ্যে ঘোরতর কাম্য। নিকৃষ্ট সমাজে এরূপ প্রথা তখনও ছিল; এখনও আছে। নাগকন্যা উলূপী, রাক্ষস-জায়া মন্দোদরী, বানর পত্নী তারা পুনর্ভূ হয়েন; শ্রেণীবিশেষ মধ্যে এরূপ প্রথা ছিল বলিয়াই শাস্ত্রে এরূপ কাম্য কর্ম্মের উল্লেখ আছে, কিন্তু কাম্য কর্ম্মের নিষেধ, শাস্ত্রের প্রতি শাখায় প্রশাখায় দেখিতে পাওয়া যায়। সহমরণও কাম্য কর্ম্ম; তবে পারত্রিক সুখভোগের কথাটা স্বামীর ত্রিকোটি কুল উদ্ধারের কথাটা উহার সহিত জড়িত থাকায় এরূপ ঐহিক আত্মবিসর্জ্জন কাম্য কাম্য মধ্যে অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু তবু ত কাম্য বটে, সুতরাং হিন্দু বিধবার পক্ষে একমাত্র ব্রহ্মচর্য্যই অবলম্বনীয়।

পতি বিয়োগের পর স্বামীকে স্মরণ করিয়া ইন্দ্রিয় সংযম পূর্ব্বক যাঁহারা জীবনের অবশিষ্ট ভাগ যাপন করেন, সকল সভ্য দেশেই এরূপ সাধ্বী নারী পুনর্ভূ অপেক্ষা সমধিক সম্মানিত এবং আমরণ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া পরোপকারে জীবন যাপন করেন, এরূপ নরনারীর সম্প্রদায় প্রায় সকল সভ্য দেশেই আছে, আর সভ্য জাতি সেব্য সকল ধর্ম্মেই এরূপ ব্রহ্মচর্য্যের আদর আছে। খ্রীষ্ট ধর্ম্মের য়ুরোপে, মুসলমান ধর্ম্মের আরব, পারস্য, তুরস্কে; বৌদ্ধ ধর্ম্মের চীন, জাপানে আছে। কিন্তু হিন্দু মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য কেবল মাত্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের সেব্য নহে। প্রতি গৃহের লিঙ্গরূপে এবং ছাদরূপে ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত হইবার কথা! এই অধঃপতনের পূর্ব্বে এমন দিন ছিল, যখন সাধারণতঃ কৈশোরের ব্রহ্মচারী, যৌবনে গৃহী হইয়া আবার সন্ন্যাসীর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতেন। যে জাতি সমগ্র মনুষ্য-জীবন কেবল মাত্র একটি অনুদযাপনীয় অনন্ত ব্রত বলিয়া এখনও মনে করে, সে জাতির পক্ষে এরূপ হওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নহে।

হিন্দুর সতীত্ব ধর্ম্মের পরিষ্কার আদর্শ বলে, হিন্দুর সমাজ সংগঠনের আধ্যাত্মিক প্রণালী প্রযুক্ত হিন্দুর ব্রতবেদী গৃহের নিয়ম অনুসারে, হিন্দু বিধবা আমরণ ব্রহ্মচারিণী। পতিভক্তি, পতিপ্রীতি, পরকালে স্থিরতর বিশ্বাস, সামাজিক ব্যবস্থায় আন্তরিক শ্রদ্ধা, পারিবারিক নিষ্কাম ধর্ম্ম, এই সকল পবিত্র ভাব সংমিশ্রিত হইয়া হিন্দু সমাজ মধ্যে যিনি হিন্দু বিধবার উপর বলব্যবস্থিত ব্রহ্মচর্য্যে (enforced widowhood) অত্যাচারের কথা বলেন, তাঁহার সহৃদয়তার প্রশংসা করিলে চলে, কিন্তু তিনি হিন্দু নারীর চিত্তক্ষেত্রের স্বচ্ছ, নির্ম্মল, পবিত্র, নিষ্ঠাশক্তি যে সম্যক্ বুঝিতে পারিয়াছেন, তাহা বলিতে আমরা প্রস্তুত নহি।

আধ্যাত্মিক আর্য্যধর্ম্মের মহিমা বলে, সর্ব্বজন পূজ্য মন্বাদ মহর্ষিগণের ধর্ম্মসঙ্গত সুব্যবস্থার গুণে, বাল্মীকি প্রভৃতি কবিগুরুগণের প্রতিভাময়ী সৌন্দর্য্যসৃষ্টির আকর্ষণে, মহামহা মুনি ঋষি প্রণীত পৌরাণিক উপাখ্যান সকলে অপূর্ব্ব উপদেশে বহুকালের পুরুষানুক্রমিক শিক্ষায়, সমাজের জলন্ত দৃষ্টান্তে, হিন্দু নারীর পাতিব্রত—তাঁহার সহজ ধর্ম্ম, স্বভাব ধর্ম্ম, প্রাকৃতিক ধর্ম্ম হইয়াছে।

অথচ হিন্দু নারীর পাতিব্রত্য, জগতের একটি দুর্লভ পদার্থ। ছাদন দড়ি গোদা নড়ীর মত এই পাতিব্রত্যে "যখন যার, তখন তার" ভাব আসিতে পারে না। হিন্দুর আধ্যাত্মিকতার মূল মন্ত্র 'সোহহং'। হিন্দুনারীর সতীত্বের মূলমন্ত্র 'সোহহং'। হিন্দুর ধর্ম্মের মূলমন্ত্র একমেবাদ্বিতীয়ং হিন্দুনারীর সতীত্বের এই একমেবাদ্বিতীয়ং ভাব, যাঁহারা নষ্ট করিতে উদ্যত, আবার বলি, তাঁহাদের হৃদয়ের যে কোন ভাগের প্রশংসা করিতে হয়, কর, কিন্তু তাঁহারা যে হিন্দু সমাজের শক্তিতত্ত্বজ্ঞ—একথা মুখে আনিও না।

হিন্দুনারী জানেন, কেবল এক এবং অদ্বিতীয়, কাজেই তিনি পতিচারিণী হইলেই একচারিণী, সেই পতি যখন ব্রহ্ম লীন হইলেন, কাজেই তিনি ব্রহ্মচারিণী।

সেই মূর্ত্তি কি ক্ষেমঙ্করী, কেমন শান্তিময়ী, কেমন নিষ্কামে কার্য্যকরী কেমন কোমলে কঠোর, যেন ইহকালে পরকালে ছায়া, সে সৌন্দর্য্যে বিলাস নাই; সে কোমলতায় আবেশ নাই, সে ললিত ভৈরবে গিট্‌কিরি কর্তৃপং সে বেহাগে "ঢলিয়া পড়ি, ধর ধর" নাই। সে মূর্ত্তি আপনাতে নির্ভর করিতে জানে, করিতে পারে, বিনা মূল্যে সংসারের সেবা করে, তাঁহার কাছে ভোগের সহিত সেবার বিনিময় নাই; তাঁহার কর্ম্মই—প্রকৃত নিষ্কাম কর্ম্ম, তাঁহার ধর্ম্মই প্রকৃত—হিন্দুধর্ম্ম, তাঁহার জীবন—মহাব্রত, তিনিই যথার্থ ব্রতধারিণী, ব্রহ্মচারিণী, তিনি নারী হইয়াও দেবী।

হিন্দু সমাজে সধবার সন্তান-পালিনী গণেশ জননী মূর্ত্তি। সেই চোখে চোখে বজ্রহীন বিদ্যুতের ধীর, স্থির চালনা, সেই হৃদয়নিঃসৃত ক্ষীরের সহিত স্নেহ সঞ্চার, সে সকলই ভাল, সকলই সুন্দর; কিন্তু তবু তাহার অন্তরতম স্তরে একটুকু 'আপনি' আছে; জননী আপনাকে ভুলিয়াছেন বটে, কিন্তু কেবল আপনারই জন্য, আপনার সন্তানের জন্য। য়ুরোপের কবিরা এই মূর্ত্তি ধ্যান করিয়াছেন, য়ুরোপের ধর্ম্মশাস্ত্র এই দেবীমূর্ত্তি গ্রহণ

করিয়াছেন; পূজা করিয়াছেন: অঙ্কে শিশু যিশু শোভিতা মেরী মূর্ত্তিই গণেশ জননী। কিন্তু হিন্দু বিধবার সংসার-পালনী ধাত্রী মূর্ত্তি ব্রহ্মচারিণী মূর্ত্তি,—য়ুরোপের কবিরা বুঝেন নাই, য়ুরোপের শাস্ত্রজ্ঞেরা জানেন না। ননেরিতে ব্রহ্মচর্য্যের অনুকরণ করিতে গিয়া ভ্রংশ্রীকরণ করিয়াছে। সংসারস্থিতা ব্রহ্মচারিণীর সংসার নির্লিপ্তা মূর্ত্তি সংসার-সেবিকার সংসার কর্ত্রীর মূর্ত্তি দাসীর দেবী মূর্ত্তি—এ বৈচিত্র্য, এ রহস্য, য়ুরোপ বুঝে না, জানে না; য়ুরোপের সাহিত্যে নাই, কবিত্বে নাই, ধর্ম্মে নাই, সমাজে নাই। সেই রুক্ষ-কেশা, সামান্ত-বেশা, দেব-সেবান্তরতা ভোগ-রাগ-বিরতা—অতিথি-সৎকার-কারিণী, পরিবার-প্রতিপালনী সেই সেবার কর্ত্রী, সর্ব্বজনের ধাত্রী,—ব্রতধারিণী ব্রহ্মচারিণীই ত এই বঙ্গ সমাজ রক্ষা করিতেছেন। তুমি, আমি—আমরা ত সকলেই—একদিকে উদরের দায়ে ব্যস্ত, অন্যদিকে পৃষ্ঠের ঘায়ে ত্রস্ত। গৃহিণী সন্তানগণের সৃষ্টি স্থিতি দায়ে বিব্রত। কেবল হিন্দুর বিধবাই হিন্দুর ধর্ম্ম রক্ষা করিতেছে। হিন্দুয়ানি রক্ষা করিতেছে; নহিলে এতদিন, আমাদের নিত্যসেবা উঠিয়া যাইত, ঠাকুর ঘরে drawing room হইত, তুলসী মঞ্চে ক্রোটন বসিত, শালগ্রামে বিলিয়ার্ড হইত; গৃহে ব্রাহ্মণ ভোজনের পরিবর্ত্তে ক্লাবে ডিনর দিতাম প্রাত্যহিক আতিথ্যের বদলে poor fund-এ subscribe করিতাম, মুষ্টি ভিক্ষুককে যষ্টি দিতাম। তাহা যে আজি হয় নাই, চুণাগলি যে আজিও চুণাগলিই রহিয়াছে এখনও রুই কাতলার রাস্তা হয় নাই—সে কেবল ঐ বিধবার ব্রত পালনের ফলে। গৃহে গৃহে সেই নিষ্কাম ব্রত পালনের জলন্ত দৃষ্টান্ত এখনও আছে বলিয়া, এই ঘোরতর অন্ধকারের মধ্যে যেন আমরা একটু আলো দেখিতে পাইতেছি, আমরা এত মূর্খ হইয়াছি, তবু যেন একটা মহৎ তত্ত্বের আভাস বুঝিতে পাইতেছি। এই ঘোর অমাবস্যার কোটালের প্রবল বানের তুফান তরঙ্গে পড়িয়াছি বটে ভাসিয়াও যাইতেছি, তবু ঐ বেদ ব্রাহ্মণ অতিথি পরিবারের সেবিকার মূর্ত্তি দেখিলে মনে হয়, যে এ তুফান থাকবে না, এই তরঙ্গ কমিবে, এ বান ফুরাইবে এ জোয়ার থামিবে। আমরা আবার সেই অনন্ত বাহিনী সুর-তরঙ্গিনীর মন্দস্রোতে অনন্ত সাগরাভিমুখে ধীরে ধীরে পুর্ব্বমত যাইতে পারিব।

বিনয়ে প্রার্থনা করি, হিন্দু সমাজের এখনকার দিনের এই একমাত্র জীবন্ত শিক্ষয়িত্রীকে আপনারা ছলে, বলে, কৌশলে—আইনে আন্দোলনে—সহৃদয়তায়, সভ্যতায় তাঁহার পবিত্র বেদী হইতে অবতারিত না করেন। প্রকৃত শিক্ষকের অভাবে, আমাদের দিন দিন শিক্ষা বিভ্রাট হইতেছে। স্কুল কলেজের শিক্ষকেরা শিক্ষা দেন না, get up করেন; পরীক্ষার জন্য ছাত্র গঠন করেন; লড়াইয়ের জন্য মেড়া বানান। দীক্ষা গুরু মৃত মন্ত্র কানে দেন; সে মন্ত্রের প্রাণ নাই, তাহা প্রাণে লাগিবে কেন? পুরোহিত ঠাকুর শিক্ষা দেবেন কি, নৈবেদ্যের গুরুত্ব বুঝিয়া নিবেদকের গৌরব করেন; শিক্ষার ধার ধারেন না, ভিক্ষারই অবতার। তবে আর শিক্ষা দেবেন কে? এক শিক্ষা দিবে ইতিহাস? তাহা ত জানি না; এক শাস্ত্র? তাহা ত বুঝি না; এক ধর্ম্ম? তাহা ত

মানি না ; এক অন্যের কর্ম্ম ? তাহা ত দেখিতে পাই না। ব্রত শিক্ষা দিতে জীবনের মহাব্রত বুঝাইতে বাঙ্গালা দেশে মানুষকে মনুষ্যত্ব শিখাইতে বুঝাইতে দেখাইতে— এখনকার দিনে আছেন কেবল হিন্দুর বিধবা ; প্রার্থনা করি, তাঁহাকে তাঁহার এই গরীয়সী বেদী হইতে, মহীয়সী পরিচর্য্যা হইতে যেন পরিভ্রষ্ট না করেন।

হিন্দু সমাজের সহিত হিন্দু বিধবার শিক্ষায়, দীক্ষায়, সুখে, দুঃখে, শিরায় শিরায় জড়িত। যেমন, আতিথ্য, দেবসেবা,—ক্রিয়াকর্ম্ম,—শ্রাদ্ধ তর্পণ—প্রভৃতি লইয়া হিন্দু সমাজ বলিয়া ইহার কিছুই ত্যাগ করা যায় না ; তেমনই বিধবার ব্রহ্মচর্য্যও এ সমাজের নিতান্ত অঙ্গীভূত, কাজেই অবলম্বনীয়। উচ্চতর হিন্দু সমাজে বিধবার বিবাহ গরম গরম বরফের কুলপীর মত অতি উপাদেয় হইলেও, তাহা হয় না। গরম করিতে গেলে বরফ থাকে না, বরফ রাখিতে গেলে গরম করা হয় না। উচ্চতর শ্রেণী মধ্যে বিধবার বিবাহ দিলে, হিন্দুয়ানি থাকে না, হিন্দুয়ানি রাখিতে গেলে বিধবার বিবাহই হয় না। বরফ গরম করিলে, গরম জল হয়, গরম জল অনেক কাজে লাগে, কিন্তু তাতে ত প্রাণ ঠাণ্ডা হয় না। হিন্দু নারীর পাতিব্রত্য বড় ঠাণ্ডা জিনিস—প্রাণ শীতলকারী পদার্থ, যেখানে তাহা আবশ্যক, সেখানে বিধবা বিবাহের উষ্ণতা আনিলে চলিবে কেন ? অবশ্য বলিতে পারেন, যে গরম জলও ত চাই ? যেখানে চাই, সেখানে আছে, থাকিবেও। নিকৃষ্ট শ্রেণীর মধ্যে আছেও, বটে, থাকিবেও বটে।

সুতরাং উচ্চতর সমাজে বিধবা বিবাহের প্রচলনের চেষ্টা করা, একরূপ অসম্ভবের সম্ভবনা করা। হিন্দুর আনুপুর্ব্বিক ইতিহাস দেখিলেই তাহা বুঝা যায়। ত্রিশ বৎসরের আইন দুর্দ্দশা দেখাইয়া, এ কথার ঐতিহাসিক প্রমাণ হইয়াছে বলিলেও চলে ; ত্রিশ বৎসর কেন বলি, সমস্ত কলিযুগ, বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতেছে। পরাশর ত কলি-কালের ধর্ম্মশাস্ত্র প্রযোজক, কেবল কলির জন্যই ত বিধবা বিবাহের নিয়ম আছে, তবে কলিতেই আবার বিধবা বিবাহ দেখি না কেন ? তবে কি মুসলমানেরা বন্ধ করিয়াছিলেন ? না তাহা ত কেহই বলেন না। তবেই বলিতে হইতেছে, যে বিধবার বিবাহের আইন সমস্ত কলিকালেই আছে, তবে যেখানে খাটে, সেইখানেই খাটিতেছে।

বিধবা বিবাহের পুর্ব্ব পক্ষ, উত্তর পক্ষ তর্কবাদ করা, আমার সঙ্কল্প নহে। ধর্ম্মাধর্ম্মের দোহাই দিয়া যে সকল কথা উঠে, প্রসঙ্গ ক্রমে আমি বোধ হয়, তাহার অনেক কথা বলিয়াছি ; তবে সংক্ষেপে সেইগুলি এই সময় একবার ধারাবাহিক রূপে বলিলে ক্ষতি নাই।

ব্রহ্মচর্য্যে কঠোরতার কথা, ব্রহ্মাচারে ব্যভিচারের কথা, বংশ বৃদ্ধিতে ব্যাঘাতের কথা, অবিবাহিত পুরুষ সকলের বিবাহে সুবিধা হইবার কথা, এই সকল কথা নানা কারণে আমি এই স্থানে তুলিব না ; যাঁহারা ইহার জন্য আমাকে অপরাধী করিতে চান, তাঁহাদের কাছে আমি অপরাধ স্বীকার করিতেছি।

কিন্তু ঐগুলি ছাড়া আরও কতগুলি কথা আছে ;—একটি তর্ক আছে ; তাহার মূল বিলাতী সাম্যবাদ। বিপত্নীক পুরুষ যদি আবার বিবাহ করিতে পান, তবে বিধবা কেন না পারিবেন ? কিন্তু আধুনিক সাম্যবাদীই, ইহার উত্তর দিতে পারেন ;

To have a young widowed one in my house, I would have certainly tried my utmost to get her remarried; but in that case, I would have thought of her and her only, and never cast a glance about the effect of her marriage on the community at large. In other words, I would have claimed my individual liberty, the liberty of choice of my daughter, and not the claims of morality.

লেখক স্পষ্টই বলিতেছেন যে, যখন বিধবার বিবাহ দিতে ইচ্ছুক হই তখন কেবল আত্ম-চারিতাবৃত্তি চরিতার্থ করিতে অবসর দান করি, সমাজের দিকে তাকাই না, ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখি না। হিন্দু বলেন, ধর্ম্মের দিকে, সমাজের দিকে না তাকাইয়া, আত্ম ইচ্ছার চরিতার্থ করা—কেবল অধর্ম্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে।

এক্ষণে যে সব মহিলা সাবিত্রী লাইব্রেরির অধ্যক্ষগণের প্রস্তাব অনুসারে এই বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে দুই জনেব দুইটি কথা আপনাদের আলোচনার যোগ্য বলিয়া উদ্ধৃত করিব।

টাকী শ্রীপুরের শ্রীমতী পটেশ্বরী অধিকারী, অষ্টম বর্ষে বিধবা হন। তিনি বলেন—"বাল্য বিবাহই বৈধব্যের মূল কারণ।" আমরা বলি, একথা ঠিক, পুরুষের বাল্য বিবাহ শাস্ত্র-বিরুদ্ধ, নীতি-বিরুদ্ধ কার্য্য। আসুন না; সকলে মিলিয়া আমরা বালক বিবাহের কার্য্যতে প্রতিবাদ করি, করিলে, বাল বৈধব্যের প্রতিরোধ করা হইবে ; যাহার বিবাহ হয় নাই, সে বিধবা হইয়াছে, এ বিড়ম্বনা আর দেখিতে হইবে না। "যে তবে বিপত্নীকের পুনর্দ্দার রহিত হোক।" হিন্দু কিন্তু সেভাবে উত্তর দেন না। হিন্দু সাম্যবাদ মানেন না ; হিন্দু মানেন অনুপাত-বাদ। ক খ যখন সমান নহে, তখন তাহারা সমান পাইবে না ; ক যেমন, তেমনই ক পাইবে, খ যেমন, তেমনই খ পাইবে। ক খ মধ্যে যেরূপ সম্বন্ধ ; ক-র ও খ-র স্বত্বাধিকার মধ্যেও সেইরূপ অনুপাত হইবে। হিন্দু এই অনুপাত-বাদী। হিন্দু স্ত্রী পুরুষের সাম্য স্বীকার করেন না ; কাজেই হিন্দু স্ত্রী পুরুষ মধ্যে সাম্য ব্যবস্থা করেন না। সাম্যবাদ হিন্দুর নহে। যাঁহারা সাম্যবাদী তাঁহারা আপনারাই বলিবেন, যে সাম্য হইতে বিধবার বিবাহ আসে না, বিপত্নীকের পুনর্বিবাহ বারণ হয়।

আর এক কথা বিধবার ব্রহ্মচর্য্য অনমুপালনীয়, unpractical, সুতরাং উহা ধর্ম্মই নহে। আমরা বিস্তারিত আলোচনায় দেখাইয়াছি, যে যাহা সম্পূর্ণরূপে পালন করা যায় না, অথচ পালন করিতে হয়, যত পালন করা যায় ততই সহজ হয়, তাহাই ধর্ম্ম। বিধবার ব্রহ্মচর্য্য সেইজন্য মহাধর্ম্ম।

শেষ কথা individual liberty বা স্বাতন্ত্র্যবর্ত্তিতা। হিন্দু বলেন, সামাজিকতাই ধর্ম্ম, মনুষ্যত্বই ধর্ম্ম; আত্মচারিতা ধর্ম্ম নহে। ঘোরতর অধর্ম্ম। বিধবা বিবাহের পোষকতায়, যিনি সম্প্রতি বঙ্গ সমাজে এই তর্কের উত্থাপন করিয়াছেন, তিনি স্বয়ং তাহা স্বীকার করিয়াছেন; স্পষ্ট বলিয়াছেন, যে আত্মচারিতা ধর্ম্ম নহে। আমরা কোন নাম নির্দ্দেশ না করিয়া পণ্ডিতবরের যুক্তির সেই ভাগ ইংরাজিতে উদ্ধৃত করিলাম।

"I advocate it (widow marriage) on the broad ground of individual liberty of choice."

... ...

যদি কিশোর বালকের সহিত অপোগণ্ড বালিকার বিবাহে হিন্দুসমাজ প্রশ্রয় দেন, তবে জানি না, কি বলিয়া সে সমাজ মজঃফরপুরের বহরমপুরের শ্রীমতী শিবদাস দেবীর যুক্তি খণ্ডন করিবেন, তাঁহার প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিবেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

"প্রথম ও দ্বিতীয় এই দুই বিবাহ না হইলে বিবাহ সম্পূর্ণ হইল না। প্রথম বিবাহে আমাদের শাস্ত্রমতে পিতা কন্যাকে দান করিলেন, কিন্তু পিতার তো কাহাকেও কন্যার শরীর ভোগের অধিকার দিবার ক্ষমতা নাই। সে অধিকার আপনার ভিন্ন আর কাহারই নহে। ঘটনাবিশেষের পর স্ত্রীর সেই আত্মসমর্পণকে সেইজন্যই দ্বিতীয় বিবাহ বলে।

এই জন্য দ্বিতীয় বিবাহ না হইলে বিবাহ পূর্ণ নহে। দ্বিতীয় বিবাহের পূর্ব্বে যদি স্বামীর মৃত্যু হয়, স্ত্রী মুক্ত হইলেন, তখন পিতা যাঁহাকে দান করিয়াছিলেন, তিনি আর নাই। তখন অবশ্যই তাঁহার অন্যকে আত্মসমর্পণ করিবার অধিকার হইল। যখন তাঁহার পূর্ণ বিবাহই হয় নাই, তখন কেন না সে বিবাহ করিতে পারিবে?"

এই প্রশ্নের কি সঙ্গত উত্তর আছে আমরা জানি না; শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কোন উত্তর পাই নাই। ফল কথা, যদি এস্থলেও নাম-মাত্র বিধবার বিবাহ দিতে হিন্দু সমাজের আপত্তি থাকে, তবে বালক বিবাহের কার্য্য ত প্রতিবাদ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য।

বিধবা বিবাহ প্রথা হিন্দু সমাজে প্রচলিত। এক্ষণে ঢাকার শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরী দেবীর লিখিত প্রবন্ধের উপসংহার ভাগ, আমার শেষ কথা রূপে উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা করি। যে দেশের শিক্ষিতা রমণী এরূপ উচ্চতর ভাবে উদ্দীপিত, যে দেশে মহৎকর সমাজ বিপ্লবের আশঙ্কা আমাদের না করিলেও চলে।

"বিধবা বিবাহ প্রথা হিন্দু সমাজে প্রচলিত হইলে, ইষ্টাপেক্ষা অনিষ্টের পরিমাণ অধিক হইবে সন্দেহ নাই। যাহাতে হিন্দু বিধবাগণের সতীত্ব ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি হইতে পারে এবং তাঁহারা ধর্ম্মচারিণী হইয়া চিরকাল পরোপকার সাধন করিতে পারেন, তজ্জন্য প্রত্যেক নর নারীর যত্নবান হওয়া উচিত; যিনি একটি বিধবার জীবনও সৎপথে রাখিতে পারিবেন, তিনি হিন্দু সমাজের শত শত ধন্যবাদের পাত্র।

হিন্দু বিধবা রমণীগণ! আপনাদিগের নিকট আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, আপনারা বাল্য, যৌবন, কি বৃদ্ধ, যে কালেই বিধবা হউন না কেন, পরম যতনে ধর্ম্ম সাধন রূপ মহৎব্রতে জীবনটি ব্রতি করুন; যথা শাস্ত্র যে ব্যক্তির সহিত আপনাদের বিবাহ হইয়াছিল, তিনি পাপী থাকুন, আপনাদের প্রতি করুণাশূন্য থাকুন, যাহাই হউন না কেন, তাঁহার প্রতি অনুরাগিণী হইয়া সেই মৃত স্বামীর ধ্যানে জীবন যাপন করুন; মৃত পতিকে বিস্মৃত হইয়া কি অন্য পুরুষে প্রণয় স্থাপন করিয়া অধিক সুখী হইতে পারিবেন? কখনই না।

আপনাদের ভাল বসন ভূষণ, উত্তম আহারাদি ও সন্তান সন্ততি হইবে বটে, কিন্তু তাহাই কি মনুষ্য জীবনের সার সুখ?

পত্নী বিয়োগে পুরুষগণ যেরূপ আবার বিবাহ করিয়া অনেক বিষয়ে কিয়ৎপরিমাণে সুবিধা পান, সেরূপ আপনারাও পাইতে পারেন বটে, কিন্তু তাহাতে আপনাদের কি মহত্ত্ব হইল? বিবাহ না করিয়াও যখন ধর্ম্ম কার্য্যাদি আপনাদিগের আয়ত্তি রহিল, তখন পুরুষদের দাসীত্ব গ্রহণে কি ফল বুঝিতে মৃত পতির ধ্যানে জীবন যাপন করিলে, ধর্ম্ম বিষয়েও অনেক অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে।

আহা! যাহার সহিত একত্র চিরকাল ধর্ম্ম সাধন ও সাংসারিক সুখ ভোগাদি করিবেন বলিয়া, আপনাবা বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, দুর্ভাগ্য বশত যখন অকালে আপনাদের সেই জীবনসর্ব্বস্ব পতি সকল সাংসারিক সুখ ভোগাদি পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, তখন আপনারা কোন্ প্রাণে পুনঃ স্বামী গ্রহণ করিয়া অসার সংসার সুখে মত্ত হইবেন? কোন্ প্রাণেই বা সেই মৃত স্বামীর প্রেম মুখ বিস্মৃত হইয়া অন্য পতির প্রতি অনুরাগিণী হইবেন?

সেই মৃত স্বামীর মূর্ত্তি হৃদয় পটে অঙ্কিত কবিয়া ধর্ম্ম সাধনায় ব্রত হউন, ইহকাল ও পরকালে আপনাদিগের পরম মঙ্গল সাধিত হইবে।

মৃত পতির পাদপদ্ম—ধ্যান-মগ্না ব্রহ্মচারিণী বিধবার মূর্ত্তি কি রমণীয়! তিনি কি শ্রদ্ধার পাত্রী! তাঁহাকে দর্শন করিলেও জীবন পবিত্র হয়; ধর্ম্মারাধনাই মানব জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব, পশুপক্ষী আদিও ত অন্যান্য ইন্দ্রিয় সুখেব অধিকারী, মানব জীবন ধর্ম্মারাধনাতেই সম্পূর্ণরূপে সফল হয়। আপনারা অন্যান্য সমস্ত সুখ তুচ্ছজ্ঞান করিয়া ধর্ম্মারাধনায় রত হউন। আপনারা লোকের কথায় উতলা না হইয়া, আপনাদের জীবনের যথার্থ সুখের পথ খুলিয়া লইয়া নিজেরাও সুখী হউন, সমস্ত হিন্দু সমাজকেও পবিত্র করুন; আবার ভারত রমণীর সতীত্বের মহিমাতে পৃথিবী মোহিত হউক, এই আমাদের একমাত্র কামনা।"

নিরস্ত্রকরণ (Arms Act) : পৃষ্ঠা ৩৭৫

"The Vernacular Press Act was not the only retrograde and unpopular measure of Lord Lytton's Government. Next year, 1878, the Arms Act was passed aiming at the wholesale emasculation of the Indian subjects of the British Queen. Like the Vernacular Press Act, the Arms Act was also a discriminating measure. Not only the British subjects in India but the subjects of every foreign State temporarily or permanently residing in India were exempted from the operation of this Act. The Hottentot and the Zulu could carry arms while walking along the streets of Calcutta or Bombay but the native Indian subject of the British Government could not do so. Even more than the Vernacular Press Act, this Arms Act wounded our national self-respect. And the feeling of resentment against it was, though not so vocal, much wider than that aroused by the Vernacular Press Act. By these measures Lord Lytton, instead of reconciling the new political consciousness in the country to British rule, which was certainty not difficult at that early stage, helped to create and strengthen a new anti-British feeling among our people."

—B. C. Pal : *Memories etc.*, p. 294

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর স্মৃতিকথা—*A Nation in Making* গ্রন্থে লিখেছেন :

"Lord Salisbury's regime as Secretary of State for India was distinctly reactionary. He was responsible for sending out to India as Viceroy, Lord Lytton, of whom the Marquis of Hartington (afterwards Duke of Devonshire) said from his place in Parliament, that he was the very reverse of what an Indian Viceroy should be. His son, however, the present Lord Lytton, Governor of Bengal, is a ruler, an advanced Democrat, with genuine sympathy for Indian aspirations. Many years later, in the nineties of the last century, Lord Salisbury, when Prime Minister, sent out Lord Curzon, and the

story of his viceroyalty is one that all the ingenuity of Mr. Lovat Fraser of *The Times* has failed to whitewash.

"But I am, perhaps, anticipating coming events. I have already referred to the reduction of the limit of age for the Indian Civil Service and the agitation to which it gave rise. Lord Salisbury's Viceroy, Lord Lytton, gagged the Vernacular Press, and disarmed the population of British India. These two measures, the Arms Act and the Vernacular Press Act provoked widespread agitation, in which I took my humble share

"In the dark days of the Indian Mutiny, when the British Empire in India was really exposed to serious danger, Lord Canning and his advisers did not think it necessary to disarm the Indian population. The Afghan War in Lord Lytton's time (which, by the way, was a grievous blunder, the whole policy that dictated it having been undone) caused no serious excitement in India, none at any rate among the Hindu population, and little, or hardly any, among the Mohamedans, except perhaps on the frontiers. The Arms Act was unnecessary in the sense that it was not required as a measure of protection against internal revolt ; it was mischievous because it made an irritating and invidious distinction between Europeans and Indians, a distinction that has recently been done away with. It inaugurated a policy of mistrust and suspicion, utterly undeserved and strongly resented by our people, and it imposed upon us a badge of racial inferiority. We protested against it at the time. We appealed to Mr. Gladstone, and he supported our protest and condemned it and the Vernacular Press Act in his speeches in the ... campaign ; but, unhappily, when he became Prime Minister he did us only partial justice—he repealed the Vernacular Press Act, but the Arms Act he left untouched".

—**Surendranath Banerjee : *A Nation in Making*, London 1925, pp. 57-58**

রিপন ও মিউনিসিপাল অ্যাক্ট : পৃষ্ঠা ৪১০-১৬

"Lord Ripon justly urges on behalf of his own scheme of local self-government, that it will be an instrument of political education. Paragraph 5 of a resolution published by the Government of India in May 1882 observes: 'At the outset the Governor-General in Council must explain that in advocating an extension of local self-government, and the adoption of this principle in the management of many local affairs, he does not suppose that the work will be, in the first instance, better done than if it remained in the sole hands of the Government district officers. It is not primarily with a view to improvement in administration that this measure is put forward and supported, it is chiefly desirable as an instrument of popular political education. His excellency in Council has himself no doubt that, as local knowledge and interest are brought to bear more fully upon local administration, improved efficiency will in fact follow. But at starting there will doubtless be many failures calculated to discourage exaggerated hopes, and even in some cases to cast apparent discredit upon the principle of self-government itself.'

"These remarks have been sheered at as sentimental and ill judged rhetoric; they seem to me to be the utterance of sound statesmanship."

— Henry Cotton : *New India* . pp. 75-6.

রিপন ও ইলবার্ট বিল : পৃষ্ঠা ৪১৫-৪৩

"At the end of Lord Ripon's viceroyalty, India was convulsed by an extraordinary outburst of racial feeling, engendered by the Criminal Jurisdiction Bill, which was brought forward by Sir Courtenay Ilbert, the Law Member of the Viceroy's Council, in 1883. By the existing law, no Indian judge could try a European on a criminal charge except in the presidency towns. As a certain number of Indians were now about to reach the higher ranks of the Civil

Service, it was necessary to confer upon them the same rights and privileges as those enjoyed by their European colleagues. This immediately provoked a loud outcry among the indigo planters, who had already earned themselves a bad reputation by their treatment of the peasantry of Bengal, which had led to serious disturbances 23 years previously ; much feeling had been roused at the time by the execution of a planter's assistant of the name of Rudd who had murdered an Indian, and a missionary who had translated a play entitled *Nil Darpan*, or the Indigo-planting Mirror, which showed up the oppressions practised by the planters and their agents, was fined and imprisoned.

"These people, together with the mercantile community of Calcutta, started the same kind of agitation against Lord Ripon that they had directed previously against Lord Canning, and the controversy, which was conducted with the utmost bitterness, spread to England and was taken up by the press and in parliament. A European Defence Association was started, and one hundred and fifty thousand rupees were subscribed towards it. Eventually the bill was amended so as to give Europeans the right of claiming trial by jury in criminal cases. The agitation, with all the racial antipathies, which it aroused, was singularly ill-judged, and provoked the keenest resentment among educated Indians, who rightly regarded it as a slur on their integrity. On the other hand, it made the Viceroy a popular hero in Indian eyes, and extraordinary demonstration of affection took place at the time of his retirement in December 1884.

"After he had ceased to be able to promote or punish any man, all northern and western India, including the pick of the fighting races, prostrated itself at his feet. His journey from Simla to Bombay was a triumphal march such as India had never witnessed—along procession in which seventy millions of Indians sang hosanna to their friend. Lord Ripon had done nothing, had taken off no tax, had removed no burden, had not altered the mode of government

one hair's breadth. He was only supposed to be for Indians and against Europeans, amd that sufficed to bring every Indian in a fervour of friendship to his side."

—H. G. Rawbinson : *The British Achievement in India*, London *P1984, P152-53*

'ইলবার্ট বিল' আন্দোলন সম্বন্ধে সুরেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে যা লিখেছেন তা এখানে উদ্ধৃত হল :

"The Ilbert Bill controversy helped to intensify the growing feeling of unity among the Indian people. The Anglo-Indian community had formed their Defence Association with its branches in different parts of the country. They had raised over a lakh and fifty thousand rupees to protect what they conceived to be their interests, and to assert their special privileges. Their organization and their resources had secured success to their cause. The educated community all over India watched the struggle with interest. There was the Ilbert Bill agitation with all its developments taking place before their eyes. They could not remain insensible to the lesson that it taught, of combination and organization; a lesson ··· which in this case was enforced amid conditions that left a rankling sense of humiliation in the mind of educated India. It was, however, fruitful of results. It strengthened the forces that were speeding up the birth of the Congress movement; and, as I have observed, before the year was out the first National Conference was held in Calcutta. In its organization I had no inconsiderable share *quorum magna parsfui.* It was the reply of educated India to the Ilbert Bill agitation, a resonant blast on their golden trumpet. The Conference met for three days, from December 28 to 30.

"The questions that even now substantially form the chief planks in the Congress Platform were taken up for discussion. They were Representative Councils, or Self-government, Education, general and technical, the separation of Judicial from Executive functions in the administration of Criminal Justice and, lastly, the wider

employment of our countrymen in the public service. Mr. Wilfrid Blunt, the great friend of Oriental nations, was then touring through India. He was present at the sittings of the Conference and he gives the following account of his impressions in his *India under Ripon* :

'Then at twelve, I went to the first meeting of the National Conference, a really important occasion, as there were delegates from most of the great towns and, as Bose in his opening speech remarked, it was the first stage towards a National Parliament. The discussion began with a scheme for sending boys to France for industrial education, but the real feature of the meeting was an attack on the Covenanted Civil Service by Surendranath Banerjea. His speech was quite as good a one as ever I heard in my life, and entirely fell in with my own views on the matter. The other speakers were less brilliant, though they showed fair ability, and one old fellow made a very amusing oration which was much applauded. I was asked to speak, but declined as I don't wish to make any public expression of opinion till my journey is over. But at Bombay I shall speak my mind. I was the only European there, and am very glad to have been present at so important an event. The proceedings would have been more shipshape if a little more arrangement had been made beforehand as to the speakers. But on the whole, it went off very creditably. Both Banerjea and Bose are speakers of a high order. The meeting took place upstairs in the Albert Hall, and about one hundred persons were present. Before the speaking commenced, a national hymn was sung by a man with a strong voice, who played also on an instrument of the guitar type.' "

—Surendranath Banerjea : *A Nation in Making*, London *1925, pp. 85-7*

"বেঙ্গলী" সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ড : পৃষ্ঠা ৪২৫

সুরেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে এই মামলা সম্বন্ধে যা লিখেছেন তা এখানে উদ্ধৃত হল :

"The facts of the of the Contempt Case are these. On April 2, 1883, the following leaderette appeared in the *Bengalee* ;

"The Judges of the High Court have hitherto commanded the universal respect of the community. Of course, they have often erred, and have often grievously failed in the performance of their duties. But their errors have hardly ever been due to impulsiveness, or to the neglect of the commonest considerations of prudence or decency. We have now, however, amongst us a judge, who if he does not actually recall to mind the days of Jeffreys and Seroggs, has certainly done enough, within the short time that he has filled the High Court Bench, to show how unworthy he is of his high office, and how by nature he is unfitted to maintain those traditions of dignity which are inseparable from office of the judge of the highest Court in the land. From time to time we have in the columns adverted to the proceedings of Mr. Justice Norris. But the climax has now been reached, and, we venture to call attention to the facts as they have been reported in the columns of a contemporary. The *Brahmo Public Opinion* is our authority, and the facts stated are as follows : Mr, Justice Norris is determined to set the Hooghly on fire. The last act of *zubberdusti* on his Lordship's part was the bringing of a *salıgram*, a stone idol, into court for identification. There have been very many cases both in the late Supreme Court and the present High Court of Calcutta regarding the custody of Hindu idols, but the presiding deity of a Hindu household had never before this had the honour of being dr.gged into Court. Our Calcutta Daniel looked at the idol and said it could not be a hundred years old. So Mr. Justice Norris is not only versed in Law and Medicine, but is also a connoisseur of Hindu idols. It is difficult to say what he is not. Whether the orthodox Hindus of Calcutta will tamely submit to their family idols being dragged into Court is a matter for them to decide, but it does seem to us that some public steps should be taken to put a quietus to the wild eccentricities of this young and raw Dispenser of Justice.

"What are we to think of a judge who is so ignorant of the

feelings of the people and so disrespectful of their most cherished convictions, as to drag into Court and then to inspect, an object of worship which only Brahmins are allowed to approach, after purifying themselves according to the forms of their religion? Will the Government of India take no notice of such a proceeding? The religious feelings of people have always been an object of tender care with the the Supreme Government.

"Here, however, we have a judge who in the name of Justice, sets these feelings at defiance and commits what amounts to an act of sacrilege in the estimation of pious Hindus. We venture to call the attention of the Government to the facts here stated, and we have no doubt due notice will be taken of the conduct of the Judge.'

"The leaderette was based on information that appeared in the now defunct newspaper, the *Brahmo Public Opinion*. The *Brahmo Public Opinion* was edited by the late Babu Bhuban Mohan Das (Mr. C. R. Das's father), a well-known solicitor of the High Court. As no contradiction appeared, I accepted the version as absolutely correct, especially in view of the fact that Babu Bhuban Mohan Das, being a solicitor and an officer of the Court, might naturally be presumed to be well informed on all matters in connexion with the High Court. I reproduced the substance of what appeared in the *Brahmo Public Opinion* and commented upon it.

"Soon after I received a writ from the High Court to show cause why I should not be committed for Contempt of Court. The writ was served on me on May 2 and May 5 was fixed as the day for the hearing. The time was short, and my difficulty was that I could not get any barrister to take up the brief on my behalf. Mr. Monomohan Ghose was ill and confined to bed. Mr. W. C. Bonnerjea at last undertook to defend me, but on the distinct understanding that I should apologize and withdraw the reflections I had made on Mr. Justice Norris. As the comparison which I had suggested in the

incriminating paragraph between him and Scroggs and Jeffreys was unfair and indefensible, written in a moment of heat and indignation, I readily consented.

"On May 2, the case came on before a Full Bench consisting of five judges, among whom was Sir Romesh Chunder Mitter, and was presided over by the Chief Justice, the late Sir Richard Garth. I had moved from Calcutta to Barrackpore in 1880 and was living there at the time. I came down to attend the High Court that morning from my residence at Barrackpore. I told my wife when taking leave of her that I was likely to be sent to prison, and I came prepared for it with my bedding and the books that I wanted to read during my enforced leisure,

"I was in Court by about half past ten. The Court premises and the environments were swarming with a surging crowd; and a large body of police, European and Indian, were in attendance. The student community had mustered strong force, and among them I noticed some who rose to high distinction as servants of the Crown."

—Surendranath Banerjee: *A Nation in Making*, London 1925, pp. 74-6, 78-9

মেরী কার্পেন্টার : পৃষ্ঠা ৫০৯-১৬

সমাজসেবিকা কুমারী মেরী কার্পেন্টার তিনবার আমাদের দেশে আসেন—১৮৬৬, ১৮৬৯ ও ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে। বাংলাদেশে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতিকল্পে তিনি বিদ্যাসাগর প্রমুখ সমাজ-সংস্কারকদের সহযোগিতায় অনেক ভাল কাজ করার চেষ্টা করেছেন, স্ত্রী-নর্মাল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ও পরিকল্পনা তার মধ্যে অন্যতম। কুমারী কার্পেন্টারের মৃত্যুর পর রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত "দাসী" পত্রিকায় যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়, এখানে তা উদ্ধৃত হল :

মেরী কার্পেন্টার

দাসী : সেপ্টেম্বর ১৮৯৩

"পর দুঃখে সহানুভূতি, স্নেহ, দয়া, মমতা প্রভৃতি কতকগুলি সদ্‌গুণ রমণীজাতির হৃদয় স্বভাবতঃ আলোকিত করিয়া রাখে। যদি রমণী-হৃদয়ে এই সকল সদ্‌গুণ না থাকিত,

যদি রমণী-হৃদয় পুরুষ-হৃদয়ের ন্যায় কঠিন হইত, তাহা হইলে জগৎ প্রকৃত পক্ষে মরুবৎ অপ্রীতিকর হইত। আর রমণী হৃদয়ে এই সকল সদ্‌গুণ আছে বলিয়াই সভ্যজগতে এত রমণীকে আমরা বিশ্ব-সেবাব্রতে ব্রতী হইতে দেখিতে পাই। বিশ্বসেবাব্রতে জীবন উৎসর্গকারিণী রমণী-মণ্ডলীর মধ্যে কার্পেণ্টার একজন অগ্রগণ্যা।

"১৮০৭ খৃষ্টাব্দের ৩রা এপ্রেল তারিখে ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী এক্‌সকিটার নামক স্থানে মেরী কার্পেণ্টারের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ল্যাণ্ট কার্পেণ্টার একজন উদারহৃদয় পরোপকারী ধর্ম্মযাজক ছিলেন। পিতার এই সকল সদগুণ কন্যায় বর্ত্তাইয়াছিল। পিতার সদুপদেশে কন্যার হৃদয় জ্ঞান ও কর্ম্মের জ্যোতিতে আলোকিত ছিল। তিনি যখন ব্রিষ্টল নগরে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি সেখানে দরিদ্র বালক বালিকাদিগকে ধর্ম্মনীতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষা দিবাব জন্য একটী রবিবাসরীয় বিদ্যালয় (Sunday School) সংস্থাপন করেন। এই সময়ে মেরী পিতার সাহায্যে ল্যাটিন্ গ্রীক প্রভৃতি ভাষা এবং বিজ্ঞান ও গণিত শিক্ষা করেন। পিতা সর্ব্বদা জনহিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। কন্যা এই বিষয়ে তাঁহাকে সাহায্য করিতে স্থিরসংকল্প হইলেন; এবং এই অল্প বয়সেই অসীম উৎসাহের সহিত তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

"যে পরোপকারবৃত্তি মেরীর হৃদয়ে প্রধূমিত হইয়া পরিশেষে আগ্নেয় গিরির অদম্য উদ্গমের ন্যায় বিশ্ববাসীদিগের হৃদয় প্লাবিত করিয়াছিল, এই ব্রিষ্টল নগরে তাহাব সূত্রপাত হয়। রবিবাসরীয়-বিদ্যালয়ে পিতার সাহায্য করিয়া মেরী শিক্ষয়িত্রীর কার্য্যে নিপুণা হইয়াছিলেন এবং পরিশেষে একটী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বালিকাদিগকে শিক্ষা দান করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে পিতার রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ের ভারও তিনি স্বয়ং গ্রহণ করেন, কিন্তু মেরী কার্পেণ্টাবের ন্যায় রমণী ছাত্রীদিগের পাঠের ব্যবস্থা করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না। তিনি তাহাদিগের গার্হস্থ্য জীবনের নৈতিক উন্নতির প্রতি বিশেষ যত্নবতী হইয়া তাহাদিগের গৃহে গমনাগমন করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সকল দরিদ্র বালক বালিকাদিগের গৃহে পাপের লীলাভূমি দেখিয়া মেরী অনুভব করিলেন যে ইহাই তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র; ইংলণ্ডের দরিদ্রদিগের অবস্থা বড় ভয়ানক। তাহারা পাপপঙ্কে একেবারে নিমগ্ন হইয়া থাকে এবং যাহা কিছু উপার্জ্জন করে তাহা প্রায় সমস্তই সুরার সেবায় ব্যয় করে। অনেক সময় অনাহারে ক্লিষ্ট হইয়া তাহারা প্রাণাপেক্ষা প্রিয় সন্তানদিগকে নির্দ্দয়ভাবে রাজপথে পরিত্যাগ করিয়া যায়। তাহাদিগের এই শোচনীয় অবস্থা অবলোকন করিয়া মেরীর হৃদয় কান্দিয়া উঠিল; তিনি তাহাদিগের অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন।

"১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে মৃত মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এবং আমেরিকার বিখ্যাত অধিবাসী ডাক্তার জোসেফ টুকারম্যান মেরীর পিতার গৃহে অতিথি হয়েন। ইঁহাদের সহিত পরলোক এবং ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় আলাপ করিয়া মেরী যথেষ্ট শিক্ষালাভ করেন।

ভারত-গৌরব-রবি রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর সময় মেরী কন্যার ন্যায় তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন এবং রাজার মৃত্যুর পর তাঁহার হৃদয় এক নবীনভাবে পুর্ণ হইয়া উঠে। তিনি ভাবিলেন,—জগতে মানব-জীবন নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী। তবে যে কয়েকদিন বাঁচিয়া রহিব, বিধাতার প্রিয় কার্য্য সাধন করিব।

"মেরীর জীবন যখন এই নূতনভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিল, তখন যেন বিধাতার উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্যই আমেরিকা হইতে ডাক্তার গ্যানেট ব্রিষ্টলে আগমন করিলেন। ডাক্তার গ্যানেটের নিকট আমেরিকার দরিদ্রদিগের উন্নতির বিষয় শুনিয়া মেরী ইংলণ্ডে এই প্রণালীতে কার্য্য করিবার সংকল্প করিলেন। আশ্রয়বিহীন ব্যক্তিগণকে আশ্রয় প্রদান করা, দরিদ্র ও দুঃখীদিগের দুঃখমোচন করা তাঁহার জীবনের এক মহৎ উদ্দেশ্য হইয়া উঠিল।

"এই সময় মেরী পিতৃহীনা হইলেন, কিন্তু ধর্ম্মপরায়ণ রমণী আপনার হৃদয়ের বিষম শোক প্রকাশিত না করিয়া ধীরভাবে মাতার সান্ত্বনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময় ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে তিনি তাঁহার বিশ্রাম সময় অতিবাহিত করিতেন। ইংলণ্ডে পিতামাতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত যে সকল শিশু পথে পথে কান্দিয়া বেড়াইত ও পরিশেষে জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য অসৎ পথ অবলম্বন করিত, তাহাদের প্রতি মেরীর দৃষ্টি পড়িল। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট নিউইন্সমিড নামক স্থানে তিনি এই সকল অনাথদিগের জন্য একটি দরিদ্র বিদ্যালয় (Ragged School) স্থাপন করিলেন এবং ইহাদিগের চরিত্রের উন্নতির বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার চেষ্টার সুফল ফলিতে লাগিল।

"অল্পবয়স্ক বালক বালিকাগণ কারাগারে প্রেরিত হইলে অন্যান্য কারাবাসীদিগের সংসর্গে থাকিয়া আরও অসৎ হইয়া যাইত। এইসকল দেখিয়া মেরী সংশোধন বিদ্যালয় (Reformatory) স্থাপন করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে কিংসউড নামক স্থানে প্রথম সংশোধন বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে এ সম্বন্ধে একটা আইন বিধিবদ্ধ হইল। মেরী দেখিতে পাইলেন যে বালক ও বালিকাদিগের বিদ্যালয় স্বতন্ত্র করা আবশ্যক এবং বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য ব্রিষ্টলে নিজ ব্যয়ে "রেড লজ" নামক গৃহ ক্রয় করিয়া দিলেন।

এবার তিনি ভারতবর্ষের হিতকল্পে জীবন উৎসর্গ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। বৃদ্ধবয়সে তাঁহার উৎসাহ কিছুমাত্র কমে নাই। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রথমবার ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। ভারতবর্ষে নিজ অভিজ্ঞতার ফল তিনি "ভারতবর্ষে ৬ মাস অবস্থিত" নামক গ্রন্থে প্রকাশ করেন। তাঁহার দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষে আগমনের ফল মহিলাদিগের জন্য নর্ম্যাল বিদ্যালয় স্থাপন এবং "জাতীয় ভারত সভা" গঠন। ১৮৬৯ খৃঃ অব্দে পুনরায় ভারতবর্ষে আগমনের পর ১৮৭৩ খৃঃ অব্দে কারাগার পরিদর্শন করিবার জন্য আমেরিকায় গমন করেন। ১৮৭৫

খৃঃ অব্দে ও শেষবার এদেশে আসিয়া স্ত্রীশিক্ষার ক্রমবিস্তার দেখিয়া বিশেষ সুখী হয়েন। এইবার তিনি বরাহ-নগরের শ্রমজীবীদিগের বাটীতে গমন করিয়া তাহাদিগের অবস্থার অনুসন্ধান করেন।

"জীবনের শেষ পর্য্যন্ত জনহিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া মেরী মানব লীলা সম্বরণ করেন। কোন প্রকার রোগযন্ত্রণা সহ্য করিয়া তাঁহাকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয় নাই। মৃত্যুর পুর্ব্বে নিয়ম মত কার্য্য করিবার পর একটী আবশ্যকীয় বিষয় লিখিয়া শয়ন গৃহে নিদ্রাগত হইলেন। সেই নিদ্রাই তাঁহার অনন্ত নিদ্রা হইল। প্রভাতে তাঁহার পালিতা কন্যা গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, প্রাণশূন্য দেহ পড়িয়া রহিয়াছে। যেদিন তাঁহার দেহ সমাধিস্থ হইল, সেইদিন বহু দরিদ্র ব্যক্তি আপনাদিগকে মাতৃহীন বোধ করিল এবং কৃষ্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সজলনেত্রে তাঁহার মৃতদেহের সহিত গমন করিল।"

মেরী কার্পেণ্টার তাঁর ডাইরী ও চিঠিপত্রে এদেশের সমাজ, স্ত্রীশিক্ষা ইত্যাদির কথা লিখে গিয়েছেন। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে তিনি এ বিষয়ে যা লিখেছেন তার গুরুত্ব আছে। J. Estlin Carpenter লিখিত—*The Life and Work of Mary Carpenter* (London, 1879) গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

কথকতা ও রামধন তর্কবাগীশ : ৭০০-২

কুশদহ নিবাসী রামরাম তর্কালঙ্কার বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর পুত্র রামপ্রাণ বিদ্যাবাচস্পতি। রামপ্রাণের পাঁচ পুত্রের মধ্যে রামধন তর্কবাগীশ চতুর্থ। রামধন শাস্ত্রব্যবসায়ী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ছিলেন। ইনি রামচন্দ্র ন্যায়বাচস্পতি মহাশয়ের অতি প্রিয়তম ছাত্র। গুরুর কাছে ব্যাকরণ সাহিত্য ও কিছুটা ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষা করে রামধন ভট্টপল্লীতে গিয়ে বিশেষভাবে ন্যায় ও স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন শেষ করেন। পরে ভট্টপল্লী থেকে ফিরে এসে গুরুর পরামর্শে একটি চতুষ্পাঠী স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। তখন কুশদহে বহু তাম্বলীবণিকের বাস ছিল। একদিন একজন সঙ্গতিপন্ন বণিক তাঁর গৃহে পুরাণ কথার অনুষ্ঠানের জন্য বাঁশবেড়িয়া নিবাসী বিখ্যাত কথক গদাধর শিরোমণি ও কৃষ্ণহরি ভট্টাচার্য্যকে নিমন্ত্রণ করেন। গদাধর শিরোমণি তখনকার শ্রেষ্ঠ কথক ছিলেন এবং তাঁর কিছুটা অহংকারও ছিল। কুশদহ-খাঁটুরা অগঙ্গা দেশ এবং সেখানে কৃষ্ণভক্ত লোকের বাস নেই বলে গদাধর বায়না নিয়েও তা ফেরত দেন এবং কৃষ্ণহরি কথকতা করতে আসেন। কৃষ্ণহরি রামধনকে ধারক নিযুক্ত করেন। নির্দিষ্ট সময়ে পুরাণকথা শেষ হয়ে যায়। কিভাবে কথকতা করতে হয় তার কৌশল রামধন এই সময় শিক্ষা করেন।

রামধনের রচনাশক্তি বাল্যকাল থেকেই অত্যন্ত প্রখর ছিল। খুব সামান্য বিষয়

নিয়েও তিনি অতি প্রাঞ্জল মধুময় ভাষায় রচনা করতে পারতেন। একদিন তাঁর গুরু ন্যায়বাচস্পতি মহাশয় তাঁকে বলেন: "রামধন! কৃষ্ণহরি যে প্রণালীতে কথকতা করে থাকেন তা তুমি সম্প্রতি নিশ্চয় ভাল করে লক্ষ্য করেছ। তোমার কণ্ঠস্বর কৃষ্ণহরির চেয়ে কোন অংশেই কর্কশ নয়, বরং অতীব মধুর। সুতরাং আমার ইচ্ছা তুমি কথকতাবৃত্তি অবলম্বন কর। তাতে বিলক্ষণ দুপয়সা উপার্জনের সুবিধা হবে। 'কুশদ্বীপ কাহিনী'তে লিখিত আছে: "কৃষ্ণহরির কথকতার প্রণালী দেখিয়া রামধনেরও পূর্ব হইতে একপ্রকার বিরক্তি জন্মিয়াছিল এবং এই প্রণালী সংশোধন ও রচনাদি সুললিত করিয়া লইলেন, কথকতা দ্বারা সাধারণকে যেমন জ্ঞানশিক্ষা প্রদান করিতে পারা যায়, তেমনই উহাতে দুই পয়সা লাভ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা, অথচ উহা শাস্ত্রানুমোদিত বৃত্তিও বটে, এই ধারণা জন্মে। বিশেষতঃ তদীয় গুরুদেবও তাঁহাকে এই ব্যবসায় অবলম্বন করিতে উপদেশ প্রদান করিতেছেন দেখিয়া রামধন কথকতার এক পরিশোধিত প্রণালী উদ্ভাবন করিয়া এই ব্যবসায় অবলম্বন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। এই সময়ে রামধনের বয়স অষ্টাদশ বর্ষ।"

রামধনের অভিনব কথকতাপ্রণালী ও তাঁর খ্যাতি-প্রতিপত্তি সম্বন্ধে 'কুশদ্বীপ কাহিনী'কার লিখেছেন:

"যথার্থ কথা বলিতে কি, রামধনের পূর্ব্বে গদাধর শিরোমণি ও কৃষ্ণহরি ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি যে কথকতা করিতেন, তাহা মহাভারত ও ভাগবতীয় কথা বলিয়াই সাধারণের ভক্তি আকর্ষণ করিত ও তাহাই লোকে একমনা হইয়া শ্রবণ করিত। কিন্তু তৎপরে রামধন যে প্রণালী উদ্ভাবন করিলেন, তাহা সাধারণের ধর্ম্ম শিক্ষার ও ভক্তি আকর্ষণের যেমন মহাস্ত্রস্বরূপ হইয়াছিল, উহার রচনাপারিপাট্য, সঙ্গীত সমাবেশ, সাময়িক বর্ণনা, সুললিত বাক্যবিন্যাস যোগ্যতা প্রভৃতিও লোকসাধারণের তেমনই প্রীতিকর হইয়াছিল। ফলতঃ সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক যিনি যে ভাবেই তাঁহার কথকতা শ্রবণ করিতেন, তিনি সেই ভাবেই চরিতার্থ ও মোহিত হইতে পারিতেন। বলিতে কি, রামধনের কথকতা এরূপ শ্রুতিমনোহর ও লোকশিক্ষার অমোঘ উপায় হইয়া উঠিল এবং সাধারণে এতদূর আগ্রহ সহকারে তাঁহার কথা শ্রবণ করিত যে, দ্বিসহস্র আবালবৃদ্ধ বণিতার সমাবেশ একটী সামান্য সূচীপাত স্বর অনায়াসে শ্রুতিগোচর হইত। ফলতঃ আমরা সাহঙ্কারে বলিতে পারি যে, কুশদ্বীপে বহুতর মহামহোপাধ্যায় সুধীমণ্ডলীর জন্মস্থান; কিন্তু সেই সকল খ্যাতনামা মহাপুরুষগণের জন্ম না হইয়া, কুশদ্বীপে এক রামধনই যদি জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলেও কুশদ্বীপের মুখচন্দ্র স্বতঃ আলোকিত হইত এবং কস্মিন্ কালেও সেই বিমল মুখমণ্ডল কলঙ্কিত ও রাহুগ্রস্ত হইত না।"

দীনবন্ধু মিত্র তাঁর সুরধুনী কাব্যে কথক রামধন সম্বন্ধে লিখেছেন:

"ভদ্র-জন বাসস্থান, গরিফা নৈহাটী,
ভাটপাড়া যথা চতুষ্পাঠী পরিপাটী।

পণ্ডিত মণ্ডলী করে শাস্ত্র আলাপন,
ব্যাকরণ ন্যায় স্মৃতি ষড় দরশন।
এই স্থানে রামধন কথক রতন,
কলকণ্ঠ কলে কল করিত কলন।
সুললিত পদাবলী বিরচিত তাঁর,
সকল কথক সুরে করিছে বিহার।"

রামধন ৬০।৬৫ বছর বয়সে গণেশ ও শ্রীশ নামে দুই পুত্র ও স্বর্ণময়ী নামে এক কন্যা রেখে পরলোকগত হন। কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীশ সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করে'বিদ্যারত্ন' উপাধি পান এবং এই শ্রীশ বিদ্যারত্নই প্রথমে বিধবার পাণিগ্রহণ করে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহ মতের প্রচলন করেন। রামধনের ভ্রাতুষ্পুত্র ধরণীধর তাঁর কাছে কথকতা শিক্ষা করে বাংলাদেশের অদ্বিতীয় কথক বলে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। শ্রীশচন্দ্র পিতার স্মৃতিরক্ষার্থে বামোড়ে একটি ঘাট এবং সেই ঘাটে দুই পাশে দুইটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করে এই শ্লোকটি খোদাই করে দেন:

"শাকেশবাঙ্ক শৈলেন্দৌ থাকঢা কঙ্কণাতটে।
তীর্থং সূর্য্যমণির্দ্দেবী নিম্মমে শ্রীসুবিদং॥
পঞ্চনব সপ্তশশী সংখ্যশকহায়ণে
ঘট্টতটতোরণ সুশোভি মঠযুগ্মকে
সূর্য্যমণিব গ্রজন্মুঃ রামধনগেহিনী
শ্রীশজননীশ যুগমত্র সমতিষ্ঠিপৎ।"

—দুর্গাচরণ রক্ষিত: কুশদ্বীপ কাহিনী (১৩০৮ সন) ? পৃষ্ঠা ১৬৫-৭৪

নির্ঘণ্ট

রূপচাঁদ পক্ষী

উনিশ শতকের স্বভাবকবিদের মধ্যে বাংলাদেশে যাঁরা বিশেষ লোকপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে রূপচাঁদ দাস অন্যতম। নিধুবাবু, ঈশ্বরগুপ্ত ও কলকাতার অন্যান্য সম্ভ্রান্ত সঙ্গীতরসিকরা রূপচাঁদকে 'পক্ষীরাজ' উপাধিতে সম্মানিত করেন। রূপচাঁদের পূর্বপুরুষরা উড়িষ্যাবাসী ছিলেন। উড়িষ্যায় চিল্কা হ্রদের কাছে তাঁদের বসবাস ছিল। রূপচাঁদের পিতা গৌরহরি দাস উড়িষ্যার দেশীয় রাজা হরিহর ভঞ্জের আমমোক্তার ছিলেন এবং কাজের জন্য তাঁকে অধিকাংশ সময়ে কলকাতা শহরে গড় গোবিন্দপুর অঞ্চলে (বর্তমান ফোর্ট উইলিয়াম) থাকতে হত। রূপচাঁদ জন্মগ্রহণ করেন ১২২১ সনে, ইংরেজি ১৮১৪ সালে। কলকাতায় বৌবাজারে মলঙ্গা অঞ্চলে রূপচাঁদের বাল্যকাল কাটে। কৈশোর পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শেখেন এবং ডেভিড হেয়ারের স্কুলে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহনের কাছে কিছু ইংরেজি শিক্ষারও সুযোগ পান। কিন্তু লেখাপড়ায় অমনোযোগী হওয়ার জন্য বাংলা বা ইংরেজি কোন ভাষাই ভাল করে তিনি শিখতে পারেননি। হিন্দী উড়িয়া তৈলঙ্গী প্রভৃতি কয়েকটি প্রাদেশিক ভাষায় রূপচাঁদের বেশ দক্ষতা ছিল, তিনি এই সমস্ত ভাষায় বেশ স্বচ্ছন্দে কবিতা ও সঙ্গীত রচনা করতে পারতেন।

সঙ্গীত রচনা ও চর্চার দিকে রূপচাঁদের ছেলেবেলা থেকে ঝোঁক ছিল। তিনি সেকালের বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞদের কাছে গীতবাদ্যের অনুশীলন করেন। পাঁচালি, আখড়াই, রামায়ণ, কৃষ্ণমঙ্গল, যাত্রা, অপেরা, ঢপ, কবি, গাজনের সঙ এবং অন্যান্য নানাবিধ গীত রচনায় তাঁর শক্তির পরিচয় জনসমাজে অল্পদিনের মধ্যেই প্রকাশ পায়। প্রভাকর, রসরাজ সোমপ্রকাশ প্রভৃতি পত্রিকায় সঙ্গীত ও কবিতা নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে। তাঁর স্বভাবকবিত্বের শক্তি গুণীজনেরা স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হন না।

রূপচাঁদের কবিত্বশক্তির বিচিত্র বিকাশ হয় সামাজিক ব্যঙ্গগীত রচনার ক্ষেত্রে। তাঁর সমসাময়িক সামাজিক জীবনের নানারকমের উপসর্গ, আর্থিক ও রাজনৈতিক সমস্যা ইত্যাদি নিয়ে রূপচাঁদ পক্ষী বহু গীত রচনা করেছেন। বস্তুত কোন উল্লেখ্য সমস্যা তাঁর সজাগ দৃষ্টি ও নির্মম বিদ্রূপবাণ এড়াতে পারেনি। 'সঙ্গীত রস কল্লোল' মনে হয় রূপচাঁদের একমাত্র গীতসংগ্রহ, যা তাঁর জীবদ্দশাতে প্রকাশিত হয়েছিল। কেবল রূপচাঁদের কবিত্বশক্তির নিদর্শন হিসেবে নয়, তৎকালের সামাজিক জীবনের খণ্ডচিত্র হিসেবেও রূপচাঁদের গীতগুলি লুপ্ত হয়ে যাওয়া উচিত নয় মনে করে আমরা অতীব দুষ্প্রাপ্য 'সঙ্গীত রস কল্লোল' এই সঙ্গে পুনর্মুদ্রিত করলাম। বাংলাদেশের যে সময়কার সমাজচিত্র সোমপ্রকাশ পত্রিকার রচনাসংকলনের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে, রূপচাঁদের গীতগুলি সেই চিত্রকে আরও পূর্ণাঙ্গ করতে সাহায্য করবে। —সম্পাদক